

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA  
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Title and No.: KLMLGK 2007	Place of Publication: ওদ, (কলিকাতা) (মদ, গুরুতর)
Collection: KLMLGK	Publisher: বিজ্ঞান প্রকাশনা
Title: প্রবন্ধ	Size: 7" x 9" 17.78 x 22.86 c.m.
Vol. & Number: 2/2-V	Year of Publication: ১৯৬৮-৬৯, ১৯৬৬
	Condition: <input checked="" type="checkbox"/> Brittle: <input type="checkbox"/> Good
Editor: প্রবন্ধ প্রকাশনা	Remarks:

C.D. Roll No. KLMLGK



চিত্র	পৃষ্ঠা	চিত্র	পৃষ্ঠা
জাপানের একটা উৎসব	১৩১৫	বরফের উপর নটলাসু-মার্শিগণ	১৩৪
শুনী উৎসবে ধর্মসিদ্ধি	ঐ	বাতাশে ঢালাইবার মটর	১৪৫১
জাপানের নৃত্যরীতি	১৩১৬	বৌদ্ধগুপের হাপত্য-নিদর্শক বুদ্ধমূর্তি	১৪৬
জাখান ছাত্রগণের স্বেচ্ছাসেবকতা	ঐ	ভায়ামান চুছুই এর দল	১১৭৫
জন শুটেনবার্গ ; ফ্রেডারিক কনিগ্ ; মেগোহেলার ;	এক্স	জন হিডেনবাগের প্রতিমূর্তি	১১৭৫
মেহলি ও ; রিচার্ড মার্চ হো ; কেকটন ও জন ফাট	১৩৪৬	তুলনেশ্বর মন্দির—উত্তর দিক হইতে	১২০২
টেগিলোনে বজ্রার চিত্র-প্রদর্শন	১৪৫১	তুলনেশ্বর মন্দির—উত্তর পূর্ব দিক	১২০২
টেগিলোর সাম্প্রদায়িক ভোজনালয়	১৪৫৮	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৮৩৭
ভিক্রগড়ে আবিস্কৃত ও কামরূপ অত্মসজ্জান-সমিতি- গৃহে লক্ষিত পিতলের চূর্ণাঙ্গুষ্ঠ ও বিকুমুষ্ঠি	১৩৪৮	মহাপ্রস্থানে হরপ্রসাদ	১০২
চুড় পরিষ্কৃত করিয়া বোতলে পোরা হইতেছে	১১৭২	মাটার বন্দর	১৩৮
দগুদীর বাড়ী	১৪৪৯	মাটার রাজধানী ভ্যালিটা	ঐ
দাক্ষিণাত্য হইতে সর্পপূজার নিদর্শন	১৪৮২	মহাশ্মার গুহ ছাগলদে দোহন করা হইতেছে	১০২৫
নরেন-নরোবর তীরে শ্রীগৌরাস্তের উপবেশন-স্থান	১২০২	ম'সিয়ে এম পোল চুছুই লইয়া বসিয়া আছেন	১০২৭
নটলাসের বার্ষিকে পৌছিবার সময়	১৩১৩	ম'সিয়ে এম পোল চুছুইদের লইয়া খেলা করিতেছেন	ঐ
গ্রোড়ে রবীন্দ্রনাথ	১০৪১	মাটার তলায় বাসগৃহ	১০২৮
পুবিবার সর্পাপেক্ষা ক্রতগামী রেলগাড়ী	১১৭৪	মনীষী রোমের রোলে	১০৩১
পরশুরামের মন্দির	১২০৩	মহাশ্মাজী ও ডাঃ হিউলট জনসন	ঐ
ঐশ্বর্য কৃষ্ণ-মহাদেবের অর্ঘ সাহায্যে নৃতন উপনিবেশের বেড়ায় রহু করা হইতেছে	১৪৫৮	মহাশ্মাজী ও শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু একজন ভারতীয় মহিলার সহিত কথা বলিতেছেন	১০৩২
কোডারেল কমিটার অবদানে মালবাজী	১০৩০	মহাশ্মাজী বাসনা বজ্র তা দিতেছেন	১০৩৩
কোডারেল ঠাকুরার সাবকমিটিতে সভাপতির পার্শ্বে	ঐ	মাণায় টাকওয়ারাদের উপাসনা	১০৩৫
মহাশ্মা ও তাহার পরে মালবাজী	১০৩০	মদ্যপন্থা দ্বাৰা	১০৩৫
কোডারেল একটা পরীক্ষা	১৪৫০	গ্রাইকেল ফেরাডে	১৪৪৯
কোডারেল আর একটা পরীক্ষা	ঐ	মাহুয়ের গুহের পরিমাণ জানিবার ময়	১৪৫৯
বর্ধমানে অহুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে হরপ্রসাদ	১০৩	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	১৪৫৫
বিলাতে মহাশ্মাজীর ঘরের ভিতরকার অবস্থা	১০২৯	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	১৪৫৮
বিলাতে একটা বালক ও একটা বালিকা মহাশ্মাকে কমলালের দিতেছে	১০৩০	রাজপুতানা জাহাঙ্গে মহাশ্মাজী ও শীরাবাই	১০২৯
বিলাতে পৌছিবার পরে মহাশ্মাজী	১০৩২	রবীন্দ্রনাথ	১০৪৪
		রবীন্দ্রনাথ—উৎসবাস্থে	১০৪৮
		রবীন্দ্রনাথ	১০৫২
		'রীক'-পুস্তকের দোকান	১৪৪৯

চিত্র	পৃষ্ঠা	চিত্র	পৃষ্ঠা
লণ্ডনে নামিলে মহাত্মা ও শ্রীসুন্দর দেবোজিনী নাইডু	১০৩১	বামী বিবেকানন্দ	১০৩১
শিলা-কালীমূর্তি—নিবসাগর	১০৩২	আলেকজান্ডারসক্স প্রতিকৃতি দেখাইতেছেন	১০৩২
শিলা-কালীমূর্তি	১০৩৩	স্বর্গ-রশ্মির চিকিৎসালয়	১০৩৩
প্রোভাক মিডকা (শ্রীমতী)	১০৩৪	স্বর্গ-রশ্মির চিকিৎসালয়ের একটি বাহুর ভিতরের দৃশ্য	১০৩৪
শোনপুরের ফেরীঘাট	১০৩৫	সংবাদ	১০৩৫
শিলাস্তম্ভ হইতে ফোঁসিত সপ্তমূর্তি	১০৩৬	সিংহমূর্তি অঙ্কিত অমরাবতীর স্তম্ভ	১০৩৬
সাইপ্রাসের চর্ভেজ ভাটিন দুর্গ	১০৩৭	স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রামাণিক	১০৩৭
সাইপ্রাসের দ্বিতীয় শহর লাইমসন	১০৩৮	হল টার্কিশিয়ান শহরের সাধারণ দৃশ্য	১০৩৮
বীর পাঠাগারে রবীন্দ্রনাথ	১০৩৯	হরিন্দাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দির	১০৩৯
সৌন্দর্য রাধাবার অদ্বুত দ্বারনা	১০৪০	হরিশ্চন্দ্রের মেলা	১০৪০
সাবমেরিগ সমুদ্রের গর্ভে নামিয়া বাইতেছে	১০৪১	হর্স-শু-ইলেক্ট্রো মাগনেট	১০৪১
সামোয়েল হাট-পিয়ার পয়েন্ট কলেজের ছাত্রগণ	১০৪২	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১০৪২
পাহাড় উঠিতেছে	১০৪৩	হঠযোগী নরসিংহ	১০৪৩
সেল মাইনর ইংরেজী বিজ্ঞানালয়ের কয়েকজন ছাত্র	১০৪৪	হবারনিউকিনের ক্রিস-উপনিবেশের একটি দৃশ্য	১০৪৪
সেলার সাম্প্রতিক হরিসভার একটি অধিবেশন	১০৪৫	জুসতম ঘোষক	১০৪৫

## নিবেদন

পঞ্চম সংস্করণের বর্তমান নিয়মাবলীতে পত্রিকাখানি প্রতি মাসের পঞ্চাশতাব্দীতে প্রকাশিত হয়। তাহার পর পুণ্ডলিকোট নতুন প্রেস ডিকারেশনের জন্ত কয়েকদিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রতিমাসের প্রথম তারিখে পত্রিকাখানি বাহির করিবার বন্দোবস্ত হইল। আমরা ১৩৩৯ সালের অক্টোবর মাস হইতে পঞ্চম সংস্করণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করিতেছি। পঞ্চম সংস্করণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ (১৩৩৯) বাহির হইবে। আশা করি গ্রাহকগণ আমাদের ক্রটি ক্ষমা করিয়া পঞ্চম সংস্করণে গ্রাহক থাকিয়া আমাদের উৎসাহ দৃষ্ট করিবেন।

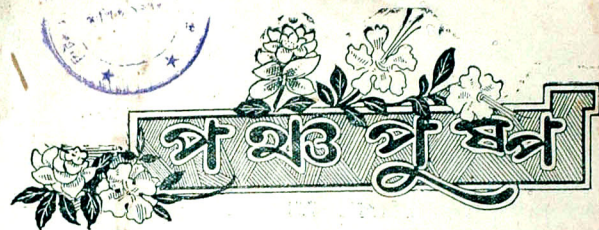
ভি: পি:তে বুধা কিছু পরমা নষ্ট হয়। ২৫ এ জুলাইর মধ্যে গ্রাহকগণ অগ্রহ করিয়া পঞ্চম সংস্করণের প্রথম সংখ্যা গ্রহণ করিবেন। ইহাতে উভয়েরই সুবিধা। বাহারা টাকা ঐ তারিখের মধ্যে পাঠাইবেন না তাহা হইলে নামে আমরা অক্টোবর মাসের ভি: পি: করিব। বাহারা গ্রাহক থাকিবেন না তাহারা অগ্রহণযোগ্য পত্রিকা জানাইবেন। নতুন আবাদিগণের বুধা কতিগাহ হইতে হইবে।

পঞ্চম সংস্করণ



মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী





৭২২৩

সচিত্র মাসিক পত্র

চতুর্থ বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

কান্তিক—চৈত্র ১৩৩৮



সম্পাদক—শ্রীঅনুল্যভরণ বিদ্যাভূষণ

—পঞ্চপুষ্প কার্যালয়—

৩১, তেলীপাড়া লেন, কলিকাতা



## বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অমরাবতী—শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ		১৫৮১	গীতার অঙ্গুর বীজ (প্রবন্ধ)—জিতেন্দ্রনাথ বসু বি-এ		১৩৬২
অভিভাষণ—স্বরেন্দ্রনাথ কুমার		১৫৯০	গৌরীর তপস্যা (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক ফণীকৃষ্ণ রায় এম-এ		১৩৭১
আঘাত (কবিতা)—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী		১৬৫	গ্রন্থকার গোবিন্দের সন্ধান (আলোচনা)—অচ্যুতচরণ চৌধুরী		১৪৮১
আর তুলিস্তো না (কবিতা)—অনিলবরণ রায়		১০৯৪	তহনিমি		১৪৮১
আলাপ-আলোচনা	১৫২৯, ১১৮০, ১২৮৪, ১৬০০		গ্রামের বধু (কবিতা)—কনককৃষ্ণ মৃণোপাধ্যায়		১৫৫৭
আলোচনা	১৪৭, ১১২৮, ১১৮৪		জ্ঞান-সিদ্ধ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (কবিতা)—অধ্যাপক প্যারীমোহন		৮৯৯
আদি পরিণয় (কবিতা)—স্বকুমার সরকার		১৫৪৪	সৈনগুপ্ত		৮৯৯
আধারে আলো (গল্প)—শ্রীমতী রোয়া ঘোষ		১১৩৬			
ইরাণীরগণের উপনয়ন ও বিবাহ-প্রথা (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক			চন্দ্রকোণা (প্রবন্ধ)—মৃণালনাথ রায়		১২৯১
অশোকনাথ ভট্টাচার্য, এম-এ		১২৮২	চাবির গোছা (গল্প)—অধ্যাপক ফণীকৃষ্ণ রায়, এম-এ		১৪৭৯
এপ্রিয় ফুল (গল্প)—বিরামকৃষ্ণ মৃণোপাধ্যায়		১৭৬	চিত্রকর (চিত্র)—শচীন্দ্রমোহন সরকার, এম-এ, বি-এল		১৫৪৩
কবিচর্চা (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক অশোকনাথ ভট্টাচার্য এম-এ		১৩৭৪			
কোবিদ-কুল-পুণ্ড্র-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—জ্যোতিষচন্দ্র চট্টো-			ছন্দ-প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—প্রবোধচন্দ্র সেন, এম-এ		১২৭৭
পাধ্যায় ভাগবতকৃষ্ণ		১৩৭	ছড়া (সংকলন)—ইন্দুবিকাশ বসু, এম-এ বি-এল		১১০৬
					১৩৬৭
গান—অক্ষয়কুমার সিংহ		১৪২০	জয়ন্তী (কবিতা)—করণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়		১৫৬৯
গোবিন্দ ভরন (কবিতা)—চন্দ্রশঙ্কর রায়চৌধুরী, এম এ		১৩৬৮	জানবার কথা		১২৭
			জেনেভা-ভ্রমণ (ভ্রমণ)—স্বয়ং দেবপ্রসাদ		১৫১২
কি ? (প্রবন্ধ)—জিতেন্দ্রনাথ বসু বি-এ		১১৪৫	সর্বাধিকারী,		
			কে, জা		

[illegible]



## বর্ণানুক্রমিক চিত্র-সূচী

ক্র	পৃষ্ঠা	চিত্র	পৃষ্ঠা
অনুভূতি সিং-বিশিষ্ট গাড়ী	১০২৬	উন্নতির চরমকালের সাউথজার্নের হাতে টাকা দিয়া	
স্বর্গীর অবতার চন্দ্র লাহা	১০৩৮	স্টেটবার্গের চেষ্টা	১০৪৭
অলিম্বিক ক্রীড়া ভূমি	১১৭৪		
অনন্য স্তম্ভ	১২০৬	একজন শ্রমিক শোধান করিতেছেন	১১৭২
অর্থ	১৪০৩	একজন ছদ্মদোহন করিয়া আসিতেছে	১১৭১
অমরাবতীর হিন্দু-মন্দিরের বেদী	১৪০৩		
অমরাবতীর স্থাপত্য-নিদর্শন বৃক্কের বিশিষ্ট আসন	১৪৮৪	ওয়েস্টমিনস্টারের ছাপাখানার কেবল	১০৪৯
অমরাবতীর প্রাচীন হিন্দু মন্দির	১৪৮৪		
আসামের কয়েকটা মূর্তি	৯৯৫	কবির বিশ্বকর্মা টমাস এডিসন	১০২৫
আমেরিকাবাসী ভারতীয় পরিবার বেতারের সাহায্যে		কয়েকজন কর্মী	১০১৮
মহাদ্বার বাণী প্রবণ করিতেছেন	১০২৬	কানিংহাম-নির্মিত স্বাস্থ্য-নিবাস	১৫৬০
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	১০৪৯	গো-দোহন করিবার উপায়	১১৭২
আচার্য্য সি, ভি, রমণ	১০৫০	গাড়ীর বাটে যয় লাগান হইতেছে	১১৭২
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র	১০৫৪	গাড়ীর বাটে লাগান যয়	১১৭৩
আলালনাথের মন্দির [ দ্বিতীয় স্তম্ভ ]	১২০৮	গাড়ী-আরউইন গ্রেডিয়াস	ঐ
আলালনাথের মন্দির	১২১১	গুপ্তযুগের স্থতিকল্পে ফুলোংসব	১২০৪
আটিক মহাসাগরের উপর নটালাস	১০১৩	গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫০৬
আটিক মহাসাগরের মধ্যে বরফের উপর হইতে বেতারের		ঐক আদর্শের নিদর্শন	১৫৮৩
অন্তহানে সংবাদ প্রেরণ	১০১৩		
আবিস্তৃত মুদ্রাযন্ত্র, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের	১০১৩	চতুর্দশের জীবন রক্ষার নতুন উপায়	১১৭৫
আধুনিক ছাপাখল	১০৫১	চন্দ্রনাথ বসু	১৫০৮
ইহার সাহায্যে তাহার আটাত্তিক মহাসাগর পার			
হইবার অল্প প্রসঙ্গ হইয়াছে	১৫৬০	জনাড়ন মূর্তি—গোহাতি	৯৯৩
উত্তরায়ণে (২৫ বৈশাখ গৃহীত)	১০৫২	জন্মান্তর উৎসব উল্লেখ বিলাতের ভোজে মহাদ্বারী	১০৩২
উত্তরায়ণে শরদ গৃহে	ঐ	জগদীশ-উৎসব—পরিষদ-প্রদত্ত অর্থদান	১০৩৭
উত্তরায়ণে কয়েকজন ভক্ত	ঐ	জগদ্রাধনদেবের মন্দির [ প্রথম স্তম্ভ ]	১২০৮
উত্তরে গায়ে জ্যামিতি-মূলক চিত্র	১১৭৪	জগদ্রাধনদেবের মন্দির	১২০৯
		জাপানের নতুন প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সহধর্মিণী	১০৮৪



দ্বিতীয়ার্দ্ধ

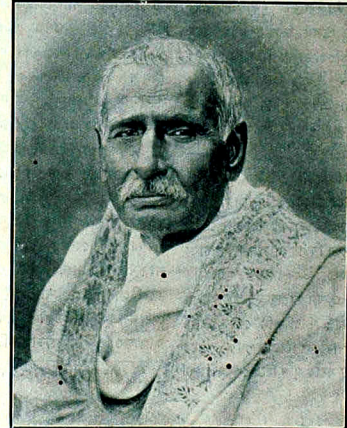
চতুর্থ বর্ষ, ১৩৩৮

প্রথম সংখ্যা  
দ্বিতীয়

## হরপ্রসাদ

শ্রীরাধাকান্ত ঠাকুর

আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নতুন যুগের পুরাতত্ত্ব সঞ্চয়ে তাঁর রচনা ইংরেজী ভাষাতেই প্রকাশ অবতারণা দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে হোত। কিন্তু আধুনিক কালের বিজ্ঞানবাহার জনো



বাংলা ভাষার মধ্যে খাত  
খবন করার কাজে তিনি  
প্রধান অগ্রণী ছিলেন,  
তাঁর স্বাক্ষর প্রকাশিত  
বিবিধার্থ-সংগ্রহ তাঁর  
প্রথম। তাঁর লিখিত  
বাংলা ছিল স্বচ্ছ প্রাঞ্জল  
নিরলঙ্কার।

সে অনেক দিনের  
কথা। সেদিন একদা  
পুস্তকীয় অগ্রণী স্মৃতি-  
রিজ্ঞানার্থের সঙ্গে এজেস-  
লাল মামিকতলার  
বাড়িতে কী উপলক্ষ্যে,  
গিয়েছিলুম সেটা উল্লেখ-  
যোগ্য। বাংলায় বৈজ্ঞানিক  
পরিভাষা বেঁধে দেবার  
উদ্দেশ্যে তখনকার দিনের  
প্রধান লেখকদের নিয়ে  
একটি সমিতি স্থাপনের

সকল অসম্মিষ্ট উপাদানের  
মধ্যে বিকল্প সত্যকে  
উদ্ধার করবার কাজে  
রাজেন্দ্রলাল আমাদের  
কৃত্তি দেখিয়েছিলেন।  
প্রদানত ইংরেজী ভাষায়  
ও যুরোপীয় বিজ্ঞানে তাঁর  
মন মাহুত হয়েছিল;

মহামোহাপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী



সময় মনে ছিল। তাতে বহিষ্কৃতকেও এনেছিলাম।  
বিভাগসাগরের কাছেও সাইন করে রাখি। সে। তিনি  
বললেন, তোমাদের উদ্দেশ্য ভালো সটকে নেই কিন্তু যদি  
সাধন করতে চাও তা হলে আমাদের মতো “হোমরা-  
চোমরা”দের কখনই নিয়োন, আমরা কিছুতে মিলতে  
পারিনে। তার কথা কতক অংশে খাটল, হোমরাচোমরার  
দল কেউ কিছুই করেননি। যত্নের সঙ্গে কাজ আরম্ভ  
করেছিলেন একমাত্র রাজেন্দ্রলাল। সমিতির প্রত্যেকের  
কাছে ফেরি করিয়ে নেবার জন্যে তিনি ভৌগোলিক পরিভাষার  
একটি বসড়া লিখে দিলেন। অনেক চেষ্টা করলুম  
সকলকে ছোট করতে, মিলিয়ে কাজ করতে, তখনকার  
দিনের লেখকদের নিয়ে সাহিত্য-পরিষদ খাড়া করে  
ভুলতে—পারিনি, হয়তো নিজেই অক্ষমতাবশত। তখন  
বসড়া এত অল্প ছিল যে অনেক চেষ্টায় ঝাঁপে টেনেও ছিলুম  
তাদের কাছে লাগতে পারব না।

আজ মহামহোপাধ্যয় হরপ্রসাদের মৃত্যু উপলক্ষ্যে  
শোকসভার রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই  
যে আমার মনে এই দুঃস্বপ্নের চরিত্রচিত্র মিলিত হয়ে আছে।  
হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছিলেন।  
আমি তাদের উভয়ের মধ্যে একটি গভীর সাধুস্ব লক্ষ্য  
করেছি। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জলতা একই  
শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের মধ্যে ছিল পারস্পরিকতা—  
যে কোনো বিষয়ই তাদের আলোচ্য ছিল তার জটিল গ্রন্থি-  
গুলি অন্যায়সেই মোচন করে দিতেন। জ্ঞানের গভীর  
দীপ্যকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে  
এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাদের বিজ্ঞান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য  
সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষলাভ করেছিল।  
অনেক পণ্ডিত আছেন তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই পানেন  
কিন্তু আরম্ভ করতে পারেন না; তাঁরা খনি থেকে তোলা  
বাড়ুলি ওটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক করতে  
শেখেননি বলেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা

ভারী করেন। হরপ্রসাদ যে মূর্খো জ্ঞানের তপস্ভার-প্রবৃত্ত  
হয়েছিলেন সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কার-  
মুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল।  
তাই হুল পাণ্ডিত্যধন্যই বাধা মত আত্মত্ব করা তাঁর পক্ষে  
কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না। ভূমোদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে  
এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সেই সঙ্গে স্বচ্ছ ভাবের প্রকাশের শক্তি  
আজো আমাদের দেশে বিরল। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা  
নেই এইটাই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই।  
অধিকাংশ হলেই আমরা কম শিক্ষার বেশি মার্কা পাবার  
আভাস্য। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের  
দলে এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য-পরিষদে হরপ্রসাদ  
অনেকদিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব  
প্রসার্যে করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্র-  
লালের সহযোগিতায় ঐতিহাসিক মোসাম্বিকের বিভাজ্যে  
নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরল বয়সে  
তিনি যে অশ্রুত তপস্বী করেছিলেন সাহিত্য-পরিষদকে  
ভারই পরিণত ফল দিয়ে এককাল সতেজ করে রেখেছিলেন।  
এমন সম্বাদীন স্রবোগ পরিষদে আর কি কখনো পাবে?  
বাদের কাছ থেকে দূরত্ব মান আমরা পেয়ে থাকি কোনো  
মতে মনে করতে পারিনে যে, বিখ্যাত দক্ষিণাধারী তাঁদের  
বাহকে মৃত্যু কোনোদিনই নিশ্চেষ্ট করতে পারে। সেই  
জন্তে যে বয়সেই তাঁদের মৃত্যু হোক দেশ অকাল মৃত্যুর  
শোক পায়, তর কারণ আলোক নিরাসনের মুহূর্তে  
পরবর্তীকের মনে তাদের জীবনের অমৃতত্ব দেখতে পাওয়া  
যায় না। তবু দেবদার মরণেও মনে আশা রাখতে হবে যে,  
আজ গীর হান শূন্য, একলা যে আসন তিনি অধিকার  
করেছিলেন সেই আসনেরই বর্ণা শক্তি সঞ্চার করে  
পেয়েন এবং অতীতকালকে যিনি দখল করেছেন তাই-  
কালকেও তিনি অলক্ষ্যভাবে চরিতার্থ করবেন।

\* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শোক-সভার পরিচয়।

## জ্ঞানসিক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

নম প্রশান্ত জ্ঞানের সিক্ত,

বকে ভারত-কণার গণি,

গণি অপরূপ, গণি উজ্জ্বল,

ইতিহাস-গণি, কত বা গণি!

সিক্ত, তোমার বেলায় দাঁড়িয়ে

হেরিছে ভারত বিশাল কত,

হেরিছে আর্গ্যকীর্তি-কাহিনি

কিবা সীমাহীন, কি উন্নত!

তব তরঙ্গ-ভঙ্গে নিমগ্ন

অতীত ভারত কল্যাণিষা

হ'ল জাগ্রত, হ'ল বেগবান,

পুরাণ মৌদের শূন্য হিয়া।

তোমারি মাঝারে গণি খুঁজিবারে

ছুটেছি আমরা ক্ষুদ্র দীর্ঘ,

হে সাগর, তুমি ছিলে অপরূপ,

অভিসমাণ্ড, ছিলে না হীন।

ওহে বন্ধিম-শিষ্য মহান,

তাহার স্মৃতির বাহক তুমি,

তব ব্যাখ্যায় সেই বন্ধিমে

উজলি ভুলালে বসন্তকুমি!

জ্ঞানের সিক্ত, প্রণাম তোমারে,

ইতিহাসকারী তোমারে নমি;

কালিদাস-সেবী তোমারে প্রণাম,

নম বন্ধিম-শিষ্য, শমী।



## স্মৃতি-তর্পণ

স্বায়ং দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী

বাঙ্গালার নাম করিবার লোকের অভাব ক্রমশঃ অতি দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে। এক এক মহারথের পতন হইতেছে, আর উৎকর্ষ ভোগ্য বাঙ্গালা কাতরবধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'ইহার যান কে লইবে?' ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে এই একই প্রশ্ন স্বদীর্ঘ নিখাসের সহিত উন্মিত হইতেছে, কিন্তু সহস্রর নামই।

মহানহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মণ্ডাশয়ের অক্ষম্যে তিরোধানের এই প্রশ্ন আমার উদ্ভিগ্নাচ্ছে। সহস্রর পূর্ণাঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

সংস্কৃত, পাণি, বাঙ্গালা, প্রাকৃত ইংরেজীসকল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই তুল্য-বন্দী। তুল্য-কৃতী তুল্য-অধ্যবসারী হরপ্রসাদের যান কে লইবে?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক চক্রান্ত-বৃহৎকর জালে শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণাভাতি কিছুদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত্ত রান হইয়াছিল। সে রানতা দূর করিয়া তাঁহাকে স্ব-ক্ষেত্রে ও স্ব-সৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটাইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিতসমূহ পুণ্ডর সর্বস্ব প্রশ্ন করিয়াছিলেন, হরপ্রসাদ পালির জানে কি? প্রশ্নের এই অস্তিত্বনীয় আপদ্বিটাই প্রশ্নের উত্তর হইয়াছিল। তাঁহার পালি জানা না থাকিলে কিছুই জানা ছিল না। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রশ্নের আংশিক উত্তর দিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাভাজন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৭২ বৎসর বয়সে মৃত্যুর সময় ধর্ম্মগত তাঁহার হেঁ স্তু ও সবল ছিল। শিলালঙ্গ ঠেগানের প্রাকৃতক্ষেত্রে তাঁহার মেরুশ ও ভাবিয়া দেওয়াতে কর্ণের শিখিতা শেষ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত করেন নাই। রাত্রি ১১টায় মৃত্যু হয়। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সকল জ্ঞানের সহিত শাস্ত্র, সাহিত্য ও সাংসারিক আলোচনা করিয়াছিলেন। চুল পাঁকে নাই, দাঁত পড়ে নাই, গাল বসে নাই। কেবল ভাঙ্গা কোমরের অছরোরে কখনও

ঠেলাগাড়ী, কখনও বগলে করা লাঠির সাহায্যে কর্ম্মবীর হরপ্রসাদ শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মজীবনের কর্তব্য পালন করিয়া ছিলেন, পরিতাপের বিষয় তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে পুত্রকজা কেহ উপস্থিত ছিল না। তিনি একাই থাকিতেন, একাই ভাবিতেন, একাই কাজ করিতেন।

পুনঃ প্রশ্ন এই—এখন সে কাজের বাকী অংশটুকু করিবে কে। সে অংশ অতি গুরু, অতি বিশাল, অতি দায়িত্বপূর্ণ। সে অংশ অসম্ম্যে বৃষ্টিগত সংগ্রহ।

তাঁহার ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। তাঁহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারে এমন শিষ্য প্রশ্রিয়া হুর্ভাগ্যক্রমে প্রস্তুত হয় নাই যে, তাঁহার তাঁহার এই গুরুতর গ্রন্থ করিতে পারে। কে জানে সে সম্বন্ধে কতদূর সুবিধা হইবে। যদি এই অপূর্ণ সন্তানের যথেষ্ট ব্যবহার সম্ভব না হয় তবে তাহার বাঙ্গালার চরম হুর্ভাগ্য।

প্রিন্সিপাল প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃ ভোগ্য মনীষীগণের প্রাথমিক নেতৃত্বের হরপ্রসাদ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ন এবং অচিরে বর্ণমালায় ভূষিত হ'ন।

আমি শাস্ত্রী মহাশয়কে বালাকাল হইতেই জানিতাম। তিনি স্বেচ্ছাতা প্রিন্সিপাল প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং আমার স্বেচ্ছা সচোদর সত্যপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সতীর্থ ছিলেন। বলিতে গেলে আমাদের মধ্যে কেবল পাক পৈতৃর প্রভেদ ছিল। সর্বদা আমাদের বোঝাবার ও নবর বাস্তবে আসিতেন ও থাকিতেন। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিজয়াপাণ্ড, মাইকেল মধুসূদন, রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ী, তারকনাথ পালিত, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীগণের সহিত যোগাযোগের অবকাশ ছিল এবং সাহিত্যিক আলোচনার যথেষ্ট অবসর পাটত। সম্প্রতি

১৩৮]

স্মৃতি-তর্পণ

১০১

সংস্কৃত কলেজের সুবোধ্য নবীন অধ্যক্ষ শ্রীমুখ ডাঃ হরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের চেষ্টায় কবির রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংস্কৃতের জ্ঞান এক সভার অবিশেষণ। য। অমিনকনের উত্তরে কবি বনিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত কলেজে তাঁহার সে অভিনবমনের সার্থকতা তিনি সম্যক বৃষ্টি ত পারেন না; কারণ, সংস্কৃত কলেজের সহিত বাঙ্গালী সাহিত্যের মৌলিক সম্বন্ধ তাঁহার অজ্ঞাত।

এ ভ্রান্তি অপনোদনের জন্ত সম্যক উত্তর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক নাম করা যাইতে পারে, যথা—ঈশ্বরচন্দ্র বিজয়াপাণ্ড, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (প্রথম বৈজ্ঞানিক পরিভাষা), রাজকুমার সর্বাধিকারী (প্রথম শাসনতন্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থ), দ্বারিকা নাথ বিজয়াপাণ্ড, রাম নারায়ণ তর্করত্ন (নাটক), গিরিশ চন্দ্র বিজয়লাল, হরিনাথ জায়রাম-কাক্যবৃন্দ, ভাষাশরত তর্করত্ন (বান্দরী), তারক-কুমার বরদর, রজনীকান্ত গুপ্ত, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, (অর্থনীতি), শশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় (ভূগোল), ফের-মোহন গুপ্ত, কালীদাস চট্টোপাধ্যায় (ভূগোল), যদু-জাঃ হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্রেমচন্দ্র তর্কবাণীশ, ব্রজকান্ত তর্ক-লাল, মধুসূদন বাচপতি (বসন্তসেনা), কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামকমল ভট্টাচার্য, রামগতি জায়রাম, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরিশ্চন্দ্র কবির, ভাষাশরত চট্টোপাধ্যায় (ভূগোল), রাম-বাহাদুর বরদা মজুমদার, যদুজেননাথ শাস্ত্রী, কালীদাস বরদাভাষাণী, রাজকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকমল ভট্টাচার্য, চুণীলাল বসু, জগদ্বোধন তর্কালঙ্কার, শ্রীশীল চন্দ্র বিজয়াপাণ্ড,

যোগেন্দ্রনাথ সিংহাচরণ, উদয়চন্দ্র গুপ্ত, মনমোহন তর্ক-লাল।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ ও এডিসিয়াটিক সোসাইটি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট কত ধর্ম্মী তাঁহার বর্ণনা আমার পক্ষে নিশ্চয়োজ্ঞ। গহ পূজাব্যবস্থার অব্যবহিত পূর্বে এডিসিয়াটিক সোসাইটির মাসিক অবিশেষণে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার শেষ দেখা হয়। পুরী মন্দির-ভিত্তি-সংগ্রহে আবিষ্কৃত এক প্রস্তরফলকের উৎকীর্ণ শিপিণ্ড সম্বন্ধে তিনি গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক সম্বন্ধ পাঠ করেন। Walshএর History of Murshidabad ও শ্রী মহাশয়ের নিজ গবেষণা-ফলের, সর্বাধিকারী বংশের সহিত উদ্ভিতা শ্রীশ্রীজগদ্বা-বেদ্যের শ্রীমন্দির সংস্থার ও সংরক্ষণ-সংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় এবং আংশিক অজ্ঞাত তথ্যের উদ্বেগ করিয়া তিনি আমাদিগকে চিরস্মরণীয় করেন।

রাধানগরের অধুগত বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির সভাপতি-রূপে তিনি এই সকল তথ্যের অনেক বিবৃতি করিয়াছিলেন তদন্ত আমার কৃতজ্ঞ। কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ চিরদিন নববীণ ও ভট্টপঞ্জীর সম্যক ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিখ্যাত একদা শাস্ত্রী মহাশয় স্বীকার ও বিবৃতি করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বংশের অনেকে এখানে গুরুগিহি করিয়াছেন। সঞ্জয় আমাদের প্রতি শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ আকর্ষণ চিরদিন ছিল।

এই সকল আত্মবীণা ও আকর্ষণের কথা আজ মনে পড়িতেছে; যখন হারাইয়া আমার মুহূর্ত্তান।



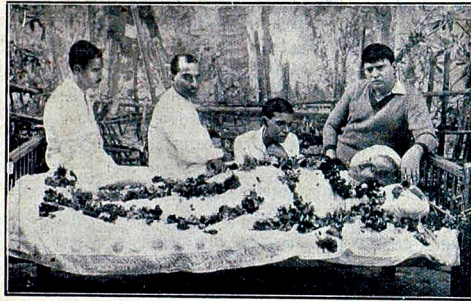
## মহীমহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীমহাপ্রসাদ চন্দ

বঙ্গদর্শন

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝখানে, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, হরপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে আধুনিক বাঙ্গালার ইতিহাসের সত্যযুগ। জাতীয় জীবনের কর্মক্ষেত্রের সকল বিভাগেই তখন সব মারাত্মক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভারতের অস্বাভাবিক শোষণের লোকেরা তখন বাঙ্গালার নেতাদের অগ্রসর করিত, বাঙ্গালীর অধিকার করিত। বাঙ্গালার শোষণ আর এখন নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শোষণের চুইজন

হরপ্রসাদ যখন ইংরাজী স্কুলের বঙ্গদর্শন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার গ্রামবাসী বঙ্গদর্শন চট্টোপাধ্যায়, “বঙ্গদর্শন” নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক বৎসর পরে “বঙ্গদর্শন” কাটালশাড়া বঙ্গদর্শন যবে ছাপা হইয়া বহির হইতে লাগিল। হরপ্রসাদ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বি-এ, পড়িবার সময় মহারাজ হোলকারের প্রদত্ত পুরস্কার



মহাপ্রসাদ হরপ্রসাদ

মহারদীর সহযোগিতাপে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। অস্বাভাবিক শোষণের লোকেরা তখন বাঙ্গালার নেতাদের অগ্রসর করিত, বাঙ্গালীর অধিকার করিত। বাঙ্গালার শোষণ আর এখন নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শোষণের চুইজন

পাইয়া জন্ম “ভারতমহিলা” রচনা করিয়াছিলেন। বি-এ পাশ হওয়ার পর ৬ বার্ষিক মৃত্যুপাধ্যায়ের সঙ্গে “ভারতমহিলা” প্রথমবারের কালি বঙ্গদর্শনের হাতে দিয়া আসেন। ভারতমহিলা ১২৮২ সালের চতুর্থ খণ্ড “বঙ্গদর্শন”র শেষ তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। এই যুগে তিনি বঙ্গদর্শনের অন্তরঙ্গের মধ্যে গণ্য হইলেন এবং নিম্নমত “বঙ্গদর্শন”ে খোদা দিতে লাগিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রতি তৎকালে তাঁহার কিরণ প্রগাঢ় ভক্তি ছিল

১৩৩০]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

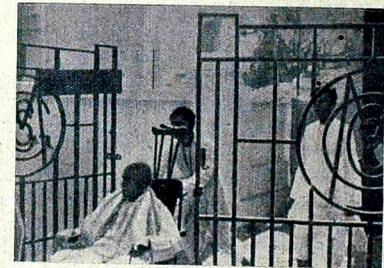
১৩৩০

তাঁহা ১২৮৫ (১৮৭৯) সালের পৌষ সংখ্যার “বঙ্গদর্শন”ে প্রকাশিত “বঙ্গীয় যুগ ও তিন কবি” নামক প্রবন্ধে দেখা যায়। এই প্রবন্ধটি যে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা তাহা তিনি “নারায়ণ” পত্র লিখিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, কালিঙ্গ, বায়ণ, বঙ্গদর্শন এই তিন জন কবির কাব্য তখন শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণের মন আকর্ষণ করিয়াছিল। এই তিন জন কবির কাব্য হইতে কি প্রকার নীতি শিক্ষা করা যায়, প্রবন্ধে তাহা স্মরণ করিয়া রাখা হইয়াছে। তখন বঙ্গদর্শনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা যে কিরূপ আদর করিতেন তাহা ১২৮৮ (১৮৮২) সালের আখিন সংখ্যায় প্রকাশিত “বাক্যিকর জয়” সমালোচনায় দেখা যায়। এই সমালোচনার উপসংহারে বঙ্গদর্শন লিখিয়াছিলেন—

“যেহা করন, তেমন বর্ণনা। বর্ণনার আশা অনেক পড়ির দিয়াছি। তাহা যথেষ্ট মতের হইতে পারে, কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বারবারকে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালী বলি।.....গ্রন্থানি অতি সুদৃষ্টি, কিন্তু গ্রন্থানি বাঙ্গালী। তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট রচনা হইতে আসিতেছেন

নিজে দেহী সারকথার ইংরেজী অনুবাদ করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি খুব পীড়িত হইয়া পড়িল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনেকগুলি সংস্কৃত সাংস্কৃত সারের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া গিয়াছিলেন। এই জন্ত ১৮৮২ সালে প্রকাশিত Sanskrit Buddhist Literature of Nepal এর মুখবন্ধে রাজেন্দ্রলাল শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট নিজের গুণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

সেই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলালের একটা নিয়ত কর্ম ছিল সরকারের পক্ষ হইতে ভ্রমশীল পণ্ডিতদের দ্বারা মফঃ



স্বলে সংস্কৃত পুথির খোঁজ করা। সেই সকল পুথির বিবরণ সংগ্রহ করা, এবং বাছা বাছা পুথি খরিদ করা। এই কাজের পরিচয় স্বরূপ প্রতি বৎসর তিনি এক এক সংখ্যা সংস্কৃত পুথির বিবরণ, Notices of Sanskrit MSS, বাহির করিতেন। এইরূপে ১৮৮৮ সাল

রাজা রাজেন্দ্রলালের সাহচর্য্য ১২৮৮ (১৮৮২) সালে বঙ্গদর্শন বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পূর্বেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজা রাজেন্দ্রলাল নিজের কাজে বাতায়িত আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অধুরোধে গোপালতাপানী উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল তখন নেপাল হইতে স্বদেশে আসিবার আশা সংস্কৃত যৌক্তিক পুথিরাশি অবলম্বনে Sanskrit Buddhist Literature of Nepal লিখিতেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল সহকারী পণ্ডিতের সহায়তায় সংস্কৃত পুথিগুলির সারকথা সংগ্রহ করিতেছিলেন এবং

পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল নয় খণ্ডে বিস্তৃত ২৩ সংখ্যা পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দশম খণ্ড পুথির বিবরণ লেখার সময় তিনি শেষ রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং এষ্ট কার্যের কতকটা ভার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর পড়িল। দশমখণ্ড পুথি-পরিচয়ের মুখবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

“The Raja was in charge of operations (search for Sanskrit MSS) up to the 16th July, 1891, the date of his death. During his last protracted illness he asked me to prepare the English summaries of his notices, which I did to the best of my power with the object of assisting, while the entire management of the work



was kept in his hands, and he passed final orders for the press."

### সংস্কৃত পুথির বিবরণ ও ক্যাটালগ

রাজা রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরই এসিয়াটিক সোসাইটির কৌনসিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর সংস্কৃত পুথি বোর্ডার, পুথি খরিসের এবং পুথির বিবরণ প্রকাশের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এই তার প্রস্তাব হইয়া ১৯১১ সাল পূর্ণাব্দ শাশ্বী মহাশয় চারিখণ্ড Notices of Sanskrit Ms প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৭ সালে, ১৮৮৮—৮৯ সালে এবং আবার ১৯০৭ সালে শাশ্বী মহাশয় পুথি পরীক্ষার এবং পুথি খরিসের জন্য বেঙ্গল গভর্নমেন্ট-কর্তৃক নৈপায়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নৈপায়ে কাজের ফল নৈপায়ে দরবার-লাইব্রেরীর হুইথ ও ক্যাটালগে নিবন্ধ হইয়াছে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর লওয়ার পর, ১৯০২ সালে শাশ্বী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির নিকট প্রস্তাব করেন যে, তিনি এখন সরকারী পুথিপুস্তকের বিস্তৃত ক্যাটালগ Descriptive Catalogue স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তত্পরযোগ্য বাধ্যতা করিয়া দিয়াছিলেন। শাশ্বী মহাশয় এবং তাঁহার সহযোগী পণ্ডিতেরা ক্যাটালগের কাজে ব্যস্ত হওয়ার পুথি বোর্ডা এবং পুথি খরিস ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সরকারের পুথির ভাণ্ডারে তখন ১১,২৭৭ খানি পুথি জমা হইয়াছিল। তন্মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল খরিস করিয়া গিয়াছিলেন ৩১-৬ খানি, এবং অর্শপিত ৮১-৮ খানি শাশ্বী মহাশয় খরিস করিয়াছিলেন। তিনি এরিয়াটিক ছিলেন ১২ খণ্ডে ক্যাটালগ সম্পূর্ণ করিবেন; তন্মধ্যে বৌদ্ধ-সাহিত্য, বৈদিক-সাহিত্য, ব্রহ্ম, ইতিহাস ও ভূগোল, পুরাণ এবং ব্যাকরণ ও অলংকার এই ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই ক্যাটালগের কয়েকখণ্ডের মূখবন্ধে (Preface) সংস্কৃত সাহিত্যের সেই সেই বিভাগের ইতিহাস এক্ষণে সমস্ত ঢালিয়া সাজা হইয়ছে। দ্বিতীয়খণ্ডের এইরূপ মূখবন্ধ ১৪ পৃষ্ঠা-ব্যানী; পুরাণখণ্ডের মূখবন্ধ ২২৭ পৃষ্ঠাব্যানী; ব্যাকরণ ও অলংকারখণ্ডের মূখবন্ধ ৩৩৭ পৃষ্ঠাব্যানী। কবিতাখণ্ডের ক্যাটালগ জাপা হইতেছিল, এবং তাহার মূখবন্ধের কতকাংশ শাশ্বী মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির

সেক্রেটারী ভান বেনেন সাহেবের নিকট শুনিয়াছি শাশ্বী মহাশয় দর্শন-খণ্ডের এবং তৃতীয়খণ্ডের বিশেষতঃ তৃতীয়খণ্ডের মূখবন্ধ লিখিয়া সুবিধার জন্য বড়ই ব্যগ্র ছিলেন। ১৯০০ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে লিখিত ব্যাকরণ ও অলংকার-খণ্ডের মূখবন্ধের উপসংহারের এই কয়টি কথাই ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা ঘটিত হইয়াছে—

"My acknowledgements are further due to Dr. Upendra Nath Brahmachari, the late, and Lt. Col. R. B. S. Seymour Sewell, the present, President of the Society, who showed great anxiety to enable me to finish the entire work within my life-time, which is drawing to a close."

এই সন্দানন্দ, অমরায়বৎ বিদ্যাসিদ্ধক পুণ্য কেন যে বৎসরাধিক পূর্বে লিখিয়াছিলেন, "My life-time, which is rapidly drawing to a close," তাহা অত্থান করা কঠিন। Notices এবং ক্যাটালগ ছাড়া শাশ্বী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির কার্যের অনেক প্রবন্ধ ছাপাইয়াছেন, বিহার ও উড়িষ্যা রিয়ার্ড সোসাইটির কার্যের অনেক প্রবন্ধ ছাপাইয়াছেন এবং নৈপায়ে হইতে সমুদ্রীত সংস্কৃত পুথির মধ্যে অথবা বৈদিক "সৌন্দর্যমূল কাব্য," আর্ঘ্যদেবের "চতুঃশতিকা, বাঙ্গালার ইতিহাসে তাঁহার প্রধান আবিষ্কার, মহাপ্রভু নন্দীর "রামচরিত" কাব্য এসিয়াটিক সোসাইটির যোগে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।

### বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ

এসিয়াটিক সোসাইটির নিকট হইতে সংস্কৃত পুথি খুজিবার ভার পাইবার পূর্বেই, ১৮৮৬ সালের আরম্ভে হরপ্রসাদ শাশ্বী বেঙ্গল গভর্নমেন্টের লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরীতে শাশ্বী মহাশয় অনেক ছাপা প্রাচীন বাঙ্গালী পুস্তক দেখিতে পাইলেন, এবং মনোহর পুথি বোর্ডার ভ্রমক পাইলেন তখন অদীনত ভ্রমণকারী পাণ্ডিতকে বাঙ্গালী পুথি সমগ্র করিবারও আদেশ দিল। ১৯০১ (১৮৯৪) সালের প্রারম্ভে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯০৪ সাল হইতে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত শাশ্বী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের অজ্ঞাত সহকারী

সভাপতি ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল ১০ বৎসর পরে ১৮৮৮ সালে বখন তিনি পুনরায় সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। শাশ্বী মহাশয় ১৯০২ (১৯১৪) সালে কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম অধিবেশনের সভাপতি সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সভাপতি-রূপে তিনি যে স্থূল্যর্থ অভিভাষণ পাঠ করেন তাহাতে এতকাল প্রাচীন পুথি বাঁচিয়া তিনি নানা বিষয়ে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। সম্মিলনের অধিবেশনের কয়েক মাস পরে, সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে শাশ্বী মহাশয় পরিষদের সভাপতি এবং পর বৎসরের আরম্ভে সাহিত্যসম্মিলনের বক্তৃতাভার অধিবেশনে প্রধান সভাপতি এবং সাহিত্য-শাখার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৯০২ সালের শুরু হইতে আর সেদিন তাঁহার তিরোভাব পর্যন্ত এই ১৯ বৎসর কাল হরপ্রসাদ শাশ্বী সাহিত্য-পরিষদের প্রধান পাণ্ডারী হইয়া বৎসরসম্বল সাহিত্যসম্মিলনের একপ্রকার রাজা ছিলেন। এ সময় নানা বিষয়ের অনেক রচনা প্রকাশ করিয়া তিনি বাঙ্গালী সাহিত্যের সম্পদ বাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি গদ্য লিখিয়াছেন, কাব্যদর্শনের কানোয় বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লিখিয়াছেন, অনেক মহাজনের চরিত্রকথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যুগ কথ্য ছিল বাঙ্গালার প্রাচীন ভাষা, বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য এবং বাঙ্গালার প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস লইয়া। এই প্রস্তাবে তাঁহার এই সকল কাজের কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

### বৌদ্ধগান ও দোহা

বাঙ্গালার প্রাচীন ভাষার এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাশ্বীর প্রধান কার্য সাহিত্য-পরিষদ-প্রাচীন বাঙ্গালী সাহিত্য ১৩০২ সালে প্রকাশিত "হাজুর বছরের পুরাণ বাঙ্গালী বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামক গ্রন্থই নিবন্ধ। ১৮৮৮-৯৯ সালে নৈপায়ে পুথি পরীক্ষার কালে শাশ্বী মহাশয় এবং বেঙ্গল সাহেব একপ্রকার অপরিচিত প্রাকৃত ভাষার রচিত অনেক কবিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এইরূপ দ্রুতকাল কবিতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত টীকাও ছিল।

বেঙ্গল সাহেব ত্রিলাতে ফিরিয়া গিয়া অনেকগুলি কবিতার আবার ত্রিলাতী ভাষার অম্বাবাদ পাইলেন। এই টীকা ও অম্বাবাদের সাহায্যে "স্বভাবিত সংগ্রহ" নামক তাত্ত্বিক নিবন্ধে যে ২৮টা প্রাকৃত কবিতা আছে বেঙ্গল সাহেব তাঁহা ইংরেজী অম্বাবাদই প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাশ্বী মহাশয় "বৌদ্ধগান ও দোহা"র প্রাচীন সংস্কৃত টীকাসহ "চর্য্যচর্য্যবিনিস্ত" সন্মোহ বজ্জের প্রকাশকোষ, কালুসাদের "দোহাবলি" এবং "ভাস্করী" প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষা এবং মর্ম দুই ইতিহাসের হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষা-সম্বন্ধে শাশ্বী মহাশয়ের শেষ সিদ্ধান্ত এইরূপ—

"দুই বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাঁহার চারিজন অন্তরে বাঙ্গালী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইখানে বাঙ্গালী বেশে চলিত ভাষার গান লেখা হইয়াছিল, অত্যাচারে সংঘে নাই। সে ভাষাকে বলাই প্রাকৃতই বলা, প্রাকৃতই বলা, অম্বাবাদই বলা, আর তাই বলা; ভাষা তাই বলা যেখানে নাম। আমি লাই, বাঙ্গালী বেশে লাই, তাইকে বাঙ্গালী নাম দিলাম, তাহাতেই বা বলা কি?"

ভাষার মহাপ্রভু মহিয়ার "বৌদ্ধগান ও দোহা"র অন্তর্গত দোহা-কবিতা দুইখানি ত্রিলাতী ভাষার অম্বাবাদের সহিত মিলাইয়া ফরাঙ্গী অম্বাবাদের সহিত প্ৰচলিত করিয়াছেন। এই প্রাচীন দোহা ও গানগুলি ইতিহাসের আকররত্নে ব্যবহার করিবার পক্ষে স্থানীয় এই ইহাদের ত্রিলাতী অম্বাবাদের সময় এবং যে অক্ষরে এই সকল কবিতা পুথিতে লেখা আছে আলোচনা করিয়া তাঁহার সময় সহজে নিরূপণ করা বাইতে পারে। শাশ্বী মহাশয় বখন ১৯২২ সালে চতুর্দশের নৈপায়ে গিয়াছিলেন তখন আরও অনেক প্রাকৃত কবিতার সন্ধান পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেগুলি লিখিয়া পুথি রাখা এখন আর কে আনিয়া দিবে?

### বিদ্যাপতির কীর্তিলতা

"বৌদ্ধগান ও দোহা" ছাড়া বাঙ্গালী ভাষার প্রাচীন



ইতিহাস উদ্ধার কার্যে সহায়তা করিতে পারে এমন আর একখানি পুস্তক, কবি বিখ্যাত ঋতুক মৈতিলী ভাষার রচিত ঐতিহাসিক কাব্য “কীর্তিলতা” বঙ্গমুখ্যদায় শাস্ত্রী মহাশয় “স্বরীকেশ” সিরিজে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নেপাল দরবার লাইব্রেরীর তিন শত বৎসরের পুরান একখানি পুথি হইতে “কীর্তিলতা” ছাপা হইয়াছে।

**চণ্ডীদাস ও কান্ধীরাম দাসের মহাভারত**  
হিন্দুদের একটা দম্বর এই, তাহারা বাহালিগকে খুব ভক্তি করেন এমন মহাপুরুষ বা মহাজনকে দেবতা করিয়া তোলে। ধর্মপাশে বা কুর্দ্দবীর ত সরাসির অবতার বলিয়া গণ্য হন। বীরাঙ্গা গ্রন্থকার, তাহার অবতার না হউন অপরূপ হইয়া যান, অর্থাৎ তাহাদের রচনা অশোকসেবায় বলিয়া গণ্য হয়। বীরাঙ্গর তিন জন কবি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, এবং কান্ধীরাম দাসের রচনা এইরূপ অশোকসেবায় প্রাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের নামে যে সকল পদ চলে, কৃত্তিবাসের নামে যে রামায়ণ চলে, কান্ধীরাম দাসের নামে যে মহাভারত চলে উহা এই কবির মূল রচনা বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব। শিকিত অগচ বীরাঙ্গের নামেরই এত মহিমা তাহাদের মূল রচনা উদ্ধারের ইচ্ছা স্বাভাবিক।

তাই সাহিত্য-পরিষদের স্থাপন অবধি চণ্ডীদাসের মূল পদাবলী এবং কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণ উদ্ধারের যত চেষ্টা চলিতেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার “চণ্ডীদাস” নামক প্রবন্ধে \* চণ্ডীদাসের স্বরূপ সম্বন্ধে কয়েকটা মূল্যবান কথা বলিয়া গিয়াছেন।

শিল্পী গ্রাম নামক নদে জেলার একটি গ্রামে কান্ধীরামের ভিট, কান্ধীরামের পাঠশালায় আস্তানা, এবং কেশব দীঘি এমনও দেখান হয়। সেই গ্রামের লোকেরা কান্ধীরামের কাল-সম্বন্ধে বাহা বরাহর বলিয়া আসিতেছেন তাহা হইতে অসম্ভবনীয় হয়, তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। কান্ধীরাম-সম্বন্ধে শিল্পী গ্রামের জনগণ এই কালের সকল পণ্ডিতই এতদনি বিশ্বাস করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের গিয়া হঠাৎ একদিন শুনিলে যে, সেখানে

১৩৮৫ সালে লেখা কান্ধীরামের মহাভারতের আদিপর্বে একখানি পুথি আছে। স্বরূপী ভূমিকাসহ আদিপর্বে প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের একটা কীকাজ পূরণ করিয়া গিয়াছেন।

### বাঙ্গালার সভ্যতার ইতিহাস

এই যে সকল এবং আরও হাজার হাজার পুথি শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি তাহাদের বিবরণ এবং তাহাদের মধ্যে খান কয়েক ছাপাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি এই সকল পুথি অবলম্বনে বাঙ্গালার সভ্যতার ইতিহাসেরও পত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস বলিতে সাধারণতঃ রাজাদের এবং রাজশাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারের বৃত্তান্ত বুঝায়। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত সত্যাকর নদীর “রামচরিত” এক বিরাট আলোক স্তম্ভ। “রামচরিত”ের চূড়িকায় শাস্ত্রী মহাশয় পালরাজাদের পারাবাহিক বিবরণ লিখিয়াছেন। তদনিহা হইয়াছে তিনি “রামচরিত”ের বাঙ্গলা অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষকালে তিনি যজ্ঞযুক্ত করিয়া থরিয়াছিলেন বাঙ্গলার সভ্যতার ইতিহাসের দুইটি বিভাগ—আভিভেদ এবং ধর্মকর্ম, বিশেষতঃ যে ধর্মকর্ম সমাজের নীচের থাক হইতে ক্রমশঃ উপরের থাকে উঠিয়াছে। এই ইতিহাসের সম্বন্ধে কার্যে তাহার প্রধান উপকীর্ষ্য ছিল অসংখ্য। তাহার কাটালগের তরফের মুখবন্ধ তিনি এই ইতিহাস খোলসা করিয়া লিখিবেন এইরূপ আশা করা গিয়াছিল। এই আশা আর পূরণ হইবার নাই। সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি এই ইতিহাস-সম্বন্ধে তাহার ভীতিকর স্বপ্নের দিগন্তের আশাস দিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ ইহা লইয়াই আমরাগিকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

“আমি একখানি পুথি এ অক্ষরে (গুপ্তধর্মের শেষ অধ্যায়) লেখাং এ খানির নাম ‘কুলিকাঠার’ বা ‘কুলিকাঠার’ হইতে ষ্ট্রের দেবীকে বলিতেছেন,—

গল্প ভরতে বর্ষে অধিকারায় সর্বস্তঃ !  
বারংবারিকার্যে ন মন্যন্ত তস্য সহ ॥”  
হইতে বৃথা থাইতে, তর ভারতের বাহির হইতে

আসিছে।...পুথি ছইখানিই অষ্টম শতকের শেষ ভাগের লেখা।

আমার বোধ হয়, খৃঃ ৭ ও ৮ শতকে যখন উদ্বেদিয়া ও আকামিয়া বলিগাণ তুর্কীরাতে আপনাদের আধিপত্য ও ইসলামধর্ম বিস্তার করিতেছিলেন, তখন সেখানে নানা রকমের লোক-চলিত ধর্ম ছিল। তাহারা সে সকল ধর্ম নষ্ট করায় তাহাদের পুরোহিতেরা পাইয়া ভারত আসেন; তাহারা ইহাও দেশে প্রচার করেন।.....

যৌদ্ধেরা তখন প্রবল; উহারা সেই তত্ত্ব লইয়া আপনাদের প্রচারকার্যে নিয়োগ করে। ব্রাহ্মণেরা ধর্মপ্রচার করিবেন না, তাহারা লন নাই। ধৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রচার করে, উহারাও লইয়াছিল। বাঙ্গালার শৈব ও “পঞ্চরাত্র” নামক বৈষ্ণব-তত্ত্ব পাণ্ডুরা বয় না। বাঙ্গালার বাহা পাণ্ডুরা বয়, তাহা প্রায়ই বৌদ্ধতত্ত্ব ভাঙ্গা। বাঙ্গালার বৌদ্ধতত্ত্বের প্রধান আড্ডা ছিল।

আমরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা এখন অর্দ্ধ-হিন্দু, অর্দ্ধ-বৌদ্ধ। যখন সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাহ্মণ। আর যখন শুদ্ধ আমরা কানে কানে দিয়া যান, আর আমরা শুদ্ধর পায়ে ঝুটাইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ।

আজ, যেভাবে তোসরা (ব্রাহ্মণ) বাঙ্গালার আসিয়াছিল, সে ভাবে তাগ করিয়া একগুণ আধা-বৌদ্ধ আধা-হিন্দু ভাব লইলে কেন? তাহার কারণ এই যে, আমাদের সংখ্যার কম ছিল। পূর্বেই বইত আসি নাই। বঙ্গালের সময় ৪০০ খ্রঃ মাজ হইয়াছিল। আমরা রাজার সাহায্য পাইতাম তা রাজা বৌদ্ধ হউন, আর হিন্দুই হউন। আমাদের সমাজও ছোট ছিল; বাহারা অসৌখ্য অথবা ব্রাহ্মণ-ক ছিল, তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতাম।”

মূলধান-বিজয়ের পরে ব্রাহ্মণেরা রাজার সাহায্য হারাইলেন, স্ত্রুতরা পেটের দামে বৌদ্ধ সমাজে বস্তুমান শিবা গুজিতে বাধ্য হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

“আমরাগিকে দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইল। আমাদের হবিধাও হইল। কিন্তুসুখ বৌদ্ধ সমাজ এক

রকম বেওরাশি মাল। যে ব্যাঙ্কে পারে, আপন দল-ভুক্ত করিতে লাগিল।...বাহারা প্রথম হিন্দুলভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা ভাল্য ব্যবহার পাইয়াছিল। তাহাদিগকে ‘নরশাখ’ বলে অর্থাৎ নুতন শাখা। তাহার পর কার্যগণ আসিয়াছিলেন; তাহাদের মান সম্বন্ধ ও সামাজিক মর্যাদা ছিল। ব্রাহ্মণের দলে আসিয়া তাহারা সে মর্যাদা হারান নাই।”

এই অভিভাষণের অন্তর্ভাগে, কেমন করিয়া এদেশে অশুভ্রতা আসিল তাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—

“ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণদলভুক্ত লোকদিগের সহিত আহার-ব্যবহারি সামাজিক সম্বন্ধ রাখিতেন। এবং নিত্যন্ত নীচপন্থী ও নীচবন্দী লোক ভিন্ন আর কাহাকেও অশুভ্র বলিতেন না। কিন্তু তাহাদের মতে হিন্দু ভিন্ন আর সকল জাতিই অনাচর্যীয় ছিল।...পূর্বকালে যখন যৌদ্ধেরা প্রবল ছিলেন, তাহারাও হিন্দুদিগকে অনাচর্যীয় মনে করিতেন।...সুতরাং অশুভ্র ও অনাচর্যীয় করার জন্ত ব্রাহ্মণদিগকে যে দোষী করা হয় সেটা ঠিক নয়।”

### সমাজসংস্কার ও সামাজিক ইতিহাস

শাস্ত্রী মহাশয় সমাজসংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। প্রাচীন সংস্কৃত পুথির আলোচনার ফলে কৈবর্ত, বাগদী, মৌলী, ভোম প্রভৃতি বাঙ্গলার সমাজের নীচের থাকের লোকের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তিনি “রামচরিত” কাব্যে কৈবর্ত জন্মায়ল দিক্ষাকের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তত্ত্ব পাঠ করিয়া জানিয়াছিলেন যৎসংস্কার চন্দ্রবীপের সৈন্য কৈবর্ত ছিলেন। কৈবর্ত, বাগদী প্রভৃতি জাতির নিকট ব্রাহ্মণেরা কৃত অগী তাহা বিনি সঠিক জানেন তিনি কখনও সমাজসংস্কারের বিরোধী হইতে পারেন না। সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

“সংস্কার, নারায়ণ, বস্তুমান, কাণ্ডকন্যাস, বাহাল, ভাটম, ভাটম প্রভৃতি যত লোকেরা ধর্ম লিখি, ইহাও যত লোক তাহার মতে সুকি

\* সাহিত্য-পরিষদ-পরিষদ ইতিহাস (১৩৩৮) ১৩—১৪ পৃ.  
+ ১৩ ৪ পৃ.



না গান্ধীরা সমুদ্রগমিকে তত্ত্ব বহিরা উল্লেখ করিয়া থাকে।.....এখন-  
কার পরামর্শ এইভাবে যে, তৎকালীন লোকগণের মনে বহুলাংশ ধর্ম্ম  
এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাফলে উৎপত্তি, স্থিতি, বৈশাঙ্গিক ও মনের  
ইতিহাস সাজে করিয়া দেয়। যতদিন সেই ইতিহাস না হয়, ততদিন  
সামান্য আদানবিক্রম ভিত্তিতে পারিব না। কোন বিষয়ে আমাদের  
সম্বোধের আবশ্যক, তাহা জানিতে পারিব না।..... কে মাগে  
সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা হইবে। না বুঝিয়া না জানিয়া কান কাগ  
করিতে গেলে যাহা হয়, সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাহাতে আশাযে  
কৃত হইব বুদ্ধি হইবে না।\*

### লেখার ধরন ও ভাষা

উপরে যে ক্ষুদ্র বচন উদ্ধৃত হইল তাহা হইতেই  
শাস্ত্রীমহাশয়ের গদ্য রচনানীতির বেশ পরিচয় পাওয়া  
যায়। ভাল গদ্য রচনায় একটু রুজিমতা, একটু একটু  
বাইন নুট বস্তবিক্যের কিছু কৌশল থাকে। কিন্তু  
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লিখিত বাঙ্গালা গদ্যে সেই রুজিমতা, সে  
কৌশলের লেশমাত্র নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি  
হইবে না। শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা জন্মের মত সহজ।  
অথচ সেই সহজ রচনা শক্তিশালী নহে; তাহার যে  
পাঠককে টানিয়া নিবার একটা শক্তি আছে তাহা  
পড়িতে পড়িতে বেশ অস্বস্তি করা যায়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের গদ্যের ভাষা বাঙ্গালী গদ্যের আদর্শ স্থানীয়।  
তিনি সেকালের সংস্কৃত কলেজের পড়িত হইলেও বহু হইতে  
পণ্ডিতী বাঙ্গালার বিরোধী ছিলেন। “বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল  
পাড়ার” নামক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “ভারত মহিয়ার”  
প্রথম অংশ “বঙ্গদর্শনে” ছাপাইবার জন্ত দিয়া আমার পর  
তিনি বহন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করিতে যান  
তখন—

“তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) বলিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমার দেখিয়াই  
বলিলেন, তুমি এসেছ বেশ হইছে। তুমি এমন বাঙ্গালী লিখিতে  
শিলে কি করিয়া? আমি বলিলাম, আমি শ্রীমত জ্যাঠাচরণ গঙ্গুলি  
মহাশয়ের ছেলে।” তিনি বলিলেন, ‘ও’ তাই বুট। নূতনে সংস্কৃত  
কলেজ হইতে এমন বাঙ্গালী বাহির হইবে না।” +

১২৮৫ (১৮৮৭) সালের ফেব্রুয়ারি বঙ্গদর্শনে, “বাঙ্গালা  
ভাষা” নামক বেনোয়া প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পণ্ডিতী

ভাষার পঞ্চপাতী রামগতি ভ্রায়রত্নের এবং বাঙ্গালী রচনায়  
অনিকল সংস্কৃত (তৎসম) শব্দ বর্জনের পঞ্চপাতী প্রামাণ্য  
গঙ্গুলির মত তুলনায় আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে  
বাঙ্গালা রচনার শব্দবোজন-সম্বন্ধে তিনি যে নিয়ম সঙ্গত  
বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহার পরবর্তী ৫৩ বৎসরের  
রচনায় যাবার সেই নিয়ম প্রতিপালিত হইয়ছে। সেই  
নিয়মটি এই, চলিত শব্দ দ্বাংকিতে কখনও অপ্রচলিত সংস্কৃত  
শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে না; এবং যে শব্দ সকল শ্রেণীর  
লোকের পরিচিত বর্ণানুসঙ্গ সর্বদা এইরূপ সহজ শব্দ  
ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া শাস্ত্রীমহাশয়  
লেখায় কথাব্যবহার ভাষা চলাইবার পঞ্চপাতী ছিলেন না।  
তিনি লিখিয়াছিলেন—

“তাঁ বলিয়া আমার এমন বলিতেছি না, যে বাঙ্গালার  
গিন-পটন হতমনি ভাষার হওয়া উচিত। তাহা কখন  
হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা  
এবং কথনের ভাষা সর্বদা স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ কথনের  
এক লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন।” \*

ভাষার জাত ঠিক হয় তাহার ব্যাকরণ অমসারে।  
তাঁহার লেখায় শাস্ত্রীমহাশয় সংস্কৃত পণ্ডিতের হিসাবে  
প্রচলিত অপশব্দ, ব্যবহার করিয়া থাকিলেও, ব্যাকরণের  
হিসাবে সে ভাষা সাধুভাষা। সাধুভাষায় সর্বদা শব্দের  
তাহাকে, তাহার দ্বারা, তাহার ইত্যাদি রূপ হয়, ধাতুর  
করিয়া, করিতে, করিয়াছিল, করিতেছিল ইত্যাদি রূপ হয়।  
শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার লেখায় সর্বদা যেরূপ এবং ধাতুর  
ব্যবহারে সর্বদা এই নিয়মই পালন করিয়া গিয়াছেন।

### উপসংহার

এতদ্বারা আমার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী  
মহাশয়ের লেখার কথাই বলিলাম। এই সকল লেখা একত্র  
প্রকাশিত হওয়া উচিত। যিনি বাঙ্গালা লিখিতে চাহেন  
তাঁহার এই সকল লেখা অবশ্য পড়া উচিত। এই সকল  
লেখা না পড়িয়া কেহ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, বাঙ্গালা  
সাহিত্যের ইতিহাস, বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে পারিবেন  
না। এই সকল বিভাগে কালের মত কাজ করিতে হইবে

একদিকে শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা পড়িয়া লওয়া যেমন। গিয়া মাথাই হেঁচকেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কেরাণী এবং  
আবশ্যক, আর একদিকে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত অশাস্ত্র  
পরিশ্রম করাও আবশ্যক। এই ব্রাহ্মণ এই ব্রহ্মণ-জীবনের  
শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত সমানে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। পুর্বেই  
বলা হইয়াছে, শাস্ত্রী মহাশয় ইন্দোনি সংস্কৃত পুথির কাটালাগ  
লইয়া যাত ছিলেন। তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন, এসিয়াটিক  
সোসাইটির হেড ক্লাক ত্রিমুখ আর শি, মাথাই একদিন অন্তর  
একদিন সন্ধ্যার সময় তাহার কাছে গিয়া কাজকর্ম তুলিয়া  
লইয়া আসিবেন। ১৭ই নবেম্বর মোমবার সন্ধ্যা ৭টা সময়  
ঘটে।

### প্রীতি-অর্ঘ্য

শ্রীসকলমোহন বিজ্ঞানভূষণ

হরের প্রসাদরূপে, হে হরপ্রসাদ,  
এসেছিলে, শান্তিবর, হরিতে জীবের  
অজ্ঞানতমের রাশি জ্বলি জ্ঞানানলোক;  
প্রকাশিলে বহুতত্ত্ব প্রভ-তত্ত্ব আদি।  
লভিল ভারতবাসী তোমার প্রসাদে  
অজ্ঞেয় অজ্ঞাত তত্ত্ব-জ্ঞান স্বপ্নাশাশি।  
সুপ্রবিত্ত, সুপণ্ডিত, সদাচারব্রত  
বিপ্রবংশ-জাত সুধী তুমি সুমহান  
প্রিপ্রোচিত কাগ্য করি সুদীর্ঘ জীবনে  
লভিয়াছ অমরতা—অনন্ত বিশ্রাম।  
বিজ্ঞানগুরু, জ্ঞানগুরু, পথপ্রদর্শক,  
শাস্ত্রতথ্য-অবিদ্যার শতকে প্রকারে  
ভারতবাসীর তুমি ছিলে আজীবন;  
ইতিহাসে, প্রত্নতত্ত্বে, দর্শনে, ভাষায়,  
তোমার গভীর জ্ঞান প্রসিদ্ধ ভারতে।  
বৌদ্ধশাস্ত্র-বৌদ্ধতথ্য-সাগর বিপুল  
মগুন করিয়া তুমি লড়েছ রতন—  
দিয়াছ তাহারে তুলি শিকিত-সমাজে।  
সংস্কৃত-গ্রন্থোদ্ধার তব পরিশ্রমে

হয়েছে সাধিত; যোগ্যতা করিবে তাহা  
তোমার অক্ষয় কীর্তি পণ্ডিত-সমাজে।  
ইতিহাস সাহিত্যের কত আবিষ্কার  
হয়েছে তোমার প্রানে, যাত্র, বুদ্ধিবলে,  
চিরদিন হ’বে গীত সে কীর্তি তোমার  
নম্র-জগত মাগে শিক্ষিত-সমাজে।  
বঙ্গের গৌরব-স্তম্ভ পরিমণ্ড-সভা  
সুপরিচালিত ছিল নেতৃত্বে তোমার।  
প্রাচীন পুথির মাঠে কাগ্য কুশলতা,  
বিপুল সে কীর্তি তব যোগ্যিবে মহিমা  
অসংখ্য অগণ্য কর্ম সাধিলে কোবিদ,  
প্রোথিত করিলে ধ্বজা অক্ষয় অমর।  
যদিও নম্র পরা ছেড়ে গেছ তুমি,  
ছেড়ে গেছ মানবের, ভারত-ভূমিরে,  
তবুও নহ’তো যুগ, নহ তুমি লীন  
‘মরুর অন্তর হ’তে। তোমারে হারিয়ে সবে  
বিচ্ছেদ-বেদনা-ভারে অশ্রুভারাহত।  
আজি দেব পরপারে স্বর্গধাম হ’তে  
লহ তুলি প্রীতি-অর্ঘ্য অর্পিত সাদরে।

\* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, একবিংশ ভাগ, ১৯২১, ৪৯ পৃ: ১।

+ নারায়ণ বৈশাখ, ১৯২২, ৫২২ পৃ: ১।

\* বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয়, ১২৮৫, ৮৭ পৃ: ১।



প্রয়াণকাল মনসাহচলন—শীত

মহামহাপ্রাণায় হরপ্রাসাদ শাজী মহাশয়ের আকর্ষিক মৃত্যুতে বনভাণ্ডা ও সাহিত্যের এবং বন্যী প্রকৃতির যে বিষম কতি হইয়াছে তাহা সহজে বা শ্রী পূরন হইবার নহে। শাজী মহাশয়ের ১৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। সাধারণতঃ বাঙালীর যে আত্মকাল, তাহার তুলনায় তাহার মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলা যায় না। কারণ, ‘শতাব্দীর পুরুষ’ এ প্রাচীন প্রবাদ এখন প্রাপ্যবাক্যে পরিণত হইয়াছে।

তিনি যাঁহি শাজী মহাশয় মৃত্যুর দিনও সন্ধ্যা অবধি নিম্নমন্ত সাহিত্য-চর্চা করিয়াছিলেন। ইহানী তাহার শরীর কিছু অপরূপ হইয়াছিল স্মৃতি, কিন্তু তাহার মনের বল, কল্পশক্তি ও অশ্রদ্ধাভিঙ্গার কিছুমাত্র খর্বতা হয় নাই। ইহাকেই বলে ‘বধ’ পরিয়া মৃত্যু। শেষ দিন অবধি কল্পধতি। ধারণা কয়েক বৎসর তাহার দেহ রপিত হইলে আরও অনেক ক্রিয়াকর্ম আশ্রয় পাইতে পারিতাম। দেশের দুর্ভাগ্য। শাজী মহাশয়ের বয়সবন্যীর কত গণনা। তিনি সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব—বিশেষতঃ প্রারম্ভিক যুগে সকল বহুমূল্য দান দেশকে দিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করবার সাধ্য আমরা নাই। তবে এ সকল যে অতি মার্হাৎ, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

পুরুষকালের ধারা, প্রাকককে কল্পণে নিয়মিত করা যায়, শাজী মহাশয়ের জীবন তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। বহু পরিচয়ের ভারপ্রাপ্ত তাহার জনকের অশ্রুতা শেষ স্বচ্ছল ছিল না। তিনি যাঁহি কিশোর বয়সে শাজী মহাশয়ের কাঁদি এন্ড্রোয় দুলে কাপেছেন পাঠ্যসাধ্য করিতেছেন। তখন তাহার নাম ছিল শরৎকান্দে ভট্টাচার্য্য। এই সময়ে জীবন শীতায় তাহার প্রাণ-সকট উপস্থিত হয়—তখন শব্দর হরের প্রসঙ্গে তিনি সাহায্য লাভ করেন। সেই অবধি তাহার স্বচ্ছলতা তাহার নাম পাঠ্যইয়া ‘হরপ্রাসাদ’ রাখেন। পরে এই নামেই তিনি বিখ্যাত হন। বাস্তবিক হরের প্রাসাদ ভিন্ন সামান্য অশ্রুতা হইতে কেহই

উন্নতি ভুলভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না। অশ্রুত এক চাকায় রথ চলে না। ইধর-প্রসাদের সঙ্গে পৌরুষ ও প্রব্রু চাই। সেইজন্য ক্রমশঃ বলিতেছেন—Trust in God but keep your powder dry. কতটা উত্তম ও উৎসাহ, পৌরুষ ও প্রব্রু, প্রয়োণ দ্বারা অজ্ঞাতনামা হরপ্রাসাদ বিশ্ববরণ্য হন এবং শুধু যখনে নহে ইউরোপ-আমেরিকার পতিতদশাও পূজা লাভ করেন, তাহা ভাবিলে বিম্বিত হইতে হয়। এখন আমরা অগ্নিতে গলিতে গবেষকের সাক্ষ্য পাই। পাক্কাভাষ্যে প্রকাশিত হুটীরের সাহায্য মাত্র লইয়া অনেক গবেষণার চরম উপনীত হইতেছেন এবং বহু চর্চায়ের চর্চণ করিয়া প্রতিষ্ঠা ও পাতিভ্যের খ্যাতি অর্জন করিতেছেন। শাজী মহাশয়ের গবেষণা কিছু সে ধরণের ছিল না। তিনি এ কার্যে প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় করিতেছেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান করিয়া তবে নিজের মতামত প্রকাশ করিতেছেন। সেইজন্য তাহার অশ্রদ্ধাভান ও গবেষণা এত সফল ও সার্থক হইয়াছিল এবং সেইজন্যই তিনি বহুক্ষেত্রে নূতন নূতন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ফলতঃ কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সর্বত্র বিবুদ্ধনের নিকট তাহার মত বিশেষ মূল্যবান মণিমা হুতী হইতে।

শাজী মহাশয়ের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র ছিল এশিয়াটিক সোসাইটি ও বন্যী সাহিত্য-পরিষদ। বন্যী সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাহার অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যতদূর অগ্রন হইতেছে তিনি তখন বৎসর পরিষদের সভাপতিরূপে এ প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যায়ন করিয়াছিলেন। পরিষদ তাহার নিকট কত ধরণে কল্পী তাহা বলিয়া নিশেষ করা যায় না। পরিষদের সভাপতিরূপে তিনি যে সকল বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন তাহা সর্বদাই নবনব প্রত্নপুণ্ডে সজ্জিত থাকিত। তাছাড়া তিনি পরিষদ-পত্রিকায় আরও কত প্রবন্ধনিবন্ধ প্রকাশিত করিতেন। তাহার আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত ‘বৌদ্ধজান ও

দৌহা’ পরিষদের এক অমূল্য সম্পদ। উহার দ্বারা বাংলা ভাষার ইতিহাস-সম্পর্কে এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত হইয়াছে। পরিষদের অর্থসকট দূর করিবার জন্য তিনি প্রাচীন যন্ত্রণে ও ভিক্ষাভাষ্য হতে ধনী এবং সীমাবদ্ধবিশেষের দ্বারা ধনী দিয়াছিলেন। অনেক স্থানে প্রত্যাখ্যাত হইতেন, কোথাও বা অজ্ঞিত হইতেন, কিন্তু শাজী-মহাশয়ের অশ্রুত অধ্যয়ন তাহার দমিত হইত না। পরিষদ যে আজ অনেক অংশে অর্থহীন হইতে মুক্ত হইয়াছে তাহার ক্ষত যদি কেহ দৃষ্টবাদ-ভাষ্যন হয় তবে সে শাজী মহাশয়।

শাজী মহাশয় যখন মূল-বিভাগে একজন নির-শ্রেণীর শিক্ষক তখনই তাহার মধ্যে গবেষণা-বৃত্তি উদ্ভিক্ত হয় এবং তিনি প্রকৃতভাবে রাজা রাজেন্দ্রলাল দত্তের সহকারীরূপে শিক্ষানবীণ করেন। এ শিক্ষানবীণ একটা কঠোর মান। অনেক কটকের কত সহ্য করিয়া তাহাকে এ কটকটিতে স্বেচ্ছা অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। এ সময় হইতেই এশিয়াটিক সোসাইটীর সহিত তাহার যোগ। কালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান হইয়া উঠেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ সভার Philological সেক্রেটারী হইতেন। এশিয়াটিক সোসাইটীর প্রাচীন Journal এও পূর্বা উন্মোচিত এক্ষেত্রে তাহার অবদানের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

এশিয়াটিক সোসাইটী অনেকদিন হইতে রাজকীয় সাহায্যে সংস্কৃত ‘পুঁথি সংগ্রহ’ করিয়াছিলেন। একজন সোসাইটীর পর্যটক পণ্ডিত নিযুক্ত ছিল। শাজী মহাশয়ের চেষ্টায় এ পণ্ডিতেরা সন্মত্তের সহিত বাংলা পুঁথিও সংগ্রহ করিতে আনন্দ করতেন। তাহার ফলে অনেক অজ্ঞাত বাংলা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটীতে সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথি বহুদিন পর্যন্ত শুপীকৃত হইয়া অজ্ঞান আকারে অবস্থিত ছিল। শাজী মহাশয়ের চেষ্টায় এবং তাহারই শ্রম ও যত্নবায়ুতে এ সকল পুঁথি বাণ্যবিভাগে সজ্জিত হইয়া তাহাদিগের স্থপরিচায়ক কাটালগ প্রস্তুত হয়। বৃত্তি, পুরাণ ইত্যাদি ভিত্তি মিত্র সাহায্যে পাণ্ডুলিপির পরিচায়ক, এই সকল কাটালগ প্রত্ন-ভাষিকের পুণ্ডে অতিশয় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। কারণ,

‘উগ্রাহা তত তালিকামাত্র নহে, এ প্রব্রু শাজী মহাশয় নানা ক্রমশঃ অজ্ঞান গহনর উপর যে আলোকপাত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যাহাটিক এ এ ত্রুণ অশ্রুর বন্যে প্রবেশ-পণ বৃত্তি লাগেই সর্বত্র হন।

শাজী মহাশয়ের গবেষণার উল্লেখ করিতে গেলে দুইটা বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়—প্রথমতঃ প্রাচীন বাঙালী সাহিত্য। চরিত্র বৎসর পূর্বেও অনেকের দাব্য ছিল যে, বাংলা সাহিত্যের আরম্ভ বিভাগ্যগর বাঙালীর হইতে। বীরাধা আর একই পিঠায়া বহিভেন তাহার ভাষ্যচর্চায়ের অধ্যয়ন ও রাধা রামদানবের রাধের নাম লইতেন। শাজী মহাশয়ই প্রথম বিশেষ বিবরণসহকারে প্রমাণিত করেন যে তৎপূর্বে শত শত এমন কি সহস্র সহস্র বাংলা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তাহাঙ্গর পুঁথি-সন্ধানের আয়োজন আরম্ভ হয়। এখন আমরা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের শোভা ও সমৃদ্ধি-সমৃদ্ধি অঙ্গের কথাই জানিাইয়া।

দ্বিতীয়তঃ হইতেই বহুবিধ নাম ভবিতাম, প্রব্রু ঠাকুরের পুঁথিও আমাদের একবারে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু প্রব্রু ঠাকুর যে যন্ত্রণের নশ কল্পের এবং প্রব্রু ঠাকুর যে প্রব্রু ও বিব্রুত বৈদ্যক্য—এ নূতন তত্ত্ব কে আবিষ্কার করিল? এ আবিষ্কার শাজী মহাশয়ের একটা বিশেষ অবদান।

শাজী মহাশয় বধ্যমে প্রায়ণ করিয়াছেন—বেদানে হাইলে আর করিতে হয় না।

যদি গগন নিবর্তকে তৎপ্রাণ পরময় মন—শীত।

মহাশয়ের প্রকৃত নাম কি? ভগবানই আমাদের প্রকৃত বাস। আর হইতে দুলিষ যন্ত্রণ বিস্মৃতির হয়, অশ্রু হইতেই কৌর যন্ত্রণ বিস্মৃতির হইয়াছে—‘বধ্য’ অর্থাৎ ‘মৃত্যু’ বিস্মৃতিঃ যন্ত্রণার পুঁথি। সেই সিদ্ধান্তানুসারে বিস্মৃতি বিস্মৃতি নিমজ্জিত হয়—‘তৎপ্রাণ’ বৈদিক কবি ইহাকে ‘অশ্রু’ গগন বসিতেন—‘হিষ্যাবতঃ’ পুরনমেই—‘কল্প’ বৈদিক। ‘অশ্রু’ শব্দের প্রাচীন অর্থ গৃহ (home)। যন্ত্রণের বলিগত—‘অশ্রু’ গগন ন পমাণং অশ্রি। আমাদের অশ্রু বা home কি? সেই অশ্রুগত—‘বীরাধা’ বহু হইতে আমরা স্বপ্ন জীবিত বিস্মৃতির হইয়াছি। তাই কবি বলিয়াছেন—

‘Frailing clouds of glory that we come From God who is our home.

শাজী মহাশয় সকল ও সার্থক জীবন বাগন কল্পে বধ্যমে প্রভাববর্তন করিয়াছেন—‘বীরাধা’ আর বধ্য সংস্কৃত হইয়াছেন। অশ্রু এবং তাহার অশ্রু—আমরা অতিমাত্র শোক করি না। তিনি সেই পরম ধাম হইতে তাহার প্রত্যাশ্রয় এই বধ্যদের উপর আশীর্বাদ বরণ করুন হইয়া আমাদের প্রাণন।



## মহাপ্রস্থানে হরপ্রসাদ

ঐগণপতি সরকার

“পঞ্চপুষ্পের” সম্পাদক অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমৃত-চরণ বিজ্ঞানচন্দ্র শ্রীমাকে পরম পূজ্যশাধ শ্রী শ্রী মহাশয়ের মধ্যস্থে কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। “অমৃতচন্দ্রের” অনুরোধ, তাহাও শ্রী শ্রী মহাশয়ের কর্তব্য, আমার অমত করিবার উপায় নাই। নতুবা তাহার এই অকস্মাৎ বিরোধে আমার যে আশাত নাশিয়াছে, তাহাতে সত্যই কলম চলে না, বাক্যও টিক সন্দেহজনক হয় না। কণ্ঠবোধের অনুরোধে যখন লিখিতেই হইবে তখন চেষ্টা করিয়া দেখি কিছু লিখিতা সেই অনাবিল পুস্তকটির, পরম শ্রদ্ধেয় পরমপূজনীয় পরম স্নেহশীল পরম পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান ভ্রাতৃপন্থ মহাশয়ের প্রায় প্রসার শ্রী শ্রী মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে প্রদান করিতে পারি কি না।

সতের বৎসর পূর্বে শ্রী শ্রী মহাশয়ের স্মৃতি আমার প্রথম পায়ের হয়। পরিচয় ঘটবার, কার্যও অভিব্যক্তি। আমার জ্যোতিষ-চক্রাই তাহার স্মৃতি স্মরণ করিবার সুযোগ বানাইয়া দেয়। একবার তাঁর দৈহিকতার বিবাহের সময় কোটির ঘোঁটক শিল্পকরশৈলী ক্রিয়া ও আর একবার অপর এক দৈহিকের বিবাহের দিন সেখানকার দ্বিবার জন্ম আমার বিনিয়োগ করেন।

সন ১৯০২ সালে আমি কলিকতা জ্যোতিষের গবেষণায় বিশেষ মনোযোগী ছিলাম। তখন কলিকতে পারিসাদ নামে “এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেসেন্ট” “ভূগোলিক” আছে। ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্রের এক অঙ্গুষ্ঠ। ইহা দৈহিকতার গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হইল। “এসিয়াটিক সোসাইটি”তে তখন মাঝে মাঝে বই-ক্রিনিতে গাইতাম। এই বা পুথি এখন হইতেও কলিকতে হইলে উহার শতাংশ হইতে হয়। ভাটপাড়া শ্রীমুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বি-এ, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের “সহিত” আমার পুথি “পনিষ্ঠা” থাকার, তাহাকে সোসাইটির সভ্য হইবার কথা বলায় তিনি বলেন, যে আর বেশী কথা কি। মহাপ্রস্থানীয় হরপ্রসাদ

শ্রী শ্রী মহাশয়ের স্মৃতি তাঁর পুণ্য দ্বারা আছে, তাঁকে বলিয়া এ ব্যবস্থা করিলেন। আশুতোষই আমাকে ১৯০৫ সালের ১৭ই নভেম্বর শনিবার শ্রী শ্রী মহাশয়ের স্মৃতি তাঁর শিল্পকরশৈলী বাড়াতে পরিচয়িত, করাইয়া দেন। ১৯০৬ সালে শ্রী শ্রী মহাশয়ের আমাকে সোসাইটির মেম্বর করেন। এই ১৯০৬ সাল হইতেই তাহার স্মৃতি স্বাভাবিক পনিষ্ঠা। ক্রমশঃই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকে। সোসাইটির পুস্তকালয়ে রক্ষিত “ভূগোলিক” হোয়াইট বেল্লপ হস্তাক্ষর হইয়াছিল, শ্রী শ্রী মহাশয়ের সন্মানে সেইরূপ প্রাচীন হইয়াছিল। চুপকোঁড়ের আকর্ষণের দ্বারা আমার মনে আকর্ষণ গাঢ় হইয়াছিল। তাঁর স্মৃতি পরিচয় হইবার পর, হইতেই তাঁর কলিকতা-অবস্থান সময়ে এমন মাস ছিল, যে মাসে আমি কলিকতার তাঁর মন্ড্রে দেখা না করিয়াছি, কখনো, এই মাসের স্থান, সপ্তাহ অধিকার করিয়াছিল। তাঁর স্মারিক ভাব, সর্বজনীন শ্রদ্ধা, ব্যবহার, নিষ্ঠাবান অঙ্গার পাতিত, অকপটে উত্তর প্রদান, বন্ধুত্ব, কলিকতা, কলিকতা, প্রতি যে, কাঁচা উৎসাহ প্রদান, অসাধারণ সৌজন্য, সামাজিকতা, ভ্রমতা ও ক্ষমা প্রভৃতি সমস্তাবলী সকলকে তাহার প্রতি আকর্ষণ করিত। দেখিয়াছি যিনি একবার তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়াছেন, তিনিই তাঁর ব্যবহার ও পাতিতের স্বাভাবিকতা করিয়া থাকিতে পারেন না। যিনি তাঁর স্মৃতি আলগা করিয়াছেন, তিনিই তাঁর প্রভাবের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছেন। যিনি এক কথাই মাত্রই মাঝে ছিলেন। যিনি যে বিনয় হয়, তার উৎকর্ষ উৎসাহের তাহাতে দেখিয়াছি।

১৯০৬ সালে আমি ভূগোলিক হই। আমার জন্মের ১০-এ, শ্রী শ্রী মহাশয়ের কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় তখন গৌরীকেশবর মন্দিরের নিকট তাঁর আশ্রম তৈয়ারি করিতে ছিলেন। এই আশ্রম নির্মাণের পর হইতেই এই স্থান বাহ্য-নির্মাণের পরিকল্পিত হইয়াছে এবং এখন অনেক

পাখি বাড়িতে গিয়াছে; অনেক বোকা, এখন বাঘপরি-বর্ধনের জন্ম এখন যায়। বাসীন্দী-মহাশয় আশ্রমের ভিত্তি স্থাপনের সময় একখানি শিলালিপি পান। তাহার মাথায় দেন একটা স্তম্ভাক গবেষণার মূর্তি আছে। এই গবেষণার ছই পাশে ছই ভাষায় লেখা আছে, আর একপাশেও লেখা আছে। এই লেখার একভাগ তামিল ভাষায়, অন্যভাগ বঙ্গ ভাষায়; তবে বঙ্গাক্ষরের ভাষা বাংলা ও উৎকল ভাষায় সম্মিশ্রণ জাত। এই শিলালিপির খানি বাসীন্দী মহাশয়ের অধীনস্থ লেখা আমি বাড়িতে লইয়া আসি, এখনও তাহা আমার নিকট আছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু জমিদার শ্রীযুক্ত পুরাণচাঁদ নাহার এম-এ, বি-এল, এটর্নি মহাশয় ইহার ছাপ তুলিয়া দেন এবং এই হস্তে আমার প্রস্তর ফলকের ছাপ লওয়া দেখা হয়। এই ছাপ লইয়া শ্রী শ্রী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হই। তিনি উহা ভূগোলিক একরূপ পড়িয়া ফেলেন। তারপর “এসিয়াটিক সোসাইটিতে” এই পাঠ্যের পড়িবার ব্যবস্থা করেন। উহা সোসাইটিতে পড়া হইয়া গেলেও জুলকমে কয়েকমাস ছাপা হয়। পরে উহা “জারজাল এণ্ড এন্সিডিং অব বি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল” নিউসিপিং ভলুম ২০, ১৯০২ সালের প্রথম সংখ্যায় বাহির হয়। শ্রী শ্রী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে শ্রীযুক্ত হুমুতী কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর বাপের ভাষায় উৎপত্তি সম্বন্ধে যে স্বরূপ পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে এই শিলালিপি হইতে সাহায্য গ্রহণ করেন, একদা হুমুতী কুমার শ্রী শ্রী মহাশয়কে বলিয়া ছিলেন। এই শিলালিপি কখনো শ্রীযুক্ত জুলকম সর্গার মহাশয় তাঁর “মন্দিরের কথা” পুস্তকেও উল্লেখ করিয়াছেন। একদা শিলালিপি হইতেও কোথাও বাহির হয় না।

এ ১৯০৬ সালেই প্রথম আমি পুরী গাই। বাসীন্দী মহাশয় আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন যে, পুরী পাতাল-গৃহে কিছু লেখা আছে। প্রবাস ওখন হইতে একটি বড়প ছিল এবং উহার বিষয় এই লেখার মাধ্যমে উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ টিক তখনও উজ্জ্বল হয় নাই। তখন শ্রী শ্রী বিরিতে হইয়াছিল বলিয়া এই বিষয়ের কোন সন্ধান লইতে পারি নাই। তারপর ১৯০৬ সালে পুরী গাই। পুরীতে গিয়া পুরীর মন্দির ও কোণারক মন্দির বিশেষ

বিবরণ জানিবার জন্ম শ্রী শ্রী মহাশয়কে পত্র লিখি। তিনি তত্ত্ববত্তে ৩১শে মার্চ ১৯২৬ সালে আমাকে লেখেন—

কল্যাণবরনমঃ—

গণপতিবাবু, পুরীতে আমার ক্রোড়, ফিলজফার ও গাইড হজেন মহাপ্রস্থানীয় সাদাশিব কাম্যকর্ষ। তিনি মন্দিরের পূর্ণ দরবার অর্থাৎ অক্ষপত্তের কিছু পূর্ণে এক বাড়িতে থাকেন। তাহার কাছে আমার নাম করিয়া গেলেই তিনি আপনাকে সব দেখাইয়া দিলেন। তিনি পুরীর যত সংবাদ জানেন তত আমায় কহেই জানি না। কোণারক জামার অর্ঘ্য নাই। একবার বাইতে বাইতে ব্যাঘাত পাইয়া রাত্তি হইতে কিরিয় আসি। আর একবার সব উজ্জাগ সন্তোষ স্বীয় দেহভাগ সংগ্রহ পাইয়া কিরিয় আসি। এবার চন্দন-বাগায় পুরী বাইবার ইচ্ছা আছে তুমি ততদিন থাকিবে কি? কোণারক মন্দির বই-প্রস কখন পেরে লিখি।

ভক্তার্থ

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রী শ্রী মহাশয় আমাকেই পত্র লিখিয়া কর্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি সাদাশিব পণ্ডিত মহাশয়কেও জামার কথা লিখিয়াছিলেন। আমি তখন এক্ষণে তাহার সন্ধান গিয়াছিলাম, পণ্ডিত মহাশয় এদিকে তাঁর এক ছাত্রকে আমার বাসার বোকে পাঠিয়েছিলেন। সাদাশিব পণ্ডিত মহাশয় বড় মূর্খ ও ক্রান্তির লোক ছিলেন, অস্বস্তি-বশত ছিলেন, শ্রী শ্রী মহাশয়ের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অপরিমিত ছিল। তিনি আমাকে পুরীর ও কোণারকের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তাঁর “ঐগণপতি-মন্দির” নামক পুস্তক আমাকে উপহার দেন এবং “কল্যাণপদ্ম” নামক যে অমূল্য হস্তিগ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাও দেখান। তাহাতে তাঁর পাণ্ডিত্যের কৃষ্ণাংগ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দনের বিষয় উল্লেখ্য অল্পকাল করিয়া ও কোণারক মহাশয় স্বর্গদেবে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাকে মন্দিরের কয়েকটা শিলালিপি ছাপ দেন এবং তাহাতে কি আছে তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি এই শিলালিপি মন্দিরের গহিতে পারি নাই। তারপর ১৯০৬ সালে পুরী গাই। কোন কোন স্থানে হইতে পাওয়া গিয়াছে তাহা টিক করিয়া বলিয়া দিতে পারেন না। পুরীতে আমার স্বীয় অস্বস্তি ওজায়



আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসি, অল্পট লিপিগুলি লইয়া পুরীর মন্দিরে লিপিগুলির সহিত নিমাইতে তখন পারি নাই। তারপর শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত ঐ লিপিগুলির ছাপ লইয়া আলাচনা করি, পার্শ্বাল গৃহে যে শিলালিপিখানি আছে তাহাও বলি। তখন কতক কতক পাঠ উদ্ধার করা হয়। আর আমাদের মধ্যে স্থির হয় যে, পুরীতে সিংহাচ্যুত দেখিয়া নিমাইরাই লিপিগুলির ব্যবস্থা করা বাইবে। তৎসময়ে ১৯২২ সালের মধ্যে আমি তিনি ও আমি একত্রে পুরী বাই। তখন ঠাণ্ড বড় জামাতা শ্রীকৃষ্ণ ভুবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুরীতে কলেজের ও ম্যাজিস্ট্রেট। আমরা তাঁর আতিথ্য স্বীকার করি। তিনিও খুব হৃদয়শীল। সেই পর্যন্ত তাঁর সহিত আমার সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় ও আমি সিংহাচ্যুত নিমাইর মহাপ্রাণোপায়ী সশনিব মিশ্র মহাশয় আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। পুরীর রাজার ম্যানেজার শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন। পরদিন পুরীর রাজা স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। প্রায়পূর্ণ দেখি জগদ্বাণের প্রসাদ রাজবাড়ী হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ত আসিরাছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাববিশিষ্ট দেখিতে আসিয়াছি একথা শাস্ত্রী মহাশয় রাজাকে ও তাঁহার ম্যানেজারকে বলিয়া তাঁরা তাঁর স্বয়ংসাক্ষাৎ করিবেন বলিয়াছিলেন। তাঁরা খবর দেওয়ার আদায় এখন সেখানে গেলাম দেখি পাতাল-গৃহেরে দুইটি দেওয়াল ভাল করিয়া পরমা মাজিয়া পরিত্ত করা করা হইয়াছে, এবং অত্যন্ত চিত্রা রহিয়াছে। পাতাল-গৃহটী অন্ধকূপ-বিশেষ, সেখানে ঘুর্যবৎ বা পনকনয়ের প্রবেশ নিষেধ। বাহ্যেইউক প্রাঙ্গণের ও কর্ণপরের আলোর সাহায্যে কোথায় লেখা আছে তাহা দেখিয়া লভা গেল; কিন্তু সে স্থান এমন অসুবিধাপূর্ণ জনক যে, দাঁড়াইয়া ঐ লিপি উদ্ধার করা স্বকঠিন। তথাপি শাস্ত্রী মহাশয় পাঁচ দশ মিনিট অতিক্রমে পঞ্চদশ চৌকি করিয়া গলবন্দ্য হইয়া বাহিরে আসেন— কার্যে কিছু মাত্র অগ্রসর হওয়া গেল না, তখন আমিও তাঁহার ছাপ লইবার চেষ্টা করিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে পরিচয়ের পর যে কথাবিশি লিপি ছিল তাহার ছাপ সংগ্রহ করিলাম, আমি এক একটা ছাপ উঠাইয়া বাহিরে পাঠাইতে লাগিলাম, আর শাস্ত্রী মহাশয় উহা অতি মনোযোগের সহিত পড়িতে

লাগিলেন। সশনিব পণ্ডিত মহাশয় 'বে' ছাপগুলি দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কয়েকটীর সঙ্গে আমার গৃহীত ছাপ মিলিয়া গেল। তখন সেগুলির প্রাতিশ্রুতি ঠিক হইল। পূর্ণ-গৃহীত ও আমার গৃহীত এই দুই ছাপ পাওয়ার পাঠ্যবাদেরে হুঁহু হইবে বোধ হইল। শাস্ত্রী-মহাশয় একবারনি পাঠ্যবাদেরে প্রায় সেইখানেই ঠিক করিয়া ফেলেন। আমাদের জন্ত দেওয়াল পরিকার করিতে সিংহাচ্যুত হইয়াছে দেখিলাম যে, অক্ষরের দুই এক স্থান ভাঙিয়া দিয়াছে; পূর্ণের ও তাহা কতক ভাঙি ছিল, এবার তাঁর অবস্থা সঙ্গীন হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর এক বিবধা দ্রাব্যধু ও বড় পৌজকে আনিয়াছিলেন। তাঁহার তীর্থদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁরা তীর্থদর্শন করিতে লাগিলেন। সশনিব পণ্ডিত মহাশয় আমাদের মিশ্রপ করিয়া যাওয়াইলেন। বাড়ীতে তো 'ভিড়িয়া' বাসুদেব রান্নাই খাইয়া আসিতেছি, সেদিন কিন্তু ওদেশের ভ্রামণ-বাড়ীতে তাদের দেশের খাও খাইলাম। নানাবিধ বাজ্ঞন ও খাবার প্রকৃতি সবই ভাল লাগিল, কিন্তু সব আহাণ্য বস্তু আমাদের দেশের মত নয়, অনেক রকমারী ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে প্রভুহই জগদ্বাণ-দর্শন, জগদ্বাণ-প্রদক্ষিণ, মন্দির-দর্শন প্রকৃতি করা গিয়াছে। বোধ হয় ঐ সময় চন্দন-বাড়া ছিল। বোধ হইতেছে মনোজ-মর্যাবরে আমার ঐ উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে পুরীর মন্দিরটি যে ত্রিযাক্ষাণিকের তাহা বুঝাইয়া দেন, কোন সময় হইতে মন্দির নির্মিত হইয়াছে এবং কিরূপে উহার শ্রীচিহ্ন ঘটাইয়া তাহাও বলেন—পুরীর অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি বলিয়াছিলেন। আমি উপবীতী কাহ্ন বলিয়া শাস্ত্রীমহাশয় আমায় প্রতি কোনদণ্ড অস্বাভাব্য কখন দেখান নাই। একই স্থানে জামাতা শৌজ লইয়া আবার সহিত তাহারে বলিলেন। একই কামরায় শাস্ত্রী-মহাশয় ও আমি থাকিতাম। শাস্ত্রীমহাশয় কালিদাসের অম্বয়ক ভক্ত-শিষ্য জানিয়া কালিদাসের বইগুলি সঙ্গে লইয়াছিলেন। সেখানে অক্ষর সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন "সঙ্গে কালিদাসের বই আছে?" উত্তরে আমি বলিলাম "আছে।" তখন তিনি আমাকে বলেন "অনুগ্রহ দিগ্বিজয় তুর্ধ্ব সর্গে" আছে, খোল, এতো অতি নীরস

দেখ, আমি বলি তুমি শোন—সরস হয় কিনা?" দেখিলাম তাঁর তো সবই শ্লোক মুখস্থ। কচিং কোন স্থানে পোড়োটা ধরিয়ে দিতে হইয়াছে। ঐ নীরস সর্গটি তিনি এমন সরসভাবে ব্যাখ্যা করিলেন এবং ভারতের দুর্ভাগ্য বেন নন্দর্পণে ধুরী দিলেন, আর ঐ সর্গে কালিদাসের কলা-কৌশল নিপুণভাবে দেখাইয়া দিলেন; আমি তো বিম্বিত হইয়া গেলাম। জানা বিষয় যে এত ভাল লাগিবে এবং তাঁর মনেও নৃতন কথা পাইয়া তাহা তো ভাবিই নাই, কিন্তু যখন আমাদের ঐ সর্গ শেষ হইল দেখিলাম, তাঁহার নিকট অনেক নৃতন তথ্য পাইয়াছি। কাব্যেও তাঁর অল্পট দৃষ্টি ছিল।

যখন কালিদাস লইয়া কথা উঠিল তখন আরও কিছু না বলিলে কালিদাসের কাব্যের রাজ্য শাস্ত্রীমহাশয়ের গভীর জ্ঞানের প্রতি আভার করা হইবে ভাবিয়া সংক্ষেপে কিছু বলি।

আমি পণ্ডিত রামসদর্শক বিজ্ঞানবৎ মহাশয়ের ছাত্র। তিনি যেমন সৌন্দর্যদর্শন ও হরসিক ছিলেন তেমনই কালিদাসের বড় বোকা ছিলেন। তাঁর কাছে পড়িয়াই আমি কালিদাসের ভক্ত হইয়া উঠি। শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার পণ্ডিত মহাশয়ের বেশ আলাপ ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের ভান হাত ছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয়ও বিজ্ঞানসাগর মহাশয়ের দেহভাজন ছিলেন। এই হুজু উভয়ের পরিকার। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার কিছু পূর্বে পণ্ডিত মহাশয়ের, পোকাগর ঘটে এল আমার "কঙ্ক-সংহারের" পড়াহবার শেষ হয়। আগশোষের বিষয় শাস্ত্রীমহাশয় আমার "কঙ্কসংহারের" অহুলাদ দেখিয়া যান নাই। আমি শাস্ত্রীমহাশয়কে আমার "কঙ্কসংহার" উপহার দিই। তিনি তা পড়িয়া বলেন "দেখিলাম সকলে যে হল করে তুমিও সেই ভুল করেছ। ভুলটি কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতাম যে, "কহলি পাছকে আমি অশোক বলিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন যে কহলি নামে বনাম-প্রসিদ্ধ গাছ আছে। অমরসিংহ ভুল করায় সেই ভুল চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য আমি আমার ঐ ভুল "প্রকৃতিতে" কালিদাসের "বৃক্ষলতা" প্রবেদে এবং জ্ঞান সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় "কহলি-পুণ্ড"

প্রবেদে সংশোধন করি। শাস্ত্রীমহাশয় পড়িয়া বলেন, "হয়েছে ভুল, কিন্তু, ঠিক জ্ঞানে।" তার, কারণ বলছিলেন যে "সব গুলে দেখাতে পারনি; আবার ইহাও বলেছিলেন যে "সব বুঝাতে বাঙালও বিপদ।" তিনি মেঘবৃন্তের ব্যাখ্যা বাহির করিয়া কি অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন, তাহা বলেন। গরবমেটের অহুলাদক শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রলাল শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার বৈখানি অশ্লীলতা-দোষে দুই বলায় রিপোর্ট করার ভিত্তি সংকট কলমেগের প্রসিদ্ধিাপাণ্ডা সচেষ্ট কম বেগ পান নি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কর্তাদের মধ্যে তাঁকে কেহ সমর্থন করেন নি। তিনি সরকারকে, যে উত্তর দেন তাতে সরকার সন্তুষ্ট হওয়ায় তব নিতান্ত পারেন। তারপর তিনি বলেন যে "শকুন্তলা" আমার কাছে পণ্ডিতের সংস্করণ ও বাংলায় সংস্করণ নির্মিত শ্রদ্ধ। পণ্ডিতম, তিনি খুঁজাইয়া দিলেন যে, কাব্যংশে বাংলা সংস্করণ কত শ্রেয় ঘটাইয়াছে এবং কতক অংশ যে প্রসিদ্ধ তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। আর শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যায় বৈশিষ্ট্য যে কোথায় তাহাও দেখিলাম। তারপর তিনি মেঘবৃন্ত পণ্ডিতে বলিলেন। তাহাও পড়িলাম। যে অনির্কলনীর মৌলিক শাস্ত্রীমহাশয় চোখের মাংমে ধরিয়া দিতে লাগিলেন, তা ত, লেখাও যায় না। বলাও চলনা। তাহা কেবল অম্বয়ক করিবার। কি শকুন্তলায়, কি মেঘবৃন্তে প্রত্যেক যোক্তক ব্যাখ্যাতই কিছু না কিছু নূনত্ব পাওয়া গিয়াছে। রামসদর্শক পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বাহা পড়িয়াছি তাহা অতি স্মরণ, অতি মূল্য, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় ঐতিহাসিক ঘটনা দিয়া ঘটনার মাস-গুলির চাক্ষুশ দর্শনের অভিজ্ঞতা দিয়া এবং রস-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়া ঐ মধুরক অম্মরুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মেঘবৃন্তের ব্যাখ্যা পড়িয়া সকলেই মুগ্ধ হয়, কিন্তু যদি ইদানীং উহা লিখিতেন তাহা হইলে উহার মাধুর্য আরও যে অনেক বেশী বাড়িত তাহা নিম্নোক্তে বলিতে পারা যায়। শাস্ত্রীমহাশয়, কালিদাসকে বৃত্তিতে সারা ভারতবর্ষে বেড়াইয়াছিলেন, তবে তিনি কালিদাসকে বুঝিয়াছিলেন। তিনি যখনই যিরেমে বাইতেন কালিদাসের বই কখনই তাঁর পাখী থাকিত। তিনি একবারের কুলাঙ্গারের ভক্ত, শিষ্য ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁর নিকট কালিদাসের কথা উঠিলে দেখিতে তিনি যেন কালিদাসময় হইয়া সেছেন।



কালিদাসের প্রত্যেক বহুখনি তাঁর কষ্ট ছিল। কালিদাস সঘরে তিনি কিছু বলিতে আরম্ভ করিলে কাহারও উত্তিরাণের সাধা থাকিত না, বরং তাঁরপর ধূম্রাক্রমশঃই বাড়িয়া যাইত। যে মহিমাধা “দ্ব্যবস্থা বিষমুচিতা” “হৃদয়ে” “সঞ্জীবনী” টাকারূপ শ্রেষ্ঠ দিয়া কালিদাসকে বাঁচাইয়াছিলেন তিনি যে কালিদাসকে বুঝেন নাই একথা বলা দৃষ্টতা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহিমাধা কালিদাসকে বুঝিবার জন্ত সাধা ভারত বোহ হইয়াছেন নাই, কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কালিদাসের রস ও সৌন্দর্যের সম্যক তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। “নারায়ণে” কালিদাসে বইগুলির উপর শাস্ত্রীমহাশয় যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন সেগুলি পড়িলেই বোধা যায় যে তিনি কবি কালিদাসকে বুঝিয়াছিলেন। এই কালিদাসের সৌন্দর্য বুঝিবার অন্তর্ভুক্তি তিনি পাইয়াছিলেন তাঁর কাব্যের গুরু রামনারায়ণ বিজ্ঞানত্বের নিকট। শাস্ত্রীমহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজে বই দেহিতে পড়েন। কাব্য পড়াইতেমু রামনারায়ণ পণ্ডিত মহাশয়। তাঁর নিকট শাস্ত্রীমহাশয় সমস্ত রত্নবিশিষ্ট পণ্ডিত। পড়ার সময় ইন্দুমতীর স্বরধ্ব পড়া হইলে, পড়িত মহাশয় তাঁর ছাত্রগণকে দেখাইয়া দেন যে, মহাকবি কালিদাস “কুমারসম্ভবে” পাণ্ডিত্য রূপবর্ণনার হাত একখানে ইন্দুমতীর রূপবর্ণনা না করিয়াও স্বয়ংসভায় এক রাজার নিকট হইতে অস্ত্র রাজার নিকট ঘাইবার কালে ইন্দুমতী সম্পর্কে কেবল বস্তুকী বিশেষণ ব্যবহার করিয়াই অস্ত্র প্রাণীভূত তাহার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্রীমহাশয় তখন অল্পবয়স হইলেও উহা হইতেই কাব্যের সৌন্দর্য ও রস উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা পান। যে শিক্ষা তিনি শুল্কাকালে পাইয়াছিলেন, তাহার ব্যবহারের উদাহরণ আমি স্মৃষ্টি একদিন পাইয়াছিলাম। “কন্যাবন্ধু” নামে এক মাদিক “পত্রিকা”র আমার “কামন্দকীয় নীতিসারের” অন্তর্ভুক্ত “কিঞ্চৎ অংশ ছাপা হয়। আমি একদিন মূল বাণিনি ও ছাপা অংশ লইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বাই এবং তাঁহাকে বলি যে, তাঁহাকে দেখিয়া দ্রুত হইলে, আমার অল্পবয়স ত্রিক হইতেছে কি না। এ কার্যে তাঁহাকে রাজী করাইতেই না। পরিচয় তিনি সেদিন কিরূপ অল্পবয়স হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্ত

কেয়টকি গোড়ার স্নোকে দেখেন। মূলগ্রেছে চাপকগ্রাসে “হৃদ্বশ” শব্দ আছে, তাই দেখিয়া তিনি ধরিলেন যে, কামন্দক চাপকবন্দে দেখিয়াছিলেন, তাহা না হইলে “হৃদ্বশ” অর্থাৎ হৃদয়, আকৃতি একথা লিখিতেন না। অবশ্য ঐ “হৃদ্বশ” শব্দের অর্থ টাকাকার ঐ অর্থ ব্যবহার করেন নাই, আমি টাকাকারকে অস্বপ্ন করিয়াছিলাম হৃদয়তা ঐ অর্থ যেহে হৃদয়তা ভাবি নাই। বোধ হইতেছে শাস্ত্রী মহাশয় “বিহার উড়িয়ার রিসার্চ সোসাইটির ভারতালে” “কামন্দকীয় নীতিসারের” প্রসঙ্গে যে অর্থ তখন করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় “বদীয় সাহিত্য-পরিষদকে” যে কত ভালবাসিতেন তা অনেক জানেন না বলিলে অতুল্য হইবে না। পরিষদের ভাষণের প্রতি অভিমান-বশতঃ তিনি পরিষদের সম্ভব তাগ করিয়াছিলেন; কারণ তাঁর প্রতি আকর্ষণ হইয়াছিল। তিনি যে মেঘদূতের ব্যাখ্যা বাবির করেন তাহা “স্মরণীয়তার অমার্জনীয় পোষ দৃষ্ট” এই কথা পরিষদের দ্বারীত্ব প্রকাশ করিতেই তিনি তাঁহাদের সম্ভব তাগ করেন। পরে তাঁরা তাঁকে পুনর্বার পরিষদে আনিতে চেষ্টা করিলে “আমি খেউগু গাই, আমি কি আ-নাগের সঙ্গে একাকসনে বসার যুগুণি” এই কথা বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের তখন আসন্ন দেন নাই, কিন্তু পরে রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী মহাশয়ের সনির্ভর অনুরোধে শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত ঘূরিয়া যায়; তাঁহাকে পরিষদে আনিতে হইয়াছিল, পরিষদের সভাপতি হইতে হইয়াছিল এবং তাঁহাকে দুইবার পাঁচবার করিয়া দশ বৎসর সভাপতি থাকিতে হইয়াছিল। দেহতাপের সময়ও তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন।

যখন পরিষদ মন্দির কাটিয়া অত্যন্ত ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় কলিকাতা কর্পোরেশন মন্দিরটাকে “কমন্ডেমেন্ট” করিয়াছিল (অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে বলিয়াছিল), তখন শাস্ত্রী মহাশয় আমার দ্বিবে একান্ত স্মরণীয় ভাবে এতদ্রূপ অশ্রুপূর্ণ নামের চাহিয়াছিলেন, “গণপতি, আমদের সাক্ষ্যেই পরিষদের সমাপি হইবে।” বৃদ্ধ লোকের সেই অথবা দেখিয়া প্রাণে যাবা পাই এবং তাঁকে আশ্রয় দিয়া বসিয়াছিলেন, “আশনি ভাববেন না, এ হ’তে দিব না।” তাঁরপর আমার

মহাশয় ভাতা শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যুৎস্বরকার মহাশয় কলিকাতা কর্পোরেশনের কন্সিগলির দ্বারায় তাঁর সহকারী কলিকাতা কর্পোরেশনের হাতে পরিষদের বাড়ীর জন্ত ২০০০ টাকা এককালীন (ক্যাপিটাল গ্র্যান্ট) আদায় করাইয়া দি। সেই সময় দ্বারার সঙ্গে বৃদ্ধ লোক বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ হীরেন্দ্রপ্রদত্ত মহাশয়ও শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে ছিলেন। কর্পোরেশন হইতেই দান বাবির করিতে বেঙ্গ দানকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ঐরূপ দান কর্পোরেশনের ইতিহাসে ঐ প্রথম। শাস্ত্রীমহাশয় একথা পরিষদের সভায় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন, হীরেন্দ্রবাবু স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁরপর পুনর্বার শাস্ত্রীমহাশয়ের অনুরোধেই রমেশ-ভবনের জন্ত বার্ষিক ২০০০ টাকা গ্রান্ট কর্পোরেশন হইতে বেঙ্গ দানার সময়তায় যত্নের বরাই। শাস্ত্রীমহাশয় ঐ দুই গ্রান্ট উপলক্ষে যে সংল চিঠি আমাকে লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে শাস্ত্রীমহাশয় পরিষদকে যে কত ভালবাসিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর বদীয় গবর্নমেন্ট হইতে রমেশ-ভবনের দেনা মিটাইবার জন্ত ১০০০০ টা এককাল শাস্ত্রীমহাশয়ের চেষ্টাতেই পরিষদ পায়। শাস্ত্রীমহাশয় ভাড়া পাইয়াই গবর্নমেন্টের গ্রান্ট আদায়ের জন্ত পরিষদের হইয়া যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা ঐ ভালবাসার ব্যতিরেকে, নতুবা ও-বসয়ে ওরূপ পরিশ্রম সংগঠনা ব্যাপার নয়। পরিষদকে ভালবাসার আর এক নিদর্শনও জানি। তিনি ও আমি দুই হইতে যে শিলালিপি ছাপা আমি তাহা উড়িয়ার ইতিহাসে নূন্য তথ্য বোঝাইয়ে একথা শাস্ত্রীমহাশয়ের বলিয়াছিলেন। আজও তাহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নি। পরী হইতে ফিরিবার পর পড়িয়া গিয়া শাস্ত্রীমহাশয়ের পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ঐ কাজ বন্ধ হইয়া। তাঁরপর যখন তিনি কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন আমি বিহার অঞ্চল হইতে একটি ভ্রাম্য-কলম পাই। উহা তাঁহাকে দেখাই। তিনি উহা দেখিয়া তখনই পড়িতে পারিলেন না, তবে বলিলেন, গুণদের সময়ের বলে বোধ হইতেছে। আরও তিনি বলিলেন, পরিষদের তৎকালকে এক ভ্রাম্য-কলম এসেছে তার কাজ না শেষ করে ঐ উড়িয়ার

শিলালিপিগুলি ও আমার এটি দেখিতে পারিবেন না। এটার পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনি এম্ব্রাটিক সোসাইটিতে পুরীর মন্দিরের এক পুরোহিতের সঘরে প্রবেশ পড়েন। তাহাতে আমাকে আনিত ঐ পুরীর শিলালিপিগুলি দেখান হয়। তারপর কথা ছিল পুঙ্খানুপুঙ্খ বইবেন, সেখান হইতে ফিরিয়া ঐ শিলালিপি কাজ শেষ করিবেন এবং আমার অনুমিত ত্রুটি-শীতির মুখবন্দ লিখিয়া দিবেন। ঐ ত্রুটি-শীতির অল্পবয়স বৎ তিনি আমার সঙ্গে আগাগোড়া মিলাইয়া পড়িয়াছেন এবং আশঙ্ক মত সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। অনেকদিন বয়স ঐ অল্পবয়স ও মূল বইখানা তাঁর নিকট মুখবন্দ লিখিবার জন্ত ছিল; কিন্তু আমাকে বেরণ দেহ তিনি কটিংস; তাহাতে আমি তাঁকে জোরজোর উঠা লিখিয়া দিতে বলিতে পারি নাই; এজন্য আমার ক্ষতি হইল সত্য; কিন্তু আমি কাজ করাইয়া হইতে পারি নাই। তিনি বলিলেন, “গণপতি, তোমার আমার ভাল লাগে কেন জানি? সকলেই আসে আমাকে exploit করতে, কিন্তু তুমি যে জন্ত তাঁর সঙ্গে অনেক কথা—অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। তার মধ্যে তিনি বলিয়াছিলেন, কি ভাবে ঐ মুখবন্দ লিখিবেন; এবং যদি তিনি লিখিয়া বাইতে পারিতেন নীতিশাস্ত্রের ইতিহাসে তাঁর এক অপূর্ণতা থাকিত। দেশের ছাত্রগণ যে তিনি লিখিয়া বাইতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন “সোসাইটির ক্যাটালগের এই বস্তুটা এগদিন হইলেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর তোমার ঐ কাজ করে দিব। কিন্তু আমাদের নিত্যন্ত ছাত্রগণ যে, তিনি আর কখনই পড়িলেন না, তাঁর যে কাজও শেষ হইল না। তাঁর শরীরে মুহুরে কোন চিহ্ন সেদিন দেখি নাই। মুহুরে একঘণ্টা পূর্ণেও বেহ জানিত না। তিনিও স্বয়ং বুঝেন নাই যে, তাহাকে অক্ষমপণেরই পরামর্শের দ্বারা হইতে হইবে। তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন যে, “আমার উইল আমি পরিষদকে তুলিব না।” তিনি পরিষদকে এক ভালবাসিতেন।

ইদানীং পরিষদের জন্ত প্রায়ই প্রবেশ তিনি লিখে



সিহনে। তাঁর প্রবন্ধ এক একটা রত্ন-বিশেষ। তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন “পা ভেঙ্গে গেছে, দ্বার পরিষদে বেতে পারির না; তবে আমি দ্বার দিবা”। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর বাক্য তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ-সম্পর্কে তিনি বলিতেন যে, “ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী কোন ভাষা কাজই করেনি; কেবল একটা ভাল কাজ করছে, সে কাজটা হচ্ছে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ’।” পূর্বেই বলা হয়েছে পরিষদের সভা থাকিলেও, শাস্ত্রীমহাশয়ই আমাদের পরিষদের কর্মকর্তাদের মধ্যে টেনে আনেন। পরিষদের রক্ষা সম্বন্ধে হীরেন্দ্রবাবু এক সময় তাঁকে এইরূপ বলেছিলেন যে “যদি পরিষদকে বাঁচান না যায় তহা কি করা যাবে, মাইসেরা যা করে ত কি চিন্তাই থাকে না। শাস্ত্রীমহাশয় হীরেন্দ্রবাবু মুখে এ ভাবের কথাও প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছিলেন। এবং আমাদের কয়েকবার উহা বলিয়াছিলেন। পরিষদের উন্নতির জন্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মল আগ্রহ ছিল। পরিষদ বাহাতে ভালভাবে চলে, তার সভা বৃদ্ধি হয়, অর্থায়ন হয়, পরিষদের হনাম হয়, পরিষদকে সকলে ভালবাসে, এসব বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টার অস্ত ছিল না। তিনি দ্বৈত ক’রে একবার বলেছিলেন যে, পরিষদকে তিনি আরও কিছু দিতে পারিতেন, কিন্তু পরিষদের কর্তৃপক্ষের চেষ্টার ও আগ্রহের অভাবে তা হ’ল না।”

শাস্ত্রী মহাশয়ই সর্বপ্রকারে প্রমাণ করেন যে, বাংলা-দেশে বৌদ্ধধর্ম আগত বর্তমান। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে “নারায়ণে” তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান যে কত গভীর তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দীনা ‘গাইকোয়াড় সিরিজে’ কয়েকটা বৌদ্ধ বই বাহির হয়, তার মধ্যে একখানি শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদন করেন। এই বইগুলি পাইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান আরও বৃদ্ধি হয়। ভারত-ইতিহাসের জায় বৌদ্ধধর্ম-সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ একথা অস্বীকৃত চিত্তে সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। ত্রীমুখ বিশালতরু পাশা মহাশয় প্রত্যহ রাত ৮টার সময় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট লোক পাঠাইতেন। শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মুখে মুখে বলিয়াছেন, তাঁহার লোকটা তাহাই

লিখিয়া লইতেন। মৃত্যুর পূর্ষদিন পর্যন্ত বিমলাবাবুর লোক আসিবে জন্মিয়াছিলম, মৃত্যুর দিন ঐ লোক আসিয়াছিল কি না জানি না। শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ ধর্ম-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বিমলাবাবুকে লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা তৎপ্রকাশিত “Buddhist Studies” গ্রন্থের Chips of a Buddhist workshop। ঐ গ্রন্থ ইউরোপের পণ্ডিত-মণ্ডলে খুব স্বখ্যাতি পাইয়াছে, এমন কি শাস্ত্রী মহাশয় যে সমস্ত ইউরোপীয় পণ্ডিত সম্বন্ধে কতিপয়কৃত করিয়াছিলেন তাঁরাও তাঁকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন, একথা শাস্ত্রী মহাশয়ের দেহ-রক্ষার পূর্ষদিন জন্মিয়াছিল।

প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে শাস্ত্রী মহাশয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, এ-বিষয়ে তিনি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের শিষ্য। রাজেন্দ্রবাবুর নিকট তিনি অনেক কিছু শিখিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় রাজা রাজেন্দ্রলাল, বিজ্ঞানসাগর ও বঙ্গবন্ধুর সময়ের লোক। এঁদের সকলের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এঁদের কত গল্পই তাঁর নিকট জন্মিয়াছিল। পুস্তার পূর্ষে কথা হইয়াছিল যে, পূর্ষ-সময়ের লোকদিগের সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাচীন স্মৃতি-কাহিনী আমি লিখিব। বিস্তৃত তাহা আর হইল না। উক্ত হইলে অনেক প্রাচীন কথা থাকিয়া যাইত। শাস্ত্রী মহাশয়ের বালাজীবন সম্বন্ধে তিনি আমায় কিছু কিছু বলিয়াছিলেন; তাহা লেখা আছে, বাকী জীবনের কথাও লিখাবার কথা ছিল কিন্তু তাঁর তিরোবাসে উহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

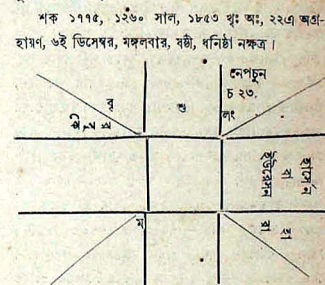
শাস্ত্রী মহাশয় বিজ্ঞানসাগর ও বঙ্গম যুগের লোক হইলেও তাঁর বাংলা লেখা তাঁহাদের লেখাকে অসুসরণ বরে নাই। তাঁর লেখা সংস্কৃত-বহুলও ছিল না বা বর্তমানের মত চলিত ভাষাও ছিল না। বঙ্গবাবুর আমলে বাংলা ভাষা পোষাকী ও আটপোরে এই দুই প্রকার ছিল। বর্তমানে পোষাকী ভাষাকে বাদ দিয়া আটপোরেকেই সমাজে চালাইবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে; শাস্ত্রী মহাশয়ের বাংলা না পোষাকী, না জ্বাটপোরে; তাঁর লেখা উভয়ের মধ্যবর্তী। বৌদ্ধধর্ম চর্চা করিয়া বুদ্ধদেয়ের বদ্যাপন অবস্থানের উপদেশ তিনি যেন বাংলা-রূপায় মানিয়া লইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষা অসুসরণ করিলে দুই দিকই বজায় থাকে, অতএব প্রকৃত বাংলা লেখা হয়; সংস্কৃতভাষারী ভাষাও হয়

না বা চলিত ভাষাও হয় না। তাঁর ভাষা বহু, সরল, সরস ও আনবিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, “সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় অধ্যাপক জামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এঁদের ইংরেজি পড়াতেন। তুর্ভিন সহজ ও মালা বাংলা লিখিবার জন্ত ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন।” তাঁর উপদেশেই শাস্ত্রী মহাশয়ের বাংলা পণ্ডিত বাংলা বা বঙ্গী বাংলায় অসুসরণ করে নাই।

শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, অনেক মৌলিক প্রবন্ধ ইংরেজিতে লিখিয়া গিয়াছেন। এ ছাড়া তিনি বাংলা ভাষায়ও অনেক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজি ভাষায়ও বাংলা-ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে তাঁর “ভারতবর্ষের ইতিহাস” বিশেষ প্রশংসাপাণ্ড; কেননা প্রাচীন হিন্দু-ভারতের ইতিহাস তাঁহার পূর্ষে এত বিস্তারিত ভাবে কেহ লিখিতে পারেন নাই। তিনি নিজ মুখে বলিয়াছিলেন যে, ভিন্সেন্ট স্মিথ তাঁর লেখা হইতেই অনেক মাল-মাল্য লইয়াছেন কিন্তু তাহা স্বীকার করেন নাই। এই ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতেই শাস্ত্রী মহাশয় ৫০,০০০ টাকা পান। একদিন শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, পুরো দেহব্যয়ের “বঙ্গদর্শন” একত্র করিলে বর্তা হয়, “বঙ্গদর্শনে তাঁর লিখিত প্রবন্ধ তত আছে। আমাদের জ্ঞাত তাঁর ২৬টা প্রবন্ধ “বঙ্গদর্শনে” আছে। তিনি বহু বাংলা মাসিকপত্র ও ত্রৈমাসিক পত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; যেগুলিতে তিনি লিখিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে, সে পত্রিকাগুলির নাম—আর্যদর্শন, বঙ্গদর্শন, নারায়ণ, বিভা, প্রবাসী, পঞ্চপুস্ত, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, বঙ্গযতী। যে সকল ইংরেজী পত্রিকায় লিখেছেন, সেগুলির নাম “জার্নাল অব্ দি এমিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল,” “জার্নাল অব্ দি বিহার এণ্ড উড্ডিচা রিসার্চ সোসাইটি,” “ইন্ডিয়ান এন্টিকুয়ারী,” এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা” “হিস্টোরিক্যাল কোয়াটারলি”।

শাস্ত্রীমহাশয়ের জন্মদাস লইয়া একটু গোল হইয়াছে। তাঁকে জন্মের সময় জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, ২২এ অগ্রহায়ণ, বধী, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র, এবং লগ্নে চন্দ্র; আর উহা ইংরাজি ১৮৫০ সালের নবেম্বর-মাস। কিন্তু ইহা লিখিতে

যাইয়া এ সালের পত্রিকা খুলিয়া দেখি যে, ইং ১৮৫৩ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখেই সহিত এ বাংলা তারিখ মেলে। শাস্ত্রীমহাশয়ের স্মৃতিশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, তারিখ সম্বন্ধে তাঁর ভুল হইত না, এইজন্য তাঁর জীবিতকালে পত্রিকা খুলিয়া দেখি নাই। আর অতিবর্তে তিনি ভ্রমতিনি পূজা করিতেন, এজন্য বাংলা তারিখ ও তিথি তাঁর চিত ছিল। এতে যে তাঁর ইংরেজী মাসে ভুল থাকিবে ভাবিতে পারি নাই। বৃষতিছে যে তিনি তাঁর জন্মসালের বাংলা পত্রিকা দেখেন নাই। অগ্রহায়ণ মাসে নবেম্বর ও ডিসেম্বর দুই মাসই পড়ে। তিনি ঘরে নিয়েছিলেন যে তাঁর জন্মদাস নবেম্বর, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ডিসেম্বরের ৩ই তারিখ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁর জন্ম সময় খুব চিত্র না হইলেও, লগ্নে চন্দ্র আছে “বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁর জন্ম-কুণ্ডলী করা গেল,—



কৌটিল্য বিচার করার এখানে আবশ্যক নাই। শাস্ত্রীমহাশয়ের মৃত্যুর পূর্ষদিন সন্ধ্যার পূর্ষে আমি তাঁর নিকট গিয়াছিলাম। দেখি, তিনি তাঁর তেতলায় বসে বারান্দায় ‘জ্যোতী’ বইটা বোঝাইতেছেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, ‘তোমায় খুঁজি’। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তিনি তাঁর ‘মেঘের মেঘে’ পুস্তকটি ছাপানেন, কিন্তু বই পাচ্ছেন না। তিনি বলিলেন যে, তাঁর বই ছেলেরা কোথায় কেলেঙ্কারে পাওয়া যাচ্ছে না, প্রকাশক হরিন্দ্র বাবুও বই দিতে পারেন না। এজন্য একখানি



পূরাতন "নারায়ণ" কিনেছেন, তাতেও সম্মত নাই; তাই আমার বৃদ্ধাঙ্কন। জামার "নারায়ণ" আছে তিনি জানতেন। আমি বলেছিলাম "বেণের মেয়ে" বই আছে, আপনারকে দিতে পারিবা। তিনি তাতে বলেছিলেন, "খুব নিশ্চয় করে তুমিও বলতে পার না, তোমারও তো বাড়ীতে ভাইপোটা আছে।" আমি তাঁকে ২০ দিনের মধ্যেই, "বেণের মেয়ে" দিয়ে বাব বলি। তারপর তিনি বলেন যে, "সময় না বেড়াবা।" আমি বলেছিলাম, "আপনার বা ভাল লগে তাই করুন, আমার জন্ম বসিবার দরকার নাই।" তিনি বলেন, ২২ বার এ হানটা ঘুরলে আশ মাইল হবে, মনে করেছি হাঁটব, একটু হাঁটলি। তারপর তিনি ও আমি হাঁটতে লাগলাম। হাঁটার সময় "বেণের মেয়ে" নিয়ে কথা হইল। পাঁচবার পাচচারি করিবার পর তিনি বলিলেন যে, তিনি আর হাঁটবেন না, কারণ বলিলেন, মাথাটা একটু ঘুরছে। মাঝে মাঝে একপ্রান্ত তাঁর হইত, তখন ঘরের মধ্যে ছই চেয়ারে চুপে বসে নানা কথাবার্তা চলিতে লাগিল। গোলাটেবিল দৈর্ঘ্যের কত কথা হইল। মহাভা গল্পী-সময়ে কথা হইল। এ প্রসঙ্গে তিনি পূর্বে অনেকবার বলেছেন, পুনর্বার বলিলেন, নুন তৈয়ারীর সময় যখন খুব পুসিবার মার-বর হইতেছিল, তখন একজন মহাভায়ে জিজ্ঞাসা করে যে, বড় মার আরম্ভ হলো যে; তাতে ধর্মীজী উত্তর দিয়েছিলেন, "মারের দেও উদয়ে পরমা পদমা দেগো", এ কথাটা তাঁর বড় ভাল লেগেছিল। তিনি মহাভায়কে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রকৃত বেশভূষা ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, তিনি প্রভুত্বের অঙ্গসম্বন্ধে যে সকল মাল-মদলা সংগ্রহ করে সেদেন তাতে দেশের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আনতে সহায়তা করেছে ও করবে। তিনি স্বদেশী বস্ত্রতা না দিয়াও দেশের যে সকল বৃদ্ধকর্মী পুনর্সজ্জার করেছেন তাতে দেশকে বড় করে তোলার অনেক কিছু করেছে। নেপালের বৃত্ত মহী মহাভায়ে, চন্দ্রসমসের জন্ম বাহাদুরের এক পুত্র তাঁকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া, শাস্ত্রী মহাশয়ের বাবতীয় বেধা যে তিনি বাদিয়ে রেখেছিলেন তাহা দেখান। আর বলেন যে, লোকে স্বদেশী স্বদেশী কি বলে, খাটা স্বদেশী কাণ্ড তা তিনি করেছেন, এগুলি তো তার নিশ্চয়।

এগুলি দেশের লোকের চোখ খুলে দিয়েছে। এক কথার মধ্যে অনেক কথা আসিয়া গড়িল। শাস্ত্রী মহাশয়ের সময়ে এত কথা মনে পড়ে যে, কথা আশুনিই বেড়ে যায়। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছি এমন সময় তাঁর তৃতীয় পুত্র পরিত্যক্ত বাব এনে ন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, ২০ দিনের মধ্যে কাবাখণ্ডী শেষ হইবে, তখন আমার জুজীভিত্তির মুখবন্দ ও নিলাশি প্রভৃতি কাণ্ড করে দিবেন। তিনি আমার নিকট তত্বের বই আছে কিনা পূর্বে জানিতে পারিয়াছেন ন। ঐ সময় কথা হয় যে উহাও "বেণের মেয়ের" সঙ্গে নিয়ে যাব। তিনি আমার সামনে তাঁর পুত্রকে বলেন যে, জুজীবর নাপার ২০ দিনের জন্ম নৈহাটী বাবেন। তারপর তাঁর বাবের চর্চি ভান্ডাখানে মালিস করিবার সময় হওয়ার, তিনি পুত্রের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, আমি বিদায় লইয়া আসিলাম। এই আমার শেষ সাক্ষাৎ, শেষ বিদায় ও শেষ প্রণাম করিয়া আসা।

মৃত্যুর দিন তাঁর মধ্যম পুত্র আন্তোবাবাব, শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত বৈকালে দেখা করিয়া গেছেন। তখন কোন কলঙ্ক দেখে যান নি। দৈনন্দিন কাজ যেমন করিতেন সেদিনও তাই করিয়াছেন। রায়ে ৬ খানির স্থানে ৪ খানি লুচি খান। বর্তমানে যে ছোটো তাঁর গম্বেশের কাণ্ড করিত সে "কমল বৃক ভিগো"র চাকরি পাওয়ার তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করে রাত ১০টার ভয়ামনে। এই "কমলা বৃক ভিগো"র সহিত শাস্ত্রী মহাশয় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি আমাকেও উহাতে লইয়া গিয়াছেন। তিনি শয়ন করিলে, সকলে নীচে নানিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ "মরে গেলাম" চিৎকার শুনে, সকলে তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে ঘরে গিয়ে দেখে যে, তিনি বসিয়া ছটফট করিতেছেন, কাশাছেন, আর কাশি ফেলিতেছেন। সকলে তাঁকে সেরা-কুশা করিতে লাগিল তিনি ঘামিতেছিলেন, মুছাইয়া দেওয়া হইল। তিনি বৃত্ত-মল্লত বীরে বলিয়াছিলেন, "বাবা রামলাল এবার অত্র আমার রাসতে পা.লি নি।" এখন-কার চাকরটির নাম "রামলাল"। পুত্রেরা একে কাছে বর্তমানে থাকিত না। ঐ সময় বড় পৌত্র ও এক দৌহিত্র তাঁর নিকট ছিল। অবশ্য বৃত্তিতে না পারিয়া একজন

নিকটই ভক্তার ভাকিতে গেল, অল্প একজন শাস্ত্রী মহাশয়ের ভ্রাতাপুত্র ডাঃ শিববাবুকে ভাকিতে গেলেন। ইতিমধ্যে শাস্ত্রী মহাশয় একবার স্বং উঠিয়া প্রার্থ্য করি-  
লেন, তারপর জল বাইয়া বিছানায় ভানদিয়ে কাণ্ড হইয়া পড়িলেন। অবস্থানে শুইয়াছেন বোধ করিয়া গায়ে লেপ দেওয়া হয়; কিন্তু পায়ে হাত দিতে পা ঠাণ্ডা বোধ হয়, আরও ভাল করে চাপা দেওয়া হয়। তাৎপর্য হাত ধরে হাতে নাড়ী না পাওয়া সকলে চকল হয়ে উঠে। তখন একজন ভক্তার এসে পড়ে। ভক্তার পরীক্ষা করে বলে

‘ময় নেই’ তার একটু পরেই শিববাবু সপরিবারে আসিয়া পড়েন, বোধ হয় তখন শাস্ত্রী মহাশয় পরশারে চলে গেছেন।

সেই রাতেই শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্রদের খবর দেওয়া হয়। বড় ও চতুর্থ পুত্র কর্মস্থানে থাকায় তাঁরা আসিতে পারেন নাই। অল্প তিন পুত্র আসিয়া তাঁর ভৌতিক দেহ নৈহাটীতে লইয়া যান, সেখানেই তাঁর শেষ কার্যে বংশাশ্রয় সম্পন্ন হয়, কারণ শাস্ত্রী মহাশয়ের এইরূপই ইচ্ছা ছিল।

## শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা

### ত্রিনিখিলনাথ রায়

একালে শাস্ত্রী মহাশয় বলিতে বর্ণগত পাণ্ডতপ্রবণ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে বুঝায়, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাই আমরা "শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা" তাঁহারই সম্বন্ধে ছই চারিটা কথা বলিতেছি। নৈহাটীর হুগ্রগঞ্জ ব্রাহ্মণ-পাণ্ডত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণের সহিত পাণ্ডত্য, পঞ্চার সম্মিশ্রণে যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানী হইতে সকলেই বুঝিতে পারেন। তিনি প্রকৃত সম্বন্ধে যে একজন বিকৃপাল ছিলেন, সে কথা বোধহয় নূতন কার্যে বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রকৃতভাবে তিনি অনেক সময়ে পাশ্চাত্য মতের পক্ষপাতী হইতেনও নিজের মৌলিকতা দেখাইতে জটী করিতেন না, আর আচার-ব্যবহারে তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ পাণ্ডতই ছিলেন, তিনি তথাকথিত সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্মো তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, ঐশ্বরিক আচার-ব্যবহার অঙ্গুণ্ড উচ্চ-হিসাবে তিনি পাশ্চাত্য মতের অঙ্গসম্বন্ধে চোঁ পাইতেন।

বাল্লা সাহিত্যে তিনি যে সকল অক্ষয় দান দিয়া গিয়াছেন, তাহাও যে অক্ষয়ী তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাঁহার 'বাসীকির জয়' বঙ্গ-সাহিত্য' এক অপূর্ণ স্রষ্ট। বাহুল্যের স্বেচ্ছা দার্শনিক আচার্য্য ব্রজেননাথ শীলের নিকট তনিয়াছি যে, হরপ্রসাদের 'বাসীকির জয়' ও চন্দ্রশেখরের 'উদ্ভাসপ্রেম' জগতের যে কোন সাহিত্যের নিকট স্পর্কা করিতে পারে। আর শাস্ত্রী মহাশয়ের দেখত ব্যাখ্যা যে বঙ্গসাহিত্যে এক নবমসের সঞ্চার করিয়াছে তাহাও বলিতে হইবে। তাঁহার 'বেণের মেয়ে' যে সেকালের একটি নিখুঁত চিত্র, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহার 'কান্দন-মালা' কথা কেহ ভুলিতে পারিবেন না। আর তাঁহার গবেষণা পুণ্ড্রপ্রভৃত্যসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী তাহাকে সকলের নিকট চির-অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার শেষ-জীবনের কার্য ইহুঁদীয়া, বাহুল্যের প্রসিদ্ধ প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণের বিবরণ প্রদান। এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণ করিয়া বাইতে পারেন নাই, সম্পূর্ণ হইলে, ইহা বাহুল্যের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়ের হসনা করিত।

প্রকৃতবে শাস্ত্রী মহাশয়ে প্রতিভা উজ্জ্বলভাবেই পরিচুট হইয়াছিল। তিনি যে কত পুণ্ড্র ঘটটিয়া নূতন নূতন পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহার জন্ম তিনি ভারতবর্ষের নানাহান পল্লিমণ্ডপ



করিয়াছেন। নেপাল হইতে অনেক নৃতন নৃতন তথ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বোধভ্রমের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনই প্রধান। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কিরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, নানা পুঁথি-পত্র হইতে তিনি তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালার ঈশ্বরচাঁদের পূজা যে বোধভ্রমের নিদর্শন, শাস্ত্রীমহাশয় এখানেই তাহা বুঝাইয়া দেন। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধ কিরূপ, অনেক সময়ে তিনি তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালীজাতের 'প্রতিভা' প্রাচীনকাল হইতে কিরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, শাস্ত্রী মহাশয় তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীকে একটি আত্মবিশ্বস্ত জাতি বলিয়া অভিহিত করিতেন। কি প্রকৃতবে, কি সাহিত্যে, সর্বত্রই শাস্ত্রীমহাশয় অপূর্ণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শাস্ত্রীমহাশয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকটই প্রথমে প্রকৃত-কথা-আলোচনা আরম্ভ করেন। সে সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রকৃতবে অধীতীর পণ্ডিত ছিলেন ও সে বিষয়ের অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করিতেছিলেন। ডাক্তার রামদাস সেনেরও প্রকৃতবে জ্ঞানোজ্জ্বল নাম ছিল। হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালকে ডাক্তার জালা চাকি করিতেন, এমন কি ভদ্রাও করিতেন। সে বিষয়ে তাঁহার নিজ মুখ হইতে শ্রুত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। যে সময়ে পণ্ডিতপ্রবর শম্ভুর তর্কচূড়ামণি মহাশয় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে রমেশচন্দ্র দত্ত ঈশ্বরদেবের বঙ্গবাস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। অল্প নত্ন মহাশয় পাশ্চাত্য মতের-ব্যাপারই পক্ষ-পাঠী ছিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের ঐয় ব্রাহ্ম-পাণ্ডিত কহাৎ তাহার সমর্থন করিতে গাঁয়েন না। তাই বঙ্গবাসীতে তিনি 'রমেশচন্দ্রের মতের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কেহ কেহ চূড়ামণি মহাশয়ের, আবার কেহ কেহ রমেশচন্দ্রকে

সমর্থন করিতে লাগিয়া যান। 'গ্রীক ও হিন্দু' প্রণেতা প্রহর-চন্দ্র প্রকৃতি চূড়ামণি মহাশয়কে এবং হরপ্রসাদ প্রকৃতি রমেশচন্দ্রকে সমর্থন করেন। হরপ্রসাদের চূড়ামণি মহাশয়ের কথার প্রতিবাদ রাজেন্দ্রলালের ভাল লাগে নাই। তিনি তজ্জন্ম হরপ্রসাদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। একদিন হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের গৃহে সাক্ষাৎ করিতে গেলে রাজেন্দ্রলাল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হরপ্রসাদের সহিত কালাপাল কহেন নাই। পরে হরপ্রসাদের অনেক অনুরোধ-বিনয়ের পর রাজেন্দ্রলাল তাঁহাকে জানাইয়া দেন যে, চূড়ামণি মহাশয়ের কথার প্রতিবাদে তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি হইয়াছেন। হরপ্রসাদ তাহার পর হইতে সে সম্বন্ধে আর কিছুই লেখা-লিখি করেন নাই।

সাহিত্যালোচনায় ইনি অবশ্য বহিঃসমর্থক ছাড়া আশ্রয় করিয়াছিলেন। বঙ্গধর্মের প্রধান যুগে অক্ষয়চন্দ্র, দীনবন্ধু, রামদাস প্রকৃতই বহিঃসমর্থকের প্রধান সহায়ক ছিলেন। কিন্তু শেষ যুগে চন্দ্রনাথ হরপ্রসাদ প্রকৃতি বঙ্গধর্মের পৌর বিস্তার করিয়াছিলেন। বহিঃসমর্থকের কাঁঠাল-পাড়ার ভবনে একটি সাহিত্য-বৈঠক বসিত। হরপ্রসাদ প্রকৃতি সেই বৈঠকে যোগদান করিতেন। আনন্দমঠের পূর্ণে 'বন্দ্যোপাধ্যায়' সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। সঙ্গীত রচনা করিয়া বহিঃসমর্থক একদিন বৈঠকের সকলকে ডানাইলেন। হরপ্রসাদ সে বৈঠকে ছিলেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মিশ্রিত সঙ্গীতটী তাহাদের ভাল লাগিল না বলিয়া প্রকাশ করার বহিঃসমর্থক বলিয়া উঠিলেন যে, 'যেহিবে দেশে ইহার কিঞ্চিৎ আদর হয়'। হরপ্রসাদ প্রকৃতি সাহিত্যের দিক দিয়াই ঐ কথা বলিয়াছিলেন, আর বহিঃসমর্থক দেশোদ্ধারের দিক দিয়া তাঁহাদের মত ব্যক্ত করেন। শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছিলেন যে, বহিঃসমর্থক কথায় যে শেষে টিক হইয়াছিল, তাহা অবশ্য এক্ষণে বুঝা যাইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু এখানে তাহা সম্ভব নহে। যাহা এই ছই চারিটি কথা বলিয়াই শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা শেষ করিলাম।

## মনাবী হরপ্রসাদ

• শ্রী অমৃত্যুচরণ বিদ্যাহরণ

গত ১লা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, রাত্রি গোরাটীর সময় মনাবী মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এই অত্যন্ত নিরলস একদিন মনাবী শশী সাহিত্যিকের পরলোকে-গমনে কেবল বঙ্গসাহিত্যের নয়, মিশ্রিত বঙ্গীয় সমাজেরও ইহলোক হইয়াছে। সাহিত্যের তপোবনে আজ বিশ্বাসের পরিচয় দনজ্ঞায়া প্রকট হইতেছে।

পূর্ণ অষ্ট শতাব্দী কাল শুধু বাঙ্গালী কেন—ভারতবাসী, ভারতবাসী কেন—ইলেক ও আমেরিকাবাসী তাঁহার অম্লান প্রতিভার জ্যোতিঃ দ্বয়ে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। বাঙ্গালীর অতীত গৌরব—সমাজ বিপ্লব ঐশ্বর্য্য এই আত্মসমাহিত নীরব তপস্বী বিশ্বস্তির অলগ্নত্ব হইতে টানিয়া তুলিয়া বিশ্বের নিকট তাহা প্রচার করিয়া বাঙ্গালীকে গৌরববীণ করিয়াছেন—সদে সম্মুখে বিশ্ব বাঙ্গালীর সম্মান ও ঘর্ষণা বাড়াইয়া দেন। অতঃপর 'বাঙ্গালী আত্মবিশ্বস্ত জাতি' এই মহাত্মকের নিপুত্বে প্রকীর্তন করিয়া তিনি স্বজাতির উদ্বোধন করিয়াছেন; ইহাতে তিনি দেশবাসীরা নিকট অসম ও পূজ্যস্থানীয় হইয়াছেন।

তিনি ছিলেন তপোব্রতী; জীবনব্যাপি বিরাট জ্ঞানবজ্র ও তপঃসাধনার সমগ্ৰ ফল জাতির প্রাণ-শক্তিকে উজ্জ্বল করিবার জন্য কামনাশূন্য হইয়া জাতিকে বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

যে শক্তিশালী পুরুষের তিরোধানে প্রজাগণ-তর্পণে বজ্র হইবার জন্ম আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যে ও প্রকৃতবে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মস্তক আপনা হইতেই তলীয় চরণে অবনত হইয়া পড়ে।

ত্রিশ বৎসরের অধিক সেই যুজ্যশ্রমের পরমাহুত হইয়া তাঁহার সমগ্ৰ দেহাধিক—কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁহার দেখে। যাহা ধরিতেন তাহা করিতেনই, কাহারও বাধা শুনিতেন না। কি উৎকট ছিল তাঁহার সাংসদিকতা—কিন্তু তাহা

একবারেই অস্বস্ত; মধ্যে মধ্যে তাহার গাষ্ঠীয়া দেখিয়া ভয় হইত—কিন্তু সে গাষ্ঠীয়া ছিল সত্যত নিরপট। ধান্দিকতার চিত্র তাঁহার মধ্যে দেখিয়া মনে মনে চরণে প্রশ্রয়িত করিয়াছি—সে ধান্দিকতা সকল সময়ে দেখিয়াছি অনাশ্রয়। অসাময়িকতা তাঁহার কথালগ্নকে সর্বদা হাতোজ্জ্বল রাখিত। ছায়ের পক্ষপাতী হইতে দিয়া খোঁসামোদকে তিনি কখনও ভুলিতেন না, মিষ্ট কথায়ও বাধা হইতেন না—সেখানে তাঁহার চিত্ত ছিল বজ্র হইতেও কঠোর। কিন্তু অল্প সময় কাহার সাধ্য বোধে তিনি এত বড় একটা ভুলোড় পণ্ডিত। তখন তিনি রঙ্গ-রসিক, একজন পুরাণপুস্তক সেকলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। সতল সময় আবার চালচলনেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বেশভূষায়ও তাই। এদিকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও বাঙ্গলাভাষার প্রতি তাঁহার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতত্বমূলক উপেক্ষা ছিল না। যৎ-যৎ-কিছো বিচারজন করিয়া অজিত বিজারও যেমন সম্মানবাহর তিনি করিয়াছেন, অজিত বিজারও সেগুলি অবলম্বন করিয়া রাশি রাশি এত লেখা যাইতে পারে।

বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার মৌলিক প্রতিভার অবদান অতুল্য ও অমূল্য। তাঁহার ধর্মপূজার ইতিহাস, বিবরণ ও ব্যাখ্যা তাঁহার নিজস্ব, তাঁহার আত্মজীবনী। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী, তাঁহার ভাষাও ছিল খাঁটি বাঙ্গালী। ভাষার দ্বারা তাঁহার হাতে কোথাও বিগড়ানো বস্তু নাই। তাঁহার বঙ্গভাষার পদ্ধতি এমন সরল, স্বন্দর—তাঁহার ভাষা এমন স্বচ্ছ ও তরল যে, ছোট ছোটের পর্য্যন্ত বুঝিয়া আশান। ধরিত



পারে। তার উপর তাঁহার মত সলপ কাণ্ডজ্ঞানী পুৰুষ বেলা তার।

তাঁহার প্রকৃষ্টত্বের গবেষণা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইবে না। জগতের যেখানে প্রাচীনত্বের আদর সেইখানেই শাস্ত্রী-মহাশয়ের আদর ইয়াছে।

এইবার তাঁহার জীবন সম্বন্ধে ছই চারি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

রাজেন্দ্র বিজ্ঞানভার্য বংশোদ্ভূত নলডাঙার রাজেন্দ্রের সভাপতিত্ব ছিলেন। রাজেন্দ্রের বংশ গড়িতের বংশ বলিয়াই বিখ্যাত ছিল। মাহিকচন্দ্র তর্কভূষণ রাজেন্দ্রের প্রপৌত্র ছিলেন। ইনি খুশনা জেলা, দৌতা পরগণা, সুমুড়িয়া গ্রাম হইতে গঙ্গানাম করিতে আসিয়া নৈহাটীতে বাসস্থান স্থাপন করেন; ইনি জগন্নাথ তর্কভূষণের সমসাময়িক ছিলেন। সে প্রায় ১৭০০ সালের কথা। ইহার কিছু পূর্বে আমাদের বংশ নৈহাটীতে গিয়া বাস করে। ৯০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া মাহিকচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার ছই ভ্রাতৃ ছিলেন। প্রথমার গর্ভে সাদাশিব তর্কভূষণ—ইনি ত্রীময়পুরের গোবামীসের সভাপতিত্ব ছিলেন। দ্বিতীয়ার গর্ভে ত্রীনাথ তর্কপঞ্চানন—ইহার পুত্র রামকমল ভায়রুপ্ত পরে ‘ভায়রত্ন’ উপাধি পান। ইনি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন বড় নৈয়ায়িক ছিলেন। রামকমলের দুই পুত্র—নন্দকুমার ভায়রুপ্ত, রত্ননাথ ভট্টাচার্য্য, বদ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শরৎনাথ ভট্টাচার্য্য ও বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য। নন্দকুমার ‘শমসুদর্শ’ অভিধান প্রণেতা। ইনি ভায়রত্নের মৃত পণ্ডিত ছিলেন। শরৎনাথ ও বৈদ্যনাথ যখন শিশু তখন রামকমলের মৃত্যু হয়। শরৎনাথের জন্ম ১৮১৩ সালের নভেম্বর মাসে। বাল্যকালে গ্রামে কিছুদিন অধ্যয়নের পর চোত্ৰ ভাতা-নন্দকুমারের সহিত শিদিদাবাদ জেলার কান্দীতে গমন করিয়া বদ্রনাথ, হেমনাথ, শরৎনাথ ও বৈদ্যনাথ কান্দী (রাঙ্গ) স্থলে ভর্তি হন। ১৮৩১ সালের ১লা নভেম্বর ৭ বৎসর বয়সের সময় তিনি ঐ স্থলে-বর্ষ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তারপর ১৮৩৩ সালে শরৎনাথ কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলিজিয়েটে স্থলে ভর্তি হন। তখন ‘শরৎনাথ’ নাম পরিমার্জিত হইয়া তাঁহার নাম ‘হরপ্রসাদ’ হইয়াছে। এরূপ নাম ইহার একটি

রহস্যও আছে। সংস্কৃত কলিজিয়েটে স্থলে ভর্তি হইবার পূর্বে তাঁহার কটিন পিড়া হয় এবং মহাভাসের অকুণ্ঠে ও প্রসাদে আশেপাশে ব্যস্ত করেন। এইজন্য বালক শরৎনাথের নাম হইল ‘হরপ্রসাদ’। হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আগমন করিলে বিজ্ঞানভার্য মহাশয় তাঁহাকে বাসস্থানাদি দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৮৩১ সালে প্রথম বিভাগে Entrance পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলেজে হইতে ১৮৩৩ সালে প্রথম বিভাগে হরপ্রসাদ P. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৩৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অষ্টম স্থান অধিকার করিয়া বি. এ. পাশ করেন। ঐ বৎসর বিশিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু হরপ্রসাদ সংস্কৃত প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে তিনি ‘ভারত-মহিলা’ নামক গ্রন্থ লিখিয়া মহারাজ হোলকার-প্রদত্ত বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮৩৭ সালে সংস্কৃত কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে বৎসর সংস্কৃত আর কেহ পরীক্ষা দেন নাই। বরাবর সংস্কৃত-কলেজের ছাত্ররূপে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ‘শাস্ত্রী’ উপাধি লাভ করেন; সংস্কৃত কলেজে তাঁহার অধ্যয়ন-কালে মনীষী প্রসন্নকুমার সর্মাধিকারী বংশীয় সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শাস্ত্রী মহাশয় সরকারী অধ্বাবাক ও হোয়ার স্থলের হেডপণ্ডিত নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডো ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৮৩৮ সালে নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নিযুক্ত হন।

১৮৪০ সালের জাহ্নবীর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গল লাইব্রেরী সহকারী গ্রন্থাগার (Asst. Librarian) নিযুক্ত হন।

১৮৪১ সালে নৈহাটী বেঙ্গের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। পরে বরার ইহার সভাপতি থাকেন।

\* প্রায় ছই বর্ষদশন বার্ষিক হয়।

১৮৪২ সালে তিনি এমিরাটিক সোসাইটির সভ্য হন। ১৮৪৮ সালে বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হইয়া আট বৎসর প্রাণস্বারা সহিত কাজ করেন।

১৮৪৮ সালে Central Text Book Committeeর সভ্য হন। ১২ বৎসর আগে ঐ বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফেলো নির্বাচিত হন।

১৮৪৯ সালের জুলাই মাসে রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের মৃত্যু হইলে তিনি এমিরাটিক সোসাইটী হইতে পুথি-সংগ্রহ-ব্যাপারে ডিরেক্টর হন।

১৮৪৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৮৪৯ সালে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে প্রেসিডেন্সী কলেজে এম. এ. ক্লাস খোলা হয়।

১৮৪৮ সালে গভর্নমেন্ট তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জ্ঞাত হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে মহামহোপাধ্যায় নীলমনি ভট্টাচার্য্যের সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষতার সহিত অধ্যাপকতা করেন।

১৯০৪ সালে তিনি এমিরাটিক সোসাইটীর পক্ষ হইতে প্রতিনিধি রূপে Royal Asiatic Societyর Bombay শাখার শতবার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন।

১৯০৮ সালে তিনি সংস্কৃত-কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শাস্ত্রী মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক ছিলেন তখন স্থলবিভাগে তিন জন অন্তরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হয়। সংস্কৃত কলেজে পূর্বে এম. এ. পরীক্ষার মাত্র ‘A’ Group পড়ান হইত। শাস্ত্রীমহাশয়ের উজ্জাগে ‘B’ ও ‘D’ Group খোলা হয়। সংস্কৃত কলেজের চতুর্থাঙ্গী-বিভাগে তিনি একজন ভ্রাতের অধ্যাপক, একজন স্বস্তির অধ্যাপক এবং একজন বৈদ্যের অধ্যাপকের পর প্রবর্তি করেন। ইহারই ফলে সংস্কৃত কলেজে Associationের সৃষ্টি হয়।

১৯০৮ সালে অধ্যক্ষের অধ্যাপক ম্যাকডোনাল উত্তর-ভারত ভ্রমণ করিবার জন্ত ভারতে আগমন করেন। শাস্ত্রী

মহাশয় সরকার হইতে অল্পকাল হইয়াই অধ্যাপকদের সহিত পুরী, বাকীপুর, নান্দাদা, বাদগুহ, মুন্সফরপুর, কান্দী, লন্ডো, বদরনাথপুর, সাহেব-মাঠে, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, শেখোওয়ার, বঁসী, খাজুরাহো ও মোরাই গুরিয়া আসেন। এই সময় অরুণোত্তর ম্যাক্স-মুল্লেরের ভিত্তিকর্তৃক যে সভা হয়, তাহার জন্ত তিনি কয়েকখানি গ্রন্থাদি বৈদিক পুথি সংগ্রহ করেন। নেপাল-মহাশয় জ্বর চরমসময়ের জন্ম বাহারর বোডলিয়ান লাইব্রেরীতে প্রায় ৭০০০ পুথি দান করেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের উজ্জাগেই এই পুথিগুলি কেনা হয়, তিনিই এইগুলি গুহাইয়া তালিকা করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

১৯০০ সালের দ্বি-জাহ্নবীর একখানি পত্র লেখ কর্তন শাস্ত্রীমহাশয়কে একজন বিশেষ গ্রন্থাবলী জ্ঞান দেন।

১৯১১ সালে তিনি সিমলায় “Conference of Orientalists”এর সভ্য মনোনীত হন।

এই বৎসর দিল্লী-কনফারেন্স-দরবার উপলক্ষ্যে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে সি. আই. ই. উপধি প্রদান করেন।

১৯১২ সালে জর জন মার্শালের অধ্বারো তিনি তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া ১২০০০ পুথি প্রকৃত-বিভাগের জন্ত জর করিয়া দেন।

শাস্ত্রীমহাশয় সাহিত্যচর্চা, ঐতিহাসিক গবেষণা প্রভৃতি কার্যে নিজেকে লিপ্ত রাখিয়াও এক সময় জর আন্তর্জাতিক মুখ্যপাধ্যায়ের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন-কার্যে লাগিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের বিজ্ঞান-কলেজ সর্গশ্রেষ্ঠ করিয়া তোলা তাঁহাদের উদ্দেশ ছিল। জর আন্তর্জাতিক বৈদিক বহুকালা হইতেই তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধু ছিল। সাধারণের ধারণা জর আন্তর্জাতিকের সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের যমের মিল ছিল না। শেষ জীবনে অবশ্য মত-বিরোধ হইয়াছিল। কিন্তু পূর্বে তাঁহাদের মত-বিরোধের বহু প্রকৃতি গাঢ় ছিল যে, জাহ্নবী স্মৃতি করিবার জন্ত শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার-পুস্তকের নামের সঙ্গে আন্তর্জাতিকের ‘তোষ’ শব্দটি জুড়িয়া দেন। এদিকে আন্তর্জাতিক তাঁহার পুণ্যপণের নামের সঙ্গে ‘হরপ্রসাদের’ প্রসাদ’ শব্দ যোগ করিয়া দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যবিধি-কল ‘চোরা’ লগ্না যখন পোষণের আরম্ভ হয় তখন তিনি কলিকাতা হইতে পাটনা বিশ্ব-



বিভাগে চলিয়া যান। সেখানে ‘মগধ’ সম্বন্ধে বহু গবেষণায় পরিচয় দিয়া বক্তৃতা করেন। যাত্রাসংক্রান্ত গ্রন্থ তাঁহার মনীষার একটি বিশিষ্ট পরিচয়। পাটনা হইতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘রিজার’ নিযুক্ত হ’ন। ঢাকা তাঁহাকে Doctor of Literature উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। পরে ঢাকার কাজ ছাড়িয়া তিনি কলিকাতায় বসিয়া গবেষণা করিতে থাকেন। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় বঙ্গী-সাহিত্য পরিষদের অঙ্গতম স্তম্ভ ছিলেন। তিনি আকাতরে পরিষদের সেবা করিয়াছেন। পরিষদের বর্তমান প্রতিষ্ঠার মূলে শাস্ত্রীমহাশয়ের কৃত্ত্ব অনেকখানি; তিনি ১৪ বৎসর (১৯০৪, ১৯০৯, ১৯১৮, ১৯১৯, ১৯২০, ১৯২১, ১৯২২, ১৯২৩, ১৯২৪, ১৯২৫, ১৯২৬, ১৯২৭, ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩০) ভারতের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয়সাহিত্য-

পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৯২৯সংসর আঁটার (১৯২০, ১৯২১, ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩২, ১৯৩৬) ঐ সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রত্নতত্ত্ব-প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর দুইবৎসর (১৯২০-১৯২১) সভাপতির পদ গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। পূর্বে ঐই সোসাইটীর তিনি Philological Secretary ও সহকারী সভাপতি ছিলেন। পরেও তিনি Philological Secretary ও সহকারী সভাপতির পদে বৃত্ত ছিলেন। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য তালিকার অস্থায়ী করিয়া দ্বয় হইয়াছে।\*

\* চব্বদম্বর নৃগোপাল দাশেরী বক্তৃতা অগ্রহস্ত শোক-সভার সভাপতি অভ্যর্থন।

## পরলোকে হরপ্রসাদ \*

ত্রিসতীশচন্দ্র বস্থ

সভাপতি ও ভদ্রমহোদয়গণ,

শাস্ত্রী মহাশয়ের কর্মজীবনের বৃত্তান্ত হয় কলিকাতায়। কলিকাতা হইতেই তাঁহার যশোরব সমগ্র ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া যুরোপ ইউরোপ ও আমেরিকা যাত্রা প্রসারিত হইয়াছিল। কি সংস্কৃত সাহিত্য, কি প্রত্নতত্ত্ব-বিজ্ঞান, কি প্রাচীন বাঙলা ও বেঙ্গলভাষার আলোচনা, কি ইতিহাস-সমীক্ষা, সকল বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসামান্য এবং সেই কারণে তাঁহাকে সাহিত্য-মণ্ডলী মধ্যে একশ্রেণীর মহাপুরুষ বলিলে অত্যাধিক হয় না। একদিকে যে পাণ্ডিত্য লাভ করা জগতে অশেষ বিরল, অল্পজন তিনি, জীবদ্দশায় সমগ্র বিবেকসম্মানে ও রাজসম্মানে এমন কি বহু গবর্নর কর্তৃক বহবার অসামান্য রাজ-সম্মানে বিভূষিত হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার দেশের লোক ও আত্মীয়—তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়াই জানিতাম কিন্তু তিনি যে কত বড় পণ্ডিত ছিলেন

তাঁহার দাঁ পা করা আমাদের জ্ঞানাতীত। তিনি ১৯০৮ সালে রাজকর্মাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে—কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর দিন ১৭ই নবেম্বর পর্যন্ত এক মূহুর্তের ওজ বিচারজ্ঞ হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কলিকাতায় নানাক্রম কার্য-কলাপের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও তিনি দেশের অনেক কার্য করিয়াছিলেন। প্রথম বয়সে মিউনিমিপালিটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ ভাইস-ম্যেয়র ও চেয়ারম্যান হইয়া দেশের অনেক হিতকার্য করেন। পরে যখন দেবিদেন উদ্বোধন দলটির পাকন ছাড়া আর কিছুই কার্য হয় না, তখন উহা ছাড়িয়া

\* শাস্ত্রী মহাশয়ের বাসগৃহ বৈকুণ্ঠে মহাসম্মানোপাধায় পণ্ডিত পদস্বরূপ তর্কহর মণ্ডলের সভাপতিত্বে ২৪শ নবেম্বর তারিখে বৈকুণ্ঠ মিউনিমিপালিটির অধিবেশনে শোকসভায় পণ্ডিত।

দিয়ে। এ ছাড়া তাহার দেশের প্রধান কার্য ছিল তার মাসের ‘মহেন্দ্র-স্মরণ’—

১৮৩০ খৃঃ অব্দে আমার পিতা স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বস্থর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার স্থগিত এই মূল্যী ঋণীমহাশয়ের হাতে আসে। সে সময়ে তাহার আর সামান্য ছিল ও অবসর তত ছিল না; কিন্তু যতটা পারিয়াছেন অকাতরে তিনি পর্যাখর ও অর্থ-সংগ্রহ করিয়া মূল্যীকে নানা বিয়-বিপণির হাত হইতে উদ্ধার করিয়া আজ উহাকে যে অবস্থায় দাঁড় করাইয়াছেন সেজন্য করা যে সে লোকের কণ্য নয়। মূল্যী আজ একটি প্রথম শ্রেণীর উচ্চ ইংরেজী বিভাগেই পরিণত হইয়াছে। নিজের আর্থিক উন্নতি ও পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মূল্যের সর্বস্বাধীন উন্নতি-সাধন করিয়া তিনি তাঁহার দেশ-হিতৈষণা ও মহাভবতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁর দেশের কর্মজীবনের কথা বলিতে গেলে তাঁর মাসের বৈকুণ্ঠের মহেন্দ্র-স্মরণের কথা বলিতে হয় এবং সেই সঙ্গে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সহিত তাঁর কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল সে বিষয়ে একটু না বলিলে তাঁহার জীবন-চরিত্রের এক অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে যখন তিনি প্রথম ঢাকুরী হোয়ার মূল্যে ছেড় পণ্ডিত করিলেন সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে ক্যানিং কলেজে সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদ ছয় মাসের জজ অধ্যায়ীভাবে খালি হয়। স্বর্গীয় বিভাগ্যসার মহাশয়ের চেষ্টায় তিনি সেই ঢাকুরীটা বঁধা লক্ষ্যে যান। আমিও তখন তাঁহার সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলাম। আমার তখন বয়স ১০ বৎসর মাত্র। প্রথম অল্পবয়সে পিতামাতার কোল ছাড়িয়া তাহার সহিত যেমন বিদেশে গিয়াছিলাম তিনটি ওজ্ঞপ আমাকে গ্রহণোপেক্ষা অবিক রেহ করিতেন। এমন কি রাতে একখানি দড়ির বাটিয়া ছদ্মন শয়ন করিতাম। আমার পিতা আমাদের গল্পের গোলে জুলিয়া দিবার সময় বস্তুতে পারেন নাই যে, আমি বাস্তবিক তাঁহার সঙ্গেই যাই। কিন্তু অন্তরিক্ত সেই এমন জিনিষ যে, আমি পিতামাতাকে ছাড়িয়া দশ বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত যুরোপ লক্ষ্যে যাত্রা করিলাম। যাত্রার সময়ে আমার পিতা তাঁহাকে বসিয়া ছিলেন যে, প্রথমে কাশ্মীরে গেলেন নানিয়া বিভাগ্যসার মহাশয়কে প্রথম করিয়া বাইত। সেজন্য আমার স্যার

প্রথম কাশ্মীরে নানিয়ায়। বিভাগ্যসার মহাশয়কে প্রথম করিবার সময় তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ হেলেনী কে?” তিনি বলিলেন, “এটি আমার ভাইপো।” তাঁর ‘ভাইপো’ বলিয়াই বিভাগ্যসার মহাশয়ের নিকট তখন পরিচিত হইলাম। তারপর যখন রাতে আমাদের সময় হইল, আমার আসন একটু পৃথক করিয়া দিতে পাচককে ইঙ্গিত করায় বিভাগ্যসার মহাশয় একটু আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “হা হে হরপ্রসাদ, তুমি না বললে এ হেলেনী তোমার ‘ভাইপো’? তাহা হইলে তোমার আসন একপা পৃথক করহ কেন?” তাহাতে তিনি যে উত্তর দিলেন তাহা আজও আমার অন্তরের মর্মহবে চরদিনের মত জ্বলন্ত অক্ষরে রাখা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন “ওরা কাহন্য, কিন্তু আমার না সর্বদা বলেন যে, তোমরা ছদ্ম সন্যাসের বটে, কিন্তু তোমার মহেন্দ্রলালও আমার আর একটি সন্তান জাতি।” মাতৃবাক্য তিনি ও তাঁর সন্যাসেরো কিরূপ প্রতিপালন করে এসেছেন তাঁর আর একটু আভাস এইখানে দিই। যেদিন আমার পিতা ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে বিদ্বতিকা-রাসে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেদিন শাস্ত্রী-মহাশয় কলিকাতায়। তাঁর কনিষ্ঠ মেঘনাদবাবু বাবার নিকটে ছিলেন, মৃত্যু অবধার আমার বাবা তাঁকে বলিয়া যান, হরপ্রসাদকে বলিও আমার মূল আর হেলেরা রহিল।”

যাত্রার মৃত্যুর পর আমাদের সাময়িক অবস্থার ভীষণ পরিবর্তন ঘটে, এমন কি অতি কষ্টে ভরণ-পোষণ হইত। কিন্তু আমার পণ্ডিতনার ব্যবস্থা শাস্ত্রীমহাশয় করিয়া দেন। তিনি আমার মাসিক ৫ টাকা ভেতন দিয়া গল্প গল্পে ভক্তি করিয়া দেন ও সর্বদা লেখাপড়া ওত্বেষণ করেন। বলিতে গেলে তিনি আমার একজন প্রতিপালক হইলেন। তাঁর কণ্ঠে মেঘনাদবাবুও এ বিষয়ে পরামুখ হই নাই। ইহাতে স্পষ্ট প্রজ্ঞমান হয় যে, শাস্ত্রী মহাশয় ও তাঁর ছাত্রেরা তাঁদের সেই মাতৃবাক্য কিরূপভাবে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ণবয়সের পেনসন ভোগ করিয়া পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু কর্মজীবনের অবসর লইবার সময় পান নাই। এশিয়াটিক



সোশাইটি, সাহিত্য-পরিষদ, ইউনিভারসিটি অর তাঁর দেশের স্থলগুলির কাণ্ড করিতে করিতে দেহপাত করিয়াছেন, এমন কি মরণের শেষদিন পর্যন্তও স্থলের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে গিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহার মৃত্যুর অন্তিমপুর্বেই স্থলের সেক্রেটারী নরেন রায়ের মৃত্যু ঘটয়াছিল। কাহার উপর সেই ভার দিলেন সেই ভাবনাই তাঁর প্রধান ভাবনা হইয়াছিল। কলিকাতার কার্যগুলিতে যথেষ্ট কর্মী আছেন, কিন্তু দেশের স্থলে তিনি একমাত্র কর্তব্যর ছিলেন বলিয়া এই ভাবনা তাঁর শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত ছিল।

ট্রাফালগার যুদ্ধে আহত হইয়া বীরবর হোরেলিও নেলসন যেরূপ মৃত্যুশয্যা শাসিত হইয়া তাঁহার নিকটই সহকর্মী এডমিরাল হার্ডিকে ডাকিয়া মৃত্যুমুখা ভোগ করিতে করিতে যুদ্ধের শেষ কল জাণিবার পূর্বে যুদ্ধেশবাসীদিগকে 'কর্তব্য-কর্ম' হইতে বিচলিত হইও না' বলিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয়ও তজ্জন শেষ মূহুর্তে তাঁর কাজের অসম্পূর্ণতার ভাবনা ভাবিয়া তাঁর নিকটে থাকা ছিলেন তাঁদের বলেন "কিরে বাঁচতে পারলিনে—বাঃ ভাবের খেলা সাধ হ'ল"

এই শেষ বাক্য বলিয়া তার প্রাণব্যয় বহির্গত হয়, আর সেই সঙ্গে বঙ্গের সাহিত্যকালের প্রাণী রশ্মি চিরদিনের মত অস্তিত্ব হইয়া গেল। নবর বেহ কলিকাতা হইতে আনিয়া নৈহাট্টির গঙ্গাভীরে ভরীকৃত হইল—সব ঘুরাইয়া গেল।

আজ আমরা সেই মহাপুরুষের মহাপ্রস্থানের শোক-প্রকাশে সম্মত হইয়াছি। কি করিয়া তার দ্বিতরঙ্গা করিতে পারি তার উপায় উদ্ভাবনা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আপনারা তাঁর মঙ্গল দেশবাসী—আপনাদের নিকট আমার সন্নিবন্ধ অছুরোণ, যাতে তাঁর দেশের অসম্পূর্ণ কার্য সাধের 'মহেন্দ্রভূটানী' বজায় থাকে, তাহা করুন। তাহা হইলেই তাঁর পরিকল্পিত পুষ্কিত হইবে। যুদ্ধের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যেমন তিনি শান্ত্রি-ময়ের কোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, পরলোকও সেইরূপ চিরশান্তি ভোগ করিবেন। আশ্রন আমরা শাসনমণ্ডলে সেই মহাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া তাহারই পথ অমর্যপন করিয়া তাহার কৃত কার্যটিকে বাহাতে অধিকতর সাফল্য-যুক্ত করিতে পারি তাহাকে সচেষ্ট হই।

## শান্ত্রি-চরণপ্রাপ্তে

শ্রীমুখীন্দ্র নাথ বিন্দ্যোপাধ্যায়

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আর থাই, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ঐযুক্ত ইহাতে আমাদের অভিযোগ-করিবার বিষয় কিছুই নাই; জীবনকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া পরিত্যগ বয়সেই প্রস্থান করিয়াছেন; কিন্তু তবুও কেবল মনে হয় তিনি আরও কিছুদিন থাকিলে আমরা আরও কত নতুন জিনিস পাইতে পারিতাম।

আজ তাঁহার শ্রাদ্ধদিনে অনেক উপযুক্ত ভক্তই তাঁরাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছেন, আবার কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয়ের জ্ঞানের আশীর্বাদ ধারণ করিবার সামর্থ্য একেবারেই নাই, আজীবন কাল ধরিয়া যে সব অল্পা বস্তু তিনি স্বীকৃত সমাজকে দান করিয়াছেন, তাহাতে বাঁহাদের অধিকাংশ আছে তাহার সে বিষয় আলোচনা করুন,—আমি শুধু যে কয় কটা তাঁহার নিকট অভিহিত করার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম সেই

মহাত্মাই নবর করিতে পারি। আমার মত নগণ্য এবং অসামর্থ্য অপরিত্রিতক তিনি যেরূপ বেহ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনোবল গুণেই করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে "রামচরিত" অথবা দ করিবার অদেশ পাইয়া আমি একদিন অপরাজে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট গমন করি। ইতিপূর্বে আমি তাঁরাকে চান্দ্র কথায় দেখি নাই। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার নিকট বাইবার সময় বেশ একটু nervous হইয়াছিলাম কিন্তু তিনি প্রথমেই আমার সহিত এমন পরিচয়ের ছায় কথা করিলেন যে, আমি আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম।

তেতলার ঘরে তাঁহার লাইব্রেরী ও শোবার ঘর। ঘরের সমুখে থাকিতা খোলা ছায়া। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই দেখি খোলা দরজার সামনে ইঞ্জিরোরে বসিয়া কি এক-খানা তাম্রলিপি লইয়া magnifying glass-এর সাহায্যে পড়িতেছেন। আমি নিকটে বাইয়া পড়িতেই আমার দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন "কে?" আমি পরিবরের পরিচয় দিয়া রামচরিত-অধ্যায়ের জন্ম প্রেরিত হইয়াছি বলিলাম। যেহেতুকাঃ বসাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সংস্কৃত আমি কিরূপ জানি, এবং বুঝাইয়া দিলেন যে "রামচরিত" বইখানি নৈহাৎ সহজ নয়, গুঃ ১২শ শতকের রচনা,—প্রত্যেক লোকের দুইটা করিয়া অর্থ, চার সর্গের পুস্তক, কিন্তু দেড় সর্গের অধিক টীকা নাই, অথবা দ করিবার চেষ্টা অনেক অনেকবার করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি বলিলাম "সংস্কৃত আমি একেবারেই জানি না এবং আমার সংস্কৃত জ্ঞান না-জানার কিছু আসে যায় না, কারণ আমি মাত্র লেখকের কাজ করিব; আশ্রনর স্ববিধাযত সময়ে আমিও আপন বাহা বলিলেন লিখিয়া লইব মজা। তিনি হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত জান না কি রকম, ছেলে-বেলা থেকে সংস্কৃত পড়া হয় নি, তাই বল, তা নইলে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম যাঁদের তাঁদের আবার স্কট করে সংস্কৃত শিখতে হয় না কি।" তারপর "রামচরিত" পুস্তক আনিবার জন্ম Asiatic society's Secretary's নিকট চিঠি দিয়া, কখন তাহার নিকট বাইলে স্থবিধা হইবে ইত্যাদি উপদেশ দিয়া গেলে বলিলেন "কলেজের ছাত্রের পর

আমিছো, এখনও বাড়া ফেরনি, একটু জল খেয়ে বাও" এবং তারপর নৈহাট্ট হইতে আনিত বইয়ের মোটা খাণ্ডাইয়া দিয়াই দিলেন।

তারপর তাঁহার নিকট অনেকবার বাইতে হইয়াছিল। যদিও রামচরিতের অধ্যায়-কাণ্ড বিশেষ কিছুই অগ্রসর হয় নাই বা সবদিন তিনি রামচরিত লইয়া বসিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার নিকট চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও একটা পত্রীকার পড়া করিত পড়া শোনা করিতেছি ইত্যাদি তিনি পত্রীকার জন্ম কিরূপ পড়া শোনা করিতেছি ইত্যাদি তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া পত্রীকার পূর্বে আর তাঁহার নিকট বাইতে হইবে না বিনীচ চার মাসের ছুটি দিলেন। দিনের বেশা জন্ম লোক সমাগমের জন্ম এক একদিন দুপুরে তিন চার ঘণ্টা বসিয়া থাকিতা চন্দ্রাঙ্গিত হইত বসিয়া তিনি নিজে এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন যে তাহাতে আমার লজ্জা বোধ হইত। "কয়েকদিন এইরূপ হইলেও তিনি আমাকে সন্ধ্যার পর আসিতে বলিলেন। আমি সন্ধ্যার পরও কয়েকদিন গিয়াছিলাম, কিন্তু শাণ্ডাযজ্ঞ হইতে এই কাজের জন্মই বাইতে হয় শুনিয়া তিনি আমার বিকালে আমার কলেজের ছাত্রের পরই সময় ঠিক করিলেন।

এম এ পত্রীকার পর আবার তাঁহার নিকট হাবির হইলাম, কিন্তু তখনও বিষয় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের বই-খানি ও আমার হস্তলিখিত অধ্যয়নগুলি আর বুজিয়া একসাথে ছিল, কিন্তু কোথায় যে হারাইয়া গেল তাহার পাত্তা গেল না। এইরূপে তাঁহার Memoir এর volume একরূপ ভ্রাম্যরই জন্ম খোঁজা হইয়া গেল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে Society's বইখানি পূর্বেই ফেরৎ দেওয়া হইয়াছিল।

পূর্বস্মরণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, পুস্তকালয় হইতে রামচরিত লইয়া প্রথম হইতে আশ্রয় করা গেল, কিন্তু উপযুক্ত কয়েকবার তাঁহার নৈহাট্ট যুগোপায় ভক্ত সোনার অম্বুধা একটুও অগ্রসর হয় নাই। একদিন তিনি হাসিয়া আমাকে বলিলেন "দেখ তোমার চেয়ে অনেক কম উৎসাহ







রাজার 'মকী' বিতে হইবে, শূন্যরাজ বা 'মাক্কাজকে বহু' শাসী বিতে হইবে, মীলঙ্গ সন্নিকটস্থ জিনি বিতে হইবে, অথবাের রাজা সোমেন্দ্র কুল বিতে হইবে, সিদ্ধার্থক পনিবায় বিতে হইবে, আর কিংবদন্তি হস্তি বিতে হইবে।

অথবাে হিমাল্য বসিমা দেবতার কথা নাই। দশম মণ্ডলে একবার হিমবন্ত শব্দ আছে, তাহার অর্থ যতদূর গাধা—ই গাধার উপরে বসিমা দেওয়া কথিত হইবে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান সন্নিহিত হিমালয় লেখকা হইলেমনে কবিতা হইবে, এখানে গাধায়া যথা ভাল করিয়া চিত্রিত হইবে, তাহাই তাহার বলি হইয়াছে। হিমবানের দেবতা হওয়াও বস্ত হস্তীর উত্থার বলি হওয়া, এই দুই ঘটনার 'শব্দ' বোধ হইতেছে যে, আধিপ্য এমন ভারতবর্ষে মধ্যে অনেক সুখ আনিয়া গড়ির যেন।

হিমালয় এক কালে বেতী হইলে না, পরে দেবতা হইয়াছেন। ইহার একটা কাহিনী কিছুস্থানে দেওয়া আছে। সে পুরাণে প্রসঙ্গটি বর্ণিত্যেছেন, "আদি যেরে উপকল্প সোমবংশীর উপজতির জন্ত হিমাগিরের স্তুতি করিয়াছি।" তাই ইহাওই কাহিনী হইয়াছে, "সোমবংশিনিবাসিনঃ স্তুতিং কৃত্বাঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ হিমাগিরের দেব পরে প্রসঙ্গটি করিয়াছেন এবং যজ্ঞে তাহার ভাগও একটু পদে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

পুঃ পূর্ণ বস্তুসংস্কৃত হাতী গোমা পুঃ চলিত হইয়াছিল। হুতদানের এক হাতী ছিল। তাহার ভাই বৈরভক্তও হাতী ছিল। হুতদানের স্ত্রী করুণিত করিতে একটা হাতী ভক্ত বসিয়া ছুটিয়া বেগিলা যেন তাহাকে হাতী বেগানে শড়িয়াছিল সেখানে একটি খোয়ার হাতী হইয়াছিল। উক্তর রাত্রে "আদিগি" নামে একটি একাও হাতী ছিল। তাহার নিদ্রের ও চতুঃক্ষেত্রের জড় বড় হাতী-শালা ছিল, হাতী বারাহ পুঃ বসিয়া ছিল।

এই যে হাতী ধাতু ও গোময়মান, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা, হুতদার জন্ত তাহারে তৈয়ার করা—এ সব গোময় হইয়াছিল? এই প্রশ্নের এক উত্তর আছে। কাহাি এখন যে দেশে বস কতি, তাহা আমাদেব মাতৃভূমি, সেই বসদেশই এই একাও জন্তক বশ করিতে এখন নিস্কৃত্যে, সে দেশে এক দিকে হিমাগির, এক দিকে লৌহিত্য ও এক দিকে সাগর—সেই দেশেই হস্তিবিজ্ঞার প্রথম 'মুদ্রিগার'। সেই দেশেই এমন এক মৃদুপুত্তরে আভির্ভাব হয়, যিনি বালীকাল হইতেই হাতীর সঙ্গে বন্ধাভিভেদ, হাতীর সঙ্গে বাহিত্রু, হাতীর সঙ্গে বালিকেন, হাতীর সঙ্গে কবিতেন, হাতীর গাউ হইলে চিকিৎসা করিতেন, এমন কি এক রকম হাতীই হইয়া নিয়াছিলেন। হাতীরা যেন যে মাইত, তিহিৎ সেই চাচাই বাহিতেন। কোন দিন শাহাভের চুচাং, কোন দিন নদী ভাঙে, কোন দিন নির্বিজ্ঞ বস্ত্রের স্বে, হাতীর সঙ্গেই তাহার মন ছিল। হাতীরাও তাহারে যথেষ্ট ভাল লাগিত, তাহার সেবা করিত, তাহাি অনেক মত বাবার গোমাইয়া বিত, ব্যাধার হইলে তাহার স্তম্ভগ করিত।

অন্যদেশের রাজা গোমায়ার বস্মাণীর স্থাপতি। তিনি রাজা বস্মায়েব আদাই ছিলেন। তাহার একবার সপ্ন হইল, হাতী আবার বাহন হইবে। ইঙ্গ যেখানে ঘেরা হাতী চড়িয়া বোয়ান, তাহাও অনেক হাতীর উপক্কে চড়িয়া বোয়াইবে।" কিন্তু হাতী কেনন করিয়া বশ করিতে হইবে, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সমস্ত কবিগের নিদ্রাশত করেন। কবিতা পদারস করিয়া কোথায় হাতীর বশ আছে, লোক কবির জগৎ অনেক লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা এক একা একা প্রভেদে উপকৃত হইল। যে আবার "লম্বারাজিক", "পুণ্ডা" এবং সেখানে "লৌহিত্য" নামেরাতিম্ব বসিয়া মাইতেছে।" সেখানে তাহারা অনেক হাতী দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সঙ্গে একজন মুনিকেরও দেখিতে পাইল, যেমিহাই তাহারা বুঝিল যে, এই মুনিই হাতীর বশ রক্ষা করেন। তাহারা কিতরা আনিয়া রাজা ও কবিরগণকে বস্ব বিব। রাজা সৌম্য সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কবি আদার না হইল; তিনি চড়িয়া সেবার জন্ত হুতের গমন করিয়াছেন। রাজা হাতীর বস্তুটি তাহারা লক্ষ্যে চোখায়ে উপস্থিত হইলেন ও তাহাদের পদারস মত হাতী-শালা তৈয়ার করিয়া সেখানে হাতীরে বসিয়া বসিয়া ও বাহর দিগা নবের প্রবেশ করিলেন। কবি আদিগা বোয়িলেন, হাতীরা হাতীগুলি নাই। তিনি চারিটিকে বুদ্ধিতে মাগিলেন ও কবিতা আদার হইল। অনেক দিন বুদ্ধিগা বুদ্ধিগা শেষে চম্পানগরে আদিগা; তিনি দেখিলেন যে, তাহার হাতীগুলি সব চম্পানগরে বাধা আছে, তাহারা রোগ্য হইয়া বিমোহে, তাহা-বর গায়ে বা হইয়াছে, মানা রূপে তাহাদের উপস্থিত হইয়াছে। তিনি জম্পানা, মতা, পাতা, শিকড়, মাকড়স তুলিয়া আনিয়া বাটার তাহাদের গায়ে জেলে দিতে মাগিলেন, হাতীরাও মানা রূপে তাহাদের কাটিতে লাগিল। অনেক অঙ্গের পর পরশশ মনিলেন, তাহার ও তাহার হাতের মত আনয়। রাজা শব্দ শুনিবলেন—তিনি কৈ, কি পুস্তকো আনিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন। মুনি কাহারও সহিত কথা করিলেন না। কবিতা আসিলেন, তাহাদের সহিতও কথা হইলেন না; রাজা নিজে আসিলেন, মুনি তাহার সহিতও কথা করিলেন না। শেষে অনেক গায়া-সম্ভার পর মুনি আদার পড়িতে বসিল। তিনি বলিলেন, হিমাগিরের নিকটে যেখানে লৌহিত্য মন সাধারণভূমুপ মাইতেছে, সেখানে নামানয় নামে এক মুনি বসিলেন। তাহার উদ্দেশ ও এক করুণে পুস্তক আবার জন্ম। আমি হাতীরে স'হতই বোয়াই, তাহায়াই আমার আদ্যি, তাহায়াই আমার বসন। আমায় মন পালকপা। আম হাতীরে পালন করি, তাই আমার নাম পাল। আর কাণাপায়ে আমার লম্বা, সেই জন্ত আমার নাম কাণা। লোক আমার পালকপা হইল। আমি হস্তিকবিতায় বেশে নিদ্রু হইয়াছি।" তাহার পর রাজা তাহার হাতীরে বসিয়া নামা কথা গিজাসা করিতে মাগিলেন, তাহার উত্তরে তিনি হাতীর আদুর্লভশায় বাধ্য করিলেন। তাহার শায়ের নাম 'হস্তাভূষণ' বা "পালকপা"। উহা জাটিন পুস্তরে আবার লেখা। অনেক

জীবাণর জন্ত আক, অনেক তাহার গড়ও আছে। আদুর্লভ পুস্তক পুস্তক বিতস্তিত পদ, তাহাতে ক্রিয়াপাল নাই। জাটিন পুস্তকে যতই ক্রিয়াল আছে এং অসংখ্য অধ্যায়ের প্রথম "বাস্যাপ্রাসঃ" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা আছে। জাটিন পুস্তকের সহিত "পালকপাণে" আছে এই যে, অধ্যানে হাতা ও মুনির কাণাপকলম্বলনে যত লেখা হইয়াছে। ভক্ত-মোটা-পড়ি জন্ত অস্ত কোন জাটিন পুস্তকে একজন পালকপকলম্ব নাই। শেষে হয়, কোন এককামি জাটিন হস্তিপুস্তকে পরে পুরাণের আকারে লেখা হইয়াছে।

এমন কথা হইতেছে যে, কবি বলিলেন, "কাণাপাণেজ আদার বদ।" কিন্তু তেজস্বী বদ হি, অদি, ই. যে "শোভমানবিশিষ্টকলম্বনঃ" লেখা করিয়াছেন, তাহার শেষে হিমান অদি সাত্তে চারি হাজার যে রের নাম দিগিলেন, ইয়াতে কাণাপাণেজ নাই। অর্থাৎ যে সকল মোম-প্রসার প্রু এই দেশে চলিত-আছে, তাহার কাণাও কাণাপাণেজের মন নাই। তবে পালকপা কিল্পন কাণাপাণেজের লোক হইলেন, বিজ্ঞাই যে হাতীকে আদ্য বা ব্রাহ্মণ বলা মাইতে পারে? ইহার উত্তর বলা মাইতে পারেন, এই পুস্তকের প্রথমে মোমপাণ যে সকল মুনদের আদার করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কাণা বলিয়া একজন মুনি আসিলেন, আদ্যবাস্যোপাধিগার পুস্তকে তাহার নাম পাঠ্য নাম নাই। হুতরাজ অধুনান করিতে হইবে, তিনি আদ্যগের মাধ্য চলিত থাকের লোক মনেন, এ লোক যেন হয় বাগতা বেশেই চলিত ছিল। পালকপা বসনধেবে লোক ছিলেন। লৌহিত্য বা উদ্ভূতদের গায়ে, সূর্য ও হিন্দাঙ্গের মধ্যে তাহার জন্মভূমি ও শিববার স্থান। যদিও অন্তরাগে চম্পানগরে তাহার আদুর্লভ লেখা ও প্রচার হয়, তিনি আসিলে রাজা কহেই নোক। এই যে প্রকাও জন্ত হস্তী, ইহাকে বশ করিয়া তাহাদের মাধ্য কাণা, ইহার চিকিৎসার ব্যস্থা-কথা—এ সমস্তই বাগতায় হইয়াছিল। পালকপা পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে যেন যেন বদা। অস্ত কোন ভাষা হইতে স্পষ্টতঃ প্রকৃত্য করা হইয়াছে, অনেক সময় মনে হয় হাতী মাকড়স ব্যাকরণের মতে বলিতেছেন। এ প্রু যে জন্ত জাটিন তাহা হিঃ শব্দ কাণাপকলম্ব। কালিদাস ইহাকে অতি জাটিন শব্দ বলিয়া বিখ্যাতেন। হুতর মত মর্মে তাহার বস্মা অক্ষরাজ্যে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, বস্মাণ হইতে শুনা মাইতেছে যে, অথঃ হুতকাসেরা ইহার হাতীগুলিকে শিখা দিয়া যান, সেই জন্তই ইনি পুণ্ডিতগা থাকিয়াই ইঙ্গেরে প্রথম ভোগ করিতেছেন।

কৌল্যের অধ্যায়ে "হস্তপ্রদার" অধ্যায়ে হস্তি-চিকিৎসকের কথা আছে। পুণ্ডে হস্তি হাতীর কোন বহর হ, মল্লভূষণ হ, অক্ষরাজ্য হ, পুত্ত, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহার প্রতিবিদ্যা করিলেন, ইহার বাহা আছে। হুতরাজ কৌল্যরাজ পুণ্ডে যে হস্তি চিকিৎসার একটি পাঠ্য হিৎ, তাহা পুঃ মাইতেছে। যে আকারে পালকপাণের পুস্ত লেখা, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, উহা অতি আদ্য। হুতরাজ মামসুদার হাথেকে

"Sutra period" বলেন, সেই সময়েই পালকপা পুস্ত রচনা হইয়াছিল।" হিউয়ালা সাহেব বলেন, পালকপা ও বৌদানয় পুঃ পুণ্ড ও ষষ্ঠ শতকে পুঃ নির্দিষ্টাছিলেন এবং তাহাও আসে বলিত 'প' গোমায়ের পুস্ত লেখা হইবে।" পালকপাণে সেই সময়েই লেখা বলিয়া বোধ হয়।

ভারতের পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, হুত-রচনার কাগ আরও একটু আগে হইবে, কিন্তু সে কথা নইয়া বিদ্যার কবিরাজ কয়েজন নাই। পুঃ পুণ্ড পদক বা ষষ্ঠ শতকে যবি বাবলা দেশে হস্তি-চিকিৎসার এক টিগিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা স্বস্বভাবের কলম লেখের কথা নয়।

## আমাদেবর ইতিহাস হুতপ্রদান শাস্ত্রী

আমাদেবর দেশের ইতিহাস।" চাট্টিয়া সাজিতে হইবে। একজন আমদা যে ভাবে ইতিহাস গড়িয়া আদিত্যহিমান, সে ভাবে আমা চলিলে না। আমাদেবর ইতিহাস ছিল না, ইউরাগিগারনা নামাণিকের ইতিহাস নির্দিষ্টাছিলেন, সে কথা লম্বা। তাহা আমাদিগকে যে পণ্ডে রাজ্যচিকিৎসক, আমদা এখনও সেই পণ্ড চলিতেছি; কিন্তু তাহাদের কথা শুনিলে আর চলিলে না। তাহারা আমাদেবর দেশের বস্ব বারগেন না, সবাই পড়েন না, সকলের মতে মিশেন না; দুই বস্মাণিই বই গড়িলেন, তাহা হইতেই একটা ইতিহাস গড়া করিয়া যেন। আমাদেবর দেশের অনেকের সন্সকার যে, আমদা যে পুরাণ মাজি, এটা বলিতে তাহাদের সন্সকা হয়। প্রথম প্রথম তাহাি বলিয়াছেন, "মুনানামদেবর অণে ভাভতর্ঘের ইতিহাস ছিল না; রাজা-রাজাটা বালিকায় পড়ে, ছোট বড় রাজা থাকিতে পাত, কিন্তু সে বড় মিশর কোন কাহেরে না। তাহাদের কোন ঐতিহাসিক ইতিহাস নাই, তাহাদের কোন এককথাই আছে।"

"মুনানামদেবর অণে ভাভতর্ঘের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ নামা ছোট-ছোট রাজ্যে ভাগ-করা ছিল। সেখানেও লোক অস্তায় নিয়াযাণী ও হুতদানের ছিল; তাহাদের সভ্যতা ছিল না, দিয়া কথা তাহাদের সভ্যদের মধ্যে হইয়া নির্দিষ্টা ছিল।" এইভাবে কিছু দিন চাটার পর যখন অনেক সাক্ষত পড়িতে লাগিলেন, তখন বলিলেন,—না, এরাও যেন একটু ভাল লোক ছিল, একটু যেন জ্ঞানি শব্দ হইয়াছিল; কিন্তু ইতিহাস তাহাদের একেবারেই নাই।" হুতপ্রদানি কাহা আছে। ব্যাকরণ আছে, একটু আদ্য নির্দেশাশ্রয় আছে, আর বাকী সব ক্রোধ—ইতিহাস একেবারেই নাই।

এই ভাবে যিনি কতক লেখ, তাহাণে বৌদ্ধিগুটি আরম্ভ হইল। রাশি রাশি তামার পাত বাহিঃ হইতে গিলিল। সাহেবেরা একটু চমকিয়া পেলেন। অশোণ রাজার কতকগুলি জবকাণী (পাথরের লেখা) বাহির



হইল। আশাবর বেশের লোক দেওলি পড়িত 'মুদ্রিত না। সবে-  
বেগা পড়িলেন। শেষে হির হইল, দেওলি চক্করপের নাক্তি সময়ে।  
কিছু ভেজলি থেকে আরম্ভ করিয়া মুলশানবের সময় পর্যন্ত মাফানো  
'শান্তি বিরাগে' লেখা। 'বিহঙ্গম', 'পালিহাবন'-সাহেবেরা বিখ্যাত করিলেন  
না। হস্তরাঃ এয় যোগ শত বৎসর একটা ঠাঁক পড়িয়া রহিল।  
তাৎপা ক্রমে তাঁমার পাত আর পাখাবের লেখা পড়া একটা নিজার  
নামে হইয়া পড়াইল।

অনেকে মন করেন, সাহেবেরা এ বিজ্ঞা জানিতেন; আমর বেবেদের  
লোক একেবারেই জানিত না। কথাটা সত্য নয়। সাহেবেরা পড়িয়া  
লিখিত—বেদের পণ্ডিতদের বিদ্যা। কত সাক্ষ্য পণ্ডিতের মন্তিক চাননা  
করাইয়া যে তাঁহার 'জ্যোতি অর্কচন্দ্র' করিয়াছেন, তাহা যথা যার না।  
একটা কথা স্পষ্টত জানিয়াছি—জ্যোতি স্পষ্টত জানিয়াছি। উইলিয়ম  
সাহেব ও সিম্‌সন-সাহেবের শিলালেখখানি মেম্বাটায় তৎকালী  
মহাদেব পাঠ করিয়া লিখিতেন। ক্রমে এই সকল লেখা পাঠ্য ও লিখা  
করিয়া জানা গেলে যে, জ্যোতিষের অনেক রাজার রাজত্ব ছিল—যাবান  
রাজা নবো দিতেন। তাঁহারের মাজার 'লুপ' বিহার সময় তাঁহারের  
নাম উল্লেখ করিত। যাবান রাজাবের সকলেই শিখা উঠায় করিতেন  
এক শিখার তাঁহারের নাম থাকিত।

এইরূপে দেখা যেন, প্রায় হাজার দুই হাজার রাজা এই যোগ শত  
বৎসরের ভিতর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে তাঁহারের যোগশত  
পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁহার কখন সময়ে রাজা এবং কখন বেদের  
রাজা, সেটা পাওয়া গেল না। যেমন কলিকতার-রাজার মজা ভালে;  
তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতকগুলি রাজত্ব ভাসিত লাগিল;  
পরশুরের কি সপথ, বুঝা গেল না। হস্তরাঃ ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা  
হইল না।

ই চার বেদের দুই চারশানি ছোট বড় ইতিহাসের পাওয়া গেলে,  
তাছাড়া ইতিহাসের ধারাটা টিকি হইল না। এত বড় যে সঙ্কট  
সাহিত্যটা, সেটির বিকে ইতিহাসবিদগণা চোখও দিলেন না। হস্তরাঃ  
খবিত কতকটা ইতিহাস হইল, সেটা ভাষা ভাষা, বেশ ঠাঁক পড়িয়া  
হইল না।

সাহেবেরা কিন্তু বলিলেন যে, 'ভারতবর্ষের সভ্যতাটা এই গুণবের  
সময়েই হইয়াছিল—১৩১০ শত বৎসর আগের। তার আগে কাহা ছিল  
না, ধর্শন ছিল না, জলধারি ছিল না, বিদ্যেটার ছিল না, সভ্যতার ছিল  
বড় একটা ছিল না।' তবে আশাবের সময় ব্যাকরণ-সাহেবের একটা চর্চা  
করিয়াছি। কিন্তু চর্চা হইলো কি হয়। মোক্ষমুখার সাহেব বলিলেন  
যে, বুদ্ধদেব সেই গণিলেন, সঙ্কট অর্জন হইয়াছিল; কিন্তু সে যেন  
একবারেই ভাঙে না, শুভ রাজার কোন রকমে ভাঙাইলেন।  
বুদ্ধদেবের আগে ইহারের ইতিহাস উঠিহাস কিছু পাওয়া যায় না। সব  
লক্ষ্যকার।

আশাবের মত দেখ। সে বেবও অনেকটা বুদ্ধদেবের পরের লোক,  
কিন্তু আশাবের খবিত পারিতেনি না। হস্তরাঃ কাৎকেব বিপ্ত খুটী।  
১২১০ শত বৎসর পূর্বের লেখা, তার আগে কিছুতেই বাইতে পারে না।  
বুদ্ধদেব-কৃত যোগ হুয় হইয়াছিল, সেটা ১৩১২ শত বৎসর বিপ্ত পুটর  
আগে।

এই ভাবে আশাবের ইতিহাস ক্রমে 'নিহাঃ' গিয়া বিপ্ত-পুটর  
১২১০ শত বৎসর আগে পর্যন্ত পৌছিল। তার মধ্যে আশাবের জন্মের  
পর থেকে সেটির একটু খাট খাবিল। তার আগে সব কলকা।

এই ভাবে আশাবের ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে। সঙ্কট-সাহিত্যটা  
জান্য করিয়া সব বিবৃ থেকে আরম্ভ করিবার চেষ্টা কেহ করেন নাই,  
করিবার কলমও অতি অল্প লোকের ছিল। সেটা জানা করিয়া পড়িলে  
কিন্তু ইতিহাসের যে বর্ণনা। হইয়াছে, সেটা হইত না।

অনেক শাস্ত্র আছে, যে শাস্ত্রে প্রমাণ বিহিত হয়—প্রমাণ না দিলে  
শাস্ত্র কেহ বিশ্বাস করে না। ক্রমে দিতে গেলেই আগে যে শাস্ত্রে  
গোড়া বই নিখিলা গিয়াছেন, তাঁহারের নাম খোঁজিয়া হইয়া একটা ঠাঁক  
কথা তুলিতে হয়। এই রকম করিয়া কথা তুলিতে তুলিতে একটা  
পূর্ণপাণ্ডা ধারা গাঁটায়। স্মৃতিশাস্ত্র-এইজন্য প্রামাণিক শাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্রে,  
অকাটা প্রমাণ দিতে না পারিলে লোক বিশ্বাস করে না, অন্ধাও  
করে না।

এই শাস্ত্রের বৃত্ত পুথি আছে, সব পুথির একপানি ভল ক্যান্টন  
সম্মত উঠারি হয় নাই। আর ইহা হইলে যে ইতিহাস পাওয়া যাইবে,  
সেইও বড় লোকের বাধ্যও হয় নাই। কিন্তু শুভ ক্যান্টন হইতে  
লেখা যায় যে, মৃতদ রাজত্ব হইলেই মৃতদ স্মৃতি হইয়াছে। কথিদের যে  
পুথি, তাহা ভিন্ন ভিন্ন বেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈয়ারি হইয়াছে,  
জটিকারো ভিন্ন ভিন্ন বেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই কথিদের স্মৃতির টীকা  
করিয়াছেন।

জ্ঞানার মুলশানবের যে সময় এদেশে আসিতেন আশ্রম করিলেন,  
তখন হইতে কথিদের স্মৃতি ও টীকারাজবের টীকা চলিল না।  
তাৎপাও তখন অত্যন্ত কলম ভুল বদ্বয় করিয়া 'এক একটা  
নিম্বক' তয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন। মুলশানবের সময় লেখা  
বিশ্বদেবের রাজনীতিতে একটু খাড়া হইয়াছে, সেখানে তাঁহারা নিম্বক  
তৈয়ারি করিয়াছেন। নিম্বক আর একটু বিশেষ আছে। বেবানে  
হিন্দুধা যাবান, লেখায়ে নিম্বক আর এক বিশেষ বই রাজনীতির  
আছে। কিন্তু সেটা মুলশানবের বেশে, দেবার রাজনীতি পক্ষত নাই।

অনেক জ্ঞানার বিদ্যুৎ-জ্ঞানসম্পন্ন লোকের আগাবের বেবানী মোক্ষমুখার  
করিলেন। লেখায়ে নিম্বক আরো যাবাহারের এক প্রকৃতি বই আছে।  
যে লেখায়ে মুলশানবের বেশে হিন্দুধা যাবান হইয়াছে, লেখায়ে হস্তরাঃ  
ভিকের উপর একপানি বই আছে।

কিন্তু পূর্ণে বিদ্যাভিরা, স্মৃতির বই নিখিলে গেলে প্রমাণ বেতরা চাই।

এই প্রমাণ ক্রমে বাটটা খুটী বেবিত পেলেন, কোন বইখানি কোন  
সময়ে হইয়াছে, তাহা বেশে ধরা বরা এবং বহিঃসাহাবের দেবার আচার  
যাবাহারের চেয়েম জান থাকে, তাহা হইলে কোন বেবন হইয় ছিল,  
তাছাড়া নিম্বক বেতরা থাকে।

হস্তরাঃ ভল করিয়া খুটী পড়িলে ইতিহাসটা পাকাপাকি তৈয়ারি  
হইয়া যাইতে পারে। আমি বেবগ জানেন কথা বলিতেছি, এজন্য  
জান—এই ভাবে। পড়া, পূর্ণে না হইলেও পূর্ণে যাবাহার বড় বড়  
পড়িতে হিলেন। তাঁহারের একটা যাবাহার যাবাহার। এই প্রমাণ ভল ও জান  
হইয়াছিল। তাই হস্তরাঃগণা নিম্বক এনিম্বক মোসাইটতে 'যেমাতি'র  
একটি নিম্বকটা সব ছাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিন ভাগের দুই  
ভাগ ছাপান হইয়া গিয়াছে; যেমতিঃ সমস্ত জানা ছিল। তিনি নিম্বক  
বলিয়া গিয়াছেন—বেবগিহির যাবতঃ রাজার খবিত বই বড় বড়  
রাজকথা করিতেন। সেটা ১২০০ খৃঃ হইতে ১০০০ খৃঃ পর্যন্ত।  
হস্তরাঃ তিনি যে সকল বই হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি  
তাঁহার পূর্ণে বইল নিম্বকই। কাগ, তিনিও ত কোন বড় পুথিত,  
বড় রাজার জন্মস্মৃতি। তিনি আর পুথি না দেখিয়া তাহা হইতে প্রমাণ  
সংগ্রহ করেন নাই।

এই রকম করিয়া যোখাইয়া মাজলি সাহেব, মৃতদ উপর যোখাইবিঃ  
যে টীকা আছে, সে। ছাপাইয়াছেন। যোখাইবিঃ যে সকল বইএর  
প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলিও তিনি দেখিয়াছেন। এইজন্য করিতে  
করিয়া গিয়াছেন।

বিহঙ্গম সাহেবের বলিয়াছেন যে, খোঁস-মর ধর্শনার শিখ পুটর হাজার  
বৎসর পূর্ণে বলিতে আমি সঙ্কট লেখ করি না। খোঁসমর ধর্শনার  
যৌবিক সঙ্কট লেখা নয়—পার্মানি যে সঙ্কট-ভেদ স্রজ ব্যাকরণ  
করিয়াছেন, সে সঙ্কট লেখা নয়—মাজখাি এক অবস্থার সঙ্কট।  
পার্মানির সময় এখন এক কলম ঠিক হইয়াছে—বিত্ত পুটর ৭ শত  
বৎসর আগে। খোঁস 'হাজার বৎসর আগে। খোঁসমর ভাষার সঙ্গে  
পার্মানি ভাষা তুলনা করিলে অনেক জান লাভ করা যায়।

খোঁসমর ভাষার 'অশেখা' স্মৃতি বই পড়িয়াছেন—তিনিও প্রমাণ  
গিয়াছেন। সে সব প্রমাণ আমরা পুথিয়া পাই না, লেখ হইয়াছে।  
তিনিও স্মৃতিরই প্রমাণ গিয়াছেন। তাহা হইলে খোঁসমর আগেও স্মৃতি  
হিঁ। স্মৃতি তাহা যাবান শাস্ত্র নয়। সবাই বলে, স্মৃতি বেবের খবিত।  
লোকের স্মৃতার, অনেক বেব লেখ হইবার পর কথিদের যে সকল কথা  
সংগ ছিল, তাহা একত্র করিয়া স্মৃতি হয়।

তাহা হইলে বহু ছিল, বেব লেখা হইয়াছিল, তাৎপার  
গিয়াছে—এই রকম করিয়া তাৎপারের সভ্যতার ইতিহাসটা আরও  
পড়াইয়া যাইবে। কত গিয়াইয়া যাইবে, তাহার একটা আভাস  
দিতছি।

পূর্ণাণে এক জ্ঞানার লেখা আছে, 'যেভাচারতের স্মৃতির পর অর্থাৎ

ইকসক-স্মৃতির পর 'পাণ্ডা' পর পর ৩০ জন রাজা হইয় গিলেন। তাঁরপর  
মল্লধাভাঃ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। মল্লধাভাঃ বিপ্তপুটর ৭ শত  
বৎসর পূর্ণে প্রমাণ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। পাট্টার সাহেব  
এই ৩০ জন রাজার নাম অনেক পূর্ণিপূর্ণি পুথিটা উদ্ধার করিয়াছেন।  
মোটাটুটি খবিত গেলে এক শতাব্দীর ৩০ জন রাজা হয়। তাহা খবিত  
হয়, তাহা হইলে ৩০ জন রাজার ৭ শত বৎসর হইবে; ৪০ খবিত ১০০  
যোগ করিলে ১২০০ হয়। কিন্তু পাট্টার সাহেব একশ বৎসর ৩০ জন  
রাজা করেন নাই—১৩১২ জন করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের স্মৃতি। বিপ্ত-  
পুটর পূর্ণে ১২১২ বৎসর লেখা তাহাও পড়া আসিয়া যে পাওয়া গেল।  
কিন্তু সে কালের রাজারা এখনকার চেয়ে একটু দীর্ঘজীবী হইতেন।  
আমরা বরা একশত তিন ৩০ রাজা খবিত পাই। তাহা হইলে  
বুদ্ধদেব-স্মৃতি আরও শিখাইয়া যাইবে। কথিদের ইতিহাস র-  
মত-নিম্বকিত বলে, বুদ্ধদেব-স্মৃতি বিপ্তপুটর ১২১২ বৎসর আগে হইয়াছিল।  
কোন না, তাঁহার বলেন, কলির ১৩ শত বৎসর পরে বুদ্ধদেব-স্মৃতি হয়,  
আর কলি ৩০১ বৎসর পূর্ণে আরম্ভ হয়; হস্তরাঃ ২০ শত বৎসর  
তেরিছে। ইহায়ে পাওয়া যাইতেছে।

কথিদের প্রথম খবিত অজ্ঞা। তখন লেখা যায় যে, বেব পার্মিক  
পার্মিক লেখ হইয়া আসিতেছিল। মহাভারতের জ্ঞান যে সব লেখা  
আছে, তাহাতে কেবল 'জীকমলকম' বর্ণনা। খবিতা চেয়েম করিয়া  
হইল, যে জ্ঞান-পাঞ্জরি কিছু বিখ্যাত যায় নাই। তাহাও স্মৃতিতে হয়,  
তখন যোগ-জ্ঞান বড় হইয়া গিয়াছিল এবং বেবও লোক লেখ হইয়া  
আসিতেছিল। বেব এখন খবিত, খবিত, মাম, অপর্যন্ত ভাগ হইয়াছে।  
তাহা হইলে বেব বিস্তার শিখাইয়া যাইবে।

মহাভারতে লেখা আছে যে, বুদ্ধজীঃ রাজার এক কথা ছিল, এ মায়া  
কথা; তাহার বিবাহ হইল জ্ঞানবের কোন বই। এই জ্ঞানবের হইলে স্মৃতি-  
সৌন্দর্যের কথা। স্মৃতিতে সৌন্দর্যেরা অনেক বই রাজত্ব করিতে  
হিলেন। সে যাবার জ্ঞানবের সঙ্গে ছাপনার বিবাহ হইল। স্মৃতি  
স্মৃতিতে স্মৃতি হইয়া মজা পড়ার মধ্যে একটা প্রমাণ নার স্মৃতি  
পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মজাযেবের অনেক নির্দশ পাওয়া গিয়াছে।  
জ্ঞানবের জ্ঞানবের জ্ঞানবের কোন নির্দশ পাওয়া যায় নাই, যা পাওয়া  
গিয়াছে পাঞ্জা উপাধাযেবের ধারে। অনেক বলেন, হস্তরাঃ বিনর  
বেবের অপর্ণাও প্রাচীন। অনেক বলেন—নাই। এটা বিশেষের চেয়ে  
একটু নতুন। 'অদ্বাভা' স্মৃতি, হস্তরাঃের খবিত এত বড় একটা নির্দশ  
নিম্বদেবের মায়ে পাওয়া গিয়াছে, তখন হস্তরাঃ ভারতবর্ষে হইতে পাঞ্জা  
উপাধাযেবের বাইতে গিয়ে, পাঞ্জা উপাধাযেব হইতে ভারতবর্ষে আসিতে  
পারে। এই হস্তরাঃ জাতিই ভারতবর্ষের সৌন্দর্য। সে ত বিপ্ত জীঃ  
৩০ হাজার বৎসর আগে। আর বুদ্ধদেব-স্মৃতি দিত তাহারের সঙ্গে  
তুল্যকালে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সভ্যতাটা কোথায় গিয়া  
পড়িয়াই, যেখানার বিবাহ হইয়াছে।



বেশ, দ্বিভি, এই দুইটি স্নিগ্ধ হাড়িয়া বিশেষ আর একটা পুষ্টি-আমাদের মনে করিত হইবে। কৃষ্ণস্নেহ-মুচ্ছর পর পরীক্ষিত হইতারা রজা হইল। তাঁহার হাত পুষ্প পদে হস্তিকা নগরপদার তালিকা যার এবং পরীক্ষিতবশ কোশাখীত আশ্রিতা রাহুত কদম। হস্তিনা—বলাহ ধারে দ্বিভি জোয়ার ছিল। কৌশাখী এলাহাবাদ হইতে ১৭১৩ ক্রোশ পশ্চিমে বম্বার বাহা। আর এই সময় পদ্রিগ্ধবশে অবিনিস-কৃষ্ণ নামে একজন রাজা হন। তাঁহার সময় ভারতবর্ষে একখানি ইতিহাস লেখা হয়। তাঁহার পূর্বকার ঘটনাজলি নিম্নোক্ত সময়ে এইটী কালের বিতরিক ব্যবহার করা হইয়াছে। তাঁহার নিম্নোক্ত সময়ের ঘটনাজলি বহনমান হুসেনে বাগ্যার, আর তাঁহার সম্রাট ঘটনাজলি ভবিষ্যৎ কালের বাগ্যার। বাঁহায়া পুরাণ পড়ুন, সকলই মনে করেন, পুরাণজলি অসীমসুন্দর সময়ের লেখা। বাস্তবিক যদিও ভবিষ্যৎ কাল, অসীমসুন্দর সময় হইতেই, হস্তিনা, অথোয়া, মধ্য প্রভৃতি দেশের রাজ্যাবধি বংশতালিকা অনেক পুরাণে পাওয়া যায়, সেই বংশতালিকা হইতেই পাঠিত র সাহায্যে ৫০ পুস্তক লম্বায়ের রাজ্য পাইয়াছেন। ইতিহাসে মানে পুরাণ ঘটনা। ইতিহাস অতীত কালের ইহা থাকে, বর্তমানের হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে কদম করিয়া হয়। পুরাণের মধ্যারা বজায়া বাগ্যারের জন্ত পুষ্টি কালের লোক ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার করিয়া পরের ঘটনাজলি পরে জুড়িয়া যিয়াছেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে এই ঘটনাজলি এককালে অসত্য হইতে পারে না। এখনকার লোক ভবিষ্যতে ইতিহাস লিখিতে পারেন না। তাঁহারা এক্ষণে হয় নিম্নোক্ত কালে, না হয় জুয়াচোয়ের শাস্ত্র বলিয়া মনে করেন। কখন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পুরাণে ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার অধিক এবং ভবিষ্যৎ কালের ইতিহাসও অধিক। আর সে ইতিহাসে যে আমোদিক, তাহা পাঠিতার সঙ্গে বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং অন্ত কালকেও শীকার করিতে বলিতেছেন।

অসীমসুন্দর সময় পুষ্প পর আরম্ভ হইল, তাহার আশ্রিত ইতিহাস পুষ্টিতে অনেক দেশের ভিতর সিরা পুষ্টিতে হয়। পাঠিতার মাঝে যে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বায়জীবন পুরাণ পড়িয়াছেন। বসম তাঁহার এখন ১৭১৩ হইবে। তিনি কখন ভারতবর্ষে সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা করেন, তখন হইতেই পুরাণের উপর তাঁহার বড় মাদ। আমি সে সময় হইতেই তাঁহাকে জানিলাম। তিনি যখনই ভারতবর্ষে যিকোন পুরাণ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক কথা হইত। হস্তিনা পুরাণ সম্বন্ধে তিনি বাহা বলেন, সেটা একটু মন বিজ্ঞা শোনা উচিত। তিনি যখন বেদের মধ্যে একশে কলিগেল, তখন কিন্তু তিনি নিজের কোটা ছাড়িলেন।

তাঁহাকে ম্যাকডোনাল্ড ও কীথ সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কারণ, ইঁহারাও এখন ইউরোপের মধ্যে বেদের সম্বন্ধে বেশী বই লিখিয়াছেন। পাঠিতার সাহায্যে পুষ্টি হস্তিনার লোক। তিনি যে আপনার কোটা ছাড়িলেন, তাহা তিনি বেশী পুষ্টিগেছেন। মত অসংলগ্ন করা তাঁহার কাজ। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—আমি এখনে ম্যাকডোনাল্ড ও কীথের পদাঙ্কসমূহ করিয়াছি। ম্যাকডোনাল্ড ও কীথ তোটাধর ভক্তি থাকে, আমাকে বিবাস কর; না থাকে না কর; কিন্তু আমার বিবাস, ভারতবর্ষের tradition, সেটা বিধি সমাধা।

এই সমস্ত কারণে বলিতেছিলেন যে, ভারতবর্ষে ইতিহাসটা পুরাণ আর গালাগি মাটিতে হইবে। একশত বর্ষ পূর্বে একজন মন-কুসারিতরিক বিত্ত পুষ্টি ৩ শত বৎসর পরের লেখা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি দশবৎসরতিরিক ভাল করিয়া পড়িয়া ইহাকে বিত্ত পুষ্টি ২ শত বৎসর পূর্বে বিত্তে সন্দেহে রাখি। মত আর কিহা গিয়াছেন। ছেন পদিনি, সত্যায়ন, বাড়ি, গুজলি ইহাওয়ের সময় লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনেক ভিন্ন ভিন্ন মত আর কিহা গিয়াছেন। একজন পাদিনিকে পুষ্টি ২ শত বৎসর আগেকার বলিয়া গিয়াছেন। একশত দুইশত বৎসর আগের বলিয়াছেন। পতন্তরিক কেষ্ট দুই শত বৎসর আগের বলিয়াছেন, কেষ্ট বিত্ত পুষ্টি ২ শত বৎসর আগের বলিয়াছেন, কেষ্ট বিত্ত পুষ্টি ২ শত বৎসর আগের বলিয়াছেন। কিন্তু সত্যসাহিত্যের এই পণ্ডিত পণ্ডিত এক জাণা বলে দেখা গেল, এবং হইতে ১২শত বৎসর পূর্বে রাশেন-র তাঁহার কাহা-নীসায়ের বলিয়া গিয়াছেন, পদিনি, সত্যায়ন, বাড়ি, গুজলি, ইঁহারা সকলেই পাঠকপুস্তক পদীকা বিজ্ঞা শাখিলভ করিয়াছেন। পাঠকপুস্তক মধ্য বিত্ত পুষ্টি ২ শত বৎসর পূর্বে রাজধানী হয় এবং রাজার শব্দে ভারতবর্ষের প্রধান নগর বলিয়া কথা থাকে। হস্তিনা পাদিনিকে বহুত বৎসর পূর্বে দিল্লীর মত উপায় নাই।

একজন পুষ্টি-সাহিত্যের বই পণ্ডিত পণ্ডিত অনেকের স্থান ও কাল গ্রিক হইয়া যাইবে। এ বিলিউকে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। শুধু ইহাওঁরা পড়িয়া আর সাহায্যের বই পড়ি। ভারতবর্ষে ইতিহাস লিখিবে না, জমা হইতে পারিবে না। কিন্তু এখনকার ইতিহাসবাগ্যীরা সাহায্যের বই ছাড়া পণ্ডিত পারেন না। সমস্ত তাঁহারের কাহা-নীসায়ের বায় বলিয়া মনে হয়। অনেক কাহা-নী ১৭১২, ১৮১৩, ১৮১৪ একজন পণ্ডিত রাগিয়া সত্যুতের কাজ করেন। পণ্ডিত বাহা বলিয়া বেন, তাঁহাকে বাহাওঁ বিবাস করিতে হয়। এই কালে ইতিহাস চালাইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সত্যে না হইয়া মিথ্যার রাশি হইয়া উঠিবে।

## কোবিদ-কুল-পুঙ্খ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীজ্যোতিষশাস্ত্র চট্টোপাধ্যায়

“আবার প্রথমদিবসে” দারুণ গ্রীষ্মাতিপথের পর বর্ষার প্রারম্ভে কালিদাসের যক তাঁহার বিরহ-গাথা-পান আরম্ভ করেন। আমি এই অগ্রহাণ মাসের সেই প্রথম দিবসে দারুণ “ভাভরে গুমোটের” পর শীতের প্রাক্কালে—ইংরেজি ১৭ই নবেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি ১১টার সময়—কলিকাতা মহানগরীতে শাস্ত্রীমহাশয় পুণ্ডীর নিকট হইতে চিরবিদায়গরণ করিয়া অনেক সজ্জনকে তাঁহার বিদায়-গাথা-বাগ্য বিদিত করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মৃত্যু জনসাধারণের নিকট একটা বড়লোকের মৃত্যুর অধিক কিছু না হইতে পারে, কিন্তু বাঁহায়া বিশেষ শিক্তি তাঁহার অবশ্যই বুঝেন যে, তেমন ভাবের গীর্জাধীর কোন বরপুত্রের আবার পুণ্ডীবীতে সহো আসিবার আশা করা যায় না। আমি তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞানবের গোড়া নহি—বরং কোন কোন বিবেকে তাঁহার বিক্ষুব্ধবী; কিন্তু যখনই আমার মনে হয় যে, কি এক চিরকল্প জ্ঞান-ভাণ্ডারের ধারের ঢাচি হাতে লইয়া তিনি এ দেশে জন্মিয়াছিলেন, তখনই আমি দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তিতে বঙ্গরাজ্যের কীর্তী হইতে যে মহার্ঘ রত্ন বসিয়া পড়িল, তাহা কে কতদিনে তাহার বঙ্গজননীস্নিহুতে পুনঃস্থাপিত করিতে পারিবে, তাহার বিজ্ঞাতাই জানেন।

শাস্ত্রীমহাশয় গবর্ণমেণ্টের এবং বিশ্বমণ্ডলীর নিকট উপাধ্যায় মহান পাইয়া গিয়াছেন। ১৮৭৮ সালে তিনি হোয়ার পুণ্ডীর হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁহার পর তিনি ক্রমশঃ লক্ষ্যে কামিৎ কলেজের এবং তৎপরে সাত্ত্বত কলেজের সাত্ত্বতের অধ্যাপক হন। এই কার্যের পরিপক্ব অবসার—১৯০০ সালে—তিনি শেখোয় কলেজের অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তৎপূর্বে বহুবৎসর পর্যন্ত তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ানের কার্যে যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতীত কলেজের অধ্যাপক পদে থাকিবার সময় তিনি পেনসন লম। তাঁহার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের “জীন

অফ ফ্যাকাল্টি অফ সাত্ত্বত ইন্ডিজ” পদে অবিরত হন। বহু ভাষায়—যথা সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, বাদ্ধালা এবং ইংরেজিতে—তাঁহার বিলম্বণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “অভিনায়া কলেজ”র পদও অলপকাল বিদ্যা-ভিলেন; তথাহীত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “রিমার্চ প্রাইজ” পরীক্ষার, পরন্তু প্রেমচাঁদ সায়চাঁদ বৃত্তি-সম্বন্ধীয় এবং পি এচ, ডি, ও অজ্ঞাত পরীকার, তন্নিম্ন এলাহাবাদ ও মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীকার পরীক্ষকের কার্যও বহুবৎসর করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া সাত্ত্বত ও হিন্দি ভাষায় “অন্যরুদ” পরীক্ষকও তিনি হইয়াছিলেন।

সরকারি কর্ম হইতে অবসর-গ্রহণের পরে—১৯০৮ সালে—তিনি “পুরো অফ ইন্সপেকশন”এর ভার গ্রাণ হন। বাদ্ধালার সিবিল কর্মচারীদের ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদির তথ্য-সম্বন্ধে খোঁজ-খবর থিয়া সাহায্য করার জন্য “পুরো” সমাপ্তি হইল। এনিম্যাক্ট সোসাইটিও তিনি অতীত জীবিত-কর কর্তী সদন্ত ছিলেন। “বঙ্গীর-সাহিত্য পরিষৎ”-প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও তিনি একজন। অনেক বৎসর—তাঁহার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত—তিনি উহার সভাপতিস্ত করিয়াছেন। বৌদ্ধ-সাহিত্য, বাঙ্গালা সাহিত্য প্রভৃতি-সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানময় কার্যের ফল চিরস্মরণীয় থাকিবে। অনেক সাময়িক পত্রেও তিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; সে সকল দেখা অবশ্য তাঁহার বিলম্বণ গৌরবের। শ্রীমতী মহাশয়ের বংশ পাণ্ডিত্যের জন্ম যাত। ধন্যতা পরিবারে তাঁহার জন্ম না হইলেও তিনি আপনার চেষ্টাতেই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনায় চর্ছমানীয় ছিল। এম-এ পরীক্ষায় সাত্ত্বত তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেন, বি-এ পরীক্ষাতেও তাহাই হন। এম-এ পরীক্ষার ফলে তিনি শাস্ত্রী উপাধি পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে “ডক্টর অফ লিটারেচার” উপাধি দেন







ধাকি। সে সময়ের মধ্যে আমি একবার কলিকাতায় আসিলে সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরের এক অধিবেশনে আমাকে উপস্থিত থাকিতে হয়। সেখানে সভাপতি ছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়—অধিবেশনের কার্য ছিল তথ্যের স্মৃতিভাষ্যের নব-সংস্থাপিত মর্ম্ম-বর্জিত তৎকল্পক আবরণ উন্মোচন। আমাকে দেখিয়া সাদর-সম্ভাবন-পূর্ব্বক শাস্ত্রীমহাশয় আমাকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইলেন। সেখানে আবরণ উন্মোচনের পর আমি তাঁহার অঙ্গুরোধে একটি কীর্ত্তন গান করি। শুনিয়া শাস্ত্রী-মহাশয় ও তথ্যের সমুদ্রপিত আমার পর প্রবেশ বহু শ্রুত্বকীর্ত্তন নাথ দত্ত, অনুরূপ পরবাক-গত আমার পূর্ব্বক উপস্থিতি কর্ত্তব্যের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হৃদয়কুমার অগতি মহাশয় এবং অজ্ঞাত বহুগণ ও সমবেত সভ্যগণ সকলে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করেন। আমা-

দের এই করবার সাক্ষাতের কথা এইজন্ত গিলাম খ্যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে বহুদিন-ব্যাপী একজপ ইচ্ছাকৃত বিচ্ছেদ তখনও চলিতে থাকিলেও শাস্ত্রী-মহাশয়ের আমার সহিত কথাবার্ত্তা সেই পূর্ব্বের ভাব প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে প্রশংসারই কথা।

বিগত শাস্ত্রীদ্বারা-পূজ্যর অনতিপূর্বে আমি বিশেষ হইতে কলিকাতায় কিরিয়া আসিয়াছি। গত বিজ্ঞানদর্শনীর পর-দিন—কি জানি কেন?—শাস্ত্রী-মহাশয়ের সহিত একবার বিজ্ঞানর সম্ভাবন করিতে প্রবল ইচ্ছা হইল। তখন তাঁহার পল্লভাঙ্গা ট্রাটের বাড়ীতে যাইলাম; সেখানে শুনিলাম, তিনি নৈহাটীতে আছেন। তাঁহার পর এখন সব দুঃসাহায়ে—তাঁহার মহাবাধ্যা হইয়াছে। তবে—

“গল্প শিখাচ্ছে পছন্দ: সঙ্গ।”

## সম্মোহিতা

(উপভাস)

(পূর্ব্বাহ্নয়তি)

শ্রীমতী উষা রিত

দশ

বিপদের সম্ভাবনার মানব শিরায় উঠে ততক্ষণ, যতক্ষণ না সে উদার সমুদ্রী হইয়া উঠে ততক্ষণ, যতক্ষণ না সে ঠাড়াইয়া উঠার সহিত সমুদ্র-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সমুদ্র শক্তি সংগ্রহ করিয়া লয়। ক্রমে আসন্ন বিপদের প্রচণ্ড দাহকারী শক্তি সহিতে না পারার ভয় থাকে না। ইহাই না কি প্রকৃতির নিয়ম; তাই রায়-পরিবারে এমন শোচনীয় ঘটনার পরেও আত্ম-আবার নিয়মিত কার্য চলিতে লাগিল। হঠাৎ—দুই বিবসের ওজাওর শান্তি দেখি—যেদিন জীবনধারা শান্ত করিয়াছিলেন হুলেখার মনে হইয়াছিল—এ আশ্বাস সুখি সে সহিতে পারিবে না—মাতৃ-শ্রুত গৃহে থাকিতে পারিবে না। কিন্তু ক্রমে দেখিল সবই সহিয়া যায়। বাটীতে চা চালাতে চালাতে রীতিমত বিমিত হইয়া লেখা ভাতার নব-পরিচ্ছদের দিকে চাহিয়া রহিল।

“কি রে—অমন হাঁ করে চেয়ে রইলি যে?”

“তোমার নতুন পোষাক দেখছি দালা, মাথো এত মোটা বিস্ত্রী ধুতি হুপি কেমন করে পরেছ?”

জিতেন হুলেখার আরও একটু কাছে গিয়া কৌটার একটি অংশ উদার হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—“দেখ কি চমৎকার জিনিস।”

“এমন মোটা পড়পড়ে কাপড় যদি ভাল হয় তবেই গেছি।” বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

“হাসিস না লেখা—আমাদের বাড়ীতে বিলাতী জিনিস ছাড়া এসব কৌশলিন দেখি নাই—তোমার বোম্ব কি—বাক সে কথা। এ আমাদের দেশের—তোমার মত মেয়েরা চাকায় হুতো কাটে, আর সেই সব হুতো দিয়ে যে কাপড় তৈরী হয় তার নাম ধারী, এ নাম শুনি স নি কি কখন? এ সেই বন্দর।”

“না দাদা এ বড় বিস্ত্রী।”

“না যে খুব নরম—পরশি একখানা?”

“কিন্তু এত মোটা কি আমি পরতে পারব দাদা?”

“কেন পারবি না রাণী? কত বড় ঘরের কোমলাঙ্গীরা এ পরছেন—আর পারবি না তুই? আমাদের দেশের জিনিস আমরাই যদি ধুণ্য করে দূরে সরিয়ে দি, তবে বিদেশীকে হুবহার কি আছে? তাদের বরং বিক্রয় করবার অধিকার আছে।”

“আর আমাদের?”

“কি পাগলের মত কথা বলছ লেখা? আমাদের হাতের তৈরী আমাদেরই নিজস্ব জিনিস দেখে হাসবার অধিকার কেমন করে থাকবে রে পাগলী?”

“আমার ভারি আশ্চর্য লাগছে—তুবি বা বিলাতী শাস্ত্রীপুত্রের বিধি ধৃতী ছাড়া পর না তাই—” লেখা চুপ কাশল।

“কিন্তু মাহুয়ের মন পরিবর্তন হ’তে এক মুহূর্ত্তের দরকার, মনের এ পরিবর্তন সময়-সময়ে যে কত তুচ্ছ ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে লেখা। মত মাহুয়ের কি চিরকাল সমান থাকে? না, তাই শাকা সত্ত্বব?”

“কেন থাকে না দাদা?”

“আবার অব্যবহৃত মত প্রাণ—এ যে প্রকৃতির নিয়ম রে রাণী।”

“এতবড় শক্তি তার যে মাহুয়ের চিত্ত—তাকেও সে অঙ্গ করবে?”

“কিন্তু মাহুয়ের চিত্ত যদি প্রকৃতির উপাদানে তৈরী হয়।”

হাসিয়া লেখা বুটাইয়া পড়িল,—“সে আবার কি দাদা?”

“সব কথার সীমাংসাই কি কেতাবে থাকে? না সব মাহুয়ের মনই সমান? আমার যদি এই বিশ্বাস, এই ধারণা হয়।”

অজমলকভাবে লেখা বলিল,—“তা হ’বে কিন্তু হঠাৎ তুমি বদলী হ’য়ে উঠবে কেন?”

“দেখি মায়ের গর্ভে, দেখি মাটিতেই যে জন্মেছিল দেখি উপাদানেই যে শরীর-মন গঠিত, লেখা।”

“কিন্তু এসব কারণ আগেও তো বর্তমান ছিল দাদা।”

“কর্ত্তবান ছিল—প্রকাশ হ’বার সুযোগ বা সুবিধাগার নি।

তখন আমার মধ্যে হুলেখা ছিল বুঝি—আর একটা কথা জেনে রাখ, কারণ বিনা কাজ হয় না।”

“কিন্তু সম্ভ্রুতি কি এমন কারণ ঘটে উঠেছে যাতে সোটা প্রকাশ হ’তে পেরেছে।”

“সেই কারণই যে আজ বলব, পল্লীগ্রামে আবর্জনার মধ্যে যে এক বিদূষী নির্মলকার উদারচেতা রমণী আছে, সেই মহিমময়ীর সংস্পর্শে আমার হৃদয় প্রকৃত জগে উঠে থক হ’য়েছে—কিন্তু তখন আশ্চর্য হ’বি তুই হুবে তিনি কিছু বলেন নি—সামান্য একটু ইঙ্গিত পর্য্যাপ্ত করেন নি।”

“তবে—তবে কি—”

বিমিত হুলেখার মনের ভাব দেখিয়া জিতেন বলিয়া উঠিল,—“হাঁ তাঁর কাজের শক্তি মনের আমার সব কল্লোল সাক করে দিতেছে—সে অনাবিল আকর্ষণী শক্তির পরিচয় হুৎ লেখা আর না তা হুৎ ক্ষুদ্রতমের জিনিস। তাকে একবার আমার সেই দিগির কাছে নিয়ে যাব। দেখবি অভাবের ভেতর হাসিমুখে কেমন করে সংসার চালাতে হয়—হুবা আত্মরূপে কেমন করে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে বাঁচিয়ে তুলতে হয়—মরণাপন্ন রোগীকে সেবা-ভ্রমরা করে কেমন করে অমৃতের প্রলেপ ছড়িয়ে দিয়ে মাতনার লাভব করতে হয়—কেমন করে—সম্মানের সহিত নারীর নারীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়—দেখবি রাণী কেমন করে সংসারের সব ভ্রম, সব কল্যাণ, সব লালনা-গলন স্বিরভাবে হাসিমুখে বুক পেতে নিতে হয়।”

অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও গুলাকে জিতেনের চিত্ত ভরপুর হইয়া উঠিল।

শুনিয়া আনন্দে হুলেখা বলিল,—“বাব আমি তাঁর কাছে—তিনি হুপি বন্দর পরেন।”

“হু—জমীদারের বৌ-ছোট এক মেয়ে নিয়ে বিধবা হ’য়েছিলেন—দেবর সব বিষয়-আশয় গ্রাস করে ফেলেছে—ছোট এক ঘরে সেই মেয়েটিকে নিয়ে তিনি থাকতেন, কিন্তু কে জানে কার অভিশাপে সে দিন মেয়েটীও মারা গেল।”

তাঁর একতরফ হুৎখর কাহিনী শুনিতে শুনিতে পরহুৎ-কাতরা লেখা চকল হইয়া পড়িল। হুৎ খানি বিবর্ণ পাণ্ড



হইয়া উঠিল। মাঝের স্মৃতি প্রবলতর হইয়া পীড়া দিতে লাগিল। অক্ষয় দ্বারা হুলেখা নেত্র মাধুর্য্য করিল।

বিচলিত হইয়া—জিতেন ভদ্রীকো শাস্ত্র করিতে প্রয়াস পাইয়া বলিল,—“চুপ কর লক্ষ্মী বোন, বাবা আবার সেখণ্ডে গোয়ে অধির হ'বেন।”

“বাবা সেখণ্ডে পাবেন, শুভতে পাবেন বল্পে যে আমি কোন দিন কান্না না দাখা, কিন্তু বাবার শরীর দিন দিন বড় ধারাপ হ'য়ে যাচ্ছে, এত বয়স করছি কিছু হচ্ছে না।”

“আমিও দেখছি এ আঘাত তিনি সহিতে পারছেন না, ভুলে পড়েছেন। তুই ভাবিস না বাবা আবার সামলে উঠবেন।”

“আমরা পেরেছি দাদা, তিনি কেন পারছেন না?”

“আমরা আঘাত সহিতে পেরেছি সত্য কিন্তু সকলের খন তো সমান হয় না বাবার মনটা বড় কোমল—আর এটাও মনে রেখ গুণ্ডা কত দিনের সাথী, কত স্বপ্ন-স্বপ্ন এক সঙ্গে ভোগ করেছেন।”

“আমার মনে হয় মাকে বাবার মত আমরা স্তত ভাল-বাসি না।”

“ভালবাস না? কি বলতে চাও তুমি? তাকে ভুলে গেছি?”

“পারি না দাদা—আজও মাকে ভুলতে, তবুও বলব' বাবার মত পুড়ী আমাদের ভালবাসা নয়। মা যেন বাবার নিজের হাতে গড়া জীব।”

উদার অক্ষ মুহূর্ত্তা জিতেন বলিল,—“আমি সব বুঝি লেখা—বেশে দেও-কথা—ওই যে মেরেটীর কথা বাদুধুম ইনি কে জানিস—নরেনের বোদি।”

“মনে পড়ছে এর কথা নরেন-দার মুখে—কত বার শুনেছি—নিজের খায়ে তুমি আবার?”

“নিশ্চয়। নরেন আর কত দিন আসে নিজে?”

“সে আমার মনে নেই—কিছু দিন খেঁচ' তিনি আসছেন না; আমার কিন্তু একটা জিনিস চাই দাদা।”

“কি বলিস?”

“না তুমি হাসবে।”

“বল লক্ষ্মী হাসবে না।”

“তিন সত্যি কর হাসবে না।”

মৌখিক জোখের সহিত জিতেন বলিল, “বা শুভতে চাই না তোরা কথা।”

ভাতার মধুর দিকে অভ্যমানভরা চোখে চাহিয়া সে বলিল,—“না চাই না।”

কিছুমাত্র আগ্রহের ভাব না দেখাইয়া জিতেন বলিল,—“যখন বলবই না, তখন শুনব কেমন করে? আমি তো, নরেন নেই—”

রাগিতে গিয়া হুলেখা হানিয়া কেলিয়া বলিল,—“বাও—তুমি ভারি চুই—আমার ই—য়ে চাই।”

“সে আবার কি?”

সকোচের সহিত দীরে দীরে সে বলিল, “একটা চরকা আর ধাতীর শাড়ী।”

জিতেন হাসিয়া উঠিল। সে বুকিল তাহার সৌন্দর্য্য-প্রিয় ভদ্রী ভাতার খাতিরে বদর পরিবার বাসনা করিয়াছে মাত্র, না হইলে উদার চকুতে ধাতী কোন দিনই সৌন্দর্য্যমণ্ডী হইয়া উঠিলে না। ভদ্রীর শুক মুখের দিকে চাহিয়া সে ব্যগিত হইল,—নিজের উপর বিরক্ত হইল, তারপর আদর করিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল,—“বেশ তুলো আর চরকা কাপ এনে দেব, কেমন করে হুতো তৈরী করতে হয় তাও দেখিয়ে দেব।”

গভীর বিষয়ে লেখা বলিল,—“স্বতো কাটতে জান তুমি?”

“দিলিকে কাটতে শেখছি যে, তাঁর কাছে শিখিছি।”

“ওর চরকা আছে?”

“নয় তো স্বতো তৈরী করেন কেমন করে? আর আমিও একটা চরকা কিনে দিয়েছি।”

“আমার আজই এনে দেবে?”

“আজ্ঞা।”

“আর ধাতীর শাড়ী?”

“এনে দেব কিন্তু সে যে তুই পরতে পারবি না।”

“কেন?”

“তোরা চোখে ও জিনিসটা স্বন্দর লাগবে না।”

“হোক গে, স্বন্দর আমার চাই না, দেখের যা গরু, আমার দাদার যা গরু, সে কুৎসিতই আমার ভাল।”

যেহে ভদ্রীর মস্তকে হাত দিয়া জিতেন বলিল, “তুই আমার

এত ভালবাসি রাণী? আজ্ঞা লেখা নরেনের চেয়েও?” দ্বিধা—কত বলছেন, জানিস তুই—কিন্তু তাকে যখন হুখী করতে পারি নি—

“সেইজেই যে বর্গুছি জীবিত থাকে ঘুদী যখন করতে পারি নি—তাঁর আদ্যাকে হুখী করে তাকে একটু শান্তি পেতে দাও।”

জিতেন নীরব রহিল। আগ্রহভরে লেখা বলিল,—“বল দাদা একবার বল তুমি বিয়ে করবে।”

বাগ্গিতবশে জিতেন বলিল,—“না লেখা এ অস্বরোধ কর না, জানিস না তাঁর কোন কিছু একটা—সামান্য কথা রাখতে না পারলে কত দুঃখ পায় তাঁর দাদা।”

“সেই জজ যে বলছি গো বিয়ে কর, বিয়ে কর, তুচ্ছ এই বোনের আদার রেখেছ কতবার—এখন এই সত্যিকার অস্বরোধে ব্যথা। বল, বল দাদামনি। একবার তুমি না করো না।”

বিবাহপ্রণীতকণ্ঠে জিতেন বলিল, “এবে পারব না রাণী?”

“কেন?”

“সে তুই বুঝি না; তুই যে জানিস না অন্তরে তাঁর দাদা কত দুর্গল, সেই দুর্গলতাকে জর করবার হচ্ছে কি ভীষণ চেষ্টাই না করছে সে,—যে দিন তা পারবে সে দিন তাঁর অস্বরোধে রাখব এখন মিছে অস্বরোধ করিস নি দিদি।”

হুলেখা অল্প নৃতন নৃতন কথা শুনিয়া বিষয়ে হতবুদ্ধি হইয়া এক টুটে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে আপন মনে জিতেন বলিল, “না—না এ অস্বরোধ এ হতে পারে না। এর কারণ কোন দিন জিজ্ঞাসা করিস নি লক্ষ্মী; আর তাঁর দাদার দোষ—অজ্ঞ লোকের মত বিচারের, নিতান্তে তুলে ধরিস নি, সে আমি সহিতে পারি না।”

“কি বুজ দাদা সত্যি করে অপরাধ যে কোন দিন তুমি করতে পার এ আমি বিশ্বাস করি না, তুমি চুপ কর।”

“সত্যি কি মিথ্যে জানি না কিন্তু তুই তাকে নিতান্তে তুলিস নি; হয়তো তুলিস না, তবু এই টুট আমি তাঁর কাছে চাই—”

“কি বুজ দাদা সত্যি করে অপরাধ যে কোন দিন তুমি করতে পার এ আমি বিশ্বাস করি না, তুমি চুপ কর।”

“কথা না কি বলি না?”

“তুমি যা চুই—কিন্তু—সত্যি এবারে বিয়ে কর দাদা, বল করবে?”

অশ্রুভরা নৈরে জিতেন বলিল,—“মার বড় সাধ

আমার মনে জিতেন বলিল,—“মার বড় সাধ

আমার মনে জিতেন বলিল,—“মার বড় সাধ

আমার মনে জিতেন বলিল,—“মার বড় সাধ



যেন আমার ভক্তি-প্রদায়ী দাদা আছি, তেমনি চিরকালই থাকবে।"

"আর যদি সত্যিকার দোষ করি?"

"তুও তুমি তাই থাকবে কিন্তু—"

"না আর কিছু নয়, তুইও এবার থাম।"

"বেশ তাই, যেতে দাও ও কথা; তুমি যে বলেছিলে এক মিন দিগির কাছে নিয়ে যাবে?"

"তার কাছে? চল মাই।"

"ও কি এখনি উঠে দাঁড়াতে কেন? বসে পড় তোমার মন এমন টিক নেই।" স্বপ্নোপাধি হইয়া উঠিতেছিল।

হাসিবার বার্ষ প্রকাশ করিয়া জিতেন বলিল,—"না ওটা কিছু নয় কি বলছিল তুই।"

"এখন আর কোন কথা না তুমি শুনে গড়।"

"আমি ভাল আছি রে পাগল—কোথার বাবার কথা বলছিলি?"

"তোমার দিগির কাছে।"

"এখন কি করে হর লেখা—বাবার শরীর দেখছিল কেমন হয়ে আছে মিন দিন—বিন কতক পুরী বা তোয়া, কেঁরবার পর সেখানে নিয়ে যাব।"

"তুমি?"

আমি এখন যেতে পারব না রাণী। পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে, শেষে মিন কতকের জন্মে যাব।"

কি ভাবিয়া লেখা বলিল, "আজ্ঞা দাদা সবাই মিলে যে তাঁকে এত ব্যথা দেয়—এমন ভাল তিনি কিন্তু তাঁকে লোকের আখা কষ্ট দেয়, এতে একটুহু কি তাদের মনে ব্যথা হয় না?"

"তোমার মত এমন করে পরের ব্যথা সবাই যে অসম্ভব করতে জানে না—আমার দিগিরের মত এমন উদার মনের লোক জগতে খুব কমই আছে—সাদাধরণ মাথায় জানে শুধু বিচারের ভাণ করতে—ভাড়া হোক, অজার হোক, সত্যি মিথ্যা মাই হোক—জানেন অপরাধীর বিচার না করেই নও দিতে—অপরাধ করতে মাত্র—বিচারের নিমিত্ত তুলে ধরতে। কিন্তু ছাড়ের মর্যাদা রক্ষা করবার তার কোন দিনই উপযুক্ত নয়।"

লজিত লেখা পূর্ণ গিয়াইতে গিয়া দেখিল কেহ যেন

সমুচিতভাবে দ্বার খুলিয়া আবার উঠা বন্ধ করিয়া দিল। বিমিত্ত লেখা জিজ্ঞাসা করিল,—"কে ওখানে দাদা?"

"দেখি বলিয়া বাহির হইয়া জিতেন বিমর্ষ নরেনকে দ্বারপার্শ্ব হইতে দূরিয়া আনিল, লেখা তখন অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া উঠিল। "তুমি একটু লেখার কাছে বস, আশ্চর্য থাকে ওর চরকা নিয়ে ঈশ্বরী আসুক।"

"কেন হয়েছে—তুনেছ।"

"এর জন্মে হুং করছিস কেন? অব্যর্থ চেষ্টা কর পাস।"

"কিন্তু আমি—"

বাধা দিয়া জিতেন বলিল,—"যেহে মানুষের মত মন তার—একটু আখাত সহিতে পারিস না। আজ্ঞা আমি আসছি এখনি।"

"তুনে যাও জিতেন।"

"না—না এসেই শুণ্ব—বড় মরকার ভাই।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া জিতেন চলিয়া গেল। শুভভাবে নরেন বয়সী রহিল। সে যে মারারাত জারিয়া, কত-বিকত হইয়া নিজকে দূত করিয়া—কৃতপাক্ষ হইয়া আসিয়াছে, অস্বীকার করিতে—স্বলোথাকে বিবাহ করিতে পারিবে না বলিতে কোনমতে সে তাহার উপযুক্ত নয় জানাইতে, কিন্তু জিতেন চলিয়া গেলে সব যেন স্ফায়াই গেল। লেখার নিকটে বসিয়া নরেন অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল।

নরেনের অজ্ঞকার বাহ্যের লেখার যেন কেমন কেমন লাগিতেছিল। অজ্ঞাত আশঙ্কার সে কাঁপিয়া কাঁপিয়া, উঠিতে লাগিল। এ নীরবতার ভিতর প্রজ্বল লক্ষ্য উদয়কে পীড়া দিতেছিল। জোর করিয়া গেরোটুকুকে সরাইয়া কশিত-কটে লেখা জিজ্ঞাসা করিল,—"কিছু কি বলবার আছে?"

"না।"

লেখা উঠিয়া, বলিল। "একটু বস তুমিচা নিয়ে আসছি, 'দাঁড়াও লেখা'।"

বিমিত্ত লেখা ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও নরেন এখন কিছু বলিল না, লেখা তখন আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল,—"কেন হয়েছে? বলে এত হুং করছ কেন? অব্যর্থ চেষ্টা কর কৃতকার্য হও।"

"কিন্তু আমি আর পড়ব না।"

"বেশ না পড়, অত কিছু কর—যা তোমার ইচ্ছে।"

অপরূপীর চার মুখ তুলিয়া নরেন বলিল,—"সেই কথা বলতে এসেছিমু জিতেনকে?"

স্বলোথার বকে যে ভারী পাথরবানী চাপান ছিল, এই কথার সরিয়া যাওয়ার মন হাল্কা হইয়া উঠিল।

মুগ্ধ হাসিয়া সে বলিল,—"কিন্তু এর জন্মে মজোরের কিছু নেই।"

"না আছে।"

আশ্চর্যভাবে লেখা বলিল, "কিন্তু আমি যে বুঝি না।"

"বলতে এসছি—থাক, সে কথা জিতেনকে বল।"

অধৈর্য হইয়া লেখা বলিল,—"কেন আমি কি তুনেতে পারি না?"

"পার।"

"তবে?" লেখা উগ্রবাহ হইয়া কহিল।

"হী শোন—আমার ইচ্ছে যতক্ষণ না নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি, অন্ততঃ তিন-চার শতাকা উপার্জন করতে না পারি, বিয়ে করব না।"

উত্তরেই নিবৃত্ত। কতক্ষণ পরে নিবৃত্ততাকে ভঙ্গ করিয়া নরেন বলিল,—"তুমি কি বল?"

দীরকটে লেখা বলিল, "বেশ তো চেষ্টা কর।"

"কিন্তু যে কত দিনে, কত বছরে হবে তার ঠিক নেই, সেইজন্মে তোমার দাদাকে ও বাককে বলতে এসছি অজ্ঞত তাঁরা তোমার বিয়ে দিন।"

"তুমি—" অসহ বিষয়ে লেখা নীরব হইল। তাহার পায়ের তলার পৃথিবী যেন সরিয়া বাইতেছিল বোধ হইল। মাথা-গাফিয়া উঠিল—ভগবান—ভগবান হৃদয়ে বল দাও, এ নির্দয়, জলদহীন লোকটার সামনে তার এ দুর্বলতা যেন প্রকাশ হইয়া না পড়ে। সমগ্র শক্তি একত্রিত করিয়া শাস্তকটে সে বলিল,—"আমি তাঁদের ত্রুণা বলে দেব।" উহার মুখ বেথিয়া নরেন বুঝিতে পারিল না, উহার অজ্ঞকরণ এ সংবাদে হুং পাইল—না—আনন্দ পাইল। পুনরায় বলিল,—"আর শোন আমি এর জন্যে বিশেষ লক্ষিত।"

এ—নিরঞ্জন চকল-চিত্ত লোকটা বলে কি? এর জন্ম শুধু সে একটি লক্ষিত। নিত্যের এক পরিহাস! তবুও লেখা বলিল, "এর জন্মে লক্ষ্যের কিছু নেই—তা'লে দাদাকে বলে দেব এখন।"

"অজ্ঞের সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুমি স্বপ্নে থাকবে, কিন্তু স্বপ্নে কি আমাকে মনে করবে না? বস লেখা মিনাতে একবার—"

অবেগভরে নরেন লেখার হাত ধরিল। লেখা কাঁপিয়া উঠিল—আবার—আবার সেই মোহকর সন-তুলান স্পর্শ দেখমেন কি এক ব্যাকুল শিরণ জাগিয়া উঠিল—চাঁৎকার করিয়া উহার বলিতে ইচ্ছা হইল—

"ওগো নিটুর, ওগো নিঃশব্দ-অস্থিরচিত্ত, নিজেকে নিঃশব্দ করিয়া তোমারই চরণে লিখাই।" বিরাহি—অনেকদিন আগে—সেইদিন—সেই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই—আমার নিজের বলিতে সখল আজ কিছুই রাধি নি, রিক্ততার নেশার মাতিয়া উঠিয়া—রিক্ত সর্বস্বান্ত হইয়াছি—নই দেবতা কিছুই নাই। যদিও—

নিঃশব্দ তুমি আজ প্রত্যাখ্যান করে আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাবাত করলে—কিন্তু সেই সর্বগ্রাসী নেশা ও স্পর্শের সেই হৃদিত যে অমর্য লাভ করে ফেলেছে—এই বুকের মাঝে চিরদিন অমাননিত তা থাকবে, তাহার শেষ যে কখনও হবে না; কিন্তু না—নারীর অবমাননাকারী অস্থিরচিত্ত—অবিশেষতঃ দায়হীনকে একথা বলিয়া নিজেকে হীন—দুর্বল, পরাজিত স্বীকার করিয়া উঠিতে যে প্রস্তুত নাই। এ না-পাওয়ার হুং অন্তর বাপিয়া উঠিলেও উহার মধ্যে যে শান্তি ও স্বপ্ন পোষন ছিল—আগ্র-ভরে সে উহাকে বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল।

কিন্তু হার নারীর যে সক্ষম করিয়া রাখিবারও অবিকার নাই। অদৃষ্টের একি লালনা একি বিজ্ঞপ—এমতাবৎ যে বাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল উত্তরই নিমিত্ত হৃদয়ে এ উন্নততা, এ ব্যাকুলতা—তাজব্বা বাপার! নিজের উপর দৃষ্টি ও বিতৃষ্ণার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল অদৃষ্টের জাগিয়া উঠাকে সচেতন করিয়া তুলিল। বিষম বিরক্তির দাঁহিত লেখা হাত ছাড়াইয়া লইয়া পরিকার কটে বলিল, "আজ্ঞা আজ তুমি এস।"

"বাছি—লেখা, জন্মেমতই বাছি—আর কোনমিন তোমার পথে এসে দাঁড়াব না কিন্তু—"

"না কিন্তু আর নেই—এর মধ্যে কিছু আর থাকতে



পারে না।" নরেনকে তবৎস্বয়ং রাধিমা ধীরপদে অগ্লেণা স্বীয় ককে প্রবেশ করিয়া আরাম-কেন্দ্রারানায় শুইয়া পড়িল। সে তো উঠাকে চাহে নাই, তবে কেন দিনে রাত্রে এত আশ্বাসবাণী দিয়া, নিজের বদ দিয়া, স্পর্শ দিয়া শনিয় ছায়া বিসিয়া থাকিয়া ভবিষ্যতের মধুর ছবি আঁকিয়া উদ্ভাস করিয়া তুলিয়াছিল! প্রত্যাহ্বানে উঠাকে পথে টানিয়া ফেলিয়া দিবারই যদি ইচ্ছা ছিল, তবে কেন—কিসের গল্প নিজের সর্বগ্রামী দাকসাগ্রিতে উঠাকে দখ করিয়াছিল। লেগার মনে পড়িল সে শিবস উহার মোহময় স্পর্শের সহিত কেমন করিয়া সে উহার উদ্ভাস মনকে লোকচক্ষুর অগোচরে এক পূর্ণ শান্তিভরা দেশে ছাড়িয়া দিয়া স্বাধিকতার আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ সন্তোর কঠোর আঘাতে তার সব স্বাধিকতা—সব মাদকতা স্বপ্ন-শান্তি আনন্দ ধূলার লুটাইয়া পড়িয়াছে। কি সে অসীম শান্তি, বিপুল স্বাধিকতা, অতুল উদ্ভাসনাই না ছিল উহার পরিত্যক্ত স্বপ্নের ভিতর। স্বপ্ন দুরাইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার অতুল-পরমাত্মে—স্বীয় মোহময় কাম্য স্মৃতিচক্র মাদকতার মদিরায় অবলিষ্ট করিয়া রাধিমা গিয়াছে আজ সে বিনা আজ সে কান্ধা। নেত্র মার্জনা করিয়া লেগা উঠিয়া বসিল। এমন সময়ে ছই ব্যগ্র বাহ উঠাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—“দিদি—মাণী—সেখা আমার।”

ব্যক্তি বসে সে বলিল,—“কেন দাদা।”



“নরেনের দেওয়া এ হুগং সইতে কি তুই পারবি বোন?”  
“পারব দাদা।”  
“না দিদি তুই পারবি না—যখন সে আমার বদলে তার মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়ো করতে ইচ্ছে করছিল, কাপুরুষ—বিশ্বাসঘাতক—যাঁক সে কথা কিন্তু তুই কি পারবি—এ—”  
“কেন পারব না দাদা, তোমার দিদি যদি অতর্কিত হুগং সইতে পেরে থাকেন, তখন আমিই বা পারব না কেন? সেই নারীরই যে জাত আমি।”

“আশ্চর্য্য ও নরেন ছেলোটা, ছোটো বেলো থেকে দেখছি তাকে ওই এক গুঁয়ো খামখেয়ালী। অস্তির স্বভাব কিন্তু তেই গেল না। কত সে যে এমন পাণ্ড ও জানতুম না।”

“থাকগে ও সব কথা—চূপ কর দাদা।”  
চকিতে ভদ্রীর দিকে চাহিয়া জিতেন বলিল,—“আমি জানি যে তোকে ভালবাসে, তবে ঐ এক খেয়াল; আর একবার তাকে বুঝিয়ে বল।”

“দাদা ছি” উহার কণ্ঠে দ্বুণা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

“নারী কি আত্মসম্মান ও অঙ্গুর বাধার অধিকার নেই?”

“আছে।”

“তবে?”

“কমা কর রাণী—আমার মিমিকে বুঝি নি আগে।”

( জমশঃ )

## আলোচনা

### জৈন-সাহিত্যে কৃষ্ণচরিত্র

#### ত্রিচায়াহরণ চক্রবর্তী

গত ভাস্ত্র মাসের ‘পঞ্চপুণে’ অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় ‘বৌদ্ধ ও জৈন-সাহিত্যে কৃষ্ণ-চরিত্র’ নামে একটি উপাদেশ বহুত্যাগপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি খেতাবের জৈনদিগের সাহিত্যে কৃষ্ণসংকে যে সকল কথা পাওয়া যায়, তাহাদের সাহিত্যেও সে এই সংক্ষেপে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় তাহার কোনও অভাস তাহার প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায় না। তাই বর্তমান দিগন্ত-সাহিত্যে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের কিছু ইঙ্গিত প্রদান করিতেছি।

জৈনেরা কৃষ্ণের উপাসক না হইলেও কৃষ্ণকে তাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের ত্রিখণ্ড-শলাকা-পুরুষের মধ্যে কৃষ্ণ অন্যতম। দিগন্তের জৈনদিগের সাহিত্যের মধ্যে জৈন মনোভাগ্যাকৃত জৈন হরিবংশপুরাণ, (৭০০ শকাব্দ বা ৭৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত), গুণভাগ্যাকৃত উত্তর-পুরাণ (৮২০ শকাব্দ বা ৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রচিত) ও প্রথম-চরিত্র (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত) প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। (এইগুলি জৈন পদ্যপুরাণদি গ্রন্থে জীমামত্স্রাণি হিন্দুপুরাণ প্রসিদ্ধ চরিত্রের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩৩১ সালের জৈনবাণী নামক অনুবাদপুস্তক বাঙ্গালা জৈন পত্রিকায় মণিগতি ‘জৈন-পদ্যপুরাণ’ নামক বিস্তৃত প্রবন্ধে জৈন-পদ্যপুরাণের বাঙ্গালা সার দেয়া।)

এই সকল গ্রন্থে খুব প্রাচীন না হইলেও ইহাদের মূল্যবৃত্ত বর্ণনায় বিষয়গুলি জৈন-মতকে জনশ্রুতির (ট্র্যাডিশন) আকারে এবং প্রাকৃত প্রাচীন গ্রন্থাবলির মধ্যে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। বস্তুতঃ, হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি অবশ্যম্বে হিন্দুপুরাণাদিতে যেগুলি কৃষ্ণচরিত্র উপ-বর্ণিত হইয়াছে—জৈনদিগের মধ্যেও ঠিক সেইরূপে কৃষ্ণচরিত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জৈনসমাজে কৃষ্ণচরিত্র কতদিন হইতে আলোচিত হইতেছে জিনসেনাচার্য্য স্বরচিত

হরিবংশপুরাণের প্রারম্ভে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—“এই কৃষ্ণচরিত্রের মূল প্রকাশকর্তা ভগবান মহাবীর এবং তৎপরে (তাঁহার শিষ্য) গৌতমগণধর প্রভৃতি। এইরূপে বহু আচার্য্য উত্তরকালে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের গ্রন্থই জৈন প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছি।” (জৈন হরিবংশ ১০২—১)

জৈন হরিবংশে বর্ণিত কৃষ্ণ-চরিত্রের সংক্ষিপ্ত সার আমি জৈনবাণী পত্রিকায় (১৩৩১, কার্তিক—মাঘ) প্রকাশ করিতেছিলাম। পত্রিকা বন্ধ হইয়া যওয়ার এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। তাহাতে কল্পিত-হন পণ্ডিত আখ্যানভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই আশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি নিয়ে নির্দিষ্ট হইতেছে। জৈন হরিবংশ মতে কৃষ্ণ জৈনদিগের ধার্মিক জীবনের অগ্রিনিমিত্ত গুণভূক্তা ভাই। বহুবংশে অন্ধকবীর জ্যোতিষ সূত্র-বিজ্ঞানের মহাবী শিবাবদীর গর্ভে অগ্রিনিমিত্ত জন্ম। সূত্র-বিজ্ঞানের সর্বকর্মিত পুত্র বহুবংশের দেবকী নারী জীর গর্ভে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্রিনিমিত্ত ও কৃষ্ণের সমসাময়িকতা হইতে ডাক্তার বার্গেট মহোদয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে বা তৎসময়মধ্যে বর্তমান ছিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ বিমলাচরণ লাল শিখিত মধ্য ভারতের কবির জাতি, প্রথম খণ্ড, নামক ইংরেজী গ্রন্থের ডাঃ এল, ডি, বাসনেট শিখিত ভূমিকা প্রদ্রব্য।)

কৃষ্ণের জন্মের পর কৃষ্ণের হাতে ও পায়ে শখ, চক্র, গদা, খড়্গ, অশ্বপ, পদ্ম প্রভৃতির রেখা দেখিয়া সকলেই বিমল যে, বালক ভবিষ্যতে মহাত্ম্যাপ্যান হইবে। এই রেখা হতে থাকার রূর্ণনা ও শ্রীকৃষ্ণ শখচক্রগদাপদ্মরাশি—এইরূপ কল্পনা, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তাহা ধারকাপুরাণ নিম্নাংশ-কাব্য সমাপ্ত হইলে কৃষ্ণের কৃষ্ণের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নানাবিধ অলঙ্কার, কুহুম্বী গদা, নন্দক নামক খড়্গ, শাপধ্বজ, গরুড়-চিত্রাকৃষ্ণ গদা, নানাবিধ শাস্ত্রপত্র বিদ্যার, চামর ছত্র প্রভৃতি উপহার প্রদান করিলেন (৪১৩৩)। হিন্দুপুরাণের মতে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের বাহন গরুড় নামক পক্ষিরাজ। জৈনদিগের গ্রন্থে অজরও



এইরূপ পতপক্ষী-চিহ্নিত জ্বালাবির উল্লেখ পাওয়া যায়। এক রাজবংশের পতাকা বানর-চিহ্নিত ছিল বলিয়া ঐ বংশের নাম হয় বানর-বংশ। 'ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রিক্যাল কোয়ার্টারলি' পত্রের প্রথমখণ্ডে মলিখিত 'বানর ও রাক্ষসজাতি' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জৈন হরিবংশে ৪২ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় কুক্ষের সন্ধিক্ষেত বোল শত ব্রী ছিল। ত্রিগুপ্ত মল্লমহারাজ ও এই সংঘাই পাইরাছেন। হৃতরাং এই সংঘার কল্পনা খুব প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

হরপ্রসাদ পুরির্দশন প্রসঙ্গে নারদের এক বিবৃতি বিবরণ কল্পিত-হরপ্রসাদের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বর্ণনার মধ্যে তাঁহার বিপার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

## হুসিংহমুরারী মিত্র ঠাকুর

ত্রিগৌরীর মিত্র

হুসিংহমুরারী (বা বজ্র) মিত্র ঠাকুর মহাশয় মনোহর-সাহা কীর্তনের বিশিষ্ট গায়ক-পরিবার মনোহাভাণের মিত্র ঠাকুর-বংশের আদি পুরুষ। ইঁহার আদি নিবাস রাজড় গ্রামে। এই গ্রাম পূর্বে বীরভূম জেলার অন্তর্গত মনোহর-সাহা পুরণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে ইহা বর্তমান জেলাস্বর্গ হইয়াছে। এই গ্রাম আমোদপূর্ণ-কাটোয়া-বল-লাইনের রামজীবনপুর ষ্টেশনের অদূরবর্তী স্থানে অবস্থিত।

গ্রাম তিনশত বৎসর পূর্বে হুসিংহমুরারী তাঁহার আদি বাসভূমি রাজড় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বীরভূমের মনোহাভাল নামক গ্রামে আসিয়া ত্রিবিগ্রহমূর্তি স্থাপনপূর্বক স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ করেন। অণ্ডাল-গাঁইখিরা-লাইনকে পাঁচড়া জৈনদের ছুই-মাইল পশ্চিমে মনোহাভাল গ্রাম অবস্থিত। হুসিংহমুরারীর জন্ম এবং স্বগ্রাম পরিত্যাগের যে প্রায় তিনশত পাঁচড়া যায় তাহা এই—

হুসিংহমুরারীর মাতার মৃতবংসা দেখা ছিল, তাঁহার পিতা কালীদেব এবং পিতামহ চূর্ণাচরণ এ লোক নিবাসনের জন্ত বহু সেবতার নিকট 'মানত' করিয়া এবং কবিরাজী ও

হাকিমী চিকিৎসারি করািয়াও কোন ফলাভ করিতে পারেন নাই।

রাজড় হইতে কাটোয়া বেশী দূর নয়। চতুর্দশের লোক কোন নী কোন উৎসব-উপলক্ষে প্রায়ই কাটোয়া যাতায়াত করিত। হুসিংহমুরারীর মাতাও কাটোয়া বাইতেন। একদিন তিনি কাটোয়ার গিয়া আপন ছাঘের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় রাজড় গ্রামের নিকটবর্তী কান্দড়া গ্রামের এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ছাঘের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী আপন ছাঘের সকল কথাই ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিলেন। ব্রাহ্মণ রমণীর ছাঘে জমিলিত হইয়া বলিলেন—'বাও, বাড়ী এয়া, এয়ার থেকে তোমার গুজ বেঁচে থাকবে—মরবে না। বাওর প্রথমেই তোমার যে পুত্র হবে তার নাম হুসিংহমুরারী মিত্র ঠাকুর রাখবে এবং তাকে আমার শিষ্য করবে।' এই বলিয়া ঠাকুর তাঁহার মুখস্থিত চন্দ্রিত তাম্বলের কতক অংশ রমণীকে পাইতে দিলেন এবং সকল কথা গোপন রাখিবার জন্ত অম্লভাষ্য করিলেন।

রমণী অম্লভাষ্য হইলেন এবং বৎসরময় এক পুত্রসন্ত প্রসব করিলেন। বলা বাহুল্য এই পুত্রই হুসিংহমুরারী। হুসিংহমুরারী বাল্যকালে বোবার মত থাকিতেন। এঁহার বৎসর বয়সেও তাঁহার বাক্যদ্বন্দ্ব হইত না সেদিন সকলে মনে করিল যে, বালক শাগল হইবে; কিন্তু কার্যতঃ তাহা হইল না। নিখিলি দিনে সেই ব্রাহ্মণঠাকুর আসিয়া হুসিংহমুরারীকে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষিত হইবার পর বালকের বাক্যদ্বন্দ্ব হইল। হুসিংহ ব্রাহ্মণঠাকুরের দামক গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলেন; কিন্তু ঠাকুর বলিলেন—'গৌরাঙ্গ প্রভুই সকলের প্রভু, আমি কারও প্রভু নাই; ভূমি তারই শরণ লও।' এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

বালক হুসিংহ প্রভুকে বনে বনে ডাকিতে লাগিলেন। প্রভু আকির্ভা হইয়া বলিলেন—'ভূমি বীরভূমের মনোহাভাল গ্রামে গিয়া, সেখানে আমার মূর্তি স্থাপন কর। সেখানে একটা প্রকাণ্ড নিম্বক দেখিতে পাইবে। স্থানীয় ভাস্কর দ্বারা তাহাতেই আমার মূর্তি নির্মাণ করাইবে

প্রভুর প্রত্যাশে মত হুসিংহমুরারী স্বগ্রাম পরিত্যাগপূর্বক বীরভূমের এই মনোহাভালে আসিয়া প্রভুর মূর্তি নির্মাণ করিয়া দত্ত হইলেন। বর্তমানে ইহা সেই গৌরাঙ্গদেবের মূর্তি।

হুসিংহমুরারী মিত্র ঠাকুর মহাশয় আতিষ্ঠ উত্তরাচারি কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখন মনোহাভালেই বাস করিয়া প্রভুর সেবার্থ্য এবং মনোহরসাহা কীর্তনে ও মল্লবন্দনে অসাধারণরূপ কৃতিত্ব লাভ করেন। মনোহাভালে মিত্র ঠাকুর-পরিবারের এই সমীর্জন ও মল্লব-বাগনের দেশব্যাপী খ্যাতি কোথাও অজ্ঞাত নহে। পরবর্তীকালে বীরভূমের তামানীস্থল অধিষ্ঠিত নগরের মুহম্মদান রাজা, মহাপ্রভুর সেবার জন্ত বহু নিম্বর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন।

হুসিংহমুরারী মিত্র ঠাকুর এবং তাঁহার পুত্র হরেক্ষক মিত্র ঠাকুর মহাশয় গীতবাঙ্গাটতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হুসিংহমুরারী মিত্র ঠাকুর মহাশয়-রচিত অনেকগুলি পদ আছে—সেগুলি এ-নাথ আদৌ প্রকাশিত হয় নাই। এই স্থলে কয়েকটা পদ প্রকাশিত হইল—

## ত্রিগৌরচন্দ্র

( ১ )

মধুর মধুর মধুর মধু, চাক বিমল কনক কল,  
বল মল বর, উল্লে জ্যোতি, গৌরবর্ন ইন্দুখা ॥  
বদন চন্দন বিধু কাতি, নাশা তুল্য স্বপ্ন ভাতি,  
হেরি মুরজে মদন কোটি, বর্দন অমৃত সিদ্ধি ॥  
অতি হৃদয়লিত বার্ষণ্য, কি শুভে তুল্য করত উত্ত,  
মহাভূজ তুলি হরি হরি বলি, সতত নটন রঙ্গিণী ॥  
সোভারি সে মুখ নিকুঞ্জ বাগ, ভকত নিকর পাওত রাস ॥  
প্রেম সর্দন মাধব মনন, বীর গদাধর সঙ্গিণী ॥  
রাঙ্গল মননে রহত লোর, পুরল যিমগ্ন গুণ জোর,  
চক্রে চক্রে গমনে গীরত, ভকত কণ্ঠ কথুরা ॥  
উঠে মেক পর পরের সার, স্বরমনি বনি স্বরত ধার,  
ত্রিবিধ লোক তারল কারণ, গাত তুল্যত বিদ্যুরা ॥  
অজস্র দ্বান করণ, বীন দ্বার অরুণ চরণ,

উজোর নখর শোহত ভাল, বর বিধু বর পাতিয়া ॥  
প্রাণ পূজ বোর গৌর শর, নরসিংহ স্বপ পরম রঙ্গ ॥  
সতত মিলন সাধু মুদ্র, কিরি গৌরী শুণে মাতিয়া ॥

( ২ )

উজোর বিজুর	ত্রিভঙ্গ মাদুরী	ত্রিভূষ পঞ্চর রাগে ॥
রাঙা উৎসল	নরেন নৃপদ	ভুক কাশ লাগে ॥
মাই সৌ, কি না	সে গৌরী কল	
কি এ পরতেক	শ্রেয় স্থাবর	মনমগ্ন মনমগ্ন ॥
আজিহ ললিত	বাহু স্থাবলিত	বদন কৃপণ তর ॥
স্বরবে স্থানর	রসে চর চর	ভদর মিলিত অহ ॥
তরুণ অরুণ	চরণ ইন্দুর	দময়ধিপণ শোভা ॥
তালা উল্লসিত	হনি মন্দাকিনী	মঙ্গলিহ মনোভা ॥

( ৩ )

কোট ইন্দ্	বিনিমিত স্থানর	ত্রিভূষ শোভা ॥
কোট অরুণ	অপে নিরঞ্জন	সৌম্যাদী নিজ আভা ॥
হৃদয় গৌর কিশোর ॥		
অবনি মনে	শেখল বিজয়নি	স্বরদনী জীর ॥ ৪ ॥
হৃদয় স্থাবর,	স্থাবক করজিনি	স্থাবলিত বাহুশাল ॥
উর অতি পীণ,	ভুবন বোহন	বিলিখিত করবীর মাল ॥
তরুণ অরুণ	কিরণ জিনি উটরণ,	

হেরি স্বরধর্ম কাকি বিকাশ ॥

জন্মভব দুর্গিণয় ধ্যানবরত তহি —দেন নরসিংহ দাস ॥

( ৪ )

ত্রিগৌরচন্দ্রের আরতি

আগতি কি জয় ত্রিগৌর-গোপাল কি।  
কনক কমল, কচিয়ারিন, চক্রে তিলক দরভাল কি।  
দীপ্তা ধনরত্ন, স্বরধনি বারী, মুরগ মুরগ জয় তাল কি।  
করকীর্তি, কুহর ভুলদীপন, শোভাবলি বনবালি কি।  
বাহে ধরে, ত্রিমাধবদলন, সঙ্গিনী সুকৃ সঙ্গাল কি।  
ভকত ভক্তবর্গ, গীত চৌর, বদী বদী দ্বিধবর লালী কি।  
রূপক ভূপ, অরুণ বর, নাটনি উল্লসিত গৌর দরশন কি।  
গৌর অঙ্গ পূজ, নরসিংহ হি কাতি, কাভর উদা বর্ম কাল কি ॥



## অভিনন্দন কবির তাম্রচিত্র

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

সম্ভাব্যক নন্দী-বিরাচিত রামচরিতকাব্য অনেকের নিকটেই পরিচিত, কিন্তু এই অভিনন্দন কবি-রচিত রামচরিতের কথা বোধহয় খুব কম লোকেই জানেন। এই পুণ্ড্রকথানী সম্ভাতি গাইকোবার দরবার হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মহাকাব্যের আকারে লিখিত এবং চরিত্র, সূৰ্ণ সমাপ্ত। প্রথম চরিত্র সূৰ্ণ অভিনন্দনের লিখিত। শেষ চারি সূৰ্ণ দুইজন বিভিন্ন কবির রচিত। ইহার মধ্যে একজনের নাম জানা যায় না। অস্তের নামভীম। তিনি নিজকে 'কারুণ্য-জাতিসুলভিক মহাশ্রীবংশালের পুত্র মহা শ্রীভীম' নামে পরিচিত-করিয়াছেন। তিনি শ্রীহাজার রচনার খুব গর্বও করিয়াছেন, লিখিয়াছেন :—

"ন মধুর মধু কন্তু চ কাণ্ডিত্য রসগর্যম সিংহাসিত যথা যথা  
অথর এন নবপ্রদায়গোষে লসতি ভীমকবে: কবিতারসে ॥"

[ ৩৬৯ পৃষ্ঠা ]

কবি যে তাঁহার জীবনকালেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ভাড়া তাঁহার 'নিজের' কথা ছাড়াই প্রমাণিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন :—

"কবীনাং কিং দত্তেন্দ্রপপঙকিওবিরসময়ে পরং পুণ্ড্রীপালঃ  
কন্যমপি স কণ্ঠ্যে বিবর্ততু ॥

অন্যত্র তত্ত্বজ্ঞপতি স্ববিপুলার্থব্যতির্যত্র প্রতিষ্ঠা বেনোভৈঃ  
জগতি নমিত্তঃ, রামচরিতম্ ॥ ২০ পৃষ্ঠা

তথা কুণ্ড: কবে: কন্তু নির্ণয়ঃ জীবততা বনঃ।  
হারবর্ষপ্রদানে শতানন্দেবধাধুনা ॥ ৩০ পৃষ্ঠা

অভিনন্দন যে একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন তাহা তাহার পরবর্তী কবিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কবি সোভজল তাঁহার উদয়ভদ্রদীক্ষা নামক চণ্ডিকাধার অভিনন্দকে কালিদাস, বাণ এবং বাসুদেবভট্টকেই সঙ্গ করিয়াছেন, যথা :—

"বাণপ্রিয়ঃ হস্ত ভজ্ঞে অভিনন্দনমর্থমগ্ন্য বাসুদেবভট্টাধীয়ে।  
রদেধর্যঃ সোমি চ কালিদাসঃ বাণস্ত সর্গেধরমদ্যনাতোহুদ্রি ॥

পরবর্তী কবিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে অভিনন্দনের কবিতা বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কবিত্বের সম্মান করিয়া

ছেন। একাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত বিভিন্ন দেশীয় সত্কাঙ্গিগ্ৰন্থকাক, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ইত্যাদি নিম্নলিখিত গ্রন্থে রামচরিতের স্নেহ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাঁহার কবিতা-প্রশংসিত হইয়াছে :—

১। শ্রীদরাসের সত্কাঙ্গি কব্যাংকুত—

[ ১১০৬ পৃ: অং, বঙ্গদেশ ]

২। জগদ্বনর সত্কাঙ্গিকালাকী—

[ ১১৪৮ পৃ: অং, দাক্ষিণাত্য ]

৩। শারদধর পঞ্চতি—(চতুর্দশ শতাব্দী, শাক্তধর্মী)

৪। সোভজলের উদয়ভদ্রদীক্ষা—

[ একাদশ শতাব্দী, গুজরাট ]

৫। উচ্ছলদত্তের উপাসিতহরপ্রতি (ত্রেদায়ন শতাব্দী)

৬। বদ্যাদিত্য সর্গানন্দ-রচিত অমরকোষের টীকাসম্বন্ধে—

[ দ্বাদশ শতাব্দী, বঙ্গদেশ ]

৭। রায়মুকুটের অমরকোষের টীকা—

[ পঞ্চদশ শতাব্দী, বঙ্গদেশ ]

৮। ভোজদেব-রচিত শূর্য্যপ্রকাশ ও সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ

[ একাদশ শতাব্দী, ধারা ]

ইহা ভিন্ন বহু গ্রন্থে অভিনন্দন, অভিনন্দন, গোষ্ঠ-অভিনন্দন নামা কবিগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারা রামচরিত-কাব্যের কবি কি না তাহা সঠিক জানা যায় না বলিয়া তাহার সম্বন্ধ বিশেষ কিছু বলা গেল না। সত্কাঙ্গিকালাকী ও শারদধর-পঞ্চতিতে অমর, অচল, অভিনন্দন এবং কালিদাসের প্রশংসাসহক স্নেহ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এই চারিজনই প্রকৃত কবি, কবি নামে পরিচিত আর সকল অক্ষরপকারী কবি মাত্র, যথা :—

কবিরমরঃ কবিরচয়ঃ কবিরনিবন্দনঃ কালিদাসতঃ।

অন্তে কবয়ঃ কপয়ঃ চাপলামায়ঃ পরং মুদ্রতি ॥

অভিনন্দন নামে যে একাক্ষিক কবি ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কামদেবী-কথাগার ও যোগেশ্বরিদাসের অভিনন্দন নামক এক ব্যক্তির রচিত। কাহার কাহারও মতে এই অভিনন্দন ও রামচরিতের কবি অভিনন্দন বিভিন্ন ব্যক্তি।

কামদেবী-কথাগারের রচয়িতা নিজকে জয়ন্তভট্টের পুত্র, কল্যাণভট্টের পৌত্র এবং ক্তিবাখ্যার প্রপৌত্র বলিয়া পরিচয়

দিয়াছেন। শক্তিবাহারী পিতামহ শক্তি পূর্বে বাঙ্গলার সৌদেয় অধিবাসী ছিলেন। পরে কান্দীরের দার্ভাভিয়ার গ্রামে বিবাহ করিয়া সেইখানে বাসস্থাপন করেন। এই অভিনন্দনের পূর্ণপুত্রবাখ্যার মধ্যে জয়ন্তভট্ট ও ক্তি-বাহারী ইতিহাসে পরিচিত। জয়ন্তভট্ট তাম্রাঙ্গরী রচনা করেন এবং শক্তিবাহারী কান্দীরের রাজা লজিতাসিতা মুক্তা-পীড়ের মন্ত্রী ছিলেন। রামচরিতের অভিনন্দনের বংশ অথবা বাসস্থান সম্বন্ধে কোন বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি একতুলে মাত্র আপনাকে শতানন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩০ পৃষ্ঠা)। শতানন্দ অর্থাৎ তিনি শতানন্দের পুত্র। এই শতানন্দ কে? ভাঙ্কায় এক, ভলগিটামাস বলেন অলঙ্কার-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রুদ্রট একতুলে বামুদভট্টের পুত্র শতানন্দ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মনে করেন এই শতানন্দই রামচরিতের অভিনন্দনের পিতা। রুদ্রট নামধারী তাহাকে অনেক কান্দীরবাসী বলিয়া মনে করেন। শতানন্দ নামে একজন কবিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবতঃ বঙ্গদেশবাসী ছিলেন, কারণ বঙ্গদেশে সংকলিত সত্কাঙ্গিকর্ণাণাম ও কবীন্দ্রবন্দনসমুচ্চ এই উভয় গ্রন্থেই শতানন্দ নাম কবির কবিতা বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত হইয়াছে। রুদ্রট-শতানন্দ এবং এই শতানন্দ এক ব্যক্তি না হওয়ারও খুব সম্ভব। রামচরিতের অভিনন্দন এই শ্রেণীক শতাব্দীর পুত্র হওয়া সম্ভব, কারণ উক্ত সত্কাঙ্গিগ্ৰন্থেই অভিনন্দন ও শতানন্দের কবিতা প্রদত্ত পুত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমাদের মতেই অভিনন্দন আখ্যানিক আখ্যানিক ও বিদ্যাস নামেও পরিচিত করিয়াছেন। রামচরিত-কাব্যের সম্পাদক রামাবাসী শাস্ত্রী মনে করেন যে, অভিনন্দন আখ্যানিক বৌদ্ধ ছিলেন, সেইজন্য আখ্যানিক নাম গ্রহণ করিয়া থাকিলেন। তিনি বলেন রামচরিতের যোদ্ধা সূৰ্ণ হস্তম্বনের স্তম্ভে বহুদেবীভক্ত দেবীর ছোজ পাঠ করাইয়াছেন; তাহা হারা তিনি যে দেবীভক্ত ছিলেন তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু আখ্যানিক বিষয় এই যে, এই বিদ্বত প্রমুখার কোথারও দেবীর আখ্যান নামের উল্লেখ পাওয়া গেল না। আমাদের মনে হয় কবি আখ্যান উদ্ভবপ্রিয় ছিলেন, তজ্জন্ম তাঁহার আখ্যানিক নাম হইয়া থাকিলে।

কবি যে রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার রামচরিতকাব্য

প্রণয় করিয়াছেন, তাঁহার নাম লিখিয়াছেন হারবর্ষ ও যুবরাজদেব। ইহা ভিন্ন, সান্না স্নোকে তাঁহাকে পালারায়ভূজ-বনকবিরোচন, পালকুলগ্রন্থী, পুণ্ড্রীপাল, ভীমপরাক্রম, বিরক্রমশূলক্কা, বিরক্রমশীলনন্দন, পালকুলিক, রামপরাক্রমের স্তম্ভ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। এই হারবর্ষ-যুবরাজদেব কে? সম্পাদক রামাবাসী মনে করেন, এই রাজা পালারায়ভূজের মহারাজ ধর্মপালের পুত্র দেবপাল। পাল-রাজবংশের তাম্রাঙ্গনসমূহে ধর্মপালের পুত্র যুবরাজ জিতুবন পাল ও মহারাজ দেবপাল এবং দেবপালের পুত্র যুবরাজ রাজাপাল। ধর্মপালের বাখ্যার আর কোন নাম জানা যায় না। ইহার পরে ধর্মপালের ভ্রাতার বংশ আরম্ভ। জিতুবন পাল ও রাজাপাল যুবরাজ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যে কোন নামের রাজা হইয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই যুবরাজদেব হারবর্ষ যে রাজা ছিলেন তাহা বেশ বুঝা যায়। কবি হারবর্ষের দানশীলতার প্রশংসা করিয়াছেন। মুদ্রের-তাম্রাঙ্গনসমূহে দেবপালেরও দানশীলতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। দেবপাল নন্দম শতাব্দীর লোক। কবি সোভজল পূর্বকবিরিচয়ের প্রশংসিতে অভিনন্দনের নাম রাজশেখরের পূর্বে উল্লেখ করিয়াছেন। রাজশেখর ১১ম শতাব্দীর লোক। এই কারণে রামাবাসী অভিনন্দনকে নবম শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করেন। ধর্মপাল বিরক্রমশাল বিজয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কবিত হইয়া থাকেন। এই কারণে দেবপালকে বিরক্রমশীলনন্দন বা বিরক্রমশালক বলা যাইতে পারে। দেবপাল তুঙ্গরাজবংশের দৌহিত্য। তুঙ্গরাজ-গণের অনেকের নাম বর্ণিত। এই কারণে দেবপালের নাম হারবর্ষ হইতে পারে।

উপরে যে সব কারণ প্রদর্শিত হইল তাহা ছাড়া হারবর্ষকে দেবপাল মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু আরও কতকগুলি কারণ আছে যাহাতে তাহাকে দেবপাল, এমন কি বঙ্গের পদারাজত্বপ্রিয় কি না সে বিষয়েও সন্দেহ জন্মে। শব্দবুলাই হৈহয়রাজবংশে বিবাহ করেন। এই হৈহয়রাজবংশে যুবরাজ কেশর্যবর্ষের নাম পাওয়া যায়। হারবর্ষকে পালারায় কিংবা পালকুলগ্রন্থী বলিলেও তাঁহার পালারায় বনোদ মুদ্রিখিত হয় নাই। পুণ্ড্রীপাল তাঁহার বিশেষণ করিয়াই মনে হয়। যে কখনো হস্তলিপি দেখিয়া



এই পুস্তক সম্পাদিত হইয়াছে তন্মধ্যে বরদ্বার ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁজি অন্ততম। ইহার প্রথম সর্বত্র পুস্তিকার শেষে বরদ্বারের প্রশাসনসূচক একটি নোংরা সোঁতা বার। এই বরদ্বারকে তৎসময়ে সম্পাদক কিছুই বলেন নাই। ত্রেদাদশ শতাব্দীতে ওজরটে ভীমদেব ও লবণ-প্রমাণ নামে দুইজন রাজা ছিলেন। বরদ্বার নামে তাঁহাদের একজন মর্যাদা ছিলেন। এই বরদ্বার কীর্তিকৌরবী ও ব্রহ্মকোষসংস্কৃতি। কবি হওয়া সম্ভব আছে, কিন্তু এই বরদ্বারের নাম রামচরিতে আসিল কি প্রকারে? পাল-রাজগণের কোন লিপিতে ইহাটিকে পালার কিংবা পালকুল বলা হয় নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর কামরূপ-বৈষ্ণবাবের কামোজি-লিপিতেই ইহাটিকে প্রথম পালকুল বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে। ধর্মপালেশ্বর বিজয়শীল, রামপ্রসাদ ইত্যাদি নামের বা বিবেচনায় উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। রাজস্বার পালকুলবংশেই যে কেবল ধর্মপাল নামে রাজা ছিলেন তাহা নহে। কামরূপেও ধর্মপাল নামক এক রাজার তাম্রশূল্য-পাওয়া গিয়াছে। এই ধর্মপালকে 'পালাব্রাহ্মণধর্মবি ও কবিরাজ-চুড়ামণি' বলা হইয়াছে, যথাঃ—

“পালাব্রাহ্মণধর্মবি কবিরাজচুড়ামণিঃ

কলিতসর্গকলাকাপিণঃ।

ঐশ্বর্যদানপুণ্ডিত গুণবসিদ্ধব্রতঃ।

প্রশস্তিকরোবদ্যতীক্ষিণঃ।”

—ব্রহ্মপুত্র সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, দশম ভাগ, ১৭-১৯ পৃষ্ঠা।

এই ধর্মপাল দশম শতাব্দীর শেষভাগ কিংবা একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই বর্তমান থাকার সম্ভব। হারবর্ষ এই ধর্মপালের বংশের হওয়া অসম্ভব কি? কবির বংশের কবির উৎসাহরাতা ও পুস্তিকার হওয়া খুবই সম্ভব।

অভিনবকে যে কারণে সম্পাদক নবম শতাব্দীর লোক বলিতে চাছেন তাহা পুঁজিই বলিয়াছি। ‘সোড়ল’ যে সময় ধরিয়া পর পর কবিশিখের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি? রাজবংশ ও অভিনব প্রায় সমসাময়িক ও হইতে পারেন অর্থাৎ উভয়েই দশম শতাব্দীর লোক হইতে সোঁতা কি? অভিনব বলিয়াছেন, তিনি জীবিতকালেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যদি নবম শতাব্দীর লোক হ’ল তবে নবম বা দশম শতাব্দীর কোন পুস্তকে রামচরিতের উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? তাঁহার কাব্যের উল্লেখ একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর পুস্তকেই পাওয়া যায়। এই কারণে আমাদের মতে অভিনব দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংবা একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হারবর্ষও সম্ভবতঃ কামরূপের ধর্মপালের বংশসকৃত এবং ঐ কালের লোক।

রামচরী মনে করেন যে, অভিনব বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী কবি কামরূপ-রাজ্যের সভাকবি হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা নাই, কিন্তু যে কারণে তিনি অভিনবকে বাঙ্গালী মনে করেন সেই কারণেই কামরূপবাসীর পক্ষেও প্রজ্ঞা, স্বরাজ্য আদ্যের অনুমানে যদি কোন সত্য থাকে, তবে তাঁহার কামরূপবাসী হওয়াই বেশী সম্ভব। অভিনব সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন না, কারণ দেখা যায়, তিনি হারবর্ষকে নমস্কার করিতেছেন, যথাঃ—

“পালাব্রাহ্মণধর্মবর্নকবির বয়োচনাথ ঠৈম

নমোঃস্ত ত্বরাগ্জ্ঞানব্রতধরায়।”

(তম, ৮ম, ১৪ম ও ৩৬ম সর্গ)

“নমঃ ঐশ্বর্যবর্ধায় যেন হলাদানন্তময়।”

(৫ম ও ৮ম, ১০ম ও ১২ম সর্গ)

সেকালে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণত্বের রাজাদিগকে নমস্কার করিতেন কি না জানি না।

## দরদী

নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক

মোহিনীমোহনকে দেখিয়াই চন্দ্রকান্তবাবু বলিয়া উঠিলেন—আজ যে একলা—খোকা কোথা?—  
বুড় হাসিয়া মোহিনী বলিল—আজ তার মার কাছ-ছাড়া হ’ল না—

চন্দ্রকান্তবাবু পরের কথাগুলো শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—বা! তাও কি হয়? এই বাট বহর বয়সে এক মাইল পথ হেটে আমি এখানে আসি—তার সঙ্গে দ্রুত কণা বলতে, আর সে আমাকে না?—বাও নিয়ে এস তাকে, নিজেই মনে যে যখন আমার সঙ্গে আত্মকথা বলে তখন আমি যেন আত্মহারা হয়ে যাই!—

আনন্দোৎসবের কণ্ঠে মোহিনী বলিল—আহন না গরীবের কুড়ের ..

হাসিয়া চন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন—ঘরের ভেতরের চেয়ে এ ফাঁকা বায়গাড়া আমার বেশ ভাল লাগে। আমার ভাইকে বস্তু দিয়ে—আমি এসেছি, শুনে সে থাকতে পারবে না—আমি বই!—

ইহার পর মোহিনীমোহন আর কোনও কথা না বলিয়া বাড়ীর উদ্দেশে পা বাড়িয়া গেল।

মঠিখানার প্রান্তভাগেই টিনের একখানা বাড়ী। এই বাড়ীর একখানা ঘরভাড়া করিয়া সন্ন্যাসী মোহিনী বাস করে।

মোহিনী চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্তবাবু একটা লীফ-নিমগ্ন আশ্রয় করিয়া আকাশের পানে তাকিয়া বসিলেন।—সমুদ্রের পর দিয়া অবিভাগ যে বায়ব প্রাচীর-বাড়া চলিয়াছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্যই নাই।

খোকাকে লইয়া মোহিনীকে বাটার বাহির হইতে দেখিয়া চন্দ্রবাবুর চিন্তার খেয়াল ছুটিয়া গেল।—উজ্জল আনন্দে সেইখান হইতেই ডাক দিলেন—ভাই!

সর্বের হাসি মুখানিতে উদ্ভাসিত করিয়া পিটার কোল হইতেই শিশু উত্তর দিল—দাছ!—

আমি দাছ আর!—হীরে দাছ! এক মাইল দূর হতে আমাকে এখানে টেনে এনে ভুই বসে থাকবি আমার কোলে?—পাজী কোথাকার?—তোরা কি সবাই এসনি দাছাবাছ?

চন্দ্রকান্তবাবুর এতগুলো কণার উত্তরে ছই বৎসরের শিশু কেবল তাঁহার কোশে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডাকিল—দাছ!—

বুড় তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—বেড়তে বাবি ভাই!

কুন্দফুলের মত সাদা পাতগুলি বাহির করিয়া শিশু বলিল—দ-ব।

মোহিনী বলিল—বাড়ীতে বসছিল, একবার বসি কুড়ের য’ন।—

চন্দ্রকান্তবাবু বলিলেন—মাকে বলবেন একদিন যাবোই, কিন্তু এখন তো পারছি না।—ভাই আমার বেড়তে যেতে চায়!

এই বলিয়াই বৃদ্ধ শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন দিকে বাবি ভাই!

হাত বাড়াইয়া শিশু বলিল—এদিকে।

চন্দ্রকান্তবাবু মোহিনীকে বলিলেন একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আমি এত্বে!—

ছই

ঘড়ির স্কট যখন নমটার ঘরে গিয়া পৌছিল তখনও চন্দ্রকান্তবাবুকে আদিত্য না দেখিয়া মোহিনীমোহন পুত্রের জন্ম একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল, অথচ আর অপেক্ষা করিবারও সময় নাই, অক্ষি যাইতে হইবে!—  
আহারে বলিয়া স্নানকো মোহিনীমোহন জিজ্ঞাসা করিল—



কি ব্যাধার বল দেখি; কখন খোকাকে নিয়ে গেলেন এমন পর্য্যন্ত—

নিরুদ্ভাবাবেই পত্নী নীরদা, বলিল—কিয়ে বাবেধন এমন ত প্রায় নিয়ে নীর।

সহাস্তমুখে মোহিনীমোহন বলিল, তাতো খান, কিন্তু ভাত যে মুখে দিতে পারছি না। মস্তে বসে খায়—সন্টার বেশ আশোদ পাচ্ছি না।

নীরদা বলিল—তুমি এমনভাবে ছেড়ে দাও কেন। জানা নেই, শোনা নেই—

বাধা দিল মোহিনী বলিল—তুমিও জাননা নীর! হুজবে ওর হুজনের কি ভালবাসা—পঞ্চ শ হাত ধরে তাকে দেখতে গেলে—“দাছ” বলে তার কোলে ছুটে বাধার জন্তে খোকার কি ব্যাকুলতা, আর খোকাকে দেখবার জন্তে সেই ভ্রমলাকেরই বা কি আগ্রহ—এক মাইল দূর হতে রোজ—

নীরদা জিজ্ঞাসা করিল—তার বাড়ী কোথা?

মোহিনী বলিল—তাত জানি না, তিনি বলতে চান না—এইটাই হ’লে যে বড় মুগ্ধ।

উত্তরে সে কি বলিতে বাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে আর বিপত্তে হেলি না—বাহির হইতে ডাক আসিল—মোহিনীবাবু!.....

মোহিনীর তখন আহার প্রায় শেষ হইয়াছিল। ব্যস্ত ভাবেই আচমন করিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিতে পাইল খোকাকে কোলে লইয়া চন্দ্রকান্তবাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।.....

মোহিনীমোহন হাত বাড়াইয়া খোকাকে লইতে গেলে চন্দ্রকান্তবাবুর বুক মাথাটা গুঁজিয়া নিরীকারভাবে শুইয়া গিয়া। গিয়া চন্দ্রবাবু বলিলেন—ও আর আপনার কাছে যাবেন না মোহিনীবাবু।

টিক তেমনি হাসিয়া মোহিনী বলিল—ভাইত দেখছি... আরে...—স্বামী বাবা, আর অগ্নিসের বেশা হয়ে বাচ্ছে।

মোহিনীমোহন একদল ধোর করিয়াই খোকাকে কোল হইতে টানিয়া লইয়া চন্দ্রবাবুর বলিল—চলুন একটু বসবো—

আর আর নয় মোহিনীবাবু—বলিয়া চন্দ্রবাবু বলিলেন—ভাই বজ ডড়িয়ে ফেলছে, নিনকতক আসা বন্ধ করতে হ’বে দেখছি।

মোহিনীউত্তর দিল—‘হ’লেই হচ্ছে। বাড়ীতে বসছি—

—দুপুরবেলা গুমোয় না, কেবল ডাকে—হা হা হা দাছ!...

তা আমি জানি মোহিনীবাবু, তা না হ’লে আমিই বা ছুটে আসব কেন!—ডাক দেয় বলেই আমি এখন চলব।

—আপনারও অফিসের বেলা—

তিন

পোড়ার একটু কথা!...

স্ট্রাকে সাংসারিক কাজের একটু সুবিধা দিবার জন্ত মোহিনীমোহন প্রায় প্রত্যহই তাহার ছই বসন্তের পুরটাকে লইয়া বাটার সমুখের মাঠে আসিয়া বসিত। সমুখের রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া, বহু মাছের পণ-চলা দেখিতে দেখিতে খোকা যেন সব ভুলিয়া গিয়া তন্মগ্ন হইয়া বাইত।—পাড়ার আরও পাঁচ সাত জন তাহাদের ছোট ছোট ছেলগুলি লইয়া সেইখানে আসিয়া সমবেত হ’ত; খোকা সেই সব ছেলদের সহিত খেলা করিতে করিতে উৎসাহের আনন্দে মতিয়া উঠিত।

মোহিনীও মোহিনীমোহন খোকাকে লইয়া—মাঠে বসিয়া ছিল।

খোকা ইতস্ততঃ খেলা করিতে করিতে ছুটপাটের উপর চন্দ্রবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া গিয়া ডাকিল—“দাছ!”

তাহার এই ডাক শুনিয়া সুখের সমস্ত শরীর যেন উত্তেজ হইয়া উঠিল। এতখানি আগ্রহের সঙ্গে তাহাকে বুক ভুলিয়া লইলেন যেন এই ডাকটা শুনিবার জন্তই তাহার হৃদয় মনের প্রত্যেক স্থানই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই একান্ত অজানিত শিশুটিকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া অজ্ঞ প্রেই-চুপে তাহার মুখখানাকে ডরাইয়া বৃদ্ধ যেন অনেকটা স্থির হইয়া উঠিলেন।

মোহিনীমোহন ৭মের এই কাণ্ড দেখিয়া ভাড়াড়ি চন্দ্রবাবুর নিকট ছুটিয়া আসিতেই তিনি বলিলেন—খা-ক, খা-ক...ও আমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলছে—

আহার মুখে পরিপূর্ণ হৃদয় উজ্জল হাসি।

মোহিনীমোহন উত্তর দিবার মত কোনও কথা বুলিয়া না পাইয়া বলিল—ওর ঐ রকমই সুখ—আপনার পর বাথে

না, বাকে সামনে পাবে তার কাছেই ছুটে বাকে।

সহাজে চন্দ্রবাবু বলিলেন—ভবিষ্যতে আপনার এ ছেলে মাছ হ’বে।

তারপর তিনিও মোহিনীবাবুর সহিত মাঠের উপর আসিয়া বসিলেন।—খোকা তাহার সহিত প্রায় বুলিয়া

আদ আদ ভাবায় কত কথাই বলিতে লাগিল, চন্দ্রবাবুও আপন-ভোলা হইয়া তাতে যোগ দিলেন।

সন্ধ্যের রাস্তায় ফেরিওয়ালা ডাকিল—চাই আঙুর।

চন্দ্রবাবু তাহার নিকট হইতে আধসে আঙুর কিনিয়া একটা খোকার মুখে দিতেই মোহিনীমোহন বাস্ত হইয়া

বলিল—কি করছেন সবিতাই মোহিনীমোহন বাস্ত হইয়া

চন্দ্রবাবুর এ কথার উত্তর দিবার সময় হইল না, খোকা তাহার হাত হইতে একটা আঙুর লইয়া বুকের

মুখে দিতে দিতে বলিল—“কা।”

চন্দ্রবাবু “না” বলিলেন না,—খোকার অম্বরোধ রক্ষা

করিয়া মোহিনীমোহনকে বসিলেন—দেখলেন মোহিনীবাবু,

সম্পর্ক কোনভাবে নিবিড় করতে হয় তা আপনার খোকা

বেশই জানে।

মোহিনী হইতেই চন্দ্রবাবু প্রায় প্রত্যহই খোকার

কাছে আসিতেন।—তাহাকে দেখিয়া খোকাও যেন সব

ভুলিয়া বাইত।

নিকটে রাখিবার জন্ত তাহার ব্যাকুল মনের এতখানি আগ্রহ।

আবার নিকটে রাখিলেও অন্তরের কোনও একস্থানে যেন কষ্টক বিদ্ধ হইয়া...বাতনার চকু দিয়া ছই দোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে, কিন্তু সেই বাতনা চাপা দিবার জন্ত খোকাকে বুকের মধ্যেই নিবিড় ভাবে ঢালিয়া ধরেন।

কিন্তু একদিন যখন তাহার অন্তরের শিকোটার হইতেই যে বলিয়া দিল, খোকা তো তার নিজের পোজ নয়, তখন তাহার চমক ভাবিয়া গেল—সত্যি তিনি একি করিতেছেন?...

তাই সেদিন খোকাকে রাখিতে আসিয়া মোহিনীমোহনকে বলিয়া গেলেন—মায়ার ফাঁস এমন করে গলার পরব না মোহিনীবাবু!...দ্বারের দিকে পা করে বসে

আছি, কেন আর এ মিছে মায়াই—কি বল দাছ।

দাছ—ওরকে খোকা—শুধু হাসিয়াই জবাব দিল—

কোনও কথা বলিল না।

করণ-পুষ্টিতে চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া মোহিনীমোহন বলিল—হঠাৎ আপনার এ ভাব হ’ল কেন?

হাত-তলরক্ত চন্দ্রবাবু উত্তরে বলিলেন—দিনওলা

যখন হুরিয়ে আসছে মোহিনীবাবু, তখন নিজের কাজ

একটু করি...পরকাল বল’লে একটা কিছু আছে—জবাব

দেব কি? বৃদ্ধ যেন না।

স্বিতহাতে মোহিনীমোহন বলিল—পারবেন তো?

উৎসাহের আশিত্যেই চন্দ্রবাবু বলিলেন—নিশ্চয়ই!

ওপার হ’তে ডাক আসছে...এখনও—কি এপারের

মায়ার আনন্দ হইয়া থাকে উচিত—পারতেই হ’বে।

দেখলেন, তখন বললেন—হাঁ চন্দ্রবাবুর কথা বটে।

সহাজে নয়দার করিয়া চন্দ্রবাবু চলিয়া গেলেন।

দিন পাঁচ সাত সত্যি তিনি, আর দেখা দিলেন না,

তাগর হঠাৎ একদিন মোহিনীমোহনের দ্বারপ্রান্তে

আসিয়া ডাক দিলেন—দাছ।

পাঁচ

নিজের সঙ্গ হইতে পুনঃ পুনঃ বিচ্ছিন্ন হওয়ার চন্দ্রবাবু

যেন অনেকটা অসন্তি অশ্রদ্ধ করিতে লাগিলেন—মায়ার



হাত হইতে তাঁহাকে মুক্ত হইতেই হইবে, তাহা না হইলে, হরিণ হইয়া ভরত মূনির মত কি তাহাকেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।।।

এবার তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—বাহা হইবার তাহা হইয়াছে, ওপরেই আর তিনি চলিবেন না, কে খোকা?—কেন?।।।

সেইদিনই তিনি ঋষ্যচর্য্যায় মনোযোগ বিলেন।

বাড়ীর পাশেই ছিল শিশোমণি হাশমের টোল, সকাশ-সন্ধ্যায় সেইখানেই গিয়া তিনি তরু-কণার আলোচনা করিতে লাগিলেন—ঐক-মতের বিশিষ্টাঙ্কিত, মায়্যাবাদ প্রভৃতির কোনও বিষয়ই বাদ থাকিত না, কিন্তু বাটীতে কিরিয়াই তাহার সব সোণামাল হইয়া বাইত।।।

নিমস-স্বীকৃত, জী-পুত্র 'কেহই নাই।।।' জী গত হইয়াছেন।।। তৃত্য ও পাচক তাহার বাড়ীখানার মধ্যে একবার অবলম্বন।।। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় যতটা সময় কাটে—

অলস গ্রিহমের শ্রীমদাগবতের পাতায় চক্ষু ছুইটা মেলিয়া তিনি আনন্দনা ভাবে কি ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ তখনই পাইলেন ধারণ্য হইতে খোকা ডাকিতেছে—দাছ!।।।

সেই অবস্থায় তিনি বলিয়া উঠিলেন—এসছি, আর ভাই আর!।।।

ভূতা বলিল—কাকে ডাকছেন, কে?।।।

অপ্রতিভের জায় চম্ভাবু বলিলেন—কেউ নয়? আমাকে কেন ডাকিলে তুমি?

সেইদিনই তিনি 'মোহিনীমোহনের ধারণা' আসিয়া ডাকিলেন—দাছ!।।।

মোহিনী তখন অক্ষিমে।

অবগুণে মুখ আবৃত করিয়া মোহিনীসংগৃহের দ্বী খোকা'কে কোলে লইয়া সররের বর গুলিয়া দিতেই—চম্ভাবু পরিপূর্ণ আনন্দে ডাকিলেন—দাছ!।।।

খোকা ছুটিয়া তাহার কোলে আসিল।।।

ছইঙ্গের মধ্যে কত কথা, কত হাসি, কত খেলা চলিল।।।

খোকা বলিল—খোকা চল।।। চম্ভাবু তখনই ঘোঁড়া হইলেন, আর খোকা তাহার পিঠের উপর চাপিয়া বসিল।

তাহাকে সওয়ার করিয়া চম্ভাবু ঘরখানার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।।। বৃক্ষপকট হইতে বড়িটা কুলিয়া পড়িয়াছে।

গড়ি সেইসময়েই মোহিনী অক্ষি হইতে কিরিয়া আসিয়া যুদ্ধের এই অশ্রুত ব্যবহার দেখিয়া প্রথমটা নীরব হইয়া গেল, তাহার পর লজ্জিতভাবে বলিল—এ কি করছেন আপনি?

সহাস্ত্রযুগে চম্ভাবু বলিলেন—যাচার রাস কাটাছি মোহিনীবাণ, একরাস শাস-এখ কিনিছি কিনা!।।।

মোহিনীমোহন তাড়াতাড়ি খোকাকে তাহার পৃষ্ঠ-দেশ হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল—ক'নি যে ওর কি ভাবে কেটেছে তা আর আপনাকে কি বলব?।।। কেবলই—আপনাকে চায়। রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ডাকে—দাছ!।।।

গুস্তারভাবে চম্ভাবু বলিলেন—ডাকবেই তো, ডাকি তো স্বাভাবিক! ও আপনার আমার মত ত আর নেমক-হারাম হ'তে শেখে নি।।। কি বলিস রে ভাই! এঁা।।। বলিয়াই খোকাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন।

### চয়

অক্ষি হইতে কিরিবার পথে মোহিনীমোহন দেখিল, একখানা দ্বিগত বাটীর বারান্দার দিকে অশ্লকলমেজে চাহিয়া চম্ভাবু 'ল-ব-মো-ন-ত-তৌ' অবস্থায় দাঁড়াইয়া বহিয়াছেন, আর বারান্দার উপর হইতে কতকগুলি ছোট ছোট ছেনে-মেরে টিংকার করিতেছে—দাছ—ও দাছ!।।।

ডাক শুনিয়া চম্ভাবু সৈলিক অগ্রসরও হইতে পারিতেছেন না বা সেখান হইতে চলিয়াও আসিতে পারিতেছেন না—যেন আর কাহারও অধীর আশ্বাসের জন্ত লানারিত হইয়াই অতি আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন।।। অথচ সে আশ্বাস অনেকগুলি পর্য্যন্ত তাহার কানে আসিয়া না পৌঁছাতে তিনি ক্ষুধিত-বৃষ্টিতে ছেলগুলিকে দেখিতে লাগিলেন।।।

মোহিনীমোহন ডাকিল—চম্ভাবু!।।।

মেক্ষিত হইয়া চম্ভাবু তাহার দিকে কিরিয়া চাহিলেন।।।

মোহিনীমোহন জিজ্ঞাসা করিল—এখানে দাঁড়িয়ে?

বিবাহহাতে চম্ভাবু ছেলগুলিকে দেখাইয়া বলিলেন—

তখনই পাইলেন না ডাক—দাছ! দাছ!।।। চলুন খোকাকে দেখে আসি।।।

ছইঙ্গেনই পথ চলিতে লাগিলেন; কিন্তু চম্ভাবুর পা-ছুইটা যেন চলতে চাহিতেছিল না—অন্তরের উৎসাহও যেন অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল।।।

মোহিনীমোহন বলিলেন—জগতের সব ছেলগুলির সঙ্গেই দেখছি আপনাবা ঐ সম্পর্ক।।।

চম্ভাবু বলিলেন—কিন্তু বাড়ীর মালিক কি রকম নেমক-হারাম, কি রকম দাগাবাজ দেখলেন তো? ছেলেরা জগৎ জগৎ দাছ বলে!।।। মালিক জানালায় ভেতরের দিকে একবার আঁচকে দেখলে, অথচ ডাকলেও না একটা বার বা ছেলেরাও একবার কাছে আসতে দিলে না!।।। অথচ আমিও যেমন ঐ ডাক শোনবার জন্তে পাগল; ওরাও কাছে আসবার জন্তে তেমনই অধীর।।। একটু দাঁড়ান মোহিনীবাণ! ছেলেরাও এখনও ডাকছে—আর একবার ত'দিকে দেখে আসি।

মোহিনীমোহন সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন চম্ভাবু কিরিয়া গেলেন; কিন্তু পথে কিরিয়া আসিয়া বলিলেন—না মোহিনীবাণ!।।। তারা ভেতরে চলে গেছে।।।

ছইঙ্গেনই পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন।।।

তারপর মোহিনীমোহনের বাড়ীতে আসিয়া ডাঙিলেন—দাছ!।।।

খোকা দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার বুকে উঠিতেই চম্ভাবুর ছই চোখ দিয়া খর খর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।।। যেন কতকালের সঞ্চিত জ্বল জ্বল হইয়া তাহার চক্ষু দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।।।

মোহিনীমোহন জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'বে এবার?।।।

—না কিছুনা আপনি কাপড় ছেড়ে মূখ-হাত মুখে আব্বুন।

চম্ভাবু খোকাকে লইয়া মাঠের উপর বেড়াইতে লাগিলেন।

### সাত

ইহার পর প্রায় একরাস গত হইয়াছে।।।

এই সময়ের মধ্যে চম্ভাবুর কানও সংবাদই মোহিনীমোহন না পাইয়া, বিস্মিতও যেমন হইয়া পড়িল,

চিন্তিতও তাহা অপেক্ষা কিছু কম হইল না, যে লোক খোকাকে দেখিতে প্রত্যহ অন্তত একবার, কোনও কোনও দিন দুইবারও আসেন, আজ এতদিন তিনি নীরব থাকিলেন কি করিয়া?।।। শরীরের কোনরূপ—

তাহার চিন্তার বাধা দিয়া খোকা ডাকিল—বাবা!—দাছ!।।।

আজ ক'দিনই সে দাছর জন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।।। কিন্তু তাহার ত কোন স্বদানই নাই, টিকানাও জানে না যে খোকাকে লইয়া তাহার নিকট বাইবে।।।

খোকা পুনরায় ডাকিল—দাছ!।।।

জ্বলাইবার জন্ত মোহিনীমোহন তাহাকে কোলে লইয়া বলিল—চল তোর দাছর কাছে যাই।

মোহিনীমোহন বাটীর বাহির হইতেই একটা লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার নাম মোহিনীবাণ?

মোহিনী বলিল—হ্যাঁ, কি দরকার?।।।

লোকটি বলিল—সে চম্ভাবুর ভৃত্য, আশ্র মাসাদিক তাহার অর—বাটীর আশা নাই। খোকাকে এবং মোহিনীবাণকে লইয়া বাইবার জন্ত তিনি তাহাকে পাঠাইয়া গিয়াছেন।

শুনিয়া মোহিনীমোহন আর হির থাকিতে পারিলনা—খোকাকে লইয়া—ভৃত্যের সহিতই চম্ভাবুকে দেখিবার জন্ত বাহির হইয়া পড়িল।।।

চম্ভাবুর শরীর পুষ্যার সহিত বিশিষ্টা গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া আর চিনিবার উপায় ছিল না।।। মোহিনীমোহনও হয়ত চিনিতে পারিত না কিন্তু তাহারিগকে আসিতে দেখিয়া কাঁপকটে চম্ভাবু বধন ডাকিলেন—দাছ!।।। শৌহিনীমোহনের চক্ষের জল আর বাধা মানিল না।

মলিনহাটে 'চম্ভাবু, পুনরায় ডাকিলেন—দাছ! খোকা তাহার পাশে বসিয়া—অতি বড় দরদীর মত তাহার মাথায় হাত দিয়া ডাকিল—দাছ!।।।

চম্ভাবু বলিলেন—আ: ভাইরে—তোর এই সেবা-টুকুর অপেক্ষায়ই বোধহয় এখনও বেঁচে আছি। আর একটু অমনি করে মাথায় হাত দিয়ে থাক ভাই!







আবার শুধু ঈশ্বরের পথ দেখাইয়া দিব কিরূপে।—  
“অন্ধনৈব নীরমানা যশাক”

বিষয়ক কলিকাতার অসিয়া একজন বন্ধুই  
কোন ভুলোকে “বাসাথ থাকিলেন। বিষয়ক  
লিখিয়াছেন যে, “এই ভুলোকেটা হুয়াপান-সংসার  
সভা-পতি। এখন বাঁহাদিককে বড় ব্রাহ্ম বলিয়া  
যেহেতু, সেইসময়ে তাঁহাদিককে উদ্বাহপূর্ণ করিয়া  
হুয়া দেবন করিতে বেঁধিয়াছি। তাঁহারা আমাকে  
হুয়াপান করিবার অস্ত্র বিশেষ চেষ্টা করিতেন, আমি  
প্রাচীন সংসারের বশবর্তী হইয়া তাঁহাদিককে তিরস্কার-  
পূর্বক হুয়ার নিন্দা করিতাম। আমি অষ্টমৎশকাতে  
গোখামি; আমি হুয়াপান করিলে অথবা অস্ত্র কোন  
পাণ্ডাভাষ্য করিলে আমার “নিখল পিতৃহত বলম্বিত  
হইবে, কেবল এই সংসারে অনেক সময় আমাকে কুপস  
নরকে হইতে রক্ষা করিয়াছে। সেই অর্থাৎ তাঁহারা  
আমাকে গোপন করিয়া হুয়াপান করিতেন। হুয়াপান-  
নিবারণ বিষয়ক হিম্মতের শাসন অতি চমৎকার!  
ইংরেজী ভাষা শিক্ষা এবং ইংরেজদিগের সহবাস, খুঁটান-  
খুঁটান-প্রাচুর্য্য, বিলাসী সভ্যতার বাহিরের আকর্ষণ,  
এইসকল কারণে হুয়াপান অধিক প্রচলিত হইয়াছে।  
পূর্বকাল কাশ্মীরের একতরফ সাহায্য না পাওয়াতে  
যেহ পাঁচাল্লেরে অসভ্য হইয়া হুয়াপাদীদিগকে বিলম্ব-  
রূপে গান্ধিবধ করিতাম। এখন আমি অসভ্য না  
থাকিলে নিশ্চয়ই প্রধান প্রধান কোকের ছাত্র হুয়াপাদী  
হইতাম, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।” বিলাসী-  
সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাভবেরে বিশেষরূপে আমাদের  
ইচ্ছাতে এবং বিষয়ককে বার বার জেনে-কালে বিলাসী-  
সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কলিকাতার হুয়াপান না করিলে  
নিশ্চিত বাঙালী সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইত না।

নবখনিয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব প্রব্রিহাইলাল  
সেন মহাশয় তাঁহার প্রবৃত্তি “কীয়েম ব্রহ্মসঙ্গী” বীকায়  
পুস্তকে ২ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, “তখন (১৮৭৯ খৃঃ)  
ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য এবং ব্রাহ্মদের মধ্যে মতপন  
প্রভৃতি বিষয়ে অতি শিথিল ভাব ছিল; এমন কি কোন  
ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য মতপন করিয়া উপাসনা আরম্ভ

করিলে মন্দের দেশান্তে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে  
দ্বাধরি করিয়া বাড়ীতে পৌছান হইল।”—কেশবচন্দ্রের  
নেতৃত্বাধীনে বিষয়ককে প্রভৃতি প্রচারবদের দ্বারা এই  
মোঘ পরে ব্রহ্মসঙ্গী হইতে প্রতীকৃত হইয়াছিল।

বগুড়া ব্রাহ্ম বন্ধুরা বিষয়ককে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে  
বাংবাব অমৃতোপ করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহারা  
বিষয়ককে স্বরূপে উদ্ভিত হইল। তখন প্রভি  
বুবার ব্রাহ্ম-সমাজের আবেশন হইল। বিষয়ককে  
বলেন, “ব্রাহ্মসমাজ দেখিবার পূর্বে আমার সংসার ছিল  
যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেমন তবলা বাজাইয়া গান করে,  
বেদ পাঠ করে, অবশেষে হুয়াপান ও মাংস ভোজন  
করে। ব্রাহ্মসমাজ সংঘে কতদূর অজ্ঞতা থাকিতে পারে,  
তাঁহা আমি বিলম্ব অহুভব করিয়াছি।—মাংসভোজ  
পদ্ধতি হইলে ব্রাহ্ম-সমাজে গমন করিলাম। সমাজের  
কালোকালা, তালমানসংস্কৃত মনুষ্য সঙ্গীত, ভক্তিভাবে  
স্তোত্রপাঠ, বহুমাধ্যম পোষকের গভীরতা, এই সকল  
দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আমি ব্রাহ্ম-সমাজকে স্বর্গধাম বলিয়া  
স্বপ্নদ্রব করিতে লাগিলাম। আমার পূর্বের সংসার  
ভিত্তিক হইল। পরে ভক্তিভাষ্য বাবু দেবেন্দ্রনাথ  
তাঁহা স্বর্গধামে বস্তুত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুর  
দুর্দশা—ঈশ্বরের বিশেষ কল্পনা এই বস্তুত শ্রবণ করিয়া  
আমার পূর্বকার ভক্তিভাষ্য দ্বিতীয় উদ্ভিত হইল,  
এতদিন যে ঈষ্টদেবতার পূজা করি নাই তৎসং প্রাণ  
আত্ম হইয় উঠিল, সমস্ত শরীর গাৎস্বর্গ কপিত হইতে  
লাগিল, অক্ষয়ল জয় ভাসিতে লাগিল, চুর্চুর্চ শূন্য  
বেধিয়া অন্তরে দ্বন্দ্বের নিষ্কট এই প্রার্থনা করিলাম  
যে, ‘দেয়াম ঈশ্বর! প্রাচীন হিম্মতেরে আমার বিশ্বাস হয়  
না, অস্ত্র কোন ধর্মের আমার বিশ্বাস নাই। ধর্ম সংঘে  
আমার ভ্রাতৃ ভাগ্য বোধহয় পৃথিবীতে আর কেহ  
নাই। যখন পৌত্তলিক-ধর্ম বিশ্বাস ছিল, তখন ঈষ্ট-  
দেবতার পূজা করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতাম,  
এখন তাঁহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। এইমত চলিলাম  
তুমি আমারে নাথ, প্রভো! আমি তোমার পরমপায়  
হইলাম, তুমি আমাকে রাখ, আর আমি কোথাও মাইব  
না, তোমার দ্বারে পড়িয়া রহিলাম।” (কমণ্ডা)

ফুল

(গল্প)

[ মূল কাহীন হইতে অন্তর্ভুক্ত ]

উত্তর ত্রীশত শতাব্দী

শীতের সন্ধ্যায় বরফ ঢাকা মাঠের উপর পায়েচী  
করে বাড়ী ফিরেছি। চারিদিক নিরন্তর মৌন  
গাছগাছের ভাঙে গিয়েছে। আমার মনের মধ্যে কত  
নিবিড় নিপন্যস্ততার সুখের হ'লে উঠেছে। অস্ত্রে অস্ত্রে  
অন্ধকার তার কাল সাড়ী শ'রে নেমে এল। আমার  
পড়ার ঘরে লাগে ভেলে, একটা চুপ্ত সুখে দিয়ে এই যাত্র  
বসেছি। টেবিলের উপর থানকতক বই এলোমেলো  
হয়ে পড়ে আছে। এই রাত্রির মৌন আনন্দ আমাকে  
কোন এক আত্মীয় জগতে এনে আমার সকল ব্যথা  
অপেক্ষের তরে দ্বিগুণ প্রলেপে ঢেকে দিয়েছে—বলো একটু  
বন্ধুত্বাৎ বোধ হতো।...আবার সেই চির-অস্থির চিন্তার  
টেউ মনের অন্তরতম প্রদেশে কানিয়ে ফুল...সেই একই  
কথা বার বার কানে আনছে—‘তোমার জগতের সব আলো  
যেনি দিয়েছে’।

কতদিন হ'লে সে চলে গিয়েছে। কতবার প্রসারিত  
হোটেলের মত ভেবেছি, সে মরণের ভাগ হ'ত, এ যে  
মরার চেয়ে নিশ্চয়! না-মরার চেয়ে নিশ্চয়ই না, সে তো সভ্য  
বাসিনের হাসিকারি-ভরা জগৎ ছেড়ে গিয়েছে। সে এখন  
চাঁদার নীচে, গভীর অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে আছে। কতবার  
দিলের পিঠা, ‘রাতের অন্ধকার এল’, ‘গেল’, কত গ্রীষ্ম  
বর্ষা শীত বসন্ত তাহার উপরে মাটা মাড়িয়ে গেল’, সে  
তো আর এল না—তার অভাব কি আমার বেদনা-জড়িত  
করেছিল? বেদনা? না, এ তো বেদনা নয়! মাছের কথা  
তাঁহার বোৎসর্ক-প্রকাশ করে। আমার ভিতরের আমি  
কেমন এক নিঃসঙ্গতার অধ্যাক্ত ভরে মুচ হইতে পড়েছে। সে  
চলে গিয়েছে তার অশরীরী অবস্থান কি এক অনন্ত  
জগতের হাসি-কারার শব্দে আমাকে অস্থির করে তুলেছে—  
তার অশুভ চকুর তীব্র দৃষ্টি আমাকে অসমর্থিত পদ্য পূর্ণ  
করে তুলেছে।

বেদন তাহার ছলনা আমি জানতে পেরেছিলাম  
সেইদিনের কথা মনে হ'চ্ছে; হঠাৎ আমার চারিদিকে  
কোন অস্বাভাব্য অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। তখন  
বেদনাহীন জগতের চাক্ষুষ আমার বেদনা অতি ভীত  
হ'লে উঠেছিল—হিংস্র স্থানীয় দীপ্ত অহিন্দা নিরন্তর  
নিষ্ঠুর পরিহাসের নির্দয় জ্বালাতে আমার জগৎ রিক্ত,  
জর্জরিত। ক্রমে ক্রমে বেদনার যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল, এমন  
সময় স্তন্যনাথ সেও যন্ত্রণা-বিহীন—আমার বর্ধিত জন্মে কি  
ভুলি, কি শাসনের অবসাদে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হ'য়ে  
গেছে সেই হোটেল চিঠিখানির মূলের গন্ধে এখনও! আমার  
মানস-সাক্ষ্য ভরপুর। সে চিঠি এখনও আমার কাছে  
আছে!...আজ এই শীতের রাত্রির অন্ধকারে, আমার  
জানালার বাহিরে এসে সে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে দূরে  
গিঁধের শেষে, তারার ছটার নীলাশ্বরী-গোষ্ঠিত দেখেছি। সে  
থিঁথি আমার চেয়ারের পাশে এসে কতবার দাঁড়িয়েছে।  
তেমনি জীবন্ত হাসিভরা মুখে কতবার যেন চেয়ারে ভাষার  
ব'লেছে—‘আমি যাই নাই, আমি তোমারই কাছে’...  
তখন হৃৎস্পর্শিতের মত চমকে উঠছি।

...যখন তার শেখবার দেখি সে তখন তার  
হেলেনেলোর মতই সরল স্বচ্ছ চোখের চাহনিতে আমার  
‘দিকে চেয়েছিল’ আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিই  
নি—সে ‘চ’লে গেল, শেখবার ‘চ’লে গেল!—সেবারার  
রাষ্টার কোণে সে নিশিয়ে গেল—সে আর আসবে না।

আমি ঘটনাক্রমে জেনেছিলাম সে আর আসবে না।  
প্রথম সে জেনেছিল। হয় তো সপ্তাহ কতক, জোর মাস  
কতক পরে সে আমার ফিরবে। হঠাৎ এক বছর পরে  
তার এক আত্মীয়ের সেখা পাই, তিনি কখন কখন  
ভিজেনায় আসতেন। পূর্বে ছ’ একবার তাঁর সঙ্গে  
আমার কথাবার্তা হইত। একবার এক কল-নায়ে,



র বিহে তার বখন তার দাঁর সঙ্গে আসে তখন সেই  
অস্বাভীতি এসেছিলেন। তার পাশ আশি একবার  
হু' একজন বন্ধকে নিয়ে প্রাচীরে শাব্দী হোটেল ছিল,  
সেইখানে সেই বোকটাকে বারি ভিনজনের সঙ্গে খাওয়ার  
টেবিলে বসে থাকতে দেখি। তিনি আমাকে ডেকে  
একধারে নিয়ে গিয়ে বলেন "আমার ভাইবির যে তোয়ার  
জন্ত পাগল।" সেই বীধাবেনুখরিত হোটেলের ঘরটি  
বেন এক অপার্থিব আদোতে ভ'রে থে। আমি বেন  
বুদ্ধকে মধুরে সকল আকাঙ্ক্ষার, সকল দোঁচাওয়ার  
পূর্বতাব্যঙ্গক মনস্কুর্জিত দেখলাম। তখন বেন তাঁর  
নিঃখাম-প্রথমে আনন্দের চেঁ বইছে তার এখন—  
আজ প্রভাতে। আমি তাঁর পাশ কাটির হ'লে  
বাছি, বেন সময় সোজস্তের খাতিরে—বিশেষ কোন  
ওংস্করকের জন্ত নয়—তঁকে তাঁর ভাইবির কথা  
জিজ্ঞাসা করলাম। আমি তার খবর অনেক দিন পাই  
নি, চিঠি আসা অনেককাল বন্ধ হ'য়ে গেছে, শুধু  
আমাদের মিলনে ব্যতন্ত্রণে মাসে মাসে তাঁর কাছ থেকে  
হুল আসত—কেবল দুলের শব্দইনা কোবল করণ ভাষা  
তার খবর এনে দিত। বুদ্ধকে তাঁহার ভাইবির কথা  
জিজ্ঞাসা করতই তিনি চমক উঠেন, বলেন, "জান না  
সে যে হস্তাখানেক হ'ল এ ভগ্নৎ ছেড়ে গিয়েছে।" আমি  
মহব্দন বাতায় চাঁৎকার করে উঠলাম। তখন তিনি  
আর কিছুই বলেন নি; সে অনেক দিন রোগ-বরণা  
ভোগ করে, কিন্তু আটদিনও শয্যাপারী হয় নাই—তার  
রোগ প্রধানতঃ মানসিক—শারীরিকের মধ্যে রক্তাভার।  
ভাক্তারের দিক কিছুই বখতে পারে নি।

বৃদ্ধ আশাকে দেখানো পাড়াতে দেখেছিলেন সেখানে  
আমি আর বেশীকণ পাড়াই নি—আমার বদ-শক্তি দ্বারা  
নিশেষ হ'য়ে গিয়েছিল। কি এক বিরাট পাহাড় আমি  
বেন কাঁধে ব'হে এনেছি। তথাপি আমি আজ সে পুরান  
মাঘব নই। আমার জীবনের একটা পরিচ্ছেদ শেষ  
হয়েছে। কেন?.....কেন? আমি যে একেবারে  
তার কাছ থেকে দূরে চলে গেছি। জগতের সঙ্গে  
বাহিরের সংস্ক চুক পেয়েছি। তাই আমার পড়ার ঘরটার  
কোঠাও দিক দিয়েছে—হাসিকাগার সীমা ছাড়িয়ে আশ-

নিরাশার অতীত অনন্তে এসে পড়েছি। এখন কেবলই মনে হচ্ছে ‘ফুলের বার নাহিক’ আর ‘ফসল বার ফলো না’ তাকে আর মরল-অমরলের খবর নিতে হয় না—এ কি অনাবিল শান্তি—এ কি চিরনির্ভাব……আজ চোখের জল ফেলতে সতি হাসি পায়।

শীতের দিনে খানিকটা বাহিরে ঘুরে বাড়ী ফিরিলে। আকাশ তার মান-মুদ্রার দ্বিগুণ বিস্তৃত বিরাট শরীর নিয়ে শীতে কাঁপছে—আর আমি শান্ত, মৌন, শিশল। সে যুদ্ধের সঙ্গে কাল বেধা হয়েছিল, তিনি আবার পুরাতন স্মৃতিতে আবার মান-মুদ্রার সমুদ্রে এসেছেন। আমি প্রেটেন্সকেও বেশ স্পষ্ট দেখি, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাল নিকরে সোনার রেখার মত মুটে উঠেছে—টীক আগের মতই তাকে দেখি—তবে একটু তকণা আছে। আজ আর তার কৃতি কোন বিরক্তি, কোন অধিত্যক নিয়ে আসে না। সে যে মানুষের জগৎ হেড়ে দিয়েছে, নির্জনে অন্ধকার বাটার ঈষদ একটা ছোট বিমানও শুনে আছে—একথা কিন্তু মনেই হয় না। আজ আমার বিচ্ছেদ-কেশ-বোধ নাই—বিশ্বগ্রাসী নীরবতা আমার চারিদিকে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আনন্দ-বিরানন্দ এরা কিছুই নয়—এরা তো শুধু আলোক-বিচ্যেদের ব্যঙ্গ হাসিতে ভরা। আমরা নির্বন্ধ হাসিকায়ার অন্তরে শূন্যতা ভরেছে তুলি। আমি এখন গভীর অর্পণবিৎ বৈয়াকন। ভবিষ্যে তার সংগ্রহ করতে পূর্ণাঙ্গী বৈয়াকন ছবিগুলি মাঝে নির্বন্ধ হ'বে। পড়েছিল আমার তাঁদের তিমির-গুহ সৌন্দর্যে আমার সমুদ্রে ধাঁড়ায়। মরণের পরপারে আমার কত পরিচিত প্রিয়জন চ'লে গিয়েছে, আর আর সে চিত্তা

• আমাকে বেদনাক্রিষ্ট করি না। যত্না অর্থহীন—তা'কে ভাল-মন্দ বিশেষণে অতিবর্তিত করি না। সে নিরুপেক্ষ—নিষ্কর মাটেই এল। ১০০৮

পথ দাঁট বরফে আচ্ছন্ন। বরফের আচ্ছাদন দিন দিন  
 পুরু হ'য়ে চলেছে। একটা ভাবনা ক'দিন থেকে কেবলই  
 মনে আসছে। একদিন আমিও এই বরফের আন্তরঙ্গের নীচে  
 শুয়ে পড়বো। তখন ঘরের মধ্যে আগুনের ঠোঁড়ের চার  
 ধারে কত হাঙ্গ, কোলাহল চ'লেবে, আর আমি—আমি  
 আবার নিমস্র, নিপল্স অগতঃ চির-অন্ধকারে—জীবনের সকল

इःखु-सप्लं दुःलं अनस्त निद्राय - मग्न—'निर्वांत निरूप्यमिव प्रदीपः' ।—

কখন গ্রেটেল এসে পাঁড়িয়েছে জানি না। সে বললে—“আজ আমি বরফের মধ্যে তোমার ডাঙা পেয়েছি, তোমার সকল আশা সকল আশো আবার ফিরিয়ে এনেছি। জগত কিছুই একেব র ধ্বংস হয় না। তোমার যে আশা, নিরাশা, সফলতা, বিফলতা একবার মুঠ হ’য়েছে— তার কি আবার চলে যায়? আমার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার তোমার কাছে এসেছে”—সে যেন অপরাধের শাস্তিতে তুমার সকল বন্ধন ছিন্ন ক’রে দিলে।

আজ নির্দিষ্ট রাতে অর্ধরাত্র্যের অবসর। একটা অল্প  
 চিন্তা মনে এল। আমি যেন আমার দেহ থেকে বাহিরে  
 এসেছি—আমার ভিতরের মানুষটা স্বরূপে দেখা দিয়েছে।  
 সোনার্ক, নির্মম; সে আপনার চিরপ্রিয়কে চিরনিজার  
 শরণে দেখেও এক কোঁটা চোয়ের জল ফেলে না।  
 একবারও মৃত্যুর বজ্রকটোর উগ্রমুখি দেখেও শিউরে উঠল না।  
 সত্যই নির্দিষ্ট পেরেছে আমার অন্তরের কোমলতা কে যেন  
 নিঃশেষে বাহির কর দিয়েছে।

অতীত অতীতে বিশেষ গিয়েছে। জীবনের নব-  
উজ্জ্বল, নব চাকলা আবার চারিদিক পূর্ণ হয়ে উঠেছে।  
আবার আমি মানুষের দলে এসেছি। আমার সকল  
অবেষ্টন উজ্জ্বল-হিলোলে তরঙ্গাধিত। এমন সময় গোটেল  
তার কদম-দুগুটিতে সজল নাখন আমার দিকে চাইলে। সে  
তখন অনির্লভনীয়, মৌল্যে মণ্ডিত। শত স্বর্গের কিরণছটায়  
তার মুখগুণ উজ্জ্বলিত। অঙ্গ নিরাকরণ; সে এসেছিল  
‘শুধু চাশে জড়ায় বনমূল’। মর্ত্যগগন ছায়াব নতন  
মিলিয়ে গেল। সেই অনন্ত নারী, আবার আমাকে উজ্জ্বল  
নিয়ে চলল।

আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। আজ মাসের প্রথম দিন। এই দিনেতেই প্রায় ষ্টোরে আমাদের ফুল পাঠিয়ে দিত।

আজ্ঞাও ফুল এনে হাজির। সকালে পৌষ্টম্যান একটা কাগজের বাস্ক নিয়ে গেল। সেই বাস্কটোতেই ফুলগুলি এসেছে—যেন চিরন্তন প্রাণের কোন পরিবর্তন হয় নাই। আমি তন্মালস ছিলাম, তখনও ঘুমের ঘোর কাটে নি।

বাক্সটা খুলতেই ফুলের গন্ধে ঘর ভরে গেল, অমিও বেশ  
সজাগ হয়ে উঠলাম।

...তখন চমকে দেখি সোণালি রংএর কিতা দিয়া একটা পিংকু ও ভাগশেই ফুলের গুচ্ছ...কে যেন তাদের একটা কার্ডবোর্ডের শাব্যাবণে শমন করিয়ে দিয়েছে। ফুলগুলি হাতে করতেই আমার সকল দয়দয় করণ সরস হ'য়ে উঠল। আমি বুঝিলাম আজ দেই পুষ্পগুচ্ছ কোন এনেছে। প্রোটেলে তাহার বৃহুশাব্যায় আনাকে ভুলে নাই। বা'তে রিক নিমিত্ত আমার কাছ থেকে তাহার ফুলের উপহার পোঁছায়, তার বান্দাবণ সে করে গেছে। আজিকার কোমল-রকণ ফুলের সন্তানবণ আমি আজ্ঞদ হ'য়ে প'ড়েছি।

—আজকের পুষ্প-দুহ সাধনা বহন কর'বে এসেছে।  
সব যেন আমারকের মতই আছে। কিন্তু মূলগুলি হাতে  
নিয়েই বোধ হ'ল তাদের নির্মাক্সা আলাপের ছন্দে ছন্দে  
মুড়ার বিবোধ-করণ কন্দনের হুহ বহন করেছে—যরপাশুখ,  
জুতার বোতের কাছে তাহার স্বাক্ষর শেষ নিবেদন পাঠিয়েছে  
—হায় আমার মরক-কি—তাহা শ্রুতি না অথচ প্রিয়জন,  
বিরোধজননি শ্রুতা পূর্ণ কর'বে আছে মুহূর্ত! আজ এই  
মূলগুলির স্পর্শে আমার চিত্তাধারা অম্পদে বইতে লাগল,  
বোধ হ'তে লাগল এই মূলগুলি আমারদেই মত সজীব,  
একই জোরে চেপে গেলেন আজ বেন্দনারিষ্ট হ'য়ে অশ্রুত  
করাই হুহ সফল প্রণালি অধীর কর'বে দুলবে, আমার  
পড়ার টেবিলের উপর মূলের তোড়াতী রেখে গিলাম, আমার  
বিবার-করণ হাসিতে যেন আমাকে দম্ভাব দিল। কোন  
অতীতের অনন্ত-করণ বিচ্ছেদ-বেদনা আমার হৃদয়ের অন্তর-  
তম প্রদেশে প্রবেশ কর'বেছে। আমার বোধ হ'তে এই  
মূলের ভাষা আমি বৃকতে পারিলে তারা হ'লে কোন  
শেষ বিকল্পের মর্মস্পর্শ! আলান আমার কার পাঁচে হিবে।  
বাক আর অর্থ-তাবল বকবোনা, এগুলি ত মূল ছাড়'  
আর কিছুই নয়। এরা শুধু জীবনের পরমার থেকে  
অমৃতের ধারা এনেছে—এরা মুড়ার বাগি নয়, মুড়ার  
আলান নয়। যে কোন মূলওলাগীর কাছে এমন একটা  
মূলের তোড় কিনে বাকে ইচ্ছা। পাঠান যার।  
তাই যদি হুহ তাহ'লে এ মূলের তোড়াতীরা পাঠিয়েছে  
ফেলো রাখিলেই তো পারি।



আর্থিক আদি কৌশল নিৰ্দ্ধান পথে পাৰাচাৰি ক'হেই  
কাটাই, মাথুৰে কোণালহলৰ শ্বৰেৰে সৰ্জে আমাৰ  
অন্তৰেৰে স্বৰ বিলাতে পাৰি না-আমাৰ দ্বাৰ-ততী কেনে  
বেহুলা বেলে উঠে শতাব্দি হ'লে বা। গোটেই আমাৰ  
ঘৰে ব'সে কত কি ব'কে বায়-কি বলে তাহাৰ কোনেই  
অৰ্থ আমাৰ বোধ হয় না। বৰন সে চ'লে যায় মনে হয়  
অনন্ত মানব-সমূহৰে একটী ডেউ আমাৰ কাছ দিয়ে  
ক'ল গেল। সে আৰ না গলেও কোন অভাব বোধ  
কৰি না।

ফুলগুলি গর একটা ফুলানিতে রেখে দিয়েছি, সমস্ত ঘর তাদের ফুলকে ভরপুর—এক সপ্তাহের উপর ফুলগুলি রয়েছে, এখন দেখছি, প্রকৃতির নির্ঘ্ন কদম্পর্শে তারা চপ্পল হয়ে উঠেছে, তুচ্ছকি নাহলে। আমার খোলা হাতে সখী-নিজীবি সকলের সঙ্গে আলাপের ভাষা শিখবে। নরীকে—স্বগাণকে কত কথো জিজ্ঞাসার আছে, এই ফুলগুলিকেও তাদের গর প্রশ্নে ব্যাখ্যাস ক'রে বুঝবে। হয়তো কিছুদিন অঙ্গের ভাষা আমার কাছে অর্থহীন থাকবে, তারপর ষড়ের সঙ্গে আমার মেগামেগার একটা পদ্ধতি আশ্চর্যি হইবে।

উপলব্ধতার শীত শেষ হয়ে গেছে। বসন্তের বাতাসে  
আধারন বয়ে এসেছে। পুষ্কর নদই নির্মল বাহু,  
তথাপি বোধ হচ্ছে যে আমার জ্বলন্ত বৈদ্য একটু  
শিথিল হয়ে পড়েছে। অতীত জীবন কোথায় হারিয়ে  
গেছে, হৃদয়ই পুষ্কর নদীও তখন বোধ হোক যে  
কোন জীবনে গোঁড়ের শব্দে বেধা হয়েছিল কি না তাহা  
এখন অতিক্রম করে জানতে হয়—সেকি সত্যই মানুষের  
মন আমার কাছে ছিল না শুধু দু'দৃশ্যকৃত্তিই আমি  
তাকে দেখেছিলাম। কোন নদীর স্রুত পথের  
প্রান্তে তাকে দেখেছি—তারপর খনন সে কথা স্মৃতি  
হাস্তর কাছে আমি আমার সমস্ত জ্ঞানভূমি তেজস্বিত্ব  
গড়ে। তার কথার আভাষী স্মৃতি থেকে স্মৃতির হয়ে  
গড়ে, চারিদিকের বর্ণনায় উল্লস থেকে উল্লসের হয়ে  
ধাক্কা—গেটেলে তার সকল কমনীয়তা মণ্ডিত হয়ে  
আমার কাছে আসে—আবার আমি একটু, দাঁদী হয়ে  
পদ্মপঙ্খ। হৃদয়গুলি নদী হয়ে পড়েছে, নদীই তাদের

সব পাঁপড়ী ব'রে পড়বে। তাদের গুরুসন্তার বিশেষ  
হ'য়ে এসেছে। গোঁড়েল অনেকদিন তাদের দেখে নি, আজ  
যেন একবার অনেকক্ষণ ধ'রে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে,  
কি যেন অস্বাভাবিক ব'লবে বলে বোধ হ'ল, কিন্তু হঠাৎ  
কেমন ভীত হ'য়ে ত্রুণপরে সে চ'লে গেল।

ফলগুলি আরে কাতে শুখাচ্ছে। তাদের মুখ হাসি  
নবীন হয়ে এসেছে। মরশুর হিমশর্শে তাদের অধ-  
প্রভাত শীতল হয়ে উঠেছে, তার আসন্ন ঋণিময়  
শরীরে মাহুৎ কেমন অধোঃ, ভীত হয়ে ভরে জ্বলন্ত  
করবে। এই মধ্যাহ্নে ফলগুলির ককণ তন্দ্রামের  
আকুল আরাণ্য রেণুগুলির মর্ম্ম শর্শ করেছে, সে আশ  
এসেছে। এবার কিন্তু রেণুগুলির ধরণ বাধে নেছে, সে  
আর হাঙ্গো না, কবোও কহে না, কেবল ককণ জ্বলন্ত  
আবার দিকে তাকিয়ে থাকে—কি, নো আখকে জিজ্ঞাসা  
করবে। কেমন একটু অনিচ্ছা উদ্ভবে, ভয়ে আমি  
চঞ্চল হয়ে পড়ি। নাহে নাহে সে আবার পাশের চোয়ারে  
তার উল বোনার চুপড়িটা নিয়ে বসে—নিশ্চয়  
শোলাইয়ের কাজ করে। আখকে বই পড়তে দেখলে সে  
শোলাইয়ের কাজ বন্ধ করে কি একটা নো আখকে  
বোঝে চায়। আমি তখনই ল্যাপসে তপরকার রেশ-  
মের সেডটা সরিয়ে রাখি। উজ্জল দীপ্তিতে রেণুগুলির  
চোখ হুটী হাতে থাকে। তাগধর কনক যে অন্ধকার  
ঘরের তাকে ঘনিষ্ঠে এল বৃথিতে পারি নি, একি-  
ওঙ্কিত ককণে ঘনিষ্ঠে যে রেণুগুলি ঘরে নাই, কখন চলে  
গেছে জানতে পারি নি। আজ বাহ্য-সন্ধ্যায় আখা-  
ঘরের জানাণা খুলে দিয়েছি—দূরে রাস্তার ধারে শাশ-  
পোষ্টের নীচে রেণুগুলি বায়ী করে ধীরে আসে।  
একি আলো-হাচা-সম্পাতে একটা দৃষ্টভ্রম মাত্র।  
কখন হবে। রেণুতে তা আবার চারপায়ে বেড়িয়ে  
বেড়াচ্ছে। আঁধারঘরের আরাণ্যে সে আবার জীবন-  
বসন্ত জাগিয়ে তুলেছে। কে বলে মাহুৎ মরশুর অধ-  
প্রভাত চলে যায়। আমি জানাণার পর্দা নামিয়ে হুটীয়ে  
আলোকে তার থেকে তাড়িয়ে দেই, পর্দার অপর পাশে  
মুহুরের আলো কি ঘনিষ্ঠের নষ্ট হয়ে যায়? রেণুগুলি  
পাখির-জীবনের অবকীলা পড়ে গিয়েছে, তাই বলে সে

মনে নাই। অমর একটা কল্যাণ-জগৎ সৃষ্টি ক'রে সেই এই বসন্তের সন্ধ্যায় তারার আলোর গেটেল ডাহার চির-জগতে জন্মদাতার অভিনয় চিরকাল বেথি। তাই বোন অনন্ত নারীস্ব, অনির্বাণ মধ্য আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার জীবনের সকল প্রদীপ আবার জ্বলেছে—আমি অমরের সন্ধান পেয়েছি।

ଆସାତ

শ্রীমত্রেয়ী দেবী

সমস্ত সহিতে পারি যদি আসে নাথ  
তোমার চরণ হ'তে কঠিন আঘাত ;  
জীবন হারাতে পারি তোমার খেলায়,  
তবু মানুষের এই বিদারশালায়  
মরিতে পারি না প্রভু, যারা নাহি জানে  
সব জীবন ছোঁতে কিসের সন্ধান-  
তাই তাকে ছাড় করে । নদী দেখে সব  
বিচারের ছলে খেলে তোমার মানব ।  
ফাল্গুনের রাতে আসে উৎসারিত সুর  
চিৎ নীত-মুগ্ধরিত-বেদনা-বিধুর  
কণ্ঠে পরিমাণা যবে স্তম্ভক আকুল  
এই জীবন-পথ-প্রান্তে কত ঘটে ভুল ।  
দূর যাত্রা-পথ হ'তে আবাহন স্রাসে  
অনন্ত জীবন ছোঁতে অনন্ত আঁকবে  
এ সমস্ত লাভ কতি তুচ্ছ নির্দা যত

যে অঞ্চলে আছে বীধা সে দোলে সতত  
গগনে গগনে আর ঘন মেঘে মেঘে  
অবীর অস্থির ছোটে ছুরতু আবেগে ।  
যারা নীচে বসে থাকে তারা শুধু হায়-  
তাহারি একটি কথা দেখিবারে পায় ;  
তাই লয়ে ঘরে ঘরে নাহি পায় তল  
তল তর্কে বিরতি কবীন শৃঙ্খল ।  
নিরবধি অতি ক্ষুদ্র বিারের ঘরে  
শিশু সম অর্থহীন খেলা করে মরে ।  
তারা নাহি জানে প্রভু এ হৃদীর্ঘ পথে  
ছুটিতে ছুটিতে ধলা বারে অপ হাতে ।  
কুশি যবে বাণা দাও মদিত নয়নে  
ভাঁরা তারে অবিরাম শান্তি বলে মানে ।  
নাহি নাশে যেহেতু হ'বে তল উর্দ্ধে নাথ  
তোমার ক্রমেটে টানে তোমার আঘাত







বহুদারামানন্তঃ বেনোদ্যৈবান্না দ্বিতাঃ।  
অন্যদন্তঃ শক্বে বহুতৈবৈব শক্বে ॥ গীতা ৩৬  
“যে মন দ্বারা মন জয় করিয়াছে, মন তাহার আপনায়  
বদ্ধ, কিন্তু যে মন জয় করিতে পারে নাই, মন শক্ত ভায়া  
তাহার শক্ততা করে।” হস্তরাং সানানার পথে সিদ্ধিলাভ  
করিতে হইলে এক্ষণ শক্তিসম্পন্ন মনকে সংযত করিয়া  
আমাদের অভীক্ষিত বিষয়ে পরিচালিত করিতে হইবে।  
তাহা আমরা করিতে পারি; কারণ, বিশিষ্টদেব রামচন্দ্রকে  
বলিয়াছেন—

বৃত্তং সসম্যক্তামায়াং বৃদ্ধায়াং চিত্তজাভায়া।

তন্মানঃ প্রোচ্যতে রাম ধরোদেণাচারিকাকৃত।

মন সং ও অমং—এই দুইটির মধ্যে শোণায়মান,  
ইহাকে বৈদিক চাণিত্য করিবে, সেই দিকে যাইবে।  
ইহাকে আমাদের অভীক্ষিত দিকে চালিত করিলে, অগ্রে  
ইহাকে সংযত করিতে হইবে। কিন্তু ইহাকে সংযত করা  
স্বকঠিন, কারণ “চক্ৰং হি মনোবর্ধং বহু ধর্মো যথোক্ততঃ”  
—উক্ততা যেমন অধির ধর্ম, চক্ৰলতাও সেইরূপ মনের ধর্ম।  
ইহাকে সংযত করিবার উপায় সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ  
বলিয়াছেন—

আংগং মনঃবাহ্যো মনো গ্রহণং চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥ গীতা ৩৩

“মন যে চক্ৰল ও ইহার নিগ্রহ যে কঠিন, তাহার সংযত  
নাই, কিন্তু যে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ইহার  
নিগ্রহ হয়।” এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য মনোবৃত্তি-  
নিরোধেরও উপায়। আমরা যে মনকে স্থির ও সংযত  
করিতে পারি না, তাহার কারণ নানাবিধ মনোবৃত্তি সর্গসা  
মনোমধ্যে উদ্ভিত হইয়া মনকে বিচলিত করিতেছে। আবার  
আমরা মনোবৃত্তিকে যে নিরুদ্ধ করিতে পারি না, তাহার  
কারণ আমাদের মন আমাদের বশীভূত নয়। মন ও  
মনোবৃত্তি—ইহাদের উভয়কেই সংযত করিবার উপায়—  
অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

অভ্যাসের অসীম শক্তি। “অভ্যাসাং সর্গসিদ্ধিঃ স্থাং”

—অভ্যাস দ্বারা সর্গের নিরোধই সিদ্ধিলাভ করা যায়। এই  
যে নানাবিধ মনোবৃত্তি আমাদের অনিচ্ছা সংঘেও মনোমধ্যে  
নিহত উদ্ভিত হইতেছে, এই যে মন আমাদের অজ্ঞাতমারে

নিহত নানাবিধ বিষয়ে ভ্রমণ করিতেছে, ইহাও অভ্যাসের  
ফল। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আমরা নানা অবস্থানীয় মনো-  
বৃত্তিকে আমাদের মনোমধ্যে স্থান দিচ্ছি, মনকে বিষয়  
হইতে বিচলিতের ভ্রমণ বরিতে যাবিনতা দিচ্ছি,  
তাই এখন আমাদের অনিচ্ছাসংঘেও সেই সব মনোবৃত্তি  
মনোমধ্যে বাসধান স্থপতিভূত করিয়া মনকে সর্বদা বিচলিত  
করিতেছে, তাই মনও মর্কটের মত বিষয় হইতে বিষয়াধরে  
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বশীভূত হইতে চায় না। যদিও আমাদের  
অতীত জন্মে সেই মন ও দেহ ইহজন্মে নাই, কিন্তু বিখ্যাত  
এমনই অপূর্ণ বিধান যে, মানুষ প্রত্যেক জন্মে যে সব  
মনোবৃত্তির অমূল্যলন করে, স্মৃতির পর সেই সকল মনোবৃত্তি  
ও চিত্তার সংস্কার-বীজরূপে তাহার প্রত্যেক জন্মের সংস্কারী  
অভিভাবের (মানসিক) “ভূতপুঙ্গ” মধ্যে লীন থাকে।  
মটক-বীজ হইতে বটপুঙ্কেই জন্ম হয়—অতএব কোন জন্মের  
পরেই হইতে পারে না। কিন্তু সেই বৃক্ষের উৎপত্তির জন্ম  
উপযুক্ত কেবল বীজ বপন করিতে হয়, তারপর উপযুক্ত  
জল, বায়ু প্রভৃতি অমূল্য অবস্থার সাহায্যে তাহা হইতে  
অল্পর উপস্থাপন হয়, এবং সেই অল্পর জন্মে বৃক্ষ পরিণত হয়।  
সেইরূপ মানুষের পুনর্জন্ম গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে,  
যখন সে “দেহবীজঃ ভূত-পুঙ্গাঃ সংপারিষজঃ” —দেহ-বীজ  
ভূত-পুঙ্গ (১) সমুদ্বার্য পরিষজ হইয়া সর্গ হইতে  
ভূগোলের মধ্য দিয়া এই পৃথিবীতে অবতরণ করে, তখন  
সে এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে, এমন পিতার গর্ভে, এমন  
মাতার গর্ভে প্রেরিত হয়, ও তাহার দেহ-গঠনের জন্ম  
এমন সব উপাদান (factor) প্রাপ্ত হয় যে, তাহার  
পূর্ণজন্মের অভ্যাস মনোবৃত্তি ও চিত্তার সংস্কার,—যাহা  
বীজরূপে তাহার মধ্যে লীন ছিল—ইহজন্মে অঙ্কুরিত হয়।  
পূর্ণজন্ম ও ইহজন্মের মধ্যে শত সহস্র জাতি, বহুদর শ্রেণী  
ও করকোটি কলম ব্যবধান থাকিলেও পূর্ণজন্মের সংস্কার  
ইহজন্মে একত্রপদই থাকে (পাতাল-ল-সর্ব গ্লান)। এই  
এই অলজ্ঞানী নিয়মবশতই আমাদের পূর্ণজন্মের অভ্যাস  
অবস্থানীয় মনোবৃত্তি ও চিত্তাগুলি ইহজন্মে অঙ্কুরিত হইয়া  
আমাদিগের স্বভাব গঠন করিয়াছে। স্বভাব হইতে এখন

(১) “ভূত পুঙ্কং বিষয় জানানার ওত বৈরাগ্য ধর্মণে” ৩১।—১

পূর্ণজন্ম সংস্কার-বীজ

বহিঃশৈ সকল জগদ্বাসী মনোবৃত্তিকে দ্রুতীভূত করিবার জন্ম  
নিহত প্রথম করি—একপ্রকারে আমাদের অবস্থায়  
স্বাধীনতা আছে ও করিতে পারি—এখন যদি বিপরীত  
মনোবৃত্তির অমূল্যলন করিতে অন্তরীতভাবে প্রচেষ্টা করি,  
তাহা হইলে ইহাও অভ্যাস হইয়া যাবে এবং তদ্বারা নূন  
স্বভাব গঠিত হইবে। কিন্তু এই অভ্যাস দুই এক দিনে বা  
দুই এক মাসে দুই হয় না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—  
“স তু দীর্ঘকাল নিরন্তরং সংস্কারবিশেষে দৃঢ়ভূমিঃ”  
(১।১৪)—দীর্ঘকাল অনন্তরীতভাবে তীব্র শ্রদ্ধার সহিত প্রথম  
করিলে অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়। আমরা যে কোন একটা  
পুরাতন বদ-অভ্যাস সহজে জয় করিতে পারি না, তাহার  
কারণ আছে। এক্ষণ আমাদের—তা’ তাহা ভালই  
হউক বা মন্দই হউক—একটা শক্তি আছে, এবং সেই-  
জন্ম অভ্যাস যত পুরাতন হইলে, তাহার শক্তি তত  
বর্ধিত হইবে, ও তাহা জয় করা তত কঠিন হইবে।  
কোন একটা বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলে বা  
কোন একটা কার্য পুনঃ পুনঃ অমূল্যলন করিলে ইহার মধ্যে  
একটা সংস্কারগত বেগ (momentum) সঞ্চিত হয়।  
সহসা ইহার প্রতিরোধ করা সহজ নয়। ইহার প্রতিরোধ  
করিতে পারে, এমন শক্তি এখন আমাদের মধ্যে  
করিতে হইবে। শক্তির ঐ বেগ ক্ষয়ের জন্ম আমরা  
ইতঃপূর্বে যতটা শক্তি ব্যয় করিয়াছিলাম, উহার  
প্রতিরোধের জন্ম এখন আমাদের ততটা শক্তি সঞ্চয়  
করিতে হইবে। সেইজন্ম আমাদের বৈরাগ্যধার্য করিয়া  
উহার প্রতিরোধের জন্ম প্রচেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য  
প্রথমে আমাদের পুনঃ পুনঃ বিফল হইবে, কিন্তু তাহাতে  
কিছু আসে যায় না; কারণ আমাদের প্রত্যেক প্রচেষ্টা  
উহার বেগ হ্রাস করিয়া দিবে। অবশেষে এমন সময়  
আগিলে, যখন উহার সমস্ত শক্তিই শূন্য হইয়া পড়িলে,  
বর্তমান জন্মই আমাদের একমাত্র জন্ম নয়—জন্ম-  
বিকাশের ভূমিশাখার আরোহণ করিবার পূর্বে  
আমাদিগকে অনেকবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এবং  
ইহজন্মে যদিও আমরা আমাদের প্রচেষ্টা সংঘেও মন ও  
মনোবৃত্তি সংযত করিবার অভ্যাস দৃঢ় করিতে নাও পারি,  
তাহা হইলেও আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই, কারণ

ইহজন্মে আমরা জন্ম-বিকাশের যে সোপানে থাকিয়া দেহ-  
তাগে করিব, পরজন্মে আমরা ঠিক সেই সোপানে হইতে  
কার্য আরম্ভ করিব, এবং ইহজন্মে আমরা যেরূপ বেগ-বৃত্তি  
ও অভ্যাসলাভ করিব, পরজন্মে আমরা ঠিক তাহাই পাইব,  
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যত ত বুদ্ধিসংযোগঃ লভতে পৌরুষেইহংকিঃ।

বৃত্ততে চ ততো ভূয়ঃ মসিদ্ধৌ নূরমহনঃ।

পূর্ণাভ্যাসেন তেভ্যম হিহতে বহুশাংলপনঃ।

প্রবর্তন্যতমানন্তঃ যোগী সন্তুষ্কবিযঃ।

অনেকজন্মবাসিসম্বস্ততা বাতি পরাং গতিং ॥ গীতা ৩।৪৩-৪৫

“যোগাভ্যাসেনকারী ব্যক্তি যোগী-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া

পূর্ণজন্মের বৃত্তিসংস্কার পায় ও উহা হইতে অধিক শক্তি

পাইবার জন্ম তত করে।” পূর্ণজন্মের অভ্যাসবশতঃ সে

অশ্ব অর্থাৎ আপন ইচ্ছা না থাকিলেও শক্তির দিকে

আকৃষ্ট হয়। এই প্রকার প্রথমপূর্ণজন্ম উত্তোষ করিতে পাপ

হইতে শুদ্ধ হইয়া যোগী অনেক জন্মের পর পরাংগতি লাভ

করে।”

যাহা হউক, মন ও মনোবৃত্তিবিষয়ের জন্ম আদর্শগত  
অভ্যাস করিতে হইবে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“তং  
প্রতিষেধাৎ একত্বাভ্যাসঃ” (১।২২)—ইহার প্রতিষেধ  
জন্ম এক তত্ত্বের অভ্যাস করিবে। কিন্তু একই এক তত্ত্ব  
সকলের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না; সেইজন্ম তিনি  
পরমার্থ স্বতন্ত্রগত (১।২৩-২৪) কদেকটা তত্ত্বের নাম  
করিয়াছেন। কারণ পক্ষে কোনটা উপযোগী, তাহা  
প্রত্যেকের নিজে পরীক্ষা করিয়া তাহার অভ্যাস করা  
কর্তব্য। তবে আমাদের মনে হয় যে, বীহার্য বীতরাগ  
মদ-গুণের সৌকর্য হইবার অভিলাষী, তাহাদের পক্ষে মহর্ষি  
পতঞ্জলির নির্দেশিত ঐ উপদেশটা উপযোগী। সেটা  
হইতেছে, “বীতরাগ বিমেক্ষা বা চিত্তম্” (১।২৭)—বিনি-  
বীতরাগ, এমনই কোন মহাপুরুষের দান করিবে, ইহাতে  
অস্থির মন স্থির ও শান্ত হইবে।

তারপর (মনো দ্বারা) নান্দীগুলির সংযম সম্বন্ধে। ইহা  
বৃত্তিতে হইলে, নান্দীগুলি কি ও ইহাদের স্ফাণ্ডাবলী কি ও  
নান্দীগুলির সহিত মনের সম্পর্ক কি, তাহা বৃত্তিতে হইবে।  
আমরা সকলেই জানি যে, চক্ৰ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও



রূপ—এই পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় ধারা আমরী যথাক্রমে রূপ, ও স্পর্শ অহুত্ব করি, এবং বাক্য ভগ্নিতের যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান লাভ করি ও বাক্য, গন্ধ, পুষ্প, উপস্থ ও পান্য এই পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় ধারা আমরা যাবতীয় চেতনা কাণ্য সম্পন্ন না করি। মন এই বস ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ হাঙ্গনিক চক্ষু দ্বি ইন্দ্রিয় বলি। জ্ঞান, সেন্সুগলি প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দ্রিয় নয়—ইন্দ্রিয়-ধারা (sense organ) প্রকৃত ইন্দ্রিয় অভ্যন্তরে অবস্থিত। ত্রিশদ্বারা চার্ঘ্য বলিয়াছেন—“চক্ষুরিন্দ্রিয় নাম গোলকবর্ণবিশিষ্টং গোলকপ্রায়ঃ কক্ষতারকাগ্রপংখী রূপগ্রহণশক্তিযুক্তং যদ্বিস্ত্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি” — গোলকাকৃতি চক্ষুর আয়তন হইতে ভিন্ন অথবা গোলকাকৃতি কক্ষবর্ণ তাকার অগ্রবর্তী রূপগ্রহণশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিরের নাম চক্ষুরিন্দ্রিয়। স্তবরাং, চক্ষু ও চক্ষুরিন্দ্রিয় এক জিনিস নয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যথার্থেই এই কথা। প্রকৃত ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়-ধারার অভ্যন্তরে অবস্থিত ও তাহা অতি শক্তিশালী স্বল্প বস্তু বিশেষ (ত্রিশদ্বারা চার্ঘ্যের “সাদ্যনাম্যবিরক” শ্রব্য)। শারীর-তত্ত্ববিদগণ বলেন যে, আমাদের মস্তিষ্ক সংজ্ঞার আধার, ও এই মস্তিষ্ক হইতে টেলিগ্রামের দ্বারা হুই শ্রেণীর কহকগুলি অতি স্বল্প তত্ত্বৎ প্রাচ্য প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-ধারার সহিত সংলগ্ন আছে। পাঠ্য ও পাশ্চাত্য শারীর-তত্ত্ববিদ ভাবায় এই স্বল্প তত্ত্বৎ পদার্থগুলি যথাক্রমে “নাড়ী” ও “নার্ভ” (nerve) নামে অভিহিত। সংজ্ঞাশক্তি ও বেদন-শক্তি ইহাদের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে। বাহ্যজগৎ হইতে রূপ-রসাদির স্পন্দন আসিয়া যখন আমাদের তত্ত্বৎ ইন্দ্রিয়-ধারার অভ্যন্তর উপস্থাপিত করে, তখন তত্ত্বৎ ইন্দ্রিয়-ধারার অভ্যন্তরে অবস্থিত সংজ্ঞা-নাড়ী (sensory nerve) সেই উত্তেজনা-প্রবাহ বহন করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায়। ইহার ফলে বিশেষ বিশেষ সংবেদন (sensation) উৎপন্ন হয় ও ইহা হইতে অহুত্ব ও বাহ্যবস্তুর জ্ঞান জন্মে। সংজ্ঞা নাড়ী দ্বারা উত্তেজনা-প্রবাহ মস্তিষ্কে গৃহীত হইলে, তাহা হইতে আমরা প্রেরণা হইতে পারি। এই প্রেরণা মস্তিষ্ক হইতে আক্ষা-নাড়ী (motor nerve) দ্বারা পেশীতে অবশেষিত হয়। ইহার ফলে অঙ্গ-সংলগ্ন অঙ্গি ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। ইহা ভিন্ন

আর এক শ্রেণীর নাড়ী আছে, তাহার বাহ্যন্তরে সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত নহে; ইহাদের দ্বারা বাহ্য-প্রবণ ও পাকায়ন শ্রুতি আভ্যন্তরীণ বস্তুসমূহের জিন্মা পরিচালিত হয়। ইহা ভিন্ন মানসিক ক্রেশ সংবেদন-ময় স্তব নাড়ী আছে। বাহ্যজগতের রূপ-রসাদির স্পন্দন দ্বারা তত্ত্বৎ ইন্দ্রিয়-ধারা উত্তেজিত হইলে, কেবল যে বিশেষ বিশেষ সংবেদন উৎপন্ন হয়, তাহা নহে—ইহার অহুত্বকর স্বপ্ন, ভ্রম, ক্রোধ, ভয়, লজ্জা প্রভৃতি নানাবিধ মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়। আলােকে সংবেদন তীব্র হইলে চক্ষুর কষ্ট হয়, অগ্রিম কথা শুনিতে ক্রোধ ও হৃৎস্বের অহুত্ব হয়। স্তবরাং দেখা যাইতেছে যে, শারীরিক ও মানসিক স্বপ্ন-ভ্রমাদির অহুত্বটি ব্যাপারগুলি নাড়ীর উপর নির্ভর করে।

কিন্তু কেবল নাড়ী দ্বারা কোন প্রকার অহুত্বটি হইতে পারে না, ইহার সহিত মনের মনোংগ চাই। অনেক সময় এমন হয় যে, আমরা মনুস্থখিত ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া মশটা বাজিয়া যেল। আমরা হইতে দূরবর্তী গোক তাহা শুনিতে পাইল, কিন্তু আমি ঘড়ীর সম্মুখে থাকিয়াও তাহা শুনিতে পাইলাম না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আমরা মন শ্রবণ-নাড়ীর (auditory nerve) সহিত সংযুক্ত থাকে নাই—অল্প কোন বিষয়ে সংযুক্ত ছিল। স্তবরাং দর্শনাদি ব্যাপারে মন তত্ত্বৎ নাড়ীগুলির সহিত সংযুক্ত না থাকিলে চক্ষু দেখিয়াও দেখে না, কর্ণ শুনিয়াও শুনে না। সেই ভ্রত উপনিষদের শ্রুতি বলিয়াছেন; অজ্ঞ অহুত্ব নাদর্শন, অজ্ঞানমনা অহুত্ব নাদর্শন ইতি, নমনা শ্রবণ পশ্চতি, নমনা মুখ্যতি। (যুঃ আঃ ১৮৩) —আমার মন অজ্ঞ ছিল, সেইজন্য আমি দেখিতে পাই নাই; আমার মন অজ্ঞ ছিল, সেইজন্য আমি শুনিতে পাই নাই; কারণ মন দর্শন করে, মন শ্রবণ করে।” আসল কথা, ইন্দ্রিয়-ধারার অন্তরস্থ নাড়ীগুলি দ্বারা স্বপ্ন-ভ্রমাদির অহুত্ব ও বাহ্য-স্বপ্ন জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু নাড়ীগুলির সহিত মনের সংযোগ থাকে চাই। মন নাড়ীগুলির সহিত যত তীব্রভাবে সংযুক্ত থাকিলে, অহুত্ব ও বাহ্যবস্তুর জ্ঞানও তত তীব্র হইবে ও মন যত কীর্ণভাবে ইহাদের সহিত সংযুক্ত থাকিলে, অহুত্ব ও বাহ্য বস্তুর জ্ঞান তত কীর্ণ হইবে। স্তবরাং বলিতে হইবে

যে, নাড়ীগুলিকে যদি সংযত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহারিগকে মনের দ্বারা সংযত করিতে হইবে।

উপরিউক্ত প্রবচন মধ্য মদগুরু আদ্যাদিগকে আমাদের নাড়ীগুলির সংযত করিতেও উপদেশ করিয়াছেন। কারণ বাহ্যজগতের রূপ-রসাদির স্পন্দন নিয়ত আমাদের তত্ত্বৎ ইন্দ্রিয়-ধারার অভ্যন্তর উপস্থাপিত করে; ইহার ফলে আমাদের নাড়ীগুলি উত্তেজিত হইয়া আদ্যাদিগকেও উত্তেজিত করিতে করে; সেইজন্য আমরা আমাদের নিমিত্ত পথে ভ্রতভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। কিন্তু যদি আমরা আমাদের নাড়ীগুলিকে সংযত করিতে পারি, তাহা হইলে বাহ্যজগতের রূপ-রসাদির স্পন্দন ইহাদিগকে উত্তেজিত করিবেও, আমরা উত্তেজিত না অহুত্ব করিব না। এ সম্বন্ধে বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

“আমরা চকল বা বায়ু (নার্ভ) দিয়া সর্বদাই কাণ্য করিতেছি। এই চকল বায়ু দিয়াই আমরা মনোভাব গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করিয়া থাকি। কিন্তু মাধ্য বা equilibrium অবস্থায় বায়ুর কোন চিন্তাই করি না। চকল বায়ু সব সময়ে আদ্যাদিগকে কাণ্য প্রেরণা বিবেছে। এই জন্ম জন্মের সর্ব সময়ে চকল ও মনও চকল। কিন্তু যদি নিমিত্ত অভ্যন্তরে দ্বারা (রাগমোহ প্রকৃতির দ্বারা, আমরা চকল বায়ু হইতে স্থির মায়াতে গমন করিতে পারি—তাহা হইলে বার্ষিক জগতের কোণাহল বা স্পন্দন বা শব্দ ক্রমেই দূরীভূত হয় এবং ধীরে ধীরে অস্তিত্ব হারায়। তখন আমরা বাহ্যজগতের শব্দ বা স্পন্দন আর অহুত্ব করিতে পারি না।” (১৩০৮) অগ্রহাল, প্রবর্তক

কিন্তু নাড়ীগুলিকে সংযত ও স্থির করিবার উপায় কি? ইহা উপায় মন—একমাত্র মনের সাহায্যেই নাড়ীগুলি সংযত ও স্থির হইতে পারে। নাড়ীগুলির সহিত মন সংযুক্ত হইলেও যন স্বপ্ন-ভ্রমাদির অহুত্বটি, মনোবৃত্তির প্রকাশ ও বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয়, এবং ইহাদের সহিত মন যত তীব্রভাবে সংযুক্ত হয় অহুত্বও তত তীব্র ও মন যত কীর্ণভাবে সংযুক্ত হয়, অহুত্বও যখন তত কীর্ণ হয়; তখন মনের দ্বারা নাড়ীগুলি সংযত ও স্থির হইতে পারে ও ইহাও থাকে।

মনের মধ্য দিয়া যদি আমরা আমাদের অন্তরস্থ ইক্ষা-শক্তি (will-power) পরিচালিত করি, তাহা হইলেই নাড়ী-

গুলি সংযত ও স্থির হইয়া থাকে। ইহার একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত এই যে, আমাদের চক্ষু মধ্যে কিছু পড়িলে, সাধারণ যেন উত্তেজনা হয়, তাহার ফলে চক্ষু-পর্দায় আপনা-আপনি ঘন ঘন পড়িতে থাকে; কিন্তু যদি আমরা ইক্ষা করি যে, পর্দায় পড়িতে দিব না, তাহা হইলে পর্দায় স্থির রাখিতে পারি যায়। দেহ-মধ্যস্থ সকল নাড়ীই যদি স্ব স্ব প্রধান হইতে, তাহা হইলে সংযত করিবার বিধি কঠোর উপায় না থাকিত, তাহা হইলে দেহ মধ্যে যের আনন্দকতা উপস্থিত হইত। অনেকস্থলে আমরা অজ্ঞাতমারে মনের মধ্য দিয়া ইক্ষা-শক্তির পরিচালনা করিয়া নাড়ীগুলিকে সংযত করিয়া দেহকে বিশুদ্ধতা হইতে রক্ষা করিয়া থাকি; স্তবরাং আমরা জ্ঞাতমারে আমাদের ইক্ষা-শক্তি মনের মধ্য দিয়া প্রবল ভাবে পরিচালিত করি, তাহা হইলে মনের নাড়ীগুলি সংযত হইবে। তখন বাহ্যজগতের কোন প্রকার স্পন্দন আমাদের অভ্যন্তর করিতে পারিবে না। ইহা অসম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে বিশ্বব্রহ্মা বৈজ্ঞানিক ত্রীমূল জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—“... স্তবরাং দেখা যায় যে, মায়া-ব্রহ্ম উত্তেজনা-প্রবাহ ইক্ষা-ব্রহ্মে (১) দ্বারা বা বৃত্তি করা হইতে পারে। ... বাহিরের শক্তি দ্বারা বা বৃত্তি। থাকে, ভিতরের শক্তি দ্বারাও অনেক সময় তাহা সংঘটিত হয়। বাহিরের আঘাতে হস্তশ্রেণী ক্রোশ সঞ্চিত হয়, ভিতরের ইক্ষা (২) সেইরূপ সঞ্চিত হয়। উক্ত রকমে ব্রহ্মে হাত মগ্ন হইয়া থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে, মায়া-ব্রহ্মে আঘাতক গরিনেশ ইক্ষা-ব্রহ্মে (৩) দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে। তাহা হইলে ভিতরের শক্তিবলেও মায়া-ব্রহ্মে উত্তেজনা-প্রবাহ বন্ধিত বা সংযমিত হইতে পারে, তবে এই দুইপ্রকার আঘাতক গরিনেশ করিবার ক্ষমতা বহুদিনের অভ্যাস ও সুখনা সাপেক্ষ। শিশু প্রথমে হাঁটিতে পারে না, কিন্তু অনেক দিনের চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে চলা-ফেরা স্বাভাবিক হইয়া যায়। স্তবরাং মায়া-ব্রহ্মে অহুত্বের দাস নহে—তাহারই মধ্য এম এক শক্তি নিহিত থাকে, যাহা দ্বারা সে বিহীনভাবে তাহারই ইক্ষা-ব্রহ্মের বাহির-ভিতরের প্রবেশ-দ্বার কখনও উন্মোচিত, কখনও বা অবরুদ্ধ করিতে পারিবে।

(১), (২) ও (৩) আমরা যাহাকে “ইক্ষা-শক্তি” নামে অভিহিত করিয়াছি, বসুশীলশ্রুত তাহাকেই “ইক্ষা-শক্তি” বলিতেছেন।



...অন্ত প্রকারে সে বাহিরের সর্ব বৈজ্ঞানিকের 'অতীত' হইবে, অন্তর-রাজ্যে যে বেজ্ঞানিকের কবিরের স্বভাব মধ্যেও অন্তরুৎপাদকে।" (অব্যক্ত)

তারপর সব-প্রকৃতি কবিরেছেন :—  
এই যোগ্যত বিমলী [অন্য] বাবা নাড়ীগুলির সমন্বয়। কবিতা-নাথ, বাহ্যে যখন ভূমি সাধন-পথের দিকেরে প্রস্তুত কর, তখন তোমার বেহ তীক্ষ্ণত অস্বাভাবিক-শক্তিগণিত না হইবে বাহ্য না। সে-স্বভাব তোমার বেহের নাড়ীগুলি কোন শব্দ বা কোন ধারার-মধ্যে উত্তপ্ত হইয়া পড়ে ও সমান্তর ভাবে উৎপাদকে সমুদয় করে। কিন্তু তোমাকে তোমার মনোভাব সঞ্চিত হইবে।

নাড়ীগুলিকে সংযত ও স্থির করা কঠিন; কারণ ইহাদের অনিষ্টান-কেন্দ্র হইতেছে হৃদয়ে; আর এই হৃদ-দেহের উপর মন—বাহ্য দ্বারা নাড়ীগুলি সব যত হইতে পারে—সহজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। মনের দ্বারা স্বকল্পবলকে অর্থাৎ প্রাণময় ও মনোময় কোষকে বহু সংযত সংযত করিতে পারা যায়, কিন্তু হৃদয়ে বা অময়কে কোষকে সংযত সংযত করা যায় না; কারণ স্বকল্পেহগুলি স্বকল্পের উপাদান অংশ ও অতিরিক্তে গঠিত বলিয়া সমগ্রী অর্থাৎ সহজে সাজা যায়, কিন্তু হৃদয়ে হৃদ উপাদান স্ফিত-ভুক্ত গঠিত বলিয়া অসমগ্রী অর্থাৎ সহজে সাজা দেবে না, সেইজন্য ইহাকে সংযত করা অসম্ভব কর্তব্য। তাহার উপর উচ্চতর মনোময় সাজা দিবার উপযুক্ত কবিবার জ্ঞান অস্বাভাবিক-শক্তি বিন্যস্ত আহার-বিহার, ধ্যান-ধারণা আদি দ্বারা বর্তই তাহার হৃদয়ে সংযত করিতে থাকে, ততই ইহা তীক্ষ্ণত অস্বাভাবিক-শক্তিগণিত হইতে থাকে। আর বর্তই ইহা তীক্ষ্ণত অস্বাভাবিক-শক্তিগণিত হয়, ততই ইহাকে সংযত করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ তখন ইহা সামান্য শব্দ বা আঘাতেই অতিক্রান্ত হয়, যে শব্দকে সাধারণ মানুষ জপেপও করে না, সেই শব্দ তীক্ষ্ণত অস্বাভাবিক-শক্তিগণিত ব্যক্তি বহুগুণে অতিক্রান্ত করে। মনঃসংযততাও। মনঃসংযততা ব্যক্তির নিকট অবধান করাও তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক-শক্তিগণিত হয়। অনেক গীতা আছে, যাহাতে নাড়ীগুলি অতিশয় অস্বাভাবিক-শক্তিগণিত হইয়া পড়ে, প্রথম অবস্থায় এমন কি, কুকুরের বেঁটে খেঁটে শব্দ শুনিয়া রোগীর আবেগ (Convulsion) হইতে থাকে। নাড়ীগুলি যে কর্তব্য তীক্ষ্ণ অস্বাভাবিক-শক্তিগণিত হয়, এবং এরূপ হইলে, ইহা-

বিগত সংযত ও স্থির রাখা যে কর্তব্য কর্তব্য, ইহা তাহারই একটা দৃষ্টান্ত।

বিশ্ব-আধ্যাত্মবিজ্ঞানী নাড়ীগুলি কোনরূপ গীতা-গ্রন্থ নহে—বহিঃস্থ তাহা হইলে সে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে পারে না—তাহার নাড়ী কথা বা টান (tense) দড়ির মত সামান্য আঘাতেই স্পন্দিত হইতে থাকে, সে-জন্য ইহাটিকে সংযত করা তাহার পক্ষে নিরতিশয় কর্তব্য হয়, তথাপি ইহার জ্ঞান তাহার জ্ঞান তাহার খ্যাতিয়া কঠিন হইবে—ইহাই সদ-প্রকার ব্যক্তি। আমরা ইহাতে পুনঃ পুনঃ বিফল হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে কিছু যায়-আসে না। তিনি চাহেন যে, আমরা যথাসাধ্য করি।

তারপর সব-প্রকৃতি কবিরেছেন :—  
মনঃসংযত অর্থ সাধারণ মতে, ইহা হইয়া যখন বিভিন্ন ধারণা গণের গ্রন্থ ও পরীক্ষাগুলির সমুদায় হইতে পারিল।

মন স্থির হইলে, কোন প্রকার মনোবৃত্তি দ্বারা ইহা বিন্দুমাত্র আলোড়িত না হইলে, সেই স্থির মনে "অমৃত" ও "অজয়" আদ্যের বহুগুণ দর্শন হয়। মানুষ তখন নিজেকে অমৃত ও অজয় আদ্য বলিয়া উপলব্ধি করে। কাজেই তখন সকল প্রকার ভয় বিবর্তিত হয় ও হাইল জন্মে।

সাধারণ পক্ষে প্রবেশ করিতে হইলে অধ্যাত্মবিজ্ঞানীকে সকল প্রকার ভয় দূরীভূত করিয়া অবলিলাত সাহস অর্জন করিতে হইবে; কারণ সাধনার পক্ষে প্রবেশ করিলে মনকে নানা-প্রকার গ্রন্থ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ইহা অনিবার্য। ইহার কারণ হলুপ। মানুষ বর্তমান সাধারণ মানবের তত্ত্ব থাকে, বর্তমান না সে মনকে ইহা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানভেদে জ্ঞান সাধনার পক্ষে প্রবেশ করে, ততদিন তাহার জন্ম-জন্মান্তরে "সংকীর্ণ" কর্ম ক্রম-বিকাশের সাধারণ নিয়মামুসারে শত শত জন্মে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং এইরূপে যখন তাহার সমস্ত "সংকীর্ণ" কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন সে সংসার-চক্র হইতে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু যে-ব্যক্তি স্বয়ং মোক্ষলাভ করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ মানবের তত্ত্ব গঠিত করিয়া সাধনার পক্ষে প্রবেশ করে, তাহার সেই জন্ম-জন্মান্তরে "সংকীর্ণ" কর্ম সমুদয়—বাহ্য সাধনার নিয়ম অনুসারে তাহার শত শত জন্মে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া—তাঁহা কোন জন্মে ক্ষয় ক্ষয় করিবার আবশ্যক হয়; নতুবা সে স্বয়ং মোক্ষলাভ করিতে পারে না। সেইজন্য

সাধনার পক্ষে প্রবেশ করিলে, মনকে তাহার পূর্ণ-জন্মের অন্তত কর্মসমূহ ক্ষয় করিবার জ্ঞান রোগ, শোক, ব্যাধি, দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য, অথবা অন্য প্রকারে গ্রন্থ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এই সব গ্রন্থ-কষ্টের সমুদায় হইবার জ্ঞান, বর্তমান হইবে। বিচ্ছিন্ন না হইবার জ্ঞান, লোকে তাহার সমক্ষে বাহ্যই মনকে, বাহ্যই করক, বাহ্যই ভাবুক, তাহাতে দুঃখপাত না করিয়া, তাহার নিজের নিকট বাহ্য ছাড়া ও তত্ত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাই করিবার জ্ঞান, তাহার যথেষ্ট নৈতিক ও মানসিক সাহস আবশ্যক প্রকৃত ভৌতিক সাহসও আবশ্যক। সাধন পক্ষে এমন বস্তুকল্প বিপদ ও কষ্ট আছে, যাহা আদ্যে সাম্প্রতিক বা উচ্চতর জগৎসংস্কারে নয়, আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম মধ্যে সাহস ও বৈদ্যের পরীক্ষা আদ্যেই আসিবে। সেইজন্য অধ্যাত্মবিজ্ঞানীকে পূর্ণ হইতেই ভয়ান হইবার জ্ঞান প্রস্তুত হইতে হইবে। ভয়ান শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিয়াছেন :—

প্রশান্তাত্মা নিগতভীরুশ্চাচারী ব্রতে স্থিতঃ।  
মনঃ সংযম্য মজিতো মুক্ত আশীত তৎপরঃ। গীতা ৬:১৪  
"ভয়ান হইয়া শান্ত-চিত্তে তৎপর-ব্রত পানন করিয়া এবং মনকে সংযত করিয়া আশা-গত-চিত্ত ও আশা-পরায়ণ হইয়া যোগ-ব্রত হইবে।"

সর্ববিধ ভয়ান হইবার—অবিচলিত সাহস লাভ করিবার একমাত্র উপায় জন্মের সহিত নিজের একান্ত উপলব্ধি করা। ভয় হয় তাহার? চুত্ৰাচার বা দেহের—প্রকৃত আচার নহে। কারণ, "এতদমৃতমভ্যাসতঃ" (ছান্দোগ্য ৪:১০) —ব্রত অমৃত ও অজয়, এবং আনন্দ যখন সেই "অজয়" জন্মের অংশ, তখন আমরাও স্বরূপকঃ অজয়। কিন্তু আমরা আমাদের আশ্রয়-স্বরূপ বিন্যস্ত হইয়া চুত্ৰাচার সহিত আধ্যাত্মিক একীভূত করিয়াছি বলিয়া ভয় পাই। উপনিষদের ধর্মি বলিয়াছেন যে, জীব যখন সেই "অজয়" জন্মের সহিত নিজের একান্ত উপলব্ধি করে, তখন "সোহং ভগ্নো গতো ভবতি" সে ভয়ান হয়, কিন্তু যখন সে জন্মের সহিত নিজের ভেদ দর্শন করে, তখন "তত্ত্ব ভয় ভবতি" (তাৈত্তি, ২/১১) —তাহার ভয় হয়। সুতরাং যত দিন না আমরা সেই "অজয়" জন্মের সহিত আমাদের একান্ত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, তত

দিন আমরা সম্পূর্ণরূপে অজয় হইতে পারি না। আমরা বলিয়া থাকি বটে :—"অহং ব্রহ্মস্মি"—"আমি ব্রহ্ম"; কিন্তু তাহা আমরা যথেষ্ট বলিয়া থাকি না, অতএবে উপলব্ধি করিতে পারি না। সেইজন্য আপদ-বিপদ উপস্থিত হইলেই আমরা ভয়ে অতিক্রান্ত হইয়া পড়ি। কিন্তু এই ভয়ে অতিক্রান্ত না হইবার জ্ঞান আধ্যাত্মিক সেই "অজয়" জন্মের সহিত একান্ত উপলব্ধি করিবার দৃঢ় প্রচেষ্টা করিতে হইবে। উপনিষদের ধর্মি বলিয়াছেন, এতদমৃতমভ্যাসঃ শান্ত উপাসীত—"অমৃত ও অজয় জন্মের উপাসনা করিয়া শান্ত হও। এতদর্থে আমরা যদি প্রভাৎ প্রাতঃকালীন ধ্যানের সময়, "ব্রহ্মস্মি" মনঃ শান্ত মজিতানন্দলব্ধমঃ"—"আমি বিচারহীন শান্ত মজিতানন্দ-ব্রহ্ম" ধ্যান করি ও ইহা উপলব্ধি করিবার জ্ঞান অনন্তরিত-ভাবকে কিছু দিন প্রচেষ্টা করি, তাহা হইলে ইহার ফল যে শক্তি লাভ হইবে, তাহার কতকাংশ সমস্ত দিন আমাদের সহিত থাকিবে ও সেজন্য প্রাতঃকালীন জীবনে আপদ-বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাতে ত্রাণমাগিকেরে অতিক্রান্ত হইতে না দিয়া ইহার সমুদায় হইবার জ্ঞান সাহস প্রদান করিবে। ইহা জিহা সাহস অর্জনের অজ উপায় নাই।

আরও এক কথা। আমাদের মধ্যে যে আত্ম বিরাগদ্বান আছে,

অজ্ঞোহায়মানাঃ যোহং-কৈজোহেশোষ এব চ।  
নিত্যঃ সর্গগতঃ স্বায়ুতলাংহং সনাতনঃ। গীতা ২/২৩  
"তিনি অজ্ঞ, অদ্বা, অজ্ঞে, ও আশা, কারণ তিনি নিত্য, সর্গগত, স্থির, অচল ও সনাতন" সুতরাং আমরা যদি উপলব্ধি করি যে, আমরা সেই আত্ম-নাথ-বেহ নহি, তাহা হইলে আমাদের কোন ভয় আশ্রিত পারে না। কিন্তু ইহাও উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যও আত্মবৈরাগ্যের সনাতনভাবে নাই। জীবাত্মার অস্বনিহিত শক্তি বাহ্যে, যত বেশী প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার ইহা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য তত বেশী। মূলতঃ আমরা সকলেই সনাতনভাবে শক্তিশালী, কারণ "সম সর্গস্বয়ং ব্রহ্মত্বং তিত্ত্বং পরমেস্বরম্" (গীতা ১৩/২৭) —এক পরমেশ্বরের সকল জীবের মধ্যে—সনাতনভাবে বিজ্ঞান। কিন্তু আমাদের জীবাত্মার জন্মের তারতম্য আছে। যখন আমরা



সেই আশা, তখন আমরা জানি যে আমাদের সেই আশার অশ্রুধ্বংস শক্তির পরিচায়ক উপর আমাদের শক্তি ও হুঁশিয়ারি নির্ভর করে। স্বতন্ত্রাৎ যখনই কোন ভয় অনুভূত হউক না কেন, তখন বাহির হইতে অজ্ঞ কাহারও সাহায্য প্রার্থনা না করিয়া নিজের অন্তর হইতেই অদিকতর শক্তি বাহির করা কর্তব্য; কারণ আমাদের মধ্যেই সেই শক্তির উৎস বিদ্যমান আছে। কিন্তু “নাভি কা স্বগদ যুগ নাভিপাণ্ডেত দুড়ত ব্যাকুল হোই”—মৃগ যেমন নিজের দেহান্তর নাভিকে স্বগদন্তে উৎস না জানিয়া স্বগদেবের সন্ধানে ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ সৌভাগ্যোন্মীড় করে, অজ্ঞ মানব ভয়াভিত্ত হইলে নিজের অন্তরস্থ শক্তির উৎস তাগণ করিয়া অপরের নিকট সাহায্যাব্যাহার জ্ঞ ব্যাকুল হয়।

আপার-বিপদের সময় অনেকে সঙ্গুপ্তর নিকট রক্ষার জ্ঞ প্রার্থনা করেন। সঙ্গুপ্তর শক্তিতা সর্গদা আমাদের নিকটে আছে, তাহার সন্দেহ নাই এবং আমাদের প্রার্থনা যে তাহার নিকট পৌছিতে পারে ও তাহার সাহায্য যে আমরা পাইতে পারি, ইহাও নিশ্চিত। যিত বৃষ্ট বলিয়াছেন, “হাশা প্রার্থনা করিব, তাহা প্রাপ্ত হইবে।” কিন্তু যে কাণ্ডীতা আমাদের নিজে করিবার জ্ঞ সর্মগ হওয়া উচিত, তাহার জ্ঞ তাহাকে আমরা উভাক্ত করিব কেন? ইহা সত্য যে, যদি আমরা ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমরা রক্ষার জ্ঞ, শক্তির জ্ঞ তাহাকে স্মরণ করিতে পারি, কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমরা যদি আমাদের অন্তরস্থ ঈশ্বরকে স্মরণ করি ও অদিকতর শক্তি বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে সাহায্যের জ্ঞ ক্ষীণভাবে তাহাকে আহ্বান করিয়া বাহা করিতে পারিতাম, তাহা অপেক্ষা ভাল করিব ও তাহার অদিকতর নিকটবর্তী হইব। ইহা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার আশ্রয়কার বা অনবিকারের কথা নয়। কিন্তু সেই “অহেতুক দর্শনিক” সঙ্গুপ্ত “জননিহেতুনাশ্রয়ণি তাংমুহু”—জগতের বহু নর-নারীগণকে ভব-মাগর হইতে জাগ্র কারবার তজ্জ যে কিরণ বাস্তু আছে, তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জ্ঞ প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা করা উচিত নয়, বিশেষতঃ আমাদের নিজের

মধ্যেই যখন শক্তির ভাণ্ডার আছে, এবং তাহা হইতেই আমরা নিশ্চিতই শক্তি ব্রাহির করিতে পারি। ইহা করিতে অদিকতর হওয়াই আমাদের অর্থ—বিধাসের অভাব—নিজকে ও নিজের এই-শক্তিতে বিশ্বাসের অভাব। কিন্তু “যে নিজের জ্ঞ সাহায্য করে, ঈশ্বর তাহারই সাহায্য করেন।”

তারপর সঙ্গুপ্তর দলিতোছেন—

মহা ইংরেজের জর্জ মনের জটজট ও বটে, ইহার মনে একটাক বাক্তির জীবন-দেহ-মরণ ইত্যাদি আছে, তাহা তুমি তুমি জ্ঞান করিতে পারিবে, এবং অনেক লোকে সামান্য সামান্য বিষয়ে দৈব উপদেশ স্বরূপে ইহাদের অদিকতর স্মরণ করায়, সেই সব বিরাট ইশ্বর হইতে তুমি রক্ষা পাইবে।

মন স্থির হইলে, সেই স্থির মনে অবিকারী আশ্রয় স্বরূপ দৃষ্ট হয়, তখন মাহুৎ গুণ-কণ্ঠে বিচলিত না হইয়া অটল থাকে।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানীর জীবনের উপর দিয়া যে-সব কাল-বৈশাখীর ঝড় বহিয়া যায়, তাহাদের সমুদ্রান হইবার জ্ঞ মনের যেরূপ সাহস আবশ্যক, তাহাদের দাপটে ভাঙ্গিয়া না হইবার জ্ঞ সেইরূপ অদিকতর আবশ্যক; সকল প্রকার মানসিক কষ্টের মধ্যে উৎকৃষ্টই জঘন্ততম। কারণ মাহুৎকে ধ্বংস করে উৎকৃষ্ট—পরিশ্রম নাহ। সেইজ্ঞ প্রাচীনরা বলিয়াছেন—“চিত্তা ও চিন্তার (চিন্তিতার) মধ্যে চিত্তা (চিন্তিতা) গরীয়সী, কারণ চিত্তা মৃতকে দগ্ধ করে, কিন্তু চিত্তা (চিন্তিতা) জীবিতকে দগ্ধ করে।” কিন্তু ছুয়েবর বিষয়, বর্তমান যুগ উৎকৃষ্ট ও সবেগের যুগ—অদিকতর শক্তি কোন না কোন বিষয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু কোন বিষয়ে উৎকৃষ্ট আদিলে, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, সেই বিষয়টির প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি না, যদি থাকে ও তাহা যদি আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে তাহা আয়ত্ত করিতে হইবে; আর যদি কোন উপায় না থাকে, থাকিলেও তাহা অনায়াস হয়, তাহা হইলে তাহার জ্ঞ উদ্বিগ্ন হওয়া নিরর্থক। অনেকে অতীত বিষয়ের জ্ঞ উদ্বিগ্ন হন। তাঁহারা বলেন, “যদি ইহা করিতাম (বা না করিতাম), তাহা হইলে এরূপ ঘটত না।” তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা যখন করা হইয়া গিয়াছে (বা

করা হয় নাই) তখন তাহার জ্ঞ চিন্তা করিয়া তাহার পরিবর্তন করা অসম্ভব। এমত অবস্থায় “গতন্ত শোচনা নাশ্টি”—এই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া নিরুদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। আবার অনেকে ভবিষ্যতের জ্ঞ উদ্বিগ্ন। কিন্তু ভবিষ্যতের জ্ঞও উদ্বিগ্ন হওয়া সমানভাবে নিরর্থক, কারণ ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, তাহা জানি না, তাহা ঘটতেও পারে, না ঘটতে পারে। স্বতন্ত্রাৎ তাহার জ্ঞ এখন হইতে উৎকৃষ্টনালে দগ্ধ হওয়া বিজ্ঞের কার্য নহে। কিন্তু ছুয়েবর বিষয়, অনেক লোক ভাবী সম্ভাব্য বা অতীত ঘটনার বা অজ্ঞ কোন ঘটনার উৎকৃষ্ট মমন্ত রাত্রি জাগ্রত থাকে, আর দিব্যভাগের ত কথাই নাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট মন কিন্তু বাক্তির জায় উৎকৃষ্টবহীনভাবে চতুর্দিকে ধাবিত হয়। মনের এরূপ ধাবনের পরিণাম নিশ্চয়ই মারাত্মকভাবে অনিষ্টকর। মনের উপর উৎকৃষ্টের এই হাফাংকভাবে পরিচালনা ও অসারতা বুদ্ধিতা উৎকৃষ্ট অপরিহার্যভাবে পরিচালনা করা ও ইহার পরিবর্তে ঈশ্বরের অপার কক্ষণ ও মঙ্গলময়কে ও অশ্রুণীয় কর্ম-বিধিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্থির হওয়া উচিত। জগতে বাহা কিছু ঘটতেছে, তাহা অতি ক্ষুণ্ণ ও তুচ্ছ হইলেও অকারণ নয়, নিরর্থক নয়। সকল ঘটনার মূলেই একটা কারণ আছে





## এপ্রিল ফুল

(গল্প)

শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আদি

শ্রীশ্রীটোলায় কানুনগো বনের একটা ঘেস-বাড়ীতে সেদিন বৃদ্ধমহলে আলোনা চলেছিল—কেমন করে এই এপ্রিল মাসটা সব দিক দিয়েই সার্থক করে তোলা যায়। বৃদ্ধদের মধ্যে নিরীহ অচিন্তাই প্রথমে বলে উঠল—আজ্ঞা এই সামনের ছুটিতে পুরীতে গেলে হয় না?—পুরী যারপায়টাও নেহাৎ...

এ দলর অগ্রণী সীতুদা "ওরফে সীতানাথ একগাল হেসে বলে উঠল—কেন হে, পুরীর পায়ে আর তান কেন?—তোমার শ্রীমতী সেখানে 'আছেন তা' আমাদের কি?...

—কথাতার মধ্যে একটু ইতিহাস আছে। শ্রীমান অচিন্তাকুমার সভাবিহিত। শ্রীমানের খবরভালের সকলেই গ্রীষ্মের প্রকাশ থেকে রেহাই পাবার জন্তে সকাল সকাল সাগরকূলে পাড়ি দিয়েছেন। অচিন্তা-গৃহিণীও গুণের সার্থে আছেন।

সীতুদার কথা সবাই হেসে উঠল। বৃদ্ধের মধ্যে কবিশব্দ-প্রাণী উদীয়মান সাহিত্যিক জীকোরক রায় (নবীন কবি সম্রাট কবিতা ছাড়াই গলে হাত বিরাহে)—হু' একদানি মাসিকও তাহার লেখা বাহির হয়। ইহা ছাড়াও শোনা যায় কোরকুমার রায় হলে আধুনিক আওতায পড়িয়া কেবল নিজ কোরক রায় হইয়াছেন এবং মাধব বাবুরা রাধিয়া আপনাকে মন্ত বড় অর্ধট্ট বালির পরিচয় দেন, এতক্ষণ তাহার শব্দ্য রাধীয়া নিয়ে চুপ করেই ছিলেন কিন্তু, এ হেন সীতুদার অধ্যক্ষ সভা-আবিষ্কারে সবুজ কবির বাক্যসুষ্ঠি হ'ল—You are quite right Sir, I support you in every respect—(বাঁটা কথা বলছে সীতুদা—আমি সব দিক থেকে তোমার প্রস্তাব সমর্থন করছি)—বৃদ্ধদের হাসির হব্দরা তখনও ধামে নি।

Oriental Artist প্রাচ্যকলাশিল্পী মনোজ (ইনি অহীন চৌধুরী এবং শিশির ভাণ্ডারীর আটকে একটু পরিবর্তিত করিয়া বৃদ্ধমহলে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন) বলে উঠল—আ—রে, ওদম কথা-হেঁড়ে দরিদ্র এমন!—একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে হে—এটা যদি হয় ভারী মজা হ'বে কিন্তু...

উপস্থিত বৃদ্ধগণের সবাই সম্মত উৎসাহভাবে মনোজের দিকে চেয়ে হিজিমা করলে—কি—কি...

মনোজ বিশিষ্ট বিজ্ঞের মত ব'লগে লাগল—তোমরা সবাই বোঝ হয় জান অচিন্ত্যাল সন্ধ্যা-বিবাহিত; দাদা আমার, বৌদির সখ্যে প্রায়ই অভিমান্য করে থাকেন যে, বৌদি নাকি তার সখ্যে একরূপ উদারসীনই;—অর্থাৎ শ্রীমতী বৌদি দাদার অজ্ঞাতেই সমুদ্র-কূলে পাড়ি দিয়েছেন।...আজ প্রায় হু'দাস হ'ল—একটা চিঠি দিয়েও দাদার—মানসিক তো দুরের কথা—শারীরিক কুশলও মেনু নি।...স্বতরাং...এ ক্ষেত্রে দাদাকে দিয়ে এমন কিছু একটা করতে হ'বে যা'তে পুঞ্জীয়ার বৌদির একটু হাঁস হয়, আর দাদাও এই দীর্ঘ বিরহের পর একটু মধু-বসন্তের আশ্বাস পান।

—দাদা ছাড়া উপস্থিত বৃদ্ধরা সকলেই একবাক্যে মনস্তত্ত্ববিদ্য মনোজের কথা সমর্থন করে নিয়ে বাড়ি নেড়ে বসে—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ভারী মজা হবে তা' হ'লে। আটটি না হ'লে কি আর এমন মাথা খেলে।...কিন্তু কি করে...

—আহা রোস না, দাদার এ বিরহে তোমাদের সহায়ত্বটি প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য!—আমরা সব সময়েই প্রস্তুত—সকলে সোংসায়ে বলে উঠল।

বলা বাবুল্যে, দাদা আমাদের নির্বজ্ঞ নন। স্বতরাং, একটু লজ্জার খাতিরেই হোক, অথবা আড়ালে থেকে এই 'রোমান্টিক' অধিকতার প্রতি-কৃত্তিক হ'তে পারে এই আনন্দে দাদা দরদী বৃদ্ধদের ছেড়ে উঠে গেলেন।

মনোজ পুনরায় বলে চলল—যাক, অচিন্ত্যার' উঠে গেল ভালই হ'ল।...আহ, দাদার শব্দ্যর বাড়ীর সবাই পুরী থেকে সম্রাতি ক্লির এসে ঐ সামনের বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে আছেন। অচিন্ত্যার শালা হুজানের সঙ্গে আমার বিলম্ব পরিত্যক্ত আছে।...ভনুস্ব, বৌদিও আছেন ঐ বাড়ীতে; কিন্তু দাদা এ-সখ্যে কিছুই জানে না।—হুজাবরাও জানে না যে দাদা এখানে এই মেসে প'ড়ে বৌদির বিরহে ছুটুক বসে...স্বহরাং এক্ষেত্রে দাদাকে দিয়ে একটা কিছু করতেই হবে।—আমি বিয়ে—ও বাড়ীতে ঐ বারান্দায় বসন বৌদি এসে বেলিং দ'রে দাঁড়ান ও বেড়িয়ে যেতান সেই সময় দাদাকে দিয়ে আমাদের হাঙ্গের গুণ থেকে বৌদির মুখের উপর উর্জ লাইট ফেলতে হ'বে।...অননি ভদের বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে যাবে।...দাদাকে কিন্তু এই বলে বুঝাতে হ'বে যে—ও বাড়ীর ভই বোড়শী আইবুড়ো মেয়েটা দাদার প্রেমাভাজিনী—ভাই থেকে থেকে ঘরের বাইরে এসে বারান্দায় বেলিং দ'রে দাঁড়িয়ে থাকে—বেড়িয়ে বেড়ায়।—আরও দাদাকে বলে কয়ে বসতে হ'বে যে, বৌদি বসন দাদার মুখের দিকে চাইলে না তখন দাদার এ সুযোগ ত্যাগ করা একান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হ'বে।—এই দীর্ঘ বিরহের মধ্যে দাদা নিশ্চয়ই রাগী হয়ে না হ'লে করতেই হ'বে যে কোন উপায়।

হাসতে হাসতে সবাই মনোজের এ হেন উদ্ভাবনী-শক্তিকে তারিফ করতে লাগল।...

মনোজ পুনরায় ব'লগে লাগল—আহা, এখনি হেসে রসজ্ব ক'র কেন?...তারপর এ নিয়ে গুণের বাড়ীতে বা' হ'লে তায় জন্তে আছি শেষে আমি আর হুজাব।...আজ্ঞা, এ ব্যাপারটা হ'লে কেমন মজা হ'বে বল তো?

সকলেই প্রশংসাসুষ্ঠিতে মনোজের দিকে কিছুকণ দ'রে তাকিয়ে রইল। সবুজ-সাহিত্যিক কোরক রায় বলে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা যদি হয় তো ভারী রোমান্টিক হ'বে কিং—Art of Love (প্রেমের আর্টের) দিকে দিয়েও এ ব্যাপারটা হ'লে কেমন মজা হ'বে বল তো? হুজাব এ অধীকার করে—উপন না প'ড়ে ঐ রসহীন প্রোচা পিশীয়ার মুখেও গুণের পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ও বাড়ীতে গুণগোলের সৃষ্টি হয়।

করীর ভার প'ড়বে এ কাজে সিদ্ধহস্ত আমাদের সীতুদার গুণ।

অধ্য

তারপর...

—কয়েকদিন পরের কথা। সন্ধ্যার পর অচিন্ত্য বৃদ্ধের প্রেরোচনায় ও কতকটা অচিন্ত্যতার প্রেম-কৌতুহলের বশবর্তী হ'য়ে হাঙ্গের গুণর পায়েচারী আরম্ভ ক'রে দিল, ও মাঝে মাঝে বাঁশীতে হুঁ-বিত্তেও হুজ করলে। রোজই দেখে, সামনের বাসার মেয়ে হিমালী অর্থাৎ অচিন্ত্য গৃহিণী গুণের এমিক-কুমার বারান্দায় এসে বেড়িয়ে বেড়ায়,—কখনও কখনও বেলিং দ'রে দাঁড়িয়ে থাকে। ও বাসার পুর দিকের বারান্দাটা আর যেসের ছায়াটা প্রায় সামান্য নান্দনে ছিল, এই ঝু হুহুহু। কিন্তু...

এই ই বাড়ীর মধ্যে দুইদুইও কম ছিল না—আর এর জন্তেই কেউ কাউকে স্পষ্টরূপে চিনতে পারে নি।...

দাদা আমাদের ছ'একদিন পায়েচারী করতেই নিজে এসে প্রেমের আর্টের কৌশল পা দিলেন—নিজ্ঞ এসেই বৃদ্ধের কাছে ও বাড়ীর ভই আকাঙ্ক্ষিতার গুণ গারিতে আরম্ভ করেন,—কখনও বা ও বাড়ীতে কোনও একটা ছুতো দ'রে যেতেই চাইছিলেন কিন্তু বৃদ্ধ দল রসভঙ্গের আশঙ্কার অতিক্রমে অচিন্ত্যকে সাধনা দিয়ে বলে,—দাদা, বৈধে ধর,—সবুজে মেওয়া ফলে...

দাদার বৈধের গুণেই হোক অথবা হিতৈষী বৃদ্ধদের বন্ধু-শ্রীতিতে হোক হ'লক দিনের মধ্যেই মেওয়া ফলিল।...অর্থাৎ...

সেদিন সন্ধ্যার একটু পরেই ও বাড়ীর সেই মেয়েটা তার শিশীলার সার্থে বারান্দায় বেড়াতে এলেন। আশ্চর্য্য অচিন্ত্য—প্রেমে ও কৌতুহলের বশবর্তী হ'য়ে ও বাড়ীর বারান্দায় তারই উদ্দেশ্যে উর্জ লাইট ফেলল। পিছনে ছিল অভাব্যতা সীতুদা ও মনোজ প্রভৃতি।

কিন্তু দাদার এমনি ছড়াগা যে কোঁকাস লাইট তার আকাঙ্ক্ষিতার মুখের উপর না প'ড়ে ঐ রসহীন প্রোচা পিশীয়ার মুখেও গুণের পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ও বাড়ীতে গুণগোলের সৃষ্টি হয়।



অস্ত

আচিন্তা!—এখানে কোথেকে?

বড় শিশীমা মুখে আসো প'ড়তেই চেঁচিয়ে উঠলেন—  
ওরে, ও হুতা, ও-চাক, দেখতো, ঐ সামনের ছাদ থেকে  
কে আসো। ফেলছে—ওমা, কি লজ্জা, যেদার মশি, যেদার  
মরি।

কোকাস লাইট পড়তেই হিমালী শিশীমার সহ ত্যাগ  
করে ঘরের ভিতর ঢুক যায়—আর আচিন্তা, শিশীমার  
চাঁৎকারে ভক্তিক গিয়ে ছুটে লোভালয় এসে একেবারে  
পায়খানায় দোর দিয়ে বসল।

ও বাড়ীর স্বলগর ক্রমেই বেড়ে চলল।

দেখতে দেখতে হুতাৰ প্রভৃতি ছুটে এসে যেস বাড়ী  
চড়াও করে—কিন্তু কেউই কিছু বীকার করতে চায় না।

পায়খানার দুর্গন্ধ অবিকল্প সহ ক'তে না পেরে  
অচিন্তা বাইরে আসতেই মনোজ হাসতে হাসতে তাঁর  
দিকে দেখিয়ে বল—ওই যে আসামী!

হুতাৰ আচিন্তাকে দেখেই বিশ্বয়ে প'লে উঠল—

...ওমা,—একি গো, আচিন্তা যে!—সবাইই মুখে  
বিশ্বর-পুলক ফুটে উঠল!

—হুতাৰের মুখে আসামীর অপরাধ শুনে সবাই হো-  
হো করে হেসে উঠলেন।...শালীর দল ব্যাচালী-দালার  
কান হুতা স্বাভাবিক রকম লাল করে দিয়েছিলেন—  
ব্যাক-বাপে বিদ্ধ করতেও কহর করেন নি।

...বলা বাহুল্য, বেশী রাত হ'য়ে বাওরায় সে রাতে  
দাদা আমাদের, হিমালীর প্রেম-কারায় কদম্বী হয়ে  
ছিলেন।



## জেনেভা-ভ্রমণ

( পূর্বাত্তর )

অর শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী

রবিবার, ১৯ অক্টোবর, ১৯৩০

বয়ে এটরী-সভার সম্ভাবক নিঃ নারায়ণ পাণ্ডে  
বয়েতে হুদ্রিন থাকিয়া এটরী-সম্প্রদায়ের কনফারেন্সের  
বে সব কাজ বাকী আছে তাহার আশিষ্ট আলোচনার  
লজ্জা লিখিয়াছেন। সহ্য বয়ে আসা সম্ভব হইবে না  
বলিয়া ইহাতে স্বীকার করিয়াছি। বয়ে হইতে ছাড়িবার  
সময় তাহার এ কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু বয়েতে  
গোলমাল স্বতঃপাড়াইতে তাহাতে এ সকল কাজ-কর্ম  
বীরে হুয়ে করিবার সময় ও সম্ভাবনা কোথায়—দেশের  
সাধারণ বিপদে সকলেই ব্যস্ত, এ সকল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র  
বিষয়ে সংঘতভাবে মন দেওয়া সম্ভব হইবে কি না সম্ভেদ।

এতেন হইতে পূর্বদৃষ্টি হইয়া জাহাজ ক্রত চলিতে  
পারিতেছে না—কোয়ার হাওয়া বাধা দিতেছে। গরম  
ক্ৰমশঃ কমিয়া আসিতেছে, জাহাজ বত পুগাতন  
তনিয়াছিল। তত নয়। ইলেকট্রিক পাখা নাই;  
তাহার পরিবর্তে আছে বড় বড় ফ্যান, যে ফিকে ইচ্ছা নল  
বোয়ান নয়, কিন্তু রং ঠাণ্ডা হয় না। এক জায়গাতেই  
হাওয়া লাগে।

সোমবার, ২০ অক্টোবর, ১৯৩০

আজ ভূত চতুর্দশী—আগামী কাল অমাবস্তা, কালী  
পূজা—বয়ে পৌছিব। বৃহস্পতিবার জাত্তবিত্ত্য। বয়ে  
ইহাতে বাজার দীর্ঘায় দিলে হইয়াছিল অমাবস্তা, পথে  
পথেই সব পাল পার্কণ কাটিতেছে। ভুবনুরের দশাই  
এই। এ যমসেও আমাতে ইহা বৈধে প্রয়োজ্য।  
তিনবার বিলাত, একবার দক্ষিণ আফ্রিকা, একবার বর্মা,  
একবার নেতুবন্ধ-রাশের, তারপর কতর বয়ে, লাহোর,  
সিমলা, দিল্লী, পোহাটা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি গুরিমাছি তাহার  
যথ্যা নাই। কত হাজার হাজার মাইল জলে স্থলে গুরিলায়,

পাইলাম কি তা জানি না। বিনি বুরাইতেছেন তিনিই  
জানেন। আমি পাই নাই কিছু, খুঁজি নাই কিছু।  
বখন যে কাজে ভাগ্যবিধাতা কেলিয়াছেন বিনা বিরক্তিতে  
তাহা করিয়া গিয়াছি। দ্বিবিহিত স্বীকেশু তাহার কাজ  
জানন বোধন করেন, আমার এই বোশার মধ্যে গিয়াই  
তাঁহার কাজ।

আর কিছু করিতে পারি, বা না পারি। প্রাক, দেশের  
কোন কাজ হউক না হউক দেখানে ব্যাধা পৌছায় ও  
খুলাপে, দেখানে বয়েই ব্যাধা গিয়াছি—এটা গ্রন্থ স্থির।  
আর সকল আপন-পিত দাটিয়া বাইতেছে, সে কেবল  
সেই ব্যাধার মাঝে তময় তপতায় ক্ষুণ্ণ। সকল রকমে  
হুদরিত হইয়া আমি থা।

অশ্রান্ত অক্লান্তগতিতে আবহমান কালের সাগর চলেছে  
—মানবকে সে তার বহান্ন বস্ত্র্য শিখাচ্ছে নিশিদিন  
হুগা যুগান্ত ধরে। ক্যাবিনে শুয়ে এবং ডেকের রেলিং  
ধরে দাঁড়িয়ে নরনারীর স্রোতের মাঝে আমি ক্ষুদ্র  
ভূগের মত মনোভ্রান্তে ভেসে যাবার অহুত পথে আমি  
একটা আশাস ও অভয়গণি পাই। বাট হাজারের  
মাইলের বেরী গোধ হয় জলদ্রবণ হয় নি। প্রতি উত্তাল  
তরঙ্গের তলে তানে মনে হয় আমি সৃষ্টি-বিশ্বতির  
মধ্য দিয়া জীবনের আদি হ'তে এই তরঙ্গেরই মত  
উঠিতেছি পড়িতেছি ছুটতেছি। কোথায় অন্ত কে  
জানেন?

অর জাহাজীর স্বাভাবী রান্নাবান্না ও Special Dish এর  
তরির খুঁ করিতেছেন—পোলাও, কানিমা, মিচুড়া,  
পায়স (চোদ শাক না জুটুক) অনেক রকম সবজী ভূত-  
চতুর্দশীর মহিমা হক্ষা করিয়াছে। স'হেব বা যেমনদের  
কাজে ভূত-চতুর্দশী, অমাবস্তা, জাত্তবিত্ত্য, অমাবস্তা  
প্রভৃতির তথ্য আলোচনা করিতেছি। বুরাইলে অনেক  
বোখে, কেহ কেহ চমবিত ও মোহিত হয়। ভাল শ্রেণীর



ইংরেজ স্ত্রী-ও পুরুষের ভারতে ব্যপ্ত প্রয়োজন। সম্বা-  
তা শাস্ত্রব্রহ্মে আবদ্ধ হইতে হইলে পরপদের খেঁক-  
পড়া নিত্য আবশ্যক। বিনিত্যে যে সকল সংবাদ  
জাহাজে পৌছিতেছে তাহাতে বোকা-পড়ার ভিন্ন তো  
কিছু নাই। বৎসর অবধা শেচনীস, সর্বত্র তাই।

মঙ্গলবার ২১ অক্টোবর, ১৯৩০ আমাবস্তা  
জাহাজের জোঁর বাড়িতেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৮৮  
মাইল দৌড় করিয়াছে। জাহাজের দৌড়ের পরিমাণ  
উৎসাহ করাৱা অনেক জুই-বজা-খেণা হইতেছে।  
দেওয়ানী পক্ষ এইরূপেই যুক্ত হইতেছে। কালারাজে  
‘গুণ্ডন অধঃবসন’ দৌড় ধাপে রাত বাটী পর্যন্ত  
কাটিয়াছে। জাভা আন্দোলন-জাহাজে বিশেষ ‘বরশী’ আর  
খোয়াখুলা শেষ হইয়া বিজয়ী দলকে পুরস্কার বিতরণ করা  
হইলে, স্বদরদী যুক্তীর প্রোগ্রাম বেচিয়া বেড়াইতেছে।  
অসিয়া হাসিয়া দাঁড়াইতে লেগেছে হয়। যেমন এতদ্য ব্যাপার  
চলিয়াছে তেমন চলিয়াছে তার জুই অ্যাগার, মি:  
জটিল ব্যাবসায়িক, কর্ণেল উইলিয়াম, প্রোফেসর ক্রস,  
কর্ণেল বৃদ্ধান্ত, কর্ণেল কাউউইলসের সহিত নানা  
বিষয়ে সারগত আলোচনা, কলিকাতার সদস্যের ম্রিধ  
সাহাবের স্ত্রী সেন্ট এন্ড্রাসের প্রাক্তরে, তাহাব সঙ্গে  
ও অস্ত্রা মহিলাগণের সহিত আলাপ আশায়ন চলিয়াছে।

বৃহস্পতি ২২ অক্টোবর, ১৯৩০  
জাহাজ খুব চলিয়াছে দিনে ৪৮৮ মাইল চলিয়াছে।  
কাল বেলা ৯ টার সময় জাহাজ বসে বসে লালিবার  
কথা, দেশে বাইতেছি, বাড়ী বাইরে; তবু মন এত নিঃসংসার  
কেন; এত তার কেন? দেশের দিন দিন যে সংবাদ  
অসিতেছে তাহাতে মন ভাও ও নিঃশব্দ হইতেছে বিজি  
কি? ভাবান যে জান, শক্তি, বুদ্ধি ও ইচ্ছা দিয়াছেন  
দেশমাতৃকার সেবার চৌর্য তাহার ইচ্ছাকৃত জড়ী এ  
পর্যন্ত হয় নাই। কিন্তু কোথায় যে কিছু খাপ  
খাওয়াইতে পারিতেছি না। চারিদিকের সকল জোঁর  
বর্ষা ইয়া নিরাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, কঠোর  
বাহে বিলোড়ক গম্ভীর (Guncotton) দ্রিা আসতাতীর  
দল দেলপন ছই চারদিন পূর্বে উড়াইয়া গিয়াছে, কিছুদিন  
পূর্বে পূর্ববঙ্গ বেঙ্গলগণে এই ব্যাপার হইয়াছে। গুন-

থারানী দাস্তা লুট দর-আলান জেল নিত্য কর্তব্যের মধ্য  
দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

উক্ত পক্ষেই পাগলের মত ব্যবহার করিতেছে, কর্তৃপক্ষ  
কি করা উচিত তাহার স্থ-পরামর্শ চাহিলেই বা কি  
বোধ্য যায় না। বাঁহারা অস্থির অসহযোগিতা  
নামে এই আঁচন আলাইয়াছেন তাহারা ইচ্ছা কলিও  
এ আঙন আর নিবাইতে পারেন না খিরাই বোধ হয়  
রাউও টেবল কনফারেন্স না খিরাই অছিল খুজিয়া  
বাইবার দাচি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অব্যাহতি  
পাইয়াছেন।

এই তো সব দেশের দশের কথা, পারিবারিক ক্ষে-ও  
চিত্তার যমগত কারণ—যত ভারতবর্ষের নিরুদ্বাঙ্গী হইতেছি  
তত চিন্তাভাবের দ্বন্দ্ব হইয়া পড়িতেছি। রহস্ত করিয়া কেহ  
কেহ বলিলেন যে, বেরুগ স্বদরদায়ে জাহাজ চলিয়াছে—  
সকলেই যে যে বার নিজের ইচ্ছামত বুদ্ধি আশোদ  
পাঠিতেছে ও করিতেছে। তাহাতে মনে হয় আরও  
কিছুদিন এইরূপে চলিলে হয় ভাল। এত শীঘ্র বসে  
গৌদান কাহার কাহার ভাল লাগিতেছে না, বিবি  
বিবরে ভোট দিতে হয় তবে কোন পক্ষে ভোট দিব  
করা দুঃসম্যা। জাহাজ চলিতেছে ভাল—হাওয়া ভাল,  
গরম কাটাগা গিয়াছে—বাওয়া-হাওয়ার তলির রীতিমত  
চলিয়াছে—কর্ণচাচারী সকলেই আশোদে স্থ-বন্ধনের  
জন্ত সর্বদাই ব্যস্ত। P. & O. Companyর অধীনে  
প্রজন্মক জাহাজের এই শেষ বাটা বদ্বিয়া বুদ্ধি সঙ্গ  
বাতীর স্থ-আন্দ-স্থবিধার জন্ত বহুপরিকর।

সহযাত্রীগুলিও ভাল জুটিয়াছে, নতুন কত লোকের  
সঙ্গে আশায়ন হইল তাহার ইয়ত্তা নাই, কাহারও কাহারও  
সঙ্গে এ যমসে এই চিন্তাভাবগত মনেও বন্ধনের স্বরূপাত  
হইয়া গেল, কোন কাজ নাই কর্ম নাই—চকুর হাঙ্গার  
জন্ত পড়াভার বালাই নাই কেমন চিন্তা আর কথা।

নানান লোকের সঙ্গে নানা ছাঁদে নানা ভঙ্গিতে কথা  
সর্বত্রই ভাবরাজ্যের আদিশতা-স্থাপনের চেষ্টা এ স্থান  
স্বভাগি, বহু স্থলেই সে চেষ্টা কৃত্রিম বাড়িত। জগৎ সম্প্রদায়  
আছেন, শিক্ষক সম্প্রদায় আছেন, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার

সরকারী কর্মচারী, কট্টান্ত্র, সৎপাপের মহাজন সব আছেন,  
দলে দলের সহিত স্বতন্ত্র কথা অনেক লিখিতেছি; বুদ্ধি  
বা দেশহিতাবে কিছু লিখাইতেছি।

এ দিক লইতে দেখিলে নাজাজাক জাহাজে যাত্রা  
নিত্যন্ত নিশ্চল হইল।

Last night of the voyage বলিয়া বিশেষ খ্যাতি-  
নামা ইংরেজ শিল্পীর চিত্রপট বহুদিন পূর্বে দেখিয়াছিলাম।  
আজ সেই Last night—সকলেই বিদায় গ্রহণে তৎপর।  
জিনিস প্যাক ও চিঠি লেখার হাঙ্গামাও খুব চলিয়াছে।  
কর্ণচাচারীগকে নাক-পেন্স (tip) কি হার দেওয়া  
হইলে তাহার পরামর্শ ও ব্যবস্থা চলিয়াছে, খেলা-খুল,  
আমোদ-আশ্চর্য, ব্যাও, নাচ ইত্যাদি চলিতেছে। আজ  
রাত্রি আহারের পর Spanish bandএর আয়োজন।  
ইংরেজ বাজ্ঞেও জানে আমোদও জানে ও করে।

কাজ প্রদেশের পুনর নিরুদ্বাঙ্গী ভোর (Bore)  
রাজ্যের অধিপতি বিশেষ ভদ্রতা দেখাইয়েন ও আদর-  
আশায়ন করিয়াছেন। নিজ রাজ্যে বাইবার জন্ত সর্বনিঃস্ব  
আমোদ জানাইলেন।

যেদের গীড়াগীড়িতে দীর্ঘ স্বদর ম্রম কথা লেখা হইল,  
তাহারা ছাড়া আর কেই বা পড়ে যা পড়িলে। যদি তাহারা  
কিছু আমোদ ও শিক্ষা পায় তাহাই যথেষ্ট। বহু কার্য  
অধিশিষ্ট রহিয়াছে। জীবভাবনের, নাম লংঘা বৃদ্ধি  
ইচ্ছা ও শক্তির মত নিজ কঠোর সমাক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ  
দেশমাতৃকার মহাসেবায় যেন জীবন সন্ধ্যা কাটাইতে  
পারি—উদ্ভাসে এই কথা লিখিলাম।

বৃহস্পতিবার ২৩শে অক্টোবর, ১৯৩০

আজ সমুদ্র বাতায় শেষ বিন—যেমন হয় তাই হইল।  
সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, আশায় উৎকর্ষা, আশায়  
রাত্রি প্রভাত হইল, ভারতের স্বর্ঘ্য আবার ভারত গগনে  
উদিত হইয়াছে। ‘জয় জগদীশ হরে’—নিরাপদে বার চরণ  
তলে আবার কিছাইয়া আনিলে প্রভু। প্রায়জনের আশঙ্কা  
শঙ্কা, দুঃ কলিলে, ভূমি জান আবার কি গন্তব্য, কি পথ,  
কোথায় গিয়া উঠিব, চকু দৃষ্টিইন, ভূমি না আলো দিলে,  
মুক্তি দিলে কে দিবে?

বদের কুলের দৃষ্ট ভোনের আলোতেই চ’বে পড়িল।

তখন তালীবনরাত্রি নীলর শোভা কমে নাই বরং  
বাড়িয়াছে। গৌর-হস্ত-শোভাও অক্লমলীয় কিন্তু কি একটা  
দাক্ষণ অভাব বিরাট শূন্যতা বুক ভরিয়া বাইতেছে।

জাহাজে ধাবিবার নাবিবার মাঠী গোলাগোলে বহুসংখ্য  
কাটিল, বিধায়ের পালা দীর্ঘ হইল, বহলোকের সহিত  
নতুন পরিচয় হইয়াছে; বহু প্রভাচন পরিচয় ঘনীভূত  
হইয়াছে, চৌদ্দ দিন এক জাগরণ বাসে সাধন-কালার ভেদ  
অনেক কমিয়া যায়। স্বপ্নের পূর্বেই না কি সে প্রভেদ  
আবার জাগিয়া উঠে, আমার ভাগ্যে তাহা হয় নাই,  
জাহাজ হইতে নামিবার সময় ও নতুন পরিচয়ের স্বরূপাত  
অনেক হইল, জাহাজ সময়ের পূর্বেই পৌছিল কাজেই বহু-  
বাক্ষর বাহাদের বন্দরে বাইবার কথা তাহাদের পৌছিতে  
বিলম্ব হইল, চুটী, মাহল শব্দীদের হাত হইতে মাল খালস  
করিখে পৌছাসেড়ি করিতে হইল, গদগদগদ হইতে হইল।  
লক্ষণ শ্রোত্রীকা হইতে কিরিবার সময়ও এই কথা মনে  
হইয়াছিল, বিশেষে আদর-আশায়ন ও সুবিধার অন্ত নাই  
আর দেশে ফিরিতে না ফিরিতে ভূমি বুঝে তিমিরে সেই  
তিমিরে।

Incorporated Law Society's President Mr.  
Pyne স্বঃ স্বঃ আর্থর্ন কলিতে আসিয়াছিলেন এবং আসিয়া-  
ছিলেন চিরসাহসু লোকপ্রিয় কর্মঠ নীরব কর্ম সেক্রেটারী  
নায়ায়ন পাণ্ডে বহাশয়। ছই জাহাজেতে বাসস্থান নিশ্চিষ্ট  
ছিল, কিন্তু পাণ্ডে মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া বাড়ীর মত  
ধাক্কা স্বঃ হওয়াই শ্রেয় বোধ হইল, বহুকালের পর ভাব  
খাইয়া মুক্তি পরিয়া মাহুরের উপর বসিয়া পান খাইয়া  
বাটিলাম।

প্রায়র সপ্তাহ সাহেবানার পর আর তাকমহল হাতেলে  
মাস চলিঁয়া না।

দশবার জলবাতা শেষ হইল, বাহার ক্রুপায় সকল বিপদ  
হইতে মুক্ত। পাইয়াছি তাহার অভাব চরণে কোটা প্রিণিপাত।

ইজিপ্ট ও অ্যারবিয়া (Egypt and Arabia) নামক যে  
ছুই জাহাজে প্রথমবার বাওয়া আসা হইয়াছিল, তাহা যুদ্ধের  
সময় জ্বরিয়াছে। একবার (Brindisi) হইতে আইসিস  
(Isis) নামক জাহাজে পোর্ট সৈন্য পর্যন্ত আসিয়াছিল।



তাহা বিজয় হওয়ার হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে। এবার যে জাহাজে আমিরাম রাজস্বাক (Rajmahal) তাহাও বিজয় হইয়া New Zealand চলিয়া গেল। স্বামীর দয়া করে বাহাখা আশ্রয় দেয় তাহাদের অনেকের এই দশ।

মাহাদের সন্নিহিত আগ্রহে বসেছে দুই দিন থাকা বির করিয়াছে—বাহাদের পূজ পাইয়া এখানে রহিয়া গেলাম, তাহাদের কেহ কেহ বিষম বিপন্ন। ধারীনভেতা—নির্ভীক প্রিয়-ভাবী শেখাব পূর্বে হইতেই জেলে পঠিতছেন; নগেন্দ্র মাঠার (Nagendra Master) বিলাত হইবার সময় বেনোকে শুদ্ধ সঙ্গে লইয়া শিরা বন্দরে মাল্য পরাইয়াছিলেন—অন্তরের শুভ ইচ্ছার সহিত বিবাহ বিয়াছিলেন, তিনিও জেলে। পুলিশের অধিনায়করাই বধে শর ধরহরি কম্প। এডেনে আমি পাওয়ে যে পূজ পাই তাহাও গর নগেন্দ্র মাঠার কারাক্ষ হইয়াছেন—কার কখন নির্ঘাতন ও কারারোধ হয় কে বলিতে পারে?

যদি সমষ্টি Round Table Conference, House of Lords Royal Galleryতে রাজকীয় বহুতার সহিত হুলিবে। একই সভার আয়োজন—বর্ধার কাজ কতদূর হইবে কে জানে। জনসাধারণ স্বপ্নপীড়িত—উভয় পক্ষেই বুদ্ধির জটা বণ্ডেই হইতেছে।

বসেছে দেওয়ানীর ধুমধাম কিছু মাত্র হয় নাই। কোন প্রাণে ধুমধাম হইবে?

শুকবার, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৩০

পূরানন্দ্র দেশী ভাবে বেশে ও ধরল চকিশ ঘটা কাটায়া বিবেচ আরাম হইল। Incorporated Law Societyর নারায়ণ পাণ্ডে পুরা দেশী ভাবের গুজরাটী রাশ্বণ—নিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারের পরাকাষ্ঠা, নাগর রাশ্বণ-দিগের আহার্যাদি সম্বন্ধে বৈরঙ্গ কঠোরতা তাহা পূর্বে হইতে জানা আছে। ইংরেজী হোটেল কিংবা, ব্রজচরী পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করিলে একগু স্বাধীন বদশেী ভাণের আরাম পাইতাম না।

বৈরঙ্গ কাজের মধ্যে বসেছে আটক পড়িলাম, তাহার সম্বন্ধে নিম্নি কাল বধে হাইকোর্টে সত্যা পণ্যত হইয়া গিয়াছে, আজ দল্লি দলের সন্ধিত হইয়া গোলাযোগ পরিকার হইয়া গিয়াছে। বোধো বাও—যে বিবরে হঠাৎ—সুদূর তর বাহাদুর নর, আসল খগড়া পণ্যত আরম্ভ হইয়াছে,

কাজেই কাজের চেয়ে স্বকাজই বেশী। ২৩ দিনে এই সব হাঙ্গামা মিটিয়া কাল শনিবার রাতের বধে মেলে কলিকাতা বাওয়া স্থির হইয়াছে। বাহাদের সঙ্গে দেখা হইবার কথা ছিল তাহার কেহ কেহ Round Table Conferenceএ গিয়াছেন, কেহ কেহ থুগা কিংবা মার্মান এইরূপ কোন ঠাণ্ডা জায়গায় গিয়াছেন, কেহ বা অজ্ঞ কাজকর্মে গিয়াছেন, সকলের সঙ্গে দেখা হইল না, গরমের জ্বীতে হাইকোর্ট এখন বন্ধ, বাঁহারা শুনেই হইল।

বদশেী ও স্বরাজী দলগুলির মধ্যে হাঙ্গামা গোলাবাল না কমিয়া নিত্য বাড়িতেছে। বানরসেনা বলিয়া ছোট ছোট ছেলের লইয়া একদল হইয়াছে। মাজ্জার সেনা নামে ছোট ছোট মেদের দল হইয়াছে, স্বদেশী-সেনিকা সুল লোভী মেয়েদের দল হইয়াছে; এ ছাড়া পিকটল, ভলানটিরার দল প্রভৃতি আছে। নিত্য পুলিশের সঙ্গে মারামারি নিত্য হয়তাল, জেলে বাওয়া ইত্যাদি-লইয়া মাহু বেনাম অত্যাচার-জর্জবিত, তেমনই ভয় শৃঙ্খল হইতেছে। দুইজন প্রধান এটলী ও আমাদের বদ্ব দ্বানীয় Khare এবং Nagendra Das, Merchant বন্দে গিয়াছেন, বাহারা Round Table Conferenceএ গিয়াছেন কিংবা বাইতেছেন তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও অপমান ব্যাধা হইতেছে, নগরের বাণিজ্য ও জী সব অস্থিত, গরমও তেমনই পড়িয়াছে।

আজই বসার পূর্বে বখন আখিয়াছিলাম; তখন প্রসিদ্ধ ভাণের অগাধ (Wagh) এক প্রস্তর মূর্তি আশ্রয় করিয়াছিলেন, তখন তাহা শেষ হয় নাই। তাড়াতিড়ি চলিয়া হইতে হইয়াছিল বখিয়া কাজ কদম বদ্ধ ছিল, এবার দুই তিনিদিন ধরিয়া সব কাজ তিনি শেষ করিলেন। বেনোদের অমূল্য চট্টোপাধ্যায়ের কজা ও জামাতা তাঁহার পূজ পাইয়া দেখে করিতে আসিয়াছিলেন, অজ্ঞাত বন্ধ-বান্দবও অনেক দেখা শুন্ন করিতে আসিয়াছিলেন; অতএব বিশ্রামের সময় অত্র, বদশেী দলের কর্তারদের সঙ্গে বিবাহ-রাজ বিবরণ কল-ভাড়া চলিতেছে, কিন্তু বিশেষ কলসেদগের সত্যবান দেবিহেতি না। বেনোনে সঙ্গ ও জরাকর কলসেদগের হন নাই বেনোনে আমার কথা কি কলসদগের হইবে? উদারমতি বাহারা মধ্য-পন্থী তাহারাজ অনেক আমার কথা বুঝিয়েন বলিয়া বধ-হয়, আজ অনেক মিটিং ও লোকজনের সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল, সে সকল গারিবে অনেক বিলম্ব হইল।

## পূরাতন আফ্রিকা

( গল্প )

প্রীক্ষণীভূষণ রায়

তখন আমি কমিসিয়ারেটে কোরাগিগিরি করি—জা

সিলালও আমাদের আকিমে কোরাগিগিরি কর্তৃক এবং আমার সহযোগী ছিল। ইতালী যুদ্ধে তার বাঁহাত কাটা পড়েছিল—সে তখন ছিল “ননকমিশনড অফিসার”—কিন্তু জান হাতখানা বেঁচে গিয়েছিল। ভাগ্যের কথা! কারণ তার ডান হাতখানা একখানা হাতের মত হাত ছিল—কলম ধরে সে যখন লিখতে স্বক স্বক, যখন হ’ত যেন মূর্ত্য বর্ণন হচ্ছে—তা’ লেভীহাওই বনো, উকালি ধরনের লেখাই বনুন—জাঁদেয়েলা কায়দার লেখাই বনুন। যে কোনো ছাদের লেখাই বনুন—বেন মূর্ত্যপাতি—আর সবসেয়ে নাম সহী করবার সময়—কলম দিয়ে এমন একটা প্যাচাল বোঁচা মার্ত—বোঝাই যেত না নামই সহী কর—না ছোট একটা পাখী একে বলল!

খুব ভাতিজি ধরনের লোক ছিল—সিলাল! সেই পুরান আমলের সৈন্য—সম্রাটের মত সাধু, সুমারীর মতন পণ্ডিত। বয়স হ’লে বোধ হয়—বছর চল্লিশেক—এরি মধ্যে কিন্তু সোণালি রংএর দাড়ীতে পাকাপাল ছ’এক গাছা দেখা দিয়েছিল—বহুকাল “আফ্রিকার” কাটাবার জন্ত হ’য়ে হয় তা। এই প্রাচীনকালের যোদ্ধাটিকে আফ্রিকার সকলেই আমরা “ফারার রিলাল” বলে ডাকতাম—কিন্তু এই ডাকা-ডাকির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বড়টা না ছিল ততটা ছিল নয় এবং ঘণ্টা, কারণ আমার তো জানতাম—কি উচ্চ, কঠোর কর্তব্যময় ছিল তার জীবন। “এফিয়েল টাওয়ার” এর কাছে সত্য ভাঙার একটা ছোট বায়াস সে। তার বোনকে এনে জুটিয়েছিল। বোনটা বিবাহ—তার একপাল হলেপেলে—মাসের পর মাস তার উপার্জনের সব টাকা কয়টা দিয়ে তা’দের ভরণপোষণ করে যাচ্ছিল। উপার্জনই থাকি—শেষানের টাকা, বাহিনীর টাকা, “লিভিং অব

অনারের” গরু প্রাপ্তির দরশন বিশেষ পেপন—সব কুড়িয়ে পাঁচশ ত্রি (franc)—লোক কি হিঙ্গল ছাড়াই চাশন। সে বাই হোক—“ফারার রিলালের” ব্রক—কোটগুলো—হাতায় তিনটে, তিনটে বোতাম আর বকেও তিনটে করে বোতাম—সেগুলো সর্দঙ্গ রাস করে এমন চক্কে করে রাখা হ’ত যে দেখলে মনে হয় “ইনসপেক্টর বেনোরেল” আজই পরিদর্শনে আসছেন আর কি। আর রাস্তাতে বকেতে হ’লেই, “লিভিং অব অনারের” গাল ফিতা “হাল হোলো” পরাই চাই—“লাতুর” কোপানীর নুট জুতা পায়—তা’ না হ’লে ঘরের বাহর হ’বার তার উপায় ছিল না।

আমি তখন পারী সहरের দক্ষিণ দিকের সহরতলীতে বাসা নিয়েছিলাম; স্তরতঃ অনেক সময়েই বাসার দিকের পথে “ফারার রিলালের” সঙ্গে যেতাম আর মজারকর যুদ্ধের গল্প শুনতাম। “লিভিটারী” কলেজের সামনে দিয়ে ছিল আমাদের বাবার পথ—ওর ধারের কাছে এলে নানারয়ের পোষাকের নানারকম সৈজ দেখতে পেতাম—“ইন্সপিরাল গার্ডের চোখ-শলসানো পোষাক, “গাইডের” সবজ,” “ল্যাআর”দের শালা—আর “আটলারি” অফিসার-দের জবকালা—কালো এবং সোণালি রঙের পোষাক হা—ওর কম পোষাক পর্তে পেলে—ঘরেও স্থা আছে। .....বেদিন খুবই গরম বোধ হ’ত—ফারারকে বলতাম চল না একটু শালাটা ভিজিয়ে আসি—আমিই গরম করে বলতাম—জানি যে বেচাটা হাজার তুকা পেলেও খরয়ের ভয়ে ওইটুকু পণ্যত অমিতব্যয়িতা স্বীকার করবে না। সেই, সেই দিন “মাপকি”—রাস্তার মিটিটারী কাষেতে আমাদের দুই, এক ঘটা বেশ দেরী হ’য়ে বেত। রাস্তার বেরিয়ে গেলাম কি রকম উকীলনামে যে “ফারার” যুদ্ধের গল্প বলে যেতে—তা’ আপনারা বুঝতে পার্জেন।

একদিন সন্ধ্যায়—আমার এখনও স্মৃতিই মনে আছে—

• Mon Franco’s Copper La Vieille Tunisie নামক ফারী গল্পের অধ্যায়।



“মকটা” সুদিন একটু মাক্কা ছাড়িয়েই পৌঁছায় হয়েছিল—  
 যখন আমরা “বুলবুল... ” দিয়ে বাজিলাম—হঠাৎ  
 “ফাদার” একটা পুরানো মিলিটারী পোষাক বিক্রেতার  
 বোকারের সামনে পাড়িয়ে পড়লাম—এ রকম “সেকেন্ড হাণ্ড”  
 বোকারের হুড়াহুড়িই শুধু নয়—বিশিষ্ট, নোরা  
 লোকান জান্না দিয়া বোকা বাজিল—বহুকালের মধ্যে  
 পড়া শিশুর, বহুকের বাজতে বহু রকমের গোতাম—বহু  
 পুরান কোটের-কাপড়ের গালা এবং মধ্যে মধ্যে মিলিটারী  
 অবিশ্বাসের “আশ্রাধরা”—বুট এবং রোয়ে বিবর্ণ—  
 বিলাল তার বোকা হাতখানা ছিল—সেই হাত দিয়ে আবার—  
 হাত ধর—এবং একটু উত্তেজনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে—  
 হাতের লালি দিয়ে একটা পুরান আশ্রাধরা তুলে দেখাল—  
 “আফ্রিকান” সৈন্যদের কোনো কর্মজাতীর পোষাক হ’লে  
 হয় তো;—সাত জায়গায় কুঁচকান বিবর্ণ বহিও বর্ষবর্ষের  
 সামরিক “তারকা”গুলি তখনও নজরে আসছিল; বিলাল,  
 আনকে বলে—বেশই আমি পূর্বে যে সৈন্যদের কাছের  
 কতক—সেই সৈন্য গুলিরই পোষাক—যার তার পোষাক  
 নয়—যং কাপড়ের—এই বলিয়া পোষাকটাকে ভাল  
 করিয়া দেখবার জন্ত সে আদায়ী হলো। আশ্রাধরার  
 বোতামে সৈন্যদের সংখ্যা পড়ে ফেলে—মহা উল্লাসে—  
 বলে উঠল—“এ যে আমাদেরই” রেজিমেন্ট—  
 “আজিজিয়া আশ্রাধরা” প্রথম রেজিমেন্ট। এই বলিবার  
 ফাদার বিলালের হাতখানি বা তখনও সেই বহু-পুরাতন  
 পোষাকটির উপর ছাপ ছিল—হঠাৎ কেমন স্থির হয়ে  
 গেল। তাঁহার উদ্দেশ্যের মুখমণ্ডল বিবর্ণ এবং পাণ্ডুলে  
 হ’লে উঠল—ওঁদের মূর্ত্ত্বপূর্ণ হ’লে—সে অশ্রুপূর্ণ হ’লে  
 বাইরে বলল—হা ভগবান—এটা কি সেই পোষাক!  
 বলবারমতই পোষাকটাকে টেনে ফেলে দিয়ে—সে উঠে  
 পাড়াল। আমিও গুরুত্বপূর্ণ দেখে নিলাম—পোষাকটির  
 ত্রিক মাথাখানি ছোট একটা ছিঁড়—নিম্নগত বদকের  
 গুলীর—অনেক রকমের রক্ত জন্মে চারদিকটা ফেরান কাণে  
 হিন্দে—ছিঁড়টা এমন ভাববহ এবং কল কল দেবে মনে হয়  
 যেন ক্ষতটি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।  
 হা—হা—কি ভয়ানক!—বললাম আমি “ফাদার”কে  
 —ফাদার কিন্তু ততক্ষণ পোষাকটা ছেড়ে বেশ তাড়াতাড়ি

হাটতে শুরু করেছ—মাগাটা হেলিগে হেলিগে—ভাবলুম,  
 এই পুরান আশ্রাধরাটাকে নিয়ে হয়তো একটা বেশ  
 রোমাঞ্চকর গল্প আছে—তাই তার পেট থেকে কথা বার  
 করবার জন্ত বুললাম—দেখ ফাদার—সরাচার সেনাপতির  
 পোষাকের পিছনে ত গুলীর দাগ থাকে না কিন্তু সে যেন  
 গুলিতেই গেল না, তাঁর গৌরব কীমতের দ্বারা—কি যে  
 বিজুবিজু কর্তে গালগল—এটা এখানে এসে কি ফেলে! কোথায়  
 “মেলেগনানো” হুজুরজ্ঞ আর কোথায় “বুলবুল...” এর  
 পুরাতন কাপড়ের বোকার। হাঁ, জানি শুনুন প্রকৃতির  
 লোকজন—মৃতদেরের পোষাক পর্যন্ত থলে নিয়ে আসে।  
 আমি কেন ওখানে, এখানে থেকে “মিলিটারী” কলেক  
 ছ’না দূরে—নিম্নগতই সে এই পথ দিয়ে যায় নিম্নগতই  
 পোষাকটা দেখলে চিন্তে পারবে, কিন্তু কি চমৎকার  
 চেনাই চিন্বে।

—দেখ, ফাদার—তাঁর হাত ধরে নড়া দিয়ে বসায়,  
 —এ তোমার অভায় হচ্ছে, বিলাল, কি সব হেয়ালী  
 আরম্ভ করছে, তোমার যদি কোন পুরান গল্প, পুরান  
 আশ্রাধরা দেখে মনেই পড়ে থাকে—তা’ আমাকেও বলতে  
 হ’লে।

আমার কথা শুনে হিবদাল কেমন যেন অবিশ্বাস  
 দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, যেমন যেন ভয়-ভয় চাহনি  
 ...কিন্তু হঠাৎ সে মনস্তির করে ফেল। তারপর এক  
 নিঃশ্বাসে আরম্ভ করে দিল—বুললাম “বাবু”এতে আর  
 যদি পিপাসা না মিটিয়ে আসা যেত, তা’ হ’লে বিলালের  
 পেট থেকে কি? কথা কিছুতেই বেরকত না।

হাঁ, বেশ, বলছি তোমার ঘরটা—তুমি ছোঁকার বরসেই  
 বেশ ব্যক্তিগত, অনেক বিষয়ে তোমার জানাশোনা,  
 দেখ তোমার উপরে আমার খুবই শ্রদ্ধা। যখন আমার  
 গল্প শেষ হ’লে—তোমাকে বলতে হ’বে। বলতে কি বুকের  
 উপর হাত রেখ বলতে হ’বে, যে তুমি মনে কর কি না—  
 আমি যেমন ক্ষতের করেছিলাম—আশ্রাধরত? করেছিলাম  
 ...শোন, কিন্তু কোন্‌খানে আরম্ভ কর্স! প্রথমেই বলে  
 রাখছি, আমি তার নাম বলতে পার্স না—দ্বিতীয়তঃ এখনও  
 যখন সে বেঁচে আছে—তখন আমার তাকে যে ডাকনামে  
 ডাকতাম, সেই নামেই গম্ভী বলছি—“লা-সোয়াফ”—হা,

আমরা তাকে ডাকতাম—লা-সোয়াফ বলে এবং সে এই  
 নামের অর্থোপা ছিল না; কাপড় মদের দুখা সৈন্যদের  
 মনেকরই থাকে কিন্তু নাটো বাজবার তলে তাগে  
 বারো গ্রাম মদ েতে লা-সোয়াফই পাবত। আশ্রাধর  
 দ্বিতীয় সৈন্যদলে সে ছিল সার্জেণ্ট, আমি ছিলাম “সোয়াটার  
 মাইল” গুলি ভাল বোকা ছিল—খুব বোকা—কিন্তু যেমন  
 মাতাল, হেমনি বগড়াটে। আবার ছোটখাট জিনিস  
 নিয়ে প্রভাতরাটুকুও বেশ ছিল। অর্থাৎ সৈন্যদলে থাকলে  
 না’ যা’ কিছু বণ্ডন হয়—কিন্তু উভয় অঙ্গের মত সাহসী  
 ছিল সে। কি হুসনী চকু, শান সেওয়া ইপাতের মত  
 ভীক। কটা রংএর দাড়ীতে মুখ ঢাকা। তার মুখ  
 দেখলেই মনে হ’ত লোকটা নিকট প্রকৃতির মোটেই নয়।  
 আমি যখন সৈন্যদলে প্রথম ঢুকলাম, তখনও ছুটিতে ছিল।  
 ছুটি দূরাল ও পুনর্বার এসে ঢুকল। একসঙ্গে কিছু  
 টাকা পেল কি না—ওর কাণ্ড দেখে কে! জন পাছ ছয়  
 মিলে, একটা গাড়ী ভাড়া করে শহরের মত নীচ-গাড়ী  
 চু চু করে বেড়াতে লাগল। অবশেষে তাকে তারা  
 একদিন ধরাশির করে নিয়ে এল—মাথায় তারোয়ার  
 আঘাত। এক মূং-শরিকার বাড়ীতে “আশ্রাধর”  
 সৈন্যদের সঙ্গে মায়ামারি হয়েছিল—সেই হুটপোলের সময়  
 লোকটির চোটে গম্বিকাটও মারা পড়ে। সে যা হোক, লা-  
 সোয়াফ নিম্ন পনের পর ঘেরে উঠল। সে উঠবার পর  
 তার কয়েদ হ’ল—আর হ’ল “ভিগেওডেন”। এইরকম নীচ  
 দিক প্রদোশন সে এর আগেও ন’বার পেয়েছিল। এই  
 রকমের খব চরিত্রের লোক না হ’লে, কবে সে কাপ্তেন হয়ে  
 যেত। লেখাপড়া জানে সে—ভাল বোকা সে। বাবু, এই  
 মুক-মেটের খবন পর কয়েদ সে আবার প্রদোশন পেয়েছিল।  
 প্রায় বাস দশেকের পরে—কাপ্তেন সাহেবের অগ্রগেহে—  
 গার অধীন ও প্রথম যুক্ত করে।

আমাদের বুড়া কাপ্তেন সাহেব যখন সেনাপতি হ’লে  
 চলে গেলেন, তখন আমাদের কাপ্তেন হ’য়ে এলেন  
 যত্বের ছোঁকার, একজন কশিকান—নাম তার কুড়িল।  
 তিনি সব মাজ সামরিক কলেজ হ’তে পাশ করে বেরিয়ে  
 ছেন—খুব গম্ভীর প্রকৃতি, উচ্চাশা এবং কাহে-কর্মে বেশ  
 ব্যস্ত। কিন্তু বড়াকুর ছিল তার নিয়ম। কারো বদুকে

‘যদি একটু “মরগে” পড়া থাকত কাপ্তেন সাহেব “বাট”  
 ছিল দেখা যেত, তবে কিছুদিনের জন্ত শ্রীর বাস  
 দ্বার ভাঙো ঘটত।’  
 “আলফেরিয়া”তে কাণ্ড করেন নি; প্রভুরাৎ ওখানকর  
 বিশৃঙ্খলা এবং অসদৃশ্য বসায়ত করে উঠতে পারছিলেন না।  
 প্রথমই তিনি পড়লেন লা-সোয়াফকে নিয়ে—লা-সোয়াফ  
 অশ্রু ছেড়ে কথা কইল না। প্রথম যেদিন লা-সোয়াফ  
 সন্ধ্যার সময় হাজির হ’ল না, তিনি তাকে পত্রি ফাঁ  
 জরিমানা করলেন এবং প্রথম যেদিন লা-সোয়াফ মাতাল হ’লে  
 চলাচলি আরম্ভ করল—তিনি তাকে পনের দিনের কয়েদ  
 করে দিলেন। ছোটখাট, আশ-মলাটে রংএর সেই ছোঁকার  
 কাপ্তেন সাহেব যেন ছু লোহেভন্ত, রাং করলে তাঁর, গৌরব  
 জোড়া শিকারী বিভাালের গৌরবের মত ফুলে উঠত।  
 ...লা-সোয়াফকে দণ্ড দিবার সময় খুব কর্কশকণ্ঠে বলে-  
 ছিনেন—“আমি জানি তুমি কেমন—বিস্ত তোমাকে আমি  
 মায়োতা করব’না।” লা-সোয়াফ, কিন্তু কোনো কিছু না  
 বলেই বেশ ঠাণ্ডা স্থিরভাবে, সামরিক কয়েদ-খানার  
 দিকে হেটে গিয়েছিল। অবশেষে—কাপ্তেন সাহেব লা-  
 সোয়াফকে চিনতেন না, তা’ না হ’লে লা-সোয়াফের  
 ইপাতের মত ভীক চকুতে যে নিলাকর প্রতিহিংসা বিভাালের  
 মত কলক মেরে উঠেছিল, তার কথা ভাবতে ভাবতে  
 তাকে হুসনী হ’তে হ’ত।

ইতি মধ্যে সম্রাট (তৃতীয় নেপোলিয়ান) হুজ যোযা  
 করলেন। অষ্ট্রিয়ানদের বিরুদ্ধে—কাজে কাজেই “ইতালী”  
 বাবার জন্ত আদর্শদিকো জাহাজে উঠতে হ’ল। বাবু—  
 যুদ্ধের কথা এখানে আর বলে কি হ’বে...মেলেগনানো  
 (Melegnano) যুদ্ধের পূর্ণশিখি—তুমি তো জানই ঐ  
 যুদ্ধ আবার ঐ হাত কাটা পড়ে—ছোট একটা গ্রাম  
 আমরা ঠাঁবু ফেলেছিলাম। সৈন্য পরিশ্রমের সময় সেদিন  
 কাপ্তেন সাহেব বলেছিলেন যে, (লেকচার দেবার ক্ষমতাও  
 তাঁর ছিল)—আমরা যেন ভুলে না যাই—আমরা যিহরাজে  
 উপস্থিত হয়েছি—কেউ যদি কোনো, প্রকারের অত্যাচার  
 অবিশ্বাস্যের উপরে তাকে করত—তবে তাকে তিনি আশ্র  
 দণ্ডিত করতেন। কাপ্তেন সাহেব যখন বস্তুত দিচ্ছিলেন—  
 লা-সোয়াফ আমাদের পাশেই ওর বদুকের উপর কোনো



যত দাঁড়িয়ে তুলছিল—আর বিজ্ঞানের ভূমিতে খাড়া নাড়ছিল—কিন্তু সৌভাগ্যের বিদ্রূপ কাশ্মির সাহেবের নজরে ও পড়ে নি।

আমরা শুয়েছিলাম খোলা-বাকালুয়—মাঝ রাত্রিতে হঠাৎ চমকে উঠে ঘুম ভেঙে গেল। দৃষ্টিপথে উঠে বিজ্ঞানের উপর বসেছিল—সেই আমাদের কয়েকজন সৈয়দ এবং আমাদের কতকগুলো চাষী জড় হয়ে লা-সোরাফের হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। অতি দ্রুত একটি মেয়েকে—আহা মোচারীর চুলের গোছা এবং কাপড়-চোপড় সব এলোমেলো হয়ে গেছে— লা-সোরাফ গজ্ঞাচ্ছে যেন হিংস্র পশু আর মেয়েটী কাতর করে ‘মাদান’। ‘মাদান’ বলে বিলাপ করছে। লাক্ষিয়ে গিয়ে এক শিক্ষা দেব—ঠেঁষে স্বয়ং কাশ্মির সাহেব এসে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর চোখের চাহনিতে—প্রভুর দৃষ্টি ছিল ঠিক চোখে—ঐ হেঁচখাতি কিশানানটির—লা-সোরাফ যেন কুঁচিয়ে গেল। মিষ্টি মিষ্টি আদরের কথায় মেয়েটীকে আশ্বস্ত করে—লা-সোরাফকে নিয়ে তিনি নিজের তাঁবুতে গেলেন—সেখানে গিয়ে রাগ সাম্যহাত না গেরে লা-সোরাফের গালে সটান এক চড় বসিয়ে দিলেন—‘তোমার মত জ্ঞানোয়ারকে পাগলা কুকুরের মত গুলী করে মারা উচিত—যে যুগ্মতে কর্ণেলের সঙ্গে আমার দেখা হ’বে—সেই যুগ্মতে তোমার চাকরী যা’বে—কাল যুদ্ধের দিন—যুদ্ধের মার একটা কিন্তু গৌরব আছে।’

এর পরে সকলে গিয়ে শুয়ে পড়লাম—কিন্তু কাশ্মির সাহেব ঠিক বসেছিলেন—শত্রুপক্ষের কামানের শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙল। তাড়াতাড়ি হাতিয়ার নিয়ে লাইন বন্ধ হয়ে আমরা ঠাড়াশাম—লা-সোরাফ, গুরু নীল চকুতে অমন হিংস্রবার আর কখনও দেখি নি। আমাদের আশেপাশেই ছিল—তখন ‘নার্ভ’ করার হুকুম হয়েছে। ‘সলেগনা-১’ গ্রামে অষ্ট্রিয়েরা কামান খাড়িয়ে বসেছিল—ওদের হটতে হ’বে। সতর্কতায় আমরা অগ্রসর হচ্ছি—জঁ-ক্লোমিসটির বেতে না বেতেই অষ্ট্রিয়ানদের গোলা এসে পড়ল—ওদের না দেখেই জন দশকে দিশাহারী হল। তখন কর্তৃত্বারীরা আমাদের ছুটাক্ষেতে লুকাতে বলেন—তাঁরা কিন্তু ওখানেই দাঁড়িয়েই হলেন এবং আমি তোমাকে দিক বলছি—সকলের আগে সটান দাঁড়িয়ে দিলেন আমাদের সেই

হোঁকারা কাশ্মির সাহেব। আমরা শুভ্রি মেয়ে নিশাঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলাম—হঠাৎ শত্রুপক্ষের কামানের উপর দ্বিধে পড়বার হুম; হঠাৎ কে যেন আমাদের কতই দূরে দাঁতের দাঁতের দাঁত দিল—মুখ ফিরিয়ে দেখি লা-সোরাফ আমার দিকে তাকিয়ে আছে—নীচের স্টোটা ভেঙে চিয়ে যে বন্দুকে একমনে গুলী ভরছে। মাথা নেড়ে ইমারা করে সে কাশ্মির সাহেবকে দেখিয়ে বলল—‘দেখছ—কাশ্মির সাহেবকে’

‘কেন দেখব না, বেশ দেখছি’ আমি তাকে বললাম—কাশ্মির সাহেব আমাদের খেঁচে ঘোটে কুড়ি পা দূরে দাঁড়িয়েছিলেন।

‘বেশ, বেশ—কালরাত্রিতে যা’ তা বলে অগমান করেছিল না আমাকে’—বলতে না বলতে নিমুণ্ডভাবে লম্বা স্থির ক’রে হঠাৎ হাত উঠিয়ে সে গুলি করল। আমার চোখের সামনে কাশ্মির সাহেব—হঠাৎ তাঁর দেহ ঝুঁকে পড়ল—মাথা পিছন দিকে এলিয়ে এল—এক নিমেষের জুহু হাত দিয়ে মনে বাতাস আঁকড়িয়ে ধরতে চাইলেন—হাত থেকে তরোয়াল পড়ে গেল—ভিনিও সংজাহীন হ’য়ে গড়িয়ে পড়লেন।

‘ঘুনে-ভাকাত’ বলে আমি লা-সোরাফের হাত ভেটী চেপে ধরলাম। কিন্তু সে আমার বুকে বন্দুকের হাতল গুরিয়ে এমন খা মারল যে তিন হাত দূরে গিয়ে চটকে পড়লাম।

—গ্রাফ—আহা হাথক কে প্রমাণ করবে—আমি যে মেরেছি!

মরিয়া হ’য়ে উঠে পড়েছি—কিন্তু দেখি, আর সকলেও এখন উঠে দাঁড়িয়েছে—আর আমাদের কর্ণে সাহেব—মাথায় তাঁর টুপি নাই—একটা ঘণ্টাক ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঠাঁয়কার করে বলছেন, এসোরা, এসোয়—সঙ্গী নিয়ে কামিয়ে পড়—অষ্ট্রিয়ান কামানের উপর—অষ্ট্রিয়ান কামানের উপর—

তখন আর আমার কি করবার ছিল—কিছুই না—সকলের সঙ্গে আক্রমণের যোগ দেওয়া ছাড়া—সেলেগনানো রণক্ষেত্রে আলজীরীয় সৈন্যের সেই আক্রমণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা—তোমাকে আর নতুন করে বল কি—যে পরে দিনে পাঁচাত্তর উপর অশাশ্বত সমুদ্রে তরঙ্গ নিমেষে দেখেছ

তো। আমি তাই বেনে সেদিন নিজের চোখে দেখেছিলাম। ঝটকি-বিশুদ্ধ টেঙুলো যেন—প্রপাতের মত গিয়ে পাঁচাত্তর গায়ে পড়ে—সকলের পির দল ফরাসী সৈন্য ভেদন করে কাঁপিয়ে পড়ছিল। কিন্তু, ভিনবার অষ্ট্রিয়ানদের জলধ কামানগুলো ফরাসী সেনার নীল পোষাকে ঢেকে গেল—ভিন ভিনবারই পাঁচাত্তর-আহত ডেউয়ের মত ফরাসী নৌবোকে বিমুগ্ধ হয়ে হটে আসতে হল।

চতুর্থবারের আক্রমণের পালা পড়ল—আমাদের দলের উপর। ভিন খাচ্ছে আমার গিয়ে কামানগুলোর সামনে ঠাড়াগেম—বন্দুকের হাতলের উপর ভর দিয়ে লাক্ষিয়ে গিয়ে পড়ল—এমন সময় প্রৌঢ় গোছের একজন অষ্ট্রিয়ান তরোয়াল দিয়ে আমার বাঁ হাতে এমন আঘাত করল যে যেন হ’ল বা হাতখানা উড়েই—বন্দুক হাত হ’তে খসে পড়ল মাথা ঘুরতে লাগল—আমি একখানা কামানবাহী গাড়ীর চাকার কাছে—কাঁ হ’য়ে পড়ে—অন্তেষ্ট হ’য়ে পড়লাম।

যখন চকু মেলালাম—তখন দূর হ’তে গোলাগুলির শব্দ আর শোনা যাচ্ছিল না। আমার সঙ্গীরা অষ্ট্রিয়ান কামান-গুলোর চারদিকে ইতস্ততঃ দাঁড়িয়ে ‘জয় সন্ন্যাসের জয়’ বলে উঠল এবং হাতের বন্দুক নেড়ে ঘুর আন্দোলন করিল। ঘোড়া ছুটিয়ে এতদন সময় একজন বুড়ো সেনাপতি এসে পড়লেন—তাঁর দলবল নিয়ে। তিনি এসে তাঁর ঘোড়া ধালালেন—সোনালি কাঁধ করা মাথার টুপি উঠিয়ে আমার সঙ্গীদিগকে অভিনন্দন করে বলেন—‘সাবাস, সাবাস—আলজীরীয় সৈন্যগণ পৃথিবীর সবচেয়ে দেরা বোদ্ধা তোমরা।’

আমি তখন অতি কষ্টে উঠে বসেছি গাড়ীর চাকটা ধরে ডান হাত দিয়ে আমার আহত বাঁ হাত খুব চেপে ধেছি—তখনও কিন্তু সকল চিন্তা ছাড়িয়ে একটা চিন্তা আমার মনে ভাসছিল—আ লা-সোরাফ কাশ্মির সাহেবকে গিমনাটিকে গুলী করে মারল।

সম্মুখে চেয়ে দেখলাম—সঙ্গীদের পিঠেরে ফেলে—ই’এক পা করে ও বুড়ো সেনাপতির দিকে এগিয়ে এল—ঈ—সেইই লা-সোরাফ—কাশ্মির সাহেবের হত্যাকাণ্ডী—মুগ্ধ ওর মাথার আরবী ফেজ কোথায় উড়ে গেছে—মাথায় প্রাকটু গাড়ীর দ্বন্দ—তখনও নাক মূখ বেয়ে

রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। এক হাতে ওর বন্দুক—আর এক হাতে একটা ‘সঙ্গীদান’ পতাকা—শতজিহা—রক্তপঙ্কিত—শত্রু পুরাণের কবিরে ওঠে ও ছিনিয়ে এনেছিল। বুড়া সেনাপতি প্রশংসমান দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে সেই জয়-নিবর্ণনটী দেখলেন—তারপর তাঁর ‘এডিক্ট’—এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন—‘দেখছ ত্রিকুর—বোদ্ধা বটে এরা—লা-সোরাফ গম্ভীরকণ্ঠে বলে উঠল—‘আপনি সত্য বলেছেন সেনাপতি—কেন হ’বে না—আলজীরীয় সেনাদলের প্রথম রেজিমেন্ট যে—তবে আর একবার আক্রমণ করতে পারি এই কুচী লোকই আমরা বেঁচে আছি।’

—তোমার বীর উক্তি! জন্তু তোমাকে দস্তাব—পদক পাবে বুঝি জানি?

‘কোন বোদ্ধা—কোন বোদ্ধা’—বারবার এই কথা শোনা গেল। সেনাপতি ‘এডিক্ট’কে আর যেন কি বললেন—জানই তো মুগ্ধ-মুগ্ধ লোক আমি মানে বুঝি না—বলে দিলেন—কেননা—না ত্রিকুর যেনস্ট্রার্চ (Plutarch) এর কোনো চরিত্র কথা বলছে।

হাতটা বড় চিন-চিনিয়ে উঠল—আমার মাথা ঘুরতে লাগল—আর কিছু দেখতে, অন্যত পাক্ষিলাস না—মুছিত হ’য়ে পড়লাম।

বাকীকিছু তোমার জানা আছে। তোমার কাছে অনেকবারই বলেছি—ভাঙ্গার আমার হাত কেটে ফেলল—জঁমাস ঈসপাতল ময়মর অবস্থায় কাটাতে হ’ল। রাত্রিতে যখন ঘুম আসতে না—তখন মনে মনে ভাবতাম—কি আমার কবী উচিত হ’ তো লা-সোরাফের বিরুদ্ধে সব প্রকাশ করে দেওয়া। অবশ্যই দেওয়া উচিত—কিন্তু ‘প্রমাণ কর’ কি করে? আর লা-সোরাফ—নন্দাতক—কিন্তু বীও বটে—কাশ্মির জাঁতিলক হতা করেছে—কিন্তু শত্রুর হাত হ’তে ই তো ‘শতাকা’ ছিনিয়ে এনেছে—ভারতে, ভারতে আমি কিছুই দিক করে উঠতে পারতাম না। তারপর যখন সেরে উঠলাম—তখন স্তন্যাম মুগ্ধক্ষেত্রে বীরদের জুও ‘লীজিন অ’ আদরের পদক পেয়েছে এবং ‘ইস্পীরিয়াল’ গার্ড দলে উন্নীত হয়েছে। পদক ও পদোন্নতি ওর প্রাণাই—তবে কি না—আজকে



এসব মনে হ'চ্ছে কতদিনের ঘটনা—বহুদিন না-সোহাগের সঙ্গে দেখাশুনা নাই—আমি এখন কোরাগিরি করি—ও পূর্বের মত সৈন্যদলেই আছি—আজকে হঠাৎ পুরানো কাপড়ের দোকানে সেই “আঙ্গুরাখা”—সেই শেহন থেকে মারা গুলীর দাগ দেখে—ভগবন জানেন কার হাত হ'তে গুলীটা এসেছিল—মনে হচ্ছে পাণের এখনও প্রায়শ্চিত্ত হয় নি—কাপ্তেন জাঁতিলের হৃদিত আত্মা এখনও হুঁশিয়ার করে নি।

আমি যথানুযায়ী “কাদার হিদ্দাল কে (Vidal) শাস্ত করবার চেষ্টা করলাম—সে বলতে বলতে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল—আমি তাকে বরাস—হতাশাকারী তবু বীরও বাটে—বাক্য চূপ করে থাকুই ভাল হয়েছে!

দিন করেক পরে আফিসে এসে দেখি—হিদ্দাল আমার চেয়ারে বসে আছে—একুশখানা খবরের কাগজ আবার দিকে ঠেলে দিয়ে সে বলল, “জান কি ব্যাপার?”

আমি খবরের কাগজখানা তুলে ধরে পড়লাম—“মদ-খাবার বাড়াবাড়িতে আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। গত কাল ‘হৃৎপূর্ব-বেলা’—‘হায়ে’ (ডাক নাম না-সোহাগ) আলজীরিয় সৈন্যদলের সার্কেট—জ'জন বন্ধকে নিয়ে

“বুলবুলার—” এর “বাহের” সমুখে রাস্তায় বসে—রাসের পর রাস মদ ওড়াচ্ছিল।” সেই সময় রাস্তার ওপারে একটা পুরানো কাপড়ের দোকানে—একটা মেথাকের উপর তার নজির পড়ে—নজির পড়তেই সে হঠাৎ কেপে উঠে। সন্দেহ উঠিয়ে সে রাস্তায় থাকে তাকে আক্রমণ করতে থাকে এবং চাঁৎকার করে বলতে থাকে “নরহত্যা আমি করি নি—আমি মেলেগানানো রথক্ষেত্রে—অস্ট্রিয়ান-পতাকা জয় করে এনেছিলাম”—তার সঙ্গীষর অনেক কষ্টে তাকে পাকড়াও করে। তাকে মিলিটারী হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু সকলেই বলছে এ হতভাগ্যের প্রকৃতিত্ব হ'বার আশা খুব কম।...

আমরা বিশ্বস্ত হয়ে জানি—সত্যসত্যই “হায়ে” মেলেগানো রথক্ষেত্রে প্রকৃতিত্ব দেখাবার জন্য “পদক” পেয়েছিল এবং মদ খাবার বন্ধ জ্ঞাপনের দরুন কোনদিন ‘কাপ্তেন’ হ'তে পারে নি।

যতক্ষণ পড়ছিলাম—কাদার হিদ্দাল মৌন-গম্ভীর নেড়ে আবার দিকে তাকিয়ে ছিল—তারপর ধীরে ধীরে বলল,—কাপ্তেন জাঁতিল “কর্ণিকান” ছিলেন—একদিনে তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ হ'ল—তাঁর আত্মা রক্ত তর্পণ হ'ল।



## বিসর্জন

শ্রীহরপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রচণ্ড মার্চওকরক্লিষ্ট বহুদিকার যখন হাংকায় উঠে তখন সভ্যসামাজ্যের অন্তরালে নিহত প্রান্তরে নব-জীবনের বীজ বপন পরিবার ক্ষেত্র—অন্তত কবিতাে তাপদগ্ধ দেহে নীরব কর্মী ব্যস্ত থাকে। মহাস্রাংস্তর তীক্ষ্ণ রশ্মি-অলায় মাতার তপ্ত ক্ষয়খণ্ড ক্রমে জুত হইতে জুততর বহিতে থাকে এবং শেষে প্রলয়ের বাতাস স্বজন করে। সেই ঝটিকা দেখিলেই বারিবাহনের বণ-ভেরী বাধিয়া ওঠে, আর উচ্চ হ'তে পল্লভ প্রবলবেগে নামিয়া আসে; তাহাতে ভূমূল সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। সেই আহবে স্ফুটিতের আশ্রয়রূপ কত উন্নতশির তরুভাঙ্গি—কত গর্গ-বদ্ধিত সৌন্দর্যশির ভাঙ্গিয়া গুলিমাংস হয়। দীনের সূচীরও নিস্কৃতি পায় না। গৃহহীন নীরব কর্মী নিরুপায় হইয়া বিবেধেরে নাটমন্দির আশ্রয় লয় ও প্রকৃতিপুঞ্জের তাণ্ডবলীলার অবমানের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। অবসর পাইলেই সে একবার উর্দ্ধে চাহিয়া বিধিপতির চরণে প্রণিপাত করে এবং আশায় ক্ষুদ্র বাদিয়া সজীবনী-বীজ ছড়াইয়া দেয়। তারপর তাহার চির-আহৃত গৃহ ও দৈন্যের মধ্যে বসে কয়েকটা দিন কাটাইবার জন্ত ঘরে চলিয়া যায়। উৎসাহিত ছই একটা তরুশাখা নির্মিত ও তারুক্ষের ছই চারিটা ছিন্নপ্রয়োজ্যাদিত অপূর্ণ স্বপ্নাসে তাহার মহদমিথ্যা ভবিষ্য-কর্মীকে তার দেহ-পাড়া দিয়া রক্ষা করিতেছে। কিন্তু কর্মী যখন দেখিল কত পুরাতন সদন শ্রীহীন হইয়াছে, কত নুতন নিবাস রেখরির শরীরে লাহুনা ও অবমাননার দাঙ্গা দিতেছে, তখন নিজের ঘরের দিকে একবার না চাহিয়া সে ছুটল, বিপর্য্যস্ত প্রজ্ঞামণ্ডলীর ভগ্ন-গৃহ পুনঃস্থাপন করিতে অথবা নুতন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি নির্মাণ করিতে। তাহার এই কর্ম শেষ না হইতেই নির্দম মহীঘরের পাথাবণক বিদীর্ণ করিয়া পরিত্রীর অবক্ক মেঘধারা প্রধাববেগে চারিদিক প্রাণিত করিয়া দিল। কর্মী

আবার ছুটিল—সেই অপ্রত্যাশিত অন্তরিক্ত মেঘ-ধারা স্থানে স্থানে বীথিয়া রাখিল, ভাবিল—জীবন লাভ করিলে তার পরিপোষণের নিমিত্ত বর্ষান্তে প্রয়োজন হইবে; কর্মী নিজের প্রাণধারণের উপযোগী বৎসাব্যস্ত রাখিয়া তাহার সমস্ত উপার্জন বিশ্ববাসীর আনন্দের জন্য উৎসর্গ করে। তাহার বাতানী সর্বপেক্ষা অদিক। প্রতি-নিমিত্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া দিব্যবাসনে যখন তাহার দেহ রাস্তা হয় তখন সে নীরবে মাতার বক আশ্রয় করে, দিবার আলোকে জাগ্রত হইলে সমস্ত গৃহ-দৈন্ত ছুটিয়া মাতার কার্য্য করিতে পুনরায় চলিয়া যায়।

এইরূপে অগালাম গ্রীষ্মের অবমান করিতে যে বীর-দর্পী বর্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেও চম্বিয়া গিয়াছে। বারি-বাহনের বিরম-নিদান ক্ষান্ত হইয়াছে। পবনের প্রবল বাহিনী শান্ত হইয়াছে। গগনবজ্রকে চপলের ক্ষণহাসি ধামিয়া গিয়াছে। শরৎ শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে। বিধগ-কুল আনন্দে আকুল হইয়া তার অভিক্রমে সঙ্গীত গায়িতেছে। তার দ্বিগ্ধ শাসনে চারিদিকে শান্তির পাখা বিরাজ করিতেছে। লতাগুচ্ছ তরুভাঙ্গির অক্ল কুণ্ঠসে হার ছলিতেছে। শ্রামদা ধরণীর বক্ষে নবজীবনের বীজ গুণবিসমুৎখেলা করিতেছে। তারকাভূষণ নিশানান্যের অবরে জ্যোৎস্নার হাসি ফুটিয়াছে। নবজীবনের আশায় তৃত্যায়ের অন্তরে একটা আনন্দের উৎস উঠিতেছে। এমন সময় মৃদুয়া প্রতিমার বিশ্বজননী মহামারা অস্রাশক্তিরা আবাহন হইলে, তাঁর সঙ্গে শ্রীবিধা সিন্ধি শৌণ্ডি আহৃত হইলেন। মৃদুয়ার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইবে তিন চিস্মায়—হইয়া বজ্রবানের, পুরোহিতের, পৌর-জনের সাক্ষ্য-কর্ম-পূর্ণ করিতে বসিলেন।

সেই পুঞ্জার নিমিত্ত বিশত তিন দিন আনন্দ উৎসব চলিয়াছিল। আজ সেই প্রতিমার বিসর্জন। নদীতীরে হলে দলে আলবলবুধবগিতা সাধামত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া এই বিসর্জন দেখিতে চলিয়াছে। আমি চলিয়াছি আর



ভাবি—বিস্মন্ধ কেন? বিস্মন্ধনের পর এই আনন্দ কোলাহল নির্ভা যাবে। তখন মনে হইল আছ 'বিজয়া দশমী'; বিস্মন্ধনের পর সিদ্ধি প্রাপ্ত করে বিজয়ার আমন উপভোগ করিতে হইবে। কিন্তু—ব্রাহ্মসান্নাসের তা পূর্ণহই চিহ্নাচার বিস্মন্ধন দিয়াছেন, তাহার শব্দ সিদ্ধি সম্পদ শৌখি বিজা বাহা ছিল সবই গিয়াছে। বাকী ছিল মাজার প্রতিমা, তাহাও ভুলে ভাসাইয়া দেওয়া হইবে— থাকিলে কি? বাহার জন্ম সিদ্ধি দেবন করিয়া আনন্দ করিতে হইবে? তবে যে বিজয়া এ সিদ্ধি কাহার? এমন ভিতর একটা শিবম ধাৰ্য্য পোয়াইয়া উঠিল। হঠাৎ একটা লোক পদ্মং থেকে বলিল,—এ সনাতন ধর্ম সকলের ধর্ম, এখানে হিন্দু-অহিন্দু— দেব নাই, সকলেরই সমান আনন্দকর।'

কিরে দেখি লোকটা কিশোর নহে, বয়সের চপল ভঙ্গি নাই; যুবক নহে, অস্থিরতা বক্ষ বিক্ষারিত হয় নাই; বৃদ্ধও নহে, নৈরাগ্রে তাহার জাহ্ন ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই; তার ভাতি বোঝা গেল না, কারণ যেত, ক্রম, পীত বা পীতবের কোন বর্ণই ভালমত প্রকাশ পাইতেছিল না। তার দেশটা ধরিতে পারিলাম না—কারণ বিলাসবাজক কেশ-বিক্ষাণ নাই, হৃদিত মস্তক বা চুটকাটাও নহে, রমণীয়ও কেশরাম নাই, শিরে কোন প্রকার শিরস্কাণ নাই। ধর্মও বৃদ্ধিতে পারিলাম না—কারণ তার তিলক নাই, অঙ্গ-দণ্ডের অপূর্ণ আন্দোলন নাই, উৎসাহোদয বা একেবারে উৎসাহ ম্রুগ নহে; পরিবেশেরও কোন পারিচয় নাই। সে কিঞ্চি কি শব্দ বৃদ্ধিতে পারিলাম না। দৈত্যের দাশন ছিল তার অঙ্গে কাঁকা ছিল, কিন্তু দীপ্ত আশার উজ্জ্বল কিরণ তার ভীত চক্ষু হইতে বাহির হইতেছিল।

আমি বিজ্ঞাসা করিলাম—'একলের আনন্দ' কোঁদার? বিস্মন্ধনই বা আনন্দ কেন?'

সে উত্তর দিল—'বসমানের আনন্দ'—বর্ষা, পুরোহিতের আনন্দ—দক্ষিণার, পুরবাসীর আনন্দ—অশ্রু-কৃত্যের আর বিধবাসীর আনন্দ বিস্মন্ধনে। আনন্দময়ীর বিস্মন্ধনে আমাদের অশ্রু আনন্দ পূর্ণ হয়। বসন্তের উল্লাস, নিরাশের উজ্জ্বল, বর্ষার বেদনা শরতের হাসি, হেমন্তের ক্রন্দন শিশিরের শোক-বদন আমরা দহিতে পারি। কাগজকে

বিষপ্রাণ বিভাব্যুর সম্বংসর ধরে আনন্দ প্রাণের আনন্দে দেখিতে পারি। দিনের আলো রাতের আঁধার, স্তম্ভপঙ্কে অস্ত্রাবর, ক্রমপঙ্কে অপক্কে, মাসের মাসভক্তি আবার আলাসের সলীলতা সমান আশ্রয় নিতে পারি। বোল আনা আনন্দের অধিকারী হইয়া সাত আনয় প্রাণদায়ক করি, পাঁচ আনা পাঁচ জন আত্মীয়কে বিতরণ বরি আর চার আনা চতুর্দশ জন করিতে রক্ষা করি।'

লোকটা এই বলিয়া জনমুখে মিলিয়া গেল। আমার মনের ধাঁধা ঘুটিল না। বিস্মন্ধন যেখা কাহাকে হামিতে, কাহাকে কামিতে, কাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া ঘরে ফিরিলাম। ঘরে আমিরা সিদ্ধিটা কিছু বেশী মাজার সেবন করিলাম। অময়ের সকল ভাব পোষন করিয়া কাঁচ হামি হামিয়া শব্দকেও আলিঙ্গন করিলাম। বিজয়ার জীতি-আলিঙ্গন শেষ করিয়া বনন ঘরে ফিরি, তখন দেখি সিদ্ধি নেইটা বসে চড়িয়া উঠিয়াছে। মাথা গরম হইতেছিল ক্রমে জলিয়া উঠিল আর চারিদিক আলোতে ভরিয়া গেল। আমি আরাম কেশরাম শুইয়া পড়িলাম। সেই আলোর মধ্যে বা তগবতী তাঁর পূর্ণ বরুণ নিয়ে দীর্ঘে দীর্ঘে প্রকটিত হইলেন।

আমার আচারে নিষ্ঠা নাই কিন্তু ধর্মের ভক্তি আছে। ঘরে বিবাস নাই, কিন্তু ভাবে শান্ত আছে। বাহ্যতে বদ নাই ভগবান পরজীড়ন দেখিলে দাঁতবাজও কম্পিত হয়। কোন সম্পদ নাই তবু পরহৃদয়ে বেবনা জায়ায় ওঠে। রূপের গৌরব নাই অথচ প্রাণে প্রেমের তরঙ্গ খেলে। শিরে বিজার ভার নাই কিন্তু মনে জিহবার ঘৃণা আছে। আমি বলিলাম,—'মা! সত্যই কি এসেছিল, না কোন অতীত যুগে হিমাব্রি-ভবনে তোরা আগমন হ'ত, বিশ্বস্তার আশ্রয় সরিতে তার যে অনিনয় হ'য়ে গেল, আমার উমা মৃত্তিকে কুই সেই অভিনয়ের প্রতিক্ষেপ মাত্র।'

মা বলিলেন,—'আমি নিত্যও সত্য, ব্রাহ্মহর নরের ওননী সঙ্গীতবের সর্গানন্দকরী মহাপ্রাণশক্তি। আমি যেখানে অভিনীত হই সেখানে উপনীত হই না। তবে আনন্দ-ময়ীর অভিনয়ে যে আনন্দ আছে সে আনন্দ অভিনেতৃগণ ও দর্শকসম বধাপ্রাপ উপভোগ করে। প্রাণময়ীর অভিনয়ে প্রাণের উৎস কিছুক্ষণ ছুটতে পারে, তারপর জ্বাখ শিরে ফেলে, প্রাণ নিশ্চেষ্ট হয়। কিন্তু সত্যসঙ্গীতি না

আবাহন আবির্ভাব নহে, উদ্বোধন; আমার বিস্মন্ধন ভিত্তোভাব নহে, তাহা অস্থানিমান। অজ্ঞানের প্রভাবে জাহ্ন জীপ আমার নিত্যতা উপলব্ধি করতে পারে না। প্রাণময়ী আমি উজ্জ্বল হলে প্রজ্ঞানের সর্গাশিবকে শিরে ধারণ ক'রে দশভুজ দশ দিক হ'তে সিংহবিরজে' পলতাবদ্ধ হ'তাতারী অস্থরের দমন ক'রে থাকি। তখন সিদ্ধিসম্পদ এসে আমার দক্ষিণ দিক আলোকিত করে, শৌখি ও বিজা এসে আমার বাম দিক ভূষিত করে। আমি আনন্দময়ী, বিনাশের আনন্দ পেতে অস্থরের বসন্তে আমার উদ্বোধন করে; সূচতার আনন্দ পেতে দেবতার শরতে আমার উদ্বোধন করে। অস্থর-নিদ্রা, দেবতা-সরসকণ্ঠ আমার নিদ্রা দেখানে হয় দেখানে আমি নিত্য বিরাজ করি। চমকের তুরাণপাতে অদ্বিহ্ম হ'লে, অতাতারের কশাঘাতে সেই অচল হ'লে মাহুর কঁপে আমার উদ্বোধন করতে চায়; কিন্তু আমার মহাশক্তি ধারণ করবার প্রতিমা গড়তে জানে না। বনন ব্রহ্মচর্য শিরী অনিত্যকূলের উচ্ছেদিত হৃদয় কাঠ, পরাশরীজন বরকরকৃত ক্রমগম্ভ আর নিত্য বদনহিত হের মুক্তিকার সংহতিতে আমার প্রতিমা গড়বে; বনন জ্ঞানশিখী জাহ্নল অদ্বৈত-ময়ে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে, বনন বনবাং বসমান ব্রাহ্মভরণ দিয়া তার নয়তা ঢাকবে, বনন ভক্তপূজারী প্রভার সন্তার বহন করবে। তখনই আমি মহাশক্তি হ'য়ে দেখা দেব। আমার শক্তির প্রভাবে প্রতিমাও সত্য হ'য়ে বাবে। জন্তরের অস্থরে সে শক্তির নিদ্রা হ'লে ভবাপ্রাণে প্রতিমা বিস্মন্ধন করবে। যে উপর উপর দেখে যে বিজয়া সেবন করে আমার নিত্য প্রতিমা দেখতে পার না। আর যে অস্থরে জ্বা হয়ে দেখে সে বিজয়া সেবন না করেও আমার প্রাণময়ী প্রতিমাকে গড়ে সকল সিদ্ধিলাভ করে। সম্বংসর অনেকবার ঘুরে এসেছে; কিন্তু যে সম্বংসরে আমার আবাহন হয় সে সম্বংসর তো কই আসে নাই। এখনও তোমাদের পৈতৃক ঠাঠামানা ভয় চটমিওপে বতীকের আরবল ঢাকা রয়েছে। আমার প্রতিমা গড়তে শিল্পীকে বোঁধ, প্রাণদ্যক জাগাও, জ্ঞান পুথির মধ্যে না রেখে শিরে দরতে বল, উপার

বসমানকে উজ্জ্বলিত কর, আবাহন সাধাংকে শ্রদ্ধারপ করতে বল, চটমিওপের সংহার কর। আমার আমি প্রচণ্ডশক্তি ধারণ কর। দেবতার নিজেদের তেজ পূজীকৃত করে আমায় জাগিয়ে দিল।, অস্থরেরা আচরণ বিজা আমায় কিনেছিল। তারা জানত আমি তাদের প্রাণের শক্তি। তাদের মত প্রত্যেক শক্তিবিদ্যকে প্রত্যেকের প্রতি প্রদানিত কর। প্রত্যেকের শক্তি প্রতি করে পূজীকৃত কর। সকল অস্থর শক্তি দেখে কেশীকৃত কর। দেখবে আমি এক অস্থিতীয় মহাশক্তি। যুত্বাহন মহিরাহরণের অত্যাচার হ'তে তোমাদের রক্ষা করতে বিরাট অস্থব চান্না করছি। জানবে, এ অস্থর আমার বলে বলীয়ান। আমার মহিমা প্রচার করতে এ অস্থরকে আমিই কল্পনা করেছি। তাই দেবতার মত এ অস্থর আমার বদি অমৃতত্ব লভিবে তবে এমন করে আমার পূজার দূরত হও।

আচারেই বাতহ্য রক্ষা করে; আচারে নিষ্ঠা-ভক্তির নিরপ্ন। শব্দ আকাশে বিলীন হয় অর্থ থাকিয়া বায়। ময়ে বিবাস ক, বয়োজ্ঞারনে ভাব শুষ্কী হ'বে। বলের অস্থশীল কর, বাধা দিতে সক্ষম হ'বে; তপস্কর, সম্পদ আপনি আসবে, অনৌপার্ণের আক্ষেপ রহিবে না। বিব-রূপের উপাসনা কর, রূপ ছুটে উঠবে; প্রেম প্রত্যাখ্যাত হ'বে না। বিজার আলোচনা কর, অবিজা লজ্জায় লুপ্তবে। আমি সত্য বলছি—আমি প্রাণ, আমি শক্তি, আমিই বিশ্বের জননী। যে আমার আবাহন, বিস্মন্ধন জানে সে কর্মণও প্রাণহীন শক্তিহীন হয় না।' এই বলিতে বলিতে মা অস্থরিত হইলেন।

ক্রমে সে আলোক অশ্পষ্ট হইয়া গেল। ঘূমের আবাহন সব ঢাকা গড়িল। বনন যুব ভাঙ্গিল তখন শুনিতে পাইলাম কেঁ দেন আমায় ভিতর হইতে বলিতেছে—'আমি প্রাণ, আমি শক্তি; আমি প্রেম আমি ধর্ম; আমি সিদ্ধি, আমি সম্পদ; আমি শৌখি, আমি বিজা; আমি তেজ, আমি বশ;..... মোহোহং।' এখনও সে পলনি বেদে কোন দূর-দূরত্বের হইতে যুগ্ম-যুগ্মের ধরিয়া ভাঙি আসিতেছে। তোমরা কি শুনিতে পাইতেছ?



# পূজারী

(চিত্র)

শ্রীমদীগোপাল নিয়োগী

পূজারী নিত্য পূজা করে। কি যে তার একাগ্র ব্যগ্রতা কে জানে! বাহুজগতের পরিচয় যেন সে রাখতেই চায় না। সাজিভরা রাশি রাশি ফুল—ডালভরা নানা উপচার—পূজার কত আয়োজন! পূজার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কত ভক্ত-বর্শক সমবেত হয় সেই মন্দিরতলে; কিন্তু তাদের প্রাণের গভীর মমকথা পূজারীর দ্বয় স্পর্শ করে না—তার পূজা পার্বনিক্ত—বেদীপরে বিগ্রহের মূখের উপর কি যে মলিন বিষয়তা তখন ফুটে ওঠে তা তার চোখেই পড়ে না।

সেদিন সব আয়োজন ঠিক—নেই শুধু দুর্দ্বাদল। পূজারী বেরিয়ে যায়—কি-প্রপণে—মুক্ত হার দিয়ে—দুর্দ্বার অহুসন্ধান—কণেক পরে আবার ফিরে আসে। কিন্তু হার, জোড়ের বর্শশিখা তখন পূজারীর নামে প্রতিভাত। অহুসে ছিল শিশুর দল ব্রাহ্মণের অহু-পবিত্রির হুসোমে নৈবেদ্য উপচার নিয়ে তাদের অভিনয় দেখে পেছল—তাদেরই উপর ব্রাহ্মণের সমস্ত শোভ-পূর্ণন বহিত হ'ল। শিশুর সরল অজানতার ভিতর থেকে যে অভিনায় তখন জেগে উঠল তা' নিঃস্বভাবে গিয়ে বাহুল দেবতার অন্তরে—তাদের অশখারা নামবার পূর্বেই

যে দেবতার অশখল পো নে দেখা দিয়েছিল তা' পূজারীর লক্ষ্যেই এ'ল না।

মধ্যাপূজার সময় হ'য়ে আসে; ব্রাহ্মণ এল পূজা করতে। কস্ত সর্গনাশ, দেবতা তো নাই! পূজারী আকুল হ'য়ে মূল্য লুটিয়ে পড়ে। দেবতাহীন শূন্য মন্দিরে বিঘের হাটাকার যেন তা'কে বিজ্ঞ করে উঠল। দুর্দ্বাদল, পূজোপচার অবহেলায় পড়ে থাকে—পূজারী মন্দির থেকে দীর্ঘে দীর্ঘে বেরিয়ে আসে—তারপর—চুটে চলে যায়—অনির্দেশের পথে। একটা বিরাট, নিঃস্বতা যেন তাকে উদ্ভাট করে দিলে।

যহদিন পরে—ব্রাহ্মণ ফিরে এল। এবার তার মুখে এক নতুন প্রেমের সন্দোহন মাড়া দিয়েছে। সে এ'ন বালকদের নিজেই থাকে—তাদের সেবা তার শ্রেষ্ঠ ব্রত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পূজামণ্ডপে দেবতার পুনরাবির্ভাব হ'য়েছে। পূজারী এখন নতন করে নতন অহু-প্রেরণা অহুত্ব করে—শিশুর অস্তরের ভিতর দিয়ে যেন সে ভগবানের অন্তর দেখতে পায়—আর দেখতে পায় মহান পবিত্রতার প্রতিচ্ছবি।

## হতশ্রী

শ্রীমূলতা সেন

মুকুতে হেরিয়া আপনার ছায়া শিহরি উঠি  
কক চিত্রর কপালে, কপোলে প'ড়েইশ্রুটি  
পলক বিক্লান আবার গুণল নরন তারা  
চাহিয়া রয়েছে উদাসীনার মত, লক্ষা শ্রাব্য  
কাহারে বাধিতে চাহিছে আমার এ বাহুজুটি  
মুকুতে হেরিয়া আপনার ছায়া শিহরি উঠি।  
চরুণের তলে কেন বারে বারে টলিছে ভূমি?  
ওকি চায় বোরে আদর করিতে চরু ভূমি?  
প্রিয়ারে শ্রাব্য বক্ষ টলিছে কখনে, কখনে,

সে স্মৃতির ছবি একেছি দ্বয়-দেবারতনে।  
অধর প্রাণে পাগলের হাসি উঠেছে ফুটি,  
ছায়ামুকু নোর মুকুতে হেরিয়া শিহরি উঠি।  
মুকুর ফলিরা ভাবি, হায় কত হ'য়েছে ভুল,  
মিলনের কণে সাজিনি যতনে, বাধিনি চুল,  
সখায়ে সাজিয়ে দিহিনি আদরে পুষা ভোরে,  
বিদায়ের বাধা সধা শঙ্কায় দিয়েছে ভ'রে।  
আজ মনে ছব সে মধুকণের সখল কটি  
হেলায় স্কাকানো রূপ হেরে তাই শিহরি উঠি।

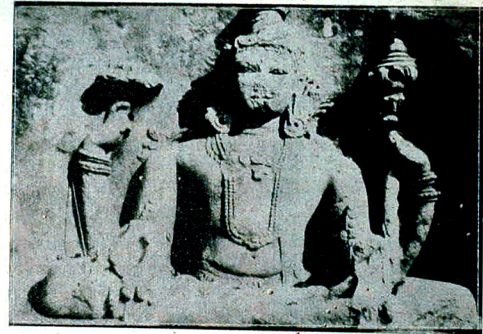
## ভারতীয় মূর্তিশিল্পে আসামের স্থান

শ্রীঅজিত ঘোষ

ষাশত ভারতের একটা পোরবের ব্রিন্দ। Vincent A. Smith বলিয়াছেন, "Architecture is the dominant art of India." শুধু যে ভারতের সভ্যতার ইতিহাসে উহার প্রভাব প্রবল শক্তিশালী তাহা নয়, উহা জগতের সভ্যতার বিরাট কাঁড়িধরুপ। অতীত জাতীয় সভ্যতার ইতিহাসে স্থাপত্য-বিদ্যার মত একুপ মহান অবদান আর কোন দেশ জগতকে দিতে পারে নাই। দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্য, অ তক্ষশিলায় তবতুপ স্মার্টা, এলিফাণ্টা ও

হাইতে পারে। আমাদের আলোচ্যবিষয় কিন্তু মূর্তিশিল্পের সেই অংশ, য হাকে ইংরেজীতে বলে 'Statuary.'

স্থাপত্যে ভারতীয় মূর্তিশিল্পের প্রাথমিক গুণই বেশী। ভারতের সর্গস্রই এই শিল্পের প্রাচুর্য্য। মূলতঃ ধর্মভাব লইয়াই উহার গঠিত—অর্থাৎ উহার বহু দেবদেবীর মূর্তি ও ধর্ম ধর্মদ্বায় বিবিধ মূর্তির অভিব্যঞ্জনা। ভারতের চিত্তাধারা ধর্মের জিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; ধর্মকে ছাড়িয়া ভারতবর্ষ মূর্তির কমনাই করিতে পারে না।



জর্দান মূর্তি—গৌহাটি

বাগুজার ভাস্কর্য্যনিচয়, বাহেজাদারো, ও পাহাড়পুরের বর্তমান প্রবন্ধ আসামের মূর্তিশিল্পই আমাদের আলোচ্য। সুপ্রাচীন শিল্প-সম্ভার ইহার অপূর্ণ নিদর্শন।

মূর্তিশিল্প স্থাপত্যের একটা প্রধান অংশ। মূর্তিশিল্প যম্মা, প্রস্তর, দাতু, চুল, কাঠ, নোম প্রভৃতি যেকোন তাহার ফলে বাহা আকিষ্ট হইয়াছে তাহা সফলতার ব্রিনিসে নিশ্চিত হইতে পারে এবং যে কোন ব্রিনিসেরও পরিচায়ক ও আশাপ্রদ।



মূর্তিশিল্পের মধ্যে শিলামূর্তিরই প্রাচীণত্ব আসামে বেশী। আসামের নানা স্থানে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এখানকার মূর্তিশিল্প প্রধানতঃ ত্রিভৌ শ্রেণিতে বিভক্ত—প্রথম, পর্বতের গায়ে খোদিত মূর্তি; দ্বিতীয়, প্রস্তর-নির্মিত স্তম্ভের মূর্তি এবং তৃতীয়, মন্দিরের গায়ে খোদিত অথবা বিশেষ বিশেষ ঘটনা-নির্দেশক মূর্তি। এই মূর্তিগুলি শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব-ধর্ম-সম্বন্ধীয়; তবে উহাদের মধ্যে শাক্তধর্ম-সম্বন্ধীয় শিলামূর্তিই খুব বেশী। মূর্তিগুলি প্রাচীন কলার অস্থাপত্যে এরূপ ভাবে গঠিত যে, উহাদের সময় ও তথ্য নিরূপণ করা একপ্রকার দুঃসহ। স্থাপত্য-শিল্পের দক্ষিণাভূমিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অঙ্গ-নিত। আসামের অনেক মূর্তিশিল্পে এই শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার ছায়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ আসামের মূর্তিশিল্প অনেক স্থানেই দক্ষিণাভূমির অঙ্গুরণ মাত্র।

আসামের কামাখ্যার মন্দির ভূবন-বিখ্যাত। উহার কারুশিল্প কাহারও অধিকৃত নাই। কামাখ্যা গোহাটীতে অবস্থিত। উহার ছাতীমূর্তি মন্দির ও মন্দিরার স্কেটা-ই



শিলা-কালীমূর্তি—শিবসাগর

খাইতী মন্দিরও সমদিক প্রসিদ্ধ—উহাদের প্রতিষ্ঠাতা-দেবী ভূগী ও কালী। এই ভূগী মূর্তির শিল্পকলারও বিশেষত্ব এমন অস্বাভাবিক, দেখিলে বিশ্বাস না হইয়া পাকা যায় না। ত্রীমূল লক্ষীনাথ বড়ুয়া শিবসাগরের স্কন্দ নামক নগরে

একটা কালীমূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন—উহা প্রস্তর-নির্মিত ও একটা বিশেষ কলার পঞ্চপাতী। আরও অনেক শিলামূর্তি ও কালীমূর্তি শিবসাগরে পাওয়া গিয়াছে যে, কিন্তু



ভিক্রাগ্রে অবস্থিত ও কামরূপ অঙ্গুসন্ধান-সমিতি-গৃহে রক্ষিত পিবলের দুর্গামূর্তি ও বিষ্ণুমূর্তি

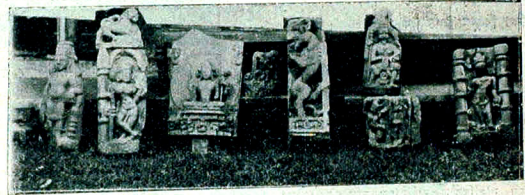
ত্রীমূল বড়ুয়া মহাশয়ের আবিষ্কৃত এই মূর্তি মূর্তির বিশেষত্ব খুব স্পষ্ট। বৈষ্ণবধর্ম-সম্বন্ধীয় মূর্তিগুলির মধ্যে অথরাষ্ট্রের বিষ্ণুমূর্তি ও নানা বাহন-বিশিষ্ট বিষ্ণুমূর্তি উল্লেখযোগ্য। এই বিষ্ণুমূর্তিগুলির ভাঙ্গুর্য ও কারুকাৰ্য্য বিশেষ নিপুণতার পরিচায়ক। ইহার একটা দৃষ্টান্ত আমরা পাই গোহাটীর অথরাষ্ট্র-মন্দির হইতে। ঐ মন্দিরের দেববিগ্রহ বিষ্ণুমূর্তি অতি হৃদয় ও হৃদয়-কারুকাৰ্য্য ব্যতীত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, আসামের মূর্তিশিল্প অনেকস্থানে দক্ষিণাভূমির অঙ্গুরণে গঠিত। অথরাষ্ট্রের এই বিষ্ণুমূর্তিই উহার একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ। দক্ষিণাভূমির বিষ্ণুমূর্তির সহিত এই মূর্তিটার কোনরূপ অসামঞ্জস্য দেখা যায় না।

মন্দিরের দেওয়ালে অঙ্কিত মূর্তিগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনামূলক ধর্মসম্বন্ধীয়—একধারা আভাস পূর্ণ—ইহা হইয়াছে। সমগ্রাচার আসামদেশে দশ-অবতার-মূর্তি খোদিত থাকে। অত্রিঙ্গের সূর্য্য, ব্রহ্মা, বসুধ, বলরাম, পরশুরাম প্রভৃতিরও মূর্তি দেখা যায়। ইহা ছাড়া গণেশ ও শিবলিঙ্গের মূর্তিও খোদিত থাকে—তবে এরূপ দৃষ্টান্ত কম।

ভাঙ্গুর্য ও স্থাপত্যের ইতিহাসে আসামের কামরূপ, শিবসাগর, ভিতগড়, গোহাটীর ভিতরুট পর্বত, শুকেশ্বর মণিকুট পর্বতের দেবালয়, শালগ্রাম, গোয়ালপাড়ার সূর্য্য পাহাড়, তেজপুৰ নগর, বামনী পর্বত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান। গোহাটীর শুকেশ্বর মণিকুট পর্বতের হরগীৰ্ব-মাধবের মন্দিরের নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ মন্দিরের চতুঃপাশে আসামের যে সমস্ত মূর্তিশিল্পের নিদর্শন আছে, তাহা বাস্তবিকই হৃদয় ও বিস্ময়প্রদ।

আসামদেশে মন্দিরগুলির দেবীর উপরে ছই প্রকার মূর্তি স্থাপিত থাকে। আসামে উহাদের বলে 'চলন্তা মূর্তি' ও 'অচল্য মূর্তি'। পূজার্কনার জন্ত যে বিগ্রহ পূজা-বেদীতে স্থাপিত থাকে তাহাকে বলে 'অচল্য মূর্তি' আর অজ্ঞাত যে

তথ্যাবিকারে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। তেজপুৰ নগর ও বামনী পাহাড়ের সূর্য্য অসংখ্য—এগুলি প্রধানতঃ দেবদেবীর মূর্তি। গোহাটীর শুকেশ্বর মন্দিরে স্থাপিত জ্ঞানদীন-মূর্তি বিশেষ বিখ্যাত। এই মূর্তিটা যেমন বিরাট তেমনই হৃদয়। আজ পর্যন্ত আসামের জ্ঞান কোন স্থানে এরূপ মূর্তি আর আবিষ্কৃত হয় নাই, এমন কি ইহা ভারতের যে কোন জ্ঞানদীনমূর্তির সমতুল্য হইতে পারে। অনেকে এই মূর্তিটাকে বৌদ্ধ-মূর্তি বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন। কামরূপের হরগীৰ্ব-মাধব মূর্তিকেও অনেকে বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন। লক্ষীপুৰ জেলার শিলামূর্তির বাহন্য খুব। ইহাদের বহিরাও বৌদ্ধ ও হিন্দু মতভেদ দেখা যায়। শিবসাগরের নানা শিলামূর্তিগুলি খুবই হৃদয়। একস্থানে কচকগুলি



আসামের কচকী মূর্তি—বাম হইতে দক্ষিণে—(১) গোলাঘাটের বিষ্ণুমূর্তি (২) অজ্ঞাত (৩, ৪, ৫, ৬) বাহন্যের বিষ্ণুমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি, বিষ্ণুমূর্তি ও বিষ্ণুমূর্তি।

মূলক মূর্তি ইত্যন্ততঃ থাকে তাহাদের বলা হয় 'চলন্তা মূর্তি'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি বিষ্ণুমূর্তি। 'চলন্তা মূর্তি' অর্থে যে, মূর্তির ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার শক্তি আছে, আর 'অচল্য মূর্তি' অর্থে যে মূর্তির নড়িবার শক্তি নাই, উহা কেবল এক স্থানে অবস্থিত থাকে। আসামের কি চলন্তা, কি অচল্য—অনেক মূর্তি সহিত লিপি সংযোগিত থাকে। ঐ লিপিসমূহ সমস্ত ভাষায় লিখিত। গোলাঘাটের দেও-পানীর বিষ্ণুমূর্তির গায়ে এইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দেও-পানীর বিষ্ণুমূর্তিটা প্রকৃতাবিকরণ গুণীয় নবম শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমান যে উহার লিপি হইতে করা হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ-ভারতের আর একটা অঙ্গুরণের উদাহরণ মুনিহুমুত্তি। আসামের নানাস্থানে এই মূর্তির প্রাচুর্য্য দেখা যায়। বহু মূর্তি জিহ্মত, স্তম্ভাং উহাদের মূর্তিভবের

মূর্তিকে 'অর্জুনরাশির মূর্তি' বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি বিষ্ণুমূর্তি।

শিবলিঙ্গের মূর্তির সংখ্যাও আসামে অনেক। গঙ্গার উপনদী গওকী নদীর তীরে এই স্থান অবস্থিত। শালগ্রাম হিন্দুর একটা প্রসিদ্ধ স্থান—উহাতে হিন্দুগণ মান করিয়া পূজা অর্জন করেন। এই শালগ্রামে বহু শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়। অত্রিঙ্গের গোয়ালপাড়ার সূর্য্যমন্দিরেও অঙ্গুরণিত শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গোহাটীর চিত্রাচল পর্বতের নবগ্রাহের মূর্তি শিবলিঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে শালগ্রামত্বস্বারে নব-গ্রাহের মূর্তি বিভিন্ন ও নানা লক্ষণমূলক হওয়া প্রমাণিত। ইচ্ছার-সংস্কারের নবগ্রাহ-মূর্তি হইতে ইহার একই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গোহাটীর শুকেশ্বরমন্দিরে স্থাপিত শিবলিঙ্গও স্তম্ভাং।



আসামের মুন্ডিশরে আর এক প্রকার বিশেষ মুন্ডি  
দেখিছে। পাওয়া যায়—উহার নয় মুন্ডি। কামরূপের  
কামদেব মদনের পরমাবশেষে বহু নয় প্রণয়াক্ত মুন্ডি  
আছে। হানীরা অসুস্থকান-সম্বন্ধিত গৃহে এইরূপ কতক-  
গুলি নয় মুন্ডি আছে। উহাদের অপরূপ গঠন-সৌন্দর্যের  
ভাষ্যা অমূল্য। কাশ্যাদ্বায়ী বসন্তে বে উহাদের গঠন  
হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

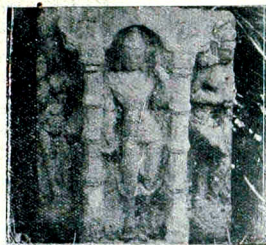
আর একটি বিশেষ শ্রেণীর মূর্তি গোপাল-মূর্তি, যাদব-মূর্তি ও বংশীবাদন-মূর্তিতে সন্নিবেশিত। গোপাল-মূর্তি ও যাদব-মূর্তি প্রত্নত্বের অংকো বংশীবাদন-মূর্তির সম্বন্ধেই বেশী। কুচবিহার অঞ্চলে ও আসামের আরও নানাদানে এগুলি দেখা যায়।

এই তে গো শিশা-মূর্তির কথা। এছাড়া বায়ুমূর্তি-সময়েও কিছু কিছু আন্দোলন করা প্রয়োজন; কারণ শিশা-মূর্তির হার আশামের বায়ুমূর্তিও দুমকি উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তিগুলি বোম্বা, তাম্র, পিত্তা, তামা ও রত্নের নির্মিত। এগুলি অসমীয়া জাতির পারিবারিক জীবনে, গোহা-ঘরে প্রায়ই হুঁ একটা দেখা যায়। এই মূর্তিগুলির মধ্যে গোপাল-মূর্তি, বাঘ-মূর্তি, বংশীধার-মূর্তি, গোবিন্দ-মূর্তি, ও কালী-বা কৃষ্ণমূর্তিরই প্রচুর মনে। দ্বৈষ্টাধররূপ কুব্জবাসীর রাধাশিলা বংশীধার-মূর্তি, আউতালগুণ্ডা গোবিন্দমূর্তি, গুণগণাটের বাঘমূর্তি উৎকৃষ্টতম। ভিত্তরগণের বিনিন্দিচ্ছা নায়ক গানে একটা হুঁমূর্তি পাওরা গিয়াছে, মূর্তির বাঁদা অতি সুন্দর এবং স্থগা কারুকাণ্য-ময়। এই শ্রেণীর আর একটা প্রসিদ্ধ মূর্তি গোহাটার বয়ল-চতুর্ভঙ্গি।

আসামের ধাতুনির্গম প্রচলন যে কেবলমাত্র অসম-  
প্রদেশের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল তাহা নয়, ইহার বাহিরেও অস-  
মীয়া শিল্পী-গঠিত মূর্তি লইয়া বাণিজ্য হইত। ইহার প্রমাণ  
আমরা অনেক পাই। কাশিতে এইরূপ একটা মূর্তি পাওয়া  
গিয়াছে, সেটা অসমীয়া শিল্পী গঠিত।

শাস্ত্রীয় মতে দেবদেবীর নাম, লক্ষণ, ভঙ্গিমা, প্রতিষ্ঠা ও

অলঙ্কার-সম্ভা বিভিন্ন প্রকারের । মন্ত্যপুৰাণ, অগ্নিপুৰাণ  
বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আমরা এই মন্ত্য নিৰ্দ্ধারণ  
করিতে পারি । ( ১ )



শিলা-বিকৃতি—ভুবিলী গার্ডেন, গোহাট।

আসামের দাতুন্ডি শিলাগুঁড়িরই অনুরূপ। উভয়ের  
বৈশিষ্ট্য একরূপ এবং উভয়েরই গঠন-মোন্দর্য ও ভঙ্গিমা-  
মাধুর্য্য মনোরম। \*

[illegible]

\* এই প্রবন্ধ-সঙ্কলনে অসমীয়া ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সৰ্বেশ্বৰ শৰ্মা কটকী মহাশয়ের সাহায্যে কৃতজ্ঞতার সহিত শ্রীকার্য্য করিতেছি।

**ভূমধ্যসাগর**

সাইপ্রাস দ্বীপের ৫২,৫০০ বর্গ মাইল আয়তনের ১২,০০০ বর্গ মাইল ইংরেজের। আজ ইরাক অসু সুসজ্জিত বিমান নভো, ভারতীয় অসু বিমান, সাহিত্য দিগ্গজ, তারার দিগ্গজ ও সাধনা দিগ্গজ, নামা জিহাদ, অসু বিমান প্রায় ৪৫ কোটি মাইলের উপর আশ্রিত্য দিগ্গজ করিতে চায়। ভাষাশাস্ত্রী ইংরেজের লম্বাটে হৃদয়কাণ্ড করিতে কঠোর, দ্বন্দ্বিতা, ছেদন। আজ জেনেরেল "প্রজিত-গল্প"কে উপহাস করিয়া ইংরেজের কঠোর মার্গের অন্য কথাই উচ্চারণ কর—The British Empire embraces parts of every continent and includes sections of

the major races of mankind, with their diversities of colour, creed and culture. It is so to speak a microcosm of the world and consequently all the main problems of world-society can be found in operation within it.....The dominions and Britain together

constitute a unique international soc'ety. It is a league of nations more closely bound together than the League of Geneva by common traditions and sentiments and a preponderance of common blood." অর্থাৎ "League of Nations" নহে, ইংরাজ-সাম্রাজ্য ... ঘিরে ঘিরে একত্বকার "League of Races" হইতেই চলিয়াছে।

জিল্লার  
ভূমধাসাগরে, রাষ্ট্রবিৎ ইন্সান-শক্তি ঘাট আগলাইয়াছে - জিল্লার  
ও মাটাচ।

৭১১ খৃঃ শ্রী সেনাপতি তারিফ বর্ষের গলশঙ্কিতে তিন দিনের মহাযুদ্ধে পরাভূত করিয়া আন্দালুসিয়া ও বার্বাস" অধিকার করেন ও আফ্রিকার সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য "মরু কাহ" নামক

## জানবার কথা

ଭୂମଧ୍ୟମାଗରେ ଇଂରାଜଶକ୍ତି

পিরগুড়ের উপর এই মদুত দুর্গ স্থাপন করেন। ১৪২ খৃঃ ইহার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। ১৩০৯ খৃঃ সেন ইহার উদ্ধার করে; কিন্তু ১৩০০ খৃঃ পুনরায় ইহা দ্বারাবৃত্ত হয় ও ১৯১১ খৃঃ ইহা ব্রাণ্ডার নৃশাসন-কর্তার অধীন হয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ইহা আবার যখন সেনের স্বত্বাধীন হয়, সেনেন্দ্রজ্যোতি বাস দখলে ইহাকে মদুতভবে অক্ষত করিয়া লওয়া হয়।

১৭.৪ খ্রঃ ২৪ জুলাই অক্টোবর মিজরামে সংযুক্ত ইংরাজ ও ৬৫ সেনা  
তিন দিন ধরিয়া অবরোধ করিয়া এই গিরিপূর্ণ অধিকার করে।



হাল টার্কিস্থান শহরের সাধারণ দৃশ্য

পাইয়া শেন যে পক্ষবর্ণবাদী হৃদয় অবরোধ করে। ইরাজের অসীম  
বীরত্ব ও আত্মদানে তাহাও অবশেষে বাণ্যতায় পরিণত হয়। তদবধি  
জিব্রীল ইরাজেরই করায়ত্ত আছে।

মান্টা

ভূমধ্যসাগরে-ইংরেজের বিধায় দাঁটি-মাটা। এম্বিড কার্কে-  
জেনাবেল জ্বালিয়ে গেলুম এই আত্মন বোপে গুং বও শতাব্দীতে  
পরিণাম জাতিই তার মাথা এখনো আদায় বসতি হাপন বরে ও  
গরি বোমের সহিত বিধাখিতার ফলে ইহা বোমের জন্তত বহা।  
নির্ভানবওমাগল সিলেহে। এই স্থানই নির্ভানবের জন্ত সর্বপ্রথমে  
মদ্যনৌক বহন। আবার লগণিখাত সেটল কালাক-ডুনি হইহা  
এই বোপই আদায় না কি আভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাস্টার  
বে সকল স্থানে আদায়বিসিক মণ্ডলও বহা স্বপত্ত-নিবের নির্ভান



















লোক বিলাস। অসহ্যের সময় হঠাৎ বহু জলস্রাব নিমতলার খাটে উপস্থিত হইলেন।

—বনবাণী

### নবদ্বীপে নব নারী-আশ্রম

আমরা অবগত হইলাম, নবদ্বীপে এক নব নারী-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নোপেয় এক ভাষ্কি এই আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এইজন্য বোধ্যে কথা হইয়াছে যে, ঐ আশ্রমে পুষ্করিণী ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং বরণ লইয়া বিভিন্ন মণ্ডলের লোকের সহিত

আশ্রমবাসিনীদের বিবাহ হইবে। বাঙ্গালী মহিলাদের হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হইবে, এই সুবাদ পাঠ করিয়া আমাদের মনে মনে আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। অবশ্যই ১১ দিনে ও পাঁচালি বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাবই যেন হিন্দী শিক্ষার বর হইবে এই সংকেত হইতেছে। শুনা যায়, মঙ্গলিক নবদ্বীপে এক জন দিল্লির সহিত একটা বাঙ্গালী মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহের ঘটক কে, তাহা জানা অসম্ভব। নবদ্বীপে, অবিবাহিতা এই আশ্রমে তথ্যসম্মান করুন। কে ইহার স্থাপন কর্তা, কে ইহার অর্থদাতা, তাহার বর লইল। এই আশ্রম কোথা হইতে বাঙ্গালী মেয়ে গিয়া, তাহা জানা অসম্ভব।

—বনবাণী

## ব্যবসা ও বাণিজ্য

### ভারতে বীমা-ব্যবসায়

(পূর্বাংশ)

#### নূতন বীমার পরিমাণ

আলোচ্য বর্ষে বীমা কোম্পানীগুলি জীবন-বীমার ব্যবসারে এক লক্ষ ৪০ হাজার চুক্তিপত্র (policy) স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরে নূতন বীমার পরিমাণ ২৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ইহা হইতে বার্ষিক ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা হারে প্রিমিয়ম (টাকা) আদায় হইবে। ভারতীয় কোম্পানীগুলি এক লক্ষ ৩ হাজার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া মোট ১৬৬ কোটি টাকার নূতন জীবন বীমা ও বিদেশী কোম্পানীগুলি ২২৮ খুঁদে ৯১ হাজার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া মোট ১৫২ কোটি টাকার নূতন জীবন-বীমা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (বিদেশী কোম্পানীগুলির নিকট হইতে আলোচ্য বর্ষে নূতন বীমার হিসাব স কারী-রিপোর্টে প্রকাশিত হয় নাই।) ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নূতন বীমা হইতে ভারতীয় কোম্পানীগুলি প্রায় ১ কোটি টকা প্রিমিয়ম পাইয়াছিলেন।

#### ভারতে মোট বীমার পরিমাণ

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লভ্যমান সহ ভারতে মোট জীবন-বীমার পরিমাণ ১৪২ কোটি টাকা; ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ ছিল—১২৪ কোটি টাকা; ভারতীয়

কোম্পানীগুলির ৭১ কোটি টাকা ও বিদেশী কোম্পানী-গুলির ৫২ কোটি টাকার জীবন-বীমা সংগ্রহ করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় কোম্পানীতে জীবন-বীমার পরিমাণ ৭ কোটি টাকা এবং বিদেশী কোম্পানীতে উহার পরিমাণ ১১২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত ভারতে ব্যবসায়কার্য দেশী ও বিদেশী কোম্পানীগুলি মোট ৬,৬৬,০০০ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ১৪২ কোটি টাকার জীবন-বীমা গ্রহণ করিয়াছে; ইহাতে বার্ষিক প্রিমিয়ম বাব ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আয় হয়। ভারতীয় কোম্পানীগুলি বৎসরে প্রায় ৬ কোটি টাকা প্রিমিয়ম পায়; যত ও অল্প লাভ-সহ আলোচ্য বর্ষে তাহাদের ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে জীবন-বীমা-ভাণ্ডার (Life-fund) গচ্ছিত ঋণের পরিমাণ ২২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার দাঁড়াইয়াছে।

#### বাতিল বীমার পরিমাণ

পারিপূর্ণ অনেকই বোরহয় অবগত আছেন যে, নিয়মিতভাবে প্রিমিয়ম না দিলে চুক্তিপত্র বাতিল (lapse) হইয়া যায়। চুক্তিপত্র বাতিল হইয়া গেলে বীমা-কারী উক্ত

চুক্তির সত্তাপ্রদায় কোন প্রবিধান নাই; পূর্বে যে টাকা তিনি প্রিমিয়ম বাব দিয়াছেন কোম্পানী তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়।

প্রতিবৎসর ভারতে বহু টাকার বীমা ও চুক্তিপত্র প্রিমিয়ম না দেওয়ার বাতিল হইয়া যায়। পুণ্ডিয়ার অজ কোন দেশে এত বেশী টাকার চুক্তিপত্র বাতিল হয় না। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার চুক্তিপত্র অর্থাৎ নূতন সংগৃহীত বীমার প্রায় শতকরা ৩০ জন বাতিল হইয়া গিয়াছে। ইহার অল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেটগুলাই দ্বারী। কোম্পানীগুলি অত্যধিক কমিশন দিয়া একেটগুলাই নিযুক্ত করেন। একেটগু ও প্রথম বৎসরে মোটা রকমের দীও মরিবার উদ্দেশ্যে (বীমাকারীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই) অনেক সময় জোরজরদস্তি করিয়া বীমা সংগ্রহ করেন। (আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব) একেটগু অল্পরোপে অনেক বীমা করেন ও ছই একটা প্রিমিয়ম দেওয়ার পর চুক্তিপত্র দেখ্যায় বাতিল করাইয়া দেন। একেটগু নিজ স্বার্থক্ষিতির অতীক আশা পূরিতাগ করিয়া বীমাকারীর লাভ-লোকসান চিন্তা করিলে ভারতে প্রতি বৎসর ৫ কোটি বা ততোধিক টাকার চুক্তিপত্র বাতিল হইতে পারে না।

#### বিভিন্ন দেশে বীমার পরিমাণ

বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যার অল্পদাতা মাথা পিছু (per head) বীমার পরিমাণটী সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টে একটি পরিচ্ছেদ সমিষ্টি হইয়াছে। নিম্নে আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম :—

#### দেশে নাম

দেশে নাম	মাথাপিছু বীমার পরিমাণ
আমেরিকা	২০০০ টাকা
কানাডা	১৫০০ "
নিউজিল্যান্ড	২০০০ "
ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস	৬০০০ "
অস্ট্রিয়া	৬০০০ "
নরওয়ে	৪৫০০ "
সুইডেন	৪২০০ "
নিদারল্যান্ডস	২২০০ "
ডেনমার্ক	৩২০০ "
ভারতবর্ষ	৫০ "

আমেরিকায় মোট জীবন-বীমার পরিমাণ সমভাবে ভাগ

করিয়া দিলে দেশের প্রত্যেক লোক ছই হাজার টাকা করিয়া পাইবেই, আর ভারতে মোট জীবন-বীমা সমভাবে ভাগ করিয়া দিলে দেশের প্রত্যেক লোক মাত্র ৫ টাকা হারে পাইবে। অর্থাৎ ভারতে "মাথাপিছু" বীমার তুলনায় আমেরিকাবাসিগণ ৪০০ গুণ বেশী টাকার বীমা করিয়াছে।

#### জাৰ্মানীতে বীমা-আইন

অধ্যাপক নিয়মক্কার সরকার মহাশয় জাৰ্মানীতে বীমা-আইন সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে বিবৃত হইল। দেশীয় কোম্পানীগুলিকে বেরপ সাহায্য প্রদান করা উচিত। ভারতে সরকারী বীমা-আইন সেধন কোন সাহায্য প্রদান করে না; শক্তিশালী ও বহুদিনের পুরাতন বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলিকে ভারতের বাজারে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা করিতে কোন বাধা দেওয়া হয় না; ফলে শক্তিশালী ও বয়োজ্যেষ্ঠ বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কোম্পানীগুলি ধীরে ধীরে হটয়া পড়িয়া

জগতের অল্পাংশ দেশে কিন্তু বিদেশী কোম্পানীকে ব্যবসায় আরম্ভ করার পূর্বে নানারূপ বিধিনিষেধের গভীর মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়। বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বাহ্যতে হটয়া যায়, তৎপ্রতি ঐ সময় দেশের শাসকগণ সতর্ক হইয়া রাখেন। সেইজন্যই আজ জগতের সমস্ত স্বাধীন দেশে তৎদেশীয় বীমা কোম্পানীগুলি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতেছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জাৰ্মানীতে মোট ১৪৬৬টি কোম্পানী বীমা ব্যবসায় করিয়াছে, তন্মধ্যে ১৩৬৬টি কোম্পানী বিদেশী ও মাত্র ৭০০টি কোম্পানী দেশীয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আরও ২৪টি বিদেশী কোম্পানী ঐ দেশে বীমা ব্যবসায় আরম্ভ করে। কিন্তু জাৰ্মানিগণ এখন পর্যন্ত বীমা ব্যবসারে বিদেশী কোম্পানীকে কোনরূপ প্রাধান্য দেয় নাই; তাহার সাধারণতঃ স্বদেশী কোম্পানীতেই বীমা করিয়া থাকে।

জাৰ্মানীগণে ব্যবসায়তঃ বিদেশী কোম্পানীগুলিকে ঐদেশে ও হাঁদেদে আকৃষ্ট পরিচালনার অল্প প্রদান করণ-চারী পদে একজন জাৰ্মানগণ নিযুক্ত করিতে হয়; হানীয় ডিরেক্টর বোর্ডেও অধিকাংশ জাৰ্মানগণে নিযুক্ত করিতে হয়। জাৰ্মানিগণ বীমা-আইনের দ্বারা অল্পস্বল্পে কোন কোম্পানী



ইহার অধ্যা করিলে অধ্যায় সরকার' এই কোম্পানীর কারবার জ্ঞানার্থীতে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

বর্ত্তমান বিশেষ কোম্পানী জাৰ্জাণ্ডিতে ব্যবসায় করিতেছে, তাহার সকলই অন্তরে অন্তরে এই দেশের আইন মানিয়া চলে। বিলাতী, মার্কিন, ইটালিয়ান বা চিনেমার কোন কোম্পানীই জাৰ্জাণ্ডির বীমা-বিধি অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হয় না।

জাৰ্জাণ্ডিতে যে সমস্ত বিশেষ কোম্পানী ব্যবসায় করে! তাহারিগকে বার্ষিক দুই দফা হিসাব নিকাশ প্রকাশ করিতে হয়। জাৰ্জাণ্ডিতে তাহার যে ব্যবসায় করে তাহার হিসাব জাৰ্জাণ্ডি মুদ্রায় ও পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে সংগৃহীত ব্যবসায়ের মোট হিসাব নিজ নিজ দেশীয় মুদ্রায় দেখান হয়। জাৰ্জাণ্ডিতে সংগৃহীত ব্যবসায় সম্পর্কে স্বতন্ত্র রিপোর্ট প্রকাশের প্রতিক্রিয়া না দিলে কোন বিশেষ কোম্পানীকে তথ্য বীমা ব্যবসায় করিতে দেওয়া হয় না।

জাৰ্জাণ্ডিতে স্বদেশী কোম্পানীগুলিকে যে সমস্ত বিধি নিষেধ মানিতে হয়, বিশেষ কোম্পানীগুলিও তাহা মানিতে বাধ্য থাকে। সরকারী বীমা-বিভাগ সমস্ত বীমা কোম্পানীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। বীমাকারীর বার্ষিকহানি হইতেছে নূন, কমিলে করিলে সরকারী বীমা-বিভাগ যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন কোম্পানীকে কাজ বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

বীমা কোম্পানী অডিটরের সাহিত বড়দায় করিয়া বাহাতে কখনও বীমাকারীকে ক্ষতি দিতে না পারে, তজ্জন্মে সরকারী বীমা-বিভাগ যে কোন সময় যে কোন কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষা করিতে পারে এবং স্থায়ীভাবে যে কোন কোম্পানীর স্টাডিটর নিযুক্ত করিতে পারে।

এতক দেশেই বীমা-আইন অমুসারে কোম্পানী-গুলিকে প্রিমিয়মের একটা নির্দিষ্ট অংশ স্বতন্ত্রভাবে জমা রাখিতে হয়। জাৰ্জাণ্ডির বীমা-আইন অমুসারে দেশী-বিশেষী সমস্ত কোম্পানীই এই টাকা জাৰ্জাণ্ডিতে থাটাইতে বাধ্য। তাহার এই টাকা জাৰ্জাণ্ডির বাহিরে প্রেরণ করিতে পারে না। কোম্পানি, কি ভাবে, এই টাকা খাটান হইতেছে সরকারী বীমা-বিভাগকে তাহা জানাইতে হয়।

বীমা কোম্পানীর জমা টাকা খাটান-সম্পর্কে সরকারী বীমা-বিভাগ যে নির্দেশ প্রদান করে, বিশেষী বা স্বদেশী—প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকেই সেই নির্দেশ মানিতে হয়। মোট কথা, বীমাকারীর বার্ষিক অক্ষয় রাখবার জন্য জাৰ্জাণ্ডি-সরকার সর্ববিধ সতর্কতা গ্রহণ করিয়াছেন;—বিশেষী কোম্পানীর প্রতিযোগিতার দেশীয় কোম্পানীগুলি বাহাতে হট্টয়া না যায়, তাহার তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন।—বল্যা বাহলা, ভারতে বীমা-আইনের একজন কোন অনুবাস্থা নাই।

## সন্ধ্যা-তার।

শ্রীকরণাময় বসু

দিনের সহস্র দাহ, পুঞ্জ পুঞ্জ ঘোর কলরব  
জ্বলন্ত করিয়া রাখে আনন্দের অমৃত উৎসব।  
দয়্যাহীন, কমাহীন সংঘাতের প্রলয় গর্জনে  
দিগন্ত বিদীর্ণ করে বিফোডের বিপুল তর্জনে।  
মান-ব সীমা ভেদে বার্ষিকীত জ্বর হিম্মতোল  
রক্তে রক্তে উজ্জ্বলিছে খণ্ড খণ্ড জ্বর কতি, ক্ষোভ  
বীরে বীরে সন্ধ্যা এল নতনত্রে প্রশান্ত জলধরে  
সকল অশ্রুজল, স্বপ্নবির অন্ধকার লয়ে।  
নিষিদ্ধে বনজমি, কল্লোলিয়া বৃক্ষ নলীজল

কাঁদিলে অথাক্ত স্বরে, 'বারে চাই, কোথা সেই বল?'  
'কোথা বল? কে ধা বলহ?' দিগন্তেরে ওঠে প্রতিধ্বনি;  
সহসা চমকি উঠি উজ্জ্বলনে চাহিলু অমনি।  
ওই তরুজ্বল শিরে দেখা দেয় সন্ধ্যা স্তারা-রেখা—  
নিত্যক আধারমুখে অসীমের আশীর্বাদ লেখা।  
চক্ষু কে যে বুঝাইল স্বপ্নের কিরণ-অঙ্গুলি,  
কাঁদাইল বক্ষ ঘোর পৃথিবীর শেখড়নি তুলি।  
আত্মার অন্তর হ'তে ছোঁয়াতিত্বয় পুঙ্খ প্রকাণ্ডী  
কাঁদাল সমুখে আমি' প্রসারিতা অনন্তের অঁখি।

পঞ্চপুস্ত



JUNG PRINTING WORKS—CALCUTTA.

নাতি ও ঠাকুরমা  
শিল্পী—শ্রীযামিনী রায়



মোহ

(উপভাস)

(পূর্ণাঙ্গবৃত্তি)

শ্রীমতী নীলমা দেবী

আটশ

প্রীতি লক্ষ্যে হইতে ফিরিবার পর সাড়ে তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দেবব্রতের জীবনে অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সে এখন আর পূর্বের মত নাই, এখন সে শব্দই পশ্চীর ও কিসে চিন্তার বিভোর। তাহার সম্মুখে আর স্বপ্ন বা শান্তি নাই, বহুদিন ধাবৎ স্বামী-স্ত্রীতে মনের মিল নাই। সেই মুহূর্ত্তে হইতে যে বিচ্ছেদের ছায়া পড়িয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া এখন ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে। তাহার এখন শুধু নামেই স্বামী-স্ত্রী।

এমির দোমেই এতদূর বিচ্ছেদ হইয়াছে। এমি প্রথমে বুঝে নাই যে ভারতীয়কে বিবাহ করিলে, তাহার স্বামীর মত উচ্চ পদই হউক না কেন, তাহার নিজের দেশের লোকের ও সমাজের চক্ষুতে পতিত হইবে—সে আর ইউরোপীয়দের সমতুল্য গণিত হইবে না। প্রথমে সে নূতনবধূর মোহে স্তব্ধ হইয়াছিল কিন্তু ক্রমেই নিজ জাতীয়দের ব্যবহার তাহার মনে বিচ্ছেদের বিধে জন্মাইতে লাগিল। তাহার পর যখন তাহার পুত্র জন্মিল ও সে অবিকল দেবব্রতের মত হইল, এবং ভারতীয়দের মত বর্ণ পাইল, তখন তাহার স্বামী ও পুত্র উভয়ের উপরই কিছুকাল জন্মিল, দেবব্রতের ও তাহার মধ্যে এক অত্যন্ত ব্যবধান সৃষ্ট হইল।

এমির প্রকৃতিতে উচ্চতা বড় একটা দেখা যাইত না, সে ছিল বড় স্বার্থপর, অহঙ্কারী ও আমোদপ্রিয়। পিতা মাতার একমাত্র সন্তান ও রূপসী বালিকা সে বরাবরই ঘেঁষামত সব কাজ করিত ও নিজের জেদ সর্বদা বজায় রাখিত। শুধু বিবাহের পরই ছই বৎসর তাহার চিন্তার এক পরিবর্তন হইয়াছিল, সে সত্যই দেবব্রতকে ভাল বাসিয়াছিল বালিয়াই হউক, বা প্রণয়ের মোহেই হউক সে কিছু কালের জন্য স্বার্থ তুলিয়াছিল। সেই জন্য বিবাহের পর প্রথমে দেবব্রতকে স্বধী কবিবার প্রণাম পাইয়াছিল ও

যেখণে করিয়াও ছিল। কিন্তু সন্তান হইবার পর হইতেই সে আবার নিজমুখী ধারণ করিল। সে কখনও নিজস্বত্বের বা আশ্রয়ের এতটুকু ব্যাঘাত সহ্য করিতে পারিত না। সন্তানের যত্ন-পরিচর্যা তাহার জীবনকে বিবময় করিয়া তুলিল।

দেবব্রতও প্রথমে এমিকে সত্যই ভালবাসিয়াছিল, তাহার সকল সাধ পূর্ণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। সেটা প্রণয়ের জন্য কি সে এমিকে প্রবঞ্চনা করিয়া বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রতিপালনের জন্য তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, তখন এমির সখী ইচ্ছা পূর্ণ করিতে একটু বিরত হইলেও দেবব্রত হাসিমুখে সবই করিত। এমির রূপ ও তাহার মিষ্ট ব্যবহারে প্রথম কয়েক বৎসর দেবব্রত তাহাকে স্তব্ধ করিয়া আনন্দ পাইত। কিন্তু এখন তাহার মোহ টুটিয়াছে, শুধু তাহার পুত্রের কথা ভাবিয়া সে এমির সঙ্গে সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। আজকাল এমি শীতকালে পাহাড় থেকে ফিরিয়া সকল রকমে দেবব্রতকে উৎসাহিত করিয়া তুলে ও তাহার সহিত কলহ করে। ফলে দেবব্রত যতদূর সম্ভব দূরে থাকে। সে নিজের পাঠাধি ও কর্ম লইয়া ব্যস্ত থাকে, আর এমি আমোদ-প্রমোদ লইয়া জীবন যাপন করে। তবুও মনোমার্শল হর, কারণ দেবব্রত ছেলের প্রতি অত্যন্ত সখ্য করিতে পারে না, আর এমি ছেলের যত্ন করিতে মোটেই চাহে না, সে ছেলে মাছব কড়া কিছুনা জান করে। দেবব্রত শ্রান্ত হইলে কর্মক্ষেত্রে প্রীতির ধ্যানে কাটায়—তাহার জীবন এখন “প্রীতিময়”। প্রীতিই তাহার নিষ্ঠুর চিন্তা, আশা, ধারণা, ধ্যান সবই; কিন্তু প্রীতিকে পাইবার কোন উপায় নাই।

তাহার পুত্রই দেবব্রতের একমাত্র সান্না, ছেলেও পিতার অমরক, এক মুহূর্ত্তও পিতার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাহে না। অনেক সময় যখন দেবব্রত পাঠে বা



নিষ্করম্যে মাংস থাকে, তখন ছেলেরা তাঁহার শীরের বেড়ে বসিয়া আশ্রয় নেন। খোলা করে—কেবল মধ্যে মধ্যে সে দেবব্রতকে স্পর্শ করিয়া যায়, সেই শরশেই যেন তাঁহার আনন্দ, শান্তি। তাঁহার মাতার সহিত তাঁহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।

এমির ছেলের দেখিবার সময় নাই, সে বলে “আমি ও সব ব্যাড়া সহিতে পারি না।” এমির পুত্র আগ্রাসন দ্বারাতে লাগিত হইতহে। এমি যখন শৈলবিহারে যায়, পুত্র সঙ্গে যায় বটে কিন্তু এমির তাহাকে দেখিবার বা তাহার কোন কাজ বহুত করিবার সময় বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। শুধু দেবব্রতের ভয়ে ঐতাহার আয়াকে সকল কথা বুঝাইয়া দেয়। ছেলেরা দেখে দেখিবে দেবব্রত একবার বড়ই রুষ্ট হইয়াছিল ও কড়া হুকুম দিয়াছিল—কাজেই অতটুকু করিতে এমি বাধ্য হইয়াছিল।

এমি বহুদিন পাসে পাহাড়ে থাকে ও সেখানে দিবারাজি বিবিধ আমোদ-প্রমোদে মাতো ও নিজবাটোতে অতি অল্পকণই থাকে। এমন কি যখন দেবব্রতও আসে তখনও সেইরূপ জীবনই এমি কাটায়; ফলে এক একদিন স্বামী-স্ত্রীতে বেধা পর্যন্ত হয় না। দেবব্রত অনেক চেষ্টা করিল বাহিরে কেমন প্রকারে বাহিরে উকোরে ভাব বজায় রাখিয়া এমির সহিত যাবন পন্থা করিতে পারে কিন্তু পারিল না। জীবন অল্প হইলেও দেবব্রত এমির সহিত বহন-ভাগ্য করিতে পারিল না, পাছে তাহার ছেলেকে একটুকু ঘায়ে মাছহারা হইতে হয়। মনে মনে তখনও দেবব্রতের বিশ্বাস ছিল যে বড়ই অমর কলক মা'র ছেলের প্রতি আশ্রয়কে সহ্য নিশ্চয় থাকে, এমি একটু বেশী আমোদপ্রিয় হইলেও সে তাহার সন্তানকে দেখিতে ভালবাসে। দেবব্রত বাহিরে গিয়া রাধিবার চেষ্টা ছাড়িল না, কিন্তু তাহাদের মানসিক মিলের সম্ভাবনা কখনো সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল।

এমি শুধু আমোদপ্রিয় নহে, অসভ্য না হইলেও সে পরপুরুষের পুরা অনাসক্ত নহে, বহু পুরুষ-পরিচয়িত হইয়া অসম্মানে দেখিতে সে বেশী ভালবাসে। দেবব্রত কিন্তু তাহার এসমস্ত বড়ই অশোভন ও বিসদৃশ মনে হয়, তবু সে নীরবে থাকে। যখনই এমির যেন চিন্তা করে তাহার মনে হয় সে কত বড় অপরাধ করিয়াছে, সে অপরাধের দায়িত্ব লীমা

নাই, হইয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই ভাবিয়া দেবব্রত নীরবে জীবন্ত দারুণ-মন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল।

উন্নতি

ছই বৎসর হইল দেবব্রতের সহিত তাহার মাতার মিলন হইয়াছে, সেইটুকুই তাহার বিবাহের জীবনে একমাত্র সুখ ও শান্তি। সে প্রথমে প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যখন দেখিল যে তাহার মাতা তাহাকে কমা করিলেন না, তখন সে অভিমানের মাতার সহিত সম্পর্ক তুলিয়া দিবে ভাবিল। সে মাকে পর পর্যন্ত লিখিত না কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভায়েদের পর দিত। তাহার মনে হইত যে মাতৃমুখে পুত্রের অপরাধ কমা করিতে না পারে সে হইবে তাহার আশঙ্ক্য নাই, কিন্তু আবার পুত্রের সেই অসীম মেহের কথা মনে হইলে সে মনে মনে লজ্জিত হইত। তাহার পর যখন দলকো মায়ের প্রীতিকরে দেখিল, তখন দেবব্রত যখন যে কত বড় অপরাধ করিয়াছে, তাহার মাতার প্রাণে কত বড় আঘাত দিয়াছে। তখন সে বিশেষ অশ্রুপূর্ণ হইল।

দেড় বৎসর কাল অসুস্থতাপানলে পড়িয়া পড়িয়া শেষে একদিন আর থাকিতে পারিল না, সে মাতৃসকাশে চলিল। পুত্রের কোন সন্বাদ না দিয়া একদিন প্রাতে সে নিজগৃহে উপস্থিত হইল। বহু দিনের পর অসুখ্য পুত্রকে দেখিয়া দেবব্রতের মাতা জানারবারে সব চুটুয়া গিয়া পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিলেন। তাঁহারও প্রাণ ছেলেকে দেখিবার জন্য বহুদিন যাবৎ ব্যাকুল হইয়াছিল, তখন অপ্রত্যাশিত মিলনে তিনি মুহুর্তের মধ্যে পুত্রের সকল নোয় তুলিলেন। মাতাপুত্রের বহুশব্দ নীরবে অশ্রুপাত করিলেন।

অন্যমনে দেবব্রত কহিল, “মা, তোমাকে দেখবার জন্য প্রার্থনা অনেকদিন থেকে বড় ব্যাকুল হয়েছিল, তোমাকে না দেখে আর থাকতে পারলাম না, তাই এসেছি। অনেক আগেই আস্তাম কিন্তু সাহস করে আসতে পারি নি, ভয় বড় পাড়ে তুমি আমারকে দেখে খুব ফিরিয়ে নাও। আমার দায়ের কথা নাই।” বস্তু বা তুমি আমার “মা,” তোমার মেহ থেকে আর আমাকে বঞ্চিত করে রেখ না। কমা আশা করি না, কারা আমার অপরাধের কথা নাই।”

উত্তরে মা বলিলেন, “আমি তোকে কমা করলে কি

হবে, বাবা? ভগবান আর যার জীবন তুমি একেবারে নষ্ট করেছ তাঁরা তোমাকে কমা করতে পারলে তবেই তোমার কমা। এমন সে কথা বা'ক, তোর ছোরা এমন হয়ে গেছে? কেন? তোর সে হাসিমাখা চোখের চাহনি কোথায়? শুনেছিগিমা' তুই খুব সুখে আছিস তবে এমন বিবাদমাথা মুখ কেন?”

“আপরাধী কি কখনও সুখী হ'তে পারে?” বলিয়া দেবব্রত অজ্ঞ কথা উত্থাপন করিল। সে মাতার নিকট নিজের অশান্তিমায়া জীবনের কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহে। সে বেশ জানিত যে তাহার মা ছই চারিটা কথা কহিলেই সব দুরিগা ফেলিবেন, সে মায়ের কাছে কিছুই গুকাইতে পারিবে না।

দেবব্রতের মায়ের কাছে আসিবার আরও একটা মত উদ্ভ্রম ছিল। বহুদিন সে প্রীতির খবর পায় নাই। প্রীতিকরে আর একবার দেখিবার ও তাহার সহিত কথা কহিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছিল। সে একবার জানিতই চাহে যে তাহার প্রতি প্রীতির মনের ভাব কিরূপ? উহার মনোভাব লক্ষ্যেই সে মোটেই বৃথিতে পারে নাই। যদিও বা তখন একদিন অসুখের পাইল তখন তাহা আশিয়া বিড়ম্বনা বাধাইল। সেদিন দেবব্রতের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে প্রীতি তাহাকে তাহাযবে কিছু পরদিন প্রীতি চিঠি দেওয়া যে কি যে ভাবিবে স্থির করিতে পারে নাই। দেবব্রত এখন আর লক্ষ্যেই নাই, সে অজ্ঞতালিয়া গিয়াছে; দলকো ছাড়িবার পূর্বে সে স্তনিয়াছিল যে প্রীতির সহিত নির্মলের বিবাহ কোনরূপে সম্ভব হইবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার পর আর মনো ভাব পায় নাই। রমা তাহাকে মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিত কিন্তু তাহাতেই প্রীতির সন্বাদ থাকিত না। কাজেই প্রীতি ও নির্মলের বিবাহ-সম্বন্ধ কি হইয়াছে দেবব্রত জানিত না, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেও পারে নাই।

অনেককণ মা-ভাইদের সঙ্গে পানায় গল্পে পর দেবব্রতের মা বলিলেন, “এইবার মান করতে বা বাবা! অনেক বেলা হ'য়েছে। তোর নিজের ঘরে সব জিনিস রাখিবে দিচ্ছি ও সব বন্দোস্ত করছি। বাবা, তোর কত মায়ের ঘর, নিজের কত করে শাড়িই ছিলি, সেই ঘর আজ ৭৮ বৎসর তোর অপেক্ষায় পড়ে আছে।”

“মা, তুমি কি সে ঘর এতদিন কাউকে ব্যবহার কর্তে দাও নি?” “সে ঘরে বার অধিকার আছে সেই কেবল মাশে মাশে ব্যবহার কুরে, তা' ছাড়া পড়েই থাকে।”

“শুনেছি যে তোমার কাছে সর্বদাই আসে, তখন কি সে এই ঘরেই রাত কাটায়?”

“আমার অসুখ-বিসুখ কর্তেই সে আমার সেবা করবার জন্য এখানে এসে থাকে, এ ঘরে সে বড় ভালবাসে, কি যত্নে ঘর রেখেছে দেখেলেই বুঝি। তা'র গুণের কথা কত দল, কা'রও পেটের মেয়ে বোধ হয় মা'কে তার চেয়ে বেশী সেবা-বহন কর্তে পারে না। তার কথা বলে আর কি হবে? ভগবান তো আমাকে এমন বউ নিয়ে ঘর কর্তে দিলেন না, বাহাকে আমার কি অপরাধ? এত কষ্ট দিলেন জানি না। তার কথা এখন থাক, তা'র মুখ মনে পড়লে বুক বেটে যায়। তার কথা মনে পড়লে তোর উপর আমার এত রাগ হয় যে তোকে আর দেখতে পর্যন্ত ইচ্ছা হয় না। আজ অনেক দিন পরে তোকে পেয়েছি, বাবা, দেখত ভুলে তোকে বুকে করে একটু শান্তি পাই। মা, এখন মজা কর্তে।”

ঘরে গিয়া দেবব্রত বাধা দেখিল তাহাতে তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। প্রবাসে বাইবার দিনের সকল কথা একে একে তাহার চক্ষুর সামনে পড়ে আঁকা ছবির মত মাগিয়া উঠিল। ঘরটা যেমন ভাবে সে রাধিয়া গিয়াছিল ঠিক তেমনই ভাবে শাহজান রহিয়াছে, সকল অব্যাহি নিজ নিজ স্থানেই তখনও রহিয়াছে। দেবব্রত চোখেরে বসিয়া পড়িল, পুরু-স্থিতিগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া মাগিয়া উঠিল—প্রীতির তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, কারা, তাহাকে কিছুতেই বাইতে দিবে না বাবা, ফলে দেবব্রত যে সব চূহন মিশা তাহাকে শনিয়াছিল যে সে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে—এই সকলচিত্রই তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এইসকল বহুশব্দ দেবব্রত চিন্তাময় রাখিল। এক দলটা পর যখন তাহার মা তাহাকে ডাকিতে আসিলেন, সেই ভাবে তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিল, সে লজ্জিত হইয়া ভাড়াভাড়ি ঘর করিতে গেল। তাহার মা তখনই জানিলেন যে পুত্রের মনে অসুস্থতাপ জাগিয়াছে। তাঁহার প্রাণে আশার উদ্ভ্রম হইল কিন্তু কি ভাবে যে প্রীতিও দেবব্রতের পুনর্দিলন হইবে সে সমস্তার শীমাখা করিতে পারিলেন না।



দশদিন দেবরত্ন মায়ের কাছে রহিল। এই দশদিন সে ত্রিক ছেলোবদার মত দিন-রাত কেবল মায়ের কাছে কাছে থাকিত, যা বসিলে তাঁহার কোলে মাথা দিয়া ভুইত, ভাইসের সঙ্গে পূর্ণবয়সে ও গর করিত কিছু এত করিয়াও দেবরত্ন তাহার মায়ের চোখে ধূলা দিতে পারিল না। তিনি জানিলেন যে দেবরত্ন অসুখী, তাহার মনে শান্তি নাই। তিনি আনন্দ এইতে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চানেন নাই, তাহার সম্মান প্রাপ্তির কথা তাঁহারই কাছে প্রকাশ করিলে এই আশার উদ্ভূত হইয়া রহিলেন। সেই প্রথম দিনের পর প্রীতির কথা আর কেহই উত্থাপন করে নাই, কেবল প্রতিদিন রাতে স্বপ্নে মাতা-পুত্রে আলাপ হইত দেবরত্ন কি যেন বধিবার প্রয়াস পাইত কিন্তু বসিতে পারিত না। দেবরত্নের মা একদিন দেবরত্নের মনের কথা বা তাহার সম্ভাবের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, সে তো কোন কথাই বলে নাই, কিন্তু ছেলোবদার গর সর্বদাই দেবরত্ন করিত। সে একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিল “মা তোমার কি তাকে একবারও দেখতে ইচ্ছা করে না?”

“তোমার ছেলের যে আমার কর্তৃমালা হ'বার কথা, তুমি নিজেই তো সে মাঝে বাস দেখেছ। যদি কোনও তাকে আনি তো দেখ, তোমার মনের বাড়ী তো আমি দান না। তোমার চক্ষু হ'তে পারে কিন্তু তোমার এ ছেলে কোনই আমার শ্রাণ ছুঁতে বসবে না।”

“তোমার চক্ষুও নই, রাগও নই, তোমার প্রাণে যে আমি কত ব্যথা দিয়েছি তা' কি আমি বুঝি না? আমার ছেলেকে ভালবাসা তো দুরের কথা আমাকে যে তুমি আমার এমন করে রেখ করবে সে আশাও আমি করি নি, মা। তুমি আমার প্রাণে কত শান্তি দিয়েছে তা' তুমিও বুঝবে না মা।” সেদিন এই বলিয়াই সে উঠিয়া গিয়াছিল।

দেবরত্ন চলিয়া বাইবার আগের দিন রাতিতে দ্বারের পর দরজা একেতে ছিলেন, দেবরত্ন মায়ের কোলে মাথা দিয়া ভুইয়াছিল। রাতি দশটা বাজিতে তাহার মা বলিলেন, “তবে আমি নি, বাবা, রাত হয়েছে।”

“তোমার কি ঘুম পেরেছে, মা?”

“আমার কি আর ঘুম হ'বে?”

“তবে চল, তোমার ঘরে যাই, তোমাকে একটা কপা জিজ্ঞাসা করবার আছে।”

এই কথা শুনিয়া দেবরত্নের স্নাতারা শিঁজ নিজে ঘরে চলিয়া গেল। দেবরত্নের মা বলিলেন “তুমি চল, আমি এখনই আসছি।” দেবরত্ন মাতার ঘরে প্রীতির একখানা মত রঙীন আলোক-ছবি দেখিয়া তাহারই সন্মুখে তখন চিত্তে ঝাঁড়াইয়া রহিল, তাহার ছই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু করিতে লাগিল ও সে অশ্রুই ঘরে কি বসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে যে তাহার মা আসিয়া তাহার নিকট ঝাঁড়াইয়াছেন তাহা দেবরত্ন জানিতেই পারে নাই। তিনিও পুত্রকে বিরক্ত না করিয়া মীরবে তাহার ঘরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি একটা শব্দ হইয়াছে দেবরত্নের হাঁস হইল, সে বলিল, “মা, তুমি কতজন এসেছ। এ ছবি থানা কি সম্প্রতি তোমার হইতেছে? বড় ভুলান হয়েছে।”

“ছবি ছ'মাস হ'ল তোলা হয়েছে।”

“তখনইলাম যে প্রতি তোমার কাছে সর্বদা আসে, তা' কেই এ ক'দিনের মধ্যে একবারও তো এল না। আমি এখানে এসেছি শুনে বুঝি আসে না, না, কি তার নিরলসের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে?”

“কে তোকে বলে রে যে তার বিয়ে হয়েছে?”

“যেহিলাম যে নির্মল ও প্রীতির বিয়ে দেবার জন্ত নির্মলের বাবা খুব চেষ্টা করছেন ও অনেক দূর এগিয়েছেন। তারপর আর কোথাও থবর পাই নি।”

“চেষ্টা করেই হয়েছিল, কেবল আমার সতীলক্ষী মা কিছুতেই তাহার বিয়ের কথা কাণেই তুলে না, তাই হ'ল না।”

“কেন সে রাজী হ'ল না? সে তো নির্মলকে খুব ভাল-বাসে আমার নির্মলও তো তা'কে ভালবাসে।”

নির্মলকে প্রীতি বড় ভায়ের মত ভালবাসে। প্রীতি বা নির্মল কেহই জানে না যে তাদের বিয়ের জন্ত চেষ্টা করা হইছিল। নির্মলকে শুধু দালা হয়েছিল প্রীতিকে জিজ্ঞাসা করত যে সে আমার বিয়ে করত চার কি না। তাতে প্রীতি বলে যে ও কথা কেউ আমাকে বল না, আমি কখনই আর বিয়ে করব না।

ছই মাস হ'ল প্রীতি এখানে নাই, তারা দালাপাতো

বেড়াতে গেছে, তারপর “উটীতে থাকবে। কবে যে বাছার মূখ আমার দেখব জানি না।” তুমি যে এখানে এখানে যে খবর তাকে সেই দিনই দেওয়া হয়েছে, তা'র চিঠির উত্তরও পেরেছি, তার ভারী আনন্দ হয়েছে। তোমাকে দেখতে যেতে যে আমাকে অনেক করে বরাবর বলত।”

“দেবরত্ন, তুমি আমাকে একটা কণার উত্তর দিবে কি? আর পুত্রকে আমি প্রীতির কাছ থেকে কোন কথা টের পেলাম না, লজ্জা থেকে কিরে অবধি বাছার আমার কি যে হ'য়েছে, সে যেন কোথাও ভিড়তে পারছে না, কেবল এ-দেশ, ও-দেশ, সে-দেশ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন তা'র মন এত চঞ্চল হয়েছে? এর কারণ কি তুমি জানিনা? সুবাবালা বিশ্বাস মীমিয়ার বিয়ে হ'য়ে গেছে বলে প্রীতির এমন হয়েছে, আমার কিন্তু তা' মনে হয় না। প্রতিরা মা তো জানে না যে, তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে কিন্তু আমি তো জানি। প্রীতি তার মাকে জানতে দের নি যে তুমি লক্ষ্যেই ছিলে ও তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। আমি জানুহু বলে সে শুধু বলেছে যে তুমি তাকে ভিনতে পেরেছিলে এবং সকলের সামনে তোমার বন্ধুর মত ব্যবহার করত। হাঁয়ে প্রীতিকে দেখেও কি তুমি টলসি নি? তোর মনে যে আমার প্রীতির চেয়ে কোন আবেগ ভাল তা' আমার বিশ্বাস হয় না। শুধু কটা মড্ডার কি এত মহিমা? প্রীতি মত মনে আর প'র্যন্ত আমার একটাও দেখলাম না, তার রূপ-গুণের তুলনা নই।”

“তুমি কি জানতে চাও? জানাব কি আছে? আমি স্বচ্ছন্দে নিজের জ যে শয্যা পেতেছি, তাতেই আমাকে শুতে হ'বে। এখন আমার জীবন দুঃখের হ'লেও তো আমি কাউকে শোষ দিতে পারব না। তবে এই অসুখাপ যে আমার পাণের ফলে তাকে কেন ভুগতে হচ্ছে; তার জীবনটা আমি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছি। আমি যদি সেই ছ'চার দিনের মধ্যে তার জীবনপটে না আসতাম, তো আজ সে কত সুখী হ'তে পারত। তাঁকে সুখী করবার ক্ষমতা আমার নাই, আমি যদি পারতুম তো প্রাণ দিয়ে তাকে সুখী করতে চেষ্টা করতুম কিন্তু চারিদিকে কেবল বাধা আমাকে নেন বিয়ে রেখেছে, কোন সিকিই আশার

আশা দেখতে পাচ্ছি না। তা, ছাড়া আমার ওপর তো সব নির্ভর করছে না, আমি তাকে চাইলে কি হ'বে, সে তো আমার চায় না। চাইবেই বা কেন, তার তো আমাকে বুঝা করবার কথা।

“অনেক কথা তো বলে কিন্তু যা জানতে চাইতুম তা' জানতে পারলাম না। প্রীতির সঙ্গে তোমার কি এ সব বিষয়ে কোন কথা হ'য়েছিল?”

“হ'য়েছিল যে কি, সে তো আমাকে আমার কর্তব্য শিখিয়ে দিয়েছে, কি বলেছে জান? সে বলেছে যে, আমার প্রথম কর্তব্য এখন আমার ছেলের ও তা'র মা'র প্রতি, তাদের সুখ নষ্ট করা আমার উচিত নয়।”

“তো'র প্রতি তার মনের ভাব কিছু বুঝতে পেরেছিল কি?”

“না, সে ঠিক এক একটা হোঁসলির মত, কখনও মনে হ'ত যে বুঝি একটু টান আছে, আমার পরমহুর্ন্তই মনে হ'ত যে তা' নয়। তার কাছে ভালবাসা আশা করাও আমার পক্ষে হুঁত মাঝ। ও সব কথা ছেড়ে দাও, মা, আমি শুধু আশা করেছিলাম যে, একবার তা'কে এখানে দেখতে পাব, তাও হ'ল না। তা'কে যদি আমি মাঝে মাঝে শুধু দেখতে পাই তা' হ'লেও তুমি হয়।”

“এত যদি তুমি তাকে ভালবাসি ও চাস, তবে কেন তার কাছে আসি না, কেন সকলকে তার পরিচয় দি না।”

“পরিচয় এমন দিতে প্রস্তুত আছি—তা'তে যদি সে সুখী হয়। মা, তাকে জোর করে তার অনিচ্ছার আমি নিতে চাই না। সেই বা কেন নিজের পরিচয় মুকিয়ে রেখেছে, আমি তো বুঝতে পারি নি।”

“তুমি তো বড় দুর্ব, তোর স্বপ্ন ও স্নান্য বজার রাখবার জন্তই সে নিজ পরিচয় মুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। তোর ওগল বাজে কথা রাখ, যেমের ভয়ে পারবি না। মনে থাক না, তাকে যখন বিয়ে করেছিস, ছেলে হয়েছে, তাকে আর কি ছাড়তে বসতে পারি, তবে অনেকে তো ছই প্রী নিয়ে ঘর করেছে, তাই কেন কর না?”

“প্রীতিকে কি বলে আমি অজ্ঞের অশীলার হ'তে বলব? তার যে সর্বস্বী হবার কথা। আর সে কখনও এ



নীচ প্রাণে রাণী হ'বে না আমি জানি। কোন উপায় নেই, মা, এ জীবনে আমাদের আর মিলনও হ'বে না, যুগও হ'বে না।"

বেশতর আর কিছু বলিল না, নিশ্চুপে চুপিয়া গেল। তাহার পরদিন বাইবার সময় শুধু বলিয়া গেল, "মা, মনে করো না যে আমি স্নেহে আছি, তোমাদের যে চোখের জল ফেলিয়েছি, তার ফলে আমাকে সারা জীবন কাঁপতেই হ'বে।"

এই কথ বসন্তের ভিতর দেবতার আরও দুই চারিবার বাজী আসিল, কিন্তু প্রীতির সহিত সাক্ষাৎ হইল না। একবার দেবভক্তের মা প্রীতিকে দেখা করিবার কথা বলাতে প্রীতি সম্মত হয় নাই, বলিয়াছিল "কি হ'বে দেখা করে? তা'কে কোন বস হ'বে না, মিথেষ্টার অশান্তি বাড়বে।"

উত্তরে তিনি বলেন,—“তোরা কি, মা, একবারও দেখতে ইচ্ছা হয় না, এতই কি তা'কে বুঝা করিস? তা'কে কি এ ভয়ে ক্ষমা করবি না, মা? সে বড়ই অস্বপ্নে ও অশান্তিতে আছে, তাকে দেখলে বুঝি, মা, যে অত্যাচার তাকে কি রকম করেছে। সে শুধু তোরা সঙ্গে দেখা করে তোরা কাজে অসহমতি নিয়ে আত্মপরিচয় সকলকে দেবে।"

“তাকে বলবেন যে আমার এতদিন যেভাবে জীবন কেটেছে, সেইভাবে দিন কেটে যাবে, আমার জ্ঞান আবার কেন আর একদমনকে কষ্ট দেন? আর জ্ঞান রকম কিছু এখন সম্ভব নহে। ক্ষমা তাঁকে আমি করেছি, তিনি ও তাঁর শ্রী-পুত্রাদি স্নেহে থাকুন এই আমি চাই। আমার পূর্বজন্মের পাপের নিশ্চর এই প্রায়শ্চিত্ত, নইলে এমনই বা হ'বে কেন। এ মা, ভগবানের অভিসম্পাত তাঁর দোর কি?"

প্রাতি একবারও সাক্ষাৎ করিতে সম্মত না হওয়ার দেবভক্তের বৃহৎ বিলাস হইল যে, তিনি তাহাকে মোটেই ভালবাসেন না। কিন্তু সে বুদ্ধিলা ন কেন সে নির্মলকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই।

দিন

এই সাত্বে তিন বসন্তের প্রীতির জীবনেও অনেক পারদর্শন হইয়াছে। সে লক্ষ্যেই হইতে মিরিয়া কেমন বৈ-

হইয়া গিয়াছিল। কখনও বা দিনের পর দিন তাঁহার ক্ষুধিত লীমা থাকিত না, আবার যখন সে তাঁকে বাহিরে তখন আনন্দের হানে ঘন বিবাহ তাহার প্রাণ ভরিয়া দিত। তখন সে প্রাণবন্ত পুত্রলিপিকা প্রায় হইত; কেবল নির্মলের সাহচর্য তাহার প্রাণের ভিতর একটু স্পন্দন আনিতে পারিত।

এই কারণেই সকলের মনে হইয়াছিল যে নির্মলের সহিত প্রীতির বিবাহ হইলেই প্রীতি সুখী হইবে ও সেইজন্যই সকলেই সেই বিবাহের জন্ত বিশেষ উত্তেজিত হইলেন। কিন্তু প্রীতি যখন সে কথা শুনিলা না, তখন সকলেই আশ্চর্য হইলেন। প্রীতির যে স্বামীকে মনে আছে বা সে স্বামীকে ভালবাসিতে পারে এ কথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না।

ছয় মাস পরে প্রাতির সেতাব কাটিয়া গেল, দেশের মন্থের প্রায় ইচ্ছা হইল। প্রায় এক বসন্ত কাল সে কখনও শ্বশুরের বাটতে, কখনও পরীপুণ্ডে, কখনও দূর-দেশান্তরে গাশিল কিন্তু তবু তাহার চিত্তচাক্ষুস্য গেল না। তখন সে আবার জ্ঞান দিকে মন দিল, সভা, সমিতি, শিক্ষা, দেশের নানান কাজ, তবু তাহার তৃপ্তি নাই, মনের শান্তি নাই। প্রীতির মাতা বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন, তিনি আশঙ্কা করিলেন বুদ্ধি তাঁহার কতটা মস্তিষ্ক বৃদ্ধ হইয়াছে।

নির্মল প্রীতির চিত্ত-চাক্ষুস্যের কারণ নির্ধারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু বিপর্যিত পারিল না। ই চারিবার তাহার মনে জাগিয়াছিল যে, হয়তো দেবভক্তের সহিত প্রীতির কোন সম্পর্ক আছে ও তাহার কারণেই তাহার অশান্তি; আবার পরমুহুর্তেই সে চিন্তা দূর করিত। একদিন নির্মল প্রীতিকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কি হয়েছে, তুমি কেন হঠাৎ লক্ষ্য থেকে সরে যাব পর এমন হ'বে কেন? তোমার এ পরিবর্তন আমি প্রথম সেখানেই একটু একটু লক্ষ্য করিয়াছিলাম। প্রীতি, আমাকেও কি তুমি বলবে না কেন তুমি স্থির হ'তে পারছ না? আমি বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি কোন বিষয়ে চিন্তাশ্রম করতে চেষ্টা করছ। প্রাতি, আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না?"

“দাদা, সমর এলে তোমাকে একদিন আমি সব কথা বলব, তোমার কাছে আমি কিছু লুকাব না। তোমাকে

বলতে পারছি না রোলেই এত কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু এখন আমি নিজেরই বুঝতে পারছি না যে আমি কি চাই। তোমার ও মায়ের অনীম বেহেরে জড়ই আমি এ কষ্ট মুখ করতে পারছি, তুমি আমার জ্ঞান এত কর বলেই মিনগুণা কেটে যাচ্ছে। তুমি না থাকলে আমি কি যে করতাম জানি না, অতঃপর আমি এত স্বাধীন যে, তোমার কাছে সবই নি কিছুই দিতে পারি না। তোমার যেন পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই, কোন কাজ নেই, কেবল আমার স্বপ্নের জন্ত সর্বগা ব্যত। এদিকে আমি শুধু সে যেহে দুটোই চলেছি; কত আবদার করি, কেন যে তুমি আমার এত অত্যাচার সহ করছা নি।"

“পাগলামী রাগ, তোমার জ্ঞান আমি সব করতে পারি, তোমাকে সুখী করতে পারলেই আমি সুখী হ'ব, আমি প্রতিনিয়ত চাই না। প্রতিনিয়তের আশাভেঁই কি জগতে সব করতে হয়?"

“তোমার মত ভালবাসতে কেউ জানে না। আমার বড় সৌভাগ্য যে তোমার মত দাদা পেয়েছি। যে এত নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে জানে, সে যে প্রী-পুত্র নিয়ে সঙ্গীরা হতে চাইছে না এই বড় দুঃখের বিষয়।"

“প্রীতি, আবার ও কথা তুলছ, আমি তোমাকে কি অগ্রহেরে করেছিলাম?"

“আমি নিজের স্বার্থে ও কথা তুলছি। তুমি কি ভবে দেখেছ যে তুমি যদি বিয়ে না কর আর, কেবল আমার জ্ঞান এত কর তো তাকে কি বলবে? তোমার মত দেবভক্ত কেউ বদনাম করবে সে আমি সহিতে পারব না, কাজেই আমাদের ছাড়া ছাড়ি করতে হ'বে।"

নির্মল হাসিয়া উঠিল। বলিল, “যারা বদনাম করবে তারা কি একটা বউ থাকলে করবে না ভাবছ? বদনামের ভয় আমি করি না, নিজে স্বাধীন থাকলেই হ'ল, তবে আমার জ্ঞান যে তোমার পবিত্র নামে কেউ কিছু বলবে তা আমারও সহ হ'বে না। কিন্তু যাকে মুখ কেউ কখনও বন্ধ করতে পারে? ও সব গ্রাহ্য না করাই ভাল। এমন কথা ছেড়ে চল একটু পান-বাঁধানা করি গিয়ে। কতদিন তোমার পান শুনি নি, জানই তো তোমার পান শুন্তে আমি কত ভালবাসি।"

চিত্তের চাক্ষুস্যবশতঃ সেদিন আর নির্মলের উপহার সে রাখিত পারিল না। কি করিলে এই দৃষ্টান্তের হস্ত হইতে রক্ত পাইতে পারা যায় তাহাই এখন প্রীতির একমাত্র ভাবনা হইল। হঠাৎ তাহার মনে হইল পরী-জননীরা সেবা করিয়া একবার দেখিবে যে তাহার চিত্ত জয় হর কি না? ভাব-প্রবণ প্রাতি তখনই কার্যে আত্মনিয়োগ করিল।

প্রায় একবৎসর হইল প্রীতি নিজের পরীগ্রাম সন্ধ্যার মত হইয়াছে। সুরেনবাবু চিরদিনই এই কাজটা অগ্রসর করিতেন, এখন প্রাতির অত্যন্ত উৎসাহ দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। প্রাতিদের বাবা জ্বর ছিল তাহার মাতা এক অংশ তাহারেরে বরখ হইত, প্রতি বসন্ত বাকী টাকা কেবল জমাই হইতেছিল। প্রাতি অনেক দান করিত, তবু তাহার টাকা কেবল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে যে টাকার কিয়দংশ ব্যয় করিবার উপায় বিপর্যিত করিল, সে তাহার গ্রামে এক বসিকার-বিভাগর স্থাপন করিল। সে বিভাগয়ের মত ভারি প্রাতি লইল, উচ্চ বেতন দিয়া লক্ষিতক মহাদেশের এই গ্রাম-বিভাগেরে শিক্ষাবিদ্যা আনিল। তাহার গ্রাম গ্রামে তাহারেরে সকলের বস-বাসের ব্যবস্থা করিল। সেইখানেই তাঁহারেরে আহােরেও ব্যবস্থা হইল। আবার পাছে ম্যালেরিয়ার ভয়ে শিক্ষাবিদ্যা পরীগ্রামে আসিতে বিধা বোধ করেন সেক্ষেত্র জীতি ব্যবস্থা করিল যে, আশ্রম প্রাচীরের শেষ হইতে কাঁড়িকের শেষ পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এ বিভাগেরে শুধু পাঠের ব্যবস্থা হইল না, সর্বাধিক কলাভিত্তিক স্থাপন হইত। প্রীতি নিজে সেলাই ও পান বাঁধানা শেখাইত ও প্রত্যেক শ্রমিকার বিভাগ আনিয়া চিত্রাঙ্গন বিজ্ঞা শিখাইতে লাগিল। নির্মল সন্তানভেদে সেই গ্রামের ও নিজেই সকল গ্রামেরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। বিভাগয়ের আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সেখানে ধনী-সরিরেরে মেয়েমা সবারই সমান ব্যবহার পাইত। দরিদ্র সন্তানদের প্রাতি নিজে বস্ত্রাদি দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিত।

নির্মল পুণ্ডেই প্রীতির জীবন শেষ কাটতে লাগিল। সে সমস্ত দিন বিভাগর লইয়া মাত্ৰিা থাকে। অপরাহ্নে সে তাহার মাতা ও বিভাগয়ের শিক্ষাবিদ্যের সঙ্গে বৈঠাইতে যায় ও পরিষ্কার প্রাচীরের বাটা দিয়া তাহারেরে মুখ-মোচনের



চেষ্টা করে। তাহাদের অনবস্থের বান্ধব, রাগের ঐধন পথ্য সকলই প্রীতি জোগায়। প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে নির্মল আসে, সেও দুই দিন এই সকল শুভকর্মে প্রীতির সঙ্গী ও কৰ্মী হয়।

কিন্তু মন এত একাকী পূর্ণ রাখিয়াও প্রীতি দেবরতকে ভুলিতে পারিল না। সে তাহাকে প্রকৃতই ভালবাসে কিন্তু তাহাকে অন্তরে কাছ থেকে কাড়িয়া দিতে চাহে না। তবু সে মধ্যে মধ্যে দেবরতকে দেখিবার জন্ত তাহার কঠোর শুনিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িত। অথচ বধন দেবরত আসিয়া অনেক কঠোর অধরোধ করিয়াছিল তবু একবার দেখা করিবার জন্ত, তখন প্রীতি কিছুতেই সম্মত হয় নাই। সে কি যে চায় তাহা সে নিজেই জানিত না।

একমুখে এক বঙ্গের কাজ করিয়া আবার প্রীতির চিত্তে চাক্ষুষ আনন্দ, সে আবার দেশ-ভ্রমণে ব্যগ্র হইল। তখন বিজ্ঞানর বেশ হৃদয়ভাষে চলিতেছে, সকল বিষয়ে স্বরূপশব্দ হইয়াছে, ইতরাত প্রীতি মনে করিল যে, এইবার একটু ভ্রমণে বাহির হইলে বিজ্ঞানের কোন অন্তি হইবে না। হ্রসেনবাবু ও হরপ্রদাদর কিন্তু আর তাহাতে উৎসাহ নাই। বহুদিন পরে দর্শনের সহিত মিশিয়া নানা কৰ্মে লিপ্ত থাকিয়া তাঁহারা চুঃখকষ্ট কতক ভুলিয়াছিলেন। সিমানি শ্রমের ভাবনা ভাবিয়া প্রীতির মাতার মন কেমন চিন-বিচিনে ভরিয়া গিয়াছিল, এমন দেশের কাছে যখন মধ্যে তিনি বেন পুনর্জীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার সে কাতরতার হানে এমন কি একটু 'আনন্দের চিহ্নও দেখা যাইতে—তাই তিনি পুনঃ দেশ-ভ্রমণে যাইতে কিছুমাত্র ইচ্ছুক ছিলেন না। হ্রসেনবাবু ও তিনি প্রীতিকে বিরত করিবার বহু চেষ্টা করিলেন।

প্রীতির কিন্তু দেশ-ভ্রমণের ইচ্ছার আরও এক কারণ হইল। তাহার মধ্যম দেবর পরীকারা সঁকল হইয়া সরকারী কোষাগারের অধ্যক্ষের পদ পাইল। তাহার সহিত প্রথম বিবাহের সম্বন্ধ চলিতেছে। নির্মল সে জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। প্রীতিরও তাহাতে বুঝি মত, কিন্তু এ বিবাহে তাহার এত দিনের সম্বন্ধিত ও গুণ কৰ্ম্ম একাধি হইয়া বাইবে, তাহাতে দেবরতের সন্তি হইতে পারে বলিয়া

প্রীতি ভীত। সকলই পাত্রকে প্রীতির দেবর বলিয়া জানিত কিন্তু এতাবৎ কাল কেহই তাহার সহিত দেবরতের কি সম্পর্ক তাহা জানিত না, কারণ সকলই দেবরতের পরিচয় পোষন রাখিতেছে। দেবরতের ব্যবহারে তাহার মাতা বড়ই মর্শ্বাশ্রিত হইয়াছিলেন, তিনি বলিতেন "তার সঙ্গে আমাদেবু সম্পর্ক নাই, তার নাম আর কেউ করবে না।" আত্মকাঃ যদিও দেবরত মধ্যে মধ্যে আসে সে কখনও আত্মীয়স্বজনদের সহিত দেখা করে না, কাছেরই সে কে, কোথায় যে চিরদিন কল্যাণের জালিন না। প্রীতি বেশ জানিত যে তিনিই তাহাদের সম্পর্ক কখনই থাকা থাকিতে পারে না, তবু সে এই বিবাহ পাশা হইবার পূর্বেই দুই মনে চলিয়া যাইতে চাহে। দেবরত সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিল না, অজ্ঞ গোকে যে সে সজ্ঞ প্রচার করিবে তাহা প্রীতির পক্ষে অসম্ভব হইল। সে চায় যে দেবরত সকলকে সে পরিত্যজিবে, কিন্তু সে আশা তো বিকল; হতরাত প্রীতি মাতা বা খুঃ-পিতামহের কোন কথাই শুনিয়া না, সে দুঃ-দেহ-ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে লাগিল, সে বদরীকাক্ষম যাইবার মানস করিল।

### একত্রিংশ

এক দিন নির্মলের পক্ষে প্রীতি বর পাইল যে নীলিমারা কয়েকদিনের জন্ত কলিকাতা আসিয়াছে। সে সবাদে প্রীতি নীলিমাকে দেখিবার জন্ত ব্যস্ত হইল, নীলিমার পুত্র হইবার সময় শেষ দেখা হইয়াছে, তাহার পর দুই বছর আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। পুত্র পাইয়াই প্রীতি হ্রসেনবাবুর সহিত কলিকাতায় আসিল নীলিমাকে তাহার প্রতিশ্রুতি হরণ করাষ্টা দিলে। প্রীতি নীলিমার খোঁসাকে রাখিয়া দিতে চাহিয়াছিল, ফলে তাহার বহু কণা দিয়াছে যে, তাহার আবার সম্ভাব হইবার পূর্বে যদি প্রীতি ও তাহার স্বামী পুনর্মিলন না হয় তো তাহার দ্বিতীয় সন্তান প্রীতিকে দিবে। তবুই প্রীতির বিশেষ ইচ্ছা যে আমি ও নীলিমাকে সে তাহার দেশ দেখাও ও সেখানেই ছাড়ি চিরি তাহাদের রাখিবে। তাহাদের অবাক করিবার ইচ্ছার সে পূর্বে কোনও বর না রাখিয়া আসিল। কলিকাতা পৌছিয়া নিম্নগৃহে সব ঠিক করিয়া প্রায় সন্ধ্যা ছয়টার মোটর করিয়া নির্মলের মাঝার বাড়ী গেল, সেইখানেই নীলিমারা উঠিয়াছে।

সেখানে পৌছিয়া প্রীতি শুনিল যে নীলিমারা সাক্ষা-বিধানে গিয়াছে, গৃহে আসেন শুধু তাহাদের মাসীমাতা ও নির্মল। গৃহিণী ও গিয়াছেন মানে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। কি আর করিবে সে তো এ বাড়ীতে মনোগত নহে, সে এবার নির্মলের ঘরের দিকে গেল। নির্মল ততোধার নিজে ঘর নির্মাণ করাইয়াছে, কারণ সে মধ্যে মধ্যে একটু নির্জন স্থান উপভোগ করিতে চাহে। সেখানে বড় বেশে যায় না, বধন তাহার ইচ্ছা হয় নির্মল সেখানে গিয়া নির্মলে চিত্তাক্রমে মন দেয়। প্রীতিকে দেখিয়া নির্মলের বালক ভূতা বলিল, "দাদাশাবুকে খবর দিই।" প্রীতি উত্তরে বলিল, "তোকে আর খবর দিতে হবে না আমি নিজেই খবর দিচ্ছি।" ভূতা বলিল, "দাদাশাবু যে আমাকে বলছেন কেউ এলে তাঁকে আমা খবর দিতে, আমাকে যে বন্ধনেন।" ততক্ষণ প্রীতি বাপ না শুনিয়া ক্ষতবেদে উঠিয়া গিয়া ক্ষত ধাখান্য ভূতাকে অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্বেই নির্মলের গৃহে গেল। সেখান উপনীত হইয়া সে ডাকিল "দাদা" কিন্তু সে যারা সেখিল তাহাতে সে নির্মল হইয়া ঝাঁড়াইয়া গেল। নির্মল চাহে আমা খবর দিই জীবন্ত প্রতিমূর্তি, তৈলচিত্রে অঙ্কিত করিয়া ছবির নিয়ে স্বর্ণকণ্ঠে বিখিয়া রাখিয়াছে "দেবী আমারা"; আর তাহারই সমুখে মুগ্ধ বাজানুশব্দভাষে রহিয়াছে।

প্রীতির কঠোরতা তাহার চমক ভাঙ্গিল, প্রথম তাহার মনে হইল যে, সে জ্ঞাতোই স্বপ্ন দেখিতেছে, কিন্তু চিরিয়া দেখিল প্রীতি সন্দেহের উপস্থিত। সে প্রীতির দিকে অগ্রসর হইল। প্রীতি আর ঝাঁড়াইতে পারিল না, সে নির্মলের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কান্নিতে লাগিল। কিকর্কটাব্যুত নির্মল তাহারই পার্শ্বে বসিয়া আবেগ-ভরে বলিল, "প্রীতি, কি হয়েছে, আমাকে বল। তুমি কেন হঠাৎ এগিয়ে, কেনই বা এমন করে কাঁদছে?" প্রীতি সমস্ত শরীর তখনও কাঁপিতেছিল, সে উত্তর দিতে পারিল না। নির্মল তাহার পৃষ্ঠে ও মন্তরে হাত কুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা পাইল।

কিছুক্ষণের পর প্রীতি মূব ভুলিয়া যীয়ে ছবির দিকে অগ্রসর নির্দেশ করিয়া বলিল, "দাদা, ও কি করছে?" নির্মলের তখন হৃদয় হইল যে ছবিদানা খোলা আছে,

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পর্দা টানিয়া দিল।" আর দুই বঙ্গর হইল নির্মল নিজ হাতে এই ছবি আঁকাইছে। প্রীতি বধন কেবল দূরে দূরে বেড়াইত তখন তাহাকে দেখি-বার অজ্ঞ উপায় না পাইয়া আত্ম-তৃষ্ণির জন্ত নির্মল তাহার এই জীবন্ত প্রতিমূর্তির স্বজন করিল। নির্মলের জীবনে প্রীতির চিত্রা ভিন্ন অজ্ঞ চিত্রা নাই, তাহার ধ্যান-ধারণা সবই প্রীতির। সে প্রেমে স্বার্থ নাই, প্রতিদানের আশা নাই। নির্মল ঈর্ষ্য হাসিয়া উত্তর দিল, "কি আবার হবে, তোমার ছবি কি আঁকতে নেই? আমি তো সকলেরই ছবি আঁকব মনে করেছি, সময় পাই নি বলে হয় নি।"

নির্মল আশা করিয়াছিল যে প্রীতি তলার লেখাটা দেখে নাই, তাই তাহার প্রীতিকৈ কুলাইয়া এই প্রকাশ। কিন্তু প্রীতি উত্তর করিল, "দাদা, যুগ্মাঙ্ক কেন? আমার আর কিছু বুঝতে পারি নেই, এই অভাগিনীর জন্তই তুমি সংসারী হলে না। জেনে শুনে কেন এমন বিধি পান করলে, দাদা? এতদিন আমি ভাবতাম না জানি' কেমন সে মেয়ের রক্ত তোমার প্রাণে এমন হ্রসব প্রণয় জাগিয়েছে, যাঁর রক্ত তুমি সকল কামনা ত্যাগ করে প্রদর্শন-মুখ-প্রদর্শন-পথে এগোচ্ছে। যদি আগে জানতুম যে তোমারই হৃদয়ের পথে কীটা হ'লে ঝাঁড়া—"

নির্মল প্রীতির মুখ চাপিয়া ধরিল, কথা শেষ করিতে দিল না, বলিল, "ও কথা বলতে পারো না। তুমি কি জান যে তুমিই আমার স্বপ্ন, আমার শান্তি, আমার ধ্যান, আমার ধর্ম। প্রীতি, কেন গুংগ করছ, আমি হুখে এই জীবন বরণ করেছি। প্রীতি, তোমার কাছে একটা অধ্যরোধ এই যে আমি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যবহারের স্টাইল না করে, আর আমার প্রতি তোমার মনের ভাব যদি বর্ণে যায় তো আমার হৃদয়ের শীমা ধাক্কাবে না।"

"দাদা, তোমাকে আমি জিগ্মসাই বড় ভাইয়ের মত ভালবাসি, গুংগজ্ঞানে, দেবতাজ্ঞানে আমি তোমার পূজা করি, তুমি চিরদিনই আমার প্রাতঃসমর্পণ। তোমার কাছে কত না গুণগণা পেয়েছি, তুমিই আমাকে এমন করে গড়ে তুলেছ।" তবু বলি এ ব্যাপারই হ'লেই ভাল ছিল। দাদা, আমার একটা কথা শিখিয়ে শোনো, তার পর বেশ ভাল করে সব দিক একবার বিবেচনা করে দেখ। প্রকৃতির



নিম্নে একমুখী চার, ভালবাধা দিতে ও পেতে চার, সম্ভান চার। কেউ তো বেছায় প্রণয়সীন, সঙ্গীদীন জীবন চার না। বাসে ভাগ্যদোষে সঙ্গীদীন অবস্থাতে দিন কাটাতে হয় তাদের কত দুঃখ, তাদের কত বিভবনা, তাদের জীবন শেষে হয় তো তিরিক হয়ে ওঠে। বেদী আমি বলতে পারছি না। দাদা, আমার কথা শোন, এমন করে নিজের জীবন মাটি করো না, একটা মনের মত মেয়ে দেখে বিয়ে কর। স্বীতা ভালবাসতে, সহানুভূতির কলকে তোমাং জীবন পূর্ণ হয়ে উঠবে। আমি তোমার হেসেদের নিয়ে নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলব।"

"প্রীতি, কেন মিছে এত বাজে কথা বলছ। তুমি কি করে আমাকে বিয়ে করতে বলছ? আমি একজনকে বিয়ে করে তার কাছে প্রাণচাড়া ভালবাসা দেব, আর দেব ভালবাসার অভিনয়। তাতে সে তুষ্ট হবে কেন?"

"কালো তুমি তাকে ভালবাসতে শিখবে।"

"বুঝা, আমি আমার মন বেশ জানি, ও সব হবে না, আমি কিছুতেই বিয়ে করব না। আমার প্রাণের মন্দিরে অত কারও আসন নাই, হতেও পারে না।"

প্রীতিতুপ হইয়া গেল, নির্মল আরও বলিল, "প্রীতি, আমি তো একজনকে ভালবেসে তাকে জীবন উৎসর্গ করেছি, তুমি কার জন্ত নিজেকে সব হু হতে বঞ্চিত করেছ? সে তো তোমার ভালবাসা পাবার উপকূলও নহে।"

"আমি যে কিছুতেই তাঁকে ভুলতে পারছি না, দূরে গিয়ে, কাছে যেন ভুলিয়ে কিছুতেই আমি সম্মত হ'তে পারছি না। দাদা, তুমি তো বেশ স্থির আছ, আমি কেন এমন আশ্বর্য হই? আমার মনে হয় যদি তিনি আমাকে এতদূর পত্নীবলে স্বীকার করেন, তা হ'লেই আমি সব অপমান ভুলে তাঁর সেবাদাসী হ'তে প্রস্তুত হই।"

তোকের চোখে ধূলা মিলে কেমন করে? সে তো শুধু এক দিন তাঁর দ্বারা বিয়েছিল, তখন তোমার ব্যবহারেই তো আমি তাঁকে পেলাম। আজ যুক্ততে পারছি যে কেন এমন দ্বিচারী অমায়িক লোক হঠাৎ আমাং প্রতি বিবেচনা বোঝা, অত পূর্বে আমার সঙ্গে বেশ ভাব ছিল। আমি মনে মনে ভাবতুম যে একে এমন ভাবে ঈর্ষা প্রকাশ করে। ছুই তিন দিন তো তোমাকে নিয়ে অপজা বাধার মতই হ'য়েছিল। কেবল তুমিই তার সঙ্গে এমন সহজ ব্যবহার করত, যেন সত্যই বহুদিনের আশাশ্রমাজ;। দেখও কিছু দ্রুতবে পারি নি যে তাতে তোমাকে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।"

প্রীতি একশব্দ মাথা নীচু করিয়া ছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, "আজ তোমার কাছে আর কিছুই গ্রহণ করি না, দাদা। তোমাকে অনেক দিন বসতে গিয়েও বলি নি, কেন তা জান কি? আমি চেষ্টাছিলাম যে লোকের মনে তাঁর মুখ থেকে আমার পরিচয় পায়। তুমি কেমন করে আজ আমাকে ধরে ফেললে? দাদা, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হ'বে যে তুমি এখনও কাকোর কাছে আমার এ পরিচয় দিবে না।

চিরদিন একথা ঘূষান থাকবে না সত্য, তাই আমি দেখতে চাইছি তিনি নিজে কি করবে। আমার যত্ন তাঁর ভাবের সঙ্গে বিয়ে হয় তখন তো সবাই জানতে পারবে, তুমি অন্ততঃ ততদিন কা'রও কাছে কথাটা প্রকাশ করো না।"

"আজ্ঞা, যে যেন হ'ল, আমি কাউকে বলব না, কিন্তু তোমার ওপর আমার বড় অভিমান হচ্ছে। তুমি কি বিশ্বাস করে আমাকেও বলতে পার নি। প্রীতি, তোমার জন্ত আমি কি না করেছি, বিগততে সমস্ত বড় বড় কলমে ত'র তর করে খুঁজেছি। নামটী দখলন্ত মিন্ধ্যা বসেছিল।"

"না, দাদা, নাম মিথ্যা নয়, ঐ নামে আমাদের গ্রামে হ'য়েছিল। তুমি রাগ করলে আমার প্রাণে বড় বাধবে।" আঁঠু তো তোমাদের সকলকে সমান নিতে বারন করছিলাম, তোমারই শোন মি। আমি যে তাঁর মুখে ব্যাখ্যাত মিটে চাই নি দাদা, আমি যদি তুমিদের জানতুম যে ত'নি ওখানে আছেন আমি লক্ষ্যে যেতাম না। প্রথম যখন তাঁকে দেখি তখন আমার কি অবস্থা হ'য়েছিল বুঝবে কি? আমি যে সেইখানেই মুখোঁ হাঁই নি সেটা আমার বড়

মনের জোয়ের জুড়। তার পর দিনের পর দিন আমার কত যে মনোবিশেষ গোছে তা'বে যে ভেঙ্গে পড়ি নি এ আরও আশ্চর্য, তাঁর পক্ষে তো ব্যাপারটা অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিল। তোমাকে বলি নি বলে বাগ করো না ভাই, আমার বা আজ পর্যন্ত জানেন না যে আমাদের দেখা হ'য়েছে। কেবল আমার শাওজী জানেন, তিনি তো জানতেন যে তাঁর ছেলে দেখানো আছেন কিন্তু তিনি তাঁকে বা আমাকে সাবধান করে দেন নি। তাঁর অভিজ্ঞার বোকা শক্ত নয়, তিনি আশা করেছিলেন যে ওখানে আমাদের মিলন হ'বে।"

নির্মল প্রীতিকে বাগা দিয়া বলিল, "আগে আমাকে একটা কথা বল, তা'মতে তা'তে এখন কি সম্ভব?"

কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া প্রীতি বলিল, "তোমার কি মাথা ধারাপ হ'য়েছে দাদা, তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক থাকা সম্ভব? আগেও বা ছিল এখনও তাই আছে।"

"তোমাদের কি কোন রকম বোকা পড়াও হয় নি?"

"দাদা, ধৈর্য ধরে সব শোন, তোমার কাছে সব বলে আমি নিজের মন হাল্কা করব।" প্রীতি তাহারপর দীর্ঘে দীর্ঘে প্রায় সবই বলিল, কেবল শেষ দিনের আলাপের কথা বলিতে পারিল না।

সকল শুনিয়া নির্মল দেবভক্তের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "সে তোমাকে পাবার উপকূল নয়। মুখে প্রণয় বেগার কাছে কিছুই করেন না, সে প্রণয়ের কি মূল্য।"

"তাঁর প্রতি অবিচার করো না দাদা। তিনি এখন কি করতে পারেন, নিজ স্বর্গ ফল তো এখন ভোগ করতে হ'বে। আশ্বজ আমার বিশ্বাস হয় না যে প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাকে ভালবাসেন, হয়তো আমার প্রতি যে অত্যাচার করেছেন তাঁর জন্ত ক্ষমত হ'বে, তাহাই সম্মোহনের প্রয়াস পাচ্ছেন। যদি আমাকে সত্যই চাইতেন, তো এত দিনে একটা কিছু বিহিত করতেন, কিছু দিন আগে তাঁর মার মুখে থবর দিয়েছিলেন যে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান ও আমি সম্মত হ'লে সর্বসম্মত আমার পরিচয় দোঁদেন। আমি দেখি কি দরজার তাও বন্ধি না? তাঁর স্বীকরণে একবিষয়ে পরামর্শ করে তবে তাঁর এ কথা তোলা উচিত ছিল না কি? তাঁর স্বীকৃত আমি আমাকে নিয়ে একসঙ্গে থর না করতে চায়,

তা হ'লে তাকে যে বোঝ দেওয়া যায় না, কারণ এ রকম যে হ'তে পারে তা ইংরেজের মেয়েদের দারপার অজীত।"

"তুমি যে তাকে ভালবাস সে কি তা'র জানে?"

"কি বলছ তুমি দাদা? আমার কি এতটুকু আশ্চর্য-জ্ঞান নেই যে আমি একথা তাঁকে জানতে দেব? বয়ঃ এ তাঁর দারবা যে আমি তোমাকে ভালবাসি। এমন দিন যদি কখনও আসে যে তিনি আমাকে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চাইবেন তখন আর আমার মান-অভিমান থাকবে না, তিনি যদি সত্য আমাকে চান, তখন আমি তাঁর কাছে যাব। দেখতে চাই আমি আমার হৃদয়, আর তুমি কি না এই আমার জন্ত তোমার অমূল্য ভালবাসা বিলম্বন দিয়ে মানম করছে।"

এ উত্তরে প্রীতির ছুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল যেখান নির্মল বলিল, "কেঁদ না, প্রীতি, আমার কোনও কষ্ট নেই, তোমাকে ভালবেসেই আমি হুঁশ। আমি তোমার প্রতিদান চাই না। চল, নীচে বাই, নীলাম্বা হয় তো এসেছে।"

নীচে বাইবার পূর্বে প্রীতি তাহার সঙ্গ-বিদ্যোত নয়নে নির্মলের মুখপানে চাহিয়া তাহার দুইটা হাত ধরিল। নির্মল, "যে বড় ভাগ্যবতী হয় সেই এমন অপাধি ভালবাসা পাবার যোগ্য, কিন্তু পরস্ৰী হ'য়ে এ ভালবাসার কথা আমার ভাবাও পাপ।"

ইতিমধ্যে প্রীতির ভ্রমণের সমস্ত সমুচ্চ হইল, সে স্থির করিল যে, এক বৎসর কি ততোধিক কাল বিশেষ থাকিবে, ফলে হয় তো নির্মল তাহাকে ভুলিতে পারিবে। আর সেই সঙ্গে নিজেও ভগবৎ চিন্তার নিম্নের মন তুলাইবার চেষ্টা পাইবে, দেবভক্তকে ভুলিবে ও সম্যগের স্মৃতিমালা হইতে মুক্ত হইবে। "হিমাদয়ের সকল তীর্থ-ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা তাহার জাগিল। কিন্তু সঙ্গে বাইবে কে? মুরেনবা'র ব্রত হইয়াছেন, তিনি তো সে তীর্থ পথ পরিত্যাগে অতিক্রম করিতে অসমর্থ।

সেইদিনই প্রুবে প্রত্যাহারের পূর্বে প্রীতি নির্মলকে বলিল, "দাদা, আমার জন্ত তোমাকে একটা কাজ করতে হ'বে, আমি কোন আপত্তি গুনব না।" আমি তীর্থ-ভ্রমণে যাব, আমার ক্ষতস্থিতিতে আমার সম্পত্তির ভার ও আমার



## শান্তিপুত্র-চিত্র

( পূর্ণাহুতি )

ঐক্যবাহু চিত্রাচার্য্য

সাত

ডোলানাবাহু শান্তিপুত্রবর্ননা প্রসঙ্গে তথ্য বহু বিবাহ ও বিবাহ-বিবাহের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে শান্তিপুত্রের জন্মস্থানে। তৎপূর্বে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে 'সমাচার-দর্পণে' উত্তর-প্রভাতরূপে 'শান্তিপুত্রনিবাসিনী' কুলীনকথা ও বিবাদের মর্মবোধ ইংরাজী অম্ববাদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখা পুরুষের বসিয়াই বোধ হয়। ইহাতে রাজসকালে প্রতীকারের প্রার্থনা করা হইয়াছে। তৎকাল-প্রচলিত ব্যবহার-মত একটু খোলাখুলি ভাব দেখা গেলেও ইহা বর্তমান কালের 'কামায়ন'-সাহিত্যের নিকট পরাভব পায়। এই উত্তর-প্রভাতের মধ্যে 'শান্তিপুত্র-নিবাসিনী' ১৪ই মার্চ তারিখে প্রথম তাঁর পেন প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ১৮ই এপ্রিলের 'সমাচার-দর্পণে' নবমীপ-বাসী-কর্তৃক 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র লিখিত এই খবরের প্রতি-বাদের উত্তর দিয়াছিলেন, ২১শে মার্চ 'চুঁচুনিবাসী-ঐগণ' 'সমাচার-দর্পণে' উক্ত খবরের মর্মণ করিয়াছিলেন। (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১০৩৮, পৃঃ—২৪৮-৯।)

কমলা

শ্রীমত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপে।

আমারদিগের এই কএক পাক্ষিক মহাশয়ের দর্পণকদম্পে হান-দান-প্রাপ্যনানের সম উপকার হয় অর্থাৎ আমার প্রৌঢ়া পাতনীনা বীনা কিণী এবং অবিহাতি কুলীন-ভ্রাতৃদের কথা, পতি অভাবে আমারদিগের যে বেদনাবেদন ভূপতিকে অবগত করণে অশক্তা একজ মহাশয়ের সমাচার দর্পণে প্রেরণে আশ্রিত। কারণ দর্পণকদম্পে মুদ্রিত হইলেই জীবিতদিগের দৃষ্টকোপণ এবং শ্রবণে ২ ভূপতি শ্রবণগোচর হইনের অসাধ্যসাধন।

শ্রীমত ইন্দরবাহুহররের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধবাবস্থা হইলে তারারদিগের পুনরায় বিবাহ হয় কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গলা দেশে বাদসারীয়া দ্য যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কথা বিধবা হইলে ও প্রধান ২ পতিত মহাশয়ের দ্বারা অবগত হইয়া শুদ্ধসংচার পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সমবেশ

না হইলে বিবাহ হয় না। যতপি এই স্ত্রীলোকেরা উপগতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু এই উভয় বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনার্য্যসে বৈজ্ঞান্যগে গমনপূর্বক উপ-স্রী লইয়া সমভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না। বিধেয়তঃ তাহারান্নামতঃ যতবার পাইতেছেন এবং ধর্ম্ম কর্ত্তে পৈতৃক আশ্রমে ধর্ম্মবৎ ধর্ম্মের ভারাক্রান্ত আছেন ততঃ সমধর্ম্মভারাক্রান্ত নহেন। কেবল স্ত্রী-লোকের নিমিত্তে সমধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গলা শাস্রমতঃ এমন আছে যে জ্যেষ্ঠোদ্য বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। তাহার প্রধান আছে বাহারা সুরা-সুর ও প্রধান প্রধান পুরুষের রাজা তাহারদিগের পত্নী পতি-অভাবে পুনঃ-বয়সরা হইয়াছেন এবং স্বামিসহে অনার্য্যসে উপগতি লইয়া সমভোগ করিয়াছেন। তাহাতে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় নাই। অতাপিও তাহারদিগের নাম উচ্চারণ এবং ধর্ম্মে পাণপ্ৰসঙ্গ হয়। তৎসময়ে কুলীনাকুলীন ছিল না কিম্বাচার্য্য। সুরাহার রাজারদিগের এ সকল কর্ত্তে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় নাই। এইকণে পুরুষেরদিগের ধর্ম্মবিকৃত হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্মভোগ নিবেদার্থে কি ধর্ম্মপাত ও পুরাণতঃ বহন হইয়াছিল।

আমরা আমারদিগের শাস্র অবলম্বন করিয়া সাধ্যমতে আছি তথাচ আমারদিগের বৈধবস্থা ও আকাজকীয় উত্তম আহারীয় জীব্যাদি ও পতিসংসর্গ বাক্তিত হইয়া অহরহঃ অমহ বিরহবেদনায় বাহজ্ঞান রহিত হইয়া কি নিমিত্তে কালনাশন করিতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বৃত্তিতে পারি নাই। যাহা হউক অবলার অবলা মনোবাধা সমতা-করণের কর্ত্তা পতিস্বভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইকণে ধর্ম্মিক রাজা ইংরেজ বাহাদুর নানাবিধ ধর্ম্ম সাহায্যন করিতেছেন। আমারদিগের ধর্ম্ম শাস্রে এই যাতনা নিবা-রণের উপায় আছে তাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্রের দুই-পূর্বক ও প্রধান ২ পতিত মহাশয়ের দ্বারা অবগত হইয়া শুদ্ধসংচার করিয়া অমহাধর্ম্মপূর্বক আইন অমহারে প্রকাশ করেন। কিয়

শর সকল কাজের তার ভোমাকেই নিতে হবে। ফিরে আসবে। এর পরে তুমি খোলাসে যেতে চাও আমি তোমার ইচ্ছামত তুমি কাজ চালাবে।

“তোমরা কোথায় যাবে আগে তুমি।”

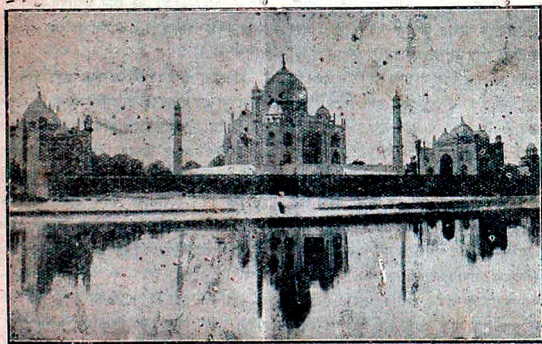
সব মতলব জানিয়া সে আরও বলিল, “অতঃপরে আমি তোমাদের কখনই শুধু দায়কে নিয়ে যেতে দেব না। আমাকে যখন তুমি বড় ভাইয়ের হান দিয়েছ, তখন আমার মতে চলতে হবে। আমি নিজে তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব।”

“না, দাদা, তুমি গেলে আমার এত সবারে সকল কাজ পও হবে, তা ছাড়া তোমারও কান্নের ক্রতি হবে। সে হবে না। আমাদের সঙ্গে যাবার লোক ছুটে যাবে, আমার ছোট দেবরকে তো নিয়ে যেতে পারি।”

“আমার কাছ থেকে দূরে থাকবার ভক্ত বৃত্তি এসব মতলব করেছ প্রীতি? তা বেশ তোমার ইচ্ছামতই কাজ হবে। কিন্তু আমার কাছে তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে এবার বরিকাক্রম থেকে আর বেশী দূর ছর্ম্মণ পথে যাবে না,

“তোমার সঙ্গে যেতে তো ভালবাসি, তা’তে কত নিকা, পাই, তোমার শিল্পীর চোখে কত নূতন সৌন্দর্য্য দেখতে পাই, কত আনন্দ উপভোগ করতে পারি,—কিন্তু এবারটা থাক। তবে একথা স্পষ্ট করেই বলি তুমি যে উদ্দেশ্যের কথা তুলেছ সেটা আদৌ সত্য নয়, আমি প্রকৃতই তীর্থ-দর্শনের মানস করে সব জায়গাভ্রমণও ঠিক করেছি, আমি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভেতর ভুবে থেকে পতি দেবতাকে ভুলতে পারি কি না দেখতে চাই—আর চাই সত্য-নিবন্ধনের দ্বন্দ্ব-দেবতার সাক্ষাৎ পেতে। আশীর্বাদ করা দাদা যেন মনস্তামনা সফল হয়।”

বিদিত নির্মলকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই প্রীতি গৃহ ত্যাগ করিল।





বিশিষ্ট কুলোত্তম বংশাধরের দিশের উপদ্রী। প্রকৃত সম্ভোগ রচিত করেন। তাঁহা হইলে আমারদিশের ধর্ম বসন্ত হয় এবং রাজার প্রধান ধর্ম শাস্ত্রপন হয়। কেন না স্রীলোকো ব্যক্তিত্বা চক্রে পুণ্যের ধারা যতপূর্ণ পুণ্য সকল উপদ্রীভুক্ত হন তবে স্রীলোকো কুলটা হইতে পারে না। স্বভাবে ধর্মের ধর্ম রক্ষা করেন। কাহি শাস্ত্রপুণ্যনিবাসিনী।" (সমচারণ, ১৪৩১০১৩০)।

ইহা হইতে সৌভাগ্য সমাজ হইতে লেখা হইয়াছিল।

বিশনারী ও ব্রাহ্ম সমাজের চেউ অবশ্যই লাগিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও রাজা রাজবল্লভের পর বিজ্ঞানসম্পন্ন পুণ্য সমাজপন্থী সমাজ হইতে এই প্রচেষ্টা নৈতিক সাহসের প্রকাশ দেখাইতেছে। বাহা হউক, ইহার প্রতিবাদের উত্তর প্রেরণ হইল।

“শ্রীমত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সর্বাধে।

আমারদিশের এই একক পঞ্জি মহাশয়ের দর্পণকেন্দ্রে স্থানবাসে প্রোক্ত অনুভূতি পত্নীনা বিরহিনীরদিশের মনের ব্যাধা অনেক সমতা হইতে পারে অর্থাৎ সমগুণনির্গুণ বৈশাখক অসীম বৃষ্ণ দর্পণপাঠক দর্পণে আমারদিশের বৈশাখক অসীম অস্বস্ত হইয়া যতপূর্ণ কান মহাশয় অগ্রহ করিয়া ভূপতির গোচরপূর্বক আমারদিশের প্রভূদায়ক করেন সে মহাশয়ের দর্পণপাঠক অর্পণ ব্যতীত হইতে পারে না।

২ চৈত্র শনিবার শাস্ত্রপুণ্যনিবাসিনীর উক্ত এক পত্র শ্রীমত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় প্রকাশ করেন। ২১ চৈত্র শ্রীমত চন্দ্রিকাপ্রকাশক নবদ্বীপনিবাসিনীর উক্ত তাহার উত্তর বসিয়া ধর্মার্থ শাস্ত্রের ধর্ম শ্রীমত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়কে অবিকলো রচনা পূর্বক নানাবিধ ভৎসনা করেন সে তাহার অভ্যাসক্রান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল অস্বস্তিগো বিজ্ঞতা বসে দ্বিতীয় কুস্তীর ব্রহ্মজ্ঞাত দ্বিগুণ বলায় ধর্মপুণ্য বসন্ত পদ্যপুণ্য এইকম ধর্মভাষ্যসম্পাদক কিম্বা সচিবচক উত্তরকারক বসন্ত মুক্ত বিরাতপুণ্য উত্তর তেননি উল্লেখ্য পদ্যের উত্তরে বিজ্ঞাপ্রকাশ হইতেছে। দেখাব্যবহার বিভাজন দ্বয়ে করিয়া সিদ্ধের সহিত শিকারে স্বীকার করিয়াছেন। সে বাহা হউক ধর্মপ্রকাশকের অধর্মতা দেখিয়া আমারদিশের ধর্মশাস্ত্রাহারী দেশাধিপতিকে ধর্মবৈশাখকেন্দ্রে অবগত

করিয়া আমারদিশের যাকনা নিবাসিনী ও লম্পটপুণ্যের লম্পটতা বারপকরণার্থ উজ্জী তাহাতে চর্যাপী ধর্মপুণ্য প্রতিবাদী। ইহাও বোধ হইল যে ধর্মপুণ্যের স্বীয় পরিবাসের মনের ব্যাধা বৃষ্টি অগত নহেন। কেবল ভেদের তার কমবস্তু বসিয়া মনু আহরণ করিতেছেন। কিন্তু সম্ভোগে বস্তু আদিয়া রসে ভদ্রে কমলাপুণ্যের অনঙ্গপ্রসঙ্গে মধুপান করে সেই সম্বন্ধ ধর্মশাস্ত্রিনীর ধর্মশাস্ত্রায় ধর্মের ছালা বাধা যায় তাহা কল্যাণ রচিত হয় না। কিম্বা কুলসীপ ও কল্যাণ দ্বিগুণ আটক করিতে পারেন না। তবে যে প্রতিবন্ধক ইহাতে অল্পতম এই যে বিরহিনীরদিশের উচিত বিহিত ব্যবস্থা হইলে যেটুকু পটক যটকের বৃত্তিভেদ হয়। স্বভাব্য বিহিতাহুসারে বিরহিনীর স্বীয় ২ মনোরাহন্যহারী মনুধর্মশাস্ত্রমতে বাসিগ্রন্থ অর্থাৎ বসন্তায় ইহা অপ্রকাশিত হইত। কতটা বৈশাখকর্তার কি প্রয়োজন তাহার আর প্রভূ থাকে না। সে বাহা হউক বিবাহের প্রার্থনা তাহার অন্তে তাৎপর্য কতিপয় পঞ্জিতে এমত আছে যে স্রীলোকের বৈশাখকাতনা নিবাসনের ব্যবস্থা নিগূঢ় ধর্মশাস্ত্রে বাহা আছে তাহা রাজ্যধিপতি আইন অহুসারে প্রকাশ করেন কিম্বা পুরুষসকল উপদ্রীভুক্ত হন কেন না স্রীলোককে কুলটাকরণের কঠী পুণ্য সকল অতঃপর পুণ্য উপদ্রী ভুক্ত হইলে স্রীলোকো কুলটা হইতে পারে না স্বভাবে ধর্মের ধর্ম রক্ষা করেন। আমারদিশের ধর্মশাস্ত্রের বিবি সকলের প্রতি তাহাতে পুণ্য বী স্রীলোকের ভেদ নাই তাহা বিতর্ক না করিয়া কেবল ইতরের পক্ষ বলিয়া সুব্যক্তি সম্ভাব্য করিয়াছেন আর বৈশাখকের প্রতি উপমা দেখিয়া বিধিগাহেন যে বৈশাখকের সহিত উপমা দেখা সে উকালের ঠাকুরালি। তাহার প্রমাণ দৃষ্টি করিলেন। যথা মহাভারতীয়ঃ। অহল্যা প্রোদগী কুন্তী তারো মন্দোদরী তথা। পঞ্চকালঃ ধর্মোত্তমঃ মহাপাতকনামঃ। দেবপক্ষে। ভেদে পৌতমহুকীয়ঃ স্বরপতিভক্তঃ ইত্যাদি। এমত আর ২ অনেক ২ কৌণ্ড ও দেবতার ভগাণ্ডন গ্রন্থে প্রকাশ আছে সে কি উকালের ঠাকুরালি কি ঠাকুরেরদিশের ঠাকুরালি ইহা নিশ্চয়না না করিয়া কেবল সুকথা বলিয়া ভিত্তি বাসি দিতে কমতাপন হইয়াছেন। সকল অনুভূ প্রোক্ত পত্নীনার প্রতি যে বিবি নানাবিধ ধর্মশাস্ত্রে বিধান করিয়াছেন

তাহা প্রনিধান না করিয়া বহিরের মত অব্যবস্থা করিয়া হুসন্তায় রাধাচন্দ্রে যখন চন্দ্রমা রাহুগ্রস্ত তেননি নিগূঢ় ধর্মের অবস্থা করিয়াছেন।

পরন্তু রাজ্যধিপতিকে অধাধিক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভৎসনাকরণে কি তাৎপর্য। রাজ্যধিপতি তোমারদিশের সাধারণ ধর্ম ধার্য্য করিয়া স্বভাব্যগমতে আত্ম করেন যেহেতু বান্ধবা ধর্মশাস্ত্রে এমত আছে যে স্রীলোকো পতিপরিভাগ্য করিয়া উপপতি লইয়া জবন ভূপতির হৃদয়ে হামির হয় তাহার আরম্ভে জ্ঞাতিতে কি অধিকার থাকে। তিনি পুনরায় পতিগৃহে প্রবেশ করিলেই দেশবিদেশে অশ্রব লোককে জবনজাতি প্রাপ্ত করান। যেহেতু আপনাতা ধর্ম ভাবিয়া করেন যে পাপায় গ্রন্থ করিলেই জাতিভূত হইতে হয় তজ্জন্মই দেশাধিপতি সেই মত স্বাভা করেন যে হে পুণ্য কৃষ্ণ ভক্ত হও তোমাকে ও চাহে না। সে বাহা হউক বান্ধবদ্বয়ে বিরহভাষা নির্দোহ হইতে পারে না। আমরা অকুলে গড়িয়া আকুলা হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রতি পূর্বক ভূতিকে নিবেদন করিতেছি আমারদিশের যাকনা নিবাসনের ব্যবস্থা আমারদিশের নিগূঢ় ধর্মশাস্ত্রে বাহা আছে তাহা ইন্দ্রিতে ভদ্রিতে অল্পতম প্রকাশ করিয়া গ্রন্থ হইতে রক্ষা করেন তাহা হইলে প্রাণরক্ষা হয় এবং বিপদের কুলটাকা চক্রে জলে ভাগিতে হয় না বিবেচ্যতঃ দেশাধিপতির প্রধান ধর্ম সাহায্যন হয়।

কামাঃ শাস্ত্রপুণ্য নিবাসিনীকেবিরহিণী।" (সমচারণ, ১৪৪১০১৩০)। শ্রীপুণ্ডর উল্লেখ্যের মহাশয়ের সৌভাগ্যে সসীত।)

৬৮শাশ্রি রাব বিধবাবিধানে কল্যাণ শাস্ত্রপুণ্যের নবীনা বিধাদের আনন্দ ও প্রবীণাদের আক্ষেপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।)

“কিরে বিবাহ বিবার, বিধব শাস্ত্রি বিধবার, শাস্ত্রপুণ্য যে মিন রটিগ।  
যত বিধবা বৃত্তিতরে, মান করে সব গদ্যতীরে  
এক সুখতী কহিতে লাগিল।”

শাস্ত্রপুণ্যের তত্ত্বানুযায়ী কল্যাণের পাণ্ডে বিধবাবিধা সম্বন্ধে অনেক গান বলা করিয়াছিল। তন্মধ্যে চন্দননগর

ধনসিনীর ৬৮শ্রবণাঃ মুখোপাধ্যায় (দ্বারাঃ) কর্তৃক রচিত গীতী নিয়ে এসত হইল—

“বৈতে থাক বিজ্ঞানাগর চিরজীবী হয়ে।  
সর্বের করেরে বিশেষ্ট বিধবা রমণীর বিয়ে।  
কবে হবে যেন দিন, প্রকাশ হবে এ আইন,  
জেশাঃ জেশাঃ থানার থানার বৈকুণ্ঠে ছকুশ,  
বিধবা রমণীর বিয়ের সেগে যাবে ধুম।  
কে যাবে এদের সনে বরণ ভাঙ্গা মাথায় ল’য়ে।  
কবির হেসে কয়, মুচিলা নারীর ভয়,  
সকলের হাতের খাছু হইল অক্ষয়।  
সবে বল বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের জয়।”

এই গানের ব্যাপ্য পাণ্ডা গানও হইয়াছিল।—  
“ভয়ে থাক বিজ্ঞানাগর চিরজীবী হয়ে। (নটীয়া-কানী।)  
কি শাস্ত্রপুণ্যে এগাথ বিদ্যুৎ-সমাজের উজ্জ্বল বিধবা বিবাহের ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। বাৎ ১৩৩৬ সালে ছুতারপাড়ার শ্রীশরঙ্গ ভবাই ১৮ বৎসর বয়সে একটা বিধবাকে বিবাহ করিয়াছিল, সে বিবাহের ৪ মাস পরেই বিধবা হইয়াছিল; ইহাতে তাহাকে সামাজিক নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। আর একবার স্বয়ং প্রাতঃকালে মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কস্তার বিবাহের সহিত সঙ্গিষ্ট ব্যক্তি-বর্গকে লইয়া ‘দৌট’ চলিয়াছিল। সম্রাট কলিকাতার নিম্নলি বন্দনারী মহাসম্মেলনে শাস্ত্রপুণ্যের অল্পতম প্রতিনিধি শ্রীমত প্রতিভা রাব এ প্রসঙ্গে বাহা বলিয়াছেন তাহা উক্ত হইল—“এমন বয় বিবাহ বড় কষ্ট করে না। সকলেরই সমস্যার অবস্থা ধারাপ, বহু বিবাহ করলে ধারাপ দিবে কোথা থেকে? যদি এমন হয় স্রীলোক পছন্দ হয় না, তা’হে কখন কখন স্বামী অল্প বিবাহ করে। যে মাইল লাতে তার অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল হয় না। আইন থাকলে এটাও বহু হয়ে যার সম্ভব স্ত্রীই মরবার। তার পর বিধবা-বিবাহ প্রচলন—বড় ব্যাধা হয়েছেন, ছেলোপিলের মা তারেরেই বৈকুণ্ঠে কথা নয়। ছেলে মাছ যারা, ১০-১২ বৎসরের যাদের বিয়ে হওছে, যারা সমস্যার কিছুই বুকে না যে সব বিধবাদের বিয়ে হওছে উচিত। ঈশ্বরজি বিজ্ঞানাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নবীনা দেখাইয়াছেন। ছোট ছোট বিধবাদের বিবাহ দিলে ক্ষতি অপেক্ষা সমাজের লাভ বেশী,



সেইজন্য অমের বিবাহ বাতুলীয়। (নিখিল বন্দ নারী-মহাসম্মেলনের কার্য-বিবরণী।) ইনি সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদেরও সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন।  
ভোলানাথবার শাস্ত্রিপূর-সংকে আর একটা কথা নিখিরাছেন। "মহারাজ রুকচন্দ্র গুপ্তিপাড়া হইতে বীদর সংগ্রহ করিয়া প্রায় অর্ধলক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া তাহাদের বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী। (পাদারী লঙ্ সাংবে

বলিয়াছেন এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।) তত্পক্ষে নববীণ, গুপ্তিপাড়া, উগা ও শাস্ত্রিপূর হইতে পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বর্তমান কালে ঐ ঘটনার উপর মন্তব্য করিতে গেলে বলিতে হয় যে, মহারাজ নিশ্চয়ই ঐ দুই দলের মধ্যে জাতিক অহুভব করিয়াছিলেন, নতুবা তিনি পণ্ডিত ও বামের মিলন করাইতেন না।"

## ফরে পাওয়া

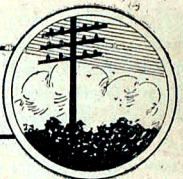
শ্রীকৃষ্ণমার সরকার

উদ্ধার সাগ্রহে গ'রে ছুটিরাছে কাহার সমুখে  
ভাবনুভব মর্ম মোর, বোবনের উৎকণ্ঠিত অঙ্গে  
আকুল এ তরু-তীর্থ; ঢকে মোর লক্ষ স্রঙ্গে হারা  
ধরার ধ্যানের রস; অবিশ্রাম চালে হৃদা ধারা  
শ্রামল কপোল তার; আমি যেন হয়েছি অদ্রুত  
অবিশ্রীত রূপের মোহে; মানসীর মাধুর্যের দূত  
কোষে নিশি বর্ণাকরে; তার প্রতি ছন্দ প্রতিবেশা  
চিকনিছে পরে পরে; ছন্দ তার দিলো আঁজি দেখা  
মেঘের মেঘের পায়ে; ত্বাচুত মোর বক্ষ-কোষে  
আকাশ পাঠার বার্তা; বাধুতে কি সারা-জাল বোনে  
রূপহীন বাতাসের স্পর্শ-রস-আমরগ বানি!  
বিচ্ছেদ-বারিষি হ'তে সমুদ্রা মিলনের রাণী  
উঠেছে অদ্রুত লয়ে; কি আশেবে কেন যে ছদর  
আপন স্পন্দন সাথে আপনি স্বপ্নের কঁধা কর!  
তৃণের মুখের পরে সজল অধর-স্পর্শ সাজি  
নিলাজ নিশির হীনে; দূরে বহু দূরে উঠে বাজি  
নদীর গতির বীণা শুনি আমি আর মনে হয়  
প্রতি তব্বী সুর সাপে আছে মোর সিঁদু পরিচর!  
দুয়ারে পড়িছে চুপ; স্রব শুধু জেগে আছে চোখে  
কল্পনের রূপ ধরি, হেরি আমি অমর-আলোক  
সে মোর এসেছে কাছে ক'য়েছে বে কথা ধীরে ধীরে,  
'বিদ্রুতির রাজ্য হ'তে এসেছি পরল-লোকে কিরে!'

তারি রূপ-সরোবরে দৃষ্টি মোর মরালের সম  
পলকের পাখা মেঘি সঞ্চারিছে; মন-বিহ্বল  
অসুট কাঙ্ক্ষী করে; মনে হয় মোর কক্ষে কক্ষে  
আরো কতবার মোর কৈশোরের স্পুটন-লগনে  
পাঠায়েছে প্রেম তার; নিজ-বারা চামেলীর রূপে  
দিনান্তের পাড় তার কত বার দিলো চুপে চুপে  
প্রেম; জোয়াত্মা ধবল মোর রাভেরে ত্বায়ে  
কত স্বপ্ন সাধ হ'য়ে প্রেম তার গিরেছে নিশারে  
আমার অধীর চোখে; মধ্যাহ্নের বন-বীণি দিয়া  
করে পড়া বকুলের বুলি-স্নান রূপখানি নিরা  
কতবার দিলো ধরা; নিলো গিরে পদপ্রান্ত মোর  
বসন্তের বিটপিতে হয়ে বাঁকা লতা-বাছ-ডোর  
কতবার ডাকিলো সে; কতবার রক্ত অঙ্গকারে  
রহজের রূপ ধরি প্রেম তার ডেকেছে আমারে!  
নৃময় কারার বদ ছিন্ন করি পাগলের মত  
তৃণে রূপান্তরিত হ'য়ে প্রেম তার যেন অবিরত  
আমারি চক্ষু-স্পর্শ বিলায়েছে পরিপূর্ণ হৃদা!  
সে দিন আঁধক পাওয়া; আজ মোর ছদরের স্মৃতা  
ভাসের নদীর মত তুষ্টির আনন্দ বানি বহি  
কীপায় হাসিগে মোর; তারি সাথে কীপে রহি রহি  
হৃদয়ের চোখে জল; প্রাণের অমরাবতী বানি  
স্বদ্বিছে কি দ্যাগ-লোক সাথে লয়ে স্বপ্নের ইচ্ছাণী!



বিশ্ব-জগৎ



পরলোকে টমাস এডিসন :—

টমাস আলভা এডিসনের নাম শুনে নাই, জগতে  
একপ লোকের সংখ্যা বিরল। এত বড় বৈজ্ঞানিক  
আবিষ্কারক এ পর্যন্ত আর কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই।



কথিত বিখ্যাত টমাস এডিসন

এডিসনের জন্ম হওয়াও। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিয়ানে  
জন্মগ্রহণ করেন। এডিসনের বয়স যখন সাত বৎসর তখন  
তাহার পিতামাতা তাকে লাইলা মিডিয়ানে বসতি স্থাপন  
করেন। জাতীয় যুদ্ধের সময় এডিসন সামান্য বয়সের  
কারণের ফেরিওয়ালারূপে ট্রেনে ঘুরতেন।

মায়ের প্রতিভা কখনও বন্ধ থাকে না। একবার

না একবার তাহা আশ্চর্য্যকর করবেই। এডিসনেরও  
তাহাই হইল। তিনি মাত্র টেলিগ্রাফের কাজ শিখিয়া  
সামান্য চাকুরী হইতে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া ছ'একটা  
টেলিগ্রাফ সংস্থার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া সাধারণে তাহার  
পরিচর দিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ উন্নতি হইতে উন্নতির  
শিখরে উঠিয়া তিনি কালে সহস্রোক্ত প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার  
করিয়া ফেলিলেন। পৈতৃত্যিক আলো, চলচ্চিত্র, স্যাব-



মহাত্মার অল্প ছাগল্লজ্ঞ দোহন কথা হইতেছে

চিত্র, ফোনোগ্রাফ, রেডিও, টাইপ-রাইট-যন্ত্র প্রভৃতি  
তাহারই আবিষ্কার।

বিগত ১৭ই অক্টোবর, ৮৪ বৎসর বয়সে এই আলোক-  
সামান্য ব্যক্তি পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি একজন  
আদর্শ কর্মযোগী ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে বিজ্ঞান-জগতে  
বে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পুঙ্খ হইবার নহে।



মহাশ্মার জন্তু ছাগ-দুগ্ধোদ্যমঃ :-

সকলোই বোধ হয় অবগত আছেন, মহাশ্মা গন্ধী বিলাতে থাকিবার সময় তিনি যে ছাগলের চতুঃপাশেই বসে সোটা বিলাতে ছাগ-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাতে যখন হয়, মহাশ্মার ছাগবৃদ্ধের জন্ত কোন ক্ষতি হয় নাই। লণ্ডনে চুইজন দুগ্ধশেহন করিয়া সর্ববরাহে এক কারবার করিয়াছে—গন্ধীশীর জন্ত তাহার ও ছাগ দুই বরবরাহ করিত। এই ছবিটিতে ব্যবসায়ী চুইজন মহাশ্মার জন্ত ছাগ-দুগ্ধোদ্যম করিতেছে।

আমেরিকায় মহাশ্মার বাণী-প্রেরণা :-

নিম্নে যে ছবিটি দেওয়া হইয়াছে, উহা আমেরিকা-প্রবাসী এক ভারতীয় পরিবারের। উত্তরা আমেরিকার ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেসের সভ্য। মহাশ্মা গন্ধী রাউণ্ড-টোপ কনফারেন্সে বোম্বে দিল্লী গিয়া বিলাতে পদার্পণ কার্য্যই যে বাণী আমেরিকায় বেতারের সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন,



আমেরিকাবাসী ভারতীয় পরিবার বেতারের সাহায্যে মহাশ্মার বাণী শ্রবণ করিতেছেন

ইহার তাহাই শুনিতেছেন। গন্ধীজী এই বাণী কেশবস্বামীর আমেরিকার উৎসাহেই প্রেরিত হইয়াছিল।

বেতারের চিত্র :-

বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে নানান দৃষ্টান্তে মানুষের শক্তি যে কতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে তাহা ধারণা করাও দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। ক্রমে ক্রমে দেখা যাইতেছে যেন মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ নয়। নিত্য নূতন আবিষ্কার ও মানুষের নূতন উদ্ভাবনী-শক্তি জগৎ কে যেন আশ্চর্য্যহারা করিয়া তুলিয়াছে।

বেতারের চিত্র-প্রেরণ বিংশ-শতাব্দীর বিজ্ঞানের একটি নূতন অবদান। বেতারের সঙ্গীত কিংবা নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গায়ক বা নর্তক কিংবা নর্তকীর চিত্রও শ্রোতার সম্মুখে প্রতিকলিত করা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। এইরূপ একটা যন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। ইংলণ্ড মিঃ বের্ডার্ড বি. বি. শি, ইন্ডিও হইতে ৮টা মানবের পূর্ণ চেহারার সমান দৃষ্টাবলী বিকশিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মিস্ মুরিয়েল হোরটাই-পিরানো বাজাইরা গান করিবার সময় ও মিস্ ট্যানলী নাচিবার সময় উভাদের প্রতিকৃতি শ্রোতার সম্মুখে পরদার উপর প্রতিকলিত করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে যন্ত্রে চেহারার পূর্ণের বিশুদ্ধ আকারে প্রতিকলিত করা যায়।

মিঃ বের্ডার্ড আশা করেন যে, এই নূতন বেতারের স্ববিধার অন্বেষেই বেতারের পঞ্চপাণী হইবে। যন্ত্রের ভবিষ্যতে—তিনি যে কেবলমাত্র একটা ছবি বিকশিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তৎ তাই নহা—অন্তর্ভুক্তির সমস্ত বাস্তবকরণকেও দূরবর্তী রেডিওর যবনিকার প্রতিকলিত করিতে পারিবেন, ইহাই তিনি মনে করেন।

আমেরিকাত্তর বেতারের চিত্র-প্রেরণের উন্নতিক্রমে খুব চেষ্টা চলিতেছে। কলম্বিয়াতে দৈনিক চুইবার বেতার-যন্ত্র প্রেরণ করা হয়। দি ছাশনাল গ্রুজকাটিং কোম্পানী মিস্ চুইবার 'কেলিঙ্গ দি কাট' নামক নীরব চিত্র প্রেরণ করিতেছে—অদূর ভবিষ্যতে আরও কোহু-হলোদীপক চিত্র বাহাতে প্রেরণ করা যায় তাহার চেষ্টাও চলিতেছে।

আমেরিকার রেডিও কর্পোরেশনের সভাপতি মিঃ সারনক বলেন যে, এই নূতন আবিষ্কারে কোহু-হলোদীপক

১০৩০]

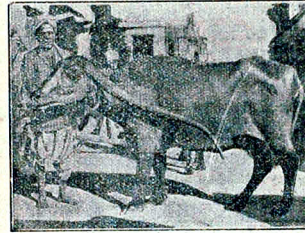
বিংশশতাব্দী

১০২৭

বা ছবিচিত্র ক্ষতিক্রম হইবে না। ইহাতে মানুষ তাহার দৃষ্ট ও শ্রবণশক্তি পৃথিবীময় বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে।

গাভীর শিএর বহর :-

যে গাভীর ছবিতা আমরা এখানে দিয়াছি, উহা হাম্পিডেয়ার। পাঠক পাঠকগণ বেগ দেখিতেছেন, উহার



অদূত শিএবিশিষ্ট গাভী

শিঃ কেন্দন বরাবর গায়ের পাশ দিয়া কতখানি আসিয়া পড়িয়াছে—একদম দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না। গাভীর অস্থবিধার অস্ত্র নাই—না পারে ঘাড় দিয়াহেতে, না পারে আচ্ছন্ন করিতে। ভগবানের সৃষ্টি ইহা এক অদূত দৃষ্টান্ত। চড়াই ও মাছের বন্ধন :-

পাণী ও মাছের বন্ধন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে, কিন্তু



মণিরে এম, পোল চুইদেয়ার বাওহাইতেছেন

নূতন কিছু ব্যাপার নহে। একদম ব্যাপার আমরা অনেকবার শুনিতে পাই।



মণিরে এম, পোল চুইদেয়ার বাওহাইতেছেন

পাণী শহরের মণিরে এম, পোল পাণীর সহিত বন্ধন করিয়া বেগ স্ক্রুতির অঙ্কন করিয়াছেন। তাহার বন্ধ একদম চড়াই পাণী। ইনি ইহার ইচ্ছাক্রমে তাদের ডাকিয়া,



মণিরে এম, পোল চুইদেয়ার বাওহাইতেছেন

হাতে বসাইয়া, আদর করিয়া পাওরানি ইনি এ চড়াই গুলির ভাবা, হাবতাব সমস্ত বুঝিতে পারেন—আশ্চর্য্য কথটা এটো!

জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পক্ষ ও বৃহৎ সম্মান :-

আমরা অনেক সময় অনেক বৃহৎ শোকের পরিচর পাঠ, কিন্তু একে যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহার বড় একটা সংবাদ পাই না। এছাড়া জীবিতদের মধ্যে কাহার বয়স যে সর্বাপেক্ষা বেশী তাহা জানিতে খুবই কৌতূহল হয়। 'ইহার অক্ষণ' একজন তুলাবাসী বৃদ্ধ। ইহার বয়স ১৫৭ বৎসর। সম্ভ্রান্তি শোনা গিয়াছে যে, ইনিই জগতের ভিত্তর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শোক। আগা ছয়টি লক্ষ



কামের মাথু সাড়ে চার ইঞ্চি এবং নাক চোখ দেখিলে  
সেকেন্দে বড় লোকদের মতন দেখায়।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে 'ইস্‌হার আফা' নাকি আফ্‌হার যুদ্ধে  
নেপালিয়নের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এছাড়া পিট,  
নেলসন ও ট্রাকলগারের কথাও তিনি জেনিয়াছেন, কিন্তু  
তাঁহাদের সঙ্গে কোনও যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন নাই। তিনি  
এগারবার বিবাহ করিয়াছেন, এবং তাহার মোট সন্তানের  
সাখ্য ৩৬টা। তাঁহার বর্তমান স্ত্রীর বয়স ৬০ বৎসর  
এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ৬৬ বৎসর।

এই তো 'খেল যুদ্ধ পুরুষ'। এছাড়া ইস্‌হার আফার  
সমসাময়িক একজন সুসাহসী বীর পাওরা বিরাড, তিনি  
নাকি জগতের সর্বাধিক পুরুষ রমণী। 'ইস্‌হার নাম রোডকা  
মিডকা'—বয়স ১৫২ বৎসর। রোডকার বাড়ী বৃগগেরিয়ার



সীমন্তী রোডকা মিডকা

বর্ষা প্রদেশের নার্নালি গ্রামে। ইনি একজন কৃষকের  
বিধবা। এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও রোডকা বেশ শক্তিশালী।  
চলিবার সময় তাঁহার গায়ের দলকা বহন না এবং ইনি বৃদ্ধ  
দোহন করেন, ইহা, মুগণী প্রভৃতি পালন করেন ও অবসর  
সময়ে পুষ্ক-পৌরাণিক পুস্তকাদিগকে শিপালান করেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম ডক :—

বর্তমানে আমেরিকার বোষ্টনের ডক পৃথিবীর মধ্যে  
সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ডক। কিন্তু সম্প্রতি লণ্ডনে এমন একটা  
ডক নির্মাণ করিবার বাবদ্য হইতেছে যাহা বোষ্টনের  
ডককেও অতিক্রম করিয়া যাইবে। 'ম্যানচেষ্টারের মেসার্স'  
এডমণ্ড নাটাল এণ্ড কোং ও লণ্ডনের 'মেসার্স' জন্  
মোমেন এণ্ড কোং সম্মিলিতভাবে এই ডক নির্মাণে  
প্রস্তুত হইরাছেন। সাউথ চ্যান্সলরনের মিলরকে এই  
বিরাট ডক প্রতিষ্ঠিত হইবে। ৭৩ হাজার টনের কুনার্ড  
সাইনের জাহাজের জাহাজ এই ডক প্রবানতঃ নিষ্কৃত  
হইতেছে। এই ডকের দৈর্ঘ্য ১০০০ ফিট, প্রস্থ ১৭৫  
ফিট ও গভীরতা ৪০ ফিট এবং ইহা চৈতরী করিতে  
প্রায় ১৮৫ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইবে।

মাসীর তলার বাসগৃহ :—

প্রাচীনকালে মানুষ যে মাসীর তলার ঘর-বাসা বাসিয়া  
বাস করিত তাহার অনেক প্রমাণ আমরা পাইরাছি।  
এখনও কোন কোন স্থানে যে এরূপ নাই তাহা নহে।



মাসীর তলার বাসগৃহ

উত্তর আফ্রিকার এটমাস নামক পর্বতের গায়ে গভীর গর্ত  
খনন করিয়া একপ্রকার প্রায় ১২ হাজার মানুষ বাস করে।  
উহারিগকে 'ব্রাইথিং টিপলোটাইটন' বলা হয়।

## আলাপ আলোচনা

নিবেদন

দেশে এই মহাভক্তিরে আমরা মহাভারত পূজা করিয়া পূজ  
হইরাছি—যার কারে আমাদের প্রাণের কামনা জানাইয়া  
শক্তি চাহিয়াছি, তারপর মার নিরঙ্কন করিয়া বিজয়া  
করিয়াছি; তারপর মার আশীর্বাদ লাভ করিয়া আমাদের কর্মক্ষে  
ত্রের হইরাছিলাম। অনিবার্য কারণে আমাদের পাঠক-  
পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকাগণের নিক



করি, যেন তাঁহার আশীর্বাদে দেশাঙ্গী ও স্বাধীনতার স্তম্ভ  
ইচ্ছার আশ্রয় কর্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি।



২। বিলাতে মহাভারতের চিত্রকর্মের অংকন

ভারত-সমগ্রায় জেনারেল 'হাটস'

রাজপুতানা জাংখালে মহাভারত ও মারাবাই

আমাদের যে যথেষ্ট জট হইরাছে, তাহা আমরা পূর্বেই  
জানাইরাছি। মাসিক-পত্র পত্রিলালনে বর্তমানের  
অভ্যুত্থানে যাহা কিছু করিয়াছি বা করিয়াছি বিবেচনায় বসে  
এর নাই বা বলি নাই; তবু যদি কাহারও সহিত  
আমাদের মতভেদ ঘটয়া থাকে বা সমালোচন-ব্যাপারে  
যদি কাহারও মনে অপ্রিয় সভ্য বলিয়া রুচি পাই থাকি তবে  
তাঁহাদের নিকট সনির্বন্ধ অস্বেরোধ, যেন তাঁহারা উহা  
মনের মধ্যে গোপন করিয়া না রাখেন। তাঁহারিগণেরও আজ  
আমরা সাদর সম্বাদন জানাইতেছি। মানুষ মারেরই কট  
বিচারিত আছে; মানবেরই ভুল ভ্রান্তি হয়, এ সকলের জন্য  
আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শ্রীজগদানন্দ নিকট, প্রার্থনা

বিলাতে অবস্থানকালে দক্ষিণ-আফ্রিকার জাতীয়-নেতা  
জেনারেল 'হাটস' ভারত-সমগ্রায়-গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ  
তারিখে নিম্নলিখিত ভীমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"বিলাতের পক্ষে বর্তমানে ভারত-সমগ্রায় সর্বাপেক্ষা  
গুরুতর এবং বিপজ্জনক সমস্যা; ভারতকে সমগ্র করিবার  
জন্ত গ্রেট-ব্রিটমকে অনেক দুঃ অগ্রসর হইতে হইবে এবং  
তাঁহা বড় শীঘ্র সম্ভবপর, ততই ব্রিটনের পক্ষে মঙ্গল; যেহেতু  
বর্তমান যুগের দীর্ঘস্থায়ী না হইতে পারে। তাঁহার দৃঢ়  
বিশ্বাস যে, যি: গভী: ভারতসত্ত্ব অপোষ মীমাংসার জন্য  
সর্বাঙ্গতরপে বরপরিচর আছে। তাঁহার যে প্রবল শক্তি,  
তাঁহা আপোষ মীমাংসার নিয়োজিত করার পক্ষে বর্তমান  
যুগের ইংলণ্ডের কখনই পরিচাপ করা উচিত নহে।



তাহার মত ক্ষমতাপন্ন নেতা ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। ভারত ও বিহারের মধ্যে মনোমানচিত্র বৃদ্ধি হইয়া ভারতে পুনরায় যাহাতে প্রবলতর অশান্তির আবির্ভাব না হয়, তাৎপ্রতি ইংলণ্ডের সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।



ফেডারেল কমিটির অফিসে মালবারী

শারীরিক শক্তি এবং স্বর্ণমণ্ডিত দ্বারা কখনও বর্তমান সমস্যার সমাধান হইতে পারে না; সম্ভার এবং মিত্রতা দ্বারা ইহার স্থায়ী মীমাংসা সম্ভবপর। সাম্প্রদায়িক প্রণয় এবং সার্বজনীন বিবরণগুলি সামরিকের ব্যবস্থা কখনও এই সমস্যা সমাধানের বিকল্পে অন্যতরম্য অন্তরায় হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে আন্তরিকতা থাকিলে, আপোষ মীমাংসা করাপি সম্ভব হইতে পারে না।

বিশ্বাস্তে একটি বালাক ও একটি বালাকা গন্ধীজকে কমখ্যাত্মক দিক্তে



ফেডারেল প্রাক্তরশাসকমিটিতে সভাপতির পাশে গন্ধী ও তাহার পায় মালবারী

চিরশীল ব্যক্তিমায়েই এই মনীষীর সহিত একমত "ভারত কিরিত্তি; একত্র আমি আনন্দিত,কি

হইবেন। এতবড় বোকাও শাস্ত্রিক-প্রয়াসী হইয়া আপোষ-মীমাংসারই পক্ষপাতী। বাস্তবিক এ সুযোগের সম্যবহার না করিতে গুলিলে বৃদ্ধি ইংলণ্ডে প্রকৃত রাজনৈতিকের একান্ত অভাব হইয়াছে।

মহাশ্রম বিদায়-বাণী

মহাশ্রম গন্ধীজী ইংলণ্ড ভ্রমণ করিবার সময় রমটায়ের বিশেষ প্রতিনিধির নিকট নিম্নলিখিত শব্দ বিদায়-বাণী প্রকাশ করেন :—



ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া আমার জুপে হইতেছে। এখানে আমি প্রণে ছিলান।" তৎপরে তিনি বলেন,—"ভাষা না কখন বেন ইংরেজের সহিত আমাকে অবযোগ যুক্ত না চালাইতে হয়—আর যদি কোনদিন চালাইতেই হয়, তা হইলে ইংরেজকে বলি আমি বিবেচ-বশে যুক্ত কখনই করিব না। আমার নিত্য প্রিয়জনদের সহিতও কখন কখন আমাকে যুক্ত করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেক্ষেত্রে আমি যেমন প্রেমপ্রবৃত্ত হইয়া যুক্ত করিরাছি, এক্ষেত্রে তাহাই করিব। সুতরাং ভারতের আত্মমন্ত্রি। অকুর রাধিরা সহযোগিতা করিবার জন্ত আমি সর্বদাই সচেষ্ট থাকিব।

মহাশ্রমজী ও বোম্বে রণা

ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া গন্ধীজী স্ববি রোম্বে রণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হুজাররও যাত্রা করেন। নিসর্গ



মহাশ্রম রোম্বে

সুখমা-মণ্ডিত স্বমির আশ্রমে সরসরীর স্ববি উপস্থিত হইয়া যে কথাবাড়ী কথেন তাহা সাধারণে প্রচারিত হয় নাই। উভয়েই গুণ-ভাই, একই স্বমির শিবা—সমিয়ার মঙ্গলই স্ববি উল্লসি উভয়েরই গুণ। উল্লসি যে অদহযোগ-নীতির কথা জগতে প্রথম প্রচলন করেন, তাহাকে কার্যক্ষেত্রে ব্যাবহারিক মতে প্রতিষ্ঠাত করিতে পারেন নাই—শিবা এ পক্ষে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন কি আমাদের আশা হয় শিবা জগৎ এই নূতন সত্যের সম্যক উপলব্ধি করিবে যে, নিকশতর অদহযোগ নীতির কি অতুত-শক্তি আছে। জগতে শাস্তি-স্থাপনের এমন অযোগ্য প্রতিকার আর নাই—মানবকে হত্যা করিয়া মানবের যে উপশাচিক আনন্দ হয়, তাহা জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে। মহাশ্রমের পর হইতেই এই মুখ্য ব্যাপারের ধর্মিক-পাতের জন্ত, 'অন্ কোয়ারেট অন্ দি ওয়েস্টার্ন হ্রাউ' প্রত্টি পুস্তকের লেখকরা একব্যাক্ত এই মত সর্ম্মন করিতেছেন।



এদীজী ও ডাঃ হিউগেট জনসন।



শ্রমণে নামিলা মহাশ্রমজী ও শ্রীযুক্ত নাইট।



বাড়ী ভাড়া হ্রাসের চেষ্টা

কলিকাতার ব্যবসায়ীদের আড়তগুলির বাড়ী ভাড়া অনেক কমিয়া গিয়াছে। মাধেব-মজুমদারের বাড়ীভাড়া প্রায় অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু উত্তর কলিকাতার বাড়ী ভাড়া এখনও কিছুমাত্র কমে নাই। দেশের এই চরমদিনে কলিকাতার বাড়ী ভাড়া কমাইবার সম্বন্ধে যে আন্দোলন তাহা অতিশয় সম্ভব। বাড়ীর মালিকেরা এখনও ভাড়া কমাইবার কোন লক্ষ্য দেখাইতেছেন না; কিন্তু আমরা যদি এই আন্দোলনকে প্রবল ও আস্থাসিক করিতে পারি, তাহা হইলে জমিদারগণকে টলিতেই হইবে। সমগ্র দেশের আবহাওয়ার বিরুদ্ধে কতদিন তাহারা দ্রুত করিবেন।



জমিদার-উৎসব উপলক্ষে বিবাহের  
ডোকে গরীবীজী

জমিদারদের শোচনীয় অবস্থার কারণ

আমাদের জমিদারগণ সেদিন বড়লুটের নিকট কাছিম গিয়াছেন যে, বর্তমানে তাহাদের অবস্থা কান্না এবং দেশের ১০ দিন বসিয়াই তাহাদের এমন হইয়াছে। কিন্তু আমরা যদি একথা চিন্তা করি। সরকারী দলিল হইতে জানা যায় যে, বহু জমিদারদের সম্পত্তি সরকারের দ্বারা পুতিচালিত হইতেছে।

দেবার দ্বারা জমিদারীর চরুগতি হওয়াতে তাহারা আর নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে পারেন নাই, সরকার

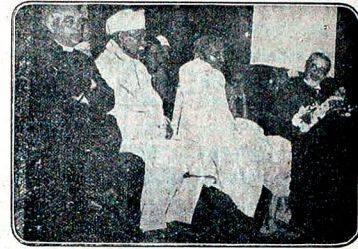
বাহ্যেরকে তাহার ভার লইতে হইয়াছে। এই ধ্বংসের কারণ বাহিরের কোন কিছু, অভাব নয়। আমাদের অবিকাশ জমিদার নিগারিতা ও স্বীয় সম্পত্তি পরিচর্যা করিবার অক্ষমতাহেতু ক্ষণস্থায়ী জড়িত হইয়া পড়েন। অথবা ব্যয় করিয়া 'কাবু' হইয়া পড়েন। তাহাদের যদি আজ শোচনীয় অবস্থা হইয়া থাকে তবে তার জন্ত দাবী তাহারা নাই।



মহাযাজী ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু একজন  
ভারতীয় মহিলার সহিত কথা কহিতেছেন



বিবাহে পৌছিবার পরে মহাযাজী



বিবাহের ফ্রেণ্ডস্ হাউসে মহাযাজী বসিয়া বক্তৃতা দিতেছেন।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কি পাইলাম

এত দিনের পর গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা শেষ হইল। এ বৈঠকে নূতন কিছু পাওয়া যায় না—প্রথম বৈঠকে যে সকল সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছিল, সেইগুলির এবার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে মাত্র। প্রধান মন্ত্রী যোগদান হইতে জানিতে পারা যায় —

(১) বর্তমান ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট বিগত ১৯ জুলায়ারী তারিখের যোগদান পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষ লইয়া সংস্কৃত-রাষ্ট্র-গঠন-সম্পর্কে ব্রিটিশ-গভর্নমেন্টের বিবাস আছে এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সেই পক্ষই অগ্রসরণ করিবেন।

(২) প্রধান মন্ত্রীর যোগদান মধ্যে যে নীতির কথা আছে, তাহা অগ্রসরণ করিবার জন্ত শীঘ্রই পার্লামেন্টের কমন্স সভাকে অগ্রসরণ করা হইবে।

(৩) অগ্নিদিনের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন সম্ভাব্য যদি নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা 'সীমা'য় পরিণত না পারেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট স্বয়ং একটা সীমাংসা করিয়া দিবেন।

(৪) সরকার সম্মতকে ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত সংখ্যা গণিত সাম্প্রদায়িকতার স্বাভাবিক দাবী ও অবিকার

রক্ষা করা হইবে—এই মর্মে শাসন-তন্ত্রের মধ্যে একটা বিধান সংযুক্ত করা হইবে।

(৫) গোলটেবিল বৈঠকের একটা ওয়ার্ক-কমিটি করা হইবে। ভারতের বড়লুটের মারফতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সময় সময় এই কমিটির সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৬) শাসনতন্ত্রের সমতা প্রসূতের জন্ত যে কমিটি গঠিত হইবে, সেই কমিটির সিদ্ধান্ত-সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করিবার জন্ত তৃতীয়বার গোলটেবিল-বৈঠক আহ্বান করা হইবে।

(৭) সীমান্তের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং বর্তমান ভারত-শাসন আইনের গভী অতিক্রম না করিয়া অগোঁবে সীমান্ত-প্রদেশকে গবর্নর-শাসিত প্রদেশের সমান করা হইবে।

(৮) অর্থ-সমস্যার সম্ভাব্যজনক সমাধান হইলে সিদ্ধমতকে পুঙ্খ প্রদেখ করা হইবে এবং অর্থ-সমস্যা-সমাধানের জন্ত চেষ্টা হইবে।

(৯) তিনটা নূতন কমিটি গঠন করা হইবে—(ক) বাজেটের ভিত্তিতে সাময়িক রাষ্ট্রের রাজস্ব সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্ত একটা কমিটি হইবে (খ) ভৌতাত্তিকিকার ও নির্মাণ-সংক্রান্ত সম্পর্কে স্থাপন করিবার জন্ত একটা কমিটি করা হইবে (গ) দেশীয় রাজস্বের সঠিক বর্তমান যে-সমস্ত



সন্ধি আছে; তাহার বিপর্যয় বিবেচনা করিবার জ্ঞান আর একটা কমিতি হইবে।

(১০) কলৌর আইন-সভায় কৌন দেশীয় রাজ্য হইতে কতজন প্রতিনিধি নিৰ্বাচিত হইবেন, ইহা নিৰ্দ্ধারণ করিবার জ্ঞান পর্য্যবেক্ষিত ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে সাহায্য করিবেন।

গন্ধীজী শ্রেয় কথা

প্রধান মন্ত্রী গন্ধীজীর সংযোগিতার জ্ঞান সন্নিবেশিত অধরোধ করেন। উত্তরে তিনি তাঁহার স্বভাবানুগত সত্যবাদিতা ও নির্ভীকতার মহিমা বলেন, “সম্মানজনক সন্তে আমরা সত্যতার জ্ঞান প্রদত্ত; কংগ্রেস শুধু কথার ভিত্তিতে না—কংগ্রেস ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার প্রাণ। দেখিতে চায়। কিন্তু বতরিন পর্য্যন্ত আপনারা ভারতের যে ছায়ামুখতার দাবী উপেক্ষা করিবেন ততদিন পর্য্যন্ত আপোষ-নিষ্পত্তি হইতে পারে না।

আমি আইন-আদালত-আন্দোলন পুনরায় প্রবর্তন করিতে চাই না—আমি শান্তির প্রার্থী। এই যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে মহামতি লর্ড আরউইন ব্যতিব্যস্ত হইয়া কঠোর আইন প্রণয়ন করিয়া কৃতকাৰ্য্য না হইয়া অবশেষে নৃ-বিরতি করিয়াছেন, এই বিরতিকের দ্বারা শান্তিতে পারণত করিতে চাই। লর্ড আরউইন সূর্যকণ্ঠে বাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

আমাদের হাত্ত আইন আছে। আইনের কোডাক্সে ফেলিয়া বিলম্ববাদের সহিত আপনারা সংগ্রাম করিতে পারেন; কিন্তু ভারতকে বতরিন পর্য্যন্ত আপনারা স্বাধীনতা না দিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত এমন সমস্ত সহজ নিষ্পত্তির অসহযোগ ভারতবাসী আছেন, বাহারা ততদিন পর্য্যন্ত নিজেরাও শান্তি কাঙ্ক্ষা করে জানিবে না, আপনাদিগকেও জানিতে দিবে না।

প্রকৃত স্বাধীন-শাসন লাভ করিতে হইলে সাময়িক ও পর রাষ্ট্র-বিভাগে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা চাই। এ সম্বন্ধে বিগত ১৫ই মার্চের হুগলি-সংগঠন-কমিটিতে যে মতাদর্শ জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার একস্থলে বলিরাছেন—“পূর্ণ-স্বাধীন-শাসন লাভে কেবল যে ভারতের

সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ হইবে তাহা নহে, উহাতে ইংরেজেরও লাভ হইবে। পুলিশ বা তথাকথিত আইন ও মুখলা, সাময়িক ও পররাষ্ট্র-বিভাগ, এই সকলে পূর্ণ ক্ষমতা যে স্বাধীন-শাসন-প্রণালীতে না থাকিবে, তাহা স্বাধীন শাসন নহে।”

গন্ধীজী ও আইনটাইন

বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অধ্যাপক আইনটাইনের নিকট হইতে গন্ধীজী নিম্নলিখিত বাণী পাইয়াছেন—“আপনি আপনাদের সমস্ত কর্মের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, বিনা রক্তপাতেও আমরা আমাদের আদর্শলাভ করিতে পারি; অহিংসানীতির দ্বারা হিসার পুষ্কারিগণকে আমাদের আহুকুল্যে আনিতে পারি। আপনাদের আদর্শের প্রেরণা হিসা হইতে জাত মানবের স্বার্থ-সংঘর্ষ দূর করিবে এবং এ আদর্শ আহরণ করিলে সমগ্র জাতির কল্যাণ ও শান্তি আসিবে। আপনাদের প্রতি আমার অন্তরের ক্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমি আপনাদের সহিত চাঞ্চল্য আপোষের আশা করিতেছি।” গন্ধীজী উহার যথাযথিত জবাব পাঠাইয়াছেন। তিনি অধ্যাপক আইনটাইনকে সন্মমতা আশ্রমে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

ম্যালেরিয়ার নূতন প্রতিষেধক ঔষধ

ম্যালেরিয়ার বাঙ্গলাদেশে চিরজীর্ণ। মধ্যস্থলের দিকে চাইলেই জানা যায় কত সোণার ক্ষেত্র এই রোগের প্রভাবে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে; স্বতরাং এই রোগের আরোগ্যকরোঁ বাহারা জীবনব্যাপী অধ্যয়ন ও উত্তম করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে আমরা একান্ত ঋণী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা ম্যালেরিয়ার জঙ্কর, ম্যালেরিয়া-প্রাপ্তিভিত্ত দেশে আমরা বাস করি, কিন্তু এ বিষয়ে বাহারা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের দ্বারা কৃতী হইয়াছেন, তাঁহারা বিদেশী।

সম্প্রতি প্যাসোম কুইন নামক ঔষধের পক্ষে এমন দাবী করা হইতেছে যে ইহাতে ম্যালেরিয়া সুরিয়া হইবে। বোলটা ক্ষেত্রে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে এবং পরীক্ষার ফল

সন্তোষজনক হইয়াছে। যদি সত্যই ম্যালেরিয়া-নাশক এমন ঔষধ কার্যকর হয় তবে বাঙ্গলা দেশের চেয়ে উপকার আর কোন স্থানের হইবে না। বাহারা এমন ঔষধের আবিষ্কার, দেশ তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

ম্যালেরিয়া দূর হওয়ার উপকারিতা-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এই ঔষধের পরীক্ষাকারী বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন যে আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও পূর্বে আশিয়ার যে সব জাহাজ বাণিজ্যের জন্য যাত্রাভ্যন্ত করে, সে সকলের কর্তৃপক্ষেরা ও নাবিকরা প্রায় ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হয়। তাহারা এই ঔষধের গুণে রক্ষা পাইবে। এত বড় একটা দেশ যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ত হইয়া আছে, তাহার কথা উল্লিখিতও হইল না। বাহা হটক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কৃত এই নব-ঔষধের গুণ বাঙ্গলা-দেশের ছায় পরীক্ষার স্থানের ছায় আর কোথাও পাইবে না—আর যদি এইখানে পরীক্ষিত হইয়া সফলতা লাভ করে তবেই বৃষ্টি ঔষধের অমোঘ শক্তি।

শর্করা-সংরক্ষণ

কুনি-অম্বলীন-বিভাগ-সম্রাট ইন্সটিটিয়াল কাউন্সিলের ‘শর্করা-সমিতির’ বিবরণী হইতে জানা গেল যে, ভারতীয় শর্করা-শিল্পকে আঁপাততঃ ১০ বৎসর রক্ষা করিবার জ্ঞান সরকার বাহাদুর সমিতির হাতে বার্ষিক ৮৮ লক্ষ টাকা দিবে। ভারতের শর্করা-শিল্পকে রক্ষা করা যে দরকার এতদিন পরে কর্তৃপক্ষের ইহা মনে পড়িয়াছে তর ভাল। জ্ঞাত ও জার্মানী হইতে আনীত শর্করার সহিত প্রতিযোগিতার ভারতের শর্করা-শিল্প পক্ষপাতিত বসিয়াছে। সেই শিল্প-সংরক্ষণের ব্যবস্থার গভর্নমেন্ট উদ্বৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা দেশবাসীর আনন্দের কারণ হইবেন।

প্রবালী বঙ্গ-সাহিত্য-সংকলন

আগামী বছরনের চুটতে এলাহাবাদে প্রবালী বঙ্গসাহিত্য-সংকলনের দশম অধিবেশন হইবার কথা ছিল, কিন্তু এ সময় কলিকাতার রবীন্দ্র-জগতী-উৎসব উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের অনেক সাহিত্যিক উৎসবে যোগদান করিবেন বলিয়া সম্মেলনের কর্তৃপক্ষেরা। এ সময় সম্মেলন হইবে না

বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাজটা যে তাঁহারা ভালই করিয়াছেন তা আর বলিতে হইবে না। তাঁহাদের বিচার বুদ্ধির আশ্রয় প্রশংসা করি। দেশের এই ছদ্মনিমিত্ত সভা-সমিতি যত কম হয় ততই ভাল। নূতন আইনের বেড়া দ্রোণে বাঙ্গলায় যে কত শত বৃক্ষের পড়িতেছে তাহাদের আশীর্বাদ স্বজনদের মনের অবস্থা ভাবিয়া ও দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা কথো চিন্তা করিয়া একেবারেই বন্ধ করাই ভাল। রবীন্দ্র-জগতী সম্মেলনও আমাদের ব্যক্তিগত অভিমান এইরকমই; কিন্তু একেই একটা কথা হইতেছে যে জগতীর কথা বহুদিন পূর্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙ্গলা বা বাঙ্গালীর নয়—সমগ্র জগতের। জগতের বহু মনীষী ইতিপূর্বে এই উৎসবে যোগদান করিবার জ্ঞান যাক্তা করিয়াছেন। যদি বঙ্গ-সংগ্রাম তাহা হইলে তাঁহাদের মনোবোধ ও অর্থনৈতিক উন্নতি হইবে; নতুবা রবীন্দ্রনাথকেই আমরা অধরোধ করিতাম রবীন্দ্র-জগতী বন্ধ করিয়া দিবার জ্ঞান।

বাঙ্গালী-মুসলমান ছাত্রের কৃতিত্ব

ডাঃ কুসুমিত খুদা নামে একজন বাঙ্গালী মুসলমান লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এসসি উপাধি পাইয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে ইনি সর্বাগ্রণম এই সম্মানীয় উপাধি পাইলেন। আমরা শুনিয়া স্তম্ভী হইলাম যে, ইনি সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গলা দেশ তাঁহার ছাত্র জগতী একজন বাঙ্গালীর নিকট রাসায়নিক গবেষণামূলক আবিষ্কার দেখিতে চায়। রসায়নের ব্যবহারের দিকের আলোচনা করিয়া তিনি বাঙ্গালীর উপকার করুন।

বাঙ্গালী হিন্দু ছাত্রের কৃতিত্ব

নিখিল-ভারত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার জগদ্রাথ কলেজের মেধাবী ছাত্র ত্রীমান অরবীন্দ্রমোহন কুমারী লর্ড আরউইন স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল “বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ ও বেকার-সমস্যা” ভারতের সমুদায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রেরা এই প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। স-সকল দেশের ছাত্রদের ভিতর ত্রীমান অরবীন্দ্রমোহন প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বাঙ্গালার ছাত্রেরা যে চিন্তাশীলতা তাঁহার



প্রমাণ দিচ্ছে। এত বড় সমস্তা-সমানারের চেষ্টা যে যুবক করিতে অগ্রসর হইতে পারে তাহার ভবিষ্যৎ সমুদ্র।

বাঙ্গলা-দেশ হইতে একাধিক-সমস্যা কি ভাবে দূর-করিতে পারা যায় কিংবা বাঙ্গালীর অবস্থা উন্নতি করিতে পারা যায় সে বিষয় নহীয়া অনেক চিন্তাশাল যুক্তি চেষ্টা করিতেছেন—জানিনা কবে কোন মনীষীর উদ্ভাবনী-শক্তি হইতে হইবে—তার প্রকল্পের উপায় বাহির হইবে? তবে কিছুদিন তপস্বী কল্যাণের পাঁচ বৎসরের কৌশলবিগাতে প্রচার করিবার সময় জনৈক রূপ-দেশের সাংসারিক গর্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র জগতে যদি কোন দেশে একবার না থাকে তাহা একমাত্র বাসিন্দার ক্ষমতা দশে—একশ নাহি।

জগতের দেশে-কেনিয়া ছাড়া কোন দেশ এমন নাই যেখানে বেকার-সমস্যা নাহি। আমাদের দেশে বেকার কেহ নাই। কবীন্দ্র ব্রহ্মবংশী, ছাত্র সি.ভি.রমন প্রভৃতি এদেশের অনেক স্বামী সেভিয়েটে-গণবন্দোপকরণে মুক্তকণ্ঠে স্বাধাতি করিয়া একবার সাফ দিয়াছেন। রূশিয়া ও বাঙ্গালদেশের অবস্থা প্রায় একরূপ। বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যয়দান করিয়া দেখা উচিত করিয়া রূশিয়া বেকার-সমস্যা কে আরও করিয়াছে। কেনিয়া যেভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছে ও কৃতকার্য হইয়াছে বাঙ্গালীদেরও সেইভাবে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত।

মীরাত মামলার বিরাট ব্যয়

সন ১৯৩১ সালের ৩-শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মীরাত বড়ময়-মামলার সরকারি ব্যয় ৭২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এই ব্যয় ভারত-সরকার এবং মুক্ত-প্রদেশ সরকারের তহবিল হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার ভিতর সাক্ষী ও এক্ষেপার বিচার ব্যয় বাবদে প্রায় বাট হাজার টাকা এবং উকীল-ব্যয়াদির কিং বাবদে নয় লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত এই মকদ্দমার যে কত টাকা গত হইবে তাহা হোতে স্থিরতা নাই। একটা মকদ্দমার জজ, দরির ভারতের এত টাকা খরচ করা কোন মতেই সমর্থন করিতে পারা যায় না। এত ব্যয় না করিয়া কি মকদ্দমা চালান হইতে না?—কিটায়ত্তঃ এই সকল শিক্ষিত ব্যক্তিদের এতদিন আস্তে-করা কি ভার ও বৃত্তিমূল্য? সভ্য-জগতের কোন দেশে কোম্পানী মামলা এত বিলম্ব হইয়াছে কি? সরকারের উচিত নীতি এই মকদ্দমার বনবিকাশ হই, তাহার ব্যবস্থা করা।

বিলাতের নির্বাচনে বার্লিড শ'দ' অধিষ্ঠিত

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ লোক জনবৃদ্ধ চিন্তাশীল বার্লিড শ' বর্তমান নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের প্রাধিকার্য সন্তোষ-লাভ করিতে পারেন নাই; কারণ তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—গতবারের রক্ষণশীল দল নীল-নদের বীধ কাটিয়া মিশর দেশ জুয়ািয়া দিতে চাহিয়াছিলেন এবং আঁকদের ডাকাতি করিয়াছিলেন। এবার ম্যাকডোনালাড, এই লোক শাসনা-ধীনে রাখিতে না পারিলে আবার অল্পরূপ ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা। একথা হইতে বেশ বুদ্ধিতে পারা যায় রক্ষণশীল দলের প্রেক্ষা যে ভারতবর্ষকে সহজে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিলেন তাহা কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে; তাহাদের ক্ষমতার বহুত্বকু আওতাধীরা বাধা দিলেন। ইহাতি মধ্যেই হাউস অব কমন্সে গাঁহারা নানারূপ গোলাযোগের সৃষ্টি করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। দেখা যাক কি হয়?

মূল্যবদ্ধ-কৃতিবিহারের উদ্বোধন-উৎসব

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ লাভ করিয়া সারনাথে তাহার উপাসনা-বাণী প্রথম প্রচার করিয়া নির্মূল্য লাভের-সহজ সরল উপায় দেখাবারীকে জানাইয়াছিলেন। যেখানকার মূল্যবদ্ধ-কৃতিবিহার হইতে বৌদ্ধদের দর্শন, মনো-বিজ্ঞান, চারিত্র্য প্রচারিত হইয়া ভারতবর্ষ তথা জগৎকে নূতন বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্মান দিয়াছে কালের স্মৃতিল গতিতে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—এখানকার বিপ-বিপ্লবের হইতে কত ছাত্র জ্ঞানলাভ করিয়া দেশ-বিদেশে শিক্ষাদান করিয়া অক্ষতপূর্ণ কীর্তি লাভ করিয়াছে তাহার স্মৃতি করা যায় না। সেই বিহারের সম্মুখ ত্তপে উপর হুজন বিহার সংস্থাপিত হইল। গত ২২এ নভেম্বর এই বিহারের ধার-উদ্বোধন ও উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ২৫০০ বৎসর পূর্বে এই স্থান বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল এবং ইহাই সেইসকল বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সর্গপ্রধান কেন্দ্র ছিল। ৮০০ বৎসর পূর্বে মহম্মদ খোরা এই বিহার নিধিত করেন। এই বিহারের যে প্রকাণ্ডে বুদ্ধদেব বাস করতেন তাহা "গন্ধকুটী" বা, স্বয়ংদায়িত" একেই নামে অভিহিত হইত। মহাবোধি সোহাইটার প্রাচীরতা স্বাক্ষরান শ্রীকৃষ্ণ অণারিক ধর্মপাল-কর্তৃক আবিষ্কৃত এই স্থানের এক সিঁথিত তাম্র-

ধর্মপত্র দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বহু শতাব্দী পূর্বে সারনাথে এই নামে এক বিহার ছিল। এই বিপ্লব বিহারের দ্বিতীয়-রক্ষণের জন্ত এই স্থানে নির্মিত বিহারের এই নামই রাখা হইয়াছে।

এই বিহার-নির্মাণে এক লক্ষ দশ হাজার মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। প্রাচুর্য শ্রদ্ধেয় ধর্মপাল, মিসেস মেরী এলিজাবেথ সচরাচর এবং অপরূপ করেকজনদের অর্থসাহায্যে ইহা নির্মাণ করিতে পারিয়াছেন। ১৯২২ সালে এই বিহারের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হয়; কিন্তু কয়েক বৎসর দরিয়া ইহার কার্য বিশেষ বাধা ও অনিবার্য কারণে বন্ধ থাকে, তাহার পর ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে পুনরায় কার্য আরম্ভ হইয়া ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে উহা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

হুগলি বিহার শতাব্দীতে বৌদ্ধসম্রাট কণিক সর্গেশ্ব গাভ্রজ্ঞাতিক বৌদ্ধ-মন্দির অস্থান করিয়াছিলেন। তাহার পর বৌদ্ধধর্ম হইতে বিজ্ঞান মতে বিচ্যুত হয়—একটা মহাবান, অপরটা হীনবান। বিহারগত বৌদ্ধগণ প্রথমটা এবং দক্ষিণ-বিভাগের বৌদ্ধগণ দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত হয়। তাহার পর ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ নাই। নূতন সারনাথ-বিহারের উদ্বোধন-উৎসবে উত্তর-বিভাগের বৌদ্ধগণকে বহু সম্মানে ভূষিত করা হয় এবং দক্ষিণ-বৌদ্ধগণের পুরোহিত-গতনাসর খেতো এই মন্দিরে সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করেন। ইহাতে এই বিজ্ঞান মতাবলম্বীদের মধ্যে মিনন হার্পিত হয়। বারপারের কলঙ্কিত বাহ্যভর মুক্ত-প্রদেশের শাসনকারীর পক্ষ হইতে মহাবোধি সোহাইটিকে একটা রোপা-নির্মিত আমলকা ফল উপহার দেয়া করেন। সক্রী পণ্ডিত জয়রাজ উসংবে বোগলান করেন ও কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বিহারকে একটা জাতীয় পতাকা উপহার দেন।

এইবার আমরা হিন্দু-মহাসভার বাণী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—  
হিন্দু-মহাসভার পক্ষ হইতে অসংখ্য প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রায়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় উক্ত মহাগণনে নিম্নলিখিত বাণী পাঠ করিয়াছেন—“হিন্দু মহাসভার গুণাধি, কীর্তীর গুণ ২২এ নভেম্বর তারিখে দিল্লীতে মহাসভা হইয়া গিয়াছে, ঐ সভায় গাঁহারা গুরুত্ব-বিহারের স্থাপনে আনন্দ প্রকাশ

করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের আশ্রম হইতে আজ ১৭ শত বৎসর কাল পর্যন্ত এই বিহারের দ্বিতীয় রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। ৮ শত বৎসর পূর্বে মুঘলসারো এই বিহার ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। বুদ্ধদেবের শ্রীচরণপূত এই ভূমিতে যে মন্দির নির্মিত হইল, ঐ মন্দিরে হিন্দুদের বাসতীর সম্প্রদায় নির্মাণ প্রবেশাধিকার পাইবেন। এই কমিটি আশা করেন যে, এতদ্বারা হিন্দুধর্মের সর্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটবে। এই কমিটি ভারতের বাসতীর হিন্দু-সম্প্রদায়কে অসুরোধ করিতেছেন যে, গাঁহারা বেন সকলের সহিত, এমন কি ভিন্নদেশীয় বৌদ্ধদিগের সহিতও মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন, কারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আধ্যাতিক মনোর জীবনের মূলে যে সত্য নিহিত আছে, ঐ সত্য প্রাচীন যুগের ঋষি জ্ঞান ও যুবকগণ একই ভাবে প্রচার করিয়া দিয়াছেন।

তৎকালীণ ধর্মপ্রাধিকার ত্তপে পণ্ডিতে সারি সারি কতকগুলি মন্দির আছে। তার জন-বার্ণাশ এই সকল মন্দিরের ভিতর বুদ্ধের দেহাবশেষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। একটা রক্তাধারের ভিতরে রূপার তার-বেষ্টিত একটা স্বর্ণধার ছিল। সেই স্বর্ণধারের ভিতর পাথরের কোটার জতি সাধনানে বুদ্ধের দেহাবশেষ সুরক্ষিত ছিল। এই কোটা তৎকালীণ পাওরা গিয়াছিল। ভারত-সরকার এই দেহাবশেষ আর একটা নূতন রক্তাধারে রাখিয়াছিলেন।

কথিত আছে যুগ পূঃ ৭৯ অব্দে ১৫ই আবার তৎকালীণ প্রাঙ্গণে বোধিসত্তা-মন্দিরে উদ্ভাটন নামক একজন বাক্ ট্রুয়ানবাণী বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্রামণ্য রবীন্দ্রনাথ এই বৌদ্ধ-বিহার-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে কবিতা রচনা করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম:—

ঐ নামে একদিন ধ্বংস দেশে কুশাস্ত্রে

তব জন্মকৃত্তিমি।

সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে

দান করো ভূমি।

বোধিসত্তমলে তব সেগিরের মহাগণগণ,

আবার সার্থক হোক, যুক্ত হোক বোধ-জীবন,



বিমুক্তির রাজ্যশেষে ও ভারতে তোমাদের মরণ  
তব প্রান্তে উঠুক কুস্থি ॥

চিত্র হেথা মৃতশ্রাব্য, অমিত্যভি, তুমি অমিত্যভ্য,  
আমু করো দান ।  
তোমার বোদনময়ে হেথাকার তজ্জালস বামু  
হোক প্রাণবান ।

থুলে থাক কৃষ্ণদ্বার, তোরিকে বোমুক শৃঙ্খলনি  
ভারত অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,  
অমের প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃশব্দ  
এনে দিকু অমের আরাধন ॥

এই সম্পর্কে গভীর চিন্তাধর্মের সহিত বলিতে হইতেছে যে, শ্রদ্ধের ধর্মপাল মহাশয় উদ্বোধনের প্রারম্ভে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে সাধারণের অভাব অত্যন্ত সজ্জিত হইয়াছিল—ভারতের অজ্ঞাত ধর্মের সম্বন্ধে তিনি বেঙ্গল মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া হাজ সাধারণ করিতে পারা যায় না—তাহার অভিন্নত ঘুটান প্রচারকদিগের বক্তৃতার মতই হইয়াছিল—অসহিষ্ণু ব্যক্তিত্ব যেমন আপনাদের ধর্মমতের প্রাধিকার স্থাপন করিতে গিয়া অপর ধর্মাবলম্বী-লিঙ্গকে অবাধ্য কুংসা করিয়া থাকেন একেজের তিনি ঠিক সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আর না হয় তিনি সেই সকল ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ । পনের মূখে কাগ বাইরা তিনি এরূপ কথা বলিয়াছেন—মূল সত্যত বা প্রকৃত সত্যত-পণ্ডিতদের অস্বপ্ন পড়িয়া এরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করিতে পারিতেন না । আর্থ-ধর্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া বলি, বিদ্বেষ-ধর্মের বরি উদারতা না থাকিত তাহা হইলে বুদ্ধদেবকে কি হিন্দু? ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লুইত । তাহার উচিত ছিল সকল ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য কোথায় আর মিলন-কেন্দ্রই বা কতটুকু দূর বিবৃত তাহাই বলা : সর্গধর্ম-সম্বন্ধের ভেঁটার দিকে কোন কথা না বলিয়া গর্ভাক হইয়া—বৌদ্ধধর্মের প্রচেষ্টার পটভূমি কিছুই না দিয়া—হিন্দু-ধর্মের যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহা আদৌ শোভন হয় নাই । বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মমতের অধিকাংশই হিন্দুধর্ম হইতে গৃহীত । বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য মনোবিজ্ঞান ও চারিত্র্যে ।

লোকান্তরে

স্বর্গীয় অবতারচন্দ্র লাহা

বিগত ২রা কান্তিক ১৩৩৬ বোমবার মহাভৈরবী রাত্রিতে প্রবীণ সাহিত্যিক অবতারচন্দ্র লাহা ৭৪ বৎসর বয়সে ৬৮শা-ধামে স্বর্গারোহণ করেন । তাহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশে বহিঃ-মুগের আর একজন সাহিত্যিককে হারাইল । শৈশবে পিতৃ-



স্বর্গীয় অবতারচন্দ্র লাহা

হীন হইয়া তিনি নিজেই ধর্ম ও অধ্যবসারে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন । তাহার জ্ঞানলিপ্সা অসাধারণ ছিল । বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত নানা বিষয় জ্ঞানিবার জন্য তাহার আগ্রহ বোঝনের মতই প্রবল ছিল । বই না হইলে তিনি একদণ্ড থাকিতে পারিতেন না । স্বরসিক অবতারচন্দ্র রসরসনার ও কথাবার্তার পাঠক ও শ্রোতবর্গকে বিমল আনন্দ দান করিতেন । রসরসনার অবতারচন্দ্রের কৃত্তি তাহার বোমবে রচিত “আনন্দ-সংহা” নামক উপদ্রব্যসংগৃহীতে প্রকাশ পাইয়াছে, এখানি সাহিত্যসম্রাট

বহিঃমতের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল । সে যুগের ছাত্র-এক-বানি বিখ্যাত প্রহসনের উপর এই রসোপজ্ঞাসাখানির প্রভাব পড়িয়াছে । “আমার দলো”, “ভদ্রদৃষ্টি” প্রভৃতি তার আরও কয়েকখানি রসনার উপভাস আছে । বোমবে তাহার সাধস ছিল অপরিণীত । বিমানবিহারী শৈশবের নিকট বোমাবান লইয়া অবতারচন্দ্রই প্রথম এদেশে বেগুনবাড়ী হইবার সঙ্গ করেন । আরোহণ সম্পূর্ণ হইতে বাধা ঘটে, শেষে তাহার বন্ধু রামচন্দ্র এই সোভাগ্য লাভ করেন । রামচন্দ্রের সহকেই তখনকার দিনে সকলের মুখে মুখে ছিরিত—“উইল বেগুন গড়ের মাটে, পড়ল গিয়ে বাগির ঘাটে।” স্বদেশী-আন্দোলনের পূর্বে হইতেই তিনি স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতেন । তাহার মত পরোপকারী অস্বার্থিক প্রকৃতির স্থায়িক মিষ্টভাষী স্বলোকের লোকান্তরে আনন্দা বেনা অনুভব করিতছি । তাহার কোটা পুর বুকবি ও স্থলোক পৈলোদ্রেক লাহা ও তাহার মধ্যম কন্যা ত্রীমতী বিদ্যাবালা দায়ী ইতিপূর্বেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথিতযশ হইয়াছেন ।

স্বর্গপিতৃ কুমারকৃষ্ণ দত্ত

বিগত ১৫ই কান্তিক রবিবার বেলা দুই ঘটিকার সময় গোয়াবানি ষ্ট্রাট বাটোতে কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন । তিনি কলিকাতা হাই-কোর্টের জুরপিক এটর্নী ছিলেন । তাহার মতভা, ভায়নিষ্ঠা, কর্তব্যজ্ঞা, তীর্ষক বরণো করিয়া রাখিয়াছিল । অসুস্থবাগ-আলোকনের সময় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন তাহার বন্ধু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দত্ত হন তখনই তিনি আইন-ব্যবসার ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন ।

কুমারকৃষ্ণদত্ত ছিলেন একজন নিঃস্বার্থ কর্মী । জন-হিতকর সাধারণ আন্দোলনে তিনি সর্বদাই যোগদান করিতেন । সরিসন্যারামের সেবায় তিনি প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন । শিক্ষা ও কবির উত্তির জ্ঞান তিনি পরিপ্রদন করিয়াছেন—বৈজ্ঞানিকের নিকটবর্তী রিমি গ্রামে ও কুসন নামক স্থানে আদ্য কলিকাতা স্থাপন করিয়া দেশবাসীকে পাশ্চাত্য-দেশের বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্রাণাধীনে শিক্ষিত হইবার সুযোগ ও সুবিধা দিয়াছিলেন ।

কুমারকৃষ্ণদত্ত ছিলেন একজন প্রকৃত সাহিত্যিক ।

তাঁহার মত অধ্যয়ন-পরায়ণ ও চিন্তাশীল লেখক বড় কমই দেখিতে পাওয়া যায় । ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় তাঁহার ধ্বনি ছিল অসাধারণ । ইণ্ডিয়ান ডেমী নিউজ পত্রিকায় ও অ্যান্ড ইংরেজী পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে চিন্তাশীল প্রবন্ধাদি লিখিতেন । অনেক সময় আমরা বলিয়া থাকিতে থাকিতেই তিনি মৃত বড় একটা সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করিয়া ফেলিলেন দেখিয়াছি । তাঁহার উভয় ভাষায় লিখিত প্রবন্ধই চিন্তার খোরাক জোগাইত । কয়েক বৎসর ধরিয়া দর্শন ও ধর্মের আলোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, এদেশের শিক্ষা-প্রণালীতে দেশের বালক-বালিকারা প্রকৃত মাহুৎ হইতেছে না । ধর্মহীন শিক্ষাকে বিবৎস ত্যাগ করা উচিত । দেশের সর্বদানের মূল হইতেছে কর্মহীন শিক্ষাই । কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি একখানি পত্রিকা স্বদানভাবে চালাইয়া আসিতেছিলেন । ইহাতে তাহার লোকদান হইত সত্য, তত্রাত তিনি কোন দিন সুচিন্তিত রচনা ছাড়া লণ্ড রচনা প্রবন্ধ করেন নাই ।

৬প্রিয়দাস মুখোপাধ্যায়

গত ৯ই অগ্রহায়ণ আমরা রায় বাহাদুর প্রিয়দাস মুখো-পাধ্যায় মহাশয়কে হারাইয়াছি । মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল । জনহিতকর নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সশ্রিষ্ট ছিলেন । অজ্ঞ আমারা জীবন-কালিনী পান্ডুর হইতে উজ্জ্বল করিয়াছি । গীতা-সোপাইটার তিনি একজন কর্ণধার ছিলেন । বাঙ্গালা-সাহিত্যেও তাঁহার অনেক সুচিন্তিত দার্শনিক ও জনহিতকর প্রবন্ধ ‘পদ্ম’ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ।

‘পরলোকে জানেন্দ্রনাথ প্রামাণিক

বিগত ২রা অগ্রহায়ণ, বুধবার অমরা আমাদের আর একজন বন্ধু জানেন্দ্রনাথকে হারাইয়াছি । জানেন্দ্রনাথের ছায় ছাত্রবৎসল, দানশীল মনোবী বাংলায় খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।

১৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কার্য গ্রহণ করেন । কালে এই কার্য হইতে ইনি বহু অর্থ, যশ, মান অর্জন করিতে সক্ষম হইল । নিজের প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার বহুকাল সরকারের কার্য



করিয়া ঐ কার্য ছাড়িয়া ইনি ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন।

নোবেল পুরস্কার

জানেন্দ্রনাথ আলীদন বহু স্তরভাষ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। দান, গ্রন্থ ছাত্রগণকে সাহায্য, বিদ্বাদের সাহায্য প্রভৃতি তাহার নিত্য-কর্ম ছিল। তিনি কলিকাতার ধর্মসম্ভার-

এবংসক্রে সাহিত্য বিভাগে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।  
প্রইডেনার মৃত কবি ডাঃ ইরিক এসেল কাথকেন্স। বিগত



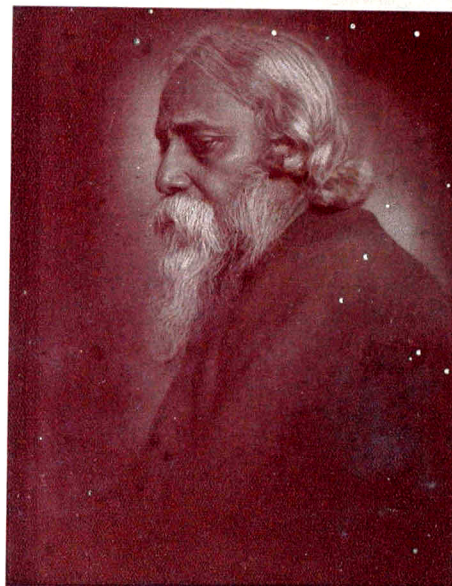
পরলোকগত জানেন্দ্রনাথ প্রামানিক

সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন ও বহুকাল স্বর্গীয় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাজা জগেন্দ্রকিশোর চৌধুরী প্রমুখ বনীবীণেশের সহিত ঐ সমিতির উন্নতিকল্পে কার্য করিয়াছেন। জানেন্দ্রনাথের নিবাস বরাহনগরে। স্থানীয় বিদ্যালয়ের তিনি একজন কর্ণধার ছিলেন। আমরা এই সম্মানের মৃত্যুতে কতিপয়।

৪ঠা এপ্রেল তারিখে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পুত্রের পুরস্কার যে তাঁহাকে প্রদান করা হইবে তাহা স্থির হইয়া গিয়াছিল। ইনি ছিলেন হুইডিন একাডেমির স্থায়ী সম্পাদক। ইতিপূর্বে একবার যখন তাঁহাকে এই সম্মানই পুরস্কার দিবার কথা হইয়াছিল তখন তিনি এই সম্মান গ্রহণে সম্মত হন নাই।

শ্রীশৌরীন্দ্রজুমার ঘোষ কর্তৃক বিখ্যাত গ্রন্থ, ২১৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে মুদ্রিত  
এবং পঞ্চপুণ্য-কার্যালয়, ৩২ তেলিপাড়া লেন হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

পঞ্চপুণ্য—



বিখ্যাত বনীবীন্দ্র নাথ  
শ্রী অমলহোমের সৌভাগ্যে

JUNO PRINTING WORKS—CALCUTTA.



কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
পবেষণা কেন্দ্র  
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯



চতুর্থ বর্ষ  
দ্বিতীয়ার্ধ

শ্রাবণ, ১৩০৮

তৃতীয় সংখ্যা

## রবীন্দ্র-জয়ন্তী

এবারের বড়দিনের সন্ধ্যাপেকা উরেবযোগা ঘটনা  
রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষ  
পরিপূর্ণাঙ্গ উপলক্ষে কলিকাতা টাউন-হলে গত ৯ই  
পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর) শুক্রবার হইতে এক বিরাট  
উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। রবীন্দ্র-জয়ন্তী-শিল্প-প্রদর্শনীর  
দ্বার উদ্বাটন করিয়াছিলেন ত্রিপুরাদিপতি বীর বিক্রম-  
কেশর মাণিক্য বাহাদুর। উদ্বোধনের সময় তিনি বঙ্গ-  
ভাষার লিখিত অভিভাবধে বলেন—

“আপনারা আমাকে এই মহাবজ্রের হোতৃপদে বরণ  
করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। জগৎপুঞ্জ  
বিষকবির সংঘর্ষনার কোনো অংশের নেতৃত্ব করিতে আমার  
ভ্রার ব্যক্তির সঙ্কেচ হওয়া অবশ্যস্বাভাবিক। তথাপি কবির  
সহিত ত্রিপুরারাজ-পরিবারের যে চির-স্নেহিতা সখ্য বিস্তার  
আছে, তাহাই আজ আমাকে উৎসাহিত ও অরুণাশিত  
করিচ্ছে। পূর্ণ গৌরব-মণ্ডিত রবির ভাষার দীপ্তির  
ঐখর্যে জগতের চক্ৰ স্থলসিয়া বাইতে পারে, কিন্তু ঐখর্যের  
প্রতি আজ আমার লক্ষ্য নাই। আমি আপনাদিগের  
আলোচনে আমার পিতামহ প্রপিতামহের দেহপরাণ বদ্ধ  
—আমাদিগের বিশ্বজনীন অস্তিত্বের সত্য-উৎসবে যোগদান



প্রোফে রবীন্দ্রনাথ



করিতে পারিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি।  
দুর্দিন স্ফূর্তা ব্রাহ্মণের সাহসে আজ আমি বলীয়ান।

বিভাতার বিধানে ত্রিপুরা-রাজপরিষদের চিরকাংক্ষিত কলা-সৌন্দর্য্য সেবী। তাই শুভকণ্ঠে উদীয়মান রবির তরুণ সৌন্দর্য্যের ছটার আমার প্রপিতামহ পুঙ্খাপান স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্য আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তদবধি কবিবরের সহিত আমাদিগের বিশেষ সন্ধ। পিতামহ রাধাকিশোর মাণিক্য তাঁহার পরম বন্ধ ছিলেন এবং পিতৃদেব বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যও সে সম্পর্ক অক্ষর রাখিয়াছিলেন।



উত্তর রণে—২৪শে বৈশাখ—৩০ প্রহীত

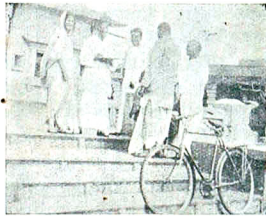
শিল্পপ্রিয় ত্রিপুরা রাজবংশের উপর কবির প্রভাব সামান্য নহে। পঞ্চাশের গিরিনিক রিঙ-পোক্তা বনপুঙ্গবগিতা, শ্যামলা পাক্তা ত্রিপুরার স্বভাবসৌন্দর্য্য, গোবিন্দমাণিক্য-প্রমুখ আমার পুণ্ড্রপুঙ্খগণের কাহ্নিকলাপ, ত্রিপুরার সাহিত্য-চক্কা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, 'চির ও বন-শিল্প' মহাকবিকেও আকৃষ্ট করিয়াছে, ইহাতে ত্রিপুরাবাসী মাত্রেই পোষিত।  
আপনারা কহা করিবেন আমি স্বর্ণপদের ছায় মহাকবির সহিত আমার ব্যক্তিগত সন্ধের উল্লেখ করিলাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'বাল্যকাল কবি—ভারতের কবি—বিশ্বকবি'—আমি তাঁহাকে ত্রিপুরার কবি বলিয়া অর্ঘ্য-প্রদান করিতেছি।

তথাপি একথা কোনমতেই তুলিবে চলিবে না যে, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠক্ষেত্র কেবলমাত্র সাহিত্য-জগতেই



'উত্তর রণে' পরন-গুণে রবীন্দ্রনাথ

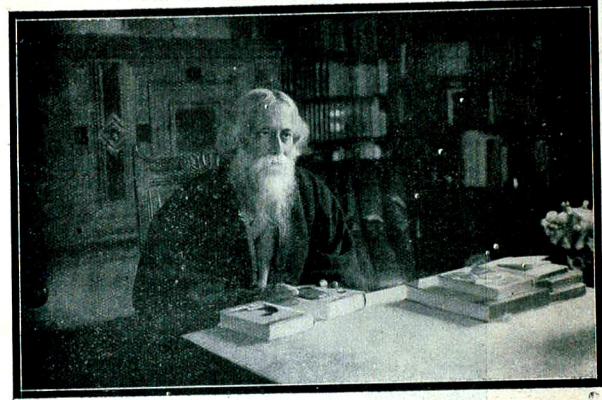
আবদ্ধ নহে। বিরহমানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উদাত্তগুণে বাজিয়া উঠিতেছে; কিন্তু সেখানে তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তাহাদের চরিতার্থতার জন্ত



'উত্তর রণে'র তোরণদ্বারে কয়কজন ভক্ত তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, যামাচ্ছ মহাবীর দৈনন্দিন জীবনও তাঁহার নিকট উপেক্ষণ কর নহে; কাহ্নিতে ক্রীতে মগ্নিত

হইয়া বাহ্যতে উগ্র অথও বিশ্ব-জীবনের মধ্যে আপন প্রতিষ্ঠা হইতে স্রষ্টা না হয়,—উপদেশের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা নিজের জীবনব্যাপী কণ্ঠপ্রচেষ্টার দ্বারা সঙ্গদাই তিনি এই আদর্শকে অধ্যায়সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই জন্তই শিল্পজগতে কোনদিনই তিনি কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞের

উপদেশবাণী রাজ্যপরিচালনকে—সৌন্দর্য্য এবং কল্যাণের কাহ্নিকে উজ্জল করিয়া তুলিবার বিষয়ে দিবা ইন্দ্রিত্যের নির্দেশ আনাদিগকে প্রজ্ঞ করিতেছে।  
আমি আর' অধিকক্ষণ আপনাদের সময় লইতে চাই না। আহন, আজ মহাকবির সম্মুখতম জন্মোৎসবে



স্বীয় পাঠাগারে রবীন্দ্রনাথ—স্তর রমণ-কর্তৃক গৃহীত ফটো হইতে

উপভোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই; নিজের দেশের শিল্প-কলাকে সমগ্রভাবে, স্বার্থভাবে দেখিবার শিক্ষা আমরা তাহারই নিকট পাইয়াছি; তাহারই নিকট দীক্ষা পাইয়া শিল্পসৌন্দর্য্যের দিবা-নিকেশনের সমস্ত দ্বার আমাদিগের সম্মুখে উন্মোচিত হইয়া গিয়াছে। এবিষয়েও ত্রিপুরাবাসীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। কেননা দেশীয় শিল্পকলাসম্বন্ধী তাঁহার সঙ্গপ্রদান প্রবন্ধ 'দেশীয় রাজ্য' প্রায় ২৬ বছর পূর্বে আগরতলায় ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মেলনীতে পঠিত হয়। আজ একদিকে যেমন গীতাঞ্জলির করুণ হরের কল্লার আমাদিগের বৈকল্য পরিবারের প্রাণে অহরহ প্রতিফলিত হইতেছে, অজ্ঞানকে সেইরূপ 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধের মহতী

আমরা সমবেতভাবে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করিব যে, তিনি তাঁহার বরপুঙ্খকে অস্বীকার্য জীবন প্রদান করিয়া তাঁহার যুগে স্বীয় অজবাবী বিশ্বময় প্রচার করিতে থাকুন।  
কবিবরের আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমি এক্ষণে এই শিল্পপ্রদর্শনীর দ্বারোন্মোচন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।  
ইতি ৯ই পৌষ, ১৩৪০ ত্রিপুরা।"

কবি তাঁহার উত্তরে লেখেন—  
"ত্রিপুরার মহারাজকে এই অজ্ঞানে নিয়ম করা হইয়াছে এবং তিনি এই কলা-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে রাজী হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দের সহিত এখানে আসিয়াছি। এই রাজপরিবার সম্পর্কে-আমার



হুইয়া বালাস্থতির উল্লেখ করিতেছি। অল্প বয়সে যখন আমি মাসিক কাগজে নিখিতাম, তখন একদা বর্তমান মহারাজার প্রণিতামহের নিকট হইতে দূত আসিয়া আমাকে প্রায়েন যে, আমার লেখা পড়িয়া মহারাজা হুইয়া হইয়াছেন। তাহার,

বর্তমান মহারাজার পিতামহের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাজাশাসন-সংক্রান্ত বিষয়েও আমার পরামর্শ চাহিতেন। আমি তাহাকে যথাস্থিতি পরামর্শ দিতাম। প্রাচীন-ভারতে রাজন্যবর্গই চিত্র, কলা, সঙ্গীত, কাব্য



রবীন্দ্রনাথ—অল্প বয়সে কলিকাতা গৃহীত ফটো হইতে

সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে তখন কার্দিয়াং নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তদার গেলে মহারাজা আমার পরম আগ্রহে অভ্যর্থনা করেন। তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং আমার রসস্থিতির প্রশংসা করিয়াছিলেন।

হত্যায়ির পোষক ছিলেন। বর্তমানে এ বিষয়ে দেশীয় নৃপতিগণের তাদৃশ অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। তথাপি জিহুগ-রাজপরিবারের কলবিজ্ঞার প্রতি যথেষ্ট অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়, ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা।”

ঐদীন অপরূপে বিখ্যাত কণাধারিত্যক শ্রীকৃষ্ণ শরৎকল্প চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে টাউনহলের বিস্তারিত এক সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছিল। ঐ সভায় শ্রীকৃষ্ণ মান-কুমারী বহু, জিরেশ্বর দেবী, কামিনী রায়, শ্রীমতী নিমুশমা দেবী, রাধারণী দেবী, জগদ্রস সেন, প্রথম চৌধুরী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বতীন্দ্রমোহন বাগচী, বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকগণ প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি মহোদয় তাহার অভিভাবকে বলেন—

“কবির জীবনের সমুদ্রি বহুর বয়স পূর্ণ হৈলো; নিসাতার এই আশীর্বাদ কেবল আমাদিগকে নয় সমগ্র মানবজাতিকে বল করে। সৌভাগ্যের এই দৃষ্টিকে আনন্দ-উৎসবে মগ্ন ও উজ্জ্বল কোরে আমরা উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে চাই, এবং সেই মুহুর্তে নিজেদেরও এই পরিচরিত্ব তাহদের দিরে যাব যে, কবির শুধু কাব্যই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখি, তাঁর কথা কানে শুনি, তাঁর আশ্বাসের চারিধারে ঘিরে বসবার ভাগ্য আমাদের ঘটেছে। মনে হয়, সেদিন আমাদের উদ্দেশ্যেও তাঁরা নমস্কার জানাবেন।

সেই অমৃতস্রোতের একটা অঙ্গ আজকের এই সাহিত্য সভা। সাহিত্যের সম্মিলন আরও অনেক বসবে, আরোজনে-প্রয়োজনে তাহদের গৌরবও কম হলে না; কিন্তু আজকের দিনের অসামান্যতা তাঁরা পাবেন না। এতটা সভ্যতার নয়, এ বিশেষ এক দিনের, তাই এর শ্রেণী স্বতন্ত্র।

সাহিত্যের আগের সভানারকের কাজ করিবার ডাক ইতোপূর্বে আমার আরও এসেছে, আন্তরিক উপেক্ষা করিতে পারিনি। নিজের অযোগ্যতা স্বরূপ করেও যদ্যেতে কর্তব্য সমাপন করে এদেচি; কিন্তু এই সভায় শুধু সন্তোষ নয়, আজ লজ্জা বোধ করছি। আমি নিঃসংশয় যে, এ গৌরব আমার নয়, এ ভারতবর্ষে আমি অক্ষম। এ আমার প্রচলিত বিনয় বাক্য নয়, এ আমার অক্ষপট সত্য কথা। তথাপি আমরণ অস্বীকার করিনি—কেন যে করিনি আমি সেইরূপ শুধু স্বাক্ষর করব।

আমি জানি বিতর্কের স্থান এ নয়, সাহিত্যের ভাষামূলক বিচার, এর জটিলক-নির্ণয়ের সমস্ত নিয়ে এ পরিষদ আহুত হইল—তার প্রয়োজন যথাস্থানে—আমরা সমবেত

হয়েছি বুদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিতে। তাঁকে সহজভাবে বসতে—কবি ভূমি অনেক দিরেছে, এই দীর্ঘকাল তোমার কাছে অনেক পেরেছি। স্বপ্ন, সপন, সর্গসিদ্ধিাদারিনী ভাষা দিরেছে ভূমি, দিরেছে বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিরেছে অপূর্ণ সাহিত্য, দিরেছে জগৎকে কাছে বালার ভাষা ও ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচর, আর দিরেছে যা সকলের বড়—আমাদের মনকে দিরেছে ভূমি বড় করে। তোমার সৃষ্টির পুণ্যস্থল বিচার আমার সাপাণী—এ আমার দর্শনবিদ্যা; প্রাঞ্জলিমান যারা, যথাকালে তাঁরা এর আলোচনা করবেন; কিন্তু তোমার কাছে আমি নিজে কি পেরেছি, সেই কথাটা ছোট করে জানাবেন বলেই এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করসাম।

ভাষার কারুকার্য আমার ঐ, ওতে যে পরিমাণ বিজ্ঞা এবং শিকার প্রয়োজন, সে আমি পাইনি, তাই মনের ভাব প্রচলিত সহজ কণার রসাই আমার অভ্যাস,—এবং এমনি কোরেই বসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রজ্ঞা এসে দির ঘটালে। একে আমি বিখ্যাত, কুড়ে, তাতে বাসুপিত্ত-কক্ষ আদি আনুর্ভোক্তা চরের দল একযোগে কুপিত হয়ে আমাকে শয্যাশায়ী করে দিলে। এমন ভরসা ছিল না যে, নড়তে পারবো। কিন্তু একটা বিপদ এই যে, চিরকাল দেখে আসছি, আমার অস্বপ্নের কথা কেউ বিশ্বাস করে না; বেন ও আমার হতে নই। কল্পনার স্পষ্ট দেহেতে পেলাম সবার স্বাক্ষর নেড়ে মিডাজ বলাচেন, উনি আসেন নি? এ আমার জানতাম! সেই বাক্যবাহের ভয়েই আমি কোমরতে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখন দেখছি ভালই করেছি। এই না আসতে পারার হুগ আমার আমরণ যুক্তো না, কিন্তু যা লিখে আনবার হইছে ছিল সে হয়ে উঠেনি। একটা কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তার চেয়েও বড় ঠিকিৎস আছে। মাহুনের সুরগর্য্য অর্গার কবাই মনে থাকে, তাই লিখতে গিয়ে দেখলাম কবির কাছ থেকে পাওয়ার হিসাব দিতে যাওয়া যথ্য—দর্শনপ্রায়ী বর্ধ মেলে না।

ছেলেবেলায় কথা মনে আছে, পাড়ীঘারে মাছ ধ’রে ভোঙ্গা ঠেলে, নৌকা পেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে বাজার দলে সাব্বেরি করি, তার আনন্দ ও



আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিকরেশ-বস্ত্রার বার হই। চিক বিধ-কবির কাব্যের নিকরেশ যাত্রা নয়, একই জীবন। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতিবিক্ষত পায়ে নিষ্কীর্ণ-দেহে যাত্রা দিলে আসি। আদর্শ-অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে অভিভাব্যেকরা পুনরায় বিজ্ঞানে চালাইল করে দেন। সেখানে আর এক দফা স্বর্ধনা-লাভের পর আবার বোধোদয়, পঞ্চপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা তুলি, আবার গুহ সন্ন্যাসী কাঁধে চাপে, আবার সাগরেদি হ্রক করি আবার নিকরেশ-বস্ত্রা, আবার ক্রিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন-স্বর্ধনার খটা—এমনি করে বোধোদয় পঞ্চপাঠ ও বাবারাজীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল।

এখন শহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভ্রমি করে দিলেন ছাত্রব্রি ক্লাশে; তথার পাঠা—নীতার বনবাস, চাক্ষুপাঠ, সন্ন্যাস-শতক ও মৃত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে, যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিক সমালোচনা ক্লাস নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি টীকিত্তিরে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। হুতরাং অদ্যোচৈত বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তারপর বহুদূরে আর একদিন সে মিথ্যাবুৎ কাটিলো, তখন ধারণাও ছিল না যে, মহিষকে ছাগ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে!

যে পরিবারে আমি 'মাহুল', সেখানে কাব্যউপভাস চন্দ্রীতির নামান্তর, সঙ্গীত অঙ্গুষ্ঠ; সেখানে সবাই তার পাশ করতে এবং উকীল হ'তে; এমি মাথপানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাশেও বিপর্যয় ঘটলো। আমার এক অস্ট্রীয় তখন বিশেষ থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অস্বাভাব, কাতো আকর্ষিত; বাড়ীর মেয়েদের লজ করে তিনি একদিন প'ছে শোনানেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুরুলে জানিলেন, কিন্তু যিনি প'ড়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাঠে চরলগা প্রকাশ' পাঠ, এই লজ্জার কাড়াভাড়া বাইরে চ'লে এলাম। কিন্তু কানোর সঙ্গে

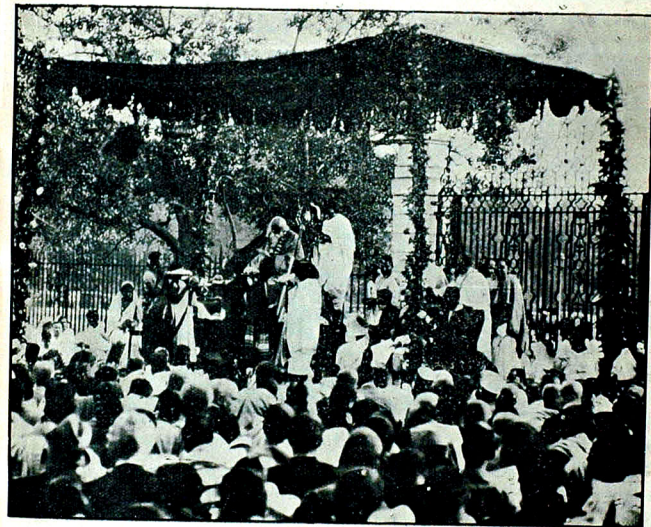
কিত্তিব্যার পরিচয় ঘটলো, এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তাঁর প্রথম সত্য পরিচয়। এরপরে এবাড়ীর উকীল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে মইল না, আবার 'কিরত' হলো আমাদের সেই পত্নী-ভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা দেওয়াল থেকে খুঁজে বের কোরলাম "হরিদাসের গুরুকথা" আর বোলো "ভাবাণী-পাঠক"। গুরুজনের দোষ দিতে পারিলেন, সুলের পাঠা তো নয়, গুণলো বদলেদের অগাধা গুরুক। তাই পড়বার ঠাই করে নিতে হোলো আমাকে বাড়ীর গোয়ালঘরে, সেখানে আমি পড়ি তারা শোনেন। এখন আমি পড়িনে, যিনি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে।

একই স্থলে বের দিন পড়লে বিজ্ঞা হয় না, মাষ্টার মশাই হেহবশে একদিন এই ইন্সটিটুট দিলেন, অতএব আবার ক্রিরত হোলো শহরে। বলা ভাল, এর পরে আর সুলে বদলাবার প্রয়োজন হয়নি। এইবার খবর পেলাম বহিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। উপভাস-সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। প'ছে প'ছে বইগুলো বেন মুগ্ধ হয়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা লেখ। রক্ত অক্ষরবর্ণের চোঁটা না করেছি যে নয়, লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একবারে ব্যর্থ হ'য়েছে; কিন্তু চোঁটার দিক দিয়ে তার মফর মনের মধ্যে আজও অহুতর দিক।

তারপর এলো বঙ্গদর্শনের নবপরিচয় বৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বাসি' তখন দার্শন্যাদিক প্রকাশিত হচ্ছে, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নতুন আলো এসে যেন চোখে প'ড়লো, সেদিনের সেই গভীর ও স্থতীক্ষ আনন্দের স্থতি আমি কোনদিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কমনার ছবিত নিজে মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেও যেম একটা পরিচয় পেলাম। অনেক প'ড়লেই যে অনেক পাওয়া যায়, একথা সত্য নয়। ওইতো থানজেকে পাঠা, তার মধ্যে দিয়ে যিনি এতবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া বাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি ভুলেই পেলাম যে জীবনে একটা ছরও কোনদিন লিপেচি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কি করে যে নবীন বাঙালী-সাহিত্য দ্রুতবেগে সঞ্চিত হ'তে উঠলো, আমি তার কোন খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনোদিন দৃষ্ট হবারও সোভাষা ঘটেনি, তাঁর কাছে

ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বারবার ক'রে পড়েছি, কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, ক'কে বলে আট' কি তার যজ্ঞ, গুজম মিলিয়ে কোথাও ক'কানো জটা ঘটেছে কি না, এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—এসব ছিল আমার কাছে বাহ্যিক। শুধু স্ববৃদ্ধ প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর



গুরুদী-উৎসব-পরিবহন-প্রদর্শন অর্ঘ্যদান

ব'দে সাহিত্যের শিক্ষা-গ্রন্থেরও সুরোগে পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইটা হলো বাইরের সত্য কিন্তু অস্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিশেষ আমার সঙ্গে ছিল কবির থানকরক বই—কাব্য ও সাহিত্যে এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন

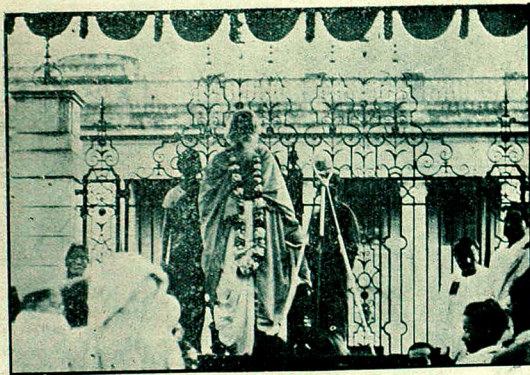
কিছু হ'তেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ করে প্রোচ্চের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শাস্ত, উজ্জম সীমাবদ্ধ—



শেষবার বুধ পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিজ্ঞান সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু অকালে সাদা নিলাম—ভয়ে কথা মনেই না। আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাঘা করতে আমি পারিনে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা গুরু অস্ত্রের সন্ধান আমাকে দিয়েছে। পণ্ডিতের তত্ত্ববিচারে তাতে তুল খি থাকে তো হোক, কিন্তু আমার কাছে সেই সত্য হয়ে আছে।



শ্রীমতী কামিনী রায়

রবীন্দ্রনাথ উৎসবগোষ্ঠে

আচার্য্য রায়, মেঘের

\* জিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় এ সকল অব্যক্ত, হয় তো বা অর্থহীন; কিন্তু গোড়াতেই আমি বলছি যে আলোচনার জন্ত আমি আগিনি, এর সমস্ত দ্বারায় প্রবাহিত মাধুর্যের বিবরণ দেওয়াও আমার সাধ্যাতীত, আমি এসে-ছিলাম শুধু আমার ব্যক্তিগত গোচর করে কথা এই জ্যৈষ্ঠী-উৎসব সভার নিবেদন করে যেতে।

কাব্য, সাহিত্য ও কবি রবীন্দ্রনাথকে আমি যেভাবে লাভ করেছি, তা জানালাম। মাহুর রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে আমি সামান্যই এসেছি। কবির কাছে একদিন

গিরেজিলাম বাঙ্গালা-সাহিত্য সমালোচনার ধারা প্রবাহিত করার প্রাক্তব নিয়ে; নানা কারণে কবি স্বীকার করতে পারেননি, তার একটা ক্ষেত্রে এই দিয়েছিলেন যে, বার প্রকাশ্যে করলে তিনি অপরাধ, তার নিম্নে করতেও তিনি তৈরি অক্ষম। আরো বলেছিলেন যে তোমরা যদি একাই কর, কখনো ভুলোনা যে অক্ষমতা ও অপরাধ এক বস্তু নয়। ভাবি, সাহিত্য-বিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখত।

কিন্তু এই সভার অনেকখানি সময় নষ্ট করেছে, আর না, অবশ্যো ব্যক্তিগত সভাপতি নির্বাচন করারই এটা দণ্ড, এ আপনাদের সহিতেই হইবে। সে যাই হোক রবীন্দ্র-জ্যৈষ্ঠী উৎসব উপলক্ষে এ সমাদর ও সম্মান আমার আশার অতীত। তাই সঙ্গতরূপেই আপনাদিগকে নমস্কার জানাই।

দ্বিতীয় দিন

১৩ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর) শ্রুর সর্গপুত্রী রাধাকৃষ্ণের সভানেতৃত্বে ইরাজী ভাবনা সভা হইয়াছিল। এই সভার

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ রবীন্দ্রনাথের রচনা-সমগ্রকে প্রবন্ধ পাঠ করেন ও বক্তৃতা দেন। এই সভায় সমাগত ডাঃ আকৃ হাট, তর সি, ভি, রমণ, ডাঃ রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হাসান হুসেইন ও প্রোঃ এইচ, কে, ভট্টাচার্য্যের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সভাপতির অভিভাষণ—

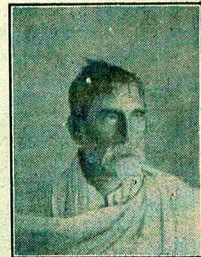
“কবির মহৎ কার্য্য ও অসীম প্রভাবের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতে পারিরা আমি অত্যন্ত আনন্দপ্রসার লাভ করিতেছি। জীবনের মাধুর্য্য ও মানব-সত্যতার তাহার প্রচুর দান। আমাদের অনেকের জীবন যখন সংসার ও সন্দেহে ক্লান্ত, যখন বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আমাদের চক্কু অগসিয়া পড়াচ্ছে এবং যখন রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আমাদের প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সেই সময় তিনি উল্লীপনামময়ী বাণী দিয়া আমাদেরকে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন যে, অর্থ, সম্পদ বা জড় জগতের উপর কলুষ করাই সভ্যতার মাপকাঠি নয়, পরন্তু সত্য ও প্রেম দিতর দ্বারা সভ্যতার মূল্য নির্ধারণ করিতে হয়।

শরীর বা মনকে মাহুর ধূসিয়া লইলে চলিবে না। আরও এমন কিছু আছে যাহা বুদ্ধির অতীত—সেটা হচ্ছে মাহুরের অন্তর্নিহিত আত্ম—যাহা সর্বভূতের সহিত এক বা যাহা নিজেই সভ্য শিবা স্বরূপ।

যদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, প্রতীচ্য সভ্যতার ভিত্তি হইতেছে, যুক্তিতর্ক ও বস্তুতত্ত্বের উপর; আর প্রাচ্য সভ্যতার ভিত্তি হইতেছে অব্যাক্ষর্য্যের উপর। সেক্রেটিস হইতে রাসেল পর্যন্ত সকলেই তর্কশাস্ত্রের উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন।

ধরিলে লগ্না ঘড়িক যে, আমরা ইউরোপীয়রা অবশিষ্টা, সেখানে রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি নাই—সকলেই উত্তম বাড়ীতে বাস করে, খাওয়া পরার কোন কষ্ট নাই। ইহাই কি আমাদেরই হইতে পারে? না। আমাদের ভিতর অশ্রুত আকাঙ্ক্ষা, অপূরণীয় কামনা সর্বদা জাগ্রত রহিয়াছে। মনবান্না সর্বদা এমন একটা কিছু চায়, যাহা এই বাহ্য-জগৎ দিতে পারে না—মখনই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মাহুর প্রতিদিন মরিতেছে, মাহুর নিরাশার সহনে অবিশ্রা

সমগতা পজারিত হইতেছে—তখনই মনে এ সমস্ত বিষয়ের সমাধানের জন্ত শত সহস্র প্রশ্ন জাগিয়া উঠে; তখন বিজ্ঞান, যুক্তিতর্ক বা বস্তুতাত্ত্বিকতা ইহার উত্তর দিতে পারেন না। আমরা আরও কিছু ভিতরের ভিত্তি চাই—আমরা চাই এমন কিছু যাহা অস্ত্রাঘাতকে হুত্বী করিতে পারে। আজ হয় তো অনেককেই হৃদয়হ্রদয়ে আছেন কিন্তু তাহা হইলেও তাহার অস্তরে বিরীত শূন্যতাই অতুত করিতেছে।



আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ তাহার লেখার ভিতর দিয়া এই অশ্রুত ছিদ্র ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক আধিক্যশ নাহিতাই ভাব ও প্রেরণার অভাবই দৃষ্ট হইতেছে। বার্ণাশ' এবং এইচ, জি, ওয়েলসের লেখা বেশ উপদেশপ্রদ, মনোজ, চিত্তাকর্ষক ও প্রতিভার পরিচায়ক কিন্তু ঐ সমস্ত লেখা আমাদের মনের অন্তরালে মোটেই বা ঘের না। রবীন্দ্র ভ্রাজের ‘টোয়েন্ট অব মিউজি’ দার্শনিকতত্ত্বের উচ্চাঙ্গের বিশদব্যাখ্যা কিন্তু ‘উহাও মুরমের ভিত্তে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের ঘরে লুকোচুরি, করিলে চলে না। নিজের অন্তরুঞ্জি না হইলে অতর্কিত অতর্কিত দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ এমন দেশের লোক, যে দেশের লোকেরা ব্যপ-পরম্পরায় এমন একটা অব্যাক্ষর-প্রেরণার দ্বারা রাখিয়া গিয়াছেন যাহার ফলে আজ আমরা কবি রবীন্দ্রনাথকে পাইছি। ইহার লেখার ভিতর এমন একটা শাখাতের প্রেরণা রহি-



রাছে, এমন-একটি অন্তর্দৃষ্টি রহিয়াছে বাঁহারা কলে আমা-  
নিকগে বাস্তবজগৎ হইতে গভীর সত্যের সন্ধান লইয়া যায়।  
তাঁহার লেখা যে কেবল আমাদের 'অন্তর্দৃষ্টি' উজ্জীয়া দেয়  
এমন নহে, পরন্তু ইহাশ্রোকেই পরলোকের একটা সন্ধান  
দেয়। জগৎটা মারাময় বলিলে চলিবে না—এই জগৎভরে  
ভিতর দিয়াই আমাদের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে।  
'প্রকৃতির প্রতিধ্বনি' নামক নাটকে একটা বালিকার চরিত্র  
অঙ্কন করিয়া একটা সমাজিক হইয়া উপলব্ধি করায়াছেন  
যে, যেহে ও ভালবাসার বন্ধন পাশ ছিন্ন করিলেই যে মুক্তির  
পথ প্রশংসনীয় তাহা নহে, কিন্তু পার্থিব অসুখ বন্ধনের  
মধ্যেই উহা পাওয়া যায়—সমীচীন ভিতরেই অসীমকে  
লাভ করা যায়।



আচার্য্য সি, ডি, রমণ

তিনি নিজে অকৃত্রিম উচ্চতরে উঠিতে পারিয়াছেন  
বলিয়াই সামাজিক বিধানের নামে যে সমস্ত ভ্রান্তি ও  
হীনতা চলিয়াছে, তিনি তাহার বিরোধী। মানবজীবন  
আইনের গভীর বহু উপরে—সেইকল্প সৌন্দর্য্য শৃঙ্খলার  
উপরে এবং সত্য সমগ্রতরে উপরে। যে আশ্রয় অন্তর্দৃষ্টি  
ঘটিরাছে, সেই আশ্রয় বিশ্বমানবকে না ভালবাসিয়া থাকিতে  
পারে না। ইহা প্রেম দ্বারা সকলকে জঁর করে,—শব্দকে  
বশীভূত করে, গুরুত্ব দমন করে এবং 'পানপান' উচ্চ

করে—কবির সমস্ত লেখার ভিতর দিয়াই এই ভিত্তি সত্য  
দৃষ্টি উঠিয়াছে:—আশ্রয় অন্তর্দৃষ্টি, বাহ্য বৈরাগ্য এবং  
প্রেম ও ধ্যানের পরিপূর্ণতা। তাঁহার আশ্রয়ই হইতেছে—বৃহৎ  
ভিতর একের দমন। এই আশ্রয় লাভ করিতে যাওয়া  
নিজেকে একেবারে বিসর্জন দিলে চলিবে না, পরন্তু  
আত্মোন্নতি লাভ করিতে হইবে।

### ডাঃ আরকোহাট

রতীশর্মা কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ আরকোহাট  
বক্তৃতাপ্রদানকালে বলেন যে, যদিও তাঁহার নাম কার্য-  
তালিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তথাপি তাঁকে যে 'রবীন্দ্র-  
নাথের ভারতীয় ধর্মের স্বরূপ বাধ্য'—সংক্ষেপ বক্তৃতা প্রদান  
করিতে হইবে, এই বিষয়ে, এমন কি একখানি পোটকার্ড  
দ্বারাও তাহাকে জানান হয় নাই। শনিবার প্রাতঃকালে  
সংবাদপত্রে এই মহতী ও বিরুদ্ধনপূর্ণ সভার অঙ্গতম  
বক্তারূপে তাঁহার নাম দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন। হুতরাং  
অতীব দ্রুতের সহিত তাহাকে জানাইতে হইতেছে যে,  
তিনি যথোচিতভাবে তাঁহার কর্তব্যপালনে সমর্থ হইবেন না।  
যাহা হউক, মহাকবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন স্বরূপে পাইয়া  
তিনি নিজেকে দগ্ধ মনে করিতেছেন। যদিও তিনি ভিন্ন  
দেশ হইতে আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ  
সময় তিনি ভারতেরই অতিবাহিত করিয়াছেন। কবির  
অতুলনীয় কাব্য ও সাহিত্য সমগ্র জগৎকে মৈত্রী-বন্ধনে  
আবদ্ধ করিবার পথে কতখানি সাহায্য করিয়াছে বক্তা  
তাঁহা বিবৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রবীন্দ্রনাথ কোন স্থান-  
বিশেষের কবি নহেন, পরন্তু তিনি সমগ্র জগতের কবি।  
সমগ্র জগৎ তাহাকে অতুঃপ্রেরণা দিয়াছে। অতঃপর  
বক্তা বলেন যে, পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি ভোগের পর মানুষ কি  
করিয়া ভাগ্যবত্ব আনন্দলাভ করিতে পারে রবীন্দ্রনাথের  
রচনার প্রত্যেকটি ছত্র হইতে তাহার নির্দেশ পাওয়া  
যায় এবং এই জগৎই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানব জাতির দ্বারা  
অধিকার করিয়াছেন।

### আচার্য্য সি, ডি, রমণ

'জর' সি, ডি, রমণ বক্তৃতাপ্রদান কালে বলেন যে,  
যদিও তিনি গত ২৪ বৎসরকাল 'মানব কলিকাতা পিন-

বিভাগের সহিত-সংশ্লিষ্ট আছেন এবং মাস্ত্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়  
হইতে এম-এ, ডিগ্রী লাভ করা সহযোগে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের  
প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার কথা তিনি বিশ্বত হইয়াছেন,  
তথাপি তাহাকে মাস্ত্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে রবীন্দ্র-  
নাথকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার অস্বাভাব্য আপন করা  
হইয়াছে (হাত)। অতঃপর তিনি মাস্ত্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের  
পক্ষ হইতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার সপ্ততিম জন্মোৎসব  
উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

### ডাঃ রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বক্তৃতা প্রদানে রাজনীতির দিক দিয়া কবির কার্য-  
কলায়ের আলোচনা করেন। এতৎসম্পর্কে তিনি গত  
১৯০৫ সালের বঙ্গের আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিয়া  
বলেন যে, সেই সময় জাতীয় প্রেরণা দানে রবীন্দ্রনাথের  
দান বাঙ্গলা কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না।

### ডাঃ হাসান হুসাইনী

ভাইস চ্যান্সেলর ডাঃ হুসাইনী কবির বহুবলী  
প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়া বলেন যে, একমাত্র  
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সৃষ্টির মিলন  
সম্ভব হইয়াছে।

### অধ্যাপক এচ কে ভট্টাচার্য্য

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি অধ্যাপক এচ কে,  
ভট্টাচার্য্য কবির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়া কবির দীর্ঘ-জীবন  
কামনা করেন এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যে,  
তিনি যেন বিশ্ব-মানবকে 'আরও জ্ঞানের আলোক দিতে  
পারেন। কবির সমস্ত লেখা বাহ্যতে সমগ্র ভারতে  
পঠিত হয়, তজ্জন্ম তিনি গ্রামে গ্রামেই সমস্ত লেখা পড়ার  
বন্দোবস্ত করিয়া জগৎ প্রভাব করেন এবং কবির যে সমস্ত  
লেখা এখনও অসংখ্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সমগ্র তাহার  
অম্বাদ করা উচিত।

### তৃতীয় দিন

১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর) অম্বাদ ৪৯০ ঘটিকার  
সময় টাউন হলের সমগ্ররাজ্য পথের উপর কবিগুরুকে

অভিনন্দিত করা হয়। টাউন হলের সমগ্ররাজ্য প্রবেশ ক্রেত  
অতি অপূর্ণভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। রাজপথের  
দক্ষিণ দিকে বিচিত্র সজ্জাপত্রের পুষ্প ও গুল্মবাগানের  
সুসজ্জিত বৈদী নির্মিত হইয়াছিল। দেবীর উপর কবির  
আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মঞ্চেপারি রবীন্দ্রনাথকে  
আনিয়া বসান হইলে পাঁচটা বাঙ্গালী মহিলা সম্পূর্ণ হিন্দু-  
প্রণাম তাহাকে বরণ করেন।

প্রথমে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মেয়র  
শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় কবিকে মাথো বিতুতি করেন এবং  
নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কর-কমলে—

বিষবের্য্য মহাভাগ,

তোমার জীবনের সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে  
কলিকাতা নগরীর পৌরস্বত্বের পক্ষ হইতে আমরা তোমাকে  
অভিবাদন করিতেছি।

এই মহানগরী তোমার জন্মস্থান এবং তোমার যে  
কবিত্রিভা সমগ্র সভ্যজগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে—এই স্থানেই  
তাঁহার প্রথম সুরঙ্গ। এই মহানগরীই তোমার শ্রুতিভা  
অনুসারে ধর্মবিশ্ববাসের সাধনক্ষেত্র, এই মহানগরীই তোমার  
নরেন্দ্রকর পিতামহের আত্মীয় কর্মক্ষেত্র এবং এই মহা-  
নগরীর যে বংশ ভাবে, ভাষায়, শিল্পে, সাহিত্যে সঙ্গীতে,  
অভিনয়ে, শিল্পচার ও সাধারণে সমগ্র সজ্জনসমাজের  
প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, তুমি সেই বংশেরই  
অক্সাঙ্কল রত্ন—তাই তুমি সমগ্র বিশ্বের হইলেও আমাদের  
একান্ত-আপনার জন। বিশ্বের বিরুদ্ধসমাজের সমাদর  
লাভ করিয়া তুমি কলিকাতাবাসীরই মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ।  
তোমার সর্বতোমার প্রতিভা বঙ্গ-ভাষাকে অপরূপ বৈবরণে  
মণ্ডিত করিয়া জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে,  
তোমার অসংখ্য কল্পনা-প্রসূত শিখার আদর্শ বাঙ্গালার এক  
নিরুত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে,  
এবং তোমার লেখনীনিষ্ঠ অমৃতসারা বাঙ্গালী জাতির  
প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত করিয়াছে। যে  
মাতৃপুঞ্জার প্রধান পুরোহিত, যে বঙ্গভারতীয় বিশ্বজয়  
সম্ভার, যে জাতীয় জীবনের জ্ঞানগুরু, আমরা তোমাকে  
অর্থা প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। বন্দোবস্তময়।



তোমার গুণপূর্ণিত কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য-  
রূপের পক্ষে শ্রীবিধানচন্দ্র রায়, মেয়র।

এই অভিনন্দনের উত্তরে কবি বলেন, একদা কবির  
অভিনন্দন রাজার কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাহার  
আপন রাজমহাশয় উজ্জ্বল করিবার জন্তই কবিকে সমাদর  
করিতেন, জানিতেন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কবিকীর্তি  
তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকালে প্রসারিত।

আজ ভারতের রাজসভার দেশের গুণিজন অধ্যাত—  
রাজার ভাষায় কবির ভাষায় গৌরবের মিল ঘটে নাই।  
আজ পুরসভা স্বদেশের নামে কবিসম্মানের ভার লইয়াছেন।  
এই সম্মান কেবল বাহিরে আমাকে অবদান করিল না,  
অন্তরে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিল।

এই পুরসভা আমার জয়নগরীকে আরামে আরোণে  
আত্মসম্মানে চরিতার্থ কান, ইচ্ছার প্রবর্তনার চিত্রে,



রবীন্দ্রনাথ

স্বাপত্তো, গীতকলায়, শিরে এধানকার লোকালর নন্দিত  
হউক, সর্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলর  
এই নগরী খালন করিয়া দিক—পুরবাসীদের দেহে শক্তি  
আসুক, দূতে অঙ্গ, মনে উজ্জ্বল, পৌরকার্যসাধনে

আনন্দিত উৎসাহ, ভাড়াবিবোদের বিঘাত আঘ-হিসার  
পাপ ইহাকে কদৃশিত না করুক—তৎপুঙ্খি দ্বারা এধান-  
কার সকল জাতি, সকল ধর্ম-সম্প্রদায় সমিলিত হইয়া  
এই নগরীকে চরিত্রকে অমণি ও শাস্তিকে আবিস্কৃত  
করিয়া রাখুক এই আমি কামনা করি।

### উৎসব-সমিতির অর্থ্য

অতঃপর রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পরিষদের পক্ষ হইতে  
শ্রীযুক্ত বিমলেশ্বর শাহী নিম্নলিখিত মহ উদ্বোধন করিয়া  
কবিকে অর্থদান করেন। কবিকে দুগ, দীপ, শব্দ,  
মূর্ত্তিলাল, চন্দন এবং সন্ধান পুষ্পোপাচারে অর্থ্যপ্রদান  
করা হয়। কয়েকটা বালিকা অর্থ্যদানস্বরূপ দ্বালিগুলি  
কবির নিকট বহন করিয়া লইয়া যান এবং সেগুলি কবি  
খিত্যভাস্তরকারে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করেন।

এতচ্চলনমস্ত্র শীলমিব তে চন্দ্রোজ্জ্বল, শীতলঃ

দীপোহয়ঃ প্রতিভাপ্রভাব ইব তে কাশঃ

দ্বিগঃ দীপ্যতে।

বৃন্দোহঃ তব কীর্তিসমুদ্র ইবামৌলিন্দ্রেশো

ব্রাহ্মতে

মালাঃ নির্ঝলকোমলাঃ তব মনস্তথাঃ সমুদ্রাশিতঃ॥

কথস্থাপিতমৈতদ্বৎসলঃ কাব্যো দ্বীপঃ দ্বা

পুষ্পশোণিতঃ গুণানিবিব তে পুষ্পজ্ঞানকমিণী

অর্থ্যঃ ভাবামদ্যঃ কৃত্যঃ তব কৃতে,

দুর্দীভুগাণ্ডিত্য

নমোহং প্রতিগৃহত্যঃ কমণ্ডায়া সত্যতঃ তে

শাস্তবতঃ॥

আপনক শীলের ছায় এই চন্দন চক্রে মত উজ্জ্বল ও  
শীতল, আপনার রমণীর প্রতিভাপ্রভাবের ছায় এই দীপ  
বিরাভবে দীপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে। আপনার কীর্তিরাশির ছায়  
এই দুগ-সৌরভ সমস্ত দিক্কে বাস্তু করিতেছে।  
আপনার মনের ছায় নির্মল ও কোমল এই মালা উদ্ভাসিত  
হইয়া রহিতেছে। আপনার কাব্যের ছায় সমগ্র এই জগৎ  
শব্দে স্থাপিত কর্তা হইতেছে এবং আপনার গুণসমূহের  
ছায় এই কুহুমগুলি দর্শকগণকে আকর্ষণ করিতেছে।

দুর্দীপ অন্ধুর অন্ধতির দ্বারা আমরা আপনার জগৎ এই  
অর্থ্য রচনা করিয়াছি। আপনি স্বপ্না করিয়া ইহা গ্রহণ  
করুন। আপনার শাস্ত কুণল হউক।

### প্রণতি পাঠ

ভেদো যজ্ঞ ন চ স্বতোহতি ভুবনে প্রাচী-

প্রাচীতাতি বা

মিথোঃ প্রকটীকৃত্য চ সত্যং যেনোদয়ঃ কর্মণা।

বিধঃ যজ্ঞ পথাঃ প্রসিদ্ধমনিশা সত্যো চ বস্যা

স্থিতিভূত্যাং তদা জগো রবেববিতস্তঃ তেনো

তৃপ্তঃ জগতঃ॥

বাঁহাং প্রাচী ও প্রাচীটা বলিয়া ভুবনে স্বস্ত্য কোমো  
ভেদ নাই, যিনি সত্য নিগের কথের দ্বারা প্রকটিত  
কার্য্যরূপে যে তিনি মিত্র, বিধই বাঁহাং প্রসিদ্ধ হান এবং  
সত্যই যিনি নিয়ত অবস্থান করেন, সেই রবির অবিরামে  
জগৎ হউক ও তাহা দ্বারা জগৎ তৃপ্তি লাভ করুক।

### শাস্তিপাঠ

পৃথিবী শাস্তিরদ্বারাঃ শাস্ত্রজ্ঞো শাস্ত্রনারায়ণঃ

শাস্তি রোবদয়াঃ

শাস্তিবিধে নো দেব্যাঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ

শাস্তিভিঃ।

তাভিঃ শাস্তিভিঃ সর্গশাস্তিভিঃ শমসামোদয়াঃ

যদিহ যোরাঃ

সমিহ কুরঃ যদিহ পাপাঃ তচ্ছবঃ সর্বমেষ

শমন্তনঃ॥

পৃথিবী শাস্তিময় হউক। অস্ত্রীক শাস্তিময় হউক।  
দ্রাক্ষক শাস্তিময় হউক। জল শাস্তিময় হউক। ওয়ি-  
সমুদ্র শাস্তিময় হউক। বিশ্বদেবগণ আমাদের জন্য শাস্তিময়  
হউন। এবাণে বাহা কিছু ভাবনক, বাহা কিছু কুর, বাহা  
কিছু পাপ তাহা আমরা সেই সকল শাস্তি দ্বারা, সমস্ত  
শাস্তির দ্বারা উপশমিত করি। তাহা শাস্ত হউক। তাহা  
শিব হউক, সমস্তই আমাদের কল্যাণকর হউক।

### বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ

অতঃপর আচার্য্য প্রমুখচন্দ্র রায় বঙ্গীয় সাহিত্য-  
পরিষদের পক্ষ হইতে কবিকে নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র  
প্রদান করেন:—

হে কবীন্দ্র, স্বদেশের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় সাহিত্য-  
পরিষৎ ভবনীয় সম্মতিতম জ্ঞাত্তি-উপলক্ষে সাদরে ও  
ও গৌরবে আপনাকে বরণ করিতেছে।

কিশোর বয়সেই আপনি বঙ্গবাসীর অর্জনায় আত্মনিয়োগ  
করেন। তদবধি ব্রতধারী তপস্বীর ন্যায়, হুত্রিকাল নিয়ম  
ও নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত-অকুণ্ঠভাবে তাহার আরাধনা  
করিয়াছেন। হে তাপস, আপনার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে—  
দেবী আপনার শিরে অমর-বর বর্ষণ করিয়াছেন—আপনার  
জিত্ত্বীতে তাহার অমৃত-বাগীর অভয় সূক্ষ্মন সঙ্গারিত  
করিয়াছেন। হে বরাভয়মণ্ডিত বনৌষী, আপনি শতাব্দী  
হইয়া, এই যৌনিন্দ্রার নিমন্ত্রণ-বাহিনী প্রাণে বীরা ও বলের  
প্রেমণা দ্বারা, তাহার স্বপ্ন চেতনাকে প্রবৃত্ত করন এবং  
প্রতিভার কল্লোলকে বিরাট করিয়া, মুক্তহস্তে প্রাচ্যকে  
ও প্রাচ্যকে নব নব স্রব্যা ও গৌরব, কল্যাণ ও  
আনন্দ বিতরণ করুন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ উনচত্বারিংশ বৎসর ব্যাপিয়া  
আপনার উপচার্যমান স্তম্ভ সাহিত্য-সম্পদে বিপুল গর্ভ  
অবতর করিয়াছে। আপনার বক্তৃতার মর্মে ইহার আজ  
বাগিক উৎসব মন্ত্রিত হইয়াছিল। আপনার পঞ্চাশবৎসর  
পূর্ণ হইলে পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া কৃতজ্ঞ  
হইয়াছিল। আবার আপনার শ্রমণীয় ব্যতিক্রম জন্মদিনে  
সম্মানীয় সন্তান সজ্জিত করিয়া পরিষৎ আপনাকে সম্বরণে  
অর্থ্য নিবেদন করিয়াছিল। কবি-জীবনের সেই সেই সন্ধিক্ষেপে  
উজ্জ্বলিত পরিষদের উত্তরাণা ও আকাজকা আপনার কীর্তি-  
ভাজিত সম্মান হইয়া আজ সফলতার উপ-ভূমিতে আরোহণ  
করিয়াছে। প্রথম আপনি বিনয়র গুণ-স্বপ্নের মধ্যে সত্যের  
শাস্ত স্বরূপকে দর্শন এবং, বসন্তের মধ্যে অশ্রু, বিভক্তির  
মধ্যে সমগ্র, ব্যস্তির মধ্যে সমগ্র, বহর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান  
পাইয়া যথার্থাভিলষক ভারতের সনাতন আদর্শকে ভাগীরথা-

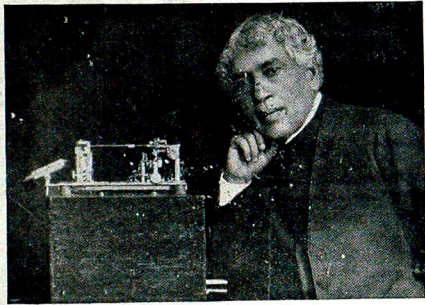


ধারার জায়গাতে আবার অবতীর্ণ করাইছেন। হে সত্যজিৎ, আপনাকে শত শত নমস্কার।

হে বাণীর বরপুত্র, হে বিশ্ববরেন্দ্র কবি, “বর্ণ-গুরু-গীতম্বর” এই বিচিত্র বিধি যাহার স্বরভিষাগ, কবি-কবিরদের “দী-র” অভ্যন্তরে মুগ্ধিত প্রেম-প্রজ্ঞা-প্রতাপ যাহার সং-চিত্ত-আনন্দের প্রজ্জ্বল আভাস, সেই শব্দর বিশ্বস্তর বিখকবি আপনার চিরযশি ও শান্তি বিধান করুন; যৎ ভবন্তং তদ বা আ স্ববন্ত; আর, স বা বুদ্ধা তত্ত্বা সত্যানন্ত্।

॥ ঐ যশি ॥ ঐ যশি ॥ ঐ যশি ॥

কালকে উজ্জল করিলেন, এই কথা বিনয়নন্দ আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইল।



আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র

উত্তরে কবি বলেন, “সাহিত্য-পরিষদের প্রথম আরম্ভ-কালেই এই প্রতিষ্ঠান আমার অন্তরে অভিমদন লাভ করিয়াছিল—এ কথা-তাঁহারা সকলেই জানেন, যাঁহারা ইহার প্রবর্তক। আমার অকৃত্রিম প্রিয়বৃন্দ “রামেন্দ্রসুন্দর জিবৌ অক্সাণ্ড অধ্যাবসারে এই পরিষদকে প্ৰভবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে বিচিত্র আকারে পরিপাতি দান করিয়াছেন। একদা আমার পঞ্চাশবাৎসরী জয়ন্তীসভায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্বোধনী এবং সেই সভায় তাঁহারই সিদ্ধ হস্ত হইতে আমার বরেন্দ্র দক্ষিণা আমি লাভ করিয়াছিলাম, পরিসরের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী বর্তমান জয়ন্তী উৎসবের সূচনা সভায় সভানায়কের আসন হইতে প্রশংসাবাদের দ্বারা আমাকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ দান করিয়া গিয়াছেন। আমি অমূল্যব করিতেছি এই মানপত্র। আমার পরলোকগত সেই সঙ্গম স্রষ্টাদের অলিখিত স্বাক্ষর রহিয়াছে, যাঁহাদের হস্ত অস্ত স্তব—যাহাদের বাণী নীরব।

অদ্য পরিষদের বর্তমান সভাপতি সর্গজন-বরণে জননায়ক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই যে মানপত্র সমর্পণ করিয়া আমাকে ঘোরাব্যতি করিলেন, এই পত্রের সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গ-ভারতীর বরদান বহন করিয়া আমার জীবনের দিনান্ত

হিন্দী সাহিত্য-সংগলন

তৎপরে পণ্ডিত অধিকাংশার বাজপেয়ী হিন্দী সাহিত্য-সংগলনের পক্ষ হইতে কবিকে নিরলিখিত অভিনন্দনের দ্বারা সাংগঠিত করেন—

“শ্রীকবীন্দ্র শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়!

মাননীয় মহোদয়,

হিন্দী সাহিত্য-সংগলনের পক্ষ হইতে আপনার সমুচিত্ত প্রাপ্তির অবসরে আমরা আপনাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি এবং আপনাকে শ্রদ্ধাজলি প্রদান করিতেছি।

শ্রীমান, ভারতবর্ষে অনেক প্রতিভাশালী এবং প্রভাব-শালী কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পৃথগ্ পন এবং সম্মানের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছেন। রাজপুত্রনার চারপ-কবিগণ অনেক সাংগঠিক কবিত্বপূর্ণ উপদেশ দ্বারা ইতিহাসের স্বরূপ পৃথগ্ বদনাঁয়া দিয়াছেন। সেইরূপ হিন্দী-কবিগণ যোগেশ-সম্রাটকে পৃথগ্ত নিজেদের কবিতার চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাকবি ভুবন তো আপনার কবিতার দ্বারা হিন্দুরাজ্য পুনঃ সংস্থাপনে প্রভূত সাহায্যই করিয়াছিলেন। আপনিও আপনার বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি প্রভাবে স্পৃহনীয় নোবেল-পুরস্কার লাভ করিয়া ভারতের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

কবীন্দ্র! আপনি বিশ্বভারতী স্থাপন করিয়া প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে সশ্রমণের জল্প যে কেন্দ্র প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে আপনার কী-চিৎকৌমুদী চতুর্দিক আলোকিত করিয়াছে। আমাদের সভ্যতার প্রতিনিধি-রূপে আপনি ইউরোপে ও এশিয়ার দেশসমূহে যে প্রকারে ভারতের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, সেজন্ম আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।

আমরা পুনরায় আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি এবং পরমাশ্রায় নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন।

উত্তরে কবি বলেন—“আজ হিন্দী ভারতীয় মহোদগণ বঙ্গ-ভারতীকে সম্মানিত করিলেন। দৈব রূপাতে আমি এই শুভ অমৃত্যনের উপলক্ষ যে হইতে পারিয়াছি, এজন্য আমি নিজকে ধন্য মনে করিতেছি। কবির দ্বন্দ্ব কখনও আপনার জন্মস্থানের সীমার ভিতর বদ্ধ থাকিতে পারে না, আর যদি তাঁহার বশ: ঐ সীমা অতিক্রম করে, তাহা হইলে তিনি সৌভাগ্যবান। হিন্দী-সাহিত্যের দৃঢ়রূপে আপনারা আমার এই সৌভাগ্য বহন করিবার জন্য আসিয়াছেন, এজন্য আপনাদের আমার সন্তুষ্টি-নকস্কার গ্রহণ করুন।”

প্রবাসী

বঙ্গ-সাহিত্য-সংগলন

ইহার পর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সংগলনের পক্ষ হইতে

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী কবিকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং নিরলিখিত কবিতার দ্বারা অভিনন্দিত করেন।—

হে কবি! জয়ন্তী-অর্ণব নিয়ে হাতে

তোমার হরণে

স্বপ্ন প্রবাস হ'তে এই পথে, কবি নিবেদনে,  
এলো যারা, সে কি তারা বয়সের দাবী

কেন তব ?

তা তো নয়, দেখি রূপ, অপূরণ,

চির অভিনব;

বয়সের দীক্ষা তব, নিত্য নব নর্দনের কোলে,  
সমুদ্রিত বয়সের বৃক্ষে, সাত বয়সের

শিশু দোলে

সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন; সময়ের হিসাব না রাখে  
বিস্তৃত বিশ্বের মন তার পানে চেয়ে

শুধু থাকে।

কার চোখে এত দীপ্তি ? কার বাণী

নিত্য বহমান ?

কার প্রীতি নিতি নিতি, রচি চলে

বিশ্বের কল্যাণ

অরুণ প্রাণ-রসে; সে যে এই শিশু

চিরস্থনী,

যুগে যুগে হে প্রবীণ! গাধ নবীনদের

জরজ্বলি।

বাগদার বৃক্কের ছালা! সত্যজিৎ!

হে অমর কবি!

কালক্ষয় করে ভূমি জয় গেয়ে বেও

স্বপ্নের পূর্ববী।

চির-সমুজের সমারোহ নিত্য হোক

জীবনে তোমার,

প্রাণের তাগবাসা-ভরা ধর এই

অর্ণব উপচার।



ইহার পর আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার বেকিন্স আমেরিকাবাসীরা পক্ষ হইতে কৃষির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অতঃপর জর্জস্ট্রী-উৎসব-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কামিনী রায় নিয়োগিত অর্থ পাঠ করেন।

কবিশুদ্ধ,  
তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিষয়ের সীমা  
নাই।

তোমার সমুচিত্তম-বর্ষ শেষে একাধ্বনে প্রার্থনা করি,  
জীবন-বিধাতা তোমাকে শতাব্দী দান করুন; আত্মিকার  
এই জর্জস্ট্রী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।

বাল্লভ দেবী আজ গানান স্পন্দ করিয়াছে। বঙ্গের কত  
কবি, কত শিল্পী, কত না সবেক ইহার নির্মাণকল্পে প্রাণ-  
সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন; উহারেবর্ণনা ও সাধারণ  
মনে, তাহাদের তপস্বী তোমার মধ্যে আজ সিদ্ধিলাভ  
করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সাহিত্যাচাৰ্যগণকে তোমার  
অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আম্বার নিপুণ রস ও শোভা কলাগাণ্ড ও ব্রহ্মণ্য তোমার  
সাহিত্যে পূর্ণ-বিবেচিত হইয়া বিধকে মুগ্ধ করিয়াছে।  
তোমার স্মৃতি সেই বিচিত্র ও অপূর্ণ কালোকে  
স্বকীর চিত্রের গভীর ও সত্য-পরিচয়ের রক্তকণ্ঠ্য হইয়াছে।  
হাত পাতিয়া জগতের কাছে আশ্রয় নিয়াছি অনেক,  
কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছি অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শাস্তমনে  
নমস্কার করি। তোমার মধ্যে স্বকরের পরম প্রকাশকে  
অজ্ঞা বারধার নবশিরে নমস্কার করি। "ইতি।"

রবীন্দ্র-জর্জস্ট্রী-উৎসব-পরিষদের পক্ষে  
শ্রীকমলাদাস চন্দ্র বসু, সভাপতি।

উত্তরে কবি বলেন,—“বিপুল জনসমূহের একটি-সময়ে  
আজ আমি শুভ। এখানে নানা কণ্ঠের সম্ভাষণ, এ যে  
আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য একথা আমার মনে সঘর্ষে  
ও সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম। স্বর্গের আশ্রয়  
বাসাসিক দুর্ভিক্ষবীর্য বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়া পৃথিবীতে  
পরিব্যাপ্ত হয়, কোথাও বা সে ছায়ার রান, কোথাও বা  
সে অন্ধকারের দ্বারা প্রভাতাখ্যাত, কোথাও বা সে বাসনা

আকাশে সমুজ্জ্বল, কোথাও বা পুষ্পকাননে বসন্ত তাহার  
অভ্যর্থনা, কোথাও বা শতক্রেত্রে শরতে তাহার উৎসব।  
দৈবরূপার আমি কবিরূপে পরিচিত হইয়াছি; কিন্তু  
সেই পরিচয়ের স্বীকার দেশবাসীর জন্মে অবজ্ঞার  
নহে, তাহা স্বভাবতই বাধাবিরোধ ও সংঘরের দ্বারা কিছু  
না কিছু অবগুণ্ঠিত। তাহাকে বিকলিত হইতে সংক্ষিপ্ত  
করিয়া, আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া এই জর্জস্ট্রী অষ্টাদশ  
নিবিড় সংস্কারে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া দিল—সেই সঙ্গে  
উপলব্ধি করিলাম, দেশের জীতিপ্রসঙ্গ দ্বন্দ্বকল্প—তাহার  
অপান অগ্রাহ্য বিরাটরূপে। সেই আশ্চর্যরূপ দেখিলাম  
পরম বিষয়ের, আনন্দে, স্রবণের সঙ্গে, মস্তক নত করিয়া।

অজ্ঞকার এই প্রকাশ করল যে আমারই কাছে অপূর্ণ  
অপূর্ণ তাহা নহে, দেশের—নিজের কাছেও। উৎসবের  
আয়োজন করিতে গিয়াই দেশজী সম্ভাষা আবিষ্কার করিয়া-  
ছলাম, তাহার গভীর অন্তরের মধ্যে কতটা আনন্দ, কতটা  
প্রীতি নানা ব্যবধানের অন্তরালে অজ্ঞ সংজ্ঞিত হইতেছিল।  
আবারকাল দেশমাতার প্রাণের গাহিয়াই আমার কণ্ঠ-  
সাধনা। মাঝে মাঝে যখন মনে হইতে উদাসীন তিনি,  
তখনো বৃষ্টিয়া তাহার অগোচরেও হ্রস্ব পৌষিহা ছিঁটা  
অন্তরে; যখন মনে হইয়াছে তিনি মুখ বিরাইয়াছেন,  
তখনো হয়ত তাহার শ্রবণবার কক্ষ হয় নাই। ভালো ও  
মন্দ—পরিণত ও অপরিণত, আমার নানা প্রয়াস তিনি  
দিনে দিনে মনে মনে আপন স্মৃতিহরে গাথিয়া লইতে  
ছিলেন। অবশেষে সস্তর বস্তুর বহলে বহন আমার আশ্রয়  
উজ্জীব হইল, যখন তাহার সেই মাগার শেষ গুহি দিবার  
সময় আগম, তখনই আমার শীর্ণ জীবনের চোঁটা তাহার  
পুষ্টিমুখে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণপ্রায়। সেইজন্মই তাহার এই  
সত্য সত্যের আমরণ, বিশ্বস্তরে তাহার এই বাণী আজ  
উচ্চারিত—আমি গ্রহণ করিলাম।" সম্ভার হইতে বিদায়  
লইবার দ্বারের কাছে সেই বাণী স্পষ্ট ধ্বনিত হইল আমার  
হৃদয়ে। ক্রটি বিস্তর আছে, সাধনার কোন অপরাধ ঘটে  
নাই, ইহা একেবারে অসম্ভব; সেইগুলি বৃষ্টিয়া বৃষ্টিয়া বিচার  
করিবার দিন আজ নহে। সে সমুদ্রে অতিক্রম করিয়াও  
আমার কর্মের যে সত্যরূপ, যে সম্পূর্ণতা প্রকাশমান তাহা-  
কেই আমার দেশ তাহার আমরণ সামগ্রী যথাস্থি চিহ্নিত

করিয়া লইলেন। তাহার সেই স্বীকারই এই উৎসবের  
মধ্য দিয়া আমাকে বরদান করিল। আমার জীবনের  
শেষ বর্ষ, এই শ্রেষ্ঠ বর্ষ।

অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা স্তুরূপে ক্রমগত  
মতোই, উভয়েই যোগে রাজির পূর্ণ আয়ুপ্রকাশ। আমার  
জীবন নিষ্ঠুর বিরোধের প্রকৃত দান হইতে বাক্ত হয় নাই,  
কিন্তু তাহাতে আমার সমগ্র পরিচয়ের কতি হয় না, বরঞ্চ  
তাহার বা শ্রেষ্ঠ বা সত্য তাহা স্থগিত হইয়া উঠে। আমার  
জীবনেও যদি তাহা না ঘটিত, তবে অজ্ঞকার এই দিন সার্থক  
হইত না। আমার আশাতপ্রাপ্ত শরৎকাল ব্যাতিরিক্ত মধ্য-  
দিয়া এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাই আমার  
শুভ ও ক্রম উত্তর পক্ষেই তথিকো প্রমাণ করা আমার  
পক্ষে আজ সম্ভব হইল। যে ক্ষণের দ্বারা ক্ষতি হয় না, তাহাই  
বিষাভার মনঃদান—জগতের দিনেও যেন তাহাকে চিনিতে  
পারি, শ্রদ্ধার সহিত যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা  
নহে না।

পরিচয়ে "গোল্ডেন বুক অব টেম্পোর" কমিটির পক্ষ হইতে  
উক্ত কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবিকে  
উক্ত গ্রন্থ উপহার প্রদান করেন।

অন্তপের "বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল" গানটি স্রমবহু  
কণ্ঠ গীত হইবার পর অষ্টদ্বিতীয় পরিসমাপ্তি ঘটে।

#### ছাত্রজীবনের অভিনন্দন

সেন্ট হলে ছাত্র ও ছাত্রীকৃষি কবি যে সম্বন্ধনা করেন,  
তাঁহার উত্তরে কবি প্রথমে মুগ্ধ মুগ্ধ কিছু বলিয়া পরে এই  
স্মৃতি প্রতিভাবাদ পাঠ করেন—

"সে-সময়ে প্রথম কবি মেলেছিলাম, সে ছিল অতি  
নিম্নত। শহরের বাইরে শহরতলীর মত, চারিদিকে প্রাচীন  
বন্যের ঘর-বাড়িতে কলরবে কাশাকাশীকে আঁট করে  
বাধে।

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের  
নোঙর তুলে পথে ধাওয়াটারে বাইরে এসে ভিড়ছিল।  
আচার অধ্যয়ন ক্ষিপ্রাক্ষরে সোপানে সমস্তই বসে।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার  
ছিল গোষ্ঠিকতক ভাড়া চাল, বর্ষা ও মরচে-পড়া তলোয়ার-

বাটোনে কেউই, ঠাকুর-দালান, তিন চারটে-উঠান, সব  
জনদের বাগান, সবসবের গলাফল ধরে রাখবার মোটা  
মোটা জাল-সাজানো, অন্ধকার ঘর।" পূর্ণবয়সের নানা  
পালাপালিরে পর্যায় নানা কলরবে সাজসজ্জার তার  
মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল ক'রেছিল, আমি তার স্মৃতিরও  
বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসার তখন  
পুরাতন কাল সজ্জা বিহারী মনেতে, নতুন কাল সবে এসে  
নাগল, তার আদ্যবাসজ তখনও এসে পৌছায়নি।

এ বাড়ি থেকে এদেশীর সামাজিক জীবনের স্রোত  
যেমন সরে গেছে, তেমনি পূর্বতন ধনের স্রোতেও পড়েছে  
ভাঁটা। পিতামহের প্রথমদীপাবলী নানা শিখায় একসা  
এখানে শীপমান ছিল, সেদিন বাকী ছিল দলন-পেয়ের  
কালো ধাপগুলো, আর ছাই, আর একটামাত্র কম্পান  
ক্ষীণ শিখা। প্রচুর উপকরণমাসকী পূর্বকাল্পে  
আমোদ-প্রমোদ বিলাস-মহারোহের সরস্বতা কোথো  
দুলিমান জীর্ণ অবস্থার কিছু কিছু বাকী যদি বা  
থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে  
জমাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।

এই নিরাশ্রয়, এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল  
সে স্বাভাবিক—মহাদেশ থেকে দুর্ভিক্ষের ধীরে  
গাঢ়পালা জীবাঙ্কুরই তাহার মূল। তাই আমাদের  
ভাষার একটা কিছু ভঙ্গী ছিল, কলকাতার লোক বাকে  
ইমারা কানে বগত ঠাকুর বাড়ির ভাষা। পূর্ণ্য ও বেরে-  
সেরে বেরকাতোও তাই, চালচলনেও।

বাংলা ভাষাটিকে তখন শিক্ষিত সমাজ অন্তরে বেরে-  
বেরে হৈলে বেরেছিলো, মনে বারবার হ'ত ইয়েকী—  
চিঠিপত্র, লেখাপড়া, এমন কি, মুখের কথা। আমাদের  
বাড়িতে, এই বিকৃত ঘটেত পাতেনি। সেখানে বাংলা  
ভাষার প্রতি অমরা ছিল স্থগীত, তার ব্যবহার ছিল  
সব কালে জেগে।

আমাদের বাড়িতে আর একটা সমাবেশ হইছিল  
সেই উপলক্ষেযোগে। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক-  
পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল  
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বালাকালেই প্রায় প্রাচীনদৈব নিষেধ  
উজ্জ্বলে অনর্গল আনুভূতিক করেই উপনিষদের স্রোত।



এর থেকে বুঝতে পারা বাবে সাধারণতঃ বাংলাদেশে কৃষকশ্রমজীবী ভাবাবেগের: যে উদ্বেলতা আছে, আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করেনি। নিতুলসেবের প্রাণবন্ত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিতি।

এই যেমন একদিকে যেমন অন্ধকৈ আমার গুণ-জনদের মধ্যে ইংরেজী-সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্ষণীয়রের নাট্যরস-সম্বোধে আন্দোলিত, মার গলাগাটার স্বরের প্রভাবও প্রবল। দেশ-প্ৰীতির উদ্গারনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলাগের 'স্বাধীনতাসহীনতার কে বাঁচিতে চায়নে' আর তারপরে হেটমস্কের 'বিশিষ্ট কোটি মানবের বাস' কবিতার দেশ-মুক্তি-কামনার স্বর ভোরের পাকীর কাকলীর মত শোনা যায়। হিন্দুমেবার পরামর্শও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উদ্যোহিত, স্নেহ প্রদান কর্তৃকর্তী ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেঘার গান ছিল মেঘদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়" গদ্যদ্বারা লেখা "লজ্জার ভারত-বন্দ গাইব কি করে" বড়দাদার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভাগত ছিল ছড়া বার্য্য বানাতে পারত তাদের দেগে এমন তোমারি।" জ্যোতিষাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন ক'রেচেন, একটি গোঁড়াবাড়িতে তার অধিবেশন, ধর্ম্মবেদের পুঁথি আর মন্ডার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অস্থান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমার ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পোষাম।

এইকাল বাংলা উন্মাদ উন্মাদে এরা কিছুই ঠোকাঠি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ ক'রেছিল। রাজসরকারের কোতোয়াল, হয় তখন সর্ক ছিল না, নয় উদ্যোগী ছিল, তারা সভ্যর সভ্যদের মাথার খুলি ভর্য্য রাসসর করতে আসেনি।

কলকাতা শহরের বক তখন পাথরে বানান হয়নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেল-কলের ধোঁয়ার আকাশের মধ্যে তখনও কালী পড়েনি। ইমারত-অগণের কাঁচা কাঁচার পুঞ্জের জলের উপর স্বর্গের আলো ঝিকিয়ে বেত, বিকল বেলায় অশবের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় চলত নারকেল গাছের পত্র-খালস, বাঁধা নাড়া বেয়ে গঙ্গার জল স্রবণর মত স্বরে পড়ত আমাদের

দক্ষিণ বাগানের পুরুষের, মাঝে মাঝে গলি থেকে পাখী বেহাওয়ার হাইহাই শব্দ আসত কানে, আর বড় রাস্তা থেকে সহস্রের হেইও হাঁক, সন্ধ্যাবেলায় জ্বলন্ত তেলের প্রদীপ, তারই কীণ আলোর মাজর পেতে বড়ী দাগীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিতুলজ্ঞার রগতের মধ্যে আমি ছিলাম এক কোণের মাহু, লাছু, নীরল, নিশ্চঞ্চল।

আরও একটা কারণে আমাকে খাপছাড়া করেছিল। আমি ইংল-পালানো ছেলে, পরীক্ষা দেইনি, পাগ করিনি, মাস্টার আমার ভাবী কালকে সম্বন্ধ হতখাস। ইংল-বরের বাইরে যে অকল্যাণ্টা বাধাহীন, হেঁথানে আমার মন হাংবরের মত বেরিয়ে পড়ছিল।

ইতিপূর্বেই কোন্ একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলাম, লোকে বাকে বলে কবিতা, সেই চন্দ-মোশানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন দিনও এমন ছিল ছড়া বার্য্য বানাতে পারত তাদের দেগে থেকে বিস্মিত হ'ত। এখন যারা না গানে তারাই অসাধারণ বলে গণ্য। পয়ার ত্রিংশদী-মহলে আপন অবাধ অধিকার-মোদের অস্বাভ উদ্যোগে লেখায় মাদুস। আট অক্ষর, ৬য় অক্ষর, দশ অক্ষরের টোকো-টোকো কত রকম শব্দ তাগ নিয়ে ঢল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাগ্যভার পেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।

এই লেখাগুলি যেমনই হোক, এর গিছনে একটা ভূমিকা আছে—সে হচ্ছে একটা বালক, সে কুণ্ডো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইংলুগের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হাল্কা। পিতৃদের ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিষাদা, থাকে আমি সকলের চেয়ে মানুস, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোন বাধন পরাননি, তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর করেছি বরজের মাঝ। তিনি বালককেও অশ্রা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার

চিত্ত-বিকাশের সহায়তা করেচেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার উৎসাহ' যদি দোঁরাহা করতেন তাহলে তেলুগুরে তেড়েবেকে যা-হর একটা কিছু হকুম, সেটা হস্ত ভ্রাম্যমাঞ্জের সম্ভাব্যজনকও হ'ত, কিন্তু আমার মত একবারেই হ'ত না।

হুক হ'ল আমার ভাগা ছন্দে টুকরো কাবের পানা, উন্মাদীর মত; বালকের 'বা-তা' ভাবের এলোমেলো কাণ্ড গাথনি; এই রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজাগত। এতে যথেষ্ট বিপদের শঙ্কা ছিল। এখানেও অপঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। তার কারণ আমার ভাগ্যক্রমে সকালে বাংলা সাহিত্যে ব্যাতির হাটে ভিড় ছিল অতি সামান্য—প্রতিযোগিতার উত্তেজনা উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠেনি। বিদ্যারম্বের দণ্ড থেকে অগ্রসর আর প্রিয়র আঘাত নামত, কিন্তু কটুটি ও কুংসার উত্তেজনা তখনও সাহিত্যে ঝাঁকিয়ে ওঠেনি।

সৈদিকার অরুণাথ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বরষে সব চেয়ে ছোট, শিকার সব চেয়ে ক'তা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-বঁটা, লেখবার বিঘ্ন ছিল অক্ষুট উজ্জিত স্বাধা, ভাবার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা যুগের কথা বা লেখার প্রায়ই আমাকে প্রশ্নর দেননি,—আধ-আধ বাধো বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদ্ম্বকের নয়, সেটা বিদ্যাব্যাবসায়ের অঙ্গ ছিল না।

তাঁদের লেখার শাসন ছিল, অসৌজ্ঞ ছিল না লেশমাত্র। বস্তুতঃ যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিবেক দেখা দেয়নি। তাই প্রশ্নেরে অভাব সঙ্গেও বিরুদ্ধরীতি মধ্য দিয়েও আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেন।

সৈদিকার গাথাহীনতার বিধ প্রথম প্রশ্নের কটে গেল। প্রকৃতির স্তম্ভিত্য ও আদ্যীরদের মেঘের ঘনজায়ায় ছিলেম দ'সে। কখনও কাটিয়েছি তেভাগার ছাদের প্রান্তে কন্থহীন অবকাশে মনে মনে আকাশ-কুহুমের মাথা পেঁপে, কখনও গাঝিপূরের রক্ত নিমগাছের তলায় ব'সে ইদারার জল বাগান সেঁচ দেবার কর্পাধানি অন্তত তনতে অঙ্গর গঙ্গার স্রোতে বরনাকে অহুতুক

বেদনার বোকাই ক'রে দুপে ভাষিয়ে দিয়ে। নিজের মনের আলো-আঁধারের মধ্য থেকে হঠাৎ পরের মনের কুহুমের দাঙা খাবার জন্মে বড় রাস্তার বেরিয়ে পড়তে হবে এমন কথা যেমনি ভাবিওনি? অবশেষে একদিন গ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাকুরোজে তেনে বের করলে। তাপ ক্রমেই বেরে উঠল, আমার কোণের আলার একবারে ভেঙে গেল। ব্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্তরের চেয়ে তা অনেক বেশী আবিল হ'য়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরণ, এমন অপ্রতিহত অসমাননা আমার মত আর কোনো সাহিত্যিককেই সহিতে হয়নি। এও আমার গ্যাতি-প্রিয়মাপের বৃহৎ মাপকাঠি। এ কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি তে, প্রতিফল পরীক্ষার ভাগ্য আমাকে লালিত করেছে, কিন্তু পরাভবের অগোরবে লালিত করেনি। এছাড়া আমার হুগ্রেই কালো বর্ষের এই যে পটীত ঝুপিয়েছেন এরই উপরে আমার বৃদ্ধদের সুপ্রসার ধূম সম্মল হয়ে উঠেচে। তাঁদের সংখ্যা অল্প নয়, সে কথা বুঝতে পারি আজকের এই অস্তানোই। বৃদ্ধদের কাউকে জানি, অনেককেই জানিনে, তাঁরাই কেউ কাছে থেকে কেউ দূরে থেকে এই উদ্ভব-মিলিত হয়েছেন, সেই উদ্ভবে আমার মন অভিনন্দিত। আজ আমার মনে হচ্ছে তাঁরা আমাকে হাঠাৎ তুলে দিতে যাচ্ছে এগে ঠাকুরেচেন—আমার খোঁজাতীরা পড়ে দিবে দিবালোকের পরপারে তাঁদের মঙ্গল-ধারি কানে নিয়ে।

আমার কর্পাধের যাত্রা সত্তর বছরের গোমুখি-বেলায় একটা উপসহায়ে এসে পৌঁছল। আলো মান হবার শেষ মুহুর্তে এই জ্বলন্ত-অস্ত্রাতনের দ্বারা দেশ আমার দীর্ঘজীবনের মধ্য স্বীকার করলেন।

ফল যতদিন নাঠে ততদিন শংখ থেকে যায়, বুদ্ধিমান-মহাজন কেতের 'শিকে তাকিয়েই আগাম দান দিতে দিখা করে, অনেকটা হাতে রেখে দেয়। ফল যখন গোলায় উঠল তখনই ওজন বুঝে দামের কথা ক'লা হ'তে পারে। আজ আমার বুঝি সেই ফল-শেষের হিসাব চুকিয়ে দেবার দিন।



যে মাছের অনেক কাল বেচে আছে সে অতীতেরই  
সামি। বৃহত্তে পারিত আমার সাধকে বর্তমান এই  
হাল বর্তমান থেকে বেশ ধানিকটা তফাতে। যে সব  
কবি পালা শেষ করে লোকান্তরে, তাদেরই আনিবার  
কাছটার আমি এসে দাঁড়িয়েছি তিরোভাবের দ্রিক  
পূর্ণসীমানার। বর্তমানের চন্ডি রথের বেগের মুখে  
কাউকে বেধে নেবার যে অসম্ভবতা সেটা আমার বলা  
এতদিনে কেটে যাবার কথা। যতখানি দূরে এসে  
চলনার ক্যামেরার মাছেরে জীবনটাকে সমগ্রলক্ষ্যক  
করা যায়, আধুনিকের পুরোভাগ থেকে আমি ততটা  
দূরেই এসেছি।

পঞ্চাশের পরে বানপ্রস্থের প্রস্তাব মধু করেছেন।  
তার কারণ মধুর সিংহবাহত পঞ্চাশের পরে মাছের  
বর্তমান থেকে পিছিয়ে পড়ে। তখন কোমর বেধে  
ধাধবান কালের সঙ্গে সমান ঠোঁকে বা ফেলে ছোঁটার  
যতটা স্পষ্ট ততটা সফলতা থাকে না। যতটা ঘন  
ততটা পূর্ণ হয় না। অতএব তখন থেকে স্বতঃপ্রসূত  
হয়ে তাকে সেই সর্বকালের মোহনার দিকে যাত্রা  
করতে হবে যেখানে কাল শুরু। গতির সাধনা তার  
ক'রে তখন স্থিরতা সাধনা।

মধু যে মেসার 'ঠিক' ক'রে দিয়েছেন এখন সেটাকে  
গড়ি ধ'রে খাটানো প্রায় অসম্ভব। মধুর যুগে নিশ্চয়ই  
জীবনে এত দায় ছিল না, তার গড়ি ছিল কম।  
এখন শিকা বল, কণ্ঠ বণ; এমন কি আমোদ-প্রমোদ  
খেলা-ধালা, সমস্তই বহুযাচ। তখনকার সম্রাটেরও রণ  
যত বড় ভয়ঙ্করো হোক, এখনকার রেগলারের মত  
তাতে বাহাদুরি এত লক্ষ্যসাধন ছিল না। এই গাড়ির  
মালা বালান করতে বেশ একটু সময় লাগে। পাঁচটার  
আগিনে ছুটা শারনির্দিষ্ট বটে, কিন্তু বাতাসের বন্ধ করে  
লৌহনির্মাণ ফেলে বাড়ি-ঘরে হবার আগেই বাতি  
ভালতে যায়। আমাদের সেই ধনা। তাই পঞ্চাশের  
সেবার বাছিরে না নিলে ছুটা মজুর অসম্ভব। কিন্তু  
সব্বরের কোঠার পয়সে আর ওজর চলল। বাইরের  
লক্ষণে বৃহত্তে পারিত আমার সময় চলল আমাকে  
ছাড়িয়ে—যম ক'রে ধরলেও অন্তস্ত পশ বছর আগেবার

তারিখে আমি বসে আছি। দূরের নক্ষত্রের আলোর  
মত, অর্থাৎ সে বনকার সে তখনকার নয়।

তবু একেবারে থামাবার আগে চলার কোঁকে  
অতীতকালের ধানিকটা ধাক্কা এসে পড়ে বর্তমানের  
উপরে। গান সমস্তটাই শেষে এসে পৌঁছলে তার  
সমাপ্তি; তবু আরও কিছুক্ষণ ফরমাস চলে পালায়  
গাবার জন্তে। সেটা অতীতেরই পুনরাবৃত্তি। এর পরে  
বড়-ছোট দুটো একটা তান লাগান চলে, কিন্তু  
চূপ ক'রে গেলোও চোঁকানো নেই। পুনরাবৃত্তিকে  
দীর্ঘকাল তাজা রাখবার চেষ্টাও যা, আর কই মাছটাকে  
ভাঙার কুলে মাসধানকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাও তাই।

এই মাছটার সঙ্গে কবির তুলনা আরও একটু এগিয়ে  
নেওয়া যায়। মাছ যতগুণ জলে আছে তাকে কিছু কিছু  
গোলাক জোগানো সংকল্প, সেটা মাছের প্রয়োজন।  
পরে বণন তাকে ভাঙার তোলা হ'ল  
তখন প্রয়োজনটা তার নয়, অপূর কোন জীবনে।  
তেমনি কবি যতদিন না একটা স্পষ্ট পরিণতিতে পৌঁছ  
ততদিন তাকে কিছু কিছু উৎসাহ দিতে পারলে  
ভালই—সেটা কবির নিজেরই প্রয়োজন। তারপরে  
তার পূর্ণতা বর্ণন একটা সমাপ্তি বসি আসে তখন তার  
সংক্ষেপ যদি কোনো প্রয়োজন থাকে সেটা তার নিজের  
নয়, প্রয়োজন তার দেশের।

দেশ মাছেরের স্থিতি। দেশ মূরম নয়, সে চিন্ময়।  
মাছ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত।  
স্বজন্মা স্বকলা মলয়জনিততা ভূমির কথা বতই উচ্চকণ্ঠে  
দাঁত ততই জ্বা-ব-দিহির দায় বাড়বে, প্রায় উঠবে  
আত্মিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক  
সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হ'ল। মাছেরের হাতে  
ফেনের গুণ যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়  
যদি বিগিয়ে উঠে মারী বীজে, নষ্টের ভ্রমি যদি হয় বকা,  
তবে কাগ-বন্ধার দেশের লজ্জা টালা পড়বে না। দেশ  
মাটিতে হঠনি নয়, দেশ মাথলে উঠি।

তাই দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই গাড়িরে অঙ্গর  
তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্তে যারা কোন সাধনার  
সার্বক। ততো না থাকলেও গাড়িপাণী জীবজন্তু জমা,

বুট পড়ে, নদী চলে কিন্তু দেশ আছন্ন থাকে,  
মরুভূমিতে ভূমির মত।

এই কারণেই দেশ যার মধ্যে আপন ভাষারান  
প্রকাশ অস্বস্ত করে তাকে সর্বজনসমক্ষে নিজে ব'লে  
চিহ্নিত করবার উপলক্ষ্য রচনা করতে চায়। যেদিন  
তাই করে, যেদিন কোনো মাছকে আশ্বস্তের সঙ্গে  
সে অন্ধকার করে, সেদিনই মালির কোণ থেকে দেশের  
কোলে সেই মাছেরে জয়।

আমার জীবনের সমাপ্তিদণ্ডার এই জরাজীর্ণতার  
যদি কোনো সত্য থাকে তবে তা এই তাৎপর্য নিয়ে।  
আমাকে গ্রহণ করার দার দেশ যদি কোনোভাবে  
নিজেকে লাভ না ক'রে থাকে তবে আশ্বস্তের এই উৎসব  
অস্বীন। যদি কেউ একবার অঙ্গরারের আশঙ্কা ক'রে  
আমার জন্তে উদ্বেগ হন তবে তাঁদের উৎসব অন্যত্রক।  
যে খাতির সখ্য জ্ঞাত তার সমারোহ হতই বেশী হয়  
ততই তার দেউলে হওয়া স্রুত ঘটে। ভুল মত  
হয়েই দেখা দেয়, চুকে যায় অতি সুদূর হয়ে।  
আত্মবাহির অস্বিয়ারক আলোটাঁই তার নির্দোষের  
উজ্জল তর্জনী-সংকেত।

এ কারণে সম্ভব নাই যে পুরস্কারের পাত্র-নির্বাচনে  
দেশ ভুল করতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসে লক্ষণবৃত্তা  
গ্যাতি মোনসাধন বার-বার দেখা গেছে। তাই  
আজকের দিনের আয়োজনে আজই অতিথির উল্লাস  
যেন না করি এই উপদেশের বিজ্ঞপ্তি বৃদ্ধি চলে না।  
তেমনি তা নিয়ে এখনি তাড়াতাড়ি নির্বাহ হবারও  
আজ কাগ-ব'লে না। কালে কালে সাহিত্য-বিচারের  
দ্বার একবার উন্মুক্ত করে আবার পাণ্ডিত্যেরও থাকে।  
অব্যবহিত-চিত্ত মনগতি কালের সব-শেষ বিভায়ে  
আমার ভাগ্য যদি নিঃশেষে ফাঁকিই থাকে তবে এখনি  
আগায শোচনা করতে বঁসা কিছু নয়। এখনকার  
মত এই উপস্থিত অঙ্কটানটাই নগর লাভ। তারপরে  
চরম জ্বা-ব-দিহির জন্তে প্রপোজেরা রইলেন। আশাততঃ  
বন্ধদের নিয়ে আশ্বস্তচিত্তে আনন্দ করা যাক,  
অপর পক্ষে বাঁদের অতিক্রমি হয় উত্তরা যুগকারে  
বৃহৎ বিদ্যার্ণবকার উৎসাহে আনন্দ করতে পারেন।

এই দ্বিধাতা ভাবের কালের সাধারণ সঙ্গারের  
আনন্দধারার যমের কথা। মনো ও শিবজি-নিঃসৃত গল্প  
মিলে থাকে। মধুর আপন পুঙ্খপূর্ণে মৃত্যু করে পুণ্ড্র,  
আবার শিকারী আপন লক্ষ্যভেদগর্বে তাকে গুলি করে  
মহা আনন্দিত।

আধুনিক কালে পাশ্চাত্য দেশে সাহিত্যে কলাসৃষ্টিতে  
লোকচিত্রের সমৃদ্ধি অতি ঘন ঘন বধন হয়, এটা দেখা  
লাকে। বেশ বেড়ে চলেছে মাছেরের দানে বাইনে, বেশ  
অবিশ্রাম ঠেলা দিকে মাছেরের মন প্রাণকে।

যেখানে বৈয়াকিক প্রতিবেশিতা উগ্র সেখানে এই  
বেগের মূলা বেশী। ভাগ্যের হারির খুঁট নিয়ে হাটের  
ভিড়ি ধ্বংস পরে যেখানে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি  
সেখানে যে-মাছের বেগে যেতে পারে তার সিমত।  
তুচ্ছানি লোভের বাহন বিরোধীন বেশ। মাছ  
পশ্চিম বাতালের মত টপমল করতে সেই লোভে।  
সেখানে বেশবুদ্ধি জমে লাভের উপলক্ষ্য না হয়ে স্বাঃ  
লক্ষ্য হয়ে উঠে। বেগেরই লোভ জাজ জলে বুলে  
আকাশে হিস্টোরিয়ার চাঁৎকার করতে করতে ছুটে  
বেরলো।

কিন্তু প্রাণ-পদার্থ তো বাষ্প-বিভাজের ভূতে তাড়া  
করা লোহার এগ্রিন নয়। তার একটা আপন ছন্দ  
আছে। সেই ছন্দে ছই এক মাত্রা টান সর তার বেশী  
নয়। মিনিট কয়েক জিগবাঞ্জি ধেরে চলা সাধ্য হ'তে  
পারে, কিন্তু দশ মিনিট যেতেনা-বেতে প্রমাদ হয়ে যে  
মাছের বাইসিকলের ঢাকা নয়, তার পদাতিকের চাল  
পদাধীনের ছন্দে। গানের লয় মিলি লাগে বধন সে  
কানের সজীব ছন্দ মেনে চলে। তাকে মূন থেকে  
চৌদ্দনে ছড়ালে সে কদা-দেছে ফৌল-সেহ নেবার  
জঞ্জই ইন্দ্রাঙ্গ স্রুত থাকে। তা'দি যদি আরও  
ভাড়া তা'হলে রাগিণীটা পাণিলা-গারদের সমর গেটের  
উপর মাথা ঝুঁকে মাথা বাবে। সজীব চোখ তো ক্যামেরা  
নয়, ভাল ক'রে দেখে নিতে সে সময় নেয়। কটাটা বিশ  
পটিন বাইল দৌড়ের দেখা তার পক্ষে কুরা দেখা।  
একটা তাঁরীখানা ব'লে সজীব পদার্থ আমাদের দেশে  
ছিল। ক্রমের-পূর্ণরাস নিয়ে সেটা সম্পন্ন হ'ত।



কলের গাড়ির আমলে তাঁর রইল, বাজা রইল না, ভ্রমণ নেই পৌছানো আছে, শিক্ষাও বাদ দিয়ে পরীক্ষা পাস করা থাকে বলে। বেক-কোম্পানীর কারখানায় কল্যাণীসা তাঁর-বাড়ার ভিত্তি লামের বটিকা সীলনো, গিলে ফেলেই হ'ল—কিন্তু হ'লই না যে সে কথা বোঝবারও দুরূহ নেই। কালিদাসের যক যদি মেঘদূতকে বরখাস্ত করে দিয়ে রেবোরেনটকে অবকাশ পাঠাতেন তাহলে অমন ছুই সর্গভরা মনোজ্ঞাভ ছন্দ ছচারটে বোঝ পার না হ'তই অপরূপে সরত। কল্যাণীসা শ্রীর তেজ আঙ্গ বাজারে নামেন।

মেঘদূতের সেই শোকবিহ পরিণামে শোক করবে না এমনকি বলনান পুত্রব আঙ্গাল দেখতে পাওয়া থাকে। কেউ কেউ বলছেন, এজন কবিতার যে আঙ্গাঙ্গাল শোনা থাকে সে নাভিখালের আঙ্গাঙ্গাল। ওর সময় হয়ে এল। যদি তা সত্য হয় তবে সেটা কবিতার দোষে নয় সময়ের দোষে। মাহুদের প্রাগটা চিরদিনই ছন্দে বাঁধা, একই তার কাণটা কলের তড়ার সমুদ্রিত ছন্দ-তাড়া।

আগুনের ক্ষেত চাবী কাটি পুতে দেয়, তার উপর আঁর গতিরে উঠে আশ্রয় পায়, কল ধরায়। তেমনি জীবনব্যাপ্তিকে সবল ও সর্বল করবার জন্তে কতকগুলি রীতিনীতি বেঁধে দিতে হয়। এই রীতিনীতির অনেকগুলিই নির্দোষ নীরস; উদ্দেশ্য অস্বাভাবিকের পুঁতি। কিন্তু বড়ায় লাগানো জিরল কাঠের খুঁটি যেমন রস পেলেই বেঁচে ওঠে তেমনি জীবনব্যাপ্তি বধন প্রাপ্তের ছন্দে শান্ত গমন চলে তখন শুকনো খুঁটিগুলো অন্তরের গভীরে পৌছবার অবকাশ পেয়ে ক্রমেই প্রাণ পেতে থাকে। সেই গভীরেই সজীবনরস। সেই রসে তত ও নীতির মত পদার্থও স্বপ্নেরও আপন সামগ্রীকণে সজীব ও সজ্জিত হয়ে উঠে, মাহুদের আনন্দের রং তাতে জাগে। এই আনন্দের প্রকাশের মধ্যেই 'চিরন্তনতা'। একদিনের নীতিরক আর-একদিন আমরা গ্রহণ নাও করতে পারি, কিন্তু সেই নীতি বে-প্রীতিক্রমে বে-সৌন্দর্যকে আনন্দের সত্য ভাবায় প্রকাশ করেছে সে আমাদের কাছে নূতন থাকবে। আজও নূতন আছে যেগুলি সাম্রাজ্যের নিয়ম—

সেই সাম্রাজ্যকে, তার সাম্রাজ্যনিতিকে আমরা পছন্দ করি আর না করি। কিন্তু বে-যুগে দলে দলে গরজের তড়ার অবকাশ ঠাঙ্গা হয়ে নিতেই হয়ে যায় যে যুগ প্রয়োজনের, সে যুগ প্রীতির নয়। প্রীতি সময় নেয় গভীর হ'তে। আধুনিক এই ভ্রাতা-ভাঙিত যুগে প্রয়োজনের তাগিদ কচুরি পানির মতই সাহিত্য-ব্যবার মধ্যেও তুরি তুরি চুকে পড়েছে। তা'রা বাস করতে আসে না, সমসাময়িকদের দরখাস্ত হাতে ধরা দিয়ে পড়ে। যে দরখাস্ত যতই অল্পত হোক তবু সে বাঁটা সাহিত্য নয়, সে দরখাস্তই। দাবি মিটলেই তার অন্তর্ধান।

এমন অবস্থার সাহিত্যের হাওয়া বদল হয় এবেশা-ওবেশা। কোথাও আপন দরদ রেখে যায় না, পিছনে ছেড়ে লাগি যেতেই চলে, থাকে উঁচু করে গড়েছিল তাকে দুর্দাসাৎ করে তার প'রে অটুথাসি। আমাদের মেরেদের পাড়গালা শাঙি, তাদের নীলাধরা, তাদের বেনারসী জেলি মাঠের উপর নীলকণা বদল হয়নি—কেননা ওরা আমাদের অন্তরের অঙ্গরগণকে আঁকড়ে আছে। দেখে আমাদের কাঁধের রাস্তা হয় না। হ'ত রাস্তা, মনটা যদি রসিয়ে দেখবার উপভূত সময় না পেয়ে বেনারসী ও অঙ্গরগণরায় হয়ে উঠত। স্বদুর্দীন অগভীর বিদ্যারের আয়োজনে অকারণে অনারাগে ঘন ঘন ফালনের বদল। এখনকার সাহিত্যে তেমনি রীতির, বদল। স্বদুর্দীন দৌড়তে দৌড়তে প্রীতি স্বপ্নের রাণী পাখত ও পরাতে পায় না। যদি সময় পেত স্বপ্নের করে বিনিময়ে বিনিময়ে পাখত। এমন ওকে ব্যস্ত লোকেরা ধমক দিয়ে দেখে, দেখে দাঁও তোমার স্বপ্নের। স্বপ্নের পুরোনো, স্বপ্নের সেকলে। আনো একটা যেমন-তেনমন করে পাক-দেওয়া শল্লের গড়ি—সেটাকে বদল রিয়ারিক্রম—এমন-এমন হুদাচ হুদাচ পাঁচগালা লোকের ট্রেটেই পছন্দ। বসায় কাশান হঠাৎ নবাবের মত উজ্জত—তার প্রধান অঙ্গরার এই যে সে অধুনাতন, অর্থাৎ তার বড়ই গুণ নিয়ে নয়, কাণ নিয়ে।

বেগের এই খেঁচর-কলগা পশ্চিম দেশের মন্থনাতন। ওটা এখনও পাখা দখিলে আমাদের নিজস্ব হয়নি। তবু

আমাদেরও সৌভাগ্য হ'ল। ওদেরই হাওয়া-গাড়ির পাদদানের উপর লাফ দিয়ে আমরা উঠে পড়েছি। আমরাও খরকেশিনী খরকেশিনী সাহিত্যকাঠির টেকনিকের হালু ফাশান নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করি, আমরাও অধুনাতনের শৃঙ্খলা নিয়ে পুরাতনের মান ধানি করতে অভ্যস্ত থই হই।

এই সব চিন্তা করেই বেলজিয়াম আমার এ বয়সে প্রাথমিক আমি বিবাহ করি। এই মাহুগার শিকারে বনে-বাগাড়ে ছুটে বেড়ানো সৌবনেই সাঙ্গে। কেননা সে-বয়সে যুগ যদি বা নাও মেলে যুগটাতেই বসে। সুল থেকে কল হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে, তবু আমরা স্বভাবকেই চাকল্যে সার্থক করতে হয় যুগকে। সে অশান্ত বাইরের সিকিই তার বর্ষ গড়ের নিভা উজ্জম। ফলের কাজ অন্তরে, তার স্বভাবের প্রচারণে অপ্রণয় শাস্তি। শাণ থেকে মুক্তির জন্তেই তার সাদনা,—সেই মুক্তি নিজেই আত্মিক পরিশ্রমের বাণে।

আমার জীবনে আজ সেই ফলেরই গুহু এসেছে। যে কল আজ বৃষ্টিভাতির অপেক্ষা করে। এই গুহুটার সুযোগে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হ'লে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের শাস্তি স্থাপন চাই। সেই শাস্তি প্রাথমিক-অপ্রাথমিক হৃদয়ের মধ্যে বিস্তার হয়।

প্রাথমিক কথা থাক। ওটার অনেকখানিই অপ্রাথমিকের বাণে পরিক্রান্ত। তার সঙ্কটচল-প্রসারণ নিয়ে যে মাহুয় অতিমাত্র ক্ষুদ্র হ'তে থাকে সে অশিশ্রু। তাগোর প্রথম মন প্রীতি, কবির পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাই। যে-মাহুয় কাজ দিয়ে থাকে প্রাথমিক দিয়ে তার বেতন শোধ চলে, আনন্দ দেওয়াই তার কাজ প্রীতি না হ'লে তার প্রাথমিক শোধ হয় না।

অনেক কবিই আছে যা মাহুয়কেই উপকরণ পেতে গড়ে তোলেন। যেমন রাষ্ট্র। কর্মের বর্গ দেখানো জন-মণ্ডল—তাই দেখানো মাহুয়কে দলে টানান নিয়ে কেবলই দ্বন্দ্ব চলে। বিস্তারিত প্রাথমিক বেড়াঙ্গাল ফলে মাহুয় ধরা নিয়ে ব্যাপার। মনে কর, গড়ে জঙ্ক। ওঁর বুদ্ধিকে তাঁর শক্তিকে অনেক লোকে যখন মানে তখনই তাঁর কাজ চলে।

বিবাহ আগবা হ'লে বেড়াঙ্গাল গেল ছিঁড়ে, মাহুয়-উপকরণ পুরোপুরি ছোটে না।

অপর পক্ষে কবির সৃষ্টি বধি-সত্য হয়ে থাকে সেই সত্যের সৌরস সেই সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের মন্থতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করেনি এমন প্রাণই বটে থাকে। তাতে ব্যাকারদের কতি হয়, কিন্তু সত্যমুদ্রার কতি হয় না।

সুল দৌড়ে এইটাই ফলের চরম কথা। যার ভাল খালা সেই জিহ্বা, ফলের জিহ্ব তার আপন আদিভায়েই, স্বকরের অন্তরে আছে একটা রুমর রসমায় আয়তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেই সত্য তার অনির্কটনীর সন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আবেগেই হয় মধুর, গভীর, উজ্জম। আমাদের ভিতরের মাহুয় বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, সিয়ে ওঠে। আমাদের সত্য বনে তার স দ রঙে রঙে বিলে যায়—একই বলে অঙ্গরগণ।

কবির কাজ এই অঙ্গরগণে মাহুয়ের চৈতন্যকে উদ্ভীপ করা, উদাসীন থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মাহুয় বড় বলে যে এমন সকল বিবরে মাহুয়ের চিত্তকে আলিঙ্গ করেছে বার মধ্যে নিভাতা কালো, বহিনা আছে, মুক্তি আছে, বা ব্যাপক এবং গভীর। কাণ ও সাহিত্যের ভাঙারে দেখে দেখে কালে কালে মাহুয়ের অঙ্গরগণের সম্পদ রচিত ও সজ্জিত হয়ে উঠে। এই বিলাপ তবুই বিশেষ দেশের মাহুয় বিশেষ কাকে ভাগবৎসে সে তার সাহিত্য দেখেইই বৃষ্টিতে পারি। এই ভাগবৎসার হারাই তো মাহুয়কে বিচার করা।

বীণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনটা সোনার, কোনটা তামার, কোনটা ইস্পাতের। স্যারদের কণ্ঠে হাঙা ও ভারী, আনন্দের ও প্রেমাদের বত রকমের হুর আছে, সবই তাঁর বীণায় বাজে। কবির কাণেও হুরের, অসাধ্য গৈরাট। - সবই যে উদাত্তপানির হওয়া চাই এমন কথা বলি নে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকে চাই, যার ইঙ্গিত প্রদানের দিকে, সেই 'বৈরাগ্যের দিকে বা অঙ্গরগণকেই বীণাবান ও বিস্তৃত করে। ভগ্নহরির কাণে দেখি ভোগের মাহুয় আপন হুর পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই কাণের গভীরের মধ্যে



বলে আছে তাগের মাহুয় আপন একতারা নিয়ে—এই  
—এই হরের সমবাহুই রঙ্গের এজন ঠিক থাকে, কাব্যেও  
মানবজীবনেও। দূরকাল ও বহুজনে, যে-সম্পদ দান  
করার দ্বারা সাহিত্যে স্থায়ীভাবে সার্থক হয়, কাগজের  
নৌকায় বা মাটির গাম্‌মায় তো তার বোকাই সহ্যে না।  
আধুনিক-কাল-বিলাসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে বলতে পারেন এস-  
কথা আধুনিক কালের বুলির সঙ্গে মিলতে না—তা, যদি হয়  
তাহলে সেই আধুনিক কালজীবীই হচ্ছে পরিতাপ করতে  
হবে। আশ্বাসের কথা এই যে সে চিরকালই আধুনিক  
ধাক্কা, এত আত্ম তার নয়।

কবি যদি ক্রান্ত মনে এমন কথা মনে করে যে  
কবিত্বের চিত্রকলের বিবরণগুলি আধুনিককালে পুরানো  
হয়ে গেছে, তাহলে বুদ্ধি আধুনিক কালজীবী হয়েছে  
বুদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তার সহজ অহ-  
রাগের রস পৌছাচ্ছে না, তাই জগৎটাকে আপনায় মধ্যে  
নিত্য পারল না। যে-কল্পনা নিজের চারিদিকে আর রস  
পায় না, সে যে কোনো চোঁকাকৃত রচনাকে দীর্ঘকাল সরস  
রাগতে পারবে এমন আশা করা বিতৃষ্ণনা। রসনার বার  
কিছু মনেও চিরদিনের অর্থে সে তৃপ্তি পায় না, সেই একই  
কারণে কোনো একটা আশ্রয়বি অয়েও সে চিরদিন রস  
পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

আজ সস্তর বয়সে সাধারণের কাছে আমার পরিচয়  
একটা পরিণামে এসেছে। তাই আশা করি গীরা আমাদের  
কানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তঃ-  
তারা একথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্ম-  
গ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে বা দেখনুম চোখ  
আমার কখনও তাতে ক্রান্ত হ'ল না, বিশ্বাসের স্রুত পাই-  
নি। চরাচরকে বৈঠক করে অনাধিকালের যে  
অনাইতবাহী অনন্তকালের অভিমুখে, প্লাবিত তাকে  
আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই  
বিবাহী গুণে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের  
হোট গ্রামাণ্ডা পৃথিবীকে গভীর আকাশ-দুর্ভাগি  
বিচ্ছিন্ন-বসের বর্ণসজ্জার সাজিয়ে দিয়ে যার, এই  
আবদের অষ্টমানে আমার দৃশ্যের অভিব্যক্তির নিয়ে যোগ  
দিতে কোনদিন আলস্য করিনি। প্রতিদিন উষাকালে

অন্ধকার রাজির প্রান্তে শুক হয়ে ধাঁড়িয়েছি এই  
কথাটি উপলব্ধি করার জন্যে যে, যতই কণা কণাও  
ততই পশ্চিম। আমি সেই বিরাট সত্যকে আমার  
অন্তরে স্পর্শ করতে চেষ্টা করি সকল সত্তার  
সম্বন্ধের একাত্মতা, বীর পৃথিবীতেই নিরন্তর অব্যাহতরূপের  
প্রকাশে বিচ্ছিন্নভাবে আমার প্রাণ ঘুরে ঘুরে উঠেছে—  
বলে উঠেছে—কোষেবাভাং কং প্রাণাভ্যং যদেব আকাশ  
আনন্দো ন জ্ঞাতঃ বাতে কোনো প্রয়োজন সেই তাও  
আনন্দের টানে টানবে, এই অত্যাশ্রয় ব্যাপারেরে চরম  
অর্থ বীর মধ্যে; যিনি অন্তরে অগ্নির মাহুয়কে পরিপূর্ণ  
ক'রে বিভ্রমান বলেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে  
আমরা আত্মত্যাগী পাগলের পাশ্চাত্য বলেই হলে  
উঠেগম না।

বার লাগি রাজি অন্ধকারে  
চলেছে মানববাহী যুগ হ'লে যুগান্তর পানে  
বার লাগি  
রাজপুত্র পরিচাছে ছিন্ন কল, বিবরে বিরাগী  
পথের ভিক্ষুক, মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে  
সামান্যে ক্ষুদ্র উষ্মীভূত, তুচ্ছের কুংসার তলে  
প্রভাতের বীজসংসার।  
বার পদে বানী সঁপিয়াছে মান,  
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,  
গাঁহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ পান  
ছড়াইছে বেশে বেশে।

ঈশোপনিষদের প্রথম যে ময়ে পিতৃদেব দীক্ষা  
পেরিয়েছিলেন, সেই যজ্ঞটি বার-বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে  
আমার মনে আকোষিত হয়েছে, বার-বার নিজে  
বণেটি—তেন ত্যজেন ভূজীবাঃ মা গুহঃ আনন্দ কর  
তাই নিয়ে বা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে  
তোমার চারিদিকে, তাইই মধ্যে চিত্তস্থ, সোভ ক'রো  
না; কাব্য-সাধনার এই ময় মহামূল্য। আগন্তিক যাকে  
মাকড়সার মত ভাবে জড়ায় তাকে জীর্ণ ক'রে দেব,  
তাতে রানি আসে রান্ধি আনে। কেন না আগন্তিক  
তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন ক'রে নিজের গীমায়

মেরী বাধে—তার পরে তোলা হলের মত অক্ষরখেই  
সে রান কর। মইং সাহিত্য ভোগকে সোভ থেকে  
উদ্ধার হয়ে, সৌন্দর্যকে আকর্ষণ থেকে, চিত্রকে  
উপস্থিত গরবে দগুয়ারদের কাছ থেকে। রাবণের  
ঘরে গীতা গোভের দ্বারা বন্ধী, রামের ঘরে গীতা  
প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্যপ্রকাশ।  
প্রেমের কাছে দেহের অপসারণ রূপ প্রকাশ পায়, গোভের  
কাছে তার স্থল মাংস।

অনেকদিন থেকেই গিণে আসটি, জীবনের নানা  
পর্বে নানা অবস্থায়। হুক করেটি কাঁজ বয়সে—তখনও  
নিজেকে বুদ্ধি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহ্যে  
এবং অন্তরীণ জিনিষ ভূরি ভূরি আছে, তাতে সন্দেহ নেই।  
এ সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকী বা থাকে আশা করি  
তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে আমি ভাগবতের  
এই জগৎ, আমি প্রণাম করেছি মংকে, আমি  
কামনা করছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরম পুরুষের কাছে  
আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মাহুয়ের  
সত্তা মহামানবের মধ্যে যিনি সবার জ্ঞানাত্মক রূপে  
সমিষ্ট; আমি আবাল্যমজ্ঞাত একান্তিক সাহিত্য-  
সাধনার গভীরে জড়িত করি একটা সেই মহামানবের  
উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্তব্য অর্থাৎ আমার তাগের  
নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি  
বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেরেছি প্রসাদ।

আমি এসেছি এই ধর্মীর মহাতীর্থে—এখানে সর্গদেব  
সর্গরাজি ও সর্গকালের ইতিহাসের মহাকল্পে আছেন  
মহাদেবতা—তাইই বেদীমূলে নিহুতে বসে আমার  
অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি দ্বন্দ্ব করবার চুপাচুপ চোঁয়  
আজও প্রবৃত্ত আছি।

আমার বা-কিছু অক্ষিৎকর তাকে অতিক্রম করেও  
যদি আমার চরিত্রের অন্তরন্তর প্রকৃতি ও সাধনা লেখার  
প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার  
পরিণতিই আমি প্রীতি কামনা করি আর কিছু নয়। এ  
কথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্য পেরেছি সেই  
উদ্দেশ্যে কাছে গীরা আমার সমস্ত কৃতি সমগ্রও জেনেছেন  
সমস্ত জীবনে আমি কি চেষ্টা, কি পেরেছি, কি দিয়েছি,

আমার অর্পণ জীবন অসমাপ্ত সাধনার কি ইদিত আছে।  
সাহিত্যে মাহুয়ের অস্বাভাব-সম্পদ সৃষ্টি করাই যদি  
কবির বর্ণার কাজ হয়, তবে এই দান গ্রহণ করতে গেলে  
প্রীতিরই প্রয়োজন। কেননা প্রীতিই সমগ্র করে দেবে।  
আজ পর্যন্ত সাহিত্যে দ্বারা সন্ধান পেরেছেন তাঁদের  
রচনাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখেই শ্রদ্ধা অর্জিত করি।  
তাকে টুকরো টুকরো হিঁচড়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ি সন্ধান বা ছিঁড়ি  
বনন করতে সভ্যতার প্রবৃত্তি হয় না। জগতে আর  
পর্যন্ত অস্তি বড় সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মাননি,  
অস্বাভাববঞ্চিত পুরুষ চিত্র নিয়ে যার শ্রেষ্ঠ রচনাকেও  
বিভ্রণ করা, তার কর্তব্য করা, তার প্রতি জগৎজনন হু-  
বিকৃতি করা, যে কোনো মাখা না পারে। প্রীতির  
প্রদর্শনই সেই সহজ ভাষিকা যার উপরে কবির সৃষ্টি  
সমগ্র হয়ে বৃষ্টি হয়ে প্রকাশমান হয়।

মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠদান এই প্রীতি আমি পেরেছি। এ  
কথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেরেছি পৃথিবীর অনেক  
বরগীরদের হাত থেকে—তাঁদের কাছে ভ্রুতজ্ঞতা নয়,  
আমার নিবেদন ক'রে দিয়ে গেলুম। তাঁদের  
দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানববৈষ্ণব স্পর্শ লেগেছে  
আমার ললাটে,—আমার বাকিছু শ্রেষ্ঠ তাঁদের গ্রন্থের  
যোগ্য হোক।

আর আমার স্বদেশের লোক বীরা অতিকিটের  
অভি-পরিচয়ের অপ্সারী ভেদ ক'রেও আমাকে  
ভাবাব্যাস্ত পেয়েছেন, আজ এই অষ্টমানে তাঁদেরই  
সহযাত্রীতে অর্থাৎ সাক্ষিত। তাঁদের সেই ভালবাসা  
ছয়র সঙ্গে গ্রহণ করি।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে  
নিধিধের পানে গ্রহণে হয়েছিল হারা।  
অতুলি ভূমি তারাতুলি অসিমনি  
মাতে বুলিরা নীরবে দিতেছে সাড়া-  
মান দিবসের শেষের কৃত্রিম ভুলে  
এ কল হইতে নব-জীবনের কুলে  
চলোছি আমার বাত্মকরিতে সারা।  
—যে বার সন্ধ্যা, বাহা কিছু ছিল সাধে  
—আমিছ তোমার অক্ষলপাশে টাকি।



আধারের সাধী, তোমার করুণ হাতে  
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের সাধী ।

কত যে প্রান্তের আশা ও রাতের গীতি,  
কত যে হৃদয়ের দৃতি ও হৃদয়ের স্রীতি,  
সিঁদায় বোঝায় আঁজি ও রহিল বাকী ॥

যা কিছু পেয়েছি, যা যা কিছু গেল চুকে,  
চলিতে চলিতে পিছিয়া রহিল পড়ে,  
যে যি হ্রদিল যে বাখা বিধিল বুকে,  
ছায়া হয়ে বাঁধা মিশায় বিগতেরে,

জীবনের ধন কিছুই যাবে না কোথা,  
ধূল্য তানের ঘঁট হোক অবহেলা,  
পূর্বের পদ-পরশ তাদের' পরে ॥

গীত-উৎসব

গত ২ই ও ১০ই পোষ রজনীযোগে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপ-  
লক্ষে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে গীত উৎসব  
অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত সঙ্গীত-  
সমষ্টির মধ্য হইতে পরষট্টি সঙ্গীত উৎসবে গীত হইয়াছিল।  
সঙ্গীতগুলির প্রথম চরণগুলি আমরা এখানে উদ্ধার করিলাম।  
বেদগান দ্বারা গীত-উৎসবের উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন হয়।

প্রথম রজনী

“যদেদি প্রমুদরবিব দৃষ্টিমুগ্ধাতে অস্রবৎ”  
(বেদগানটির প্রথম চরণ)  
“যদি স্বপ্নের মেঘের মত আমি দাঁহি চঞ্চল অন্তর,”  
(রবীন্দ্রনাথ-কৃত বেদগানটির অন্তর্ভাব)

“ভুবনবধ হে, মোচন কর বন্ধন সব, মোচন কর হে।”  
“তুমি ধন্ত ধন্ত হে, ধন্ত তব প্রেম,”  
“বেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাতে হে।”  
“বিপুল তরঙ্গ রে সব গগন উল্লেগিলা”

“মন্দিরে মম কৈ অগিলে হে।”  
“কখন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে,”  
“স্বধামাগর-তীরে হে এসেছে নরনারী সুধারস-পিরাসে।”  
“বিমল আনন্দে কাগরে।”  
“কার মিলন চাও বিরহী। ওঁহারা কোথা পুঞ্জিহ—

“মোরে বারে বারে কিরালে।”  
“আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধুরে,”  
“আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে,”  
“এমন দিনে তারে বলা যায়,”  
“তুমি রবে নীরবে ছন্দরে মম।”  
“আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে।”  
“মরি গো মরি, আমার বীণীতে ডেকেছে কে।”  
“সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এ দেশে।”  
“আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।”  
“বেদনা কি ভাষায় রে,”  
“আমি কান পেতে রই ও আমার  
আপন ছন্দর গহন দ্বারে।”  
“বারে বারে পেয়েছি যে তোরে,  
চেনায় চেনায় অচেনারে।”

“শুধুপাতার সাজাই তরলী,”  
“মনরে ওরে মন”  
“চৈত্র পবনে মম চিত্ত-বনে”  
“প্রথম তপন তাপে

আকাশ ভুবায় কাঁপে,

বায় করে হাচাকার।”

“আমার নয়ন তুলানে এসে,”  
“আজ বলন্ত জাগ্রত বারে।”  
“নিবিড় ঘন আঁধারে অগ্নিছে প্রবতারা।”  
“দ্রাব্যের দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে।”  
“কেন আমার পাগল করে বাসু”  
“দে পড়ে দে আমার তোঁরা”  
“দিনগুলি মোর সোনার বাজার রহিল না।”  
“আঙ্গা যাওয়ার মাথখানে”  
“দেশ দেশ নমিত করি” হস্তিত তব ভেদী,”

দ্বিতীয় রজনী

“বাজাও তুমি কবি তোমার সঙ্গীত স্রবধুর”  
“মোর ছন্দরে গোপন বিছান ঘরে”  
“যে প্রবণ দিয়েছ বিধি বিশ্বতানে,”  
“তোমার আমা এই বিরহের অন্তরালে,”  
“জদরবাগনা পূর্ণ হলো, আজি মম পূর্ণ হলো”

শ্রুতন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ বামিনীরে”  
“আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে,”  
“তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, আমার সাধের সাধনা,”  
“বাজিল কাহার বীণা মধুরহরে”  
“গবি, আমারি ছন্দরে কেন আসিল”  
“ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল ক’রেছ,”  
“বড় বিশ্বর লাগে বেরি তোমারে।”  
“তুমি বেয়ে না এখনি।”  
“অগ্নি ভুবন-মনোমাহিনী,”  
“তোরা আপন জন্মে জাড়বে তোঁরে”  
“আজি বাংলাদেশের দ্বন্দ্ব হতে”  
“জন্মগামন-অবিনাশক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।”  
“আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রস”

“যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,”  
“রাজে তোমার বাজে বাঁধি,”  
“মিসরে ন্যু তা জানি,”  
“তুমি একলা ঘরে বসে বসে কি হুর বাঁধালে”  
“স্বয়ম্বর বরিষে বারিধারা”  
“নীতের হাওয়ার লাগল নাচন  
আমলকির এই ডালে ডালে।”  
“আকাশে আজ কোন চরণের আসা যাওয়া।”  
“এই শরৎ-আশোর কমল বনে”  
“তব মনে রেখো যদি দূরে বাই চলে।”  
“কান্দা-হাসির দোল-লোলানো পৌষ কাশনের পালা,”  
“প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি স্বমধুর,”  
“কোন স্বপ্ন হতে আমার মনোমাঝে”

## রবীন্দ্রনাথের স্মরণ

শ্রীজগদ্রণ সেন

বিগত ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ সত্তর  
বৎসর অতিক্রম করেছেন।

কবির প্রতি আমাদের অসীম শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভক্তি  
নিবেদন করবার জন্ত আমরা ‘রবীন্দ্র-জয়ন্তী’ উৎসবের  
আয়োজন করছি। এ উৎসব শুধু বাংলা দেশের নয়,  
ভারতবর্ষের নয়—সমস্ত পৃথিবীর। কাশ্মীরের ঘরের  
কোমিন্দু—যে আজ জগৎ-সভার সজ্জনতম রত্ন। বিশ্বকবির  
চরণে আজ তাই নিম্নলিখিত-ভক্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি এসে পৌঁছেছে।  
মহাকবির এই মহাপুংগব যোগ দেবার জন্ত আমরাও  
ভাক পড়েছে। আমার মত একজন জরাজীর্ণ অশক্ত বৃদ্ধ  
কি অর্ঘ্য দিতে পারে, আমি কিছুই তা এতদিন ভেবে  
পাইনি।

এই ভাবনার কথা একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে বলতে তিনি  
বললেন, আপনার সহিত বিশ্ব-কবির অনেক দিনের পরিচয়  
কতদিন কত ব্যাপারে আপনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে,

কত বিষয় নিয়ে আলোচনা-আলোচনা হয়েছে, সেই কথাগুলি  
গুছিয়ে বলুন না।

বন্ধুদের এক-কথা অবশ্য আমাকে মানতেই হবে যে,  
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার অধ্যায়সার সাক্ষাৎ হয়েছে।  
অধ্যায়সার যে আমি তাঁকে দেখেছি, এক-কথা অস্বীকার  
করতে পারব না। কিন্তু, সে ত আজকার কথা নয়—  
সত্তর বছরের কথা ও নয়;—কালজরী কবির আয় কি বৎসর  
দিয়ে গণনা করা যায়? সে যে অগণিত যুগ-যুগান্তরের  
কথা—শত যুগের সুসংস্কৃত কথা। বারে বারে—কালে  
কালে এই কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু, সে  
কথা ত গুছিয়ে বলবার আমার শক্তি-সামর্থ্য নেই—সে-  
সাধনা যে আমার নেই।

সে কোন অস্বাভাবিক যুগে—কোন সত্যকালে, এই  
আর্ঘ্যচুমির প্রস্ফাবর্তে, কোন পূণ্যতোয়া সরস্বতী-দুর্গাতীর  
পবিত্র তীরে শাস্ত্ররাম্পদ তপোবনে, কোন বৈকুণ্ঠ মহা-



মানবেরা জগতের অধিবাসীকে স্বভাবকণ্ঠে ডেকে  
নামেছিলেন—

“মুগ্ধ বিধে অমৃতত পূজাঃ”—

সেই আচলক ত্রিকালঙ্কৃত তরুণীদের মধ্যে আমি সেদিন  
বরণের রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

সেই যে কবে, কোন আরবাদের সিন্ধু-ছায়াচ্ছন্ন বনভূমি-  
মূলে সমবেত মহাবিক্রম গগন-পবন মুগ্ধিত করে উদাত্ত-  
কণ্ঠে সাম্যবান করেছিলেন, সেই অসামান্য গায়কমণ্ডলে  
আমি সেদিন স্বকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

যে পূর্বাত্মক আধ্যাত্মবিগ্ৰহ পঙ্কজকণ্ঠে জগতে অকুলমীর  
বেগমের উচ্চারণ করে পবিত্র ধোমানলে অগ্নি-দেবতাকে  
বজ্রাতি দিতেন, আমি সেই মনুষ্যজ্ঞানের মধ্যে গৃহীত  
রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম।

যে প্রজাতি তপস-সংহতি একদিন সেই মতো ময়ীয়া  
সর্বশক্তিমানের উদ্দেশে নতজাহ্নব হয়ে নৃত্যকরে প্রার্থনা  
করেছিলেন—

“অসতো মঙ্গলস্যম, তমসো মা জ্যোতির্দয়ম”—

সেই নিত্যমুক্ত শুদ্ধস্বভাব পরমোপাসকদের মধ্যে আমি  
সাপেক্ষ রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম—তার মধুর কণ্ঠের স্নাত্ত  
পেয়েছিলাম।

সেই যে কোন দুর্গত দিনে, নৈমিষারণ্যে এক  
মহতী পরিব্রজে অবিবেচন হয়েছিল, সেই পবিত্র স্থানে  
সমবেত মহাপুরুষদের মধ্যে আমি জ্যোতির্দয় জ্ঞানমুগ্ধ  
রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম—তার অভয়-বাণী স্নাত্ত  
পেয়েছিলাম।

তারপর, তাঁকে দেখেছি ব্যাধবান্ধবত জৌকমধ্বনে  
শোকে তমসাতীরে অশ্রু-বিসর্জন করতে, তাঁকে দেখেছি  
ক্লেতন-বিহারে বৌদ্ধমতের ত্রিগুণবান শ্রবণ পৌতনের পূর্ণ  
আনন্দন রূপে; তাঁকে দেখেছি উজ্জয়িনীর রাজসভায় মহা  
রাজ বিক্রমহিত্যের নবরত্ন মণ্ডলে। এযনিষ্ঠর শহ-স্বপ্নে স্থানে  
শত সহস্র রূপে, শত সহস্র বেশে, শত সহস্র বার আমি রবীন্দ্র-  
নাথকে দেখেছি। বারবারেই এই মহাপুরুষকে চিন্তে পেরে

আমার সত্যিক প্রাণটি জানিয়েছি—সে যে অনেক কথা।  
এই ব্রহ্মা, ব্রহ্মা, অধিতীর মহামানবের সঙ্গে আমার সে  
অনন্ত পরিচয় কেমন করে আমি শুধিয়ে লিপিবদ্ধ করব?

এবারকার এই সত্তর বছরের মধ্যেও সেই যুগ-যুগান্তরের  
রবীন্দ্রনাথকে যে আমি দেখেছি, কখন রাজবেশে, কখন  
কবিরে আভরণায়, কখন বাউলের আনুগ্ৰহাণায় একতারা-  
হাতে নৃত্য করতে, কখন আত্মভোগ্য কবির বেশে, কখন  
জানবৃত্ত তরুণীর মুখিতে, কখন দেখেছি স্বদেশের  
স্বপ্ন-প্রবেশ কাতর মাথনের মত, কখন দেখেছি সর্ব-মারা-  
মুক্ত, সকল বন্ধন-বিস্তৃত উদারী শ্ববির মত।

আজকের এই সত্তর বছরের রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ-  
বর্ণনা করতে ব'লে আমি যে দেখতে পাচ্ছি সেই  
যুগ-যুগান্তরের মহাপুরুষকে—যিনি মৃত্যুভয়, অপমান  
অনিশ্চয় কীষ্টির চেয়েও যিনি মহৎ, যিনি লোকে  
লোকে চির-পূজিত। এই রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী  
প্রতিভার সত্যিক বিশেষণ আমার কাছে তাই অসম্ভব  
ব'লেই মনে হয়। সত্তর বছর দিয়ে কি তার পরিমাণ  
করা যায়, যা সত্তর শতাব্দী ব'লেও শেষ করা যাবে না?  
রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে যারা সাহস ও স্পর্ধা রাখেন  
তাঁরা সেকালের ভার নিন্—আমার সেশক্তি নেই—  
আমি সে সাধনা করিনি।

আমাদের এই রবীন্দ্রনাথ সর্বদে দেশ-বিশেষের  
বহু মনীষীর লেখা অনেক প্রবন্ধ আমি পড়েছি;  
কবির কথা নিয়ে রচিত ভ্রাতারিণি পুস্তকের মধ্যেও  
আমার পরিচয় হয়েছে; কিন্তু প্রত্যেকটি পড়বার  
পর আমার অজ্ঞাতসারেই আমার মূখ দিয়ে নেন  
বেরিয়েছে—হল না—হল না, “ইহ বাহু, আরও কহ।”  
রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ নির্ণয় করা এত সহজসাধ্য নয়।

হয়ত এই ‘রবীন্দ্র-জয়ন্তী’ উৎসবে কবির উদ্দেশে  
রচিত বিশ্বের বন্দনা শুনেও আমাকে বলতে হবে—

“ইহ বাহু, আরও কহ।” \*

• রবীন্দ্র-সাহিত্য-সংগঠনে পঠিত।

## জয়ন্তী

শ্রীকরণাধিনান বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্তরে মাদুরীন্দ্রা, কণ্ঠে তব মহাসরস্বতী,  
দ্বীপের আগনে বসি গারিতেছ তুমি আরতি;  
সোনার বীণেতে বাজে স্বন্দরের স্বরধ্বনি গান,  
রচিত্য রসমুগ্ধি, মহিমার পেরেছ মজান।

লাট প্রাণী তব কি অপূর্ণ যোতির তিলকে,  
কি রহস্ত প্রতিভাত আলোকের অতীত আলোকে;  
বাণীর বাহিনী তব বহুদুর করে প্রদক্ষিণ,  
উজ্জ্বল-ময় স্থরে স্বকারিছ কি উদাত্ত বীণ।

চিত্তস্নান সত্য শিব,—সেই কাব্য, অমৃত-প্রাণন,  
উপহার-ভালি ভরি' নামা দেশে কর বিতরণ,  
নানা ভাবে বিকসিত তোমার মানসপদ্মবালা  
কেশে পরাগে তার স্বর্ণের কুন্তময়ে ঢালা।

সেই অবিদ্যারী প্রাণ তরু-তৃণ, মাটিতে-আকাশে  
আনন্দের অগ্নিপানে লুপ্ত উৎসবে ফিরে আসে,  
অসীম-অপরিমাণ সেই প্রাণ, তারি পূর্ণ লাভি'  
ভারত-পূণ্য-ক্ষেত্রে উদিতাছ তুমি মহাকবি।\*

• রবীন্দ্র-সাহিত্য-সংগঠনে পঠিত।

## রবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীপ্রিয়জ্ঞানুরা বহু

যে জাতিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন সে জাতি ধর্ম।  
রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর বয়সের জন্ম তাঁকে স্মরণিত করে  
আমরা নিজেদের জগতের কাছে প্রকাশিত করেছি।  
অনেকবার তাঁকে এর আগে আমরা অভিনন্দিত করেছি,  
আরও অনেকবার করব এ আশা রাখি।

বিশেষ থেকে সাহিত্যের জগতে পুরুষত্ব হয়ে রবীন্দ্রনাথ  
বাঙলা ভাষাকে তাঁদের কাছে গণ্য করেছেন এবং তাঁর  
প্রতি তাঁদের প্রাণবন্ত অধরাগ জেগেছে—আমাদের কাছে  
তার খুব বেশী দাম নেই। যারা পেয়েছে যৎকিঞ্চি,  
তাঁদের বাস্তবিক গুণগাহিত্যের বলে তাহেই তারা ঝড়  
করে দেখেছে—তাতেই তারা মুগ্ধ হয়েছেন।

আজকের বাঙলা ভাষাকে তৈরী করেছেন রবীন্দ্রনাথ।  
বাঙলাভাষাকে তৈরী না করলেও সব দিক দিয়ে, তার  
সকল বিভাগে 'যে অতিশুভপূর্ণ অবর্ণনীয় শক্তি ও সম্পদ

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে তার উৎস এক।  
রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাঁরই প্রভাবে এর এখন অতাবনীয়  
পরিণতি ঘটেছে। যেখানে তিনি হাত দিয়েছেন তাঁর  
স্পর্শের ইচ্ছাভালে সেখানেই সোণা ফলছে। ছবি  
আঁকবার জগ্গে তিনি ফুটি ধরে—চিত্রকলায় পৃথিবীর সহ  
ওস্তাদ ছবির সমজ দারকে বিদিত—চমকিত করেছেন।  
তার-তার আঁকা ছবিকে শ্রেষ্ঠত্বের, মর্যাদা দিয়েছেন।  
অনেকবার একথা বলেছি, আবার বলাই যে বিশ্বসাহিত্যের  
ইতিহাসে এমন উদাহরণ বিদ্যমান নেই। আমরা অনেক  
পূর্বেই পূণ্য করেছিলাম—রবীন্দ্রনাথকে আমাদের বলে  
দাবী করতে পারছি। শরৎচন্দ্র খারাপই বলেছেন, ভবিষ্যতে  
যারা আসবে তারা রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়বার সৌভাগ্য  
লাভ করবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখেছে, তাঁর কথা শুনেছে  
তাঁর কাছে যেতে পেয়েছে এমন পূর্ণ তারা করতে



পারবে না—সে গর্ষের কেবল আমরাই অধিকারী হয়ে  
রইগুম। অনেক বলছেন এমন সময় রবীন্দ্র-জয়ন্তী  
হওয়া উচিত ছিল না—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুগীতসংবরণ  
আয়োজন করা উচিত ছিল না। মতভেদ জগতে হ'তে  
পারে, হ'লেই থাকে; কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ হয় তাদের  
উক্তি, তারা এখন ইঙ্গিত করেন যে, দেশের বিষয়ে  
যেন রবীন্দ্রনাথ উপাশীল। রবীন্দ্রনাথ কি দেশকে ভাল-  
বাসেন না, রবীন্দ্রনাথ কি দেশের স্বত্ব কান্ডে চেয়ে কম  
কিছু করেছেন, দেশের বর্তমান প্রসঙ্গেরও কি তাঁর বাণী  
তাঁর রচনা, তাঁর ভাবনা স্বভাব অধিকারকে তীক্ষ্ণতার বিন্দু  
করেনি? কিন্তু তিনি প্রধানতঃ কবি—কবিরা স্বভাব  
তিনি ছাড়িয়ে কি করে। সকলে সব সময়ে শুধু এক-  
দিক দিয়েই, শুধু একটি মাত্র ব্যাপার অবলম্বন করেই  
দেশের মুখ চাইবেন না তো। দেশের কি আনন্দ যেতে হবেনা  
রসের নিক থেকে তার কি দ্বয়ের কোন আকাঙ্ক্ষাই  
থাকবে না? সে জ্ঞানন্দ, সে আকাঙ্ক্ষা দুয়ের পাশে  
পাশেই চলেবে, দুয়ের তীব্রতাকে মোলারেম করবার জন্যে  
তারও প্রয়োজন। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি :—

‘তুনেতা অসিমালা, ওরা বড় বিজ্ঞার দিচ্ছে, ঐ ও  
পাড়ার মল্লের দল, উৎসবে তোমাদের চাপলা ওদের  
ভালো লাগে। শৈবালপুঞ্জিত শুভাচারে কালো  
কালো শিলাবণ্ডের মতো তাম্রপ্রগণ গাঠীয়ে ওরা নিশ্চল  
হয়ে জলুটি করছে, নিরুপাশী ওদের সামনে দিয়ে বেগিয়ে  
পড়ছে এই আনন্দময় বিবরণে আনন্দ-প্রাণ দিয়ে গিলতে  
বইয়ে দিতে, নাচে গানে কলোলে হিলোলে কলগাছে :—  
চূর্ণ চূর্ণ সূর্যের আলো উৎসল তরঙ্গদগ্ধ হলে ছলে বিকীর্ণ  
করে দিতে। এই আনন্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে অক্ষর  
সৌর্যের অম্লপ্রেরণা আছে, সেটা ওদের শাব্দবচনের  
বেড়ার বাইরে দিয়ে চলে গেলে। ‘তব ক’র শানো তোমার।  
নৈশবাসের নিমন্ত্রণে তোমার এসেচো, তাঁর প্রসন্নতা  
যেমন নেমেচে আমাদের নিকটে অস্তঃস্থিত গল্পগল্প মুখের  
প্রাঙ্গণ গল্পগল্পে, তেমনি মানুষ তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে,  
তোমাদের খেলার নিকট নটনোৎসবে। সেই গিনি  
স্বরের গুণ্ড, তাঁর চরণে তোমাদের নৃত্যের অর্ধা নিদ্রার  
ক’রে পাও।’

রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে বিরুদ্ধমতবাদী আছে এমন থাকবে।  
থাকই তো স্বাভাবিক। পৃথিবীর সকলে সর্বসম্মতিক্রমে  
গ্রহণ করেছে এমন ব্যাপার বা এমন মাধ্যম ছিলনা—নেই—  
থাকবে না। বিরুদ্ধ মত থাকে, তাঁদের বিরুদ্ধও সম্মান-  
যোগ্য বতকণ্ড তা বিবেচনায় কদুদিত, শিল্পীতার বিন্দু বা  
ইহর না হয়—বতকণ্ড তা রবীন্দ্রনাথের রচনার সমালোচনা  
হয়, রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তির নয়।

রবীন্দ্রনাথকে তারা ভালবাসেন না, রবীন্দ্রনাথের কাছে  
যাবার কোন তাগিদ তাঁদের নেই, কিন্তু তাঁকে তারা  
ভালবাসেন তাঁদের অনেকেও তাঁর কাছে যেতে পান না  
এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। অভিযোগ সত্য  
হ'লে খুবই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে এই  
ব'লে তাঁদের প্রবোধ দিতে হ'বে যে, তাঁদের চেয়ে তারা  
রবীন্দ্রনাথকে বেশী ভালবাসেন বলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস,  
সেই সব ব্যক্তিদেরই তাগিদ ভাল—বা এমনও মনে করা  
যেতে পারে যে তারা ভালবাসা দেখায়, প্রচার করে বা নানা  
উপায়ে প্রকাশ করবার কৌশল আয়ত্ত করছে, তাদেরই হয়  
অজ্ঞানকার, তারা সত্য ভালবাসে কিন্তু তার ঢাক পিটার না  
বা বিজ্ঞান দিতে জানে না তারাই হয় বাকিত। ছোঁর  
যারা করুতে পারে তাদেরই মিল আছে, তারা বিরুদ্ধ করেনা  
‘এক্সপ্লিট’ করে না তাদের পিছনেই পড়ে থাকতে হ'বে,  
ভালবাসার বিষয়েও এমন হ'লে সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু যদি  
হয় তো উপায় কি?

কিন্তু কী পৌর-সভার অভিনবনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ  
বা বলেছেন তারই প্রতিধ্বনি করে বলি ‘এই পুরসভা আমার  
জন্মগণরীকে আরামে আশ্রয়ণ আশ্রয়ণে চরিতার্থ  
করুক, ইহার প্রবর্তনে চিত্রে, ছাপতো, গীতকলায়,  
শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক, সর্বগণকার মনো-  
নিবাস সুখে সঙ্গে আশ্রয় কলঙ্ক এই নগরী খালক করি।  
তার, পুরবাসীদের দেহে শক্তি আনুক, গৃহে স্নান, মনে  
উজ্জ্বল, পৌরকলাপ-মাধনে আনন্দিত উৎসাহ হোক। দ্রাষ্ট-  
বিদ্যোদয়ের বিশ্বাস আশ্রয়দায়ক পাপ ইচ্ছাকে কদুদিত না  
করুক—স্বত্ববুদ্ধি ধারা এখানকার সকল জাতি সকল ধর্ম  
সম্প্রদায় সমিলিত হইয়া এই নগরীকে অমলিন ও শান্তিকে  
অবিচলিত করি। এই আমি কামনা করি।’

## যাত্রা-পথে

(গদ্য)

শ্রীমন্তের গুপ্ত

(১)

গুপ্তের ছেলেটা ভারি অদ্ভুত। যেশে সে অনেকের  
সঙ্গে, কিন্তু বন্ধুর ছিল খুব অল্প লোকের সঙ্গে। কেউ কেউ  
ঠাট্টা করে বলত, “গুপ্তেনের সব চেয়ে বড় হচ্ছে ‘সিনেমা’।  
সে নিজেও একধা বড় অধিকার করত না। সিনেমা  
দেখা তার নিত্য চা খাওয়ার মতই স্বাভাবিক হ'য়ে  
গিয়েছিল। প্রথম প্রথম তার আদ্য-স্বজন আর পরিচিত  
লোক অনেকেই তাকে বাধন করেছিলেন, কিন্তু সে তা  
হাসে উড়িয়ে দিত। চণ্ডার ‘পাওয়ার’ও বেড়ে চলেছিল,  
কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করবার তার মোটেই সময় ছিল না।  
অবশ্য পড়তে তার কোন আগ্রহ ছিল না, আর সে পড়তও  
ভাল। তা না হ'লে কি আর ‘মেডিকেল কলেজ’ বদলার  
সীমিত পাস করে যেতে পারে? লেখাপড়া কিছু করত  
বলেই তার বিপক্ষে বাড়ীতে বিশেষ কোন কথাবাণী  
উঠত না কিন্তু তাকে প্রতি সপ্তাহ কেউই বড় ছিল না, কারণ  
তাকে যদি বলা হ'ত, পুঁব দিকে যেতে সে তা হলে  
পশ্চিম দিকে যাবেই যাবে। এতে সব চেয়ে আশা  
পড়তেন তার মা। সে যে বৃকতে পারত না তা না, তবে  
বৃকতে পেরেও কিছু করে উঠতে পারত না। এটা তার  
এমনই অভাঙ্গ হ'য়ে গিয়েছিল। এ ছেন গুপ্তেন এখন  
এলাহাবাদ থেকে প্রণতির এক আহ্বান আসতেই যাবার  
ছদ্ম প্রবৃত্ত হ'ল, তখন তার পরিচিত বা অল্প পরিচিত  
সকলের কাছেই এ ধরটা গিয়ে পৌঁছল; আর সকলেই  
বেশ আশ্চর্য হ'য়েছিল, কারণ এটা ছিল তার স্বভাব-  
বিরুদ্ধ। তার মা একটু দুঃখ করেই বলেছেন, “কোথাকার  
কে প্রণতি ভাঙতে ছেলে একবারে এলাহাবাদ চললেন,  
আর আমরা যদি একবার গ্রামবাঙ্গার যেতে বলি তা হ'লে  
ছেলের পড়ার ক্ষতি হয়। ধড়ি ছেলে!” বাস্তবিক কান্ডের  
কথা শোনা তার মনে খাটখাট ছিল না। যে কোনো  
কথাতেই সে গোড়ায় না বলে বসে, তাই সে যখন এক ডাকে  
প্রণতির কাছে ছুটল তখন সকলেই আশ্চর্য হ'য়েছিল।

প্রণতির কাছে গুপ্তেন ছিল আর এক রকমের মানুষ।

তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একবারে ভাল মানুষ হ'য়ে  
যেত—যেন কত কথা গল্পী ছেলেটা। কোন মেয়ের কাছে  
সে যে এত শান্ত হ'য়ে যাবে তা সে ভাবতেও পারে নি।  
সত্যি, মেয়েদের দেখলেই তার কমন একটা আকোশ হ'ত যে,  
সে আশা না করে থাকতে পারত না। আশা কতকে  
সে মনে করত সে যাকে আশা করলে সে তার কাছে  
আর আসবে না, কিন্তু তা হ'ত না—আর হ'ত না বলেই তার  
আকোশ আরও বেড়ে যেত। কেবল প্রণতির বেলায় এ  
নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ত।

(২)

প্রণতির সঙ্গে তার পরিচয় হ'য়েছিল এক অদ্ভুত রকমে।  
সে দিন ছিল তার পেন্সাল ডিউটি (বিশেষ কাজের পালা),  
ঘরে গিয়ে বেধে একটা বছর পাঠকের ছেলে—তার হ'য়েছে  
ডিপথের। তার পাশেই বসেছিল প্রণতি। একবার  
ছেলেটাকে দেখে নিয়ে গুপ্তেন নিজের চোরে গিয়ে বসল।  
মায় রাত্তর ঘামের ‘ডিউটি’ (কিন্তু) পড়ে—বিশেষতঃ  
এই সব রোগের কাছে, তাদের অবস্থা কি ভয়ানক! ঘুম  
থেকে উঠে এসেছে—চোখ তখনও ঘুম ভেঙ্গে পড়ছে,  
অথচ এক মুহূর্ত অজমল্ল হ'বার উপায় নেই। ছেলেটার  
গলায় ছোট ‘টিউব’ (রোগের নল) দেওয়া আছে—একটার  
মধ্যে আর একটা। ছেলেরের কাছ হচ্ছে ভেতরকার  
‘টিউব’টা পালক দিয়ে পরিষ্কার করা। যার পালক না  
দেওয়া যায় তা হ'লে কোন হাউস-সার্জেনকে ডেকে  
পাঠাতে হ'বে। গুপ্তেন যখন তার উঠে ‘টিউব’ পরিষ্কার  
করে দিচ্ছে—বেশ শঙ্ক অবস্থা ছেলেটা ছিল। হঠাৎ  
প্রণতি তাকে ডেকে বসলে, “কি রকম করছে দেখুন।  
গুপ্তেন উঠে গিয়ে দেখলে একবারে শীল হ'য়ে উঠেছে—  
আর পালক চলে না। কোন দিক না ভেবে যে ‘ইনার’  
(ভিতরকার) ‘টিউব’টা টেনে বার করে দিলে।  
ছেলেদেরই এ বিষয় কিছু জানা ছিল না। সকলেই তখন



ছোটো 'টিউব' থাকে, কিন্তু কি রকম করে যে বার করতে হয় তা জানে না। 'টিউব'টা বার করে দিতে ছেলেরা হুস্থ হুস্থ বটে, কিন্তু স্বতন্ত্রের বোজার ভয় হ'য়ে গেছে। টিউব বার করার তো তাদের কোন অধিকার নেই। সে 'হাউস কিংসিয়ানকে' ডেকে পাঠালে। তিনি এসে বললেন, "বাঃ, এত বেশ রয়েছে, তুমি আমায় ডাকলে কেন?"

"মার একটা অভাব করেছে। ছেলেরাও দম আটকে যায় মনে ভিতরকার টিউবটা খুলে দিয়েছি।"

"বল কি? খ্রিস্টিয়ান জানতে পারলে—"

প্রণতি বললে, "উনি যদি তখন এই সামান্য অজারটা না করতেন তা হ'লে একে বাঁচান সম্ভব হ'ত না। তখন যে অবস্থা হ'য়েছিল তাতে আপনাদের কারুকে ডেকে আনবার আগেই আপনাদের আসবার দরকার ফুরিয়ে যেত।"

"ক'র লাভের জন্তে ছোটো কল্লি সব সময় স্বীকার করে নেওয়া যায় কি বল স্বতেন? হাউস কিংসিয়ান চলে গেলে প্রণতি বললে, "তুমি তাই আর যে উপকার করলে—"

"ভাই বলেই যদি বলেন মনে তা হ'লে আর উপকার করার কথা বলছেন কেন?"

"এটা কি শুধু কথার কথা না সত্যি বস্তু?"

"সে কথা তো আপনাকেও জিজ্ঞাস্য করতে পারি।"

"আচ্ছা যে ক'দিন এখানে থাকব তার মধ্যেই বুঝতে পারা যাবে।"

( ৩ )

হাসপাতাল থেকে চলে যাবার সময় প্রণতি স্বতেনকে অজ্ঞায়্যে করেছিল তার বাড়ী যাবার জন্তে। অল্প ক'উ এ কথা বললে স্বতেন হেসেই উড়িয়ে দিত, কিন্তু প্রণতির কাছে তা পারে নি। প্রণতিদের বাড়ী গিয়ে সে আবাক হ'য়ে গেল—প্রণতি আর তার ভাই ছাড়া তার আপনান বসতে আর কেউ ছিল না। প্রণতি বসতে পেরেই বললে, "আমাদের একা থাকতে দেখে একটু আশ্চর্য্য হসছে না? একদিন যে কি ভাবে কেটেছে তা কি বলা! এলাহাবাদে হঠাৎ এক তার পোশাক যে মার অবস্থা খুবই পরাণ—চলে আসতে হ'ল; স্বামী ছুটি পেলেন না তাই একাই চলে এলাম।"

"এলাহাবাদ থেকে একা এলেন?"

"তা এলাম বৈ কি? আমি তো ভাই পোড়া হিন্দু বারের মেয়ে নই; আমাদের মাঝে মাঝে এরকম করবার দরকার হয়। যদি না আসতাম তা হ'লে কি হ'ত বসতো? যেদিন এলাম, সেই দিনই মা মারা গেলেন। ভাইটাকে নিয়ে ঘিরে যাব ভাবছি এমন সময় ওর হ'ল 'ডিপারিডা'; এই যদি পাড়াতে হ'ত তা হ'লে কি বিপদেই পড়তাম বল তো?"

"পতর বাড়িতে আপনার এমন কেউ নেই যে এই বিপদের সময় সঙ্গে আসতে পারেন?"

"আছে সবাই, কিন্তু আমাদের সাহায্য করার কেউ নেই। আমার স্বামী হিন্দু ছেলে, শুধুনি হ'য়ে আমার বিয়ে করেছেন কি না।"

"আপনার স্বামী কি করেন?"

"সেখানকার কলেজে অধ্যাপনা করেন।"

"আপনি তা'হলে নিম্নাধার—"

"তুমি তাকে জান?"

"হ্যাঁ জানি—আপনার চেয়ে বোধ হয় ঢের আগে থেকেই জানি। তা হ'লে তো আপনাকে দিদি বলা চলে না, বোদি' বলতে হয়।"

"না ভাই, যে সম্পর্ক অজানতে হ'য়ে গেছে সেটাই ভাল—বোদি বললেই পুরোন কথা সব পনে পড়ে যাবে। তিনি আমায় বিয়ে করে শুধু যে জাত হারানোটা না নয়, সেই সঙ্গে স্বাধীন-বন্ধনের বেধ থেকেও রক্ষিত হ'লেন।"

"সেই থেকে বঞ্চিত হ'য়েছেন তা ঠিক বলা চলে না। কঠোরতাটা হয়তো তাদের বাইরের পোশাক হ'তে পারে—সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে অনেক সময় মহদকে নিজের সঙ্গেও প্রত্যারণ্য করতে হয়।"

"একি ভাই ভাবী অজ্ঞায়! ধর্ম বদলে গেলেই কি ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়ে যায়, না তা ইচ্ছে করলেই ছিঁড়ে ফেলা যায়? মনের স্বাভাবিক বন্ধনের মাঝে মাহুষের হাতে গড়া কৃত্রিম ব্যর্থন কি টিকতে পারে না তা গড়তে যাওয়া উচিত?"

"সেই কি সত্যই ক্রমতে পারে? ও শুধু লোকাতারের ভাবে লোকের চোখে মুখে দেবার চেষ্টা। বাবু কথা কইতে কইতে অনেক দেরী হয়ে গেল, আঁধা উঠি।"

( ৪ )

( ৫ )

এলাহাবাদে ফিরে যাবার আগে প্রণতির কাঁজে স্বতেনকে প্রতিজ্ঞা করত হ'ল যে, সময় পেলে সে প্রথমেই বাবে এলাহাবাদে।

ফতন শুধু কথাই বের নি, প্রণতি চলে যাবার পর সে রোজই তার কথা ভাবত, আর ভাবত কবে তার ডাক আসবে, তাই সে ডাক বোধিন এল, সে দিন আর সে ভাববার অবসর পেল না, একবারে যাবার জন্তে প্রস্তুত হ'য়ে গেল।

প্রণতির পরিচয় সে বাড়ীতে কারুকে দেয় নি, আর সে যে নিম্নাধারের বাড়ী যাবে একথা কেউ করনাও করতে পারে নি, তাই তার পক্ষে যাওয়াটা খুবই সহজ হ'য়ে গিয়েছিল।

প্রণতির চিঠি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ অনেক কথাই তার মনে হচ্ছিল। নিম্নাধ তাকে দেখে কি বলবে, প্রণতি তাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করবে ইত্যাদি। এলাহাবাদে সে গিয়েছে অন্ধারিন আগেও—নিম্নাধের বিয়ের আগে পর্যন্ত; তবু মনে হচ্ছে যেন কত দিন সে যায় নি।

খুব আনন্দের সঙ্গে সে নিম্নাধের বাড়ীর কাছে এগিয়ে চলেছিল, দূর থেকে নিম্নাধকে সে দেখতে পেল, কিন্তু সে তাকে দেখে যে খুব সন্তুষ্ট হয়েছে তা তার মনে হ'ল না। সে ভাবি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। এতো সে মাথাও করতে পারে নি। নিম্নাধ বললে—"এসেছি! আয়।"

প্রণতির সঙ্গে দেখা হ'তে বললে, "ব্যাপার কি বলুন তো?"

"কেন?"

"এতদিন পরে এলাম তা নিম্নাধ-পা ভাল করে কথাই কইলেন না! নাঃ, এসে তো তাহলে ভাল করি নি।"

"হাঁ, আশ্চর্য্য উনি একটু বেশী গম্ভীর হ'য়ে গেছেন। তা হ'লেও তুমি তো আর ওর ডাক আস নি, এসেছ আমার কাছে। বোনের কাছে ভাই এসেছে, তাতে আর একজন যদি কথা নাই কর তাতে ক্ষতি কি?"

দন ওগো যে কোথা গিয়েছে কেটে যাচ্ছিল তা স্বতেন মোটেই বুঝে উঠতে পারলে না। কলেজের পড়ার সময় তা দিনগুলো এত সহজে কাটে না। তখন মনে হয় পৃথিবী এত বৃদ্ধা হ'য়েছে যে সে আর একটানা চলতে পারে না, তাই বোধ হয় একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। লেখাপড়ার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাই কোন বিশেষ কাজ তার ছিল না। দিনের মধ্যে অনেকটা সময়ই সে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিত, আর রাত্তি সময়টা কেটে যেত প্রণতির সঙ্গে গল্প করে। যে স্বতেন মেয়েদের দেখলে ঠাট্টা করবার লোভ কোনদিন সাধারণ করতে পারত না, সে যে হঠাৎ প্রণতির সঙ্গে এত সহজ হ'য়ে বন্ধন স্থাপন করতে পারবে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। স্বতেন বলত সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরেছে তার কথা, আর প্রণতি বলত তার ছোটো বেলাকার কথা। রোজই প্রায় এই প্রসঙ্গেই আলোচনা চলত, কিন্তু তাতে তাদের আনন্দের কোন বাসন্ত হ'ত না।

নিম্নাধের সঙ্গে স্বতনের দেখা হ'ত অরই। কলেজের কাজ তার বেশীকণ্য করতে হয় না, তবু বাড়ীতে তার দেখা পাওয়া দের না—বিক্ষেপ করলে বলত "অনেক কাজ আছে।" কাজ যে এত কি তা স্বতেন তো বুঝতই না, প্রণতিও বোধ হয় জানত না। একদিন স্বতেন বললে, "আচ্ছা নিম্নাধা আগে তোমার কাছে এলে তুমি আমার একা থাকতে দিত না, আর এবার তোমার দেখাই পাওয়া যায় না। কি হ'য়েছে বলত?"

"তখন ইলান মাহুষ, এখন এসে পাঁড়িয়েছি ঠিক মাহুষ ও পরবর্তী জীবনবিশেষের ব্যবধানের খোঁজ, আর দুদিন পরে হয় তো আমার সাধারণ লোকের মধ্যেই খুঁজে পাবি না।"

"সেই ভাই করছি, কিন্তু কার কি বলা তো?"

"জলে ভোবাবার সময় লোকে যে কাঠে'র ঘিরে চলে গোটো যদি হঠাৎ লোহা'র জুড়ে যায় তা হ'লে কি আর ভাসা চলে?"

স্বতেন এ কথার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না।



কোন কথা জিজ্ঞেস করবার আগেই নিশাচ চল গেল, কারণ প্রণতি এসে দাঁড়িয়েছিল।

শ্বতেন তার মুখের দিকে চাইতেই প্রণতি বললে, “বৃহতে পারলে না? ভেবেছিলাম তোমার একদিন বলব, কিন্তু পেরে উঠি নি। আজ কথাটা যখন উঠল তখন বলি! আমার বিয়ে করে তোমার দাদা একটুও সুখী হন নি। বিয়ের আগে ভেবেছিলাম তাকে সুখী করতে পারব, কিন্তু আজও তা পেরে উঠলাম না। যে বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে আমার বিয়ে করেছিলেন, সে বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হয়েছে! তাকে দৃঢ় করতে যত বেশী চেষ্টা করি, সেটা তত বেশী দৃঢ় হয়ে যায়।

শ্বতেন কৃষ্ণে ঝড় উঠবে, আর সে ঝড়ে বোধ হয় এক্ষণে এ মৃত্যু সূত্রের নীড়টা অটুট থাকবে না। এ সব কথা ভাববার কোন দিন সে অবসর পায় নি—তাই আজ যখন তার সামনে এসে কাল বৈশাখীর অগ্নিহুত ছোট মেঘটা দেখা গেল, তখন সে বেশ বিরম্ব হয়ে উঠল। এর চেয়ে যে প্রণতিকে না জানো ছিঁগে ভাল! তাই কি?

( ৬ )

হৃৎকণের সঙ্গে শ্বতেনের বড় বেশী পরিচয় ছিল না, তাই এত বড় একটা হৃৎকণের ছায়াপাত হ’তে দেখে প্রথমে সে একটু চমকে উঠেছিল। তাবলে, ভেবে কিছু ঠিক করে উঠতে পারলে না। বিরক্ত হয়ে প্রণতিকে বললে, “চলুন বেড়িয়ে আসা যাক”

সন্ধ্যার পর তারা বেড়িয়ে ফিরছিল গল্প করতে করতে। মেঘটা বেন অনেকটা হালকা হয়ে এসেছিল। হঠাৎ প্রণতি চলতে চলতে দাঁড়াল। সে যে দিকে চেয়েছিল, সেদিকে চেয়ে দেখে বসন্তবাণ, “নিশাচনা না? সঙ্গে কে বসুন তো?”

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রণতি বললে, “চল ভাই তাকাত্তি বাজী দিয়ে যাই; বনের কাজ করতে হবে তো।” তার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে শ্বতেন একটু আশ্চর্য হয়েছিল। প্রণতির মুখের দিকে চেয়ে সে বেশ কৃষ্ণে যে সে তাকে শাসন করবার চেষ্টা করছে! কেন, তার কথাগুলো অস্বাভাবিক প্রণতি দিল না? শ্বতেন না পেয়ে? না আজ কোন কারণে? তার সম্বন্ধে হ’ল।

রোজ বেড়িয়ে কেবল সময় পাঠা মাটিরের বাজী হ’য়ে, শ্বতেন বিস্মিত। তার চিঠি আসত কেবল অব পাঠা মাটিরের সঙ্গে; পাছে কেউ জানতে পারে সে নিশাচদের বাজী আছে তাই সে এই পথ ধরেছিল। আজ প্রণতি গলেছিল বলে আর পাঠা অফিসে যাওয়া হল না। সন্ধ্যার পর তার চিঠি দিয়ে গেল একটা চাকর। চিঠি দিয়েছেন তার বাবা, আর তাকে পরদিনই ফিরে যেতে লিখেছেন—বিশেষ কাজ আছে। এমন কি কাজ থাকতে পারে সে ভেবেই গেল না। এত তাকাত্তি চল যেতে হ’বে বলে তার গুণ হুগু হুগু হচ্ছিল।

কথাটা জানতে পেরে প্রণতি বললে, “তোমার ডেড দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না ভাই, কিন্তু কি করব? তুমি চলে যাবার পর আর কিছু ভাল লাগবে না ভাই।” শ্বতেন ঠাট্টা করে বললে, “চলে গেলে আর মনেও পড়বে না।”

“অনেক কাজের মধ্যে তুমি হয় তো আমার কথা মনে না করতে পার, কিন্তু আমি এত অবসরের মধ্যে মনে না করে তো থাকতে পারব না!”

( ৭ )

আশ্চর্য্য অনেকে অনেক রকমে হয়, কিন্তু শ্বতেনের মত বেশ হয় কেউ-কোনদিন হয় নি। বাজী চুকতে না চুকতেই ছোট ভাই ছোট এসে খবর দিলে, “দাদা, তোমার বিয়ের সব ঠিক হ’য়ে গেছে। বাবা বলেছেন আমাদের মাষ্টার ছাড়িয়ে লেবেন, বৌদি এসে পড়বে।” এতবড় সুখবরের বললে হঠাৎ কাশাবা খেয়ে বেচারী বেজার চটে গেল; কিন্তু শ্বতেনের হ’ল ভাবির বিশ্বাস। এক কণা আজ পর্যাণ্ড সে তো কোনদিন ভেবে দেখবার অবসর পায় নি! বিয়ে করবে? তাও কি সম্ভব? সকলে করছে বলেই তাকে করতে হ’বে? কিন্তু না করেই বা উপায় কি? বাবা যদি হুকুম করেন তাহলে কি সেটা অশাস্ত করা উচিত হ’বে? কি করা যাক তা তেবে ঠিক করবার আগেই তার বাবার কাজ থেকে ডাক এল।

বাবার কাছে যেতে যেতে তার মনে হ’ল তার বৃদ্ধ দর-অনেকেরই তা বিয়ে হ’য়েছে, তারা কি অসুখী না সুখী?

“বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি বললেন, “তোমার এত তাকাত্তি নিয়ে এসেছি কেন তা বোধ হয় তুমি পট্টর কাছে শুনেছ।” এতে তোমার কিছু বলবার নাই?”

শ্বতেন কোনদিন তার বাবার মুখের ওপর কথা কয় নি। আজ তার কি হ’ল হঠাৎ বলে ফেললে, “এখন বিয়ে করা কি ঠিক হ’বে?”

“না হ’বেই বা কেন?”

“আমার এখনও পড়া শেষ হয় নি।

“তা আমি জানি।”

“নিজে দাঁড়াতে না পেরে আর একজনের তার নেওয়া কি—”

“এর মধ্যে কারুর তার নিতে তোমাকে বলা হচ্ছে না। সে ভাবনা আমার। তুমি কি মেরে দেগতে চাও?”

দেখে এসেই ভাল।

“দেখবার কোন দরকার নেই—আপনাদের পছন্দ হ’লেই হ’ল।”

“তাকে দেখলে অপছন্দ করবার কারণ যে কিছু থাকতে পারে না—কুপ লম্বী শুণে সরস্বতী”—তার উপর বড় লোকের মেয়ে, আদব-কায়লা দ্রুত।

“বড় লোকের মেয়ে?”

“আতকে উঠলে যে। তাতে দোর কি? শুধু বড় লোকের মেয়ে হ’লে আমি নিজেই বাধা করতাম, কিন্তু সে যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে। আমি সেইজনই তার দিকে এত খুঁকেছি।”

শ্বতেনের কোন আপত্তি ট’কল না। এতে সে বিশেষ দুঃখিত নয়। একদিকে জীবনের এক মৃত্যু বিড় তার কাছে গুলে যাবার অবসর হ’ল, আর অপর দিকে একজন বড় লোকের শিক্তা ময়েকে আপনায় সে করতে পারে এতে জয়ের আনন্দও পড়তে লাগল। শীলার মত বিদ্বী তদৃশীকে সে নিজের সম্পূর্ণ অধীনে পারে—তবু মনে কোণায় একটা অনিচ্ছা শরা তার মনে মাঝে মাঝে উকি মারতে লাগল।

নিশাচের যে নিমন্ত্রণ হবে না তা সে জানত, তবু একবার মা’কে বললে। তার বাপ শুনে বললেন, “সামাজ্য থাকতে গেলে তাকে কি করে নিমন্ত্রণ করি বল!” শ্বতেন আর এ বিষয়ে কিছু বলিল না।

( ৮ )

শীলার সঙ্গে শ্বতেনের দু’ভাব হয়ে গেল খুব অল্প দিনে। আর এটা বেশী যে কোন অশিক্ষিত মেয়ের পক্ষে তা ভাবাই কঠিন। শীলা তার কবিতার খাতা শ্বতেনকে দেখাতে রাজি হ’ল, আর শ্বতেন তার বদলে তাকে তার ডায়েরী দেখতে দিলে। সে বেশ জানত তার সিনেমা দেখার হিসেব শীলার বেশীকাল ভাল লাগবে না, তাই তাকে একমনে পড়তে দেখে বললে, “ব্যাপার কি? এ তো হস্তাশ-প্রেমিকের ডায়েরী নয়, এত করে পড়ছ কি কলতো?”

“আচ্ছা তুমি তোমার ‘প্রণতি-দীপ্তিকে খুব ভালবাসা না?”

“প্রণতি-দীপ্তি? তুমি তার নাম জানলে কি করে?”

“বাবা ডায়েরীর পাতার পাতার তার নাম, আর আমি তার নাম জানলাম কি করে? আচ্ছা তাকে খুব ভালবাসা না? আমার চেয়ে বেশী?”

“তোমার চেয়ে? পৃথিবীর সকলের চেয়ে তোমার তো এই কদিন কাছে পেরেছি।”

শীলার সম্মানে আশাও লাগল, সে আর কোন কথা বললে না। শ্বতেন কোনদিন মনস্তত্ত্বের ধার ধারত না, তাই শীলার মধ্যে যে কোন পরিবর্তন হ’তে পারে তা মনেও করলে না। কিছুকাল পরে জিজ্ঞেস করলে, “তোমার কি রাগ হল না কি?”

“রাগ হ’বে কেন সত্যিই তো।” এক দিনের পরিচয়ে অন্তটা আশা করা কি ঠিক?”

শ্বতেন মনে-করলে ঝড় কেটে গেল। সে জানত বৃদ্ধের মনের ঝড় ঠিক এমনি ভাবেই কেটে যাবে। মেঘ ঘন অন্ধকার হয়ে আসে, কিন্তু কোথাগুণে ঝড় এসে সে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যায়—আবার আসে, দেখা দেয়। শীলা হেসে তার সঙ্গে কথা ক’ইলে, সে মনে করলে সব বিপদ এখানেই কেটে গেল।

( ৯ )

দুঃখ কষ্ট সঙ্কট প্রণতির কোনদিন অভাৱ ছিল না। তাই দুঃখ যখন তার সামনে এসে দাঁড়াল, সে তাকে



একশ চমকে উঠল। সে আর তার ভাই ছাড়া তার বাপ-মার আর কেউ ছিল না; তাই যাবার স্মারক রাখা গেল—সেদের চেয়ে অনেক স্নেহ-স্বাধা উপভোগ করেছে। বাপ-মার যাবার পরও সে কোনদিন কোন কষ্ট পায় নি; কারণ তার বাপ-মার সময় তাঁর সন্তান হচ্ছিল না। যাকে রেখে গেছেন। আর সেটা ভাই-বোনদের আশা-আমিহ।

ভাই তার ভিগ্নের পর থেকে বদলিয়ে গেল। আর তাকে নিশীথ এক বিরক্ত হয়েছিল যে তার কোন ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা তার কথা শুনেই তার রাগ হত। প্রথম প্রথম সে কোন কথা বলত না, কিন্তু বেশীদিন সে তাই পেল না। সারাদিন সে বাড়ি থাকত না। কোন কথা জিজ্ঞেস করলে বলত যে, 'হাঁসপাতাল বাড়ীতে বসে, তা'তে কার বাড়ী চুকতে ইচ্ছা হয় না।' একথাও প্রণতির সঙ্গে গেল কিন্তু যেদিন মাঝে মাঝে ত্রিধিকবে ডাকবার কথা নিশীথ বলে, 'আজ্ঞা বিপদে পড়া গেছে তো, ছেলেরা যাবারও নাম নেই'—তিনি প্রণতি আর নিজেকে সমস্ত রাখতে পারলে না। সে বললে, 'বলতে একটু বাধল না? তোমার এক কড়া কাপা-কড়ির দার ও ধারে?'

"না তা ধরে না, কিন্তু আমার বাড়ীতে—"  
"তোমার বাড়ী? বলতে একটু লজ্জা হ'ল না?"  
নিশীথ আর কথা কইতে পারলে না। আঘাত করার ইচ্ছে তার ছিল না—আর আঘাত সে করতে চায় না, কিন্তু না কেন এমন জায়গায় সে যা দেবে যে তার-বাড়ায় সে নিজেই চমকে উঠে। আজও সে বুঝে কত বড় কটনি আঘাত সে করেছে, কিন্তু কি করবে? ইচ্ছে করে জোঁকরণে।

( ১০ )

নিশীথের কথা শুনে প্রণতি ভয়ে চমকে উঠল। তার মনের হৃদয় মাড়র সে ভুলটি করে যত দূর করত, চোঁটা করলে তত নিশীথের গণ্ডর-রাগ তার কমে যেতে লাগল। সে ভালবেসে 'পাণ্ডা' মুখ দিয়ে বেরিয়েছে বলে চোঁটা আর বলা যায় না যে উনি সত্যি এই চান।' কিন্তু ভয় তার বাপ মানে না। সে ভাবতে চোঁটা কত যদি শেবে নিশীথের কথাই ফলে যায় তা হ'লে কি হ'বে; কিন্তু

জবাবতে পারত না। এক একবার তার মনে হ'ত যদি এ সময় না বেঁচে থাকতেন, তা হ'লে এ দায়িত্বের হাত থেকে সে বেঁচে যেত বটে, কিন্তু এই দায়িত্বের মধ্যে সে যা পেয়েছে তা তো কোনদিন পাবার আশা তার থাকত না। আজ্ঞা যদি কেউ এসে তাকে তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়, সে কি সন্তুষ্ট হ'বে? মোটেই না; এ শুধু তার দায়িত্ব নয়, এ তার অধিকার। মার কাছ থেকে সে যেমন সম্পত্তি পেয়েছে ত্রিক সেইরকম এ দায়িত্বও পেয়েছে। ছাড়তে পারবে না।

ছাড়তে হ'ল। মাহুষ সবচেয়ে বেশী থাকে আকড়ে ধরতে চায় সেই বোধ হয় সব চেয়ে আগে তার কাছ থেকে মরে যায়। যে প্রণতির মুখ কেউ কোনদিন গুস্তার দেখেনি তার চোখে জল দেখে নিশীথ বললে, 'কৈলো না না, তল গেছে আমার আসবে।'

প্রণতি চমকে উঠে বললে, 'আসবে? না, না, সে আর আসবে না। অভিমানে কবে সে চলে গেছে আর তো বিদে আসবে না।'

প্রণতি অ-মুখ নয়; তাকে বোঝাতে যাওয়া দিক নয়, তাই নিশীথ আস্তে আস্তে সরে গেল—তাকে একা রেখে। প্রণতি তা জানতে পারে নি—নিজের হৃদয়ে সে এমন অজিত্র হতে গেলো। সে ভাবত, 'যদি আমি কখনও কেড়ে নেবো ভগবান তা হ'লে দাও কেন?' এ প্রশ্নের উত্তর সে বুঝে পেরে না। সময়ে যেমন সব সূচ্য হ'য়ে যায়, তারও তেমনি এ শোকের বেগ কবে যেতে লাগল।

( ১১ )

সেদিন নিশীথ কমেজ ছিল। চাকর এসে প্রণতিক জানালো ডাক্তার রায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। প্রণতির ভাবি বিশ্বাস বোধ হ'ল। তাকে আসতে বলতেই চাকর চলে গেল।

ডাঃ রায় এসে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্প সময়ের, কিন্তু তার ভেতরই আপনার ভায়ের পাশে দেখে আপনাকে জানবার বক্তব্য হ'য়েছিল আমার হয়েছে। তাই অত্যন্ত অপ্রিয় এবং অন্তিমোচ্চ হ'লেও

একটা কথা আপনাকে বলতে বাধ্য হ'ছি। আজকাল আপনার স্বামীর মাজের প্রতি আপনি একটুও লক্ষ্য রাখেন না।'

"স্বামীর কাছের প্রতি লক্ষ্য রাখা জীবন কর্তব্য বলে আমি মনে করি না।"

"আপনাকে সব কথা শব্দ করে বলতেই আমি এসেছি। আপনার স্বামীর আচরণের উপর আমার মান-সম্মদ অনেকটা নির্ভর করে।"

"কি রকম?"

"আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকার সত্ত্বেও তিনি আমার বাড়ী এত বেশী যান যে, তা আমি পছন্দ করে উঠতে পারছি না। তাঁকে বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নি।"

"তা হ'লে তাঁকে সাধবান না করে নিজে সাধবান হ'লে বোধ হয় ভাল হয়।"

"তা যে হয় তা আমি জানি, কিন্তু সেটা করতে গেলেই এমন পণ আমার নিতে হ'বে যেটা নিশীথবাবুর পক্ষে মোটেই ভাল হ'বে না—আর আপনার পক্ষে তো নয়। আমি সেটা ইচ্ছে করি না, তাই আপনাকে জানাতে এসেছি, যদি আপনি কিছু করে উঠতে পারেন।"

"আমি কিছু পারব না, আপনার যা ইচ্ছে হয় করতে পারেন।"

"কিছু পারব না" বলতে প্রণতি চুপ করে থাকতে পারলে না। সে নিশীথকে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার সঙ্গে ডাক্তার রায়ের কি খুব বেশী আলাপ আছে?'

"না।"

"তবে তুমি তার বাড়ী যাও কেন?"

"সে কৈফিয়ত তোমাকে দিতে বাধ্য নই।"

"কতকটা কারণ তার ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে।"

"তার মানে?"

"ডাঃ রায় আজ এখানে এসেছিলেন। তুমি যদি এখনও তাঁর কথা না রাখ তা হ'লে তোমার তাঁর কথা রাখার জগৎ, শেখ উপায় যা তা তাঁকে নিতে হ'বে—

তার মানে তোমার এখান থেকেও সরতেই হ'বে, আর কোন ভরসাভার মুখ দেখাতে পারবে না।"

"কারণ ত্রিক ভুলে নিজেদের পারবে কীনা লাগে।"

"কথা শুনে বলতে লজ্জা হ'ল না?—তিনি কিছু করার আগে তা হ'লে আমাকেই কিছু করতে হ'বে। এর পর তোমার সঙ্গে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।"

( ১২ )

যতনে তার ডাক্তারি শেখ পরীক্ষা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে, প্রণতির কোন খবর নেবার অবসর তার ছিল না। পরদিন কোন খবরই সে শুধন রাখত না। পরীক্ষার পর সে ভালবেসে একবার এলাহাবাদে যাবে, কিন্তু একা যেতে ইচ্ছে হয় না। প্রণতি বলেছিল শীলাকে নিয়ে যেতে, অথচ তাকে এখন নিয়ে যাওয়া সোজা নয়, তাই আর যাওয়া হয় না। চিঠি দিয়ে কিং কোন জবাব পেলে না প্রণতির কাছ থেকে—জবাব দিলো নিশীথ। পড়ে যতনে চমকে উঠল; শীলাকে দেখালে। শীলা পড়ে বললে, 'এতো জানা কথাই! বুড়ানোর মতো—'

তাকে বাধা দিয়ে যতনে বললে, 'ছি! শালা, তুমি ভেতরকার কোন কথা জান না, তাঁকে দেখা দিও না। যদি কোনদিন তাতে দেখতে পাও তা হ'লে বুঝতে পারবে আজ কত বড় অন্যায় তুমি করলে।"

শীলা যুব অসন্তুষ্ট হ'ল কিন্তু কিছু বললে না। সে বুঝেছিল যতনে প্রণতিক প্রজ্ঞা করে দেবার মত—তবু বাধা না দিয়ে পারল না।

নিশীথ গিয়েছিল—সে প্রণতির টিকানা জানে না, তাই যতনের পক্ষে তাঁর বোঝ করা একবারেই অসম্ভব হ'ল। তবু সে চোঁটা করতে ছাড়েনি। দিনকতক কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে কিছু কোন ফল হ'ল না। শেষে সে বন্ধ করে দিলে। সে আশা করেছিল প্রণতি তাকে চিঠি দেবে, কিন্তু কেন যে দিলে না তা সে ভেবে দিক করে উঠতে পারেনা না। সে ভেবেছিল দিনকতক বাইরে যুরে আসবে। সেটা ভাবও লাগবে, আর হয় তো কোথাও প্রণতির সঙ্গে দেখাও হ'য়ে যেতে পারে; কিন্তু তাও হ'ল না। দিল্লীর সরকারী হাসপাতালে সে একটা চাকরী পেলে, আর তাই নিয়ে তাকে



চলে যেতে হল। সেখানে কোয়ার্টার (ধাকবার বাসনা) পেয়েছিল বরং শীলাকে তার সঙ্গে নিয়ে গেল। মা তার সঙ্গে যেতে পারলেন না, কারণ তিনি তো আর তার এক্সার মা নন—আর বুঝ বাবাকেও তাকে দেখতে হবে।

( ১০ )

হুতেন আর শীলা দিল্লীতে ছিল বেশ মনের স্থখে। এখানে গিল্লিপথার সম্পূর্ণ হুবিধা পেয়ে শীলার দিনগুলি ভালভাবেই কাটিছিল; কেবল প্রণতির কথা মনে হ'লে হুতেন ভারি গুস্তার হ'য়ে যেত। শালা এ কথা বুঝতে পারত, কিন্তু কোন কথা তুলত না। হুতেন চাইত শীলার সঙ্গে প্রণতির সম্বন্ধ কথা কয়, কিন্তু পারত না—হ'একবার চেষ্টাও সে করছিল, তবে শীলার কোন আগ্রহ নেই দেখে সে চুপ করে যেত। মিশীথকে চিঠি লিখতে তার মোটেই ইচ্ছে হ'ত না। এমনি করে একদিন হুতেন প্রণতির কথা তার কাছে অতীতের ইতিহাস হ'য়ে যেত। ক্লান্ত হয় তো সে ক্লোনসিনি পারত না, তবু তার কথা যে পুরান হ'য়ে—যেত তা নিশ্চয়—এবং পুরান হ'লে ভাবের তীব্রতাও কমে যেত; কিন্তু...

একদিন 'অপারেশন থিয়েটার'এ (অপেরাঘাটের টেবিলে) গিয়ে দেখলে সেপানকার নার্স আসে নি। 'জেনারেল ওয়ার্ড' থেকে একজন নার্স পাঠাবার জন্তে সে লিখে চাচ্ছে। 'নার্স' এসে তাকে কাজ বুঝিয়ে লিখে গিয়ে সে চমকে উঠল। হুজনেই বানিকৃষ্ণ চুপ করে থাকবার পর হুতেন বললে, "নিউ-বি" তুমি এখানে এশোঁকি করে?" "এখন তো বলবার সময় হ'বে না, পরে বল।"

"বেশ, তোমার কাজ শেষ হলে আমার কোয়ার্টারে (বাসার) যাবে তো?"

"বাব।"

কোন রকমে কাজ শেষ করলে হুতেন গেল শীলার কাছে বসবাসে। শালা শুনে কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে বললে, "শেষে তিনি নার্সের কাজ নিলেন। স্বামীর ভাত কি তাঁর এতই অসহ্য হয়েছিল?"

"ভাতের জন্তে তাকে এ কাজ নেবার কোন দরকার ছিল না। তাঁর যা আছে, ভাতে তিনি আমাদের মাইনে দিয়ে বাড়ীতে চিরকাল রাখতে পারেন।"

তা তবো এটা নিতান্তই পরোপকার।"

"দেখ শীলা আমার সামনে তাঁর সম্বন্ধে ওভাবে কথা কওয়া তোমার উচিত নয়, তা কি তুমি বুঝতে পার না?"

তুমি জান আর আমি তাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করি।"

"তাই আমাকেও শ্রদ্ধাভক্তি করতে হবে।"

"নিশ্চয়।"

"বেশ।"

প্রণতি এসে দাঁড়াতেই হুতেন বললে, "তোমার একটা নতুন রিসি দেখাও।"

"কি বল তো?"

"দাঁড়াও না, শালা কে এসেছে দেখেও এস।"

"বোকে নিয়ে এসেছ তা বলতে হয়।"

শীলা এসে দাঁড়াতেই প্রণতি হারাত ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ দেখে বললে, "তাই হুতেন যে, স্বয়ং পোষেছ তার মধ্যিমা বেন কোনদিন ভুলে যেও না।"

"আর উপায় কি? কিন্তু বাইরে থেকে তোমরা বেশ শুধু রহস্যের দৃষ্টিটা কিন্তু যে বোচারাকে তার ভার বহিতে হয় সে আর দীর্ঘি দেখবার অবসর পায় না। বাক, এখন কথা হচ্ছে তুমি যতদিন দিল্লীতে থাকবে ততদিন তোমাকে আমার কাছেই থাকতে হবে।"

"তা হ'লে দিল্লীতে পাঁকাই হয় না।"

"তার মানে?"

"মানে—ভাবের ঘরে বোন চিরদিনই পর। ভাঙ্গ যদি আসব করে ডাকে তা হ'লেই তো সেখানে থাকা যায়।"

"তা হ'লে শীলা, তুমি দিল্লীকে জোর করে আটকে রাখ। অজ্ঞান নতিদি তুমি হঠাৎ নার্স হ'তে গেলে কেন বল ত?"

"একটা কাজ তো চাই। দিনরাত কিছু চুপ করে বসে থাকা যায় না—সার একমাত্র এই কাজটাই আমি কিছু জানি।"

হুতেনের কাতর অস্বাভাবিক শেষ পর্যন্ত প্রণতিতে রাগি হ'তে হ'ল হুতেনের বাড়ী থাকতে। শীলা কথা এত কম কইছিল যে হুতেন আশ্চর্য হ'য়ে বললে, "কি তুমি যে একেবারে চুপ করেই রইলে বাপার কি?"

শীলা কোন উত্তর দিল না। প্রণতি সন্দেহ হ'ল বোধ হয় তার আসা শীলার ভাল লাগেন।

নারীর মন বৃষ্টিতে পুরুষের বত দেবী লাগে পুরুষের মন বৃষ্টিতে নারীর তত দেবী লাগে না, তাই হুতেন এতদিনে বা বৃষ্টি উঠতে পারে নি প্রণতি অল্প কটা কথাই তা বুঝে নিলে। ফিরে যেতে চাইলে হুতেন কৈফিয়ৎ চাইবে; কি কৈফিয়ৎ তাকে দেবে?—আর একা থাকতে তার সত্যই ভাল লাগে না। ঘর ছেড়ে সে চলে এসেছে পরের ঘরে তার এ আকর্ষণ কেন? সে বেশ বৃষ্টিতে পারলে থাকতে যে কিছুতেই বেশী দিন পারবে না তবু চলে যেতে চাইতেও পারলে না।

( ১৪ )

প্রথম প্রথম কেউ অত লক্ষ্য করত না প্রণতি থাকে কোথায়। হঠাৎ একদিন একজন ডাক্তার আবিষ্কার করে দেখলেন যে, নতুন নার্স থাকে ডাক্তারের বাড়ী। তাই নিয়ে ডাক্তার-মহলে আলোচনাটা খুব বেশী চলতে লাগল—এত বেশী যে তা প্রণতি এবং হুতেন হ'জ্বেনেরই কাছে পৌঁছাল। হুতেন শুনে বললে, "শোকগুণ্ডার গেরে-গেরে কি কাজ-কর্ম নেই যে কে কোথায় থাকে তারই খবর নিয়ে বোঝাচ্ছে।" মুখে একথা বললেও মনে মনে যে সে বেশ অবজ্ঞা বোধ করছিল। সে ভাবত, হঠাৎ একজন ডাক্তার তারই সম্বন্ধে একজন নার্সের সঙ্গে কথা কইলেন। সে ভ্রত্যাভ্রতভার্যার বিচার ভুলে গিয়ে বললে, "ডাক্তার বোম, কোন ভ্রলোকের সাংসারিক কথাবার্তার বিষয় তার অস্বাভাবিক আলোচনা করাটা কি সম্ভব?"

ডাক্তার বোম একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়েছিলেন।

নার্সটা বললে, "হুজনে লোকের কথার মধ্যে কথা কওয়াটা কি ভ্রত্যা তা কি?"

"আপনি চুপ করলে বিশেষ বাধিত হ'ব—কথা হচ্ছে ডাক্তার বোমের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ নয়। আর আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে কাজের সময় গর করার জন্তে আপনার বিপক্ষে আমি 'রিপোর্ট' করব।"

"ভাতে আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারবেন না।"

এই বলে সে চলে গেল।

হুতেন বললে, "দেখুন ডাক্তার বোম এ সব কথা বলে আপনার ক্ষতি করার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না, কিন্তু ওর সাহস দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম, তাই এই

কটা কথা বলতে হ'ল। আমার সম্বন্ধে বত হ'লে আলোচনা করুন কোন ক্ষতি নেই কিন্তু আর একজন ভ্রল মহিলার সম্বন্ধে—"

"তার সম্বন্ধে আলোচনা করার অনেক কারণ রয়েছে। পদীর আড়ালে কি আছে বোকে সেটা দেখবার জন্তে ব্যস্ত হয়, তার হুহুখে কি আছে তা দেখতে চায় না। উনি একজন নার্স অথচ বা রোগীপার করেন তার চেয়ে ঢের বেশী দৃষ্টিদেয় জন্তে থরক করেন আর নিজের থাকেন। যথেষ্ট ভালভাবেই। তাই তো লোক এত আশ্চর্য হয় আর তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে।"

"আমি এতদিন পষ্ট করে বলবার এই হুযোগ খুঁজছিলাম, উনি নার্সের কাজ নিয়েছেন সখ করে। ওর যা টাকা আছে তাতে উনি বেশ বড় লোকের মতই থাকতে পারেন। আমারই ব্রাহ্মণী ডাক্তার লাগুদের সবলকে বাড়ীতে মাঝি দিয়ে রাখতে পারেন।"

"উনি আপনার কে হল জানতে পারি?"

"আমার এক দামার বৌ।"

"আমি এ কথা কখনও করতে পারি নি। মাফ করবেন। কোনদিন আর তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা উচ্চারণ করব না।"

ডাক্তার বোম, ভাবলেন প্রণতি নিশ্চয় বিধবা কারণ, সে হুতেনের বৌদি আর তার মাথায় সিঁদুর নেই। তা না হ'লে হুতেনকে মহা বিপদে পড়তে হ'ত সব কথা বলতে গিয়ে। ডাক্তার বোম সব বুঝলেন, কিন্তু নার্সটা কোন কথা শোনে নি, তাই কিছু জানল না।

( ১৫ )

হুতেন কিছু সত্যিই নার্সতার বিপক্ষে রিপোর্ট করলে না কিন্তু সে তবু বিপক্ষে এমন আরম্ভ করলে যে তার পক্ষে চুপ করে থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। একদিন ডাক্তার বোম তাকে বললেন, দেখুন হুতেনবাবু এখনকার নার্সগুলো বড় বাড়াবাড়ি করছে। আমি তাদের বিপক্ষে রিপোর্ট করব, আপনি সই করতে রাগি আছেন?"

"গরীবদের কতগুলো টাকা মাইনে কাটা যাবে, কি দরকার?"



ডাকার বোম্ব তা শুনলেন না, তাদের বিপক্ষে 'রিপোর্ট' করে দিলেন। তাদের কিছু করে জরিমানা হ'বে গেল। এর ফল হ'ল এই যে তারা মনে করলে, এটা নূরুন্নাহার স্বতন্ত্রের কাজ আর তার ওপর চট্টোয়াল টিক সেই পরিমাণে। তাই সবাই মিলে কোট বেঁধে তার বিপক্ষে এক নালিশ করলে কর্তৃপক্ষের কাছে। বিশেষ কিছু ফল হ'ল না। বটে, কিন্তু কথাটা ঘোটেই চাপা রইল না। শীলাও শুনবে নাসরি স্বতন্ত্রের বিপক্ষে নালিশ করেছে—প্রমাণি নাকি তাদের রায়ের কারণ। কোন কথা না বলে সে তার ভাইকে এক চিঠি লিখে দিলে এসে তাকে নিয়ে খাবার ভুলে। স্বতন্ত্র একথা জানত না তাই শালকে হঠাৎ আশেতে দেখে বললে, "কিহে বাপু আর কি? হঠাৎ যে খবর না। দরই?"

"কি রকম? শীলা যাবে বলে চিঠি লিখেছে, আর তুমি জান না?"

"শীলা যাবে? ঠিক সে কথা তো কিছু বলে নি।"

"হী একটা কথা, তোমার নিশিখদার খবর জান?"

"না, কেন বল তো?"

"কে এক ডাকার রায় তাঁর বিপক্ষে ডামেজ-স্টুট (কর্তৃপক্ষের মকদ্দমা) করেছে; মকদ্দমায় তিনি হেরে গেছেন" এই বলে সে একটা খবরের কাগজ দেখালে।

স্বতন্ত্র একদিনে প্রণতির চলে আসার আসল কারণ বুঝতে পারলে। সে হেসে বললে, "নিশিখদার যে কোন দিন এত অবনতি হ'তে পারে তা আমি কখনও কবি নি।"

"আচ্ছা, তোর চাকরি যাবে তো নিশিখ; আত্মীয়-স্বজন তো সকলেই তার বিপক্ষে। তার চলবে কি করে বল তো?"

"না চলবেই বা কি এসে যায়? ও রকম পোকের চলার চেয়ে না। চলটিই বোধ হয় জগুপ্তের পক্ষে মঙ্গল।"

স্বতন্ত্র ভেবেছিল প্রণতিও টিক তার মতই কথা কইবে তাই কাগজটা নিয়ে তাকে দেখাতে গেল। প্রণতি পড়ে

গেল। তার মুখের কোন পরিবর্তন হ'ল না। সে বললে, "ভাই, আমার যে আজই যেতে হবে।"

"সে কি? কোথায় যাবে?"

"তোমার দাদার কাছে।"

"একদিন তুমি দেখছো সেখানে সেখানে থেকে চলে এসেছিলে।"

"সেদিন তাঁর সাহায্যের দরকার ছিল না, আর তিনি সে মহাবীর।"

"তিনি তোমার সাহায্য নেনেন?"

"নিশ্চয়। তিনি তো অবুধ ন'ন ভাই।"

( ১৬ )

স্বতন্ত্র শীলাকে বললে, "তুমি চলে যাচ্ছ, নতি-দিক আজই চলে যাচ্ছে।"

"সত্যি? ঠাকুরকে বোল আনা পূজা দৌব।"

"তার মানে?"

"কোনদিন যে উনি যাবেন তা ভাবিনি।"

"উনি তোমার কাছে এতই তার হ'য়ে উঠেছিলেন না কি?"

"তা কেন হবে? তোমার তো আর লক্ষ্য-সমর নেই। মনে কর আমি কিছুই জানি না, নাসরি—তোমার বিপক্ষে নালিশ করলে কেন?"

"সে কৈশিক তোমাকে দিতে হ'বে না কি?"

"দরকার নেই। আমি আজ যাচ্ছি বাপের বাড়ী। যদি কোনদিন নিজেকে আমার খাবী বলে দাবী করবার উপস্থিতি মনে কর, তাহলে হয় তো বিরে আসতে পারি।"

"সে প্রয়োজন আমার মনে কোনদিন না হয়।"

সেইদিনই এক সময়ে ভাঙনে ঢুকিয়ে চলে গেল প্রণতি আর শীলা। তারপর স্বতন্ত্রকে ডাকতে এল হীসাপাতাল থেকে, কিন্তু সে কার্টার-এ ছিল না, সকলেই মনে করছিল কিছুকণ পরে ফিরে আসবে কিন্তু তাকে আসা দেখতে পাওয়া গেল না। সে এক সীমাহীন পথ ধরে চলেছিল—কোথায় তা সে নিজেই জানে না।

## সম্ভাব্য যুগে যুগে

অধ্যাপক শ্রীঃসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

মানব-সভ্যতার আদিম যুগে যখন মানব অভাব-বঞ্চিত যে নাই, যখন ঐতিহ্য পৃথিবীতে অতি অল্প-সংখ্যক মানবের বহুবিধবিশেষ: ভূম্পত্তি বা বাসগানের জন্ত পরম্পর বিবাদের বিরহাৎ আশঙ্কতা হয় নাই, যখন বাণিজ্য বা হস্তাঙ্গদার অত্যাচারে ধরিত্রী ভাঙ্গাকাত্ত হয় নাই, তখন মাসিডোনি-পতি মহাবীর সিকন্দরের ছায় কোনও মহাবীরের বিবিধ প্রায় জন্মে নাই। তখন বিরাতী বিশাল বহুদূর

ভিন্ন ভিন্ন মানবের সম্পর্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া মানবের সম্পর্কভাত 'দখল' বা 'অধিকার-সংঘের' সীমানা বৈশিষ্ট্য অনুভব করিয়া কলঙ্কিত হইয়া পোলাক-ধাঁধার আকার ধারণ করে নাই। কারণ হানানভাব রূপ দাব্যগ্রকতা তখনও প্রাগৈতিহাসিক মানবকে চিন্তাক্রান্ত করে নাই। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব না থাকিলেও মানবজাতি পরস্পর বিবাদের কারণে অসম্ভাব বোধ করে নাই। গ্রাসাচ্ছাদন বা আবাসভূমির অভাবের অভাবে মানবের বিবাদের হেতু হইয়াছে ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মাহুতান। তোমার ধর্মবিশ্বাসে যদি আমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে তোমাকে ও আমাকে বিবাদের অবস্থাপ্রাণী। এই কারণে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগে যে কত ধর্মযুদ্ধের অমুঠান হইয়াছে, তাহার রয়তা করা যায় না। ধর্মযুদ্ধের নামে কতই যে রক্তপাত হইয়াছে, ধর্মের নামে কতই যে অধর্মের অমুঠান হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? এই সকল রক্তাক্ত বা মনঃতা বিভীষিকার ফলে কত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, বিশ্বমানব যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয়প্রাপ্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে, তাহার নির্ণয় অসম্ভব। কিন্তু প্রতি যুগেই মানবের আত্মবাহিনী বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে একটা শান্তিবিধায়িনী স্বতন্ত্রশক্তির প্রাচুর্ভাব হইয়াছে দেখা যায়। আমাদের গীতার নিরশেক আশোচনা করিলে আমরা

মানব-ইতিহাসের এই মূল তথ্যটা জানিতে পারি। ভারতীয় আত্মজাতি অতি প্রাচীন কালেই এই তথ্যটা দৃঢ়দৃষ্ট করিয়াছিলেন। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

বদা বদা হি ধর্মন্ত প্রানিবর্তিত ভারত।

অভ্যুদয়ানমধঃস্ত তদান্যনং স্বজামাণম্ ॥ ৭ ॥

পরিত্রাণায় সাধুন্যং বিনাশায় চ হস্তকাম্।

ধর্মসংস্থাপনাখ্যায় সম্ভাব্য যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

মানবের একটা মানসিক ধর্ম এই যে, মানব সকল বিষয়েরই আদি কথা জানিবার জন্ত ব্যগ্র হয়। কোনও কার্য দেখিলে তাহার কারণ জানিতে ইচ্ছা এই মানব ধর্মেরই ফল। এই কারণেই কোনও ঘটনার বিবরণ শুনিবামাত্র সেই ঘটনার আদি যুগান্ত জানিবার জন্ত আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহল জাগরিত হয়। কিন্তু সেই আদিযুগান্তের অন্তিম যদি আমাদের প্রত্যক্ষকণমা না হয়, অথবা তদ্বিষয়ে যদি কোনও পরিষ্কার প্রমাণ না থাকে, তবে সেই সকল বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু আদিম যুগের যে মানবজাতির যে কল্পনাক্রান্ত প্রবৃত্তি ছিল না তাহারা যে কল্পনাতীত স্বয়ং আবিষ্কার করিতে পারিতেন তাহাতেই তাহাদের মন মর্পতোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত, অল্প কোনওরূপ কল্পনা তাহাদের মনে স্থান পাইত না। সুতরাং সেই কল্পনাতীতেই তাহারা জ্ঞানান্তর সহ্য বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহার অধ্যয়নকে কেহ করিলে অথবা তাহার বিক্ষমত কেহ প্রচার করিলেই বিবাদের সূত্রপাত হইত এবং তাহারই ফলে রক্তাক্ত হইয়া অমুঠিত হইবার পক্ষে কোনও বাধা থাকিত না। তখন বহিঃশক্তির পশুবলের পরিমাণ দ্বারা অন্তঃশক্তির ধর্মবংশের পরিমাণ নির্ণয়-চেষ্টার ঘোর অধর্মের স্বষ্টি হইত।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। প্রাচীন যুগের







উল্লেখ করিতে হয়। স্তবরাং বেদমন্ত্রসমূহের মধ্যে যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাইবে তাহা এক যুগেরও নহে, এক দেশেরও নহে, এক সাম্রাজ্যেরও নহে। ইহার মধ্যে বহু যুগের, বহু স্থানের ও বহু সাম্রাজ্যের বিস্তারিত একত্র সংগৃহীত রহিয়াছে। কোনও কোনও স্থলে মতের বিভিন্নমুখিতা প্রকটীভূত। আমি সে সকলের আলোচনা করিব না। তবে আমার আলোচ্য বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে কোনও কোনও অল্পহীন ইরাণীয়গণের সহিত বিভিন্ন ইহাবার পূর্বযুগের এবং কোনও কোনও অল্পহীন পরযুগের। ইহা বরখারি বেসকল প্রাচীন দেবতার স্তোত্র বেদে আছে তাহার অধিকাংশই পূর্বযুগের। কারণ ঐহিক 'অব'-শব্দে শক্তিমান বরখদেবতা ইর ঈশ্বরের প্রোট দেবতা 'অহুরা-মজ্জদা' রত্নে। ইরাণীয়গণের উপাস্য ইহা-দেবতা 'অহুরা-মজ্জদা' ইরাণীয়গণেরও দেবতা। কিন্তু পরবর্তী যুগে 'পূর্বব' দেবতা 'প্রজাপতি' দেবতা, 'হিরণ্যগর্ভ' দেবতা, 'সূর্য' দেবতা, 'বিষ্ণু' দেবতা প্রভৃতি দেবতা প্রাচ্য লাত করিয়াছেন, বা নতুন উদ্ভূত হইয়াছেন। প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে এ যুগের ঋষিগণ বিরোধ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা আমরা নান্দীয় হৃত, পুরুষহৃত, হিরণ্য-গর্ভ হৃত ও প্রজাপতি দেবতার প্রাচ্যভাগ হৃত ভণিতে দেখিতে পাই। ঐহিক হৃৎকের হেতুত্ব ধর্মের উপাদানসমূহ এখানে অনাদৃত হইয়াছে এবং পারত্রিক স্তবিত্ত আকাজ্ঞা জাগিয়াছে। একটা বিচার ও বিবেচনের যুগ যে এই কালের মধ্যগত্রে প্রকাশ করিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচীন নরধর্ম-প্রচার নিদর্শন-স্বরূপ স্তবশ্লোকের আখ্যান অনাদৃত হইয়াছে। বজ্রাঘাতের দ্বারা ইন্দ্রবাহুর প্রভৃতি প্রলোভনের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ জাগরক হইয়াছে। ব্রাহ্মণের উপর স্থানে স্থানে ক্রিয়ের প্রাচ্য দেখা দিয়াছে। পর-বর্তী উপনিষদের যুগে ক্রিয়ের প্রাচ্য স্থপরিণামক হয়। কেবল যে বিশ্বাসিত ধর্মবিশিষ্ট লাত করিয়াছেন 'এব' সারা-জীবন বশিষ্ঠের সহিত কলং করিয়াছেন, তাহা নহে। বহু স্থানেই ক্রিয়ণ্ডল পুরোহিতের কর্ম করিয়াছেন, এবং অনেক রাজার নিকট ব্রাহ্মণগণ তজ্জিহ্বাস্থ হইয়াছেন। অপরূপিত কৈবর্ত, কাশীরাজ অজাতশত্রু, প্রাবাহন জৈবলি,

রথবিজ্ঞানসূত্র সংস্কার, চিত্র গদ্যারনি, রাধিক জনক প্রভৃতি বহু ক্রিয় ব্রাহ্মণগণকে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগেই হউক, আর এই যুগেই হউক পরবর্তী ভাগ্য-প্রসূর ব্রাহ্মণগণ ক্রিয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধাধোপা করিয়াছেন। যেটা কথা সনাতন আধ্য-ধর্ম একটা মালিঙ্গ এই যুগে দেখা দিয়াছে এবং এই ধর্ম-গানি বিদ্রুত করিবার জন্ত ভগবানের আদিগণ আশঙ্ক হইয়াছেন। ইহার ফলে দেখিতে পাই রক্ত দেবতা প্রায়ের বিরাগ দ্বারা করিয়া মটরাকের হাতের আরম্ভ করিয়াছেন। ইদ্রাদি প্রাচীন দেবগণ ইহার নিকট মাথা নত করিয়াছেন। আধ্য ও অনাধ্য সাম্রাজ্যের মধ্যে শুভ মিলন সংঘটিত হইয়াছে। রাক্ষস, অশুর ও দেবতাদের লিপ্যেবতা 'মহাদেব' আধ্যসমাজের সমস্তুত হইয়া 'ঐশ্বর্য' দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। অনাধ্যগণের ভূতগণ আধ্যগণ দেবতার সহিত মিশিয়া আধ্যগণ তাদের বেদেবতা 'ঐশ্বর্য'ও 'মহেশ্বর্য' লাত করিয়াছেন। ইহার পর হইতেই ত্র্যমের দেবতা ইহা আধ্যসমাজে অনাদৃত।

এই পরিবর্তন ধ্যাম করিলে কাহার না চিত্র আধ্য সভ্যতার মহামিলনাত্মক মহাহৃৎ সুখ হয়। কোথার ভূতপিতাদের আত্মীয় লিপ্যেবতা, আত্মকোথার অষ্টদিকের আত্মীয় তাদের দেবতা শিব। ইহার পরবর্তী যুগের শাস্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, যতি-পূরাণাদি কতকগুলি শাস্ত্র ঋষিরাচিত এবং কতকগুলি এই 'মহাদেব'-রাচিত। মহাদেবের নামে প্রণীত ত্র্যমী শাস্ত্রসমূহ অনাধ্যশাস্ত্র আধ্যসভ্যতার গৃহীত বৈশিষ্ট্য পণ্ডিতগণের বিধাশ।

এইরূপেই আর একবার ধর্মযুদ্ধের ফলে বিষ্ণুদেবতা আধ্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাত করিয়াছেন। বেদের যুগের সেই স্বরূপী ত্রিবিধ বিষ্ণুই রূপান্তরিত হইয়া আচালা মূলক একত্র মিলিত করিয়া সমগ্র ভারতে এক ধর্মব্রাত্য স্থাপন করিয়াছেন ইনি একাক্ষিক বেনন কোণামোক্ত ব্রাহ্মণগণের পটচিহ্ন বন্ধ ধার্য করিয়া সনাতন ক্রিয়ের মানবগণের নিকট ধর্মজন্ত ব্রাহ্মণের ধর্মহীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অন্তরিক সেরূপ ব্রাহ্মণ-পরিভাষ্য চণ্ডালের মালিন্য ঘোচন করিয়া ব্রহ্মোড়ের শীল ছায়া দান করিয়াছেন। ইহার পর হইতে ভারতীয় আধ্য বৈদিক-

যুগের ইন্দ্রাদি দেবতাকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিবিধিক সমাধিক সমাদরের সহিত ধর্মের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ক্রিষ্ট ইরাতের ঠাকুরের শাস্তি হয় নাই। পাণ্ডী আমরা, ধর্মের নামে অধর্মের অহুতান করিব, আর সেই নির্দিষ্ট পুরুষপ্রবরকে যুগে যুগে পাগের কালিমা দুহিবার জন্ত আমাদেরই ছায়া নব নব জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। আমরা আবার জীবহিংসা ও জীব বধে করিতে লাগিলাম। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব আবার অহিংসামন্ত্র চণ্ডার করিয়া ধর্মের মালিন্য ঘোচন করিলেন। এইরূপে যুগে যুগে ঠাকুর আমাদের আমাদেরই মধ্যে আবিস্কৃত হইয়া আমাদেরই মালিঙ্গ ঘোচন করিতেছেন। কবিক উদাহরণ দিয়া আমার এবন্ধ ভারাক্রান্ত করিব না। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে যেমন ভগবান পুনঃ পুনঃ আবিস্কৃত হইয়া জাতীয় ধর্মের মালিন্য ঘোচন করিয়াছেন, বিজ্ঞানভাষ্যে মানবের চিত্ত যুগে পাগের ভায়ে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন তিনি বিবেক-রূপে আবিস্কৃত হইয়া মানবচিত্তের পাগরাশি অল্পতাপনালে ধ্বংস করিয়া দেন এবং সেই নির্মল পবিত্র চিত্ত-সিংহাসনে বসে অধিকৃত হইয়া মানবকে বৈশ্বজিৎ সঙ্গার করিয়া তুলেন। ইহাই মানব জীবনের ইতিহাসে একমাত্র সনাতন সত্য কথা। আবার আমাদের মধ্যে বাঁহারা পরোপকারার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ঐ ভগবানেরই অবতার স্বরূপ। আমরা যেন তাহা বিশ্বস্ত না হই।

হে ঠাকুর! হে ধর্মদেব! তুমিই তো প্রজাপতিরূপে আমাদের আত্মভাষ্যের সৃষ্টি করিয়াছ, তুমিই বিষ্ণুরূপে যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের পালন করিতেছ, আবার তুমিই ব্রহ্মরূপে আমাদের ধর্মের সংস্কার করিয়া আমাদের মালিঙ্গ তমোর কণ্ঠে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠরূপে বিরাজ করিতেছ। হে অনন্ত! হে অমীম! তুমি আমাদের ধর্মের সর্গদাতা ভাস্কর্য্য দাতা। হে নির্দিষ্ট পুরুষ! তুমি আমাদের ধর্মকে সংস্কারমুক্ত করিয়া অনন্ত লোকের সঙ্গে মিলিত কর। হে বাসাদারী গোত্রজ কুম্ভকটক! তুমি আমাদের চিত্তের জাতিবিরোধ করিয়া দুহিয়ার দিয়া আমাদের চিত্তের জাতিবিরোধ করিয়া লও। হে রামমোহন! তুমি আমাদের অন্তরে

কুম্ভকটক ও বাহিরের পাগের আকর্ষণ হইতে রক্ষা কর। হে বিজ্ঞাসাগর! তুমি আমাদের আর্জ ও পরিত্রাহিতক দরিত্র-নারায়ণের 'সোম্য' প্রচোচিত কর। হে নন্দ! তুমি আমাদের অশুভ মেঘের সোম্য আচ্ছাদন করিতে শিখাও। হে শ্রদ্ধানন্দ! তুমি আমাদের পরিত্রাহিতের প্রাশস্তিতের ব্যবস্থা দিয়া আমাদের সমাজকে পরিত্রাহিত ও পবিত্র কর। হে প্রায়শ্চিত্ত! তুমি অহুতাপরূপে পাণ্ডীতীরে ধর্মের ধর্মের আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের পাণ্ডাশি ধ্বংস কর। হে সজ্জনানন্দ! তুমি সভ্যজ্ঞানের উজ্জল আলোকে আমাদের মনের অন্ধকার দূর করিয়া দাও, যেন আমরা আত্মদত্ত পণ্ডিত প্রতি জীবনের মধ্যে শিবকে দেখিতে পাই। যেন আমরা তৈয়ার অবতার বরূপ মাহমুদে নীচ বা হীন বশিষ্ঠ ঘৃণা না করি। আমাদের দ্বন্দ্ব সেই ভক্তিতে পূর্ণ কর, বাহ্যের প্রভাবে আমরা পাণ্ডীর চিত্ত হইতে দানবকে বিতাড়িত করিয়া সেইখানে তৈয়ার প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। তৈয়ার আচ্ছন্নপণ্ডিত মানবের সেবা করিয়া যেন আমরা সেই আনন্দ লাত করিতে পারি, বাহ্যের বসে আচারের 'অমৃততর সন্তান' নাম সার্থক হয়। সেই অমৃততর পুষ্প পার্শ্বে যেন আমাদের পূর্ব সৌন্দর্য ও পূর্ব বিশালতা আমাদের বৃত্তিতে জাগরক হয়। তৈয়ার বিদ্যা চক্ষু পাইয়া যেন আমরা দেখি যে, আমাদের উপার আধ্যসভ্যতা পূর্ণ সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত দেশের ভিত্তি ভিন্ন মানব জাতিতে এক ধর্মের বন্ধনে ধরিয়া ছিল। যেন মনে পড়ে যে ঠাকুর-কমল আনন্দ-চম্পা স্বর্ঘ্যবিশ্ব-বশীল-বলিষ্ঠ প্রভৃতিতে একাধা পর্যন্ত হিন্দুধর্ম বিংশ ক্রিয়গেছে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ প্রভৃতি বৈরাগ্য মলিনের মলিনের পুঞ্জিত হইতেছেন। কি বিরী-বিশাল মলিনমাত্রা সেই সকল প্রমোদে আকাশে মাথা তুলিয়া আত্মসিদ্ধতার উদারতা ও মাংসের মনে মনে মিলনের শক্তি ঘোষণা করিতেছে!

আমাদের যে তেজস্বী অসিঙ্গ ভগোদীপ পূর্ণ পুরুষ-গণের পুষ্পকীর্তি আজ শত শত বৎসর কালের বাত্যা ও বজ্রা উপেক্ষা করিয়া বর্ষা, প্রাধান্য, ওকারধাম, আত্মবিদ্যা প্রভৃতি পূর্বদেশে ও মধ্য এশিয়ার মরুভূমে



প্রশংসিত হইয়াছে, তাহাদের তেজস্বিতা লাভ করিয়া—যেন আমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করিতে পারি যে আবার আমরা আমাদের পূর্ব পুরিমা, আমাদের সভ্যতার প্রাচীন আশ্রম, মহানবনের মধ্যে ইমামিনের অমৃতময় প্রচার করিতে পারি। অজ্ঞতার অন্ধকারে বা পাশের কলকে আমাদের মধ্যে বাহাদের চিত্ত আজ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের মালিক্য ঘোচন যেন আমরাই করিতে পারি। আমরা যেন আবার আমাদের যমতরীর উদ্ধার করিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণের সন্নিহিত জানকন লাভ করিতে পারি।

আমরা এবার মন করেছি ভোবা জাহাজ তুলতে যাচ্ছি সাগর—ভরা ডুবির ধনের ঘড়া খুলতে।

মোহর ভরা ধনের ঘড়া

বহিই লোনা জল ঢুকু যার

সোনা তবু সোনাই থাকে পারিনে সে ভুলতে।

আমরা এবার পূর্ণ করেছি ভোবা জাহাজ তুলতে ॥

মন করেছি আমরা ক'জন নষ্ট মাছ তুলতে।

পকে আছি নামতে রান্নি মনের চাবি খুলতে ॥

দোষ যদি হয় ঢুকেই থাকে

মজিয়ে থাকে মসজিদকে

মাছই তবু মাছ, ওগো, পাখি না ভুলতে।

মন কলঙ্কি, পণ করেছে হারা ক্ষয় তুলতে ॥

উল্ল ছেউএর পিছল চিঠি হবে রে আজ ছুতো  
ক্ষতির খাতায় পড়বে না সব পারিস যদি উল্লতে

জাহাজীরা বাদের মানে

হাজা-মজার হিসাব জানে

তাঁরা তো কেউ দেখানো ভয়, দিচ্ছে সাহস উল্টে

আয় তবে আয় চল দরিয়ায়, ওলোনা কোলায় সুলতে ॥

লোনা জলে রেশম পশম, আর দেওয়া নয় সুলতে।

আর দেওয়া নয় পতিত জনে পাশের নেশায় ঢুলতে ॥

দোষ যদি হয় ঢুকেই থাকে

আমরা শোধান করব তাকে

করতে হবে নূতন বোধন জাগিয়ে তাকে তুলতে।

মাছ, দোষে ওগেই মাছ, পাখি না সে ভুলতে ॥ •

হুগ ও কেকা

• রামসাহা বলেন গীতা-পুরিদের বাৎসরিক উৎসবে পঠিত ॥



## শব্দব্রহ্ম

ত্রিহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

১

শব্দ বোঝা যায়, কিন্তু শব্দব্রহ্ম বোঝা বড় কঠিন। শব্দব্রহ্ম কথাটা সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে সর্বদাই উদ্ভূত পাওয়া যায়। গৃহীদের মধ্যে সকলে না বললেও পণ্ডিত মহাশয় পুঁথি খুলেই শব্দব্রহ্মকে নমস্কার করে পাঠ আরম্ভ করেন 'সহস্রের্ণ'। আর আমাদের হাকমাষ্টার তানপুরা নিয়ে 'ভারব্যাও' সাধতে সাধতে বলেন, শব্দব্রহ্ম।

পুঁথি অনেক দিন পাখারে ভাসিয়ে দিয়েছি, সরস্বতীর সরস ক্রতি ক্রতিপথে আর উড়িত হয় না। মনে হ'ত, পণ্ডিত মহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু বখন দেখতাম, তিনি দেখরূপ, ঋষিধ্বজের খবর না ক'রে পিতৃধ্বজ পরিশোধ করতে অনেক নূতন ধ্বজ করেছেন, আর সেই ধ্বজের বায়ে একেবারে 'সহস্রের্ণ' হয়ে বসে পড়েছেন, আর এক পা এগুতে পারছেন না, তখন ভাবতাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করা বিষমথন।

হাক মাষ্টারের ওখানে প্রায় সকল সময়েই একটা ছোটখাট আড্ডা বসত; সকালে তামাকের, দুপুরে তাসের, বৈকালে সিঁড়ির, আর ভাল রকম জন্ম সন্ধ্যার পর। মাষ্টার সন্ধ্যা-বন্দনা শেষের প্রবীণদের নিয়ে বিবিধ যন্ত্র-যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টা দুই শব্দব্রহ্মের আলাপে আসর জমিয়ে রাখতেন। তারপর আসর তরুণদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি যেতেন পাকের ঘরে।

নিত্য নূতন রসনাতৃপ্তিকর খাণ্ড প্রস্তুত করতেন, নিজে যেতেন অন্ন, খাওয়াতেন তার অল্পগতদের, বাদের মধ্যে আমি একজন। আমার বেষহরো বেতালো দোষ তিনি কিছুতেই সারাতে পারতেন না। রান্নাঘর থেকে আবার খানা লক্ষ্য করতেন আর বলতেন, 'ও হ'ল না, ও হচ্ছে না; তারপর বিরক্ত হ'য়ে খুব নিকট সম্বন্ধহতক সাধোখনে আদর করতেন।

হাক মাষ্টারের তিন কুলের কাহাকেও কখন দেখি

নাই। ঘর সংসার কখন ছিল কি না জানি না। বড়লোকের ছেলেদের গান বাজনা শিখিয়ে নিজের ঘরঘরের উপায় হ'ত, আজ্ঞার খরচ চালু চাঁদার। শনিবারের রাজিয়ার ছোট রকমের ভোজ হ'ত। কোন কোন মাসে বড় বড় শিখদের খরচায় বড় রকম ভোজের আয়োজন হ'ত। সেদিন বাহিরের দু'একজন গুস্তাদ ও বান্ধব শিখেরা আসতেন।

মর্ত্য জগতে বার অপ্রতিহত প্রভাব তার ভৈরব আলাদা এক ভীমা রূপীতে আমাদের একজন ছুটিয়া চলিয়া গেল। পরদিন আড্ডা প্রায় থালি। শূন্য কোলাহল নিবে গেছে; যেন একটা দ্বিধাবহ অন্ধকার আমাদের চেপে ধরছে। আমাদের 'সদানন্দ' মাষ্টারকেও নিরানন্দ আশ্রয় করেছে। তিনি উর্দ্ধমুখে গভীরভাবে বসে আছেন। আমরা অধোমুখে মাটিতে দাগ কাটছি। মাষ্টার বলেন,—'বাঃ, আর ভেবে ধুংসের বোঝা বাড়িয়ে কি হ'বে, কালের ডাকে একে একে সকলকেই যেতে হ'বে। রতনা চলে গেল, তার যতনটা রেখে পের। ঐটাই সত্যি, ঐটাই সত্যি। রাতনা যদি ভুলতে চাস তবু তার ঐ যতনকে ধর, ঐ যতনই তোদের রতন সেলাবে। বা এখন তোরা ঘরে বা, যে বার নিজের কাজে মন দিগে। মন ভোলায় মন ভোলা, কাজ গেলেই ভুলে যাবে।' এই বলে উঠে দাঁড়াবেন, চোখ দুটা অশ্রুতে ভরে গিয়াছিল, গম্ভীর মত দু'খোঁটা মাটিতে পড়ে মিলিয়ে গেল।

সকলেই চলে গেল, আমি • থান্ডাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে। বলায়,—'মাষ্টার, রতনা চলে গেল, কিন্তু যতন করলে তাকে কিরে পাওয়া যাবে?'

মাষ্টার হেসে বলেন,—'তুই হাসালি, আরে যে বার সে কি ফেরে। শব্দব্রহ্ম লীন হ'য়ে গেল, রেখে গেল তার সাধনা। সেই সাধনা, ধর, সেই সাধনাই সকল রতনের



সার; সেই শব্দ রত্ন মেলাবে—তুই চিরকালটাই বেহুশ।  
বেতলা থাকৃবি।

বজ্রাম,—“মাষ্টার, এইটে তেশার সেরা হৈয়ানী, বলতে পার, এই শব্দরত্ন পরখাটী কি? আকাশে বায়ুর তরঙ্গে ধনি উঠে, কবে কীণ হইতে কীণতর হ’য়ে মিলিরে যায় তার থাকে কি?”

মাষ্টারের উত্তর যোগায় না, বিরক্ত হ’য়ে কিছুক্ষণ নির্জাক থাকলেন; তারপর অপ্রতিভভাবে বলেন,—“ভাই রে আমি কে তাই আজ পর্যন্ত জানিলাম না, তার উপর শব্দরত্ন, সে তো মন্ত বড় কথা।”

বজ্রাম,—“তোমার ঐ সব ছাকামী ভাল লাগে না, তুমি আবার তোমাকে জানবে কি? তোমার যদি ভীষ্মবনী ধরে থাকে তবে আমি তোমাকে বলছি তুমি আমাদের হাক্ক মাষ্টার।”

মাষ্টার হো হো করে হেসে বলেন,—“হাক্ক মাষ্টার কি ক’রে হ’ল, কোথা থেকে এল, জানিনু?”

বজ্রাম,—“তুমি আমাদের ঠাকুরদার বয়সী, তোমাকে জন্মে পর্যন্ত হাক্ক মাষ্টার দেখেছি;—আমাদের হাক্ক মাষ্টার আমাদের মধ্যে আছে, সে আনন্দের খনি, তার আনন্দমর্মে আমাদের সকলের আনন্দ। তার জাতকুল শীলের খবর রাখি না। বল না—তোমার বিবরণটা আজ শুনি।”

মাষ্টার বুকের মধ্যে জাপটে ধরে বলেন,—“ওনেছি, বাপ ছিল আমার সাপে, মা ছিল হাড়ী। তাদের জাতের ছিল না টিক, আমি তাদের কুড়ানি ছেলে। বাবা বাঙ্গলাবাজার থেকে আমাকে সাপের খাঁপিতে ক’রে এনে মাকে বিয়েছিলেন। তিনি তুবড়ী বাড়িয়ে বাজারে খেলাতেন সাপ আর ঘরে খেলাতেন আমাকে। মা—অভাগিণী হারান বলে আমার চুমা খেতেন। মা’র আভরণ ছিল জপতের ঘুণা, বাবার সম্পদ ছিল তুনিয়ার লৈজ। তার প্রেমের তুবড়ীতে ঘলের রাজা সাপও বশীভূত হ’ত। শেব কালসাপের তাড়নাতেই তাঁকে মসার’ হেড়ে যেতে হ’য়েছিল। মা থাকলেন একা, আমি লিলাম তার কাপড়গারের বেড়ী। আমি একটু বড় হ’তে যখন বেড়ী আদর্শ হ’ল—তখন আমার বিশেষত্বের নাট্যমন্দিরে ছেড়ে দিয়ে, মা বাবার বৌয়ে চলে গেলেন। বেথে গেলেন

আমার জন্ম বাবার তুবড়ীটা আর তার গলার আঁটা একখানা টিকিট—লেখা তার ‘শব্দরত্ন’। সেই হারাপ এখন তোমাদের হাক্কমাষ্টার। শব্দরত্নে খবর হ’লে ভাই জানতে পারবি।”

এই কথাগুলার সঙ্গে মাষ্টারের দৃষ্টিও যখন স্পন্দিত হ’ছিল, আমি ভয়ে-বিষয়ে অতিভূত হ’য়েছিলাম।

২

রত্ন না যাওয়ার পর আমাদের আঁড়ালী ফাকা ফাকা টেক্টে, মাষ্টারও মাঝে মাঝে অছমনস্ত হ’তেন। সে ছিল মাষ্টারের শ্রিমাশিষ্য, সকল ব্যয়ে গুট, তরুণদের মধ্যে সব চেয়ে সঙ্গীতনিপুণ। আহা! কি মহাব কঠ, কোনরূপ মুদ্রাদোষ ছিল না। যখন গায়িত, তখন মাষ্টারের মুখ লাল হ’য়ে উঠত, গান থাকলে বলতেন, ‘রত্নন, তুই শব্দরত্নকে ঠিক জাপাতে পারবি।’ সেই রত্নন চলে গেছে, আঁড়াল একটা বিবাদের ছায়া তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে মাষ্টার মন-প্রাণ দিয়ে বড় একটা গান করেন না।

একদিন বজ্রাম,—“মাষ্টার, সেখবরটা আর জমতে পার না কেন?”

বজ্রাম,—“তানপুহোটা পুরাণো হ’য়ে গেছে, বসটা চটেছে, সোচ্চারীটা ফেটেছে, তারগুলার মতুচে ধরেছে। এটাকে মেয়ামং না করলে শব্দের হ্রস্ত হ’বে না।”

বজ্রাম,—“একবার তুবড়ীটা বাজাও না, ওতেই হয় তো তোমার শব্দরত্ন প্রকট হ’তে পারেন।”

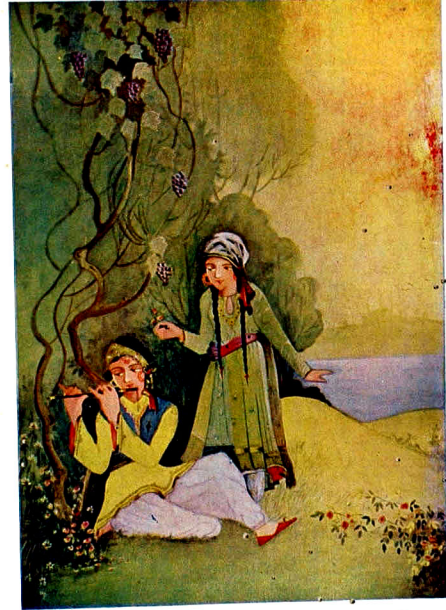
বজ্রাম,—“বাপ ওকি আমার কাজ? ওতে বড় দমের দরবার, আর দৈর্ঘ্য চাই আসীম। ওর শব্দ শুনলে সাপ জড় হ’বে। তখন একটু বেশতরো বয়েই ছোবল মারবে ওতে আমি কখন হাত দিই নি।”

ঘোড়াশাকের তানপুরা মেয়ামং করতে দিয়ে মাষ্টার বাড়ী ফিরলেন। মেঘলা ম চোখট্টা লাল হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম,—“কি হয়েছে মাষ্টার?”

বজ্রাম,—“আরে ছাঃ তোমাদের পাঠালেই হ’ত। সব রকম বাস্তব বিকৃত শব্দের সঙ্গে নানা তন্ত্রের বিকৃত স্বর মিশে একটা গুলানের বাজনা উঠেছে—সেখানে গিয়ে

পঞ্চপুষ্ণতত্ত্ব



আকর্ষণ

শিল্পী—শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র বন্দ্যো

জুজেল অফ ইন্ডিয়া প্রেস।



মাখানোর গেছে। কাণের মধ্যে নানারকম শব্দের ধ্বনি হচ্ছে। সাজ দেখি একছিদ্রমু তামাক।"

তামাক সাজা হ'ল, টেনে বলেন, "এ, এটাও বিসাদ। বাঁরে তোরা বাড়ী যা। আজ রাত বেহুয়ে ঘের গেছে, কিছুই ভাল কাগছে না।"

সকলে বলে,—“দেখো, মাঠার রতনার মত তুমিও বেন আমাদের কাঁদাইয়ো না। তোমার আনন্দমত উঠে গেলে আমরা আর বাঁচব না।"

সকলে চলে গেল। আমি মুগ্ধমানু বেতাল, আমার আগাগোড়া বেহুয়ে বাঁধা। বল্লম,—“আমিও তা হ'লে বাই।"

বল্লম,—“কেন রে? তোরা মা নেই যে কাঁদবে। বউ নেই যে ধড়কড় করবে। এক আছে পিসি—তিনি নিচ্ছই বারোয়ারী তলায় বালকসঙ্গীত সুনতে যাবেন। তুই আজ এখানে থাক।"

বল্লম,—“আমার বেহুয়ে বেগর-বাস্তাসে তোমার বেগডান সুর আরো বেহুয়ে বলবে।"

বল্লম,—“চুপ কর। ওরে মুখ, বেহুয়ের ভিতর থেকেই সুর উঠে, বেগলয় লুকিয়ে থাকে। কিছু থাকলে, তা থেকে অনেক কিছু হয়। আর, কিছু না থাকলে কিছুই হয় না। এক ছিদ্রমু ভাল করে তামাক সাজ দেখি, নলচে খোল পরিষ্কার করে জল ফিরিয়ে সাজ বি বুঝলি?"

বল্লম,—“মিছে, আর তামাক খেয়ে মাথা গরম করবেন কেন?"

বল্লম,—“চোপরাও গাথা; তুই আমাকে শেখাবি? নারিকেল নির্ধিত খোল, ও ব্রহ্মার কমণ্ডলু। পূর্ণ তাহে ভাগীরথীর পূর্ণা বাহি। যুক্ত ঐ যে নল, ও বিবৰ্ণ্যার নির্ধিত ষষ্টি, ওর এক টুকরার কাছে দ্ব্যচিহ্ন হাড় হার ঘেনে যায় বাবা। আর ঐ যে কলকে দেখছ, ও মহামায়ার ষষ্টি। তাম্রকূট-ওটা কালকূটের অধিক—তমের স্বেদ রসের পাক। যার বিষ্ণুপুরে স্নান তার তুলনা নাই। বিমিত্তে তাকে পোড়াতে হয়। যে পারে সে মধুর গুরুর গুরুর ধ্বনি সুনতে পায়। শ্রীগুরুর কৃপা হলে তবে তো শব্দব্রহ্ম প্রকাশ পাবেন। খুব মন দিয়ে আমার

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সাজবি। বুঝলি—সরগ মনই সাধনা। সাধতে জানু রহনা।"

আঃ—

মাঠার অর্ধশাফিত অর্ধউপবিষ্ট অবস্থায় শয্যা নিলেন। হাঁকোর নলচে খোল সুর পরিষ্কার করে, বিষ্ণুপুরি বাহিরী সেকো তাকুয়া চড়ান হ'ল। ক্রমে বাহিরার গন্ধে চারিদিক আমোদিত হ'তে বল্লম—“কেনমন বাহিরার গন্ধে হাথীর নেমে আস'চ তো।"

এক টান টেনে বলেন,—“উ'হ এখনও হয় নি। তোর মোহ যায় নি। ঐসুখোর কড়া গন্ধ রয়েছে, ও টানলে কনিজা আড়ষ্ট হ'য়ে বাবে, আর একটু পুড়ুক।"

খানিক পরে বল্লম,—“একবারে পুড়ে চাই হ'লে খাবে ছাই।"

বল্লম,—“না রে না, ও পুড়তে অনেক সময় লাগে। কেহ ধরতে না ধরতে দুটান টেনে নামিয়ে রাখে—বলে, দেখা হ'ল না। শেষে দেখা যায়, ওপর ওপর একটু পুড়েছে। ভেতরে কাঁচা মাল যেমন স্বেদমানি। হী, এই বার ধরেছে—তায় পুড়ে গেছে, আছে কেবল রস। এই রসে মজলে ঘরে কি'রিরি ডাকে ঝালাপালা হ'তে হয়, আর ঘর বাহিরে বার হ'বে তবে বারিদেব কৃপাপুষ্ট অলস দ্বিত্বগণের জয়ধ্বনিতে দেশতাগী করবে। এই যে কাণের ভিতর শব্দব্রহ্ম বোঁ বোঁ করছেন। প্রাণটা পাক পাচ্ছে, ব্রহ্মলোকের বিকেল ছুটবে।"

মাঠার এই বলে নলে মুগ্ধ দিলেন প্রথমে আঁতে আঁতে—“গুরু গুরু গুরু" তারপর একবার জোরে “গুরু" ক্রমে চোখ কপালের দিকে উঠতে থাকল। শেষ একবার “গুরু" শব্দ সুনতে পাওয়া গেল। নলটা মুখ থেকে পড়ে গেল। চোখের মণি ভগ্ন একবারে ভিতরে। মাথায় হাত দিতে হাত পুড়ে যেতে লাগল, গা পা একটু একটু বামছে দেখে একটু আশা হ'ল। মাঠার তবে সশরীরে ব্রহ্মলোকে গেলেন।

তারপর কয়েকদিন হেঁসে জর। ঐমধি পথা কি জল মুখের কাছে—থরলে ইন্দ্রিতে নিবেশ করতেন আর পাশ ফিরে শুভেন কেবল এইটুকু হ'ল দেখা যেত। যেদিন তার



বাম নিয়ে জর ছাড়ল সেদিন আমায়ও ঠাপ ছেড়ে বাচলাম। অটলা (অটলরাম) বলে,—"না'র কাছে হরিষ্টু খেনেছি বাবা, মারবে না তো কি?" পেটো (পকানন) বলে,—"আমি বাবাঠাকুরের কাছে যোড়া দুখে খেনেছি বাবা, না শেরে যাবে কোথা?" ছিরে (ওরফে-শ্রীকান্ত) বলে,—"শরি সাহেবের মরজা তিন হৈলা করে প্রাণী দিয়েছি বাবজান, সেই জন্তে সেরেছে।"

শেষ সূত (সত্যশরণ) বলে,—"সত্যনারায়ণের সিঁদুর ব্যবস্থা শিগগির কর—আমাদের হায়াগ মাটিরকে ফিরে পেরেছি। হুনিয়ার বস্ত সওয়া আছে সব এতদ্বারা কর; আমাদের সত্যব্রজ মাঠেরের চারিদিকে ককির বেড়া দিয়ে কুমারীকাটা স্ত্রী দিয়ে দিলে ফেল, হাতে আনন্দন্ত ছেড়ে মাঠার কোন অসত্য-থামে না যেতে পারে। হারুমঠাঠাই আমাদের সত্যনারায়ণ। যে নিজেছে হারিয়েছে সেই সত্যকে বেখেছে ও সত্য হয়েছে।" আমি বললাম,—"মাঠার ব্রঙ্গলোক দর্শন হল?"

হেসে বললাম,—"হা তার বিবরণ একদিন বলব। এখন শ্রী সিঁদুর ব্যবস্থা কর। সওয়ার সিকি আমায় দিল, তোরের জন্ত পুরো রাখিল।"

আমি চিরদিনই বেসরা বেতলাম। সতেটা মাঠেরের কথার বেশ অঙ্করণ করতে পারে। আমি কিছুই বুঝতে পারি না। অকৃতি হ'য়েও মাঠেরের ভালবাসা শ্রেয়েছি এতই মহা আনন্দ। ভাবলাম—আচ্ছা যেটা ধরি সেটাই তো পুরো। পুরোটাতে পাঁচভাগ করলে কি সওয়া পাওয়া যাবে তবু পাই কোথা? পুরোটার যি একপাশ বৃদ্ধি হয় তবে বাড়তি পোষাট তোমায় নিবেদন করা যেতে পারে। যারা পাঁচের উপর সওয়া চাপিয়ে বাহিরের ব্রবা আহরণ করে—সপাচপো সপাচপো—তারা নিজের ভোগেই সব লাগায়। তাহাদের হিমাবের তুল সত্য-নারায়ণের নিকট ধরা পড়ে সব মিথ্যা হয়ে যায়। আর বাহের লক্ষ ধন বাড়তে থাকে তারা তাহার অচর করবে তবু একপাশ সত্যের উদ্দেশে উৎসর্গ করবে না। মাঠেরের মনন মুখে কীণ হাতির রেখা দেখে আশ্চর্য হ'লাম, ভাবলাম সময়ে ব্রিজাদা করব।

যার যাহা মানিত ছিল ক্রমে দেখাও স্বরূপ হল। মাঠেরের ঘরে ঘোরা দিগধরী মুক্তকণ্ঠী বৃন্দমাণিনী খলুমুখাবারগী বরাভরকরা জ্বলোকাতারিণীর প্রকাণ্ড পট প্রলম্ব ছিল। তার নীচে তুলতো গলায় টিকিট আঁটা সেই তুংগুটী। অটলা তার কাছে হরিষ্টু দিলে। পাড়ার হেলেরের খুব আনন্দ, সেই আনন্দে আমারও আনন্দ। মাঠার মজলিসে গাইলেন—

‘তারা পরমেশ্বরী।

কখন পুরুষ হও না কখনও বোড়শী নারী।

জ্ঞানদে জ্ঞানদায়িনী, ভক্তিমুক্তি প্রদায়িনী,

এ ভব সংসারে যাগো ভগ্না শ্রীপদন্তরী।’

পেটো পকানন-তলায় যোড়া মেঘ বলি দিয়ে নিয়ে এল। তার স্বপ্ন একদিন জমাট মজলিসে চলে। তার মধ্যে মাঠার গাথিরাছিলেন:—

‘কুতনা ভব ভৈরব শকর; গরাধর ময় মনানবিহারী,

মাতে ভৈরব ভৈরব রসে, প্রমত্ত ভৈরব ভীম তরঙ্গে

কৃষির তুলন জয় পিণাকথারী।’

ছিরে কতকগুলো পদ্মা অগণ্য ক’রে একদিন আচ্ছাদ্য দেওয়া দিলে। শেদিন পাড়ার লোক ভেঙ্গে পড়েছিল, জমকাল মজলিসে বড় বড় রাগ-রাগিণীর আশাপ চলতে লাগল, তার মধ্যে মাঠার ধ্বলন—

‘নিবিড় অঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি;

তাই যোগী ধ্যান মরে হয়ে দিগি শুধাবারী।’

ককেদিন অগণ্য ক’রে সত্যেকে বলাগ,—"কি বাবা

তোমার সত্যনারায়ণের সিরিটা এইবার হ'য়ে যাক।"

স'তে বলে,—"বুড়ার জন্ত কুমারীর স্ত্রী পাওয়া

গেল না অ'হাদিন ল'লে অকমাণ হ'বে।"

বললাম,—"মাঠার যি গালায় হ'বে।"

বললাম,—"আমরা প্রেমের ভোগে বেখে রাখ'ব।"

মাঠার বলেন,—"যখন প্রেমের ভোগে বেখেছি তখন

পূজা হ'য়ে গেছে সবলে এখন প্রাণ পাও দেখি।"

এই বলে বিবিধ কল মিঠা বিসর্জন করতে লাগলেন।

নিজের জন্ত কিছুই রাখলেন না। ভাবলাম, বাড়তি

সিকিটা বৃষি আগেই ভোগে লাগিয়েছেন, নতুন প্রাণ

হ'ল কি করে। মাঠার তখন মনে মনে গুণগুণ করে গাচ্ছিলেন—

‘‘ভিত্তের চাকল্যে জীবভাব ঘটে, চকলতা গেলে

সকল আশা মেটে

স্থির হ'লে চিত্ত হৈত চিত্তপটে, অঁকা আঁশে

ধাকামদনমোহন।’

৪

‘কয়েকদিন চেপে বসি ডর করল। আচ্ছাদ্য মেঘ-মহাঘের মোহড়া চলেতে লাগল। যেদিন বাহা ছাড়ল, সেদিন অঁজল অঁজল বলে পোকা এসে ক'ব ও নাশার মধ্যে বাসা নেবার ব্যবস্থা করতে লাগল দেখে আলো নিবিধে সব আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে আছি। সেই সময় আমি শব্দব্রহ্মের বিবরণ শুনবার জন্ত মাঠারকে নাজোড়বন্দা হ'য়ে ধরলাম।

বাহিরের আলো নিবিধে দিলে ঘরের আলো খোলে ভাল, সে দিন আমি তাহা বেশ বুকেছিলাম। এই বলে মাঠার আরম্ভ করলেন—

‘‘তামাক টানতে টানতে শরীর অবশ ও ঝিম ঝিম

করতে লাগল, আর শিরে সহস্রাধির প্রচণ্ডকিরণ জমাট

ব'ধল,—মনে হ'ল, অন্ধরত ফেটে আমি বিচ্ছিন্ন শিখার

মত বের হ'য়ে যাচ্ছি। মুখ হ'তে নলটি ঘষে পড়ল, দেহটা

মড়ার মত পড়ে রইল। আমি ব্যোমপথে আলোক-

গতির কোটিগুণ বেগে ছুঁতে লাগলাম। এক একটা

ব্রহ্মণ্ডে জ্বল লোকবিশ্বর মত প্রকাশ পেলে নিম্নের

মধ্যে আমি বিস্তার লাভ করল; আবার দেখতে না

দেখতে ক্ষুদ্রতম বিন্দুতে পরিণত হ'য়ে লীন হ'য়ে গেল।’’

এরূপ কত ব্রহ্মণ্ড অনন্ত অঁধার কোলে বৃহদ্রথের মত

উঠল-আর লয় পেয়ে গেল। শেষ আমি লোকালোকের

সীমার উপনীত হ'লাম। তখন মনে হ'ল এই অনন্ত

আকাশ স্পর্শিত হয়ে আমার পিঠে ফেলতে আনুচে

অনন্ত আঁধার জমাট বেধে আঁখিকে চেপে ধরতেই এক

অব্যক্ত মধুর ধ্বনি শুনতে পেলাম ‘ও আর্হাি—আমি

নিঃস্রিয়া সংজ্ঞাহীন ফলাম। যখন চৈতন্য হ'ল তখন

দেখি কোটিসুখের জ্যোতির মধ্যে কোটি চন্দ্রমা খেলা

করছে। তার অনন্ত বিস্তৃত সিদ্ধ স্বপ্নার হিলোলে হস-হাসী মূর্তা করছে। হৃদ-কেন্দ্রী, টপা-চামেলী, টগর-পাতিজাত, বেল-নকুল, শেকাশী-শবলবের গদে ভরে গেছে। বসন্তের বাতাস বইছে। তার মাঝে একটা অব্যক্ত স্বর আর আমি তার সঙ্গে মিশে আছি। মনে হ'ল, সমুদ্রাভূ-নির্মিত সপ্তভার মাকড়সার জালের মত ঘিরে রয়েছে। তাতে সমুদ্রেরের তরল উঠে ক্রোড়ভিম্ব চলেছে। সেখানে অধঃ, উর্দ্ধ, পার্শ্ব কিছুই নাই। আমি তরল সিদ্ধ জ্যোতির মধ্যে হাতড়ে পেলাম দুখানা পাহুকা।

এই বলে বীণা-সংলগ্ন তুহী দুইটা দেখাইলেন—‘‘সেই দুটা দুই করে ধরতেই আমার এক অশূর্ষ দারুণ শরীর সৃষ্ট হ'ল। তাতে সপ্তভার এসে বুক হ'য়ে চিরপু সন্ধির স্বপ্নন করল। ‘ভাবলাম আমি কে?’ ধনি উঠল, ও। মুখ খললাম, শব্দ হ'ল, ও মা ও ও ও। চেয়ে দেখি সমস্ত জ্যোতি জমাট বেধে এক আনন্দময়ী সৃষ্টি হ'য়েছেন, আর আমি তার কোলে ব'সে আছি।’’ ব্রিজাসিলাম,—‘কে—মা?’

মা বলেন—বাকু দেবী।

বললাম—আমি কে মা?

মা বলেন—তুমি শব্দব্রহ্ম।

বললাম—তিনি যে মা নিত্য, আর আমি অনিত্য।

মা বলেন—তবু আমি—তুমিই সেই—তোমার নিত্য

প্রতিপদ করতে অনিত্য ব্রহ্মের স্বপ্নন করেছি।

বললাম—কিরূপে প্রতিপত্তি হ'বে?

মা বলেন—তোমার আমি নিই স্বতরাং অন্ত নাই।

‘‘তোমার সত্যত্ব বরং বখন বিবৃত হয় তখন আধিরূপে

বাক্য অকার্যের উৎপত্তি হয়। তাই লোকে কিছু বলতে

চাইলে প্রথমে বলে অ বা অরে। এখন ভাল মত বিবৃত

হ'ল তখন উঠল ‘উ’। তাই শব্দ শোনা গেলে লোকে

বলে উ বা হ’। যার উৎপত্তি হয় তার বিনাশ অনিবার্য।

ধরক জাগাইরা এইরূপে ছেড়ে দিলে লয় পেয়ে যাবে।

তাই স্বরের বিরামের পূর্বে মুখ সত্যত্ব কর্তে হ'বে। তা

করলেই তোমার নিত্য ব্রহ্মসীমা দেহতে পাবে অ—উ—ম

বা ও। এখন ওঁ-ভিত্তের কুণ্ডলী পাকাতে থাকুক







নেকামি? বঙ্গলট্টা কোথা গেল? খুলে নিয়েছিল বুঝি? এই যে- মাজের সায়েবের চাপরাশি আসছে। হ্যাঁ যে মিকাজান, এটা হজুর বাহাদুরের কুকুর না?”

“কেনেছেন? এরকম কুকুর হজুর কখনও পোষেন?”

দারোগাবাবু বলিলেন, “আমি আসে থাকতেই জানি। তবু ওই শিবে বেটা—”

দাঁতকাঠি ফেলিয়া দিয়া শিব ঘরে ঢুকিল। “জ্ঞান সময় নষ্ট করেনা। নিয়ে চল বেটা খেঁকি কুস্তাকে ধরে। লোকটাকে কামড়ে আধ-মরা করে দিয়েছে। আজই গুনে বোঁটাকে সাবড়ে দিতে হবে। লে চলো।—”

মিকাজান বলিল, “কুকুরটা হজুরের নয়। হজুরের ভাই আজ কদিন হ’ল এসেছেন। তারই কুকুর।”

“হজুরের ভাই এসেছেন? তা তো একশ গুণ আমাকে বল নি। বেড়াতে এসেছেন বুঝি? হজুরের ভাইয়ের কুকুর? তা একশ বলতে হয়। আমি গোড়াতেই

বুঝেছিলুম, ভাল জাতের কুকুর। মাংসকই বোঁধ হচ্ছে। কি চমৎকার লোম! মুখখানা কি! তুলে নাও তুলে নাও মিকাজান! বজ্রাত বেটারা! হজুরের ভাইয়ের কুকুর—তাকে গেছিস বিড়ি খাওয়াতে! এক নিমিষ বাড়ির কুকুর যে পরমাণু তেরগুণা বিড়ি খাওয়াবি। এ হচ্ছে মারিফ্লেট সাহেবের ভাইয়ের কুকুর! দশ টাকা ডজনের হাভানা চুকট খায়। ঝাঁপচিস কেন রে? ছুঁটী রেখে উঠেছে বুঝি? তুলে নে, মিকাজান! আমি আর সজাল বেলো ছোঁব না। খাসা কুকুর!”

মিকাজান কুকুর লইয়া চলিয়া গেল। দর্শক-বৃন্দ হরিহরের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

হরিহরের নাকের কাছে ঘুসি তুলিয়া দারোগা বলিলেন, “চড়িয়ে লাল করে দেব, পাঞ্জি কোথাকার! আঁধু কামড়ে! তোর নাকটা কামড়ে নিলে আমার মনে দুঃখ বেত। বিড়ি খাইয়েছেন! এটা—”

দারোগা বাবু কৃত্য মস্ মস্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

## “আর ভুলায়োন”

শ্রীঅনিলবরণ রায়

আর ভুলায়োন! নোরে অশেষ ছলনে  
হে স্বন্দর! মায়া তব স্বরূপ।  
জন্ম জন্ম আছি বঁধা তব বাহুপাশে  
সাধ্য নাই পাশ ফিরে চাহি একবার!  
বস্তু ভাবি আর নাহি বর বন্ধ হয়ে  
বস্তু চাই আপনাদের নিতে সরাইয়া—  
কি কোহিনী জান তুমি, নিমেষের মাঝে  
দাঁও সব উলটিয়া। আয়তারা হয়ে  
নিশে যাই তোমা সনে, ইঙ্গিতে তোমার  
উঁঠি বসি প্রাণহীন পুতুল যেন থো।  
তোমারি হাসিতে হাসি, ফেলি অশ্রুজল  
জিলমাজে আপনাদের না পারি ভাবিতে!  
শৈশবে লইয়া ক্রোড়ে জননীর রূপে  
এ-বিচিত্র ধরণীর দিলে পরিত্যক্ত—  
বিশ্বদয় পুঙ্ক এক হ’ল বিবাহিত—  
নিভারি বন্ধের সুখা দিলে গড়ে ধরি  
বাঁধিলে বেহের হস্তার শিরায় শিঃয়।  
যমুদয় বোঁধনের কড়ার উত্তর,

মর্ত্যমাঝে অমরার দেখালে স্বপন,  
লইয়া রূপের ডালি ধাঁড়ালে সমুদ্রে,  
বুকভরা যৌবনের পূর্ণ মায়াবিন্দু;  
চকল আঁধার ঠারে নাচে রক্তধারা,  
ছুটাইলে শিল্পে পিছু উল্লাসের প্রায়!  
জীবন-সংগ্রামে কত জয়-লক্ষীরূপে  
বিলে গলে বরমালা, কত নিঃশ্বাসিলে  
পরাজয়ে অসমানে ধুলির উপর।  
জরাজপে সর্বশক্তি করিয়া হরণ  
জাগায় রাখিলে শুধু অস্তরের ফুঁ  
যেন জন্ম জন্মান্তর সেবি পাশ হ’য়ে!  
মৃত্যুরূপে জীব দেহ করি অবসান,  
আবার নবীন দেহ বিলে কিরাইয়া  
পর্যাহতে নবভাষে মায়ার শুমল।  
কতকাল খেলিলে এ খেলা, হৃৎকিনী?  
বন্ধনের বাঁধা আঁজি বড় বাজে যুগে—  
মুক্ত কর—মুক্ত কর তব মোহপাশ,  
দাঁও এবে অবসর লাইগো চিনিয়া  
কে তুমি কে আমি কেন বিলেছি হেথায়।

## প্রাচীন বঙ্গে খ্রীশিক।

শ্রীভগমানাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত।

বঙ্গের এক সৌবরয় যুগ আঁধা বিস্তৃতির অতল সলিলে  
নিমগ্ন। যে যুগে বাঙ্গালী নাবিক অজ্ঞাতভাষে সমুদ্রপথে  
বাণিজ্য-সত্তা লইয়া গিয়া দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করিতে  
মাইত, অথবা উপনিবেশ স্থাপন করিত—যে যুগে একজন  
বাঙ্গালী মহাপুরুষ তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের সংহার করিয়া  
তৎকাল মহাসম্মানিত অজ্ঞাত “লামা” বা পুরোহিতের  
জ্ঞান অল্পভূত করেন—যে যুগে বাঙ্গালী ভাঙ্গর, বাঙ্গালী  
শিল্পী, বাঙ্গালী স্থপতি, বাঙ্গালী ধর্মোপদেশী, বাঙ্গালী বীর ও  
বাঙ্গালী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ দেশ-বিদেশে বাঙ্গালীর প্রভাব বিস্তার  
করিয়াছিলেন ও ধর্মের মূর্তন থায়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই  
প্রাচীন হিন্দু-বুৎ ধর্ম। এই যুগের ইতিহাস কালের  
স্বর্ণযুগ হইলেও অধুনা দেশবাসল অঙ্গসন্ধিঃস্বর্ণণ আত্মবান  
রূপায় লিপ্ত থাকিয়া ইহার কথঙ্কিঃ উদ্ধার করিতে সমর্থ  
হইয়াছেন। এতদেশে নানা কারণে ঐতিহাসিক উপাদানের  
বিশেষ অভাব থাকিলেও সেই অভাব ক্রমে দূরীভূত  
হইতেছে। আশা করা যায় প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসের  
উদ্ধার-সাধন ইতঃপূর্বে একরূপ অসম্ভব হইলেও এখন আর  
অসম্ভব মাটেই নয়। সেই স্বপ্নিন আগন্তপ্রায়। যে সব  
উপাদানের মধ্যে দেশের ইতিহাস তাহারে রাখা গাত করিয়া  
যায়, সাহিত্য তাহার অঙ্গভূত। চর্যাপুর বিবর আমাদে-  
শের প্রাচীন সাহিত্যের অবিচাংশ ভাগই কবিকল্পন-  
যুগে। এই তেজ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে এতদেশের  
ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়া  
থাকে। কথ্যটা আংশিক সত্য হইলেও আমাদের দৃষ্টি বিবাস  
উদ্ধার কবিকল্পনার মধ্যে অহুসন্ধান করিলেও এই দেশের  
প্রাচীন ইতিহাসের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু মূল্যবান উপাদান  
প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কবিকল্পনা নিমিত্তই কথঙ্কিঃ সত্য  
আশ্রয় করিয়া সংগঠিত হইয়াছিল। বাংলার সেই অজীত  
যুববীর যুগে বাঙ্গালী যত বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল  
খ্রীশিক। তন্মধ্যে অজ্ঞতম। সমাজের একাঙ্গীঃ পূর্ণতা লাভ  
বিস্তবে ও অপরাধঃ অপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে, ইহা

কখনও হইতে পরেন না। প্রাচীন বঙ্গসমাজ এই বিষয়ে  
যথেষ্ট সাধন ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন কবির  
অতিশয়োক্তিপূর্ণ কাব্য ও কথাসাহিত্য হইতে আমরা আজ  
প্রাচীন বঙ্গের খ্রীশিকার কথঙ্কিঃ আভাব দিতে চেষ্টা  
করি। কাব্যগুলির অধিকাংশ ভাগ মূল্যবান-বিজয়ের  
পরে লিখিত হইলেও প্রাচীনতঃ হিন্দুযুগ ও আংশিক  
মূল্যবান যুগের অবস্থা হইতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া  
অহুমান হয়। এই বিষয়ে সঠিক কাল নির্দেশের সময়  
এখনও আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালার  
এক সময় খ্রীশিকার যথেষ্ট প্রসার ছিল। ইহার  
অজ্ঞত কারণ সম্ভবতঃ এতদেশে বৌদ্ধপ্রভাব। বৌদ্ধ-  
যুগে খ্রীপুরুষ উভয়েই সমভাবে বৌদ্ধবিহারে শিক্ষালাভ  
করিতেন। ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নাই।  
তৎকালে জাতিভেদের অবর্তমানতা এই বিষয় নিঃসন্দেহে  
যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার পরে পৌরাণিক যুগের  
অজ্ঞাদে জাতিভেদ বেশ স্ব্পষ্ট কঠিন আকার ধারণ  
করিল ও “ক্ট্রী ও ব্রহ্ম-মণ্ডলে সমাজাণ্ডিগণের বিচার  
রেক্ষণ ধাঁড়াল তাহাতে তাহাদের মধ্য হইতে শিক্ষাবিঘটী  
একবারে লোপ পাইবার উপক্রম হইল। বাহা হউক  
অশোকাকৃত আধুনিক কবিশর্গের কাব্যের মধ্যেও আমরা  
দেখিতে পাই রমণিগণ তাহার প্রাচীন শিক্ষার ফল হইতে  
একবারে বঞ্চিত হন নাই। এই কবিশর্গের বর্ণিত  
রমণিগণের মদ্যর বল, ধর্মবুদ্ধি—শিক্ষা-দীক্ষা তৎপূর্ববর্তী  
কবিশর্গের বর্ণিত রমণিগণ অপেক্ষা বিশেষ হীন নহে।  
প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে হইলে যে মানসিক ও বৈহিক এই  
উভয়েরই উৎকর্ষ লাভ আবশ্যক। ইহা প্রাচীনগণ সম্যক  
উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইজন্য দেখিতে পাই প্রাচীনযুগের  
রমণিগণ এই উভয় বিষয়েই যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ  
করিতেন। আমরা নিজে এই উভয় শিক্ষা-সম্পদে ছ’একটা  
উপাহার দিতে চেষ্টা করিব।

পূর্বে একই পাঠশালায় পুত্রকর্ত্তাগণ শিক্ষালাভ করিতেন,



এমন উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে আছে। “পুষ্পমালা” গল্পে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, এক রাজকন্যা ও এক কোতো-  
দালীর পুত্র একই পাঠশালায় লেখাপড়া করিতেন। ইহার  
ফলে একতরফের প্রেম-বশিত ব্যাপার এই গল্পে বর্ণিত আছে।  
দয়্যামের সারদামঙ্গল কাব্যে (১৭শ শতাব্দী) বর্ণিত  
সহিত্য একই পাঠশালায় পড়িতেন। এই ছেলেরা রাজ-  
কন্যাসেবকের নিবাসের দ্বারা ও কুটা জোগাইয়া ‘ধলাকুটা’  
এই নাম লাভ করিয়াছিলেন। এই তো গেল ছেলে-মেয়েদের  
একই পাঠশালায় বাইবার কথা। শুষ্ক মেয়েদের পাঠ-  
শালায় বাওজের বর্ণনা আমরা ১১, ১২শ শতাব্দীর গোবিন্দ-  
চন্দ্রের গানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। রাণী ময়নাবতী একস্থানে  
বসিতছেন—

বেকালে জনক গৃহে আছিলায় আমি।

মোরে জ্ঞান বিরাজেন গৌরনাথ মুনী।

পাঠশালে পড়ি আমি বাই নিকতন।

যোল শত বোণী লইয়া গৌরঙ্গ গমন।।

গোবিন্দচন্দ্রের গান।

এইতো গেল পাঠশালায় সাধারণ লেখাপড়ার কথা।  
মেয়েদের উচ্চাঙ্গের লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা পাঠশালায়  
ভালরূপ ছিল কি না তাহা জানা যায় না। তবে সম্পন্ন  
ঘরের মেয়েরা নিচাইয়া বাড়ীতেই উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে  
রীতিমত লেখাপড়া শিখিতেন। মেয়েরা যে ভাগ্যবশত  
শিক্ষিতা হইতেন তাহার কিছু প্রমাণ আমার যখন হইতে  
পাওয়া যায়। আমার সম্বন্ধে কিংবদন্তী বাহাই থাকুক না  
কেন, বাঙ্গলা ভাষার তাঁহার নামে যে বচনাকীর্ণ চলিতভাষে,  
তাহাতেই প্রতীকমান হইবে যে, মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষা প্রাচীন-  
যুগে আকাশকুসুমবৎ প্রতীকমান হইত না। বিজ্ঞান-সময়ের  
গল্পে দেখিতে পাই রাজকন্যা একজন উন্নতরূপে বিজ্ঞা অর্জন  
করিয়াছিলেন যে, তদ্বারা তাহার বিজ্ঞা নামের সার্থকতা  
সম্পাদিত হইয়াছিল। ৩২কালে সম্রাটের একদিকের  
আলোচ্য আমরা বিজ্ঞান-সময়ের গল্পে প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞানিতে  
পারি। ইহা বিরাগণ মেয়েদের বিবাহ। যে ব্যক্তি কোন  
শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবে তাহাকে  
কিন্তু তর্কে পূর্ণে সেই কন্যাকে পরাক্রান্ত করিতে হইবে,

নতুবা বিবাহ হইবে না। কতাদিগের কি সমস্ত-প্রতিজ্ঞা।  
বিজ্ঞান-সময়ের পুরাতন ‘গল্প’ অংশধন করিয়া মহাকবি  
রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এই সম্বন্ধে বিজ্ঞার পানের কথা বার  
লিখিয়াছেন, তা এই—

জন রাজা সাবধানে, পূর্ণে ছিল এইস্থানে,  
বীরসিংহ নামে নরপতি।  
বিজ্ঞানসে তার কন্যা, আছিল পরম ধরা,  
রূপে লক্ষী গুণে সরস্বতী।  
প্রতিজ্ঞা করিল সেই, বীরো জিনিবে সেই,  
পতি হবে সেই সে তাহার  
রাজপুত্রগণ তার, আসিয়া হারিয়া যায়,  
রাজা ভাবে কি হবে ইহার।

ভারতচন্দ্রের অমলমঙ্গল

বিজ্ঞা ও হুম্মরের তর্ক-প্রসঙ্গের বর্ণনা এইরূপ :—

পণ্ডিত পণ্ডিত কথার রসের তরঙ্গ।

প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ।

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।

অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধুক।

বোদ্ধ একমেবাদিখ্যাবাদি তর্ক।

নীমাংসায় নীমাংসায় না হয় সম্পর্ক

বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে।

পাতঞ্জলে মাধ্যম অঞ্জলি বান্ধি হাং—

মাংসোত্তে কি সংখ্যা হবে আশ্বিনীরূপ।

পুঙ্খানুসংখ্যিত বৃত্তি মনু বিজ্ঞ নন।। ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের অমলমঙ্গল

“চন্দ্রসং-বিবাহ” গল্পে আছে, নিরীত সন্ন্যাস যুব  
চন্দ্রসংয়ের আশীত গুণ চিত্তিতে লিখিত বিব শব্দটোই নী-  
কন্যা বিবাহ গোপনে “রা” যোগ করিয়া তাহার প্রণয়  
করিয়াছিলেন।

নয়নের কঙ্কল লইল স্ববিধানে।

শেখিল বিবাহ দান দিহত যদনে।

—জনশ্রুত দাসের মহাভারত

চতুর্ভাষার ধনশক্তি-উপাধানে বর্ণিত আছে যে, যাদু  
প্রথমা পত্নী লহনার অমুরোমে নীলাবতী ধনপতির শিখা

একশনি শ্রুত সম্পূর্ণ জাল করিয়াছিলেন, এবং ধনপতির  
বিত্যর ক্ষেত্র জীর্ণনাট ও তাঁহার স্বামীর হস্তাক্ষর যে  
জাল তাহা মুখিতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। বধা—

নীলাবতী পত্র লিখন।

দ্রুই জন একস্থানে করিয়া মুকতি।

কপট প্রবন্ধে পত্র লেখে নীলাবতী।

বৃত্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি।

অশেষ মঙ্গল ধাম লহনা যুবতী।

লহনার বোসেত যুগ্মনা পড়ে পাতি।

হাসনে যুগ্মনা ছন্দ দেখি কিছু ভাতি।

বলে দিদি ইথে আমি না করি তরাস।

কেবা পত্র লিখে মোরে করে উপহাস।

তন দিদি সাধুর অক্ষর ভিন্ন ছন্দ।

কেবা পত্র লিখে মোর করিয়া প্রবন্ধ।

—কবিচন্দ্রের চতুর্ভাষা

ময়মনসিংহ গীতিকার-বর্ণিত ময়ুয়া ও কমলার ছড়ায়,  
বংশীদাসের পদ্মা-পুরাণে ও পশ্চিম ময়মনসিংহে প্রচলিত  
চান্দীদাসের গল্পেও জীশিক্ষার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।  
অস্পষ্টাকৃত আধুনিক যুগে এইরূপ শিক্ষিতা নারীগণের  
নাম কত করিব। সুবিখ্যাত মনসামঙ্গলগুরু বংশীদাসের  
কন্যা চন্দ্রাবতী, চতুর্ভাষার প্রেমপাত্রী রাণী বা রামশিখি ও  
রাজা রাজবল্লভের আদ্যায় আনন্দময়ী—ইহারা বিশেষ  
উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রাবতী, রাণী এবং আনন্দময়ীও সাহিত্য-  
সাহিত্য জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন।  
ইহারিগের মধ্যে চন্দ্রাবতী (১৩শ শতাব্দী), রাণী  
(১৪শ শতাব্দী) ও আনন্দময়ী (১৮শ শতাব্দী) অত্যাধিক  
অনেক পরবর্তী যুগে হইলেও প্রাচীনকালের কাব্যে ও গল্পে  
বর্ণিত শিক্ষিত নারীগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহারিগের নাম  
উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

উজ্জ্বিত বর্ণনাময় ভিন্ন জীশিক্ষার বিস্তারিত আলোচনা  
পড়িয়া আছে। বারবণিতাগণও লেখাপড়ায় বিশেষ দক্ষতা  
লাভ করিত। ইহারা নিজহস্তে দলিল লিখিত বলিয়া মানিক-  
চন্দ্র রাজার গোনে হারানার প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। বধা :—  
গোনাট খত কলম বোলাইল আমিরা।

বার বড় কড়ি নাট আনিল গণিয়া।

১০৬

লেখ লেখ বলিয়া হাড়ি হকুম ভালা দিল।

সন তারিখ শ্রী কাগজত লিখিল।

ঐ বার কড়া কড়ি কাগজত লিখিল।

ধর্ম্মী নামটা কপালগীত লিখিল।

মানিকচন্দ্র রাজার গান।

বারবণিতা হরিক-সম্বন্ধে ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে বর্ণিত আছে  
যে, সে যুবরাজ লাউসেনকে এমন সব কুট প্রণয় করিয়াছিল  
যে, লাউসেন অন্তোপান্ত হইয়া মহাবেদ, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি  
বৈদ্যবিশারদের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সংযত  
সাহিত্যের বারবণিতা বাসবদত্তার ছায়া এই সব বার-  
বণিতাতে দেখিতেও পাওয়া যায়।

সেকালের নারিগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেন বা যি  
চিত্রবিজ্ঞা, হস্তিকার্য, মৃদুগীত, এমন কি রন্ধন বিজ্ঞাতও  
অন্যোন্মোদী ছিলেন না। এই বিষয়ে তাহার সত্যক  
দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহগীতিকার বর্ণিত

কাজল রাখার আলিগনা দেওয়ার বর্ণনা এইরূপ :—

উত্তম সাইলের চাউল জলেতে ভিজাইয়া।

দুইয়া দুইয়া কড়া লইল বাটরা।

শিটালি করিয়া কড়া পরধমে আঁকিল।

বাগ আর মারের চরণ যদন পাঁধা ছিল।

জোরা টাইল আঁকে কড়া আর ধান ছড়া।

মাখে মাখে আঁকে কড়া থির লহনার পাঁরা।

শিবদণ্ডী আঁকে কড়া কৈলাস ভঙ্গন।

পদ্মপত্র আঁকে কড়া লক্ষী নারায়ণ।

ইত্যাদি—কাজল রাখা

হস্তিকার্যে একদেশের নারিগণের দক্ষতা চিরপ্রসিদ্ধ।  
প্রাচীন কাহিনী নির্মাণে যে সব হস্ত হস্তিকার্যের পরিচয়  
বর্ণিত আছে, তাহা যে নারীর হস্তের এই বিষয়ে সন্দেহ  
নাই। চাকতে অজ্ঞাপি শ্রেণীবিশেষের রম্যগণ এই  
বিষয়ে দিগ্‌দম্বন। কবিবন্ধনে ময়মনসিংহের চতুর্ভাষা  
বর্ণিত তুর্গার কাহিনী ও রূপরমের ধর্ম্মমঙ্গল বর্ণিত মায়ার  
কাঁচুর বর্ণনা হস্ত হস্তিকার্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মনসামঙ্গল  
ধর্ম্মমঙ্গলে বারবণিতা হরিক-সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে—

হস্ততরং তংপর আনিয়া খড়িকা।

হাতা হতি পত্র নিকে হরিকা নারিকা।।



পরস পরের রচিল হই আল।

খুরি বাতী ব্যঞ্জন যোগাতে কালেকাল ॥

নানানিচি বিভিন্ন নির্মাণ পরিপাতি।

পঞ্চাশ শতাব্দী সাংগে শতাব্দিক বাতী।

রচিত তেঁতুল পত্রে পরিপূর্ণ বারি ॥

—মনরামের ধর্মমঙ্গল—

এক সময়ে নৃত্যগীত শ্রী-শিকার একটি বিশেষ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। উচ্চশ্রেণীর রমণীগণ ইহাতে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতেন। মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত বেহলা শুধু নৃত্যের দক্ষতা দেখাইয়া দেবপুত্রী হইতে মৃত বামী লবঙ্গদলের প্রাণতিকা করিয়া আনিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। নৃত্যের পারদর্শিতার জন্ত বেহলা “নাচুনি বেহলা” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যেও রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা-প্রসঙ্গে রমণীগণ নৃত্যে দক্ষতালভের কথা পাওয়া যায়।

রজন-বিজয় প্রাচীনকালে রমণীগণ বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিতেন। কি উচ্চ কি নীচ সব শ্রেণীর রমণীগণের মধ্যে রজন-ক্রায়ে পটুতা লাভ করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। ব্যাধকতা হুয়রার বিবাহ-প্রস্তাবের সময়ে তাহার এক গুণ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছিল :—

রাহিতে বাড়িতে ভাল এই কড়া জানে।

বহুগণ মিলিয়া সবাই গুণগানে ॥

—কবিকল্পের চণ্ডীকাব্য, কালেকতুর উপাখ্যান

উচ্চশ্রেণীর মধ্যে রাজপুত্রবৎ গৌরবান্বিতা বণিকপত্নী ধূম্রনা ও মনকার রক্তনের বর্ণনা চণ্ডীকাব্য ও মনসামঙ্গলের একটা উল্লেখযোগ্য ভাগ স্মৃতিরাকার করিয়া আছে। মানিক গাঙ্গুলির ধর্মবঙ্গলে বর্ণিত স্মরণকার রক্তন ও চৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণিত (মধ্যখণ্ড) সীতাদেবীর রক্তন এই বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই তো গেল লেখাপড়া, বিভিন্ন শিল্প ও স্রুতকার কলা-শিল্পে প্রাচীন বঙ্গের রমণীগণের দক্ষতার কথা। তাহার সৈহিক বঙ্গের উৎকর্ষসাধনেও কম তৎপর ছিলেন না। এই বিষয়ে তাহাদের যথাচিত মনোযোগ ছিল। ফকির-রাম কবিরূপের স্রাণ বোনার গয়ে আসন্ন রাজকুমারী স্মরিকার সৈহিক বঙ্গের যে পরিচয় পাই তাহা গম্য হইলেও উল্লেখযোগ্য বটে। মরিকা স্বয়ং পুণ্ড্রবঙ্গের সমস্ত বঙ্গজন্ত শিকার করিতে বাহির হইতেন এবং গম্য প্রান্তে যে বহুস্তে ব্যায় শিকার করিতেন। ইহাতে অনেক সময়ে অস্ত্রেরও

আবশ্যক হইত না। ছোট তরবারী সাহায্যে তিনি বহু হস্তী বধ করিতেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহার পাণিপ্রার্থী হইবেন তাহাকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। ময়িকাকে বিনি পরাজিত করিবেন। তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। আমরা বিজা ও মরিকার গম হুঁচিতে দেখিতে পাই যে, কি মানসিক কি শারীরিক—উভয়দিকেই নারীগণ পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে কৃত্ত যোগ্য করিতেন না। উহা কম গৌরবের কথা নহে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় যে, কালুভোম-পত্নী লক্ষী, রাজকন্তা কলিঙ্গ প্রভৃতির জায় ঘোঁড়া কোন সময়ে পুরুষদিগের মধ্যেও কদাচিৎ গম্বব হইত। একাধিক কবি ইহাদের রূপ-পারদর্শিতা অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আমরা উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে দেখিতে পাই যে প্রাচীনকালে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা পুরুষদিগের ন্যায় নারীদিগেরও সমান প্রাপ্য ছিল। অতি নিম্নস্তরেও এই শিক্ষা অল্প বিস্তার প্রবেশ লাভ করিয়া ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণাদি-বর্ণিত চরিত্রগুলির বর্ণনা নারীগণের নৈতিক বলাধান করিয়াছিল। লেখাপড়া অল্প জানা থাকিলেও কথকতাকুর ও মঙ্গল গায়কদিগের রূপায় পুরাণাদি-বর্ণিত ঘটনাগুলি সকলেই অল্প বিস্তার জানিতে পারিতেন এবং তাহার ফলে চণ্ডীকাব্য বর্ণিত দুঃসার নায় সাহায্য ব্যাধপত্নীও ছদ্মবেশী চণ্ডীদেবীর অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি পারিবারিক কর্তব্য পালন, এবং ডাক ও খনার ঘটন বর্ণিত গৃহহারা ব্যাপার বঙ্গনারীর বিশেষ অভিজ্ঞতালভের উপায় করিয়া দিয়াছিল।

পরন্তু পৌরাণিক ম্যাপ্রদেহ তৎপূর্ণবর্তী হোঁদুগুপে নারীগণ অধিক কর্মপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার নিজস্বাচারে মাল্যাক অষ্টের উপর আশ্রয় করিতেন না। রূপকথার মাল্যাকমালার উপাখ্যানের মাল্যাকমালার ধর্মমঙ্গল কাব্যের লক্ষী, কলিঙ্গা প্রভৃতি ইহার প্রমাণ উদাহরণ। কিন্তু পৌরাণিক প্রভাবে অষ্টদেবীর কি নারী কি পুরুষ—সকলকেই ক্রমে অভিজ্ঞত করিয়া দেবতার উপর নির্ভরশীল করিয়া ফেলিয়াছিল।

বাহ্য হউক “কন্যাপোষ পালনীয়া শিক্ষণীয়তা বহুত” শিক্ষায় বিশেষ যত্নবান হইতেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে উক্ত এই সামান্য কয়টা উদাহরণই বোধহয় তৎপক্ষে

কিৎপরিমাণে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।



কথা—ত্রিবিভূতিভূষণ দাস,

মুর ও সুরলিপি—ত্রিহরেন্দ্রকুমার সিংহ

ইমন ভূপালী—একতালা

আসিবেই সখা আসিবে।

আমার এ আশা হ'বে না ব্যর্থ

মিলিবেই দেখা মিলিবে।

তুমি ত পার না ভুলে চলে যেতে,

মালা যে রেখেছে নিরঞ্জে গৌণে,

শুকিয়ে সে ঝরে যাইবার আগে

তোমার বক্ষে শোভিবে।

মিছে নয় মোর নিশি-জাগরণ,

মিছে কত নয় পূজা-নিবেদন,

তুমিত পরানে এই পথ-চাওরা

পুলকে ভরিয়া উঠিবে।

নিরদয় নাহি যুগ যুগ রবে

ধরা একদিন দিতেই যে হ'বে

বিরহ-অশ্রু আপনার হাতে

তখন যতনে মুছিবে।

সংকেত চিহ্ন :—

উদাহরণ—

তারাগ্রাম—

০ ১ + ০

সা ধা ধ প গা

আ ঠ সি বে ই

০ ১ + ০

গা-পা পা পা পা পা

আ-মা র এ আ শা

০ ১ + ০

গা-পা পা পা পা পা

আ-মা র এ আ শা

০ ১ + ০

সা ধা ধ প গা

আ ঠ সি বে ই

০ ১ + ০

গা-পা পা পা পা পা

আ-মা র এ আ শা

০ ১ + ০

গা-পা পা পা পা পা

আ-মা র এ আ শা

০ ১ + ০

সা ধা ধ প গা

আ ঠ সি বে ই

০ ১ + ০

গা-পা পা পা পা পা

আ-মা র এ আ শা

০ ১ + ০

গা-পা পা পা পা পা

আ-মা র এ আ শা

০ ১ + ০

সা ধা ধ প গা

আ ঠ সি বে ই

০ ১ + ০

গা-পা পা পা পা পা

আ-মা র এ আ শা

০ ১ + ০

গা-পা পা পা পা পা

আ-মা র এ আ শা

০ ১ + ০

সা ধা ধ প গা

আ ঠ সি বে ই

০ ১ + ০

গা-পা পা পা পা পা

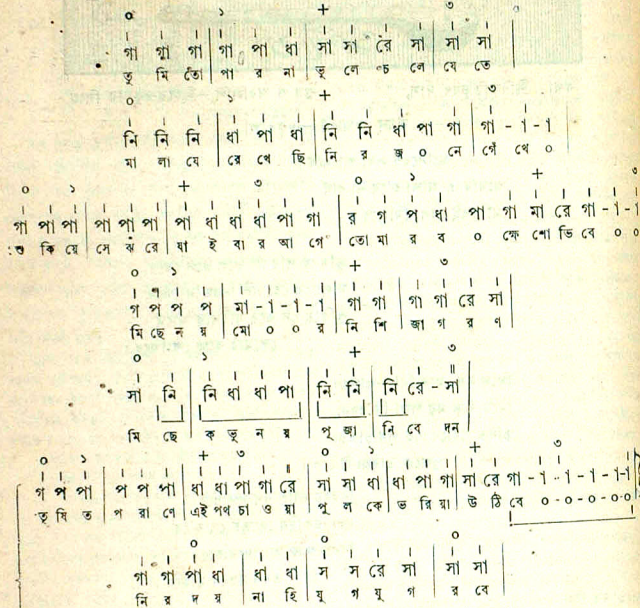
আ-মা র এ আ শা

০ ১ + ০

গা-পা পা পা পা পা

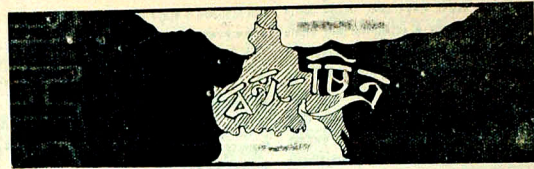
আ-মা র এ আ শা





সা পা সা গা গা নি নি নি রে সা সা সা ধা ধা পা গা সা রে গা - ১-১  
বি র হ' অ ঞ্চ আ প না র হা তে তথ ন য ত নে যু ছি বে ০ ০

‘তাল’, ‘মাজা’ ও ‘তারাগ্রাম’ উপরে এবং ‘উনারা’ পরস্পর নিয়ে চিহ্নিত হইল।



### ব্রহ্মতন্ত্র বাঙ্গালী

উড়িয়াকে একটি পুৰ্বক গ্রন্থে পরিণত করিবার আন্দোলন চলিতেছে। বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে তিনটি গ্রন্থে বাস করিতেছেন। বাঙ্গলা ভাষা-ভাষাবিশেষকে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিবার আন্দোলন চলিতেছে। গত ১৯২১ সালে বিহার ও উড়িয়া গ্রন্থে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১০০,১০০ জন ছিল। মাদকত্ব জেলার পরিমাণ ৪৩৭ বর্গ মাইল, শোকসংখ্যা ১০০,৭৭৭; ইহার মধ্যে বাংলা ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ১০,০০০, হিন্দী ভাষা ভাষীর সংখ্যা ২৮০, ৫০, বানমার মহকুমা পরিমাণ ৮০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৪০০,০০০ জন। মাদকত্ব বাংলা লোকসংখ্যা ৭০০,০০০; ইহার মধ্যে বাঙ্গালী ১০০,০০০, কোন গরমণের পরিমাণ ও শোকসংখ্যা এবং উড়িয়ার সংখ্যা কত তাহা নীচে তালিকায় দেওয়া হইল।

পথে	পরিমাণ	লোকসংখ্যা	উড়িয়ার	শতকরা
চন্দ্রাবদ	২০০,	১১,০০০,	২৪০০	২২.১০
মাইল	১১০,	০১০,০০০,	২৪০০	২২.১০
কোলহান	১১১,	২৪০,০০০,	৬৪০০	২০.১০
মাদকত্ব	৮১২,	৪০০,০০০,	১৪০০	২১.১০

বকেটী দানার লোকসংখ্যা ও উড়িয়ার সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল।

বাঙ্গালী	লোকসংখ্যা	উড়িয়ার	শতকরা
বাঙ্গালী	২০,০০০	১২,০০০	১০.১০
মাদকত্ব	৪২০০	১৪০০	২২.১০
মাইল	২০০০	১৪০০	২২.১০
মাদকত্ব	৪২০০	১৪০০	২২.১০

বিহার ও উড়িয়ার যত বাঙ্গালী বাস করে তাহার শতকরা ২২ জন বাংলা-ভাষা-ভাষীর বাস করে। ১৯১১ সালে বিহার ও উড়িয়ার বাংলা-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ২২০,০০০ ছিল। পূর্বে পুণ্ডি জেলার কিঞ্চিপুত্রের আধুনিকায়িত বাঙ্গালীর মধ্যে থা হইয়াছিল কিন্তু গত

১৯২১ সালে উহারিগকে হিন্দুস্থানীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ১৯২১ সালে পুণ্ডি জেলার বাঙ্গালীর সংখ্যা ১২,০০০ ছিল কিন্তু ১৯১১ সালে ১২,০০০ ছিল। ভাঙ্গালপুর জেলায়ও বাঙ্গালীর সংখ্যা কম থা হইয়াছে। সিংহভূমের সরাইক-রাইয়া নৃদ্বীপ-জাতি বাংলা ভাষা ব্যবহার করে।

গত ১৯২১ সালে আগমের লোকসংখ্যা ৭০,০০০ ছিল, ইহার মধ্যে বাঙ্গালী ০২০,০০০ ছিল। হরদা উপত্যকা-বিশেষের পরিমাণ ২০,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ০০,০০০, হরদা উপত্যকার পার্শ্ব-বিশেষে বাঙ্গালী ২০,০০০। হরদা উপত্যকার কোন ভাষা কত বাঙ্গালী ও আসামী তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

বাঙ্গালী	জাঙ্গালী
২০,০০০	২০
০১,০০০	১০০
০০,০০০	১০০
১০,০০০	১০

আসাম উপত্যকা-বিশেষে পোয়ালপাড়া-জেলার পরিমাণ ০০,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ০০,০০০ জন, রঙ্গলা ০০,০০০ জন। যে সকল জেলার আসামী অংশে বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী সেগুলি বাঙ্গালীর সহিত যুক্ত করা হইবে। তাহা হইলে হরদা-উপত্যকা ২০,০০০ বর্গ মাইল এবং পোয়ালপাড়া ০০,০০০ বর্গ মাইল—মোট ২০,০০০ বর্গ মাইল জুড়িয়া আসাম টুইতে বিভক্ত করায় বাংলা-র সহিত যুক্ত করা হইল। জুড়িয়া ও পোয়ালপাড়া এই তিনটি জেলার পরিমাণ ১২,০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৩০,০০০ জন, ইহার মধ্যে বাঙ্গালী ০০,০০০ জন।

মৈনিনীপুর জেলার উড়িয়া ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ১২ ১ সালে ২০,০০০ জন, ১৯১১ সালে ১০,০০০ জন এবং ১৯২১ সালে ১২,০০০ জন ছিল। বাহারী উড়িয়া ভাষা-র নি মতে ও পড়তে জানে তাহাদের অধিকাংশই বাংলা ভাষাকেও লিখিতে-পড়িতে পারে। ইহাট তাহাদের কোন অধিকাংশই হয় না। ‘অনেক আবার মাদকত্বা উড়িয়া হইলেও বাংলা ভাষাই শিখিয়াছে।







## প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

এই প্রার্থনা করিলাম প্রহরয়ে অনেক পরিমাণে শান্তিলাভ করিল। তখন মনে করিলাম শান্তিলাভের এম সন্তোষ উপায় থাকিতে আমি কত অশান্তি ভোগ করিয়াছি। দয়াময় ঈশ্বর অত আশ্বাসে উদ্ধার করবার জন্য ব্রাহ্ম-সমাজে আনিয়াছেন, আমায়ই উদ্ধারের জন্য ভক্তিজ্ঞান দেবেন্দ্র-বাবু অন্য এই ফলভেরী বক্তৃতা করিলেন। মনে মনে দেবেন্দ্রবাবুকে ধন্য জীবনের গুরু বলিয়া ভক্তিতে গৌণ প্রণাম করিয়া ব্রাহ্ম সমাজ হইতে চলিয়া আসিলাম।

ব্রাহ্ম-সমাজ দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণের সরল মনে কিরূপ ছাপ পড়িয়াছিল তাহা তাঁহার লেখা দেখিয়া সহজে অস্বহিত হয়। বৈষ্ণব বিজয়কৃষ্ণ কৌলিক বৈষ্ণবচরণ মানিরা দাঁড়িতে পারেন নাই। বিগ্রহ-সেবায় আনন্দলাভ করিলেও তাহার আধ্যাত্মিক হৃদয়ার তৃপ্তি হয় নাই। বেদান্তের ব্রহ্মবাদ ভাল লাগিলেও জীবনে তাহা সাধনাব্যাহার লাভ করিতে ব্যাহত হন নাই। মনের এই বৃষ্টির অবস্থায় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রার্থনার দ্বারা উপাসনা তাঁহার অন্তরে স্পর্শ করিল। প্রার্থনার দ্বারা উপাসনা খৃষ্টান-ধর্মের মূলমন্ত্র। রাজা রামমোহন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজে বেদপাঠ, উপনিষদ পাঠ ধর্মব্যখ্যান ও স্তোত্রপাঠ ও ভজন-সঙ্গীতের দ্বারা সমাজ করিতে।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রার্থনার দ্বারা উপাসনা ব্রাহ্ম-সমাজে প্রথম প্রবর্তন করেন। রামমোহন ছিলেন শব্দরাহণ্যামী, অষ্টবৈষ্ণবানী, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তৎবিশিষ্ট। রামমোহন শব্দকে সর্ববিষয়ে মাত্র করিছেন, দেবেন্দ্রনাথ শব্দকে সর্ব-ব্যয়ে অস্বস্ত ও মাত্র বলিয়া মানিতেন না। তাই খৃষ্টীয় স্নাত-অগ্রদূত ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও প্রার্থনা দ্বারা উপাসনা ব্রাহ্ম-সমাজে দৃঢ়ীত হয়। বিজয়কৃষ্ণের শ্রুত দ্বয়ে প্রার্থনার দ্বারা উপাসনা ভাবী আধ্যাত্মিক উন্নতির বীজ রোপন করিয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ এই সময়েই জীবনের কী আশোচনা করিয়া বলেন, “প্রতিদিন প্রার্থনা করিয়া কি

অপার শান্তি লাভ করিতে লাগিলাম, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ধর্ম সংক্ষেপে বাহ্য কিছু জ্ঞাতব্য হইতে, তখনই নির্জনে প্রার্থনা করিয়া দয়াময় পিতার নিকট প্রণাম করিয়া উন্মুক্ত উত্তর প্রাপ্ত হইতাম। যেদিন সে সত্যলাভ করিতাম, তাহা নিশ্চয়ই রাখিতাম।” বিজয়কৃষ্ণ বৃন্দিলেন যে, দয়াময় পরমেশ্বর যে গুরু হইয়া অজ্ঞানকে জানবান করেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিজয়কৃষ্ণ প্রার্থনা দ্বারা শান্তিলাভ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বড়ডাং গমন করেন। বড়ডাং ব্রহ্মদ্বন্দ্ব্যপ তাঁহার এই পরিবর্তন দেখিয়া পরম অনন্তিত হইলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া বিজয়কৃষ্ণ ভাস্করাই বাসনা করিতে মনস্থ করিলেন এবং মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে চলিয়া আসেন। পথে কয়েকদিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় একদিন পরমেশ্বরের পিতৃত্ব আশোচনা করিতে করিতে বিজয়কৃষ্ণের বিশ্বজনীন সত্যভাব জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল “পরমেশ্বর মস্ত মহত্বকে স্বজন করিয়াছেন, তিনি সকলের পিতা-মাতা। এজন্য প্রত্যেক নরনারীকে ভ্রাতৃত্বের বিনিময় বিশ্বাস করিতে হইবে। সর্বপাশাঈ ঈশ্বর সকলেরই অন্তরে বাস করেন, তিনি বাহ্যকেও ঘৃণা করেন না, স্বতরাং মস্ত মহত্বকে ঘৃণা করিলে যুগপৎ ঘৃণ্য হয় সন্দেহ নাই। ইতিএব জাতিভেদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরের পিতা বলিয়া বিশ্বাস করা হয় না। এই বিষয়ে আশোচনা করিতেছি, এমন সময়ে একাদশবর্ষধর একটা বালক বলিয়া উঠিল যে, যদি তুমি জাতিভেদ মান না, তবে পৈতা রাখিয়াছ কেন? তৎকথায় বাহ্যকেও ঠিক বোধ হইল, তখনই তাহার সাক্ষাতে উপবীত ত্যাগ করণ। বাসপাঠ তখনই আমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপবীত-ত্যাগের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। মাতাঠাকুরাণী উচ্চেনে প্রাপ্তত্যাগ করিতে গমন করিলেন দেখিয়া পুনরাবৃত্ত উপবীত

এবে কুরিলাম।” পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতে আসেন। বিজয়কৃষ্ণ এই সময়ে চলিলেন যে ইহার জন্য ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইতে হয়। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইতে বিজয়কৃষ্ণের প্রত্যজ্ঞ অভিলাষ হইল। তিনি দেবেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা লাভ করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ এখন পূর্বদ্বন্দ্ব্যপ ব্রাহ্ম হইলেন। কিন্তু উপবীত ত্যাগ না করাতে তাঁহার মনে প্রবল অশান্তি হইল। তিনি বলেন, “একদিন ভক্তিজ্ঞান দেবেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ‘মহাপ্রাণ উপবীত রাখা উচিত কি না, মস্ত মাস ভজন করা উচিত কি না?’ তিনি উত্তর করিলেন, ‘উপবীত রাখা নিতান্ত কর্তব্য। উপবীত না রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ আমি উপবীত রাখিয়াছি। মস্ত মাস না বাইলে শরীর কষ্ট হয় না, মশা ছারপোকা বধন মরে, তখন অন্ন জীব হওয়ার যোগ কি?’ এই দুই উত্তরই আমার মস্তের সহিত ঐক্য হইল না। মনে করিলাম এখনও ব্রাহ্ম-সমাজে কৃষ্ণ-স্বাক্ষর রহিয়াছে। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু আমাকে যে পূর্ণপাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা, মরণ করিয়া তাঁহার দূষিত মস্তের জন্য তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা হইল না।”

পূর্ববাবালালার কয়েকটা সহপাঠীর সঙ্গে একত্রিত হইয়া বিজয়কৃষ্ণ “হিত সঞ্চালিকা” নামক একটা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। প্রকটন সেই সভায় আলোচিত হইল যে, বাহ্য সত্য বলিয়া ব্রহ্ম বাইবে, তাহা প্রতিপালন না করা ভগ্নায় ও পাপ। বিজয়কৃষ্ণ অমনি উপবীত ত্যাগ করিলেন। বাড়ীতে সে সংবাদ নিজেই নিশ্চয় পাঠাইলেন। উৎসাহী বিজয়কৃষ্ণ শুণ্ড উপবীত পরিত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না। চতুর্দিকে লোকের অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া তিনি অশ্রুপাত করিতেন, শেষে রাগপথে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করিবার সংকল্প করিলেন। একদিন অপরায়ণে বিজয়কৃষ্ণ প্রেসিডেন্সী কলেজের নিকট দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করিতে লাগিলেন। চারি পাঁচ শত লোক একাগ্র মনে তাহা শুনিলেন। বিজয়কৃষ্ণ বলেন, “কিছুদিন এইরূপ করাত

আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। ইহাতে লোকের প্রতি দয়া হয়, সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি হয়, সত্যের মহিমা দৃঢ়রূপে জয়যম করা যায়।” পাড়াপের বৈষ্ণব বিজয়কৃষ্ণ দীর্ঘ দীর্ঘে কল্পে পাশ্চাত্যভাবে অগ্রপ্রাণিত হইতেছিলেন, তাহা আমার দেখিতে পাইতেছি। প্রথমে প্রার্থনা, উপাসনা, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও খৃষ্টীয় আধ্যাত্মিক সাধনা যৌ আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য অবশ্যজন্য করিলেন—কিন্তু সামাজিকভাবে মানুষ মানুষে ভ্রাতৃত্বের বিরোধী জাতিভেদ, স্বাধীকার ও উপবীত-ত্যাগ—পরে মানবহিতার্থে পাশ্চাত্যের জন্য পাশ্চাত্যের ভাষা রাগপথে দাঁড়াইয়া ধর্মপ্রচার শুণ্ড বিজয়কৃষ্ণ ন'ন বাবালালেশে তখন শিক্ষিত যুবক-সমাজ পাশ্চাত্যভাবে ভাবাচিত হইয়া খৃষ্টীয় ভজনালয়ের অগ্রকণ্ঠে নরধর্মশিক্ষার প্রতিষ্ঠা, খৃষ্টীয় ভজনালয় প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা ও ভজন সংগীত ও খৃষ্টীয় প্রচারকমণ্ডলীর দ্বারা প্রচারকমণ্ডলী-গঠন ও প্রচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পাপবাহ ও দীক্ষা-গ্রহণ একটা প্রধান ধর্ম মত রূপে ব্রাহ্ম সমাজ অবলম্বন করেন। পাশ্চাত্যভাবে বাবালালার শিক্ষিত সমাজে সমাজ-সংস্কার ও সংগঠন করিতে উনিবিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রাহ্ম-সমাজ তৎপর হইয়াছিলেন। ইহারের সর্বপ্রধান অগ্রদূত ছিলেন অচ্যুত কেশবচন্দ্র।

কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত সৎসংস্কার সাংবাদিকগণ আবেশনে গমন করিয়া ‘অস্বস্তি’ নামে একটা পত্রিকা বিজয়কৃষ্ণ করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ বলেন, ‘তাঁহা পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, তাহাতে লিখিত আছে যে, উপন্যাসের সময় উপবীত গ্রহণ করিবে না’—ইহা পাঠ করিয়া মনে করিলাম যে, উপবীত ত্যাগ করা সৎসংস্কার মত। অতএব এই সভাতে গমন করিতে হইবে। পূর্ববাবালালানী সভাখন ভ্রাতৃত্বের সহিত গমন করিয়া সৎসংস্কার সভা হইল। ইহার পূর্বে ভক্তিজ্ঞান কেশববাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল না। সৎসংস্কার নিত্য মূল সত্য লাভ করিয়া ভক্তিজ্ঞান কেশববাবুর নিকট অন্ত্যস্ত রক্ত হইতে লাগিলাম। এই সময় হইতে কেশবচন্দ্রের সহিত বিজয়কৃষ্ণের পরিচয় হইল। (কমলা)



## ছড়া

## ত্রিইন্দ্রবিকান বহু

( ৬০১ )

তাল বাড়ে খোপে,  
খেজুর বাড়ে কোশে।

( ৬০২ )

জানাইয়ের নামে মেরে ইস,   
মারে কীয়ে খায় মাস।

( ৬০৩ )

শাক, শাক, তিন শাক,  
তবু বুড়ী করে রাগ।  
( কোথাও কোথাও বুড়ীর জাংগার  
মিলে'ও শুনিয়াই )

( ৬০৪ )

বুটকী আগল  
সেয়ান পাগল।

( ৬০৫ )

ধন দিয়ে মন বুঝে  
যৌবন দিয়ে আকুল বুঝে।

( ৬০৬ )

প্রয়াসে গিয়ে সুড়িয়ে মাথা,  
বাগে পাপি বেথা সেথা।

( ৬০৭ )

একদিন বি ঝট,  
একদিন ধাত হিরুট।

( ৬০৮ )

বেশান থেকে উৎপত্তি,  
সেখান থেকে নিবৃত্তি।

( ৬০৯ )

ঝোয়াড়ে পড়লে হাটী,  
চামচিকেতে মারে লাথি।

( ৬১০ )

না বিয়েলেক মা, বিয়েলেক খী,  
খাল খেয়ে ম'ল পাড়াপড়শী।

( ৬১১ )

বালির বাধ, শঠের পিরীতি,  
এ দু'য়ের একই রীতি।

( ৬১২ )

গাছে কাঁঠাল,  
গোঁফে তেল।

( ৬১৩ )

মাকো ঘবো যাব না,  
ফাঙ্কন এলে রব না।  
( গা-ফাটা সম্বন্ধে বলা হয় )

( ৬১৪ )

গরীব মানুষ ফড়িং খায়,  
ঘোড়ায় চেপে বা...যায়।  
( ৬১৫ )

ধাকত পান দিতাম হাতে,  
এম খয়ের দিয়ে ঘরে খেতে,  
একলা পোড়া চুশের দাব,  
ভরম সরম সকল যায়।

( ৬১৬ )

ধাকরে কুরুর আমার আশে,  
ভাত দিব তোরে পৌর মাসে  
( ৬১৭ )

রেতে মশা, দিনে মাছি,—  
এ নিয়ে কলকাতার আছি।

( ৬১৮ )

মাটা, বেটা, মিথ্যাকথা,  
এ তিন নিয়ে কলকাতা।

( ৬১৯ )

কুজড়া, কাওয়ারী, মুর,  
এ তিন নিয়ে বেদিনীপুর।

( ৬২০ )

আঁকুড়া বাঁকুড়াবাণী,  
মুড়ী খায় রাশি রাশি।

( ৬২১ )

সকল গুণ আছে পুতে,  
হাঁড়িতে খায়, শেষে মতে।

( শেষে = শব্দ্য )

( ৬২২ )

ভুখী যায় হুখীর কাছে,  
ভুখৈ যায় পাছে পাছে।

( ৬২৩ )

ধা তিৎ তিৎ কশ মাগল,  
সেখা শুনা বেই বেলাকে সেই বেলা।  
( সেখা শুনা হ'লেই কথা বলা হয়,  
তা ছাড়া আর হয় না )

( ৬২৪ )

মাথিতে আপন কাজ বাঁধা ঘরি মনে,  
কপাচ পরের কথা শুনিও না কানে।

( ৬২৫ )

নিগুণ পুরুষের ভক্ষণ সার  
সলাই করেন মার মার।

( ৬২৬ )

এত ক'রে পুথিলাম,  
না মানিল পোষ,  
মানিলাম এ আয়ার  
কপালের দোষ।

( ৬২৭ )

পণ্ডিতে পণ্ডিতে হয় প্রীতি কথায় ছন্দ,  
বালকে বালকে হয় প্রীতি কথায় ঘন্দ,  
যুবায় যুবায় হয় প্রীতি কথায় হাসি,  
বুড়ান্ন বুড়ায় হয় প্রীতি কথায় কাশি।

( ৬২৮ )

আপখানা কুচি,  
পর পুরণা খুসী।  
( ৬২৯ )

লোহা পাথরে যুদ্ধ করে,  
শোলা দিদি পুড়ে মরে।

( ৬৩০ )

বেখানে নাই মান,  
সেখানে ছাড় পাকা ধান।  
( ৬৩১ )

অবাক কলি, বোখা ভার,  
গুপ্ত লীলা অতি চমৎকার।

( ৬৩২ )

যেমন চাষার বুদ্ধি, বলে,  
পল্লী গ্রামের মার্ভে,  
নদী না দেখে নেটে। হ'য়ে  
দাঁড়িয়ে আছে-হাটে।

( ৬৩৩ )

পতি ম'ল ভাল হ'ল,  
ছই সতীনে পিরীত হ'ল।

( ৬৩৪ )

ভাবুনী লো ভাবুনী,  
তোর ঘর পড়ে যায়।  
বাক গে মৌর ঘর পুড়ে,  
মোর ভাবুন ব'য়ে যায়।

( ভাবুন = সাজসজ্জা ; ভাবুনী = সজ্জাবিলাসী )

( ৬৩৫ )

যার কাজ তারে সাজে,  
অন্তকে লাঠি বাজে।  
( ৬৩৬ )

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে,  
তার মাইনে চোদ সিকে।

( ৬৩৭ )

ললনা ভোঁমার কাছে হলনা কি খাটে ?  
তুমি খাও ভাড়ে লল, আমি খাই খাটে।



(৬৩৮)

কুমি যদি বাও ডালে ডালে  
আমি বাই পাঠায়,  
তোমার চাতুরী বুঝা যায় কি না যায়।

(৬৩৯)

হেমিয়ে পেয়েছ ঘর,  
রাতে কান্না, দিনে অর।

(৬৪০)

নেড়ে, বোঁড়া  
তিনিঙল বাড়া।

(৬৪১)

কাচ আর মন—হুই সম প্রায়  
একবার ভাঙ্গে যদি জোড়া লাগা দায়।

(৬৪২)

গৃহিণী লক্ষ্মীলক্ষ্মী,  
বাম হ'লে কাল ভুজঙ্গিনী।

(৬৪৩)

ছিঁড়লে স্বতা না যায় গাঁথা  
গাঁট দেব তার কত,  
ঘুচলো আশাপ তোর সনে মোর  
এ জনমের মত।

(৬৪৪)

নদী, নারী, শৃঙ্গবরী  
এ তিনে না বিখাস করি।

(৬৪৫)

আমার হ'য়েছে হায় হিতে বিপরীত,  
কৌশল করিয়া শেষে কৌশল করি জিত।

(৬৪৬)

মনের মন্থা কাটিতে চাও,  
সুজিতায় মন দাও।

(৬৪৭)

দাসখত লিখে দিয়ে পড়ে যদি পায়,  
তবাপি নারীর মন পুরুবে কি পায় ?

(৬৪৮)

হয়েছ হাটের নেড়া,  
হুজুগ তো চাই—  
ঠাটের ঠাকুর বট

নটের গৌসাই।

বজ্রায় রেখেছ ঠাট,  
হ'য়ে ছাড়াছাড়ি,

ভাল আছ ঠাটে ঠাটে  
হাটে ভেঙ্গে হাড়ি।

(৬৪৯)

সুমনী শাক রেঁধে মনে বড় খুসী,  
দৈবজ্ঞ এসে বলে যথার্থ আজ একাদশী।

(৬৫০)

নিষ্টি লাগল ছাই,  
স্বামী পুতকে নাই।

(ছ'াই=পিঠের পুর)

(৬৫১)

আপনার হাতে পড়লে হাড়ি,  
ভাত রেখে আমনি বাড়ি;  
পরের হাতে পড়লে হাড়ি,  
আমনি রেখে ভাত বাড়ি।

(৬৫২)

ছোট সরাসী ভেঙ্গে গেছে,  
বড় সরাসী আছে;  
নাচ, কৌড় বউ আমার  
হাতের আঁটকাল আছে।

(৬৫৩)

কুঁহনী—কড়াই শুঁটী  
চুল নেইক দড়ির খুঁটি।

(৬৫৪)

ছিঁচ কাঁহনী নাকে ঘা,  
রক্ত পড়ে চেটে খা।

(৬৫৫)

যার নামে উপবাস,  
তার সঙ্গে পরবাস।

(৬৫৬)

আহার, নিজা, ভয়,—  
বত বাড়িও তত হয়।

(৬৫৭)

কাজের মধ্যে চাষ,  
রোগের মধ্যে কাশ।

(৬৫৮)

আ মরি, মিসে লোক হাসালে,  
গোফ রেখেছে তোষড়া গালে।

(৬৫৯)

অমের আলা বড় আলা,  
একদিন না হ'লে কর্ণে লাগে তালা।

(৬৬০)

মাসী, শিশি, টাটকা বাগী  
বনের ধারে ঘর।

কখন মাসী বলে নাক  
খই নাড়ুটা ধর।

(৬৬১)

মেঘ ক'রেছে আকাল কুল  
ও তীতি বৌ চরকা তুল।  
(আকাল কুল=আকাশ জুড়ে)

(৬৬২)

ভাত দেবার ভাতার নয়,  
কিল মারবার পৌসাই।

(৬৬৩)

কারও পোষ মাগ,  
কারও সর্গনাশ।

(৬৬৪)

ঘরি মাছ না ছুঁই পানি,  
তবেই বুদ্ধি বলে মানি।

(৬৬৫)

আপনার পোলা খায়,  
ঘর পানে ধায়;  
পরের পোলা খায়,  
বন পানে চায়।

(৬৬৬)

হাতে দই পাতে দই,  
তবু বলে কই, কই ?

(৬৬৭)

খাঙ্কিল তীতি তীত বনে,  
বাগ হ'ল তার এড়ে গর কিনে।

(৬৬৮)

আপনার ঘন পরকে দিয়ে,  
দৈবজ্ঞ ঘরে এঁটো পাত কুড়িয়ে।

(৬৬৯)

রাজমাদবী রাজার খী,  
গিরদে আসে পাশে  
ছবের সর গলায় বাধে,  
ক্ষীর দেখে বমি আসে।

(৬৭০)

ভাড়ে নেই বি,  
ঠক্টকালে হ'বে কি ?

(৬৭১)

যেমন কর্ম তেমন ফল,  
মশা মারতে গালে চড়।

(৬৭২)

আপন কোটে পাই,  
ছিঁড়ে কুটে খাঁই।

(৬৭৩)

গৃহ স্থির আগে বরে,  
গৃহিণী স্থির তার পরে।

(৬৭৪)

প্রাণে পক্ষের মাগ হেলা-ফেলা,  
'বিত্তীয় পক্ষের মাগ গলার মাগ,  
ভৃতীয় পক্ষের মাগ পাতে ব'লে মান,  
চতুর্থ পক্ষের মাগ কাঁধে চড়ে বান।

(৬৭৫)

দোজপক্ষের মাগ গল্পরা হাতী,  
ভাতারকে মারে তিন লাথি।



(৬৭৬)

প্রথম পঙ্কের মাগ চিহ্নী যাছের খোশা,  
দ্বিতীয় পঙ্কের মাগ করন গোঁসা।

(৬৭৭)

অকালে না নৌয় বাঁশ,  
পাকলে করে ট্যাশ ট্যাশ।

(৬৭৮)

মা দেয় নি চেয়ে,  
পেট ভরে নি খেয়ে।

(৬৭৯)

ঘরে নাই দশটা,  
তাই করে ফটি নষ্ট।

(৬৮০)

অভিমানী হ্রয়ো,  
নেট পেট খুয়ো।

(৬৮১)

দয়ার পর ধর্ম নাই,  
হিংসার পর পাপ নাই।

(৬৮২)

যদি সেগুতালার আশ পাই,  
তবে আসতলায় কেন যাই।

(৬৮৩)

উররে না খাঙ্ক,  
খং কুড়কে খাঙ্ক।

(৬৮৪)

অর চিন্তা চাংকারা,  
ঘরে ভাত নাই জীতন্ত বরা।

(৬৮৫)

অজ্ঞান করে গাপ  
জান হ'লে হ'রে।

(৬৮৬)

সজ্ঞান করে গাপ  
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

(৬৮৭)

খাগে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে।  
পাছে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে।

(৬৮৮)

সারাদিন ফিরিয়ে মালা,  
অভিধ হ'লে সন্ধ্যাবেলা।

(৬৮৯)

সেহ নয় মনি কেঠ',  
শেখাল, কুকুর নয়—চোঠা বেটা।

(৬৯০)

আরের মন আর দিকে,  
চেরের মন বৌচকার দিকে।

(৬৯১)

কাজ নেই প্রসাধ পেয়ে,  
গতর গেল পাখর ধুয়ে।

(৬৯২)

শতদল ভাসিয়ে জলে,  
শাপুকের মালা পরেছি গলে।

(৬৯৩)

অধিক খেতে করে আশা,  
তার নাম বৃদ্ধি নাশা।

(৬৯৪)

ঢাকা, উল্লাহ, কলশা, কানা—  
জল ব'লে খায় চিনির পাপা।

(৬৯৫)

দাড়িকে মাশি করা,  
মাখ গাঙ্গে ডুবে বরা।

(৬৯৬)

আগে হাটে, পাটা কাটে,  
প্রদীপ উত্তায়, দই কাটে,

(৬৯৭)

ভাগুরী, কাণ্ডারী, রাধুনী বমন  
বশ পায় না এই সাত জন।

(৬৯৮)

অন্নপূর্ণা বার ঘরে,  
সে কাঁদে অন্দের তরে।

(৬৯৯)

সাবলে জামাই খায় না,  
এটো পাতলী পায় না।

(৭০০)

আগে জামাই কাঁঠাল খান না,  
পেয়ে জামাই ভোঁতাও পান না।

(৭০১)

আগে হাটনী, পান বাটনী, বোর দাট,  
এই তিনজনের বশ নাই।  
(বোর দাট=বধুর দারী)

## পাবনা জেলার প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার

প্রীতিলোকচন্দ্র চৌধুরী

গত আশ্বিন সংখ্যার “পঞ্চপুণ্ডে” পাবনা জেলার  
কয়েকজন প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকারের পরিচয় দিয়াছি।  
বর্তমান প্রবন্ধে আরও কয়েকজন কবির পরিচয় দেওয়া  
গেল।

### ১৫। রণজিৎ রায়

রণজিৎ পোতাভিয়ার রায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন।  
ইহাদের আদি উপাধি নন্দী—রায় ইহাদের বাহাদুরত্ব  
উপাধি। রণজিৎ আরবী, পার্শী, সংস্কৃত, হিন্দি ও বাংলা  
ভাষা জানিতেন। এমন কি পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ  
প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকগণের ভাষাও কিছু কিছু শিখা  
করিয়াছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সময় ইহঁতে নবাব  
আলীবর্দি খাঁর সময় পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। রণজিৎ  
বিক্রপাশ্বক কবিতা লিখিয়া সেকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া-  
ছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত পরমার্থ তত্ত্ব ও  
ত্রীকুল-লীলা বিষয়ক বহু কবিতা প্রচলিত আছে। তাঁহার  
কোন কোন কবিতায় হিন্দি, সংস্কৃত, বাংলা ও পার্শী  
ভাষায় মিশ্রণ দেখা যায়। বিস্তৃত বাংলা ভাষাতেও তিনি  
কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। রণজিৎএর পৌত্রাবলি  
“চিঁচতান কেতাব” নামে অভিহিত ছিল। তাহাতে  
প্রায় সহস্রাবধিক কবিতা ছিল। রণজিৎ অনেক সমসাময়িক  
ইতিহাস ও কবিতাকারে রচনা করিয়া গিয়াছেন।

### ১৬। হরিদেব রায়

ইনি ভাড়াশের জমিদারগণের পূর্বপুরুষ। পূর্বোক্ত  
রণজিৎ রায়ের একটা কবিতায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।  
হরিদেব রায়ের বহুস্ত লিখিত অনেক গ্রন্থ এই বংশের  
পুত্র বিশ্বদান আছে, তন্মধ্যে জৈমিনি ভারতের পুঁথি  
ইহঁতে ১৬৬০ শকে তিনি উহা নকল করেন জানা যায়।  
(কাষস্থ পঞ্জিকা—১৩১০ সাল ৩৬০ পৃঃ)

### ১৭। গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ

ইনিও পোতাভিয়ার নন্দীবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

গোবিন্দমোহন গণ্ডে চাকুরী রচনা করেন। ইনি বৃন্দাবী,  
জীলাবতী ও অষ্টাদশ বিভা নামক কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা  
করিয়াছেন।

### ১৮। গুরুচরণ সরকার

গুরুচরণ পাবনা জেলার মাগিক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।  
ইনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে  
“রাধাকৃষ্ণ জীলা” বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহার রচিত  
ছড়া এখনও স্মৃতিতে পাওয়া যায়। গুরুচরণের বংশধরগণ  
মাগিক গ্রামেই বাস করিতেছেন।

### ১৯। ফকির সেখ

বাঙ্গালা দেশের অষ্টাদ জেলার মত পাবনা জেলাতেও  
ঠগীনের উপজন্ম ছিল। এক সময়ে এই জেলার শিবপুর  
গ্রামের মৈত্রবংশীয় জমিদারগণ ঠগীন্দলের দ্রোতা ছিলেন।  
এই দস্যবদের সর্বশেষ নেতা লক্ষীচন্দ্র মৈত্র প্রায় ৮৫  
বৎসর পূর্বের দ্বারা পড়েন। ফকির সেখ এই লক্ষীচন্দ্রের  
সমসাময়িক। ইহার অনেক কবিতায় শিবপুরের ঠগী  
দস্যবদের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল কবিতার  
শেষে ফকির “বাহবা পামহা মোড়ার দল” ব্যবহার  
করিয়াছেন।

### ২০। সৈবকদাস

সেবকদাস সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কাঁঠিখোলা  
গ্রামে বৈষ্ণবুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কবিতাকারে  
ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি মহারাজ অশোকের  
বেঙ্গল ওড় বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ইহঁতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত  
করিয়া দেওয়া গেল।

“অশোক নৃপতিবর পরম ধার্মিক।

সদাচার চারবানু বীরেন্দ্র নির্ভীক ॥

সর্বজীবে করিতেন সমভাব জ্ঞান।

হৃদ্যাছিল সভাই তখন জাতি অভিমান ॥



অহিংসা পরমার্থ তার আচরণ।  
হুখে কাল সোয়াইল তার প্রজাগণ।  
এই পুঁথির শেষ ভাগে জানা যায় যে ইহার লিপিকাল  
বাক্সাল ১১২৫ সাল।

## ২১। উদীচ্য ভট্টাচার্য্য

ইনি ছাত্তকের রাজা দেবীদাস ওরফে ঠাকুর কুলীনার  
সপ্তম অবন্তন পুত্র। ইহার আসল নাম রামকৃষ্ণ রায়।  
ইহার পাণ্ডিত্যে বৃদ্ধ ইহার মন্ত্রপুত্রে তৎকালীন অধিপতি  
রাজা রায় তাঁহাকে নিজ সভায় লইয়া বান। নবাবের  
শক্তিশক্তি ইহাকে মহাসুহোপাধ্যায় উপাধি দিয়াছিলেন।  
ইনি “ককি কোমুদী” ও “অরিকর কোমুদী” নামক  
দুইখনি গ্রন্থ লিখিয়া বিখ্যাত ইহাছেন। অধিকরণ  
কোমুদীর অধ্যায় ও অধ্যাপনা অত্যাশি নবাবী প্রভৃতি  
স্থানে ইহা ধাকে।

## ২২। রামতোষণ বিজ্ঞানস্বার

রামতোষণ বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে আগমবাগীশ ভট্টা-  
চার্য্যের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত

ও তাত্ত্বিক সাধক ছিলেন। ইনি পাবনা জেলার হরি-  
পুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালিত “প্রাণতোষিণী”  
তন্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য। শাস্ত্রজ্ঞান ও তন্ত্রের গভীর  
গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার বাসস্থান এখন  
হরিপুরে বিদ্যমান আছে।

। বহু গায়ান

পাবনা জেলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের কবিগোলা।  
নিবাস বেড়া ধানীর অন্তর্গত রুপপুর গ্রাম। ইহার  
ভাল নাম কি তাহা জানা যায় না। এই নামেই  
তিনি সাধারণে পরিচিত। ইহার কবিগণ এককালে  
এ অঞ্চলে বিশেষ সমাদৃত ছিল।

## ২৪। হরু নামিত

ইনি ফরিদপুর ধানীর অন্তর্গত ডেমরা গ্রামে জন্ম  
গ্রহণ করেন। ইনি কবিতাকারে ১৮৭৩/৭৮ সালের  
পাবনা জেলার প্রজা বিদ্রোহের বিবরণ দিয়া গিয়াছেন  
হরু এই বিদ্রোহকে “পলো বিদ্রোহ” বলিয়াছেন।  
ভবিষ্যতে পাবনা জেলার প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার  
সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

## সনেট

(Shakespeare হইতে মর্দাহাবাদ)

শ্রীশান্তোষ সান্যাল

চিশি চিশি ফাঁসলীলা ঘেরি আমি যবে,—  
জাঁপ জরা যবে যায় শুকপত্র প্রায়;  
মহাসিদ্ধ আসে ধেরে মত কলরবে,  
গ্রাসীতে ধরণী; যবে ফুলায় গুটায়,  
স্ববিশাল সৌন্দর্য্য; সাগরের বুকে,  
ভূমি যবে যায় ছুটে আলিঙ্গন যাবি;  
নেহারি যখন মোর নয়ন সমুখে,—

মহাকাল চলিছে রথচিহ্ন আঁকি,—  
দলিত বখিত করি, বিশ্ব-চরাচরে;  
হৃদহার রবে মহাউল্লাসে সদাই;  
কীপন হয় যে ব্রহ্ম বৃকের ভিতরে,—  
ভয় হয় সখি, তোরে পাছে বা হারাই।  
তাই কঁদি অহনিশ; ভূমি জান না লো,  
তোমারে হারানো ঢেরে যক্ষ্ম সোর ভালো।

## সমোহিতা

(উপজ্ঞাস)

(পূর্ণীছব্ধি)

শ্রীমতী উষা মিত্র

বার

স্বামীর দীর্ঘ এক আলোক-চিত্রের সমুখে সজ্জামাতা,  
কুনকরাহ কুন্তলা মুগ্ধমতী পুণ্যলিঙ্গীর ছায় বসিয়াছিল।  
কিসের গভীর ব্যথার নেত্র বহিয়া অশ্রু বজা নামিয়া উঠার  
বন্যগ্রভাগ সিক্ত করিয়া দিতেছিল। বুদ্ধিবা—দুঃখ—  
কষ্ট—মাতন—জালা—মর্দেয় ব্যথা—প্রত্যেক গোপন  
কথাটা উজ্জ্বল করিয়া ঐ দেবতার চরণে—নীলবর্ণ নিবেদন  
করিয়া দিতেছিল। এই সেদিন স্বামীর প্রথম এবং শেষ  
দান আদরিণী কজা গীতালির কোমল গাওে—বিন্যাসের শেষ  
চূর্ণন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। একমাত্র—শান্তি—সাম্বনা  
কাড়িয়া লইয়া বিধাতার কি এমন লাভ হইল। তাঁর  
অপূর্ণ রসনা এই বিখ—এত বড় ছন্দীর ভিতর কি ঐ  
স্বয়ং একটা শিশুর মধ্যে খুব ছোট্ট একটু স্থানের সমুদান  
হইত না? দেবতা—দেবতা এই অভিশপ্ত জীবনের শেষ  
কর—মৃত্যু দাও—এ দৃঢ় আত্মার শেষ কর—সকলই তো  
শেষ হইয়াছে, আছে শুধু বুকভরা দুর্ভেদ হাহাকার—  
ওগোশ্রীও শেষ করে দাও প্রহ্লাদ। কুন্তলা আকুলভাবে  
অন্নচিহ্নে স্বামীর চিত্রখানা ছই ব্যগ্র বাহ দ্বারা জড়াইয়া  
ধরিল। এমন সময় তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কে বলিয়া  
উঠিল, “ও কি করছ বড়-বোঁ।”  
কুন্তলা বিরক্ত-চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। বহুকাল পরে  
রমণের মাসীমাতাকে সেবিয়া একটু বিম্বিত হইলেও  
বাহিরে সে ভাব প্রকাশ করিল না।  
“এস মাসীমা! একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া কুন্তলা  
তাঁহার পদধূলি মথকে লইল।  
“ধাক কা হয়েছে তাও কিসের পূজা করছিলে?”  
“পূজার আমি কি জানি মাসীমা ও অমনি।”  
“তা বা ঠাকুর দেবতা থাকতে—স্বয়ং ছবিতে কেন?”  
মান হাসিয়া কুন্তলা বলিল,—“ঠাকুর দেবতা কে তো  
চিনি না, শুকেই চিনি, দেবতা বলে জানি।”

“ও মা সে আবার কি কথা গো, তা বা কে, বার  
যেমন ইচ্ছে... গীতার কথা শোনবার পর থেকে প্রাণের মধ্যে  
আকুলি-বিবুলি করছিল আসবার জন্য, তা পোড়া সংসারের  
জগৎ বাইরে বেরবার কি দুঃসং আছে। কাজ, আর কাজ,  
আর তাই পারি কি বুড়া হাতে সহ্যে, আরে পড়মুখ, আজ  
সবে ছুটে ভাত মুখে দিয়ে আসছি।”  
“কে গো, বড়-গিরা না কি?” নবগতা বিনয়ের পিসী-  
মাতা আসন গ্রহণান্তে বলিলেন, “কার অসুখের কথা  
বলছিল বড়-গিরা?”  
“কার আর বলব দিদি, এই নিজের কথাই বলছিলাম—  
শরীরটা ভাল বাচ্ছিল না, এই বাটুনি কি বুড়া হাতে  
সয়?”

“গতি, তা বাপু ছেলের রিয়ে দাও না।”

“আমার কথায় কি সব কাজ হয় দিদি, ছেলের আমার  
ধর্ম্মপূর্ণ পণ, স্বন্দরী মেয়ে, সে আবার যেমন তেমন নয়,  
নিমুখ হ’বে তবেই রমেন বে করবে।”

স্বন্দরীর অভাব কি। আবার তাও বলি, আমাদের  
বড়-বৌর মত এমন ডানা-কাটা পেরী পাচ্ছেন না।—বাই  
বল, এত শোকে দুঃখেও কি ছিরি, রূপ যেন দেখে ধরছে।  
না। তিনি একবার আড়চোখে কুন্তলার দিকে চাহিতে  
ভুলিলেন না। কিন্তু বাহাকে নিম্বিত করিয়া এতগুলো  
প্রশংসা বর্ণিত হইল লক্ষ্যার দৃষ্টিতে সে অহির বিব্রত হইয়া  
উঠিল। কুন্তলা বুদ্ধিতে পারিল না কিন্তু সে তাহার  
রূপের স্তুতি করিতেছে। যাঁরা হউক, মাসীমাতার ইহা  
মহা হইল না, মুখ ঘুরাইয়া কর্ণদণ্ডে বলিলেন, “মেঘ নি  
আমার ভাঙ্করণ-বোঁকে। আমের লোক একবারো  
বলেছিল—হা স্বন্দরী একটা দেখা গেল বটে। প্রত্যয়  
যাবে না দিদি, পুরুষ-পাড়ে দাঁড়ায়ে, জলে গার রং দেখা  
যায়।”

“হা গো বড়-গিরা জল বে সবারি ছায়া পড়ে।”



“আহা অ আরা জানি না; বুকে হ’তে চল্লুম কিন্তু রাগ জ্বলবে ওপর চক্চক করেতে দেখেছ কখন?”

অবাক বিময়ের “বিনয়ের পিসী” অস্বীকারহত মন্তক নাড়িয়া বলিলেন, “কবে?”

জয়ের গর্বে মাসীমাতা প্রচুর হইয়া গলিতনয়ে চাহিলেন, “তুমি তাই নয়, অন্ধকারে যখন সে দাঁড়ায় আলোর দরকার হয় না।”

“ও, এ আবার কি বলছ বড়-গিন্নী, এ সব কথা যে কেতাবেই পড়েছি, এও না কি সত্যি হয়?”

রোমন্বরে মাসীমাতা বলিলেন, “তবে মিথোই বলছি এই বুকে। বরসে—পূজোআজ্ঞা ছেড়ে দিয়ে মিছে বলব না কি? সে মরে নি, আমিও নী, প্রত্যয় না হয় কনকাতার গিরে দেখে আসতে পার।”

বিনয়ের পিসী বলিল, “তোমার মিথোবাদী বলি নি বড়-গিন্নী। রাগ করছ কেন, যাক গে বাবু, ও-সব কথা আর আমার দরকার কি। বড়-বৌর কাছে একটু কাজে এসেছিলাম, তা উঠি এখন বাছ।”

“না, না পিসীমা এসেছ বাবে কেন?”

“না বাছা, মুখ আলগা মনিয়া এক কথা বলতে গল্প কথা বলে ফেলব, উঠো বুকে বড়-গিন্নী রাগ করবে। জমীদারের রেয়ত, তাই কি পারি জমিদারের সঙ্গে কথাড়া করে গায়ে বাস করতে।”

পূসী হইয়া মাসীমাতা বলিলেন, “আহা বাবে কেন দিদি। আমারি বোঝাবার ভুল, বস ভাই ভাল আছ তো? এই বীণু রোজ আসে কত ছেঁকা-ভক্তি করে আমার, বীণু আর রমেন যেন একজোড়া, দেখলে চক্কু ছুঁতে।”

“সেকথা আর বলতে—বাড়ী এসে বীণু আমার কাছে কত স্বপ্ন-বতক করে তোমার—বলে খিঁচিয়া দেয়া আমাদের বড় গিন্নী, সুদূর কত সব ভরিতরকারী পাঠিয়ে দিচ্ছে—বীণু আছাদে আটখানা তা আমাদের জমিদারও যে তুনি খুব ছেঁকাভক্তি করেন তোমার।”

“মিছে বলব না,—মাসী বলতে বাছা অজ্ঞান, তবে কি না ভাই, সোধাগি মেয়েটার জালায় অস্থির হয়ে উঠেছি। সময়ে সময়ে পাগিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়—তাই কি

আছে মাঝার বো! রমেন যায়ে ছাড়িয়ে ধরে বলে, ছেলে-মাঝার জন্মবুদ্ধি হয় নি।”

চক্চক কপালে উঠাইয়া পিসীমা বলিলেন—“বল কি গো, ওই আবার বছরের মেয়ে ছেলে মাঝার।” কুন্তলা অন্তরে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। বাঁয়ে বাঁয়ে পিসীমা বলিলেন, “ছেলে মাঝার বই কি, কতটুকুই বা ওর জ্ঞান হয়েছে।”

অজ্ঞান ময় হইলে ছ’কথা মাসী শুনাইয়া দিতে ছাড়িতেন না। উহার কথার প্রতিবাদ করিয়া আঙ্গ দখলত বহে নিষ্ঠুরিত গায় নাই—তবে না কি পাছে কুন্তলায় গহিত উহার “বিশেষ প্রয়োজন ছিল—উহাকে চটাইতে তাই ইচ্ছা হইল না, চাটিয়া গেলেন।

ভাষ্যপর কোমলকণ্ঠে কুন্তলাকে মাসী বলিলেন,—“তোমাই বা কি বয়স মা, এই বয়সে কত না সহিষ্ণু—সব মনে হইলে চোখে জল রাখতে পারি না। ব্যাধিহীন কি, ইলা তোমার খুব কথা শোনেন, তাকে বুঝিয়ে একটু বসো,—রমেনকে বললে সে ছেসে উঠির দেয়, বলে বৌদি ওগল জানেন, সেই ওর বিয়ে দেবে। মা ইলাকে গুরাই হাতে দিয়ে গেছেন—বিয়ের আদি জানি কি।”

উহার উপর দেবরের এখনও এত বড় বিশ্বাস আরে জানিয়া এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও কুন্তলায় চিত্ত শান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

“ইলাকে রাজী করা তো শুরুর মাণীমা।”

আনন্ডিতা মাসী বলিলেন, “রাজী করা বাছা—বিয়ের নামে ঘরে খজায়াস্ত—পাঠার আমি টিকি করেছি।”

বিম্বিতা কুন্তলা বলিল, “এখানেই কি?”

“পাণ্ডারী কথা শোন। এখানে তার গৃহী পাড়া কোথা পাব? আমার পুত্রভূতো দেওরের ছেলে কাঠী চরণ, রূপে কাঠিক, তবে সোপাড়া তেমনি শেবে বি জমীদারের ছেলে কি না, বুঝে বোনা, একটু আয়ে হয়, তাই একটু বা বাব দেখা। মা মাসী হাপসে মরে ছেলে বাড়ী থাকে না, আমি বলি একটা বড় গড় মরে দেখে বে সে, সব সেয়ে যাবে—কি বল দি?”

বজ্রহস্তের ভার শুকভাবে কুন্তলা বাসিয়া রহিল।

মাসী আগ্রহভরে বাসিয়া চণিলেন, “বড়লাকের ছে-

অনন্য মূর—বর আর পাবে না বো, তুমি ইলাকে রাজী করা বাছা, এই সামনের মূসে বে দিয়ে ফেলা।”

কড়ের মত হঠাৎ সেখানে আসিয়া ক্রুদ্ধ পূর্ণনে ইলা বলিয়া উঠিল, “খুব সভা ব’লে গেছে, কার বিয়ের কথা হচ্ছে তুনি।”

কৌতুকভরে কুন্তলা বলিল, “তোমার।”

“কেন আমার বিয়ের না করে বুঝি তোমার প্রাণ ভাঙা হবে না! বেশ, বিয়ের করে দেখ কদিন এ গারে থাকতে পার, সবাই মিলে তোমার চিবিয়—মেয়ে কেধে দেবে।”

উহার বলায় ভরীতে কুন্তলা হাসিয়া ফেলিল।

“ঠি তোমার দোষ বড়-বো। এই আত্মরাতে নাও বেড়ে উঠেছে—ওঙ্করকে গ্রাহি করে না।”

“কেন তোমার জালায় কি বৌদি একটু হাসবেও না? করবে না আমি বিয়ে, কি করবে তুমি?”

সহসা মাসীমা উগ্রভাব সঞ্চার করিয়া যথাসম্ভব মধুর-কণ্ঠে বলিলেন, “এবার ছাড়া-নি-ছি-য়ে-নেই, দেখিল কেনম টুকটুকো বর এনে দেব,—বড় ঘরের বো হ’বি। ভামাচরণ মে’র মত এমন বড় জমীদার এ অঞ্চলে নেই।”

হাসিয়া চলিয়া পড়িয়া ইলা উঠরে বলিল, “এতকণ্ঠে কুন্তলা, তোমার সেই আয়েরে কাণীচরণ বুঝি? জমীদারীর খবর রাবি না, তবে তার মত খুঁট—বন্দ্যাইস—মাতাল এ অঞ্চলে নেই, এটা টিকি মাসীমা।”

উঠরে কুন্তলা বলিল, “কি বলছ ইলা? মুখ সামলে কথা বল, তার নামে না তা বল না।”

কুন্তলায় দিকে মুখ ফিরাইয়া মাসীমা বলিলেন, “মুখ্য নয় মা, তিনধানী ইয়েলী কেতা-ব পড়েছে, জমীদারের ছেলে—”

ইলা হাসিয়া উঠিল, কুন্তলা হাসিবার জন্ম মুখ ফিরাইল।

“ও মা অবাক করলে, মেয়ে হেসেই ঢলে পড়লো যে, এমন পাঠার তোর পছন্দ হয় না?”

শায়কণ্ঠে কুন্তলা বলিল; “পছন্দ অগ্ৰহণের ও কি জানে।”

“হ্যা তাই বল মা—তোমার পছন্দ হয়েছে তো?”

দৃঢ়স্বরে সে বলিল “না।”

“কেন?”

এই কেনর উত্তর দেওয়া কত কঠিন একথা কুন্তলায় জ্ঞান অপর জ্ঞানিত না, অগত্যা কুন্তলা নীরব-বাঁকাই বক্তৃ-সমত বিবেচনা করিল। ইলাকে তাড়াইতে পারলে মাসীমা নিশ্চিন্ত হইবেন, ভরে ভরে কতদিন থাকিবেন তিনি। ইলা ব্যতীত তাহার ধারণা কোনদিন হয়তো উঁহার একাধিপত্য ঐ মেয়েটার কথায় রমেন কাড়িয়া লইবে। কুন্তলায় নীরবতার মাসী অস্থির অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, “অজ্ঞাত-বহিষ্ঠিত কাব্য করিয়া ফেলিলেও, কুন্তলায় কদম্ব চাপিয়া নয়ম স্বরে তিনি বলিলেন, “বেশ তো মা,—তুমি, তুমিই না হার বুঁকে-পেতে সং-পায়ে ওর পা লাগ।”

মাসীমার শাস্ত সম্বন্ধে ব্যবহারে ইলা বিরক্ত হইলেও কুন্তলা যেন ইহার কারণ বুঝিয়াছিল। অধিক বাস্য ব্যয় করিতে কুন্তলায় প্রবৃত্তি হইল না। সংক্ষেপে বলিল, “তাই দেখো ছেলে একটা আচ্ছ।”

আগ্রহভরে মাসী খিজিয়া করিলেন, “কি করে? কোথায় থাকে? নাম কি মা।”

“আগে ঠিকরপোকে বলি, তখন বলব।”

“কেন আমার বিশ্বাস হয় না?”

সমুচিত ভাবে কুন্তলা বলিল, “আজ থাক মাসীমা।”

কি ভাবিয়া মাসী বলিয়া উঠিলেন, “তা হ’লে আজ বাই বোমা, চট্টা করো বাছা বাতে শিগরীর হয়।”

বিলু বিলু করিয়া ইলা হাসিয়া উঠিল; কুন্তলায় ইঙ্গিতে সে চুপ করিল।

কুন্তলায় শুকনান মুখের দিকে চাহিয়া ইলায় বৃষ্টিতে বিলম্ব রহিল না যে, অজ্ঞ উহার বৌদি আহার হয় নাই।

নিশ্চেষ্টে মাসীমা আসিয়া সে বলিল, “বড় কিমে পেয়েছে বৌদি, ভাত দেবে চল।” ইতস্ততঃ করিয়া কুন্তলা বলিল, “ভাত নেই।”

“কেন?”

“গ্লান্না করি নি।”

“কেন করি নি?”

“ভুলে গেছি।” কুন্তলা জোর করিয়া হাসিল।

“তুমি এমন করে না গেয়ে মরবে উঠেছ। আমার জন্ম

বাঁচাও কি দরকার মনে কর না? এমন করে বোজ



থেকে না খেয়ে থাকবে, যা ইচ্ছা তাই করবে? পারবে না সইতে আমি?" বলিয়া ইলা কৌশিক ফেলিল। বিনয়ের শিখামাতা বলিলেন, "সে কি মা এখনও তুমি যাও নি, যাও ওঠো ছুটো ছুটো নাও গে, বেলা যে আর নেই।"

কুন্তলা শান্তমুখে বলিয়া রহিল। চক্ষু মার্জনা করিয়া ইলা শশবে রাস্তাঘরের দ্বার খুলিল। বাসনগুসার শব্দ করিয়া উমান আলিয়া, রন্ধন চাপাইয়া দিল।

"মাও মা, ওঠ।"  
"ইলা রাস্তা করছে শিখীমা, তুমি ব্যস্ত হয়েনা।"  
"এমন আর করো না,—এতে শরীর বে ধারণা হ'বে মা।"

"কি হ'বে আর শরীর নিয়ে শিখীমা—"  
"ওমা তা বলে কি হ'বে, কিই বা এমন বল তোমার, এ ব্যবস্থা কত মনে আবার বিধবা বিয়ে করছে তা তুমি জান না? বীণু সে দিন খবরের কাগজ পড়ে বলছিল—কত কত বিধবা না কি বিয়ে করছে। আমি বলি বুঝি সে ভাল, লুকিয়ে কতকগুলো পাপ না করে, একটাকে নিয়ে না হয় রইল, তুমি এ সব শোনো নি মা?"

ভীড় দৃষ্টে পিসী কুন্তলার দিকে চাহিলেন। অজ্ঞানভাবে কুন্তলা ক্ষুব্ধ হ'ব' ব্যতীত কিছু বলিল না।  
কতকণ পরে পিসী বলিলেন, "তাই আজ তোমার কাছে এসেছি।"

চকিতে কুন্তলার মনে পড়িল, ইনি কি যেন প্রয়োজনের কথা বলিয়াছিলেন, তার পর বিবেচনা করিয়া বলিল, "তুমি কি দরকারের কথা বলছিলেন না?"  
"সেই কথাই যে বলছি গো, একবার দেখে আসি কেউ—আবার না শোনে।" শিখীমাতা উঠিয়া বিহর্ষণ পরীক্ষা করিয়া ফিরিলেন।

উদার এ সতর্কতা কুন্তলার ভাল লাগিল না কিন্তু উদার কারণও সে জিজ্ঞাসা করিল না। উদার নিকট সরিয়া আসিয়া মুকুট তিনি বলিলেন, "সে শোনো মা, বীণু আমার সে দিন কত করে বললে—"জিজ্ঞাস্য-নেয়ে কুন্তলাকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া শিখীমা বলিলেন, "বিধবা বিয়ে অনেক হচ্ছে, তাও বলি তোমার ব্যয়ই বা ক্রি। এখানে কেউ জানতে পারবে না, কলকাতার বিয়ে হ'বে—সেখানেই

সে তোমার নিয়ে থাকবে—কত করে বোঝানো কিন্তু শোনে। তার মাকে লুকিয়ে তাই আজ তোমার কাছে এসেছি, অমত করো না মা, এতে ভাল হ'বে স্বামী হ'বে।"

মুহূর্ত্তনা কুন্তলার নিকট হইতে আনোকেস দীপ্তি সরিয়া গিয়া শিখীমাতা অন্ধকার জমাট বাধিয়া উঠিল।

সমসারের চক্ষুতে সে বড় হয়ে উঠিয়া পড়িয়াছে, লোকের যে এমন একটা হীন ধারণা তাহার বিরুদ্ধে পোষণ করিয়া লইয়াছে তাবিয়া সে মরমে মরিয়া গেল। লোকের কি এ বাধা-হীন—সহোচ্চক্ষু স্পর্ধা। বাহা হউক কুন্তলার নীরবতার সম্ভবিত্বকত বৃদ্ধি শিখীমাতা উঠিলেন, "তবে যাই মা, তাকে এ কথাই ব'লে দেব'না।"  
কুন্তলা শিখিয়ার উঠিল—আর্দ্র অসহায় কণ্ঠে বলিল,—  
"কোথার যাও? কাকে কি বলবে?"

"তবে কি তুমি রাজী মও?"  
কুন্তলা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "কি বলছ তুমি, এ'ত বড় কথা বলতে তুমি সাহস কর—তোমার একটু লজ্জা হ'ল না। এগুলি তুমি চলে যাও—যাও, এগুলি ইলা শুনে ফেলবে, যাও—তুমি যাও।"

"ও মা এ কি কাণ্ড কে জানে বাড়া আজকালকার মনে-দেহ চরিত্র, দেবতাও বৃত্তে পারবে না বাছাকে আমার পাগল ক'রে এখন বলে কি না, চলে যাও।"

অবজ্ঞার স্বরে—অঙ্গুলিসম্বন্ধে ঘুর বেগাইয়া কুন্তলা বলিল, এখানে দাঁড়িও না—"যাও।" উদার রক্তবর্ণ চক্ষু ও ভীষণ আকৃতি দেখিয়া পিসী আর বিরক্তিক্রিতে সাহস করিলেন না।

( ১০ )

"বৌদি"

"কেন হলি।"

"কি বলছিল ঐ বীণুদ্বারা পিসী তোমার?"

লজ্জার কুন্তলা রাস্তা হইয়া উঠিল।

"বল না কি বলছিল?"

"সে কথা তুমি নাই শুনি।"

"না তোমার বলতে হ'বে, কেন তুমি এমন রেগে

উঠেছিলে, রাস্তাঘর থেকে যে তোমার আগোয়াল শুনেতে পাচ্ছিলুম, চুপ করে থৈক না, বল বৌদি।"  
পরিষ্কার কণ্ঠে কুন্তলা উত্তর দিল, "ও-কথা তুমি জানতে চা'ল না ইলা।"

"কিন্তু কেন?"

কুন্তলা হাসিয়া উঠিল, "খদি তোর 'কেন'রি উত্তর দেব তবে সব বলতে আপত্তি ছিল কি?"

"আমার কাছে লুকবার কিছু থাকতে পারে তোমার, এও কি আজ বিধাঙ্গ করতে বল বৌদি?"

উদার কণ্ঠস্বরে কুন্তলা চমকিত হইয়া বলিল, "কেন বিদি তবে শোন, কিন্তু তার আগে প্রতিজ্ঞা কর ইদি, গোলা কিছু করবি না, করিস যদি তবে তোর বৌদির ক্ষতি হই শাল কিছু হ'বে না।"

"সামান্য কথা বলবার জন্ম আজ তোমার কুমিতার দরকার কেন হচ্ছে বৌদি? ভাল লাগছে না, শিশুগীর আমার বল।"

বেদনার হাসি হাসিয়া কুন্তলা বলিল—  
"কুমিতার যে দরকার হ'রে পেড়েছে কথাগুলো গলা থেকে যে কিছুতেই বার হ'তে চাচ্ছে না।"

"এমন কথা; আর তাই শুনে চুপ করে রইলে তুমি?"

"এ ছাড়া উপায় নেই ইলা আমি যে বড় ক্রান্ত হয়ে পড়েছি, মিছে তর্ক করে কতকগুলো কুটু অশ্রাব্য শুনেতে গুড়ি হ'ল না, বারের বারের বিচারের মাশ্কাটিতে ভুলে ধরতে আর যে পারি না নিজে—আর পারি না সত্যি বলছি ইদি।"

মনে মনে ইলা প্রত্যজ্ঞা করিল এইবার সে উদার বৌদির অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে উত্তমরূপে শাস্তি না দিয়া ছাড়িবে না। কিছুকণ পর জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর বল।"

মুকুটকে কুন্তলা বলিল, "তারা আবার আমার বিয়ে করতে পরামর্শ দেন।"

দত্তব্যার অমর চাপিয়া ইলা বলিল, "এই তারা মানে? কোন মহাপুরুষ?"

"সে কি আর একজন তাই নাম মুখস্থ করে রাখব।"

"দেখ বৌদি মিথ্যা আমার ভুলিও না, বা-তা-বলে দিও না, বিনয় বাবু স্ত্রীর বিয়ে করতে চান বৃষ্টি?"

কুন্তলা চুপ করিয়া রহিল।

"বাত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। আচ্ছা দেবব এবার এ গীয়ে কে প্লাকতে পার, জমীদারের বৌকে বিয়ে করার সাহস মন্দ নয়।"

ইলাকে এখন ছাড়িয়া দিলে সে যে কি করিবে তাহা বুঝিতে পারিয়া কুন্তলা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কি করিস ইলা সব তা'তে ছেলেমানুষী করিস না একটু বুঝতে শেখ।"  
"ছাড় ছাড় বৌদি মজাটা একবার দেখিয়ে আসি।"

কুন্তলা অত্যন্ত বিরত হইয়া পড়িল; শক্তি সহযোগে ধরিয়াও সে উঠাকে রাখিতে পারিতেছিল না। কিন্তু জ্বিতেনকে আগিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্রিতা হইল, অকস্মৎ উদার লম্বাঘে ইলা শান্তভাবে ধারণ করিবে—কিন্তু উদার বৃত্তিতে মগ্ন হইল না যে এ বিভাস্তা তাহার সত্য নহে।

"বড় আজ যে যুদ্ধ আগন্ত হ'য়ে গেছে, ব্যাপার কি দিদি?"

"এয়া বলে—এই বিনয় পাঞ্জি বলে—"বৌদিকে বিয়ে করবে, সে আমি সইতে পারব না, সে এই গীয়ে থাকুক নয় আমি তাকে দেখে, একবার, বৌদিকে ছেড়ে দিতে বসুন না জ্বিতেনমা।"

আনাজে কতক বৃদ্ধি জ্বিতেন স্তম্ভিত হইল। কতকণ পরে শুককণ্ডে বলিল, "কিন্তু এই নিয়ে গোল করে কোন লাভ নেই ইলা।"

"বলেন কি আপনি এ কথা শুনেও চুপ করে থাকব?"  
"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কেন, কেন সে যা তা ল:?"

"ভগবান! সাহসের জ্বিত-মিথোহেন কথা বলবার জন্মে, তাদের যা ইচ্ছা তা বলবে, এ নিয়ে গোল করে লোকসান ছাড়া লাভ নেই।"

"তাই বলে এমন স্পর্ধা দেখেও অন্ধ হ'রে থাকতে হ'বে?"

"যখন উপায় নেই তখন সইতে হ'বে বই কি; কিন্তু এ স্পর্ধা তারা দেশে কোথা থেকে সে কথা কি ভেবে দেখেছে কোন দিন?"

"এর মধ্যে আবার ভাব'বার কি আছে জ্বিতেন-মা।"



“আছে বৈ কি বোন, এ সাহস তারা সেই দিন পেয়েছে, যে দিন—”

“না না বল দাদা আমি বুঝতে পারছি না, চুপ করে থেক না।”

“কিন্তু সে কথাই যে তুমি আঘাত পাবে দিদি।”

“হোক গে, বল তুমি, আমার কিছু কষ্ট হবে না।”

“বুঝতে পারছ না ইলা? আমার কিন্তু আপত্তি মনে পড়ছিল, যখন তোমার দাদা ঐ নীচ প্রকৃতির লোকগুলোর সামনে দিলেক—”

মুখ ঢাকিয়া ইলা কুক্কুকে বলিয়া উঠিল, “বুকেছি, সব বুকেছি, চুপ কর দাদা চুপ কর। এই লজ্জাকর ব্যাপার চাপা নিবার ভজ হাসিয়া কুন্তলা বলিল, “আজ ছুয়া যে ছুতারের টিকির সন্ধান মেলে নি—ব্যাপীর কি?”

“নরেন কোন আসে না সে কথা জানি না, কিন্তু আমি ইচ্ছে করে আসি নি এ ভেব না দিদি, হঠাৎ মা মারা গেছেন—”

“ও ভাই! সমবেদন্য নারীদ্বয়ের প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

“তারপর আমার বোন হুলেবা আর বাবাকে পুরাত্ন রেখে এলাম। বাবা বাহ্য একেবারে খারাপ হয়ে গেছে; লেগা এখানে আসতে চেষ্টাছিল।”

“এখানে-আমার কাছে?”

“হাঁ দিদি তোমার কাছে, বলেছি কিরবার সময় তাঁদের কিছুদিন এখানে এনে রাখব। আমার বিশ্বাস তোমার কাছে থাকলে তাঁরা শান্তি পাবেন।”

আগ্রহভরে ইলা বলিল, “এন, দাদা নিশ্চয় এন, আমার বৌদির কাছে থাকলে নিশ্চয়ই শান্তি পাবেন।”

“সে আমি ভাল রকমেই জানি বোন।”

“নরেনের অস্থির-বিস্ময় কিছু করে নি তো?”

“অস্থির? কই একথা জানি না।”

“কেন তবে সে আসে না আর?”

“অলোপার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল না? মায়ের

জন্ম বুধ দিন পেছিয়ে গিয়েছিল?”

“না সে, বিয়ে করতে অস্বীকার করছে।”

বিয়ের সহিত জিতেনের দিকে চাহিয়া কুন্তলা বলিল,

“কি বলছ তুমি? সে নিজে সর্ধক ভেদে দিলে? কিন্তু

সে যে আমাদের অনেকবার বলেছিল যে লেগা বড়ই ফেঁদে করে। তবে কি তবে কি—”

“না দিদি সে ভালবাসত না মোটেই, আমরাই ভুল করেছিলাম লেগাকে তার সঙ্গে বিশেষ দিয়ে—আর ভুল করেছিল সে অন্তরের কথা ভাল করে না বুকে, কিন্তু তার এই ভুলের জন্য ও ধামধামিগত কত বড় প্রাণ পৃথিবীর বুকে ফুটতে না দিয়ে নষ্ট করে দিলে, ব্যর্থ করে দিলে তা যদি শাস্ত্যভাবে সে একবার বোঝাবার চেষ্টা করত।”

“সে চিরকাল অধিরচিত, কিন্তু তার এই অপরিণাম-দর্শিতার ফলে একটা কোমলপ্রাণা কচি প্রাণ যে নষ্ট হয়ে থাকে তা কি সে একবার ভাবে নি, এ আমি ভাবতে পারি না। কিন্তু না এ হতে পারে না, নিশ্চয় কোন কারণ ঘটেছে।”

“কারণ সে পাশ হয় নি, কিন্তু সে যে ফেল হয়ে এও যে জানা কথা দিদি, কলেজে অর্ধেক দিন যেত না, গতি বহি লেগার ওপর চান থাকত তবে কি ফেল করে এমন উসক হয়ে উঠত।” “সে ফেল হয়েছে বলে বুঝি বাবা রাগী হলেন না?”

“না বরং নিজেই সে আর প্রস্তুত নয়।”

কুন্তলা নীরব হইল, বহুকণ পরে কুন্তলা বলিল, “তার ঠিকানা আমার দিও।”

“সে কসকাতায় নেই।”

“কোথায় গেছে?”

“হলে যায় নি দিদি।”

আহারাদি করিয়া কুন্তলা তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিল ও অপর গৃহবাসিনীতে জিতেনের শয্যা গুঁড়েই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। গভীর নিশিথে কাহার যেন আকুল ক্রন্দনে ধকড় করিয়া কুন্তলা উঠিয়া বলিল, চকু পুরিকার স্বভাৱের নিকট গিয়া দ্বাণ পতিয়া শুনিল, হাঁ এ যে পরিচিত কণ্ঠ। অবিলম্বে জিতেনের রক্ত ধারে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। দ্বার খুলিয়া জিতেন জিজ্ঞাসা করিল— “কি হয়েছে?”

“এস আমার সঙ্গে” কুন্তলা শিবানীদিগের গৃহাভ্যন্তরে ছুটিল। কিংবৎ অগ্নির হঠাৎ সে দেখিল কয়েকজন ভদ্রলোক আলোক হস্তে পাড়িয়া আসেন। শিবানীর জননী পথে পড়িয়া

গর্জনভেদী হাহাকাহাক করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে।”

উত্তরে শুনিলেন, এই মাত্র কাহারো শিবানীকে জোর করিয়া থরসা লইয়া গিয়াছে।

জিতেন জিজ্ঞাসা করিল “তারা কোন দিকে গেছে?” আকুলভাবে শিবানীর জননী অজুলি-সঙ্কটে পাগড়ের সর পড়টুকু দেখাইয়া দিলেন।

কুন্তলা হস্তদ্বিত লগ্নন লইয়া জিতেন প্রাণপণে দর্শিত পথে দৌড়াইলেন।

সাধারণের নিমিত্ত কুন্তলা সমাগত মল্লভাষিগণের প্রতি চাহিতে গিয়া তত্ত্বিত হইল, সে স্থলে একটাও প্রাণী নাই, মাত্র শিবানীর জননী। তখনই ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেই পথের দিকে তাৎক্ষণিক চাহিয়া রহিয়াছে। শিবানীর অপহরণকণ লইয়া পুরুতীর পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। উদ্যোগের সহিত আলো ছিল না, কিন্তু স্বীয় হস্তদ্বিত লগ্নন-

লোকে জিতেন অল্পমান করিল উহার সাধারণ পক্ষদশেরও অধিক হইবে। মাত্র একজনকে অস্মিতে দেখিয়া উহারো কিরিয়া পাঁড়িইল। লক্ষ্যদানে জিতেন এক ব্যক্তির সমুপে আসিয়া হাতের লাঠি কাড়িয়া লইল। উহাকে সকলে খিরিয়া ফেলিল। লাঠির আঘাতে লগ্নন চূর্ণ হইল। অন্ধকার শঙ্ক-মিত্র চেনা অসম্ভব হইল।

ইহাতে জিতেনের স্ববিধাই হইল। এমনই সময় মশাপ-হস্তে গ্রামবাসী কতিপয় ভদ্রলোক আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, লাঠি চলিতে লাগিল—উহা স্ফার্য বুদ্ধি ধারণ করিল। মশাপ আঘাত লাগিয়া জিতেন বলিয়া পড়িল। আঘাতের উপর পুনরায় আঘাত লাগায় মজারীনে জিতেনের দেহ মাটিতে গুটিয়া পড়িল, পরে যখন সে দেখা জাপ্ত হইল, তখন নিজেই কায়কক্ষে মর্যে দেখিয়া তত্ত্বিত হইল।

ক্রমশঃ

## মদন-ভাষ্য

ত্রীকণ্ডিত্ত্বয় রায়

তারকাহরের তপসালঙ্ক ঐখণ্যে দেবলোকের যে ঊর্ধ্বতি হইয়াছিল—“কুমার-কাব্যের” ভিত্তির সর্গে তাহা সম্যকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। “কুমার-সম্বৎ” মহাকাব্য; সকল মহাকাব্যেই নায়ক এবং প্রতিনায়ক থাকে—তাইই পরম্পর প্রধান শক্তি থাকে—যাহাদিগের বিরোধিতার ইতিহাস করির লেখনীমুখে কাব্য-ব্যাপী বিস্তার লাভ করে। এই দুই প্রতিদ্বন্দীর মধ্যে দ্বারপ্রান্তে পাঠকের স্বাভাবিক পক্ষপাত্তি থাকে তিনিই নায়ক বলিয়া অভিহিত হন। কুমার-কাব্যের নায়ক দেবতা এবং প্রতি-নায়ক অসুর। তবে “নায়ক” বলিতে একটামাত্র ব্যক্তিকে না বুঝিয়া ‘পণ’ ‘সমূহ’ ‘গণপ্রাণী’ বুঝিতে পারি; নায়ককে বা বৃদ্ধিকে, কুমার-কাব্যের নায়ক দেবতা-সমূহ। সে যাহাই হউক,

সকল মহাকাব্যের এই একটা স্বর্ণনির্জন রীতি যে—নায়ককে শ্রেষ্ঠ পুংলব বলিয়া পরিচিত করিতে হইবে। নায়ক হইবে দীর্ঘোদাত-গুণাবিভূত ইত্যাদি। তাহা। এখন কুমার কাব্যের আখ্যান-ভাষ্য একবার মনঃপূর্ণ করিয়া দেখি। তারকাহর ঔৎকটিক তপস্যা দ্বারা বীর্ঘবন্ত হইয়া ইজার্মি দেবতাগণকে পরাস্ত করিয়াছেন—এমক কি দাসকে বিনিয়োগ করিয়াছেন। এই পরাস্ত, বিগত-মহিম, দাসীকৃত দেবতা—কুমার-কাব্যের নায়ক। কুমার-কাব্যে দাস—নায়ক কথ্যতা উজ্জ্বল করিলেই কেমন যেন বিরক্ত ভাবনা বলিয়া কণে ভাগ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাবীর অবস্থা-সঙ্কটও মনে পড়িয়া যায়। মহাকবি কিন্তু অসম্ভা সাধন করিয়াছেন; পরাজিত দেবতাকে অকলীক্রেমে কুমার-কাব্যের নায়ক করিয়াছেন—



অথ কাব্যের উন্নত মহিমাকে কদাপি ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। পরাজিত দেবতার নায়ককে তাঁহার কাব্য কখনও অমহোদয়ান হয় নাই। পশুপুং লম্বায়তে গিরিম—  
কুমার-কাব্যে কথার কথা না হইয়া চাক্ষুষ প্রমোদে পর্য্য-  
বসিত হইয়াছে।

কুমার-কাব্যের ২য় সর্গে পরাজিত—উৎপীড়িত দেবতার ইচ্ছাকে পুরাবর্তী করিয়া পিতামহ ব্রাহ্মার মদনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইন্দ্রকর্তৃক অহরুদ্ধ হইয়া ভগবান্ বৃষ্ণপতি দেবতাদিগের দৈনন্দিন অপমান ও গ্লানির একটা দীর্ঘ ও বহু বিবরণ ব্রাহ্মার সমীপে উপস্থাপিত করিলেন। এই বিবরণ হইতে একটা স্নোক্ত এখানে উদ্ধৃত করিলাম। বৃষ্ণপতি বলিলেন—

পূরে তাবন্তমেবাত তনোতি রবিরাভগম্।  
দীর্ঘিককাম্যোঃ যাব্যাক্ষেপমাধাতে ॥

মন্ত্রিণাম স্নোক্তার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কঠোর কিরণোপমি স্নোক্তোভ্যঃ স্নোভেব তদভাতা পূরে প্রকাশিত ইত্যাদিপ্রায়ঃ। ইহা গভাঘটকিত ব্যাখ্যা—ইতিতত্ত্ব অর্থ-বিভাস নহে। এই প্রকার ব্যাখ্যাতে কাব্যাদম্ভার-উজ্জীবিত হইবার আশা কোন প্রকারেই করা যায় না। এই স্নোক্তার ভিতর মহাকাব্যের যে গুঢ় ইঙ্গিত আছে, তাহাই এখন বৃত্তিতে চোঁটা করিল। তারকারপর পরাজিত, দাসীকৃত্যে বৃত্তিতে ভাঙ্গিয়া বসিলেন—অর্থাৎ—তুমি যে মহাকাব্যের প্রবর প্রভাব আমাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিলে, তাহা হইবে না—তুমি সন্ধ্যাকালগায় দেহীকৃত্যে আঘাতে বিকীর্ণ করিলে, বাহাতে আমার দীর্ঘ দীর্ঘিকার কলমফুলের উদ্দেশ্য হয়—তারপর তোমার ছুটি অর্থাৎ উদর-শৈলোই তোমার অন্তঃ সত্যকথা, পরাজিত শূন্যে প্রভাব কেহই সহ করিতে পারে না, কিন্তু হর্ভাগ্যের বিষয় তারকারপরকে পরাজিত শূন্যে প্রভাব স্বীকার করিতে হইয়াছিল—কারণ তপ্তশালক ঐশ্বর্যে তারকারপর যদি বা আশিত্যলাভের ক্ষুণ্ণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন—কিন্তু ফল ছুটাইবার মধুর ক্ষমতা লাভ করেন নাই। এই জন্ত ঐশ্বর্যবান্ ইন্দ্র-পরাভক্ত, স্বর্ঘ্যজ্ঞেতা হইয়াও তারকারপর—অস্বর এবং পরাজিত, অপমানিত দাসীকৃত হইয়াও

আশিত্য—দেবতা। ব্রাহ্মার উজ্জ্বল বাধার্থ—এইজন্ত হৃদয়ে উল্লাসকি করি—ময়া সৃষ্টিই সোকাণাং রক্ষা যুগ্মবস্থিতাং। বিধের সঙ্গে তারকারপরের স্বামী সখ্য কিছুই নাই—তাঁহার শক্তি বিশ্ব-নিয়ামক শক্তি নয়—তাঁহার অবর্তমানে ফল কদাপি অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। হুতরায় তারকারপের “ধুমকেতুরিবোখিতঃ” ছাড়া কিছুই নয়—একটা আকর্ষণক এবং প্রভও উপাধি। বলিতে কি—ব্রাহ্মার বর পাইয়াও তারকারপর “বাকীহিতি” লাভ করেন নাই—শাশ্বত কোন স্থায়িত্ব লাভ করেন নাই।

সে যাহাই হউক—পরাজিত দেবতার ব্রাহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার কাছে—দেবতাদিগের জ্ঞানকর্তা—“গোষ্ঠায়াঃ স্বরাজ্ঞানাং”কে প্রার্থনা করিলেন—ব্রাহ্মা “বিদ্যকোষপি” বলিয়া স্বয়ং কিছু করিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু বলিলেন—নীলগোহিত দেব অহরহঃ সমুদ্রের মত সমামিষ হইয়া রহিয়াছেন—তাঁহার মাংস-তপ্তমিত মন উমার রূপভাষ্যে আকৃষ্ট করিলে মনমগ্নমানা সিদ্ধ হইবে; কারণ ইহাদের মিলনে যে কুমার সন্মুত হইলেন, তিনিই দেবতা দিপকে দৈত্যহন্ত জ্ঞান করিলেন।

হুতরায় সমাধির শিবের তপ্তভাষ্য করা দেবতাদিগের পক্ষে জীবন-ধারণ-সমস্তা—এখনকার পরিভাষায় জাতীয় সমস্তা। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণের অঙ্গ—এমন কি হরিতক অঙ্গ-গুচ্ছ ব্যাহত হইয়াছে; হুতরায় নৃত্য নৃত্যের নৃত্য যোদ্ধার আবির্ভাবের আর প্রয়োজন হইয়াছে। হুতরায় বিধের দেবতাদিগের এই মহাবিপদের সময় দেবদীপের সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত—অথ সৃষ্টিকর্তা ব্রাহ্মা যখন বিশেষ সৃষ্টি করিতে প্রাধিক্য হইলেন (নহস্য সিন্ধো যাতামি) তখন শিবের তপ্তভাষ্য করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই রহিল না। ইন্দ্র, এই অবস্থা-সঙ্কটে মনকে গ্রহণ করিলেন—কারণ মদন ব্যতীত হিমাচলের তপস্বীর মাংসাস্তমিত মন রূপের আকর্ষণে আর কে আকৃষ্ট করিবে? জীবনের কৃত্তগুণে, সত্যগুণে—সহজ আনন্দের গুণে কন্দর্পের প্রকাশ সম্ভারত কোনই মরকার হইত না। রূপে তখন বিশ্ব জয় করিতে সমর্থ হইত—উর্ধ্বশী-রূপের চারু-প্ররোদে জয় না লাভিল তপস্বী পরাজিত হইয়াছেন। কিন্তু এখন, যখন জীবনের পরিপূর্ণ সুখমা বৃদ্ধি এবং হর্ষানীত বিচারশক্তি দ্বারা গঠিত

হইয়াছে—তখন তপস্বীরূপের সম্ভারত কন্দর্পবায়ের প্রচুর স্বাক্ষর খটাইতে সক্ষম নাই। এখন, যখন জীবন ও ইন্দ্রিয়-প্রাধি বিচার একটা বহুদল আনন্দ অচ্যুত করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তখন কন্দর্পের স্বয়ং রপগুণে আবৃত্ত হওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

ইন্দ্রকর্তৃক হৃত হইয়া কন্দর্প দেবসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি লগিতবোহিতের জলতার মতন চাক ধুচাপ স্বক্কে ধারণ করিয়াছিলেন—তাঁহার কণ্ঠে রতি-বলরাগভাষ্যে ইতস্ততঃ চিত্ত পরিভ্রম্যমান হইতেছিল—তিনি বসন্ত-সপ-সহচর মধুকরের হস্ত ধারণ করিয়া এবং নব-চুতাকুরেস্থীর পূর্ণ করিয়া শতাব্দেমহী ইন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া প্রবর্তিত করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি হুতরায় এবং সৌন্দর্যের প্রশ্নে যুগপৎ নয়নাভিমান এবং চিত্তব্রজ। কুমার কাব্যের তৃতীয় সর্গের প্রথম কয়েকটা শ্লোকে তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণিত আশ্রমের বর্ণনা প্রদান করে। কোন্ তুচ্ছনীতির অর্থায়িত্বকে জীবনের অনিবার্য ভোগে প্রবৃত্ত করাইছে—হইবে, কোন্ হুতরাকে প্রাণ-শয্যা গ্রহণ করাইতে হইবে—কোন্ মুক্তি-অর্থ্যেয়কে জীবনের মায়াপথে বাধিতে হইবে—এমন কি বোধীধরের ধ্যানও কি ভঙ্গ করিতে হইবে—এই রহস্য সব গর্ভে মিশ্রিত আনন্দের উজ্জ্বল কন্দর্পের উজ্জ্বলিত বাগিতার প্রকাশিত হইয়াছে। এখন যে নীতিজ হইতে লাগিল ধর্ম্মিক কুরিবে—তাঁহাকে এই কথার মায়াপথে হারাইতে হইবে যে মদন দেবতা—অর্থাৎ সত্য, স্বয়ং এবং অপরিবর্তনীয়। তাঁহার পক্ষে মিথ্যাচারিত্ব করা অসম্ভব তাঁহার প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো দ্বৈতভাব নাই। জ্ঞান-মায়ামাংসপ্রয়োগ্য উচ্চ হইতে পারে—কিন্তু দেবতা কখনও প্রকৃতিভ্রাতৃ হইবে না। সর্বদা স্বয়ং প্রকৃতি থাকবে। সে যাহাই হউক—ইন্দ্র তাঁহাকে অবহাস্যকৃত বৃথাইয়া হর-ধ্যানভঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। মদন প্রপঞ্চমীয়া তপস্বীর সহিত সেই গুচ্ছ এবং হুতরায় কার্য গ্রহণ করিলেন। তিনি যে মায়াভীত চোঁটা করিলেন—তাঁহা তাঁহার মূখের কপালেই প্রকাশিত হইল (অমরায় প্রদর্শিত কাব্যগির্জাঃ)। আধুনিক কালের আদর্শে তাঁহাকে বলিব স্বভাবানিষ্ট—সর্বভাষ্যী কন্দর্পবীর। সে যাহাই হউক—

দেবতাদিগের পরম ভগ্নতি দূর করিবার জন্ত মদন যুদ্ধে চলিলেন। মদন রাশিতে হইবে—মদন-দেবতা পৃথিবীর প্রাচীনতম অস্তিত্ব বোধো—পূর্ববর্তমান নিকোপ করাই তাঁহার স্বভাব—ব্রহ্মণ্য তিনি নিকোপ করেন না। তাই বৃষ্ণি-সহচর মধুকর তাঁহার গমনপথ অকাল ভাগেরে প্রচুর পুষ্পাদম্ভারে কুসুমকীর্তি করিয়া গিলেন।

যেহে পাশাপাশী—রতির গুঢ় আশঙ্কার আসর বিপদের আভাস পাওয়া যায়। কবির অপরূপ নিপুণতার কুমার-কাব্যের তৃতীয় সর্গ কাব্যোপেক্তে চিরসমরীয়া হইয়া রহিয়াছে। মদন-ভঙ্গের ব্যাপার আরও বিস্তার করিয়া বলিবার মরকার নাই। পরন্তু-রাক্ষসভার রূপকে সার্থক করিবার জন্ত মদন সম্মোহন ব্যাধি নিকোপ করিতে দিলেন—এমন সময় উগ্র তপস্বীর লগতি-গুণে তৃতীয় নয়ন হইতে বিনাশী বৈশ্বানর আবৃত্ত হইল এবং পলকই মদন ভীত হইলেন। যে দেবতার অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাদিগের অগ্রবোদ্ধার নৈপুণ্য দেখিতে ছিলেন, তাঁহারা “কোষঃ সাহসঃ সাহসেরতি” বলিয়াও মদনকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

মদন-ভঙ্গের পর রতির স্বর্ঘ্যবাণী বিলাপে মদন-ভঙ্গের কাণ এবং নৃগণসভা বিশেষরূপে দুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা কিন্তু এখানে দ্রুতের দিক্ দিয়া না বৃষ্ণি—তবের দিক্ দিয়া “মদন-ভঙ্গ” বৃত্তিতে চোঁটা করিব। সেইজন্ত পূর্বকার শ্লোকার উদ্ধার করিতেছি—

পূরে তাবন্ত মেবাত তনোতি রবি রাভগম্।

দীর্ঘিকা কাম্যোঃ যাব্যাক্ষেপমাধাতে ॥

তপস্বী তারকারপর আশিত্য লাভের ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন; এখন সেটি তপস্বী শিব মদনদমনের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। আমরা বলিব—আশিত্য-পরাভক্ত তারকারপর ও মদন-নাটক শিব এই ছই জনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। কারণ ইন্দ্রের ছই জনেরই তপস্বী। বিধের বাহা চিত্তবৃত্তি নীতি—শাস্ত-রীতি তাহার বৈপরীত্য করিতে গেলে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই হয় না কলম ও পার্শ্বতী চিত্রকর—জীবনের মায়াভ্রাতৃ। তপস্বীর বলে আশিত্য ও মনকে নিগ্রহ করা যায়—দুর্জিৎ কোলা যায় না—কলম ও পার্শ্বতীকে যে তাহা হইলে হারাইতে হয়। হুতরায় পরিণামে মদন ও আশিত্যের সেব স্বীকার করিতে হয়



এবং কমল ও পার্শ্বতীর কাছে কিরীয়া আসিত হই। যাক্, ঈশ্বরা এবং বৈরাগী জীবনের পথে মহা উৎপাত উপস্থিত করেন—কিন্তু জীবন তাহার “আমনাঃ” পথে “কৃত-পুণ-ধাবিত” স্বাভাবিক মত চিরকাল চলিয়াই যায়। জীবনের এই অক্লান্ত চলিবার পথে ভীতভূত “মদন”ই চিরকালের গারিগি।

এইরূপে “মদন-ভঞ্জন” কাব্য-মীমাংসা করা যায়— “ধর্ম-মীমাংসা” করিতে হইলে প্রসঙ্গান্তর অবগতন করা ছাড়া উপায় নাই—যাহা এখানে অসম্ভব। “ইশ্রো দেবতা”র যুগ না বুলিলে মদন-ভঞ্জন “ধর্ম-মীমাংসা” বুলিতে পারিব না। কিন্তু কাব্যে “মদন-ভঞ্জন” কে সৌন্দর্য্য তাহা মহাকবির ঈঙ্গিত্তে বুলিলাম। ধানী শিবের উপর “মারের আক্রমণ,

তপস্বী শিবের পরিচর্যায় পৌরীর নিয়োগ, শিবের তপস্বী, তপস্বী করিবার জন্ম “আ-ক্রমণ” দেবতার প্রায়স, এসমস্তই হিন্দু কবির প্রতীক্ষিত—বৌদ্ধ মতবাদের উপর প্রত্যক্ষ এবং পশ্চিৎ এবং রিপু আক্রমণ। কুমার-কাব্যে পরিণামে “মদন”ই জয়শীল। কিন্তু এই প্রবন্ধে সে কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে— কারণ, এই প্রবন্ধের নাম দিয়াছি—“মদন-ভঞ্জন” পৌরীর তপস্বীর আলোচনা করিবার সময় “ভীতভূত” মদনের জয় কর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা পাইব। এইখানে এইমাত্র বলিতে চাই দেবতাদিগের পরম চূর্ণভিত্তে মদন সহ্যকর্ম্মে আত্ম-হতী প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দ্বিতীয় দধীচি বলিলে অস্বীকার করা হইবে না।

## রস-সৃষ্টি

ঐশ্বর্য্য চট্টোপাধ্যায়

সন্ধানসৃষ্টিই বস্তু আর রসসৃষ্টিই বস্তু হ’লারই আরম্ভ হয় সাধারণতঃ যৌবনের আগমনে। অর্থাৎ একটা জিনিষের চরম পৃষ্ঠতা না হ’লে তা’ থেকে আর কিছুইই সৃষ্টি হ’তে পারে না।

দেহের দিক্ থেকে একখাটা বেশাই বোকা যায়। একটা পরিপূর্ণ দেহ হ’তেই অপর একটা দেহের উৎপত্তি হয়। এ কথা সেই সৃষ্টির আদি যুগের “সেন্-ডিভিশন্” থেকে আরম্ভ ক’রে আজকালকার স্তন্যদোহপানদনের পক্ষে সুমান পাঠে। শরীরে যতটা পূর্ণতা পাওয়া দরকার, ততটা যদি সে কা পায় তা হ’লে সৃষ্টির ক্ষমতাও যে সেই পরিমাণে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, এ পরীক্ষিত সত্য।

এই তো সৌজ্ঞা কথা; কিন্তু এটা মনের সম্বন্ধে খাটতে গেলেই একটা গোলাপনের সৃষ্টি হয়। মনের পূর্ণতা কি? তার কি মাপকাঠি আছে? মনকে মাপব কেমন করে?

এর উত্তরে এই কথা বলা যেতে পারে যে মনের কোনো নির্দেশ ও চরম মানদণ্ড নেই। আপেক্ষিকতা’ই তার মানদণ্ড; অর্থাৎ মনের বিকাশের সম্ভাবনা যখন অনন্ত, তখন যত্নর ভবিষ্যতের কথা ছেড়ে দিয়ে বর্তমান ও জন্মের ভবিষ্যতে মনের চরম পরিণতির যে আদর্শটুকু আমরা গঠন করে নিয়েছি, সেই আদর্শের সমীপবর্তী মনকেই আমরা পূর্ণ-বিকসিত মন বলাতে পারি।

দেহের সম্বন্ধেও একথা বেশ বাটে। ভারতীয় প্রকৃতি সৃষ্টিভঞ্জন মতে অস্পষ্ট পরিবর্তনধারার সাহায্যেই মানুষের আধুনিক দেহের উৎপত্তি। আদিনি “নোব” প্রাণিকদেরই ক্রমোৎকর্ষে আধুনিক দেহের গঠন। তাই যদি হয় তবে যে অনন্তকাল আমাদের শাশ্বত রয়েছে তা’তে ক্রমোৎকর্ষের ধারা দেহের এখন তো অনন্ত উৎকর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে; কিন্তু তা হলেও আমরা আমাদের সাময়িক জ্ঞানের গভীর

মধ্য থেকেই আমাদের দেহকে চিনি, আর সেই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মাপকাঠি দিয়েই দেহের পূর্ণতা মাপ করি।

কিন্তু হাঙ্কিল মন ও রস-সৃষ্টির কথা—সাময়িক জ্ঞানাহারা পরিপূর্ণ মন রসসৃষ্টি করে কেন, আর কেমন করেই বা করে?

মন যখন অপরিণত থাকে তখন সে চারদিক্ থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করে। হাজার ভাব তখন তার মনের ধারে ভিড় ক’রে এসে দাঁড়ায়। তখন সে হ’হাতে সংগ্রহ করে। দেবার আগ্রহ বা সময় থাকে না। তার এই সংকলের প্রায়সটাই তাকে অভিজ্ঞতার পথ দিয়ে চরম পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রায়সটা তো সব সময়ে এক রকমের হ’তে পারে না। বৈচিত্র্যই স্বগতের প্রাণ। এই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই তার মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের ভাবায়—

“ভুক্তি নানা মূর্ত্তি দেখে ধোঁয়া দিতে আসে নানা জনে

এক পথ্য নহে,

পরিপূর্ণতার যুগ্য নানা শাসে ভুবনে ভুবনে

নানা শোভে বহে।”

কিন্তু এই নানা শোভের একটা সমুদ্রের মত নানানের স্থান আছে। বহুকে একের মধ্যে দেখিবার সাধনা ভারতই এতকাল করে এসেছে।

কিন্তু সেটা সম্ভব হয় যদি আমরা স্থান কাল ও পাত্ররূপ পার্থিব বিষয়গুলিকে অন্তরের সেই খণ্ড খণ্ড রূপগুলিকে আমার নিজের মধ্যে দেখিবার চেষ্টা করি। আমার নিজের মধ্যেই বিষয়ের বিভিন্নরূপের ব্যোমহার রয়েছে। এই সীমার মাঝে অসীমের উৎপত্তির কথা রবীন্দ্রনাথ তো বলেছেনই। তা ছাড়া জগন্নাথ দার্শনিক “কিক্-টের” মতও তাই। প্রিওবার্ণে তাঁর “গ্রোথ অফ দি সোল”-এ আদ্যার উৎকর্ষ) পুস্তকের এক-স্থানে বলেছেন,—

ফিক্টে-শেখাওতে চেষ্টাছিলেন, বা কিছু ঘটে তা

আমাদের আদ্যার অন্তরেই ঘটে, আদ্যাকে অবগতন করেই ঘটে—আমলে সে কিম্ব অজ কিছুই নেই। রোমানটি-গিজন্ (কল্পতরু) আর মাথলেকটিজ আইডিয়াগিজন্ (বস্ত্তাবলিপক্ষে ভাববাণ) এই হচ্ছে মূল স্বয়ং।

‘রাভর্গেরে ছায়া সাগর পাড়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম।’

‘পাহাড়ের গুহায় আমার বাস।’ ‘ছোট-কেলেটি আমি,

দরজার দিকে তাকিয়ে থাকি।’ ‘পৃথিবী দিনের কথা ভাবতে থাকি।’ এই সব ছত্রগুলিতে ঐ একই স্বর বাজতে পাঠে। সত্যটি কি এই ‘অহং’ এতই উজ্জ্বল? সম্ভাব্যদের আত্মবোধের ‘আমার’র চেয়ে কবির ছোট ‘আমি’ কত বিনম্র নয় কি?

সত্যই আমাদের এই আত্মোপলব্ধির মধ্যে গুণভেদের কিছু নেই। নিজেই যদি প্রতিষ্ঠিত করতে না পারিলাম তবে অপর কিছু প্রতিষ্ঠিত না হ’লে কি করব কেমন করে? নিজের ক্ষমতার উপর যদি দৃঢ় প্রত্যয় না থাকে তবে কণ্ঠ-প্রচেষ্টা আনবে কোথা থেকে? আর কণ্ঠ-প্রচেষ্টাই যদি না থাকে তা হ’লে সৃষ্টির পথ তো বন্ধ!

তা’ হ’লে আত্মোপলব্ধির সঙ্গে বিবোধলব্ধি মিলিত হ’লেই রস-সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আমার দেহের জন্ম ব্যর্থ মন বা কিছু দেখে, বা কিছু শোনে তা’তেই “অপন মনের মাদুরী মিশারে” দেয়। তখন যেটার সৃষ্টি হয় সেটা জলে, ফুলে, আকাশে কোথাও ছিল না। তাকে গুণার্জ্জুগার্থ আর শৈলী ‘কবি-মানস’ নাম দিয়েছেন। এই ‘কবি-মানস’ের হোঁচাচ লেগে সম্পূর্ণ নূতন জিনিষই জন্ম পায়।

কোন অল্প কবির মনের রং লেগে অন্ত-মেঘ রাজা হ’য়ে ওঠে? কোন ছন্দবৈকী রূপ-সুজারীর কামনার কাননে কাননে গোলাপের সমারোহ?

এই রসোপলব্ধির জন্ম স্বতন্ত্র জীবনের প্রয়োজন। স্বপ্নভেদে ধূলির আবেষ্টনের চূড়নের সঙ্গে যে উচ্ছ্বাসটুকু আছে তা’ সেই আবেষ্টনের ময়ূর পরিণতি হ’লে তবেই বোকা যায়; কিন্তু জয় যদি না হয়—পরাজয়ের দ্বানিই যদি প্রায়সের আনন্দকে রান ক’রে দেয় তা’হলেও তো আমরা নিজের প্রাণের অক্ষয় স্বর্গলোক থেকে সেই ধরার ধূলিকে দূরে রাখতে পারি। এখানে অবশ্য আমি সর্বসাধারণের কথা বলছি না। কবিরকী নির্বাচিত লোক; অর্থাৎ রস-স্রষ্টাদের কথাই বলাচি। তাঁদের এই মনের স্বর্গলোকে ধূলির প্রবেশাধিকার নেই সত্য, কিন্তু ধূলির ক্রমশঃ তো ধবনিত হয়; কারণ ক্রমশঃ মনো কণ্ঠের জন্ম ব্যর্থ-মনোবাহ একটি প্রাণের জন্মের প্রতি, প্রায়সের প্রতি উদ্ভাব-আক্রান্ত দুখন রয়েছে। এই ক্রমশঃ মনোও আশা আছে। আর জন্মের হাঙ্গির মধ্যে তো আরও বৃহত্তর দিকের আশা রয়েছে।



এই আশাই আমাদের মনের স্বর্ণলোক স্বপ্ন করে।

সুপ্তির উপযোগী এমন কিছু বিকসিত করতে হ'ল মনকে ক্ষুধিত হতে হ'বে। তা' সম্ভব হয় এই অন্ধ স্বর্ণলোকে। অন্ধ-ভ্রমের অজ্ঞান যে আশার আলো আছে, তা' এই স্বপ্নেই বৃথতে পারা যায়। এখানকার অধিবাসিনী জেনে অস্তিত্ব নাশিত জীবনের মধুর স্বপ্নগুলির চিন্তায় স্থগত পান। এখানকার স্বপ্ন উজ্জ্বলতর। এখানকার কল্পনাজনিত রহস্যের মাহুতী, মধু বিস্রাজ লুকান থাকতে পারে, কিন্তু বিভীষিকা নেই। এখানকার চর্যাগোপন দরদী মেঘের অন্ধজল পথের মূলাই ভিজিয়ে দেয়, ঝড়ে দোলা শুকনো পাভাঙলোকেই উড়িয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু স্বর্ণলোকে থাকলেও স্বপ্নজনীল মনের একটা চাকলা, একটা অকৃপিতর অধিরতাও থাকা চাই। এ অধিরতা অন্তরে আমাদের মধ্যে যে অসীম দৃষ্টিতে আছে তাকেই। একটু আগে বলেছি অন্ধুর ভবিষ্যতে পূর্ণ বিকাশের আশ্রয়ে বিকসিত মনই—সেই সুপ্তির অধিকারী—কিন্তু এই সুপ্তির মধ্য দিয়েই সে জন্মশঃ এগিয়ে যাবে মূদুর ভবিষ্যতের দিকে। নবনব রূপের মধ্য দিয়েই সে অসীম রূপের আভাস পাবে। রূপই তার স্বপ্ননের প্রাঙ্গণের কারণ ও কল।

কিন্তু রূপ কি? কাকে রূপ বলব? প্রভাতের প্রথম রসিকাল রোজই আকাশকে অপূর্ণ মহিমা দান করে, নব-জাগ্রত নর-নারীর প্রাণে কর্ম-প্রেরণা আনে। রোজই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘিরে আসে, আকাশে সিংহ তারাগুলি অনেক একে ফুটে ওঠে, দীপির ঠাণ্ডা মিঠা জলে গাছের লম্বা ছায়া অশ্রুত থেকে অশ্রুততর হতে আসে—মাঘসের প্রাণ জড়িয়ে যায়। এ ছুটো রূপ তো চিরকালের;—তবু তারা মাঘকে রোজই এত নূতন আনন্দ কি করে দেয়? একের—এই সত্যের—অসীমতর রূপের উৎস কোনখানে?

পূর্বেই বলেছি আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্যে শৈলী, প্রকৃতিপ্রাণ প্রকৃতি মতে এই উৎস মাঘসের আশ্রিত—অর্থাৎ মনে। সে যদি না ওই পৃথগুণিকে মনের মত ক'রে দেখতে পারত তা হ'লে সেগুলি অত মন্দর মনে

হ'ত কি? সবাই মনের মধ্যে একটা কোমল দান আছে। একটা উৎকৃষ্টতর দিয়ে সবাই আকর্ষণ আছে। কাহ্নেই বা' আসলে ভাল, আসলে স্বন্দর তা সকলেরই ভাল লাগে; কারণ তাদের এই দৃষ্টিতে রাখা ইচ্ছাটা তৃপ্ত হয়। মাঘসের মন বলে কোন জিনিষ যদি না থাকত আর পঞ্চ-ইন্দ্রিয় যদি শরীরে না থাকত, তা'হলে সৌন্দর্য জিনিষটাও মাঘসের কাছে চিরদিন অজ্ঞাতই থেকে যেত।

এখন কথা হচ্ছে যে, উৎকৃষ্ট জিনিষ মাঘেই স্বরূপ নয়। তার কারণ উৎকৃষ্টের ধারণা সকলের এক নয়। কাহ্নেই একের কাছে যা রূপ অপরের কাছে তাই অপরূপ। এখানে দেখতে হ'বে কোন জিনিষগুলিকে মাঘর তার প্রাতিবিম্ব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিচার করছে, আর কোনকালেও তার মন সাধারণ জীবনের ক্ষুদ্র গভীর বাইরে নিয়ে গিয়ে নিজের সম্ভাবিত বিরাটতর। কল্পনার মূদুর সেই অবসর সময়ে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করছে। শেষেরটাই আগল বিচার, কারণ মা' সর্গীর তা' অধ্বাধার—তা' কখনই শাশ্বত ও সনাতন হ'তে পারে না।

কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

সুপ্তির সেই আদি গুণ থেকে মাঘর ছুটা প্রধান কাজ ক'রে এসেছে—নারী-রক্ষা আর নর-রক্ষা। তাদের বত কিছু কাছ, বত কিছু চিন্তা, মত কিছু আশা—উজ্জ্বল সমস্তই ওই ছুটাকে আশ্রয় ক'রে। বড় বড় স্বপ্ন হ'লে গেছে—কত বেশ ধ্বংস হ'য়েছে—কত ব্যর্থাবিক, সৌন্দর্য ও গুণের মধ্যে ক'রে একজন লম্বা-ছাড়া লোকের শির-কার্য্য নষ্ট হয়ে গেছে—সুখ ওই ছুটার জন্ত। এই যে আশ্রয় ও আশ্রয়-প্রতিষ্ঠার উগ্র বাসনা, তা' এখনকার সকল লোকের মধ্যেই আছে—তবে কিছু রঙ বদলে গেছে। সভ্যতা মাঘসকে ভগমায়ী রূপে দান করেছে। মাঘসের বুদ্ধি হয়েছে তীক্ষ্ণ।

কিন্তু শুধু এই কথা বললে সভ্যতার প্রসারের উপর অভায় দোষারোপ করা হ'বে। সভ্যতা মাঘসকে আরও কিছু দিয়েছে। মাঘসের বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ হ'য়েছে তেমনি অনেকস্থলে হৃদয় হারিয়েছে। একটা অশ্রুত বাসনার, মা' এতদিন তার কাছে একেবারে অজ্ঞাত ছিল, আজ তা'

কণে কণে তার মানস-লোকের সামনে দ্রুতগতিতে চমকে যায়। সে আশ্রয়না হ'লেই, কিন্তু সমাজ-বন্ধনের মধ্যে এতদিন থাকার অভ্যাসের জন্তই অপরের পক্ষে একবারে অচেতন থাকতে পারে না। অন্ধকে, পৃথকে, আত্মরূপে আগ্রহে সাহায্য করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। প্রতিবেশীর বিপদের কথা তো বটেই, দূরের একস্থানের অধিবাসীদের দৃষ্টি অবশ্য শুনেল অনেকের মনে স্বতই সাহায্যের ইচ্ছা জেগে ওঠে। রোহিণীসের মূলময় এখনি ও নর-নারী পরস্পরের দিকে কাঁড়ি হয়, কিন্তু এমন প্রেমও দেখা গেছে মা' অনির্বাণ দীপ-শিখার মত জীবনের প্রারম্ভিকার শেষ প্রহরগুলিও ভাবুর করে তুলেছে। এই সবই হচ্ছে মানসের মন চৈতন্যের মধ্যে উৎকর্ষতরের জ্ঞান অশ্রুত অহুতির বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু এদের চেয়ে আরও একটা নির্বাচিত দল আছে, যাদের দৃষ্টি স্বস্বভাব—উৎকৃষ্টের ধারণা যাদের উচ্চতর। ধন্যতর তারা ক্রমশঃ, ভাবকে হ'লে ঘুরে বেড়ান। অনন্তর চরম আশ্রান এসে পৌঁছায় ওই ভাবসুন্দর কাছেই। এরা পুষ্পের কাছে ভ্রমর আবার মধুর ক্রমাৎকর্ষের দিকে প্রকৃতির গভীর ইঙ্গিত বুঝতে গেলে মুগ্ধ হ'য়ে যান। সব জিনিসেরই একটা বিশেষ রূপ তারা দেখতে পান।

আমরা আমাদের আরাধ্য দেবতাকে—অসীমের সেই প্রতীককে—চিরহৃদয়ের রূপে কল্পনা করি। যারা নিজেদের প্রাণের মাঘে তাকাতো শিথছে, তারা দেখে সেখানে প্রেমের শতাল ফুটে রয়েছে যার রূপ নীলম-ভূতাল। তাই তারা তারই আশ্রয়, দিশাধারা হ'য়ে জগৎবাসীর কাছে হৃদয়ের গান গেয়ে বেড়ায়—সে গান তারই নিজের স্বপ্নের গান। রূপের সঙ্গে রস-সুখের তাই এত নিকট সম্বন্ধ।

এটা বোঝা সহজ কিন্তু বুঝিয়ে বলা শক্ত। সাহিত্যের রস উপলব্ধির জিনিষ—তর্ক করার জিনিষ নয়। সকাল বেলা নীল আকাশের তলা দিয়ে একদল বক উড়ে গেলে আমার খুব ভাল লাগতে পারে, কিন্তু যে ভ্রমরলোক সকাল হ'তে না হ'তেই হিসারের বই নিয়ে বসেদেয়, তাঁকে তো রোমা মেয়ে ভালগাণ্ডেতে পারি না। তাঁর চোখ নীল আকাশের কালে শেষে যাকার চেয়ে শাখা খাতার উপর কাশোর আঁচড়েই বেশী অভ্যস্ত। আবার যে ভ্রমরলোক খুব

কাছের, তিনি বর্ষার কাদার কণিকাটাই দেখতে পান, আর কবির দল বসে বসে-খন বরষার নিবিড়তার মাধুর্য্যটুকু অহুত করেন।

ধন্যতর এমন ছ'দ্বয়ের লোক আছে—রসিক ও অরসিক। স্বীকার করি কাছটার খুব প্রয়োজন, কিন্তু একথাও মনে রাখতে হ'বে যে, কলাগমীর আসন উজ্জনের অনেক উপরে। তেমনি রসের বিচার করতে গিয়ে কেবলমাত্র স্বনীতির দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল আসল বিচার হ'বে না; কারণ কেবল নীতির স্বতন্ত্রতা জীবনে খাটিয়ে গেলেই রস-সুখ হয় না। তা' হ'লে "কলাচ মিথ্যা কথা কহিও না" এই কথা ভাবে ও সাহিত্য-রসে অনবহ হ'য়ে উঠেতা। তবে দ্বন্দ্বীতার প্রশ্ন দিতে বলি না আর রস-সুখটিতে বার সব চেয়ে প্রয়োজন সেই স্বরূপের গভীর বাইরে যেতেও বলিল না। আমাদের কথাবার্তার যেমন, তেমনি রস-সুখের ক্ষেত্রেও একটা সহজ ভব্যতাজ্ঞান থাকা চাই।

জীবন-সংগ্রামে কতবিশত হ'য়ে মাঘর জন্মশঃ তুলে কাছে যে কোনও রকমে টিকে থাকটাই বাচাট একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বাবার উদ্দেশ্য বাচা কিন্তু বাচারও একটা উদ্দেশ্য আছে। আশ্রয় কৃপা মেটাবে কে? প্রত্যেকের মধ্যে যে অসীম আশ্রয়কে ব্যর্থ করার জন্ত হাধাকার করছে, তার স্বরটাকে কি চিরদিন নিষ্করণে চাপা দিয়েই রাখতে হ'বে?

কে উত্তর দেবে? সবাই পেটের ক্ষুধা নিয়েই ব্যস্ত। যাদের সে ছালাপা নেই তারা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের কৃপা মেটাতই ব্যস্ত। আশ্রয় কৃপারূপ পরম-সুখের দিকে মনোযোগ দেবার অবসর, ইচ্ছা ও কন্মতা খুব কম লোকেরই থাকে। যাদের থাকে তাদের মধ্যেই অনেকেরই সত্যিকার রস-সুখী।

রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই প্রবন্ধের শেষ করি,—  
"আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে একটা অন্তলপার্শ্ব বিরহ আছে। আমরা যার সঙ্গে মিলিত হতে চাই সে আমাদের "মানস-সংসারে"র অগম্য ভীয়ে বাস করছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পঠান যায়, সেখানে সমরীর উদ্ভীত হবার কোন পণ নেই।" অর্থাৎ আমাদের স্বপ্ন ভাবধারার অর্থাৎ রস-সুখের পথদিয়েই আমাদের মন "আনন্দ ক্রমবৃত্তমুখি" দৃষ্টিভিত্তি সেই প্রিয়তর জন্মসের পদতলে পৌঁছায়।"



ভারতবর্ষের প্রাচীন সঙ্কত নাটকগুলি প্রায়শই নায়ক-নারিকার প্রণয়-রসজ্ঞ বর্ণনামূল্যেই রচিত হইয়াছিল। এইরূপ বিভিন্ন এই মানব-চরিত্রের অনেকখানি আশেই নাট্যকারগণের পৃষ্টি-পথের অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে। দাম্পত্য-প্রেম ছাড়া অন্য নানা ভাবের ভিত্তর দিয়াও যে নাট্যকারের মনোভাবের বর্ণনা পিতার পাওয়া যাইতে পারে, সঙ্কত নাটকগুলি হইতে সে কথার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানব-চরিত্রের বিপুল-রহস্যের সন্ধান সঙ্কত নাটকগুলি বলিয়া দিতে পারে না। ভারতের মনোভাব ছাড়া মানব-চরিত্র-রহস্যের রসিক-বিশেষ। অতঃ, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সকল উপকরণ ঐ ছদ্মই, মনোভাব হইতে সংগৃহীত হইয়া সঙ্কত নাটকগুলির অঙ্গ-সৌভব সাধন করিয়াছে, সেগুলি সবই সেই নায়ক-নারিকার বিরহ-বিগলনের হাহাভাব ও দীর্ঘ-বাস। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত্যাপ মার্ধ্য্য আছে, পেলব সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু নাট্যকারের ভিতর-বাহিরে যে বহুবিধ সূচক অঙ্গের চলিতেছে এবং অবশেষে যে সূচকগুলি নাট্যকারের সৌন্দর্য্য বর্ণনা ভাণ্ডে ও নিষ্কার্য্য সার্থকতা লাভ করিতেছে, সমগ্র সঙ্কত নাট্য-নাট্যকারের ভিতর কোণার সেই বলিষ্ঠ, জটিল ও কল্পনাময়ী ভাবনের বহুমুখী উদ্ভাস পতি। এইখানেই “পাণ্ডব-গৌরব” রচয়িতাকে কেবল মাত্র যে মধ্যযুগের ভারতীয় কবিশ্রম-প্রবর্তিত পন্থাই পরিচাণ করিতে হইয়াছে তাহা নহে, এমন কি এ বিষয়ে তিনি তাঁহার সাক্ষিত্য-গুরু সেকন্দরপুর-কেও অঙ্গস্বয়্য করেন নাই। সেকন্দরপুরের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটকই প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয় ব্যাপারকেই কেন্দ্র করিয়া রচিত। বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্র-অঙ্গন পটভাস, শুল্লভিত ঘটনা-প্রবাহ কোণে পলিগণিতকে আমরা সেকন্দরপুরের সমকক্ষ বলিয়া মনে করি। কিন্তু কেবল নরনারীর প্রণয়-কথাকেই তিনি তাঁহার নাটক-রচনার

মুখ্য অবগতন রূপে গ্রহণ করেন নাই। মানব-জীবনের এক একটা আদর্শকে ছুঁয়াই তুলিবার জন্তই, তিনি যেন পাঠক-চিত্তকে আকৃষ্ট চরিত্রের জীবনের পর জীবন, ঘটনার পর ঘটনার ভিতর দিয়া অতি সহজ ও স্বাভাবিক গতিতে লক্ষ্যভিত্তিক হইয়া যান।

মহাভারত আছে—একজনকে পাণের ফল অনেককেই ভোগ করিতে হয়। হরপুত্র, উগ্র-তপস্বী দ্রুপদাধিব কাম এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে অনর্থের সৃষ্টি করিলেন, মর্ত্যলোকের অধিবাসিবর্গকে একদা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। তমোণ্ডে যোগপুষ্টিহীন অথি ইন্দ্রিয়-পরিপুষ্টি সাধনে বিফল-মনোরণ হইয়া অঙ্গা উর্ধ্বশীকে নিদ্রাশয্য শাপগ্রস্তা করিলেন এবং শাপ-মোচনের একটু আভাসও দিয়া পেলেন বটে, কিন্তু তিনি কি জানিতেন যে, স্বর্গে যে মোহের জন্ম, মর্ত্যেও তাহা সঞ্চারিত হইতে পারে, এবং কালের জটিল-কুটিল পন্থা অতিক্রম করিয়া, সে মোহ রূপান্তরিত হইয়া এমন কল্যাণের মূর্তিতে দেখা দিয়া থাকে যে তাহা স্বর্গেরও কল্যাণাতীত, আর সেই কল্যাণী মূর্তির আবির্ভাবে উর্ধ্বশীরাও শাপমুক্ত হইয়া যান—যদি দণ্ডীরাও বিঘাতকুলাভ করেন। মোহে যথার উৎপত্তি-মূল্যেই তাহার পরিমাপনি দৃষ্টিয়া থাকে।

‘পাণ্ডব গৌরব’ পাণ্ডবগণের গৌরব-কাহিনী প্রচার করিতেছে। পাণ্ডবগণের প্রকৃত মহত্ত্বের উৎস কোণার সেই কথাই কবি অতি সহজভাবে এই নাটকে দেখায়া দিয়াছেন। ‘পাণ্ডব-গৌরব’ শুধুই পাণ্ডবগণেরই গৌরব-কাহিনী নয়, উগ্র মনোভাবের গৌরব-কাহিনী বটে। মনুষ্য যদি আদর্শভেদ না হয়, সত্য ও জ্ঞানের স্বত্ব ভূমির উপর অঙ্গভাবের দণ্ডায়মান হইয়া মনুষ্য যদি সমস্ত বিপরীতভাবকেও ধর্ম-মুখে আচ্ছাদন করে, তবুও জ্ঞাতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা মনুষ্যের সেই সমস্ত মনুষ্যের একটি মাত্র কেশও কাঁপাইয়া তুলিতে পারে। মনুষ্য যখন জ্ঞানের পক্ষ লইয়া অজ্ঞানের বিপক্ষে বিগ্রহে যোষণা করে,

তখন ‘মহাশক্তি’ স্বয়ং আসিয়া মানুষকে তাঁহার বাহুধেই মনের মত বিচারা রূপে এবং সাধারণতঃ অধিব্যবহার সম্বন্ধিত শক্তির সমস্ত শক্তি তখন বার্থ হইয়া যায়। মোহ-রাজ, প্রাণতরঙ্গিত নিরাশ্রয় অবতাররাজ দণ্ডী যখন বিশ্বকাকোলের সর্বশাসন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া, দেবী সূর্য্যার মাতৃশক্তি আশ্রয় লাভ করিল, তখন যদি পাণ্ডবগণের পৌরুষ-শক্তি সেই মাতৃশক্তির বার্থে মর্যাদা স্বীকা করিতে না পারিত, তাহা হইলে মাতৃ-শক্তির পরাভব যদিও ঘটিত না, কিন্তু পাণ্ডবগণের গৌরব করিবার কিছুই যে থাকিত না সে কথা নিশ্চিত। নারীর মাতৃশক্তি গুরুত্বকে ধর্ম্মকে প্রবৃত্তি করিয়া কেমন করিয়া বিশ্বের সমস্ত বৈকল্পিককে পরাভূত করিতে পারে, মহাকবি তুলিকাভাটে পাণ্ডব-গৌরব নাটকে সেই কথাই অতি উজ্জলভাবে দৃষ্টিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু মনুষ্যের এই বিজয়কাহিনী আঁকিতে গিয়া কবি মানুষকে অর্থক উদ্ধত ও দান্তিক করিয়া তুলেন নাই। এই যানে কবির প্রকৃত ভারতীয় জন্মমূহুর পলিতর পাওয়া যায়। কেমন সংঘত বীর ও অনাড়ম্বরভাবে পাণ্ডবগণ আসর সজায়ে অস্তিত্বের অগ্রসব হইতেছেন—যেখানেই অসামান্য আশ্রয় হইয়া যায়। কাহারও কথাবার্ত্তার উল্লেখ চাঞ্চল্য নাই—অর্থবীন প্রণায়ের অনর্থক উজ্জল কাহারও মুখ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে না। কোনও প্রতীচ্য-ভাবাপন্ন আধুনিক কবি যদি এই এই আখ্যানবস্ত্র অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক লিখিতেন, তাহা হইলে, তথা-বধিত ‘দুঃখমুখের’ অজ্ঞাতনে এমনভাবে চরিত্রগুলি অঙ্কিত করা হইত, যাহা হতেই তাহা-অজ্ঞানে কবিতার বুদ্ধি পাকিত অনেক—কিন্তু বার্থ ভারতীয় ভাবটুকু কখনই অঙ্গুর পাকিত না। সে নাটকের গল্প হয় তো কতকটা এই রকম ভাবে পরিকল্পিত হইত—“যদিও ক্রোধে উর্ধ্বশী ইচ্ছা-বর্জিত স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে নির্গাসিতা হইয়া যেটুকু নামে খলিতা হইতেন। মহাযাজ দণ্ডী তাঁহার সেখানি তাঁহার প্রেমে একেবারে পাগল হইয়া বাইতেন। হয় তো এই সময়ে তাঁহার মনে বীজানুভবের ‘উর্ধ্বশী’ কবিতার আত্মিক শূন্যতে পাওয়া যাইত। ক্রম এই প্রণয়ে বাস গামিতেন। তাঁহাকে একজন লম্পট ও কুট রাজনীতিজ্ঞভাবে অঙ্কিত করা হইত।

তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া প্রেমের দায়ে রাজ্য ও গৃহ পরিবার সমস্ত ত্যাগ করিয়া, দণ্ডিগির উর্ধ্বশীকে লইয়া আশ্রয়ের জন্ত দেব-দেবীভূতের দ্বিরা ‘অবশেষে ‘উর্ধ্বশী’ পরামর্শে সূর্য্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। সূর্য্যার তাহাদের আশ্রয় দিবার কতকটা প্রার্থনা একেবারে পুরীকায় জন্ম, কতকটা বা জন্মের মহত্ত্ব দেখাইবার জন্ম। তাঁহার মুখে আমরা নারী-জগৎগণের জামাদারী বক্তৃতা নিম্নলিখিত শুনিত পাইতাম। সূর্য্যার বক্তৃতায় লজ্জিত হইয়া পাণ্ডবেরা বাধ্য হইয়া দণ্ডী এবং উর্ধ্বশীকে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এদিকে ক্রম এই কথা শুনিত পাইতাম সমস্ত দেবপুত্র, সহিত সম্মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন। এই অবসরে থানিকটা দ্রব্যোদ্যানের চরিত্র-মহাভাষ্যও আমরা দেখিতে পাইতাম। তিনি ভাষণের এই বিশেষ সাধনা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহার পর দেখিতে পাইতাম দেব-মহাবীর যুদ্ধ। দেবগণকে গানি গিয়া মানুষেরা জন্ম-গতির ভাষায় নিজেদের মহত্ত্ব প্রচার করিতেছে। হয় তো এক দল নারী-সৈন্যও স্বয়ংক্রমে দেখিতে পাইতাম। ইতিমধ্যে নির্দাসন কাজ শেষ হইয়া যাইত, উর্ধ্বশী হয় তো পলাইয়া বাইতেন। যুদ্ধ থামিয়া যাইত এবং দণ্ডিগির আঁখি-বিরহানন্দে দগ্ধ হইতেন। একটা করণ রাসায়নিক বিরহ-কবিতার আত্মিক সঙ্গ সঙ্গের এই রোমান্টিক নাটকের যুগ্মিকা পাত হইয়া যাইত।” বলা বাহুল্য, এ ধরনের নাটক-রচয়িতার কলমার ‘কল্পকীর’ মত চরিত্রের সহি সন্ধাননা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইত। হয় তো একজন বয়স থাকিত—যে সময়ে, অসময়ে গ্লোহের উপর আসিয়া দণ্ডিগিরের সঙ্গে ইয়ার্কি-মক্কা করিয়া দর্শকগণকে হাসাইয়া যাইবার চেষ্টা করিত। ছেলেরা এ প্রণীর নাটকের মূল্যকে প্রশংসা করিত—কাগজে কাগজে ‘মহাভারত’ নাটক-রূপে নাটক-খানি অভিনয়িত হইত।

বড় বড় সাহিত্য-জ্ঞানের লেখার ছুটী দিচ্ থাকে। একটা বাদেশিকতার দিচ্—আর একটা সার্ক-জীনতার দিচ্; একত পক্ষে, ধারিত গেলে বাদেশিকতা ও সার্ক-জীনতা, দুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। এই বাক্য-বাত্ত্যের দিনে, জাতি-বাত্ত্যকে ফোঁ যুক্তি বলে অধীকার করা



বাইতে পারে, বৃত্তিতে পার না। যাহা কোন একটা জাতি বিশেষের সম্পদ—তাহা এক হিসাবে সমস্ত বিশেষের ও সম্পদ। যে খাঁটি বাঙ্গালী—সে খাঁটি বামুনও বটে। হুতরাং যাহা জাতীয়-সাহিত্য—তাহা যে বিশ্ব-সাহিত্য হইবেই। জোর করিয়া বিশ্ব-সাহিত্য গড়িতে গিয়া যদি এমন কিছু গড়িয়া ফেলা হয়, যাহাকে সেই সাহিত্যের জন্মস্থান আশান-সাহিত্য বলিয়া চিনিয়া লইতে না পারে,—তবে তেমন সাহিত্য যে বিশ্ব-সাহিত্য ও হয় না—একথা আমাদের দেশের “গুণ-মান-বোরে” করে বুঝিবে।

গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী—যেহেতু সেগুলি খাঁটি স্বদেশী সাহিত্য—সেইহেতু সেগুলি বিশ্ব-সাহিত্যও বটে। বিশ্বের সাহিত্য-দরবারে ইহার বেশ সগৌরবে থাণ্ডা উঠু করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ধরা যায় এই পাণ্ডব-গৌরবের কথা। ‘পাণ্ডব-গৌরবের’ ‘ক্ক’ কি ‘ক্কুকা’-চরিত্র—আগাগোড়া ভারতীয় পরিচয়না—‘পাণ্ডব-গৌরবের’ অজ্ঞাত চরিত্র-গুলিও ভারতীয়ত্বাবে ওতঃপ্রোতঃ। সমগ্র মহাভারত-পাঠে বৃষ্টিধর, ভীম, অর্জুন, ভীষ্ম, দুর্য়োধন, কৰ্ণ, কুন্তী, ও হুতরা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, এক পাণ্ডব-গৌরব পাঠেই তাঁহাদের চরিত্র-সম্বন্ধে সেই ধারণাই স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রতিভার স্পর্শ পাইয়া, পাণ্ডব-গৌরবের ক্ক, ভীম ও হুতরা-চরিত্র আরও যেন যথু এবং উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা না থাকিলে এই চরিত্রগুলি সম্যক চুট্টা উঠিতে পারিত না। সেই সঙ্গী ও উল্লংঘন-বিরোধের মত অপকৃষ্ট চরিত্র-গুলিও ঠিক যেন ভারতীয় আবহাওয়ার মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রতিপাত মূল-আর্শও ভারতবর্ষীয়। একদিকে যেমন এই গ্রন্থখানি জাতীয় ভাব-সম্পন্ন—আর একদিক দিয়া ইহা সার্বজনীনও বটে। যে মহত্বগুলি ইহাতে অঙ্কিত করা হইয়াছে—তাঁহাদের প্রকৃতিগত স্বভাব—যে কোন দেশের মানুষের চরিত্রে চুট্টা উঠিতে পারে। বহুতঃ কাম ক্রোধ, ঘেং হিসা, কাপুরুষতা প্রভৃতি দোষ এবং ক্রমা, প্রেম, অহিংসা, ও তেজস্বিতা প্রভৃতি সঙ্গুণগুলি—কোনও জাতি-বিশেষের একচেটিয়া সম্পদ নহে। কোনও ভৌতিক আদর্শ বা কোনও মতঃ ভাব কেবল কোন একটা বিশেষ দেশ সম্বন্ধেই সত্য হইতে পারে না। মানুষের অন্তর্নিহিত ভাব সর্বত্রই একরূপ,

কেবল তাহাদের বিকাশের ধারায় পার্থক্য আছে। তাই যে প্রকার রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ হইলেও উহার উপর সর্ব-কালের এবং সর্ব-দেশের দাবী আছে—তেমনই জগতের অজ্ঞাত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। পাণ্ডব-গৌরব একদিক দিয়া যেমন স্বদেশের নিজস্ব সামগ্রী—তেমনি আর একদিক দিয়া সর্ব-কালের এবং সর্বদেশের মানব-মনই ইহার ভিতর হইতে সত্যত্যাগাদিত ও সহস্রভূতি আনন্দ পাইতে পারে।

একথা বলাই নিম্নোক্তরূপ যে, গিরিশচন্দ্রের নাটক-রচনা-প্রণালীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রণালী এই পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্য উদ্ভাবিত হয় নাই। পঞ্চাঙ্গ এই নাটকের প্রত্যেকটি গভীর ও অতীত পরম্পর-সম্বন্ধ। কার্য-কারণের হুজু যোগ-স্বপ্ন আগাগোড়া গাথা। একটীও বাগ্‌চাফুচি বড় খেলা অথবা একটীও অনাবশ্যক চরিত্রের অবতারণা নাটকের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঠ করিতে করিতে আগ্রহ যেন জমাট বাঁধে—স্বপ্নাবোধ যেন প্রগাঢ় হইয়া ওঠে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া, কথোপকথনের মাধ্যমে একদিকে যদি নাট্যোজ্জ্বল চরিত্রগুলি বিদ্যমান হইতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে আর একদিকে স্থান, কাল ও পাত্রের হ্রাসভিত্তি রক্ষা করিয়া স্বাভাবিকভাবে স্বচ্ছল গভিত পরিপাতিত দিকে অগ্রসর হইতে পারে—তবেই তো তাহাকে প্রকৃত নাটক বলা চলিবে। এই লক্ষণ বাহাতে আছে তাহারই খাঁটি নাটক—নহিলে কেবল মাত্র বাহিরের চেষ্টার একটু আদর্শ অদল-বদল করিলেই নাট্য-রচনার নূতন রীতি প্রবর্তন করা হয় না।

অনেকে নাটকখানিকে অঙ্গ-গভীরে বিভক্ত না করিয়া দৃষ্টে দৃষ্টে ভৌতিক করিয়া থাকেন। আমরা এ পরিবর্তনকে কোন একটা মৌলিক পরিবর্তন বলিয়া মনে করি না। ‘অঙ্গ’ কথাটির বদলে ‘দৃষ্ট’ কথাটা বসাইলেই যুব একটা গুরুতর পরিবর্তন হয় না। ‘দৃষ্ট’র বিস্তৃত বিবরণ দেওয়াও যে যুব আবশ্যক আছে, এমন কথাও আমরা মনে করি না। কারণ এ কাহিনী রসমঞ্চের শিল্পী যিনি—তাঁহানই কাহ। নাটকের প্রত্যেক দৃষ্টের পোড়ায় উৎকণ্ঠ এক একটা বিষয় জুড়িয়া দেওয়ার শিল্পীকে তাঁহার কল্পনা-বিকাশের কোন স্বপ্নাঙ্গ দেওয়া হয় না। নাট্যকার শুধু দৃষ্টের একটু ইঙ্গিত

দিলেই যথেষ্ট। ‘ঐ ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন শিল্পী নব নব রূপে শিল্পকলার শোভা-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া তুলিতে পারেন।

কেহ কেহ আবার আখ্যান-বস্তুর ‘অনৌকিক ঘটনাগুলি অথবা চরিত্রের স্বগতোক্তি পরিহার করিয়া নাটক খানিকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে চাহেন। কিন্তু ইহাতে অনেক সময়ে আখ্যান-বস্তুর কাব্য-সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ চাপা পড়িয়া যায়। ঘটনা যতই অনৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন—রাজ্য পাঠকে শুধু দেখিতে হইবে, সেই সেই ঘটনা-চক্রের আবর্তে পড়িয়া চরিত্রটা বিকসিত হইয়া উঠিতেছে কি না। উল্লংঘন দিবাভাগে ‘অশ্বিনী’র আকার লইতেই হইতে বলিয়া, দণ্ডীর প্রত্যাবৃত্তি ফল প্রতীক্ষা-পারায় হইয়া স্বীয় প্রকৃতির হিংস্ররূপ প্রকাশিত একটি করিতেছে—

“কাল ব্যা দিয়া মূখে,

চালাইব হুজীত চাবুক ঘায়—

প্রবেশির সাগর মাঝারে

দেহ তোর মরম-কুণ্ডারে থাবে।”

অথবা—

“প্রাতে বুঝাইব আমি শীতল কেমন,

তুবাননে মায়াক্রপী অশ্বিনী পড়ায়।”

ঘটনা যতই অনৌকিক হউক মানব-প্রকৃতি মানব-প্রকৃতিই। স্বগতোক্তি-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—উহার উত্তর চরিত্রটির স্বরূপ কথি হুস্পষ্ট হইয়া উঠে। স্বগত উল্লংঘন দ্বারা মনের যে আভা মূখে বলা হয় তাহা হয় তো, অনেক সময়ে ভাবভঙ্গীর দ্বারাও দেখান হইতে পারে—কিন্তু অনেক সময় আবার তাহাও সম্ভব হইয়া উঠে না। স্বগতোক্তির সময় সর্বকণ্ঠে মনে করিতে হইবে, জৈয়ে যেকোনো রসমঞ্চের উপর তাহার মনের আসনে যে কথাটি পুরিয়া বলিতেছে, তাহা তাহার পার্থক্য লোকসম্মত সত্যই সত্য হইতে পারে। তাহার মনের নীরব কথাটি যেন সরব হইয়া কেবল সর্বকণ্ঠেই কাণে আসিয়া বাজিতেছে।

নাটকের ভাষা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও চলিত।

কিন্তু সাধারণ পাঠকের উপর এই ভাষার প্রভাব কমনস্ব, তাই এ সম্বন্ধে ‘এক কথা বলিতে চাই। ‘সাধারণ পাঠক তাহার অসামান্য উজ্জ্বল ও অশোভন কবিত্বের দ্বারা এতটা বিমগ্ন-বিমুগ্ধ হইয়া যান, যে চরিত্র-বিকাশের পক্ষে সেই ভাষা সমস্ত ও সহায়ক কি না তাহা দেখিবার আর তাঁহাদের অবকাশ থাকে না। নাটকের পাঠ-পাঠীরা যদি যোগাৎ পেঁচাল ভাষায়, নিজেদের নিজেদের চরিত্র-বিশ্লেষণ করিতে বলিয়া যায়, অথবা স্থানে-স্থানে কবিতা আভিষ্টি করিতে থাকে, তবে তাহার ভিতর মনস্তত্ত্ব ও কবিত্ব যতই থাকুক না কেন, নাট্য-সৌন্দর্য্য সে ভাষায় কখনই স্পষ্ট হইতে পারে না। কথোপকথনের ভাষা এমন হওয়া চাই—যেমন মনে হয় উহা কথোপকথনেরই ভাষা। গভীর হউক অথবা চমকেই হউক—ভাষা হওয়া উচিত চরিত্রোপযোগী, সত্য ও স্পষ্ট—যেমন, মনে হয় এই ভাষাই স্বাভাবিক। ইহারই ভিতর নাটকের কাব্য-সৌন্দর্য্য নিহিত থাকে। নাটকের এই ভাষার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলেও গিরিশচন্দ্রের সমকক নাট্যকার বাঙ্গালার আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য, অজ্ঞাত নাট্যকারদিগের তুলনায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অনুরক্তগণ এ বিষয়ে অনেকটা মরম-কাম হইয়াছেন।

সাহিত্য-রচনার কেবল একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিবে কি থাকিবে না—এ গভীর বর্তমানের একটা তর্ক পাকিয়া উঠিয়াছে। উদ্দেশ্য-বিশীনভাবে সাহিত্য-সৃষ্ট হইলে কাহারও কাহারও মতে সাহিত্য কোন রকম পক্ষপাত দোষ-হীন হইবে না। যখন নিরুদ্ধিতভাবে কাঁজ করিলে মানুষের কোন কাঁজই সার্থক হয় না, তখন সাহিত্য-সৃষ্টি বোঝাতেই না উৎকণ্ঠ মনোভাবকে বলা যাক—নাহি নয় ভগ্নাঙ্গী ছাড়া আর কি বলা হইতে পারে? যোতের মূখে গা ভাসাইয়া দেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। সাহিত্য-স্রষ্টা যত বড়ই সাহিত্য-শ্রদ্ধা হউন—তিনি মানুষ। জগতে যাহা কিছু ঘটয়া হইতেছে—সবই কিছু তিনি যেনমনা দেখিতেছেন ঠিক তেমনটা আঁকিতে পারেন না। ঘটনার প্রবাহগুলিকে তিনি তাঁহার মনের আলো ছাঁকিয়া লান। এখানে কবির উদ্দেশ্য হইতেছে আলো পাতিয়া ঘটনোপাত্তের মধ্য হইতে কোন একটা বিশেষ ভাব বা লক্ষ্য



বা আদর্শ বাহিয়া লগায়া। মনের জালের গঠন—কবির শিক্ষা, সাধারণ ও জাতির উপর নির্ভর করে। তাহা ছাড়া মানুষ বতঞ্চক না। একেবারে সমতারের সমত শিকড় মন হইতে আমূল ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিতেছে—ততঞ্চক এমন সাহিত্য তাহার কল্ম-বলে স্তম্ভ হওয়াই সম্ভব নহে, যাঁহা কি না সকল রকম সাধারণ বা উদ্বেগের বাহ্য-ভৌগার বাহিরে গিয়া পড়ে। তবে এমন হইতে পারে—যে, লেখক হয় তো নানা রকম চিন্তা ও মতাবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া, মনকে কেন্দ্রগত করিতে না করিয়া মানবজীবনের অন্তর্নিহিত চিরন্তন মূল সম্যকগুলি সম্বন্ধে কোন রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া, যাঁহা আঁকিতে চেষ্টা করেন তাহার মধ্যে ইতিমধ্যে উঠে কেবল কতকগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ মতামত ও সমতার চর্ভেজ কুহেলিকাতরঙ্গপে। ইহাতে না হয় লেখকের কোন বুঝন মানসিক উন্নতি, না হয় পাত্রদের বা দর্শকের অন্তরের পরিচুষ্টি। সাহিত্য বসন সত্যেরই স্ক্রুতম সাদন-প্রণালী, তখন সত্যকে পরিষ্কৃত করিয়া বুঝান চেষ্টাই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পক্ষপাতবিহীন হওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা নহ, বরং আমার বিচারে যাঁহা সত্য ও ভ্রায় সমস্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, আমার পক্ষে অপক্ষপাত হওয়ার চেয়ে সেই ভ্রায় ও সত্যের পক্ষাবলম্বন করাই সাধুতার ও মৎসরের পরিচায়ক।

খুদুই ভাল ভাল উপদেশ মানুষকে কখন প্রকৃত উন্নত করিতে পারে না। মানুষ চার মাহুয়ের জীবনের পরিচয়। সেই সব ভাল ভাল উপদেশগুলো মানুষের নিম্নের জীবনে ক্রিান্তবে অকলিভিত হইয়াছে—মানুষ তাহাই জানিতে চাহে। গীতা ও উনিশদশের কাব্যক্ষেত্র-মুষ্টিমেয় যোদ্ধার মধ্যে লীলাম্ব—কারেই মানুষের ঐ সার্বজনীন জিজ্ঞাসা-বৃত্তির পরিচুষ্টি-স্বাপনের জন্ম, প্রয়োজন হয় সাময়িক-মহাভারতের, প্রয়োজন হয় শকুন্তলা-উত্তরামচরিতের। সে যে সাহিত্য মানুষের এই দাবী মিটিহিতে না পারিলে, মানুষের দৃশ্যের কাছে সে সাহিত্যের কোনই আবেদন থাকিতে পারে না।

সকলেরই জানেন, গিরিশচন্দ্রের এতাত্ ক নাটকখানি এক একটা মূল ভাবের ক্ষুণ্ণি বা বিকাশ। সেই ভাব একটা

বা দুইটা চরিত্রে আশ্রয় লাভ করিয়া, কেমন করিয়া নানা অস্থূল প্রতিচ্ছল ঘটনাক্রমের সাধারণ ভাবে দুইটা উঠে—গিরিশচন্দ্র নাটকগুলি তাহারই এক একটা জীবন্ত আলেখ্য। যে চরিত্রগুলিকে গিরিশচন্দ্র নাটকের কেন্দ্রগত ভাবমুষ্টি জন্মে আঁকিতে চাহেন—তাঁহাদিগকে তিনি নানা-রকম অস্থাবর ভিতর ফেলিয়া যাঁচাই করিয়া লন। পাণ্ডব-গৌরব নাটকে অরুণা ও ভীম চরিত্রই নাট্যনিহিত ভাব-বস্তুর প্রমুখ প্রতীক। হুজুরা সেই ভাবের নারী-বিগ্রহ—এবং ভীমসেন নর-বিগ্রহ। একই ভাবের দুই নকম অভিব্যক্তি। হুজুরা, জগতের মাতৃশক্তির পালনী-শক্তির বিকাশ—ভীম, জগতের পৌরুষশক্তি—ব্রহ্মশক্তির সাংগত ও সাংগত প্রকাশ।

প্রথমে হুজুরাকে যখন আমরা দেখিতে পাই—তখন তিনি যেন আগুন-ভারতম-প্রাণের ফলাফল সম্বন্ধে কতকটা সন্নিধান—অমঙ্গল আশঙ্কার কিছু চিন্তা-ব্যাকুলিত। রুদ্ধ তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন—

চাহ যদি পাণ্ডব-কল্যাণ,  
পাণ্ডব-খরগী তুমি,  
ধর্ম মতি রেখ চিরদিন—

কারণ, যাঁহারা ধর্মবলে বধী, তাঁহাদের—“জিতুয়েন শক্তি কার পরাজিতে” হুজুরার চিত্ত তখন চঞ্চল—রুদ্ধ বলিলেন—

তন ভদ্রা, সার ধর্ম আশ্রিত-পালন,  
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় এদান।

এই বাণেই নাটকের ভাবের বীজ রোপণ করা হইল। হুজুরা তখন জানিতেন না যে এই ভাবের বীজ তাঁহারই জীবনে বিকসিত হইবার জন্ম অতি সন্নিকটেই প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার পর, আত্মদনেমুখ দৃষ্টিকে নিঃসংশয় আশ্রয়-প্রদান, কোন বিধা নাই কোন ধম নাই, সর্বপ্ন বিদগ্ধন করিতে ও অকুচিত—হুজুরার সে এক অপকূর্ণ মাতৃহৃদি! দৃষ্টিকে আশ্রয় দিয়া হুজুরা সে কথা আর কাহাকেও নিবেদন করিলেন না—এমন কি অর্জুনাৎকেও না—ভীমকে আদিয়াই সব কথা খুলিয়া বলিলেন। হুজুরা ভীমকে চিনিতেন। ভ্রৌণদীর অপমান, তাঁহা অনেকেই

যেঁহাছিল—কিন্তু কেইবা চর্যোদন-ভ্রাসনামকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—কেইবা জয়প্রথকে সমুচিত শানন ও কীচককে উৎকল শিক্ষা দিয়াছিল—আর কাহাকেই বা মাতা রাক্ষসের ক্ষুদ্রিত্বের জন্ম পরার্থে মরণের মুখে গিয়া দিয়াছিলেন? হুজুরা ভীমকে ভালভাবেই চিনিতেন। তাই, তাঁহাকে বার্ষ-মনোনাথ হইতে হয় নাই। ভীম ব্রাহ্মধুকে আশীর্বাদ করিলেন—

ধন ধন দয়াময়ী আশ্রিত-পালনী,  
জগদ্ব্যতা অভয়া-বরুণা ভবে!  
জন্মের লহ আশীর্বাদ,  
ধর্মদাম চিরদিন পূর্ণ হোক তব!

এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন—

যতপূি বিরোধ কহু ক্লম সনে হই,  
সম্ভব এনয়,  
রক্ষিব শরণাগতে প্রতিজ্ঞা আমার।

—ভাব এইখানে বিস্তৃতির অভিমুখে চলিল। ইহার পর বলদের আসিলেন—হুজুরাকে বিচলিত করিবার জন্ম। বলদের কত ভয় দেখাইলেন, তিরস্কার করিলেন, মেহপ্রকাশ করিলেন—কিন্তু হুজুরার জন্মের ভাব তখন হ্রিস্যভা ধারণ করিয়াছে। ভদ্রা কহিলেন—

চাহ যদি আমার কল্যাণ,  
ত্রীকুক্ষে দুখ্যয়ে কহ,—  
প্রাণসম অধিনী দণ্ডার,  
অন্যায় কি হেঁচু সাধ করিতে হইবে?

চক্রী অন্তরালে বসিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু বলদেরের কোপ এ কথাই বিগুণ জলিয়া উঠিল। তিনি গাঙ্গি দিলেন—“জন্ম তোম পাণ্ডব-বিশাখ হেঁচু” আর বলিলেন—“ভদ্রী আর নহ তুমি মম” কিন্তু হুজুরাকে টানানো গেল না। হুজুরার সেই একই ভাবের কথা—

সর্বদানে নাহি মম ভয়,  
চিন্তা, পাছে ধর্ম-ভঙ্গ হয়!  
চিরদিন কেবা রয় ভবে?  
আছে কত জন পতিপুষ্করী।

প্রকৃত সাক্ষী যে—প্রকৃত জ্ঞানী যে, সেই একধা বসিতে পারে। হুজুরা শুধুই ভাব-প্রবণ নহেন, তিনি দৃঢ়চরিত্র। কিন্তু এখানেও হুজুরা-চরিত্রের সবখানি পরিচয় দেওয়া হয় না। সচক্ষেই জীবন উৎসর্গ করিলে, উদ্বেগ যে জন্মক্ল হইবেই এ বিশ্বাস হুজুরার মনে তখন হয় নাই। সেইজন্যই ‘কল্লুকী’র প্রয়োজন হইয়াছিল।

মহাশক্তির আরাধনা করিতে হইলে যে বিশ্বাসের আলোকে চিত্তকে সর্গীয়ে দৌড় করিয়া হইতে হয় এবং বিশ্বাসের বলে পরম মূর্খও যে, প্রতিজ্ঞাকে পথ দেখাইয়া লইয়া বাইতে পারে এ চিত্র গিরিশচন্দ্র আঁকিলেন না তাঁহা আঁকিলেন কে? কল্লুকীর করস্পর্শে হুজুরা-চরিত্রের যে পরিবর্তন ঘটিল তাঁহা অদৌকিক হইলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না। আরও একটা জটিলতর ঘটনা ঘটিল হুজুরার এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা সপ্ৰমাণ করিয়া দিল। প্রত্যাখ্যাত দণ্ডী প্রতিশোধ-মানসে উর্দ্ধশীকে ঝুঁকুর হাতে গিয়া দিতে চাহিল। এই ঘটনার সকলেরই টনক নড়িল। সকলেই ভাবিল—যাক এই বিপদটা যখন অতি অন্তরে উপর দিয়া কাটিয়া বাইতেছে, তখন আর বৃথা বিবাদ-বিসাংয়ের প্রয়োজন কি? মানুষ এমন করিয়াই গোঁজামিল দিয়া অনেক গোঁজামাল এড়াইতে চাহে। হুজুরা বলিলেন—

দণ্ডী আছিল আশ্রয়ে, পেয়ে ভয়—  
হয় যদি অরির আশ্রিত,  
অধিনী রতন তার রাগ-প্রয়োজন;

সত্যই যে, যে হাভসেরের ঘাণান-সকল, জন্ম সমস্ত দেবদৈতিকে’ আল তাঁহার সমুদ্র-গমের আকান করিয়াছেন একটা কাপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার তাহা বার্ষ হইয়া যাইবে? হুজুরার মনে এতটা কণ্ডভঙ্গ নহে। ভীম ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। হুজুরা ও ভীমের সমবেত শক্তি, বৃদ্ধ পিতামহের নির্দোষিতাপ্রাণ উৎসাহ-বলিতে নব-ইন্দ্রন যোজনা করিয়া দিল।

প্রথমে যখন পলাতীরে দণ্ডীকে হুজুরা আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন—সে আশ্রয়-প্রদানের ভিতর হুজুরার কর্তব্য-পরায়ণতা ও নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল



কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা বিস্তৃত হইয়া হুজুরা-চরিত্রের যে কি পরিণতি সাধিত হইয়াছিল—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় দণ্ডীকে দ্বিতীয়বার কুমার দ্বারা, প্রথমবার দ্বারা পুত্রের মত আপন করিয়া লওয়ার ভিত্তি।

দণ্ডীর ধারণা ছিল—উর্ধ্বশ্রীকে সত্যসত্যই যেন তিনি বুঝি ভালবাসেন। হুজুরা সেই ধারণার মূলে এক প্রচণ্ড নাড়া দিয়া যে কথাগুলি দণ্ডীকে শুনাইলেন— তাহা কেবল প্রাণহীন কতকগুলি হিতবাণী নহে— হুজুরা-চরিত্রে সমস্ত শক্তি তাহার ভিতর প্রজ্জ্বল রহিয়াছে—

যদি প্রেম হইত বিকাশ,  
হেরি তার বদনে নিরাশ—  
অশ্রুধারা স্রবিত তোমার।  
দুঃখভার মোচন কারণ,  
কায়মন করিতে অর্পণ।  
পরদুঃখে শিক্ষা কর আশ্ব বিসর্জন,  
ধন্য হবে মানব জীবন!  
আশ্রয়ালী পার মাত্র আনন্দ—আশ্রাদ,  
নহে বিবাদ—বিবাদ-বিবাদ—  
পুত্রিত এই দ্বার!

হুজুরা-চরিত্রের তাঁরা আলোচনা এইখানেই শেষ করি। শক্তিশালী ও শ্রদ্ধাবান সমালোচক পাণ্ডব গোরবের প্রত্যেকটা চরিত্র লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলে নিঃসন্দেহ সে সমালোচনা রসিক বর্ণের উপভোগ্য হইবে। দণ্ডী-উর্ধ্বশ্রী, দুর্দাসা-নাগদ, শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্যর, সাত্যকি-ভীম, যুধিষ্ঠির, ভীম-দ্রোণ-কর্ণ-দ্রুপদ-শকুনি, কুন্তী-দ্রৌপদী, কল্কী ও এমন কি সেই অশ্বপাল ও তাহার পত্নী—এই নাটকের প্রত্যেকটা চরিত্রই কেমন সজীব ও স্বাভাৱমূল্য। বিশেষতঃ ভীমের সেই সল্লা, সবলা, ভক্তিময়, তেজস্বী, ধর্মপ্রাণ ও গর্বোন্নত চরিত্র

এবং কৃষ্ণের সেই—“অতিশু, অতিথল, অতীব কুটিল” অগ্রমের অচিন্ত্যনীয় রহস্যপূর্ণ অপরূপ স্বরূপ—কবি যে কৌশলের সাহিত্য সজ্জিত করিয়াছেন—তাঁহা অজ কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

পাণ্ডব-গোরব-নাটকের আবেদন মানুষের কাছে কখনও পুরাতন হইবার নহে। বুদ্ধিমান ও বিবেচক মরণ-জরী অথচ ভীতি-বিহ্বল দেবতারা, মানুষের চার ধর্মকে পদাঙ্গিত করিবার জন্ত, যে শক্তির শরণ লইয়া ছিলেন, সে শক্তি তাঁহাদিগকে পরাজয়ের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। সংকল্পের অমৃতাণ করিলে— অথবা সংকল্পের সহায়তা করিলে তাহার ফল কখনও অকল্যাণকর হইতে পারে না। তাই যুধিষ্ঠির এবং দ্রুপদ্যোধনের সম্মিলিত শক্তি হরিহরের চক্র এবং ত্রিশূলকেও পরাস্ত করিয়া দিল। এই বিজয়-গৌরব— ইহাই মানব-জীবনের চিরন্তন ও চির-নূতন সত্য। বর্তমান ভারতের চোখের সামনে এই সত্য উজ্জলভাবে আঁকিয়া ধরিবার প্রয়োজন আছে। তাই—আটাশ বৎসর পূর্বে বঙ্গের রঙ্গমঞ্চ যে নাটক সর্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল এখনও তাহার অভিনয়ের আবশ্যকতা থাকিবে, এবং এমন কি সে সাংগ্ৰাম-শেষ হইয়া গেলেও ইহার সৌন্দর্য্য কখনও অল্পপরিমাণে হইবে না। ভীম-দেবের এই কথাগুলি মানুষের জীবন-সংগ্রামের চিরকাল মুমুর্ষবরূপ হইয়া থাকিবে কারণ এইখানেই মানুষের প্রকৃত গোরবের চিত্তস্তন মায়ায় নিহিত আছে—

তুচ্ছ কর জয়-পরাজয়—  
দুঃখ-স্বপ্ন গণে নীচ জনে।  
কিন্তু মহামুখপ্রার্থী যেই ভাগ্যবান নর,  
কৃতান্তত না করে গণনা,  
কল্প দেয় ধর্মলক্ষ্য করি।

## সুন্দর জীবন

ত্রীপোপেখর সাধা

আজি মোর জীবনের সুন্দর প্রভাত;

শরৎ-শিশির-সিক্ত শেফালির দল,

আমারে করেছে আশ্র উতলা বিভল;

আজি যে মিশ্রিত গোধি এ বিশ্বের সাধ।

দ্বন্দ্বী গগন-বুকে হাসিটি উদার

আমার জীবনে করে কি যে শান্তি পান,

নীরব সে গীতি-তান মাতি উঠে প্রাণ

মনে হয় ও যে মোর কত আপনার!

এ বিশ্বের ঘারে ঘারে আনন্দের বেলা;

অপনি মগন আমি সে বেলায় মাঝে,

সেই ধূলা বালি নিয়ে অপরূপ সাজে

আজিকে দেখিতে চাই এ বিশ্বের বেলা।

ওরা যেন হয়, মোর কত আপনার,

আকাশের তারাগুলি কাননের মূল,

জগৎ শিশুর মুখে হাসিটি অতুল,

পূর্ণিমা চাঁদের শোভা;—অম্ম অন্তরকার!

ওরা যেন চিরসান্নাথী ব্যাধা বেরনার;

রিক্ত নিঃশ্বাসে ঘুগা নীন ওই অসুস্থর,

ওই পানী ওই তাপী চির হায় হায়,

জন্ম জন্ম চির যুগ—কত আপনার।

ধরণীর বুকে বুকে যেই হতবাস

সে যে মোর পরিচিত কত পুরাতন

আমার প্রাণের মাঝে একান্ত আপন,

সে যে মোর আপনার ছুঁখের উজ্জ্বল!

এত দিনে গভিরাছি সুন্দর জীবন;

সকলি হৃদয় আজি নয়নে আমার;

পাপ পুণ্য হাসি-অশ্রু কত আপনার,

আজি মোর এ জীবনে আনন্দ-বিশাল।



## জেনেভা-ভ্রমণ

শ্রুত নেবগ্ৰাম সর্বাধিকারী

বধে পথে। শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ১৯৩০

আবার রেল-জাহাজে চলিতে চলিতে যথাস্থান অধিক-  
কথা লিখিবার পাশা। ছেলে-মেয়ে, নাতিনা-নাতনী সবাব  
ইচ্ছায় এই ভ্রমণার্থে কক্ষের। হাতে-চপে বল নাই, মনে-  
শরীরে বল নাই, তথাপি তৃতীয়বার বিলাত-যাত্রার ইচ্ছা  
যে করিতে পারিতেছে সে সময়ে সময়ে ছই এক ছত্র লিখিতে  
পারিবে না একথা শুনিবে কে? যাহারা তাহা দেখিতে ও  
পড়িতে চায় তাহাদের জন্য এ চেষ্টা—সাধারণ পাঠকের  
জন্য নয়।

যে দিন বাসালার গবর্নর হুগ হিউ ট্রিন্ডেনসন বড় লাট  
লর্ড আরউইনের পুত্র হইতে জেনেভা গীণ অব নেশনস্  
বাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত আহ্বান ও  
নিমন্ত্রণ করেন, সে দিন হইতে যাত্রীতে কি নির্দেশ উপস্থিত  
হইয়াছে, কত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কত  
বুদ্ধিতে ও বুঝাইতে হইয়াছে, কত করিতে ও করাইতে  
হইয়াছে তাহা যে জানে ও দেখিয়াছে সেই বুঝিবে।  
অপরকে বুঝাইবার ও জানাইবার অল্প প্রয়োজনও নাই।  
প্রতিবারই হয় এই ব্যাপার। তিনবার বিলাত, একবার  
দক্ষিণ-আফ্রিকার যাত্রাও একই ব্যাপার। অতিক্রমও আয়ো-  
জনের ভিত্তি দিয়া করিতে হইয়াছে। অতএব নূতন কিছু  
নয়। তবে এবার মনে পুত্র নিখিল যাইতেছিল। শরীর-  
মন ব্যগ্র ও বাড়ীশুক দৃশ্যের অল্প, এই জন্য বাধা আগ্রহিত  
গুরুতর। কিন্তু ইচ্ছায় তাহা অতিক্রম হইয়াছে।  
বাহারের অল্প তাহারী সকলে অপেক্ষাকৃত ভায়। আমারও  
কয়েক মাস ধরিয়া গুরুতর অল্পের পর শরীর অনেক ভাল।  
কর্তব্যের আহ্বান বলিয়া বাহা মনে করিয়া আসিতেছি ও  
মনে করি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাহারা শেষে মত করিয়া শক্তি ও  
উৎসাহ দিয়া এ গুরুতর কার্যের সহায়তা করিয়াছে,  
তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া ও শ্রীভগবানের চরণে তাহা-

দিসের জন্ত মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া বিদ্যাতি মেলে কাগ  
রাজ দশটার সময় হাওড়া ট্রেনে ছাড়িয়াছি।

বিদায় ও আয়োজনের পাশা কখনই হইতে চলিতেছিল,  
গতকথা তাহা চমক মাত্রার পৌছিয়াছিল। শতজনদের  
সহিত আলাপ আপায়ন শতাধিক রকমের কাজকর্ম  
সাধ করিতে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। সাক্ষ-নয়নে  
সকলে বিদায় দিল। ধর্মকাহিন্তে কাহাকেও পারিলাম না।  
মনে হইল আমিই ইহালাল সকলের নিকট অপরাধী।  
তাই নিশ্চয়ে বিদায় লইলাম।

বাড়ীতে ও ট্রেনে কতলোক আসিয়াছিল তাহার  
সংখ্যা করা অসম্ভব। অনেককে অগিত্তে নিবারণ  
করিয়াছিলাম অনেককে সে কথা শুনিয়াছিল, অনেক  
শুনে নাই। কলিকাতা ও যোগেশ্বরসহিতে মালা-তোড়ার  
অজাব হয় নাই। এখনও এত লোকের দয়া ও মেহের  
পাশ থাকিবার সোভাগ্য পাইয়াছি ইহা অপেক্ষা কি আশা  
করা যাইতে পারে। সমুদ্রমিমে কত রকমের কত  
লোক আসিয়া শুভ ইচ্ছা জনাইয়া গেলেন তাহা বলিতে  
পারি না। নিজের সাংসারিক আয়োজন, পথের  
আয়োজন, পরিজনবর্গের সহিত বীর-হুছে দেখা-শুনায়  
কথা-বাটার এমন কি আরাম-বিশ্রাম ও বাগদা-মান্যের  
সময়ও শেষ পর্যন্ত পাওয়া চুড়ি হইল। বিলাত যাত্রার,  
কি আফ্রিকা যাত্রার কথা মাইরা পূর্ব হইতে করণ কোন  
চকান-নিমানের অভাব্য নাই। অনেকেই শেষ মুহুর্তে জানিতে  
পারিয়া দেখা করিতে আসিলেন। অনিশ্চিত অবস্থার  
যাত্রা হইলে কি না হইবে জানিবার জন্ত অনেক  
আসিলেন। এইরূপে অতি কষ্টে-খেষ্টে আসিবার আয়োজন  
সম্পন্ন হইল। সমুদ্রমিমে অবিশ্রান্ত বৃত্তি হইয়াছে—  
মনে হইল যথাসময়ে হয় তো যাত্রা চুড়ি হইবে। কিন্তু সকল  
রকমেই শেষ কাটাগা গেল।

ওড়ারগাও হুস্মিত মেল ট্রেনে যাত্রা হইল।  
আমার সম্বন্ধী গার জাহাঙ্গীর কদাচী—প্রেসিডেন্ট

কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক আমার বাড়ীতেই হান  
পাইয়াছিলেন। তাহার দ্বািতা হাংকে জুগিয়া দিয়া গেলেন।  
উত্তরে রাজ-সিন্ধুধের স্বপ্নের সকল কথা কহিতে পারিলাম।  
মোমপদাই ট্রেনে রাজা মাধোলালের দৌড়িত নন্দলাল এবং  
চিতকী ট্রেনে প্রভাতচন্দ্রের শস্তর বাবু মণীন্দ্রনাথ মিত্র  
ও কাগ করিয়া গেলেন। বর্মার গবর্নর হুগ চার্লস ইমেনস ও  
বর্মার মধোলাল কদচাচী কর্ণেল গিরিগাঙ্গাদা এই  
বাড়ীতে যাইতেছিলেন। মঙ্গলমতিবাহারীর অসম্ভাব  
নাই। সমুদ্র রাত ও আশ্রয় ক্রমশঃ বৃত্তি হইয়াছে। পাণ্ডু,  
ধ্বজ বন-প্রবেশ সব বাড়ী যৌত হইয়া সব শোভা  
ধারণ করিয়াছে।

খর গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নতাপে দহ এই প্রদেশের নদ-  
সৌন্দর্য মর্দনে ১৯১২ সালে প্রথম বিলাত-যাত্রার সময়  
ওড়িত ও ভীত হইয়াছিলাম, ১৯২১ সালেও তাহাই  
হইয়াছিল। এখন সে বাধা তিরোহিত। ১৯২৫ সালে  
দক্ষিণ আফ্রিকার যাত্রার সময় এ পথে যাওয়া ঘটে নাই,  
কারণ দিল্লী দিল্লী হইতে বেধে সেবার যাইতে হইয়াছিল।

যে পথে বারংবার যাওয়া হয় তাহার নব-সৌন্দর্য  
মরম-পথের পথিক সহজ হয় না। বিশেষতঃ নরম এখন  
নবীন নহে। কার্যক্ষেপে বহু বৎসর সেবার পর মরম  
এখনও যে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে, তাহা শ্রীভগবানের  
পরম দয়ার নির্দশন।

সেই মাদিকপুর' স্টেশন, কটনী, জরুলপুর প্রভৃতি  
শহর পার হইয়া 'গাড়ী' ছুটিয়াছে। নূতন বড় কিছু  
দেখিলাম না। নূতনের মধ্যে নন্দলাল নদীর বর্ষার নবীন  
শোভা দেখিলাম। বন্যা হইলে জল প্রায় লোহার পুলের  
সমান হয়—বর্ষার জুগিয়া উঠিয়াছে, কুলে কুলে জল রহিয়াছে,  
তথাপি পুলের অনেক নীচে। পূর্বে যে পুলে পার  
হইয়াছিলাম, বন্যার তাহা নষ্ট করিয়াছে। তাহার ভাঙ্গা  
দেখা যাইতেছে। নূতন লোহার পুল নূতন বল সকার  
করিয়াছে। গায়ে মাঝে মাঝে ছোট-ছোট গ্রামে চায়া  
কিবা কুণীর দল রেলের ধারে ঘর বাঁধিবার থামারের  
মত জাহায্য পরিবার করিয়া মাইরা দলে দলে নাচ-গান  
করিতেছে। নাজী কতক সাঁওতালী দলের দল। বর্ষার  
প্রাচুর্যে প্রচুর শস্য লাভের আশা তাহাদের এই আনন্দ।

কোট-প্যাটের দাসহ ছাড়িয়া সমুদ্র দিন-রাত ধূতির  
সাহায্যে কাটিতেছে। কদাচী-সাহেবের সহিত নানা  
কথার অঙ্গুষ্ঠাব নাই; তবে নানা কারণে নিজের  
অজাব।

শনিবার, ১৬ আগস্ট ১৯৩০

প্রায় সমুদ্র রাত রুটি হইয়াছে। যথেষ্ট ঠাণ্ডা।  
প্রায় জামা গুলিতে হয় নাই। তবে গাড়ীর অতি দ্রুত  
বেগবশতঃ নিজের মানি যথেষ্ট। সময়ে সময়ে দারুণ  
পতন ও উত্থান অব্যক্তভাবী। নাসিক শব্দে মঙ্গলা হইল।  
গোলাবরী পার হইয়া নাসিক। রাম-সীতা-লক্ষ্মণের  
কতিপুত নাসিক তীর্থস্থান হইতে কিছু দূরে। পুণ্য-  
কথা মরদ-পথে উলিত হইল।

ঘাট পর্ত্তের রেলগেয়ে প্রণালীর কোশলের কথা  
পূর্ব পূর্ববারে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি। তাহার  
পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। হুইজরগাওয়ের আরম্ভ পর্ত্তে  
উত্তিবার ছোট রেলগেয়ে চড়িবার অবশ্য গন্তব্য হয় নাই,  
এবার তাহা হইবে। তাহারই অক্ষরগণে দার্জিলিং-সিমলা-  
রেলগেয়ে নির্মিত হইয়াছে।

বর্ষা বিধৌত ঘাট ও মহালি পর্ত্তের শোভা অতুলনীয়।  
প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিত হইতে হয়। কিন্তু সে মোহের  
এখন সময় আর। নানা মোহে এখন মন সমাজহীন।  
মনে হইয়াছিল সকালে ঘাট পর্ত্তে কিছু বেশী ঠাণ্ডা  
হইবে। তাহা না হইয়া নরম গরম এবং জাহাজে  
উত্তিবার আয়োজনের পরিশ্রমে গরম আরও বেশী বোধ  
হইতে লাগিল। কদাচী সাহেবের সাহায্যে সে পরিশ্রম  
আনেক কম হইল। যেদেহা যত্ন করিয়া বেরণ হুম্বর  
তাকে অল্প হানির মধ্যে আদ্যাব-পতন শুভাইয়া দিয়াছিল  
তাহা আমার অসম্ভব। যা হয় তা হয়, করিয়া যেমন সারা  
জীবন কাটাইলাম এমনিও তাই। কোন কাগড়ের পাট ভাঙিবে,  
ইরি নষ্ট হইবে তাহা তবিবার শক্তি ও সময় করণ  
হয় নাই। এই যা হয় তা হয় করিয়াই পুনরায় ভারতবর্ষ  
ভ্রমণ করিলাম। কল্যাণ-অঙ্গন পার হইয়া সফলতার পাওয়া  
দাওয়া করিলাম।

কদাচী সাহেবকে যথেষ্ট ভাগ দিয়াও তিন বেলা



বাড়ীর ভৈরবী পবিত্র খাবারে দিন কাটিল। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সাধারণকে চাকি ছাড়া আমি তো রেশের খাবার খাই না, তবে দুধে-পুখে ত্র্যাণ্ডী কোম্পানী খাবার দেয় ভাল।

ক্রমে বসের নিকটবর্তী খাড়ি ও উপনগর ম্যাজগাঁও প্রভৃতি পার হইলাম। বধে শহরের

স্মৃতি দিন।

## আঁধারে আশে

( গল্প )

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

এক

আধ-ভোজন দরজাটা একেবারে খুলিয়া শুভ-বসনা এক প্রোতা নারী অঙ্গনে আসিয়া ঝাঁড়াইল। রান্নাঘরের সমুখে বসিয়াই মালতী আগুর খোশা ছাড়াইতেছিলেন; রমণীকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিলেন, 'ঘটক-ঠাকরুন যে? কি ববর?'

ঘটক-ঠাকরুন তাঁহার নিকটে উঠিয়া আসিয়া বসিল। তাহার পর ক্রিষ্টমুখে বলিল—'নতুন ববর আর কিছু নেই মা। আমি সেই মিত্রদের বাড়ী থেকেই এলাম জানতে, কি মত আপনাদের?'

মালতী হাতের আলুটা চার টুকরা করিয়া একটা বাটার জলে কেলিয়া গভীরমুখে বলিলেন,—'না বাছা, সে হ'বে না, বাবুর ইচ্ছে নই।'

'কেন মা এমন স্বন্দর মেয়ে—পরী বলেই হয়।'

'তা সে পরীই হ'ক আর অপরাধীই হ'ক টাকা তো তেমন বেশী দিচ্ছে না। শুধু রূপ দেখলেই তো হ'বে না বাছা, এদিকটাও তো চাই।'

কোটরগত চোখ দুইটা খাশাস্তব বিক্ষোভিত করিয়া বিরক্তিক্রমে পিষরের সুরে ঘটক-ঠাকরুন বলিল, 'বেশী

টাকা মেবে না সে কি কথা মা, নিজে হাতে দশ হাজার টাকা দেব বলেছে। যেরূপে আর দু'এক হাজারেও আটকাবে না; এও তোমাদের পছন্দ নয়? আর কি চাও তা হ'লে?'

'সে তো আগেই তোমার বলে রেখেছি টগর। কুড়ি হাজার টাকার এক পরমা কমে আমি ছেলের বিয়ে দেব না, সেই বুকে তুমি সধক এনো। এ কি কিছু বেশী বলেছি, আমার এমন ছেলে।'

বাধা দিয়া টগর বলিল,—'তোমার কথাই মানলুম মা। ছেলে তোমার খুব ভালো, কিন্তু তাই বলে কুড়ি হাজার টাকাটাও তো কম নয় যে তুমি চাইবে, আর লোকে দেবে। যতই ভালো, ছেলে হোক না কেন, চট করে অত টাকা কি কেউ দেয়, না দিতে পারবে?'

'আমার ছেলে, মেয়ে তো নয়। বলেছি ঐ টাকা চাই তারপর স্বন্দর মেয়ে—বড় বনৌদী ঘরও দরকার।'

'তা' হ'লে আমার কাজ নয় মা। আমি তবো আসি—তা হাঁ মা, বাবুর কি ঐ মত?'

'হাঁ বাছা, আমাদের ছ'জনকার কি ভিন্ন ভিন্ন মত হ'বে, ঐ বা বলেছি। ঐ রকম সধক পাও তো এনো।'



"জননী"—বিলাতি ছবি হইতে



‘উপস্থিত হাঁতে তো নেই, পরেও যে পাব তাও বোধ হয় না।’

‘তবে তুমি এস।’

‘বাই!’ উগর উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—‘তা মা একটা কথা বলব—’

‘কি?’ বীণাখানা কাত করিয়া রাখিয়া মালতী স্নিগ্ধাভ-নেত্রে তাহার দিকে চাহিলেন।

‘বলছি মা, তোমার তো ছেলে ঐ একটা, টাকাও যথেষ্ট আছে। তবে পরের টাকার ওপর এতটা ঝোক কেন? তার চেয়ে একটা সুন্দরী বৌ আন—সব দিকেই ভাল হবে। অত টাকা আর স্বন্দর মেয়ে তুমি কোথাও পাবে না মা, আমি এই কাজে মাথার চুল পাকিয়েছি তো—একথা তোমার জোর করে বলে দিচ্ছি।’

অসহ ক্রোধে মালতীর শ্রামল মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তরকারীর থালা লইয়া দ্রুতপদে রন্ধন-গৃহে প্রবেশ করিয়া জুড়কণ্ঠে বলিলেন, ‘ভবিষ্যতের কথা তোমার মুখ থেকে শুনিবার জন্তে তো আমি ডাকিনি বাছা? কি পাব না পাব, আর কি ভাল হবে—না’হবে, সে আমি বুঝব; তোমার তাতে মাথা-ব্যাকার দরকার নেই তো; আমি সব দিকে মনের মত না হলে ছেলেদেব দেব না, তাতে বে যদি মোটে না হয় তাও ভাল।’

বোম্বেরেই বলন্ত উদানোরে উপর লোহার কড়াখানা বসাইয়া দিয়া মালতী সশব্দে গুস্তা নাড়িতে আরম্ভ করিলেন। সেখানে অপেক্ষা করা অনাবশ্যক বুঝিলেও উগর নড়িল না। দরজার সম্মুখে একটু আগ্রাসর হইয়া কণ্ঠবরটা লাম্যমত কোমল করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—‘রাগ করলে মা? আমি মন্দ কথা বলি নি। বলি কি, যতই তোমার টাকা থাক মা, এই সে রকম ভাবে তো থাক না। ধর না, এই বাতীতে একটা রাঁধুনী কি চাকর নেই, বাবা টাকা দেবে তাহা তো সব দেখবে; তারপর কি বলে যে—ইয়ে—আপনাদের বাবুর ঐ একটুখানি-হা—এই একটুখানি বদনামও আছে।’

মালতী এবার খেঁচা হারাইলেন, গুস্তা হাতে লইয়াই লাকাইয়া উঠিয়া বলিলেন,—‘কি আমাদের বদনাম আছে?’

‘তা মা লোকে যে বলে—’

‘আবাণী সপনাপী কাশাখুদীরা নিজের চোখে দেখুক না আমরা রূপণ কি না—আজ্ঞা বাও বাছা তুমি, যাও ছেলের বিয়ে আমি দেব না।’

‘তা হ’লে—’ উগর কি বলিবার উপক্রম করিতেই মালতী সপজ্জনে বলিলেন—‘কিছুই নয়’ যাও তুমি, আমি ছেলের বে দেব না। হস্তজ্ঞাতিরা, আমার নামে নিম্নে। যদি ভগবান থাকেন তিনিই এর বিচার করবেন—মধুসূদন।’

উগর আর কোন কথা না বলিয়া দীরপদে বাহির হইয়া গেল।

রাগে মালতীর কটীর বদন প্রায় ঘুরিয়া আসিয়াছিল। কাপড়খানা বখাছানে সন্নিবেশিত করিয়া তিনি পূর্কস্থানে আসিয়া বসিলেন। দারুণ ক্রোধে মুখখানা তবনও বিকৃত হইয়াছিল। উগর অবশ্য কথাটা মিথ্যা বলে নাই। শুধু এ পল্লীর নহে, আশেপাশের পল্লীর লোকদের ভিতর তাহার ও তাহার স্বামী ভবেশচন্দ্রের রূপণ বলিয়া দুর্নাম ছিল। এখানকার লোকেরা ভবেশচন্দ্রের নাম, তো বড় মুখে মানিতই না। সাধ্যমত তাহার সান্নিধ্যও বর্জন করিয়া চলিত অকম অধমর্নের গলায় ছুরী দিতে, হুদের হুল তত হুদে পাওনাধারের সর্বধ নিলাম করিতে ভবেশচন্দ্র অধিতীয়। মালতীও পতির বোগ্যা পত্নী। পুত্র স্বহাস দিক পিতামাতার প্রকৃতির উত্তরাধিকারী না হইলেও শৈশব হইতে এ পর্যন্ত জনক-জননীরা শাসনে বড় হইয়া তাহাদেরই ইচ্ছামুসারে চালিত হইয়া আসিতেছে—তাঁহার নিজস্ব বলিয়া কিছুই ছিল না; তবে অনেক সময় উৎসাহিতের দ্বাবে খেদনা বোধ করিয়া অশ্রু-বিসর্জন করিতেও তাহাকে দেখা গিয়াছে। স্বহাস শিকিত—এ বিবরে ভবেশচন্দ্র উদারতা দেখাইয়াছিলেন। উপযুক্ত শিককের তহাবধানে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া তদুপযুক্ত শিক্ষাদানে রূপণতা করেন নাই। তবে পল্লীর চুট লোকেরাও ইহার মধ্যে একটা গভীর উদ্বেগা নিহিত আছে দেখিত। তাহারা বলিত পুত্রের বিবাহের সময় এই শিকার বাবা দাঁও মারিবার জন্ত ভবেশচন্দ্রের এই অপব্যয়। অবশ্য ভবেশচন্দ্র কোনদিন এ সব কথাতে কর্ণপাত করেন নাই। স্বহাস বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার পর হইতেই ভবেশচন্দ্রের গৃহে



কঙ্কাদারগ্রন্থ অভিভাবকের আসা-যাওয়া আরম্ভ হয়। অচিরে—  
ভবেন্দ্রচন্দ্রের কুড়ি হাজার আর মালতীর তাহার উপর  
ডানা-কাটা পরীর কন্যাসুতনিতা, অনেক কঙ্কাদারগ্রন্থ  
অভিভাবকেরা সরিয়া পড়িলেও কয়েকজন তখনও  
নাছোড়াবান্দা হইয়া পরিত্যক্ত ছিলেন। তাই বিবাহের বয়স  
হইলেও হুহাসের তখন পর্য্যন্ত 'আইবুড়া' নাম যুটিবার  
কোন উপক্রমই দেখা গেল না। অবশ্য ভবেন্দ্রচন্দ্রের চৌরার  
কটা ছিল না। কিন্তু সে রকম বড় মাছ সত্যই চারে  
আসিল না। ইহাতে ভবেন্দ্রচন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।  
ভগবানের দ্বারা পুত্র-কঙ্কাদার সূচ্যো তাঁহার। অতি কম—মাত্র  
এক সন্তান, বহুদিন গৃহে ছোট ছেলে-মেয়ের আনন্দ-  
কোলাহল উঠে নাই। তাঁহার নিজের পুত্র-কঙ্কাদার মত  
আশা না। কাজেই ছদ্মের সাই ঘোলে মিটাইবার আর  
তাঁহার পোস্ত-পোকারি মুখ দেখিবার জন্ম প্রাপ্তি আসিল  
হইয়া উঠিল। কিন্তু, সে সাথ মিটে কই? তাঁহাদের যে  
দুর্ভিক্ষা পূর্ণ—বিশ হাজার টাকা আর দুকরী  
কড়া চাই।

টারফটকারি কথার মালতী অত্যন্তই চটয়া উঠিয়া  
ছিলেন। তাঁহারই গৃহে পাঁড়াছাড়া তাহাকে কথা ওঝা  
যাওয়া। 'স্পষ্ট তো কম নয়। ইহারা ভাবিয়াছে কি?  
তাঁহার পুত্র অমন সোণের চাঁদ ছেলে, তাঁহার জন্ম কুড়ি  
হাজার টাকা কি কিছু বেশী বলা হয়।' (আজ)  
বিবাহটা এক বাগদার হইয়া ব্রাক তারপর—। ভবেন্দ্রচন্দ্র  
আসিয়া হারের পাঁড়াছাড়া। গুস্তি-চালনা বন্ধ রাখিয়া  
মালতী বামীর দিকে চাহিতেই ভবেন্দ্র বলিলেন, 'মাকের  
বরের ভাড়াট্টো ভাড়া ধিরেছে?'

নীচেকার খান হই বর বাদ দিয়া বাকি বরগুণা  
ভবেন্দ্র ভাড়া দিলেন। ভাড়া আগার করিবার ভার  
ছিল মালতীর উপর। বর ছিল অনেকগুলি—চার পাচটা  
পরিবার ছই একবারি করিয়া বইয়াছিল। এভাবে যাগরা  
গাকে তাহাদের অবস্থা অস্বপ্নের। ভাড়ার টাকাসম্বন্ধে  
মালতী দেবী কিছু কখনও কাহাকে কিছু মাফ করিয়াছেন  
বসিয়া দেখা যায় নাই। মাস শেষ হইতে না হইতে  
পরমাটা পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া তিনি আদায় করিয়া লইতেন—

বিপদ-আপদ, অস্বপ্ন-বিস্ময় কিছুতেই তিনি ক্রোধান  
করিতেন না।

বামীর প্রসন্ন রূপেই মালতী বলিলেন,—'না, সে আমি  
কিছুতে পারদূর না। বাবার বাপ তো শ্যামাশারী—মেয়েটা  
কেইদেই অধির। বলে বাবা তো শুনে। এমাসে মাইনে  
পাওয়া যায় নি বাব কি করে? কিছুদিন সময় দিন।'

কম মধ্যে অগ্রদূত হইয়া ভবেন্দ্র বলিলেন,  
'সময় দিন, এ কি মামার বাড়ীর আবদার না কি? ঘটা-  
বাটা টেনে আনতে পারলে না। না—না, ওসব চালাকি  
আবার স্পষ্ট চলবে না। মাস শেষ হয়েচে কবে, এমাসের  
আজি বোল দিন হ'ল, এখনও বলে সময় দাও। মজা  
আর কি? না, এমন সব হাড়-হাওয়াতে ভাড়াটে জুটেছে  
আমার কপালে, বত সব লক্ষীচাঁড়া বা বলেচ, এমন দেখি নে—  
বাড়ীর ভাড়াটা আগে দে তারপর আর কাছ। তা ম,   
বলে অস্বপ্ন। আরে তোর অস্বপ্ন তাকে আমার কি—  
আজ্ঞা দেখাচ্ছি আমি, কেমন অস্বপ্ন—'

ভবেন্দ্রচন্দ্র অস্বপ্নবর্তী একটা গৃহ লক্ষ্য করিয়া অগ্রদূত  
হইলেন। মালতীও কিপ্রভাবে হাতটা ধুইয়া তাঁহার  
অঙ্গপদন করিলেন। প্রশস্ত দালানের পর একখানি  
ঘর। পুরান সেকলে বাড়ী বরগুণার প্রায়ই-রোস্তে বাতাস  
প্রবেশ-পথখিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁহারই একটা ঘরে  
একটা বোল-সদর বছরের মেয়ে লোহার চোট উঠানো  
পুরান সোফা পজ আঁখিয়া একটা এলুমিনিয়ামের বাটার  
মধ্যে বানিকটা সাবু সিদ্ধ করিয়া বহিষ্ঠেছিল। নিকটেই  
একটা জীর্ণ শয্যা ততোধিক জীর্ণবায় এক বাজি থাকিত।  
সে জায়গায় ছিল, ভবেন্দ্রের কপাওয়া তাহার কাপে  
আসিতে কিছুমাত্র বাধা পায় নাই। সাবুর বাটীটা  
নামাইয়া মেয়েটা ডাকিল, 'বাবা।'

'বাবা মা!'

শ্যামাশারী ব্যক্তির কোটরগত প্রভাহীন চকুর কোথ  
বইয়া ছই বিম্ব অশ্রু মলিন উপাধান সিক্ত করিল। বাবারও  
চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। আপনাকে কথামাত্র  
সম্মত করিয়া পিতার দিকে চাহিয়া ক একটা মাখনার  
বাগি উজ্জ্বল করিতে প্রিয়াই সভয়ে বাঁধা শুরু হইয়া গেল।  
ভবেন্দ্রচন্দ্র দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

ভীষ্ট দৃষ্টিতে একবার ঘরের ভিতরটা দেখিয়া হইয়া বুঝাব-  
সিদ্ধ পত্রার বরে বনিলেন, 'বাবি তোমার মতলব না  
কি হে ভূপেন।'

ভূপেন ছই একবারের চোঁতার ঔরুকে অত্যন্ত অসুখ-  
বরে বাধা বলিল, তাঁহা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল না।  
ইহাতে তিনি আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

'কি বলছ সেটা স্পষ্ট করে বল, না হ'লে বুঝব কি করে?  
মাস পণ্ড তো হুই আজ মাসের তো আরেক হ'লে গেল  
এখনও হ'লে তুমি ভাড়া দিলে নি, কি মনে করে? দেখছি  
তো অস্বপ্ন। এ অস্বপ্নার নাশিল করে' তো তোমার  
পক্ষে বড় সুবিধে হ'বে না।'

পিতা-পুত্রী উভয়েই সারসে শিহরিয়া উঠিল। ভূপেন্দ্রের  
ওঠে কথা আর আসিল না, রিষ্ট বিষয় নেয়ে তপিন কঙ্কাদার  
দিকে চাহিলেন।

ভবেন্দ্রচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শান্ত কর্তে বাঁধা বলিল,  
'বাবার কি রকম অস্বপ্ন তা'তো দেখছেন জ্যাঠাবাবু।  
দুশাশ বিজ্ঞান পড়ে একটা পরমা বরে আসছে না, তাই  
সময়মত ভাড়াটা দেওয়া হয় নি।'

ভবেন্দ্র প্রচণ্ডভাবে একটা ধমক দিয়া বলিলেন, 'তুমি  
খাম তো কাঁজিলে দেখে। বড় 'লেকচার' দিতে শিখছে  
দেখাচ্ছে। ওসব জানি না; ভাড়ার টাকা এখন দেবে  
কি না শুনতে চাই?'

অতি কাঁপতেই এবার ভূপেন উত্তর দিলেন,—'কি  
করে দেব দাদা দেখছেন তো—'

'ঐ, আবার ভূমিও নাকে কানতে হুক করে?' বলি  
বলি ঘরে টাকাই না হয় নাই, জিনিষটা-পত্রটা আছে তো?  
তাই একটা বেচে কিনে আমার পাওনা ফেল দাও না  
ভূমিও নিশ্চিত হও, আমিও হই। অন্যরকম একটা ঝগড়া  
রাখা বই তো নয়। আমি পরীষ মাখন সময়মত ভাড়াটা  
না পেলে আমার চলে কি করে? সেটাও তো একটু  
বিবেচনা কর্তে হয়। ঘরের দিকে চোরে কান  
করতে হয়।'

'অজ্ঞার অর্থ কখনও করি নি দাদা তা'তো আপনি  
জানেন। আজ চার বছর থেকে যেমতীকে নিয়ে আপনার  
বাড়ি আছি। সামান্য চাকরী, চরিশটা টাকা পাই, তবু

মাস কাবার না হ'তে হ'তেই আপনাকে ভাড়া দিয়ে  
দিয়েছি এবার নিত্যন্ত দায়ে পড়ে—'

ভবেন্দ্রের প্রবল কঠরবে ভূপেন্দ্রের কাঁপকণ্ঠ গাঙ্গিয়া  
গেল। তিনি বলিলেন,—'ওহে দাদা যেমন তোমার, তেমনিই  
আমারও আছে তো। আমারই টাকা না পেলে চলে  
কি করে তাই বল তো।'

'ও কথা বল না দাদা এই সামান্য কটা টাকা—'  
ভবেন্দ্র রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন,—'তোমার কাছে  
সামান্য হ'তে পারে কিন্তু আমি তো বড় মাখন নই।  
আমার কাছে ঐ অনেক; এই ভাড়ার কটা টাকাতোই  
আমার সাধারণ চলে। এ কথা অতি সত্য।'

ভবেন্দ্রচন্দ্রের কথাটা কতকটা সত্য, কারণ ভাড়ার  
সমস্ত টাকাই তাঁহার সঙ্গার খরচে যায় হইত না, অধিকাংশই  
ব্যাকে গিয়া প্রান্তিালে অমার বর বৃদ্ধি করিত।

ইহার কথা কহে না দেখিয়া ভবেন্দ্রচন্দ্র আবার বলিলেন,—  
'তা হ'লে আমার নাশিলই কর্তে হ'বে?'

অর্ন্ত ভূপেন্দ্র বলিল,—'আপনার আশ্রয়ে এতদিন  
আছি দাদা, আমার প্রাণে মারবেন না, কি বল উপার  
থাকলে কি আমি আপনার টাকা ফেরে রাখি, ঘরে একটা  
অধাধা পর্য্যন্ত নেই, মেয়েটা দুদিন এক রকম না থেয়ে  
আছে। ঐ ঘরের নবীনাবাবুর স্ত্রী একটু দরদ করেন এটা-  
সেটা কেন—'

বাধা দিয়া ভবেন্দ্রচন্দ্র বলিলেন,—'হ্যা হ্যা অমন  
দয়া-ধর্ম আমি জের দেখেছি। আমার স্ত্রী দয়া-ট্যা নেই;  
শায়েই আছে আর রেখে ধর্ম। তা না'ক তোমারা  
যখন ভালভাবে দেবে না, তখন বাধা হ'য়েই আমাকে  
কোটে' বেতে হ'বে। আদালতের লোক এনে অশ্রমান  
না করে' তো হ'বে না ভালভাবে টাকা ভূমি দেবে  
না তো?'

ভূপেন্দ্র নিম্নীকাবে মত বিজ্ঞানার উপর পড়িয়াছিলেন,  
কথা বলিলেন না। অধীর ভাবে ভবেন্দ্রচন্দ্র বলিলেন,—

'তা হ'লে কি বল টাকা দিয়ে দেবে?'

'হ্যা জ্যাঠাবাবু আমি যা হোক কিছু দিতে করে, আজ  
বা কাল আপনার টাকা দিয়ে দেব?'

'সত্যি বলছ তা?'



‘মতিহই বলছি।’

‘বেশ তু হ’লে তাই দিও, তা দেখে বিপা যদি সোণা-রশোর জিনিস কিছু হয় তা হ’লে আমার কাছেই নিয়ে এস আমি স্থবির করে দাম দেব এখন। তোর ভাগ্যে জড়ই বলাহি। ছেলে মানুষ, কাকে দিবি। কে ঠকিয়ে নেবে।’

‘বড় নাড়িয়া বিপা বলিল—’আচ্ছা তাই বাবা।’

‘তাই আসিস, দেখিস ঢালাকি কতই বাসি যেন। আচ্ছা সন্ধ্যার মধ্যে। টাকা আমার চাই না হ’লে বাধ্য হ’লে কাল আশালভে যেতে হবে।’

‘আজই টাকা দেব।’

‘বেশ বেশ’ বলিয়া জটমনে, পরীসহ ভবেশচন্দ্র প্রস্থান করিলেন—

বিপা দারুণ বাটীটা তুলিয়া পিতার শয্যাপাশে আসিয়া বসিল। বহুকাল কেহই কথা বলিল না; আবার ক্ষীণ-কণ্ঠ ভূপেন্দ্র বলিলেন,—‘টাকা তো। দিবি বলি কিছু ঘরে তো আর বিলুই’ ‘নেই—বা কিছু সব তো আমার চিকিৎসার খরচ করি’; বারণ কল্পম শুনিল না, এখন কি করি বল দেখি।’

একটা হাত তুলিয়া বিপা বলিল, ‘আমার এই চুড়ী হটোর কত হ’বে বাবা? তিন ভরি সোণা এতে ছিল না? খুব কম হ’লেও টাকা পঞ্চাশ পাব, না?’

‘তোর চুড়ী কেবলি? বিপা! বিপা!’

‘তা’ হলোই বা, বাঁবা। তোমার অঙ্গুর ভাল হ’লে আমার গড়িয়ে দিও। দেখত ভবেশচন্দ্রা কি কল্হেন।’

ভূপেন্দ্র কথা বলিলেন না। বড় বড় অঙ্গুর বিলু উহার কপাল বহিয়া ‘নাহিতে লাগিল।’ বাস্তবতাবে বিপা বলিল,—‘কি ছেলোমানুষী করছ বাবা। নাও সাবুটা খেয়ে ফেল। অঙ্গুর-বিশুণে সকলকারই এ রকম হ’য়ে থাকে বাবা লম্বীটা কেন না।’

পিতাকে সাধনা দিতে গিয়া সেও আকুলভাবে কাঁদিয়ে লাগিল।

তিন

সন্ধ্যার অনতিপূর্বে শূন্য প্রকাণ্ডে মান মুখে ঘরে আসিয়া বিপা বিছানার বসিয়া পড়িল। ভূপেন্দ্র তার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—‘বিপা! অমন করে এসে বসলি কেন না? কি হয়েছে?’

বিপা উত্তর দিবার চেষ্টা করিল না। শোকে রূপে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। নীরবে নতনেজে চাহিয়া সে আশ্বিনকে মাংস করিতে চাহিতেছিল।

বাস্তবতাবে ভূপেন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—‘কথা বলিস না কেন রে? কি হয়েছে?’

পিতার ব্যগ্ধভাবে জ্ঞত হইয়া একান্ত চেষ্টা করিয়া আপনাকে কতকটা শান্ত করিয়া লইয়া বিপা বলিল,—‘বাবা!’

‘কি মা কি হয়েছে?’

অশ্রুজল কণ্ঠে বিপা উত্তর দিল,—‘ভবেশচন্দ্রা একটা টাকাও আমার দিলে, না। আমি যে ভবেশচন্দ্রের ঐ টাকা’ পেলো তোমার বড় ডাক্তার দেখাব, তা ছাড়া কাল তোমার কি খেতে দেব? আর যে একটাও পরমা ঘরে নেই বাবা; আমি যে বড় আশা করেছিলাম চুড়ী বিক্রির টাকায় ভাড়া দিয়েও আমাদের মাসখানেক চলে যাবে।’

‘কি বলেন ভবেশবাবু? কত টাকা হ’ল ওতে।’

‘তিনি বলেন ত্রিশ’ টাকার বেশী এত দাম হ’বে না, তা এ টাকা আমার কাছে থাক, মাস ও তো শেষ হবে এল। সামনের মাসের ভাড়াটাও নৈরে রাখণুম; তাদের পকে সে তো ভাঙই। ভাড়া দেওয়া রইল কোন হাদাম পাছরে না। পাঁচটা টাকা চাইখুম বাবা। তোমার পণ্যের জন্তে, তাও তিনি দিলেন না, আমার বকে উঠলেন। এখন হ’লে জানলে কখনও ওর হাতে জিনিস দিতুম না। পঞ্চাশ টাকার জিনিস মোটে ত্রিশটা টাকায় নিয়ে নিলেন।’

ভূপেন্দ্রনাথ ব্যথিত বেদনা প্রাণপথে বক্ষের মধ্যে চাপিয়া শুদ্ধভাবে শয্যার উপর পড়িয়া রহিলেন। বাহিরে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ক্রমশঃ জমিয়া গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। অন্ধকার গৃহে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার নামিয়া সমস্ত স্থানটা দৃষ্টের অগোচর করিয়া দিয়াছিল। সেই বিকট নিবিড়

অন্ধকারের মধ্যে গভীর ব্যথার ভায়াস্ত চিত্র পিতা-পুত্রী নীরবে বসিয়া রহিল

বাহ্যের মাংসাতী কণ্ঠ শুনা গেল।

‘হারে বিনি ওর সঙ্গে কি এত কথা কচ্ছিস?’ ঘরে সন্ধ্যাটাও আলভে পারিস নি, আচ্ছা আগসে যেতে তো; সন্ধ্যা বেগা ঘরে সন্ধ্যা না পড়লে যে লম্বা ছেড়ে বাধ, তাও কি জানিস না। তোরা ভাড়াটে দোব তো তাদের হ’বে না হ’বে আমার; একি অনুক্ষেণ কাও। তাদের অঙ্গুর-বিশুণ বসে কি আমার ভাল-মন্দটা দেখতে হবে না। ওঠ উঠে বোরে বল দে সন্ধ্যা আল; অন্তবজ মেরে তার যদি একটু আকুল-বিবেচনা আছে।’

বিপা জড়ভাবে উঠিয়া অন্ধকারের মধ্যেই থুঁতিয়া বেশালায় মাগিল। প্রাণীপের রণী কথি অন্ধকারের বুক চিরিয়া কাল ব্যপড়ে জরির রেখার মত বুক বুক করিয়া উঠিল। দরজার দিকে বিপা চাইল। মাংসাতী অন্তরিত হইয়াছিলেন। কিছুকাল নীরবে সেইভাবে চাহিয়া থাকিয়া কিরিয়া আসিয়া সে পুরাতন জীর্ণ টাকার থুঁতিয়া একখানা বহুদিনের ব্যবহৃত পাশী শাড়ি বাহির করিল। কাপড়খন হাতে লইয়া বহুকাল সে সেই দিকে চাহিয়া রহিল—এখানি তাহার মার। স্বপ্নীয়া জন্মনার স্থতি বলিয়া কাপড়খনি বহুদূর সে রাখিয়া ছিল। পরিত্রের গৃহে জন্মনার চিত্র বা অজ কোনও চিত্র ছিল না। সামাজ্য বন্দনাখানিই একমাত্র স্থতিচিহ্ন। মায়ের কথা মনে পড়িলে সেইগুলো নাড়িয়া চাড়িয়া সে তৃপ্তি বোধ করিত। আচ্ছাও কাপড়খনা হাতে লইয়া তাহার অঙ্গুরের কথা চিন্তায়া হইয়াছিল। টাক খোবার শব্দে তাহার পীড়িত পিতা একবার চাহিয়া দেখিলেন। বিপাকে একইভাবে লাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—‘কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন বিপা?’

চমকিয়া চাহিয়া বিপা বলিল,—‘বাবা আর তো কিছু আজ ঘরে নেই, দেখি ঐ কাপড়খনা নিয়ে কেউ যদি কিছু নেয়। নইলে আজ রাতে তোমার কি খেতে দেব?’

‘ওখানা ও নষ্ট করবি বিপা? নিজে তো গেমুই কিন্তু তাকেও—’ বাপুরু কণ্ঠে এইকৃন্দায় বলিয়া ভূপেন্দ্র আর কথা শেষ করিতে পারিলেন না।

পিতার শয্যাপাশে বসিয়া পড়িয়া বিপা বলিল,—‘ও কি,

ও কি বলছ বাবা? না না, তুমি সেরে উঠবে, নিশ্চয় সেরে উঠবে নইলে—আমার—’ বলিয়া পিতার বকে ধূপ রাখিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।

চার

মাংসাতী দান করিয়া উপরে আসিতেই হাসির ছটায় আর্কশ বিবৃত করিয়া ভবেশ বলিলেন,—‘আর কি মাংসাতী বাচ্ছিমতা?’

কথাটা ঠিক না বুঝিয়া বিস্মিতভাবে মাংসাতী বলিল,—‘কি?’

‘বাজি মাং, বাজি মাং, খোকার বিয়ে ঠিক হ’লে গেল এই সামনের বেশেই।’

ব্যগ্ধভাবে মাংসাতী জিজ্ঞাসা করিল,—‘কোথার ঠিক হ’ল? কখন ঠিক করলে? এই তো এই মাত্র তাঁরা এসেছিলেন, কত দেবে খোবে?’

‘বাইশ হাজার টাকা নগদ করকরে শুণে দেবে। আর ঐ একই মেরে বাপ চোপ বজলে সবই মেরে-জামাইয়ের।’

‘তা তো হ’ল মেরে-কমেন? কোথাকার মেরে?’

‘সেই বর্গপুরের জমিদারের মেরে গো। মনে নেই? সেই যে সেদিন দেখে এসেছি। পরী গো, পরী, ডানা-কাটা পরী—’

মাংসাতী হাসিয়া বলিলেন—‘আমি তো বাবু পরী-দেখি নি, তোমার ব্যাত ভাল ভূমি দেখ। তা বা’ক সত্তা মেরে শুকন না হলে কিছু বাইশ হাজারই দিক আর বক্রিহ হাজারই দিক আমি ছেলের যে দেব না তা’র’লে রাখণুম।’

আরে পাগল না কি, মেরে ভাল না হ’লে আমি কখন বাজি হই, মেরে খুবই ভাল; এইবার একবার দেখিয়ে দেব সেই বটোদের খায়া বড় বলত অত টাকা কেউ নেবে না। বড় আপশোব হচ্ছে মাংসাতী আর যদি ছি’ল একটা ছেলে থাকত।’

‘সে ধুগু করে আর এখন লাভ কি? বা’ক তা হ’লে বেশেইয়ে বিনি ঠিক হয়েছে?’

‘হ্যাঁ গো হ্যাঁ।’

জটমনে ভবেশচন্দ্র উঠিয়া গিয়া একটু থুঁতিয়া আসিয়া বলিলেন,—‘নীচে অত গোশাখান হচ্ছে কেন? কার ঘরে? ও তোমার বলতে কুলে গেছি। ঐ ভূপেন্দ্রের ঘরে ও না কি



বীণার মার অধরের সময় কার কাছে ত'শ টাকা ধার করেছিল। হুদে-আসলে সেই টাকা আটপ হয়েচে। সেই লোক কি করে এখন পেয়েছে ৩ মর-মর, তাই-এসেছে টাকা আদায় কর্তে।

‘তারপর। টাকা মিছে নাকি?’

‘পাশল তুমি। ও পায় না নিজে খেতে, টাকা দেবে কোথেকে? লোকটা ঘটা বাটা সব টেনে বার করছে।’

পতীসহ ভবেন্দ্রচন্দ্র নামিয়া ভূপেন্দ্রের গৃহের সমুখে আসিয়া ভিতরের দিকে চাহিলেন। দ্বিৎ দুগলার এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আঙ্গান করিতেছিলেন। এক পাশে আড়ন্ত হইয়া বীণা লাড়াইয়া রহিয়াছে, হিরণ্যদায়ী ভূপেন্দ্রনাথ মৃতব্য পড়িয়া রহিয়াছেন। লোকটা তারপরে চাঁৎকার করিতেছিল, ‘এ সব জিনিষ বেচলে চাপটে টাকাও দাম হ'বে না, এতে আমার সব পোষ বাবে কি করে? বদমাইনী ক'লে লোকের টাকা নিয়েছে আজও দেবার নাম নেই। বসি মরে যেতো। তাহলে টাকাগুলো আমার মাঠেই মাঝা পেতে, ভাগ্যে বাঘের পেয়ে আজ ছুটে এসেছি! কি করছ টাকার এখন বল?’

অক্ষুণ্ণের ভূপেন্দ্রনাথ বলিল,—‘কি বলব দাদা, যা ছিল সব তোমায় ছেড়ে দিয়েছি আর আমার কিছুই নেই। টাকা ধরন নিয়েছিলুম তেবেছিলুম আফিসে যে পাচল টাকা ‘ডিপোজিট’ আছে, চাকরী ছেড়ে দিয়ে তা পাব—পেয়ে তোমার বেলা। কপালকলে সে কোপালনী মকরকে ঠিকরে আফিস উঠিয়ে দিয়ে একেবারে লাল-বাতি জ্বলে গিল। আমি পথে বলসুম, তারপর এই চাকরীটা কোন ভিত্তিকে ছুটরে কঠোরশ্রেণী দিন কাটাচ্ছিলুম, উপায় থাকলে তোমার টাকা নিকট দিয়ে দিতুম।’

লোকটা হতভম্ব দিয়া বলিল, ‘রপে দাও তোমার ও-সব বাক্সে কথা। উপায় নেই বললে পাণ্ডাঘার শোনে না তো। তোমার ভাগ্য বাসনপত্র নিয়ে তো আমার টাকা উঠবে না, টাকার কি করছ বল? কোথের শরনাম, যে-সে-করে এতদিন কাটিয়ে এখন তো মরতে বসেছ আমার কানিক দেবার মতসব, টাকা দাও। তারপর ঘরের বাড়ী বেও, নইলে এই অবস্থায় তোমায় জেলে নিয়ে পুরব তা বলে দিচ্ছি। ভাগ-

মাহুরী ক'লে এতদিন নাগিন না করেই অজ্ঞায় করেছি, ছোট লোক, ইতর, অকৃতজ্ঞ তখন টাকা না দিতুম যদি?’

কাঁপকণ্ঠে ভূপেন্দ্রনাথ বলিল,—‘সে-তো তোমার দয়া, তুমি টাকা দেওয়ার তখন সত্যিই আমার অনেক উপকার হয়েছিল—সে ধন আমি কখনও শোধ কর্তে পারব না। আমিও তোমার টাকা রাখতুম না, কি করব তখনাম্বারলেন। আমার অবস্থা দেখে দয়া কর, আমি জোড় হাতে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি।’

‘আমি ত এখানে তীর্থ করতে আসি নি যে দয়া দেখাব। উঃ শরতানী মতলব! দেব দেব করে এতদিন আমার ভূমিয়ে রেখে এখন মরতে বসেছেন, ভাগ্যে ঠিক সময় এসে ধরেছি। এখন ভাল কথায় বলছি আমার টাকার ব্যবস্থা কর সম্ভব।’

‘কিন্তু কি?’

‘কি করবে তবে বল?’

‘কি করব তুমিই বল। আমার তো কোন উপায় নেই—একদম আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত ও আমার নেই। ঐ অন্তর মেরে পরদার অভাবে আজ পর্যন্তও তার কোন উপায় কর্তে পারি নি। আমি চোখ বুজলে ওর যে কি হ'বে সে ভগবানই জানেন। ভিক্ষে করে হর তো ওকে দিন কাটাতে হ'বে। এই তো আমার সঘন ঘরের এই জিনিষ ফরাটা, তা তো তোমার আশেই ছেড়ে দিয়েছি। মনে কর, রমেশ ত'শ টাকা তোমার ছোট-বেলার বন্ধকে ভিক্ষে দিয়েছ।’

‘হঁ’ ভিক্ষে দিয়েছি। কি স্তম্ভের কথাই বয়ে। না স্তত দান করবার ক্ষমতা আমার নেই। টাকা আমার চাই। আজ এসেছি যখন, তখন সব না নিয়ে আমি নাব না। কি করবে আমার বলে দাও।’

ভূপেন্দ্রনাথ কথা বলিতে পারিল না; রমেশও কিছুকণ নীরবে পান্থ্য। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বীণার দিকে চাহিয়া বলিল,—‘পরদার ভজ্ঞে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছ না বললে না?’

‘হ্যাঁ—মেয়ের তো বিয়ে দিতে পারবুই না।’

‘তা দেখ ভূপেন এক কাজ কর হাজার হ'ক ছেলেবেলার বন্ধ তুমি টাকার জন্তে তোমায় বিব্রত আমি কর্তে চাই না। আমার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত কর।’

‘কি বন্দোবস্ত?’

ভূপেন্দ্রনাথ শঙ্কিত দৃষ্টিতে বন্ধর দিকে চাহিল। বাগাবদ্ধ মানিয়া তাহার নিকট হইতে ‘নিতান্ত দায়ে পড়িয়া টাকা লইয়াছিল। অকথাং তাহাকে স্বর বদলাইতে দেখিয়া চাকর্য্যের পরিবর্তে অন্তরে ভীতিলই সঞ্চার হইল। রমেশ বলিল,—‘টাকা আমি সব ছেড়ে দেব, উপদ্রব তোমারও কিছু সাহায্য করব যদি আমার কথা শোন।’

‘বল কি কথা।’

রমেশ একবার এমিক সেমিক, একবার নতনেত্র বীণার দিকে চাহিয়া সহজভাবেই বলিল,—‘জান তো সত্যার মার, হা হ'য়েছে, একটা গিলি নইলে আমার সন্সার চলে না, তাই ভাবছি নিতান্ত দায়ে পড়েই ভাই আমার বে কর্তে হ'বে।’

ভূপেন্দ্রনাথ অবাক হইয়া শুনিতেছিলেন। তাহার যোগজিত বাস্তব পূর্ণ হইতেই অবগত হইয়া আসিয়াছিল, রমেশের এখনকার কথায় যেন ভাবিবার সুবিচার শক্তি পর্য্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া আসিল। রমেশ বলিতে লাগিল,—‘তাই বলছি তোমার মেয়েটার সঙ্গেই আমার বে হ'ক না।’

সহসা প্রচণ্ড আঘাত লাগিলে পতীর নিদ্রামর ব্যক্তি যেন মস্ত্রাসে জাগিয়া উঠে, রমেশের কথায় তেমনি ভাবে চমকিয়া উঠিয়া ভূপেন্দ্র বলিল,—‘তুমি বিয়ে করবে?’

‘তোমার ওপর দয়া করেই বলছি। নর তো মেয়ের কি কিছু অভাব আছে? তুমি নিতান্ত বাগবদ্ধ—’

‘না ভাই রমেশ মাপ কর। আমি বীণার পিতা। পিতার কর্তব্য যদিও কিছু পালন কর্তে পারিনি তবু তাকে এভাবে বলি দিতে পারব না!’

‘পারবে না?’

‘না কিছুতেই না।’

মেয়ের সঙ্গে? আমি ওকে বে কর্তে চাই এই তোমার চোদ পুরুষের ভাগিয়া তা নয়—

‘না দাদা আমার অমন ভাগ্যে দরকার নেই।

‘তাতে নেই, কিন্তু’ বামি তা কাহ হাতে দড়ি দিয়া তোমায় জেলে পুরব তখন মেয়ের কি হবে।’

‘ভগবান! আছেন, তিনিই দেখাবেন।’

‘তাই বেন দেখেন, আমি তবে উঠদুম। কাগ তৈরী হয়ে থেক। আমি আজই নাগিন করব, এতকালা জোক করাব, শেখ ডিক্রী জারি করে জেলে পাচাব।’

এক রকম লাগাইয়া রমেশ ঘর ছাড়িয়া আসিতেছিল, সহসা পূর্ণাত্তে কোমল কণ্ঠের আহ্বান আসিল,—‘একবার শুনে যান।’

রমেশ কিরিল, বীণা সরিয়া পিতার কাছে বসিয়া মুছ কণ্ঠে বলিল,—‘উনি বা বলছেন তাই কর না, বাবা।’

বিমিত হইয়া ভূপেন্দ্রনাথ বলিলেন,—‘কি ওর সঙ্গে তোব যে দেব? পাগল হয়েছি বীণা? না না সে হবে না—হতে পারে না—টাকা নিয়ে ছিলুম দিতে পারি নি, তার জন্তে জেলে যাব তাতে হুখু নেই, কিন্তু নিজের হৃৎকণ জন্তে তোকে বলি দে-না—’

‘না বাবা তুমি রাজি হও আমার দিকটাই কেন এত বড় করে দেখ। এই শরীরে তুমিই বলি—বীণা শিখরীয়া উঠিল। না বাবা সে হ'বে না ওঁকে বলে দাও ওঁর কথায় আমার সম্মত। বলিল যেন দয়া করে আর উৎপীড়ন না করেন।’

‘বীণা! বীণা! একি বলছিস? না’না এ হ'বে না।’

‘না বাবা তুমি অন্যত কর না এই হ'ক।’

রমেশ কিরিয়া পিড়িয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিল। বীণার কথায় অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল,—‘তুমি যদি সন্মত হও তোমার বাবার অন্যত আসবে যাবেন।’

‘তুমি সন্মত তো?’

‘হ্যাঁ আপনি দয়া করুন আর বাবাকে পীড়ন করবেন না।’

‘আরো না না। সে কি। উনি এখন আমার পুত্রীয় লোক হলেন—স্বস্তর। আর কি কিছু বলতে পারি?’

ভূপেন কিছু মনে কর না ভাই। দূর কর এটাই কেবল



বলে ফেলি ভাই নয়, ভাই নয়,— দিনটা তাহলে আজই ছির করে ফেলব। বিকেলে আমি আমার পুরুতের কাছে ছিলাম। তোমার হ্যাণ্ডনেট শানও অমনি এনে দিয়ে বাব।

‘তুমি শীঘ্র। বোধেধের প্রথমেই কাজটা সেরে নেওয়া যাবে। তুপেন, তোমার কিছু ভয় নেই, আমি জামাই হলে কোন ভাবনা থাকবে না; অনর্থক মন খারাপ কর না; বয়েস আমার এমন কিছু বেশী নয়—আমি তবে—মুহমান ভূপেন্দ্রনাথকে সাধনানামে চরিতার্থ করিতে রমেশ অগ্রসর হইল। মালতী ও ভবেন ধারসমুখে দাঁড়াইয়া নীরব মর্শকর মত ঘরের দিকে চাহিয়াছিলেন, এইবার ভবেন অগ্রসর হইয়া রমেশের টিক সমুখে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন,—‘আপনার কত টাকা পাওনা মশার?’

সহসা তাঁহাকে দেখিয়া ঘরের সকলেই চমকিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধভাবে রমেশ বলিল,—‘কে আপনি’

‘মহুদ?’  
‘ভূতনয় সেতো আমিও দেখছি, পরিচয় কি তাই জিজ্ঞাসা করছি। আমার পাওনা জেনে আপনার কি দরকার?’

দরকার এই—যে গোটের টাকা দিয়ে আপনার পাওনাতা শোধ করে দেব।’

পরলোকগত কোন পূর্ণপুরুষকে সমুখে দেখিলেও বীণা বা ভূপেন্দ্রনাথ এত চমকিত হইত না যেমন হইল ভবেনের কথার। বিহ্বল নেত্রে তাহার গুণ্ড চাহিয়া রহিল। ভবেন পইীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—‘লোহার সিন্দুক খুলে হাজার বানেক টাকা নিয়ে এস তো।’  
‘মালতী ভগ্নি! গেলেন। ভবেন পুনরায় বলিলেন,—‘বলুন আপনার কত পাওনা। পাই পরমা পর্যন্ত আমি দিয়ে দিচ্ছি। বুড়ো শকুন মর্মে ‘চলন্ত লজ্জা’ করেনা ভুত দেখিয়ে একটা

মেয়ের সর্গনাশ কর্তে। এই যে টাকা এনেছ গিরি দাও। মালতী একগোছা নোট’ বামীর হাতে দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। ‘ভবেন বলিলেন,—‘হ্যাণ্ড নোট নিয়ে এসে টাকা নিয়ে যাও, ভারী হুবিধা পেয়ে ছিলে না? মনে করেছিলে জেলে দেবার ভয় দেখিয়ে কচি মেয়েটার সারা জীবন একাদানীর ব্যবস্থা কর্তে পারবে শয়তান—’কথ ভূপেন্দ্রের কপোল বহিয়া অশ্রুধারা নামিয়াছিল। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভবেন সম্মুখে বলিলেন, তুপেন ভায়া কিছু মনে কর না ভাই। তোমার সঙ্গে আমিও দুর্জীবহার যোগেই করেছি, অর্থ-পিণ্ডাচ স্বার্থপর আমিও কম নই। কিন্তু আজ,—যাক ওকে আগে বিদেয় করি।’ তারপর গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—‘তুপেন ভায়াকে ওপরে নিয়ে চল, এখানে থাকলে বেচারী আর বাচবে না।’

মালতী গৃহমধ্যে আগিলেন। ভূপেন্দ্রের দিকে চাহিয়া ভবেন বলিলেন,—‘মেয়ের বিয়ের জন্তে ভেদনা ভাই আমার স্বহাস তোমার বীণার আবেগ হ’বে না। বীণা মা এই ঐশ্ব্যার্থেই আমার লজ্জা হ’বে।’

হঠাৎসুস্করকণ্ঠে মালতী বলিলেন,—‘আমিও এই কথাই তোমার বলতে চাইছিলাম, তবে আর কি তা হলে পাওনাদার মশার এখন আস্তে আস্তে সরে পড়ুন, বিকেলে এসে টাকা নিয়ে যাবেন। চলতে বেছাই এ ঘর থেকে ওপরে চল। অসম্মত ভূপেন্দ্রকে একদল টানিয়া লইয়াই ভবেন অগ্রসর হইলেন। বীণার হাত ধরয়া মালতীও বামীর অঙ্গবহন করিলেন। এতক্ষণের গোলবালে বাটস্থ নর-নারী সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ভাঁড় করিয়াছিল। অবাক-বিস্ময়ে তাহার ভবেন ও মালতীর বুদ্ধিমত্তা হইয়াছে কি না দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। রমেশ ধীরে ধীরে হানুতাগ করিয়া চলিয়া গেল।

## গীতা কি?

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

গীতা শ্রীভগবানের অকৃত্রিম অনন্ত গান। সে সঙ্গীত মহাশক্তির প্রথম বিকাশ। সে সঙ্গীতের সুর সাত ভাগে বিভক্ত—ভূ, তুণ, স্বঃ, মধ, জন, তপঃ, ও সত্য, এই সপ্ত লোক।

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তাহার মাত্রা।

সে গান প্রতি মহত্ব-দ্রব্দের গুণিতে পাওয়া যায়।

প্রতি জীবের হৃদয়াকাশে সে গান ধ্বনিত হয়।

গীতা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মূলের বাণী। এই বাণীর এমন অমোঘ শক্তি যে, যিনি ইহাকে শ্রদ্ধা করিয়া শ্রবণ ও মনন করেন, তিনি আনন্দময় পুরুষোত্তমকে লাভ করেন।

বাণী ও বক্তৃত্তে কোন প্রভেদ নাই; নাম ও নামী এক। অতএব গীতাই ভগবান। যিনি গীতাকে আশ্রয় করেন, তিনি ভগবানকে আশ্রয় করেন। গীতা উদার বাঙমুখী সৃষ্টি। এই পেছের মধ্যেই সেই গান গীত হয়। মহত্ব-দেহ, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র আদর্শ। বিরাটে ও দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে পরিবাগত তারতম্য ছাড়া, অজ্ঞ কোন প্রভেদ নাই। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড ‘ভগবানের স্থল দেহ।’ উহা ক্রিতি, অণু, ভেজ, বায়ু, আকাশ, অক্ষার-তত্ত্ব ও মহত্ব, এই সপ্ত আবরণে আবৃত। উদার মধ্যে যে বিরাট পুণ্য বাস করিত্তেছেন, তিনিই ধারণার বিষয়।

ঐ বিশ্বব্রী পুরুষের পাদমূখ—পাতাল, চরণ—রাসাল, জঘনদেশ—মহীতল, নাভি-গোবর—নভঃস্থল, বক্ষ—স্বর্লোক, গ্রীবা—মহর্লোক, বদন—ব্রহ্মলোক, ললাট—ভগ্নোলোক এবং মস্তক—সত্যলোক। আমাদের দেহও সপ্ত আবরণে আবৃত। মা যোগমায়ায় রূপায়, এই সপ্ত আবরণ ভেদ করিয়া আমরা আনন্দময় পুরুষোত্তমকে লাভ করিব।

প্রাণমে ভগবানের স্থূলরূপকে দ্রব্দের ধারণা করিতে হয়।

যোগমায়ায় আরাধনা করিয়া, বিকৃত ধারণা লইতে হয়। যোগমায়া ‘বিকৃত’ শক্তি। তিনি প্রসঙ্গ না হইলে,

আরোহণের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না এবং দ্বার উদ্ঘাটিত না হইলে, বিকৃত আশ্রয় লাভ হয় না।

শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় লাভ না করিতে পারিলে, সমস্ত কর্ম এমন কি মহত্ব-দ্রব্দেরও বৃথা।

কি উপায়ে বিকৃত আশ্রয় লাভ হয়?

অন্তরঙ্গ সাধনার দ্বারা তাহা লাভ হয়।

অন্তরঙ্গ সাধনা কি?

গুণগল্লক জ্ঞান-বলে নির্দিষ্ট উপাত্ত দেবতা এবং নিজেই যে অভেদভাবে অবস্থান, তাহাকেই অন্তরঙ্গ সাধনা বলে।

চিত্তের অজ্ঞ জ্ঞান-প্রবাহ বিদূরিত ‘করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে কেবলমাত্র উপাত্ত-বিবাহিত চিত্তকেই উপাসনা বলে। এতাদৃশ উপসনার দ্বারা দেবতা ও জীবাত্মার অভেদতাব সম্পন্ন হয়।

যেখানে নিজ চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, সেই ধানেই হুখে উপবেশন করিবে।

নির্জ্ঞান প্রদেশে গ্রীবা, শিরোদেশ ও অজ্ঞাত অঙ্গগুলি সরলভাবে রাখিয়া সম্যক চিত্তে উপবেশন করিবে।

ভক্তিপূর্বক প্রথমে নিজ গুরুকে প্রণাম করিয়া, গুরুপদত মন্ত্র তপ করিয়া, যোগমায়ায় প্রেরণা করিবে।

যোগমায়ায় প্রসঙ্গী মূর্তিকে দ্রব্দের অকৃত্রিম ও ধারণা করিবে।

‘অকৃত্রিম করিতে’ করিতেই ভাব আসিবে; ভাবময়ের আবির্ভাব না হইলে ভাব আসে না। এই ভাবই তোমার হৃদয়ের দ্বারকে উদ্ঘাটন করিয়া দিবে; এই দ্বার কিন্তু যোগমায়া রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। এই দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, তবে তুমি বিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইবে। শ্রীবিষ্ণুর চরণে পঙ্কজ-বিক্রান্তক মনকে নিবেদন করিতে পারিলে, তিনি শুদ্ধা বুদ্ধি দিবেন; এবং তাহা লাভ



করিলে আত্মজ্ঞান বা গীতা-জ্ঞান লাভ করিবার তুমি উপযুক্ত হইবে, তৎপূর্ণবনে।

তোমাং সততঃ সাক্ষাৎ ভজ্যতাং শ্রীতিপূর্বকম্।

দমাশি বুদ্ধিযোগে তৎ যেন মাশুপাশিত্তি ॥

গীতা ১০।১০

যিনি দময়ঃ শ্রবণাধিকারী বুদ্ধির দ্বারা নিদিশ্যাসন-পূর্বক শ্রীবিষ্ণুর সহিত যুক্ত হইতে পারেন, তাহাই অমৃতত্ব লাভের উপযুক্ত।

এইরূপে শ্রীবিষ্ণুতে যুক্ত হইলে, তুমি দিব্য-শক্তি লাভ করিবে। ইহা লাভ করিলে, গীতা তোমারই অন্তরে গীত হইবে এবং সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের গানের স্বরায় তোমার শক্তি-পোচর হইবে।

তখন তুমি বৃত্তিতে পারিবে যে, গীতা নিত্য, গীতা অপৌকর্য্যে, গীতা অনাদি কাল ধরিয়া অনাদি দশমে উচ্চুসিত।

যেখানে জীবনের জীবন-মরণ সংগ্রাম, সেইখানেই ভগবানের আবির্ভাব, সেইখানে গীতা ভগবৎকণ্ঠে ধ্বনিত। ভগবৎ বাণী ভগবৎকণ্ঠেই উচ্চারিত হয়; এইজন্ত গীতা অপৌকর্য্যে।

এই ধ্বনি যতক্ষণ না তুমি শ্রবণ করিবার অধিকার লাভ করিবে, সহস্র বার গীতা পাঠ করিলেও, সহস্র প্রকার চাক্ষুর জালোচ্চনা করিলেও, তোমার মূর্তি-গেহিনী ও ব্রাহ্মি নান্দিনী জ্ঞানশক্তির উন্মূহ হইবে না।

একবার এই জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে, তারপরে পৃথগ্ধৈ কল্ক আর পান্ধই কল্ক, তদ্বারা জীব লিপ্ত হয় না।

‘মহুৎপাদসি সমিদ্ধোহমির্ভদ্রবাস কুরুতেচ্ছঙ্খলম্।

জানামিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভবন্ত্যং কুরুতেতদা ॥

গীতা ৪।৩৭

এই প্রকারে, জ্ঞানপ্রতিবন্ধক-কর্ম্মের ক্ষয় দ্বারা, কালে জীব আত্ম-সাক্ষ্যকার লাভ করিতে সমর্থ হয়।

গীতা ৪।৩৮

জ্ঞান ব্যতীত জীবের অনারম্ভক কর্ম্মফল বিনষ্ট হইতে পারে না; কিন্তু প্রাণীর হোয়ারকর্ম্ম যে প্রারম্ভক কর্ম্ম, তাহা

একমাত্র ভোগের দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাহা বিনষ্ট করিতে জ্ঞানও সমর্থ নয়।

আত্মজ্ঞান স্বরূপ অমি, প্রারম্ভকর্ম্মের ফল ভিন্ন অর্থাৎ যে কর্ম্ম-ফল উপস্থিত সময়ে ভোগ হইতেছে, সেইরূপ কর্ম্ম ভিন্ন সকল শক্তিত ও জিদমাণ কর্ম্ম সকলকে তদঙ্গায় করে। ভবিষ্যতে যে যে পুণ্যা ও পাপ কার্য্য করেন, তাহা পদ্যপত্রঃ জলের দ্বারা তাহাকে লিপ্ত করে না। অজ্ঞান-জনিত দময়ঃ-গ্রন্থির বিনাশই মোক্ষের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ সন্তোষোপাসনার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইলে, নিরাকার নিঃস্বরূপে অর্থাৎ পরানন্দে জীব মগ্ন হয়।

মোক্ষ-প্রতিপাদক যোগশাস্ত্র-বিষয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, প্রকৃত স্মৃতিমান পূর্বক, আর্ন্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থাৎ গী ও নিকাম জ্ঞান-কামনা করিয়া, প্রকৃতি ও গুণের শরণাগত হইবেন এবং বহু কাল সমাধিত চিত্তে গুণের সন্তোষ সাধন করিয়া, অগ্রমন্তভাবে সমস্ত বৈদ্যাস্ত-ব্যাকার্য্য শ্রবণ করিবেন। সমস্ত বৈদ্যাস্ত ব্যাকার্য্য তাৎপর্য্য নিশ্চয় করার নাম শ্রবণ। তত্বম্যাদি ব্যাকার্য্যের বিচার করার নাম মনন।

নিশ্চয়, নিরম্বদ্য, সর্বকৃতে সমভাবাপন্ন, সঙ্গরহিত ও সর্বদা শাস্ত্রানিগূণযুক্ত হইয়া ধ্যানযোগের দ্বারা আত্ম-সাক্ষ্যকার করার নাম নিদিশ্যাসন।

শ্রদ্ধাপূর্বক গুণের উপদেশ জনিত উন্মূহিত মন পাশা-বহু হইলেও বিগলিত হইয়া যায়। গুণভক্ত শিষ্যের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। গুণের কণামৃত পান করিতে করিতে দময়ঃ আপনা আপনি একজাতেরে মূগ্ধন হইয়া থাকে। মুহূর্ত্তময় সমীর অতিক্রম করিতে গুণ-শুশ্রূষা ব্যক্তির কোন-রূপ ক্লেশ হয় না, মন্যাদিকারীর নিত্যতার উপায় ভগবান এইরূপ করিয়াছেন।

গুণমূখে শাস্ত্রব্যাখ্যা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিলে, অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার চিরদিনের জন্ত বিদূষিত হইয়া যায় এবং ব্রাহ্ম-রাশির সম্পূর্ণ শান্তি হয়।

গুণের প্রাতি শাস্ত্রা, শাস্ত্রের প্রাতি শাস্ত্রা এবং ভগবানে বিদ্যাপ হইলে, জীবের সমস্ত মোহ নষ্ট হইয়া যায় এবং আত্ম-

জ্ঞান স্বরূপ স্থিতি লাভ হয়। তখন তাহার সমস্ত গুণের তিরোহিত হইয়া যায়। গুণসেবা না করিলে, গুণমূখে উপদেশ না শুনিলে, কেবল নিজ বুদ্ধি-বিচারে কিংবা জ্ঞান গ্রন্থ-পাঠ করিলে, তত্ত্বজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্ত বুঝিতে পারা যায় না।

একবেতী গুণের চরণে প্রণামপূর্বক প্রণ ও সেবা করিয়া আত্মজ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়।

কি করিয়া গীতা-জ্ঞান লাভ করিতে হয়?

সু-গুণের শরণাগত হওয়া।

তাৎপর্য্য নিকট শক্তিময় গ্রন্থোপেত একাগ্রতা লাভ করা।

বীজময় সমূহ ধ্যানলব্ধ শক্তিবিশেষের হৃদয়তম শর্ম্ময় বিকাশ। ইহাতে স্থির বিকাশ করা।

শক্তি ও শব্দ অবিনা-ভাবী অর্থাৎ এক।

যে হৃদয়তম শব্দ অবলম্বনে একেত্র শক্তি উদ্ভূত হয়, সেই

শব্দটী সেই শক্তি বিশেষের বীজ ময়।

হৃদয়তম নাম হইতে মহতী শক্তির বিকাশ হয়

শক্তি চিদ্রায়ী, শক্তি আত্মা বা মা; হৃদয়তম শক্তির

উদ্যোতক বীজময়সমূহও চৈতন্যময়।

চৈতন্যময় সত্যাত্মীয় গুণের মূখ হইতে বীজময় প্রকার

সহিত চৈতন্যময়রূপে গ্রন্থ করিতে হয়।

এই চৈতন্যময় ময় জগের প্রভাবে সেই ময়প্রতিপাত

শক্তির আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ দেবীর সাক্ষ্যকার লাভ হয়।

ময় চৈতন্যময় হইলে, তবে পূজা সফল হয়।

ময়-চৈতন্য কাহাকে বলে?

ময়, গুণ এবং দেবতার সম্যক ঐক্য অবধারণের নাম

ময়চৈতন্য।

যে দেবতার প্রথম আবির্ভাবকালে, যে হৃদয় বীজময় ধ্বনি নির্মল প্রজ্ঞার প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই সেই দেবতার বীজ। ঐ ময় প্রতিপাত যে অর্থ তাহা গুণ অর্থাৎ ময়ত্রা জ্ঞানই গুণ। ময় উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যদি ময়ত্রা জানাটী উদ্ভূত হয়, তাহেই ময় ও গুণের ঐক্য হয়।

কিছুদিন ঐক্য অবস্থানান্বিত ময়ত্রা গুণ করিতে করিতে দেবীর আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং তখন সেই দেবীর স্বরূপ

অবগত হওয়া যায় এবং তখন সাধক বর ও অন্তর প্রাপ্ত হয়।

গুণবাসিষ্ট উপায়ে এইরূপে অগ্রসর হইলে, শক্তির আবির্ভাব হইবে নিশ্চয়ই।

যদি সাধকের নিকট কোন একটা ময় চৈতন্যময় হইয়া উঠে, তখন তাহার স্তব, স্তুতি, প্রণাম, বন্দনা সকলই চৈতন্য-ময় হইয়া উঠে।

চিদ্রায়ী বোগমায়ায় আরাধনার দ্বারা রূপালাভ হইলে, তিনি প্রজ্ঞার গুলিরা ধিনে, তখন তুমি দময়ঃ শ্রীবিষ্ণুর দ্বরণ লইবার অধিকার লাভ করিবে, যিনি তোমায় গীতা-জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান দান করিবেন।

তৎপরে তুমি ভক্তি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে, নতুবা তৎপূর্বে তুমি কাহাকে ভক্তি করিবে। শুধু ভক্তি কথা মূখে উচ্চারণ করিলেই হয় না।

যেখাং স্বত্বগতং পাপং জনানাম্ পুণ্যকর্ম্মণাম্।

তে ধ্বদমোহনিমুক্তা ভক্তন্তে মাং দ্ব্যুত্তরতাঃ ॥

—গীতা ৭।২৮

ভক্তের দেবতার সহিত যোগ বা যুক্ত হওয়া চাই, নতুবা তাহা প্রতারণা মাত্র। তখন সে বৃত্তিতে পারিবে যে ভক্তের বিনাশ নাই এবং ভগবানই ভক্তকে রক্ষা করেন।

ভক্তের নিকট সমস্ত শাস্ত্র সকলের রহস্ত আপনা আপনি উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। বিচার করিয়া তাহাকে নিশ্চয়ই উপনীত হইতে হয় না, তখন, তিনি সত্যকে দর্শন করিয়া সিদ্ধ হন এবং যিনি সিদ্ধ হন, সকল সিদ্ধান্ত তাহার নিকট আপনি আসে।

ইহাই গীতা এবং সকল শাস্ত্র অধ্যয়নের রহস্ত।

গীতা ও তাহার ব্যাখ্যা আমাদের অন্তরেই আছে।

অকপট হৃদয়ে বুদ্ধিযোগের অভ্যাস করিলে, মনের পক্ষা একটাট পর একটা সরিয়া যায় এবং নব নব সত্যের প্রকাশ আপনি হয়। তখন ধীরে ধীরে আমরা নূতন জগতের সন্ধান পাই এবং আমাদের ভিতর নব নব শক্তির বিকাশ হয়।



## মোহ

( উপজ্ঞাস )

[ পূর্ণাহবুতি ]

শ্রীমতী নীলাম্বা দেবী

বর্ণিত

অধিনাম। মুমোহিত শৈলপাদপঙ্খি শুষ্কপত্রের মর্মরন্ধন দ্বারা শীতগুরু আগমন ঘোষণা করিতেছে। পাছাদের গারে যে প্রীতের পূর্ণ হইতে বহু পুষ্পের বিবিধ বর্ণের সজ্জা ছিল, সে সজ্জা আর নাই, দূরে দূরে অজ হরিদ্রা ও নীলের আভা তিন সে পুষ্পবিশিষ্ট শৈলপাদ্রে আজ শুষ্ক পত্রিকারই আভরণ; কিন্তু হেমন্তের আগমনে আর পরবল অসুখ শোভা ধারণ করিয়াছে, কোথাও সৌন্দর্য্য তাপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহাদের সোনার বরণ হইয়াছে, কোথাও সমান্ত মাত্র শুষ্ক হইয়া সবুজ ও আরক্তিম বর্ণে সজ্জিত। আবার কাউপাদের সঙ্গে যেন নীলগজারি বহুবর্ণের সমাগম। প্রকৃতি-দেবী যেন আজ বিরহের সাথে সজ্জিতা, বসন্তকে বরণ করিবার পূর্বেই তাহার প্রাণ। সম্ভ্রান্তাগ করিতে ব্যাকুল—বিরহ যেন কখন কখন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তখনই আর শুষ্কপত্রের আভরণে ভূষিতা প্রকৃতিদেবী ও হৃদয় বৃদ্ধি ধারণ করিয়াছেন।

সন্ধ্যা আগন্তপ্রায়, এমন সময় ক্রতপদে একটা রমণী পাথরের চড়াই উঠিতেছিল। রমণী অল্পবয়স্কা, তাহার মুখ শান্ত রক্ত, চোখে যেন কোন অজানা কাকুরতার ভাব, চপল যেন বিরহিণীর নিদনপ্রসন্ন। এই সম্ভ্রান্ত যুবতী। এতহ হৃদয় যে, সকলই তাহার দিকে একবার নিরীয়া চাহিতেছে। তাহার—অন্যসোভ, হৃদয় গতি সবারই মন হরণ করে। সজ্জাও মনোরম—পরণে বহুমুখা পাতাভ সাজী, অঙ্গে ভূষণি অঙ্গ, সজ্জিত হইবার অভিজ্ঞানের চিত্র পর্য্যন্ত তাহাতে নাই, অথচ সে সজ্জার মাধুরী অসীম। সে পথের একা। বাকের কাছে আসিয়া গুনিতে পাইল,

একটু দূরেই কোন বালক বা বালিকা তাহার ছোট ছোট পা ছেঁদিয়া ক্রতপদে অবতরণ করিতেছে। বাকের ঠিক মুখে নিমেষের মধ্যে একটা ছোট ছেলে যুবতীর পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িল। সময়ে পড়ার ফলে বালকটির লগাট আঁহত হইয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। যুবতী তৎক্ষণাৎ সজ্জাহীন সেই শিশুকে বুকে করিয়া সেই পথের ধূলাতেই বসিয়া পড়িল, ও তাড়ান পায়ের পায়ের তাহাকে নিজ কোলে শাণিত করিয়া তাহার কতখন রুমাল দিয়া চাপিয়া ধরিল। কিন্তু শিশুর মুখের দিকে চাহিতেই যুবতী বিহ্বল হইল। এ কাহার অবিকল প্রতিমূর্তি! ভগবান কাহার সন্তানকে তাহারই পদতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। বাহাকে ভুলিবার ক্ষমতা এতদিন সে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছে, বাহার বিরোধীভিত্ত মনকে শাস্ত করিতে সে এত চেষ্টা করিয়াছে, আজ তাহারই সন্তান তাহার বকে জড়িত, তাহার কোলে শাণিত। না—হয় তো ইহা তাহার দাস্তি মাত্র, সাধুত্ব হয় তো তাহারই কল্যাণ। নিঃশব্দে সখ্যত করিয়া সে তাহার সন্তানের হারবানকে বলিল—“শ্রী এই সামনেই বাড়ী থেকে একটু পিছার ঠাণ্ডা জল নিয়ে এস, আর যদি বরফ পাও তো অল্প এল—সেরী কর’না।”

অনিবিলম্বে জল আসিল, রমণী দীর্ঘে দীর্ঘে দাঁতগুলি মৌত করিতে করিতে ছেলের সর্বাধীন আসিয়াছে কেন ভাবিতেছে, এমন সময় উপরে পদধ্বনি পাইল। সে মুখ তুলিতেই দেখিল যে, এক পুরুষ তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

মুহুর্তের পরে পুরুষটা বলিল, “প্রীতি, এতদিনে ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন, তোমাকে দেখতে পেলাম—কিন্তু এক ব্যাপার?” এই বলিয়া দেবরত চিস্তিত হইয়া সেইখানেই বসিয়া নিজ পুত্রের শুশ্রূষা আরম্ভ করিল। মুখে

তারে ঝলংগ কাপটা দিতে ছেলেরা আশ্চর্য্যে আশ্চর্য্য চোখ বেলিল। তখন প্রীতি বলিল, “এটা আপনার ছেলে?— আমি দেখেছি চিনেছি। কি সাধুত্ব! একলা ছেড়ে দিয়ে-ছিলেন কেন?”

“এই একটু আগে একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ’ল, আমার দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, চকল ছেলে, বাড়ীর কাছে এসেছে বলে ছুটে কখন যে চলে এসেছে বুঝতে পারি নি। শুকে না দেখতে পেয়ে আমিও ছুটে আগছি।”

“দেখুন, এই কপালের কাটাটা বোধ হয় ঠিক (শেগাই) ধরতে হবে।”

এই সময় সেইখানে তিনজন মেম ও দুইটা সাহেব আসিয়া উদ্ভিষ্ট হইল। সকলেই বলিয়া উঠিল “কি হয়েছে?” সঙ্গে সঙ্গে একজন মেম এগিয়ে এসে ছেলেকে একবার দেখে দেবরতের উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, “খদি ছেলেকে না লম্বাতে পারবে তো লম্বা করে নিয়ে যাও কেন? তুমি এই ছেলের মাথা বেলে, তোমার কাছে থাকলে ওর মত কাবদার বাড়ি, নইলে আরা ও চাকরদের কাছে থাকে কোন, গোঁগ করে না। এখন এই কাণ্ড হ’ল—আমার স্বাক্ষরের মত সমস্ত আমোদ সাবাজ হ’ল। আজ রাতের এত বড় খরচনাও যেতে পার না।”

“তুমি স্বচ্ছন্দে আমোদ কর পে, বন্দ’ও যেও। আমি আমার ছেলে নিয়ে— থাকব, তোমার কোন ব্যাঘাত হবে না।”

ব্যাপারটা পরম হৈতুকে দেখিয়া প্রীতি বলিল, “দেখুন, আপনারা কত আমার রিক্স গাড়ীপানা নিয়ে শীঘ্র একজন ডাক্তার নিয়ে আসুন। আমার মনে হ’চ্ছে পোকার কপালের কাটাটা একটু বেশী গভীর হয়েছে, শেগাই করা দরকার। ‘অজ বা’ লেগেছে তা’ বিশেষ কিছু নাই।’ এই বলিয়া প্রীতি তাহার হারবানকে বলিল, “গাড়ী থেকে আমার কোট্টা নামিয়ে নাও।” সাহেবদের মধ্যে একজন ডাক্তার আনিত গেলেন। তখন প্রীতি দেবরতকে বলিল, “আপনার বাড়ী তো কাছেই বৃদ্ধিছেন, আপনি কি থোকাকে কোলে করে বাড়ী নিয়ে যেতে পারবেন, না সারোয়ান দিয়ে আসবে?”

“আমিই নিয়ে যেতে পারব, ঐ যে আমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে।”

“আপনার কাছে কদ’ রুমাল আছে কি? তা’ হ’লে তাই দিয়ে একটু বেঁধে দি। আমার রুমালটা তো কাটার উপর দিয়েছি। বাড়ী গিয়ে একটু আইডিন দিয়ে ঘুয়ে দেবেন, তারপর তো ডাক্তারই এসে পড়বেন।”

দেবরত প্রীতির কোল হইতে ছেলেকে নইবার সময় নিম্নস্বরে বলিল, “একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই, অনেক কথা আছে।” ছেলেকে যখন সে তুলিতেছে ছেলেরা প্রীতিকে বলিল, “আপনি আমাদের বাড়ী চলুন না।”

প্রীতি তাহাকে আদর করিয়া বলিল, “আমার মা আমার জন্ত বসে আছেন, আমি এখন বাড়ী যাই।”

ছেলেটা বলিল, “আমাকে এখন আসবেন তো?” প্রীতি হাসিল, সে উত্তর না দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু একজন অনভ্যন্তর্য্য সেই স্থর সবল বালককে কোলে রাখিয়া তাহার পাণ্ডুলি অধর হইয়াছিল, তাই সে দাঁড়াইতে গিয়া টলিয়া পড়িল। সে ভাড়াভাড়া দেবরতের বাহতে ভর দিল ও অজ সাহেবেরাও তাহার দায় ধরীয়া ফেলিল।

তখন দেবরত ব্যাকুলভাবে বলিল,—

“তোমার পাড়ী তো পাঠিয়ে দিলে এখন বাবে কি করে?”

এতক্ষণে এমির বাগ কমিয়া উভতা করিবার জ্ঞান হইল।

সে অগ্রসর হইয়া প্রীতিকে ধরবার বিয়া বলিল, “আপনার পায়ে লেগেছে কি? আমার বাড়ী চলুন, সেখানে একটু বিশ্রাম করে আমার সাড়া আছে তাই পদে বাড়ী আসি। এরকম রক্তমাখা ভিলে কাপড়ে রাতা দিয়ে যাবেন কেমন করে।”

উত্তরে প্রীতি বলিল,—“আপনি ব্যস্ত হ’লেন না, আমি কোট্টা পরছি, তা’ হলেই সব ঢাকা পড়ে যাবে।”

“আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আমি আর দেরী করতে পারব না। এমনিতেই বড় দেবী হ’য়ে গেছে, আমার মা স্বাক্ষর হ’য়ে পড়বেন।”

এমি ও তার সঙ্গের মেমেরা হাসিয়া বলিল, “কেন আপনি তো কত খুচী ম’ন, সঙ্গে সারোয়ান, তবু আপনার মা ভাববেন?”

“আমাকে অনেক দূর যেতে হ’বে, আর আমাদের বাড়ীর দিকটা বড় নির্জন, তাই মা রাত পর্যন্ত বাহিরে থাকা



ভালবাসেন না। আমাকে কমা করুন আমি আপেক্ষা করিতে পারব না।

“আপনার নামটা জানতে পারি কি? আমার নাম মিসেস বোব।”

“আমিও মিসেস বোব।” এই বলিয়া সে দেবব্রতের দিকে ফিরিয়া বলিল, “আর দেবী করবেন না, থোকার কতি হ’বে—যান, শীঘ্র বাড়ী যান।”

দেবব্রত বলিল, “তোমার পায়ে বেগেছে বোধ হয়, তোমার রক্তে—একটা রিঙ্গন ডেকে সিক, এতদূর হেটে যেতে পারবে কি?”

অজ্ঞ সাহেবটীও রিঙ্গন ডাকিবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু প্রীতি বলিল, “আমার কিছু হয় নি, আমি বেশ চলে যেতে পারব।”

তখন সাহেবটী দারোগাবানের হাত হইতে কোটটা লইয়া প্রীতির জন্ত ধরিল ও প্রীতিকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি এই পাহাড়ের সব ঢেয়ে উঠে ও শেষ বাড়ীতে থাকেন?”

“হাঁ, আপনি কখন ক’রে জানলেন?”

“আমি আপনাকে অনেকবার ওদিক থেকে আসতে দেখিছি। আপনাকে যে শুধু অনেক দূর যেতে হ’বে তা নয়, চড়াইটাও কম নয়।”

প্রীতি সকলের নিকট হইতে বলিয়ার চাহিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। সকলেই তাহার দিকে দেখিতে লাগিল। সাহেবটী বলিল, “কি স্বন্দর রূপ—আর তখনই স্বন্দর গঠন ও চক্ক—শিল্পীর চিত্র হরন করা রূপ।” এমি ও অজ্ঞ বৈষম্যটী একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, “তা’ হোমার মনটা হরণ ক’রে ফেলেছে দেখছি।” দেবব্রতের এ-সব বাক্য ধারণ লাগিল, সে বিরক্ত হইবে বলিয়া, “এমি, ওর বাধ্য না। ক’রে বাড়ীতে চল, ছেলোটাকে একটু দেখা দরকার।”

এমি জোঁধবন্দে বলিল,—“তুমিই বা এতক্ষণ যাও নি কেন? হাঁ ক’রে—এই মেয়েটার দিকে ঢেয়ে আছ, যেন তাকে চোখ দিয়ে গিয়া ফেলবে।” দেবব্রত উত্তর না দিয়া ক্রমশঃ চলিয়া গেল। সাহেবটী বাগল, “সাদাধান। মিসেস বোব, যদিও আপনি খুব সুন্দরী, কিন্তু একটু কম নয় উপরন্তু ওর কাটা মোহিনী শক্তি আছে—দেখ যেন,

যেন শেষে আপনার হোমটী হাতছাড়া নী হ’য়ে যায়।”

গৃহে ফিরিয়া এমি দেখিল দেবব্রত পুত্রকে নিজের ঘরে নিশ্চ-শয্যা শোয়াইরাছে এবং চাকরকে বলিয়াছে ছেলের ছোট পাটটা তারই ঘরে আনিতে। এমি ছেলের কাছে হাঁতে দেবব্রত বলিল, “তুমি এখানে কেন? যাও, নিজের শাক-সজ্জা করবে। আমি যতক্ষণ আছি আমার ছেলেকে দেখতে পারব, তোমার কিছু করতে হ’বে না।”

“অত রাগের মানে আমি বুঝতে পারছি না।” “তোমারই দোষে ছেলে পড়ে গেল, আমার গুণের রাগ ক’রে হ’বে কি? বেশ, আমি যাচ্ছি, আমি কা’রও অজ্ঞার রাগকে ভয় পাই না। ছেলেরও একটু শিকা হওয়া দরকার ছিল—কতবার বারণ করেছি তবু পাহাড় থেকে নামতে চুইয়ে—এইবার আর করবে না আশা করি। আর আমি ওকে তোমার সঙ্গে বেড়াতে-যেতে দেব না।”

ছেলে সত্যে বলিল, “মা, এবারটী কমা কর, আর আমি অব্যথা হ’ব না। বাবা যতদিন থাকবেন আমাকে তার সঙ্গে বেড়াতে দিও, আমি আর কোনও রকম চুষ্টী মি করব না বা তোমাকে বিরক্ত করব না। আমি কেবল বাবার কাছে থাকতে চাই।”

দেবব্রত পুত্রকে স্থির হইতে বলিয়া এমিকে বলিল, “দয়া ক’রে এখন চুপ করে থাক, আমার এ-সব ভাল লাগছে না।”

“তুমি আজকাল যত সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি কর, আমি এত সহ্য করতে পারি না।”

“আমি তো তোমার কোনও বিষয়ে বাধা দিই না, তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না। তবে ছেলটী যতদিন ছোট আছে, তুমি যখন তার মা, তুমি তা’কে যত করবে এইটুকু চাই। আজকাল বড়ই তা’কে অবহেলা করা হচ্ছে, আমি ছেলের প্রতি অসহ্য সহ্য করতে পারি না। তোমার কি মাঝে-মাঝে কিছুকিছু নেই? একটু বড় হইলেই ছেলেকে আমি রাখব, তখন তুমি যা ইচ্ছা করতে পারবে—আমি অস্বাদনের জন্ত এসেছি, তোমার সঙ্গে ঋগড়া করতে

চাই না—বাপ-মায়ের ঋগড়া ছেলের শিক্ষার পক্ষে বড় ধারণ।”

“আহা আমার ভালমালুমটী” বলিয়া এমি সেই ঘর হইতে চলিয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া ক্ষতস্থান শোয়াই করিয়া দিলেন ও সার্বদানে ছেলেকে রাখিতে বলিলেন, তবে অস্ত্র দিয়া গেলেন। এমি একবার ডাকিল যে সে রাতে আর নাচে যাবে না, কিন্তু এই নাচের জন্ত সে নুতন পোষাক কিনিয়াছে, লোকে তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে মোহিত হইবে সে লোভ সে তাগ করিতে পারিল না। দেবব্রত কিন্তু হাল না, সে পরের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল।

সেখানে একলা বসিয়া দেবব্রতের মনে কত রকম চিন্তাশ্রী হইল। উদ্বেক হইল। এরকম করিয়া কতদিন চলিবে? এ তাহার পাদপের প্রায়শচিত হইতেছে বটে, কিন্তু কতদিন সে এই আলা সহ্য করিবে? এমিও তো অসহী, তার পক্ষেও তা এ যখন বাধ্যনীয় নহে, তাহার প্রত্যেক কথায়—ব্যবহারে যেন যখন ছিঁড়িবার প্রয়াস। কিন্তু তাহাদের যে ধর্মবিবাহের অভ্যন্তর বন্ধন টুটিবার নহে। দেবব্রত ভাবিতে লাগিল, এমি যখন নিজের দেহ ধর্ম ভাগ্য করে আমার বিয়ে করতে রাজী হ’ল, তখন কি সত্যই আমার ভাগ্যদেহছিল না শুধু মোহের বশে? যদি ভালই বেসেছিলো তো আর মধ্যে সে ভালবাসা গেল কোথায়, বা কার দোষে? আমি তো জানে কোন জট করি নি যার নিজে সব দোষ ঘাড়ে নিয়ে এমির সব অত্যাচার যুবব্রজে সহ্যেছি। তবে কেন এমি সে প্রণয়-বন্ধন ছিঁড়ল, তার ব্যবহারে কেন মনে হয় যে সে সামান্যিক বন্ধনটুকু কাটতে পারলেই নিজ জাতীয় কাউকে বিয়ে করে স্বখী হয়? আর আমি নিজেই বা কিসের জন্ত সব ভুলে, এতব্যক্ত অজ্ঞার করণাম—সে কি লগাবাসীর জন্ত নয়, শুধু মোহে? আমিও তো বেকায় বজানো অগ্নি সাক্ষী করে যা’কে বিয়ে করেছিলাম তাকে ভুলে সখী-স্বপ্নবনের রকম বন্ধন ছিড়ে এই গাপে করছি—সমীচীন কি মোহের বশে? তখন আমি যখনই ছিলাম সত্য, প্রণয়-কৃত্যার আমার প্রাণ আকুল ছিল বটে, ছোট মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বলে আমার মেজাজ

বিগড়ে গেছিল সত্য কিন্তু আমি তো প্রণয়ের অব্যবধে এমিকে পরেছি। তবে কি সবই আমার জন্ম হয়েছ।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেবব্রতের শরীর অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, বাহিরের শীতল বাতাসের জন্ত সে ব্যাকুল হইল। থোকা তখন বেশ সুস্থভাবে ঘুমাইতেছে। দেবব্রত ব্যথারূপে সেই বান্দে বসিতে বলিয়া নিজে যেন অসহ্য ছিল থা’র হইয়া পড়িল। সে আনমনে চণ্ডালগিরি আরোহণ করিতে লাগিল, কোথায় বাইতেছে, কেন বাইতেছে কিছুই তাহার জ্ঞান নাই। রক্ত পক্ষের রাক্ষস, খুব জোরে বাতাস বহিতেছে, তাহারই মধ্যে অনাবৃত মস্তক দেবব্রত চলিল, বাহিরেও অন্ধকারও স্বচ্ছ, তাহার মনেও বিবাদের অন্ধকার, সন্দেহের ঋণ।

কিছুদূর আসিয়া রাস্তা ছইদিকে গিয়াছে, দেবব্রত কিছু না ভাবিয়া তন্মধ্যে দুর্গম পথটা ধরিল। কিছুদূর গিয়া দূর হইতে গানের আওয়াজ পাইল, সে সুর তো ইংরাজী বা পাখাড়ী গানের নহে। সেই মোহিনী সুর বেল দেবব্রতের প্রাণে আশার সঞ্চার করিল, যে দিক হইতে স্বরতরঙ্গ আসিয়া আসিতেছে সেই দিক লক্ষ্য করিয়া সে ছুটিয়া চলিল। ক্রমে সে এমন স্থানে আসিল যে আর উঠিবার পথ নাই—এদিকে গভীর বনগণ অত্যন্ত সরিয়াছে। সেইখানে দাঁড়াইয়া দেবব্রত তন্ময় চিত্তে গান শুনিতে লাগিল।

কাছে মাত্র দুই তিন খানা বাটা, কোথাও কেহ জাগিয়া আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে কে এই গান করিতেছে, কে তাহার সমুদে এই আশার আভাস দিয়াছে? অজ্ঞ পরে সে একটা প্রকাণ্ড বাঁকের মত বাগানের ভিতর ঢুকিল, যদি সেই গায়িকার সন্ধান পায় এই আশায়। সে যে পুরের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে, কেবল তাহাকে অপমান করিতে পারে তখন সে খোলাস তাহার ছিল না। ক্রমে সে এক উন্মুক্ত বাতায়নের নিয়ে উপনীত হইল, সেখানে গায়িকা সেই স্থলচিত্র কর্তব্যে মুগ্ধ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

এদিকে গায়িকা নিজ মনে গানের পর গান গায়িতেছে, তাহার কণ্ঠস্বর চারিদিকে মধু বর্ষণ করিতেছে। গানগুলি



বালা বলিয়া দেবব্রতের প্রাণকে অধিকৃত, স্পর্শ করিয়া বিভোর করিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে দেবব্রত কানিলেবে কে গাইতেছে ও গান ধামিতেই "সে বেশ উজ্জ্বল বসিল "গাও" আরও গাও, শ্রীতি, থেম না।"

গানিকা চমকিয়া উঠিল, তাহার প্রাণের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল। এ কি, কে ডাকিল? এ কি স্বপ্ন, এ কি মারা, না এ সত্য? কেন এত রাতে দেবব্রত আসিল, তবে কি ছেলেরা কিছু ইচ্ছায়ে।

সে সম্বর মুক্ত বাতায়নের কাছে গেল, বাহিরে দেবব্রতকে ওজন অবস্থার দেখিয়া শ্রীতি অধিকতর শঙ্কিত হইল। আবার আর এক চমকিতা তাহার মনে আসিল, দেবব্রত কি মনঃকণ্ঠে স্বরূপান আরত করিয়াছে? শ্রীতি ভরিত পরে নাথিয়া গেল, দরজা খুলিয়া সোজা দেবব্রতের কাছে উপনীত হইল। শ্রীতি দেখিল দেবব্রতের চোকে উদ্ভাস, মুখ বিবাদ-মাথা, শ্রীতি ভাবিল যে তাহার ছেলের কোন অমঙ্গল ইচ্ছায়ে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "খোকা ভাক আছে তো?"

দেবব্রত শুধু বলিল, "হঁ", তারপর অনিমেয় মননে শুধু শ্রীতির মৃণ্মনে চাষিয়া রাখিল।

শ্রীতি সাগ্রহ-ভরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি এই ঠাণ্ডার টুপি-কোট না নিয়ে এমন করে বেরিয়েছেন কেন? অস্থব করবে যে। এত রাতে এত দূরে একা এগিয়েই বা কেন?"

উত্তরে দেবব্রত বলিল, "মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলছে তাই একটি ঠাণ্ডা করবার আশায়। ছেলেরা একটু ঘুমিয়েছে সেখা বেরিয়ে পড়লাম। এতদূর আসব ভাবি নি, কেমন করে এতদূরে এসে পড়েছি তা জানি না। কোন পথ দিয়ে কেমন করে এসে আমায় টেনে এনেছে তাও বলতে পারি না, বোধ হয় কোন অজানি শক্তি প্রাণের দ্বারা আমাকে এনে ফেলেছে।" মাহুদ যখন একটা বড় জিনিসের সন্ধান সত্যই ব্যাকুল হয়, তখনই যে তা প্রাণটা পথ দেখিয়ে তাকে সেই-খানে নিয়ে যায়। তুমি যে এখানে থাক তা তো আমি জানতাম না।" আমি তো সে আশ দলকে এখানে এসেছি আর আজই তোমার দেখা পেলাম। এ নিয়তির বিধান।"

"আপনি কতকাল এসেছেন?"

"অশ্ব দ্বারীর উপর।"

"যদি এসেছেন তো বাড়ীর ভেতর খবর না দিয়ে এখানে শীতে লাড়িয়ে রইলেন কেন?"

"তোমাদের বাড়ী আমি কোন মুখ নিয়ে ঢুকব, যদি আমার ভাগ্যে এমন দিন আবার কখনও আসে যেদিন আমি তোমাকে নিতে আসবার অধিকার পাব, সেইদিন তোমাদের বাড়ী ঢুকব।"

শ্রীতি সে কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, "শীতে এতকাল দাঁড়িয়ে থেকে ভাল করেন নি।"

"কি আর হ'বে? আমার মজা-বাঁচা সবই সমান এবং আমি এখন মরলে সকলের পক্ষেই মঙ্গল হ'বে। আমি জীবনটা এখনই বিস্মৃত করে ফেলেছি যে আমার আর বাঁচা উচিত নয়। কেবল ছেলেরা জন্ম ভাবনা হয়, আমি ছাড়া তো তাকে দেখবার কেউ নেই।"

"কি সব পাগলের মত বক্তৃতা?"

"তুমি জান না শ্রীতি যে আমি কি জীবন্ত নরক ভোগ করছি; অবশ্য এ আলা ভোগ আমার করবারই কথা। তবে এটা ঠিক যে আমি মরলে এমির আনন্দ হ'বে, সে তো এ-বাধন ছিঁড়তে পারলে বাঁচে। আর তুমি—তুমি আমার মুখ না চাইলেও শান্তি পাবে। আমারই জন্ম তো তোমারও মৃত্যুর অন্তিমের জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। আমি বেঁচে আছি বলে তোমার বেদন হয় নির্মলকে বিবেক করতে দ্বিধা বোধ হচ্ছে। নির্মল যে তোমাকে খুব ভালবাসে তা আমি লক্ষ্যে থেকেই জানি। সে খুব ভাল ছেলে, সব রকমেই তোমার উপযুক্ত—তার স্বামী হওয়া দরকার। আমি এখন তোমাকে যতই ভালবাসি না কেন, আর তোমাকে পাবার ব্যোধ্য নাই। তুমি রাগি, তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস পাওয়া উচিত ছিল, আমার মত লোক তোমাকে পেতে আশা করতে পারে না। আর একজনের ব্যবহার করা দ্রব্য তোমাকে কি বলে অর্পণ করব, তুমিই বা তা নেবে কেন? তুমি নির্মলকে ভালবাসবে, তাই তো ন্যায়।"

"আপনার আজ কি হয়েছে? কেন এত বিচলিত হয়েছেন?"

"আজ চার বৎসর অনেক সচেষ্টি, আর পারছি না।

এতদিন পাপের প্রারম্ভ করলাম, আর তো নীরবে থাকতে পারছি না। শ্রীতি আজ যখন এমন করে তোমাকে পেয়েছি, আমার জীবনের ইতিহাস তোমাকে জ্ঞাত হ'বে। আমি আমার ভুলের জন্ম কতকষ্ট পেয়েছি জেনেও তোমার কতকটা তুলি হ'তে পারে।"

সেইখানেই দেবব্রত আত্মোপাস্ত সকল কথা বলিল, শ্রীতি নীরবে সকলই শুনিল। অবশেষে দেবব্রত বলিল, "শ্রীতি, তুমি আমাকে নারক করেছিলে এমিকে আমাদের বিয়ের কথা বলতে, পাছে তার স্বপ্ন নষ্ট হয়। এতদিন তোমার কথা শুনেছি এবং প্রাণপণ চেষ্টা করেছি যাতে সে স্বপ্নই হয় কিন্তু আজ আমাকে অহুতি দাও আমি তাকে সব বলি। আর এ জীবনের অতিনর আমার সহ হচ্ছে না, আমার প্রাণে অন্ততঃ একটু শান্তি পাই। আর পৃথিবীর সকলে জাহ্নব যে আমি কিঞ্চপ নারায়ণ। এইজন্মেই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্ম ব্যর্থ হ'য়েছিলাম। শ্রীতি, আমি তো এমির প্রতি শোন অভায় করি নি, যত অভায় তোমারই ওপর করেছি। তোমার কাছেও আমার কমা নেই, ভগবানের কাছে তো নেই। তবু আমি তোমার একটা অঙ্গরোধ করব, আমার অপরাধ নিও না।"

"আপনি যাতে শ্রীতি পারেন তাই করুন, আর আপনি কি চান বদন, আমার কন্যতার যতটুকু আছে আমি করব।"

"শ্রীতি, বেশী কিছু চাইবার অধিকার আমি চাই না—আমি চাই শুধু তোমার হাত ছ'বানি একবার ছুঁতে।"

শ্রীতি ছুটি হাত তখনই বাড়িয়া গিল। দেবব্রত তাহার হাত দুইটা একবার নিজের হাতের মধ্যে রাখিল। তাহার পর শ্রীতির ডান হাতখানি লইয়া নিজের মুখে ঘূলাইয়া, তাহাতে চুষন করিল। সব শেষে হাতে করিয়া শ্রীতির মুখটা তুলিয়া ধরিয়া সফল মননে সেই মুখের পানে চাটিয়া রাখিল, যেন সেই মুখটা চিরদিনের জন্ম দ্বন্দ্ব-পটে অঙ্কিত করিয়া লইল। কিছু পরে হঠাৎ শ্রীতিক ছাড়িয়া, "আমাকে বড় শান্তি দিলে, আমি চলুম" বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

শ্রীতি বিমোহিত, কি-কর্তব্যবিমূঢ়—যখন তাহার জ্ঞান হইল যে দেবব্রত সত্যই চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহার প্রথম

আকাজক হইল ছুটিয়া গিয়া দেবব্রতকে ফিরাইয়া আনিত, নিজে সকল ভ্রূণ, মান-অপমান তুলিয়া তাহাকে বলিতে, "ওগো, আমি তোমারই, তোমাকেই ভালবাসি, তোমার হৃদয়ের জন্ম আমি সর্ব করব।" তোমার ভ্রূণ আমাকে বড় কষ্ট দিতেছে।" কিন্তু ততক্ষণে দেবব্রত বহুর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ফিরাই অসম্ভব। কিছুক্ষণ একাকী দাঁড়াইয়া থাকিয়া শ্রীতি নিজেরই গেল কিন্তু সে ব্যস্তিত তাহার ঘুম হইল না। তাহার ভর হইতে লাগিল পাছে দেবব্রত কোন্‌ত নিজের কিছু অনিষ্ট করে।

এতদিন শ্রীতি তাহার মাকে বলে নাই যে তাহার দেবব্রতের সহিত দেখা বা কথা ইচ্ছায়ে কিন্তু আজ সে তাহাকে সকল কথা বলিয়া তাঁহার স্বপ্নামর্শ্ব সেইবার জন্ম দিতে হইল। এমন কি সেই স্বপ্নায় যখন সে রক্তমাথা বিজ্ঞাপকপত্র আসিয়াছিল তাহার মাকে শুধু বলিয়াছিল, "একটা ছেলে পড়ে গেছে, তাকে কোলে নিয়ে এই অবস্থা হয়েছে।" তাহার মা যখন জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কাহার ছেলে ও কাহার কাছে তাহাকে দিয়া আসিয়াছে, তাহার উত্তরে শ্রীতি বলিয়াছিল, "এক মনের ছেলে, তারই বাপ-মার কাছে নিয়ে এসেছি।"

পরদিন ভোরে উঠিয়াই শ্রীতি তাহার মাতার ঘরে গেল। তিনি তখনও ঘুমাইতেছিলেন। শ্রীতি আস্তে আস্তে তাঁহার ঘোপের ভিতর ঢুকিয়া তাঁর ঘুম ভাঙাইল। তিনি শ্রীতির পায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি অস্থব হ'য়েছে বা? এত ভোরে উঠে এসেছ? যে, এখনও ভাল করে কর্ম্য হয় নি?"

"মনটা বড় ব্যাথা হ'য়েছে মা, সেজন্য সাঁরাতে ঘুমাতে পারি নি। কাল যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আমার অত্যন্ত বিচলিত করেছে। মা, ভগবানের কি অভিজ্ঞার ব্যুৎপত্তি পারি না। কাল যে ছেলেকে তিনি আমার পায়ে রাখার কার্যে কেন্দ্র দিয়েছেন সেটা আমার কাছে তোমাকে বলি নি। সে তারই ছেলে।"

স্বরূপা চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চিন্তা কি করে?"

"ছেলেটাকে দেখেই আমি চিনেছিলাম, একেবারে তাঁর প্রতিমূর্তি। তারপর তিনি নিজেই এসে পড়লেন।"



“তোমার সঙ্গে তো সেই ছুঁচুরদিনের পরিচয়, সেও তো বহনই হয়ে গেল। তুই তাকেই বা ভিন্দি কেনম করে?”

“মা, তুমি কষ্ট পাশে বলে আমি একটা কথা তোমার কাছে মুকিয়েছিলম। মাসী ও আমার পাখড়ী ভিন্ন কেউ জানে না।” তাহার পর প্রীতি সেই লজ্জাও গ্রহণমে সাক্ষ্য থেকে আগের দিন রাতের সকল কথাই বলিল। শেষ বলিল, “কাল রাত্রে যে রকম তাঁর অবস্থা দেখেছি, মা, আমার বড় ভয় হ’য়েছে। আশা করি ভায়র ভায়র বাড়ী গেছেন।”

প্রীতি এতক্ষণ মায়ের মুক মুখ দেখিয়া কথা কহিতে ছিল, হুসবালা তাহার মুখটা তুলিয়া ধরিয়া কি যেন দেখিতে লাগিলেন। প্রীতির চোখে যে ভালবাসা ছুটিয়াছিল তাহা দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন।

হুসবালা মনুষ্যকে বলিলেন, “প্রীতি, তুমি তাকে কমা কর্তে পারবে কি? তোমাকে যে এত কষ্ট দিয়েছে তাকে কুলতে পারবে কি?”

“সে কি এতই শক্ত কথা না? মানুষে যদি একবার একটা ভুল করেই ফেলে, তারপর যদি সত্যই অশ্রুতপ্ত হয়, তাকে কি কমা করা উচিত নয়?”

“কি করবে কিছু কি ঠিক করেছ?”

“ঠিক আমরা কি করতে পারি বল, ঠিক করবার তো কিছু উপায় নেই। যে বাঁক বর্ধকল ভোগ করবে তে।”

“তুই মা কি করেছিলি যে তোকে তার সঙ্গে এত ভুগতে হ’বে? প্রীতি, এতদিন তুমি তো আমাদের কিছুই করতে দাও নি, এখন আমরা যা হোক একটা ব্যবস্থা করবার উদ্যোগ দেখি। এইবার হয় তো মেম টাকার বেলে আমাদের সহিত ফিরে যাবে, তা’ হলে আর কোনও ভাবনা বা গোলা থাকবে না।”

“কেন ব্যাট হচ্ছে মা, দেখাই যাক না শেক পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়। আমরা কেন কিছু করি, তিনি তো এখনও কিছু বলেন নি।”

“আমি যে নিশ্চিত হ’তে চাই রে, যদি হঠাৎ মরে যায় তোকে কার কাছে রেখে যাব, মা? কাকাবাবুও তো বুড়ে হ’য়েছেন, শরীরও ভেঙ্গেছে, তিনিই বা ক’দিন বাঁচবে?”

“কেন মা ভাবছ? তোমার তো খুবই কম বয়স আমরা দুজনে এখনও অনেকদিন একত্রে থাকব। আর তা ছাড়া দাঁশি তো আছে, সে তো আমার গায়ে আঁচ লাগতে দেনেক না।”

“সে তো আমি জানি মা, তার হাতে তোকে যদি দিয়ে যেতে পারতুম তা’ হ’লে তো স্বর্গেই মরতুম। সে যে হ’বার নয়, সমাজ যে তা’ হ’তে দেবে না, কত কুসঙ্গিত কথা ভুলবে। এ স্বর্গীয় সম্পর্ক অনেককেই বুলবে না। লোকেরই বা দোষ কি? স্বী পুরুষে যে বজ্রচলে না। কাঙ্ছেই যার সঙ্গে ধর্ম্মঃ তোমার এ জীবন বাঁধা তারই হাতে দিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিত হই; যদিও সে তোমাকে পাবার মোটেই উপায় নহে। তার ওপর আমার রাগ কখনও যাবে কি না জানি না। আমার মনেই যে সে অবশ্যক কষ্ট দিয়েছে, তার শাস্তি হ’বে না তো হ’বে কার? যদি পারতুম আমি এ সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলে দিতুম।”

“মা, তুমি ও-কথা বলে না, ভগবান যে বাঁধন দিয়েছেন মানুষের কি তা’ ছিঁড়ে দেওয়া উচিত? বা’ক আর এ সব প্রাণের কাজ নেই, তোমাকে সব কথা বলে যেন আমার প্রাণটা হালকা হ’ল। তোমার কাছে কিছু ধুকোতে বড় কষ্ট হয়।”

“তুই ভুলে তো আমার কাছে সব কথা বলে বলি নি, এখনও তোমার নিজের কি ইচ্ছা তা’ তো জানি না। আমিও এতদিন যে কেনম করে এত আদ্ব হ’য়েছিলম জানি না। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে তুই তাকে ভালবাসতে পারবি। আজ তোমার চোখের চাহনিতে তোমার অন্তরের কথা আমি জানতে পেরেছি। আজ বুঝছি যে সে নিজে এগেই তুই তার সব দোষ ভুলে তার কাছে যাবি।”

“আর একজনকে স্বপ্নেই করে আমি কখনই যাব না, এটা জেনে মা। তিনি তো অনেক দিনই আমাকে ভাঙ্কছেন কিন্তু তা হ’বে না।” এই বলিয়া প্রীতি তাহার মাতার অশ্রাব্যত্যাগ করিল ও চলিয়া যাইতে উজত হইল। হুসবালা বলিলেন, “একটা লোক পাঠিয়ে খবর নাও সব কেনম আছে।”



### নাথলা ছন্দে ধর্ম্মভিত্তিক

বাংলা ছন্দের মূল প্রবাহ হচ্ছে তিনটা—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। তার মধ্যে অক্ষরবৃত্ত অনেকটা আড়ষ্ট—এর গতি স্বচ্ছন্দ নয়। এ ছন্দকে কেটে ছেটে বইয়ের রূপ অনেকটা পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু এর ভিতরের গঠনে বিশেষ বৈচিত্র্য সাধন করা যায় না।

কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে মাগোপ-বিয়োগে বাহু আকৃতি পরিবর্তনীয় হইলেও অন্তরপ্রকৃতিতে অনেক বৈচিত্র্য ঘটান অসম্ভব নয়।

গিগলপ, পদ্যাব, ত্রিপদী, চৌপদী সকলেরই মূল ধর্ম্মটা এক, বৈচিত্র্যহীন। বাংলা ছন্দের এই মৌলিক ক্রটির অবসান ঘটাবার অভিপ্রায়ে প্রায় হ’লেই বছর বাবৎ বাংলায় সাত্ত্বক ধর্ম্মভিত্তিক (রিথম) প্রবর্তনের অবিদ্যায় চেষ্টা চলে আসছে। পরম ছন্দবিৎ ভারতচন্দ্রই এ প্রচেষ্টার প্রথম প্রবর্তক।

বাংলায় সাত্ত্বক ছন্দ অর্থাৎ ধর্ম্মভিত্তিক-প্রবর্তনের ইতিহাস খুবই বিস্তরক। যা হউক, যে সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তন করলেন সে সময় থেকেই বাংলা ছন্দের ধর্ম্ম ভিত্তিক (“রিথম”) উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ইহার উৎপাদনের অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী বাঙালী কবিরা শত শত বৎসর চেষ্টা করেও ‘বা’ করতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথ অনায়াসেই

তা’ পারলেন। রবীন্দ্রনাথই বাংলায় একমাত্র ছন্দপটী ধবি।

রবীন্দ্রনাথের পথ অহমসর করেই সত্যোক্তনাথ ছন্দ। মিত্রজ্ঞান পথে আরও কতকটা অগ্রসর হয়েছেন। তিনিই অতি সূক্ষ্মভাবে ধর্ম্মভিত্তিক-স্বর মূল কথাটা আবিষ্কার করেছেন, যার ফলে এখন বাংলায় নব নব ও বিচিত্র উপায়ে স্বরতরঙ্গের সৃষ্টি করা সম্ভবপর হ’য়েছে। তবে তিনি রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত ছন্দভেদের উপর কার্যকারণ করেছেন মাত্র।

বাংলায় দীর্ঘবর কার্য্যতা না থাকলেও বাংলার সন্তক মূল ধর্ম্মভিত্তিক ছন্দের তরক থেকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) লম্ববৃত্ত, এবং লম্ববৃত্ত ব্যঞ্জন, যথা অ, আ ই, ঈ, ক, কা, কি, কী, ইত্যাদি। এগুলি সবই অমৃগ ব’লে, এদের অমৃগ স্বরও বলা যায়। (২) যুগ্মবর বা যুগ্মবৃত্ত ব্যঞ্জন, অই (ঐ), অউ (উ), আই, উই, ঐ, ঐ, ভাই, ছই, ডেই, ইত্যাদি। যুগ্মবরগুলি সবই স্বর্য্যন্তিক। (৩) ব্যঞ্জনাত্মিক যুগ্মবর, যথা—অন, ইন, অস, উস, ওস, মন, ঈন, ঘস, দুস, স্বস, ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীর অমৃগ ধর্ম্মভিত্তিক লম্ব অর্থাৎ একমাত্রিক, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর যুগ্মধর্ম্মভিত্তিক গুরু অতএব দ্বিমাত্রিক। বাংলায় দীর্ঘবর না থাকলেও এই একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক ধর্ম্মভিত্তিক পরিণামবিত্তাসের দ্বারা বাংলা ভাষায় যে বহু রকমের স্বরতরঙ্গ উৎপন্ন করা সম্ভবপর তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাংলায় স্বরতরঙ্গ সৃষ্টির মোটামুটি



তিনটি উপায় আছে বলা যেতে পারে। প্রথম উপায় হচ্ছে প্রচলিত মাজারত ছন্দে শরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে যেখানে, তাতেই নির্দিষ্ট মাজারের রাখার জিন্দে মৃত্যু বা বিখ্যাতিক ধর্মের প্রয়োগ বেশী হয়, ফলে ছন্দ ভঙ্গিত হয়ে ওঠে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) কলস-ঘারে উদ্ভিট টুটে  
রন্ধি রাশি চুপি উঠে,  
শান্ত বায়ু প্রান্ত নীর  
চুপি যায় কত।

রবীন্দ্রনাথ

এটা পঞ্চমাত্রিক ছন্দ। কিন্তু এর কোন পক্ষেই পাঁচটি স্বর নেই, চার কথা তিন স্বরের সাহায্যেই পাঁচ মাজার পরিমাণ বলা করতে হয়েছে।

(২) এ নহে মৃগের বন-মর্গের গুহিত,  
এবে অজ্ঞানগর গরজে সাগর সৃষ্টিছে;  
এ নহে হুগ-কুগ-কুহুম রঞ্জিত,  
কেন-হিমোল কল-কলোলে ঢুলিছে।

রবীন্দ্রনাথ

এটা ষষ্ঠ্যত্রিক ছন্দ, অর্থাৎ কোন পক্ষেই ছাট লঘুমাত্রা নেই। ছন্দতন্ত্র উপাদানের বিস্তার উপায় হচ্ছে প্রচলিত স্বরবৃত্ত ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া। তাতেও যুগ্মধর্মের সংখ্যা বেশী হয় এবং লাভলীলার দৃষ্টে স্বর করে। এখানে আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

(৩) বেদুশাখার অন্তরালের অন্তরালের রবি  
আঁকবে মেঘে মুছে বৈ আলোর শেষ বিদায়ের ছবি।  
খিলি যেমন শালের বনে মিন্দ্রানীরক রাতে  
অন্ধকারের জগের মালায় একটানা স্বর গাণে।

রবীন্দ্রনাথ

এটা চতুষ্রয় ছন্দ। অর্থাৎ প্রতি পক্ষেই চারের বেশী মাত্রা থাকে; কোন সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে ধর্মমাত্রার পর্যায় বিস্তার করতে হ'লে বাংলা ছন্দের অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে খনিষ্ঠ পরিচয় রাখা চাই।

বাংলা ছন্দের ধর্মনিতে উত্থান পতনের তরঙ্গলাল

নির্ভর করে প্রধানত তিনটি তত্ত্বের উপর—(১) বাংলা ছন্দপক্ষে দৈর্ঘ্য অর্থাৎ তার ধর্মসংখ্যা ও মাত্রাপরিমাণ; (২) বাংলা ছন্দের উচ্চারণ পদ্ধতি, ধর্মের গতি-ক্রম ও বিরতি, ছন্দের বৈকি বা আকস্মিক এবং যতি; (৩) লঘু ও গুরুমাত্রিক ধর্মের পর্যায়-গমনবোধ। এই তিনটি তত্ত্বের মধ্যে প্রথম দুটি পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ; প্রকৃতপক্ষে এরা দুটি পৃথক তত্ত্ব নয়, একই তত্ত্বের দুটি দিক মাত্র।

একটি ষ্ট্রোকের দ্বারা ই আমাদের উচ্চারণ পদ্ধতি অর্থাৎ উচ্চারিত ধর্মের গতি ও বিরতি নিয়ন্ত্রিত হয়। গতির বেগানে আরম্ভ সেইখানেই পড়ে বৈকি, আর যেখানে সেই গতির অবসান ঘটে সেখানটাকেই বলে যতি। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

সধি প্রাতিমনি হার। এসে কিরে যায়। কে।  
তারে আমার মাথার। একটি কুহুম। যে।  
যদি তুমি ধরে দিল। কোন দুল-কান। নে,  
তোার শপথ, আমার। নীচিটি বসি। নে।

রবীন্দ্রনাথ

বৈকি ও যতির মধ্যবর্তী যে অংশ তাকেই বলাই ছন্দ-পক্ষ। উক্ত দৃষ্টান্তের প্রত্যেক পাঙক্তিতে তিনটি করে পক্ষ আছে, তাই এ ছন্দকে 'ব'ধ' ষ্ট্রিক্সিক। এ ছন্দের তত্ত্ব হচ্ছে ধর্মমাত্রার সাম্য। এখানে প্রত্যেকের ছাট ক'রে ধর্মমাত্রা আছে; তাই ছন্দকে 'ব'ধ' ষ্ট্রিক্সিক ছন্দ; এখানে প্রত্যেক পাঙক্তিতেই প্রথম পক্ষের পূর্বে ছাট ক'রে মাত্রা স্থাপিত হয়েছে। অতি মূর্তভাবে এদের উচ্চারণ করতে হয়। তাই এ ছাট মাত্রা কোনো বৈকির একাকার আদ্যোনা; তাই এ ছাট মাত্রাকে 'ব'ধ' অতি পক্ষিক মাত্রা। মাত্রা-বৃত্তের হার স্বরবৃত্ত ছন্দেও অতি-পক্ষিক শব্দ 'যোজনায় ব্যবস্থা করা যায়। স্বরবৃত্ত ছন্দের অতি-পক্ষিক শব্দকে মাত্রা না ব'লে অতিপক্ষিক স্বর বলাই সম্ভব; কেননা ওই ছন্দে স্বরসংখ্যায় রচনার ভিত্তি, ধর্মমাত্রা নয়। অতি-পক্ষিক মাত্রা কিংবা স্বর কোনো ছন্দেই ছাট বৈশি ব্যবহার না করা ই চাই। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অতি-পক্ষিক শব্দ 'যোজনায় ব্যবস্থা নেই। রবীন্দ্রনাথ

অতি-পক্ষিক মাত্রা ও স্বর ব্যবহারের প্রবর্তন ক'রেছেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

দূরে অশ্ব-তলায়  
পুষ্টির কণ্ঠধ্বনি গলায়  
বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছে?  
সামনে অভিভাবত  
তোমার একতারাটা হাতে  
তুমি হার গাণিয়ে নাচো।

রবীন্দ্রনাথ

এটা স্বরবৃত্ত ছন্দ। এবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অতি-পক্ষিক মাত্রার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

অত চুপি চুপি কেন। কথা কও  
ওগো মরণ, যে মোর। মরণ!  
অত ধীরে এসে কেন। চেষ্টে রও,  
ওগো একি প্রণয়ের। ধরণ?

রবীন্দ্রনাথ

এটা ষষ্ঠ্যত্রিক অর্পণ ষ্ট্রিক্সিক ছন্দ।

বৈকি ও যতি স্থাপনের বৈচিত্র্য

আমরা দেখেছি পূর্বসংখ্যার দ্বারা ছন্দের বাইরের আকৃতি মাত্রা নিয়মিত হয় কিন্তু ছন্দের অন্তরের গঠন নির্ভর করে ওই পক্ষের নির্ধারণ-প্রণালীর উপর। পক্ষের নির্ধারণ প্রণালী আবার নির্ভর করে ছাট জিনিষের উপর।

(১) বৈকি এবং যতি,—এই দু'জিনিষের দ্বারা প্রত্যেক পক্ষের অন্তর্গত ধর্মের আয়তন নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি বৈকি ও যতি যখন যখন স্থাপিত হয় তবে পক্ষের আয়তন বৃদ্ধি ও ধর্মের গতি ক্ষুদ্র হয়; আর বৈকি ও যতি যদি যখন যখন স্থাপিত না হয় তবে পক্ষের আয়তন দীর্ঘ এবং যতির গতি বিস্তারিত হয়। এই বৈকি ও যতি স্থাপনকেই অজ কথায় তান বলা হয় এবং ধর্মের গতিক্রমকেই স্বর বলা হয় যখন যখন তাগে প্রসৃত এবং বিরল তাগে লব্ধ বিস্তারিত হয়। (২) জিনিষের পক্ষের নির্ধারণ-প্রণালী ধর্মবিভক্তির প্রকার ভেদের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি শুধু ধর্ম বা স্বরের

সংখ্যার উপর নির্ভর ক'রে ছন্দ রচিত হয় তবে সে ছন্দকে 'ল'গন স্বরবৃত্ত যদি শুধু ধর্মের মাত্রাপরিমাণের উপর ছন্দকে দাঁড় করানো যায় তবে সে ছন্দ মাত্রাবৃত্ত। যদি একধারে ধর্মসংখ্যা ও ধর্মমাত্রা স্থির রাখা হয় তবে তার নাম দেওয়া যায় স্বরমাত্রিক ছন্দ। আর যদি বিশেষ উপায়ে স্বরসংখ্যা ও ধর্মমাত্রার মিশ্রণ ক'রে তথাকথিত অক্ষর সংখ্যা ষ্ট্রিক রেখে ছন্দ রচিত হয় তবে তাকে 'অক্ষরবৃত্ত' সংজ্ঞা দেওয়া যায়। এ স্থলে বৈকি ও যতি-স্থাপনের বৈচিত্র্যের দ্বারা ছন্দের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাই দেখাব।

অতি চুপি চুপি কেন। কথা কও  
অতি ধীরে এসে কেন। চেষ্টে রও

এখানে উভয় পাঙক্তিতেই ছাট অতি-পক্ষিক মাত্রা আছে। বৈকি এবং যতির পরিবর্তনের দ্বারা এ ছাট পাঙক্তিতে কত পরিবর্তন আনা যায় এবার তাই দেখা যাক।—

অত চুপি চুপি কেন। কথা কও,  
এটা ষষ্ঠ্যত্রিক অর্পণ ষ্ট্রিক্সিক ছন্দ।  
অত চুপি চুপি কেন। কথা কও

এবার তিনটি বৈকি ও তিনটি যতি; চার মাত্রার পরেই ধর্মগতির অবসান। এ ছন্দ আর ষষ্ঠ্যত্রিক রইল না। এটা ছন্দ চতুষ্রয়িক অর্পণ ষ্ট্রিক্সিক ছন্দ।

অত চুপি চুপি কেন। কথা কও  
আবার ছন্দ বদলে গেল। এটা ষষ্ঠ্যত্রিক পূর্ণ ষ্ট্রিক্সিক ছন্দ।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব। হরমে  
এ ছন্দ হবে ষষ্ঠ্যত্রিক অর্পণ ষ্ট্রিক্সিক। কিন্তু যদি বৈকি ও যতি আরও যখন যখন স্থাপন করা যায়;—

ঐ আসে। ঐ অতি। ভৈরব। হরমে  
তবে ষষ্ঠ্যত্রিকের বদলে এ ছন্দ হ'ল চতুষ্রয়িক অর্পণ চৌপক্ষিক। একটা পক্ষেই বেড়ে গেছে এখানে।

ভুবন মিলিয়ে। মৌর অঞ্চল। বর্নিত্তে,  
বিশ্ব নীরব। মোর কণ্ঠের। বাণীতে,

রবীন্দ্রনাথ



একে যথাক্রমে অপর ত্রিগুণিক ছন্দ বলব। কিন্তু একে চতুর্মাত্রিক ছন্দের ভঙ্গীতেও পড়া যায়। যথা—

ত্বম নি- | লক্ষ্ম মোর | অঞ্চল | বানিতে  
বিশ নী- | রব মোর | কঠোর | বাগাতে।

অনেক সময় একেকটা সমগ্র কবিতাকেও ছরকম ছন্দে পড়া যায়। রবীন্দ্রনাথের “নিদ্রারাজ” ও “মনের মাচুল” কবিতাটি এর একটি হৃদয় নিদর্শন। একটু নমনা দেখাচ্ছি।—

আজ এক | হয়ে তারা  
মোরে করে | মাতোরা,  
এক বীণা- | রূপ ধরি'  
এক গানে | ফেলে ছায়া।

—রবীন্দ্রনাথ

এ ভঙ্গীতে পড়লে এ হ'ল চতুর্মাত্রিক ছন্দ; বিপরীক পূর্ণ চৌপদী। আবার একে যামাক্রিক ছন্দেও পড়া যায়।—

আজ এক হয়ে | তাঁরা  
মোরে করে মাতো- | তারা,  
এক বীণা-রূপ | ধরি'  
এক গানে ফেলে | ছায়া।

যে কোঁক এবং যতির দ্বারাও ছন্দে এক প্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি হয় সে তরঙ্গকে বলতে পারি “পল্লিক তরঙ্গ”, কারণ পল্লিকে আশ্রয় করেই ঐ তরঙ্গের উদ্ভব হয়। কোঁক ও যতি যত ঘন সরিষিটি হবে ছন্দের পল্লি-তরঙ্গও ততই লীলায়িত হ'বে উঠবে; আর কোঁক ও যতির সীমাবদ্ধ হবে দুর্লভী হবে পল্লিতরঙ্গ ততই দীর্ঘায়িত ও তার লীলা মুগ্ধতর হবে।

দেখো নাকি, হায়, | বেলা চলে যায়।  
সাঁরা হ'য়ে এস | িন।  
বাহু পূরবার | ছন্দে রবির।  
শেষ রাগিণীর | বীণ।

রবীন্দ্রনাথ

এটা হ'ল যামাক্রিক পল্লির ছন্দ অর্থাৎ স্থলীক ছ'মাত্রার পর একবার করে কোঁক আসছে। একেকটা পল্লি অত্যন্ত দীর্ঘ বলে তাঁর তরঙ্গও খুব আঁত। তাই তরঙ্গের

লীলাও খুব মধুর, এমন কি সত্যক ন' থাকলে এর আঁতই ধরা পড়ে না। উক্ত দৃষ্টান্তটির সঙ্গে নিম্নলিখিত পল্লি-গুলির তুলনা ক'রলেই এ কথার তাৎপর্য বোঝা যাবে।—

পৌষ প্রণব | শীতে জ্বলন্ত | যি-লি-মুখর | রাতি,  
নিমিত্ত পূরী, | নির্জন ঘর, | নির্দোষ লীপ- | বাতি।

—রবীন্দ্রনাথ

চার, তিন এবং দুই স্বরে ও ছন্দের পল্লিগুলিও ছোট ব'লে স্বর বৃত্ত ছন্দের পল্লিতরঙ্গ খুব ধরপতি। যথা—

(১) হ্রস্ব সহস্র | তপতাতোই | কোঁক বাঙালীর | জয়,  
ভরকে যারা | মানে তারাই | জাগিয়ে রাখে | ভয়।  
মৃত্যুকে যে | এড়িয়ে চলে | মৃত্যু তারেই | টানে,  
মৃত্যু যারা | বুক পেতে নয় | বাঁচতে তারাই | জানে!

রবীন্দ্রনাথ

এটা চতুঃস্বরপল্লিক ছন্দ। এবার ত্রিস্বর পল্লিকের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(২) ওর তরে | ম'হুরে | নদী হেথা | চলেছে,  
জলপিপি | ওর মুখ | বোলু বৃষি | বোলছে।  
ছই তীরে | গ্রামগুলি | ওর জয়ই | গাইছে,  
গজ্ঞে যে | নৌকো সে | ওর মুখই | চাইছে।

সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে প্রতিপর্বে তিনটা ক'রে স্বর। তাই এর পল্লি-তরঙ্গ চতুঃস্বরের পল্লিতরঙ্গের চেয়ে বেশি লীলায়িত। ছই স্বরের পল্লিতরঙ্গ আরও বেগবান। যথা—

(৩) চুপ চুপ- | ওই ডুব | জ্বাণ পান- | কোঁটা,  
জায় ডুব | উপ উপ | ঘোমটার নড়তি।  
বন্ধক- | কলসীর | বন্ধক- | শোন গো,  
ঘোমটার | কাঁক বর | মন উন- | মন গো।

সত্যেন্দ্রনাথ

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পল্লিতরঙ্গ অত্যন্ত চিত্তে ততোলা পোছের প্রায় সেই বয়েই হয়। বাস্তবিকপক্ষে এ ছন্দ প্রায়ই যথ পল্লির তাগে চলে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দেখতার তবগীতে। দেবের মানব করি' আনে,  
তুলিব দেবতা করি'। মাছপেরে মোর ছন্দে গানে।

রবীন্দ্রনাথ

এটা আট ও দশ অক্ষরের বিপদী ছন্দ। এখানে এক কোঁক আট ও দশ অক্ষরের একেকটা বড় বড় পদ অন্তিম ক'রতে হয় ব'লে এ ছন্দের পল্লিকতরঙ্গ এমন নিতেন্দ্র। আমরা দেখবু যে অক্ষরবৃত্তে পব'তরঙ্গ প্রায় নেই; কিন্তু মাত্রাবৃত্তে ও স্বরবৃত্তি ছন্দে পব'তরঙ্গ আছে এবং তার বেছিভাগ আছে। মাত্রাবৃত্তে পব'তরঙ্গ হ'তে পারে তিন রকম—চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক এবং ষষ্ঠমাত্রিক। স্বরবৃত্তের পব'তরঙ্গও তিন রকম—ত্রিস্বরপল্লিক, ত্রিস্বরপল্লিক ও চতুঃস্বরপল্লিক। কিন্তু এক বিষয়ে এই সব রকম তরঙ্গই সমধর্মী; কারণ এই সব তরঙ্গেই উচ্চারণের কোঁকটা থাকে গোড়ার দিকে। কথা বলার সময় আমরা যে কোঁক দেই সেটা অবশ্য অনিবার্য অর্থাৎ ক'টা শব্দের পর আবার কোঁক হবে তার কিছু নিয়ম নেই; ভাব-প্রকাশের প্রয়োজন অনুসারেই ঘন বা বিরল ভাবে কোঁক পড়ে। কিন্তু আমাদের নিত্যকথিত বাৎসার উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য ক'রলে দেখা যাবে যে সঙ্গীতের ছাট কোঁকের মধ্যে চার পাঁচটার বেশি স্বরলক্ষী অথবা ছ'মাত্রার বেশি ধ্বনিতা থাকে না। একটা দৃষ্টান্ত—

“কোঁকালিজ ব'লে গেচেন,—সমুদ্রে জল সর্কতাই, কিন্তু  
কোঁটা জল নেই যে পান করি' সমুদ্রের সমুদ্রে আছি,  
কিন্তু এক মুহূর্ত্ত সঁময় নেই।

রবীন্দ্রনাথ

কোক যখন অর্থের বাহন হিসেবে অনিবার্য ভাবে স্থাপিত হয় তখনই ভাষা হয় গজ, আর কোক যখন নিয়মিত ভাবে স্থাপিত হয় তখনই ভাষা হয় গজ। কোককে নিয়মিত করার মানে হচ্ছে টিহ কোকের মধ্যবর্তী ধ্বনিতাথ্য বা মাত্রাপরিমাপ নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া। কোক যদি চার স্বরের পর পর আসতে থাকে তবেই যে ছন্দ হয় চতুঃস্বরপল্লিক, আর যদি ছ'মাত্রার পর পর আসতে থাকে তবে যে ছন্দ হবে ষষ্ঠমাত্রিক। বেছে বেছে শব্দ প্রয়োগ ক'রে এভাবেই ত্রিস্বর, ত্রিস্বর এবং চতুঃস্বরপল্লিক ও পঞ্চমাত্রিক ছন্দ রচিত হ'য়ে থাকে।

বাংলার কিছু কোনো শব্দেরই প্রকৃতিগত কোকপ্রবণতা

নেই। সব শব্দই স্বভাবত সমান নিত্যরঙ্গ। বাংলায় যে কোকের কথা পূর্বে বলেছি সে কোনো শব্দেরই প্রকৃতিগত নয়, সে কোক আমাদের উচ্চারণগত। ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্তই আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে কোক দিয়ে কথা বলি; এক সময় সে কথার উপর কোঁক দিলুম আরেক সময় সে কথার উপর কোঁক নাও দিতে পারি।

বাংলার উচ্চারণ-কোঁকের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ওই কোক সর্গদাই শব্দের আদিতে স্থাপিত হয়, কখনও অন্ত্যে স্থাপিত হয় না। তার ফল এই হয়, যে বাংলা গজ্ঞে ওই কোকটাই একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে; বাংলা গজ্ঞে কিন্তু ওই কোকের দ্বারা একঘেয়েয়ের সৃষ্টি হয় না; কারণ গদ্যে কোকের ব্যবস্থান নিয়মিত নয়; তা ছাড়া ওই কোক অর্থকেই অনুসরণ করে ব'লে এবং শ্রোতার নিকট অর্থই একমাত্র লক্ষ্য ব'লে অনেক সময় ওই কোকের অন্তত্বই অস্বত্ব হয় না। বাংলার কিছু চতুঃস্বরের ছন্দের প্রয়োজন মন চেয়ে বেশি; তবে যুব নিপুণ ভাবে শব্দ প্রয়োগ করে ত্রিস্বর ও ত্রিস্বরের ছন্দও বাংলার বেশ রচনা করা যায় এবং তার ছন্দ-সৌন্দর্য্যও কম হয় না।

বাংলার পল্লিবিভাগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের উপস্থাপনার কোকও স'রে যায়; কারণ ওই কোক উচ্চারণের উপরই নির্ভর করে, শব্দের উপরে নয়। যথা—

এটি বলি। গৃহ কোণে

বসিলাম। দৃঢ় মনে

গেবকের। বোগাগনে

পাশে। ল'য়ে মসীপাঞ্জ;

রবীন্দ্রনাথ

এটা হ'ল চার মাত্রার বিপরীক চৌপদী ছন্দ; প্রতি পদে ছ'টি করে পল্লি এবং প্রতিপর্বের আদি স্বরের উপর কোক। পল্লিবিভাগের পরিবর্তন ক'রে দেখি—

এত বলি-। গৃহ কোণে

বসিলাম দৃঢ় মনে

গেবকের বোগাগনে,

পাশে ল'য়ে মসী। পাঞ্জ।



এটা ছ'মাত্রার ছন্দ; প্রতি পদে একটি পূর্ণ পদ (ছ'মাত্রা) এবং একটি অসূর্ণ পদ (ছ'মাত্রা) রয়েছে। কাজেই এটা ছ'মাত্রার অসূর্ণ বিপক্ষিক চৌদ্দা ছন্দ। বাহ্যে, এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক পদেই প্রথম পদের আদি স্বরের ষোড়শ টিক থাকলেও দ্বিতীয় পদের ষোড়শ টিক ছ'মাত্রা মানে গেছে। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

যবে কিরে আসে গোটে। গাভীদল  
সারা দিনমান মাঠে। জমিয়া

রবীন্দ্রনাথ

### বনমালী-বন্দনা

(চন্দ-চরিত-নীল কলবর—সুর)

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

গোপিকা-রঞ্জন-সীতা-চিরন্তন মাধবী-মধুবন-মাগে,  
রঞ্জিত-পবন-গুণ-ধরিত-মহী-র মৌন বাশরী খাঙ্গে।  
পুঞ্জ-পুঞ্জ অলি গুঞ্জন ঘনঘন নবর-অঙ্গর-মধু-ভোগা,  
কৈকি কুহ-কুহ সঙ্গীত সুহ-সুহ যখন। কলহাসে বেগা।  
চালে ব্রজাসনে প্রেম-পূর্ণ-রস-মৌন-বিকসিত-তালি।  
কৈশোর-নন্দিত-সুন্দর-রসময় জয় জয় জয় বনমালি।  
মুগ্ধ গোপালনা মধুমধন-বিগ্রহ রসঘনানন্দে,  
গোকুল-পুষ্করি-অন্তর-শতল নন্দিত তব পর-গন্ধে।  
নন্দ-শ্রীমদন পূর্ণরূপ-ছবি পূর্ণ মোহালি ধানে,  
ভারতবিকুল-আদিত্য-নন্দিত রুক-নারায়ণ-জানে।  
চিররস-সঙ্গিনী ব্রজরস-সঙ্গিনী বনে বনে চিরচতুর্ভাঙ্গী  
কৈশোর-নন্দিত-সুন্দর-রসময় জয় জয় জয় বনমালি।  
কালীয়-মর্দন নটবর-কুঞ্জর তরুণমার্গদ্বন্দ্ব ভঙ্গে,  
ক্রান্তি ব্রজরস-কংসবাহুর সাধার বৃষপদ-পদে।  
রাধা রাসেশ্বরী ঘনভূজ-বন্দন মধু গিলন-বিলাসী,  
প্রেমকল্লভর, ধীন ভক্তজন রাতুল-পদ-অভিলাষী।

এটা ছ'মাত্রার অসূর্ণ বিপক্ষিক ছন্দ। প্রত্যেক পংক্তি আশে পাশে ক'রে অতি-পরিমিত মাত্রা আছে। পর-বিভাগ পরিবর্তন করা যাবে।

যবে কিরে আসে। গোটে গাভীদল

সারা দিনমান। মাঠে জমিয়া—

এখানে অতি পরিমিত মাত্রা টিকিও পদের অস্বত্বক করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পর-বিভাগে বড়ই পরিবর্তন করা বাৎসরিক, বাংলা। প্রতিপদের আদি-স্বরের উপর বোঝা থাকবেই।

শ্রীপ্রবোধেন্দ্র

(বিচিত্র—পৌষ)

নিত্য পবিত্রতম ব্রজবালক নাচত ঘন কলতালি।

কৈশোর-নন্দিত-সুন্দর-রসময় জয় জয় জয় বনমালি।

কুহু-কুহু কাণ-বিমণ্ডিত উদ্গম বোল-বিহারী।

চাপু-মুগ্ধ-নির্জিত-কর্ণের গোকুল-কলি মিথরাধারী।

কুলন-মহোৎসব-নন্দিত-মাধব গণ্ডিত-বল্লভীবালা,

ভক্ত-সুন্দর-পূর্ণ-বেদন-বিচলিত লম্বিত ঘন বনমালা।

রাস-সুন্দর-পূর্ণকিতা গোপিকা নিবেদিত অন্তর-ডালি।

কৈশোর-নন্দিত-সুন্দর-রসময় জয় জয় জয় বনমালি।

ধার্মিক-পালক চকুত-নাশন, পাবন প্রেম-স্বভাৱা,

স্বয়ং-সুন্দর-চিত্র-সুন্দরনৈ মোহিত বাশরী-গানে,

রঞ্জিত কব প্রভু জীবন শতল রাতুল পদতল দানে।

রাধ মম মধুরি অন্ধ-তমস্বিনী নিত্য রূপালোকে আলি,

কৈশোর-নন্দিত-সুন্দর-রসময় জয় জয় জয় বনমালি।

### শান্তিপুত্র-চিত্র

(পূর্ণপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য

আট

ইতিপূর্বে লসাহেব শান্তিপুত্রবাসীর উৎকোচ-প্রণ-প্রভার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপূর্বে মিশনাতিগণ শান্তিপুত্রবাসীর 'সত্যপ্রবেশ অবিক্রম' ও 'নৈতিক অদ্ব-কৃতি'র বিষয় লিখিয়াছেন—ইহাও বর্তমান প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে' বাদ-প্রতিবাদ রূপে বাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। প্রথমে ২৩শে মার্চ ও পরে ২ই এপ্রিলের 'দর্পণে' শান্তিপুত্রবাসী ও নবীয়া জেলার অজ্ঞ ভূষামিগণ সরকারী কৰ্ণচারীর উৎকোচপ্রণে, উকীল প্রথা উত্তীয়া বাওয়ার প্রণার আনন্দ প্রভৃতি আইন-আদালত-সংক্রান্ত অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। তখন শান্তিপুত্র মহাকুয়ার সময় ছিল। ২৩শে এপ্রিলের 'দর্পণে' কুলনগরবাসীরা উত্তর দেন যে নাজীর কর্তব্যপারায়ণ ও কর্তব্য, যুবের কথা সর্বদা বিখ্যা, ইত্যাদি। তদন্তের ৮ই জুনের 'দর্পণে' শান্তিপুত্র ও তদন্তের ৮ই গ্রামবাসী অভিমান প্রায় ৩০ জন লোক (নাম সাধক নাই) আদালতের নানারূপ গলদ দেখান, এবং কেবল শান্তিপুত্রে মুক্তিগের স্বথ্যাক্তি করেন।

শ্রীমত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপে।

আপনকার দর্পণের দ্বারা এদেশের যে কি মঙ্গল হইতেছে তাহা পড়ে লেখা বাহুল্য সম্ভ্রান্তি আপনকার জাহাযির মাসের দর্পণে প্রকাশ করেন যে শ্রী শ্রীযুক্ত গবর্গর জেনরল বাহাদুর হজুর কোন্সেলে এই ইশতেহার দিয়াছেন যে ১৮৩৩ মাসের পক্ষম আইনে ও দ্বিতীয় আইনে প্রজালাকের কি উপকার ও অহুপকার তাহা হজুর জানাও অতএব তাহার হজুরাও আমরা নীচে লিখিতেছি আপনকার দর্পণে স্থান প্রকাশ করিলে অবশ্যই তাহার বিবেচনা হইতে পারিবে।

১ দফা। এ আইনের দ্বারা বাঙ্গালিদিগের অধিক ভার দিয়াছেন তাহাতে দেশের কি পর্যন্ত মঙ্গল হইয়াছে তাহা কি জানাইব কিন্তু আপনে সেই সকল কথা অর্পণ

হইবাতে আমরা বড় চমক পাইতেছি যদি এই সকল কথা সদর দেওয়ানীর জবাবদেহে দিখা কোন্সেলে ইমতিহাস (২) নবীয়া বেগা অযোগ্য বিবেচনা করিয়া লোক মোকরব (২) করেন তবেই সর্গদারগণ লোকের মঙ্গল হইতে পারে নতুবা জিলার হাকিমেরা আপন অহুগত মোকরব করিয়া প্রজালাকে বড় জালাতন করিতেছেন।

২ দফা। যদি মুন্সিফের উপরে লাথেরাজের মোকদ্দমা করিবার ভার হইত তবে সর্গদার মঙ্গল হইত কারণ এক ব্যক্তি যথার্থ মালের বিষয় বাবুদী নাগিশ করিলেক তাহাতে আসামী মিথ্যা করিয়া লাথেরাজ জড়াইব দিলে তাহার যে মাল কি লাথেরাজ তাহার কিছুমাত্র তদারকের ভার মুন্সিফের প্রতি নাই যদি ইহার কিছু বিবেচনা শ্রী শ্রীযুক্ত গবর্গর সাহেব করেন তবে আমরা সর্গদার ইহার মঙ্গল নিকট প্রার্থনীর কাণদ্যপন করি।

৩ দফা। মুন্সিফের করা ডিক্রী এক বৎসরের অধিকে জারী হইবেক না পুনরায় রহম দিয়া নাগিশ করিতে হইবেক হজুরের (৩) ডিক্রী যখন ইচ্ছা জারী হইতে পারে এ বড় অজ্ঞায় কারণ মুন্সিফের নিকট যে নাগিশ হয় তাহার দাবির কাগজের দাম ও ওকালতনামার খরচা প্রভৃতি কিছু কম হইত তবে যে এক বৎসরের অধিক হইলে পুনরায় নাগিশ করিতে হয় ইহাতে প্রজালাকে কেবল অনর্থক খরচার দ্বায়ে মারা যায়।

৪ দফা। পূর্বে আইন ছিল যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয় বয়লফার (৫) রাখিত তাহার বয়লত (৫) জারী করিয়া এক বৎসর মিয়াদে ইয়াগাম (৬) দিতেন ইহার মধ্যে টাকা না দিলে করিবারীকে বয়লত প্রমাণ করিয়া সরাসরী হইতে মাল মঙ্গল দেওয়াইতেন এইকমে তাহা রদ করিয়া এক বৎসর বাদে করিবারীকে চরম কাহনে (৭)

(১) পরীক্ষা। (২) নিয়োগ। (৩) হজুরের। (৪) জজের।

(৫) অর্ধের অঙ্গীকার। (৬) মোচশ। (৭) আইনে।



দাবি দিয়া নালিশ করিতে হুজুম দেন করিয়াদীকে টাকা দিয়া জিনিস বরাদ্দ করিয়া পুনরায় কত খরচের দায়ে পড়ে যদি আপনাদেব সেই বিষয় ভিন্ন বিষয় না থাকে এবং আসামীরকে না পায় তবে করিয়াদীর খরচের টাকা পাওয়া কষ্টের এক্ষণে কিছু বিবেচনা ক্রীত করিলে ভাল হয়।

৫ দফা। শ্রীল শ্রীযুত রমণ (১) আইন করিয়া মফঃস্বলে আমলাদিগের ও দারোগাদিগের হাত হইতে বাধার করিয়াছেন কিন্তু হুজুরের (২) যে বড় বড় আমলারা বাহার-দিগের নিকট আসামী করিয়া দিগেই যুগের চোকানের ছুরি গলায় দেন তাহারদিগের হাত ছাড়নের কিছু আইন করেন নাই শ্রীল শ্রীযুত জ্ঞানেন যে মোক্তারদারী বিষয়ে ১০ আট আনার কাগজে দরখাস্ত দিলেই কর্ম নিকাশ হয় কিন্তু এখন কত আট আনা যে আমলারা দেন তাহাতে প্রজা লোক কোন প্রকারে মোকদ্দমা করিতে পারে না তাহার বেওয়া (৩) এই যদি কোন ব্যক্তি হুজুম দেন তাহাতে লাচার (৪) সাহেব এই আইন করিয়াছেন একশত টাকার জামিনা হুজুম হইলে ১০ টাকা তাহার কমিশন ইহা না হইলে কয়েক পাকিতে হয় হুজুরের (৫) দিতে দিতে হয় জিলার হাকিমের নিকট জানালে শুনে নাই এবং ভয়েতে জানাইতেও পারে না আর মোক্তারদারী দাবিগের ও দরখাস্ত দাবিগের ও শহিদের (৬) জোবানবন্দী করণের সিগনিং তাহার মহাশয়ের কীট ২০ টাকা হিসাবে তিনি আইন করিয়াছেন মুহুরিরা ১০ আনা আইন করিয়াছেন কোন কাগজের নকল লইতে হইলে বড় টাকার ইষ্টাপ বাগবিক্রে কত টাকা মোহাফেক্কে দিতে হয় ইহা ভিন্ন কোন মতে হয় না আমলারা এই প্রকার আইন করিয়াছেন তাহারদিগের আইনের আলার জামিনা জালতন আছি তবে ১০-৩০ সালের দুই আইনে ইহার কি শ্রুত হইবেক এই একদম রকম ভিন্ন যে কত ঐক্যের দেন তাহা আমরা নিশ্চয় পত্র বাড়াইন যদি শ্রীযুত আমলাদিগের চান আইন

রদ করিয়া কোন আইন সাদের (২) করেন তবে আমলাদিগের দারোগা প্রজ্ঞার দার হইতে রক্ষা পাইয়া কোম্পানি বাহাদুরের মঙ্গল ৬ নিকটে নিরুপেষে চেষ্টা করি।

৬ দফা। দারোগাদিগের হাত হইতে যে প্রকারে ভাণ করিয়াছেন তাহাতে অনেক ভাণ হইয়াছে কিন্তু তাহারদিগের তাবিয়ান (২) বরকন্দাজ ও হুজুরের (৩) চাপরাঙ্গী ও বরকন্দাজ ইহারদিগের সাবক মতই দস্তর আছে থানার উপর এক হুজুম আছে রাজি মশার উপর কোন যোর বাধি হইতে পারে না ইহাতে সিদ্ধ চুরী কিছু কম হয় নাই কিন্তু বরকন্দাজের চরণ-টার (৪) পরেই ভস্মালোক পাকিয়া করিয়া টাকা লন অধিক রাতিতে চোরের সহিত সাধন করিয়া পাকিয়া করেন না বিষয়ে হাট বাজার দুটাতক করিয়া জোনা লন এবং কোন তদারক মফঃস্বলে হইলে যে পাড়ার তদারক হইবেক তাহার চৌকেনি লোক ধরিয়া টাকা লন তাহার ভরকনে নালিশ করিতে পারে না ইহার কিছুই সিদ্ধি বিবেচনা করেন নাই এবং হুজুরের চাপরাঙ্গীরা যদি নাজীর কোন আসামী দিয়া করিয়া দেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে তল্লাশ লইয়া গিয়া তাহার কাপড় কাড়া দিয়া পরসে টাকা যে কিছু থাকে তাহা লয় এবং ভাল কাপড় থাকিলে তাহাও মারগীত করিয়া লয় যদি না দিতে চাহে তবে তাহাকে যথোচিত নিগ্রহ করে ইহাতে লোকের দিগের পকে বড় মঙ্গ হইতেছে এই দশাতে ফেহ কাহারও উপর মোকদ্দমা করণে অশক্ত। অতএব শ্রীযুত এই সকল বিষয়ে কোন আইন সাদের করিয়া লোকেরদের প্রতি অঙ্গগ্রহ প্রকাশ করেন তবে সকলেই কিঞ্চিৎ স্রবী হইতে পারে আমরা আমলাদিগের যুগের আইন জারী বিষয় লিখিতছি এ নদীয়া জিলার অজ জিলার কি দস্তর তাহা পশ্চাৎ লিখিব হইত সন ১২৩২ তারিখ ২ জৈম।

(সমাচার দর্পণ, ২০। ৩। ১১৩৩।)

শ্রী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

" রামমোহন চট্টোপাধ্যায়

" স্বধারাম যানাল  
" ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
" রামকুমার চট্টোপাধ্যায়  
" গুরিয়ার ভট্টাচার্য  
" রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়  
" জগমোহন ভট্টাচার্য  
" রামবর্তন সিংহ  
" " " সরকার গুণরত্ন

(জিলা নদীয়ার শান্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা।)।" (১)

পূর্বোক্ত ৬ই এপ্রিলের নিবেদনে নদীয়া জেলার রামধন, ইলা, কুমারগুপ্ত, অগ্রবীর ও রাধাঘাটনিবাসী ভূস্বামি-দের এবং শান্তিপুরের কতিপয় ভূস্বামীর নাম স্বাক্ষর করি, তন্মধ্যে দেখা যাইতেছে যে, কয়েকজন ২৩শে মার্চের নিবেদনে নাম সহি করিয়াছিলেন।

আমরা অতি আন্তরিকভাবে সন্নিবেশ নিবেদন করিতেছি যে আপনাদেব ১৮৩৩ সালের ২০ (?) মার্চের দর্পণে প্রকাশ দেন যে আদালত সম্পর্কীয় কর্ম অনেক পরিবর্তন হইবে ইহার মধ্যে যে উকীলী কর্ম এককালে উঠিয়া যাইবে প্রকাশ করেন তাহা হইলে যে প্রজা লোকের কি স্বপ্ন হইবে তাহা আপনি বিজ্ঞ সকলি জ্ঞানেন আমরা কি লিখিব কিম্বা এই বিষয় যে শীঘ্র সকল হইবেক তাহাতে শ্রীল শ্রীযুত পর্বণ জেনারেল বাহরগের নিকট আমরাদিগের যুগের নিবেদন আছে তাহা দক্ষা গোপালি কিছু লিখিতছি যখনই মঙ্গলদায়ক দর্পণে স্থান দিয়া শ্রীল শ্রীযুতকে গাঢ় করাইলে অবশেষে শীঘ্র সকল হইবেক।

৭ দফা। সকল জমীদারের এবং অনেক বহিষ্কৃত লোকের যোর মোক্তারী মোক্তারকার সর্বস্বেরে আছে কিন্তু এককোটা মুসল্লি মরণান্ত দিতে হইবেই উকীল ভিন্ন জগদাহেনের দরখাস্ত দিতে তাহা অন্তর্য বিষয়ের দরখাস্ত দিতে হইলে ইচ্ছা তাহানামার কাগজ আট আনা লাগে এবং উকীল ছোট পত্র হইলে কি দরখাস্ত কেতা ২ টাকা মন্তরে লন ভাতি পত্র হইলে তাহার ভাতি টাকা লন কিন্তু মোক্তারকার রাখিয়া বা রাখার তুল্য হইতেছে এবং যখন মোক্তারদারী দেওয়া

যায় তখন তাহাতে লিখিয়া দেই মোক্তারমজুর আবার তরক বাহা করিবেন তাহা আমায় মজুর তবে যে মোক্তার কারের সমস্তল জগদাহেন দেওয়ানী আদালতে শুনে নাই ইহার কারণ কি কিন্তু মোক্তারদারীতে মোক্তারের দ্বারা তজবীজ হইতেছে আমরা জানি যে আদালত সকলি এক তবে মোক্তারদারী দেওয়ানী বিশেষ করা এ হাকিমের উচিত নহে যদি ভাবেন উকীলী কর্মে অনেক লোক প্রতিপালন হইতেছে সে মিথ্যা কারণ সকল প্রজার নিকট পইরা অত্যন্ত প্রতিপালন করা অজ্ঞ।

২ দফা। আপনাদেব দর্পণে লেখেন যে অনেক প্রধান ২ সাহেবেরা ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে আমরা কিছুমাত্র ভাবিত নহি কারণ যে শ্রীল শ্রীযুত লর্ড উইলিয়াম বেট্টার তিনি দায়াম এবং প্রজা প্রতিপালক প্রজাদিগের প্রতি তাহার যে দয়া তাহা লিখিতে আমরা অশক্ত তিনি যখন সাহেবদিগের অজ্ঞার প্রস্তাব শুনিবেন না আমরাদিগের যে পয়স স্বপ্ন তাহা হইতেই হইতেছে আরো ইহাবেক ইহার সন্দেহ নাই এই কারণে ছোট বিষয় শীঘ্র সকল করিয়া প্রজালোকের মঙ্গল করুন যে আমরা সর্বদা তাহার মঙ্গল চাহিতেছি আরো ৬ নকট আঁখনা করি।

৩ দফা। উকীলী বিষয় বন্দ হইবেক তাহার সন্দেহ নাই কারণ যখন শ্রীযুতের নিকট ইহা প্রস্তাব হইয়াছে আর ইহাতে রাইয়ত লোক নাহক টাকা লিখিতেই ইহাতে গোপালি বাহাদুরের কিছুমাত্র দ্বন্দ্ব নাই এবং বাহার উকীল বরক দিবার শক্তি নাই এবং আপনি হাজির থাকিলে তাহারদিগের পরিবার মারা পড়ে এমন্ত তাহারদিগের হক বিষয় উকীলী পরতা অজ্ঞানে না হক হইতেছে আর উকীলার বিষয়ে বিশেষ টোকা আইন মোক্তার আছে কিন্তু ১০ টাকার মোকদ্দমা হইলে আইনমতে আট আনা হয় কিন্তু কদাচ তাহা লন না সদরে ঐ আট আনা কিছু মফঃস্বলে ২ টাকা লইয়া পশ্চাৎ কবুল করেন যদি হাজার টাকার মোকদ্দমা হয় তাহাতে ৫০ টাকা পায় তথাচ কিছু অধিক লয় অতএব আইনমতেই টাকা দিয়া আরো কিছু ২ যুগ দিতে হয় অতএব শ্রীযুত ইহা শীঘ্র দেন করিয়া মোক্তারকারের দ্বারা মোকদ্দমা হইবার হুজুম দেন যে মোক্তারের স্বপ্নে কাল-যাপন করে।

(১) শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপে।

(১) দুই। (২) জজের। (৩) বিবরণ। (৪) নাজার।

(৫) সন্দানে। (৬) সাফায়ে।

(১) স্থাপিত। (২) স্বীকৃত। (৩) জজের।

(৪) রাজি ছয়টার



৪ দফা। **শ্রীশ্রী**ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করি যে ডিক্রীজারির আসামীর মাল নীচামে যে মুনসিপ প্রভৃতি সরকারী চাকর হইয়া মাফিয়া-ছাড়া টাকা প্রতি এক আনা দ্বয়ের রকম পাইয়া থাকেন সে কেবল সকল প্রজ্ঞাকে বধ করিয়া এক জন লোককে অধিক টাকা দেওয়া যদি করিয়াযীর হাবির টাকা সকল আদায় না হয় কিন্তু মুনসিপদের সহস্রের টাকা মধ্যে কোটিয়া লন **শ্রীশ্রী**ত বিবেচনা করুন যে মুনসিফেরা এই সকল নির্দোষের জ্ঞাত কোম্পানি বাহাদুরের চাকর এবং মাফিয়ানা পান তবু যে আশা হিরা রহম ছান এ কেবল প্রজ্ঞারিণকে শাস্যবি করা মাত্র নীচামের রহম ছান যদি কোনখানে কিছু তদারক করিতে যান তাহারা যথেনত আনা ও পানকী ভাড়ি অশা-হিদা লন যে সিব তদারক করিতে কি নীচাম করিতে যান সে বিদ্য কি হুজুরে মাফিয়ানা বাব যায় তাহা নহে এবং দারোগাদিরদের দ্বারা কোন বিবর তদারক হয় তাহার অজ্ঞ পরচ নাগে না এবং দারোগাদিরদের মাফিয়ানা অনেক কম মুনসিপদের মাফিয়ানা অধিক এ প্রকার মাফিয়ানা ভিন্ন টাকা পান অতএব আমার ভরসা করি যে **শ্রীশ্রী**ত গবর্ণর বাহাদুর এ সকল হুজুরের বিবর জ্ঞাত হইলে ইহার বিবেচনা শীঘ্র করিবেন যে আমরা প্রজ্ঞাবোকে নাহক পরচ হইতে ত্রাণ পাইয়া কোম্পানি বাহাদুরের মঙ্গল সর্বদা **শ্রীশ্রী**ত নিকট নিম্নত প্রার্থনা করি।

৫ দফা। আমরা ভনিতেছি যে বর্ধমানের শ্রীমত ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব ফৌজদারী আমলাদিগের ঘৃণা লগায়ার বিষয়ে যে মনোযোগী হইয়াছেন এবং অনেক মামলা করণে ও সাপেক্ষে করিয়াছেন বিশেষ নাজিরকে যে প্রকার শাসিত করিয়াছেন তাহাতে আমরা সর্বদা শ্রীমত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে শ্রীশ্রীত করিতেছি কিন্তু আমারদিগের নদিয়া জেলার শ্রীমত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমারদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যদি আপন আমলাদিগের শাসন করেন বিশেষ নাজির সাহেবের এবং তাহার ভাবের চাপরাসীর দৌরাহা জ্ঞাত আমরা সর্বদা আশানত তাহাকে বিশেষরূপে শাসন করিলে আমরা সর্বদা শ্রীমত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মঙ্গল চিন্তিত প্রার্থনা করি আমরা শপথের ভয়েতে স্পষ্টরূপে উল্লাহ জানাইতে পারি না যদি শ্রীমত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব

এমন কোন হুকুম সাধের করেন যে আমলাদিগের যে জুহুম প্রকার উপর আছে তাহারাজ্য করে তাহারদিগের হলাক হইবে না।

৬ দফা। যখন রেসবৎ (১) বিষয়ে নানা আইন সাধের আছে তথাচ আসামী ফরিয়াদীর সবদাই আমলাদিগের যুগের আদায় আশানত তথাপি হাকিমের নিকট জানাইতে পারে না কারণ ভরলোকসকল শপথের ভয়ে দরখাস্ত করিতে পারে না যদি কোন কেসে শপথ স্বীকার করিয়া শ্রীমত ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকট দরখাস্ত করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহার জামিনী হুকুম দেন জামিনীর হুকুম দিলেই নাজিরের হাতে পড়িতে হয় যুগের দরখাস্ত করিয়া তখন নাজির ও চাপরাসীর হাতে পড়িলে তাহারদিগের মন্তর হাসিল করে এবং আর ২ আমলার ইমারতে নাজির সাহেব ৫ টাকার বিষয়ে তাহার নিম্নত ১০ টাকা লন না বিংশ ছানিম মঞ্জুর করেন না এবং মোক্তারকার ভিন্ন অজ্ঞ মাতবর বাসিন্দা লোকের জামিন দিলে তাহা নাজির লন না যদি মোক্তারকারদিগের সহিত আশাপাদি না থাকে তবে সে ফরিয়াদীকে কয়েদ থাকিতে হয় এ বড় অববিবেচনা যে যুগের নাজিরের জামিন তলব করেন যদি হাকিম আনেন নাশিষ করিয়া ফরিয়াদী পরহাজির হইবেক এমন হয় না কারণ নিম্নত টাকা দিয়া নাশিষ করিয়া কদাচ পরহাজির হয় না আর পরহাজির হইলেই বা হাকিমের কি ক্ষতি বরং ফরিয়াদী দরখাস্তকরণকালীন তাহার নিকট মোক্তারনাম লন তাহা না করিয়া জামিনী হুকুম হয় যদি জামিন দিতেও পারে তবে শাকী প্রতি ২ টাকা দ্বস্তরে কীচ আশানত করিতে হুকুম হয় টাকা দিয়া হইলে সাইদ তলব হইবেক অতএব রেসবতের কারণ গরীব লোক শপথ করিয়া ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত করে পুনরায় তাহার উপর জামিনের ও সাইদের টাকার হুকুম হয় ইহাতেই সকল কাছ আছে কিন্তু পূর্বের হাকিমেরা রেসবতের বিষয় কিবা দারোগাদিরদের দৌরাহাের বিবর ও চুরির বিবর এবং চোরার মাল খরিদের বিবর এই কয়েক দফা মুফরকা দরখাস্ত পাইলেই তাহার ত তদারক ও তত্ত্বাবধি করিবেন তাহাতে এই কএক বিবর অনেক দমন থাকিত এক্ষণে মুফরকা দরখাস্ত পাইলে হুকুম দেন ফরিয়াদী নাজির

(১) যুগ।

হাজির হইয়া দরখাস্ত করিলে মোনাসেব হুকুম হইবে অতএব এক্ষণে কোন উপায় না দেখিয়া আমরা বিবেচনা করিলাম যে আপনায়ের প্রোপকারক দর্পণ দ্বারা সকল বিবর শ্রীশ্রীতকে জ্ঞাত করিলে অবশ্যই আমরা এককল হুজুর হইতে ত্রাণ পাই।

৭ দফা। আপনায়ের ৩০ মার্চের দর্পণে প্রকাশ করেন যে রিকর্ডের সম্পাদক মহাশয়ের বিবেচনা করিয়াছেন যে এই নুতন আইন জারী হওয়ার পর রেসবতের কোন উদাহরণ নিকর না পাওয়াতে রেসবতের গিপিসকল আমাৰদিগের নিকট একবারে অগ্রাধিক হইয়াছে তাহাতে আমরাদিগের কথিত এই যে নুতন আইন জারী হওয়ার পর যুগলওয়ার দ্বস্তর অথাপি উভয়রূপে চলিছে কিছু মাত্র লাঘব হয় নাই বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু আমরা স্পষ্টরূপে গিণিতে পারি না তাহার এক কারণ শপথের ভয় দ্বিতীয় কারণ যখন ইহার বিবেচনা হাকিমেরা না করেন তবে আমরা সর্বদাই ঐ সকল নিদর আমলাদিগের হাতে পড়িয়া মারা বাইব যদি শ্রীশ্রীত হুকুম দেন যে যুগের বিষয়ে শপথ রিতে হইবেক না এবং জামিন দেওনের জ্ঞাত তৎক্ষণাৎ আমলাদিগের হাতে পড়িতে হইবেক না তবে আমরা স্পষ্টরূপে সন তারিখ ও আসামী ফরিয়াদীর নাম ও যে মোক্তার তাহা ও যুগের টাকার তাইন (১) দিখিয়া শ্রীশ্রীতক নিবেদন করিতে পারি কিন্তু এ বিষয়ে অধিক তদারক, করিবার কল কি যদি হাকিমেরা আমলাদিগের মাফিয়ানা কি এবং পরচ কত ইহার তদারক করিলেই যুগ লগয়া না গওয়া বৃদ্ধিতে পারেন।

৮ দফা। যখন উকিলেরা তাবৎ কন্ডের যুগের জার বহু হইয়াছেন সে যথার্থ কিন্তু বাহারা ২ উকীল মোক্তরব করে তাহার সকলেই আশাধারী এবং উকীলের বেতন বিষয়ে যে আইন আছে তাহাতে উকীলেরা থাকি জমায় যে আসামী ফরিয়াদীর, পক্ষে ভাল হউক কিবা মন্দ হউক আমরা পূর্বাভেদন পাইব ইহাতে উকীলেরা উভয় রূপে কণ্ড করেন না কি যদি আপন বিখারী আদায় কোন বিবেচনা আমাদের লগায়ার লগায়ার লগায়ার রাখা যায় তবে সে ব্যক্তি আপন বিষয়ের মত জানি করিয়া

(১) পরিমাণ।

প্রাণপণে মোক্তরদার তদবীর করে আর এক্ষণে উকীলের টাকা অল্পে আশানত করিলে তবে একলত নামা দাবিল হয় কিন্তু উকীলেরা যদি টাকা না পাইয়া উকীলী কলপ মজুর তথাপি হাকিমেরা টাকা আশানত না হইলে মজুর করেন না কিন্তু এ বড় অনশ্রব্য কার্য না হইলে তাহারা কলপ করিলেও হাকিম মজুর করেন না অতএব এ প্রকার নগর টাকা না দিতে পারাতে অনেক মোক্তরদা একতরফা হইতেছে ইহাতে হক নাহক হইতেছে অতএব ইহার কোন সুনিয়ম হইলে প্রজ্ঞাদিগের পক্ষে ভাল হয়।

৯ দফা। আমরা নিতান্ত প্রার্থনা করি ইন্ডিয়া গেজটের সম্পাদক মহাশয়েরা আপন ২ পরোপকারী পত্রের পার্শ্বে উপরের গিণিত আমারদিগের হুজুরের বিবর সকল স্থান দিয়া শ্রীশ্রীত দরায়ার গবর্ণর বাহাদুরের কর্ণগোচর করিয়া আমারদিগের দ্রুত মোচন করেন।

১০ দফা। উপরের গিণিত বিবর সকলে বাহারা ঐ ২ দফা। মোক্তরব আছে তাহারাই প্রতিবাদী নুতন আর ২ সকলের প্রার্থনা উক্ত বিষয়সকল শ্রীশ্রীত শীঘ্র সকল করেন পত্র বাহালা হইল একারণ অল্প লোকের স্বাক্ষরে হইল অধিক লোকের স্বাক্ষর প্রয়োজন হয় পশ্চাত্ত ব্যক্ত হইলে লেখা বাইবেক নিবেদন ইতি সন ১২৩৩ সাণ তারিখ ২০ চৈত্র ১২৩৩ সাণ ১ এপ্রিল।

শান্তিপুত্র নিবাসী—  
শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়    শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়  
" মধেচন্দ্র দাস    " ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  
" রামযোগোপাধ্যায়    " ঈশ্বরদাসগোহাষী  
" তারিণীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়    " রামনাথ  
" কৃষ্ণকুমার    " রামমোহন চট্টোপাধ্যায়  
" রামরতন সিংহ    " সুরকর    " ইত্যাদি।" (১)

উপর্যুক্ত ৮ই জুনের 'দপণে' লিখিত বিষয়ের সারমর্ম বাহালাভ্যে এখানে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। ইহাতে প্রথমতঃ শান্তিপুত্রের হাকিম ও কৃষ্ণদাসের জ্ঞাত হইতেবৈরিত্বকে যথাক্রমে শপথ বাব দেওয়া, সপক্ষে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া, একতরফা ডিসমিস হাজির কতিপয়

) সমাচার দর্পণ, ৬। ৪। ১২৩৩।



অভিযোগ করা হয়। তারপর লেখা হয় যে যে নাভিরের অনেক চাপরাশিকে ঘুরের জন্ত বরখাস্ত করা হয়েছে, নবীয়ার আর এক দুর্নসিদ্ধের বিরুদ্ধে এরখাস্ত করার তাহাকে পদচ্যুত করা হয়েছে এবং কেবল শান্তিপুত্রের দুর্নসিদ্ধ কখনও ঘুর লন না। তারপর প্রাথমিক বলা হয়েছে যে—সরকার মা বাপ; জেলা জজ মেন ৬ মাস অন্তর লোক ডাকাইয়া কর্তাচারী, জমিদার নীলকর ও ধনীরা অত্যাচার, ঘৃণা, চুরি, বুধা অভিযোগ বন্দ্যাসেী প্রভৃতির অভিযোগ শুনে। এই তদন্ত কমিটিতে মেন জজ, কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন, ইহার বিবরণী মেন বাঙ্গালা ও ইংরাযীতে লিখিত; এবং ইহাতে সরকারের আয়ের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

## নয়

লাসাহের 'সিলেকশন্স' ক্রম আন্দাংলিউড রেকর্ডস্ পৃঃ ১১১ ও ১১৭-৮ খৃঃ অব্দের সরকারী দপ্তরের বিবরণ হইতে লিখিয়াছেন যে—পানেশীর মন্দের অগ্রে ও পশ্চাতে সরকার গোমস্তাশিগের দ্বারা শান্তিপুত্র, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে তদ্ব্যবস্থাপিকে দাবান দিয়া আনাইয়া কলিকাতার নিকট বসাবসা করা হইতেন; এবং জব চার্জকর কলিকাতায় রাজধানী স্থাপনের (১৭৯০ খৃঃ) অল্পতম কারণ এই ছিল যে ইহার নিকটে তদ্ব্যবস্থাপিগের বসতি ছিল।

উক্ত গ্রায়ে (২) কোম্পানীর ১০টী আড়ডে কত দেওয়া হইয়াছিল এবং সেখান হইতে কত পাওয়া গিয়াছিল তাহার একটী হিসাব লিখিত আছে। শান্তিপুত্র আড়ডে ৯৩, ৫২২ টাকা ও আনা ৯ পাই দেওয়া হইয়াছিল।

## দশ

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুত্রে একটী বিদ্রোহ ছিল বলিয়া পূর্বে লিখিত হইয়াছে। ইহা এবং নিরলিখিত বিদ্রোহটী অভিন্ন ছিল বলিয়া অজ্ঞান হয়। "শান্তিপুত্রে আকালিমি।—বিজ্ঞ অগচ্চ লোকহিতৈষী গোপীমোহন চট্টোপধ্যায় কর্তৃক গত ডিসেম্বর মাসের দ্বাদশ দিনে তাহা স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ বাবু তাহার অধ্যক্ষও

হইয়াছেন। ঐ পাঠশালা স্থাপনাবদি অত্র পর্যন্ত ৫৮ জন বালক পূর্ণাঙ্কে দশমবর্ষাবদি অপরাহের পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রতিদিন হাজির হইয়া শিক্ষার পৌরীপাধ্য এবং উত্তম ধারাহুতারে শিক্ষাশিক্ষা করিতেছে।...ঐ বিদ্যালয় উক্ত বাবুর ধর্মভেতে কোম্পানীর রাজ্যের পূর্ণ দিনে স্থাপিত হইয়াছে। অপর ত্রিগত জজ এডওয়ার্ড মলিশ সাহেব ঐ পাঠশালার বালকেরদের শিক্ষক হইয়া বঙ্গের ভূইয়ার বালকেরদের পরীক্ষার্থ স্থির করিয়াছেন।...কোম্পানিধর্মপত্রাধিগণ বিদ্যালয়সংকারিধ্যাক। শান্তিপুত্র ১৮৩২ সাল ২৯ জানুয়ারি।"

উত্তরকালে মিশনারীদিগের চেষ্টায় শান্তিপুত্রে আর একটী বিদ্যালয় কিছু কালের জন্ত স্থাপিত হইয়াছিল। "ইংলণ্ডীয় গির্জাকুল প্রচারকগণের কৃত যত্নানের সাধ্যা নদীয়ার সর্গাপেক্ষা অধিক; এমন কি বদের অজ যে কোনও জেলার অপেক্ষা অধিক। এই সমিতির প্রচারক-গণই নদীয়ার সর্গপ্রথম (১৮১১ খৃঃ) প্রচার উদ্দেশে আগমন করেন; প্রায় ইহার সমসময়েই 'লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি' মিঃ হিল, ওয়ার্ডেন, টাইন প্রমুখ পাদরীগণ শান্তিপুত্রে আড্ডা স্থাপন করেন। ইহা ১৮১৪ অব্দে সোমোতে স্থাপিত নর্দাল খুল বাহা প্রথমে কাপাসডাঙ্গাপরে শান্তিপুত্রে স্থানান্তরিত হয় তাহা হারীকপে ক্রমবর্ধমানস্থাপিত হয়।...বিগত ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নীল হাঙ্গামার সময় যে সকল মহাজনত্ব ইংরায ধর্ম ও ভারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জেলা বিজ্ঞতার তারতম্য চুগিয়া নীলকর-পীড়িত প্রজাকুলের সাহায্যার্থ নির্ভীক দপরে স্বজাতীয় অত্যাচারী নীলকরগণের বিপক্ষে বঙ্গপরিচর হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে শান্তিপুত্রের মিশনারী সোসাইটির রোড: সি বনওয়েলস সাহেব সচ্ছতম। (২)

বর্তমান সময়ে শান্তিপুত্রে ৩টী উচ্চ ইংরাযী, ২টী মধ্য ইংরাযী, ১টী উচ্চ প্রাথমিক, ২৪। ২৪টী নিম্ন প্রাথমিক, ১টী বালিকা মধ্য বাংলা ও ৪টী বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

## ক্রমশঃ

(১) সমাচার দপত্র, ৪। ২ ১৮৩২। পঞ্চপুণ, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৮।

(২) ইহাঙ্গের সপক্ষে পূর্বে 'কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।

নবীরা কাহিনীও প্রস্তাব।



## সাহিত্যিক শ্রেণী

১৮৫৫ সালের ২৮ অগ্রহায়ণ শুক্রবার হরিহর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ-গ্রহণ করেন।

অরুণিচন্দ্রনগরের সেন্টমেরিস ইন্সটিটিউশনে পড়িয়া হুগলী কলেজিয়েট ও তৎপরে হুগলী কলেজ ও রিপন কলেজে পড়েন। অল্প বয়স হইতেই ইহার সাহিত্যের প্রতি অমৃতরূপ ছিল। বিদ্যালয়ে পাঠকালাই ইনি লিখিতেন। বাবাস্বায়ের কার্যে প্রবৃত্ত হইলে ইহার সাহিত্য-সাধনা বন্ধ থাকে, তৎপরে প্রায় ১৪২০ বঙ্গাব্দ পরে আবার আরম্ভ হয়।

১৯১৬ সালে ফ্রান্সের মিনিগোনের নিকট হইতে ইনি "অসিসিয়েট দাকটমেরী" ও ১৯৩২ সালে সারস্বত মহামণ্ডল হইতে 'সাহিত্য কুণ্ঠ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইহার বহু প্রবন্ধ বহু সাময়িক পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার একটী সম্পূর্ণ তালিকা দিলাম।

## —প্রবন্ধ—

অষ্ট	পুণ্ডা	১৩৭
শ্রান্তপদিক	আলোচনা	ঐ
আধুনিক সমাজ	আলোচনা	১৩৯
সাহিত্যে ভ্রম	হুগলী	ঐ
বাবলা ভাবার ইংরাযকৃত উন্নতি প্রবাসী		১৩১০
বিশ্বপ্রদাম	প্রাণীপ	১৩১২
প্রদাম (পুস্তকের মধ্যে প্রকাশিত হয়)		১৩১৬
অপর দিক	ভারতবর্ষ	১৩২৫
তুখিমা ওরফে সর্গনাশ	মানসী ও মঞ্চাবাগী	১৩২৯
সভাতার মধ্যবর্ণ	বঙ্গবাণী	ঐ
সামর্থের অপচর	মাসিক বহুমতী	ঐ
মরাভাতির স্বরাজ-সাধনা	ভারতবর্ষ	১৩৩০

দেশের কাজ	নবপুণ	১৩৩১
তরোক্ত দেববৌ-চিত্র	বঙ্গবাণী	ঐ
আমাদের দেশের গতি	ভারতবর্ষ	১৩৩২
সাধারণ-সমিতির দ্বারা জনসেবা	নবপুণ	১৩৩৩
প্রতিযোগিতা	নবপুণ	ঐ
রাজ্যের পরানীনতা বাল্লিগত স্বাধীনতার		
পরিপক্বী কতটী	মাসিক বহুমতী	১৩৩৪
জনসেবা	মাসিক বহুমতী	ঐ
আমাদের শক্তি ও সমবার	প্রবর্তক	ঐ
বাঙ্গালার তরুণশক্তি ও তাহারে কর্মধারা	প্রবর্তক	১৩৩৬

## —ছোট গল্প—

অতৃপ্ত বাসনা	প্রয়াস	১২০০
অতৃপ্ততা	প্রয়াস	১২০৭
উপহার	পুণ্ডা	ঐ
রমেশ	আলোচনা	ঐ
বিদীর বিধান	প্রয়াস	ঐ
পাপের পরিণাম	পূর্ণিমা	১৩০৮
অপূর্ণ বাসি	প্রাণীপ	১৩১০
সঙ্গারের হৃৎ	প্রাণীপ	ঐ
বীণা	আলোচনা	ঐ
অদ্বুত গুণগুণি (ডিক্টেট্ট গল্প)	প্রাণীপ	১৩১১
অদ্বুত গল্প (ডিক্টেট্ট গল্প)		
ভবিষ্য	কুস্তবীন পুরস্কার	১৩১১
ভবিষ্য	প্রাণীপ	১৩১২
মারাবীপ	প্রভাতী	১৩১২
কালীচরণের চর্যাংসবর্ণন বর্ণিত-সমাচার		১৩১৮
দীনের অর্ঘ্য	চক্রবর্ত্ত	১৩১৮

(১) সমাচারদপত্র, ৮। ৬। ১৮৩০ (২) ৩৩ পৃষ্ঠা।



## — অমণ-কাহিনী —

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন	প্রবাসী	১৩২২
কতকগুলি সিন্ধুর স্বপ্নপুত্রী	বঙ্গবানী	১৩৩০
জগদ্বার রাত্রে ছইদিন	প্রবাসী	ঐ
দিল্লীর পুরাতন স্থিতি	মাসিক বহুমতী	১৩৩৪
নবাবের দেশে তিন দিন	মাসিক বহুমতী	ঐ
কামাখ্যা-দর্শন	বিখবাবী	ঐ
শিখা	মাসিক বহুমতী	১৩৩৪
মজলিসের পাত্র	ভারতবর্ষ	ঐ
শ্রীপাট শান্তিপুর	মাসিক বহুমতী	ঐ
মুশেরীর কথা	মাসিক বহুমতী	ঐ
অযোধ্যা ও কৈজাবাদ	পুণ্ডেশী বাজার	ঐ
জোনপুর	প্রবর্তক	ঐ
অনুতর	প্রবাসী	ঐ
লাহোর	ভারতবর্ষ	ঐ
আমাদের পুরীসম্বন্ধ	প্রবর্তক	১৩৩৬
পল্লীসম্বন্ধ	মাসিক বহুমতী	ঐ
শ্রীগৌরাঙ্গ-তীর্থে দুই দিন	মাসিক বহুমতী	১৩৩৭
রক্তের কয়েকটা পল্লী-সম্বন্ধ	প্রবাসী	১৩৩৭
বিচ্ছিন্ন ভাঁড়ারপোতা	পঞ্চপু	১৩৩৮

## — অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য —

ব্যবসায় ও মূলধন	ভারতবর্ষ	১৩২৯
বাঙ্গালী ধনসিদ্ধা	ভারতবর্ষ	ঐ
ব্যবসার কথা	ভারতবর্ষ	ঐ
অর্থ সমতা ও বিশ্ববিদ্যালয়	ভারতবর্ষ	১৩৩০
অর্থসমতার শিক্ষাকথা	মাদান	১৩৩১
ব্যবসার মূলধন	উপাসনা ও স্বদেশী বাজার	১৩৩৪

## — পুরাতন কথা —

একদিন পুরাতন দলিল	প্রদীপ	১৩১১
ভারতে পৃথিবীর অতীত	ভারতবর্ষ	১৩৩০
পৌরসভা ও নবাব খাঁজেন্দার বা	বঙ্গবানী	ঐ
ভারতের কয়েকটা প্রাণাস্তক-প্রথা	প্রবাসী	ঐ
রেল সীমার ডাক টেলিগ্রাফ	ভারতবর্ষ	ঐ

## ভারতে ইংরাজ ও ইংরাজি

সম্পর্কে প্রথম	ভারতবর্ষ	১৩৩০
অসামান্য প্রতীকীর শেষ ভাগে ভারতে		
পাশ্চাত্য চিত্রকর	মাসিক বহুমতী	১৩৩৪
ভাগীরথী-তীরে	ভারতবর্ষ	ঐ
সেকালের বাঙ্গলা সাময়িকে রসরসনা	ভারতবর্ষ	ঐ
ভারতে পৃথিবী-স্থিতি	ভারতবর্ষ	ঐ
প্রাচীন ভারতে রাজ্যপাশ্বন প্রবাসী	প্রবাসী	১৩৩৬
সেকালের কলিকাতার নটীর খেলা	প্রবাসী	১৩৩৭
ভারতে বাণ্যাহাঙ্গ পরিচালনের		
প্রথম যুগ	প্রবাসী	ঐ
প্রাচীন ইংরাজী-গ্রন্থে হিন্দু দেবদেবী চিত্র		
মাসিক বহুমতী	ঐ	

## — কৌতুকোচ্চীকৃত প্রবন্ধ —

জ্যামিতিক চিত্র গিয়া ছবি আঁকা	প্রবাসী	১৩২৯
অনুতর প্রকৃতির খেলা	প্রবাসী	ঐ
চিত্রকরের খেলা	প্রবাসী	ঐ
চিত্রে বৈচিত্র্য (১)	মাসিক বহুমতী	১৩৩২
চিত্রে বৈচিত্র্য (২)	ভারতবর্ষ	ঐ
ফটোগ্রাফারের খেলা	মোচাক	ঐ
অনুতর সৌন্দর্য	মাসিক বহুমতী	১৩৩৩
দৃষ্টি-বিষয়	ভারতবর্ষ	১৩৩৩

## — শিক্ষা —

শিক্ষার কথা	ভারতবর্ষ	১৩২৯
পাশ্চাত্য মেয়েদের একটা		
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা	বঙ্গবানী	ঐ
পল্লী পাঠাগারের আদর্শ	ভারত	১৩৩৩
শিক্ষার আদর্শ	নবযুগ	১৩৩২
ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা	বিষবানী	১৩৩৪
শিক্ষার জালাল	ভারতবর্ষ	১৩৩৪
শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য	পঞ্চপু	১৩৩৮

## — উদ্ভিদ তত্ত্ব —

পুষ্পের বিবাহ	পুণা	১৩০৪
---------------	------	------

উদ্ভিদ-জীবনের দুই একটা কথা	নির্বাণা	১৩০৮
কফি ও উহার চাষ	প্রদীপ	১৩২০
ফল-ফুলের বৈচিত্র্যমাধন	মাসিক বহুমতী	১৩৩০

## — নারী-গ্রন্থ —

নারী-গ্রন্থে পুরুষের কর্তব্য	ভারতবর্ষ	১৩৩০
বর্ধ-অনুপূর্ণের রমণী	বঙ্গবানী	ঐ
নারীর শিক্ষা	ভারতবর্ষ	১৩৩০
স্ত্রী-শিক্ষার একটা দিক	মাসিক বহুমতী	১৩৩৭
নারী-শিক্ষা	বিচিত্রা	ঐ

## — উপন্যাস —

অভিশাপ—১৩২০, ১১ ও ১২ সালের ‘গান্ধব’ ইহার		
কতক আংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।		

## — কবিতা —

শকুন্তলার বিহার-গ্রন্থ	পুণা	১৩০৮
অনুতর আশা	অনুতর	ঐ
ভয়গুহ	প্রয়াস	১৮৯৯
উদ্বোধন	প্রয়াস	১৯০০
দুঃস্বপ্নের কথা	প্রয়াস	১৩০৭
স্বর্গীয় নিত্যক্লম বহু	বীণাপাণি	ঐ
অনুতর প্রিয়াস	প্রয়াস	১৯০০
পুরাতন বর্ষের বিদ্যার-গ্রন্থ ( স্বপ্ন )	পুণা	১৩০৭
দোহ-পূর্ণিমার	পূর্ণিমা	ঐ
স্বর্গীয় রাজনীকান্ত গুপ্ত	পুণা	১৩০৮
অনুতর	আলোচনা	১৩০৯
চুটি কবীর উপহার	আলোচনা	১৩০৮
রাবীপূর্ণিমা	প্রদীপ	১৩১১

## — জীবতত্ত্ব —

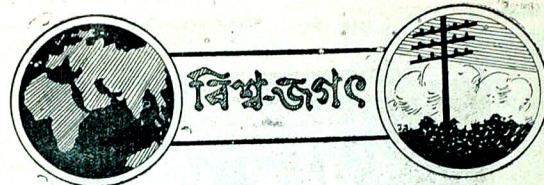
জীবদেহে প্রকৃতির খেলা	প্রবাসী	১৩২৯
মহাশয়সম্পর্কিত মানবতত্ত্ব জীব	ভারতবর্ষ	১৩৩০
জীবদেহে বায়ুর উপকারিতা	প্রকৃতি	১৩৩২
ইতর-প্রাণীর মানবীয় ভাব	প্রকৃতি	ঐ
অতি-পোক	প্রকৃতি	১৩৩৩

## — ইতিহাস, ইতিবৃত্ত ও বিবরণ —

জাপান	পুণা	১৩০৬
ইতিহাসের একপৃষ্ঠা	প্রয়াস	১৯০০
ক্লকুমারী	প্রয়াস	১৩০৭
ব্রহ্ম নাট পুণা	ভারতী	ঐ
আসামী বিবাহ	স্বা ও ভারতী	১৩০৯
রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর প্রদীপ	প্রদীপ	ঐ
সেকালের অন্তত কাহিনী	প্রদীপ	ঐ
কোহিম্বের কথা	প্রবাসী	১৩১০
আসামের নাগাজাতি	প্রদীপ	ঐ
কাশীর মানসদির	ভারতবর্ষ	১৩২২
চন্দননগর ও শিরগরবানী	প্রবাসী	ঐ
দুঃস্বপ্নের সময় চন্দননগর	ভারতবর্ষ	ঐ
শিখদিগের নামকরণ-প্রথা	প্রবাসী	১৩২৯
মধ্য-আফ্রিকার নরমাণবাদক জাতি	বঙ্গবানী	ঐ
ওয়াটসনের পদপ্রান্তে স্থাপিত বকী		
চন্দননগর ও মুক কলিকাতা	ভারতবর্ষ	ঐ
ভারতের উপাত্ত বৈচিত্র্য	ভারতবর্ষ	১৩৩০
বিরের কনকেশ	প্রবাসী	ঐ
চন্দননগর-পরিচয়	মাসিক বহুমতী	১৩৩১
চন্দননগরের সাময়িক পত্র		
ও অংশ-পরিচয়	প্রবাসী	ঐ
চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈনিক	ভারতবর্ষ	ঐ
প্রাচীন চন্দননগরে ফরাসী-শাসন	বঙ্গবানী	ঐ
চন্দননগরের শাসক ও সিদ্ধপুরুষ	ভারতবর্ষ	ঐ
চন্দননগরের কবিতা, কবিত্ত্বালা ও বাজা		
— প্রবাসী ও বঙ্গবানী		
চন্দননগরে বেণাবার ও উপাসনাগার	প্রবাসী	ঐ
চন্দননগরের আদি পরিচয় ও		
বঙ্গ-ভারতীয়ের আদি স্থান-নির্ঘ	প্রবাসী	ঐ
চন্দননগরের জীবাশ্ম-কৌতুক	ভারতবর্ষ	ঐ
কলিয়ার অতীত রাজশ্রী	মাদান	ঐ
চন্দননগরের পাঠ্য জ্যোতিষিক প্রণয়		
শতাব্দীর গ্রন্থ-গণনা ও তাঁহার সম্পাদিত		
প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তক	ভারতবর্ষ	১৩৩২



চন্দননগরের আনন্দ উৎসব	ভারতবর্ষ	১৩২২	সেকালের কলিকাতা	প্রবাসী	১৩৩৭
চন্দননগরের স্বন-শিল্প	প্রবাসী	ঐ	— বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ —		
কক্সারী কোম্পানীর বকে উপনিবেশ স্থাপন	বঙ্গবান্দী	ঐ	কাকাবাবুর গল্প	মুকুল	১৮৭৭
শিল্প-বাণিজ্য চন্দননগর	ভারতবর্ষ	ঐ	হুচনা	স্বাস্থ্যসংগ	১৮৭৭
বাহিরের দৃষ্টিতে চন্দননগর	নবায়	ঐ	আর একটা সংকলিত	মুকুল	১৩০৪
চন্দননগরে সেবাদর্শ-প্রতিষ্ঠান	ভারতবর্ষ	১৩১০	জুয়েলিয়ারি	পূর্ণা	১৮৭৭
কলিকাতার সম্পদ	ভারতবর্ষ	ঐ	কয়েকটা প্রসঙ্গ	প্রবাস	১৮৭৭
বাল হইতে জিবেলী	ভারতবর্ষ	ঐ	হুমানদাস বাবাজি	পূর্ণা	ঐ
চু চুচায় ডাক-গার্ডেন	বিচিত্রা	১৩০৪	৮৭জনীকান্ত গুপ্ত	প্রদীপ	১৩০৮
স্বদেশী-পথে চন্দননগর	নবায়	ঐ	পাটনি প্রসঙ্গ	পূর্ণা	১৩১০
পাশ্চাত্য পরিভ্রমক বার্ষিক	পঞ্চদশ-শতাব্দীর ভারত	বিচিত্রা ১৩০৪	প্রোতের ডেই (১)	স্বর্ণ-বর্ষিক-সম্মার	১৩২৭
সেকালের স্থাপত্য-বৈভব	বিচিত্রা	১৩০৬	আবিষ্কারের প্রথম স্তর	বঙ্গবান্দী	ঐ
ব্যায়ামবীর বাজারী দ্বক	মাসিক বহুমতী	ঐ	আত্মকথার কৌশল	ভারতবর্ষ	ঐ
চন্দননগরে প্রথম সত্যপ্রাণী সেনাদল	প্রবর্তক	১৩০৭	একজন অতিদুঃখী কণা	মানসী ও মধ্যবান্দী	ঐ
প্রাচীন সভ্যতার পরিচয়, মিশর	মাসিক বহুমতী	ঐ	দাতা চিত্ররত্ন	মাসিক বহুমতী	১৩০২
প্রাচীন সভ্যতার পরিচয়, ব্যাবিলন	ঐ	ঐ	প্রোতের ডেই (২)	নবায়	১৩০৪
প্রাচীন কলিকাতা-পরিচয়	ভারতবর্ষ	ঐ	রবীন্দ্র-সমীপে	মাসিক বহুমতী	১৩০৪
স্বত্বাধীন, কলিকাতা, গোবিন্দপুর	ঐ	ঐ	শিল্পী বনবিহারী দত্ত	প্রবাসী	ঐ
মিউনিসিপ্যালিটি, বিচার ও দণ্ড	ঐ	ঐ	ভিন্নদেশীয় জনবাদের মধ্য	ভাবধারার সমতা	ভারতবর্ষ ১৩০৪
কোম্পানী ও নগরের অবস্থা	ঐ	ঐ	স্বর্ণীরা কলকাতা-মিনী	বঙ্গবান্দী	ঐ
আর্থিক কণা	ঐ	ঐ	প্রোতের ডেই (৩)	পূজারী	ঐ
সামাজিক ইতিহাস; দ্বাদশাব্দী	ঐ	ঐ	পুরাতন কলিকাতা	বিচিত্রা	ঐ
একক-ব্যবসায়ী মুদ্রা	ঐ	ঐ	সাতটা স্বপ্নের মুখ (চিত্র-সংগ্রহ)	ঐ	১৩০৬
কলিকাতার পুরাতন ছাড়া ও কবিতা	ঐ	ঐ	বিচিত্রা-চিত্রশালা	ঐ	১৩০৭
বৃদ্ধিপ্রাপ্তির নামে অশান্তির কথা	ঐ	ঐ	মজার অঙ্ক	শিক্ষাবান্দী	১৩০৬
খ্যাতনামা বান্ধকের বান্ধবন	ঐ	ঐ	হুচাচিত্র-শিল্প	ভারতবর্ষ	১৩০৭
বান বানন ডাক ঐতিহ্য	ঐ	ঐ	সকল উপায়ে ফটোগ্রাফী	প্রবাসী	১৩০৬
সাধারণ দেওয়ান, মন্দির, মসজিদ, শিখা ও উৎসব	ঐ	ঐ	— পুস্তকাবলী-তালিকা —		
বিবিধ	ঐ	ঐ	অভিধান (উপভাস) ১৩০৪ ; প্রথম (প্রবন্ধ-পুস্তক) ১৩০৬ ;		
সেকালের খ্যাতনামা ইংরেজগণ	ঐ	ঐ	অনুত গুপ্তশিপি ও মৃতগণ (ফিটেড্‌উইথ পুস্তক) ১৩০৬ ;		
বঙ্গাট ও ছোট্টাটের বান্ধবন	ঐ	ঐ	প্রতিভা (সামাজিক নাটক) ১৩০৮ ; প্রোতের ডেই (চিত্রকণা) ১৩০২ ;		
৪৭৭৭ খারায়ের একখানি প্রাচীন শিখি	প্রবাসী	ঐ	৭৭৭৭ খারায়ের একখানি প্রাচীন শিখি		



## সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য—

পৃথিবীর সকল দেশেরই সৌন্দর্য্যরসের একটা না একটা বৈশিষ্ট্য আছে—কোনটা হৃদয়, কোনটা অঙ্গুলি। পাশ্চাত্যের মেয়েদের শীর্ণ চেহারা, চীনের মেয়েদের ছোট পা প্রভৃতি ইহার অঙ্গুলি দুইটি। ইহার তা সভ্যজাতি, এছাড়া অসভ্য জাতির সৌন্দর্য্যের ধারণার কথা শুনিবে

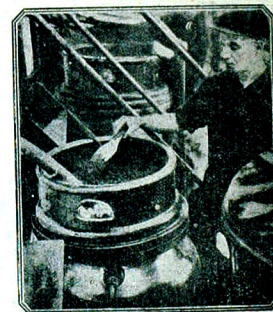


সৌন্দর্য্য রাখবার অঙ্গুলি ধারণা

বিস্তৃত না ইহা বাক্য বার না। আমরা এখানে যে ছবিটা দিলাম এটা মধ্য-আফ্রিকাবাসী একটা অসভ্যজাতির যুবতীর ছবি। ছবিটা 'ভয়েজ টু দি ককো' নামক ছাড়াডিয়ের ই স্থান হইতে তোলা হয়। উহাদের দেশে এইরূপে নাকি মেয়েদের সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়।

## বিলাসের উপকরণ—

আজকাল প্লাটিনম বিলাসের একটা শ্রেষ্ঠ সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণতঃ মণিরূপে প্রচলিত অঙ্গুলারে ইহা ব্যবহৃত হয়। লণ্ডনের একজন নামক এক ব্যক্তি শোনা গিয়াছে পৃথিবীতে যত প্লাটিনম ব্যবহার হয় তাহার



একজন প্লাটিনম শোভন করিতেছেন

এক-তৃতীয়াংশ নিজে ব্যয়ইতে পানেন। যে ছবিটা এখানে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এজন প্লাটিনম শোভন করিতেছেন—উহাতে ১,৫০০ পাউণ্ড প্লাটিনম আছে।

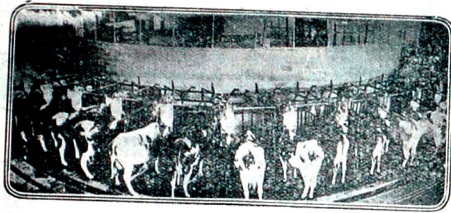
## বৈজ্ঞানিক উপায়ে গো-শোভন—

কি উপায়ে সহজভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাহ্য-রংগের উপকরণ উৎকৃষ্ট হইয়া পাইয়া যাইতে পারে তাহার



প্রচেষ্টা ও অমূল্যজন গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইংল্যান্ডের  
“বাকার গার্ডন লেবরি টেরিজে” চলিয়া আসিতেছে।  
সম্প্রতি সেখানে এক নতুন উপায় উদ্ভাবন হইয়াছে

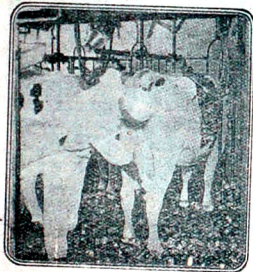
অনেকে রাখা হইয়াছে, তাহা ঘোরান হয়। উহা  
মিনিটে ১৫ ফুট ঘোরে।” ইহা একবার ঘোরাইলেই  
আপনা-আপনিই ৫০টা গাভীর দোহনকার্য সম্পন্ন হয়।



গো-দোহন করিবার উপায়

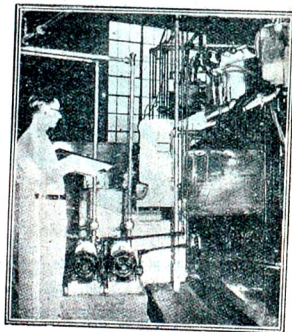
ইহাতে গুর স্বাক্ষর ভাবে সহজ উপায়ে গুর শাখ প্রচুর  
দুগ্ধ-দোহনকার্য সম্পন্ন হয়

এহকালে ৭ ঘণ্টা ঘুরিলে হইতে ১,২৫০টা গাভীর  
দুগ্ধ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটা গাভীর জন্য একটা  
করিয়া লোক নিযুক্ত থাকে—যাহাতে গরুর বাট ঠিক



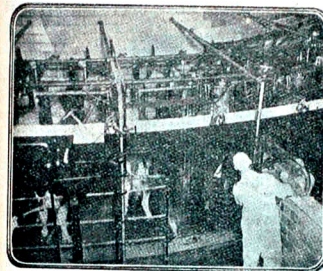
গাভীর বাটে যন্ত্র লাগান হইতেছে

প্রথম চিত্রটিতে পাঠকগণ দেখিলেন যে, অনেকগুলি  
গরুরে বৃত্তাকারভাবে সাজান হইয়াছে। এই বৃত্তটির  
ব্যাস ৬০ ফুট। দুগ্ধ দোহনের পূর্বে গাভীর উপর গাভী-



দুগ্ধ-পরিষ্কৃত করিয়া বোতলে পোরা হইতেছে

গাভী, তাহার উপর বিশেষ বৃষ্টি রাখা হয়। গাভী-  
পাণ্ডিত মার এবং সে উভয়ে ২৭ ডিগ্রি। এখন তার বয়স  
মাত্র ৫ বৎসর—তথাপি এ বাড়ে নাই। স্তন্য যন্ত্র, হাঙ্গার



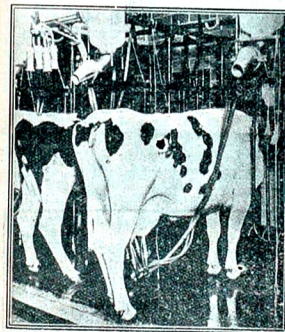
-কৃষ্ণতম ঘোটক

একজন দুগ্ধদোহন করিয়া আসিতেছেন  
ঘনিষ্ঠ দোহনকার্য সম্পন্ন হইলে উৎসাহের দুগ্ধ আপনা-

হাঙ্গার বৎসর পূর্বে ঐ দেশের ঘোড়া না কি একগুই ছিল।

গাভী-আরউইন স্টেডিয়াম—

মাদ্রাজে কাবেরী নদীর উপর গাভী-আরউইন চুক্তির  
নিবন্ধনরূপ একটা সেতু নির্মিত হইয়াছে, তাহা  
আমরা পূর্বেই জ্ঞানিচ্ছি। সম্প্রতি কইয়াটুর নামক  
স্থানে দিল্লী-চুক্তির নিদর্শনরূপ আর একটা স্থিতি-সৌধ



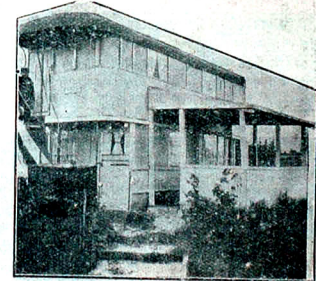
গাভীর বাটে লাগান যন্ত্র

আপনিও পাশের সাহায্যে আসিয়া একটা আধারে  
সংরক্ষিত হয়, তারপর স্বতন্ত্র বোতলে পূর্ণ করা হয়।

কৃষ্ণতম ঘোটক—

নিউইয়র্কের জন সি গুয়াডেনা নামক এক ব্যক্তির একটি

গাভী আছে, তাহার নাম “লিউই”। “লিউই”এর বয়স ১০০ স্টেডিয়াম।



গাভী-আরউইন স্টেডিয়াম

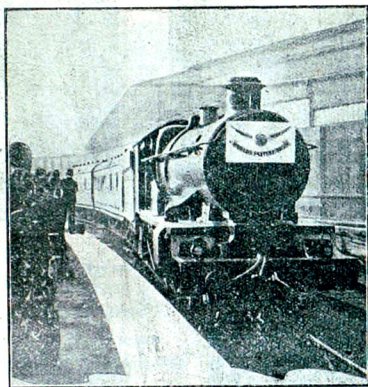
নির্মিত হইয়াছে, তাহার নাম হইয়াছে—গাভী-আরউইন



পৃথিবীর সর্বাধিকা ক্ষতগামী রেলগাড়ী—

নিম্নে যে ছবিটা আমরা দিলাম এটা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতগামী রেলগাড়ী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

অগ্নিশিখা-কীড়া ত্বনবিখ্যাত। প্রতি বৎসর অগ্নিশিখা-খেচার উজাগ্র হই যেমন, লোকও হয় তেমনি। এই বৎসরে (১৯৩১ খ্রীঃাব্দে) এই কীড়া যেখানে হইবে, সেই কীড়কের



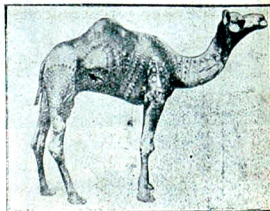
পৃথিবীর সর্বাধিকা ক্ষতগামী রেলগাড়ী

এটা বুটেনের গ্রেট ইষ্টার্ন রেলওয়ের—নাম, “শেনটেনহাম দুরার”। লগুন হইতে ৩৭০ মাইল দূরবর্তী শ্বইগুন নামক স্থানে আসিতে না কি ইহার মাত্র এক ঘণ্টা নয় মিনিট লাগিয়াছিল।

অগ্নিশিখা-কীড়া—



অগ্নিশিখা-কীড়াভূমি



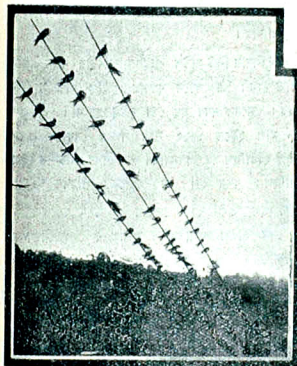
উত্তরে গারে জামানত-মূলক চিত্র

আমরা জানি যে, ক্রম ঐশ্বর্য্যী করিবার ক্ষত উটে

গোম কাটা হয়, কিন্তু উভাতে উভাদের গোম সে এমনই কাটিয়া লওয়া হয় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে উভাতে নানা চিত্রও খোঁকা হয়। যদিও এটা খুব কম, তবে প্রায়ই দেখা যায়। সম্ভ্রান্তি এক উটের গারে গোম কাটিয়া এক তামিতমূলক চিত্র-অঙ্কনের নিদর্শন পাওয়া যিয়াছে, বাহোয়ের খেবার ইহা প্রদর্শিত হয়। আমরা উভার ছবি দিলাম।

চাখামান চড়ুই—

এই ছবিতে যে তিন সারি চড়ুই-এর ছবি দেওয়া হইয়াছে, উহার গরম লক্ষ্য করিতে পারেন না। এগুলি আফ্রিকার



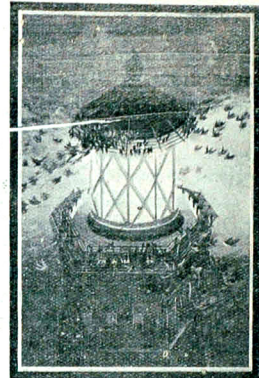
জামামান চড়ুই-এর দল

চড়ুই। যখন যেখানে ঠাণ্ডা থাকে সেইখানেই ইহার লগন হইয়া গমন করে। এই ছবিতে ইহার গরমের আশ্রয়নের পূর্বে বৈলিগারের তারের উপর বসিয়া বাহবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে।

চড়ুই-এর জীবনরক্ষা—

নিম্নের ছবিটা একটা ‘লাইট হাউসের’। ইহার আলোয় বাবসা এমনভাবে করা হইয়াছে যে, চড়ুইগণ ইহার আলোর মুগ্ধ হইয়া ইহাতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

ইহাতে তাহাদের নিরাপদে থাকিবার ব্যবস্থা আছে।



চড়ুই-এর আশ্রয়কার নতুন উপায়

চড়ুই-হিতৈষীগণ এই ব্যবস্থা কার্য্যেছেন। এরূপ চট্টান্ত আমরা নতুন শুনিলাম।

হিগুনবার্গের প্রতিমূর্তি—

ছবিতে খোটর গাড়ীর উপর যে সিরিট্ প্রতিমূর্তি দেখা



ভন হিগুনবার্গের প্রতিমূর্তি

বাইতেছে উভা জাখানীর ভন হিগুনবার্গের। হিগুনবার্গ বৈদ্য জাখানীর সভাপতি নির্বাচিত হইন সেইদিন উহ বার্লিনের রাস্তা-পথে প্রদর্শিত হয়। উহা ঐ দিনেই গৃহীত চিত্র



পৃথিবীর মধ্যে শুভতম স্থান—

আজ পর্যন্ত আমরা এই সমগ্র পৃথিবীর অনেক কিছু ধর ও বৈশিষ্ট্যের সংবাদ পাইয়াছি—অনেক সংবাদ রাখিয়াছি। পৃথিবীর মধ্যে শুভতম স্থান যে কোথায় বা কোনটি, তাহার বোধ হয় বড় একটা বোঝা রাখি নাই। এখানে আমরা কতগুলি শুভতম স্থানের সংবাদ পাঠক-সমাজে দি।

অষ্ট্রেলিয়ার মার্গারেট পর্বত ও দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে এক মরুভূমি আছে, উহা অতিশয় দুর্গম। এখানে না কি ৫৭ বৎসর অন্তর কখন কখন একটু আবুটু বৃষ্টি হয়। সুতরাং স্থানটি এতই শুষ্ক ও কঠোর যে, উহা কখনা কখনো বিস্ময়জনক। গত বৎসর জৈনিক যবক তাহার একমাত্র পূর্বতন এই মরু-ভূতটুকুমারীর পরবেশা সত্ত্বেও বৎসর পরে এই মরু মরু কদমে দেখিতে পান। তিনিও ঐ মরু অতিক্রম করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

দক্ষিণ-আমেরিকার আর একটা মরু আছে। উহা অষ্ট্রেলিয়ার মরু অপেক্ষাও শুভতর। উহা চিলির আটাকামা মরু। আবার ইহা অপেক্ষাও শুভতর বিশ্ববরেণ্য হইতে ৫ ডিগ্রি দক্ষিণে পেরুতে অবস্থিত মরুভূমি। এখানে যেথ ও কুয়ারি অভাব হয় না বটে, কিন্তু অনেকস্থলে সুসিপাত হইতে প্রায় দেখা যায় না। এমন এমন স্থানও সমুদ্রতীরে আছে। যেখানে ৮৯ বৎসরের মধ্যেও একটুকু বারিষাট হয় নাই। এখানে লোকের বসনাও আছে। পার্শ্বতা অঞ্চল হইতে যে সকল পার্শ্বতা নদী এই সকল স্থান দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহারই জলে স্থানীয় লোকেরা তাহাদের জীবন-ধারণের উপযোগী কার্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। পেরুতে যে টমার গাছ হয়, তাহার মূলগুলিও অদ্ভুত। এইস্থানের অন্তত শুভতর লুজ মূলগুলি কেবল একটু আক্রান্ত ও জলের জন্ত মাটির বহু নিম্নে বাইরা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে।

আর একটা শুভতম স্থান দক্ষিণ-আমেরিকার সমুদ্রতীরে। এখানে অসংখ্যর ভাণ্ডার পর্বতগুলিতে যথেষ্ট সুসিপাত হয় বটে, কিন্তু তীরভূমিতে হয় না। এখানেও লোক বসবাস করে।

এখানকার লোকেরা বেশ এক অদ্ভুত উপায়ে নিজেদের জল সরবরাহ করে। সমুদ্রের তলে যে মিঠা জলের উৎস আছে, তাহাই তাহাদের জীবন-ধারণের একমাত্র উপায়। স্থানীয় ভূম্বীরা প্রত্যহ জলে নামিয়া ঐ উৎস-মুখ হইতে জল সংগ্রহ করিয়া আনে।

আফ্রিকার কালাহারী ও সোমালী-ল্যান্ড আর দুইটা শুভতম স্থান। ইহাদের নাম বোধহয় অনেকই শুনিয়া থাকিবেন। কালাহারীতে অবস্থিত মরুভূমির মধ্যে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। দুই তিন বৎসর অন্তর না কি বৃষ্টি হয়, তাহাতেই স্থানীয় অধিবাসীদের জলের অভাব দূর হয়—উহাতেই সেখানে যে সমস্ত জলাশয় থাকে, তাহা পূর্ণ হইয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস, পৃথিবীর মধ্যে একটা বিখ্যাত স্থান। ঐ স্থানে বৎসরে ৪ ইঞ্চি মাত্র না কি বৃষ্টি হয়। অনেক সময় হয় তো বৃষ্টিই হয় না। একবার ১৯০০ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্যন্ত সেখানে এমন অনাবৃষ্টি হইয়াছিল যে, জীবনধারণ করা ভীষণ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বন্য ইহা মরু-স্থানে পরিণত হইবার উপক্রম হইল, তখন হঠাৎ দেশের বহু উৎস স্থানে স্থানে মাটি তেল করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ঐ দেশবাসিগণকে হাঁচাইয়াছিল।

মহিলা-তরবারিক্রীড়া-প্রতিযোগিতা:—

সম্রাট ইয়োরোপে আন্তর্জাতিক মহিলা-তরবারিক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। উহাতে মিস্ পেট্রি বাটসার নামক ব্রিটিশ মহিলা প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ‘হাটম কাপ’ লাভ করিয়াছেন। ‘হাটম কাপ’ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা নারী-তরবারিসংকলন-সুখ্যা জার্মান রমণী ফ্রেডালাইস হেলেন মায়ার লাভ করিয়াছিলেন। মিস্ বাটসার সাউন্ডি বেলার অপরাধের থাকিয়া শেষ বেলার মায়ারকে পরাজিত করেন। বাটসারই এখন এ বিভাগে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন।

বর্তমান-যুগে প্রতিযোগিতার যেক্ষণ নৃতন নৃতন পথ উদ্ভাষিত হইয়াতেছে বাস্তবিকই তাহা বেশ উপভোগ্য। নারীদের তরবারি-প্রতিযোগিতা একটা সম্পূর্ণ নৃতন জিনিস।

দ্রুগতের চলচ্চিত্র ব্যবসায়:—

আজকাল চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের প্রসার বাড়িয়াছে খুবই বেশি। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতা শহরে আমরা বায়োথোপ ও দর্শকের সাখা দেখিয়া বিস্মিত হই। ইউরোপ ও আমেরিকার বায়োথোপ ও দর্শক-সাখা এতই বেশি যে, আমাদের সহিত উহাদের তুলনাই হয় না। ১৯০১ সালের ১৯ মার্চ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশের মুখের ছিল ৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ড, তন্মধ্যে আমেরিকার মূল ধর্মের পরিমাণ ৪০০,০০০,০০০ পাউণ্ড; যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন ধর্মের পরিমাণ ১০২,০০০,০০০ পাউণ্ড। ইনিউইডে ২৬টা ইন্ডিও আছে, ঐগুলির একত্রিত মূলধন ১৫,৬০০,০০০ পাউণ্ড।

হবিউডে যে সকল চলচ্চিত্র-অভিনেতা ও অভিনেত্রী

আছে, তাহাদের বার্ষিক বেতনের পরিমাণ ১৭,০০০,০০০ পাউণ্ড।

১৯০১-০২ সালে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবার জন্ত ৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনের ব্যয় হইয়াছিল ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, মোট ১৭২৭টা সিনেমা-গৃহ আছে, তন্মধ্যে টিকি-হাউসের সাখা ১০৭১টা। ইউরোপে সিনেমা-গৃহের সাখা ২৮৪৫৪টা, তন্মধ্যে টিকি হাউসের সাখা ১০১১৫টা।

প্রতি সম্রাটে পৃথিবীর অঞ্চল দেশে যত লোক বায়োথোপ দেখে, তাহাদের সাখা প্রায় ২৫০,০০০,০০০ জন। ইহাদের মধ্যে একটা আমেরিকার দর্শক-সাখাই প্রায় ১১৪,০০০,০০০ জন। দেখা বাইতেছে, এ বিষয়ে আমেরিকাই সকলের অগ্রণী।

— শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী

## পুস্তক পরিচয়

পাকজন্ত (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—শ্রীকমলতা ঘোষ। আর্ঘ্য-সাহিত্য-ভান্ডার, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৩৭ সাল। ১/০-১/৩৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০।

লেখিকা সাহিত্য-সংসারে অপরিসীম নম্রো। তাহার পূর্বপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘রেখা’ অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাহার যে-সমস্ত গল্পনানা প্রকাশিত হইয়াছে তাহারই একত্র সমাবেশে ‘পাকজন্ত’র উদ্ভব। ইহাতে মোট ২৬টা সম্ভব আছে। সবগুলিই যথাসম্ভব সুসংগত। ভাষা সর্বত্রই জটিলতা হইতে মুক্ত। তবে ভাবের মধ্যে এতটুকু নৃতনত্বের সন্ধান মিলিল না—প্রমাণিতও কোন পরিচয় নাই। তিনি যে ঘরে বিশ্বয় সহিয়া আলোচনা করিয়াছেন সে-ঘর বহুদূরে যাবার স্তূপভায়েই আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহার লেখা পড়িতে পড়িতে অনবরত মনে হয়—‘এ-সব কথা কতবার শুনিয়াছি, বৈদিক

পত্রের স্তম্ভে পড়িয়াছি, সভ্য-সমিতিতে আলোচনা করিয়াছি।’ অতএব তাহার ‘পাকজন্তে’ কোন অভিনব স্বরমিশ্র শুনিতে পাই নাই—যেটুকু শুনিয়াছি তাহা অতি পরিচিত, ‘সর্বজনবিস্তার’ কথার গুণের প্রতিফলন মাত্র। গৌরবের অন্তরে ‘দেখাছায়া’ বতই অতলস্পর্শ হইতে না কেন, নিঃশব্দ-বজ্রিত কোনও রচনা সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করিতে অক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা যে পাঠকের অযোগ্য একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল হইলেও, বর্ণাঙ্কিত ও মুদ্রাকর্মপ্রণয় স্থানে স্থানে অক্ষমতারই হইয়া পড়িয়াছে। আর এক কথা—সাহিত্য-চর্চা যদি লেখিকার নিকট শুদ্ধ অবসর-বিনোদনের প্রারম্ভেই পর্যাবসিত হয়, তবে তজ্জনা সাহিত্য-সমালোচকের নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়া সুখ।

ক, কা, খ



## বিবিধ প্রসঙ্গ

১৯৩০-৩১ সালে ভারতে আমদানী পণ্য ও রপ্তানী-  
বাস্তবতা :—

বর্তমান সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের বেক্রম অবনতি হইয়াছে, একপ আর কখনও হয় নাই। গত আড়াই মাসেও একথা বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল। ১৯৩০-৩১ সালের ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় রিপোর্টে যেথা যায় যে, আলোচ্যবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, পরে উত্তা যে কিরূপ চরমে গিয়া ঠিকিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এ সমস্যার সমাধানে জগতের বহু শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, সভাপন্নগণ নানা মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বাভাবিক কাউতির তুলনার কাঁচা মাল ও পণ্যব্যয় প্রভৃতি, বিশেষভাবে কাঁচা মালের অতিরিক্ত উৎপাদে, আমেরিকা ও জাপানে স্বাভাবিক পরিমাণে সোণা জমা হওয়ার বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কসমূহে আমানত টাকার পরিমাণ হ্রাস এবং পুণ্ডিবীর নানা স্থানে—বিশেষতঃ ভারতবর্ষ, চীন দক্ষিণ আমেরিকার—রাষ্ট্রীয় অশান্তিতে যে এই ব্যাপার ঘটয়াছে তাহা নিম্নলিখিত—

নানাপ্রকারে উৎপন্ন হইবার অত্যধিকার ফলে ভারতের এই অবস্থা-বিপর্যায় ঘটয়াছে, ইহাতে রাজনৈতিক অশান্তির কিছু ব্যাপারও সংশ্লিষ্ট আছে; কারণ, এই অশান্তি ব্যবসায়ের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা স্বীকার করা চলে না।

১৯৩০-৩১ সালে মোট ১৯৫ কোটি টাকার মাল ভারতে আমদানী হয় এবং ২২৩ কোটি টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হয়; অথবা পূর্ণ বৎসরের তুলনার আলোচ্যবর্ষে ২৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৩২ টাকা কম জন্ম আমদানী হয় এবং ৯০ কোটি ৩২ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ২৯ টাকা কম জন্ম বিদেশে রপ্তানী হয়।

১৯৩১ সালে ব্যবসা-বাণিজ্য বেক্রম ছিল, ১৯৩১ সালের ব্যবসা-বাণিজ্য তদপেক্ষা অধিক শোচনীয় অবস্থায়

পাড়াইয়াছে। আমরা মাত্র পাঁচ মাসের একটি তুলনামূলক তালিকা দ্বারা উহা জানাইলাম—মূল্য হিসাবে উহা বেগুণা হইল।

(টাকা লক্ষ-হিসাবে করিতে হইবে)

	১৯৩০	১৯৩১	কত টাকা কম	শতকরা বৃদ্ধি	টাকা কম	শতকরা হ্রাস
এপ্রিল—						
রপ্তানী	২৪৫৮	১৪০৮	১০৫০	৪২.৭		
আমদানী	১৮০৬	১২৫৬	৫৫০	৩০.৫		
মে—						
রপ্তানী	২১৮৪	১৩১০	৮৩৪	৩৮.২		
আমদানী	১১২০	১১৪০	৪৪০	৩৮.৩		
জুন—						
রপ্তানী	২০৭১	১২৫৮	৮১৩	৩৯.৩		
আমদানী	১০৮৬	১২১০	১২৪	১২.৫		
জুলাই—						
রপ্তানী	২০২৬	১২৫৪	৮৪২	৪০.২		
আমদানী	১০৬৭	১০৭২	২০৫	২১.৬		
আগষ্ট—						
রপ্তানী	১৭৬১	১০৩২	৪০২	২৪.২		
আমদানী	১২৭১	৯৬৬	৩০৫	২৪.২		

মোট :—

রপ্তানী	১০,৫৭৩	৬,৬০২	৩,৯৭১	৩৭.৬
আমদানী	৭,৬৩৩	৫,৬৪৮	১,৯৮৫	২৫.২

সুতরাং বুঝা যায় যে ভারতের বাণিজ্যের ইতিহাসে ১৯৩১ সাল একটি দুর্যয় বৎসর।

গ্রেটব্রিটেন পূর্ণ বৎসর অপেক্ষা আলোচ্যবর্ষে ভারতীয়

বন্দরনী-মাংসে শতকরা ৫-৬ টাকা হারে ক্ষতি হইয়াছে। ব্যবসায়ী-বাহনের মধ্যে কাপড়ই সর্বাধিক অধিক কমিয়া গিয়াছিল, কারণ পূর্ণবৎসর কাপড় আমদানী হইয়াছিল ৮ কোটি টাকার এবং আলোচ্যবর্ষে হইয়াছে ৪১ কোটি টাকার। সমস্ত মালই ভারতে আমদানী হইয়াছে; বন্দরনের অবনতিই উহার এমনকি কারণ হইয়া পাড়াইয়াছে। দুর্যয় অস্বস্তি কৃতকগুলি জিনিসের একটি তালিকা নিয়ে নিম্ন—উদ্ভাওতে পূর্ণবৎসর ও আলোচ্যবর্ষের তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ণবৎসর	আলোচ্যবর্ষ	পূর্ণবৎসর	আলোচ্যবর্ষ
৪৮০০০ টন	২৪০০০ টন	কাঁচা তুলা	২৪০০০ টন
২২৭৭০০ টন	৬১২০০ টন	লোহা ও ইস্পাত	৬১২০০ টন
মোটের গাড়ী	৭ কোটি ৫২ লক্ষ	৪ কোটি ৯৯ লক্ষ	৪ কোটি ৯৯ লক্ষ
টাকার	টাকার	টাকার	টাকার
(১৭৪০০ ধানি)	(১৩৩০০ ধানি)		
মোটের বাস	১৫৭০০ ধানি	৮২০০ ধানি	৮২০০ ধানি
রবার	৩ কোটি ৫২ লক্ষ	২ কোটি ৫৭ লক্ষ	২ কোটি ৫৭ লক্ষ
টাকার	টাকার	টাকার	টাকার
এছাড়া ধাতু-সব্যানির আমদানী কম হইয়াছে ৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকার। রপ্তানীর দিক দিয়া দেখিতে বাইলে আমরা দেখি—তুলাজাত দ্রব্য ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা হইতে ৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার, পাথরখ ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা হইতে ২০ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার ও চাউন ২৩ লক্ষ ২৬ হাজার টন হইতে ২২ লক্ষ ১৯ হাজার টন এ নামিয়াছে। এছাড়া পাটের রপ্তানী কম হইয়াছে ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫ শত টন অর্থাৎ ৩৪ কোটি টাকার কম, আর চায়ের রপ্তানী কমিয়াছে ৩৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার।			

মোটের উপর দেখিতে বাইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের এই অবনতি সহজে পূরণ হইবার নহে। রাজনীতিকেরে শাস্তি ও শৃঙ্খলা না আসিলে উহা একান্তই অসম্ভব।

বাল্গার তুলা :—

গত বৎসর (১৯৩০-৩১) বাল্গার ৭৭৩০ একর

বা ২৩৩২৩০ বিঘা জমিতে কার্পাসের চাষ হইয়াছিল। ইহা সমগ্র ভারতের কার্পাস চাষের ৩-২ ভাগ মাত্র।

বাল্গার যে তুলা উৎপন্ন হইতেছে, ভারতের অল্প প্রবেশের তুলা না পাইলে তথ্যের বাল্গারীর বস্ত্রের অভাব আংশিক ভাবেও দূরীভূত হয় না। ৫০১২৫৫০ জন বস্ত্রব্যবহারী পক্ষে যদি গড়পড়তা হিসাবে বৎসরে এক রসর করিয়া কাপড় দর্য বায়, তবে আমরা দেখি, প্রতিবৎসর অন্ততঃ ১২৫০৩৪৮০ মন তুলা লাগে।

বঙ্গদেশে মোট উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ৯৩০০৫ মণ। এ স্থানে এই উৎপন্ন তুলা ছাড়িয়াও ১১০ লক্ষ মণ অধিক তুলা বাহির হইতে আনিতে হয়। মোট কথা বাল্গারী এবিষয়ে পরপ্রাণী।

বাল্গারীর এই মোট ৯৩০৫৫ মণ উৎপন্ন তুলার মধ্যে আমরা দেখি—৭২৬০০ মণ পার্শ্বতা চট্টগ্রাম, ১২৮০ মণ ত্রিপুরারাজ্যে, ৬৬৫০ মণ ময়মনসিংহ জেলায়, ২১০০ মণ বাকুড়া জেলায় এবং মেদিনীপুর জেলার মাত্র ১৫০ মণ। এছাড়া বাল্গারীর অজ্ঞাত জেলায় তুলা উৎপন্ন হয় না।

আহারের দিক দিয়া দেখিলে যেমন বাল্গারী চাউনের অভাব নাই, বস্ত্রের অভাব কিন্তু লাগিয়াই আছে। বাল্গারীর এই পরিবেশ-সমতা বিশেষ আলোচনার বিষয়। আহারের সাহায্য ঠিক রাখিয়া বস্ত্রের জন্য বাহিরের সাহায্য গ্রহণ বাল্গারীর কার্য্য নহে। দুর্যয়ভীত প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে ইয়ের-জালকবলার স্বপ্রকৃতিত হইবার পূর্ণ পর্য্যন্ত বস্ত্রাধার পরিবেশের জন্য বাহিরে হাত পাতিয়া পাড়ায় নাই—তাহারা তাহাদের নিজেদের সাহায্য রাখিত এবং এবিষয়ে বিশেষ সাবধানীও থাকিত। যে বাল্গারী বস্ত্র-শিল্পের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল, আজ তাহার চরম পরিস্থিতি কোথায় দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই বস্ত্র-সরট তুলার অভাবজাত। তুলার চাষই এখন একান্ত প্রয়োজনীয়।

ভারত ও ব্রহ্মের খন্দর :—

১৯২১-৩০ সাল অপেক্ষা ১৯৩০-৩১ সালে খন্দরের প্রসার ও উন্নতি হইয়াছে অনেক বেশী। নিখিল-ভারত কাউন্সিল-সভায় সেক্রেটারীর বিবরণে আমরা এবিষয়ের সম্যক প্রমাণ পাই। ১৯৩১ সালের ৩শে সেপ্টেম্বর



পূর্ণায় যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার সহিত নৃপবর্তী বৎসরের তুলনায় কোন প্রদেশে কত টাকার বাড়ি উৎপন্ন ও বিক্রী হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

## উৎপাদন

প্রদেশ	১২২৯-৩০	১২৩০-৩১
(১) আসাম	...	৩৪৪১২
(২) অসম	৮২৮৩৭	৭৭২৩২
(৩) বিহার	১০১৩৪২	৪৪২১৮৫
(৪) বাঙ্গালা	৪৮৩৭৪৭	২৭৭০৪৮
(৫) বোম্বাই	...	...
(৬) ব্রহ্ম	...	...
(৭) গুজরাট	৪৬৬১৭	৮২৫০০
(৮) কর্ণাটক	২৮৮০০	২৩৮৮১
(৯) কাশ্মীর	২২২৮০২	১৫০৪৭৭
(১০) মহারাষ্ট্র	১১২৮২৫	১৩২১৭৭
(১১) পাঞ্জাব	৩০৩৮২২	২০১৮০
(১২) রাজস্থান	৪৮৩২৬৮	৩২৫৮২০
(১৩) সিন্ধ	...	৩০৪৪৬
(১৪) তামিলনাড়ু এবং কেরল	১৬৪৪৪১১	২৩৭১৯০২
(১৫) যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লী	৮১৪০২০	৬২২৮৪০
(১৬) উৎকল	৭৫৬২	৬৩২১২
মোট	৪৪১১১০	৫৭৮১৮২
বিক্রী	...	...
প্রদেশ	১২২৯-৩০	১২৩০-৩১
(১) আসাম	...	১৫৮১

অন্তর্য্য দেখা যাইতেছে ১২২৯—৩০ সাল অপেক্ষা ১২৩০—৩১ সালে খন্দর বিক্রী হইয়াছে ৬৮২৩০ টাকার বেশী। বাঙ্গালা, অসম, যুক্তপ্রদেশ এই তালিকায় অসম্পূর্ণ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার গোলাযোগ্য সম্বন্ধে ১২৩০ সনের তুলনায় উৎপাদন ও বিক্রী, মোট পার্থক্য বজায় আছে। কয়েকটা প্রদেশে সাধারণ যে অল্পতা দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ, বাজার চাহিদা না থাকায় উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া। আরও বিশেষ কারণ ১২৩০—৩১ সালে বাড়ির মূল্য কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ও রাজস্থান, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃৎ কোন কোন প্রদেশে শতকরা ২৫ টাকা মূল্য হ্রাস করা হইয়াছিল। বাড়ি উৎপাদন ও বিক্রী বিষয়ে তামিলনাড়ুর উন্নতি লক্ষ্যনীয়।

## আলাপ-আলোচনা

ভারতীয় নরনারীর আচরণ-সম্বন্ধ—

গজি 'টিইমস অফ ইণ্ডিয়া'—সাপ্তাহিক পত্রে রোহিণী নাম দিয়া একজন ভারতবর্ষীয় আমাদের স্ত্রী-পুরুষগণের আচরণ-সম্বন্ধে কয়েকটা কোটহলোম্বীক কথা লিখিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালার তাহার মর্ম লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, “একজন ইউরোপীয় মহিলা একদিন আমাকে বলেন, ‘ভারতের যে সব পুরুষ ইউরোপে কখনও যান নাই, তাহারা আদব-কায়দা জানেন না।’ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আপনার এমন কথা বলিবার অর্থ কি?’ তিনি উত্তর করিলেন, ‘স্ত্রীলোকের সমুদ্রের ত্রিক কি প্রকার আচরণ করিতে হয় তাহা তাহারা জানেন না। স্ত্রীলোকেরা ঘরে ঢুকিলে পুরুষরা ঠাড়াইয়া উঠে না বা গিয়া দরজা খুলিয়া দেয় না। তাহাদের ‘শিভ্যাব্রি’ (শৌখী ও শিল্পী-চারের সহিত নারী-সম্মান রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি) নাই।

উত্তরে আমি বলিলাম, ‘ইউরোপের পুরুষদেরও আশ-কাল এবিষয়ে শৈথিল্য দেখা যাইতেছে। আধুনিক মহিলারা পুরুষদের সহিত সমতা দাবী করার কাল হইতেই পুরুষরা আর স্ত্রীলোকদের প্রতি ‘শিভ্যাব্রি’ দেখাইবার চেষ্টা করেন না। আমি ইংলণ্ডে অবস্থান করিবার সময় দেখিয়াছি যে পুরুষরা মেয়েদের স্থান ছাড়িয়া দেন না, নিজেরা সাধারণের ব্যবহারের নামের মধ্যে আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব আসনে বসিয়া থাকে, চামড়া ধরিয়া স্ত্রীলোকেরা খুলিতে থাকে। আপনি কেবল ভারতীয় পুরুষদেরই দোষ ধরিতেছেন, ইউরোপীয় পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন না কেন?’ তিনি বলিলেন, ‘সে স্বভাব কথা, আমাদের মেয়েরা একপ্রকার ব্যবহার চাহিয়াছিল, তাই আমাদের পুরুষরা এবিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের পুরুষেরা কিন্তু যে নারীদের প্রতি উদাসীন তাহার কারণ ইহা নহে যে, নারীরা পুরুষদের সহিত সমান হইবার দাবী করিতেছে। নারীদের প্রতি এমন করা পুরুষরা তাহাদের মর্যাদার পরিপন্থী বলিয়া বিবেচনা করে, সেই জন্য তাহারা নারীদের প্রতি মনোযোগ দেয় না। স্ত্রীলোকদের প্রতি তাহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা না থাকায় তাহারা তাহাদের প্রতি উদাসীন প্রকাশ করে।

আমি বলিলাম, ‘আপনার এ ধারণা একেবারে ভুল, ভারতবর্ষের নারীদের প্রতি পুরুষরা যথেষ্ট শ্রদ্ধাযুক্ত। পাশ্চাত্য আদব-কায়দার অঙ্গসমূহ তাহারা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার করে না বলিয়া একথা ত্রিক নয় যে তাহারা নারীদিগকে ঘৃণা করে। তাহাদের নিজেদের আদর্শ অজ্ঞানতার তাহারা মহিলাদিগকে সম্মান দেয় এবং তাহাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করে।’ তিনি প্রশ্ন করিলেন, ‘তাহা হইলে বেড়াইবার সময় পুরুষরা কেন মেয়েদের অনেক আগে আগে চলে, কোথাও বাইবার সময় তাহারা লাট সাহেবের মত কেন যায়, জিনিসপত্র নারীরাই বহন করে?’

আমি উত্তর দিলাম, ‘কারণ বহুকাল ধরিয়া এমন প্রথাই চলিয়া আসিতেছে এবং নারীরাও এইরূপ চায়, অন্ততঃ সনাতনপন্থী মহিলারা পুরুষদের আজীবন হইয়াই থাকিতে ইচ্ছা করে। তাহাদের মর্ম তাহাঙ্গিগকে পুরুষদের বাধ্য হইয়া থাকিতে শিখায়, তাহারা ইহাকে নারীর মার্গধারণেই গণ্য করে। স্বামী কোন দান হইতে বিরক্ত হইতে রাত করিলে সেইজন্য স্বামী হিন্দু-স্ত্রী কখনও তিনি ফিরিয়া আসিবার পুঙ্খ নিন্দা যায় না; সেই জন্যই সে বাড়ীর সকল পুরুষের ভোজন শেষ না হইলে আহ্বান করে না। সে স্বামীকে এমন শ্রদ্ধা করে যে কথা-বার্তার মধ্যে তাহার নাম সে করে না।



স্বামী ঠাড়াইয়া থাকিলে সাক্ষী স্বীকরণও আসন গ্রহণ করে না, বেড়াইবার সময় তাহার পশ্চাতে চলা উচিত বলিয়াই সে মনে করে, তাই পশ্চাতে চলে। এমন বিবাসও আছে যে পুরুষের হাতের স্ত্রীলোকের উপর পড়া উচিত নয়; সুতরাং পুরুষের আদব-কার্য্যদাই বলা চলে না, কাগপ পাঁচাত্তা আদব-কার্য্যদার অজ্ঞ হইলেও তাহার। বদশের আচার-ব্যবহার ভঙ্কির সহিত অন্তরঙ্গ করে।

করে না যে বাংলা পিতা, যৌবন স্রামী ও বার্কো সন্তানরাই তাহাকে রক্ষণ ও পোষণ করিবে এবং স্ত্রীলোক যতদিন ঠাড়িয়া থাকিবে, কখনও স্বামীর হইতে পারিবে না।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমাদের নারীদের সবচে এই সব উক্তি হুয়েতা প্রযুক্ত হইত। কিন্তু আজ তাহার। ভাঙার হইতেছে, শিক্ষিত্রী হইতেছে, দ্বািত্রী হইতেছে, এমন কি ব্যবহারস্বীকৃত ও হইতেছে, নিজের স্বীকৃতি অর্জন নিম্নেরাই করিতেছে। এখন আর বলা চলে না যে ইচ্ছা করিলেও নারী কখনও স্বামীর হইতে পারে না। নারীদের পদোন্নতি হইতেছে, তখন বাধ্য হইয়া পুরুষকে এই অর্ধ-সোতী জগতে নারীদের গণ্য করিতে হইতেছে সঙ্ক-কর্ম্মরূপে, আলস্যের মধ্যে অবস্থিত অব্যবস্থাপূর্ণ মুহূর্ত্তী হিসাবে নয়। অধিকন্তু পাঁচাত্তা রীতিনীতি ক্রমশঃ প্রতিকূল হইতেছে—স্নানত-পত্নী হউক বা নাই হউক অচিরেই প্রত্যেক লোকেরই আচার-ব্যবহার এমন হইবে যে আর ইউরোপীয়গণের তাহা বিস্ময় বলিয়া মনে হইবে না; কিন্তু ভারতবর্ষে তেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় কি না ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

ভারতীয় ভাষ্যের কৃত্তি—

বোম্বাইয়ের শ্রীকৃষ্ণ আর পি, কামাং একটা সুন্দরী নমস্কর ছোট মূর্ত্তি নিশাণ করিয়া বিলাতে 'রয়াল একাডেমী' হইতে ছয় শত টাকা ও একটা রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছেন। ভাষ্যের জ্ঞান কোনও ভারতীয়ের এমন পুরস্কার লাভ এই অপূর্ণ। ভারতের শিল্পীরা ভারতের, হাইরেও বন্দী হইলে দেশবাসীর আনন্দের কথা।

দেশীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সাক্ষ্য—

'বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী'র বশ পাঁচাত্তা দেশ সবুকেও প্রসারিত হইয়াছে জানিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ

করিলাম। বহু বিদেশী সম-ব্যবসায়ীদের তীব্র প্রতিযোগিতা সবেয যে এই কোম্পানি প্রসারিত হইয়াছেন, বাঙ্গালী পরিচালকদের ইহা বিশেষ কৃত্তিরের কথা। 'ওরালিন' নামক বহু-ব্যাংকের যে নতুন ঠাণ্ডা কোম্পানী প্রস্তুত করিয়াছেন—তার কার্য্যকারিতার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে শুধু এদেশেই নহে লণ্ডন এবং ইউরোপের অজাচ্ছ হানেও ইহা ব্যবহৃত হইতেছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল-কমিক্যাল বেশ-বিশেষণ' প্রাতি লাভ করিয়াছে। উহার অঙ্গরূপে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভেদ্য প্রস্তুত করিতে অঙ্গরূপ হইয়াছিল যে সকল বাঙ্গালী কোম্পানি তাহাদের মধ্যে এই কোম্পানিও যে কৃত্তি লাভ করিয়াছে, ইহাতে আমাদের ব্যবসায়িক বুদ্ধি যে আছে ইহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা আশা করি এই দেশীয় ব্যবসায়ী ভারতবাসীদের উদ্যোগ ও সাহায্য লাভ করিয়া উন্নতবৃত্ত, অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া সাফল্য-পৌরবে মগ্নিত হইবে।

হিন্দুনারী-কল্যাণ-আশ্রম

'হিন্দু অবলা-আশ্রম' সম্পর্কে তদন্তের পর বাংলা-দেশে অসহায় নারীদের রক্ষার জন্ত চাই নভেম্বর মাসে নন্দলাল ও পত্নীতি নাথ বহু মহাশয়ের ভবনে, যে সভার অধুনা হইয়াছিল তাহারই ফলে বেঙ্গলগিট্রা ট্রাম ডিপোয় নিকট ১১ নং হুগ্গলেনে 'হিন্দু নারী-কল্যাণ-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ণোক্ত অবলা-আশ্রমে ৩৩জন অবিবাহিত নারীই এই আশ্রমের হুগ্গলেন হইয়াছে। এইরূপ আশ্রমের আবশ্যকতা সবচে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। আমরা কয়েকবার পূর্বেও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। মাতৃ-ভাতির কল্যাণের জন্ত এইরূপ আশ্রম বাহাতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি পাবে অঙ্গরূপ হয় তাহাতে বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক হিন্দু-সংস্কৃতির বলিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীই সাহায্য করা প্রয়োজন। আর কলিকাতা যথানগরীতে হিন্দুর যদি এরূপ প্রয়োজনীয় একটি অধুনা

চালাইতে না পারেন, তাহা হইলে 'অগারবের আর সীমা থাকিবে না। এ-সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু না বলিয়া এই আশ্রমের পক্ষ হইতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র মায় প্রমুখ নিবেদক দিগের প্রচারিত পত্রিকা স্থানি পত্রহু করিয়াছিলাম:—

দেশবাসীর প্রতি নিবেদন

কালের প্রবাহে সনাতন একামত্বক প্রথা বিলুপ্ত হওয়াতে শত শত হিন্দু-নারী নিতান্ত নিঃসঙ্গ হইয়াছে। পৃথিবীতে ইহাদের কোন আশ্রয় বা স্থান নাই। গ্রামে ও নগরে চরিত্রহীন ও দুর্দান্ত লোকেরা কখনও একাকী, কখনও বা দলবদ্ধ হইয়া সন্মার-জ্ঞানান্ধিজ্ঞা বিধবা, সখ্যা বা সুদার্লিগকে কুলের বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহার সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্তা কখনও বা দুর্ভিক্ষের ভোগ্যা হইয়া মরাগ্ধে জীবন-যাপন করিতেছে। কখনও বা পতিতার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজের কলর বৃত্তি করিতেছে।

'হিন্দু অবলা-আশ্রম'র তদন্তের পর বাংলা-দেশে নারী-রক্ষার জন্ত ও তাহারিগকে ধর্ম্মনীতি ও শিক্ষা দান করিয়া স্বাবলম্বী করিবার জন্ত অচিরে এক নারী সনদ স্থাপন করা প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা অল্পতব করিয়া গত ৮ই নভেম্বর মাসে ৩৩নন্দলাল ও পত্নীতি নাথ বহু মহাশয়ের ভবনে বিরাট সভায় জনসাধারণ সমবেত হইয়া একটি নূতন আশ্রম স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। তাহাদের নির্দেশানুসারে 'হিন্দু নারী-কল্যাণ-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই আশ্রমের স্থপতিগণের জন্ত কতিপয় রানামত ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়াছেন এবং কয়েকজন কর্ম্মী আশ্রমিগে করিয়াছেন।

যাহারা নারীর ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করিতে চান, তাহাঙ্গিকে এই মহৎ কার্য্যে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিতেছি। অসহায় নারীদের আশ্রমের জন্ত একটি ভবন নির্মাণ করিতে হইবে, তাহাঙ্গিগের সাহায্য ও পরিচর্য্য-সহান এবং সংশকার সহায়তা করিতে হইবে। আশা করি কলকাতা ব্যক্তিরা আপনাদিগকে রিষ্ট করিয়া এই অত্যাধিক দুঃখের সাহায্যদান করিবেন।

বে মহিলা ভারতের গাহিরে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে বা বিলাতী-সমাজে মিশিয়াছে তাহার কাছে দল্লমত ভারতীয় আচার-ব্যবহার অজ্ঞ ও অশিষ্ট ঠেকে; তবে এতদ্বারা স্বীকার করা যায় না যে, ভারতীয় পুরুষদের আচার-ব্যবহারের ক্রম পরিবর্তন ঘটতেছে; ইহার কারণ, নারীরা তাহাদের নিকট হইতে এই পরিবর্তনের দ্বািত্রী করিতেছে। পুরুষরা এখন আর তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থেও একটা বিশ্বাস করে না যে ত্রিভুবনে এমন কোমও নারী নাই যে নিকটে নিজের কর্ম্মী বলিয়া ভাবিতে পারে। বিশ্বাস



আমরা আশা করি, এই দুর্গৎসরেও প্রত্যেক হিন্দু পরিবার  
বংশাব্যাহার সাহায্য করিয়া এই সন্মতীনটাকে স্বস্থখলতার  
সহিত চালিত করিবার সহায়তা করিতে কার্য্য্য করিবেন না।  
কর্তৃপক্ষদের নামই বৃদ্ধিতে পায়। বাইতেছে চিহ্নাবী,  
কন্ধ্যার ও তৎসহ পুঙ্কে একত্র সম্মেলনে এই  
নব-প্রতিষ্ঠিত অতীতন সাক্ষ্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হইবে।

লোকান্তরে

৮ বরদা প্রসাদ বহু

অগ্রসিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার স্বাধিকারী বরদা প্রসাদ  
বহু মহাশয়ের পরনোক-গমনে আমরা বাণিত হইয়াছি।  
'বঙ্গবাসী পত্রিকা' প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বহু মহাশয়ের  
পরলোকগমনের পর হইতে তাঁহার পলাহসরণ করিয়া তাঁহার  
জ্যেষ্ঠপুত্র বরদাবাবু কৃতিত্বের সহিত পত্রিকাখানি পরিচালনা  
করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দু-সাম্প্রদায়িক মুখপত্র-রূপে পত্রিকা-  
খানি যেভাবে যোগেন্দ্রবাবুর আমলে প্রকাশিত হইত, সেই  
ধারা বরদাবাবু অক্লান্ত রাধিয়া কাগজখানি প্রকাশিত  
করিছেন। 'বঙ্গবাসী' তাঁহার কর্ম্মকুশলতার বিশিষ্ট পরিচয়  
দিয়া আসিতেছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স্ক্রম মাত্র  
৪২ বৎসর হইয়াছিল।

৯ যোগেন্দ্রচন্দ্র সিত

গত ১০ই পৌষ মঙ্গলবার রাজি ১০টার সময় কলিকাতা  
হাইকোর্টে উকীল প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাহিত্যের  
অক্লান্ত অধ্যয়নী যোগেন্দ্রচন্দ্র সিত মহাশয় পরলোক-  
গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স্ক্রম ৭৫ বৎসর  
হইয়াছিল। পাইকপাড়া রাজপুত্রের একজিকিউটার  
স্বরূপে তিনি ঠেটের প্রভূত মঙ্গল-সাধন করিয়াছেন।  
কায়স্থ-সমাজের ও বৈষ্ণব-সমাজের উন্নতিকল্পে তাঁহার  
মহতী চেষ্টা স্বকল আনয়ন করিয়াছে। মূর্খিবাবু জৈন্য  
বাসস্থান পাঁচতুপী গ্রামের জনহিতকর সর্বাধি উন্নতির  
মূলেই তাঁহারে অগ্রণী হইতে দেখা বাইত সাহিত্য-চর্চারও

তিনি অধিহিত ছিলেন। সংসাহিত্যের পোকরূপেও  
আমরা তাঁহার নিকট হইতে অনেকগুলি পুস্তক পাইয়াছি।  
তন্মধ্যে "কালের শ্রোত" গ্রন্থখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

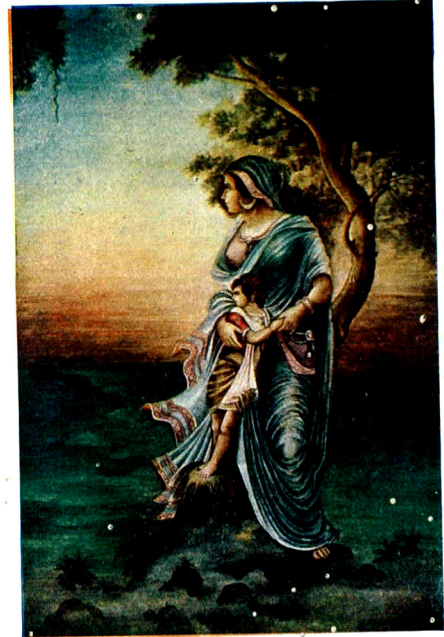
সভাতার প্রবর্তক কাহারা

বিধসভাতার বাহারা আদি প্রবর্তক, সংসারক এবং  
প্রচারক তাঁহাদের নাম, ব্যক্তিত্ব, যুগান্তকারী অবদান,  
জাতি এবং প্রকৃত আবির্ভাবকাল এতদিন ইতিহাসের  
মূল্যবিশেষের কল্পনার বিষয় ছিল। এশিয়া-মাইনর,  
মেসোপোটামিয়া, ভারতবর্ষ, ইজিপ্ট, দানিউব্ উপত্যকা  
এবং প্রাচীন যুট্টনে অনাবিকৃতপূর্ণ এমন কতগুলি  
সমাদিত-স্তোত্রবৎকীর্তি শিলালিপি পাওয়া যিয়াছে যাহা ছব্ব  
সাহিত্যিক ঐতিহ্যের দিক দিয়া মিঃ এল, এ, ওয়াডেল  
তাঁহার নবপ্রকাশিত "দি মেকার্স অফ দি ভলিজেস ইন  
রেস্ এণ্ড হিষ্ট্রী" নামক গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন।

আর্দ্রা, নডিক বা সুরম্যের জাতির উত্থান এবং  
অধিষ্ঠানকর্ম্মের কথা যাহা এতদিন অজ্ঞাত ছিল, তাহা এই  
গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। ইহা হইতে আরও  
জানা যাইতেছে,—তাঁহাদের সভাতার ভিত্তিপত্তন ও  
প্রচারের কথা; ইজিপ্ট প্রাণবংশীয় এবং প্রাচীন কালীয়,  
ক্রিট, ইথোপারত ও প্রাচীন ইউরোপে এই সভাতা-  
বিস্তারের কথা; তাহাদের প্রধান নরপতিদিগের ক্রিয়াকলাপ  
ও কৃতিত্বের সমসাময়িক ঘটনার চিত্র; আদম, দেন,  
এনক্, নোয়া, নিমরড্ ও প্রমিথিউ তথা প্রধান প্রধান  
পৌরাণিক বেবদেহতা এবং প্রাচীন সাহিত্যের বীরত্বের  
উৎপত্তি ও স্থাপনিকর; এজা-মহাকাব্যের গুডিন-থরের  
কথা; রাজা আর্গার ও তাঁহার পারিদমবর্ণ এবং হোমি  
গ্রেলের কথা; কাপাডোশিয়া ও ইলণ্ডের ট্রেড্রুখারী  
আসল সেন্ট জর্জের কথা। এক কথায়, সভাতার প্রাণৈ-  
তিহাসিক যুগ ঐতিহাসিক কাব্যবন্ধ হইয়াছে।

পুস্তকখানি শিক্ষিত পাঠকসমাজ এবং ঐতিহাসিক,  
সমাজতত্ত্ববিদ, রাজনৈতিক, জাতিবিজ্ঞানাত্তিক, প্রত্নতত্ত্ব-  
বিদ তথা শিল্প-সাহিত্য-পুরাণ-বিজ্ঞান ও তুলনামূলক দর্শ-  
তত্ত্বের সাধকের সহায়তাকরেই প্রণীত হইয়াছে।

সংস্কৃত-পুণ্য



আশ্রয়

শিলা—ব্রীহাসিরাশি দেবী।

[প্রবর্তকের সৌভাগ্য]

কুয়েল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা।

ব্রীশৌরীসুখ্যার খোব কর্তৃক বিখ্যাতার প্রেস, ২১৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে মুদ্রিত  
এবং পঞ্চপুণ-স্বাধিকার, ৩১ ডিসেম্বর সেন হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।



কলিকাতা পিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
গবেষণা কেন্দ্র  
৯৬/এম, ট্যাংবার সেন, কলিকাতা-৭০০০০৯



## ছন্দ-প্রসঙ্গ

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

বাংলা ছন্দের ধ্বনির 'ইউনিট' বা ব্যাঙী নির্ধারিত হয় তিনটা বিভিন্ন উপায়ে। ধ্বনি-ব্যাঙী নির্ণয়ের এই তিনটা পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা ছন্দকে তিনটা প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—বরবৃত্ত (সিলেবিক), মাত্রাবৃত্ত (কোরান্টিটেট) এবং যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত। বরবৃত্ত ছন্দের প্রত্যেকটি পদ (মেজার) ইংরেজী ছন্দের ভায় যুগ্মত: ধ্বনি বা স্বরের অর্ধাং সিলেবল-এর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পদ নির্ধারিত হয় ধ্বনির মাত্রা পরিমাণ (কোরান্টিট অফ সাউন্ড) এর দ্বারা। এ ছন্দে অর্থোফোনিকে লব্ধ বা একমাত্রিক এবং হ্রস্বধ্বনিকে গুরু বা দ্বিমাত্রিক বলে পৃথক করতে হয়। আর প্রতিপদের মাত্রাসংখ্যা দ্বারাই এ ছন্দের আকৃতি নির্ধারিত হয়। বাংলার বহু প্রচলিত মাহুলি ছন্দগুলিকে অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়েছি, যেহেতু প্রচলিত প্রাচীন দৃষ্টমনি

অক্ষরসংখ্যার দ্বারাই এ ছন্দের পরিমাপ করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু শুধু অক্ষর গণনার উপর ভিত্তি ক'রে কোনো ছন্দই রচিত হ'তে পারে না; কারণ ছন্দের যুগ্মত্ব অক্ষর নয়, ধ্বনি। প্রকৃতপক্ষে বাংলার লিপিপদ্ধতিতে যদি যুক্তবর্ণের ব্যবস্থা না থাকত তবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হ'তে পারত না। পক্ষান্তরে যুগ্মধ্বন (ডিপ্‌থঙ) গুলিকে একাকরের দ্বারা প্রকাশ করার ব্যবস্থা যদি বাংলার থাকত তাহ'লেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের রূপ অনেকখানি পরিবর্তিত হ'য়ে যেত। কিন্তু আপাতত: অক্ষর গণনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূলেও একটা ধ্বনিতত্ত্ব আছে, নতুবা এরকম ছন্দ রচনা করাই সম্ভব হ'ত না। সে তথ্যটি এই—এ ছন্দের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দই (ওয়ার্ড) শেবাংশে মাত্রাবৃত্তধর্মী এবং পূর্ণাং বরবৃত্তধর্মী। ব্রতরায় অক্ষরবৃত্ত আসলে মাত্রাবৃত্ত ও বরবৃত্তের মিশ্রণভাৱে একটি যৌগিক ছন্দ।



যোগিক বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের গতি অত্যন্ত মধুর ও নিস্তরঙ্গ, এর-ধ্বনি একধেয়ে, যতি অনিয়মিত, এবং পর্ববিভাগ অস্পষ্ট। এজন্য হৃদয়ের কারণ এই যে বহু শতাব্দী যাবৎ কবিদের অজ্ঞাতমানেই বাঁচি প্রাকৃত বাণ্যার বরষুতধ্বনি, সঙ্কত ছন্দের অক্ষরগণ এবং সঙ্গীতের সুরের মিশ্রণে এ ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে। বহুদিনের বহু অভ্যাসের উত্তরাধিকারিত না করলে এ ছন্দের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বাংলা ভাষার বর্ণমালা রূপটি চাপা পড়ে গেছে; ভাষার ধ্বনি-বৈচিত্র্য এ ছন্দে মুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়, এ ছন্দ ধ্বনিবৈচিত্র্য-হিসেবে অত্যন্ত নিস্তরঙ্গ ও একধেয়ে। অক্ষরবৃত্তের এই জটিল সংশোধন করার জন্যে বহুকাল যাবৎ, বিশেষতঃ ভারতচন্দ্রের সময়ে থেকে, বিশেষ চেষ্টা চালাচ্ছে। তখনকার কবিরা সঙ্কত ছন্দের আশ্রয় নিয়েই বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সঙ্কত ছন্দের ধ্বনি বাংলাভাষার প্রকৃতবিকল্প ব'লে তাঁদের সকল চেষ্টাই বিফল হয়েছে। অবশেষে এখন রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ও বরষুত ছন্দের প্রবর্তন করলেন তখন থেকেই বাংলা ছন্দে বহু বৈচিত্র্য ঘটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ থেকে কি ভাবে বরষুত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হ'ল এ প্রবন্ধে তাই দেখাতে চেষ্টা করব।

এ কথা পূর্বেই বলেছি যে শুধু দুইজন অক্ষরের সংখ্যা গুনে কোনো সত্যিকারের ছন্দ রচনা করা সম্ভব নয় এবং তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দের মূলও শুধু অক্ষরসংখ্যার উপর নির্ভর করে লেখা যায়, কিংবা বিযুক্ত যুগ্মশব্দগুলিকে যুক্ত করে লেখা হয় তবেই দেখবে। মাত্রাবৃত্ত এবং বরষুত দুইজন অক্ষরের সংখ্যামাত্রই মূল কৃণা নয়; কারণ তা হ'লে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সর্বত্রই অক্ষরসংখ্যার বৈমধ্য দেখা দেবে অথচ ছন্দ ঠিকই থাকবে। মাত্রাবৃত্ত এবং বরষুত অক্ষরসংখ্যার উপর নির্ভর করে না; তাই বাংলার বরষুতধ্বনিকে বিযুক্ত করলে কিংবা বিযুক্ত স্বরকে যুক্ত করলেও এই ছন্দে কোনো পরিবর্তন হবে না; এরা যেমন আছে তেমনই থাকবে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রত্যেক শব্দের প্রথমংশ বরষুতের স্বরমা আঁ শেবাংশ মাত্রাবৃত্তের স্বরমা। হ্রস্বরাং বা বহুলায় যে এ ছন্দের শব্দগুলির শেবাংশও যদি ধ্বনি-সংখ্যার রীতি চালাকো যায় তবেই আমরা পাব বরষুত ছন্দ; আর শব্দগুলির প্রথমংশও যদি ধ্বনি-মাত্রার রীতি চালাকো যায় তবেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হবে। আসলেও বাংলা সাহিত্যে এ দুই ছন্দের আবির্ভাব এ ভাবেই হয়েছে। হরেকটি দ্বীপ দিলেই কথাটি স্পষ্ট হ'বে। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র পূর্ণ পর্য্যন্ত বাংলায় শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে সর্বত্রই এক 'ইউনিট' গণনা করা হ'ত। রবীন্দ্রনাথও আদ্যবসরের রচনার সর্বত্রই শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে এক 'ইউনিট' হিসেবেই গণ্য করেছেন। যথা—

+

বসন্ত বাতালে আঁধি মূদে আসে,

মুহু মুহু বহে খাল,

গায়ে এসে যেন এদ্যের পড়িছে

কুহুমের মুহুরাশ।

+

আমার যৌবন-কুহুম-কাননে

ললিত চরণে বেড়ায়ে না?

আমার প্রাণের গতিকাবাদিনি

চরণ তাহার জড়ায়ে না?

—জাগ্রত স্বপ্ন, ছবি ও গান, রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দটি হচ্ছে 'হ্রস্ব-হ্রস্ব-আঁধি' অক্ষরের স্থপরিচিত লঘু ত্রিপিট, শুধু শেষ দুই পাক্ষিতে দুটি করে বেশী অক্ষর আছে। এখানে শব্দের মধ্যবর্তী দুটি মাত্র ধ্বনি (জো) চিহ্নিত। যুগ্ম অর্থীষ ত্রিযুক্তিক, প্রথমটি (সম) বাহ্যনাত্তিক এবং দ্বিতীয়টি (যউ) স্বরাত্তিক; বাকি সবগুলি ধ্বনি অপ্রাণ্য হ্রস্বরাং একমাত্রিক। একটু লক্ষ্য করলেই টের পাওয়া যাবে ঐ চেনা-চিহ্নিত 'হানদুটিতেই' ছন্দের ধ্বনি যেন ঠিক শোনাজে না; ওই দুটি ভাষায়ই একটু দ্রুত উচ্চারণ করতে হয়, তবু শ্রবকের কাছে না। এর কারণ হচ্ছে বহুকাল যাবৎই যৌবন-কুলাদ্যে ছড়া, বাউলের পান প্রভৃতি লোকসাহিত্যে ব্যবহৃত হ'লে

বসন্ত রায়ে | আঁধি মূদে আসে  
এবং মম যৌবন | কুহুম-কাননে

তা হ'লেই কিন্তু ওই দুটি যুগ্মধ্বনি স্রুতি-কটু শোনাত না। 'মানসী'-রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন, লঘু ত্রিপিট-জাতীয় বৈশাখ ছন্দের প্রতিপর্কে ছয়ের প্রাথম স্বেসব ছন্দ যুগ্মধ্বনিকে দ্বিমাত্রার মধ্যাংশ না দিলে ছন্দ ঠিক থাকে না। তাই 'মানসী'র যুগ্ম থেকেই রবীন্দ্রনাথ লঘুত্রিপিট-জাতীয় ছন্দে শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে এক না ধরে ছই ধরতে আরম্ভ করেন অর্থীষ অক্ষর সংখ্যা না গুনে ধ্বনি-মাত্রার গুণন রক্ষা করে লঘুত্রিপিট-জাতীয় ছন্দ রচনা করতে শুরু করেন। এভাবেই বাংলা কাব্যসাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আবির্ভাব হয়েছে। ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে রচিত 'ভুল-ভাঙা' নামক কবিতাটিই প্রকৃতপক্ষে বাংলাসাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত সর্বপ্রথম কবিতা; কারণ এই 'ভুল-ভাঙা' কবিতাটিতেই সর্বপ্রথমে শুধু অক্ষর গুনে ছন্দ-রচনার ভুল ভেদেছে। অক্ষরবৃত্তের শিকল-ভাঙ্গা সর্বপ্রথম বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দটির একটি নমুনা দিচ্ছি।—

ঢেয়ে আছে আঁধি, | নাই ও আঁধিতে  
প্রেমের যৌর।

বাছ-সাতা শুধু | বন্ধন পাশ  
বাহতে মোর।

বসন্ত নাহি | এ ধরায় আর  
আগের মতো;  
জ্যোৎস্না যামিনী | যৌবন হারা  
জীবন হত।

ভুলভাঙা, মানসী, রবীন্দ্রনাথ  
শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি যেখানে যেখানে ত্রিযুক্তিক হয়েছে তা দ-ও-চিহ্নের দ্বারা নির্দেশ করা হ'ল। ওই 'বন্ধন' কথাটিই সর্বপ্রথমে অক্ষরগুণিত বন্ধনপাশ ছিল করলে। বরষুত ছন্দ বহুকাল যাবৎই যৌবন-কুলাদ্যে ছড়া, বাউলের পান প্রভৃতি লোকসাহিত্যে ব্যবহৃত হ'লে

আসছিল। কিন্তু প্রকৃত রসসাহিত্যে এ ছন্দ অনেক কাল পর্য্যন্ত স্থান পায় নি। রামপ্রসাদের গানেই এ ছন্দের সর্বপ্রথম বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। তারপর নিধুবাসুর চাঁদা, ইদুর ও গুপ্তের ও ফেমচন্দ্রের ব্যঙ্গকবিতা এবং মধুসূদনের প্রহসনেও এ ছন্দের সাক্ষাৎ মেলে; কিন্তু এসব দ্বীপগুলিও লোকসাহিত্যেরই অধবর্তন মাত্র; বিযুক্ত সাহিত্যে এরা এ ছন্দকে সমর্থন করেননি; আর ওসব দ্বীপগুলিও অনেক হানোই বিযুক্ত বরষুত ছন্দে রচিত নয়;—কোথাও ছড়া পাঁচালির মতো ভাঙা-ভাঙা, কোথাও সাধুছন্দের সঙ্গে মিশ্রিত।

বরষুত ছন্দকেও রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে সাধু-সাহিত্যের আসরে অভিনয়িত করেন। তাঁর পরিণত বয়সের রচনায় এ ছন্দেরই প্রাণচয় দেখা যায়। 'কণিকা'র যুগেই তিনি এ ছন্দকে সর্বপ্রথম কবিতা রচনার একটি বিশিষ্ট বাহনরূপে ব্যবহার করতে শুরু করেন। সে সময় থেকেই এ ছন্দটি কবি-সমাজে বাঁচি বাংলা ছন্দ বলে আদৃত হ'য়ে আসছে। শিশু রবীন্দ্রনাথ যে কণিকায়ই এ ছন্দের সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছেন, তা নয়। 'কণিকা'র (১৩০৬ সাল) বহুকাল পূর্বেই 'ছবি ও গান'-এ (১২৯০ সাল) এ ছন্দের সর্বপ্রথম রচনা দেখতে পাই। 'ছবি ও গান'-এর বরষুত ছন্দের এই একটি বিশেষ মূল্য আছে যে, ওর থেকেই আমরা বুঝতে পারি বরষুত ছন্দ লোকসাহিত্যের অনিয়মিত আকৃতি পরিণামের ফলে কিরূপে কাব্যসাহিত্যে ব্যবহার-যোগ্য রূপে আকার গ্রহণ করেছে। একটা দ্বীপ দিচ্ছি—

একলা পাখী | গাছের শাণে।

কাছে তোর | বসে থাকে,

সারা জুপুর | বোলা শুধু | ডাকে।

যেন তার | আর কেহ নাই,

সারাদিন | একলাটি তাই।

মেহতর | তোরে নিয়েই | থাকে।

—আপারগণী, ছবি ও গান, রবীন্দ্রনাথ



উক্ত দুইজনকে দেখলেই বোঝা যায় যে ওটা আমাদের  
সুপ্রসিদ্ধি আট-আট-দশের দীর্ঘাঙ্গিণীদ্বারা ছাঁচে ঢালা।  
বাস্তবিকপক্ষে উক্ত পাকিগুলির অনেক ফলেই, বিশেষ-  
ভাবে চোরা-চিকিত্সিত ভিন্দি হলে, অক্ষরবৃত্তের ধ্বনিও রয়েছে।  
স্বরবৃত্তের দিক থেকে দেখতে গেলে ওই ভিন্দি আখ্যায়ি ছন্দ-  
পতন হয়েছে। এক্ষণে হ'বার কারণ এই যে এখানে কবি  
আসলে ত্রিক স্বরবৃত্ত রচনা করতেই চান নি; তিনি চেরেভেন  
প্রচলিত দীর্ঘ-ত্রিধারী রচনা করতেন। অতঃ শব্দাস্থিত  
কয়েকটা যুগ্মধ্বনিক (দ্ব-চিকিত্সিত) প্রয়োজনমত এক  
ইউনিট ব'লেও গণ্য করেছেন। তাই এখানে স্বরবৃত্ত  
ও অক্ষরবৃত্তের একটা মিশ্রণ হয়েছে; "ছবি ও গান"-এ  
একপ এবং এর চেয়েও বেশি মিশ্রণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে।  
আরেকটা নমুনা দিচ্ছি—

+  
দীর্ঘে দীর্ঘে প্রভাত হ'ল  
আধারে মিলায়ে গেল,  
উমা হাসে কণকবরণী,  
বকুল গাছের তলে,  
কুসুম রাশির পরে,  
বসিয়া পড়িল সে রমণী।  
আঁবি দিলে কর করে  
অক্ষরাণি ক'রে পড়ে

ভেঙে যেতে চার দেন বুক,

+  
রাঙা রাঙা অরুণ ছটা  
কৈশে কৈশে ওঠে কতো,  
করতল সেকন্দর মুখ।

—বিহ্বল, ছবি ও গান, রবীন্দ্রনাথ

এটা অক্ষরবৃত্ত দীর্ঘাঙ্গিণীদ্বারা দৃষ্টান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ  
নেই। কিন্তু চোরা-চিকিত্সিত ছটা স্থানে বাস্তবিকপক্ষে  
অর্থাৎ স্বরবৃত্তের দ্বারা এ ছটা জায়গায় যুগ্মধ্বনিক এক  
ইউনিট ধরা হয়েছে। আসল কথা, অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও  
শব্দাস্থিত 'যুগ্মধ্বনিক' এক ইউনিট ব'লে ধরা যায় কিনা  
রবীন্দ্রনাথ তাই পরীক্ষা করছিলেন। এই পরীক্ষা-কার্যের  
ফলেই 'ছবি ও গান'-এ অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের কবাবিশি  
মিশ্রণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই পরীক্ষা ও মিশ্রণের  
ফলেই রবীন্দ্রনাথ অবশেষে স্বরবৃত্ত ছন্দের আসল প্রকৃতির  
সন্ধান পেয়েছিলেন। 'কবিকলা' আমরা তারই পরিচয়  
পাই। 'উৎসর্গে' স্বরবৃত্ত দীর্ঘাঙ্গিণীদ্বারা পূর্ণাঙ্গ নিদর্শনের  
সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

অতি সুস্থ দীর্ঘ পণে  
আকুল ভব আঁচল হ'তে  
আঁধারতলে গলকথা রাশি'  
জোনাক-জালা বনের শেরে  
কখন এলে হঠাৎদেখে

শিথিল কেশে লগাটখানি ঢাকি।

—৩১, উৎসর্গ, রবীন্দ্রনাথ

সুতরাং দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ মাতাবৃত্ত ছন্দের স্বরপ  
যেমন অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ভিতর থেকেই আবিষ্কার করেছিলেন,  
স্বরবৃত্ত ছন্দেরও সাহিত্যিক রূপের সন্ধান তেমনই অক্ষরবৃত্তের  
মধ্যেই পেয়েছিলেন। কারণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মাতাবৃত্ত ও  
স্বরবৃত্ত উভয়েরই মূলতর পাশাপাশি অবস্থিত আছে।

## শ্রীকণ্ঠ

( পর )

শ্রীহরিপদ গুহ

মামাবাবু কি একটা কার্যোপলক্ষে নইনিভালে গিয়া  
ছিলেন; কিহিবার সময় অনাথ যুবক শ্রীকণ্ঠকে সঙ্গে করিয়া  
আনেন। তাহার বয়স তখন বহর আঠার-উনিশ হইবে।  
গ্রামবর্গ, ছিপ-ছিপে লম্বা চেহারা; একমাথা ঘন কালো  
কোকড়া চুল; চোখের নীচে একটা গভীর কাটা দাগ।  
ভাগা-ভাগা বড় ছটা চোখ। দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা  
হয়। সে মামাবাবুর নিকট বলিষ্ঠ ছিল যে, তাহার কেহই  
নাই। মামাবাবুর কথা তাহার ভাল করিয়া মনেই হয় না।  
কোন এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের কাছে থাকিয়া সে  
মাথুয হইয়াছে;—সহসা সেই আত্মীয়ের মৃত্যুতে সে একে-  
বারে নিরবলম্ব ও পথের ভিখারী হইয়া পড়িয়াছে। একটু-  
খানি আশ্রয়ের জন্ত সে মামাবাবুর নিকট কাদিয়া  
পড়িল। কোমল-গ্রাম মামাবাবু তাহার কাতর অরুণে  
উপেক্ষা করিতে পারিলেন না;—সঙ্গে করিয়া একেবারে  
কলিকাতায় আনিয়া হাজির হইলেন।

আমাদের কয়েকটা ছোট ছেলের ভার পড়িয়াছিল  
শ্রীকণ্ঠের উপর। প্রথম প্রথম আমরা তাহাকে একটু  
ভয়ের চ'খেই দেখিতাম; হু দিন পরেই কিন্তু তাহা একে  
বারে কাটিয়া গেল। গ্রাম বুলিয়া মনের আনন্দের তাহার  
সঙ্গে মিশিতে লাগিতাম। সে আমাদের খুলে পোছাইয়া  
দিয়া আসিত এবং ছুটির পর গিয়া আবার লইয়া আসিত।

আমাদের বাড়ীর পিছনে একটা গালি ঘরি পড়িয়াছিল,  
সেখানে আমরা বেলা করিতাম। শ্রীকণ্ঠ আমাদের নিত্য  
নৃতন বেলা শিখাইত, প্রতি বেলায় সে নিজেও যোগদান  
করিত। তাহার সহিত বেগিতে বেগিতে আমরা বসের  
পার্শ্বকার কথা একেবারেই বুলিয়া যাইতাম।

মাঠার মহাশয় পড়াইয়া চলিয়া গেলেও কিন্তু আমরা  
উঠিতে পারিতাম না; অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বই

লইয়া বসিয়া থাকিতে হইত! সেই সময় শ্রীকণ্ঠই হইত  
আমাদের মাষ্টার। ভুল পড়িলে সে তাহা সশোধান করিয়া  
দিত। কাহারা যুম আসিলে কাড়কুড় দিয়া যুম তাড়াইত;  
কখন কখন বা আন্তে আন্তে দুই একটা গাটী মারিত।  
আমরা কখনও কিন্তু এই সব কথা বাড়ীতে জানাইতে  
সাহস করি নাই; কারণ সে আমাদের বড় ভালবাসিত,  
আর জানাইলেও যে বিশেষ কোন ফল হইত বলিয়া মনে  
হয় না;—কারণ, মামাবাবুর কড়া-হুকুম ছিল—আমাদের  
শাসনে রাখিবার জন্ত।

তদুপর বেলা শ্রীকণ্ঠ তাহার ঘরে বসিয়া বই দড়িত, কোন  
দিন বা নিয়মে আপন মনে পাতার পর পাতা লিখিয়া  
বাইত। হঠাৎ কি করিয়া একদিন মেয়ে মহলে শ্রীকণ্ঠের  
সেখাপড়া জানার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল; বাসু আর  
দায় কোথা! তাহার আর একটা কাজ বাড়িয়া গেল।  
এখন তাহাকে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ডাকঘরে ছুটিতে হয়,  
আর সময় সময় দুই একখানি চিঠিও লিখিতে হয়।

সকণ্ঠেই জানিল বটে—শ্রীকণ্ঠ সেখাপড়া জানে কিন্তু  
তাহার বিদ্যার পরিমাণ কতটা তখনও কেহ তাহা জানিতে  
পারে নাই। হঠাৎ মামাবাবু একদিন তাহা আবিষ্কার  
করিয়া ফেলিলেন। সেই দিন বোধ হয় শনিবার।  
মামাবাবু সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। প্রথমই  
তিনি শ্রীকণ্ঠের খোঁজ লইলেন। সে তখন বাড়ী ছিল না;  
কি একটা প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছিল।

মামাবাবু মামীমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখো, এতদিন  
শ্রীকণ্ঠের উপর আমরা বড় অজ্ঞার আচরণ করে এসেছি;  
অনেক পুঙ্কেই তার সম্বন্ধে আমাদের খোঁজ লওয়া উচিত  
ছিল। সে বোধ হয় আমাদের কাছে তার সত্য পরিচয়



দেয় নি। কাল আমাদের ছোট সাহেব একটু জরুরী কাজে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তো আর বাড়ী ছিলুম না; শ্রীকৃষ্ণ সাহেবের সঙ্গে কথা করেছি। আজ সাহেব আমাদের বিজ্ঞান করছিলেন—‘বায়ু, কাল যে দুইটুকী আমার সঙ্গে কথা করেছিল, সে তোমার কে ধর? কি করে সে? বেশ সুন্দর ইংরেজী বলতে পারে তো!’

মামীমা বলিলেন—‘একথা তো তোমার আমিও একদিন বলেছিলাম যে শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রলোকের ছেলে, বড় সুন্দর স্বভাব।’

মামাবাবু আর কিছু বলিলেন না।

এই ঘটনার কিছুদিন পর আমাদের প্রাইভেট মাস্টারের জবাব হইয়া গেল, আর শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পড়াইতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণকে সকলেই বেশ স্নেহ করিত, শুধু তাহাকে সেবিত্তে পারিত না মামাবাবুর জালক প্রকাশ। প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বছর ধানেকের বয়। পার্শ্ববাসী তিনবার ফেল করিয়াছে সে। লুকাইয়া লুকাইয়া বিড়ি বায়, পড়িতে বসিয়া বইয়েতে চৌকা মারিয়া শব্দ করে—‘তেড়ে কেটে তাক!’

এক নম্বরের ফাঙ্কিল ছেলে সে।

শ্রীকৃষ্ণ এখন মাস্টার হইল, প্রকাশ একেবারে তেল-বেকনে জলিয়া গেল। সে মামীমার নিকট জানাইল যে, ঐ চাকরটার কাছে সে পড়িতে পারিবে না। মামাবাবু তুমিরা এক ঘনকে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কান্ধে ছুটানো পড়িতেই হইল। পড়িতে বসিয়া সে নানারূপ চিত্রানি আরম্ভ করিল; শ্রীকৃষ্ণকে ঠকাইবার জন্য সে নিতানু নুতান উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল; কিন্তু কোনটাতেই সে তাহাকে জয় করিতে না পারিয়া মনে মনে আরও কেশিয়া উঠিতেছিল।

সেবার পরীক্ষার ফল বেশ ভালই হইল। আমরা সকলেই ভালরূপ পাশ করিলাম; প্রকাশ কিন্তু পাশ করিতে পারিল না। সে মামীমাকে জানাইল—শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে মোটেই পড়ায় নাই,—তাই সে পাশ করিতে পারিল না।

কথাটা শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসায় সে একটু হাসিয়া মাজ।

মামাবাবুকে বলিয়া সে প্রকাশের জন্ত আর একজন

মাস্টার রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। এই নূতন মাস্টারের কাছে খালি প্রকাশই পড়িত। সে আমাদেরও তাহার দলে ভিড়িবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাতেও সফলকাম হইতে পারে নাই।

বেশদিন কিন্তু আর প্রকাশের লেখা পড়া করিতে হইল না। হঠাৎ সে একদিন বাড়ী হইতে পলায়ন করিল। মামাবাবু খোঁজ মইয়া জানিলেন যে, সে একটা যাত্রা পার্শ্ববাসী বোগদান করিয়া মফসলে অভিনয় করিতে গিয়াছে।

প্রকাশের এইরূপ ব্যবহারে মামাবাবু অত্যন্ত রোষিত হইয়াছিলেন। মামীমার অহুরেও তিনি আর তাহাকে কিরাইয়া আনিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে শুধু বলিলেন... ‘ওকে এখানে রেখে আর ছেলেদের নষ্ট করিতে পারব না।’

ইহার পর মামীমাও তাহাকে আর কোন অহুরেও করেন নাই।

সেবার আমার মামাতো বোন মণিমালায় জর হইল; জর ক্রমে টাইকয়েডে ঠাঁইহইল। সকলে তাহার প্রাপ্তের আশা এক প্রকার ভিড়িয়া ইমিছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিরাট আশার স্বপ্না পার্শ্ব বসিয়া অস্বস্তভাবে তাহার সেবা তাহাকে এ যাত্রার মতন বাঁচাইয়া তুলিল। সকলেই এক বাস্কে বলিল—‘মণি এবার বাঁচল শুধু শ্রীকৃষ্ণের জন্ত।’

মণিমালা প্রায় দুই মাস রোগে ভুগিয়াছিল; আরোগ্য হইল বটে, কিন্তু চেহারা হইল মনে ঠিক একখানি পোড়া কাঠ। স্থির হইল—গ্রীষ্মের চুটতে সকলে পুরীতে যাই। মাস দুই তিন পুরীতে থাকিলে মণিমালায় বাহ্যের অনেক উন্নতি হইবে। ডাক্তারবাবুও এই যুক্তি স্বর্থন করিলেন।

মাসখানেক হইল আমরা পুরীতে আসিয়াছি। মণিমালায় বাহ্যের বেশ উন্নতি হইয়াছে। আমরা সকলে প্রাতে ও বৈকালে সমুদ্রতীরে রমন করি। অহুদের পূর্বে মণিমালা শ্রীকৃষ্ণের সমুখের বড় বাহির হইত না। এখন আর তাহার কোন সন্ধান নাই; এখন সে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান

গানের জন্ত উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। নানা ছলে সে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্যাপার করিতে আসে। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু লজ্জার দৃষ্টকোণে লাল হইয়া ওঠে।

শ্রীকৃষ্ণ হয় তো বাহিরে গিয়াছে,—আসিয়া দেখে—গ্রাহার ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; কাপড়খানি কোঁচান, দানায় সুশিমেছে, বইগুলো গোছান, বিছানা পাশ। সে কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না; লজ্জায় একেবারে মরমে মরিয়া যায়;—মনে মনে সে ব্যাপারটা যে না বোঝে তাহাও নয়; অথচ উপায়ই থাকি!

মামীমা মণির রকম দেখিয়া মনে মনে হাসিতেন। মামাবাবু প্রতি শনিবার পুরী আসিতেন; মামীমার কাছে সব তুমিরা তিনিও বেশ উৎসাহ হইতেন। মামীমা বলিতেন—‘ভূটতে কিন্তু বেশ মানাবে। মণির শরীরটা সেরে উঠুক, গাম্বের কাণ্ডওই কিন্তু হুঁজুরের চার হাত এক করতে হবে।’

মামাবাবু হাসিতেন; বলিতেন—‘কাণ্ডনের এখনও জের বাকী, সে দেখা যাবে’ন।’

মামা-মামীমার মধ্যে এই রকম আশোচনা প্রায়ই হইত; মণি এবং শ্রীকৃষ্ণের কাণেও যে ইহার কিছু না বাইত তাহা নহে। ছদ্মনেই সরমে রাজা হইয়া ঘামিয়া উঠিত। মণি হয় তো অনেক ঘন্টা ঘুর ঘুরে পলাইয়া ফিরিত; তারপর মায় ঘর-ঘরু আশায় করিয়া ছাড়িত। এমন করিয়া বেশ আনন্দের তাহারে মন কাটতেছিল।

মণিমালা তাহার ভয়-স্বাধ্য করিয়া পাইয়াছিল।

মামাবাবু একদিন আসিয়া বলিলেন,—‘এবার তোমাদের কান্ডাতার কিরতে হবে; ছেলেদের দুল খুলে দেবে।’

তারপরই একদিন মাল-পত্র ধরিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

•

কাল সরস্বতী পূজা। শ্রীকৃষ্ণ কোথা হইতে অনেক দুল আনিয়াছিল। মণিমালা বাড়িয়া বাড়িয়া বড় বড় দুল খুঁজি মালা গাথিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দিন বাড়িয়া পুরায় ঘরটি কাগজের রঙিন দুল ও শিকল দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে।

তখন রাত্রি গোটা আটকে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ মামীমার নিকট ভাত চাহিল।

মামীমা, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আজ এত তাড়াতড়ি কেন বাবা?’

শ্রীকৃষ্ণ সহাত বদনে বলিল—‘একটু কাজ আছে মা!’

পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া বেশি পুস্তি সে চারিদিক খিরা দেখিয়াছে। যে দিকে চাই, সেই দিকেই লাল পাগড়ী। আমাদের বিশ্বরের আর লীলা রহিল না। ভয়ও বেশ হইতেছিল।

ইনস্পেক্টর সাহেব মামাবাবুকে মার্জ ওয়ারেন্ট দেখাইয়া বলিলেন,—‘আপনার বাড়ীতে আসামী আছে। শ্রীকৃষ্ণ ওর ছদ্ম নাম; আসল নাম—অরিন্দম। বি-এ ক্লাসের ছেলে সে; রাজনৈতিক আসামী। হু—তিন বছর থেকে তাকে ধরতে চেষ্টা করছি,—ভয়ঙ্কর ছেলে মশাই, আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে কিরছে;—আমরা সব হিম্মতি খেয়ে আজ শিকার পেয়েছি।’

কোথায় শ্রীকৃষ্ণ? পুলিশ তত্ন করিয়া—সমস্ত বাড়ী অন্বেষন করিয়া কোথাও তাহার সেবা পাইল না। ইন্সপেক্টর সাহেব সংশয়ে বলিলেন,—‘শমতান এবারও কাকি দিয়েছে; দেখা যাবে পাশ্চিকোপায় লুকোতে পারে।’

পুলিশ তাহার কর্তব্য করিয়া চলিয়া গেল।

মণি কাদিয়া কাদিয়া তাহার চকু ফুলাইয়া ফেলিল।

মামীমার চকুও শুক ছিল না। কিছুদিন পর্যন্ত আমরা সকলেই মন-মরা হইয়াছিলাম। মামাবাবু গোপনে তাহার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কোন সন্ধানই পান নাই।

সেদিন মণি ঘর পরিষ্কার করিতে করিতে হঠাৎ একটা ছবির পিছনে একখানি কাগজ দেখিতে পাইয়া সেখানি বাহিরে আনিয়া দেখে—একখানি চিত্রি এক সেখানি তাহাকেই দেখা। ভাজ খুঁজিয়া তাড়াতড়ি সে পড়িতে লাগিল:—

‘কল্যাণদায়ক,

মণি, বিদ্যার, ত্রিবিদ্যার। যেমন যুগেকের মত এসেছিলাম, আজ আমার তেমন সহ্যাই আমাকে যেতে হলো। বিদ্যাতার কি অপূর্ণ পরিহাস! তোমাদের কাছে পরিচয় দিয়েছিলাম তা আমার সত্যকার পরিচয় নয়।



আমার সত্য পরিচয় কাল পুণিশের কাছেই তোমরা পাবে। আমি তোমায় ভালবাসি জীবনে এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু আছে বলে ভ্রামি না;—সত্যে তার বৈশি কামনা করবার অধিকার হ'তে যে আজ আমি বঞ্চিত। পথই যার আশ্রয়, যার তার কাছে প্রণোভনের হ'লেও—পথই থেকে যাবে চিরদিন। যদি কোন অজায় করে থাকি মণি, আমার তুমি কমা কৈরো; আমার হৃদিমের স্মৃতি মুছে ফেলো।

আমার জীবন যে কি ভয়ঙ্কর তা ভাষার প্রকাশ করবার নয়;—এক একবার ইচ্ছে হয় চোরের মত এমন করে আর আত্মগোপন করে থাকব না, নিজেকে ধরা দি; কিন্তু কেন মিই না যাব? তা হ'লে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হ'বে। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ-বেশি কৃতদিনে আমার এ হৃদয়ের অবদান। চন্দ্রমুখ কোথায় যাব জানি না। মাকে আমার প্রণাম দিও।

ইতি তোমাদের  
শ্রীকণ্ঠ

মনিমালার চক্ষুহী অশ্রুতে টলমল করিতেছিল তাহার হৃদয়ে যে তুফান উঠিয়াছিল, তাহাতে সে অনেকক্ষণ অভিহৃতের মত হইয়া পড়িয়াছিল, একটু পরে প্রকৃতির হইয়া আসল দিগ্না যে চক্ষু মুছিয়া ফেলিল।—আজ তাহার চাঁৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল—“ওগো নিষ্টর, ফিরে এস। তুমি ফিরে এস। আজ জগতের সামনে বলতে কুণ্ডিত হ'ব না যে তুমি নির্দোষ।”

অনেকদিন ইহা গিয়াছে শ্রীকণ্ঠ এবান হইতে চলিয়া গিয়াছে। আজ পর্যায় তাহার মধুর স্মৃতি কিন্তু কেহ ভুলিতে পারে নাই। এখনো মনে হয় সে নিশ্চয় আসিবে, বিজয়ী বীরের মত মণোমালা ভূষিত হয়ে আসিবে, সেই আশাতে এখনো বাঁকীর সকলে বুক বাঁধিয়া আছে। মিথ্যার কুআটিকার কতক সত্য-স্বর্গ ঢাকা থাকে?

বিবেকানন্দ উৎসব

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার নানা স্থানে বিবেকানন্দ-উৎসব হইয়া গেল। ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ যে বাঙ্গালীর এ গৌরব আমরা কখনই বিস্মৃত হইব না। পুন্ড্রীকীকৃত হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবার আরো অনেক কারণ বাঙ্গালীর কাছে, তাঁর আকৃতি যেমন সুন্দর ছিল, তাঁহার প্রকৃতি তেমনই সুন্দর ছিল—হৃদয়ের তাঁর যেমন শক্তি ছিল, তাঁর কাণ্ডও তেমনই শক্তি ছিল।

কলিকাতা সিংলিয়ার দত্তবংশে বিবেকানন্দ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ বাহুবলী তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁর পূর্ণাঙ্গনাম মন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পঞ্চদশাতেই বিখ্যাত দার্শনিক মনোবী হার্বার্ট স্পেন্সারের সঙ্গে তাঁর দর্শনশাস্ত্র-মতকে আশোচনা হয়। হার্বার্ট স্পেন্সারকে তিনি এ-মতকে যাত্রা লিখিয়া পাঠান তাহাতে সেই পাশ্চাত্য মনোবী বিস্মৃত হন। ইহার এক খুসতাতের দ্বারা ইনি পরমহংসদেবের নিকট নীত হন—পরমহংসদেব তাঁহার সৃষ্টি কঠোর গান শুনিয়া মোহিত হন। প্রথম দর্শনেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে ও বক্তৃতায় পাশ্চাত্যদেশের জনসাধারণ কিঞ্চৎ হইয়াছিল, তাহা আচ্ছাদ্য কাহারও অধিনীত নাই, হুতরাং সে সকল কথার ‘পুনরাবৃত্তি’ নিশ্চয়োগ্য। তবে ইহা উল্লেখযোগ্য যে আচার্য্য দ্যাক্সমুদারের “লাইফ এণ্ড সেটিংস অফ রামকৃষ্ণ” নামক পুস্তক-রচনা-মতক্ষে প্রেরণা দিয়াছিলেন বিবেকানন্দই।

দরিদ্র ও অশুভ্রের প্রতি মমতাবশত স্বামীজী যে সেবারতের অত্যাধীন করিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহার চিরস্মরণীয় মহত্তম কীর্তি। যাহারা হুস্ত, যাহারা দুর্গত, যাহারা হুস্তিক ও বস্তা-প্রদীপ্ত তাহাদের প্রাণপণ সেবা ও যত্নের জন্য রামকৃষ্ণ-মিন কি ত্রুত লইয়াছেন তাহা কে না জানেন? সেই সেবারতের উৎস স্বামীজী।

দরিদ্র-নারায়ণের সেবাকে বাদ দিয়া বিবেকানন্দকে আমরা ভাবিতে পারি না। ভগবান করুন আমাদের বিবেকানন্দ-স্মৃতি যেন কেবল উৎসব ও বক্তৃতার মধ্য দিয়াই শেষ না হয়, আমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক-অনুসরণ করিয়া দরিদ্রের সেবার তাঁহারই মত আত্মনিয়োগ করিতে, তাঁহারই মত উন্নত চরিত্র লাভ করিতে পারি। কোন চরিত্রবান ব্যক্তি কোনদিন দেশকে বড় করিতে পারেন না ও পারিবে না, একথা যেন আমরা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখি।

ভারতের জন্য বাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ অজত। তিনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন প্রকৃত হিন্দু-ধর্মের ব্যাখ্যা করিতে, হিন্দু-ধর্মের উজ্জ্বলতা ও বিশালতার পরিচয় দিতে, পাশ্চাত্য-জগতের হিন্দুধর্মের উপর যে একটা ভুল ধারণা ছিল যে, অদ্বৈতবাদের ভগ্না হিন্দু জ্ঞানে না—বহু দেব-দেবীর পূজা করিয়াও হিন্দুতা একত্বস্বাবী এই বিরাট সত্য তাহাদের কাছে উপস্থাপিত করিতে—আর তিনি গিয়াছিলেন ভারতের জন্য মহাত্মত্ব লাভ করিতে—হিন্দুধর্মের উপর যে অথবা অজ্ঞান অদ্বৈত হইতেছে তাহা দূর করিতে। তাঁহাকে

দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া সেখানে লোক ও চিকাগোর ধর্ম-মহামণ্ডলীর সমবেত সভাপণ অস্তিত্ব ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, যে দেশে বিবেকানন্দের মত লোক জন্মিয়াছেন, সে জাতিতে অবলোপ করিবার উপায় নাই, যে জাতিতে অবনতিত করিবার শক্তি কাহারও নাই—তাঁহার বিজয়-কেতন পৈতৃক উত্তরী।

সেই হিন্দু দরিদ্র হইলেও তাহার হৃদয়ের কোমলতা নষ্ট হয় নাই, পরের দুঃখ বোধ করিবার শক্তি তাহার লুপ্ত হয় নাই, দুর্গতকে পীড়া দিয়া সে তাঁহার মহত্বকে অবমাননা করে না। প্রতি বৎসর তাঁহার জন্মোৎসব দিনে আমরা মনে তাঁহার বিষয়ে ধ্যান-ধারণা করিয়া ধন্য হইতে পারি। মহাকবি স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের উক্তি আমরা সকলকেই স্মরণ করিতে অনুরোধ করি:—“তোমার বিবেকানন্দ কে-বদান্তের পণ্ডিত বলিয়া তাঁহাকে ভালবাসি না—পর্যায় অসহায় ও নির্ণায়িত্বের দুঃখ শুনিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠে দেখিয়াই তাঁহাকে ভালবাসি। বিবেকানন্দ ছিলেন সত্যকারের প্রেমিক।” এই প্রেমিকের পদাঙ্ক-অনুসরণ করিয়া দেশ উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হউক।

স্বর্ণের রঞ্জনী

ভারত হইতে ক্রমাগত সোনা রঞ্জনী হইতেছে, কিন্তু ইহা রোধ করিবার কোন উপায়ই সমিতি হইতেছে না কেন? ভারতীয় বণিক-সমিতি এ-বিষয়ে আমাদের আলোচন করিয়াও কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই। বড় বড় রাজ-কর্মচারীরা এ-রঞ্জনীতে যে দেশের লাভই হইতেছে বলিতেছেন, তাহাদের যুক্তির সারবত্তা আমরা উপলব্ধি করতে পারিতেছি না। স্বর্ণের বিনিময়ে অধিক অর্থ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু দেশ হইতে তো স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতেছে,—যাহা হউক সেফ্টমের শেখভাগ হইতে জাহাজী মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বিদেশে বেরণ সোনা রঞ্জনী হইয়াছে নিয়ে তাহার একটা তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—



কাল	কাল	কাল	কাল
২৬-১০-৩১	২৬	১৭	
৩১-১০-৩১	২	৫৫	৫৬
১০-১১-৩১	২	৩০	৩১
১৭-১১-৩১	২	২	৮৫
২৪-১১-৩১	১	২৮	২৭
৩১-১১-৩১	২	৮১	৮২
১০-১২-৩১	৮	৫১	৫২
১৭-১২-৩১	৮	৫১	৫২
২৪-১২-৩১	১	১১	৮১
৩১-১২-৩১	২	৬০	৮২
২৮-১১-৩১	২	৩২	৩২
৫-১২-৩১	২	৪৩	২২
১২-১২-৩১	৮	৫৩	৫৬
১৯-১২-৩১	৮	৫৬	৮৭
২৬-১২-৩১	৩	২৯	২৯
১-১-৩২	২	৪৬	৪১
৮-১-৩২	১	৭১	৮৪
১৫-১-৩২	৩	৬১	১৭

আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হইয়াছে। বস্তুতঃ নিরুপেক্ষ-ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অর্থনৈতিক বিবর্তনে এমন ক্ষেত্র উপস্থিত হইবার সুযোগ আসিতে পারে, যখন স্বর্ণ-ব্যবসায়-সংক্ষেপে ভারতের অতীত গৌরব বেশের আর্থিক সুবিধা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

বড়লটি বাহাদুর 'সুযোগ আসিতে পারে' বলিয়া যে কথা বলিয়াছেন, তাহা 'নাও আসিতে পারে।' তাহার বক্তব্যকে অর্থনৈতিক অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় কি? আমরা একথাটা ঠিক মনঃসম্মত করিতে পারিতেছি না। ভারতবর্ষ যদি তাহার অগাধ স্বর্ণ সম্পদের কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া বিনিময়ে সম্ভাব্যজনক অর্থ পায়, তাহা হইলে ব্যবসায়ীরা ইংলও কেন তাহার স্বর্ণ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভারত হইতে স্বর্ণ আনয়ন করিয়া বিক্রয় করিতেছে—আপনাদের স্বর্ণ-সম্পদের ভাণ্ডার অধিক মাত্রায় স্বর্ণে পূর্ণ করিতেছে। ইংলওও তাহার স্বর্ণ-সম্পদ বিক্রয় করিয়া অধিকতর লাভবান হইতেছে না কেন? এ সুযোগ ইংলও কেনইবা ছাড়িতেছে?

#### পরমা বৈশাখ

আমরা কুনিয়া সুবী হইলাম যে, ১লা বৈশাখ সরকারী ছুটির দিন; বলিয়া কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এইদিন বাঙ্গালীর পূজার—বাগালার নৃতন বছর ঐ দিন হইতে আরম্ভ—স্বতন্ত্রা বহু আন্দোলনের ফলে কর্তৃপক্ষ যে হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন ইহা আনন্দের কথা। আর গাঁহার ক্রমাগত চেষ্টায় এই দিনটা ছুটির দিন বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে সেই অক্লান্ত-কর্মী বাঙ্গালার ব্যবসায়িক সভার সমস্ত শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরীকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

#### বাংদেশীর পূজা

এ দেশে অশিক্ষিত ব্যক্তি থাকুক, বিদ্যার চর্চা ব্যক্তি কেন অল্প হউক, বাংলাদেশীর পূজা হয় অসংখ্য স্থানে। সে পূজা অধিকাংশ স্থলেই কলা ও অন্তঃস্থ বিশ্বাস অধিষ্ঠাত্রী দেবীর

প্রাণ্ড ভক্তি-স্বাক্ষর-বশতঃ হয় না, হয় ছড়গে। পাঁচজনে করিতেছে 'আমরাও' করিব না কেন?—এই দ্বার হইতে ইহার উৎপত্তি। বিনি বিদ্যাদারিনি বীণাপাশি তাহার পূজার বহুদানে এবার যে বাহুল্য, অমণ্য অর্থব্যয়, ও অর্থব্যয় আড়ম্বর দেখিলাম, তাহা হইতে মনে হইল দেশের বর্তমান অবস্থার সম্বন্ধে লেশমাত্র খেয়াল ও দেবীর প্রতি বিদ্যুৎ-ভক্তি থাকিলে 'আড়ম্বরটা কেহই বড় করিয়া পূজাকে ধর্ম করিত না। এই প্রসঙ্গে আমরা সাধক রামপ্রসাদের সেই কথাটা দেশবাসীকে মাত্র 'স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—'জ্ঞানময়কে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে। ইত্যাদি—'

পূজাকে ধর্ম করিবার কথা এইজন্য বলিতেছিলাম, যে কোন এক ধর্মীর বাড়ীর বাগানে-পুকুর-দেখিলাম বায়ত্মেপ হইল, গাভী-ছুটি, ঘোঁটর আসিল, বস্তু ও আত্মীয়রা তুরিভোজনে আয়োজিত হইলেন কিন্তু সর্বপ্রতি পূজার দিন কি তাহার পরদিন সেখানে কোন কাঙালীকে বাইতে দেখিলাম না বহু যে দুঃখজনক বস্তুক দরিদ্র এক টুকরা খাদ্য পাইবার জন্য আশ্রয়-মাথা খুঁজিল ভৃত্যের ধর্মক বাইয়াই তাহাদের বিদায় হইতে হইল।

দেশের আব-হাওয়ায় পরিবর্তনের ফলেই কি এমনটা হইতেছে। আমাদের বাল্যকালে শহরে কি পরীণামে এমন কোন উৎসব হইতে দেখি নাই, যেখানে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হইত না—তাহারাও উৎসবের আনন্দে যোগদান করিত ও ভোজনের 'আনন্দ' হইতে বঞ্চিত হইত না।

#### প্রসিদ্ধ বিনামা ব্যবসায়ীর সম্মান

জ্যোতি-পোতাক্ষিয়ার কোটপতি বিনামা-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত উমাস বাটা সম্ভ্রান্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলিকাতা হইতে যে থানকায় জিখকোটা লোককে, কলিকাতার দ্বারা চরণ আশ্রয় করে না, ছুটা পরাইবেন অর্থাৎ ছুটার দাম খুব সস্তা করিয়া তাহাদিগকে বিনামা-পরিণামে প্রণোদিত করিবেন।

চমসাদ্য কার্ণি হইলেও শ্রীযুক্ত বাটার সংস্কৃত বনি সফল হয় তাহা এখানে একটা নূতন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান হইবে। তিনি যে জুতা প্রস্তুত করিবেন তাহার উপরটা হইবে কাপড়ের আর তলা রসের। এই রকম জুতা এখন জাপান সুরবরাহ করিতেছে। জাপান এত সস্তায় জুতা দিতেছে যে আজকালকার দিনে অর্থের টানাটানির ফলে লোকের চামড়ার জুতা ছাড়িয়া ঐ প্রকারের জুতাই লইতেছে।

কলিকাতার নিকট জুতার কারখানা খুলিবার মানসে শ্রীযুক্ত বাটা উপযুক্ত জমীর সন্ধান করিয়া কাটহারাকুল তেলের কলের নিকট সতের বিঘা জমী পাঁচ বছরের জন্য ইহারায় লইয়াছেন এবং এই পাঁচ বছরের মধ্যে, ইচ্ছা করিলে তিনি উক্ত জমী কিনিয়া লইতে পারিবেন। এখানকার অনেক লোক তাহাতে নিয়োজিত হইবে, যেকোন-সময়ের কিছু কিছু মাথা হইবে। আর জুতার প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের সর্বত্রই খুব বেশী—তাহা আর কাহাকেও কি বলিতে হইবে? এই দেশের 'ছক'-ক্রিমী-হইতে যে রোগের উৎপত্তি হয় তাহাতে দেশের শতাব্দে লোককে অকালে জীবমৃত্যু করিয়া রাখে, বহুসংখ্য তাহাদের চিকিৎসার মত হারাইতেও হয়। জুতা হইলেই করিলে এই রোগের হাত হইতে বঞ্চারে বহু গরম লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারিবে—এই রোগের প্রতিষেধক পরীক্ষিত ঔষধ এখনও বাহির হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই, তবে এ রোগের হাত হইতে জুতা পরিলে সহজেই রক্ষা পাওয়া যাইবে। মাটির উপর যে সকল রোগের বীমাণ থাকে—তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার ইচ্ছা অসংখ্য। অবিকল্প পরীণামে বহু লোকদের বাহাদের 'সাক্ষিকালে বাহির' হইতে হয়, জীব-জন্তুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইচ্ছা ব্যবহার করা খুব ভাল, কারণ চটাই সর্পাসি, গায়ে পা পড়িলে তাহারা ভয়েই ছোঁল ছোঁল থাকে, তাহাদের আশ্রয়কার জন্য ঐকর করে। বাগ্‌সিরি জল গরীবদিগকে জুতা ব্যবহারের কথা বলিতেছি না—জীবন-রক্ষা ও রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই এত কথা বলিলাম।

বিগত ১১ই মাস ভারতীয় ব্যবসায়পরিষদের উদ্বোধনকালে মাননীয় বড়লটি বাহাদুর যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার এক স্থলে বলিয়াছেন—  
“একশ্রেণীর লোক ও সংবাদপত্র ভারতের আর্থিক অবস্থা-সম্বন্ধে এমন সব বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। তাঁহারা বলিতেছেন যে, স্বর্ণ-রপ্তানী ভারতের পক্ষে অসম্ভবকর।” •• “এই সময়ে, স্বর্ণ-রপ্তানী ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্ত্যায়মুখে যখন বিদ্যে দুর্দশাগ্রস্ত, তখন 'ভারতবর্ষ' তাহার অগাধ স্বর্ণ-সম্পদের আশ্রয় মাত্র ত্যাগ করিয়া বিনিময়ে সম্ভাব্য-জনক অর্থ পাইতেছে। ৪০ কোটি টাকার যে স্বর্ণ-রপ্তানী হইয়াছে, তাহা ভারতের সমগ্র স্বর্ণের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর মাত্র। গত ত্রিশ বৎসরে ভারতের সমগ্র স্বর্ণের মূল্য ১০০ কোটি টাকা। সম্ভ্রান্ত ১৯১৫, ১৯১৬ ও ১৯১৭ সালে স্বর্ণের



জাপান সভ্য জ্ঞতার রপ্তানী করিয়া এখানকার চামড়া জ্ঞতার বাজারকে কিরূপ কাবু করিয়াছে তাহা সংখ্যার দ্বারা বিবৃত হইতেছে। পূর্বে আমেরিকা হইতে এই-প্রকারের জ্ঞতা অসিদ্ধ—জাপান আমেরিকাকার বাজার হইতে হঠাৎ হইয়াছে। জাপান হইতে অনীত জ্ঞতার সংখ্যা দেখুন :—

১৯২৬-২৭	১৯২৬....	ঝোড়া।
১৯২৭-২৮	২৭৭০০০	"
১৯২৮-২৯	৩০২০০০	"
১৯২৯-৩০	৬৭৬১০০	"
১৯ ৩০	১৯২৯১০০০	"

জাপান ও কানাডা বিনামাধ্য বাজারে কর্তৃত্ব না করিলেও ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ীরা জ্ঞতার বাজারে লাতনান হইতেন কম, কারণ কলিকাতার বছরে এক কোটি টাকার জ্ঞতার কারবার চলে এবং তাহার মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর শতক টাকার কাঙ্গ চীনা জ্ঞতা-ব্যবসায়ীদের হাতে, আমাদের আশ্রয় নাই গ্রসিলেই হয়।

দেশের লোকের চিত্তিক অজ্ঞতা এবং সেই অজ্ঞতা অল্পমুদ্রা কিরণে অজ্ঞাংগস্তো ঘূর্ণাইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিবার ও তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার মত বুদ্ধি কি আমাদের কাহারও নাই? ধর্মীর সংখ্যা আমাদের দেশে অল্প নয়, তাহারা যদি বিনামুদ্রা ও ব্যসনে অর্থ দ্বিষ্ট না করিয়া দেশে উপযুক্ত কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রমের মধ্যমা বাড়াই ও শ্রমিকদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করেন তাহা দেশের অনেক উপকার হয়।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা 'আসনাল টেনারি'র দৃষ্টান্তে আমরা সকলকে অপ্রাপ্তি হইতে বলি। অসৎ যে মহাশয় এই কৌশলী কর্ণধার ছিলেন তাহার পরিচয়ন করে তাহা ও মানা কার্যে ব্যাপ্ত থাকায় এই টেনারি কার্যে এতলাভ ভাগভাবে চলে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি এই ব্যবসায়ী এদেশে ভালভাবে চলে না। এখন চামড়া পরিষ্কার করিবার

বৈজ্ঞানিক উপায় এদেশের অনেক শিক্ষিত যুবক পাশ্চাত্য দেশ হইতে শিক্ষা আনিয়াছে। তাহা শিক্ষকে গৃহীত ধর্মীরা যদি যৌথ কারবার করিয়া এ ব্যবসা চালান তাহা হইলে যে বেশ একটা লাভজনক ব্যবসার দাঁড়াইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অসৎ একটা বা দুইটা ব্যবসায়ী কেনে হইয়াছে, অসৎ এবং ব্যবসা আর চলিবে না এক্সপ মনোভাবে পোষক কোনমতেই করা যায় না। আমরা এই মনোভাবের পোষক-কারীদিগকে কবি দীনবন্ধুর কথা শ্রবণ করাইয়া দিতে চাই—

“যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে।”

ইউডেটম্ ওয়েল-কোয়ার কমিটি—

ছাত্রদের মঙ্গলের জন্ত 'ইউডেটম্ ওয়েল-কোয়ার কমিটি' নামে যে সমিতি আছে তাহার কার্যবিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে, কৃতবিদ্য ছাত্রদিগের দ্বারা ২১, ২১০ জন ছাত্র পরীক্ষিত হইয়াছে। ঐ সকল ছাত্ররা বাড়ীতে গড়পড়তা ৩৬৭ ঘণ্টা করিয়া প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকে। বিদ্যালয় গড়পড়তা ঘণ্টা করিয়া পড়ে ও ১'৫৪ ঘণ্টা করিয়া খেলে। শতকরা ২১'৩০ জন ছাত্র টিফিন খাইয়া থাকে। শতকরা ১৭ জন উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পান করে।

এই রিপোর্টের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া কলিকাতার একখানি বিশিষ্ট দৈনিক পত্র লিখিয়াছে। Would these figures rouse the parents to a sense of what they owe their children? ছাত্রদের পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত বলা হইয়াছে, তাহাদের ছেলেরদের প্রতি কর্তব্য তাহারা কি বর্ণাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিপালন করিতেছেন? আমরা বড়-লোকদের ছেলেরদের কথা ছাড়িয়া মিত্রা গরীব ও মধ্যবিত্ত ছাত্রদের অভিভাবকদের পক্ষ হইতে বলিতে পারি যে অভিভাবকদের গুরুত্বাধিকারকে বিজ্ঞানসম্মত আধারদিয়া যোগািব্যার সামর্থ্য আছে। এক্ষেত্রে তাহারা কি করিতে পারেন? যে দেশে চুইবেলা করিয়া অন্ন জুটাইতে অভিভাবকদিগের প্রাণান্ত পরিলক্ষ্য হইতেছে, সে দেশে টিফিন বা দুগ্ধের কথা না তোলাই ভাল।

ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে দেশীয় এঞ্জেল

ভারতবর্ষে যতগুলি প্রথম শ্রেণীর রেলওয়ে আছে তাহাদের কোনটিতেও আর পর্য্যন্ত দেশীয় লোকেরা স্বাধী-ভাবে তা দূরের কথা স্বাধীভাবেও একেটের পদ পান নাই। রেলওয়ের চাকুরীর মধ্যে এই পদই সর্বোচ্চ পদ। গর্বমেন্ট ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার বি, আর, সিংহকে স্বাধীভাবে একেট মনোনীত করিয়া ভারত-বর্ষীয় বঙ্গবাদের ভাঙ্গন হইয়াছেন। বাস্তবিক গুণের আদর হইতে দেখিলে আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া থাকি। আশা করি এই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অজ্ঞাত রেলওয়ে ও উপযুক্ত দেশীয় কর্মচারীদিগকে এই পদে নিযুক্ত করিয়া উদারতার পরিচয় দিবেন। ভারতবর্ষীয় পক্ষে বড় চাকুরীর যে একটা নূতন পথ পরিলক্ষ্য হইল ইহা বাস্তবিকই আনন্দের কথা এবং এই পদে দেশীয় লোককে স্বাধীভাবে দেখিলে আমরা অসিক্তের স্থধী হইব।

অধ্যাপক পার্সিভ্যাল সাহেবের তৈল-চিত্র উন্মোচন

বিগত ২৫ মে লাহোরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক এইচ, এল, পার্সিভ্যাল সাহেবের তৈল-চিত্র উন্মোচন করিয়াছিলেন মাননীয় বিচারপতি ত্তর চাকরুজ বোম্ব মহাশয়। ১৮৮০ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া তিনি যেমাধ্যম গৃহীয়া বিলাতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার পাণ্ডিত্যের গভীরতা যেমন ছিল, তেমনিই অস্তরকরণের উদারতাও ছিল অত্যধিক। বিচারপতি মহাশয় তাহার দমতলে বসিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন, ছাত্রদের উপর তাহার যে অসীম প্রভাব ছিল, তাহার কারণ প্রথমতঃ তাহার জ্ঞানের পরিধি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত; দ্বিতীয়তঃ তাহার চরিত্র ছিল অনন্যবাহু স্বন্দর। এই দুই কারণে ছাত্রদের মনোমাজ্যে তাহার অধিগত ছিল অত্যন্ত বেশী।

মিঃ ওয়াডসওয়ার্থ, মিনি একসময়ে অধ্যাপক

পার্সিভ্যালের সহকর্মী ছিলেন, বলেন পার্সিভ্যাল সাহেবের ছিল সাহিত্যিক সহজতান। সেই জ্ঞানের উন্মিত করিয়া তিনি সাহিত্য-বিষয়ে যেমন দক্ষ হইয়াছিলেন, তেমনিই সেই জ্ঞান তাহার ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহার সহিত যোগাৎ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যকে কেবল সাহিত্য বলিয়া ধরিতেন না, তিনি সাহিত্যকে মানবজীবনের ব্যাখ্যা বলিয়াই ধরিতেন এবং তাহার উন্নত আদর্শের সাহায্যে চরিত্রগুলির জীবনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিতেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পার্সিভ্যাল সাহেব অধ্যাপক হিসাবে কতকটা হইয়াছিলেন, কারণ তিনি তাহার ছাত্রদিগকে তাহার জীবনের কাহিনী অনুকৃতভাবে উন্মোচন করিয়া দিতেন—তাহাদের চরিত্র গঠনের সহায়তা করিতেন।

যোগদর্শনের তত্ত্ব-কথা

আমাদের যোগশাস্ত্রে কি আছে তাহার বর্ণনা বিবরণ জানিবার জন্ত পাশ্চাত্য-জগৎ ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। গত বৎসরের পূর্ববৎসর রোমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দার্শনিক ডাঃ ইয়িলিডে যোগশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্ত শ্রুত কলেজের অধ্যাপক ডাঃ হুস্তেননাথ দাশগুপ্তের নিকট আগমন করেন ও দুই বৎসর শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। এবংসর আমেরিকার 'ইয়েল ইউনিভারসিটি' এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিবার জন্ত উপযুক্ত রুতি দিয়া ডাঃ কে, টি, বেহেনানকে অধ্যাপক দাশগুপ্তের নিকট পাঠায়াছেন।

ডাঃ দাশগুপ্ত পুস্তকাল্প দর্শনের কাল নির্ণয় করিয়াছেন পূর্বপৃষ্ঠায় ১৫৬। তিনি বলেন, ইহার উপর অনেক বড় বড় পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিয়া নূতন আলোচনা-পাত করিয়াছেন। এই দর্শনের পূর্বেই ইহার অল্পসংখ্য ভাবধারা ভাঙতে চলিয়া আসিতেছিল। ছয় হাজার বৎসর পূর্বে যেখানদিক বৌদ্ধীমুণ্ডিত ছিল তাহা যাজ্ঞোদারগো বননের সময় প্রাপ্ত সৃষ্টি হইতে পাষ্টই বুঝা যায়। স্বয়ং যুদ্ধের যোগশাস্ত্র-সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে চিত্তবৃত্তি নিয়োগ করিয়া তদ্ব্যবহারে বিশ্ব বিশ্বেশের উপর



মনোবোগ দান করা, কিন্তু এখানে যেভাবে আমরা জানমার্গে বা আবেক্ষিক চিন্তারাজ্যে মনোবোগ দিয়া থাকি তাহার বিপরীত দৃষ্টি হইয়া কাব্যে প্রতিবেদিত হইবে। এই দার্শনিক মূল যে মনস্তত্ত্বের ভিত্তির উপর গোষ্ঠিত ইহা ফরেক বা ভ্রমের মনস্তত্ত্বের বহু পূর্বে জগতে প্রচারিত হইয়াছে। প্রকৃত কথা বলিতে কি এই মনস্তত্ত্ব ফরেক বা ভ্রমের মনস্তত্ত্বের পরিপূর্ণকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ ফরেক বা ভ্রমের মতে আমাদের সন্নিবেশের রাজ্য অসংখ্যের রাজ্য হইতে উদ্ভূত; সন্নিবেশের বীজ অসংখ্যের রাজ্যে উৎপন্ন হয়; সন্নিবেশের রাজ্যে আসিয়া অসংখ্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়; যোগেশ্বর বলেন মানব চেষ্টা ও পরিভ্রমের দ্বারা অসংখ্যের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে উদ্ভূত করিতে পারে—অসংখ্যের রাজ্যে যে বীজ উৎপন্ন হয় তাহাকে সম্পূর্ণভাবে উত্তোলন করিয়া ফেলিতে পারে। যোগেশ্বর দ্বারা আমাদের চিত্রিত করিতে পারা যায়। যোগেশ্বর দ্বারা মন যখন একবিষয়ে সমাহিত হয় এবং চিত্তের অজ্ঞাত রূপকে নিরোধ করে তখন নূতন আত্মিক সত্য, এমন কি জড়জগতের সত্যও যোগেশ্বর নিকট উন্মোচিত হইয়া উঠে। যোগেশ্বরের মনস্তত্ত্ব তদূর বিকশিত হইয়াছে—যে সত্যই হইবার নিবৃত্তি দেওয়া আ যোগ্যিত হইতে হয়—বিস্তৃত হইতে হয় যে ইহা আধুনিক জগতের মনস্তত্ত্বের সমস্তাঙ্ক কতপূর্বে সমাধান করিয়া গিয়াছে ও নূতন আলোক দান করিয়াছে।

পরলোকে ডাক্তার প্রমদকুমার রায়

বিগত ২২শে জানুয়ারী ডাঃ প্রমদকুমার রায় তাঁহার হৃদয়বিরাগ বাহ্যিক ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্ভবতঃ যে কয়জন যুবক ভারতবর্ষ হইতে জ্ঞানলাভের জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন ডাঃ প্রমদকুমার তাহাদের অন্তর্গত। তাঁহার সঙ্গীরা ছিলেন তরু কক্ষগোবিন্দ গুপ্ত, তরু ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত, মিঃ বিহারীলাল গুপ্ত,

মিঃ আনন্দমোহন বহু ও মিঃ পি, এল, রায়। এইরা সকলেই দৈর্ঘ্যে ফিরিয়া আসিয়া দেশের সামান্যিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন— শুধু বাঙালোবশে বলি কেন সমগ্র ভারতবর্ষের ভিতর ইঁদারা যে উন্নতির অগ্রদূত ছিলেন তাহা বলিলে অসঙ্গতি হয় না। ডাঃ রায় ঢাকা-কলেজ হইতে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি সহীয়া বিলাত যান। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যখন ইনি দর্শনশাস্ত্রে ট্রাইপাস প্রাপ্ত হন তখন সুবিখ্যাত লর্ড হ্যালডেনের সহিত তুল্য যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন। আমরম এই সংবাদবিশ্বের অল্প অল্প জিজ্ঞাসা। ডাঃ প্রমদকুমার বদেপে ফিরিয়া শিক্ষা-কার্যে ব্যাপ্ত হন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডাক্তার অক সায়ান্স উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পাটনা, ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনের অধ্যাপকের কার্যে হৃদয়নভাবে করিয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে যোগ্য হয় তিনিই সর্বপ্রথম একজনমাত্র সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকভাবে অক্ষয়্যের কার্য তিনিই এদেশবাসীর ভিতর প্রথম করেন। তাঁহার পূর্বে এদেশীয় কোন ব্যক্তি এই পদ প্রাপ্ত হন নাই। তৎপরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেজিন্টারের পদ অধ্বস্ত করিয়াছিলেন। তর আন্তঃতায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার তখন ডাঃ পি, কে, রায় প্রথম কলেজ ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯১০ সালে তিনি ভারতীয় ছাত্রদিগের শিক্ষার পরিদর্শন ভার সহীয়া বিলাত-যাত্রা করেন। তাঁহার পূর্বে কোন দেশীয় লোকও এ পদ প্রাপ্ত হন নাই। তিন পুরুষ ধরিয়া বাঙালার ছাত্রদিগের শিক্ষাকার্যে তিনি ব্যাপ্ত ছিলেন। তাঁহার মত নিম্নলিখিতরূপে পুরুষ বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ধর্মবলে বলীমান ছিলেন বলিয়া তিনি ছাত্রদিগের নৈতিক চরিত্রগঠনে সহায়ক হইতে পারিয়াছিলেন। একদা আদর্শ চরিত্র ব্যক্তির মূর্তিতে বাঙালী দেশ একজন আদর্শ শিক্ষকে হইয়াছিল।

## পুস্তক-পরিচয়

মানস-সরোবর ও কৈলাস—শ্রীমদ্বিগলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক—বসুঘণ্টী সাহিত্য-মন্দির, ১৩৬ বহরমজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১০ টাকা।

বাঙ্গালী ভাষায় 'ভ্রমণ-কাহিনী'র সংখ্যা কম নয়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবত সেনের 'হিমালয়' সাহিত্যে আগুন পাইয়াছে। বাঙ্গালী 'লিঙ্গা-ভ্রমণ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'উত্তরাপথ' ভ্রমণ লিখিয়া থাকেন। পূর্বে 'বদরীনাথ', 'কদারনাথ' আমাদের বিস্ময়ের বিষয় ছিল। ক্রমে 'অমরনাথ' ও 'হর্ষ' হইয়া সরল হইয়া গেল। তখন আমাদের মন ছুটিল 'কৈলাস ও মানস-ভ্রমণ'। স্নেহে বেড়ান পথ দেখাইলেন। ১৯০৮ সালে শ্রীমদ্বিগলচন্দ্র মহাভারতী 'সাহিত্য'-পত্রে 'হিমালয়' নামে কয়েকটি প্রবন্ধে তিস্ত ও মানস-সরোবর-সংক্রমে অনেক নূতন কথা লেখেন। এমন চমৎকার বর্ণনা ও প্রাঞ্জল ভাষা প্রায় দেখা যায় না।

ভারতের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ সত্যচরণ শাস্ত্রী ও শ্রীকৃষ্ণ প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় কৈলাস ও মানস সরোবর-সংক্রমে অনেক কথা লেখেন। এ সংক্রমে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিগলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'মানস-সরোবর ও কৈলাস' এই দুর্গর তীরের যাত্রার পক্ষে অত্যন্ত যোগ্যজনীয় পুস্তক। লেখক নিভান্নান্দ্র হিন্দু, তীর্থ-যাত্রীর উপযুক্ত পথ-প্রদর্শক। লেখকের বর্ণনার কোণাণ্ড ও ফেনিল ভাষাভাষা পাই। 'রাবণ-হৃদয়ের' বর্ণনা এমনভাবে শিরিয়াছেন যে, যেন হয় যেন তুলি দিয়া ছবি আঁকিতেছেন। এদৃষ্ট গোচকে কি বিশ্বয় ও গুলকে আতঙ্কিত করিয়াছে তাহা তাঁহার লেখার সহজেই অস্বত্ব হয়। তা'—ভাড়া হস্তগত কুশার অপমৃত্যুর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে সেই কাণীনন্দন মৃত্যু-শীতল তরঙ্গে রক্তাক্ত মাহুঘের ভাব্য বদনায় দ্রবণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই ছবি হানে তাঁহার সাহিত্যিক শক্তির যথার্থ পরিচয় পাই।

গুর উদ্দেশ্য পাঠকসমক্ষে মানস-লোকে 'মানস ও

কৈলাস'ের চিত্র ফুটাইয়া তোলা—তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ কল্পকাব্য হইয়াছেন।

তিনি হারেকী শিক্তি নন, কিন্তু তাঁহার মন আশ্চর্য্য রকম আধুনিক। বইখানির শেষে পথ-পরচের এমন একটি তালিকা দিয়াছেন যে, মনে হয় বাহাদের সামর্থ্য আছে, ধর্মপ্রাণতা আছে এবং বাহাদের অগ্রসর হইয়া চলিবার স্বপ্ন ও বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক আছে, তাঁহার এই বইখানি হাতে লইয়া সহজেই এই কল্যাণকের 'মানস ও কৈলাস'কে দেখা করিয়া নয়ন-মন চরিতার্থ করিতে পারিবেন।

শ্রীমদ্বিগলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অভিশপ্তা (উপগঙ্গা)—শ্রীমদ্বিগলচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত।

মনীবাধু চিত্রশিল্পী হিসাবে পরিচিত। কথাশিল্পের দিক দিয়াও তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই খ্যাতিলাভ করিতেছেন। অভিশপ্তা গল্পটির নায়কের মুখ দিয়া তাহার বিভিন্ন জীবন-কাহিনী বলা হইয়াছে। আশাতের ভিতর দিয়া মাহুঘ কেমন করিয়া প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের প্রেরণার উদ্ভূত হইয়া দুরন্ত্য করিতেও ক্ষুধিত হয় না, এবং একদম অন্তরের মধ্যে—নাশুর চিত্তার, নানারূপ কল্লন ও জল্লনর ঘাত-প্রকোপ যেভাবে প্রত্যেক কথাই প্রত্যেক জল্পনায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই মনোহর। নানা ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া নায়কের জীবনযাত্রা বহিরা চলিয়াছে। সেই জীবন-যাত্রা-পথে কত ঘটনা ঘটিতেছে। কতজনের জীবনের সহিত তাহার পরিচয় হইতেছে, কতজনের স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসার স্বর্ণ-স্পর্শে তাহার প্রাণে নূতন আশার আলোকের দীপ্তি প্রতিফলিত হইয়াছে। হীনজাতীয়া রমণীর মাতৃস্নেহের সুকোমলস্পর্শে তাহার চিত্তে বিশ্ব-মাতৃস্নেহের পবিত্রতা বিকশিত। কি অজ্ঞান, কি পাপ, কি ভুল, কি অজ্ঞত, সর্ব-



প্রকারের তাহার বৈচিত্র্য ও মনস্তত্ত্বের অভিব্যক্তি এই গ্রন্থের মধ্যে অতি স্বন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আশাকরি, এখানি জনসমাজে সমাদৃত হইবে। ভাবার সম্বন্ধে আমাদের একটু বিবিসার আছে। উপজাতি ও ব্রাহ্মণীয় ভাষা সরল, সহজ ও বেশ স্বচ্ছ গতিতে প্রবাহিত হওয়া আবশ্যক। ননীবাধুর ভাষা বেশ সহজ ও অনাড়ম্বর হইলেও একটু ঘোরাশো—ঐ কটকটু ভবিষ্যৎ-রচনার না থাকিলেই স্থবী হইবে। বাহারা উপজাতিগণের ও গল্পগ্রন্থ, তাহাদের কাছে এখানি নিশ্চয় ভাল লাগিবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নিখের আত্মহৃতি—শ্রীমেনশচন্দ্র বর্ধন প্রণীত।  
প্রকাশক—আর্ঘ্য পাবলিশিং হাউস, ২৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।

নিখিগের কথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। এই সম্প্রদায় কিরূপে ধর্ম হইতে কর্মকে অবলম্বন করিয়া কীমুদ-সুখে বাচিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এক আশ্চর্য ব্যাপার। নিখিগের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কথা বহুবার আলোচিত হইয়াছে এবং আরও যত বেশী আলোচিত হয় ততই ভাল। এই গ্রন্থে নিখিগের ইতিহাস প্রাচীনকাল হইতে তাহারিগের অব্যপত্তন পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। আশা করা যায় এ পুস্তকখানি অনেকেরই পছন্দিতে ভাল লাগিবে।

শ্রীরমেশ বসু

শ্রীশ্রীসরস্বতী লীলামৃত—শ্রীসারদাস্বামী দাসী প্রণীত।  
প্রকাশক—বাণ্য-ভবন, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, নর্থ ব্রক, কুম নং ১৭। মূল্য ৫০ আনা।

দেবী সরস্বতী এবং মহাকবি কালিদাস-সম্পর্কিত প্রচলিত কয়েকটা কাহিনী শিক্বেষণ করিবার জন্য পুস্তক বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি ভাল না হইলেও শ্রুতদের উপযোগী। এই পুস্তকে মহাকবি-সম্বন্ধে যে কয়টা গল্প দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি বালকদিগের উপভোগ্য হইবে। মাঝে মাঝে যে ছই একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে, সেগুলির ব্যাখ্যা দিলে ভাল হইত। কাগজ, বাঁধাই ভাল। পুস্তক-

খানিতে অল্প বর্ণিত। এত অল্প বর্ণনা পুড়িয়া ছেলেরা যে শেষে বানানে সরস্বতী হইয়া যাইবে। প্রকাশক বা লেখিকার এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীহরীকুমার সেন

গ্রন্থ-প্রাপ্তি-স্বীকার

সনাতন হিন্দু—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগ্রন্থনাথ তর্কতৃণ  
স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত  
আমি ও আমার দেহ—শ্রীমদ্রথমোহন বসু  
শ্রীঐতিহ্যমঙ্গল—শ্রীমুখ্যকান্তি ঘোষ  
পান্ডিত্য বৈদিক শ্রেণীর ইতিহাস—শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী দেবী  
উদান—শ্রীজ্যোতিপাল ভিকু

অভিধর্ম্য সহস্রা—শ্রীধর্মপ্রিয় ভিকু

অষ্টমতসিকি (১ম ভাগ)—শ্রী রাধেন্দ্রনাথ ঘোষ ও

শ্রী যোগেন্দ্রনাথ তর্কতৃণ

কর্মহস্ত—শ্রীবিহুতিচরণ সরকার  
ভাইটমিন বা বাজপ্রাণ—শ্রীনীহাররজন সেন গুপ্ত  
বেদান্ত-সর্গন—শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য  
আত্মনিবেদন—শ্রীসিদ্ধমোহন বিজ্ঞানচরণ  
শ্রীহট্টারকব্যাক্য—শ্রীরঙ্গদয়াল বিশ্ববিদ্যালয়  
শ্রীগীতা-প্রবেশিকা—শ্রীবিনয়কুমার সারাদাস  
গীতার গ্রন্থধর্ম—শ্রী শ্রীশচন্দ্র দত্ত  
শ্রীরূপসনাতন—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসু  
সাধনা ও পরমানন্দ—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

সমানান—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

বৌদ্ধধর্ম ও নববিধান—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

ভ্রমণের নেশা—শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুস্তাফী

গোপুধ—শ্রীবিধুচরণ সরকার

বন্দীরা বাণা—শ্রীমুরারীমোহন ঘোষ

জামনী—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন

বৈষ্ণবস্থা—শ্রীবিজয়নাথ মণ্ডল

নমিতা—শ্রীযতীশচন্দ্র বসু

গোপনবিধু—শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

নির্মাণ্য—শ্রীদেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃত প্রণীত—শ্রীকালীকান্ত সরকার

মন্দিরের চাবি—

অশ্রুপূজা—শ্রীকলরজন মুখোপাধ্যায়

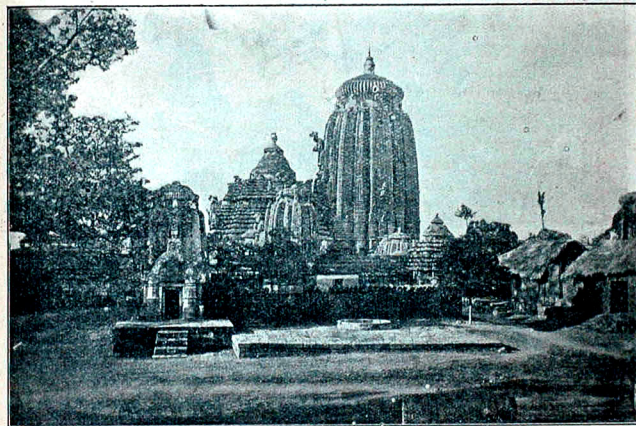
## মন্দির শিল্পে ভুবনেশ্বর

শ্রীঅজিত ঘোষ

ভুবনেশ্বর ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ শৈবক্ষেত্র। মন্দির-শিল্প-কলার ইতিহাসে ইহা যে উপাদান সাগরে করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। ইহার অগাধ্য শিবমন্দির, হিন্দু-শিল্পের অপরূপ কলা-কৌশল ও ভাস্কর্য্য দেখিলে মুগ্ধ না হইয়া থাকি যায় না। শিব ও সৌন্দর্য্য-পৌরবে জগতের ইতিহাসে ইহা এক বিরাট অবদান।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের আয়োচনার কথা উঠিলেই প্রথমেই ভারতীয় হিন্দু-স্থপতি-কলার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

এই আর্ঘ্য-স্থপতি-বিজ্ঞানের উৎপত্তি যে কোন সময় হইয়াছিল তাহা বলা বড়ই কঠিন। কাণ্ডস্ন বর্ণন—কি প্রমাণিত, কি সমাধিস্থ্য কেহই ইহার উৎপত্তির আভাস



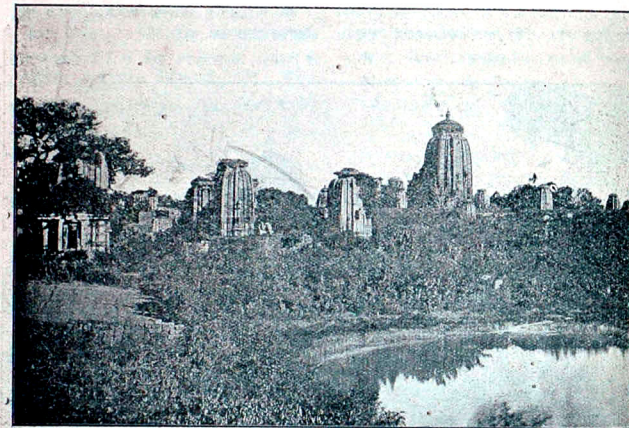
ভুবনেশ্বর মন্দির—উত্তর দিক হইতে

ভারতীয় আর্ঘ্য-স্থপতি-শিল্প আর্ঘ্য 'হিন্দু-আর্ঘ্য' মন্দিরে পারেন না। কোন 'স্থপ' সমস্তকোণ হটক কিংবা শিল্পকলার মহিমাময় ভাষা পড়িয়াছে এই মন্দিরে। আর্ঘ্য-কলার এই নিদর্শন—এই বিরাট, ক্রান্তি আর্ঘ্য-সভ্যতার যে পরিচয় দেয়, তাহাতে আমরা ইহার পৌরাণিক যৌগিকতা উপলব্ধি করি।

মন্দির-শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার অবয়ব চতুর্ভুজ



কাক্ষ্যার্থ্যগতি এবং উহার মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি সজ্জাপিত থাকে। অনেকস্থানে ঐ সমস্ত মন্দিরের সমুদ্রে একটা করিয়া মণ্ডপও দেখা যায়। ঐ মণ্ডপটা সমতলক্ষেত্র এবং উহার ছাদ অনেকটা পিরামিড ধরনের। এই মন্দিরের চতুর্দেখা-সম্মুখিত শুল্ক এবং তাহার উপর একটা সরলোন্নত দণ্ড বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে এই নিদর্শনগুলি সম্যক্রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।



ভুবনেশ্বর মন্দির—উপর পূর্ণাঙ্গিক

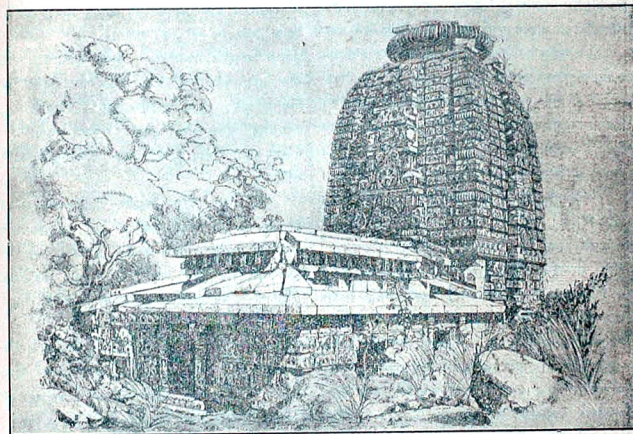
ভুবনেশ্বর-গ্রন্থ সমস্ত হিন্দু-স্থাপত্যের যে পরিচয় আমরা পাই, অনেকের মতে তাহা বৌদ্ধ স্থাপত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকের মতে আবার 'বৌদ্ধধর্মের গুপ্তের আমাদেশ দেশে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি সাধারণ 'মাহুদেরই' অস্বরূপে গঠিত হইত, পরে বৌদ্ধধর্মে উরাত 'নানা' অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রসিক্ত হইতে থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা; কারণ হিন্দু-সভ্যতা বৌদ্ধ-সভ্যতার বহু-পূর্বে। যদিও বৌদ্ধ প্রথম শতাব্দীতে হিন্দু দেবদেবী-মূর্তি-নির্মাণে

মধ্যে প্রধান মন্দিরগুলির নাম—মুকেশ্বর, কেশবরেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, গৌরী, উত্তরেশ্বর, রাছারাগী, পরশুরামেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, নাগকেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, মেঘেশ্বর, অনন্ত বাহুদেব গোপালিনী, শাকিনী, লিঙ্গরাজ, যমেশ্বর, শাকিনীদেউল, সোমেশ্বর, কোটীতীর্থেশ্বর, হাটকেশ্বর, কপালমোচনী, রামেশ্বর, গোসহস্রেশ্বর, শিশিরেশ্বর, কপিলেশ্বর, বরুণেশ্বর, চক্রেস্বর, অশ্বাশ্বকেশ্বর প্রভৃতি; ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন মন্দিরগুলি বৌদ্ধ প্রায় পঞ্চ-ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত

হইয়াছিল। ইহাদের শিবরঙলি গুব উচ্চ এবং হ্রস্বর 'আমলক' দ্বারা পরিশোভিত। দ্বার-মণ্ডপগুলি হ্রস্বর কাক্ষ্যার্থ্যগতি এবং সরলোন্নত স্তম্ভের উপর সজ্জিত। এই মন্দিরগুলির আরও কিছু পরবর্তীকালের মন্দিরগুলির মূল আরও অনেক উচ্চ—দ্বারমণ্ডপের ছাদগুলি পূর্ণাঙ্গিকা উচ্চতর। এইরূপ পদ্ধতির সর্বাঙ্গপেক্ষা হ্রস্বর ও শ্রেষ্ঠ মন্দির লিঙ্গরাজ মন্দির। পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সহিত উহার অনেকটা সৌাদৃশ্য দেখা যায়।

ভুবনেশ্বর ফেজের মধ্যে সর্বাঙ্গপেক্ষা বৃহৎ। ভুবনেশ্বরে তীর্থযাত্রীদের প্রথম তীর্থ বিন্দুনাগরের প্রায় ৬০০ হাত দক্ষিণে এই মন্দির অবস্থিত। পরশুরামেশ্বর মন্দিরটাও বিন্দুনাগরের সন্নিকটবর্তী।

লিঙ্গরাজ মন্দিরটা এরূপ বিরাট ও অপূর্ণ যে ইহার তুলনা ভারতে মেলা অসম্ভব,—অসম্ভবই বা বলি কেন, ইহা অস্বীকার। বিশেষতঃ প্রত্নতাত্ত্বিক ও মনীষিমণ্ডলীর মতে পুরীর জগন্নাথের মন্দির মন্দিরশিল্পে জগতের বিশেষ



পরশুরামেশ্বর মন্দির

যারও পরশুরামেশ্বর মন্দিরটা লিঙ্গরাজ মন্দির অপেক্ষা অনেক ছোট এবং শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্য-সৌন্দর্য্যে হীনতর, কিন্তু ইহাতেও যে সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্য দৃষ্টি উঠিয়াছে, তাহা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। মন্দিরটা অপূর্ণ কাক্ষ্যার্থ্যগতি হইয়া এক বহুমুখা সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। পরশুরামেশ্বর মন্দিরের বড় একটা ঐতিহাসিক কিত্তি নাই। 'লিঙ্গরাজ' অর্থাৎ 'লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর' মন্দিরটা

স্থান লাভ করিয়াছে। পুণ্ডরীক লোক' উহাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ মন্দির বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু এই লিঙ্গরাজ মন্দির, জগন্নাথ-মন্দিরকেও হার মানাইয়াছে। হ্রস্বর নরনামোহন স্থাপত্যকলা ও শিল্পসম্প্রদায়ে এই মন্দির এক অপূর্ণ-শ্রীধারণ করিয়াছে। ইহা ভারতীয় আর্থাগৌরবের এক বিরাট কিত্তি। কথাকথের স্বর্গদেউল অর্থাৎ স্বর্গমন্দির—ইংরেজীতে যাহাকে 'ল্যাক প্যাগোডা' বলে তাহার—



সৌন্দর্যকে ও গিল্লরাজ অতিক্রম করিয়াছে। ইহার যে শিখর—  
উজ্জাত আরাধিতের মহিমার মহিমাযিত, তাহার দ্বার  
উক্ত শূন্য ভারতের আর কোন মন্দিরের দেখা যায় না।

এই স্তূপস্থ মন্দিরস্থিতি দেখিবে ৫১০ ফুট ও প্রস্থ ৪৩৫  
ফুট। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি। প্রাচীরের  
চারিদিকে স্তূপ প্রবেশদ্বার সম্মুখে; তন্মধ্যে পূর্বদ্বার  
সর্বাঙ্গেক্ষে ২৫৫—উহাই সিংহদ্বার। এই ভোগেশের উভয়  
পার্শ্বে দুইটি স্তূপস্থ সিংহমূর্তি সংস্থাপিত। এই প্রাচীরের  
উত্তর-পূর্ব কোণে ভোগেশ—একটি ছোট প্রস্তরনির্মিত  
দ্বার আছে। তদা যার, গিল্লরাজ ভূবনেশ্বর যখন রথযাত্রা  
করিয়া গিয়াছিল, তখন গৃহমধ্যে পার্শ্বকীর্ণি অসীত হয়।

এই মন্দির-কুটির পশ্চিমদিকে ভগবতী-মন্দির অবস্থিত।  
মায়াবাপজীর মতে আমরা জানিতে পারি যে রাজা গিল্ল-  
কেশরী এই মন্দির নির্মাণ করেন—ইনি কেশরী বাণধাত।  
গিল্লরাজের মহামন্দিরের সম্মুখভাগে ভোগেশমণ্ড, তাহার  
পশ্চাতে নামিকিল্ল, তৎপশ্চাতে মোহন এবং মোহনের  
পশ্চাতে মূর্যমন্দির বা দেউল—ইহার মধ্যে গর্ভগৃহ অবস্থিত।

ভোগেশমণ্ড গিল্লরাজ ভূবনেশ্বর মন্দিরের একটি বিশেষ  
দ্রব্য তিনি। স্তূপী পতিতবর্ণ বৈদ্যপাঠ ও ভক্তবৃত্ত উপদেশ  
কৃতিবেন বলিয়া এই ভোগেশমণ্ড প্রথম নির্মিত হয়।  
রাজা রাজেন্দ্রবাহুর মতে এই ভোগেশমণ্ড ৭২২ হইতে  
৮১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কেশরী-বাণধী কন্যাকেশরী নির্মাণ  
করেন। আবার অনেকের মতে গঙ্গাবাদীর মুপতি বীর  
নারায়ণদেব তাহার রাজ্যের ২৪শ অর্ধে ভোগেশমণ্ড নির্মাণ  
করাইয়াছিলেন। ইনি কন্যাকেশরী স্তূপমন্দির প্রস্তুত  
করিয়া বন্দী হ'ন। পূর্বে আমরা যে নাট্যমন্দিরের উল্লেখ  
করিয়াছি, উহাও এই নারায়ণদেবের কীর্তি। ১১৩৬শকে  
(১২৪২ খৃষ্টাব্দ) ইহা নির্মিত হয়। রাজা রাজেন্দ্রবাহুর  
মতের মতে শালিনী কেশরীর মহিলা ইহা নির্মাণ করিয়া  
যান (১০৯৯—১১০৪)। গজরাজ, তৎকালীয় নাম উৎকীর্ণ  
শিলাশিপিতে দেখিয়া মনে হয়, উনিই শালিনী-কেশরীর  
মহিলা। ইনি এই মন্দিরের স্বত্বাধীকর্তা করিয়াছিলেন মাত্র।

দেবতাপ্রার্থ্যে নৃত্যাপ্যাতাচারি জ্ঞ এই নাট্যমন্দির  
নির্মিত হয়। নাট্যমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে মোহন ও  
মোহনের পশ্চিম পার্শ্বে গিল্লরাজের দেউল। উভয়ের গঠন

কৌশল একাত্মের ও একই রীত্যাচারী। এবং ইহাদের নির্মাণ  
কাৰ্য্যও একই সময়ের বলিয়া মনে হয়। মোহনের প্রস্তর  
নির্মাণ কৌশল, ভাস্কর্য্যকাৰ্য্য ও শিল্পসৌন্দর্য্য দেখিলে বিস্মিত  
ন হইয়া থাকার যায় না। মন্দিরটী এতই স্থলবৎ, দেখিলেই  
কোন দেবশিল্পীর তপস্বী-প্রভাবে উহা নির্মিত হইয়াছে  
বলিয়া মনে হয়। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি হইতে স্তূপস্থ  
মূর্তি যে কিরূপ অপরূপ কৌশলে নির্মিত হইয়াছে—উহাতে  
মানব জীবনের কি হৃদয়-চির অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা  
দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকার যায় না। এগুলি বেন জীবন্ত।

মোহনের ছাদ ভোগেশমণ্ডের ছাদের দ্বারা চুড়াকার।  
ইহার দৈর্ঘ্য ৬২ ফুট ও প্রস্থ ৪২ ফুট। দেউলার  
ভূম্যংশ মোহনের সমপরিমাণ। ইহার সুখশালীন নির্মিত  
নানা প্যাবণ-মূর্তি দেখা যায়। এখানকার বৈশিষ্ট্য অষ্ট  
দিকপাল মূর্তি। ইহার পূর্বদিকে ব্রহ্ম, দক্ষিণপূর্বে অগ্নি,  
দক্ষিণে যম, দক্ষিণপশ্চিমে নৈঋত, পশ্চিমে বরুণ, উত্তর-  
পশ্চিমে মরুত, উত্তরে কুবের, উত্তর-পূর্বে ঈশ-মূর্তি বিরাট  
করিয়াছে।

দেউলার গৃহ বিতল—নিম্নতলে অনাদিলিপ ভূবনেশ্বর  
বিরাটমান। এই অনাদিলিপ দর্শন করিবার জন্ত সঙ্গ  
সহস্র যাত্রী এখানে আগমন করেন। এই লিঙ্গই গিল্লরাজ—  
অর্থাৎ সর্গপ্রধান লিঙ্গ। এই লিঙ্গ মূর্তির আর একটা নাম  
কৃত্তিবাস—মন্দির প্রতিষ্ঠাতা কৃত্তিবাসের নামেই ইহার নাম।

যথাক্রমে কেশরী যখন বনমণ্ডলকে বিভাজিত করিয়া বৌধ-  
মন্দির অবসানে হিন্দুধর্ম্ম স্থপতিত করিলেন, তখন তিনি গিল্ল-  
রাজের দেউল মোহনের নির্মাণকাৰ্য্য আরম্ভ করেন  
(৪৭৪-৪২৩ খৃষ্টাব্দ)। তাহার বাৎসর লগাতরকেশরী  
বা কন্যাকেশরীর রাজত্ব কালে ৪৮৮ শকে (৬৬৮ খৃষ্টাব্দ)  
ইহা শেষ হয়।—রাজা রাজেন্দ্রবাহুর ইহাই মত। মায়া-  
পজীর উপর নির্ভর করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করা  
হইয়াছে। কিন্তু কোন হানে ইহার অস্বত্ব প্রমাণ দেখা  
যায় না। যে অনঙ্গমূর্তিযুক্ত পুরীর মন্দির নির্মাণ করেন—  
তিনিই ইহার নির্মাণকাৰ্য্য—প্রাঙ্গণ শিলাশিপিতে ইহাই  
উল্লিখিত হইয়াছে। এই অনঙ্গ ভোগেশের আর একটা  
নাম অদীতর জীবদেব। ইনি কৃত্তিবাস বা কৃত্তিবাসেশ্বরের  
নামে এই মন্দিরের নামকরণ করিয়াছিলেন।

## পুরীধামে জ্যৈষ্ঠ্য স্থান

শ্রীমন্দির দ্বার

১। তুলসী চরণ বা কমলপুর। পুরীধামে হইতে  
৮ মাইল উত্তরে ভার্গবী বা দত্তভাঙ্গা নদীর পরপারে;  
বঙ্গদেশে হইতে নীলাচলে উপস্থিত হইতে শ্রীচৈতন্যদেব  
সর্বপ্রথমে এই স্থান হইতে শ্রীশ্রীগঙ্গাধর দেবের শ্রীমন্দিরের  
স্বত্বা দর্শন করিয়াছিলেন। কমলপুরের কপোতেশ্বর  
মহাদেবের আদেশে।

২। আঠার নালা—হিন্দু রাজার কীর্তি। ইহা পুরী  
উত্তর সীমার মুট্যা নদীর উপর অবস্থিত।

৩। শ্রীশ্রীগঙ্গাধর দেবের শ্রীমন্দির। শ্রীমন্দিরাত্মক  
রত্ন-বন্দী লক্ষ শালগাম শিলা দ্বারা নির্মিত, রত্ন-বন্দী  
উপর শ্রীশ্রীগঙ্গাধর, শ্রীশ্রীলগাম, স্বত্বদর্শন চক্র, রত্নমণ্ডী  
শ্রীশ্রীসত্যভামা, স্বত্ববন্দী শ্রীশ্রীশ্রীদেবী, শ্রীশ্রীগঙ্গাধর  
বিরাট। নাট্যমন্দিরে গরুড় স্তম্ভ। এই স্থান হইতে  
সচল জগন্নাথ শ্রীচৈতন্যদেব অচল জগন্নাথ দর্শন করিতেন।  
ইহার পার্শ্বে শ্রীচৈতন্য দেবের শ্রীচরণ-চিহ্ন ছিল এক্ষণে তাহা  
মন্দির-প্রাঙ্গণে ছোট মন্দির মধ্যে রাখা হইয়াছে।  
মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে, বাহির অঙ্গনে বহু শ্রীবিগ্রহ। মন্দিরের  
সিঁহদ্বারের সম্মুখে অক্ষয়-স্তম্ভ আছে।

৪। রত্ন শালা—ইহা শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত  
বিরাট ব্যাপার।

অন্য গঙ্গার—এই স্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাঙ্গণ—  
অঙ্গ, দ্বার, তরকারী, মিঠামি বিক্রয় হয়। ইহারই এক  
পার্শ্বে রাস্তার ধারে অবস্থিত রান-বন্দী।

৫। শ্রীচৈতন্য দেবের শ্রীচরণ-চিহ্ন—শ্রীশ্রীবিষ্ণুদাস,  
পদ্ম নামে অভিহিত—শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে উত্তর পার্শ্বে একটি  
ছোট মন্দিরের মধ্যে অবস্থিত, পূর্বে ইহা শ্রীমন্দিরই নাট  
মন্দিরে গরুড় স্তম্ভের পার্শ্বে ছিল।

• অক্ষয়-স্তম্ভ। ইহা শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে  
বড় রাস্তার উপর অবস্থিত। ইহা পূর্বে কোণারক স্তূপ-  
মন্দিরে ছিল। প্রায় ১০ বৎসর হইল ইহাকে পুরীতে আনিয়া  
শ্রীমন্দিরের সম্মুখে স্থাপিত করা হইয়াছে।

৬। শ্রীচৈতন্য দেবের হস্তের অঙ্গুলির চিহ্ন গরুড়  
স্তম্ভের পশ্চাত্তের দরবার দক্ষিণ দিকস্থ প্রস্তর-নির্মিত ভিত্তি-  
পাথরে ৪টি অতি ক্ষুদ্র গর্ত—শ্রীচৈতন্য দেব এই ভিত্তি-পাথরে  
হস্ত রাখা করিয়া শ্রীজগন্নাথ মূর্তি দর্শন করিতেন বলিয়া  
প্রমাণ।

৮। এমার মঠ—রত্ননন্দন গ্রন্থাগার। ইহা শ্রীশ্রী-  
জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহ দরবার সম্মুখে অবস্থিত।

৯। পুরী রাজবাটা—শ্রীমন্দির হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে  
বড় দন্দার (রাস্তার) উপর।

১০। কাঁক-পিটা মঠ। পুরী রাজবাটার পশ্চাতে  
গলিম মধ্যে। পুরীধামে গোড়ীর বৈষ্ণবগণের প্রাচীন মঠ।  
মঠটা স্বাধিকভাবে পূর্ণ এবং শান্তিপ্রদ। পুরী ধামের বড়  
বাবাঝী শ্রীল রাখারাম চরণদাস বাবাঝী মহাপুত্র কর্তৃক এই  
মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১। জগন্নাথ-বল্লভ উজান—পুরীধামে রায় রামানন্দের  
বাসস্থান। বড় দন্দার উপর অবস্থিত।

১২। নরেন্দ্র সরোবর বা চন্দন পুষ্করিণী। পুরী রাজ-  
বাটার কিঞ্চিৎ উত্তরে এবং জগন্নাথ বল্লভ উজানের উত্তর  
পার্শ্বে অবস্থিত। এই সরোবরে বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রী-  
জগন্নাথ দেবের চন্দন-বাত্তা উৎসব হইয়া পাকে।

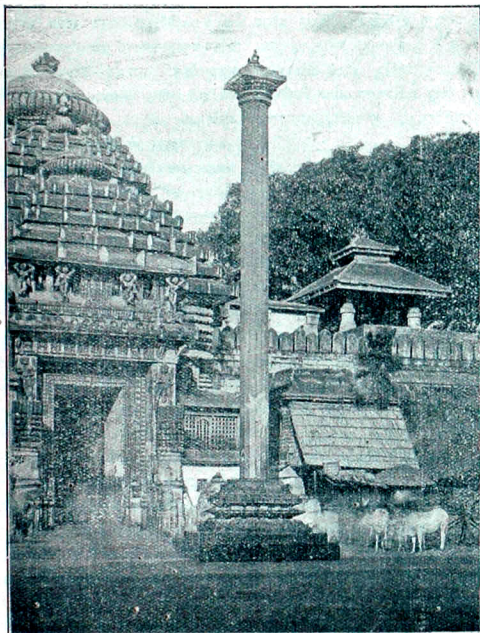
১৩। শ্রীচৈতন্য দেবের নরেন্দ্র সরোবর তীরে উপ-  
বেশন হল—শ্রীচৈতন্য দেবের রূপার এবং বৈষ্ণবগণের  
আশীর্বাদে বহু পরিশ্রমের পর গত ১৩৩৬ সালের পৌষ  
মাসে এই স্থান আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। নরেন্দ্র  
সরোবরের উত্তর তীরে শ্রীল বিজয় হুগ গোষ্ঠামী প্রভুর  
(জটায়ী বাবা) মঠের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে প্রাচীন বটরূক  
আছে তাহারই তর্পে শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণসহ উপবেশন  
করিয়া শ্রীমদগাথ পাঠ শ্রবণ করিতেন।

• এমজ্জ ক্লেহ কোন নৃতন তথ্য জানাইলে  
কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।



১৪। শুভিচা মন্দির শুভিচা গড়—শ্রীমন্দির হইতে উত্তর পাৰ্শ্বে; ইহা একটা প্রাচীন মন্দির। ইহার মধ্যে দেড় মাইল উত্তরে। রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ-স্থল। এই স্থানে শ্রীশ্রীগণাথ, শ্রীশ্রীলরাম ও শ্রীমতী

১৬। ইন্দ্রচন্দ্র সরোবর—শুভিচা গড়ের কিঞ্চিৎ উত্তরে



অরুণ-স্তম্ভ

শ্রুতভা দেবী আবাড় মাসে রথারোহণে আসিয়া আট দিন উজান-বিহার করিয়া থাকেন।

১৫। নৃসিংহদেব মন্দির। এই মন্দির শুভিচা গড়ের

সরস্বতী সরোবর। সরোবরের পশ্চিম পাড়ে একটা প্রাচীন শিব মন্দির আছে। কথিত আছে রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গগণের কুরাখাতে এই সরোবর খনিত হইয়া যায়।

১৭। মার্কভৌম ভরন বা গঙ্গামাতা মঠ—স্বর্গদ্বার পথে বালিসাইতে। এই স্থানে শ্রীল বাহুদেব মার্কভৌম শ্রীচৈতন্যদেবকে পাণ্ডারের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার গৃহে আশ্রয় করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করাইতেন। সেই প্রাচীন পুঁথি এই মঠে অক্ষাপি রহিয়াছে। এবং শ্রীচৈতন্যদেবের উপবেশন স্থগতি এখনও বিদ্যমান আছে।

১৮। বেত গঙ্গা—গঙ্গা মাতা মঠের সম্মুখে। ইহা একটা প্রখ্যাত পুণ্যস্থান। সরোবরের তীরে বেত মাধব এবং মংস্ত মাধব মূর্তি আছে।

১৯। শ্রীশ্রীদক্ষিণ কালিকা—গঙ্গামাতা মঠের কিঞ্চিৎ উত্তরে বালিসাইতে স্বর্গদ্বার রাস্তার সন্নিকটে।

অবস্থিত। ইহা ঠাকুর হরিনারায়ণের ভজন স্থলী। পাঠটা কেবল স্বর্গের উপর অবস্থিত।

২০। নানক পন্থী মঠ—স্বর্গদ্বার-পথে।

২১। নিমাই চৈতন্য মঠ—স্বর্গদ্বারের নিকটে, সমুদ্র-তটে।

২২। কবীর-পন্থী মঠ—স্বর্গদ্বার-পথে।

২৩। স্বর্গদ্বার—শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির হইতে নৈঋত কোণে এক মাইল দূরে সমুদ্রের বেলাভূমিতে। প্রবাদ রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের প্রাণনাশ রক্ষা এই স্থানেই প্রথম অবতরণ করেন।

২৪। বিহর আশ্রম—স্বর্গদ্বার-পথে, সমুদ্র-তটে।



গঙ্গীরা

২৫। শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঠ বা শ্রীল কাশিবিহার ২৬। মঠে শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ থাকেন। স্বর্গদ্বার পথে রাধাকান্ত মঠের গ্রাখাগারে বহু প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষিত আছে।

২৭। গঙ্গীরা—রাধাকান্ত মঠের মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটা অতি ক্ষুদ্র ঘর, শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার ব্যবসৃত কয়েকটা বস্তু এই স্থানে অতি বহুর সহিত অক্ষাপি রক্ষিত আছে।

২৮। সিদ্ধ বকুল—রাধাকান্ত মঠের দক্ষিণ পাৰ্শ্বে

২৯। গোবর্দ্ধন মঠ বা পদ্ম মঠ—স্বর্গদ্বার-পথে, সমুদ্র-তটে।

৩০। হরিনাম মঠ বা ঠাকুর হরিনারায়ণের সমাধি স্থান। স্বর্গদ্বার-সমুদ্র-তটে। শ্রীচৈতন্য দেব স্বীয় স্বকল্পে ঠাকুর হরিনারায়ণের নবম বর্ষ বহন করিয়া আনিয়া এইস্থানে বহুদে ভাষা সমাহিত করিয়াছিলেন। গোড়ীর বৈষ্ণব-গণের ষাটিকভাবাপন্ন শান্তিপ্রদ স্থান এবং প্রাচীন মঠ। ইহা ষাঁক পিতা মঠের অধীন। পুরীধামে ইহা গোড়ীর বৈষ্ণবগণের একটা উজ্জল কাঠি।



৩০। আল কানী মিশের সমাধি—হরিদাস মঠের পূর্বে পাথে। এইখানে অনেক প্রাচীন বৈষ্ণবগণের সমাধি আছে। সমাধিগুলির উপর কোন নাম লেখা নাই। ইহা রাখাক্ষি মঠের অধীন।



আলাল নাথ-মন্দির

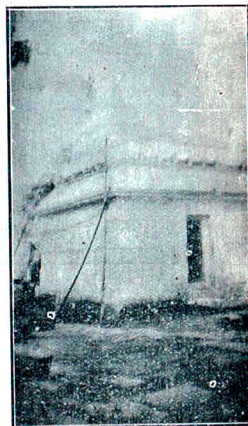
৩১। সপ্ত আসন—গৌড়ীষ বৈষ্ণবগণের অতি প্রাচীন ভজন স্থান, হরিদাস মঠের সম্মুখে (উত্তরে) গলির মধ্যে। আসন গুলির বর্ণনা যথা—রাস্তার পশ্চিম দিকে (২) পোকাগন—শ্রীল স্বল্প ঠাকুরের ভজনস্থানী (২) কামহন্দর আসন—শ্রীশীতৈতর দেবের ভজন স্থান (৩) কৃষ্ণলদেব আসন—শ্রীল ভগবান আচার্যের ভজনস্থান; রাস্তার পূর্বে দিকে—(৪) বিরিধারা আসন—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোবামীর ভজন স্থান (৫) কদমী পটকা আসন—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতের ভজন স্থান; (৬) বড় আসন—শ্রীল স্বরূপ দামোদরের ভজন স্থান; (৭) মনন মোহন আসন—শ্রীল গোবিন্দের ভজন স্থান (এই সম্বন্ধে মতভেদ দুই হয়)।

৩২। চটক পর্বত—হরিদাস মঠ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে

উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত। ইহা একটা অতি উচ্চ বালীর পাহাড়।

৩৩। টোটা-গোপীনাথ বা গোপীনাথ টোটা (উজান)—হরিদাস মঠ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে উত্তর পশ্চিম কোণে সমুদ্র-তটে অবস্থিত। কিবদন্তী আছে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের শ্রীমদ্রে শীতৈতর দেব বিলীন হইয়া যান—এসম্বন্ধে বহু মতভেদ দুই হয়।

৩৪। মমেশ্বর টোটা (উজান) শ্রীগোপীনাথ মন্দিরের পার্শ্বে উত্তর পূর্বে কোণে অবস্থিত। এইখানে শীতৈতর দেব সনাতন গোবামীর মহাশয়কে পরীক্ষা করিয়া ছিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার (সনাতন গোবামীর) কড়ুণ পূর্ব দেহ রোগমুক্ত করিয়াছিলেন।



জগন্নাথ দেবের মন্দির

৩৫। অলাবুকেখর—মমেশ্বর টোটার নিকট।

৩৬। কপাল-মোচনী। অলাবুকেখরের নিকট।

৩৭। লোকনাথ। শ্রীমন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। রাস্তা পাকা এবং পরিষ্কার, মোটির

চলে। ইহা পূর্বীর পশ্চিম দিকের শেষ সীমায় অবস্থিত। ইনি শ্রীজগন্নাথ দেবের দেহভাগ বলিয়া খ্যাত।

৩৮। পূর্বী গোবামীর কূপ—ইহা লোকনাথ বাইবার পথে পুলিশ ইন্সপেক্টর (কাড়ি) মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটা অতি প্রাচীন কূপ।

৪১। গোর্ড কমিশনার-জাগ ইন্সপেক্টর, লাইট হাউস, আদালত, ব্যাঙ্ক, মিউনিসিপ্যাল অফিস।

৪২। লাট-ডবন—সমুদ্রতটে প্রাপ্তর নির্মিত প্রাসাদ।

৪৩। চক্রতীর্থ—ইহা মন্দির হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সমুদ্র-তটে অবস্থিত। প্রবাস

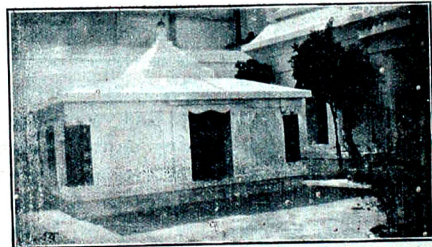


নরেন্দ্র সরোবর-তীরে শ্রীগোবিন্দের উপবেশন স্থান

৩৯। দোণ মধ্য। মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে এইখানে শ্রীজগন্নাথদেবের সোল-মাত্রা উৎসব হইয়া থাকে।

৪০। মার্কণ্ড-সরোবর—মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরে

—এই চক্রতীর্থের ধারে সর্বপ্রথম একদল ভাসিয়া আসিয়া ছিলেন। ইহার পার্শ্বে একটা জলের উৎস আছে, কল পরিষ্কার এবং মিষ্ট। এই স্থানে কয়েকটা দেবমন্দির দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে শ্রীসোনার গোরাক্ষের মন্দিরটা সমৃদ্ধিশালী।



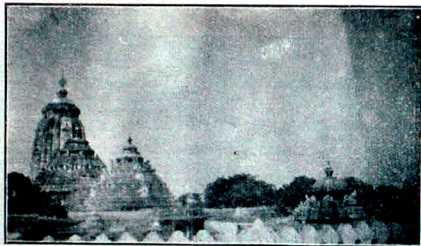
হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দির

উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। সরোবর-তীরে অনেক-গুলি শ্রীবিগ্রহ আছে।

৪৪। আগালনাথ বা অনাধনাথ—ইহা মন্দির হইতে প্রায় মাইল দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ব্রহ্মসিঁদ্র



উপর অবস্থিত। পদ্মক্ষেত্র বা গোবানে ঘাইতে হয়। অজ্ঞ কোন যানে বাইবার উপায় নাই। মোটর সাইকেলও সাইকেল আরোহিগণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না, মধ্যো মধ্যো নামিয়া হাতিয়া ঘাইতে হইবে মাত্র। সাইকেল, গোবান বা পাকী অধারোহণ ব্যতীত অন্যদিক বেলা ৯টার আগলানথো পৌছান যায়।



শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির



আগলানথের মন্দির

মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুমূর্তি বিরাজিত আছেন। শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া আসিয়া এই স্থান হইতে প্রথমে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বংস দর্শন করিয়াছিলেন। তখন শ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে যে প্রস্তর খানির উপর উপবেশন করিয়া সাষ্টাঙ্গে সঙ্কট করিয়াছিলেন, সে প্রস্তর খানি ভক্তগণ অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; পুরীর রাধাকান্ত মঠের কর্তৃপক্ষগণ একটা মনোরম মন্দির নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে পবিত্র প্রস্তরখানি যত্ন পূর্বক রক্ষা এবং পূজা করিতেছেন। ইহা রাধাকান্ত মঠের অধীন। মন্দিরের পার্শ্বে সদর রাস্তার উপর পুরীর রাধাকান্ত মঠের একটি শাখা আছে। বাজার অতি নিকটে, রাধাকান্ত মঠের পার্শ্বে। রাধাকান্ত মঠের কর্তৃপক্ষগণ যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য একটা মনোরম জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছেন। জল অতি পরিষ্কার। পুরীধামত বা অন্নয় রাধাকান্ত মঠের কর্তৃপক্ষগণকে পূর্বাঙ্কে জানাইলে যাত্রীগণে

কোনই অসুবিধা হইবে না। বাজার অতি নিকটে, বাজারে উত্তম খাদ্য, স্রবা (চাল-ভাল, ঘি-মরগা) পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে চিত্তাহার মাত্র তিন মাইল, রাত্রির গোবান চলে।

৪৫। কোণারক (কোণার্ক) বা অর্কক্ষেত্র বা হুয়া মন্দির—ইহা শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে দশ কোশ দূরে অধিকাংশে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে অবস্থিত। গোবানে বা মোটর যোগে ঘাইতে হয়। মাঘ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে এইখানে মেলা হয়।

৪৬। শ্রীসত্যবানী বা সাক্ষী গোপাল—পুরী হইতে রেল বা মোটর বা মোটর বাস যোগে যাওয়া যায়। ইহা পুরী হইতে আট মাইল দূরে উত্তরে অবস্থিত।

৪৭। ভুবনেশ্বর—পুরী হইতে রেল মোটর বা মোটর বাস যোগে যাওয়া যায়। মন্দিরে শিবলিঙ্গও আছেন এত বড় শিবলিঙ্গ আর কোথাও দেখা যায় না। ভুবনেশ্বর এক সময়ে উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। এখন বিধুশ নগরী এবং জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। প্রবাদ আছে প্রায় এক কোটি শিব-মন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে বিদ্যমান ছিল। মন্দির ও বিগ্রহাদির শিরশৈশূপা ভারতের ভাঙ্গরণ

শিল্পের উজ্জল দৃষ্টান্ত। জগন্নাথের পুর প্রাচীন-প্রদেশে একপাশ শিরশৈশূপা দৃষ্ট হয়। ভুবনেশ্বর যে কত স্মৃতিশীলী রাজধানী ছিল এই ভয় মন্দির এবং বিগ্রহাদির অপূর্ণ ভাঙ্গরণ, কার্য্য তাহা প্রমাণ করে। বিন্দু সাগর বা সরোবর নামে একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে। ইহার সন্নিকটে আরও কয়েকটা কুণ্ড আছে। কুণ্ডের জল স্বাস্থ্যগর। ভুবনেশ্বরেও রথযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে। বিন্দু সাগর বা সরোবর তীরে অনন্ত বাহুরেব মন্দির বাঙ্গালী-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহা উড়িষ্যার বাঙ্গালীর কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

৪৮। বড় গিরি ও উদর গিরি

ভুবনেশ্বর মন্দির হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। বড়গিরি ও উদরগিরি ছটা সোলাং ছোট পাহাড়। পাহাড়ের উপরে বহু প্রাচীন কালের বহু গুহা-মন্দির, আকাশ-গঙ্গা প্রভৃতি কয়েকটা কুণ্ড আছে। ইহা নিকটে না দেখিলে সন্দেশে বা লেখনী দ্বারা বোঝান অসম্ভব। এইস্থান হইতে দউলি পাহাড় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

## হরিহরছত্রের মেলা

শ্রীশ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

( ১ )

হরিহর ছত্রের মেলা গুব ভাবী মেলা। এমন মেলা ভারতের আর কোথাও হয় না। এ মেলায় দেশ-দেশান্তর থেকে কত লোক আসে, কত শত শত সাধু-সন্ন্যাসী একত্র জুটে, কত হাতী, ঘোড়া, উট, গরুর ক্রম-বিক্রয় হয় তা'র ইয়ত্তা নাই। জ্ঞান হ'লে পর্য্যন্ত এই কথাই শুনে আসিছি।

কিন্তু 'এ পর্য্যন্ত কোনও দিন এই ভারত-প্রসিদ্ধ মেলা দেখবার সুযোগ ঘটে গুঁঠে নি। ঘটবার আশাও বড় একটা ছিল না।' কারণ এতাবৎ জীবনের অধিকাংশ সময় 'আসামে'ই অতিবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশ জন্মভূমি হ'লেও, কখনও যে 'বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার জল' উপভোগ

\* হিন্দু (বাঁচি) সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।







( ৪ )

হানে এক বহু পুরাতন মন্দির আছে। তাঁর অধিভারী দেবী হচ্ছেন অম্বিকা ভবানী। সেই দেবীর নামানুসারেই হানের নাম 'অম্বি' বা 'অম্বিকানন্দ' হয়েছে। মন্দিরের সম্মুখে একটি স্থান দক্ষ রাবার 'বুজ-কুওর' স্থান বলে কাজও নিশ্চিত হয়। দক্ষরাঙা না কি এখানেই যজ্ঞ করেছিলেন! (আমরা তো জানি হরিশ্বানের কাছে কনখলে দক্ষ-যজ্ঞ স্মরণীয় হ'য়েছিল)। প্রতি বৎসর ঐশ্রব মাসে এইখানেও একটি মেলায় সমাগম হয়। তারপর দিক সন্ধ্যাবেলায় বস প্রদান করে দেহগণের সমস্ত দক্ষাদির জীবন-ব্রহ্ম ভগবান ভবের স্তব করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর স্তবিত্তে সঙ্গী হ'ল ভোলানাথ আস্ততোষ বন্যানে। শাস্ত্রমুখি পরিগ্রহ করেন, সে হানের নাম হয় 'শাস্ত'। সেই 'শাস্ত'র অপরূপ হয়েছে এখন 'শাস্তা'। একেব জন-প্রসিদ্ধি মাত্র, কিংবা বাস্তবিকই একে কোনও পৌরাণিক ভিত্তি আছে, তা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বিবেচ্য বিষয়। সত্য হ'ক বা মিথ্যা হ'ক কথাগুলো নিতান্ত অসঙ্গত বলে তো বোধ হয় না।

( ৩ )

বনগারচক ঠেঁনে এসে গাড়ীখানি পৌঁছতে না পৌঁছতেই বি. এন. ডব্লিউ লেন কোম্পানীর অয়ে পুষ্টি কর্তব্য-পূরণ একাধিক টিকেট কলেক্টর সাহেব, যাত্রীগণের নিকট টিকেটের তাগিদ শুরু করে দিলেন। শোণপুরে বড় ডিউ হয় বলে মেলার সময় এক ঠেঁনে আসে থেকেই টিকেট সংগ্রহ করা হয়। কেহ কেঁহ মন্তব্য প্রকাশ করলেন "এ বড় মেলায় তেমন পোষা জমায়েৎ হ'বে না।" কেন না তাঁদের মতে "৬নং ডাউন গাড়ী বোঝাই হ'য়ে আসছে না।" রেল কোম্পানীর অধিভানে 'বোঝাই' শব্দের অর্থ কি তা বলতে পারি নে, কিন্তু গাড়ীতে বহুদলে বসে থাকার মত স্থান তো ছিলই নী! অসিক্ত সকল কিশ দুরু করে টেঁপের ছে' পাশে বাহরুজের মত লোক সুলতে সুলতে এগিয়েছিল। সে' হ'ক শোণপুর ঠেঁনে এসে দেখা গেল পাটভাটের মত বোকের ভিড়ের অবধি নেই। সন্দের ভিনিসপথ স্থলর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে সেই পিপীলিকা প্রেয়ীৎ জনস্রোত ডানসান তুলনায় মত কখন মৃগ, কখন ও বা প্রচণ্ড

ধাক্কা খেতে খেতে রাস্তায় তো এসে পড়া গেল। রাস্তায় এসেই "বী" দাণ্ডা কখনো বিলম্ব না করে হ'খানি বোড়ার গাড়ী টিক করে ফেললেন। তাতে বোঝাই করা হ'ল, মনের যাবতীয় জিনিস, কয়েকটা শিশু ও কয়েকজন বয়েসে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে। আমরা সকলে গন্তব্য হানে পথরূপে মাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। গাড়ী দুখান আগে চলে গেল।

আমাদের বাসস্থান নির্ভারিত হ'য়েছিল, তাঁর নাম "গোলঘর"। সেই 'গোলঘরের' পূর্বদিকের খোলা ময়দানে আমাদের জন্তে এক প্রকাণ্ড তাঁবু ফেলা হ'য়েছিল। এসব বন্দোবস্ত পূর্ণ হ'তেই "বী" দাণ্ডা তাঁর মস্তকলের মারফৎ সম্পন্ন করে বেগেছিলেন। "গোল ঘর" উপস্থিত হ'য়ে দেখা গেল স্থানটি একদিকে শোণপুর রেলওয়ে ঠেঁনে ও অঙ্গরিকে মেলার কেন্দ্রস্থলের প্রায় কাছাকাছি। স্থানটি বেশ চতুর্দিক-খোলা এবং রেল লাইনের পাশেই অবস্থিত। এই 'গোলঘর' হচ্ছে বি. এন. ডব্লিউ রেলওয়ের একটা ট্রাকিং ইন্সপেক্টরের আদিস ও তদারি কর্তৃত্বাধী "রা" বাবুর আবাস স্থান। সেই বয় পরিসর হানের মধ্যে "রা" বাবু তখন সপরিবারে বস করতেন। মরিচ টাইই 'সৌরভ' ও উয়ারভার তাঁর বাসায় পাশেই আমাদের 'শোণপুর-অভিভানের' শিবিকা সরিয়েন হ'য়েছিল, তবুও 'একদল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাঁর বাস-সমিষ্টনে জটলা হ'য়ে তাঁর অসুবিধার কম কারণরূপ হ'য়ে ওঠে নি। স্থানের বিদায় "রা" বাবু অত্যন্ত ভদ্রলোক এবং ব্যপারোনাতি অতিথিপূরায়। তাঁর আঙা ও সদাশয়তার আমরা সকলেই মুগ্ধ ও আপ্যায়িত হ'য়েছিলাম। আমাদের "বী" দাণ্ডাও উভায়ে ও কার্য-তৎপরতার কিছু কম ন'ন। বলা বাহুল্য আমরা অনেক বোধ হয় তাঁর ভরসাতেই শোণপুর-অভিভানে অগতির হ'য়েছিলাম।

আমরা "গোলঘরে" পৌঁছবার আগেই দলের অজ্ঞাত লোক সেখানে জমায়েত হয়েছিলেন। সকলে মিলে সমস্ত দিনের একটা মোটামুটি প্রোগ্রাম টিক করা গেল। মেলা দেখতে যাওয়ার কথায় কারও কারও মতভেদ দেখা গেল; কারণ কাহারও কাহারও ইচ্ছা আহারীয় সমাধান

করে মেলা দেখতে যান, আবার কেহ বা যতদূর সম্ভব মেলা প্রদর্শন করে এসে আহার্যে কিছুকণ বিশ্রাম করার স্থান জানালেন। আমরা কয়েকজন শেবাক মতের পোষকতা করেছিলাম। আমি, সপুত্রক "স"দাণ্ডাও জনৈক লামাইবাবুর সঙ্গে মেলা দেখতে বা'র হ'লাম। লামাই-বাবুর সঙ্গে যাওয়ার আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তিনি একদিকে যেমন বিশ্ববিজ্ঞানের একজন কৃতী পুণ্য, অঙ্গরিকে দিবা সৌরীয় ও আলোকচিত্র-বিজ্ঞায় বস্ত্র-বুৎপত্তিবিদ। আমার সঙ্গে একটা ছোট আলোক-যন্ত্র ছিল; হুতরাং তার উপস্থিতি সুযোগ ছাড়তে আমি যাতেই ইচ্ছুক ছিলাম না। মেলা প্রদর্শন করার সময় আমাদের "গাইড" হলেন "স" দাণ্ডা। তাঁর যত্ন ও সৌজন্য ছাড়া বয়স-সময়ের মধ্যে মেলার যাবতীয় দর্শনীয় বস্তুর দর্শনলাভ খটা গ্রহণ হ'য়ে উঠতো।

খটনাস্থলের সম্বন্ধীয় হ'য়ে দেখলাম—ও কি বিপুল জনসংখ্য! তবুও না কি এবার তেমন লোক জমায়েৎ হয় নি। সর্বদান এর ওপর 'ভেমন' লোক জমায়েৎ হ'লে অম্বা যে কি হ'ত তা' বলতে পারি নে। অঙ্গরকের মধ্যেই সেই বিঘম ভীড়ের মধ্যে মিশে যাওয়া গেল। গিয়ার-সম্বন্ধী কঠিন-কোমল হস্তে চালিত জাতি-নিষেধণ বলে শোহুম সমূহের কি স্বর্গাশ্রয় হয় বলতে পারি নে, কিন্তু সেই কোলাহলপূর্ণ জনসংখ্যের মধ্যে একের পর একের অবিরত নিষেধণ ও দাঙা-স্বত্ব আমাদের পক্ষে যে কখনো ভুলসিদ্ধার হ'য়েছিল তা বুদ্ধিদান পাঠকমাত্রই বন্ধন করতে পারবেন; কিন্তু আমরা কিছুতেই পিছুপাও হই নি। সেই ছপুত্রে প্রথর মৌর মাথায় করে মস্তকণ 'মাথায় মাথ পায় না পড়েছিল' অথবা ডিকি বোর্ডের দৃশ্যময় পাক্কা রাস্তায় পরনয়ন করে 'পায়ের দুগো না মাথায় উঠেছিল', তৎকণ দারুণ উৎসাহের সঙ্গে গুরে গুরে বেগেছিলাম কোণায় কি! কিন্তু কোণায় কি, তার বিস্তৃত বিবরণ পাঠকগণকে দিতে হ'লে একখানি ছোট অভিধান ব্যবসান করতে হয়। কাজেই পাঠকগণের বৈরাট্য হ'বার ভরে সে বিষয়ে উপস্থিত ক্ষান্ত হ'লাম। নীচে একটা আভাসমাত্র দেওয়া গেল।

জামাইবাবুর কর্মসূচী ছিল, লাগ লাগ নিয়ে যাওয়া। কাজেই আমরা যে দিকে রলীন মাছ প্রত্নতির লোকন বসে, সেই দিক থেকে বেড়াতে আরম্ভ করার সাংক্য করলাম। "গোলঘর" থেকে বেরিয়ে রেল লাইনের পাশ দিয়ে আমরা গন্তব্য স্থানে যাচ্ছিলাম। এক প্রায়গার এক ব্যাপার দেখে কিছুকণ স্তব্ধ হ'য়ে ঠাঁড়তে হ'ল। সেরূপ দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখি নি। সে জায়গাটার নাম "বেল-হাটী" কত শত, কত সহস্র কত শতসহস্রাবধিক অনন্তর-বাইবের যে একজ সমাবেশ হ'য়েছে, তাঁর ইয়তা নেই! রেল লাইন থেকে দক্ষিণ দিকে দিচ্চক্রবালরণে পধ্যন্ত বস্তুর দৃষ্টি বার কেবল সেই এক দৃশ্য। সে স্থানকে "বেল-হাটী" না বলে "গো-সমুদ্র" বলাও চলে। কিছুকণ আমরা সেই "গো-সমুদ্রের" পাশ দিয়ে দিয়ে পাণীর আভার দিকে যেতে লাগলাম। কত রকম রং-বের-ওয়ে যে পাণী দেখা গেল, তা' বলা যায় না। দেখলে নয়ন-মন ছুড়িয়ে-যায়, যেন চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না। কত শালিক, চুইই, ময়না, শ্রামা—কত দোয়েল, বুলবুল মূর, তোতা—কত ডাঙ্ক, কপোত, কাঁকড়া—সমস্ত পাণীর নামও জানি নে; আহা! কিবা তাদের নামের ভদ্রীমা—কিবা মধুর কলরব হয় তো আমারই কৃষ্ণায় ভুল। বৃষ্টি সেটা তাদের আনন্দ কোলাহল নয়—কল্প, ব্যথিত প্রাণের কণক রোদন! বৃষ্টি বা তাদের সে নর্দন নয়—হৃৎকণক হওয়ার বাবুল চকল প্রয়াস! কে জানে কি! সেখানে থেকে যাওয়া হ'লে যে দিকে গাছ-গাছাড়ার পালা। বেগলাম—কত হৃৎকণ স্পন্দিত পরাধা, কত হৃদয় হৃদয় ক্রোড়, ক্রিসেন-ধাম—কত কদমুস ডালিগা, পানীয়, পাশি—কত গোলাপ, বৌী, চামেলি, টাণা—কত জাতী, হুই, হাসনা-হানা—কত অশোক, জ্বা, নিউলি, গাদা ফুলের গাছ—নাম বেশ লেখ—করা যায় না। কত ভাল ভাল আম, জাম, পেয়ারা, সিঁচু গায়েল কলম—আরও কত কি মনোহর গাছ পালা—কত গুণ-বনস্পতির একজ সমবায়—চোখে' না দেখলে অজ্ঞান করা যায় না। সে স্থানটিকে একটা মনোময় স্তম্ভ-বাগীশ, অথবা একটা ছোটখাটো 'বোতালিক গার্ডেন



বলেও অতীত হয় না। সেই সব গাছ-গাছড়া ও কলম ইত্যাদি-কলম বিক্রয়ও মন্দ হয় না।

এই সব দেখতে দেখতে বোকা কমেই বেড়ে উঠতে লাগলো। আমরা তবু সেই তপস্বীর দর্শন-অর্থীকর মাথার নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পড়াতাম হ'লাম না। বাস্তব ভাষায় শরির সারি কত বা দোকান। কোথাও সেতার-প্রসঙ্গ-বীণার শাশি কোথাও কীচের—কোথাও চান্নে মাটির—কোথাও পিতল, কাঁসা বা এম্বুমিনিমের স্তম্ভ বাসনের ব্যাং কোথাও নর-নরেন্দ্র কাপ্টেরে গালাগালি সত্যিকি কিংবা কথনের ধূপ—কোথাও মনোহারীর দোকানে মনোমোহক কত বিহীন সামগ্রীর অপূর্ণ শোভা—কোথাও অলঙ্কার-প্রিয় বিহার-মহিয়ার নিত্য বাজনার সহজ-সহজ নানা রঙ্গের কাচের বা ধারার চুড়ি এবং ত্রাত্যাহিক বরণীর লগাট-শোভন “চিকুরি” বিচিত্র বিভাস—কোথাও কাপড় জামা, শাল-দোকানার বিরাট প্রদর্শনী—কোথাও বা থিয়েটার-দর্শনের নানা ভীমময় বিভ্রাণের প্রতি নিরীহ “দেহাঙ্গী” লোকের বিষয়-বিস্তৃত কলক—কিন্তু তথাকথিত “হিন্দু-হোটেলের” চলকটিসিঁটেলোগুণ অথচ হিন্দুনী রক্ষার মত্বর হিন্দু তনয়ের সম্রাতিত বা সত্তর চান্নী, কোথাও ময়রা দোকানে বিবিধ মিঠাই তৈয়ারী করে বসে হাওয়াই—বিভাগ্য, ক্রিয়াক্ষমতা, অগাধ—তার চার ধারে মাছি ভন ভন—বিস্তারিত ভবে রেখেছে জালিয়ে খুঁটের আঙুন তাতে ধূনে দিয়ে—কোথাও বা তাম্রাকের পাতা—পানের বাহার, সিগারেট, বিড়ি, সরদা, সিগার—ইত্যাদি—ইত্যাদি কত কি স্বতাই যেন। অসুস্থকিৎহ মর্শ্বকব্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তারপর আমরা গেলাম হর-হরীর আড্ডার দিকে। দেখলাম ‘লাল কাণো মালা আমনিম জরম’ নানা প্রকারের কত অসংখ্য তুণ্য-তুণ্যদিক—কে ধন ঘন হেবারে রত—কেহ বা অধীর চকলতার অপেক্ষা করছে কা’র যেন তুণ্য-সংকেত—কেহ বা পানের ভূমি দিয়ে মাটি খুঁড়তে উজ্জত—কেহ হাড়িয়ে আসছে নিত্য অর্থ অর্থের মত। \* \* \* বড় বড় আমগাছের তলার স্থানে স্থানে কঠিন নিগড়-বন্ধ কত বিশালকার বর্জিত বারন—তত্ত্বভাবে যেন কি চিন্তায় মগ্ন! হয় তো বা আপনাপন অতীত অবশ্যলোচনায় আকুল!

অতীতের সেই স্বাধীনতার দিন—যখন পূর্ণত-পুনিমে ইচ্ছামতি বিচারণের অবকাশ ছিল—যখন সরিষ-সরোবরের শীকর জলে অবগমন করে তুষা-নিবারণে চুড়ি হ’ত—যখন ‘পুন্ড্রানে পদে ধলে কোমল মুগাল ভিড়ি উদ’ক-করবার স্বযোগ ঘটত—এখন আর সে স্বপ্ন নেই—এখন ‘হীনবল নরের অধীন’ হয়ে দিন যাপন করতে হয়। \* \*

\* \* \* রাণী-গাছের আশে-পাশে দেখা গেল অনেক দিক-দূর বণিগণের সমাবেশ—‘কুজ পুঁঠ হাজ দেহ’—কদাকার রত মলপ্রিয় প্রতিমিতনেত্রের বোধ হয় সাধারণ স্বপ্ন দেখছিল। এই উত্তালকিক হাতীর আশে পাশে রাখার একটা দেবদেহী আছে ভনলাম! হাতী কোনও কারণে সহসা হঠাৎন হ’য়ে উঠে এই উত্তালকিক ছেড়ে দেওয়া হয়—তারা এমন কোশলে গজভ্রমের কুলোপান্না কাম ধরে টানতে থাকে যে কর্ণ-বেদনার কাতর কণী অবিশেষ শাহ হ’য়ে বাধ্য হয়।

যেহা যের এক শোণখুর বাতীত—এত হর-হরী-মক-হিপের একত্র অবস্থান, শুধু ভারতের কেন, পৃথিবীর অত কোথায়ও পরিলক্ষ হয় না।

এইবার সিরবার পালা শুরু হ’ল। সকলে হির করা গেল, গঙ্গা-গঙ্গার কুলে সন্ধ্যাসীর জটনা দেখে, তারপর বেবদর্শন করে বিজরা বীরের মত, তৃপ্ত-চিত্তে শিবিরে সিরবো। যে কথা সেই কাজ। নদীতীরে এসে বেগি ঘোরাঘুরে বড় বড় মগজনী কি, তুতে কত লোক গম্বীর সঙ্গে পারাপার হচ্ছে—কত যাত্রিবারী উন্নত-মাথার ছোট ছোট তরী, তীরে ভিড়িয়ে আছে—নদীর তেড়ে গুলি তা’দের-পারে আছে গড়ে চকল করে তুলতে। যেন বস্তু, তোরা সরে যা—সরে যা;—আমরা অনন্ত কাল হ’তে আকুল হ’য়ে ওই অনাধির দেবের চরণ খুঁতে ছুটে আসছি—আমাদের গুটিয়ে পড়তে দে—বাধা নিশে। চোঁর সিরবে দেখি শত শত মাধু-সন্ধ্যাসীর অসুত গোষ্ঠী। কাহারও মাথার কত কালকার রক্ত দীর্ঘ জটাসমুদ্র—কাহারও মাথার শুণু চৈতন, অঙ্গে গেরুয়া আচ্ছাদন—কেহ কাপালিক নরপুণ্ড্রীযুত—কালক শয্যায় কের বা শায়িত—কেহ কপ্পর অস্বপ্নত দেহ—কেহ—উর্দ্ধবাহ উর্দ্ধবাহ কেহ—ত্রিগুণ-ক-রে কাহারও কপালে—যোর রক্ত দাগ শোভে কারো ভাসে—

হুই আঁচে বসে হির যোগাসনে—কেহ ময় ধানে ত্রুতিন নরন—কারো দিকি-দিকি আসে চুই আঁচি—কেহ ঈদনাম বহু থাকি থাকি—কারো মুখে ভুনি শুধু ‘সীয়ারাম’—হাওয়ার বদনে ‘হেরকল’ নাম—কারো বাজে গাল-বন্দ-বন্দ—কেহ দেহ যুগে থাকিয়ার ময়—কেহ নগুধারী—কেহ বাচারী—ছিল কথা সাছে কেহ বা ভিহারী। বর্ণনার ভীত সব। কেবা প্রকৃত মাধু, কেবা ছল্লকৌ, বোকা ঘর না। কিন্তু—

যে ধরেছে মাধুধন—নেমেছে সে জলে, মাছ ধরে উঠিবেই আপন কলশে।

অরুণ-বাণী

বাতরিক পক্ষে অনেকের দ্বারা উপেকার চোখে দৃষ্ট হ’লেও, তারের সকলই হয় তো উপহাস বা অবজার পাত্ৰ না। হয় তো খুঁজলে এখন লোকও পাওয়া যায়, ধীরে ধীরে গরীমায়—সাধারণ সিদ্ধকাম হ’য়েছেন। ধীরে প্রকৃতই হ’লেও কল্যাণকরী—আন্তের অশেষ সাধনার পথ-প্রবন্ধ। কিন্তু দৃষ্ট যৌবনের রাজত্বটা লগাটে পরে সে গৃহ সন্ধান পাওয়া যায় না। একটু শোক-তাপের বা নাথেনে—দুদার একটু নরম না হ’লে—সে সন্ধানের প্রবৃত্তিও ঘন ভাগে না।

এই জায়গায় দেখলাম পূর্ণত প্রামাণ্য “পূরী-কচুরি”। নগত মাধু-সেবার জল সঞ্চিত হ’য়েছে। সে যে কি বিরাট ব্যাপার চোখে না দেখলে, ধারণায় আসে না। একবার সাধ হ’য়েছিল, সেই সামগ্রীর সত্যাবহার দেখে নরন সার্থক করবো—কিন্তু ততখানি অপেক্ষা করবার মত ঘোঁ ছিল না।

আমরা এই সব দেখে শুনে মন্দির লক্ষ্য করে অগ্রসর হ’লাম। যতই মন্দিরের নিকটবর্তী হ’তে লাগলাম, ততই উন্নত শোভা শত সহস্র কঠিন-স্বত ধ্বনি—“হর হর হরিরহরনাম।” মন্দিরের নিকটে গিয়ে সাধা হ’ল না যে দেব-দর্শন করি। বোধ হয় অমৃত লোকের ভিত্ত দেবতার দ্বারে। দেবতার চরণ খুগলে জল-অঙ্গনি সেবার জল ব্যাকুল। কিন্তু দূর হ’তে সে জল আর দেবতার পায়ের পৌছুচ্ছে না। পূর্বোক্তী জমতি মোকেন পায়ের সে ঘন লগে মিলিয়ে বাচ্ছে। তত্ব তাতেই সব স্বত্বী—তাতে

স্বত্বী। উদ্ভঙ্গ তো ব্যর্থ হচ্ছে না। অন্তর্ধ্যায়ী তৎপার অন্তরের আকুলতা তো বৃথতে পারছেন!

প্রাণায়া মন্দিরাধিষ্ঠিত, বিব্রাহের উল্লসে সত্যিক প্রাণায় জানিয়ে তীব্রত্ব করে এলাম। \* \* \*

আমার এক মিত্রবরের তত্তাবধানে আহায়াসি প্রস্তুত হ’য়ে গিয়েছিল। ভাত, বিড়ির দাল, একটা গোলাল-বণ্ড আর গুণের আহার। সে দিন তাই যেন বড় মধুর, বড় উপায়ের বোধ হ’য়েছিল; অবশ্যবিপাকে তাতেই যখন যখন তৃষ্ণি, অপার আনন্দ অতীব করেছিল। তবৎ ওদের আচারের কথা অনেক দিন ভুলতে পারিনি—এখনও যেন হ’লে গলা কূট কূট করে।

শোণখুরের কিন্তু এত প্রাণিক কেন, আর জেলার নাম হরির ছবির জেলা কেন হ’ল, এখানে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে ত্রাৎক কথা বলা বোধ হয় অপ্রাণিক হ’বে না।

শ্রীমদ্রাগবেদে এক জায়গায় লেখা আছে, (চেম স্বত্ব ২৪, ৩৪, ৪র্থ অধ্যায়) যে পুরাকালে ত্রিকুট নামে এক পূর্ণত ছিল। [এই ত্রিকুট থেকে ‘ত্রিহত হয় নি তো?’ হ’লে পূর্ণত ছিল অতিথব শ্রীমান্ চারিদিক কীরোম সাগরে খেঁজিত দশ সহস্র পূর্ণত উজ্জিত—চারিদিকে তত সহস্র ক্রোশ বিতীর্ণ। সেই ক্রোশের লৌহী গুণ ও স্বর্ষম ত্রিভীম শব্দ ছিল। সেই জতই পূর্ণতের নাম হ’য়েছিল ত্রিকুট। সেই ত্রিকুট শিবর সর্গনা কত রক্ষম রক্ষ-লতা শুভ ও নিবর-জলপ্রপাতে শোভিত হ’য়ে থাকতো। কখন সকল ক্রীড়া-কারী সিদ্ধচারণ, গর্জর, বিভাধর ও অঙ্গরকিয়েরে পরিপূর্ণ ছিল। আর ছিল সেই পূর্ণতপ্রদনে ভূরি ভূরি মন্দির নির্মল সরিষ ও সরোবর। সেই সকল সন্ধ্যা সন্ধ্যা সরোবর-পুণিন সর্গনা মনিমর বাণুকায় স্বত্ব স্বত্ব করতো। সরোবরে কত স্বর্ণপর্ণ চুটে থাকতো, কত অসংখ্য কুমুদ-কলার, উৎপল ও শত-পত্রের শোভার সূর্যজল উদীপ্ত হয়ে উঠতো। কত মত ভ্রমরের প্রাণময় গুজনে, কত হাল, কারণ্ড, চক্রবাক ও সাগরের কলরবে, সরোবর হৃদয়িত ছিল। তা ছাড়া, আরও কত কি যে শোভনীর জিনিষ ছিল, তা বর্ণনা করা যায় না। একদিন ত্রিকুট পূর্ণতের এক গভীর অরণ্য থেকে নিদ্রা ভাঙ্গে সন্ধ্যা ও তৃষ্ণাত্ত এক গজের, যুগপরিষত হ’য়ে ঐ রক্ষম এক বিপুল সরোবরের তীরে এসে উপস্থিত হ’ল।



তার সঙ্গে ছিল অনেক মনমত্ত হস্তিনী আর বহুতর মল্লভাষী কর্তা। তাদের সকলের খোর দাপটে ত্রিকূটগিরি মনে কেঁপে উঠিল। যাই হক, সেই যুগ্মপতি গজেন্দ্র, সরোবর সমাপ্ত এষে, তাতে অবস্থান করে তো প্রথমে নিজে, ক্রান্ত দুই কর্তৃতে তার পর কাঞ্চন, গঙ্গা ও উৎপলসুখমিশ্রিত স্নগন্ধ নির্মল অমৃত জল পান করেযথেষ্ট তৃপ্ত হ'ল। নিজে এই রকম তৃপ্ত হ'লে, ত' দিয়ে সরোবরের শীতল জল তুলে, স্নগদ গৃহী পুরুষের মত, আপনার স্ত্রী করেণ্ড ও সন্তান কাচ-গুলিকে দান ও পান করাতো আরম্ভ করলে। এখন সেই গজেন্দ্র ছিল অতিশয় দুর্ভাগ্য সে এই রকমে ক্রীড়ামত্ত হ'লে সরোবর জল একবারে 'তোলপাড়' করে তুললে একবারও ভাবলে না সে তার ওজন ব্যবহারে কারও কষ্ট হ'তে পারে। এ দিকে ঘটনাক্রমে, সেই সরোবরে ছিল একটা বলবান গ্রাহ (কুতীর)। সে গজেন্দ্রের দৌরাঘোষ বিরক্ত হ'লে দৈব প্রেরিতের মত এসে, যেন কি এক বিজাতীয় ক্রোধে ঐ গজেন্দ্রের এক বান। পা মকম করে কামড়ে ধরে, গভীর জলের মধ্যে হুড়হুড়িয়ে নেনে নিয়ে যা'বার উপক্রম করলে। হাতীরও শরীরে বল কম ছিল না। সে নিজের বল-বিক্রম প্রকাশ করত যথাসাধ্য চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। হাতীও নড়তে চায় না, নজেরও জেল তা'কে টানবেই। সুতরাং রীতিমত এক তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। সে যুদ্ধে যোগ দিলে এক দিকে জলের খত সুখীর আর অন্য দিকে বনের বত হাতী; এই রকমে ছাঙ্গর বৎসর অতীত হ'লে গেল হাতী কিংবা নজের কারও নিদন সাধন হ'ল না। কেবল ব্যাপার দেখে বড় আশ্চর্য বোধ করলেন। ক্রমে গজেন্দ্রের উদ্যাহ শক্তি ও শারীরিক বল কমে আসতে লাগল। হাতী ক্রমে অবসর হ'য়ে পড়ল। তারপর যখন তা'র প্রাণ প্রায় সন্ধ্যাপর হ'ল, তখন আর উদ্যাহস্তর না দেখে যিনি ঐকান্তি দেবপনের আশ্রয়, সেই শুদ্ধ পরমেশ্বরের একান্ত শরণাপন্ন হ'য়ে, তাঁকে কাতরভাবে ডাবলে—

“হে গোবিন্দ রাখ শরণ আপ বিপদভারে—”

ভক্তের কান্ডে প্রার্থনার অধিলের আত্ম ভগবান হরি, সেই আর্ন্ত গজেন্দ্রকে রক্ষা করবার জন্তে, গরুড়ের ওপর

আরোহণ করে মহাবনেগে সেই সরোবর-তীরে এসে উপনীত হ'লেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এলেন স্বর্ণের বত দেববৌ। তাঁদের আগতে দেখে গজেন্দ্র নিজের 'উড়' দিয়ে সরোবর থেকে একটা গুল তুলে, সব দেবতার উদ্দেশে বুলে—‘হে নারায়ণ! হে অধিলের গুরু! হে ভগবান! আমি সকলকে নমস্কার করি—আমাকে আজ এ আগম সঙ্কট থেকে রক্ষা করুন।’ ভগবান হরি তা'কে অত্যন্ত শীড়িত দেখে দয়ার হ'য়ে, হাতী ও নজ উভয়কেই সরোবর থেকে উদ্ধার করলেন, আর চক্র দিয়ে প্রাচীরে মুখ বিদারণ করে, গজকে মুক্ত করে দিলেন। ভগবানের এই কাহ দেখে সব দেবতারা কৃত্তম বর্ষণ করলেন, স্বর্ণে অমনি দ্রুতটি বেগে উল্ল—গজেন্দ্রেরা নাচ-গান আরম্ভ করলে আর ঋষি, চারু আর সিদ্ধগণ সেই পুরুষোত্তমের তত্ত্ব করত লাগলেন।

এখন কথা হচ্ছে, এই গজ-প্রাচীর উভয়ের কেহই বাস্তবিক গজ ও গ্রাহ ছিলেন না। গ্রাহ ছিলেন তাঁর পূর্বজন্মে একজন গরুড়-সত্তম, তাঁর নাম ছিল হু-হু। তিনি একদিন অনেকগুলি গরুড়-রমণী সঙ্গে নিয়ে এই সরোবরে দান করত এগিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে সে দিন দেবল মূনি নামে একজন ঋষিও সেখানে দান করত এসেছিলেন। হু-হু সেই সকল রমণীর সঙ্গে কেলি কোরুকে মত্ত হ'য়ে জলের মধ্যে দেবল মূনির পা ধরে টেনে ছিলেন। দেবল মূনির তা'তে বড় রাগ হ'ল। তিনি সেই রাগের বলবর্তী হ'য়ে হু-হুকে খাপ দেন যে তিনি গ্রাহ হ'য়ে সেই সরোবরে বাস করতেন। মূনি ঋষির অভিপায় করণও বিঘা হয় না। সেই দিন থেকে হু-হু গ্রাহরূপে সেই সরণী জলে অবস্থান করতিলেন। ভগবানের চক্রাচরণে গভীর হ'বামাত্রই, তিনি সন্ধ্যাপর থেকে বিমুক্ত হ'য়ে, আশ্চর্য গজের ঘের ধারণ করে ভগবানকে প্রণাম করে, আবার দিব্যধামে চলে গেলেন। এ দিকে, সেই গজ ছিলেন তাঁর পূর্ণে ছায়ে পাণ্ডুরেদর এক রাজা। তিনি ইন্দ্রজিত নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইন্দ্রজিত বড় ধর্মপরায়ণ ছিলেন। একদিন তিনি সৌভাগ্যী জটায়ু তাপস হ'য়ে মনোভায়ে গিয়ে ভাবন-পূজার নিমিষটিত হ'লেন। সেই সময় মহাতেজা অগ্ন্য মূনি তাঁর শিশুর সঙ্গে ইন্দ্রজিতের আশ্রমে এসে উপস্থিত হ'লেন। রাজা তখন ভগবতাবিধানীয় ময় ছিলেন।

যগত্য়ানির সেখানে আসার কথা কিছুই টের পেলেন না। সে কালে ঋষিরা আগার বড় শীতলীর রেণে উঠতেন। যগত্য় ডেবজিলেন, রাজা উঠে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। কাজেই রাজাকে তা' না করত দেখে তাঁর গু' রাগ হ'ল। তিনি রেগে বলেন, “এ নিচুর অঙ্গাণু, তা' না হ'লে এ রাজকপের এমন অপমান করে। হাতী যেমন শুদ্ধ বুদ্ধি, তাই, এও সেই রকম শুদ্ধ হ'য়ে আছে। ঋষি অভিপায় দিচ্ছি, এ পরজন্মে গজ হ'য়ে জন্ম গ্রহণ করবে।” আশেই বলেছি মূনি ঋষির অভিপায় বর্ণনও ঘা' হয় না। সুতরাং ইন্দ্রজিত পরজন্মে এই হস্তী হ'য়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও শ্রীহরি স্পর্শে বন্ধন মুক্ত হ'য়ে ভগবান সাক্ষ্যতা প্রাপ্ত হ'লেন।

কিংবদন্তী, প্রাগৈতিহাসিক সময়ের এই গজপ্রাচীর যুদ্ধের শেষ ঘটনাবলি হ'চ্ছে এই শোণপুর। এখানে ভগবান হরি, মহাদেব হরের সমুদে গজ-প্রাচীরে মুক্ত করেছিলেন বলে শোণপুর, হরিনাথের নিগন ক্ষেত্র বলে এমিচ্ছি দাবী করেছে। তারপর কথিত আছে যে তাক্কা বর করে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে ফিরবার সময় শ্রীরামচন্দ্র যখন শোণ নদী পার হ'য়ে এই পথ দিয়ে সীতাকে লাভ করত জনকপুরে যান, তখন তিনি এখানে একটা মন্দির নির্মাণ করে শ্রীহরি হরনাথ মহাদেবের নামে তা' উৎসর্গ করেন। সেই হ'তে মেগার নাম হ'য়েছে “হরিহর ছাত্রের মেগা।” কিন্তু হার কিংবদন্তী। কোথার সেই ত্রিকূট পর্বত আর কোথার সেই সরোবর! শোণপুরে এখন তা'র অম্মাভাও আভাস পাওয়া যায় না।

## মোহ

( উপভাস )

[ পূর্বাহ্ন্যতি ]

শ্রীমতী নীলাম দেবী

জেরি

এদিকে দেবরত যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাজা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সে বাড়ী ঢুকিতেই আর সেই সঙ্গে একির রিক্স বাড়ী ঢুকিল। এমি দেবরতকে দেখিয়া বিজ্ঞপের ঘরে বলিল, “ধব তো ছেলেকে দেখা হচ্ছে! জোরের মত কোথায় আমোদ করত যাওয়া হ'য়েছিল?” দেবরত একটু উত্তেজিতভাবে বলিল, “তোমার কাছে আমার কোন কৈফিয়ত দেবার দরকার নেই, তোমার মত আমারও বোধ হয় আমোদ করবার অধিকার আছে। আমি যাই করি না কেন তোমার তা'তে কি আসে যায়?” কথাটা বলিয়া দেবরত নিঃশব্দে চলিয়া গেল। ছেলেটির সেই রাগে অর হইয়া সমস্ত রাতি বড় ছটফট করিল ও

মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠিতেছিল। দেবরত তাহাকে সারারাত্রি বুকে লইয়া কাটাইল। এমি পাশের ঘর ইহঁতে সব শুনিতে পাইতেছিল—সেও বিনিস ছিল। সে ছেলের জন্তই নাচ হইতে সে রাতে সঞ্চাল সকাল কিরিয়াছিল। কিছু পরে সে একবার উঠিয়া গিয়া দেবরতকে বলিল, “হুমি সারারাত বসে আছে, এখন আমি না হয় একটু দেখি, তুমি শোও।”

“তোমাকে কষ্ট করত হ'বে না, আমার ছেলে আমি দেখছি।”

এমিরও রাগ হইল, সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, শুধু বলিয়া গেল, “আমার কর্তব্য তো আমি করনুম, না যদি চাও তো আমি কষ্ট করি কেন?”







হচ্ছে না। যদি এক সপ্তে থাকতেই হয় তো অন্তত শান্তি চাই।”

এমি এই কথা শুনিয়া একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, “তুমি কি মনে কর যে আমি তোমাদের এর দেশের মেয়েদের মত দাসী যদি যে তোমারা প্রতারণা কথা শুনে আর তোমার আর এক স্ত্রী আছে জেনেও তোমার সঙ্গে থাকব? তোমাদের মত নীচ জঘন্য নোকেদের সঙ্গে আমার যেশবার বা থাকবার আসে। ইচ্ছে নেই—এই অশ্রুমানসের পর আর এদেশে থাকবারও সম্ভাবনা নেই। আমি এ বিয়েটাকে বিয়ে বলেই ধরি না, দেশে ফিরে গিয়ে আবার নিম্নবর্গে ফিরে যাব, জীবনের এই পাপস্রাবী যতদূর সম্ভব ভুলতে চেষ্টা করব। তোমার ছেলেকেও আমি চাই না। ছেলের ভার নিতে আমি পারব না। তুমি তোমার ছেলে নিয়ে থাক আর আমার প্রতি যে অজ্ঞার করণে তার ভ্রত উপভুক্ত প্রতি বিধান কর।”

“শেখ, তুমি বা চাও তাই হবে কিন্তু তোমার মত পাষাণী আমি কখনও দেখি নি, নিজের সন্তানকে পত্তন্যও ত্যাগ করতে পারে না। তোমার ব্যবহারে আমি বিশেষ বিরক্ত হয়েছি—মর্যাদিক কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু তুমি যাতে বহুজনে থাকতে পার তার ব্যবস্থা আমি করব। যেদিন থেকে তুমি চলে যাবে সে দিন থেকে আমার ব্যবহার তোমাকে মানসিক বরদ পাঠাবে কিন্তু তোমার ব্যবস্থানির পরজা আমি বইব না।”

“আমার দাত্তে তো তারি ক্ষতি, রংও আমি নিশ্চয় থাকব। আমার সব গোখরিয়া করতে কিছু নগ্নে লাগবে, মাঠ বা এগ্রিল নাগাবা আমি বেশে চলে যাব। শীতটা শুধু এখানে কাটতে বেতে চাই।”

“আমি তো তোমাকে বেতে বসি নি বা এখনই যাও বলি না, তোমার বত বিনে ইচ্ছা পাঠাতে পার। তুমি আমার স্ত্রী সে তুমি মানা আর নাই মান। এত ধর্মের কারণে বৃষ্টি না, তোমার উপর তো কিছুই অজ্ঞার হয় নি। বা কিছু অজ্ঞার করা হয়েছে প্রীতির উপর। আর আমি একদিনও দুঃখের রাখব না যে প্রীতি আমার ধর্মপত্নী আর তোমাকে সম্মার পেকে তাকিয়ে দেখ না। বেছারা তুমি বা করবে তাই হবে।”

“তোমার বা ইচ্ছা কর গে। আমি যদিও এদেশে

পাকব, তোমার বাড়ীতে থাকব না। এক শব্দেও থাকলেও ঘোটেই থাকব না। বলিয়া এমি চলিয়া বাইতে উত্তর হইলেন দেবরত বাধা দিয়া বলিল, “তুমি রাগের মাগার যে সব ছির করছে তাহা আমি ধার্য্য করছি না, তুমি ছির হয়ে ভাল করে ভেবে বা করতে চাইবে তাই হবে—আমাকে পরে বলা যে কি ছির করছে।”

“আমি ছির ভাবে ভেবে চিন্তে বসেছি আর ভাববার কিছু নেই।”

চৌত্রিশ

দেবরত ও এমির ঝগড়ার পর দশদিন কাটা গিয়াছে। তাহারা এখনও একত্রেই আছে, এমি তাহার বন্ধুরের কাছে এখনও কোন কথা প্রকাশ করে নাই। সে কিন্তু ছির করিয়াছে যে শ্রীতের শেবে স্বদেশে ফিরিবে এবং যতদিন এ দেশে থাকিবে ততদিন সে পূর্ণবিজ্ঞার আমোদের শ্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে। তাহার রূপের পূজারী অনেক, কাজেই তাহাদের মধ্যে কাহাকে না কাহাকে গিয়া সে সর্বদাই মত্ত থাকিত। সে সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে কাটাইত। দেবরতের ও তাহার ছেলের সহিত এমির এখন কোন সম্পর্কই নাই, বাড়ীর সঙ্গে শুধু তার শোবার সম্পর্ক।

দেবরত একা একা দুই দুই বুড়িয়া বেড়ায়। সে শুধু প্রীতির নিকটে থাকিবার প্রয়োজনে শোপানে আসে, তব্ধি মৃত্তরী বাস তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। দুই হইতেও যদি প্রীতিকে দেখিতে পার তাহা হইলেও সে তৃপ্ত হয়। দেবরত পত্রখরা প্রীতিকে সকল সমাচার অবগত করাইয়াছে কিন্তু প্রীতির কাছে আর যায় নাই। সে কি বলিয়া প্রীতির কাছে যাইবে? প্রীতিকে বিধায় মত তাহার যে কিছুই নাই। কোন মুখে সে প্রীতিকে তাহার হইতে বলিবে? আরও একটা কারণ সে জীবনের অজ্ঞতম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার পক্ষে অগ্রসর হইতে পারিল না। সে তো প্রীতিকে ভালবাসে কিন্তু প্রীতি তো তাহাকে ভালবাসিতে পারে না। প্রীতি তাহার স্ত্রী সজা কিন্তু সে তো প্রীতিকে জোর করিয়া লইতে পারে না। যদি কখনও

প্রীতি বেছারা তাহার কাছে আসে তবেই তাহাদের মিলন হইবে। দেবরত কি করিবে কোথায় যাইবে কেমন করিয়া দিন কাটাইবে নিরানিশি ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিত পারিল না।

দেবরতের আর এক চিন্তার কারণ তাহার পুত্র, কেমন করিয়া তাহাকে বাহুব করিবে? দেবরতের মা কি এমির গর্ভজাত পুত্রকে মাগন-পালন করিতে সক্ষম হইবেন? এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার প্রীতির কথা মনে পড়িল। প্রীতি কি কখনও এই ছেলেকে লইতে পারিবে, না সে প্রীতির চক্ষুশূল হইবে? দেবরত তো ছেলেকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না। প্রীতিকে সমস্ত দেহ মন দিয়া ভালবাসিলেও সে তো পুত্রকে ভুলিতে পারিবে না, সেই পুত্র যে তাহার নামের মণি। হঠাৎ একটা কথা মনে করিয়া দেবরতের কেমন একটা অজানা পুত্রকে দেহ শিরিয়া উঠিল। কিছুদিন পূর্বে থোকা তাহাকে মহাআনন্দে বসিতেছিল। সে ছিল রাষ্ট্রার সহিত পথে লাক্ষ্য হইয়াছিল, সে তাহাকে খুব আদর করিয়াছিল—দেবরত নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল বলিয়া বিশেষ বিবরণ শোনে নাই।

সেদিন দেবরতের গ্রাণ কেমন ছু হইতেছিল, কেমন একটা অমল্ল আশঙ্কার মন অস্থির কিন্তু এ চাকল্যের কোনই কারণ সে নির্ধারণ করিতে পারিল না। আদ্রই তো বাড়ী হইতে চিঠি পাইয়াছে, তাঁরা তো সকলেই ভাল আছেন। হয় তো-নিজের মনের অশান্তির ভ্রত এই রকম মনে হইতেছে। মার্যাদিন কোন রকমে কাটাইয়া বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইল। প্রথম যে দিকে জনসমাগম সেইদিকে গেল, ভাবিল যে দশমণ পরিচিত ব্যক্তির সহিত গল্প হইলে গল্প-গুণব করিলে মনের তার কাটিয়া যাইবে। পরিচিত অনেকের সহিতই দেখা হইল কিন্তু দেবরত শাস্তি পাইল না, সে অজ পথে ফিরিল।

তখনই সন্ধ্যা বেধী তাহার দুয়ার আঁচলবানি পুখিবার উপর ছড়াইয়া দিতেছেন, দিনমণি অস্তগত কিন্তু পশ্চিম আকাশ মেঘের কোলে এখনও অস্বস্তিত রক্তের প্রভা প্রস্ফুটিত। ক্রমে ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলিয়া উঠিতেছে, দুই নীচে দেবরতের আলোকগুলি স্বিকম্বি করিতেছে। শুভা পঞ্চমীর গাে পাড়িয়ার গাে উকি মাটিতেছে।

সকলই মনোমগ্ন কিন্তু দেবরতের সে শোভার মন নাই, সে আনমনে পশ্চিম গগনের ভ্যোতিঃ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছেন তাহার ত্যাগা রবিও আজ নিরপোহুত, সে কি সেই বিলাস দীপ্তির খোঁজে ছুটিয়াছে? তাহার কোন আশা নাই তবু সে লক্ষ্যহীন ভাবে ছুটিয়াছে।

হঠাৎ তাহার প্রীতিকে দেবিবার আকাঙ্ক্ষা বড় প্রবল হইল। প্রীতিই তাহার শেষ আশা, বৃষ্টি তাহাকে একবার দেখিলে, তাহার সহিত দুইটা কথা কহিলে তাহার এই মত্ত তাপিত জ্বর শান্ত হইবে। অহুশোচন্যর যে সে আজ করদীন বিনিস্ত, শাখিয়ারা—কি চুলই জীবনে সে করিয়াছে! তখন তো সে স্বপ্নালসার এমির পাণিগ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু এমির সম্মারে সে তো স্থখ পাইল না। কিন্তু এখন সে সম্মার প্রকৃত স্থখ ও শান্তির সজ্ঞা লাভাইত।

দেবরত আনমনে চলিয়াছে, পথে কিছুদূরই দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, বিপর্য্যত দিক হইতে যে এক অথরাহা আসিতেছিল তাহার ধারণা নাই। অথ পামল, আলোহী তাহাকে সন্ধান করিলেন, তখন দেবরতের সজ্ঞা হইল। সে চাহিয়া দেখিল সে তাহার সম্মারে ডাকার, যিনি তাহার থোকাকে দেখিয়াছিলেন। ইহার সহিত তাহার চারি বৎসরের আলাপ।

ডাকার বলিল, “মিষ্টার বোথ, আমি আপনাকেই বুজিছিলাম, আপনি ভিন্ন অস্ত কোনও বান্দালীকে আমি চিনি না।”

উত্তর দেবরত বলিল,—“জেন ডাকার কি হয়েছে?”

“সেদিন যে ভরুণীতার সঙ্গে আলাপ” করিয়ে দিলেন তার কথা বসবার ভ্রত।”

“তার কি হয়েছে, ডাকার?—শীঘ্র বলুন।”

“মেয়েটার বড় বিপদ, এখন কেউ তাহার বন্ধুর কাজ কর্তে পারলে ভাল হয়। আজ পাঁচ দিন হ’ল তার মার অস্থব হইতেছে। সামাজ ইনসুরেন্স হুয়েছিল কিন্তু কাল থেকে বড় বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। নিউম্যানিয়া ভাইদিকেই আর স্বপ্নবিপ্লব অবস্থা মোটেই ভাল নয়—তাই আমি চিন্তিত হইয়েছি। আহা, মেয়েটা একেবারে ছেলেরাম্ব, দেখলে মনে হয় ১৮১৯ বছরের—আর একেবারে সহায়-হীন। এই সময় তাকে দেখে এখন কেউ নেই। জন্মলা



যে এখানে তাদের পরিচিত বন্দেশের লোক কেউ নেই। তার সঙ্গে তার একমাত্র আত্মীয় ঠাকুরদাদা ছিলেন, তিনিও সাত সাতদিন আগে বিদেশ কাঞ্জে দেশে গেলেন, এখানে থাকবার মধ্যে লোকজন। মেয়েটির গুব বৈধা। আমাকে বাধা হ'লে তাইকেই সব খুলে বন্ধে হ'ল, আর কেউ তো নেই। তখন তার মুখের চোরা এমন হ'লে গেল যে আমার ভয়ই হ'লে যে এখনই মুক্তি বাবে। কিন্তু সে শীঘ্রই মন বৈধে নিজেই সামলে নিলে ও ধীর শান্ত ভাবে ছই তিন খানা তার কপালে ও সব ব্যবস্থা বুঝে নিলে। সে আমাকে কিছুতেই আসতে দেবে না, কেউরা বড়ই বিচলিত হয়েছিল। আমাকে সারারাত থাকতে খেতে, আমি রাত্রে যাব বলে এসেছি। মিত্রার বোব, আপনি কি তা'কে সাহায্য করতে পারেন না।"

দেবরত "আমি এখনই যাচ্ছি" বলিয়া এমন কি ডাক্তারের নিকট বিদায় পর্যন্ত না গিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল।

খ্রীষ্টদের বাড়ী পৌছিয়া সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল সিঁড়ির নীচে এক বৃদ্ধ হুতা বসিয়া আছে। সে তাহাকে বলিল, "আমাকে ওপরে নিয়ে চল, তোমাদের দিদিমণির সঙ্গে দেখা করব।" ঢাকঢাক দেবরতের হৃদয়ের দিকে নীরাক্ষণ করিয়া কিছুদূর বসিল "আপনি জামাইবাবু না?" তাহার পর নিজের মনে বলিতে লাগিল, "উ! কে বলে ভগবান সেই! তিনি যদি না থাকেন তো এই দুর্দিনে জামাইবাবু আসবেন কেন? দেবরত দেবী সহিতে-পারিল না, সে অপেক্ষা না করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। দেবরত গুব স্বপর্ণনে গিডি উঠিতেছিল কিন্তু সেই নিমন্ত্রণ বাড়ীতে সেই পরদশ ঘরের ভিতর পৌছিল। খ্রীতি মনে করিল ডাক্তার কিরিয়া আসিয়ান্নে, সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। দেবরতকে দেখিয়া বলিল, "আপনি কেমন করে এলেন?"

দেবরত সে কথাই উত্তর না দিয়া বলিল, "খ্রীতি, অতঃপর তোমার বন্দেশীয় বলতে তো আমাকে ধর গিতি পারতে। এই বিপদে তুমি একা, আমি কাছে আছি জেনেও কি ডাকতে নেই? জানি তুমি আমাকে কমা করতে কখনও পারবে না, তবু এই বিদেশে তো লোক অপরিচিতেরও

সাহায্য নেয়—না হয় তেমনি আমার ডাকতে। ভাগ্যে এখানে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হ'ল, মংসে কিছুই জানতে পারতাম না, আমি যুরে চল যেতুম। তুমি না চাইলেও আমি আর এখান থেকে নড়ছি না—বতরিন না মা ভাল হন।"

খ্রীতি কোন কথাই কহিতে পারিল না তাহার ঠোঁট ছইটা কাপিতে লাগিল, সে ছই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। প্রান্তিকে সাধনা দিবার জন্ত দেবরত অতি দীর্ঘ তাহাকে বাহ্যশাস্ত্র আবৃত্ত করিয়া তাহার মাথাতা নিজের বুক রাখিয়া নিজের রুমাল দিয়া চোখ মুছাইয়া বলিল, "ভয় কি? মা ভাল হ'লে উঠবেন।" খ্রীতি একটু শান্ত হইলে পর তাহার কাছে দেবরত সবই তুলিল। তখন ব্রহ্মবালা অজান অবস্থায় তুল বকিতেছেন।

"লাহ কোথায়? কেন চলে গেছেন? তুমি কা'কে কা'কে ধর দিচ্ছে?"

"দারুক, দাদাকে ও আমার পুজনীয়া শাওড়ী ঠাকুরদাকে—আপনার মাকে—তার করেছি। এ সময়ে এই তিন জন ছাড়া আমার আর কে আছে? দারুকে দুর্গোৎসবেরে জন্ত বাড়ী যেতে হ'য়েছে। দাদা মেশোমহাশয়ের সহিত কাম্বীর গেছে কিন্তু এখন যে কোথায় স্তিত জানি না, এখানে শীঘ্র আসবার কথা আছে। সে তার পাবে কি না সন্দেহ, দারুও দেশে তার যেতে দেবী হবে, কাজেই বনি শীঘ্র কহে আসেন তো মাই আসবেন।"

"আমাকে ডাক নি কেন, খ্রীতি?"

"আপনি তো আমার নন।"

"তুমি এখনও কি আমাকে বিশ্বাস কর না।"

প্রাত কোন উত্তর না দিয়া দেবরতের আলিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বলিল, "মাকে দেখবেন তো চলুন, তিনি কাকেও চিনতে পারছেন না।"

"আমাকে ঘরে ঢুকতে ও সেবা করতে দিতে হ'বে।

আমি একবার মাকে দেখে বাড়ী যাচ্ছি, এখনি ফিরে আসব।"

প্রাত কিছুই বলিল না। প্রাত বড়ই তৃপ্ত হইল, একজন নির্ভরযোগ্য লোক পাইয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

দেবরত এক ঘণ্টার মধ্যে ছেলের সব ব্যবস্থা করিয়া ও নিজের আশঙ্কিত ব্রহ্মা লইয়া ফিরিয়া আসিল। এমি তখন বাড়ী ছিল না, তাহাকে একটা পত্র দিগিয়া আসিল। এখানে কিরিয়া দেবরত আস্তে আস্তে সমস্ত ভাব লইল। মস্ত সমস্ত বিষয়েই খ্রীতির মতামত লইয়া কাঁজ করিতেছিল কিন্তু দায়িত্ব নিজেই সব লইল। বিশেষ খ্রীতির যত্ন করা তাহার প্রধান কাজ হইল। শেষের দুইদিন খ্রীতিকে যে মাতার অশ্রু-পার্শ্ব হইতে সরাইতে পারেন নাই, সে অন্যভাবে আশ্রয় কাটাটাইয়াছে। দেবরত তাহার জন্ত নিজ হস্তে বাবার আনিয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তাহাকে বাগাইল। খ্রীতি না থাকিলে সেও থাকিবে না বলিল, কাজেই খ্রীতিকে বাইতে হইল।

চারদিন জীবন ও মৃত্যুর সহিত ভীষণ সংগ্রাম চলিল, তাহার পর রোগীর অবস্থা ঈষৎ ভাল মনে হইল। তখন অপরূপ পাচটা, রোগী যেন স্বহস্তাবে ঘুমাতেছেন, দেবরত ও খ্রীতি একসঙ্গে বসিয়া আছে। শেষ কয়দিন খ্রীতি যেন বাস্তব জগতের জীবন্ত মাধব ছিল না, আজ সে একটু জাগ্রত। কয়দিন সে দানাদার সবই কলের পুঙ্খের মত করিয়াছে, তাহার বাহ্যজ্ঞান মূগ্ধ হইয়াছিল—জান ছিল শুধু তার মাসের নাম। মা ছাড়া তার যে গৃহীণীতে কেহই এত আদরের নাই, তাই সে সব ভুলিয়া ঠাহরই সেবার নিরত ছিল। নাম ছিল বটে কিন্তু খ্রীতি সবই নিজ হস্তে করিত, সে এ বিষয়ে নৈশুণ্যের পরিচয় দিয়া ছ। আজ খ্রীতির মনে কত কথা উদ্ভিত হইল। আজ তাহার জ্ঞান হইল যে দেবরত এই চারদিন তাহার পাশ ছাড়ে নাই, একটুও ঘুমার নাই। দেবরত না থাকিলে প্রাতি একা কি করিত? আজ পর্যন্ত কেহই আসিতে পারেন নি। বিপদ বাড়নের যে একা আসে না—একত্রের তাহাই ঘটনায়ে। দেবরতের মা সর্বা অভাবে আসিতে পারেন নি। স্বরেনবাবু পুজা-বাড়ীতে পা পিছলাইয়া পথিয়া শয্যাশায়ী। নির্মলের তার কিরিয়া আসিয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

দেবরতের দিকে চাহিয়া খ্রীতি দেখিল যে তাহাকে শান্ত ও মিয়মাণ দেখাইতেছে। সে বলিল, "আপনি একটু বাইরে ঘুরে আসুন না, আপনাকে বড়ই শান্ত দেখাচ্ছে।"

দেবরতের দিকে চাহিয়া খ্রীতি দেখিল যে তাহাকে শান্ত ও মিয়মাণ দেখাইতেছে। সে বলিল, "আপনি একটু বাইরে ঘুরে আসুন না, আপনাকে বড়ই শান্ত দেখাচ্ছে।"

"তুমিও চল না একটু নীচে বাগানে ঘুরে আসবে। মা তো ঘুমাচ্ছেন আর নাম" তো কাছে আছে।"

"না, আমি মাকে ছেড়ে যাব না, ঘুম ভেঙ্গে যদি আমার ঝোঁকেন। আপনি বান, ক'দিনের কষ্টে আপনার মূগ্ধ শুকিয়ে গেছে। আমি তো আপনার দিকে মুহূর্তের জন্তও লক্ষ্য রাখতে পারছি না, আপনার কত কষ্টই না হয়েছে।" দেবরত বড় ব্যথিতভাবে বলিল, "ছি: খ্রীতি, এরকম কথা বলে তুমি আমাকে বেনী কষ্ট দিলে।"

খ্রীতি লজ্জিত হইয়া বলিল, "আর বলব না। কিন্তু আজ আপনাকে ঘুমাতে হ'বে।"

"ঘুমাব, কিন্তু এক সের্তে—তোমাকেও ঘুমাতে হ'বে। আজ আমরা পালা করে জাগব।"

আরও দুইদিন মিন কাটিয়া গিয়াছে, খ্রীতির মা অনেকটা স্বস্থ হইয়াছেন, বেশ জ্ঞান হইয়াছে। দেবরত এখনও সেই বাড়ীতেই আছে কিন্তু এখন আর সে রোগীর ঘরে থাকে না, পায়ে দুর্বল অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া 'বক' এ (আখাত লাগিয়া) রোগীর অস্থব বাড়িয়া যায়। খ্রীতির মুখে হাসি দেখা গিয়াছে, সে এখন সময় পাইলেই দেবরতের সহিত গল্প করে। প্রভাতই স্বরহালা খ্রীতিকে বাগানে বেড়াইতে পাঠান, সেখানে দেবরতের সঙ্গে তাহার নানান গল্প হইত; সেই দিন কাকে নির্মলের চিঠি আসিয়াছিল, সে শীঘ্রই আসিবে, আবার অপরাহ্নে তাহার বনন বেড়াইতেছে তার আসিল যে দেবরতের মাতা আসিতেছেন।

দেবরত খ্রীতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "খ্রীতি, তোমার আপনার লোক তো সকলে আসছেন, আমাকে কি এই বার তাড়িয়ে দেবে?"

"আমি ভাবাব কেন? আপনি নিজে বোধ হয় এবার পালাবেন, তাই আমার যাড়ে বোব, চাপাবার চেষ্টা করছেন।"

"তুমি বেশ জান আমি পালাইত কি রকম চাই। তুমি কি নির্মলকে ফিরে পেলে আর আমার দিকে চেয়েও দেখবে?"

খ্রীতি কি একটা উত্তর দিতে বাইতেছিল এমন সময় দেবরতের চাপরাশী আসিয়া একখানা চিঠি দেবরতের হাতে



মিল। চিত্তিরাশা পড়িতে পড়িতে দেবরতের মুখ প্রথমে নিশা পরে শাল হইয়া উঠিল। কোন কথা না বলিয়া সে চিত্তি প্রীতির হাতে মিল ও চাপরাঙ্গীকে বাইতে বলিল। চিত্তি এমি লিখিয়াছে, তাহাতে শুধু এই ক্রটি কথা নিশ্চিত আছে—

“আমি কয়েকজন বড়র সঙ্গে পুর্ণিমায় আগ্রার তাজ বেগতে বাছি; কাল রওনা হ'ব। এ দেশ ছেড়ে যাবার আগে সব ত্রুণা হান দেবে বেতে চাই, তাই এখন কিছুদিন বেশভূষা করব। তুমি যখন তোমার কর্তব্যস্থানে ফিরবে তখন সব ব্যবস্থা করতে একবার সেখানে যাব। এখন তুমি এখানে বাকী ও তোমার ছেলের ভার লও।”

“আমি কি করি বল তো?”

“এখনই বাঁজি যান, তাকে যেতে দেবেন না। মা হ'য়ে ছেলেকে ছেড়ে যেতে চায়, সে কখন মা? হয় তো রাগে, ঘাড়ে বেতে চাইছে—আপনার কর্তব্য তা'কে কেমন।”

“তুমি তা'কে জান না প্রীতি, সে যা' মনে করে তাই করে, কারও কথা শোনে না। ছেলে নিয়ে আমি কি যে করব সেই আমার বড় ভাবনা হ'বে। আমার কাছে আমাকে মধ্যে মধ্যে বাহিরে যেতে হবে, অনেক কার কাছে যের্থে যাব। আমার মা'কে যে ওকে রাখতে যখন তা'কে হ'বে না, তিনি কি তা'রাজী হ'বেন? এই বয়সে যে ওকে মায়ের স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হ'তে হ'বে এইটাই সব চেয়ে দুঃখের বিষয়।”

“মা তো কাশি আনছেন, ছেলের যা' হোক ব্যবস্থা হ'বে। আমি তার মাকে যেতে দেবেন না। সে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী তো, তাকে কি ছেড়ে দেওয়া আপনার উচিত হ'বে?”

“কাউকে কি জোর করে ধরে রাখা যায়? আর জোর করে রেখেই বা লাভ কি? সেখানে ভালবাসা নেই সেখানে একসঙ্গে বাস করা কারাবাসের মত। এমি বলছে সে কিছুতেই থাকবে না। আমি তে' সেদিনও তাকে বলছি যে বেশ ভাল করে ভেবে তবে মন স্থির করতে, সে কিন্তু দুর্বৃত্তাভেই বলেছে সে ছেলে এখানে রেখেই দেশে ফিরে যাবে। শুধু ছেলের জন্য আমি তার সকল সত্যতার মুখ বুজে সবাই ও আরও সহিতে রাজী আছি। ছেলেরা

সারাদিন কার কাছে থাকবে? শুধু লোকজনদের কাছে ফেলে রেখে আমি স্থির থাকতে পারব না। আমার মা এ বিয়েটাকে নিয়ে বসেই ধরেন না, এ ছেলেকে তিনি ঘেরে চোখে দেখতে পারেন না, কারণ তিনি বলেন ওর দ্বারা তার বাশের কেউ জ্ঞান পাবে না। মা'র বয়স হয়েছে, তিনি কখনই ওকে নিতে রাজী হ'বেন না। এই বলিয়া দেবরত বিদ্রম্বন আকাশের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাছিল। রহিম—

“ভী কীটা অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া পড়িল।

প্রীতি ধীরে ধীরে তাহার অশ্রু মুছাইয়া বলিল, “কেম এত ভাবছেন? আমার কাছে থোকাকে দিয়ে কি আপনি শান্ত হ'তে পারবেন? আমি যে ছেলে বড় ভালবাসি, আমি তাকে দেখব।”

“প্রীতি, তুমি কি বলছ? আমার বা কিছু আছে তোমাকে স'ঙ্গে নিতে পারি কিন্তু তুমি নেবে কেন প্রীতি? তুমি কি ভেবে দেখেছ কার ছেলে তুমি নিতে চাইলে? তুমি মানাব, না বোঁ?”

প্রীতি যুগ হাসিয়া বলিল, “সেঁবা মাটেই নই, সাম্যত মানবী। তাই যেহে দেবার ভালবাসার পাঠ চাই। এখন এ সব কথা কার আপনি বাঁজি গিরে একবার প্রাণপণ চেষ্টা করুন, যদি মিলে। সে যখনই ভারতের থাকবে আশা ছাড়বেন না ও থোকাকে কারো কাছে পাঠাবেন না। থোকাকে আপনার কাছে একলা দেখে হয় তো তার সম্মানের প্রতি দয়া হ'বে। আর ছেলে হ'তে হয় তো আপনারই আশার মিল হ'বে। সম্মানের বন্ধন বড় বন্ধন, এ বন্ধনের ফলে বড় স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটেছে।”

“বৃথা চেষ্টা—আর সে চেষ্টারও আমার বিবেক ইচ্ছা নেই। তুমি কিন্তু যে আশা দিয়েছ তা'তে খেয়ে নিরাশ করবে না তো? তোমাকে জোর করে কিছু বলতে পারি না, তোমার দয়ার প্রার্থী আমি। আমি এখন বাড়ি রাখে ফিরে আসব।”

দেবরত বাঁজি গিয়া দেখিল এমি নিজের সব জিনিসগণ রাখাইতেছে, ছেলেরা তাহার কাছেই দাঁড়াইয়া আছে। দেবরতকে দেখিবারাজ ছেলে বলিল, “বাবা, আমরা কোণার যাব? মা কেন সব গোছগাছ করছে? আমরা কি তোমার সঙ্গে বাঁজি যাব? মা বলে আমি তোমার সঙ্গে

যাব না অজ্ঞ দেশে যাবে। মা আমাদের সঙ্গে যাবে না কেন?”

দেবরত পুসকে, বলিল “তুমি তোমার মাকে বল না, তা হ'লে তোমার মা তোমাকে ফেলে যাবেন না।”

ছেলে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “মা, তুমি আমাদের সঙ্গে বাঁজি চল না, অন্য দেশে যাবে কেন?”

এমি প্রথমে নিরুত্তর রহিল শুধু ছেলেটাকে একটু আদর করিল। বোধহয় সম্মানের কোষা ফলে প্রাণের পাখা প্রাণও গলিল। কিন্তু তাহার সে সৌন্দর্য্য দ্রবণের জন্য, যে তখনই আবার মন শক্ত করিয়া পুত্রকে ধীরে ধীরে সরাইয়া বলিল, “এখন কাজের সময় গোলা করো না, তুমি খেলা কর না।” স্বযোগ বুঝিয়া দেবরত এমিকে থাকিবার জন্য অনেক অশ্রোধ করিল, কাজতাবে বলিল, স্বামী-স্ত্রীতে মতভেদ ও মনোমালিন্য ঘটলে কি পুনরায় মিল হয় না।

এমি চুপ করিয়া সকলই শুনিয়া, পরে বলিল, “কেন আর স্ত্রত কথা বলছ, আমি মনস্থির করেছি, আমি কিছুতেই থাকব না। ছেলেটাকে পুণিবীতে আনাই আমাদের ভুল হ'য়েছে। আমার ওর জন্য দুঃখ হয়, আমার দেশে ও তো হান পাবে না, আর তোমার দেশেও না, তোকে ওকে অশুভ কুহকের মত ঘৃণা করবে। আমি ওকে নিয়ে আমার নিজের সকল ব্যথা-বিষকে বরণ করতে চাই না।” তাহার পর এমিলী টাকার কথা তুলিল তাহাতে দেবরতের এমির প্রতি প্রণাৎ বিকৃতা জমিল।

এমিলী চলিয়া যাইবার ক্ষণ দিন পরেই দেবরতের চুটী ফুরাইল। কর্তৃস্থানে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সে তাহার মাতাকে সকল কথা বলিয়া তাহার সহিত যাইবার জন্য অনেক স্তুতি ও যাবনা করিল। তিনি বলিলেন, “যেদিন তোমার ঘরে তোমার গুলনস্বীকে প্রতিষ্ঠিত করবে, সে দিন আমি তাকে বরণ করে তুলতে যাব। আমি তো তোমাকে বলেছি যে যে বাঁজিতে তার হান নেই সেখানে আমি যাব না, আমার সে প্রতিজ্ঞা অটুট থাকবে।”

“মা, তাকে আমি কোন মাহলে আমার ঘরে আসতে বলব, আমি তো তার উপগ্রক নই। সেই বা কেন আসবে?”

স্বরবাসার সহিত দেবরতের সাক্ষাৎ হইল না, তিনি

কোন কথাই জানিলেন না। ভাস্করের মতে তাহার অবস্থা দুর্দল বলিয়া তা'হাকে এ সকল কথা বলা হইল না। কিন্তু তিনি যখন আরও হুহু হইলেন, তখন তিনি সকলই শুনিলেন। সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইল।

এ সবাদে সবাই সুখী কেবল নির্দল হতাশ হইল। প্রীতি কখনও যে তাহার হইবে না, সে তা'হা জানিত কিন্তু প্রীতি যে সকল বিষয়ে তাহার উপর নির্ভর করে, সর্বদা সে যে প্রীতির সঙ্গ-স্বথ পাইত তাহাতেই সে সুখী ছিল। এখন প্রীতি দেবরতের গৃহিণী হইবে, আর তো নির্দল তা'হাকে সম্মিলিতপে পাইবে না। আর তো প্রীতি ছোট-বড় সব কারার পরামর্শ নিতে ছুটিয়া তাহার কাছে আসিবে না।

প্রীতি নির্দলের মনোবেদনা বুঝিল, সে বত্বর সত্ত্ব তাহার নিকট থাকিত ও তা'হার মনে শান্তি দিবার চেষ্টা পাইত। একদিন প্রীতি তা'হাকে বলিল, “দাদা কেন তুমি স্ত্রিয়ামণ হ'য়ে আছ? এখনও তো কিছুই স্থির হয় নি। তিনিও কিছুই বলেন নি, এমিও ফিরে আসতে পারে। আর বাই কিছুই না কেন, আমি যেমন তোমার স্ত্রী প্রীতি তেমনিই থাকব। কিন্তু দাদা, তুমি যদি সত্যসারী হও তো সকলের পক্ষে কত সুখের হয়।”

“প্রীতি, আমার ঐ কথা, সে আর হ'বে না, ওকথা বলে নুণা আমাকে কষ্ট লাগে কেন? তুমি কেন বৃথকতায় পার না প্রীতি? আমার কখনও মন বদলাবে না, আমার প্রাণে এ-জন্মে আর কারও হান হ'বে না।”

প্রীতি নীরবে রহিল।

পরদিন

ছয়মাস কাটা গিয়াছে, এমিলী ইলওে কাছারা গিয়াছে। একমাস পূর্বে দেবরতের পরে প্রীতি জানিয়াছে যে এমি গিয়াছে কিন্তু তবধি আর কোনও খবর নাই।

তখন বৈশাখ মাস, উত্তর-দিনের পর গোঁদুলি সাপে পাগুলা করা দক্ষিণ হাওয়া জুনমানকর শান্ত করিতে আগিয়াছে। প্রীতিদের বাগান ফুলের ফালে আমোদিত, তারই মাঝে প্রীতি একধালা লাল লইয়া শাল পাখিতেছে, আজ তাহার মন কত আশা-নিরাশার খেলা খেলিতেছে,



তাহার দৃষ্টিপটে কত সুখ-স্বপ্নের কাহিনী ভাসিয়া উঠিতেছে। দশ বৎসর যাবৎ এই বিদল প্রতিবারেই শ্রীতি তাহার বহুতে গোপা মালা তাহার স্বামীর চিত্রকে পরাইয়াছে, সেই প্রতি-মূর্তির পদতলে কত ফুল অঞ্জলি-দিয়াছে। অর্জু কিন্তু পুস-চরনের সঙ্গে সঙ্গে ছুঁয়ে অনেক আশা সঞ্চিত করিয়াছিল। কিন্তু সে আশার মধ্যে কত ভয়, বৃষ্টি বা এবারও তাহার মালা জীবন্ত স্বামীর গলার দিতে পারিবে না।

মালা গাথা শেষ হইল, শ্রীতি চিত্তাকুল দ্বয়ে মালাটা তুলিয়া ধরিল, দেখিল সেটা কেমন হইয়াছে। এমন সময় তাহার এক কৃত্য আসিয়া জানাইল, “একজন বাবু তাহার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।”

“আমার সঙ্গে দেখা করবেন, না দাদুর সঙ্গে?”

“না, তিনি বলেন যে আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকারী কথা আছে।”

“আজ্ঞা তুমি তাঁকে এখানেই নিয়ে এস।”

আগন্তককে দেখিয়া প্রাতি দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার রেকাবতরা ফুল নবাগতের পায়ের উপর পড়িয়া গেল। তাহার মালা হাতেই রহিয়া গেল। অতিথিই প্রথম কথা বলিল, “শ্রীতি, দশ বৎসর আগে এমন দিনে এমনই সময় তোমার পাশে স্থান পাব বলে এই বাজীতে প্রথম পা দিয়েছিলুম। সে স্থান পেয়েও আমি তার ভবনমান

করেছি, আবার সে স্থান আমার দেবে কি? আজ্ঞা আমি তোমার কমা ও দরার ভিখারী। এ অহরোধ করবার স্পর্ধা তুমিই আমার দিয়েছ, মুক্তারীতে তুমিই আমার মনে আশা জাগিয়েছ। এখন সে আশা পূর্ণ করবে কি, প্রিয়তমে?”

শ্রীতি অধোবদন হইয়া সব শুনিল, তাহার মুখ লজ্জায় রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। সে উত্তর কিছুই দিল না, কিন্তু দেবরতের প্রাণ সে নীরব ভাষা বুঝিল। সে শ্রীতিকে প্রেমাল্পনে বদ্ধ করিতে ব্যস্ত, কিন্তু তার পূর্বে সে শ্রীতির নিজস্বের স্বাগত বাণী শুনিতে চায়, তাই বলিল, “প্রাতি একবার আমার দিকে চাও, একটা কথা বলে সাহস দাও—”

“আপনার স্থান তো আপনার জন্ত এতদিন অপেক্ষা করছে, আপনিই তো সে স্থান কোন দিন অধিকার করতে চান নি।”

“হান তো আছে কিন্তু তার সঙ্গে আমার প্রাণ যার জন্ত কৃত্রিম তাকে পাবার আশা করতে পারি কি?”

শ্রীতি দেবরতের গলায় মালাটা পরাইয়া দিয়া প্রণাম করিল। দেবরত ব্যগ্রভাবে শ্রীতিকে উঠাইয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল। শ্রীতি বলিল, “চলুন মার কাছে গিয়া তাঁর আশীর্বাদ চাই।”

—:~::~—

১০

দম

শ্রীঅপর্ণাচরণ সোম

দমো নাম বাহেস্ত্রিয় নিগ্রহঃ।...কর্ণেশ্রিয়ানি পক্ষ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি পক্ষ তেভ্যঃ নিগ্রহঃ। শ্রবণাদিবাতিরিক্ত-বিষয়ভোক্তা নিম্নলিখ্যঃ :—কর্ণেশ্রিয়-পক্ষক ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-পক্ষক বাহেস্ত্রিয় নামে অভিহিত, শ্রবণাদিবাতিরিক্ত বিষয় হইতে এই ইন্দ্রিয়-দমকের যে নিগ্রহ তাহার নাম দম।

অধ্যাত্মবিজ্ঞা ভাঙের জন সাধনার পথে প্রবেশ করিতে হইলে, অন্তরিন্দ্রিয় যেমন, তাহাকে সংযত করা যেমন প্রয়োজন, বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকেও সংযত করা তেমনি প্রয়োজন; কারণ বাহ্যেন্দ্রিয়গুলির ব্যাপার হইতেছে কার্য; স্বতরাং বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি সংযত হইলে কার্যও সংযত হইবে।

এই দম সাধন-সম্বন্ধে সঙ্গুল বলিতেছেন :—

“চিন্তাটা যাহা হওয়া উচিত, তোমার চিন্তা যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তোমাকে তোমার কার্যে কোনই কষ্ট পাইতে হইবে না।”

সং-গুরু এই প্রবচনটা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, মানুষ যাহা চিন্তা করে, তাহা সম্বন্ধেই কার্যে পরিণত হয়; যে-কাজ কার্য অপেক্ষা চিন্তার গুরুত্ব বেশী। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে তাহা বুঝে না। কিন্তু ইহা সত্য; কারণ প্রত্যেক কার্যের পূর্বে চিন্তার উদয় অবশ্যজ্ঞারী—প্রত্যেক কার্য চিন্তা-দ্বারাই পরিচালিত। চিত্তের চিত্র অঙ্কিত করে, সেই চিত্র সম্বন্ধে একটা চিন্তা অথবা তাগার মনোমধ্যে উদ্ভিত হয়; তাগর সেই চিন্তাই তাহাকে চিত্রাঙ্কন করিতে প্ররুত করে। প্রত্যেক কার্যসম্বন্ধে এই কথা। উপনিষদের জ্বনি বলিয়াছেন :—

স যথা কামো ভবতি তৎ কুরুত্বতি।

যং কুরুত্বতি তৎ কর্ম কুরুতে ॥ যুঃ আঃ ৪।১৪।৫

‘মানুষ যাহা কামনা করে, তাহা সে চিন্তা করে; যাহা সে চিন্তা করে তাহা কার্যে করে।’ বাক, গাণি, পান, পায় ও উপস্থ—এই পাঁচটা কর্ণেশ্রিয়, ইহারা মনের দ্বারা পরি-

চালিত হয়। জিয়া-শক্তি জীবনের স্বাভাবিক (স্বাভাবিকী) জ্ঞান বল জিয়া চ-বেতাখতর); ইহা প্রত্যেকের অন্ত-করণে নিহিত। যখন কোন কামনার উদয় হয়, তখন এই শক্তি কার্যোদ্ভূত হয়; ইহার ফলে মনে চিন্তার উদয় হয়, মনে তখন কর্ম-প্ররুতি জন্মে। সেই কর্ম-শক্তি তখন আজ্ঞা-নাড়ী দ্বারা কর্ণেশ্রিয়ের পরিচালিত হয়; তখন কর্ণেশ্রিয় কর্মে প্ররুত হয়। কিন্তু মনে এই শক্তি জিয়াশীল হইলেও, মন তাহাকে যদি উর্দ্ধভোক্তা বৃত্তি দ্বারা সংযত করে, তাহাকে আর আজ্ঞা-নাড়ী দ্বারা কর্ণেশ্রিয় পরিচালিত হইতে না দেয়, অথবা পরিচালিত হইলেও নিরোধ-শক্তির সাহায্যে তাহাকে সংযত করে, তবে কর্ণেশ্রিয়গণ সংযত হয়,—আর কর্ম করে না। কিন্তু সে পৃথক কথা। সাধারণতঃ মনে কর্ম-প্ররুতি জন্মিলেই, কর্ম-শক্তি আজ্ঞা-নাড়ী দ্বারা কর্ণেশ্রিয়ের পরিচালিত হয়, তখন কর্ণেশ্রিয় কর্মে প্ররুত হয়, অর্থাৎ মানুষ কার্য করে। স্বতরাং দেখা বাইতেছে যে, কার্যের আগে চিন্তার উদয় হয়, অর্থাৎ মানুষ যাহা চিন্তা করে, তাহাই কার্যে পরিণত হয়। অতএব “চিন্তা-সম্বৃত বা অপূর্ণচিত্তিত কোন কার্য হয় না—হইতে পারে না। অনেক সময় লোকে বলিয়া থাকে “এ কার্যটা করিব বলিয়া আমি আঁকো চিন্তা করি নাই, কিন্তু ইহা আমি না করিয়া পারি নাই।” আসল কথা, সে নিশ্চিতই চিন্তা করিয়াছিল, তবে সে-চিন্তা বর্ধমানের না হইয়া অতীতের, এমন কি, হয় তো ইহুজন্মের না হইয়া পূর্বজন্মের হইতে পারে।

কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের পৌনঃপুনিক ও প্রথম চিন্তা দ্বারা মনের মধ্যে সেই বিষয়ের একত চিন্তা-শক্তি সঞ্চিত হয়, এবং তারপর সেই চিন্তাটা প্রকাশের যখন সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন ইহা অনিবার্যরূপে কার্যে পরিণত হইয়া পড়ে। যদি কোন সুযোগ উপস্থি না হয়, তাহা হইলে সেই সঞ্চিত চিন্তা-শক্তি বহুকাল মনের মধ্যে স্রষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু



স্বযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কার্যে পরিণত হইবেই।  
প্রত্যেক চিত্তা একই একট প্রেরণা দিয়া ইহাকে বঞ্চিত ও  
পুষ্ট করে, অবশেষে এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন প্রেরণা-  
গুলির সঞ্চিত শক্তি বাহুবলকে তাহা কার্যে পরিণত করিবার  
ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে, যে তাহা না করিয়া পারে  
না। মাঘের যে-সকল চিত্তা প্রবল থাকে, মৃত্যু হইলেও  
সেই সকল চিত্তার শক্তি নষ্ট হয় না—“যৎকৃত্বত্বমিহ লোকে  
পূর্বকো ভাবতি, তৎকথো ভবতি” (ছাঃ ৩।১৪।১)।  
মাঘই ইহাভাবে যেরূপ চিত্তা করে, আগামী জন্মে সে সেই-  
রূপ চিত্তা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কারণ ইহাভয়ের তাহার  
চিত্তা, সংস্কাররূপে তাহার মনোময় কোষের “ভূত-স্মৃ-  
ত্ব”-মধ্যে বান থাকে। এই “ভূত-স্মৃ-ত্ব” অবিনশ্বর, মাঘের  
প্রত্যেক পথের সহগামী (১)। মাঘই পুনর্জন্ম প্রদান করিলেও  
এই “ভূত-স্মৃ-ত্ব” তাহার পূর্বজন্মের স্মারক অঙ্গের চিত্তা  
করিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করে। “জাতি-দেহ-কাল-ব্যবহিত-  
নামপ্যানন্তর্য্য্য ভূতিসংস্কারযোরেকরূপং” (যোগসূত্র ৪।১০)  
বুঝি ও স্মারক একরূপ বলিয়া জাতি, দেহ, কাল ব্যবহিত  
থাকিলেও বাসনা ও চিত্তার আনন্তর্য্য থাকে। ইহারই নাম  
স্বভাব, বাহ্য পূর্ব-জন্মের চিত্তা অঙ্গের গঠিত হয়। স্বভাব  
অঙ্গেরই সে কার্য করিতে বাধ্য হয়। সেইজন্য ভগবান  
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—“কার্যতে যাবশঃ কৰ্ম সৰ্বং প্রকৃতি-  
বৈকল্যেন” (গীতা ৩।৫)—নিজ স্বভাবস্বরূপ গুণে বঞ্চিত  
ইহা (বাহ্য) মাঘই কর্ম করে। স্বভাবই অব্যবহিত  
পূর্বজন্মে বস্তা সঞ্চিত, তাহাতে মাঘই কোন জন্মে তাহার  
স্বভাবের অর্থাৎ তাহার পূর্বজন্মের চিত্তার প্রেরণায় কোন  
একটা কার্য করিয়া দেখিতে পারে, বাহ্য তাহার ইচ্ছায়ে  
অ-পক্ষি চিহ্নিত, বাহ্য স্বভাবের উত্তেরনাম অঙ্গের। ইহা  
সে তাহার পূর্ব-জন্মের চিত্তার সংস্কারাধা বেগ অঙ্গেরই  
করিয়া থাকে; এমন কি ইহাকে সে বাহ্য নিরাক্ষর চোঁ  
করিলেও সে ইহার অঙ্গতান না করিয়া পারে না। কারণ  
তাহার পূর্বজন্মের চিত্তার সন্মারের শক্তি ইহাভয়ের প্রতি-  
রোধকারিণী শক্তি অপেক্ষা প্রবল। সেইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ  
বলিয়াছেন :—

(১) মাঘই যে-দেহবীজ “ভূত-স্মৃ-ত্ব” দ্বারা পরিষদক ইহা  
জন্মগ্রহণ করে, সে সময়ে “ব্রহ্মস্বরের” ৩১ স্বরের শাস্ত্র-  
ভাঙ্গা জটন।

স্বদৃশ চোঁতে স্বভাব : একত্রেজ্ঞানবানপি।

প্রকৃতি বাস্তবিক ভূতানি নিগ্রহঃ শিখ্য কস্মিন্যতি ॥

গীতা ৩।৩৩

স্বভাবই চিত্তার কার্য-প্রণালী বুদ্ধি আদ্যের চিত্তা-  
গুলির প্রতি অবস্থিত দৃষ্টি দ্বারা মনকার, কারণ আমরা জানি  
না, কখন আমাদের চিত্তা কার্যে পরিণত হইয়া পড়িবে।  
যে-বাকি এই মনে করিয়া কোন কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় যে,  
সে কখনও ইহাকে কার্যে পরিণত করিবে না, সে কোন্ না  
কোন সময়ে দেখিতে পাইবে যে, তাহার সেই কুচিন্তা তাহার  
প্রায় অজ্ঞাতসারে কার্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে। চিত্তা  
মহেই কার্যে পরিণত হয় বলিয়াই সকল দেহের স্বভাবাচার-  
গত স্বভাব চিত্তা বর্জন করিয়া শুভ চিত্তা পোষণ করিবার  
জ্ঞান পূর্ব : পূর্ব : উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।

“তৎপাশ্চ দ্বন্দ্বং রাগিণী, মানবজাতির

মঙ্গল করিতে হইলে, শুভ চিত্তাকে কার্যে  
পরিণত করিতে হইবে। দীর্ঘস্থলতা যেন  
একবারে না থাকে,—শুভ কার্যে যেন  
অবিশ্রান্ত উত্তম থাকে।”

যদিও চিত্তা স্বভাবই কার্যে পরিণত হয়, এবং সেই-  
মাঘের যে-কোন শুভ-চিত্তা কোন না কোন সময়ে স্বভাবই  
কার্যে পরিণত হইবেই তথাপি এ হলো সং-স্কৃত একটা বড়  
প্রয়োজনীয় দ্রবীণী বিষয় বলিতেগে যে, মানজাতির মঙ্গল-  
সাধন করিতে হইলে, শুভ-চিত্তাটা কার্যে পরিণত হওয়া  
আবশ্যক। এই বিষয়ে কিন্তু আমাদের জ্ঞান আছে;  
আমাদের মতে অনেক শুভ-চিত্তা আছে যাঁহা কার্যে পরিণত  
করি না। এই সকল চিত্তা দুর্বলতার জননিক। একজন  
সং-পুরুষ এক সময় বলিয়াছিলেন যে, যে—শুভ চিত্তা কার্যে  
পরিণত হয় না, তাহা মনে কর্তৃক রোগের মত কার্য করে।  
এই উপমাটা বেশ শক্তিশালী। ইহার ৭৭ এই যে, এইরূপ চিত্তা  
যে কেবল কোন কাজের নয়, তাহা নহে, বরং নিশ্চিতভাবে  
অনিষ্টকর। কার্যে অপরিত চিত্তা দ্বারা আমাদের মানসিক  
শক্তিকে দুর্বলীভূত করা উচিত নয়; এরূপ চিত্তা আমাদের

প্রতিদ্বন্দ্বকরূপে কার্য করে ও যখন তাহা পুনরাগি উদ্ভিত হয়,  
তখন তাহাকে কার্যে পরিণত করা শুভ-সাধ্য হইয়া পড়ে।  
মৃত্যুরা শুভ-চিত্তাশুদ্ধি কর্যে পরিণত করিতে বিলম্ব না  
উচিত নয়। অনেক ইহা দ্বারা তাঁহাদের উদ্ভিত পথ চির-  
কৃত করিয়াছেন। সেইজন্য ভীষ্মদেব যুদ্ধভিত্তিকে বলিয়া-  
ছিলেন—“দীর্ঘস্থলতঃ যুক্তিঃ শিখ্যঃ ১৩৭।”

কার্যে-অপরিত কোন শুভ-সমস্ত অঙ্গগুলির একটি শক্তি  
রূপে পরিণত হয়, কারণ তাহা মস্তিষ্কের অঙ্গদগল ওষধের  
জার মনের উপর কার্য করে। স্বভাবই আমাদের চিত্তাকে  
নিরস্তিত করিবার ক্ষমতা সঞ্চিত হইতে হইবে এবং অন্তরাঙ্গার  
নিকট হইতে যখন প্রেরণা আসিবে তখন তাহাকে কার্যে  
পরিণত করিতে হইবে,—আগামী কালের জন্ম দেখিয়া  
রাগিলে চলিবে না। অনেক সদাশয় লোক উন্নতির  
অগ্রবর্তী সোপানে কেন যে অগ্রসর হইতে পারেন না,—  
যে-সোপানে অবস্থিত আছে সেই সোপানেই  
থাকিয়া যান, তাহার একটা কারণ হইতেছে যে  
তাঁহাদের সংকল্পিত শুভ-কার্য-সাধনে দীর্ঘস্থলতা ও  
বিলম্ব। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক জন যথার্থতঃ  
সদাশয় ও ধার্মিক, কিন্তু দশ বৎসর পূর্বে তাঁহার যে প্রতি-  
বন্ধক ও পাপাসক্তি ছিল, যেরূপ শক্তি ও দুর্বলতা ছিল,  
এখনও তাঁহার হইয়াছে। স্বভাবই আধ্যাত্মিক উন্নতি;  
কামীর আধ্যাত্মিক জগতের এই সকল নিয়ম জানিয়া  
অঙ্গসমূহের কার্যাবলী শুভ-সমস্ত আধ্যাত্মিক উন্নতির  
সাধক না হইয়া অন্তরায় হয়, ইহা বুঝিবার কৌশলশক্তঃ  
অনেকে উদ্ভিত লাভ করিতে পারে না। আমরা যাঁহা  
প্রাপ্ত হই, তাহাকে যদি কার্যে প্রয়োগ করি, তাহা হইলে  
আমরা উত্তরোত্তর বেশী প্রাপ্ত হইব। কোনও অকুসল  
বাহ্য ঘটনা বা কোনও বাহ্য জ্ঞানের সংযোগ আভ্যন্তরীণ  
প্রবৃত্তি ও মননের অভাব পূরণ করিতে পারে না এবং  
আমরা ইতিপূর্বে যাঁহা জানিরাছি, তাহাকে কার্যে পরিণত  
করিবার যে অক্ষমতা, তাহারও পূরণ করিতে পারে না।  
চিত্তাকে সকল স্থলেই কার্যে পরিণত করা উচিত। অঙ্গ  
সকল সময়েই চিত্তাকে যে তৎকাল্য কার্যে পরিণত করিতে

সমর্থ হইবে, তাহা নহে; কারণ “শ্রোয়সি বহুবিয়ানি”—শুভ  
কার্যে বহু বাধা-বির আছে, কিন্তু স্ত্রোয়ণ অনতি-  
বিলম্বেই আসিবে। এমন যখন চিত্তাটিকে লয় প্রাপ্ত হইতে  
না দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। যদি তাহা করা যায়,  
তাঁহা হইলে অঙ্গই চিত্তাটা আমাদের অন্তি করিবে না  
এবং স্বযোগ আসিবামাত্র তাহা কার্যে পরিণত করিতে  
পারিবে।

“কিছু বাহ্য ভূমি করিবে, তাহা

যেন তোমার নিজের কর্তব্য-কর্ম হয়—অঙ্গের  
না হয়; তবে তাহার শ্রমমতি পাইলে এবং  
সাধ্যব্যবস্থার তাহার কর্তব্য-কর্ম করিতে পার।  
প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজের কার্য-প্রণালীতে  
কার্য করিতে দিবে; যেখানে সাধ্যা করিবার  
আবশ্যক, সেখানে সাধ্যা করিতে সর্বদা প্রবৃত্ত  
থাকিবে, কিন্তু অবাচিতভাবে কখনও হস্তক্ষেপ  
করিও না। অনেক লোকের পক্ষে (অন্তের  
কাজে হস্তক্ষেপ না করিয়া) তাহাদের নিজের  
কাজে নিষিদ্ধ থাকিতে শিক্ষা করা সর্বাপেক্ষা  
কঠিন বিষয়; কিন্তু ঠিক ইহাই তোমাকে  
করিতে হইবে।”

এই উপদেশটা কর্ম-প্রণয় ব্যক্তিকে “সত্যক” করিবার  
জ্ঞান উক্ত হইয়াছে। স্মরণার্থ্য্য শাশ্বত সাধন-পথের  
অঙ্গের দৃষ্টি এখন বিবেচ্য। এক দিকে দীর্ঘস্থলতা বা  
নিশ্চেষ্টতা পরিভাষ্য করিতে হইবে, আবার অঙ্গ মিকে  
অঙ্গের কাঙ্ক্ষা হস্তক্ষেপ ও বর্জন করিতে হইবে। বাহ্যের  
খুব উদ্ভবশীল, তাঁহারা প্রায়ই অঙ্গের প্রত্যেক বিষয়ে  
অবাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করিতে চায়; কিন্তু অঙ্গ লোকের  
যে কৃষ্ণা, তাঁহা তাঁহার নিজের ব্যাপার, তাঁহাতে আমাদের  
অবাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করা কদাচিত উচিত নয়। শ্রীমদগ্বেষ  
গীতার কর্মকে মধ্য স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কহই  
মানব-জীবনের মূল মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও  
উক্ত আছে; “পরোধ্য ভাব্যঃ—পদের ধর্ম অর্থাৎ  
কর্তব্য-কর্ম হস্তক্ষেপ না করিয়া।  
ইহার কারণ স্পষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্তা কিম্বা



নিজের একটা বিশিষ্ট-ধারা আছে ও তাহা অপরের চিন্তা-ক্রিয়ার ধারা হইতে বিভিন্ন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া সেই ধারার চিন্তা ও কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে; সুতরাং আমি যদি আমার চিন্তা ও কার্য্যের ধারা লইয়া অপরের কার্য্যে অব্যাহিতভাবে হস্তক্ষেপ করি, তাহা হইলে আমি নিশ্চিতই তাহার কার্য্যে বাধা উৎপাদন করিব। তাহার কার্য্য তাহার চিন্তা-ক্রিয়ার মুক্তি-সিদ্ধ পরিণাম, তাহা কখনও আমার চিন্তা-ক্রিয়ার সমস্ত ও উপযুক্ত পরিণাম নয় ও হইতে পারে না। প্রত্যেক কর্ম্ম-প্রবণ ব্যক্তির শিক্ষা করা দরকার যে, অপরের কাজে অব্যাহিত-ভাবে হস্তক্ষেপ করিলে কেবল বিরোধের সৃষ্টি হইবে।

এমন কি, অপরে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছে, তাহা যদি অবাধ্য ও ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলেও সেই প্রণালীই তাহার পক্ষে প্রেরণকর। “শ্রোত্রী স্বধর্ম্মো বিদুঃ”—(গীতা ১৮-৪৭)। তাহার দোষ ও গুণ উভয়ের শক্তিই তাহার সেই কার্য্য-প্রণালীর পক্ষেতে বিভ্রমান আছে এবং তাহাই জন্ম-বিকাশ-মার্গে তাহার উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত করিতেছে। যেমন একজন কলমটাকে রিক বে প্রণালীতে ধরিয়া লেখা আবশ্যক, সেই প্রণালীতে না ধরিয়া লিখিতে অভ্যস্ত; কিন্তু আমি যদি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া কলমটাকে তাহার ঠিক-ভাবে ধরিয়া লিখিবার জন্য তাহাকে প্রবর্তিত করি, তাহা হইলে আমি তাহার সুবিধা করিতে গিয়া অসুবিধা উৎপন্ন করিব; কারণ ইহাতে তাহার লেখা ভাল হওয়া দূরে থাকুক বারানই হইবে। সে তাহার পূর্ণ-প্রণালীতে লিখিবার অভ্যাসে সুবিধাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিবে ও নূতন প্রণালীতে কলমটা ধরিয়া লিখিবার জন্য তাহার অনেক কষ্ট হইবে ও সময় লাগিবে এবং আমার উপর বিরক্ত হইবে। অবশ্য সে যদি নিজে তাহার কলম ধরিবার প্রণালীটির পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার সাহায্য চায়, তাহা হইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। তাহার বাহা খুসী, তাহা করিতে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এবং সেই অধিকার-অনুসারে যদি তাহাকে কার্য্য করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে তাহার কার্য্যের পদ্ধতি-নীতির ইচ্ছা-শক্তি প্রকাশ করিবে।

‘জগতে অসংখ্য বিভিন্ন প্রকৃতির জীব আছে,—তা’

যদিও তাহাদের মধ্যে এক একক নিহিত আছে। লগতে নিম্নতর শ্রেণীর জীবগণ তথা না জামিয়াই প্রাকৃতিক বিধি পালন করে, কারণ তাহা করিতে তাহারা বাধ্য হয়। কিন্তু ইহঁদের মানবকে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে চলিবার জন্য জগতে পাঠাইয়াছে। সে নিরমের রূপ গভীর মধ্যে স্বাধীন, গভীর বাহিরে ঘাইতে পারে না; কিন্তু ইহার ভিতরে সে বাধ্য খুসী তাহাই করিতে পারে। তাহার বিকাশ তাহার কার্য্য করিবার নিজের প্রণালীর মধ্যেই নিহিত। ঈশ্বরের এমনই পরিকল্পনা যে, মানব বস্তুই বিকাশ লাভ করিতে থাকে, ততই তাহাকে স্বাধীনতা প্রদত্ত হয় ও ইহা সে বিচলনতার সহিত ব্যবহার করিবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হয়; ইহার ফলেই আমরা একটু একটু করিয়া অবশেষে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই। জন্ম-বিকাশ মার্গের নিম্নতর সোপানে অবস্থিত পশুগণ বিবিধগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে; আর উহার উচ্চতর সোপানে “জীবমুক্ত”-মহাপুরুষগণও তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করেন, কিন্তু জ্ঞাতসারে; আমরা সকলে এই দুই সোপানের মধ্যস্থিত কোন না কোন সোপানে অবস্থিত আছি।

“কখনও হস্তক্ষেপ করিও না”—সদগুরু এই কথাটি খুব জোর দিয়ে বলিতেছেন। আমাদেরকে স্মরণ বাধিতে হইবে যে, এই উপদেশটা অপরের যে কেবল কার্য্য ও ব্যক্তি-সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা নহে,—অপরের চিন্তা-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; কারণ আমরা অপরের চিন্তার উপরেও হস্তক্ষেপ করি। যদি কাহারও উপর আমার সন্দেহ হয়; সে বাধা করিরাছে, তাহাতে যদি আমি কোন ভুল-ভ্রমি আরোপ করি, তাহা হইলে আমি মানস-জগতে তাহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু ইহা করিতে আমার কোনই অধিকার নাই। কাহারও উপর সন্দেহ সন্দেহ হইলেই ‘অজ্ঞায়,—তা’ সেই সন্দেহ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হউক বা না হউক। যদি আমি কাহারও উপর সন্দেহ করি, আর যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমার দ্বারা মানস-জগতে একটা নির্দিষ্ট শক্তি প্রেরিত হইবে এবং সেই শক্তি এই স্থল-জগতের দাক্ষার মত একটা দাক্ষা দিয়া মানস-জগতের প্রান্তভাগে ফেলিয়া

পঞ্চদশ—



ভিতরে পদ্মাসনা সরস্বতী,

[ দ্বারার দিক্ত দৃষ্টি হইতে ]



রিবে। ইহাতে তাহার মনের সাম্যভাব নষ্ট হইবে ও তাহার মন সাম্য অবস্থায় থাকিলে সে যাহা করিতে চাহিত না, এমন একটা অজ্ঞার কাজ করিয়া বলিবে। আর যদি আমার সন্দেহ সত্য না হয়, তাহা হইলেও আমার সন্দেহ-পূর্ণ চিন্তা কোন না কোন সময়ে তাহার অজ্ঞারের দিকে বাইবার পথ স্রবণ করিবে। উভয় স্থলেই তাহার প্রতিবুলে আমি অন্য চিন্তা প্রেরণ করিয়া তাহাকে অজ্ঞার পথে বাইতে প্রবর্তিত করিতেছি।

“তুমি উচ্চতর কার্যের ভার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছ বলিয়া তোমার নিয়মিত যে-সব কর্তব্য কৰ্ম্ম আছে সে-সব যেন তুলিও না; কারণ যত দিন না সে-সব সম্পন্ন হয়, ততদিন তুমি অপরের নিয়মিত অল্প সেবা মূলক কার্যের জন্ত বাধীন হইতে পার না। নূতন কোন সাম্যাদিক কর্তব্য-কর্ম্মের ভার লইও না, কিন্তু ইতঃপূর্বে তুমি যে-সকল কর্তব্য-কর্ম্মের ভার লইয়াছ—যে-সকল বিষয়ে তুমি স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত কর্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া নিজে বুদ্ধিতে পার, সেই সকল তুমি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিবে অর্থাৎ অপরে যে-সব বিষয়কে তোমার কর্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করিবে সে-সব নহে। যদি তুমি তাহার হও, তাহা হইলে সাধারণ কার্য তুমি অল্প লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে করিবে, কারণ তাহাও তোমাকে তাহার জন্ত করিতে হইবে।”

এই সমসার জন্মগ্রহণ একটা অস্বাভাবিক বা দৈবাবধীন ব্যাপার নয়। পূর্বজন্মের নিজের কর্ম্ম অহুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি এমন দেশ, এমন সমাজ ও এমন পরিবার মধ্যে জন্মগ্রহণের জন্ত প্রেরিত হয়, যাহা তাহার বিকাশের ও কর্ম্মকরের ঠিক উপযোগী। এই স্থানটা তাহার বিধাতৃ-ব্রহ্ম হইবে। এই স্থানে সে যাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছে ও যাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহাদের সহিত সে অতীতের কর্ম্মপাশে বদ্ধ। সেজন্ত তাহাদের প্রতি তাহার কতকগুলি কর্তব্য কর্ম্ম আছে, যাহা সে করিতে ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য। এই কর্ম্মগুলি তাহার নিয়মিত বা বিধাতৃ-নির্দিষ্ট কর্ম্ম। এই কর্তব্য-কর্ম্মগুলি সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিলে সে তাহার অতীত কর্ম্মকর করিতে পারে। কিন্তু যদি কেহ তাহার সেই সকল

কর্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদনে অবহেলা করে বা যথাসময়ের পূর্বেই তাহার পারিবারিক বন্ধন ছেদন করে, তাহা হইলে সে এই অবহেলার বা নিপুঙ্খচিতার ফলে এমন কর্ম্ম সৃষ্ট করবে, যাহা তাহাকে পুনরায় তাহাদের সহিত সাংঘর্ষিক করিয়া অধিকতর চাপে প্রাণন করিবে। সেইজন্য প্রত্যেকের তাহার কর্তব্য-কর্ম্মগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্য অপেক্ষা ভারতীয় আচার্য্যবিশিষ্ট যত্ন কর্তব্য-কর্ম্মগুলি যথাযথভাবে পালনের জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন। কর্তব্য-বিমুখ অর্জুনকে: অধ্যাত্মবিজ্ঞা উপদেশ করিবার কালে গুরুদ্বীপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “নিরতা কুরু কর্ম্ম ত্বং” (গীতা ৩।৮)—তোমার নিয়মিত কর্ম্ম কর।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, যখন কেহ অধ্যাত্মবিজ্ঞার নূতন ত্রুটি হয়, তখন সে তাহার নূতন প্রগাঢ় উৎসাহের প্রবল উজ্জ্বল তাহার নিয়মিত কর্তব্য-কর্ম্ম-পালনে শিথিলতা করে বা সে-গুলিতে অগ্রয়োজনীয়-বোধে তাহাদের পালনে ঔদাস্য প্রকাশ করে। অধ্যাত্মবিজ্ঞা লাভের জন্ত যে প্রগাঢ় উৎসাহ, তাহা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়; কারণ ‘তীতঃ সর্বেশ্বরনামাসার’ (যোগসূত্র ১।২১)—যাহার প্রগাঢ় উৎসাহ আছে, সে শীঘ্রই কৃতকার্য্যতা লাভ করে। কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি তাহার নিয়মিত কর্তব্য-কর্ম্মগুলি অগ্রয়োজনীয়-বোধে প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে সে ভুল করিবে; কারণ যত দিন না তাহার নিজের কর্তব্য-কর্ম্মগুলি সম্পন্ন হয়, ততদিন সে সৎ-গুণের কার্য্য অব্যাহতভাবে করিতে পারে না। সে যদি তাহার নিজের কর্ম্ম-পাশেই বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সে সৎ-গুণের কার্য্য কিরূপে অব্যাহতভাবে করিবে? কিন্তু যে সৎ-গুণের শিখা হইবার অভিলାষী, তাহাকে সৎ-গুণের কার্য্য অব্যাহতভাবে করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। ইহার জন্ত প্রস্তুত হইবার উপায় হইতেছে ইহকের কর্তব্য-কর্ম্মগুলি প্রতিপালন; কারণ কর্তব্য-কর্ম্মগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করিলে নিজের কর্ম্ম ক্ষয় হইতে থাকে। এই-রূপে যখন সমস্ত অন্তর্ভুক্ত আংশিক কর্ম্ম ক্ষয় হয়, তখন সৎ-গুণের কার্য্য অব্যাহতভাবে করিবার যোগ্যতা জন্মে; স্রুতায় অধ্যাত্মবিজ্ঞার পার্থিব কর্তব্য-কর্ম্মগুলির সম্পাদন অগ্রয়োজনীয়-বোধে উপেক্ষা করা কর্তব্য নয়।

তৈত্তিরীয়-সাহিত্য (৩।৩।১।১) ও মহাশাহিত্য



(৩৩৫-৩৭) উক্ত ইয়াহো যে, প্রত্যেক মনুষ্য জন্ম হইতেই আপন পুত্রের উপর তিনটি ঋণ-ভার (কর্তব্য-কর্ম) লইয়া উপর হইয়াছে ও যে-ব্যক্তি তাহার সহজাত এই সকল ঋণ পরিশোধ না করিয়া সম্যাস গ্রহণ করে, সে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ভাগবত-পুরাণে বর্ণিত আছে যে, নারদ দক্ষ-প্রাণপতির হৃদয় নামক পুত্রদিগকে তাগদেশে গৃহস্থাস্রম প্রবেশের পূর্বেই নিমিত্ত-মার্গের উপদেশ করিয়া ভিক্ষু করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এই অশ্রদ্ধার গহিত আচরণের জন্য নিশ্চিত ইয়াহিহইছেন। ব্যাসদেব বিষ্ণুরের মুখ দিয়া উপদেশ করিয়াছেন :—

উপাখ্য পূজানন্যাস্ত কৃতা বৃত্তিচ

তে ভোহহবিধার কাঙ্কিত।

হাসেন কুমারীঃ প্রতিপাখ্য সর্গা অর্য্য-

সাহস্বেহয়ঃ মুনিরু হুয়েৎ। সত্য, উ, ৩৩:৩২

“গৃহস্থাস্রমে পুত্র উৎপাদন করিয়া, তাহারাদিকে অঙ্গী করিয়া, তাহাদের জীবিকার জন্য কিছু সাহায্য করিয়া দিয়া, কতাপুত্রকে যোগ্য পাত্রে অর্পণ করিয়া, পরে বানপ্রস্থ লইয়া সম্যাস গ্রহণের অর্থাৎ অধ্যাবৃত্তি লাভের ইচ্ছা করিলে।” ইহা হইতে বৃথিতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতের যখন প্রাণ ছিল, তখন গৃহস্থাস্রমে কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন না করিয়া কেহ অধ্যাবৃত্তি লাভ করিতে অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু এখন সেই চারি আশ্রমের মধ্যে এক গৃহস্থাস্রম ব্যতীত অন্য আশ্রম নাই; সুতরাং এখন আশ্রমাদিকে গৃহস্থাস্রমে থাকিয়াই অধ্যাবৃত্তির সাধনা করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই সঙ্গে গৃহস্থাস্রমে অর্থাৎ সাংসারিক কর্তব্য-কর্মগুলিও সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতে হইবে; কারণ এ-গুলি আমাদের স্বকর্ম। “স্বকর্ম স্বাশ্রমবহিতঃ কর্ম্যহস্তানমঃ” (সাংসার্দর্শন ৩৩৩)।—নিজের আশ্রম বিহিত কর্ম্যহস্তানের নাম “স্বকর্ম”। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :— “স্বকর্মণা ততর্ক্য সিদ্ধিঃ বিদিত মানবঃ (গীতা ১৮:৪৬) —স্বকর্ম দ্বারা ভগবানের অর্জুন করিলে মানব সিদ্ধি, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে। কিন্তু

অপরায় নিম্য কৃষ্ণকৃষ্ণেতি বাসিনঃ।

তে হরেবেধিবাঃ পাণাঃ ধর্ম্মার্থঃ জন্ম যদ্বরে।

কমলাকর সাগ্রহীত বিদ্যুৎপাণ

“যে নিজ কর্ম (সকর্ম) ছাড়িয়া “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ” বলে, তাহার পাণী ও হরিবিদ্যে, কারণ শ্রীহরির জন্মও তো স্বকর্ম-সকর্ম জন্ম ইয়াহি।” সুতরাং বাহ্যর অধ্যাবৃত্তি লাভের জন্য মানবের পক্ষে প্রবেশ করিতেছেন, তাহাদের একদম ধারণা করা উচিত নয় যে, তাহাদের পারমার্থিক কার্যগুলি সাংসারিক কর্তব্য-কর্ম অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। যদি কেহ তাহার নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহার সাংসারিক কর্তব্য-কর্ম ছাড়িয়া পারমার্থিক কার্যসাধনে অগ্রসর হন তাহা হইলে তিনি ভ্রম করিবেন।

সাংসারিক কর্তব্য-কর্মগুলি কোন ক্রমেই দোষের নয়, যদি যে-গুলি সৎ-গুণের উপদেশ অম্বুদেয় অঙ্গরূপে হয়। গুরুজনী শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন : “বোধ্যঃ কংহর্য কোবদ” (গীতা ২৪:২) —কর্মের কোষলই হইতেছে বোধ্য। সে-কোষলটি আর কিছুই নয়—নিরাময়ভাবে—অন্যদৃষ্টান্তের মাংসারিক কর্তব্য-কর্মগুলি সম্পাদন। “অসংকোচাচার্য কর্ম পরমায়োতি পুত্রবৎ” (গীতা ৩১:২) —আজিক তাগ করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম করে, সে পরমব্রহ্ম লাভ করে। হৃৎ-গ্রন্থ, মাভাভাভ, জয়-পরাজয়ের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, নিরাম-ভাবে কর্তব্য-বুদ্ধিতে সাংসারিক কর্তব্য-কর্মগুলি পালন করিলে, তাহা বন্ধের হেতু না ইয়া বন্ধের হেতু হয়, অতঃপর কর্ম ইয়া শুভ কর্ম উৎপন্ন হয়, নিকামতা, পারার্থপরতা, দাম্য, প্রেম, ঘৈর্য প্রভৃতি সাধন-পথের প্রয়োজনীয় গুণগুলির বিকাশ হয়। যিনি সৎ-গুণের বর্ধার সৈবক, তিনি তাঁহার সাংসারিক কর্তব্য-কর্মগুলি সৎ-গুণের প্রীতির জন্যই অঙ্গরূপ করেন। প্রাতি-কালে গায়েখান করিয়া সাংসারিক কর্ম সম্পাদন করিবার জন্য যখন তিনি বাহ্যজগতে গমন করেন, তখন তিনি বলেন : “সাম্যমতীতোহস্তমি স্বকর্মণ দ্বৈতান্যমীরাণ্য গুরোরগীরায়। তবাজ্জর্যায় তব প্রিয়ার্থম্ সাংসার মাত্রামহব্রহ্মহৈঃ।” প্রভু-ভক্ত ভূতা যেমন তাহার করণীয় কার্যগুলি “প্রভুর জন্ম আমার নয়”—এই জ্ঞান করিয়া তাহা প্রভুর প্রীতির জন্য সম্পন্ন করে—এবং শ্রুতকরণেই সম্পন্ন করে, সেইধর্ম যিনি সৎ-গুণের বর্ধার সৈবক, তিনিও সৎ-গুণের প্রীতির জন্য সাংসারিক কর্তব্য-কর্মগুলি সম্পাদনের সময় “অহং-কর্তে-

ধরায় ভূতাবং কেরামি”—প্রভু যিনি শ্রীকৃষ্ণদেব, তাহার প্রীতির জন্য আমি ইহা করিতেছি”—এইরূপ বুদ্ধি, দ্বারা সমস্ত তাগ করিয়া স্বাক্ষরকণে সম্পাদন করেন।

যিনি সৎ-গুণের প্রকৃত সৈবক হইতে চাহেন, তাহাকে সৎ-গুণের কার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। সুতরাং সৎ-গুণের কার্য করিবার জন্য সর্বাঙ্গ ও সর্বত্র প্রস্তুত থাকিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাহার কোন মনো-পার্থিব কর্মের ভার লওয়া উচিত নয়, বাহ্য স্বার্থভর তাহার নিজের কর্তব্য-কর্ম নয়। তবে তিনি ইত্যুপলক্ষে যে-সকল কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের ভার ইয়াহিছেন, যে-সকল কার্যকে তিনি নিজে বিচার-বিবেচনা করিয়া নিজের গুণিসঙ্গত ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য-কর্ম বলিয়া উপলব্ধি করেন, সেই সকল কার্য তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, কিন্তু আশ্রমের তাগের কর্তব্য-কর্ম বলিয়া বাহ্য নির্দেশপূর্ণক তাহার উপর চাপাইতে চাহিলে, তাহা তাহাকে দৃঢ়রূপে কিন্তু সৎভক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে; কারণ আমাদের অন্তরাত্মার নিকট বাহ্য আমাদের কর্তব্য-কর্ম বলিয়া বোধ হয় না, তাহা যদি আমরা সমাজের বিধি-নিয়মের চাপে বা অপরের জবাব দিবার দায়িত্বের ভার হইলে আমাদের অধোগতি অনিবার্য। আবার, আমাদের অন্তরাত্মার নিকট বাহ্য আমাদের কর্তব্য-কর্ম বলিয়া বোধ হয়, তাহা যদি সমাজের বিধি-নিয়মের চাপে বা অপরের প্রেরণায় না করি, তাহা হইলে আমরা বিধি-নিয়মের তাগের অন্তরে হইতে পাবি না। অধ্যাবৃত্তি-জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পাবি না। অধ্যাবৃত্তি-জীবনকে তাহার নিজের বিবেক-বাণীর অঙ্গসমন করিতে হইবে। সুতরাং বিচার করিয়া আমাদের নিজের নিকট বাহ্য আমাদের কর্তব্য-কর্ম বলিয়া উপলব্ধি হইবে, তাহাই আশ্রমাদিকে করিতে হইবে। ইহা সত্য যে “কিং কর্ম কিমকর্থেতি কন্যোঃপাখ্য যোহিতঃ”—কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে কিত্তাপণ ও নিমোহিত হইবে। সুতরাং আমরা যখন অজ্ঞানী ও অপর মানব, তখন আমাদের কর্তব্য-কর্ম নির্ধারণে অনেক সময় ভ্রম করিব এবং সেই ভ্রমের জন্য গুণহত্যা করিব। কিন্তু তাহা হউক। আমাদের ভ্রমের দিক দূরকার, গুণে আমাদের জীবনের সেই শিক্ষাবাটা। কর্তব্য নির্ধারণ করিতে ইয়াই যদি আমরা ভ্রম করি, তাহা হইলে তাহার পরিণামে আমরা যে গুণ-ভোগ করিব, তাহা

আমাদের অজ্ঞান মনের বহুলা দূর করিয়া দিবে। সুতরাং সেই গুণহত্যা আশ্রমাদিকে সাদরে গ্রহণ করা উচিত। অতঃপর এতৎকর্তে ভ্রম না করিয়া আমাদের নিজের নিকট বাহ্য কর্তব্য-কর্ম-বলিয়া উপলব্ধি হয় তাহা সমুপলব্ধ হইলেও তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে ও তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে।

যিনি সৎ-গুণের প্রকৃত সৈবক, তিনি সৎ-গুণকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া সমস্ত কার্যই এমন কি তাহার প্রাত্যহিক জীবনের সামান্য কার্যগুলিও সৎ-গুণের জন্য করেন ও সেজন্য তিনি সেগুলি অন্য লোক আ-তাবেই করেন। তিনি বলেন :—

প্রাতঃ প্রভৃতি সারাহাং সারাহাং প্রাতঃসত্ততা।

যং কেরামি জগদ্রাত্তত্তবে তব পুত্রম্ ॥

সুতরাং আমরা যদি সৎ-গুণের সৈবক হইতে চাহি, তাহা হইলে আশ্রমাদিকে ও তাহা করিতে হইবে—আমাদের নিয়মিত কর্তব্যকর্মগুলি ব্যতীত প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ কার্যগুলিও সৎ-গুণের জন্য করিতে হইবে ও সেজন্য সে-সকল অন্য লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবেই করিতে হইবে—নিরুজ্জ্বলভাবে নহে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনেকের বিপরীত কটা আছে। আমরা সাধারণ কার্যগুলি অন্য লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে করা দূরে থাক, সেগুলিকে বুদ্ধি ও অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া নিরুজ্জ্বল করে। কিন্তু আশ্রমাদিকে উপলব্ধি করিতে হইলে যে, যে-ব্যক্তি সাধারণ কার্যগুলি উৎকৃষ্টভাবে করে না, সে কখনও অসাধারণ কার্যগুলি উৎকৃষ্টভাবে করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। সাধারণ কার্যগুলি উৎকৃষ্টভাবে সম্পাদনের মধ্য দিয়াই অসাধারণ কার্যগুলি উৎকৃষ্টভাবে করিবার দক্ষতা ও সেজন্য যোগ্যতা লাভ করে। সুতরাং সাধারণ কার্যগুলিও অধ্যাবৃত্তি-জীবনের নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অনেকের আধ্যাত্মিকতার অজ্ঞাত হইতে উৎকৃষ্টভাবে শেখ-বিজ্ঞান করেন না। কিন্তু ইহা আধ্যাত্মিকতা নহে। ইহা প্রভু গোরাবদেব বলিয়াছিলেন : “ভাল না পারিলে।” মহাপ্রভু এখন নয়, যে উৎকৃষ্টভাবে শেখ-বিজ্ঞান করিব না—ইহার অর্থ মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিব না, কারণ ইহা মদ-পদার্থের বুদ্ধি করে। অধ্যাবৃত্তি-জীব-



সাধা-সিথে পোষাক পরিধান করিবেন, কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট-ভাবে—সৌষ্ঠবভাবে ও সুন্দরভাবে। সৌন্দর্য অধ্যাশ-বিভাগীর নিকট একটা অর্জুনীর গুণ; কারণ তিনি বাহার সহিত মিলিত হইতে চাহেন, সেই ঈশ্বর যে কেবল “সত্যম্”, কেবল “শিবম্”, তাহা নহে; তিনি “সুন্দরম্”ও বলেন। সুতরাং আমরা যদি সেই “সুন্দরম্”এর সহিত মিলিত হইতে চাই, তাহার উপাসনা করিতে চাই, তাহা হইলে আমা-বিগকেও সুন্দর হইতে হইবে শুধু বাক্যে নয়, শুধু মনে নয়—কার্যেও। সেইজন্য বিষ্ণুপুরাণে ধৰ্মি বলিয়াছেন :—

প্রতিদ্যমালকেশঃ স্বয়ংকিঞ্চিৎকবেশয়ত্বক।

সিতা হুমনসোহস্তা বিহুতা চ্চ নরঃ সবা ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ১২।৩

“কেশগুলি চিত্রণ ও পরিকৃত রাখিবে, স্বয়ং ধারণ করিবে, চাক্র বেশ পরিধান করিবে, মনোরম গুরু পুষ্প ধারণ করিবে।” সুতরাং আমরা দৈনিক সৌন্দর্য-সাধনকেও উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহা বিলাসিতা নহে—ভৌতিক সৌন্দর্যকে আধ্যাত্মিকে পরিণামিতকরণ মাত্র।

আর এক কথা। আপনাদের সামাজ্য কার্যগুলিও সদ-গুরুত্ব জ্ঞাত করিতে হইবে। যদি আমরা কি সামাজ্য, কি অসামাজ্য, কি সাধারণ, কি অসাধারণ, কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ—সকল কার্যই সদ-গুরুত্ব জ্ঞাত করিতে অভ্যস্ত হই, তাহা হইলে আমরা ‘অচিরে সদ-গুরুত্ব লাভ করিব। গুরুজগী আত্মকও বলিয়াছেন :—

“মহর্ষমপি কংখনি কুর্শ্চন সিদ্ধিমবাপ্যসি”

(গীতা ১২।১০)

—আমার জন্ম সকল কর্ষ করিলে সিদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু আমরা বিমিত হইতে পারি যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সামাজ্য কার্যগুলি কিরূপে তাহার জন্য সম্পন্ন হইতে পারে ও তদ্বারা সদ-গুরু লাভ হইবে। আমাদিগকে

উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমাদের সামান্য কার্যগুলি, যেমন যেন সঙ্গোপগামী দপ্তরখানাবু কেরাণীর কোন চিঠি দেখা বা কোন পার্শ্বেল প্যাক, সদ-গুরুত্ব জগতের বিরাট কার্যের অংশ,—যাহা আমাদের জীবন-পথে আসিয়া পড়িয়াছে। যদি আমরা ঐরূপ কোন চিঠি লিখিবার বা পার্শ্বেল প্যাক করিবার প্রাকালে সদ-গুরুত্ব চিন্তা করি ও আমাদের সাধ্যমত তাহা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করি এবং তাহার চিন্তা করি যে, সদ-গুরুত্ব একটু শক্তি ইহার সহিত উদ্বিগ্ন বাক্তির নিকট গমন করুক, তাহা হইলে তাহা সদ-গুরুত্ব কার্য হইবে ও সেই মুহূর্ত্তেই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সুব্রহ্মস্বিত কোন বন্ধকে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন যদি তাহার মন অন্য কোন চিন্তা দ্বারা অধিকৃত না থাকে, তাহা হইলে আমাদের চিন্তা তাহার মন আকর্ষণ করে। কিন্তু “গুরুত্বী সাকীকৃতম্” সদ-গুরুত্ব মন অন্য চিন্তা দ্বারা যতই অধিকৃত থাকুক না কেন, তাহাতে চিন্তা করিলে, সেই চিন্তা তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্তই একটা স্বল্পষ্ট ছাপ উৎপন্ন করিবে ও যদিও তিনি সেই মুহূর্ত্তে তাহা অবধান না করেন, তাহা হইলে উহা তাহার সম্বন্ধে স্পর্শ-করিতে ও তিনি তাহা উপলব্ধি করিবেন এক সেই চিন্তার প্রত্যুত্তরে তিনি তাহার শক্তি ও প্রেমের দ্বারা চিত্তকণের উপর বর্ণন করিবেন। প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেক কার্য এইভাবে তাহার জন্য সম্পন্ন করিলে, তিনি তাহাকে উপযুক্ত জ্ঞানিয়া সেবকরূপে গ্রহণ করেন।

শুধু তাহাই নহে, অন্যায় কার্য সদ-গুরুত্ব জন্য সম্পন্ন করিতে কখনও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং আমরা যদি সকল কার্যই তাহার জন্ম সম্পন্ন কার্যে অভ্যাস করি, তাহা হইলে আমরা অন্যায় কার্য হইতে বিরত হইতে পারি ও কার্যে সত্যত হইয়া দম-সামান্য সিদ্ধিলাভ করিব।

## হৃদয়হীন

(গল্প)

শ্রীমদমোহন ঘোষ

[ এক ]

সে ছিল শহরের বিখ্যাত নট—নাম স্থলেখা। শহরে সকলের মুখেই তার নাম—মহা চাক্ষুষ উঠেছে তাকে নিয়ে। যুবকেরা তার নামে পাগল, প্রবীণরা আক্ষেপ করে তাদের গত যৌবনের জন্তে। সবাদপত্র পূর্ণ তার অভিনয়ের শত মুখের প্রশংসায়। প্রাচীর-বিখ্যাতদের তার নাম প্রশংসিত হ'লে পণ্ডে জনতা হয় কোন কৃতিত্বের সে দর্শকদের অভিনন্দিত করবে দেখবার জন্যে, রঙ্গালয়ে সে দিন আর একটাও স্থান খালি পড়ে থাকে না।

রূপ ছিল তার যেন অলঙ্কার—নাচের জন্যে তার কমনীয় তরুণ মনে উঠত মনে হ'ত বাতাবে অশ্লিষ্টাণী যেন তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠেছে।

এই আঙুনে পড়ে মরবার গতন্ত্র জুটত অনেক। তার গৃহের দ্বার অতিক্রম করা সৌভাগ্য বলে মনে করত অনেক লক্ষপতি, দুরারে তার বাসিতে মান-সম্মত ভূলে যেত সমাজ-পতিরা। লক্ষপতি তার ভাঙার শূন্য করে দিয়েছিল তার গান শোনবার জন্তে, সারা অঙ্গ ভরে দিয়েছিল তার মুখের লিপি দেখবার জন্যে কিন্তু তার অধিক কেউ কখনও পড়ত না। পুরুষের হৃদয় যখন তার গায়ের তপস্যার লুটিয়ে পড়ত প্রেম ভিক্ষা করে, যুগায় উপেক্ষা করাই ছিল তার আনন্দ। সকলে ভাবত কি পাশাপাশি তৈরি তার প্রাণ।

দরিদ্ররা কিন্তু জানত তাকে দেবী বলে। দরিদ্রের কন্যার বিবাহ রাজি হ'তময় হ'য়ে উঠত কার অসুচক্ষুশ্রী তা কন্ডার পিতা ছাড়া আর কেউ জানত না, অন্ধ ও ধর্মের ভিকারী সুলি কার করণ্যায় পূর্ণ হ'য়ে উঠত তা সাধারণ লোকের নিকট অজ্ঞাত থাকলেও অন্ধ ও ধর্মেরা হু' হাত ভুলে তাদের এই করণ্যায়ী মাকে আশীর্বাদ করত। তার আগমনে নিরানন্দ রোগীর গৃহ আনন্দ-নিকেতন হ'য়ে

উঠত, রোগযন্ত্রণা ভুলে যেত রোগীরা তার কোমল হাতের সোহাগ, দীর্ঘে দীর্ঘে চোপ বুকে আসত তাদের শাস্তিময় নিদ্রায়।

[ দুই ]

তার গৃহের সামনে প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থাকত একটা যুবক। সাহসভরে তার গা ছুঁতানি কখন তাকে ছুঁয়ার অভিক্রম করে ভিতরে নিয়ে যেতে পারত না। সুখোষকে দেখাই ছিল যেন তার আনন্দ। স্থলেখা ভাবত লোকটি বোধ হয় কিছু ভিক্ষা চায় তার কাছ থেকে। গোপনে সে তাকে অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছিল, কিন্তু সে তা গ্রহণ করে নি—অর্থের কোন প্রয়োজন নাই সে জানিয়েছিল।

[ তিন ]

প্রভাতে একদিন তার গৃহে সেই যুবককে আগতে দেখে অবাক হ'য়ে গেল স্থলেখা। যুবকটিও লজ্জিত হ'য়ে বলে, “আজ এই প্রভাতে আপনার কাছে আগতে নিশ্চয়ই আপনি আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন কিন্তু কাল রাতে রঙ্গালয়ের সামনে আপনার এই অলঙ্কার কুড়িয়ে পেয়ে ফেরৎ দিতে এসেছি। ফেরৎ না দেয়া পর্যন্ত কিছুতেই আর শাস্তি পাই না, তাই এই প্রভাতে ছুটে এসেছি আপনার কাছে।”

স্থলেখার তখন মনে পড়ল কাল রাতে অলঙ্কার খোলবার সময় এই অলঙ্কারখানি গুলে রাখে নি। এমন মূল্যবান, অলঙ্কার ফিরে পেয়ে সেই যুবককে অনেক ধন্যবাদ দিল এবং পুরস্কার দেবার জন্তে তাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগল। যুবকটি শুধু উত্তর দিল, “আপনার সঙ্গে এই পরিচয় আমার যথেষ্ট পুরস্কার। আমি চিত্রকর—



আমি রূপের উপাসক, অর্থের আমার কোন প্রয়োজন নাই।"

স্বপ্নে ব্যক্তি হয়ে বলে, "আপনিও কি এই মত লোকদিগের মতন নারীর রূপেই আকৃষ্ট হন?"

চিত্রকর তার কথার বাধা দিয়া বলে, "আপনি আমার ভাল বুঝছেন। অতরের রূপেই বাইরের রূপকে মধুর করে তোলে। আমি চিত্রকর আমার কাজ হচ্ছে অন্তরে যে রূপের উৎস আছে তাহাই চিত্রে প্রকাশ করা, লোক-চক্ষু হতে যে দেবী মূর্তিকে বিশালিতার ঢেকে রাখতে চান তাহাই মুটিয়ে তোলা।"

স্বপ্নেবার অন্তরে একথা শুনি যা দিল—এমন কথা আর পূর্বাৎ কেউ তাকে বলে নি। তার মধ্যে নারীকে কল্পিত তুলতে চার পুঙ্খ, দেবী বলে তাকে পূজা করতে চায়, তার বিশালিতার কল্পিত আবরণে কল্পতে চায় না। তার চিত্র চকন হয়ে উঠল, ব্যাকুলকণ্ঠে যে বলে, "না না ও কথা বলেন না, আমি পতিতা, পাণিষ্টা নারী, রূপ বিক্রয় করাই আমার ব্যবসায়। আপনি যান এ পাণ পুরাতে আর দাঁড়াবেন না। এ গৃহে আর কখন পদার্পণ করবেন না।" এই বলে চোখে কাপড় দিয়ে স্বপ্নেবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

[ চার ]

দোল পূর্ণিমার রাত্রি—স্বপ্নেবার গৃহে উৎসবের আয়োজন প্রচুর। শহরের ঘনো আঁজ সকলেই তার গৃহে সমাগত। তার রূপের নেশার সকলেই আজ উদ্ভত—ঐশ্বর্যের বিনিময়ে সকলেই পেতে চায় তাকে।

স্বপ্নেবার উচ্চ কণ্ঠের নিবেদন শুনে হাসতে হাসতে উত্তর দিল, "আজ আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করব। নারীর মন্যাবস্তু সকলেই মন্যসর্গের দিতে প্রাজ্ঞা আছেন, কিন্তু আমি কাহারও কাছে কিছুই চাই না। হিন্দুধর্ম-মতে বিবাহ করে পত্নী করতে কে আপনাদের মধ্যে প্রস্তুত আছেন?" তার কথা শুনে নীরব হয়ে রইল সকলেই—প্রশ্ন হ'য়ে গেল সকল কলরব মুহূর্ত মধ্যে। কিছু আগে মৃদু গিরে কিন্তে চেয়েছিল যারা, বিনামূল্যে আপনাদার করে নিতে কেউ তাকে চাইল না।

স্বপ্নেবার আবার হেসে বলে, "সে গমিতে লুকানো ছিল পুঙ্খের উপর প্রতিবিম্ব। নেবার প্রথম বার্ননা—সকলেই যে নীরব হ'য়ে গেলেন—কেহই আপনাদার মতন নন আমার প্রত্যবে। আপনাদের লালসার বিহিত আমাকে ইন্দন করতে সকলেই প্রস্তুত আছেন, আপনাদের কামের বস্ত্র করে আমার নারীকে অবমাননা করতে সকলেই ইচ্ছা করেন। নারীর সর্গনাশ করে তাকে পরিত্যাগ করে সমাজের মাঝখানে সাধু গেছে বাব করতে লজ্জা বোধ করেন না কিছুমানুষ। আমি কেবল পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলাম আপনাদের মধ্যে মনুষ্য আছে কি না—আর তার সম্পূর্ণ পরিচয় পেলাম। আজ আপনাদের আমার অতীত জীবনের ইতিহাস কিছু শোনাতে চাই। এমন এক পূর্ণিমা রাত্রে একটা শান্তিময়ী পল্লীর উপর বিখ্যাতর আশীর্বাদ চান্নের কিং-রূপে করে পড়ছিল। সেই জ্যোত্স্বামীর রজনীর গির্ঘা-সমস্ত সমস্ত পল্লী যুগে আচ্ছন্ন—কুটীরে পল্লী-বৃক্ষ-বাণীর বাহুতে মাথা রেখে ব্রহ্মপুত্র অচেতন। সেই শান্তি ভঙ্গ করে দ্রুপ্তদের দল একটা পল্লী-বৃক্ষ-স্বামীর দ্বর্জল বাহু থেকে ছিন্ন করে নিয়ে চলে গেল। পল্লীবাণীরা কেহই অগ্রসর হ'ল না অবলার রক্ষার জগে—যাদের দ্বারা দূতভাবে অর্পণবদ্ধ করে রইল। বাতাস কেবল সেই অবলার চাঁৎকার শুনে হা হা করে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দিন কতক পরে সেই নিপীড়িতা যখন গায়ে ফিরে এল, তখন পুঙ্খের দল একত্রিত হ'য়ে স্থির করলে যে এ নারীকে সমাজে গ্রহণ করা চলে না। সেই অসহ্য নারী দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিল আশ্রয়ের জগে, কিন্তু তাকে কেউই আশ্রয় দেন নি। তাকে আর দিয়েছিল এক নারী, যে সমাজের শাসন মানে নি—সে ছিল শহরের এক বাইকী। তিনি ছিলেন দেবী, নারীর অপমান তিনি অস্বস্ত করেছিলেন। কতবার মতনই তাকে দেহ ও বস্ত্রে লালন-পালন করে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যে নারীকে আপনাদের মতনই সমাজের নেতারা সমাজ থেকে বার করে দিয়েছিলেন, তারই গৃহে আসতে, তার কাছে প্রেম নিবেদন করতে কিন্তু আপনাদের লজ্জা করে না। যে নারীর দ্বারা আপনাদার যে রাত্রে হত্যা

করেছিলেন তার পরেও কি তার দ্বার ধাক্কাতে পারে আপনাদার আশা করেন। সেই সমাজ-পরিভ্রাতা রমণীই আমি—আর তাই আমি দ্বারহীন পায়গি। আজ রাত্রে উৎসব এইখানেই শেষ, যান আপনাদার সকলে চলে যান—ব্যথাভরা অতীতের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে আজ আমার অন্তর ব্যক্তি হ'য়ে উঠেছে।"

সকলেই নীরব একে একে করে চলে গেল কিন্তু দ্বারের এক কোণে বসেছিল সেই চিত্রকর একাকী। সকলের অলক্ষ্যে এসে চুপি চুপি সেইখানে বসেছিল। তাকে দেখেই উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠল যুগেবা, "কি শিল্পী কি ভাবছে? এখনও কি প্রেমের স্বপ্ন দেখছে, না ভাবছে কি স্বাকর একে দেখতে, কুলির টিক আদর্শ হবার উপযুক্ত।"

তার সেই ব্যঙ্গপূর্ণ কথা শুনে শিল্পী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "প্রেমেরই স্বপ্ন দেখছিলাম। তোমার উত্তরের কঠিন আবরণের নিম্নে যে প্রেমের ক্ষত বয়ে আছে তাই অস্বস্ত করছিলাম। তুমি দ্বারহীন কখনই নও, তুমি প্রেমময়ী—তুমি আমারই একথা বলতে সাহস হয় না।" স্বপ্নেবার একথা শুনে উদ্ভতর মতন চাঁৎকার করে হেসে বলে, "তোমার কবির মত রচনা-শক্তি আছে বটে।

আজ পূর্ণিমা করে দেখি তোমার ভালবাসা, কবির কল্পনার মতন কীকা কি না। প্রেমের উপহার চাই তোমার এই চোখ দুটা—দমতে পারলেন-কুবু-ব তুমি ব্যর্থই প্রণয়ী।"

শিল্পী উত্তর দিল "তাই হ'বে—আমার বাইরের দৃষ্টি দিয়ে তোমার অন্তরের দৃষ্টি মুটিয়ে তুলব।"

[ পাঁচ ]

"শিল্পী শিল্পী এক উপহার পাঠালে তুমি। মূর্খের কথাই কি সত্য বলে ঘরে নিলে—দ্বন্দ্বের নীরব নিবেদন কি তোমার দ্বারা পৌছায় নি। দ্বন্দ্বহীনাকে কি এমনই করে শান্তি দিতে হয়।"

শিল্পী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "কিরে বাও স্বন্দরী তোমার সেই ঐশ্বর্যের মধ্যে—আমার এই মহাশিশুর অন্ধকারে আমার একলা ভুবে থাকতে দাও। আমার বিদায় দাও।"

"না না আজ তোমার বিদায় দিতে আসি নি—দ্বন্দ্বের তোমার বরণ করে নিতে এসেছি। আমাদের এই মিলন তোমার মহাশিশুর স্বপ্নভাত করে তুলবে—চল কবি মাছের বাসনায় ছেড়ে চলে যাই।"

রবীন্দ্র-বন্দনা

প্রাণিলকুমার সরকার

স্বর্গলোকের কোন মহালে  
স্বর্ণ-রজা কল্পজালে

নিভোর ছিলে আশ্রয়ভোলা কোন সে মাঝার সন্ধান,  
বিরট কি এক সত্যলাগি'

পরম যোগী—

পাঠিয়েছিলে হিয়ার পূজা নীরব তোমার জগদাধি

আশ্রয়ভোলা মহানু কবি  
পূজা তোমার-দাসি সবি?

সহসা কার মূখরধনি রিগি রিগি বাজলো দীর্ঘ—

স্বাৰ্দ্ধ তুমি দেখলে চেয়ে

আকাশ ছেয়ে,

পড়তে করে আলোকবাহী অন্ধকারের বক্ষিতরে!



মুমুগি মা ধরার লাগি'  
পূরান মাঝে উঠলো জাগি,  
কতকালের পুঙ্খভূত মৌন তোমার নিগূঢ় ব্যথা,  
আলোর ধারার মর্ত্যে এসে  
ফুল হ'লে তাই জুটলে হেসে,  
হাওয়ার পোশার পাঠিয়ে ছিলে চরম তোমার সাধকতা!

সত্যি কবি, অবাক মানি  
কুণেহিমম তোমার বাণী  
জড়ের মাঝে পূরান আছে, জড়হেরও আছে মোহ,  
ধরার বুকে জড়-অজড়ে  
মিলন হুখে দৌঁদায় ধরে,  
প্রাণের নাচন বিব্যবধে, এই কথাটি সদাই কহ।

গুহ্ম-সত্য মক্খ হ্যায়,—  
মানব-কার্য,  
শূন্য লোকের গ্রন্থ-তারা,—সকলি এক ছন্দে গড়া  
অনুপমগুণের মাঝে  
সত্যাকারের মিলন রাজে—  
স্বক্সারিলে একটা অণু—বিশ্ব তাতে দেয় যে সাড়া।

প্রকাণ্ড এ পৃথিবীতে  
প্রকৃতির যে লীলা চলে,  
জেনেছ ত্য, হে দরদি, বিপজ্জরী প্রেমের বলে  
কল্পন তোমার পরাধখানি  
গুণ্ডে নিখিল মর্ম্মবাণী,  
কি কথা কর গাছের পাতায়, কলোঁসিত নদী জলে।

হে মহীয়ান, উদার কবি  
প্রভাত রবি,  
দাগনি আলো,—গাওনি শুধু ছোট আমার আভিনাতে,  
জগৎ-জনের হৃদয়-তারে  
যে-স্বক্সারে  
বাঞ্ছিয়ে ছিলে, ডেউ ছুটে তার নাচার জগৎ মুগ্ধনাতে!

অভিশাপের চিহ্ন-আকা  
বিষাদ-মাথা  
কেরে ঐ আঁখির জলে ধরার কোণে ক্ষুদ্র প্রাণে;  
বিস্মির বিধান সহিতে নাগে  
ছাপ-ভারে  
রহে যে, বকে নিলে, জুড়ায়ে ভায় করণ গানে।

আপন ভোলা হে দরদি,  
নিরবধি,  
বিরহ কার তোমার গহন চিত্র মাঝে পোপন জাগে,  
চির-অনন্দের হে বিরহী—  
বিষাদ বহি'—  
কোন্ সে চরণের বেদন-বাণী মৃত্ত তোমার করণ রাগে।

সত্যসদ্ব হে মহাকবি,  
উজ্জল রবি,  
নিখিল মাঝে ছড়িয়ে গেছে দীপ্তি তোমার আধার-হরা;  
জগতের তুমি জগৎ তোমার  
বড় আপনায়  
তুমি আমাদের গরবের তাই লহ অর্কনা হৃদয়-ভরা।

## হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ত্রিহীনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

ছাত্রজীবনে এবং ছাত্রজীবনের পরেও যে কয়জন  
জনরীর মহাহুত্ব ব্যক্তির সহিত পরিচয়ে ও তাঁহাদের  
হেলাতে জীবনে আমি ধন্ত হইরাছি, স্বর্গীয় হরপ্রসাদ  
শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহাদের প্রায়  
সবলেই একে একে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সী  
কলেজের অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন, অধ্যাপক মনো-  
নাথন বোথ, অধ্যাপক পার্শ্বভাল, জ্ঞান গুরুদাস বন্দ্যো-  
পাধ্যায়—ইহাদের কথা মনে হইলেই মানসিক, নৈতিক  
ও আধ্যাত্মিক জীবনে ইহাদের নিকট হইতে যে উপকার  
ও যে অনুপ্রাণনা পাইরাছি তাহা মরণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে  
ইহাদের প্রণাম করি। তারপরে কৰ্ম্ম-জীবনের স্বরূপাত  
হইতে জ্ঞান আন্তর্য্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দেহ ও  
উদাহ লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল।

শাস্ত্রী মহাশয়ের নামের সহিত পরিচয় হুলের ছাত্রাবস্থায়  
ইয়াছিল—কোনও বাঙ্গালী পাঠ-সংগ্রহে 'বান্দীকির জয়'  
হইতে উদ্ধৃত একটি পাঠ-দর্পনে এই পুস্তক ও তাহার  
চর্চিতা যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শাস্ত্রী মহাশয় তাহা  
হাসিতে পারি। ১৯০৭ সালে এঙ্গেলস পাস করিয়া  
কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকি এবং ঐ সময়ে কলিকাতা-  
ইনস্টিটিউট ইন্সটিটিউটে ছাত্রসভা হই। সেই সময়ে  
এমন একটা বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের ও গুণিত্য-  
বোধের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই, যাহার কথা সাধারণ্যে  
মেনে পরিভ্রান্ত নহে। ইন্সটিটিউটে আমাদের সময়ে যাঁরা  
কবী ও উত্তমগী এবং জনপ্রিয় ছাত্রসভা ছিলেন, তাঁহাদের  
মধ্যে ত্রিগুরু শিশিরকুমার ভট্টাচার্য্য অন্যতম। দরিদ্র ছাত্র-  
দের সাহায্যকরে স্থাপিত ছাত্র-ভাণ্ডারের জ্ঞান বৎসর  
বৎসর আমরা নাটক অভিনয় করিতাম, ইন্সটিটিউটের  
পূর্বপোষকগণের নিকট টিকিট বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ ছাত্র-  
ভাণ্ডারে দান করিতাম। ত্রিগুরু শিশিরকুমার এই সকল  
অভিনয়ে আমাদের অগ্রণী ছিলেন। আমি নিজে কখনও

অভিনয়-কার্যে নামি নাই, কিন্তু কলেজের ছাত্রজীবনের  
পাঁচটা বৎসর ধরিয়া অন্য বহুগুণের সাহায্যে আমাকে  
ইন্সটিটিউটের অভিনয়ে বেশকারীর কাজ করিতে হইয়া  
ছিল। নাটকে পাত্রপাত্রীগণের জ্ঞান তখন আমরা  
ইতিহাসগ্রন্থমোদিত পরিচ্ছদের প্রবন্ধনের প্রদান করি।  
হিন্দুগণের নাটক হইলে, রাজাদের ও অল্প পাত্রদের বেনারসী  
ছোড় এবং অল্প রঙ্গীন কাপড় পরাইয়া, হাতে গায়ে প্রচুর  
গহনা শিলা সাজাইয়া এবং সেটাই করা পোষাক বহাশব্দ  
কম ব্যবহার করিয়া প্রাচীন ভারতের একটু আভাস দিতে  
চেষ্টা করিতাম। আমাদের সঙ্কল্প ও চেষ্টা ছিল,  
নাট্যকবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার ও প্রাচীন  
জীবনের চাক্ষুষ পরিচয় দর্শকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত  
করা; প্রাচীন বাড়ী-ঘর, বস্ত্র, অস্ত্রার প্রভৃতি স্ক্রিপ্ট ছিল,  
সে বিষয়ে ঐতিহাসিক আশোচনা ও গবেষণার ফল  
অম্বাহারে বাঙ্গালী নাট্যভিনয়ে সেগুলির অবতারণা করা।  
এই কাজে আমরা আমাদের অধ্যাপক ও ইন্সটিটিউটের  
কর্তৃপক্ষ সকলেরই নিকট হইতে প্রচুর উৎসাহ পাই এবং  
আমাদের এই চেষ্টার আমরা সকলের চেয়ে উৎসাহিত  
হই, শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ অম্বাহারে গম্ভীর কলেজে  
সংস্কৃত নাটক (মালবিকাগ্নিমিত্র) অভিনয় কালে ক্রীট-পূর্ণ  
ষষ্ঠীয় শতকের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাটকের পরিচ্ছদের  
পরিকল্পনা হইতে। তারহুৎ সীতার ধরনে পাগড়ী এবং  
কুশলবদের প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় প্রচুর অলঙ্কার-ধারণ,  
ও বেনারসী ছোড়, ওড়না প্রভৃতি পরিধান—যাত্রার ধরনের  
জুতা পোষাক বা সন্ধ্যা চুমকী দেওয়া নানার রঙ্গের আচকান  
পেট লেন—গীতবস্ত্র প্রভৃতি কিছুস্ত সাজের সম্পূর্ণ বর্ধন—  
শাস্ত্রী মহাশয় প্রচলন করেন। সংস্কৃত কলেজের অভিনয়ের  
পরে, কি হুয়ে জানি না, সেই পোষাকগুলি আমরা  
ইন্সটিটিউটে পাই। প্রাচীন-সংস্কৃত বিষয়ক গবেষণার একটা  
অঙ্গ হিসাবে আমার নিকট পরিচ্ছদের আশোচনার একটা



মূল্য ছিল—শাস্ত্রীমহাশয়ের ভ্রাতৃ বিশ্ববিশ্বত সঙ্কটজ্ঞ ও ঐতিহাসিকের এই দিকে দৃষ্টি আছে দেখিরা আমি বিশেষ আনন্দিত হই। তারপরে, কয় বৎসর ধরিয়া ইন্সটিটিউটে আমাদের চেষ্টার ফলে, এই বিশ্বের বাহিরেও লোকের চেনা নড়িল, এবং কয়েক যুগোদ্ধাবাহী বা দেশকাহন্যবাহী পরিচ্ছদে নারিকের পাত্রপাত্রীগণকে সজ্জিত করার প্রয়াস বাঙ্গালা রম্যকে সাধারণ বস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল।

এসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়িবার কালে শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষ চট্টাচার্য আমাদের সমসাময়িক ছিলেন—তিনি বি এন্সসি পড়িতেন, তবে স্বল্প বয়সের মারফৎ তাঁহার সহিত পরিচয় ঘটে। ১৯০১ বঙ্গাব্দে বর্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনীতে শাস্ত্রীমহাশয়কে একই কাছে থাকিয়া দেখিবার সুযোগ হয়। ১৯১৪ সালে বিহারেই শাস্ত্রীমহাশয়ের সহিত আমার আত্মীয়তা ঘটে, কিন্তু তখনও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়নি। দুই বছর হইতে তাঁহার নানানুযী ঐতিহাসিক প্রত্ন শ্রদ্ধা পোষণ করিতাম, এবং বিশেষতঃ তাঁহার অননুগ্রহধরী বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের আদর করিতাম।

১৯১৬ সালে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রীয় প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্ম বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস বিষয়ে গবেষণার একটি প্রস্তাব দেই, ও সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রস্তাবটি আবেদনকারী রীতি ও নির্দেশনায় বাঙ্গালা উচ্চাঙ্গ-তত্ত্বের উপরে একটি প্রবন্ধ লেখ করি। পূজনীয় স্বর্গীয় রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী প্রকাশের ও শাস্ত্রী মহাশয় এই ছইজন আমার প্রস্তাব ও প্রবন্ধের যোগ্যতা বিচার করিবার জন্ম প্রকৃতি নিরুত্ব হন। এইরূপে এই ছইজন মনীষীর সহিত আমার নিকট পরিচয়ের সুযোগ হয়। আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা এই যে, মাতৃভাষার ইতিহাস আলোচনার এই-ছইজন আচার্য্যের নিকট আমার প্রথম প্রয়াস সর্বপ্রথম স্বচ্ছন্দে লাভ করে, এবং ইহাদের নিকট আমি নানা বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ ও উৎসাহ প্রাপ্ত হই। সাহিত্য-পরিষদের সদস্য বিহার ও আমি নানা বিষয়ে ইহাদের সহে ও অনুরোধে পাত্র হই।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস প্রণয়নে শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীকৃষ্ণ বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়-কর্তৃক আদ্যত উপাদান বস্তু

কার্য্যকর, ও উপযোগী হইরাছে, তত্বেই আর কিছুতে যেন নাই। ১৯২৩ সালে পরিণত হইতে-শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'হাজার বছরের পুরাতন বাঙ্গালা ভাষার বৈজ্ঞানিক ও দোহা' এবং 'ঐ মানে' শ্রীকৃষ্ণ বসন্তরঞ্জন তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশ করেন। এই দুই বইয়ের আলোচনার বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস পাকা বুনিরান পাইল, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের পত্তন করা সম্ভবপর হইল। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র চতুর্থ পত্রটিতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে স্বাকার করিতে হয়—সার্বভৌম প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্ম যে চারিটি গবেষণায় প্রবন্ধ দিতে হয়, তন্মধ্যে অজ্ঞতমটি ছিল এই চতুর্থ পত্রের ভাষা অবলম্বন করিয়া। ইতিমধ্যে আমি সরকারী গৃহি পাইয়া ইউরোপ যাত্রা করি, এবং তিন বৎসর ইউরোপে অবস্থানের পরে ১৯২২ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমার বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ক বই খানির মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ করিয়া দেই। শাস্ত্রী মহাশয় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাক্ষ্যত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া গিয়াছেন। উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি কলিকাতার কিরিয়া আসিলেন, তখন আমার বই ছাপা চলিতেছে। এশিয়াটিক সোসাইটিতে শাস্ত্রী মহাশয় একজন অধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত হইলেন, আমিও উক্ত সোসাইটিতে ও নির্দেশনায় বাঙ্গালা সঙ্কট বন্দনীর হইলাম। পরিণত ও সোসাইটি উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে শিখার সুযোগ হইল এবং কুটুম্বিতা-স্বত্বের যোগেও তখন এই ঘনিষ্ঠতাকে দৃঢ় করিতে সাহায্য করিল। স্বর্গীয় রাগলালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ বন্ধুগণের সহিত বা এটি গিয়া কতজনিক কত বিষয়ে আলোচনা ফল নানা দিষ্ট দিরা তাঁহার নিকট কত নূতন জ্ঞানিত পাইয়াছি, তাঁহার ব্যক্তিত্বের কত বিভিন্ন দিষ্ট আমাদের নিকট আপনাকে সুপ্রকাশিত করিয়াছে। ১৯২৬ সালের শেষভাগে তিন বৎসর ধরিয়া মুদ্রণকার্য্য চলিবার পরে আমার origin and development of the Bengali language প্রকাশিত হইল। তখন মনে জ্বল হইরাছিল যে এই বই জ্ঞান আন্তর্য্যে দেখিতে পারিলেন না, এবং পূজনীয় ত্রিবেদী-মহাশয়ের

নিকটে ইহাকে আমার প্রকার নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিতে পারিলাম না। শাস্ত্রীমহাশয় আমার বই পাইয়া এবং তাহা দেখিয়া এত পুষ্টি হইয়াছিলেন যে, তাহার আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্ম তাঁহার পুত্রের একদিন একটি অপরাহ্ন-সময়লেন কতকগুলি মনীষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহ্বান করেন ও আমার অভিনন্দন করিয়া তাঁহার শুভকামনা ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করেন। প্রাচীন বিভার ও বিজ্ঞান-গানার, এবং ত্রাক্ষ্যোপ-প্রভৃৎসক শাস্ত্রীমহাশয়ের এই অভিনন্দন এক দিকে যেমন তাঁহার গুণাবলী ও পিতৃহানীর অহুগ্রাহীদের প্রতি তাঁহার সম্বন্ধে ও উপচিকিৎসার প্রকৌশল স্বরূপ হইয়া তাঁহারই চরিত্র-মহাশ্রমে প্রকাশ করে; স্বাভাবিক ইহাও প্রতীয়মান দৃষ্টিতে আনুদিকের প্রচেষ্টার সাক্ষ্যত হইতে পারি। বিভালাচনার যাবদাহিকতাকেও প্রকাশ করে। শাস্ত্রীমহাশয়ের মত জ্ঞান-পরিষ্ঠ পিতৃভাগ্যের আশীর্বাদ তাঁহার পদগুলির সহিত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি, এবং তাঁহার বক্তৃতা-প্রণোদিত আগ্রহের দ্বারা আমার চেষ্টার সাক্ষ্যত স্পন্দিত হইয়াছে মনে করি।

শাস্ত্রীমহাশয় আমাদের 'বৃহত্তর ভারত পরিষৎ'-এরও সভাপতি হইয়াছিলেন এবং মুদ্রণপাঠ্য তিনি এইরূপে উক্ত পরিষদের গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। এই পরিষদের দ্বারানির্ধারণক সমিতির অধিবেশন তাঁহারই বাটতে হইত। এশিয়াটিক সোসাইটি, সাহিত্য-পরিষৎ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৃহত্তর ভারতীয় পরিষৎ—এই চারিটি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় তিনি দেখিতেন, এবং সকল বিষয়েই তাঁহার উজ্জ্বল ও তাঁহার আশাধারণ ব্যক্তিত্ব দেখিরা আমরা অবাক হইয়া যাইতাম। সঙ্গে সঙ্গে ছিল তাঁহার একটি সদাঙ্গাজ্ঞত রসবোধ, এবং তাঁহার দীর্ঘায়ু চিত্তপ্রসন্নতা। এই উভয় চিত্তবৃত্তি মিলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সকলের পক্ষে ঐশ্বর্য্য ও যত্নবৃত্তার মনোমগ্ন হইয়াছিল। তিনি নিজে অস্বাস্থ্যবশী ও কর্মনিপুণ ছিলেন বলিয়া, গবেষণা বা অজ চর্চায় যাহারা শ্রমকাতর ছিল, তাঁহাদের তিনি অনেক ও প্রকার প্রশ্ন দিতে পারিতেন না। 'চলানী দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না'—বিবেকানন্দের এই উক্তিই সারবস্তু তিনি মানিতেন, এবং বাহাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের দ্বারা হইতে যে তাহারা চলানী দ্বারা তাঁহার নিকট

হইতে কিছু আশ্রয় করিয়া নিজ বিশা জাহির করিতে চাহে তাহাদের তিনি কিছুতেই আমল দিতেন না। কিন্তু বাহাদের প্রতি তাঁহার প্রত্নাবোধ জন্মিত, কথা-প্রসঙ্গে নানা বিষয়ে অসকোচে তাঁহাদের নিকটে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিতেন।

শাস্ত্রীমহাশয় ছিলেন সেই দলের মনীষী মহাপুরুষ, বাহাদের মধ্যে রসজ্ঞানী দ্বিবা প্রতিভা ও বাস্তবালোচনামূলক অজ্ঞত অস্বাভাবিক একধারে বিদ্যমান। এক দিকে তিনি কবি-প্রকৃতির সাহিত্য-প্রভা—তাঁহার 'বাস্তবিক জয়' ও তাঁহার উপন্যাসাবলী তাঁহার প্রমাণ; এবং অন্য দিকে তিনি সমালোচক, তিনি ঐতিহাসিক, তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক। তাঁহার ভাবুতা ও তাঁহার কল্পনাশক্তি বাঙ্গালা ভাষাকে 'ছবিপাত্র' অধম রয় দান করিয়াছে—'বাস্তবিক জয়' ও 'বৈদ্যের মেয়ে'। 'বঙ্গবিদ্য পত্রিকা'-এর লেখক প্রতাপচন্দ্র বোস, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রাধাগোপাল, এবং শাস্ত্রীমহাশয়—ইহারা বাঙ্গালীকে তথা ভারতবাসীকে কখন এবং বিজ্ঞান উভয়ের সন্মেলনের দ্বারা প্রাচীন জীবনের কতকগুলি স্মরণের আলোখা আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বাঙ্গালীর আধুনিক সামাজিকতার আচরণ ভেদ করিয়া তাহার সামাজিক পরিহিতির সমস্ত বাহির করিয়া গিয়াছে—বাঙ্গালার প্রজন্ম বৈশিষ্ট্যের অবধান আবিষ্কার করিয়া আমাদের সামাজিক ইতিহাসের জটিলতার দমাধানের পক্ষে এক প্রকৃষ্ট উপায় দেখাইয়াছেন। অপর, এই রূপে বাঙ্গালীর জাতি ও সমাজের রক্তোদ্ভাবনেও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর ধর্ম ও ভারতীয় উৎপত্তির মটকাটির পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহার 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' চিরকালের জন্ম স্মৃতিভাজিত থাকিবে। এতদ্বিধ, বাঙ্গালীর প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার তাহাকে একজন পথিকৃৎ ও পথপ্রদর্শক বলা হইতে পারে—বাঙ্গালীর প্রাচীন-সাহিত্য-সম্পদের কথা আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে তিনিই প্রথম শুনাইয়াছেন, এবং প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বাহাদের অনুপ্রাণনা এখনও পর্যন্ত কাঁচ করিতেছে, তাঁহাদের অজ্ঞত মৈথিল কবি বিভাগতির ঐতিহাসিকতা ও ব্যক্তিক সম্বন্ধে অজ্ঞান ও অজ্ঞতক্তি প্রবৃত্ত অজ্ঞতমিহারা ও মধ্যে একমাত্র আলোক বিদ্যাপিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা



ভাষার শ্রেষ্ঠ গদ্য কবি ও ঐতিহাসিক কাহিনী লেখক, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান পরিচায়ক, বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপের আবিষ্কারক, প্রাচীন বাঙ্গালার রাজনৈতিক তথা কৃষ্টিবিষয়ক ইতিহাসের অজুত প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গালীর ধর্ম এবং জাতি ও সমাজ-সম্বন্ধে আলোচনার নূতন পথের প্রদর্শক—এত দিক দিয়া বাঙ্গালী জাতির আত্মজ্ঞানের পথে সহায়ক হইতে পারিয়াছেন কোন পণ্ডিত? ইহা ব্যতীত, সংস্কৃত সাহিত্যের ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনার ও শাস্ত্রীমহাশয়ের কৃত্তিবিশ্ব আসাধারণ। অথবাযেবর সৌন্দর্যময় কাব্য, অথবাযেবর বুদ্ধচরিতের উত্তরাংশ, সম্যাকরমসিকৃত রামচরিত, এবং নেপালে প্রাপ্ত অন্য নানা পুস্তক—এগুলির, ও নানা প্রাচীন লেখের আবিষ্কার ও সংস্করণ করিয়া প্রকাশ করা, সংস্কৃত সাহিত্যের তথা ভারতের ইতিহাসে শাস্ত্রী মহাশয়ের চিরসঙ্গীত।

শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোহানে তাঁহার ক্ষতিকোঙ্জন মনীষার নানা বিকাশের কথা মনে হয়। তিনি ছিলেন যেন এমন সাধক যুগের ব্যক্তি, আধুনিকের তুলনায়

যেন যে যুগে সবই বৃহৎ, সবই অতিকার ছিল, যে যুগে মানুষ ঠৈকি, নৈতিক ও আর্থিক শক্তিতে আমাদের অগ্গম বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাঁহার পরলোকগমনের রাতেজ্ঞান, মাইকেল, বাল্মিকি—ইহাদের কালের সহিত যে শেষ প্রাপ্তের যোগ ছিল তাহা তিরোহিত হইল। বাঙ্গালা সাহিত্যিক জগৎ হ্রদ-সমাজে তাঁহার স্থান পূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার পাণ্ডিত্যাদি গুণের কথা সকলেরই মনে হইবে; কিন্তু তাঁহার বাক্যি সাম্রাজ্য ও ব্লেহভাষের সৌভাগ্য আমার হইয়া ছিল বাক্যি এবং তাঁহার নিকট হইতে কেবল অনাবিল ও অবিয় প্রীতিমিশ্র আচরণই পাইয়াছিলাম বলিয়া, তাঁহার অবস্থানে তাঁহার সেই দৃষ্ট মধুর ব্যবহারের ও হৃদয়কৌতুক-ময় আগ্রহের কথা আজ আমার বিশেষ করিয়া মনে হইতেছে। তাঁহার দৃষ্টিকে তাহার নিম্নরূপ কাণ্ড চিরকাল মম করিয়া রাখিব। কেবল প্রার্থনা এই যে, যেন তাঁহার আত্ম আমাদের কর্মবুদ্ধিকে প্রোদগিত করিয়া ও আমাদেরই মম করিয়া যেন চিরকালের জন্য আমাদের সমক্ষে বিদ্যমান থাকে।

৩০ অগ্রহায়ণ ১৩০৮।

\*\*\*

## রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ

ঐয্যারীমোহন সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনায় ভারতবর্ষের যথার্থ মূর্তি ও প্রকৃতি,—এক কণার, ভারতবর্ষের স্বরূপ,—প্রথম মনীষাবলে উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। সমাজে, ধর্মে, রাজশাসনে ভারতের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা তিনি কবিতায়, প্রবন্ধে, গ্রামে, উপজামে, নাটকে প্রকটিত করিতেছেন। আমাদের এই কর্মক্ষম কালের বিপুল বিক্ষেপের মধ্যে বসিয়া তিনি গভীর-ধান্যদৃষ্টির দ্বারা ভারতসত্যকে উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। আমাদের আলোচ্য “গোরা” উপন্যাসে আমরা এই

ভারত-সত্য-সাধক, ভারত-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে চোঁড়া করিব।

“গোরা” পড়িতে পড়িতে মনে হয়, ভারতবর্ষের প্রাচীন উদার সনাতন বৈদ্যন্ত-ধর্মই যবির আদর্শ ধর্ম। সে, যা জাতিভেদ ছিল না, সম্প্রদায়ের গভী ছিল না বিচারবিহীন ছিল না। ভারত কোনো জাতিকে, কোনো সম্প্রদায়কে অম করিয়া আপনাদের নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। পৃথিবী বেকোন জাতি বধনই তাহার বন্ধে আশ্রয় লইয়া ভারত সমান প্রেমে তাহাদিগকে পালন করিয়াছে, শাসিত

হান করিয়াছে। চরদ্বীনই ভারতবর্ষের এই বিশ্বনাথকর কল্যাণময়ী মূর্তি।

ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা যে ঘোরতর অনিষ্টকর, তাহা যে মাঘয্যকে মাঘযের নিকট হইতে নির্ধর্মভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, তাহা কবি বহু স্থলে বর্ণিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্মে যে ভারতের সনাতন ধর্মেরই প্রকৃষ্ট বিকাশ, এবং আধুনিক কালের হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের বিভেদ-বোধ যে ঘোরতর অনিষ্টকর পরেনাথের চক্রান্তে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। পরেনাথ, হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের তথাকথিত বিভেদকে অস্বীকার করিয়া এক অপূর্ণ সমন্বয়ের মূর্তিতে ধাইয়া আসছেন।

গোরা মাঘযী ভারতবর্ষের ভালমন্দ বিভেদ-নিবেশ সমস্তকে লইয়াই ভারতকে ভালবাসিত। তাহার বেশপ্রেম স্বপ্ন উগ্র তাহাতে বিচার-বিবেচনার স্থান ছিল না। গোবীর গোঁড়ামি প্রবল, কিন্তু সে গোঁড়ামির মধ্যে যে একটা অজল নিষ্ঠা ছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইয়েরেজের শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা আপামর সাধারণ হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিয়াছি। আপনাদিগকে দূরে রাখার এই অনিষ্টকর অভিমানে গোরা ছুই পায়ে দলিত করিয়াছে। অনিশ্চিত ও শিকিত যোকের পরস্পর মিলনের জন্য সে ব্যাকুল। আধুনিক কালে যে অসহযোগ প্রচেষ্টার ভেদী-নিমানে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত রণিত হইয়া উঠিয়াছিল, এই গোরা-চরিত্রে সেই অসহযোগ মনের বীজ নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। অম্বলাভয়ের সঙ্গে, নৈমন্ত্য সাধন করিতে পারিলে যে তাহাদিগকে শক্তিহীন করা যায় তাহা গোরা বহু পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছে। গোরা স্বদেশপ্রেমের প্রথম অধিশিখার বেশের সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত ক্রীড়া দৃঢ় করিয়া ফেলিতে চায়। সে বলে দেশকে সাংগোষ্ঠিত ও উন্নত করিতে হইলে, আগে দেশকে ভালবাস, আগে দেশের লোককে আত্মীয় কর; তাহার পর ধীরে ধীরে প্রীতিবিশ্বাসে তাহার আত্মজ্ঞান জাগাইয়া দাও। সে আরো বলে, দেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রেমের গোঁড়ামির প্রয়োজন; উন্নতি সাধিত হইয়া গেলে সেই গোঁড়ামিকে বিচার-বিবেচনার সত্ত্বত করা, তাহার পূর্বে নহে।

বিনয় গোবীর সমক্ষে ভারতবর্ষের যে বিচারবিভেদহীন কল্যাণময়ী চিত্রিত করিত, গোরা যে তাহা বৃষ্টি না, এমন নহে। কিন্তু সে বোধকে গোরা দাবাইয়া রাখিত। সমস্ত ভালমন্দের মধ্যে ভারতবর্ষের সত্য রূপটি কি তাহা জানিয়াও বৃষ্টিয়া লইবার পর ভারতের মন রূপ তাহার চিত্রে সহজভাবে হইয়া উঠিলে, ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস। বিনয়ের সমন্বয়-করনা তাহাকে চকল করিত বটে, কিন্তু সে চাকলা তাহাকে অধিকার করিতে পারে নাই।

বিনয় বিশ্বপ্রেমের মহান আদর্শে চকল, আর গোরা স্বদেশপ্রেমের উগ্রভাৱে গির্জা। বিনয়কে বৃষ্টিতে হইলে গোরাতে অন্ত্রক্রম করিয়া বাইতে হইবে। স্বদেশপ্রেমের মধ্য দিয়াই বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধি।

এই বিনয়-চরিত্র উপজামের মধ্যে মহাশয়ের কাজ করিয়া চলিয়াছে। সে ব্রাহ্মদের নিকট বলিতেছে, দেশকে যথার্থ ভালবাসিতে হইলে দেশের প্রথা-আচার সমস্ত বৃষ্টিয়া তাহার মধ্যে বাহা বন্ধনীয় তাহা বন্ধন কর, বাহা গ্রহণীয় তাহা গ্রহণ কর। আবার গোবীর নিকট সে বলিতেছে, ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে থাকিয়া প্রথা-আচারকে অজ্ঞান বলিয়া পরিবর্তনের চেষ্টা না করিলে দেশের উন্নতি অসম্ভব।

গোরা যে ভারতবর্ষকে ভালবাসিত, তাহা সম্ভারমণ্ডিত, আপন-মীমা-নিবন্ধা ও স্বধর্মগোবরা। আর বিনয়ের ভারতবর্ষ উদারতাময়ী বিভেদহীন বিশ্বনাথকর। গোবীর প্রেম উগ্র বিবেচনাময়ী। আর বিনয়ের প্রেম শান্ত, গভীর, তাহাতে জ্ঞানের সান্ত্বনা আছে। মোট কথা, প্রথমে আমাদের দেশে স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য আমরা দেখিয়াছিলাম তাহা গোরা-চরিত্রে “অভিব্যক্ত। কিন্তু যে প্রেম ভারতবাসীর আত্মবাসী হইয়া উচিত তাহা বিনয়ের মধ্যে পরিস্ফুট।

পরেনাথ ও অননময়ী ভারতভিত্তির ওঁদার্যের প্রতিমূর্তি; ভারত সাধনা বাহা পড়িতে চাহিয়াছে তাহার দ্রিক তাহাই। যে সমন্বয় প্রচেষ্টার ভারতবর্ষ যুগে যুগে বিশেষীকৃত আপনাদের করিয়া লইয়াছে, পরেনাথ জীবনে তাহা প্রকাশভাবে অম্ভব করিয়াছেন। হিন্দু ও ব্রাহ্ম এই দুইটা সমাজের মধ্যেই তিনি সেতুর মত বিরাজ করিতেছেন।



আনন্দময়ী ভারতবর্ষের কল্যাণচিহ্ন। তাঁহার বিচার নাই; তিনি ভেদজ্ঞানব্রহ্ম। ব্রাহ্ম, বৃষ্টি, ন, মূলমান সমস্তই তাঁহার বৃক্কের ধন; কাহাকেও তিনি পর করিতে চান না। তাঁহার গৃহে সকলেই আশ্রয় পায়, সকলেই যেহে লাভ করে। জীৱান গোরাও তাঁহার কোলে সহজেই স্থান পাইয়াছিল। গোরা একদিনের জন্তও বৃষ্টিতে পানে নাই যে, সে আনন্দময়ীর গর্ভভাত সন্তান নহে—আনন্দময়ীর যেহে এমনই বিপুল ছিল।

গোরা তাঁহার অক্লান্ত প্রেমবলে এবং সেবা ও ত্যাগের দ্বারা যেদিন ভারতের যথার্থ রূপ উপলব্ধি করিল, যেদিন সে জানিতে পারিল যে বিদেশী অথচ ভারতবাসীর গৃহে সমস্ত লালিত, সেদিন তাঁহার চিত্ত ঔপায়সে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া পরেশবাবুর নিকট যাইয়া তাহাকে বলিল—“আমাকে আশ্রয় শিখা করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মত দিন, যিনি হিন্দু-মুসলমান দুইজন ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দু দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা!”

আনন্দের আবেগে গোরা আনন্দময়ীর কাছে গিয়া বলিল—“মা, তুমিই আমার মা! যে মাকে বুঁজে বেড়াইতুম তুমিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, ভিচার নেই, দ্বন্দ্ব নেই—সুখ তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ!”

বশেষপ্রেমের মূল ও পরিণতির দ্রষ্টা বাণী গোরা উপভাসে প্রকৃত্ত রহিয়াছে। পশ্চিম দেশ হইতে আমরা যে বশেষপ্রেম লাভ করিয়াছি তাহা গোয়ার প্রাথমিক বশেষপ্রেমেরই অন্তর্গত; তাহা উগ্র এবং প্রবল। ভারতের মাতাতে এই বশেষপ্রেমের স্থান নাই। ভারত আপনাকে ভালবাসতে গিয়া ‘আননকে ভালবাসিয়া’ ফেলিয়াছে। তাহার বশেষপ্রেমের মধ্যে বিশ্বপ্রেম অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। যে প্রেম গোয়ার মূর্ত তাহা গোরাতেই পর্যাবসিত হইল না। সে প্রেম পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর চরিত্রে গয়া পরিণতি লাভ করিল। সে প্রেম উগ্র ও প্রতিকূল রহিল না, শান্ত ও উদার হইল। এইখানেই

ভারতচিন্তের বৈশিষ্ট্য, এইখানেই ভারতবর্ষ। পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশ হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার সভ্যতার মধ্যে কল্যাণের বীজ নিহিত আছে।

রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলা হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষের বিবরণ, ভারতবর্ষের মানবপ্রতি উপলব্ধি ও প্রচার করিতে পারিয়াছেন বলিয়াও রবীন্দ্রনাথের “বিশ্বকবি” অথবা লাভের সার্থকতা। তাঁহার বশেষের চিত্ত বিশ্বমানবের প্রতি প্রীতি দ্বারা দ্বিষ্ট, এ বোধ লাভ করিয়া তিনি বিশ্বমানবের সঙ্গে তাঁহার সংযোগ অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিয়াছেন। বিশ্বমানবের সহিত ভারতের যোগস্থলের মূল তিনি ধরিতে পারিয়াছেন।

আমাদের জাতীয় জ্ঞানোন্মেষ ও শক্তি-উন্মেষের দিনে রবীন্দ্রনাথের এই ভারতবর্ষের উপলব্ধি যে অশেষ মূল্যবান, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে, এই ভারত-সত্য-সাধক কবিকে বুঝিবার দিন এখনও বোধ হয় আমাদের আসে নাই। ইউরোপের সংঘাত এখনও আমাদের উপর এতই প্রবল, তাহার ইচ্ছাশেষে আমরা এখনই মুক্ত যে, স্বদেশের দিকে হুবিচারের দৃষ্টিপাত করিতে আমরা এখনও পারিতেছি না। যেদিন আমরা ভারতের প্রাণপতি ও চিত্তরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব, যেদিন আমরা ভারত-ধর্মের বিশ্বমুখিতার পরিচয় লাভে সমর্থ হইব, সেদিন আমরা এই ভাবিয়া বিম্বিত হইব যে, যেমন করিয়া এত পূর্বে এত বিবেকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এমন গভীরভাবে স্বদেশকে অন্বেষণ করিতে পারিয়াছিলেন। তখনই আমরা বুঝিব যে, ভারতবর্ষের তথা হিন্দু ধর্মের পুনঃস্থাপনের কার্যে রবীন্দ্রনাথ কি অসামান্য সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ধানেন; পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল আলোড়নে আমাদের সমাজের ভিত্তি অবশি কাঁপিয়া উঠিয়াছে, এবং ভাঙন-গড়ন হইবে যথেষ্ট। এই আলোড়ন-মুক্তিতে বশেষকে তাহার নিজস্ব রূপ, নিজস্ব পতি, নিজস্ব চরিত্র ও নিজস্ব স্বতন্ত্র্যের কথা তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। পশ্চিমের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ভারত লুপ্ত, কিন্তু নিজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা যেন সে না হারায়। এই বাণীই গোরা উপভাসে আজ্যসে ইদিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

গোরা তাঁহার ব্যাকুল প্রেমকে পরেশবাবুর শব্দ

মাগমায় ও আনন্দময়ীর উদার কল্যাণে নিমগ্ন করিয়া দিল। কর্মময় প্রকৃতিটা আশ্রিয়া ধ্যানময় প্রাচ্যের শরণ লইল। কিশুতা শান্তির চরণে অবনত হইল। ভেদবুদ্ধি জ্ঞান্যের মহিমায় দ্বিষ্ট হইয়া উঠিল।

যে মহামানব, যে মানবকল্যাণকামী স্থবি ভারতের এই বিশ্বপ্রীতির বার্তা উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহারই মৈত্রীগাথা আবৃত্তি করিয়া আমরা যেন বলিতে পারি—

“এস হে আর্ষা, এস অনার্য,  
হিন্দু-মুসলমান।

এস এস আজ তুমি ইংরাজ,  
এস এস খৃষ্টান।

এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি’ মন,  
ধর হাত সবাচার;

এস হে পতিত, হোক অপনোত  
সব অপমান ভা’।

মা’র অভিধেকে এস এস, তরা,  
মদনযত্ন হানি যে তরা

সবার পরশে পরিব্র-করা  
ঔর্ণবীণারে

আজি ভারতের মহামানবের  
মাগরতীরে।” \*

• রবীন্দ্র-পরিষদের ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬এর বৈঠকে  
পঠিত।

## রবীন্দ্রনাথ

ত্রীশৈলেশ্বরকৃষ্ণ লাহা

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য জগতের এক অপূর্ণ বিষয়।

কবিমাত্রেরই নিজের ক্ষেত্র বাছিয়া লয়। নির্ধারিত ক্ষেত্রে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্রাজী লাভ করে। শব্দকে সম্বন্ধ করিয়া বিশেষ সীমার মধ্যে আপনাদের সাধনাকে সফল করে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক কোঁহুল অনন্ত। রূপকথার তিনি রাজপুত্র। পক্ষিরাণ্ডে চড়িয়া তিনি সাহিত্যের ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়াছেন। তবুও তাঁহার আশা মিটে নাই। জীবন-প্রভাতে তিনি দিখিছয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। সাহিত্যের সকল দিকে তিনি রাজ্য-বিস্তার করিয়াছেন। আজ তিনি সন্ন্যাসী।

ভারতের গৌরবের যুগে এখন কোঁহুল আর এক মহাকবি মধে দেখিয়াছি। এখন আমরা বাহাকে সাহিত্য বলি কালিদাসের কালে কাব্য বলিতে তাহাই বুঝাইত।

সম্বন্ধে গজও ছিল, নাটকের কথাপঞ্চন গজই হইত; কিন্তু গজের অনেক কাজ ছন্দোময় বাক্যেই চলিয়া যাইত। এই কাব্য অথবা সাহিত্যের সর্ব অঙ্গ কালিদাসের প্রতিভার প্রদীপ্ত।

যুগান্তরে কালিদাসের মন-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ।

‘রবীন্দ্রনাথের রচনার আলোচনা’ করিতে কতবার বসিয়াছি, কতবার ছাড়িয়া দিয়াছি। কোন কথা রাখিব কোন কথা বলিব? কাব্য না গজ-সাহিত্য না গান? অপরিমিত দানে সাহিত্যের সর্ব বিভাগ সমুচ্চ করিয়া তুলিতে তাঁহার মত আর কে পারিয়াছে? রবীন্দ্র প্রতিভার এই বিরাট ব্যাপকতার মধ্যে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে।



উপভাস, ছোটগল্প, কবিতা, প্রেমসন, রসরচনা, অমণ-কাহিনী, জীবন-কথা, শব্দ-তত্ত্ব, বর্ণনা-তত্ত্ব, বিভিন্ন প্রাঙ্গণ, বিবিধ প্রবন্ধ, আলোচনা, সমালোচনা—পুস্তক-সাহিত্য এমন কিছু নাই যাহা না তাহার সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন অঙ্গ-বিশিষ্ট হয়। উত্তরাধিকার, ষণ্ডকাব্য, নাট্যকাব্য, কথাকাব্য, গীতিকাব্য, গাথা—এক মহাকাব্য ছাড়া নৃতন পুরাতন সকল বিভাগেই তাহার প্রতিভা নব নব সৃষ্টি করিয়াছে।

অর্দ্ধ শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্যের সূত্র প্রত্যক—রবীন্দ্রনাথ। একাধা বঙ্গ-সম্রাজ্ঞের সূর্য্যোদয় প্রভাবের প্রভাবে বাংলা-ভাষা ও বাংলা-সাহিত্য নব-কল্যণের পরিগ্রহ করে। সেদিন বঙ্গবাণীর মন্দিরে অচিহ্নিত চাক্ষুণ্য এবং অসুতপূর্ণ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বঙ্গ-প্রতিভার তড়িৎস্পর্শে জীবনে জীবনে চিন্তার নূতন দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই অপূর্ণ সমারোহের মধ্যে নব-যুগের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেদিন এক কিশোর কবি মন্দিরে এক প্রান্তে নূতন হুরে বসি বাজাইতে শুরু করে। তুরী-ভরতীর গাভীর নিনাদে সে হুর তাঁল করিয়া শোনা যায় নাই বটে, কিন্তু বঙ্গসম্রাজ্ঞের চির-সম্রাণ কর্তে সেই নূতন হুর ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় নাই। বাংলার সাহিত্য সম্রাট, সেদিন তরুণ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে নিজ কণ্ঠের মাথা পরাইয়া দেন।

বাংলার নবজন্মভাণ্ডের প্রেরণাময় যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। ঠাকুর পরিবারের কণ ও কলার অমূল্যন, দেশ-প্রেম, পুরাতন-স্মৃতি এবং নবীন সত্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ফেনিলোজ্জস্ম কাটিয়া গেছে। কাল-প্রভাবে ডিরোজিও-নিচয়ের দারুণ অব্যর্থ শাস্ত হইয়া আসিয়াছে। সামাজিক আন্দোলনের বিদ্রোহাগর, ধর্ম্মকে কেশবচন্দ্র, রাজনীতি-ক্ষেত্রে হুরেন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সিংহাসনে বঙ্গসম্রাজ্ঞ—এমনি দিনে রবীন্দ্রনাথের সান্নাৎন শুরু হয়। ‘বিশ্বভূমি’ চিন্তাধারার ভিতর দিয়া কবির কিশোর-চিত্ত গড়িয়া উঠিল। দেশের সকল আন্দোলনে তাহার অসুতপূর্ণ-প্রাণ অন্তরংগচর্চাধীন পাড়া দিয়াছে। বাংলা-বৈশাখের নব-পরিপাণ্ডব জন্ম যাহা আরম্ভ করিল, পরিণত রবীন্দ্রনাথ তাহা সহজ শুণ্ডে ফিরাইয়া দিলেন। এই ঐশ্বর্য্য-শালী জন্মের সঙ্গ যেন অপূর্ণ, দান তেমনি অসামান্য।

বাংলা চতুর্দশ শতকের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গসম্রাজ্ঞ

লোকান্তর গমন করিলেন। তাহার পরেই রবীন্দ্রনাথের আসন্ন। ইংরেজী বিশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের দ্বারা নিরূপিত। বঙ্গসম্রাজ্ঞের পরেই রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ প্রকাশ—সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

বঙ্গসম্রাজ্ঞের মায়াময়ে সজীবিত হইয়া উপভাসের যে কল্পমূর্ত্তি একান্তভাবে বাঙ্গালীর মনোহরণ করিল, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেই উপভাস-সাহিত্যেই নূতন শ্রী এবং নূতন হুর প্রদান করিল। ‘চোবেব বাগি’, ‘গোরা’, ‘ঘরে বাইরে’ কথা-সাহিত্যের নূতন নূতন দিগ্ খুলিয়া দিল। নূতন পৃথক পুরাতনের পরিচালনার যে শক্তির প্রয়োজন তাহা অসামান্য। এই অসামান্যতা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার লক্ষণ।

নূতন সৃষ্টি প্রতিভার মৌলিকত্বের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ ও অ-একটি ছোট-গল্প রচিত হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত যে পরিচিত সেই জানে ছোট গল্পের প্রবর্তনা ও প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ হইতে। বাংলার মনে ছোট-গল্প কতগণি দান অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহার জন্ম অস্থানময় আশ্রয় নাই হয় না, বাংলা মাসিকের পাড়া উড়ই-সেই মজরে পড়ে। ইহার যে রূপ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, আজ পর্যন্ত তাহাই ছোটগল্পের আদর্শ হইয়া আছে। ‘ইংরেজী সাহিত্যও ইহার তুলনা নাই। ‘অভিধি’, ‘কৃষিত পাবা’ ‘মেঘ’ ও রোহের মায়া কাটাইয়া ছোট-গল্পের নূতন ধারা প্রবর্তন করিতে অল্প কাল মাগিবে এবং তখনও লোকে এই গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে আমাদের হুরের জীবনে ফিরায়া আসিয়া যত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্য বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ আলোচিত হয় নাই। এমন আল বিবরণই আছে। সাহিত্য ও সামাজ্যের সামাজিক নূতন আলোক-সম্পাতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাবে, ভাষায়, বিষয়-বৈচিত্র্যে ও সকল আলোচনা ক্ষেত্রে প্রবন্ধ-সাহিত্যও রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ।

‘সাহিত্যের সকল বিভাগ এমন ভাবে উজ্জ্বল করিয়া সৃজিতে জগতের আর কোন সাহিত্যিক পারিয়াছে কি না সন্দেহ। এই বিষ্টি দিয়া তুলনা করিলে প্রতীচ্য-জগতে শুণ্ডগোষ্ঠে অথবা ভিত্তির ছপোর কথা মনে পড়বে। আর এক দিকে তিনি অসুতপূর্ণ। আমি রবীন্দ্রনাথের গানের কথা বলিতেছি। এমন হুরের স্বরধ্বনি-বহাইতে জগতের আর কোন কবি পরিয়াছে? এখানে বেন শেখী ও প্রোগ-নারের গতি একত্রে মিলায়ে।

রবীন্দ্রনাথ কবি। তাহার প্রকৃতি কবিপ্রকৃতি। বিপ কবিহাকে কবিকপেই বরণ করিয়া নইয়াছে। আজ জীবনে জীবনে তাহার কবিতার কলঙ্গল অপূর্ণ পাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। যে সৌন্দর্য্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সৌন্দর্য্যে দান করিয়া দেশ-প্রকৃতি নবরূপ ধারণ করিয়াছে। দেশের সীমা ছাড়াইয়া সেই জ্ঞান প্রতিভার চর্চা বিপত্তরে দেশান্তরে ছড়িয়া পড়িয়াছে। তিনি বাক্যে নূতন হুর, অর্থে নূতন ইঙ্গিত যোজনা করিয়াছেন এবং ভাবের প্রবাহে অসুতপূর্ণ আবেগ দান করিয়াছেন।

মানবের জীবন বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব হুর, অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তাকে যাবে কিছু দূর ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অথবাহ সম উদ্ভাম হৃদয় গতি।

তাঁহার ছন্দে অপূর্ণ আনন্দ-আন্দোলিত হইয়াছে। স্বর্ণের রহস্ত এবং মর্ত্যের জীবনের মধ্যে তিনি কাব্যের সেতু বন্ধন করিয়াছেন।

ছন্দ সেই অগ্নি সম বাক্যেরে কবির সমর্পণ যাবে চলি মর্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সমরণ শুভতার পৃথিবীরে চানিয়া লইবে উর্দ্ধপানে কবীরে ভাবের স্বর্ণে মানবের দেব-পীঠস্থান।

এই কাব্যের ছন্দ তাহার সকল রচনার মধ্যে চমকিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিশক্তি তাঁহার সকল রচনাকে স্বনবা দান করিয়াছে। যে রস কাব্যজগৎ ধারণ করিয়া বেগ-বিবেশের দ্বারকে আপনায় পানে আকর্ষণ করিয়াছে, সেই রম্যই তাহার সকল সৃষ্টিকে স্বন্দর এবং মহিমায় করিয়া তুলিয়াছে। অসুতপূর্ণ অথবা বহিঃপ্রকৃতি, মাুষের

কাজ অথবা মাুষের মন—চিরদিন তাহার অন্তরে নব নব অসুতপূর্ণ সঞ্চার করিয়াছে। কাব্য গন্ত অথবা গান—যখন বাধা উপস্থিত মনে হইয়াছে তখন তাহার ভিতর সিংহাই সেই সর্বল অসুতপূর্ণ অনবচ্ছাদে প্রকাশ করিয়াছেন। কবির দৃষ্টি দিয়া-সৃষ্টি। সেই দিয়া-সৃষ্টি প্রভাবে সকল রহস্ত তাহার নিকট সরল হইয়া উঠিয়াছে। নানা কঠিন সমস্যা তিনি অতি সহজে সমাধান করিতে পারিয়াছেন।

শুধু মাছুষের নয়, ইংরেজী ভাষার তিনি যাহা দিয়াছেন ইংরেজী সমাজ ছাড়িয়া তাহা সকল দেশের সাহিত্যে ছড়াইয়া পরিয়াছে, আজ বাংলার কবি তাই বিশ্বের কবি। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনার ভিতর দিয়া বাংলা সাহিত্য জগতের ভাবধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পরিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বোকাতর প্রতিভা। অতি সংক্ষেপে শুধু সেই প্রতিভার বিস্তার ও ব্যাপ্তির কথাই বলিলাম। তাঁহার প্রতিভার গভীরতা এবং মনীষার বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে গেলে বিস্তৃত গ্রন্থ লিখিত হয়।

যে সহস্রাধ শক্তির অধিকারী হইয়া রবীন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি কোন দিন ব্যর্থ করিতে দেন নাই। তাহার অক্লান্ত এবং অসামান্য প্রতিভা তাহাকে চিরজীবী করিয়াছে। একান্ত খেলাধুলে কে জানে কবে তিনি এই সোনার ঢাবি ফুটাইয়া পাইয়াছিলেন যাহা দিয়া তিনি সাহিত্যশ্রুতীর সকল গুণ্ধার উল্লেখন করিয়াছেন। প্রতিভার এই সহজ শক্তি বঙ্গল জিনিস তাঁহার সাধারণত করিয়া তুলিয়াছে। অস্তরের পক্ষে যাহা নিভান্ত কঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাহা অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠিয়াছে। এক এক বিভাগে তিনি যে কাজ অবলোকিত করিয়াছেন তাহা করিতে সাধারণ শক্তিশালী লোকের পক্ষে অসীম অব্যবহার এবং নিয়ত সাধনার প্রয়োজন হইত। প্রবীণ বয়সে জিক্ককার এই শক্তির প্রয়োগ করিয়া বর্ণ এবং বর্ণের রচনাও তিনি প্রতিভা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার চিরনবীন কোমলতা তাহাকে নিয়তই নূতনের সন্ধান লইয়া যায়। প্রতিভার নব নবোন্মেষে জগৎ বিম্বিত এবং বিম্বিত চকুতে চাহিয়া থাকে।

এমন প্রতিভার, নিকট মতক আপনাই প্রণত হয়।



## তারপর ?

( গল্প )

শ্রীমধুরকুমার সেন

পাখীর ডাকে মাধবের ঘুম ভাঙে...

রাধলক্ষী সেই কোন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াছে। উঠান ব'লি দিয়াছে, বাসন মাখিয়াছে, ঘরদরজা পরিষ্কার করিয়াছে। রাইচরণ হ'লটা হাত হইতে নামাইয়া রাখিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইতে লাগিল; 'ওরে ও হল, ওঠ, ওঠ, ব্যাধি কখন উঠে গেছে... দাও গো আমাদের চিঠি মুড়ি যা বেচার দাও... দেখে আসি গরু ছুটকে একবার।' বলিতে বলিতে সে গোয়ালের দিকে চলিয়া গেল।

হলধর দাওয়া বসিয়া বিমাইতেছে; ঘুমের রেশ এখনও যায় নাই। বিদ্যুৎগানী পিঠে একটা চিমটা কাটিয়া চাপা কর্তব্যের বলিল, 'এখনও কিছুকি বসে, ঠাকুর যে সেই কখন থেকে ভেঙে ভেঙে হারবার হ'রে গেল।'

হলধর চক্ষু মেলিয়া বিদুর মুখের দিকে চাহিল। বিদুর সারা মুখে ঘুম-জড়ানো, চোখ ছটা বধে মাথা। আধুপাখী চুলের গুচ্ছ হইতে ছুই একটা চূর্ণকুন্তল মুখের উপর ইচ্ছাকৃত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কপালের সিন্দুরের সৌভাগ্য নান...

হলধরের চোখ ছুইটা আপনা হইতেই নামিয়া আসে, কপট গাষ্টীরের সহিত বসে, 'স্বিম্ব না তো করব কি, ঘুমোতে কি নাও সাধ-রাতিরে।'

বিদু কিছুকি করিয়া হাসিয়া ফেলিল, লক্ষ্যায় তার কর্ণমূল পর্যন্ত রাস্তিয়া উঠিল। 'হলধর মুখ-চোখ দুইয়া লালদান কাঁধে লইয়া বাপের সহিত মাঠে চলিয়া গেল। বিদু শান্তভীর ডাকে রাস্তাঘরের দিকে গেল।'

রাইচরণের সংসারটা মোড়ের উপর স্থবের বলা চলে। প্রাচুর্য্য তাহাদের নাই বটে কিন্তু প্রতিদিনকার সাহায্যের জন্তও হাত পাতিতে হয় না। আর একটা স্থবের কারণ, অভাব-বোধ তাহাদের নয়। মাধবের চোখে অভাবের

স্বষ্টি করে জান। সভ্যতার আলো তারা পায় নাই... নিম্নের প্রয়োজনের গভীর ভিতর অপ্রয়োজনীয় কতকগুলি বস্তুর আকাঙ্ক্ষাকে টানিয়া আনিয়া, অভাবের প্রাচীরকে দুর্ব্বল করিয়া ভূমিকে তাহার শিখা নাই।

সমস্ত দিন মাঠে থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই তাহার বাড়ী করে। গ্রামে কিছু দিন হইল একটা যাত্রার দল হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের চার পাঁচ থানা গ্রামের মধ্যে রাউ হইয়া গিয়াছে যে দুর্গাপুজার সময় এই দল বায়োয়াসীতলার সপোরবে ছুইদিন অভিনয় করিবে। হলধর সেখানে একটা সখী-পাট পাইয়াছে। কিন্তু তার গলা খুব ভাল নয়, কয়েকবার হারমেনিয়ারের সহিত গলা মিলাইতে গিয়া বিফল হইয়া—সে শিক্কেদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল যে, 'পাটটা তাকে বদলাইয়া দেওয়া হউক... যা' হউক একটা সৈন্স সামন্ত...'

শিক্কে কিন্তু তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, বলে; 'তোরা চেঁচোয়ার মানিয়ে যাবে'; কাজেই হলধরকে রোজই মহলা দিতে হয়।

রাইচরণ রোজ সন্ধ্যার পর দাওয়া বসিয়া তামাক টানে। গ্রামের মধুগুড়া, হরি গোন্ধাবু, বিনিন পিঙনে সকলেই সেখানে সমবেত হয়।

হ'কা হাত হইতে হাতে ঘিরিতে থাকে। আবার চালিয়া তামাক সাধা হয়।

মধুগুড়া তানের ঠাঁকে হয় তো বিনিনকে জিজ্ঞাসা করে 'হ্যাঁ বিনিন, পোষ্ট মাঠার পাণ ৭০ টাকা মইনে, আর তুমি পাও ১০০ টাকা, তবে সে তোমার চেয়ে কাকে বড় হ'ল কেন? সে বসে চেঁচোরে আর তুমি বস টুলে।'

সকলেই বিনিনের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে।

হয় তো তাহারাই ইংরাজ গর্ভমন্ডের মত বড় একটা কুটনীতির সহিত এই মুহূর্ত্তেই পরিচিত হইবে।

• অথবা বিপিনের কাছেও এটা মত বড় সমস্তা, সেও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু মাঠার শব্দটা শুকনুমূলক। সে ইংরাজের তালিক করে, বলে 'ওরা সাহেব লোক, দেবতা, কি থেকে বেকি করে তা কি আমরা বুঝতে পারি গুঁহা। দুইই বল না পোন্ধার ?'

পোন্ধার মাথা নাড়িতে থাকে।

রাইচ গভীর হয়। দুবে একটা পেঁচা ডাকিতে থাকে। উঠানের ওপারে হালধরের দরজায় অতি সতর্কপে খিল ওঠে। হ'কা রাখিয়া সকলে উঠিয়া পড়ে।

হলধরের ঘর হইতে সমস্ত রাইচ ধরিয়া কিস্ কিস্ গুঞ্জন শোনা যায়। বিদ্যুৎগানী বলে, হলধর শোনে, হলধর বলে বিদু শোনে। সে কথার মাথা হুও নাই সমাপ্তি নাই। বিদু হয় তো জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁগা, ঐ বে লোকে বলে আকাশের পেছনে স্বপ্ন গুঁ, তবে উড়াআহাছে যারা চড়ে তারা সেখানে যেতে পারে না কেন ?'

প্রশ্নটা সমস্তামূলক। কিন্তু হলধর গোঁজামিল দেয়, বলে, 'কি করে যাবে ? ওরা যে রেজে।'

বিদুর কাছেও ব্যাপারটা অত্যন্ত হালকা হইয়া যায়। সতাই স্নেহের কাছে স্বপ্নচার তো রুজ, অথচ এই সহজ সত্যটারই সে এতদিন কুলকিনারা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলে, 'ঐ যে বাহুনের ন'বাবু কাগজে জড়ান তামাক বার ওনে বেন কি বলে...'

হলধর এখনওটা জানে। ছুইদিন পূর্বে সে এই রহস্যময় তত্ত্বাদর্শনার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিয়া আসিয়াছিল, সে বলিল, 'ওকে সিগারেট বলে, কল্কাতার বড় বড় সাহেবরা ঐ কিনারাত থায়।'

বিদুর বিষয়ে বলে, 'ঐ থায় শুধু, তারা ভাত খায় না ?'

—'হাঁ, সাহেবলোক, তারা ভাত খেতে যাবে। তারা কি থায় জানো, কটা আর মাংস...'

—'মাংস কিসের গো ?'

হলধর মাথায় জোড়হাত ঠেকাইয়া উদ্বেগে প্রশ্ন করিয়া বলে, 'শা ভগবতীর, গরুর গো গরন...'

বিদু আঁৎকাইয়া ওঠে; 'ওমা !'

এক হুংসর পরে...

গ্রামে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। কে এক চিমন-লাল মাড়োয়ারী এবং সশোমন নামে এক ইছদী সাহেব গ্রামে সশরীরে উপস্থিত হইয়াছে, লোহা-লকড়ের কারখানা খুলিবে বলিয়া। দুই মাস পূর্বেও যেখানে মাদার-তাল তমাল এবং আগাছার দুর্ব্বল নাহ ছিল তারা কবে কোন কুকমন্ড্রে বন্ধুকে পরিষ্কার হইয়াছে... সেখানে এক বিরাট টিনের শেড উঠিয়াছে, কত লোক-লব্ধ-বসপাতি।

টুপি মাথায় ইছদী সাহেব কারখানার সামনে পায়চারী করে, কখনও বা টেবিলের সামনে বসিয়া লেখে। মাড়োয়ারী মাথা পাগড়ী জড়াইয়া সারাদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের সঙ্গে শহর হইতে বহু মিত্রী আসিয়াছে, আরও দুইশত লোক নেওয়া হইবে। রোজ, দেড়টাকা হইতে আট আনা পর্যন্ত।

কথটা মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। নগণ টাকা...

সকাল ৭টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত কাজ। কাজ হইয়া গেলে রোজ লইয়া বাড়ী ফিরিবে। সেখিতে সেখিতে গ্রামের গরুকে লোক কাজে চুকিয়া গেল।

হলধর গরুটাকে লইয়া লাঙ্গল কাঁধে ফেলিয়া মাঠে বাইতেছিল। বাঁকের মুখে পিছন হইতে কে তাহাকে টাংকর করিয়া ডাকিতে লাগিল। হলধর ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে ডাকিতেছিল সে আসিয়া পড়িল, তাহার নাম গোপীনাথ। গোপী বলিল, 'তুই এখনও মাঠে যাচ্ছিস লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে এমন স্থবের কাজ ছেড়ে।'

হলধর বিষয়ের সহিত বলিল, 'তুই কিসের কথা বলছিস ?'

গোপীনাথ বিষয়ের সহিত বলিল, কেন তুই শুনিদু নি ?' কারখানায় রে... আমরা রোজ মশ আনা করে পাচ্ছি... রোজ...! আমি, কেনারাম, বিদুভিত্তি, সেতে মণ্ডল...'

গোপীনাথের চক্ষু বেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, নিজের



পায়ের নতুন পাঞ্জাবী এবং পায়ের চট্টার দিকে অর্ধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, 'একেবারে বাবুর কাজ হল...তাকে কি বল...'

গোপীনাথ বিষমুখে বিরাট ঠা ক্রিয়া রহিত; রোজ দশ আনা, গোপী বলে কি ?

গোপীনাথের তখন বক্তৃতায় পাইয়াছে; 'কি করছি তুই বন্ধু আমায়, ছুতো খোঁজা ভাত আর বছরে চারখানা মোটা কাপড়...ব্যাং।' একটা ভাষা পায় দিচ্ছি না এক জোড়া জুতা পায় দিতে পারিস...ব্যাং? তোর কচি ঝুঁ, কি স্বপ্ন শাস্তি তাকে দিচ্ছি? না তাকে একটা সেমিজ...না একখানা ভাল কাপড়, না একটা মুখে মাথা পাউডার, কিছুই নাই।'

সেমিজ কাকে বলে হলধর জানে না...পাউডার শুনিয়াছে মেমেরা মুখে মাখে।

—ভেবে দেখিছ, যাই এখন সময় হ'ল—বলিয়া গোপীনাথ হাত দোলাইতে দোলাইতে গভীরভাবে চলিয়া গেল। আর হলধর মাঠে বসিয়া সারাদিন এই কথাই ভাবিল।

তারপর হুইমিন পরে রাইচরণ এবং বাড়ীর সকলে সবিস্ময়ে শুনি, হলধর কারখানার কাজ করিতে বাইবে।

কথা ঠিক হইয়া গিয়াছে।

আপত্তি হইয়াছিল।

কিন্তু টিকে নাই...

রোজ দশ আনা...

কাজ ভাল করিতে পারিলে মাথিনা আরো বাড়িবে।

বাধা আর...রোজ-গুটির 'মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।

অভাব-বোধ ইহাদের জন্মে নাই, কিন্তু মোহ আছে।

হলধর সকাল সকাল ভাত বাইরা কারখানায় চলিয়া গেল।

বাশীর ডাকে মাছঘরের ঘুম ভাঙ্গে...

পানী আর ডাকে না। হয় তো কারখানার হুইল এর

বিকট আওয়াজের ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

রাববার হলধর রতনপুরের হাটে গিয়াছিল গোপী-

নাথের সঙ্গে। সেখানে সে পছন্দ করিয়া একটা পাঞ্জাবী কিনিল, খাঁপের জন্য এক জোড়া চট্টা, মায়ের জন্য একখানা লাল চড়চা পাড় শাড়ী, বিন্দুর জন্য একটা সেমিজ, তারপর গোপীনাথ তাহাকে আর একটা দোকানে লইয়া গেল এবং হলধর একটা পাউডার কিনিল। তারপর বিন্দুবাসিনীর সেমিজ এবং পাউডার নিষিদ্ধ কবের মতো কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া বাড়ী ফিরিল।

বাড়ীতে আমাদের তুলান বহিয়া গিয়াছে।

রাইচরণ জুতা পায় দিয়া রান্না ঘরেই ঢুকিয়া বসে।

কোন পায়ের কোনটা ঠিক রাখিতে পারে না...

পিছল পুত্রস্বীর মাটে জুতা পায় দিয়া নামিতে গিয়া পড়িয়াছিল আর কি!

আমরা ঘরে বসিয়া হলধর প্যাকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া মুখে পোরে। সকলে হা করিয়া চাখিয়া থাকে। বুধ হইতে খোঁয়া ছাড়িলে আমপানের গোফেরা প্রাণপনে নাক টানিয়া হুজাগ আবাদন করে। অনেকেই প্রসাদ পায়।

গভীর রাতে হলধর বাড়ী ফেরে। বিন্দুবাসিনী তখন বিছানায় এলাইয়া পড়িয়া মুখায়। হলধর সন্তর্পণে মরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আলোটা হাতে করিয়া বিছানার দিকে আগাইয়া আসে। পাউডারের কোঁটাটা খুলিয়া বিন্দুর মুখে অতি সাবধানে লেপিয়া দেয়। তারপর মৃদুর মতো চাখিয়া থাকে।

বিন্দুবাসিনী হঠাৎ জাগিয়া ওঠে। ত্রুট হইয়া অসহ্য বসনকে বখাওনে সরিষেন করিতে ক্রটিতে বলে, 'ও কি!' কথা কহিতে গিয়া ঠোঁটের কোণে জমা পাউডার মুখের মধ্যে যায়...মুখে হাত বুলাইয়া দেখিয়া বলে, 'ও কি! মরদ মাথিয়েছ না কি মুখে?'

হলধর হাসে, বাহারী কোঁটাটা বাহির করিয়া আলোর সামনে ধরে বিন্দু শোনে, এর নাম পাউডার, কলকাতার মেমেরা মাখে। উঠিয়া সেমিজ পরে, আমদানি বার বার মুখ দেখে।

হলধর বিছানায় শুইয়া সিগারেট খায়। আর কারখানার ইছরী সাহেব তাহার পিঠে চাপড়াইয়া কি ভাবে তাহার নামটা উচ্চারণ করিয়াছিল সর্বগর্বে দ্রীক তাহাই শুনা...

তারপর দুই মাস জ্বরও কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিশ্চয় নয়।

গ্রামে গত রাতে একটা ভরানিক খুন হইয়া গিয়াছে। রীশ ও কাসিমুদিক দুজনেই খুব মদ খাইয়াছিল। নেশার বাবে বচসা হয়। পাশেই একখানা কুড়াপি পড়িয়াছিল, কাসিমুদিক তাহাই দিয়া বতীশকে আঘাত করে, কাসিমুদিকে গুলি খরিয়া লইয়া গিয়াছে।

কারখানার মরজা ছাড়াইয়া কিছুকরে আনিগেই তাড়ির লোকান এবং অন্যান্য অনেক জিনিসের দোকান। তাড়ি-খানার বসিয়া এই সব আলোচনা হয়।

হলধর টলিতে টলিতে পাড়াইয়া বলে; 'বাক পে ও বেটা, এনে কথা হচ্ছে, আমরা না কাফানে পড়ি...'

সকলেই কথাটাকে গুরুতর বলিয়া মনে করে। নেশার বাবে বোঁড়া নিতাই আনিয়া হলধরের পা জড়াইয়া ধরিয়া ধমিত্তে থাকে, বলে; বাঁচাও গুরুদেব। হলধরকে সে চর্জা করে। কারখা হলধর আন্ধকাল দেড়টাকা রোজ পায়...

মস্তাভে হুইমিন সে দেখা মদ খায়...

বাকী করদিন তাড়ি।

তাহার কাছে হাত পাতিলে সিগারেট পাওয়া যায়।

সম্পত্তি যে পদ্মনাথী কর্তা গ্রামের এক গ্রামে আসিয়া ঘর বাধিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হুকুমীর সহিত হলধরের অবিদ্য সম্পর্কের কথা শুধুখুয়া শুনিয়াছে।

ইহাই শুধু বর্ণনের পক্ষে যথেষ্ট কারণ। হলধর অন্তর দিল।

হলধর টলিতে টলিতে বাড়ীর দিকে চলিল। গ্রামের জেহা এই কয় মাসেই একেবারে বখাওয়া গিয়াছে।

মাছের ঐক্য বাড়িয়াছে, বিলাসিতা বাড়িয়াছে, অভাব-বোধ বাড়িয়াছে।

বাকী পাটীটা অনেকদিন হইল ভাঙিয়া গিয়াছে।

সেই ঘরে একজন পতিমা মুহাম্মান লজ্জা-বিস্মৃতির লোকান পাতিয়াছে এবং শুনা যায় সে না কি মালকস্ত্রবাও অন্ধ ভাবে বিক্রম করেছে।

গ্রামে কাহারও সহিত কাহারও সন্ধ্যা নাই। চায় বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে—কেবল মাত্র ছ'চার খানি জমি ছাড়া।

রাজির অন্ধকারে পথের ধারে মাতালের প্রলাপ এবং কুংসিং শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। হলধর তাই শুনিতে শুনিতে বাড়ী ফেরে।

বিন্দুবাসিনী হাঁড়ি শিকার তুলিয়া বসিয়া আছে। ঘরে থাইবার কিছুই নাই, একটা পরমা নাই... ..

রাইচরণ আর দাওয়ায় বসিয়া তামাক খায় না। হলধর আসিয়া উঠানের মধ্যে পাঁড়াইয়া ওজ্ঞন-গর্জন করে তারপর শ্রান্তদেহে বিছানায় গিয়া ঢলিয়া পড়ে।

বিন্দু সে রূপ রান হইয়া গেছে। পাউডার আর মাখিতে পায় না....

সেমিজ ছিঁড়িয়া গিয়াছে—কাপড়খানিও। মাথার কাছে বসিয়া বিন্দু পরের দিনের খাবার জোপাড়ের কথা বলে...হয় তো কাপড়ের কথাও। হলধর একটা কুংসিং ক্রভলী করিয়া উঠে, তারপর হামিতে থাকে; বলে—'কাপড় দিই না কেন জানো?'

বিন্দু কী করিয়া শোনে। হয় তো কিছু রহস্য আছে। ব্যগ্রতা বাড়িয়া উঠে...বুদ্ধের ভিতর চোঁচ, চিপ, শব্দ হয়...

কিছু রহস্য প্রকাশ পায়। হলধর বলে; 'সেমিজ কাপড় পরে ঢাকবার মতো রূপ আর নেই তোমার...'

বিন্দু অসহ্যাক্রিষ্ট মুখখানা অপমান-লাঞ্জে রান্নিয়া ওঠে। পাতলা ঠোঁট দুইটা কাঁপিতে থাকে। হয় তো কি বলিতে চায়...

হলধর তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরে। বিন্দু সর্বাধিকার মতো পিছাইয়া গিয়া আলোটা কন্ করিয়া নিবাইয়া দেয়, তারপর মেজের উপড় উপুর হইয়া পড়িয়া থাকে। দেহ-দেউলের অনাদৃত দেহতা শুমরিয়া কান্দাটা ওঠে।

সকালে উঠিয়া উঠানে পাঁড়াইয়া-রাইচরণ বলে—'শেষ মশল গন্ধটোকেও কি আমার বেচুতে হ'বে?'

কেহ উত্তর দেয় না।

রাইচরণ আবার বলে—'কারখানায় তুই মাস গেলে চল্লিশ-পঁচাত্তির টাকা রোজগার করিস, পাঁচ টাকাও ঘরে আনতে পারিস না। এ কাজে কি আমাদের সাহস হচ্ছে শুনি...'



হৃদয় এবং দরজার আসিরা পাড়ায়; বলে—‘সে তুমি বুঝবে না।’

রাইচরণ রাগে লাল হইয়া ওঠে; বলে—‘বুঝবই না কেন তুমি? এই যে তুমি ছবি-পাশগুলো খেয়ে পরয়া ওড়াসু জলের মতো ...!’

ছবি পাসু কি তাহা আর বলে না। কিন্তু হৃদয়ই বলে—  
বলে—‘মদ না খেলে ঝট্টানীর কাজ করা যায় না।’

রাইচরণ রাগে গম্ভীর করিয়া দাওয়ার ওঠে; বলে ‘তবে কাজে কি লাভ। যা’ উপায় করলি তা—কারখানার দরজার বেখে এলি, তা হ’লে বাট্টানীটাই তো বুঝা ...’

এর আর উত্তর পায় না। লাভ কি তা? হৃদয় নিজেই বুঝিতে পারে না। কারখানার বাঁশি বাজিয়া ওঠে। বাইবার একটা দানাও নাই। হৃদয় কাজে চক্ষিা গেল।

গ্রামের একপ্রান্তে একটা গোছের তলায়—বসিয়া একটা যুবক তাঁর বন্ধুর কাছে এই গল্পটা বলিতেছিল। বন্ধু কহে—  
নিঃখাসে বলি; ‘তারপর?’

—তারপর? যুবক মাথা তুলিয়া নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকালের দিকে চাহিল,—‘তারপর, এই সেই যক্ষশালা, আর এই অন্তরালে মৃত মানবতার আকাশচুম্বী প্রাচীর অতি দীর্ঘে নিঃশেষে গড়ে উঠবে। ইন্দ্রপাত আর আশ্বিনের বিরাট সূর্য্য মাহুদের কাছে চেয়ে বেড়াবে; দাঁও, দাঁও, আরো দাঁও। মাহুদ তিলে তিলে রক্ত যক্ষ-দেবতার বৈদ্যে মোক্ষন করবে, তাদের রক্ত দেবতার পদ-রক্ত রেপে উবে, তবু ভুলবে; চাই, চাই, আরো চাই ... আরো সোনা আরো শক্তি ... আরো আহার্য ...’

আর, মাহুদ? সেও রূপগতা করবে না; যয়ের মায়ে নিজের সত্যকে নিঃশেষে বিস্মৃণ করবে।’

তারপর?

## বিজয়িনী

( গান )

পিরাসী কামনা রহিল আঁধার মনে

প্রজাতন্ত্রে আগো মান হলো অকারণে;

বিজয়িনী বেশে এলে মায়াদিনী

অপরূপা অগ্নি-নাথি তোমা চিনি

তোমারে হেরিয়া লাহে মুখ ঢাকি  
নীরব সত্তাপনে।

আকাশে চাহিয়া মেঘের বুকেতে চলে  
মাগির পানের অজানা কাহিনী বলে

—অবহেলা পেয়ে হানিচ বেদনা

আকিকে কিধনে ধনে।



### বাঙ্গলার কার্পাস

এবার বাঙ্গলায় ৭৫ হাজার ৩ শত ২৭ একর জমিতে বাও কার্পাসের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর উভয় প্রকার ফির পরিমাণ ৭৬ হাজার ২ শত ৭ একর ছিল। এ বৎসরে ১৬ হাজার ৬ শত ৮ গাট আশু তুলা এবং ৩০৮ গাট গৌণ তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া হিসাব পাওয়া বাইতেছে। গত বৎসর উভয় প্রকার তুলার পরিমাণ যথাক্রমে ১৮ হাজার ৪ শত ৮০ এবং ১০১ গাট ছিল। ফসল সাগ্রহে গলে জমাগত রূটিপাত হওয়ায়, চট্টগ্রাম পাশ্চাত্যঞ্চল ও ত্রিপুরারাজ্যে আশু কার্পাসের পরিমাণ অনেক হ্রাস গিয়াছে। অত্যাচ্ছ হানে গত বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে ফসলের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। গৌণ ফসলের অবস্থা ও পর্যাপ্ত ভাল বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে।

—সম্মিলনী—

বাঙ্গলার মিলের কাপড়।—বঙ্গদেশে যে কয়টা কাপড়ের মিল রহিয়াছে, তাহাদের উৎপন্ন কাপড়ে দেশের অভাব মিটিতেছে না। বাঙ্গলাতে ২০ কোটি টাকা মূল্যের বস্ত্রের প্রয়োজন, তৎমধ্যে ১৯ কোটি টাকার বইই বাঙ্গলা দেশের বাহির হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। ইহা হইতেই প্রমাণ হয়, আমাদের কত দুর্দশা এবং আমরা কত নিরুপায়। কিন্তু কেবল তাহাই নাহে; বঙ্গদেশে যত বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহার সব বিক্রয় হয় না। আমরা বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা দেশে প্রস্তুত কাপড় না কিনিয়া বোম্বাই বা আমেরাবাদ মিলের কাপড় কিনিয়া থাকি। ইহার চাইতে লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? বাঙ্গালী যদি নিজ দেশের দেশের প্রতীকটিকে সাহায্য না করে, তবে ঐ

প্রতীকটান স্থায়ী হইবে কিরূপে? বাঙ্গলার তৈয়ারী কাপড়ের বিক্রয় বাড়িতেই মিলের উৎপাদন শক্তিও বাড়িয়া যাইবে; সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন মিল সর্বত্র স্থাপিত হইতে পারিবে। অধিকন্তু বহুসংখ্যক বেকার যুবকরও সংস্থান হইবে। বাঙ্গালীদের মনে রাখা উচিত যে, বাঙ্গলার যে সর্বনাশ হইতেছে, তাহা হইতে বাঙ্গালীরাই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। আর কেহ করিবে না।

—সম্মিলনী—

বঙ্গদেশের আর্থিক দুরবস্থা।

বঙ্গদেশের আর্থিক দুরবস্থা ক্রমশঃই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছে। মফস্বলের সংবাদে প্রকাশ যে প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই প্রচুর পরিমাণে দাখল জমিয়াছে; কিন্তু বহুসংখ্যক জেজ হইতে দাখল কাটার মজুর দাখল বিক্রয়ের প্রাপ্য অর্থদ্বারা পোষাইবে না। দাখলের দর অধিক থাকায় কৃষকেরা উজ্জ্বাহে যে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল দাখলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় এখন আর তাহার রাজস্ব দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এদিকে সেসের হারও বহুসংখ্যক অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় সেস শোধ করিবার অর্থও তাহাদের জুটিতেছে না। জমিদারের কস অপেক্ষা গাভীর ও তালুকদারের পক্ষে সেস পরিশোধ করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। বহু ক্ষুদ্র জমিদার, তাবুকদার ও পত্তনদারের সম্পত্তি নিলামে বিক্রিত হইবার সম্ভাবনা। প্রজারাও দাখল বিক্রয় করিয়া কোনরূপে জমির কস শোধ করিতে পারিতেছে না। দাখল বিক্রয় করিয়া বঙ্গাদি জুয়ের লম্বাও হইতেছে না। দারুণ অর্থদ্বাবে মান-সম্মান বাঁচা ইয়া চলা গৃহস্থের পক্ষেও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সকলোই ভবিষ্যতের



চিত্তার অধির হইয়া উঠিয়াছে। অনেককেই বাধা হইয়া কর বন্ধ করিতে হইবে; তাহার জ্ঞান আর কবচবন্ধের আন্দোলনের প্রয়োজন হইবে না। গভর্ণমেন্ট প্রজ্ঞার এই শঙ্কন অধীভাবের কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবার অপেক্ষা রাজনৈতিক আন্দোলন প্রতিমানে চোঁয় অধিকতর ভাবে ব্যাপ্ত। স্বতন্ত্রা দেশবাসীর ছাশ দেখিবার আর ক্ষেহই নাই।

—হিতবাদী—

বাংলিতে রেলওয়ে সেতুর উদ্বোধন।

গত ২৯শে ডিসেম্বর, ১৩ই পৌষ মঙ্গলবারে ভারতের বড়শাউ লর্ড উইলিংডন বাগি রিজের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। মা গঙ্গা “ট্রেনিক্টা ক্রাফের” জুগলীনে ও অমরাবতী বন্দনে আবদ্ধ হইয়া মুম্বাই অবধার দিন অস্বাভাব্য করিতেছেন, এবার তাহার আর একটা গুরুতর বন্ধন বৃদ্ধি পাইল। বিশাল সেতুর নির্মাণে সাড়ে পাঁচকোটি টাকাও অধিক ব্যয় হইয়া গেল; ইহাতে রেলপথের কি অভিনব উন্নতি সাধিত হইবে তাহা বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারেন। তবে কোকে বৃষ্টির নদীপথ সম্ভাব্যের অভাবে বঙ্গদেশে জনশঃ বাস্তবহীন হইয়া পড়িতেছে, কচুরিগানার দেশ ছাড়া গেলও তাহার প্রতিকার সাধিত হইতেছে না—কারন অর্থাভাব, কিন্তু রেলের সেতু নির্মাণের জ্ঞান টাকার অভাব হয় না গবর্ণমেন্টে রেলপথ নির্মাণে যে প্রকার আগ্রহের পরিচয় দিতেছেন, জলপথ স্বেচ্ছাকৃত রাধিবার জ্ঞানও যদি সেইরূপ আগ্রহের পরিচয় প্রদান করিতেন তবে কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না লোকমতের প্রতি উপেক্ষা প্রদান করা কোনও গবর্ণমেন্টের পক্ষেই মঙ্গলো কথা নহে।

—হিতবাদী—

বাংলায় লম্বনের কাগজখানা।

কলিকাতায় বেঙ্গল স্ট্রীট মাদ্রাসাকার্টার্স এন্ডাসিয়েসন নামে লম্বন তৈয়ারী করিবার এক কারখানারূপে কলীর গার্বমেন্ট পরীক্ষার জ্ঞান লম্বন তৈয়ারী করিবার অসম্মতি দিয়াছেন। “তদুদ্বারা উক্ত কারখানার যেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় লম্বনের কারখানা গুলিবেন। ভারত গভর্ণমেন্টের লম্বন-সম্বন্ধে অসম্মতি করিবার ক্ষমতাবী মিঃ পিট বাঙ্গলা

দেশের ১৮খণ্ড লম্বন তৈয়ারী হইতে পারে সে সম্বন্ধে অসম্মতি করিয়া ২৪ পরগণার ফ্রেজারগঞ্জ এবং বেনিনীপুরের কাপিতে কারখানা স্থাপনের অসম্মতি দিয়াছেন। উক্ত অসম্মতি দিতে হইলে লম্বন তৈয়ারী করিবার লাইসেন্স পাইবার জ্ঞান বহু আবেদন মিঃ পিটের নিকট গিয়াছে এবং বহু পরিমাণ লম্বন কারখানায় যে ভাবে লম্বন হয় সেইভাবে এবংসর প্রস্তুত হইবে। এই ছই হইলে পূর্বাভাসে মল প্রস্তুত হইতে থাকিলে বৎসরে ৫০ লক্ষমণ লম্বন প্রস্তুত হইবে। উহা কলিকাতায় প্রতিমণ পাঁচ আনা বা প্রতিভাল ৩১০ দরে বিক্রয় হইবে। বাঙ্গলা দেশে প্রস্তুত লম্বনের উর কোনও গুস্ত থাকিবে না এবং ভবিষ্যতে বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর দ্বারা লম্বন প্রস্তুত হইবে আশা করা যায়।

বাঙ্গলা দেশে ১ ক্রোর ৬৪ লক্ষমণ লম্বনের প্রয়োজন হয়। স্বতন্ত্রা দেশে বাধা হইতেছে যে যেদিনীপুর ও ২৪ পরগণাভিত্তি প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশ লম্বন প্রস্তুত হইবে। বর্তমান, গুলনা নোরাবাগী ও চট্টগ্রামে মল তৈয়ারী হইলে সম্ভবতঃ অবশিষ্টাংশ লম্বন পাওয়া যাইবে।

—সঙ্গীকী—

বাঙ্গলার সাক্ষ্যকর্ম ব্যাধি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, সমগ্র প্রদেশে সাক্ষ্যকর্ম ব্যাধিতে ১২৩ জন মারা গিয়াছে।

২২৭ স্বাস্থ্যসীরা যে সমগ্রা শেষ হইয়াছে (১৯০২) উক্ত সমগ্রাতে বাঙ্গলার ১১টা জেলায় কলারায় মুখ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মেদিনীপুর ৩৪-৩৯, মুর্শিদাবাদ ১১-২৬, বগুড়া ১৯-১৩৫, দিনাজপুর ২২-৩২, ঝড়ুয়া ১৬-১৮, ঢাকা ৪৪-৫৬, ময়মনসিংহ ৭০-৭৩, ফরিদপুর ১৫-২৫, বাঘারগঞ্জ ৪১-৫৩, ত্রিপুরা ২৭৫-৩২৩, নোয়াখালী ৭৬-২২১।

মিস্রাবিত হইলে হ্রাস পাইয়াছে—বর্ধমান ৩৩-২১, বীরভূম ২৭-৫, বাঁকুড়া ১৮-৫, হুগলী ২৯-৩, হাওরা ৩২-৮, ২৪ পরগণা ১৭৫-৬৩, নদীয়া ২৪-৩, ফুল ২৭৫-১২৫, রাজশাহী ৪৭-৩২, পাবনা ১৪-৪।

ছাড়াও বঙ্গত ১৩, মেঘনসিংহে ৪, বর্ধমান ৫

বিস্তারী ২ ও বাঁকুড়া এক জন মারা গিয়াছে কলিকাতায় ইক্সপের্ট ৮ জন মারা গিয়াছে।

—ঢাকা প্রকাশ

বাংলায় হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধি—

গুটশ-শাসিত বাংলায় মোট ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার হিন্দু বৃদ্ধি হইয়াছে হিন্দু-মিশনের কার্য-ফলে গুটশ-শাসিত বঙ্গদেশে অনুমান ৫ লক্ষ হিন্দু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিত্ত ১৯২১ সালের এবং বর্তমান ১৯৩১ সালের আদমশুমারী পর্যবেক্ষণ করিলে উহা পূর্বই প্রতীয়মান হইবে। এক্ষত নিয়ে একটা তুলনা-মূলক বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। সংখ্যাগুলি তত মঙ্গল বৃদ্ধিতে হইবে।

সাল হিন্দু মুঃ ধঃ বৌদ্ধ জড়ো অন্য মোট  
১৯১১—২০,৭৭ ২০,৯৮ ১,২৯ ২,৪০ ৭,২০ ৪৪,৮৩  
১৯২১—২০,২৩ ২০,২২ ১,৪৭ ২,৬৪ ৮,৪৪ ৪৪,৬৩,৯৫  
১৯৩১—২১,৫৩ ২১,৫৩ ১,৮০ ৩,১৫ ৫,৪৯ ৫৬,৩৩,২২  
+১৩,৩৪ +২০,৬৬ +৩৩ +৪০ -৩০১ +২ +৩৪,২৭

এই বিবরণে দেখা যায় হিন্দু বাড়িয়াছে ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজার। অত্যাঙ্গ সকল জাতিই বাড়িয়াছে, কেবল মাত্র জড়োপাসক ৩ লক্ষ এক হাজার হ্রাস পাইয়াছে। এই আদমশুমারীতে জড়োপাসকদের সংখ্যা হ্রাস হইবার কারণ অসম্মতি করিলে দেখা যাইবে ইহার। হিন্দুধর্ম দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া হিন্দু-সংখ্যার অস্বভূক্ত হইয়াছে। কত জড়োপাসক হিন্দু-সংখ্যাত্ত্বক হইয়াছে তাহা এখন পর্যন্ত আমরা জানিতে পারি নাই। আমরা ধুব নিশ্চিতভাবে অসম্মতি করিতে পারি যে, স্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে এই আদমশুমারীতে জড়োপাসকের সংখ্যা অস্বভূক্ত সাড়ে দশ লক্ষ (পূর্বে ৮,৪৪ হাজার+বৃদ্ধি ২ লক্ষ) হইবার কথা। অতঃপর আমরা সেই স্থলে মাত্র ৫,৪৪ হাজার জড়োপাসক পাইতেছি। ইহা হইতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নানাবিধ ৫ পাঁচ লক্ষ জড়োপাসক গত দশ বৎসরে হিন্দু নামবি হইয়াছে। আশিস জাতি সকলের মধ্যে হিন্দু-মিশনের প্রচারের এই কৃতকার্যতা আমরা নিঃসন্দেহে প্রকাশ করিতে পারি। এক্ষাতীত কলেক্টর মঙ্গলমান ও গুটান হিন্দু সমাজত্বক হইয়াছে। ইহাদের

সংখ্যা নিশ্চিত বলা কঠিন। কারণ যে সকল গুটান হিন্দু-সমাজত্বক হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই জড়োপাসক প্রব্রীণ। মুসলমান ও হিন্দু-সমাজ তুল্য হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ৩৯ হাজারের অধিক হইবে না।

হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির আর একটা কারণ হিন্দুর ক্ষয়ের পথ রোধ করার চেষ্টা। এই দশ বৎসরে বহু সহস্র হিন্দুকে ধর্মান্তরণ গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে।

বাংলাদেশে বিধবা-বিবাহের ক্ষণেও হিন্দুর সংখ্যা সামান্য কিছু বাড়িয়াছে।

পাঞ্জাবী, মাজেদারী, হিন্দুস্তানী, উড়িয়া বাহির হইতে প্রায় লক্ষাবিধ হিন্দু এই সময়ের মধ্যে বাংলায় প্রবেশ করিয়া হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে।

সকল সিক বিচার করিয়া ইহাই মনে হয় যে, বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে ধুব বেশী হইলে ছয় লক্ষ বাড়িয়াছে।

আদমশুমারীর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইলে উপরোক্ত মন্তব্য ও অসম্মতিসমূহ কতদূর ঠিক তাহা জানা যাইবে।

কুচবিহার ও ত্রিপুরা দেশীয় রাজ্যবাস বাঙ্গালানাই অংশ।

এই ছই রাজ্যে মোটের উপর সাড়ে ছয় লক্ষ হিন্দু ও ৩ লক্ষের অধিক মুসলমানের বাস। কুচবিহারে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু ত্রিপুরায় হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। মুসলমান ওহারা রাজ্যেই বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

—গুলনা বাগী

বাঙ্গলার চামের বঙ্গ—

সমগ্র বঙ্গদেশে ছয়বতী গাভীর সংখ্যা ১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৪৮৯ কম হইয়াছে। বঙ্গদেশে ছয়বতী গাভীর সংখ্যা হ্রাস হইবার সংখ্যা মোট ৮৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৯৯টি; আর সমগ্র বঙ্গের প্রবাসী ও স্থায়ী অধিবাসীদের (গুটশ-লোকায়) মোট সংখ্যা ৪ কোটি, ৬৬ লক্ষ, ৯৫ হাজার ৫৩৬ (১৯৩১)। অতঃপর মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক শতজন বাঙ্গালী ভাষে ২০-২৬টি বা প্রায় ছয়জন বাঙ্গালীর ভাষে একটা করিয়া গাভী রহিয়াছে। এত গাভী থাকিতেও বাঙ্গালীর “ছয়-ভাত” বাঙা উঠিয়া গিয়াছে, বিশেষণে জ্ঞান প্রভু ও নানা প্রকার “বুড়” শিশু বাঙের স্থানাবিকার করিয়াছে এবং ঝাঁটা যুত একেবারেই লুপায়া হইয়াছে।

—আর্থিক উন্নতি





মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে বাঙ্গালীর প্রভাব

বাঙ্গালী ঘরকাল দক্ষিণের নিকট যুদ্ধে ও কান্ডবলে পরাজিত হইয়াছে। চালুক্য-বংশ-গৌরব প্রথম দীর্ঘস্থায়ী খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ-ভারতে বাঙ্গালীর নিঃসাসে আসীন ছিলেন। মহাকূটের স্তম্ভলিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তিনি এক সময়ে বঙ্গদেশে অধিকার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালীর চালুক্যদের অধঃপতনের পর রাষ্ট্রকূটের দাক্ষিণাত্যে প্রাচ্য হাপন করে। উক্ত বংশের নৃপতি ধারাবর্ষ উত্তরাংশ আক্রমণ করিলে পাল-সম্রাট ধর্মপাল (খ্রীঃ ৭২০-৮১৫) ও গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশের ভিতর দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ধারাবর্ষের পরবর্তী রাজা কৃত্তীর গোবিন (খ্রীঃ ৭৫৫-৮১৫) পুনরায় উত্তর-ভারত আক্রমণ করিলে ধর্মপাল ও তাঁহার আশ্রিত কনোজের অধিপতি চক্রবর্তী রাষ্ট্রকূট-দ্বীপের নিকট মতক অবনত করেন। এই ধর্মপালের জ্ঞায় প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট বাঙলা দেশে কখনও জয়গ্রহণ করেন নাই। গোবিন্দের উত্তরাধিকারী অমোঘবর্ষের (খ্রীঃ ৮১৫-৮৭৮) সমাময়িক ছিলেন ধর্মপালের পুত্র দেবপাল। সিকরে প্রাপ্ত তাম্রলিপি হইতে পাঠোদ্ধার হইয়াছে যে বঙ্গবীশ (দেবপাল), অমোঘবর্ষকে বিশেষ সম্মান দেখাইছেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে চালুক্যেরা রাষ্ট্রকূটদের স্বেচ্ছাসাধনপূর্বক দাক্ষিণাত্যে পুনরায়

তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করে। এই বংশের নৃপতি ঠিক বিক্রমাদিত্য (খ্রীঃ ১০৭০-১১২৬) তৃতীয় বিগ্রহপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশে অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিপতি রাজেন্দ্র চোল (খ্রীঃ ১০১২-১০৫২) রাজ ও বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে পাল-সম্রাট মহাপাল হস্তী হইতে অবতরণপূর্বক রণে ভঙ্গ দেন এবং বঙ্গলিপি গোবিন্দচন্দ্র পলায়নপূর্বক প্রাণরক্ষা করেন। এইরূপে কয়েক শতাব্দী পরাক্রান্ত হইবার পর বাঙালী অংশবিশে দক্ষিণের দাস-স্বীকার করে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্মণ-বন্দীর রাজগণ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহারা কবিদের অন্তর্গত সিংহপুরের অধিপতি ছিলেন। মেন-বাঈর রাজগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙালীর রাজা ছিলেন। তাঁহারা ও কর্ণাটদেশ হইতে তথায় আগমন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ শতাব্দীর ইতিহাস বাঙালীর দক্ষিণের কাছে পরাজয়ের কথাই বলিয়া মাইতেছে—দক্ষিণের আধিপত্য ও রাজনৈতিক প্রভাব বাঙালী সহ্য করিয়াছে কিন্তু বিজিত বাঙালীকে দক্ষিণীরা ধর্ম ও কুটি সাধনায় ও বহিরাগত অনেকবার মানিয়া লইয়াছে, এবং একজন বাঙালী আচার্যের পদতলে ধর্মশিক্ষা করিয়া নিজেরা ধর্ম হইয়াছে। এই চিরস্থায়ী বাঙালীর নাম বিবেখ

খৃঃ ৮ তিন গৌড় দেশের অন্তর্ভুক্ত রাঢ়ের অন্তঃপ্রান্তী পূর্ণগ্রামের (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়) অধিবাসী ছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিবেখের শত্ৰুর আবির্ভাব হয়। তিনি নিষ্ঠাবান শৈব ছিলেন এবং নর্থদ্বীপেরে ডাফন মণ্ডলের প্রধাত গোলাকি মঠের আচার্য-পদ লাভ করিয়াছিলেন। ডাফন মণ্ডলের শৈবাচার্যদের আদিগুরু নাম হুগ্লা বা বৈবাচার্য সন্তান শঙ্কু অগ্রস্মিক গোলাকি মঠ স্থাপন করেন এবং ত্রিপুরার কলচুর-রাজ প্রথম যুবরাজের (খ্রীঃ ১০৫৫-১০৬০) নিকট হইতে তিন লক্ষ গ্রাম দান-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মঠের ব্যয়নির্বাহের জন্য ঐ গ্রামদলক উৎসর্গ করেন। তৎপর রামশঙ্কু, শঙ্কিশঙ্কু, কেদার-নিবাসী বিশালশঙ্কু ও তাঁহার শিষ্য ধর্মশঙ্কু গোলাকি মঠের আচার্য হইয়াছিলেন, আর এই ধর্মশঙ্কুর শিষ্যই বাঙালী বিবেখের শঙ্কু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতের পূর্ণাঙ্গিক বিবেখের শঙ্কুর জায় বিখ্যাত জনপ্রিয় শৈবাচার্য আর কেই ছিলেন না। কাকতি-বংশের রাজা গণপতি (খ্রীঃ ১২১০-১২৫০) তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রকৃত সম্মান দানে তাঁহাকে নিজরাজ্যে আনিয়া রাখেন। তিনি পিতৃজনে তাঁহাকে পূজা করিতেন। চোল, মালব এবং কলচুর-রাজগণও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন এই বিদ্যাংশসাহী গণপতিরাজ গৌড়-দেশ হইতে আগত বঙ্গোৎক শৈবাচার্য ও কবিবরকে প্রচুর উপহার-দানে ভূষিত করেন।

কর্ণভূমিতে অগ্ধত, সোনাগি রঙের জটাজুটে মতক মণ্ডিত এবং কণ্ঠাবরণে ভূষিত বিবেখের শঙ্কু যখন গণপতি রাজপ্রাসাদস্থ বিজ্ঞানমণ্ডলে উপস্থিত থাকিতেন, তখন শত শত নরনারী “শঙ্কু” জ্ঞানে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া বাইত। ১১৮০ শকাব্দে, খ্রীঃ ১২৩১ অব্দে গণপতিরাজ-প্রতিষ্ঠা কল্পদেবী বিবেখের শঙ্কুকে মন্দির গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাহা বেল-নানক বিদ্যের অন্তঃপ্রান্তী কণ্ডুবাটির অন্তর্গত ছিল। মন্দির গ্রামের বর্তমান নাম মন্দোদর। বেলদগুণ্ডি গ্রামও তাহাকে দান করা হইয়াছিল।

বিবেখের পরতিবর্তন ও ধর্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ

করেন। মন্দির গ্রামে তিনি গোলাকি-সম্প্রদায়ের জন্য একটি মন্দির, একটি বিহার ও একটি ধর্মশালা নির্মাণ করেন এবং সেখানে অনেক ব্রাহ্মণ আনিয়া স্থাপন করেন। তিনি প্রায়শ্চিত্ত নাম পরিবর্তন করিয়া “বিবেখের গোলাকি” রাখেন এবং এই গ্রামে ও বেলদগুণ্ডি গ্রামে হাট ঘর জাবিড় ব্রাহ্মণ স্থাপন করেন। উক্ত ব্রাহ্মণদের প্রাসাদাদ্বারের জন্য গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ভূমি দান করা হয়। উল্লিখিত গ্রাম দুইটির অবশিষ্টাংশ সাধারণ শৈবমঠের পরিপোষার্থ, শুদ্ধ শৈবমঠের ছাত্রবর্গের ভরণপোষণের জন্য, সন্তান-প্রসবের ও অজ্ঞাত হাঁসপাতালের ব্যয়-নির্বাহার্থ প্রদান করা হয়। গ্রামে গোলাকি মঠ ত্রি একটি সাধারণ ও আর একটি শুদ্ধ শৈব মঠ অবস্থিত ছিল।

বিবেখের প্রাচ্যভিত্তের সাহায্যার্থে গ্রামে একটা মন্দির-হাঁসপাতাল গুলিয়াছিলেন। গ্রামস্থ কামাখ্য বৈদ্যের ভরণপোষণেরও তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিবেখের গ্রামে বিদ্যায় স্থাপন করিয়া শিক্ষকের ভরণপোষণের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি দান করেন। ঐক, যজ্ঞ ও নাম-বেদ অধ্যাপনার জন্য পাঁচ জন শিক্ষক তিন নিযুক্ত করেন। দশজন নর্তকী, আটজন বাজক, একজন বাঁশীরা গায়ক চতুর্দশজন সাধারণ গায়িকা, একজন পাচক ব্রাহ্মণ এবং চারিজন ভৃত্তা সাধারণ শৈবমঠের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভোগদেশ হইতে আগত কতিপয় লোককে গ্রামের চৌকিদার নিযুক্ত করা হয়—ইহাদের বীরভূত বলা হইত। অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত বর্ণব্রাহ্মণ, তান্ত্রিক, মিস্রি, কুন্তকরা, রামমিস্রি, হজরত ও কোরকার বসবাস করিত।

বিবেখের জন্মভূমি রাঢ়ের পূর্ণগ্রাম হইতে বহু বাঙালী আসিয়া বিবেখের গোলাকি গ্রামে বাস করেন। এই বাঙালীদের মধ্যে হইতে কতিপয় ব্যক্তি গ্রামের আশ্রয় বা তত্ত্বাবধানের ও হিসাবকার্য নিযুক্ত হইয়াছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্যন্ত সকল বর্ণের কৃষিকৃষির জন্য তিনি অসংখ্য গুলিয়া মিস্রিছিলেন।

বিবেখের আদেশ দিয়াছিলেন যে মন্দির, ধর্মশালা, বিহার ও গ্রামের অজ্ঞাত অস্থানীয় প্রধান তত্ত্বাবধায়ক



গোলকিসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবে। অত্যাধিকারের জন্য তত্ত্বাবধায়ককে অপসৃত করা ও উপযুক্ত লোককে সেই পদে পুননিয়োগ করার ক্ষমতা সমগ্র শৈবধর্মাবলম্বীদের উপর প্রাপ্ত করা হইয়াছিল। বিবেকেশ্বর শঙ্কর দানপত্রের সত্ত্বগুলি হুচারূপে পালন করার জন্য একজন কর্মচারীকে এক শত 'নিক' বেতনে নিযুক্ত করা হয়। বিবেকেশ্বরের কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা গ্রামের বাহিরে অঙ্গদেশের অনেক স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। অঙ্গ দেশের বহুস্থানে তাঁহার কৃষ্ণাচ্ছাদিত এলাকা এখনও বর্তমান রহিয়াছে। কাশীধর গ্রামে তিনি একটি বিহার স্থাপন করিয়া উহার নাম উপলম্বর্ত রাখেন; উহার ব্যয়-নির্বাহার্থে সুপ্রতিষ্ঠিত পোস্তগ্রাম দান করেন। ময়কুটে বিবেকেশ্বর মঠ নামে একটি মঠ স্থাপন করিয়া তিনি উহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দির ও তৎসংলগ্ন অঙ্গদেশের ব্যয়নির্বাহার্থে মানপরি ও উপলি গ্রামস্থ দান করেন। তিনি চন্দ্রাবলি নগরীতে আরও একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থানীয় একটি বীথিকার দ্বারাও বড়ি করেন এবং তাহার দ্বারের অর্ধেক উক্ত শিবমন্দিরের ব্যয়নির্বাহার্থে প্রদান করেন। বিবেকেশ্বর প্রাচীন আনন্দপুর নগরের নাম পরিবর্তন করিয়া স্বীয় নামানুসারে উহার নাম রাখেন বিবেকেশ্বর নগরী। এই স্থানে তিনি একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার ব্যয়নির্বাহার্থে মনিকুটপুর এবং আনন্দপুর দান করেন।

কোমগ্রামে এবং উত্তর-সোমশিয়ার তিনি আরও দুইটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাদের ব্যয়নির্বাহার্থে ব্রহ্মপ্রোম গ্রাম অর্পণ করেন। শ্রীশৈলের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এনিধরপুরে তিনি একটি মঠ স্থাপন করেন।

কাশ্যিত-বংশের গণপতিস্বরাজ এই মঠের অমূল্য অঙ্গদেশের ব্যয়নির্বাহার্থে অবারী-গ্রাম দান করেন এবং দক্ষিণ-বঙ্গের স্বীয় স্বত্ব বিবেকেশ্বরের পলিনার বিহারে অতর্কিত কণ্ডকোট গ্রাম দান করেন। বিবেকেশ্বর মঠের মঠের আচার্য্য সেই গোলক মঠের প্রভাব তাহার ও টিনেভেলি জিলা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার দেহসংস্কার পর প্রিয় শিষ্য কাশীধর গোলক মঠের আচার্য্য-পদ গ্রহণ করেন। বিবেকেশ্বর শঙ্কর দ্বিতীয় ভারতে প্রথম বাঙালী ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। দ্বিতীয় নবম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে গোড়ের অধিবাসী বাঙালী বৌদ্ধশ্রমণ অবিস্মারক কোন্দন প্রদেশে ধর্মপ্রচার্য্য গমন করেন। তৎকালীন কোন্দন প্রদেশ রাষ্ট্রকূটগণ প্রথম অমোঘবর্ষের ( ৮১৫-৮৭৯ খ্রিঃ ) কনরাঙ্গা কপদিনের অধীনে ছিল। অবিস্মারক স্বীয় প্রতিভা ও কর্মশক্তিগত কোন্দনের অন্তর্গত কুম্ভগিরিতে কতিপয় বিহার নির্মাণ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুদের গ্রামাঙ্গারের জন্য অনেক অর্থ দান করেন।

বিবেকেশ্বর শঙ্কর নাম আজ বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছে। সেই মহাপুরুষ বাঙালীর অধ্যাত্ম-সাধনা, কর্মশক্তি, জনসেবার আদর্শ হ্রদ্বয় দক্ষিণ দেশেও বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং তৎকালীক অধিবাসীদের শৈব সাধনার দীক্ষা দিয়াছিলেন। মধ্যযুগে যেমন দীপঙ্কর, শ্রীজান বালাদ সভ্যতার প্রদীপ তিস্তাতে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন সেইরূপ বিবেকেশ্বর শঙ্কর বালাদর জ্ঞান ও শিক্ষার আলোক সমগ্র দক্ষিণ-ভারত আশ্রয়িত করিয়াছিলেন।

শ্রীধরশ্রদ্ধাঙ্গ গঙ্গোপাধ্যায়  
( প্রবাসী, মাঘ )

## তালোচনা

### গোবিন্দ কবিরাজ

ত্রিযুগলকান্তি বোম

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকার গোবিন্দ কবিরাজের কথা লিখিতে গিয়া এখানেই বলিয়াছেন,—“শ্রীমহাপ্রভুর পরমশ্রী বৈষ্ণব-পনকর্তাদিগের মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ভক্তিব্রাহ্মণ, প্রেমবিলাস, বাঙ্গালা ভক্তমাল প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেই তাঁহার উল্লেখ দেখা যায়। তথাপি ধ্রুপের হিত বর্ণিতে হইতেছে যে, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু ও জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা-সম্বন্ধে ঐ সকল গ্রন্থে কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সামান্য বাহা কিছু পাওয়া যায়, উহার মধ্যেও অনেক অনেক আছে; হুতরাং মহাকবি গোবিন্দরায়ের জীবন-বৃত্তান্ত অনেক পরিমাণেই সন্দেহপূর্ণ মনে হয়।”

সতীশবাবু বাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল গোবিন্দ কবিরাজ বলিয়া নহে, অনেক প্রাচীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরিগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তখনকার লোকেরা ইতিহাস লিখিবার কণ্ড একটি প্রয়োজনীয়তা অহুতব করিতেন না। বিশেষতঃ সমাময়িক গ্রন্থকারেরা ভাবিতেন, এবং কেহ কেহ বলিয়াও গিয়াছেন যে, সকলেই যখন এই সকল ঘটনা অগণত আছেন, তখন উহা লিখিয়া গ্রন্থের স্বেচ্ছা বৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু তাহারা কোন কোনও প্রসিদ্ধ-নামা ব্যক্তির বিষয় বাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও হ্রিচিহ্নে অহুতব করিয়া বাছিয়া বাহির করিবার বৈধিই বা আমাদের কোথায়? গোবিন্দ কবিরাজের সম্বন্ধেই এখানে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

সতীশবাবু উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহার পরেই লিখিয়াছেন, “বাহা :হউক, অগণতবাবু গোবিন্দ কবিরাজের জীবনবৃত্তান্ত-সম্বন্ধে তাঁহার গৌরব-তরঙ্গিণী গ্রন্থে উপক্রমণিকার বাহা লিখিয়াছেন, ঐ গ্রন্থস্থানি ইদানীং হুশাণা হুগুণ, ঐ বিবরণটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও,

অহুতবাবু পাঠকদিগের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।”

ইহাতে কেবল যে “অহুতবাবু” পাঠকদিগেরই সুবিধা হইল তাহা নহে, সতীশবাবুর পরিশ্রমও যে অনেকটা লাভ হইল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তিনি যদি সামান্য একটু কষ্ট-স্বীকার করিয়া অগণতবাবুর লেখাটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিতেন এবং অগণতবাবুর সমস্ত লিঙ্গ সাধন করিয়া লইতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের এইসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত না। সতীশবাবুর চায় একজন বিশ্লেষণ বিজ্ঞ বৈষ্ণব-সাহিত্যিকের সম্বন্ধে কেন এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম তাহার কারণ দিতেছি।

গোবিন্দ কবিরাজের পিতার নাম যে চিরঞ্জীব সেন, তাহা অনেকেরই অগণত আছেন। কিন্তু এই চিরঞ্জীব সেন-সম্বন্ধেই হইল দুইরূপ কথা পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ চৈতন্য-চরিতামৃত আছে—

“হুন্দুনাগ, নরহরি, শ্রীরতনন্দন।

গুণবাণী চিরঞ্জীব আর হুন্দুনাগন।”

আবার প্রেমবিলাসে দেখিতেছি রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের নিকট এই বলিয়া আশ্রয়গ্রহণ দিতেছেন—

“তিল্লা-বুদ্বী গ্রামে জন্মলাভ হয়।

পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন মহাশয়।”

কাজেই, এই বিভ্রান্ত স্থাননিবাসী চিরঞ্জীব সেন এক কি বিভিন্ন ব্যক্তি তাহাই লইয়া গোল বাধিল। সুবিজ্ঞ অগণতবাবু ঐ কথা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন, “ইহাতে কেহ কেহ অহুতবাবু করেন যে, গুণবাণী চিরঞ্জীব ও বুদ্বীবাণী চিরঞ্জীব স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এ হুক্তি যে খুব সারসন তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি আমাদের বিবাস, এই দুই চিরঞ্জীবই এক ও অভিন্ন। গোল বড় বিষয়, কিন্তু



আমরা অসম্মিত-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোল মিটার্গার খণ্ডাখণ্ড চেষ্টা করিতেছি।"

জগদ্ধবাবু তৎপরে বলিতেছেন, "আমরা আরো অস্থান করি যে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দের ভুল কুমার-নগর মাতামহায়েই হইয়াছিল।" এই বিষয় লইয়া অনেক বিচার-আলোচনা করিয়া শেষে তিনি লিখিলেন, "আমাদের অস্থান নিকট সত্য হইলে, তাহার ফল এই হাঁড়াই— চিরঞ্জীব সেনের পূর্বনিবাস শ্রীখণ্ডে; খন্ডরাগর কুমারনগরে।"

এই স্বকী ভাষা ভ্রমস্থাপন অসম্মিত-প্রমাণের বলে আরও চারিটা দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করিয়া লইলেন এবং শেষে লিখিলেন, "আমরা বিবিধ গ্রন্থোক্ত বিবরণের সামঞ্জস্য করিবার জন্য উত্তরে যে সকল অসম্মিত বা অম্লিরা আশ্রয় লইয়াছি, তাহা যে সত্য, নির্দোষ ও সত্য, অম্লিরা এক্ষণ নির্দেশ করিতে সাহস করি না এবং আশা করি অতঃপর কোন তত্ত্ব ভুল ও বৈধব্য-লেশক এই সকল তত্ত্বের নিরূপণ বীয়াসা করিবেন।"

জগদ্ধবাবু এই উক্তি-সম্বন্ধে সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "জগদ্ধবাবুর এই 'সকল অসম্মিতের অনেক কথা শুধু কল্পনামূলক হইলেও এইরূপ কল্পনা বাস্তবিক কোনও 'তত্ত্ব', 'ভক্ত' ও 'বৈধব্য' যে পূর্বেচ্ছৃত গ্রন্থের আপাত-বিরুদ্ধ উক্তি-গুলির ইহা অপেক্ষা স্বীয়মাস্যে করিতে পারিবেন, এরূপ মনে হয় না। তিনি এ সম্বন্ধে যে ধর্ম্মতত্ত্ব ও বিচারপদ্ধতির পরিচয় দিয়াছেন, ইহা নিতান্ত প্রশংসনীয়।"

এই সকল বড় বড় মহারথীদের বড় বড় উক্তি শুনিয়া, গোল মিটার্গার যোগ্য তো দুয়ের কথা, আমাদের মাথার মধ্যে আরও গুলিয়া গেল। তাঁহাদেরই এই সকল কথা বুঝিবার জন্য, হুজুর সাহিত্যিক ও পাঠকদিগের নিকট আমরা কয়েকটা কথা উপস্থাপিত করিতেছি।

প্রথমতঃ প্রেমবিলাসী গ্রন্থ-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস শ্রীনিবাসচাৰ্য্য প্রভৃতির সমসাময়িক; তিনি তৎকালীন ঘটনাবলী বাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকটা সূচক দেখিয়া লোখা। এক-কথা জগদ্ধবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রেমবিলাস-রচয়িতা (নিত্যানন্দ দাস)

গোবিন্দ দাসের পিতা চিরঞ্জীব সেনের সমসাময়িক লোক। স্বতঃস্ফূর্ত ভাষার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। ভক্তিরসাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী প্রেমবিলাস হইতে গোবিন্দদাসের আধ্যাত্মিক গ্রন্থ করিলেও তিনি প্রেম-বিলাসের সকল কথা গ্রামাণা না হইলে গ্রাহ্য করিতেন না; কারণ তিনি প্রগট্ট ঐতিহাসিক কবি।"

ভক্তিরসাকর চিরঞ্জীব সেন ও দামোদর কবিরাজ-সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণটী পাইতেছি—

"রামচন্দ্র গোবিন্দ এ ছই সহোদর।

পিতা চিরঞ্জীব—মাতামহ দামোদর।

দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডতে।

যেহৌ মহাকবি—নাম বিদিত জগতে।"

আবার গোবিন্দ কবিরাজ তাঁহার রচিত "দশীত-মাদন নাটক" এ লিখিয়াছেন—

"পাতালে বাহুবলিত ক'ল স্বর্ণে বস্ত্রা বৃহস্পতি।

গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা থণ্ডে দামোদর কবি।"

এখানে আমরা পাইতেছি দামোদর সেনের বাড়ী শ্রীখণ্ডে ছিল। ভক্তিরসাকর আরও আছে—

"দামোদর কবিরাজ মহাভাগ্যবান।

চিরঞ্জীব সেনে কৈলা কালানাম।

ভাগীরথী তীরে গ্রাম কুমারনগর।

অনেক বৈধব্য তথা—বসতি স্থলর।

সেইগ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি।

বিবাহ করিয়া থণ্ডে করিলেন বিতি।

কি কবি চিরঞ্জীব সেনের আখ্যান।

খণ্ডাবাণী সবে জানে প্রাপ্তের সমান।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুর পার্শ্ব বিজয়র।

নিরন্তর সাক্ষীর্ভনে উন্নত অন্তর।

'খণ্ডাবাণী চিরঞ্জীব'—বিদিত সর্বত্র।

দীনহীনে কৈলা যেহৌ ভক্তিরস পাজ।

চৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর মিলনে।

বর্ণিলেন খণ্ডাবাণী চিরঞ্জীব সেনে।"

এখানে আমরা পরিকারভাবে জানিতে পারিলাম যে, চিরঞ্জীব সেনের বাড়ী কুমারনগরে। তিনি খণ্ডাবাণী দামোদরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া থণ্ডে খন্ডরাগরে

হারি বাস করেন। সেখানে তিনি সকলেই প্রিয় ছিলেন এবং সর্বত্র 'খণ্ডাবাণী-চিরঞ্জীব' বলিয়া পরিচিত হইলেন। ভক্তিরসাকর-প্রণেতা নরহরি দাস চিরঞ্জীব সেনের ঠিক সমসাময়িক ছিলেন না—কিন্তু পরবর্তী কালের লোক। তাঁহার সময়ের 'খণ্ডাবাণী চিরঞ্জীব' এই চলিত কথা হইতে কাহারও কাহারও ধারণা তাঁহার পৈতৃক বাড়ী প্রাপ্ত। ইহা দেখিয়া তাহারিগণের ভ্রম সশোধনের জন্য, নরহরি দাস তাঁহার ভক্তিরসাকর উল্লিখিত কবিতার চিরঞ্জীবের পরিচয় বিশদভাবে দিয়াছেন। ইহাই আমাদের মনে হয়।

জগদ্ধবাবু গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্ত-সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তিরসাকর হইতে 'দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডে' এবং গোবিন্দ কবিরাজের স্মৃতিস্মরণ নাটক হইতে 'পাতালে বাহুবলিত ক'ল স্বর্ণে বস্ত্রা বৃহস্পতি' ইত্যাদি হুজুরি প্রোক্ত উক্ত কবিতাও কেন যে তিনি চিরঞ্জীব সেনের পৈতৃক বাড়ী শ্রীখণ্ডে ও দামোদর কবিরাজের বাড়ী কুমারনগরে লিখিলেন, এবং সতীশবাবুই বা জগদ্ধবাবুর ঐ ভুলটা সংশোধন না করিয়া কেন যে গ্রন্থ করিলেন,—তাঁহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক ইহার পরে ভক্তিরসাকর দেখিতেছি একদা শ্রীনিবাস আচার্য্য বাজিগ্রামে নিজবাটীর পশ্চিমদিকে সত্য-বহরীতে নিজপদমহা বলিয়া ভক্তিশাহালাপ করিতেছেন, এমন সময় একখানি দোলা লইয়া বাহকেরা খিরাখারি তথায় উপস্থিত হইল। দোলায় মধ্যে একটা পরম রূপবান্ধব সুন্দর বেশভূষার ভূষিত হইয়া বলিষ্ঠা-আছেন। দেখিয়া যাহা হইল তিনি বিবাহ করিয়া নিজবাটী খিরাগা হইতেছেন। তাহাকে দেখিয়া আচার্য্যপ্রভু বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন, এবং ভাবিলেন—

"কি অপরূপ যৌবন—দেবতা মনে হয়।

এ দেহ সার্থক যদি কক্ষেরে ভজয়।"

তাঁহার পর সন্দের লোকপিণ্ডকে যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে—

"কেহ প্রণমিয়া কহে—'এ মহাপণ্ডিত।

রামভদ্র নাম—কবি-মুগ্ধ বিবর্ত।"

দ্বিবিজয়া চিকিৎসক—বংশধরপ্রবর।  
বৈষ্ণবকুলোদ্ভব—বাস কুমারনগর।"

এই কথা শুনিয়া মন মন হাত্ত করিতে করিতে শ্রীনিবাস নিজালয়ে চালা গেলেন।

রামভদ্র নিকট দোলায় মধ্যে বসিয়া ছিলেন। শ্রীনিবাসপ্রভুর কথাবার্তা তাঁহার কাণে গেল; তিনি অমনি আচার্য্যপ্রভুর পানে চাহিলেন, এবং তাঁহার ভজনের ভক্তিমাধা মূর্তি দেখিয়া তখনই মনে মনে তাঁহার শ্রীপাদপরে আত্মসমর্পণ করিলেন।

বাজিগ্রাম হইতে কুমারনগর যোয়া দূর নহে। বিশ্রামান্তে লোকজনসহ রামভদ্র বাটীতে গেলেন। তিনি সারাপথ কেবল আচার্য্যপ্রভুর কথাই ভাবিতেছিলেন। বাটীতে গিয়াও তিনি হুজির হইতে পারিলেন না,—কখন প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন, এই উদ্ভাবি তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কোনপ্রকারে দিনমান কাট্রা গেল; সন্ধ্যার পরই তিনি পদরক্তে বাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন এবং এক ভাঙ্করের বাটীতে রহিলেন। অতি প্রভুরাে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া আচার্য্যপ্রভুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পদতলে ছিন্নমূলতরুর ডাল পতিত হইয়া বাহ্যবাহ্য দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস তাত্ক্ষণিক রামভদ্রের বাহ্যবাহ্য ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন এবং ধর্ম্মের ধরিয়া গাঢ় আশ্বিন করিলেন, তারপরে পদাধঃকরণে বসিলেন—

"জন্মে জন্মে ভূমি মোর বান্ধবানিশ্বর।

অন্ত বিধি মিলাইলা হইয়া সদন।"

শেষে দুইজনে বসিয়া অনেক কথাবার্তা হইল।

রামচন্দ্র সেখানে থাকিয়া আচার্য্যপ্রভুর নিকট ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি সন্তত ভাষার মহাপণ্ডিত ছিলেন, শাস্ত্রাণ্ডি অনেক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, স্তব্ধতা মনপ্রাণ দিরা দিবানিশি বৈধব্যগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই পাঠ শেষ করিলেন। তখন শ্রীনিবাস শুভকরো তাঁহাকে রাষ্ট্রাক্ষর মনে দীক্ষিত করিলেন।

সে সময় রামচন্দ্র ভাঙ্কর কুমারনগরে বাস করিতে ছিলেন। শ্রীখণ্ড মাতামহের বাটী হইতে তাঁহার কোন সময় নিজ বাটী কুমারনগরে আসিয়াছিলেন তাঁহার উল্লেখ



কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে তাঁহারিণের শৈশব-বয়স। চিরায়তের মুহূর্ত হওয়ায়, মাতামহের আগের তাঁহারিণের অনেক দিন থাকিতে, হইয়াছিল। সম্ভবতঃ মাতামহের মুহূর্তের পর তাঁহার পিতৃদ্বার কুমার নগরে আসিয়া বাস করেন।

রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণের কিছুদিন পরে নবদ্বীপে গুহাধর একতারা প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত অবদর্শন হইলেন। তৎপরে কটক-নগরে গদাধর দাস ও শ্বেত শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুর সঙ্গোপন হওয়ার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গুহাধরকার উপস্থিত হইল। শ্রীনিবাস শোক অভিজুত হইয়া পড়িলেন, এবং দেশে অতিষ্ঠ হইয়া শ্রীকৃষ্ণাবন অভিমুখে ছুটিলেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার শিষ্যসমূহকেও ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব মহাজনেরা চারিদিক শূন্যের বোধ করিতে লাগিলেন। এই সময় রামচন্দ্র শ্রীখণ্ডে গমন করেন। তাঁহাকে পাইয়া রত্নবন্দন কতকটা আশু হইয়া কল্যাণ বচনে তাঁহাকে বলিলেন, “ভাই, আর তো ভিটাইতে পারিতেছি না। এ সময় আচার্য্য-প্রভুর দেখে আসার নিতান্ত প্রয়োজন। এ কার্য্য তুমি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারিবে না। কৃপা করিয়া শীঘ্র কৃষ্ণাবন গিয়া তাঁহাকে লইয়া এস। তারপর রামচন্দ্রকে কৃষ্ণাবনে বাইবার পথ বলিয়া দিলেন। কারণ, রামচন্দ্র পূর্বে আর কখনও কৃষ্ণাবনে যান নাই। শ্রীখণ্ড হইতে রামচন্দ্র খাজিগ্রামে আসিয়া দেখিলেন সকলে অর্দ্ধমৃত্যবস্থায় রহিয়াছেন।

তথায় রামচন্দ্রকে সবে কহে বাস।

শ্রীআচার্য্য বিনা সব হেল অন্ধকার।

না কর বল—শীঘ্র বাহ কৃষ্ণাবন।

আচার্য্যে আনিয়া রাখ সবার জীবন।”

রামচন্দ্র সকলকে প্রবেশ দিয়া নিজবাটা কুমারনগরে করিয়া আসিলেন এবং তাঁহার অল্প গোবিন্দকে লইয়া নিরুত্তে বাসলেন এবং ক্রমে জানাইলেন যে পরদিবস প্রাতে আচার্য্য প্রভুকে আনিবার জন্ত তিনি কৃষ্ণাবনে বাজা করিবেন। তাঁহার পর অভিন্ন যথের আবেগে বলিতে লাগিলেন (যথা ভক্তিরসাকরে)—

“এবে হেথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়।

সমা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয়।

আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম বহু দিন হৈতে।

তাহে বে উপপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে।

শায় এই বাসায়িক পরিভাগ করি।

নির্দিষ্টে অন্যর বাস হয় সর্বোপরি।”

সেই “অন্তর বাস” কোথায়?—তাঁহাও বলিলেন—

“তাহে এই গঙ্গা-পদ্মাবতী-মধ্যস্থান।

পূর্ণাক্ষের তেলিয়া-বুধীর নামে গ্রাম।

অতি গুণগ্রাম—শিষ্টলোকের বসতি।

যদি মনে হয় তবে উপবৃত্ত দ্বিতি।”

তাঁহার পর বলিলেন, বিশেষতঃ

“শ্রীমাতামহের পূর্বে ছিল গয়াত্যাগ।

সকলে জানেন তেঁহো—সর্বত্র বিখ্যাত।”

সুতরাং সেখানে বাস করিলে সকল রকম সুখ ও হারা হইবে।” কোঠের এই প্রস্তাব গোবিন্দের বেশ মত ধরিল; তিনি সম্মত হইলেন। কনিষ্ঠের সম্মত পাইয়া রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন।

রামচন্দ্র হঠাৎ বাসস্থান পরিবর্তনের কথা কেন তুলিলেন এবং যদিই বা পরিবর্তনের আবশ্যক হইল, তবে মাতামহের আগর শ্রীখণ্ডে চাউন্ডিয়া অজ্ঞাত বিশেষতঃ তেলিয়া-বুধীর বাইবার কথা কেন বলিলেন, ইহা এক সমস্যা বটে। কি ভক্তিরসাকর-প্রবেশে নরহরি চক্রবর্তী মহাশয় রামচন্দ্রের মনের কথা টানিয়া বাহির করিয়াছেন। সেই ব্যাপারটী একটু গোড়া হইতে বসিতে চাইতেছে।

যে দিবস রামচন্দ্র প্রথমে গিয়া শ্রীনিবাস প্রভু পাদপদ্মে আশ্রয়সম্পন্ন করিলেন। সেইদিন শ্রীনিবাস কণ-প্রসঙ্গে নরোত্তম ঠাকুরের কথা উপাধন করেন। তিনি বলিয়াছিলেন (যথা ভক্তিরসাকরে)—

“অম্মে অম্মে তুমি মোর বান্ধবভিধ।

অন্ত বিধি মিলাইলা হইয়া সদয়।

ঐক্যে নরোত্তমে মিলাইলা কৃষ্ণাবনে।

“নিরন্তর কেবা না খুরয়ে তাঁর শুণে।

“তৈই একনেত্র—তুমি বিতীর নয়ন।

বোহে মোর নেত্র—চুপুচুপু ছই জন।”

নরোত্তমের যশোরানি তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রামচন্দ্র অজ্ঞাত তাহা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার মনোবৃত্তি অজ্ঞান থাকায় রামচন্দ্র তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আচার্য্য প্রভুর মূখে নরোত্তমের গুণকীর্তন শুনিয়া রামচন্দ্রের মন স্বভাবতই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। আচার্য্য প্রভু তাহা বৃত্তিতে পারিয়া ঠাকুর মহাশয়ের কাহিনী অর্থাৎ কি প্রকারে তিনি লোকনগরে সেবা করিয়াছিলেন এবং লোকনাথ প্রথমে তাহাকে দীক্ষা দিতে রাজী না হইলেও শেষে তাঁহার সেবার মহা হেতা তাঁহাকে শিষ্টজগৎ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন। শেষে—

“হাসিয়া শ্রীআচার্য্য কহে ধীরে ধীরে।

মনে যে কহিলা তাহা হইবে অচিরে।”

সেই হইতে সর্গদ্বয়—

“রামচন্দ্র এই চিন্তা করে মনে মনে।

শ্রীনরোত্তমের সঙ্গ হবে কত দিনে।

হইলে তাঁহার সঙ্গ বাবে সব ছন্দ।

দরশন গিয়া মনে না জন্মিবে স্রুত।

ঐচ্ছ হানে বহি, যাতে স্রুত সঙ্গ মতে।

স্থান স্থির হৈল—মনে ঐচ্ছ বিচারিতে।

সেই স্থানটি তেলিয়া-বুধীর। ইহা নরোত্তম-ঠাকুরের হান পৈতৃক হইতে মাজ চারি কোশ ব্যবধান—পদ্মাবতীর পরগণা। যথা; প্রেমবিলাসে—“তেলিয়া-বুধীর” পদ্মাবতী-তীরে—ও-পারে গড়ের খাঁট দেখ।”

যাহা হউক, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন বটে, কিন্তু এতদিন এই মনোভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার যথিষ্ঠা-সুযোগ পান নাই। আজ তাহাই উপস্থিত হওয়ায় কনিষ্ঠের নিকট কৌশলে “পূর্ণাক্ষের” তেলিয়া-বুধীর কথা জানাইলেন, কিন্তু এই হান যে নরোত্তমের বাড়ীর

গরিকট সে কথা বলিলেন না। যাহা হউক তিনি জানিতেন—

“নিজাতিজ্ঞ জাতা শ্রীধোবিন্দ বিজ্ঞাবান।

কার্য্যেতে চাচুর্ঘ্য চারু সর্গাশ্রয় প্রধান।”

কাজেই গোবিন্দ যখন তেলিয়া-বুধীর বাইতে সম্মত হইলেন তখন রামচন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না।

পরদিবস প্রাতে রামচন্দ্র কৃষ্ণাবন-অভিমুখে বাজা করিলেন।

“আচার্য্য গেলেন পার্শ্বশিখ মাগশেবে।

রামচন্দ্র গমন করিলা শেষ পৌষে।”

আর গোবিন্দ ইহার ২৪ দিন পরে, অর্থাৎ মাসের প্রথমে কুমারনগর হইতে তেলিয়া-বুধীর গেলেন। এবং

“বুধীর পশ্চিমে শ্রীপশ্চিমপাড়া নাম।

তথা সর্গারস্তর বাস—সেহ রম্য স্থান।”

কিন্তু শেষে—“তেলিয়া-বুধীর গ্রামে গোবিন্দের স্থিতি।

তেলিয়ার নির্জন স্থানেতে প্রীত অতি।”

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, প্রথমে গোবিন্দ কুমারনগর হইতে বাস উঠাইয়া তেলিয়া-বুধীর গিয়া বসবাস করিলেন, আর এই প্রথমে রামচন্দ্র কৃষ্ণাবনে গেলেন। সেখানে রামচন্দ্রের স্বপ্নের চেহারা, কৃষ্ণাধ পাকিত্ব ও প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া কৃষ্ণাবনবাসী মুন্ডেই মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। শেষে

“শুনিয়া রামচন্দ্রের কবিত চমৎকার।

‘কবিরাজ’ খ্যাতি হৈল—সদত সত্যার।”

জগদ্বদ্বাবু ‘অমুমিত’ ও ‘হুজি কদমা’ বিশেষ গবেষণা করিয়া যে পাঁচটি দক্ষা স্থির করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে প্রথম দক্ষাটি অর্থাৎ ‘চিরঞ্জীব শ্রীমহাশয় পূর্ণনিবাস শ্রীখণ্ডে ও মাতুলগাও কুমারনগরে’—সহীদ আমরা প্রথমে বিচার করিয়া তাঁহার ভ্রম অবদর্শন করিয়াছি। তাঁহার অমুমিত ও হুজির কল অপর চারিটি দক্ষা নিয়ে প্রশস্ত হইল :—



“২) চিরঞ্জীব কুমারনগরবাসী দামোদর সেনের কথাকে বিবাহ করিয়া খুত্তরানয়েই কিছুদিন বাস করেন; এইখানে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে।

(৩) খত্তরের সুহিত তাঁহার কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়ার তিনি ছই পুত্র লইয়া ধূরী গ্রামে বাইরা বাস করেন। এই ধূরী গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়।”

(৪) ভাটখর পিতার ও মাতামহের মৃত্যুর পর ধূরী হইতে পুনরায় কুমারনগরে বাইরা বাস করেন।

(৫) রামচন্দ্রের উপদেশক্রমে গোবিন্দ পুনরায় ধূরীতে বাইরা বাস করেন।”

আশ-স্বপ্নস্থ বাবু ‘এ-সম্রাজ্যে যে দীর্ঘতা ও বিচারশক্তি’

পরিচয় দিয়াছেন” তজ্জন্ত সতীশবাবু তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, জগদ্বন্ধুবাবু এই সকল উক্তির মূল কোথায়? তিনি কোনরূপ এলাপ প্রয়োগ না করিয়া কি একাকারে এই সকল গিপিরত করিলেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ইহাদের দ্বারা বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট আমরা এইরূপ বুদ্ধি ও উক্তির আশা করি নাই। আমাদের মনে হয়, জগদ্বন্ধুবাবু গোড়ার গলায় করিয়া সমস্ত বিষয়টী একেবারে ভল্ট-পাল্ট করিয়া আরও গোল পাকাইবাছেন এবং চর্য্যোপ করিয়া ফেলিয়াছেন।

তখন:

## সন্মোহিতা

( উপজ্ঞাস )

[ পূর্বাধুস্তি ]

শ্রীউষা মিত্র

চৌধ

মানের জন্ত পিতাকে” তাড়া সিতে আসিয়া তাহার বিবাহ স্থবের দিকে চাহিয়া স্থলেথা শিরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“বাবা ও কি কি হয়েছে তোমার?”

উমাদের মত চাহিয়া ডাক্তার জড়িতকণ্ঠে কি বলিলেন লেখা তাহার বিন্দুমাত্র বৃদ্ধিতে না পারিয়া নিকটে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি সরে বৃদ্ধিতে পারলাম না—আবার বল বাবা আমার বড় কষ্ট হয়েছে।”

“কি শুনিব মা, সব শেষ হ’তে গেছে, বাড়ী পড়ে-ছাই হ’য়েছে, জ্বিতেন পুন করা অপর্যবে হাজতে।”

স্থলেথা মাথা হাত বিয়া বসিয়া পড়িল, কিছুক্ষণ পরে পতাকে বলিল,—“মিথো কথা কে এ সব বলে?”

“মিছে কি করে হ’বে, কম্পাউণ্ডার টেলিগ্রাফ করেছে যে।”

“কই দেখি?” পতিত টেলিগ্রাম তুলিয়া লেখা পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কতকগুলি অক্ষরের সমষ্টে খাতীত অপর কিছু বৃদ্ধিতে পরিল না। আবিষ্টের দ্বার উঠা হাতে লইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল।

উভয়ে কিছুক্ষণ নির্দীকভাবে বসিয়া থাকিয়া ডাক্তার বলিলেন,—“আমি আর যে পারছি না মা, কি দিয়ে এই মকদ্দমা চালাব—জ্বিতেনকেই বা উদ্ধার করব কেমন করে?”

কথাটা বলিয়া ডাক্তার কোচে শুইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে নিঃশব্দে সংবত করিয়া স্থলেথা উঠিল।

গোলাল জলে অঙ্গ স্নান করিয়া পিতার হৃৎ যত্নে মুছাইয়া রাস্তা করিয়া তাঁহাকে স্নান করিতে প্রেরণ পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করিল, “বাবা একটু স্নান হয়েছে?”

“হয়েছি লেখা পাখা রাখ শোন, নগদ কিছু নাই, যদি নি কোন দিন, তোমার মায় আর তোমার গহনা এবং ঐ বাড়ী তা তো সব পুড়েই গেল এখন কি দিয়ে কিছুকে হাজরা?”

“কেন বাবা আমার গায়ে যা গহনা আছে তা দিয়ে রাসকে ছাড়ান যাবে না? আমি এ বিশ্বাস করি না যে গতি দাদা মাছয় পুন করেছে।”

“এ কথা আমিও বিশ্বাস করি না মা কিন্তু কোঠের কথা। ভীষণ জ্বরগার সতি মিথো হয়, আর মিথো সতি হয়। কি হ’বে মা ও কটা গহনা?”

“এ ছাড়া স্ক্রলার মালা আর চুড়ি ক’গাছা ও তো আছে।”

“বুদ্ধির কাজ করেছে লেখা অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা হ’বে; যাক তবু ভাল, কিন্তু কিছু হ’বে না এ টাকার মা।”

“ভর কি বাবা চল আগে যাই কলকাতায়।”

“চল মা” বলিয়া ডাক্তার উঠিলেন।

“এবেগা ট্রেন নেই যে বাবা।”

“নাই ট্রেন-নাই মা” বলিয়া বৃদ্ধ হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন।

“অধর্য্যো হইল না তুমি দাদা নিশ্চয় খালাস পাবেন, চান করে একটু কিছু গাও আমি ততক্ষণ শুদ্ধি দিয়ে নি।”

ভোর করিয়া পিতাকে দানাহার করাইয়া কিপ্রভার গহিত স্থলেথা প্রস্তুত হইয়া বহিল। একটা ছোটবাড়ী ভাড়া করিবার জন্ত কম্পাউণ্ডারকে টেলিগ্রাম করিয়া কতক নিশ্চিত হইয়া স্থলেথা আহার করিতে বসিল।

কলিকাতায় আসিয়া পিতাকে বলিল, “এখানে থেকে টিক জ্ঞান যাবে না তার চেও চল বাবা জ্বাক্কেই আমরা সিরাজগঞ্জে যাই।”

“সেখানে গিয়ে কোথায় ঠাঁভাবে মা।”

“সেখানে রাধার কুন্তলা-দিদি আছে সেখানকার জমীদারের বড়-বোঁ, গায়ে বাড়ী পুছে নিতে কষ্ট পেতে হ’বে না।”

“জিকুর দিদি কখনো সেখানে গেছেন নর মা?”

“হ্যাঁ বাবা।”

“ভবে চল।”

সেই দিনই তাঁহারা সিরাজগঞ্জে রওনা হইলেন।

সেখানে গিয়া ডাক্তার কি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন; কারণ স্থানীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উছাদিগকে মিরিয়া ফেলিয়া জুতা-মোজা-পরিহিতা অপূর্ণ-দর্শনা লেখাকে কোতুলনদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; পথ ছাড়িয়া দিবার আগ্রহমাত্র দেখাইল না। গ্রামের বাহিরে বাইবার সোভাগ্য বাহাদের কোন দিন হয় নাই, তাহারা এই অপূর্ণ বৈশাখী রমণীকে ছই ব্যগ্র চকুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া বিজ্ঞপাশ্বক মন্তব্য তাহার মুখের উপর প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুঠাবোধ করিতেছিল না।

ডাক্তারের সাহসের অনুরোধেও বধন তাহার তাহাদের গন্তব্য স্থান-সম্বন্ধে কোন উত্তর দিল না, তখন তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন; এমন সময় ভগবৎ-প্রেরিতের মত এক বৃদ্ধ ভিড় ঠেলিয়া উছাদের নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদের গন্তব্যস্থান জ্ঞানিয়া লইয়া তাহাদিগকে কুন্তলার গৃহে পৌছাইয়া দিলেন। সারাপথ বালকের দলও মজা ধৈবিকার জন্ত তাঁহাদের পিছু লইয়া আসিরাছে। স্থলেথা ঐ অসত্য লোকগুলার বর্করতা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল এই মহিমময়ী নারী দৃঢ়কণ্ঠে তাহাদিগকে বলিলেন,—“তোমরা বাড়ী গাও, এরা ক্রান্ত হ’য়ে এসেছেন, এখন জিরবেন।” তারপর ডাক্তারকে প্রণাম করিয়া লেখার হস্ত ধারণ কুরিয়া চিরপরিচিত্যর দ্বার বলিলেন, “বাড়ী ভিনতে কষ্ট হয় নি তো বাবা?”

“হয়েছিল বৈ কি মা।”

“আগে যদি একটু লিখতেন।”

জীতেনের জন্ত কুন্তলা জ্ঞাত্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কিভাবে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবেন সে বিষয়ে পরামর্শ করিবার লোক পাওঁ-গোছল না। ইহাদের



দেখিয়া এখন কতকটা আশ্বস্ত হইল। তাহাদের সম্বন্ধে জিনিষপত্র কিপ্রকৃতিতে তুলিতে লেখাকে বলিল,—  
“ভাই ব্যাধ, খুলে বাবদ জামাটা বার করে দাও আমি ততক্ষণ ওর জুতা-চুতা খুলে নি।”

কুন্তলাকে জুতার দিকে হুঁকিতে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন,—“ওকি মা ধাক্কা-ধাক্কা আমিই খুলে নিচ্ছি।”  
জোর করিয়া জুতার দিকটা খুলিতে খুলিতে আধারের হুহুরে কুন্তলা বলিল,—“কেন বাবা, লেগাই তোমার মেয়ে আর আমি কেউ নই?”

এই মেয়েটির সম্ভাষণবিনীত অগত ভয় ব্যবহার দেখিয়া ডাক্তার বিমিত ও পুনর্জিত হইয়া স্বহস্তে তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া বলিলেন,—“তা নয় মা তুমিই যে আমার বড় মেয়ে।”

“কিন্তু বাবা আমি যে আপনার কাছে ভীষণ অপরাধী; আমার যে দোষ সে যে কোন পিঠাই ক্ষমা করতে পারেন না।”

কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হস্তবস্ত্রের ছায় ডাক্তার উহার মুখের দিকে চাহিয়া রাহিলেন। তাঁহাকে এইরূপ অবস্থার থাকিতে দেখিয়া বলিল,—“বাবা বুঝছেন না? আর কি করবো বা বুঝবেন যে, আজ জ্বিতেনভাই এ রাফলীর জুতাই জীবনমুহুরে গন্ধি-বলে এসে দাঁড়িয়েছে।” অশ্রুশোভনায় অকৃতপাশে সে যেন কাঁদিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে সকল কথা শোনা হইলে ডাক্তার বলিলেন,—“মায়ের কাছে করেছে সে; নিজে অপরাধী ভেবে কষ্ট পেতে না মা, এখন বুঝতে পারছি তাকে বাঁচাতে পারব; কারণ এক্ষণে সে মৃত্যুর ভায়ের পথে চলছে—আর বাবা সত্য ও ছায়ের পথে চলে ভগবান সর্বদাই তাদের সহায় হন।”

“কিন্তু বাবা তার বিরুদ্ধে যে এক ভয়ানক প্রমাণ আছে শুনিছি।”

“কি?”

“এখানে বিনয়বাবু, বলে একজন লোক আছে, তিনি সাক্ষ্য দেবেন, আরো না কি কয়েকজন উল্লেখ্য সাক্ষ্য দেবেন, তাঁরা সেখানে জ্বিতেনের বাগির আখ্যাত লোকটা খুন হয়েছে; কিন্তু আমিও বলে রাখছি আমি প্রাণ-পণে তাদের সে চেষ্টার বাধা দেবো।”

“চেষ্টা কর মা লক্ষ্মী। ভগবান অবশ্যই আমাদেবু সফল হ'বেন।” আর ওই আমার এক ছেলো, আকস্মিক ঐখনির যদিও আমার সর্বশ্রেষ্ঠ পেছে তবুও যেমন করে পারি তাঁহা আমি যোগাড়া করব, বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার আমি দেব; কিন্তু যাতে এরা সাক্ষী না দেয় তাই করো মা।”

“আশীর্ব্বাদ করুন বাবা যেন স্রুতকার্য্য হই, আমার কিছু ধন্যত্ব হ'বে না, সে আপনার যেমন ছেলে আমারও তো ভাই।”

লেখা জিজ্ঞাসা করিল “সে মেয়েটির সন্ধান কিছু পেলে দিদি?”

“না ভাই তার সন্ধান মেলে নি, সেই গোপনালের মতো তারা শিবানিকে নিয়ে পাগিয়েছিল; স্বাধী সন্দেহ করতে ঐ বিনয় না কি এ কাজের পাঠা।”

“ও মা এমন পাগিল; তাই নিজের দোষ দ্বারার বাজে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাইছে।”

“তাই, কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এত বড় অবিচার হয় না লেখা, জ্বিতেন নির্দোষ নিশ্চর থালাস পাবে, তার সংকারণের পুরস্কার এভাবে সে কখনই পেতে পারেন না।”

“জান না দিদি মাসারের অসম্ভব বলে কিছু নেই।” উহার ব্যাধা কোণার বুঝিতে পারিয়া মমতার কুন্তলা চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বলিল, কুল বহুনা লেখা সংকারণের পুরস্কার আছে।

“তাই যদি হয়, তবে গীতাঞ্জলি মায় আমার অকালমুখ্য কেন হ'ল দিদি? সে যে তোমার একমাত্র সখল—”

বাবা দিয়া ব্যস্ততার সহিত কুন্তলা বলিল,—“বেলা হয়ে বাবা চানু করে নিলে তুমিও চানু করে নিও লেখা—কৌ করো না।”

ডাক্তারের সান্নাধ্যারের পর শূন্য কলগী কুন্তলাকে তুলিতে দেখিয়া হুলেগো জিজ্ঞাসা করিল,—“কোথা যাচ্ছ দিদি।”

এই রমণীর প্রত্যেক কার্য্য হুলেগো প্রশংসামান হ'তে দেখিতেছিল।

“জল আনতে যাচ্ছি ভাই, তুমি ওতমণ চার করে নাও।”

“জল আনতে কি তুমিই যাবে?”

মসিরা কুন্তলা বলিল,—“নয় তো কে যাবে লেখা? কি গ্রাস নেই তো?”

“দিদি সব কাজ তুমিই করো?”

“আমি না করলে কে করবে ভাই।”

“আগে জামাইবাণ্ড থাকতে তো কখনও করতে হয় নি তোমাকে দিদি।”

“তখনও কাজতম ভাই—শুধু জল তোলা; বাসন মাজা বাকি সব কাজই করতাম।”

“তখন অনেক লোকজন ছিল শুনেছি, তবে নিজে কেন করতে দিদি?”

“নারী-জীবনের সার্থকতাই যে সেবা ও আত্মত্যাগের ভের দিয়ে চুটে ওঠে।”

শুধু-নেত্রের ঠাণ্ডার দিকে লেখাকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া কুন্তলা প্রশ্ন করিল,—“কি দেখে লেখা?”

“কিছু না, কাজ করতে আমারও ভাল বাপে, কিন্তু বাসন মাজা, জল তোলা এ সব বাদে।” আচ্ছা দিদি সত্যি করে বলা, যখন এ সব কাজ তোমার প্রথম করতে হ'য়েছিল তখন কষ্ট হ'ত না?”

“প্রথম প্রথম হ'ক বই কি?”

“এখন?”

“এখন কই কষ্ট তো আর হয় না—ময়ে গেছে। প্রকৃতির নিম্ন যে এই, চিরকাল কোন কিছুই ত্রীভূতা সমানভাবে থাকে না, নয় তো ত্রাজ পাগল হয়ে যেতুম।”

“কিন্তু—”

“আর কিন্তু নয় বেখা যে আর নেই পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর ভাই, জল নিয়ে আসছি।”

“তুমিও কি পুকুরে স্নান করবে?”

“হ্যাঁ।”

“তবে আমিও বা।”

“বেশ ভাল পুকুরে। কখন চান কর নি বোধহয়, আজ দেখ কেমন লাগে।”

পুকুরে নামিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া কুন্তলা বলিল,—“কিন চান করার সাম মিলে?”

লজ্জিত লেখা উত্তর করিল,—“কিন্তু এ যে একেবারে খোলা যায়গা যদি কেউ দেখে?”

“কেউ দেখবে না, এ সময় এখানে বড় একটা কেউ আসে না, জমিদারের পুকুর কি না।”

বান করিয়া ভিজা-কাপড়ে উঠিতে উঠিতে লেখা বলিল,—“এ গাঁয়ে এতবড় বাড়ী তো দেখি নি, এ কাদের বাড়ী দিদি?”

“জমিদারদের।”

“জমিদারদের—তোমাদের?”

হৃদয় অটলিকা ভাল করিয়া দেখবার মানসে চাহিতে গিয়া হুলেগো দ্বিতলস্থ গবাক-পার্শ্বে মহাদ-মুদ্রির্শনে লজ্জা পাইয়া চোখ নাবাইয়া লইল।

“দেখ দিদি কি অসভ্য লোকটা, মেয়ে চান করতে তা ও হাঁ করে দেখছে?”

অশচ্য হইয়া কুন্তলা উপরের দিকে চাহিল।

“কে ও দিদি? দেখতে গেয়েছে? না ও সরে গেল তোমাকে দেখে, মাগো কি বিদ্রী, কি কালো।”

কুন্তলা রমেনকে দেখিতে পাইয়াছিল, কি কি ভাবি চুপ করিয়া রহিল।

পনের

সঙ্কট কক্ষে আত্মত কার্য্য-বচিত গামিচার উপর রূহ শুভ তাকিয়ার ঠেস দিয়া। পারিষদ-বেষ্টিত জমিদার রমেন চৌধুরী বিমোহিত। ট্রেস উপর হিটো বোতল ও কয়েকটা কাচের গ্লাস সমুপে রাখিত, এক ধারে কতকগুলো মোড়ার বোতল পড়িয়াছিল। অলৌকিক-পূর্ণ নয় ও অন্ধন হৃদয়দ্বিগণের কর্ণধী চিত্র দেয়ালাগারে লিখিত রাখিছে। গৃহের এক কোণে কার্য্যকার্য্য হৃদয় এক প্রকাণ্ড বীণ রহিয়াছে। শুণ্ডের মধ্যে রমেন বীণ বাজাইতে চমৎকার। এ অঞ্চলে উপর ছায় বীণ বাজাইতে বড় একটা কেহ ছিল না। ব্যাভিনায়া ওভারগণ দূরদেশ হইতে বীণ শুনিতে আসিয়া মুগ্ধ হইতেন। এই মণিগণে তখন হারমোনিয়ামের চাবী টিপিয়া এক ব্যক্তি ভাঙা গলায় গান দরিল। বিরক্ত হইয়া রমেন বলিল,—“থাম, হে থাম।”  
কথাটা মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল যিনি মিত্র গ্লাস পূর্ণ করিয়া উপর মুখের দিকট আগাইয়া দরিল।



তাচ্ছিল্যভরে উঠা ঠেসিয়া দিয়া জমিদার বলিলেন,—  
“আর নব আজ থাক।”

“সে কি ঐশ্বর্য আজ মন্যমি—আজ দেখছি তোমার মেজাজ ভাল নেই, চল না শিবানীর কাছে যাওয়া যাক, সে বোধ হয় এতদিনে সারোতা হয়েছে, গহনাও তো কম পায় নি, আর ফিট-ফিটনে নেই বোধ হয়, চল না হে।”

“না আজ থাক।”

“তবে বীণই না হয় বাজাও, অনেক দিন শুনি নি।”

“তাও ভাল লাগে না, আমি এমন একলা থাকতে চাই বিনয়।”

বোতলের প্রতি লোপুদু দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে নিরাশ হৃদয়ে সে নিবনের মত সকলে বিদায় লইল।

গৃহ নীরব হইলে রমেন ডাকিল, “ভ্রাম।”

“আজ্ঞে।”

“নিগধরকাকাকে ডাক।”

নিগধরবাবু রমেনের পিতার আমলের বুদ্ধ কর্মচারী। তখন জমিদারকে ইনি বাস্তবিক স্নেহ করিতেন, রমেনের অসম্ভব অসম্ভব খোরাপ এই বুদ্ধ যথাসম্ভব পুস্প করিতেন। রমেন ইহাকে ভর এবং একটু মাত্তও করিত।

নিগধরবাবু আসিয়াই প্রণ করিলেন, “আমাকে ডেকেছ রমেন।”

“হ্যাঁ কাকা ডেকেছি।”

“কেন করছ বাবা, সব সময়ে ঐ বাঁদর লম্পট-গুলোর সঙ্গে থেকে না। রাতদিন ভগবানের কাছে কামনা করি—”

“বোস কাকা হাঁ এবার আমি ভালই হ’ব। ভূমি জগৎ ক’র বংশ লোপ হ’বে বলে।”

“সে তো ঠিক। বিয়ে যদি না কর বংশ তো লোপ পাবেই বাবা—বর্ণীয় কর্তৃমাহাশয় এক গণ্ডুয় জগৎ পাবেন না—কত বোকাই তোমার, ঐ যে শনিয়া সব তোমার ঘিরে থাকে—”

বাধা দিয়া রমেন বলিল, “এই কথা বলতেই তো ডেকেছি কাকা, বিয়ে দাও আমার।”

আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলেন—“হুম্ব দাও, একবার বল বাবা, হাজার হাজার মেয়ে এনে হাজির করে দেব।”

“কিন্তু সেই মেয়েকে যদি না পাই তো বিয়ে করবো না।”

বিস্মিত হইয়া নিগধর বলিলেন, “কোন মেয়ে? কোথায় থাকে?”

“তা তো জানি না কাকা, আজ বৌদির সঙ্গে পুত্র স্নান করতে দেখেছি।”

“হাঁ হাঁ বুঝি, তাঁরা বড়মার বাড়ীতে এসেছেন, কিন্তু তারা যে ক্রিচ্চান।”

হাসিয়া রমেন বলিল, “ক্রিচ্চান হ’লে কি বৌদি বাড়ীতে থাকতে দিতেন?”

“তাও বটে, বড়মার বাড়ীতে আছেন, আমার জুতো মোজা পায় দেয়।”

“আজকাল কলকাতার মেয়েরা ওসব পরে থাকে। ঐ মেয়ে না হ’লে বিয়ে করবো না কাকা তা আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি।”

“কি এমন হুকুম সে মেয়ে—তার চেও ঢের ভাল মেয়ে এনে দেব।”

“তবে থাক।”

নিগধর অধির হইয়া উঠিলেন, “না না ও কথাও কথা বইতো নয়, সে মেয়ে যেখানে থাক—পাতালে থাকলেও এনে বে দেবো।” নিগধর গমনোচ্ছত হইলে রমেন পুনরায় উত্থাপ্ত করাইয়া দিল, “এ পাত্রী না হ’লে কিন্তু কাকা আর বিবাহ করব না।”

পরিস্রব অন্তরে আসিয়া রমেন মাসীমাতাকে বলিল, “মাসী ভূমি না বল, আর বাটতে পারছি না, সেইজন্মে তোমার মাসী আনব বলে চিকিৎসা করছি।”

কথাটা কিন্তু মাসী বৃষ্টিয়াও বৃষ্টিতে টাকিলেন না, তাবিলেন, সর্গনাশ রমেন বিবাহ করবেন না কি। যথু আসিয়া যদি উহার অপ্রতিহত প্রতাপ কাড়িয়া লয়। কোথায় তিনি ভাবিতছিলেন পণের অন্তরায়রূপ ইহার বিবাহান্তে অধিকারটুকু কায়েদী করিা লইবেন, না এ আবার এক মিটিউ। রমেনকে আবার এ কুমার দিল কে? সেই বড়-বৌটা নয় তো?”

“কি মাসী বুঝে না?”

“না বাবা।”

“বিয়ে করবো।”

একথা হইতেই ইলা সেখানে আসিয়া কথাটা শুনিয়া অননে উৎফুর হইয়া বলিল, “সত্যি দাদা বিয়ে করবে ভূমি?”

“হ্যাঁ রে সত্যি।”

“না দাদা আমার কিন্তু বিবাহ হচ্ছে না।”

“আজ্ঞা কি করলে তোর বিবাহ হয় বল?”

“বৌ ঘরে আনলে।”

“বেশ তে যাগাধ-বাড়া কর,—ঠিক পরন্ত বিকেলে বৌ এনে দেব তাকে।”

বিস্মিতা মাসী কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রশ্ন করিল,—“ও না পরন্ত বিয়ে করবি কিরে, কার মেয়ে, কেমন মেয়ে, জানা-শোনা নেই অমনি বিয়ে করবি?”

ধমক দিয়া ইলা কহিল, “নাও নাও তোমার আর দর দেখাতে হ’বে না, না জেনেই কি দাদা বিয়ে করছে?”

“এই দেখলি বাবা, যুগের সামনে কেমন ধমক দিলে, এ মেয়ে যার ঘরে যাবে তার ভয়স্ত নেই, বে গা হয়ে আমার বিয়ের করে দে, এত যুগনাড়া আর হইতে পারি না? কিসের জন্মে পড়ে আছি—বলি মাসীটা বয়ে বাবে তাই না এ অপমান সয়ে পড়ে মাছি, আর পারি না, আমার বিয়ের করে দে রমেন।”

একটু আদরের-ধমক দিয়া রমেন বলিল, “আজ হয় আসে নি তো ইলা?”

“এসেছে দাদা।”

“তবে যে বাইরে এসেছিল, যা ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক, পর বিয়ে হ’লে সব পাগলামী সেয়ে যাবে মাসী।”

“অন্তবড় মেয়ে হ’ল বিয়ের তো কিছু দেখছি না বাবা, চোঁও করছ না।”

“কিন্তু আমি যে কিছু করতে পারি না মাসী, সে বৌদি করবে।”

যথু কাইয়া মাসী বলিলেন, “কে জানে সেদিন যুগ্ম তা গ্রাহি করলে না। ছেলে পর্যন্ত ঠিক ফেলেছিলুম—সে ছেলে মেয়ের পছন্দ হ’ল না, দেখি ফট-বৌ কেমন বর আনে।”

“কোন ছেলে।”

“এই বাবা আমার বেওরগো, মন্ত জমিদারের ছেলে।”

“লোখাপড়া কতদূর শিখেছে?”

“তিনখানা কেতাব পড়েছে, এমন ছেলে হাতছাড়া করলে পাত্তাতে হ’বে।”

“কেমন ক’রে হয় মাসী, লোখাপড়া জানে না যে মোটে, এ ছাড়া বৌদির যখন মত নেই।”

“মেয়েমাহবের মতে কি এসে যায়, মেয়েমাহবের আবার একটা মত—আদল কথা তোমার নিজেই মত নেই।”

“কিন্তু এ হ’বার উপায় নেই, বাবা-বা যে ইলাকে যুগ্মর সময় বৌদির হাতে বিয়ে গেছেন।”

“কিন্তু সে যখন মত না তখন?”

“কি করে জানলে তিনি চোঁটা করছেন না? হয় তো বুঝেছেন বিয়ের সময় এখন হয় নি।”

জগিয়া উঠিয়া মাসী বলিলেন, “তোদের ঐ এক কথা বাপু, আঠার-উনিশ বছর বয়স হ’ল এখনও না কি বিয়ের বয়স হয় নি। বড়বৌ বুঝেই ওকে যা আদর দেখায়, জান না তো ও মিট-মিটে ডান, মনে বিয়ের ছুরী।”

গৃহের মধ্যে থাকিয়াই রাগে গর-গর করিতে করিতে ইলা বলিল, “বর্ণদ্বার মাসী, বৌদির নামে যা তা বল না ভূমি।”

“কি করবি ভূমি, বড় দরদ, তরে বিয়ে দিচ্ছে না কেন?”

“সে ভাব ইচ্ছে, আর আমি বিয়ে করবো না, কি করবে ভূমি। দেখ দাদা বৌদিকে মাসী যদি এমন করে অভদ্রের মত কথা বলে ভাগ হ’বে না কিন্তু।”

উজ্জ্বল “মাসীমাতা চোঁটাইয়া উঠিলেন, “বটেই তো, আমিই হয়েছি যত, মন্দ, এত অপমান সয়ে থাকছি না আর এ বাড়ীতে।”

মধ্যস্থ হইয়া অতি কষ্টে উভয়কে কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা করিয়া রমেন বহিরাগত্রে গমন করিল।

খোল

গৃহে ফিরিয়া ভাল ভাল উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া কোর্টের খরচ চালাইতে লেখার গহনা-বিক্রীস্বয় যথ



মাত্র শতাব্দেক মুদ্রা অবশিষ্ট রহিল, ডাক্তার তখন প্রমদা গরিনেনে—ভাবনার চিন্তার অস্থির হইয়া উঠেন। কোথায় কাহার নিকট টাকা চাহিবেন, আর চাহিলেই যে মিলিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? পূর্বের যুগের পর হইতে প্রাকটিক ও ছাত্রীয়া দিয়াছিলেন, এখন সম্ভার চণানেই থ'ট। অত দামী ঔষধপূর্ণ আগমারী ওসিও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, হুজীবান্য ডাক্তার অস্থির হইয়া উঠিলেন।

লেখা বলিল, “বাবা তুমি অত ভেব না, কি হ'য়ে যাচ্ছে দিন দিন। যেমন করে হোক চলে যাবে, দাদার খরচের টাকা তো আছে এখনও?”

পিতা হইয়া কেমন করিয়া বালিকাকে জানাইবেন যে অবশিষ্ট টাকা আর সামান্যই আছে। হুলেবা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “যে টাকা আছে তা'তে এখনও কতদিন চলাতে পারে?”

ডাক্তার একবার কোন উত্তর দিলেন না, কারণ সত্য কথা বলিয়া উহাকে অবিকতর চিন্তাশ্রিত করিয়া তুলিতে তাহার প্রয়াস হইল না।

“কথা কচ্ছ না যে, বল না বাবা?”

“সে হবে এখন, তুই কিছু ভাবিস না মা।”

লেখা যখন বুকিল পিতা উহাকে গোপন করিতেছেন, তখন সে আবার প্রশ্ন করিল, “আর কিছু হাতে নেই বুঝি বাবা।” ডাক্তারকে নীরব থাকিতে দেখিয়া উত্তরে সহিত সে প্রশ্ন করিল, “জাচ্ছ আর কত আদায় লাগতে পারে?”

“তিন চার হাজারও পারে।”

হুলেবা শিরিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে পিতাকে সামান্য দিয়া বলিল, “এর জন্যে ভেব না তুমি, ও টাকা যোগাড় হ'য়েই যাবে।”

কিন্তু এ হলে বাগুয়া যে কিরূপ চক্কর পিতা-পুত্রী কাহারও অবিরতি দিল না।

“শিশুগীর কি টাকার দরকার হ'বে?”

“হ্যাঁ।”

লেখা কি বলিতে গিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান নর আগন্তুক-মুখ দেখিয়া ধামিয়া গেল; বিরক্তিতে চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল,

নিশ্চয় উহার তাহাদের মৈন্যের কথা শুনিয়া ক'রিয়াজেনে ভাবিয়া লেখা মুকুটে বলিল, “বাবা দেখ ওগা কে এসেছেন!”

অপর দ্বার দিয়া লেখা বাহির হইবার সময় তাহার বর্গে প্রবেশ করিল, “এইটা বুকি আপনার ঘরে। আপনার কাছে একটা বিশেষ কাজে আমার এসেছি।”

লেখার আর বাগুয়া হইল না। দ্বারের পশ্চাতে উদ্ভীষ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তারাবু তাঁহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিয়া আসল গ্রন্থ করিতে অহরোধ করিলে দিগধর মিত্র ও তাহার স্ত্রী আসল গ্রন্থ করিলেন। তৎপরে দিগধরবাবু বলিলেন, “আপনার কন্য়ার একটা ভাল সধক এনেছি মশায়,”

ডাক্তার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসের সধক?”

দিগধরের স্ত্রী বলিলেন, “বিয়ের সধক।”

“ক'র?” ডাক্তার যেন বুকিতে পারিতে ছিলেন না।

“আপনার মেয়ের।”

“আমার মেয়ের? এখন তার বিয়ে দেবার বয়স আমার মনের অবস্থা তো নয়? আপনারা কি এ ধরনের পন্থা গ্রহণ করিতে এসেছেন। আর বিয়ে তো এখন দেব না।”

“সে কি মশায়, বয়স মেয়ের বিয়ে-দেবেন না? আমার ঠিক হ'য়ে গেছে কি?”

“হাঁ—না” বলিয়া অবিচলিতকণ্ঠে বলিলেন, “কি বিয়ে এখন দেব না।”

মুকুটে দিগধর বলিলেন, “দিলে কিন্তু ভাল করতেন, এমন পাত্র হাজারে একটা মেলে না, ও ছাড়া বরণপণও কিছু তিনি নেবেন না, তু' মেয়ে।”

“না বিয়ে দেব না।”

“তবুও দেখবেন বাঁচার মধ্যে একবার পরামর্শ করে।”

দৃঢ় অথচ শাস্তকণ্ঠে ডাক্তার বলিলেন, “নাগ করবেন মশায় এ হ'বার নয়।”

“কিন্তু এখন পাত্র, থাক আপনার যখন ইচ্ছেই নেই,

—তবে যোগ্য বড় হারালেন, আর যেনক অবহার কখনো শুভিতে পেলো তারও প্রতীকার করবার চেষ্টা করে পারি।”

কোনরূপ আত্মহের ভাব না দেখাইয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, “পাত্র কতদূর পড়েছেন ও কি করেন?”

“পড়েছে কি মশায়, সিয়াজগায়ের জমিদার—তিনি আমার পড়বেন কি? তার জমিদারীর আর যে বছরে তিন মাসের ওপর তবে ঘরে মাইটার রেখে বীতিমত লেখাপড়া করেতেন।”

“সিয়াজগায়ের জমিদার—তুনেছি তার স্বভাব-চরিত্র না কি ভাল নয়।”

“আঃ ওসব বাজে কথা, এমন হীরের টুকরো ছেলে বেথা যায় না, তা কি জানেন জমিদারের শরৎ অনেক, কেউ হয়তো এই রকম রত্নের থাকবে; তা' মশার কার মুখ বন্ধ করবো ব্যগুন? এখন আপনারের পতির জিজ্ঞাসা করতে পারি?”

ইহারে আরচনে ডাক্তার বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; সেইজ্ঞ বলিলেন, “কি হ'বে পরিচয়ে ওখানে যখন বিয়ে হ'তেই পারে না।”

এই সামান্য লোকটিকে বার বার খোশামোদ করিতে বিগধরের ইচ্ছাই হইতেছিল না। কোথার এমন এক জমিদারকে জামাতরূপে পাইয়া আনন্দে বৃদ্ধ গুণী হইয়া উঠিলে, না—আপতির ওপর আপত্তি, কিন্তু কি করিলেন, (কৌ) “যেমন যখন জেদ ধরিয়াছে তখন যে কোনও উপায়ে হোক ইহাকে রাবী করিতেই হইবে। কি একটু ভাবিয়া বিগধর বলিলেন, “মাগু করবেন মশায়, অনিচ্ছায় মৈথবাগে আপনারদের পিতা ও কন্য়ার কথাগুলো খানিকটা শুনে ফেলো, কি অভ্যাসের—বিগধের কথা না বর্ণিতেন। ৪৫ হাজার বত চান এগুনি জমিদারমশায় দিতে পারেন—প্রতিবর্ষে শুধু ছই হাতে মুখ ঢাকিয়া আন্তরকটে ডাক্তার বলিলেন, “টাকার শোভ দেখাবেন না। না, না পারব না আমি লেখাকে বলি দিতে—”

বিগধর মিত্রের তাঁহার অন্তরের কথা যেন বুকিতে

পারিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, “সে কি, বলির কথা কি বলছেন, আমাদের বড় হ'য়েন আপনার মেয়ে, আমরা কত না আত্মদেই রাখব। তারপর দেখুন কত বড় সাহায্য পাচ্ছেন; উপরন্তু ঈমিদারকে জামাতরূপে পাবেন।”

কি বলিতে গিয়া ডাক্তার চুপ করিয়া গেলেন। দিগধর আসল ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “জাচ্ছা নমস্কার তা হ'লে আমি মশায়, বিকলের দিকে একবার আসব—মনস্থির করে উত্তর দেবেন—পরন্তু ভাল দিন আছে, যদি ইচ্ছা করেন ঐ দিন বিয়ে দেবেন, টাকাও পরন্তু পাবেন।”

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া উহার প্রস্তান করিলেন। প্রস্তর-মুদ্রিত তাঁর ডাক্তার বসিয়া রহিলেন। নমস্কার বা ভয়েচ্চিত্র ছ'টা কথাও বলিতে পারিলেন না। স্বভের বেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া আকুলকণ্ঠে লেখা বলিল, “কিরোও বাবা, ওদের কিরোও, অমত করো না, তুমি কি ব্যভ না, টাকা-পেলে দান পালাস হ'বে।”

বুদ্ধের গণ্ড বহিয়া অগ্র বসিতে লাগিল। বাগদারগণকণ্ঠে বলিলেন, “মা জেনে শুনে টাকার লোভে অন্তবড় পতন হাতে তোমাকে তুলে দিতে পারব না।”

“কিন্তু দাদার কথা কি একবার ভাবছ না।”

“ভাবছি সবই লেখা, কিন্তু উপায় নেই।”

“যদি লেখা মারাত হ'য়ে যায়, তাঁর কি শান্তি হ'বে তা

কি ভাবছ না?”

“ভেবেছি, হর দাঁসি নয় দীপান্তর।”

“এ জেনেও আপত্তি করছ তুমি।”

‘অগছ বিষয়ে হুলেবার চক্কর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ব্যথিতভাবে ডাক্তার বলিলেন, “সব জেনেও আপত্তি করছি মী, তার সঙ্গে সঙ্গে রিনাগোরে আর একজনকে দাঁসিতে তুলে দিতে বলিস তুই?”

“কিন্তু দাঁসিতে তুলে দিচ্ছ না তুমি, জমিদারের গৃহীণী করে দিচ্ছ, অমত করো না বাবা।”

“এতে আমি মত দিতে পারি না, মিথ্যা অহরোধ



করো না; বিনাধোবে এমন ভীষণ শাস্তি কোনও বাপই তার মেরেকে দিতে পারে না।”

“মেরেকে পারে না, কিন্তু বিনাদোষে ছেলেটিকে পারে, এই কথাতে চাও তুমি।”

“আমি তো তাকে শাস্তি দিচ্ছি না বা, আমি যে কত নিকুপা, কত অসহায়, সে তো তুই বুঝি না। নিষ্ঠুর আমি, বড় নিষ্ঠুর, তবু সবটা তুই জানিস না। শোন শোনা, আমি কত বড় ছদ্মরহীন পাপও, যখন ভাতা চাকার সোভ দেখিয়ে চোপের সামনে জিতেনের মুক্তির চির একে মিরেছিল, তখন পুঙ্খ হ’য়ে উঠেছিলুম, তাকে পান্ডুর হাতে তুচ্ছ দিতে প্রাপের মাঝে কিসের প্রেরণা জেগে উঠেছিল, এমন পাপও অর্থলোভ পিতা সম্মানে কি আছে মা?”

পিতার পদস্বর বেধন করিয়া উচ্চস্বরে শোনা বলিল, “বাবা বাঁচালে আমার, তোমার নিষ্ঠুর ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলাম, ক্ষমা করো বাবা, কিন্তু অমত করো না, দাদাকে বাঁচাও।”

“কিন্তু, তুই তো জানিস না মা সে কত বড় চরিত্রহীন—লশট—আম—।”

“জানি বাবা, শুনেছি সব, কিন্তু মিছেও তো হ’তে পারে, ওরা সেই কথাই বলছিলেন না?”

“হ’তে পারে, কিন্তু সে যথ, এ কথা তো মিথ্যা হ’তে পারে না শোনা। আর দেখতেও সে কুৎসিত।”

“আমি তাকে দেখেছি বাবা।”

“তুই তাকে দেখেছিলি কোথায়?”

“কুস্তগা-দিদিদের পুকুরের কাছে তাঁদের বাড়ী, সে দিন জানলার ঠিকে দেখেছি।”

পিতা কন্ডাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “দেখে, সব জেনেও বিয়ে করতে চাচ্ছিলি মা।”

“হী বাবা।”

“না শোনা এ করার—আর একবার চেষ্টা কর’বে দেখব।”

“মিছে চেষ্টা, অনর্থক দেবী করো না, পরত দিবে ফেল।

টাকা হাতে এসে লাবার ব্যবস্থা হ’বে।”

“পরত? কি বলছ শোনা, ভাববারও সময় পাব না?”

“না বাবা ভাববার সময় নেই, এতে আমাদেরই লাভ,

টাকাটা দয় শিপুগুণি হাতে আসে—ওদের কর্ণার ঋমত করো না। পরন্ত দিয়ে ফেলো।”

“না আমি আরও একবার চেষ্টা কর’বে।”

“কে দেখে অত টাকা, যুগুজ না কেন বাবা, এখন তুমি বুজো হয়েছ, দাদাকে ছাড় পাবারও ঠিক নেই, এ সব কে টাকা ধার দেবে, কার এমন মহৎ প্রাণ আছে যে, আমার এ অসহায় নিম্নাৰ্ণকাবে টাকাটা এখনকার মত পাবার আশা না রেখে ধার দেবে—”

“পারে মা একজন দিতে পারে।”

আগ্রহভরে শোনা জিজ্ঞাসা করিল, “কে সে বাবা?”

“ভুলেছি নবনের বাবা মারা গেছেন, উল্লের সন্তান—মারে অর্ধেক তার—আর নগদ টাকাও সে অনেক পেয়েছে।”

হস্তগা পিতার মুখ চাপিয়া আহতকণ্ঠে শ্রলোনা বলিল, “চুপ কর বাবা, ওরা কাছ থেকে সত্যিই যদি সাহায্য দেও, তা হ’লে কোনদিন তোমার আর ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পার না। বাবা, বাবা, আমার একমাত্র আনন্দ, একমাত্র সখল কেড়ে নিও না তুমি।”

শুভ্র ডাক্তার পাখানের ছাত্র অলোভাবে বসি রহিলেন।

কতকণ পরে নিজেকে স্মৃত করিয়া শোনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবচলিতকণ্ঠে বলিল, “তা হ’লে যখন তার আগমনে মত দিয়ে পরন্ত দিন ঠিক করে ফেলো।”

ভূতাবিষ্টের মত ভীত-চকিত ডাক্তার কিছুকণ কঠোর মুখের দিকে নির্নিমেধ নেড়ে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, “হী তাই হ’বে মা।”

আনন্দগঙ্গারকণ্ঠে গমনোন্মুখ শোনা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “বাবা কিছু গুণ্য করো না, তুমিই তো নিজে আমার বিয়ে দিচ্ছ না। আমি খেছায়, স্মৃণী হ’য়ে বিয়ে করছি—স্বয়ংস্বা চাই।”

“শোনা বা আমার, তোমার মন যে এত উচ্চ তা জানব না, আমার ভজ তুই চিরজীবনের মত এত বড় ভাগ্য স্বীকার করবি? কিন্তু মেয়ের কর্তব্য ছাড়া বাপেরও তো কর্তব্য আছে মা।”

“আবার তুমি অমন করছো? তা হ’লে তোমার

অবস্থা হ’লে নতুন করে তোমার আশাত দিতে হ’বে, কিন্তু যে আশাত দিতে প্রাণ যে আমার চাইছে না, তোমার অবস্থা হ’তে বাধ্য ক’রো না বাবা।”

“আচ্ছা তাই হ’বে—জীবনের সার্থকতা কোথায়, আজ এত বড় আশ্বতাপের ভেতর দিয়ে তুই দেখিয়ে দিবি, কিন্তু এতাপে সবাইই সমান অধিকার এ কথাটা যেন ভুলে বাস না শোনা।”

“তুল তুমি করছ বাবা, আশ্বতাপের একমাত্র নারীই অধিকারিণী—এর ভেতর দিয়েই যে তাদের জীবন গড় হয়,

পরিপূর্ণতার ও সার্থকতার আনন্দে ভরে ওঠে। এ যে তুমিই কতবার আমার শিখিয়েছ, আজ তা তুলে চলে কেন বাবা।”

পূর্ণাঙ্গিতকণ্ঠে মুগ্ধ ভীক্তার বলিলেন, “শোনা মা, আমার, আশীর্বাদ করি তোমার অসহায় বাপের দেওয়া এ গুণ্য—সইবার মত মনের বল যেন কোনদিন না হারান।”

ভক্তিবস্ত্রে পিতার পদগুলি মস্তকে লইয়া শোনা বলিল,

“তোমার কথা তো কোনদিন মিছে হয় নি বাবা।”

ক্রমশঃ

## যোগমায়া কি?

প্রতিভেজ্ঞানাথ বহু

যোগমায়া ভগবানের শক্তি অর্থাৎ ভগবতী।

তিনি ভগবানের পরা-প্রকৃতি এবং ভগবানে যুক্ত।

তিনিই মারাত্মক প্রকাশ করিয়াছেন।

কিতি, অপ, তেজ, মজ, বোম, এই পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই ষড়বিধ ভগবানের অপরা প্রকৃতি।

তুমিরাপোহনলো বায়ুঃ থং মনোবুদ্ধিরেব চ।

অহংকার ইত্যায় মে ভিত্তা প্রকৃতিঃস্বয়ং।

গীতা ৭।৪

পূর্বযোব্রহ্মের ভূই প্রকৃতি আছে, একটা পরা বা শ্রেষ্ঠ, আর একটা অপরা বা নিম্নত। তেমন প্রকৃতিই অপরা বা অচেতন প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

বরেনঃ ধার্যতে ভগবৎ। গীতা ৭।৫

প্রকৃতি ও পুরুষ বাক্য ও অর্থের ভাৱ নিত্যযুক্ত।

যোগমায়া যখন ভগবানে বা পুরুষে যুক্ত, তখন তিনি

বিশিষ্ট জ্ঞানরূপিণী বা ব্রহ্মবিদ্যামায়িনি অর্থাৎ যে বিজ্ঞার দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় এবং যিনি ব্রহ্মবি তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন। জীব চৈতন্যকে জানিতে পারিলে পরমাশ্বাকে বিদিত হয়। ঈশ্বর যোগমারূপে আচ্ছাদিত বলিয়া লোকে তাঁহাকে জানিতে পারে না।

নাথঃ প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মুচ্যেহাং নান্তিজনানতি লোকো মামমব্যয়মহং।

গীতা ৭।২৫

তাই ভক্তহীন যুগলপ তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেও তাহাকে দেখিতে পার না। আমরা যতকণ পূর্ণ্য সেষ্ট যোগমারূপকে অর্থাৎ ভগবানের পরা-প্রকৃতিকে প্রসন্ন না করিতে পারি, ততকণ পূর্ণ্যত আমরা ভগবানে যুক্ত হইতে পারি না। যোগমায়া কৃপা করিয়া দ্বিঃ বুদ্ধির দ্বারা যুগিয়া দিলে, আমরা আমাদের দ্রুয়গতি নারায়ণের সহিত যুক্ত হইবার অধিকার



করি। ঈশ্বর সকল প্রাণীর জন্মের বাস করেন এবং তিনি নিজের মায়ার বলে, প্রাণাদিপিকে ঘুরাইতেছেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং কল্যেণেশুর্জ্জ্বলমিতি ৷

আমরঃ সর্বভূতানি যত্কারুণীনাং মীরাতি ৷

মীরা ১৮৮৩

যেমন স্বরূপার, কঠিনিষ্ঠিত পুঙ্খলসকলকে যত্নাক্রম করিয়া ঘুরাইয়া দিলে তাহারায় ঘুরিতে থাকে এবং যত্ন সম্বন্ধ করিলে তাহাদের গতি কষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবানের মায়ার-স্বরের প্রভাবে জীবসমূহ নানাভাবে নানাক্রমে প্রবৃত্তি ও নিরুত্তির বশীভূত হয়। সগসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন।

বিষংক্রান্ত মায়ারই নামান্তর; ওক হইতে এই প্রকৃতির পুণ্য সত্তা নাই। তাহার মহিমাৰূপ মায়াতেই জীব ও জগৎ বিকাশ পাইতেছে।

অনাদি জন্মের সংস্কারবশে, ব্রহ্ম জীবের জগৎ-বোধ হইয়া থাকে এবং ষট্ চৈতন্যের বক্রগোলাঙ্গ হয় না, ইহাই ভগবানের অনির্ণয়নীয় মায়। এই রহস্তে একমাত্র ব্রহ্ম-সত্তাই সত্য এবং তাহার অন্তর্হই ইহার কারণ। এই বোধমায়ার সকলের অন্তরে আছেন এবং তিনিই সগসার-সাগর-তারিণী, নিত্যানন্দময়ী, নিত্যব্রহ্মরূপিণী। ইনি যাহাকে অহংই করিয়া বিজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেন, তিনি হৃদয়তম পরাংমণির শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ রূপকে জানিবার অধিকার লাভ করেন।

অপর প্রকৃতি অষ্টাভি, কিন্তু পরা প্রকৃতি এক। বোধমায়ার ক্ষেত্র-ক্ষেত্রঃ সংযোগ-কর্তা ঐবৈশ্বদেবময়ী মায়। তিনি সত্ত্বা, কিন্তু তাহার আরাধনা করিলে তিনিই জীবকে শুণ্ডাভীত করিয়া দেন এবং শুণ্ডাভীত হইলেই ঈশ্বরকে জানা যায়। নিম্ভূণ ব্রহ্ম উপাসনার অতীত এবং তাহারকে লক্ষ্য করিয়া উপাসনা করিলেও উদ্ভ্রমঃ সমাপিত হয় নাই। যিনি নিম্ভূণ, নির্মিকার ও নিরন্তর তোমার জ্ঞাত তাহার স্বভাবের ভাবান্তর হয় না। হৃদ-বোধই জ্ঞানের আবরণ। একাধিচিতে দূরতর হইয়া তাহাকে ভজনা করিলে তিনি সেই আবরণ উন্মোচন করিয়া দেন। তীর ভক্তিৰ বেগ শাধু দ্বয়ে সকারিত

হইলে বোধমায়ার দ্রবণনের আবরণও বিদ্যারত হইয়া যায়।

তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, জরা-মরণের যোজকের জর বাঁহারা যত্ন করেন, তাঁহারায় পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারেন এবং সমস্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞা অবগত হন, বাঁহার দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারেন।

জীব জিগ্ধময়ী মায়ার মোহিত হইয়া, ভগবানকে জানিতে পারেন না। জিগ্ধ-বিমোহিত জীব বাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই শুণ্ডারয়ের প্রকাশ হইয়াছে, সেই ভগবানকে লক্ষ্য করিতে পারে না। তিনি জিগ্ধের অতীত এবং জিগ্ধের অধীনভূত। তিনিই জীবের আত্মরূপে বিরাট করিতেছেন, কিন্তু জীব মায়ার মোহিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। ভগবানের জিগ্ধময়ী মায়াতে জীব আবদ্ধ হইয়া আছে।

যিনি আপনার অভিমানে অহংকার দূরে ফেলিয়া, নিত্য নিরাস্রয়ের জায়, বোধমায়াকে অগতির গতি জানিয়া ভক্তিপূর্ণক তাহার শরণাপন্ন হন, তিনি দয়া করিয়া তাহাকে মাদ্যাত্ম করিয়া দেন। বাঁহার অচ্ছিন্ন মাদ্যাদ পাশে জীব আবদ্ধ, তিনি ভিন্ন এ মাদ্য-গ্রাণ্ডি খুলিবার কোশল আর কেহই জানে না।

শক্তির আরাধনা করিলে তবে শক্তিমানকে লাভ করা যায়।

কৃপা করিয়া বোধমায়ার সর্বাবরণ ভেদ করিয়া দিলে, আত্মার ও পরমাত্মার যোগ হয়—তখনই মায়ার-বন্ধন মোচন হয়, তৎপূর্ণে নহে।

আপনারে নিরাস্রয় জানিয়া, বোধমায়ার একান্ত শরণাগত হওয়াই প্রকৃত পুঙ্খার্থ।

যাহারা পাপকণ্ঠ, মৃগ ও নরাদম এবং বাঁহাদের জ্ঞান মাদ্য-কর্তৃক অপদ্রুত হইয়াছে, বাঁহার দন্ত-দর্পাদির দ্বারা আত্মরূপ লাভ করিয়াছে, তাঁহারায় বোধমায়ার ভজনা করেন না।

এই বোধমায়ার পুরুষোত্তমের অর্দ্ধাভিনী জ্ঞানী শক্তি। তাঁহার কৃপা হইলে সকল গুণের নাশ হয় এবং জীব নিরাত্মান ও নিরহংকার হইয়া আত্মহই হইবার শক্তি লাভ করে।

মৃত্যু-এবং সদগুরুর নিকট হৃদমাহিত-চিত্তে শক্তিমান প্রেরণ করিয়া, মন্ত্রার্থস্বত্ব ময় জগৎ ও স্বর্গের পালন করিলে বোধমায়ার প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মধার খুলিয়া দিলে, জীব মরণের পথ আরোহণ করিবার শক্তি লাভ করে, কারণ তখন তিনি কৃপা কারয়া মায়ার দ্বারা আর জীবকে মোহিত করেন না।

মুগ্ধ ব্যক্তি নিয়ত যুক্ত চেষ্টার দ্বারা, এইরূপে বিধিযুক্ত কৰ্ম করিয়া হৃদীর বুদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁহার চিত্ত নির্বল হয়। তখন তিনি সর্বদা কামাদি ও হিংসা

পরিত্যাগ করিবার শক্তি লাভ করেন। যে ব্যক্তি এইরূপ আচরণ করেন, তিনি সকল অজানতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করেন, যাহারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ অহংকর করিয়া বাঁহাকে জানিতে পারিলে জীব মুক্তি লাভ করে।

ভগবতী-পাতাতে উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তি ভগবতীকে ভক্তি করে না, তাঁহাদের মুক্তিলাভ বড়ই দূরত, সেই কেহ মনঃক্লেশ বহনের সহিত তাঁহার প্রতি উৎকৃষ্ট ভক্তি করিলে।

—:~:~:~:—

## বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রাচীন কীর্তি

ত্রিযোগেশ্বরজ্ঞে যোগ

অজ্ঞ আমরা বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রাচীন কীর্তির পরিচয় দিব, যাহা অনেকেরই অজ্ঞাত।

মহাভারতে মাক্ভাতা নামক স্থানে, যাহা ওড়ার-মাক্ভাতা নামে পরিচিত, অমরেশ্বর-মন্দিরের ভিতরে মণ্ডপ গাত্রে অমরেশ্বরী খোদিত লিপি আছে, তন্মধ্যে একটি ৩৪ শ্লোকযুক্ত শিবেয় স্তোত্র আছে। ইহা দক্ষিণবঙ্গী নবগ্রামবাসী হলায়ুধনামা এক ব্যক্তির কীর্তি। ইহার তারখ সংখ্যে ১১২০। এই লিপিত যখন বাঙ্গালীর কীর্তি তখন ইহাকে শকসংখ্যে বলিয়াই মনে হয়। যদি আমাদের অনুমান সত্য হয় তবে ইহা শক ১১২০ = ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত হইয়াছিল। এইসময়ে বাঙ্গালার লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করিতেছিলেন। আমরা লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক 'ব্রাহ্মণ সর্গ' গ্রন্থেতা এক হলায়ুধ চিত্রের জ্ঞান। ইহা ভিন্ন আমরা লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেন প্রদত্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ইতিত ভারব্রাহ্মণ হইতে আবহিক (আবহিক ?) হলায়ুধের পরিচয় পাই। এই উভয় হলায়ুধ একব্যক্তি নহেন। ইহাদের পাতার নাম বিভিন্ন। আমরা যে উপরে মাক্ভাতা-

নামক স্থানের উল্লেখ কারায়ছি উহা ঐ সময়ে অবস্থিত্রাহ্মণের অন্তর্গত ছিল। ঐ অবস্থির সহিত স্মারিত এই শ্লোকের হলায়ুধ সম্বন্ধতঃ আবহিক নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

মাক্ভাজ প্রসিদ্ধিগিরি তত্ত্বের জেলার জ্যোত্স্নমসনাম গ্রামস্থ সোমনাথেশ্বর-মন্দিরের দক্ষিণ প্রাচীর-গাত্রে একখানি খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, চাড়াগাও গোঁস্বামী মিশের ভ্রাতা শাভিদ্ভা-গোত্রীয় শ্রীকৃষ্ণসেন নাম একজন শৈবস্বার্থ্য কর্তৃক এই মন্দির শক ১১০৪ = ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরের উত্তর প্রাচীর গাত্রে আর একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, চোলাবাজ জিতুবন চক্রবর্তী তৃতীয় রাজেন্দ্রসেন তাহার রাজত্বের ৫ম বর্ষ (১১২২ খ্রীষ্টাব্দে) সোমনাথেশ্বরের জ্ঞান পুঙ্খবিশী ও গোপাভানের জ্ঞান স্মারিত্রবর্তে, জমি দান করিয়াছিলেন। আর্গাঙ্ক লিপি হইতে জানা যায় এই স্মারিত্রবর্তে রাজার গুণ ছিলেন।

কাশীর-দেশীয় শ্রীকৃষ্ণের কুটুম্ববংশীয় নারায়ণকর্তার পুত্র রামকৃষ্ণ 'মতস্বতী' নামে একখানি গুপ্তক লিখিয়াছেন।



ইহার শিখা শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ 'রত্নরত্ন-পরীকা' লিখিয়াছেন। এই শ্রীকৃষ্ণের সহিত উপরোক্ত শ্রীকৃষ্ণের কোন সম্পর্ক থাকিলেও থাকিতে পারে। এই রত্নরত্ন-পরীকার টীকাকার লিখিয়াছেন, তাঁহার গুরু গোড়েশ্বর হইতে আসিয়াছিলেন। টীকাকার কিংবা তাঁহার গুরুর নাম নাই। সম্ভবতঃ এই টীকাকারের গুরু শ্রীকৃষ্ণ।

মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সির গুট্টার জেলায় গুট্টার তাহুরের মল্কাপুরম গ্রামে একটা প্লাসপ্রাণ্ড মন্দিরের সমুখে একটা স্তম্ভ পাথ হওয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভপাত্র-বোদিক সিপি দক্ষিণ রাডের পূর্বগ্রাম-নিবাসী বিবেখরশিব-নামক এক শৈবাচার্যের কীর্তি বোধক করিতেছে। এই সিপি লাহার নিয়ে দেওয়া গেল :—

ভাগীরথী ও নন্দারায় মধ্যে দাহল-মণ্ডল অবস্থিত। ঐ দেশে চুর্লাস একটা শৈব-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। চুর্লাস শিবপঞ্চরাত্রভুক্ত সত্যশঙ্কর কলচুরিরাজ নৃনাথজন্মদেব নিকট জিলজী-প্রদেশ (ইহাতে তিন লক গ্রাম ছিল) জিন্কা প্রাপ্ত হন। তিনি গোলাকি-মঠ নামে একটা মঠস্থাপন করেন এবং ঐ জিলজী-প্রদেশ মঠের আচার্য-সিগের বৃত্তিরূপ দান করেন। এই সম্প্রদায় সোমশঙ্কর আর্জিভা হর। ইনি 'সোমশঙ্ক-পুজি' নামে পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহার পরে বামনমুখ আর্জিভা। কলচুরিরাজ ইহার অত্যন্ত সহান করিতেন। আজ পর্যন্ত ঐ রাজপুত্র ইহার চরণাবতান করিয়া বাসেন। (বাস্তবিক শিবক কলচুরিরাজ কর্ণদেশের বাণাশ্রী তাম্রাশ্রম (১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিত আছে, 'পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীবাহদেববাণাশ্রম্যাত')। তাঁহার শিষ্য ও প্রসিদ্ধের মধ্যে মহাব্রাহ্ম ছিল, ইহার কটাকৃপাত দ্বারা রাজারাজ্যদিগকে নিগ্রহ কি অসুগ্রহ করিতে লক্ষ্য ছিলেন। যশাসময়ে শক্তিশঙ্কর আর্জিভা হর। তাঁহার শিষ্য কীর্ত্তিশম্ভু। ইহার পর কেরণ-দেবীর বিমল-শিব আর্জিভূত হন। ইহার শিষ্য ধর্মশঙ্কর। ধর্মশঙ্কর শিব বিবেখর শম্ভু বা বিবেখরশিব, ইনি কাকট্যারাজ গণপতি-সীকাগুরু ছিলেন। এই শৈবদেবতার বিবেখর চোলা, মালা ও কলচুরী রাজপণ্ডের গুরু ছিলেন। তাঁহার নিবাস ছিল গোড়েশ্বরের অন্তর্গত রাঢ় প্রদেশের পূর্বগ্রামে।

গণপতি সীকার পর আপনাকে তাঁহার গুরুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন। গণপতির উপর যে বিবেখর গিরে অত্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল তাহা বড়াই বাহা। গুরুর অস্বাস্থ্যে গণপতি গোড়েশ্বরগাত বহু ব্যয়কিৎবে এবং কবিত্বক পুস্তক করিয়াছেন। বহু রাজা বিবেখরের রূপা পাগল করিয়াছেন। কর্ণে মুক্তাকুল, গলে হাথ, পিরে ভট্টজাণ-সমমিত উজ্জলমুগ্ধি বিবেখর যখন গণপতির বিভ্রামণ্ডলে অধিষ্ঠান করিতেন তখনকার দৃষ্ট সেবিবা মত ছিল।

গণপতির কজা রাজা রত্নদেবী ১১৮৩ শকে (১২১১ খ্রীষ্টাব্দ) পিতার নির্দেশানুসারে কলকাতা নদীর দক্ষিণতট বেলনা-ভূ-বিরে কল্কাবিশ্রী নরীমধ্যা-কল্কাহু-দিক-যে মন্দর (মন্দম) নামক গ্রাম দান করেন এবং এই মন্দির তিনি নিজেও বেদপুস্তি নামক গ্রাম দান করেন। (গণপতি মৃত্যুর পর তাঁহার কজা রত্নদেবী, রত্নদেব মহারাণ এই পুস্তকোচ্চিত নাম গ্রহণ করিয়া পিতৃসিঁহাসনে আরোহণ করেন।) বিবেখর এই মন্দর গ্রামে বিবেখরের মন্দির, মঠ, অন্নসত্র নির্মাণ করাইয়া বহু ভিক্ষু স্থাপন করেন এবং এই গ্রামের নাম বিবেখর গোলাকি রাখেন। মন্দর যে বেদপুস্তি গ্রামস্থলে তিনি ৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে ভ্রাম্মণ-পর্যায়ে প্রত্যেককে দান বিক্রয়ের আদিকার্য্য ২ পুষ্টি জমি দান করেন। অবশিষ্ট জমি তিন ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ শিবমন্দিরের জন্ত, আর এক ভাগ শুদ্ধ শৈবমঠে ছাত্রগণের ভরণাভরণের জন্ত এবং তৃতীয় ভাগ গ্রন্থশালা, আরোগ্য-শালা এবং ভ্রাম্মণভোজনের ব্যয়ের জন্ত দান করেন। তিনি ধন্য, বজ্র ও সামবেদ অধ্যাপনার জন্ত তিনজন অধ্যাপক, পদ, বাক্য, প্রাণাশ, 'সাহিত্য ও আশ্রমাব্যায়' জন্ত পাঁচজন বাধ্যাবাক্য, একজন বিক্ষণ কার্য এবং একজন রিক্স বৈজ্ঞানিক করেন এবং দশমন্দির প্রত্যেককে ২ পুষ্টি জমি দান করেন। যমিরের উক্ত দশজন নর্তকী, ২৫ জন বদীবাদক সমেত ৬ জন মাল বাদকের প্রত্যেককে ১ পুষ্টি জমি দান করেন। ইহা ভিন্ন একজন কাম্বাধিকারী গায়ক, ১৪ জন গায়িকা, ৬ জন নর্তকী এবং ৬ জন কাড়াবাদক, ২ জন ভ্রাম্মণ পাচক ও ৪ জন পরিচারক এবং এই প্রকার ৬ জন ভ্রাম্মণ মঠ ও অন্নসত্রের জন্ত নিষ্ক

হয়েন। গ্রামবন্দার ৩৩ জটাবৃত্ত ১০ জন চোলা-দেবীর রত্নরত্ন এবং ২০ জন শিবভক্ত বীরমুগ্ধি নিম্নক করেন। এই বীরমুগ্ধিগণ স্বর্গ, ত্যাগ, বশ, প্রভুর, কুণ্ডকার, রাজমিত্রী, দাক্ষার ও নাশিতের কার্য্য করিত। মোট ৭৩ জন চাকরের প্রত্যেককে এক পুষ্টি করিয়া জমি দান করিয়াছিলেন। মন্দিরের চতুর্দিকে পুষ্পোৎসবের জন্ত এক-মণ্ডাপ নিবর্তন জমি দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন গোড়েশ্বরের দক্ষিণ-রাঢ়ে পূর্বগ্রামবন্দী শ্রীবাহদেব-ভাট্ট নামকদেবী ৩০ জন ভ্রাম্মণের প্রত্যেককে ১ পুষ্টি করিয়া জমি দিয়া তাহাদিগকে গ্রামের মাধ্যয় পর্য্যবেক্ষণ ও হিযাব-রক্ষার কর্ণে নিম্নক করেন। বৈটনা-ন্য কর্ণের জন্ত ১৪০ পুষ্টি চিরকালের জন্ত জমি দান করেন। সন্তানহীনা কুলাচার্য্যবিত্তী দ্বালোকগণও গিলাক নিম্নক করিয়া তাহাদের নিম্নকি কার্য্য করাইতি। তাহা হইলে তাহারা জমি ভোগ করিতে পারিত। গ্রামের অবশিষ্ট জমি দেবতার ভোগের জন্ত কাম্বাধু বৈক-পরি-ব্রাহ্ম ও পাণ্ডপতত্ত্বাচারী বিচারিগণের অন্নসত্রের জন্ত রক্ষিত হইয়াছিল। ভ্রাম্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া চোলা পর্য্যন্ত যে কোন সামগত অন্নপ্রার্থীর জন্ত অন্নসত্রের দান অব্যাহত ছিল। এই দানবাণী মঠ, দেবালয় ও গ্রামের জন্ত একজন বৈদ্যাবাধ্যা অধিকারী নিম্নক হইতেন। তিনি ১০০ নিম্ন পাইতেন। যদি তিনি তাহার কার্য্যে অবহেলা বা অল্প কোনজন অজ্ঞার কার্য্য করেন, তবে মঠের সন্তানগণ তাঁহার হৃদে অল্প আর একজনকে নিম্নক করিতে পারিতেন। শত শত ভ্রাম্মণগণের সমুখে ধীমান রাজগুরু বেশিকেন্দ্র বিবেখর শিবাবাধ্যা এই নিয়ম করেন যে, গোলাকি-বাসের সত্যগণকে মধ্যে যিনি কৃত্যভিত্তিক, শাস্ত, ততি, শৈব-রত্নদেবী, শৈবাগমসম্মতের পারগামী, শৈবদন্তানপালক, ইহার স্বর্গ ও মোক্ষ সমজান, যিনি সর্বভুক্ত অজ্ঞকাম্যান, সত্ত্ব বিভাগ্যাপ, ব্রহ্মকট, শীঘ্রান্য ভ্রাম্মণদিগের মধ্যে প্রধান, তিনিই এই অধিকারীর কার্য্যে নিম্নক হইবেন।

ইহা ভিন্ন বিবেখর আরও বহু কীর্তি স্থাপন করেন। তিনি কালীদেব উপলক্ষ্যে স্থাপন করিয়া নিম্ন-প্রতিষ্ঠিত পোয়াগ্রাম ভ্রাম্মণদিগকে দান করেন। (সম্ভবতঃ বেগারী জেলার স্থপরিচিত কলমঠই এই উপলক্ষ্য)। মন্দিরটো নিম্ন নামে একটা গিরি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার ও

অন্নসত্রের ব্যয়ের জন্ত মানপত্রী নামে একটা গ্রামঘর দান করেন। চুর্লাসের নগরে নিম্ন নামক দান একটা গিরি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্ত সন্তপত্রী পুস্তকের বাজ্য বিতৃত করিয়া দিয়া তাহার অর্জক দান করেন।

আনন্দপদে বিবেখরনগর নামে একটা নগর স্থাপন করিয়া তথায় একটা গিরি প্রতিষ্ঠা করেন এবং আনন্দপুর এবং মুনিরূপ প্রামদ্র দান করেন। কৌশল্যগোত্র-নিক-নামে আর একটা গিরি স্থাপন করিয়া ইহার ভোগের জন্ত ৩০ বারি উচ্চ জমি এবং ৩০ বারি নিম্ন জমি প্রদান করেন। শ্রীপেশের উত্তরপূর্বে এলাইপুরে তিনি একটা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শিষ্য গণপতি তথাকার অন্নসত্রের জন্ত অভ্যাস গ্রাম এবং পলিনাথু বিবেক কপ্তকোট গ্রাম দান করেন। নিম্নকি নামক স্থানে একটা গিরি স্থাপন করিয়া চুলাল নামক অন্নসত্রের একাংশে বোলাগের অন্তর্গত পুন্না গ্রাম দান করেন। উত্তর সোম-শিলা নামক স্থানে বিবেখরের নামে গিরি প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রতগোত্র নামক গ্রাম দান করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন বাল্যাবস্থা ভ্রাম্মণ উত্তর-প্রদেশ এবং দক্ষিণ-ভারতের ভ্রাম্মণগণের গুরুত্ব বহিষ্ট হইয়াছিলেন এবং জন্মসাধারণের জন্ত, প্রুতিশালা, আরোগ্যশালা এবং বহু অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা কম সাধারণ কথা নহে। সবচেয়ে প্রাণসমনীয় তাঁহার আচাণ্ডলে অন্নবিতরণ। যে দামিণীত্যা এই বিংশ শতাব্দীতেও নিম্নকি জাতির প্রতি অত্যাচার করিবার জন্ত স্বত্বপরিচক, সেই দক্ষিণাত্যে ১০০ বৎসর পূর্বে একজন বাল্যাবস্থা ভ্রাম্মণ যে উদারতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে স্বর্ণপক্ষে লিখিয়া রাখিবার উপযুক্ত। সত্য বটে শৈবধর্মগ্রন্থে এইজন উদারতার কথা লিখিত আছে, যথা—

'পাণ্ডায় সন্তানরা ব্রহ্মবিষ্ণু-প্রদো ভবেৎ।  
পাণ্ডায় শিবত্যাগি ব্রহ্মবিষ্ণু-ন কথং ভবেৎ।'  
অর্থাৎ শৈবাগমসম্মতের সন্তত হইয়া যদি পাণ্ডা শিবকে প্রাপ্ত হয় এবং ভক্তিমুগ্ধ প্রণয়ন করিতে পারে, তবে শ্রুত কেন শিবকে প্রাপ্ত হইবে না? আবার দেবীপুরাণের ৫১ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,



বৌদ্ধগণের পুঙ্খানুপুঙ্খ কি ভাঙ্গণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র তত্ত্ব হইলেই তাহার শ্রেষ্ঠ বিনিদ্রা গণ্য হইবে। এইরূপ উদামত শায়েই বহু রহিয়াছে কার্য্যকরঃ এই বিধি কতদূর প্রতিপালিত হয় তাহা বোধ হয় কাহারও অবিরতি নাই।

এই শৈব-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হর্দ্রাসা কোন সময়ে এবং কোথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার কোনো সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। দশম শতাব্দীর পূর্বে এই সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই হর্দ্রাসা যে পুরাণাদিতে উল্লিখিত হর্দ্রাসা নহেন তাহা বলাই বাহুল্য। বহিঃ ইহাকেও কোন কোন শৈবগ্রন্থে হর্দ্রাসা মনি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বহু তরয়ে এই হর্দ্রাসার উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রিলোচন শিবাচার্য্য-বিরচিত প্রারচিত-সমুদ্র নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে আদর্শ-মঠস্থিত গুরু হর্দ্রাসার বন্দনা করা হইয়াছে, যথা :—

শ্রীআমদকস্থান গুরুবংশশুদ্ধবৎ ।

হর্দ্রাসাং ধর্ম্মি বন্দে তদুৎপত্তঃ শুকনমঃ ॥

উত্তর-ভারতের কয়েকখানি প্রাচীন লিপিতে আমদকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই আমদক কোথায়? মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তিনিভেলী জেলার তেংকশীষ একটা মন্দিরের ভাঙারখণ্ডের প্রাচীরপাথে খোদিত একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, মহারাজ জটিলবর্ধন জিতুন চক্রবর্ত্তি-কুলোদ্ভূত পাণ্ডা ১০৮৮ শকে তাহার পরমাচার্য্য মহাগণপতি-নিবিনার বামবেশকে কতক জমি প্রদান করিয়াছিলেন। “এই মহাগণপতি উত্তর-ভারতের গোড়-রাষ্ট্রের গঙ্গার উত্তর তীরস্থ বারেন্দ্রগ্রামের আদর্শপ্রমা-চার্য্যের শিষ্যবংশীয় ছিলেন। ইহা। দ্বারা মনে হয় যে, আমদপ্রশ্রয় বারেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। যদি আমাদের অনুমান ঠিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় হর্দ্রাসা-প্রতিষ্ঠিত শৈব-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বারেন্দ্রদেশে। অধো-শিবাচার্য্য-বিরচিত ক্রিয়াক্রমদ্যোতিকা-র টাকা ‘লগুপ্তা’র লিখিত আছে যে, হর্দ্রাসাই জগতে তন্ন প্রচার করেন। এ কথাই কোন সত্তা থাকিলে বসিতে হয়, সমস্ত না হউক অন্ততঃ কোন কোন তরয়ের উৎপত্তি স্থান বাঙ্গলা-দেশ। দাক্ষিণাত্যের বহু লিপি হইতে জানা যায়, হর্দ্রাসা-প্রতিষ্ঠিত

শৈব-সম্প্রদায়ের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ দাক্ষিণাত্যের নান্যস্থানে মঠস্থাপন ও শৈবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্ম্মের বেঙ্গল-প্রচলন এরূপ ভরিতর অর কোথায় দেখা যায় না। ইহার মূলে যে বাঙ্গালীর কৃত্রিম রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিবার উপায় নাই।

শৈবাচার্য্যগণ বহু শৈবধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন, যথা হর্দ্রাসা-প্রণীত কতিপয় তন্ত্রোক্ত; শ্রীকৃষ্ণ বিরচিত রত্নরত্নপত্রিকা; অধো-শিবাচার্য্যকৃত মুগ্ধবোধ-দীপিকা, ক্রিয়াক্রমদ্যোতিকা; ত্রিলোচন শিবাচার্য্যকৃত প্রারচিত-সমুদ্র, সিদ্ধান্তরত্নাবলী; ঈশানশিবাচার্য্য-প্রণীত ক্রিয়াক্রমদ্যোতিকা, ঈশানশিবগুরুদেব পদ্ধতি, সিদ্ধান্তরত্নাবলী। বৈজ্ঞানমুনি-বিরচিত আদ্যর্শ-পদ্ধতি দীপিকাংশ; জ্ঞান-শিবকৃত জ্ঞানরত্নাবলী, জ্ঞানশব্দ-প্রণীত বাগরত্নাবলী; সোমশিবকৃত কন্দকাণ্ডকম; উত্তরশিবকৃত পদ্ধতি, ব্রহ্মশিবকৃত পদ্ধতি, দ্বন্দ্বদেবিককৃত সিদ্ধান্তদীপ, বলাশিবকৃত বরণপদ্ধতি, প্রাদানশিবকৃত ক্রিয়াকরণ, নটেশদেবিককৃত ক্রিয়াকরণ, রামনাথকৃত পদ্ধতি; নিগমজ্ঞানদেবিককৃত শিবজ্ঞানবোধবৃক্ষের টাকা; রত্নতত্ত্বপদ্ধতি এই সকল টাকা; পঞ্চাকার গুরু-প্রণীত রত্নমণ্ডারাবলী; মুদ্রাজ্ঞানপদ্ধতি উহার টাকা; উমাপতি শিবাচার্য্যকৃত পৌরন্দর্যের টাকা। ইহা ভিন্ন আরও বহু শৈব-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে আরও বহু শৈবাচার্য্যগণের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকই এই সম্প্রদায়ের বলিয়া মনে হয়।

ত্রিলোচন শিবাচার্য্য ও ঈশান শিবাচার্য্য আদর্শ-মঠবাসী ছিলেন। বিবেশ্বর শিবাচার্য্যের কাশীধরশিবাচার্য্য নামে শ্রীবৎস-গোত্রীয় একজন শিষ্য ছিলেন। ইহার দিগার নাম বিজ্ঞানশিব এবং মাতার নাম সোমসানি-আম্বা। ইহার শ্রীবৎস গোত্র দেখিয়া মনে হয় ইনিও দক্ষিণ-রাঢ় হইতে আগত শ্রীবৎসগোত্রীয় কোন ভাঙ্কণের বংশধর। বিবেশ্বর শিবের শিষ্যের শিষ্য একজন ঈশানশিব নাম আচার্য্যের নাম পাওয়া যায়। উপরোক্ত ঈশানশিবই সম্ভবতঃ বিবেশ্বরের প্রশিষ্য। একখানি লিপিতে পাওয়া যায় যে, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মহাদেব চট্টোপাধ্যায় (৭) নামক এক ব্যক্তি ১২০৪ শকে বিবেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত মন্দরপুরস্থ পণ্ডপতি মন্দিরে প্রাণের জন্ম ৫০টা মেঘ দান করিয়াছেন। যদি

পঞ্চপুস্তক—



মদুপবাহনা সরস্বতী—বোম্ব-মন্দির

[ বসোনি ]



মদুপবাহনা সরস্বতী

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাঙ্গটোল নাগের মহাপ্রশয়ের চিত্রশালায় রক্ষিত



মদুপবাহনা সরস্বতী—বোম্বা-মন্দির



মদুপবাহনা সরস্বতী [ “বৈদ্য ভৈরব” ]



‘চট্টোপাধ্যায়’ পাঠ ঠিক হইয়া থাকে তবে এই মহাদেবকে বাঙ্গালী বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু চট্টোপাধ্যায়ের গোত্র ভরদ্বাজ নহে, শাখিণী ; আর রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের উপাধ্যায়-সম্বন্ধ পদবীও অত প্রাচীন নহে। সম্ভবতঃ ‘ভট্টোপাধ্যায়’ হলে লুপ্তকমে ‘চট্টোপাধ্যায়’ পাঠ ঠিক হইয়াছে।

জিসোচন শিখাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, রাজেন্দ্র চোল এদেশে হইতে শৈবসম্প্রদায়গণকে দাক্ষিণাত্যে স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা রাজরাজেন্দ্রের সময়ে সর্বশিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার প্রথম কুলোত্তম চোলের সময়ে গোড়ের রাজদেশীর উদ্যোগিত নামক একজন শৈব গুরুারের নাম পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা মনে হয় দশম শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ দাক্ষিণাত্যে শৈবগণের প্রচার করিতে গমন করিয়াছিলেন।

শৈবধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে পাণ্ডপত-সম্প্রদায়ই সর্বপ্রাচীন। ইহার শাখা নকুলীশ-সম্প্রদায়ও কম প্রাচীন নহে। দ্বুটাদেশের প্রথম ভাগে গুজরাটের কায়াবরোহনবাসী নকুলীশ বা নকুলীশ-কর্তৃক প্রবর্তিত। বায়ুপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। দ্বুটীয়া-প্রবর্তিত শৈব-সম্প্রদায় ও পাণ্ডপত-সম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া মনে হয়। নকুলীশকে শিবের অবতার বলিয়া মনে করা হয়। এই নকুলীশ হইতেই শিবের এক নাম নকুলীশ্বর বা নকুলেশ্বর হইয়াছে। নকুলীশ-পাণ্ডপত ও শৈব-সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে। বাঙ্গালীরাচার্য্যের সর্বদর্শন-সংগ্রহে নকুলীশ-পাণ্ডপত দর্শন ও শৈবদর্শন পৃথকভাবেই লিখিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহাদের পৃথক কোন সম্মতা না থাকিলেও ইহার ঐশ্বর্য্য-প্রবর্তিত দর্শনাবী সম্মতী মত নামমাত্র ঐশ্বর্য্য থাকে। পাণ্ডপত-গণ নিজেদের মন্তের জন্ত সর্বদা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল।

যে সকল রাজা ইহাদের শিষ্য গ্রহণ করিত, ইহারা তাহাদের হইয়া যুদ্ধ করিত। সম্ভবতঃ এইজন্যই বহুরাজা ইহাদের শিষ্য গ্রহণ করিত। তাঁহারা তাঁহাদের তান্ত্রশাসনাদিতে ‘পরম মাহেশ্বর’ বলিয়াই কান্ত ছিল না ; অনেকে আবার গিতপাদাঙ্ঘ্র্যাত না লিখিয়া গুরু পাদাঙ্ঘ্র্যাত লিখিত। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইহারা গুরুর সম্মান বলিয়া পরিচয় দিত। শিব এবং শৈব-সম্মতীদিগকে বঙ্গ বা বাবা বলা হয়। মহাস্তমিগকে মহারাজ বলা হয়। বলভীরাঙ্গবংশীয় ঐশ্বর্য্য শিলাদিত্য ‘বাবপাদাঙ্ঘ্র্যাত’ এবং তাঁহার পরবর্তী শিলাদিত্যগণ ‘বঙ্গপাদাঙ্ঘ্র্যাত’ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন। কলচুরীরাঙ্গ কর্ণ ও তাঁহার পরবর্ত্তিগণও ‘পরমভট্টারক মহারাজারিয়ার পরমেশ্বর শ্রীবামদেব পাদাঙ্ঘ্র্যাত’ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় রাজা-দিগের উপর ইহাদের বিরূপ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই বোদ্ধা সম্মতীদিগণ ভাঙাতে পরিণত হইয়াছিল। বাহারী মুসলমান-রাজবংশের শেষভাগে এবং ব্রিটিশ-রাজবংশের প্রথম ভাগে এই সম্মতী ভাঙাতগণ বাঙ্গালার প্রভাগগণের উপর বিরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার বিবৃত ইতিহাস জানিতে চান তাঁহারার রায় বামিনীমোহন খোঁষ বাহাদুর-কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত “সম্মতী এও ফকির রেভারন্স ইন্ বেঙ্গল” নামক ইংরেজী পুস্তক দেখিতে পারেন। ইহা নানা সরকারী রিপোর্ট হইতে সংকলিত হইয়া সেক্রেটারীয়েট বুক-ডিপো-হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বন্ধিমবাবুর আনন্দমঠে “এই সম্মতীদিগের কথাই বর্ণিত হইয়াছে।







ত্রিভুজকর্ণ • আচার্য্য কর্তৃপক্ষের তিনটা আদেশের প্রতীক মাত্র। 'হমত' (হুতিতা), 'হুত' (হুত বাবা) ও 'হুত্ব' (সংকারণ্য) — আচার্য্যের এই তিনটা আদেশ প্রাপ্তিলাভে প্রত্যেক পারসী নরনারী বহুপরিষ্কার—ইহা হি ক্রান্তি ধারণের নিগূঢ় ধর্ম। সমুদ্রে ও পশ্চাতে ছুটী গ্রহি 'লোশ' নট' দিয়া আঁটা থাকে। এই গ্রহি দ্বারা সময় প্রত্যেক পারসী চিন্তা করেন যে, পরমেশ্বরই একমাত্র নিত্য সর্ব বস্তু—মজ্জমাযি ধর্মই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ—আচার্য্য কর্তৃপক্ষই একমাত্র ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ—আচার্য্যের আদেশের আদার অস্ত পালনীয়।

ইহা তো শেল উপনয়নের কথা। এইবার বিবাহ। 'সকল আচার্য্যের মতোই বিবাহ জীবনের প্রধান সন্ধিক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। 'বেলীদার' গ্রন্থে (৩।২ ও ৪।৪) উক্ত হইয়াছে যে, 'বেলীদার' অপেক্ষা বিবাহিত পুরুষই অধরমজ্জের অধিক প্রিয় ও নিঃসন্তান ব্যক্তি অপেক্ষা সন্ততিবিশিষ্ট পুরুষই তাহার প্রিয়তর। বিবাহের দ্বারাই বংশ রক্ষা হইয়া থাকে আর বংশরক্ষাতেই ধর্মের প্রবাহ-রক্ষা। এইজন্য পারসীগণ বিবাহ ও সন্তানোৎপাদনরূপ গৃহস্থ ধর্মকেই উচ্চতম আসন প্রদান করিয়াছেন।

পারসীগণ যখন স্বদেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া গুজরাট প্রদেশের সন্ধান অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন ঐ প্রদেশের বাসব (জরুলক্ষ সন্তত) নরপতি ঃ কয়েকটা সন্তত তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে সম্মত হন। উভয় জাতির মধ্যে বৈবাহিক-সম্বন্ধস্থাপন সেই সন্ততগুলির সন্ততম। সেই দিন হইতে পারসী-বিবাহের সময়ও পরিবর্তিত হইল।

• যেখা তিনগুণ করিয়া গ্রহি দ্বারা প্রথা হিন্দুগণের মধ্যেও ছিল। ময় (২।৪৩) বলিয়াছেন—যে, ব্রাহ্মণ ও কৈতের যেখা ত্রিগুণ হইবে। কত্রিদের মাত্র একগুণ—উহা আবার পঞ্চকের দ্বিগুণও কাজ করিত। হুশাচার অনুসারে উভ্যুত এক, তিন অথবা পাঁচটা গ্রহি পড়িত।

† পারসীগণ ইহার নাম দিয়াছেন—'জাতি রাণা'।

বিবাহাণের পরিবারে হুত্যাংকব অব্যবহিত পরক্ষণেই বিবাহের প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দিষ্ট হইল •।

বিবাহ-পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ হইবেই পুরোহিত-কর্তৃক নিম্নবার সম্ভাদান বাবা "ম্যারেজ-কনট্রাক্ট" উচ্চারণ। অগল মর্যাদা পল্লবী ভাষায় রচিত। ইহার পর কোন কোন স্থলে সংস্কৃত ভাষাতেও উক্ত মর্যাদা পঠিত হইয়া থাকে। বাসব নরপতির নিকট পারসীগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাহারা রাজার অধিকারে বাস করিতে অক্ষমতা পাইলেন—সেই রাজা ও তাহার প্রভাস্বরে বোধগম্য ভাষায় বিবাহের মর্যাদা পঠিত করিতে তাহারা বাধ্য থাকিবেন। তদনুসারেই কোন কোন পরিবারে সংস্কৃত মর্যাদা পঠিত হইয়া থাকে। বিবাহপদ্ধতির একটি সন্ধিক্ষণের নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুরোহিত :.....নগরিতে সন্নিহিত এই সভাগণ মধ্যে পুণ্যভূমি ইরানের সামান্যী' বংশোদ্ভূত সম্রাট 'বজ্রদেব' শাহ-বিয়ার-কর্তৃক প্রবর্তিত অঙ্গের ;...বৎসরে...মাসের...দিবসে—বল,...নামী কন্তাকে এই বরের নিমিত্ত গ্রহণ

•পারতে বিবাহ আজিও বিবাহাণে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

† আরবগণ যখন ইরান জয় করেন, তখন ইরানে "পল্লবী" ভাষা প্রচলিত ছিল। অতএব মর্যাদা সবলই সেই ভাষায় রহিয়া গিয়াছে; কোন পরিবর্তন বা সম্ভার পরাধীনতার চাপে সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

† বর্তমানে পারসীগণ 'বজ্রদেব' অঙ্গ ব্যবহার করেন। ইরানের শেষ মোরোয়াগ্রীর সম্রাট জুজেন্দার শাহ-বিয়ার (তৃতীয় বজ্রদেব) এর সিংহাসনপ্রাপ্তির দিন হইতে ঐ অঙ্গ গণিত হইয়া থাকে। সম্রাট ৬৩২ হইতে ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদনুসারে বর্তমানে ত্রীশাব্দের ১৩০০ অঙ্গ চলিতেছে। পারস্ত বাসন্ত মসী-বিষুবার দিন হইতে নববর্ষ গণনা করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে পারসীগণের কোন সম্ভাদান আগষ্ট হইতে কোন সম্ভাদান বা সেপ্টেম্বর হইতে বর্ষারম্ভ ধরিয়া থাকেন। এই প্রত্যয়ে কারণও আছে। আমাদের সৌর বৎসরের পরিমাণ খ্রিষ্ট ৩৬৫ দিন নহে; ৩৬৬ দিন অপেক্ষা প্রায় ৬ ঘণ্টা বেশী অর্থাৎ আমাদের ১২০ বৎসরে সৌরবর্ষের ১ মাস বেশী হইয়া থাকে। সেজন্য প্রাচীন ইরাণে প্রত্যেক ১২০ বৎসরে (মলমাস হিসাবে) একটি মাস অধিক সরিবেশিত করা হইত। আরবগণ-কর্তৃক পারস্তবিজয়ের পর হইতে পারসীগণের একটি সম্ভাদান একবারমাত্র ঐট মলমাস অধিক

করিতে সম্মত হইয়াছে কি না? এবং মজ্জ-উপাসিকগণের পুরি আচার্য্যহুসারে 'মিশাহ-পুর' মুদ্রার ২০০ পবিত্র খেতবর্ষ সৌ্য 'বিরহেম' ও ছুটী স্বর্ণ 'মিনার' পাত্রীকে দান করিতে প্রতিশ্রুত আছ কি না?

সরিবেশিত করিয়াছিলেন। অন্য সম্ভাদান আবার এক-বারও মলমাস নিবেশিত করেন নাই। কাজেই এই উভয় সম্ভাদানের বর্ষারম্ভের মধ্যে ঠিক একটা মাসের ব্যবধান দেখা যায়। আর প্রাচীন ইরাণের মতে বর্ষারম্ভ সময় হইতে প্রচলিত পারসী বর্ষারম্ভকালের ব্যবধান ন্যূনাধিক মলমাস। খ্রিষ্ট ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ (বসন্তবিষুব্দবিশ) হইতে পারস্তের শাহ্ রেজা শাহ্ পল্লবী মাসের পারস্তদেশে প্রাচীন ইরাণীর বর্ষ প্রচলিত করিয়াছেন। এই নব-প্রচলিত প্রথাধুসারে প্রতিমাসে ত্রিশ দিন; বারমাসে বৎসর; বৎসরান্তে পাঁচ দিন ফাঁট। প্রতি চতুর্থ বৎসরে ষট্ একদিন বাড়িয়া ছয় দিন হয় (ইউরোপীয় 'লোপ' ইয়ারের মত)। ভারতবর্ষের কোন কোন পারসী সম্ভাদানও পারস্তের এই প্রথা অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া জন বাইতেছে।

বরকর্তা •—হাঁ। পুরোহিত—তুমি 'গপরিবারে শুদ্ধচিত্তে কার্য্যমো' বাচ্যে ধর্মবুদ্ধির উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য এই কন্যাকে... বরের হস্তে সম্ভাদান করিতে সম্মত আছ কি?

কন্যাকর্তা •—হাঁ, সম্মত আছি। পুরোহিত। তোমরা উভয়ে আমরণ এই পবিত্র সম্বন্ধ স্বীকার করিতে সম্মত আছ কি? বর ও কন্যা •—হাঁ। আমরা ঐরূপ ইচ্ছা করিয়াছি।

ইহার পর পুরোহিত মহাপ্রণাম অধরমজ্জ, অমেঘস্পেন্তগণ ও বজ্রতর্পণের নিকটে দম্পতীর মঙ্গলকামনা করিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন; এবং আশ্রয় দাম্পত্য-জীবন-সম্বন্ধে বরবধুকে উপদেশ দিয়া বিবাহহুতা সমাধা করেন।

• বরকর্তা—বরগণের প্রতিনিধি বা সাকী। ইউরোপীয়দিগের বিবাহে "দি বেষ্ট ম্যান"এর অনুরূপ। সাধারণতঃ বরের নিকটজাতি বা বিশিষ্ট বন্ধুই বরকর্তা হইয়া থাকেন। বরকর্তা ও কন্যাকর্তা উভয়কেই বোখাইএর "ম্যারেজ-রেজিটার"এ সহি করিতে হয়।



## মহায়া

( গীতি নাট্য )

শ্রীকুমাররজন দাশ  
সুশীল

নদের চাঁদ—বামনকান্দের জমীদার।

হুমড়া—বেদের সর্দার।

হুজন—ঐ পালিত পুত্র।

মাণিক—হুমড়ার ভ্রাতা।

প্রস্তাবনা

[ বামনকান্দের জমীদারবাজার প্রাঙ্গণ। নদেরচাঁদ সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটা বালক আসিয়া বেদেরের আগমনের সংবাদ দিল। ]

বালক।—( ক্রত প্রবেশান্তর আবিধান করিয়া )

শুন শুন ঠাকুরমশায় বলি যে তোমারে।

নূতন একদল বেদে আইছে তামসা দেখাইবারে।

পরম এক হুন্দরী কভা সন্দেহে তাহার।

জিয়া এমন কন্যা দেখি নাইক আর।

নদেরচাঁদ।—(উৎসাহের সহিত)

কোথায় দেখি? আন গিয়া সঙ্গে করি দ্বার।

দেখি নূতন বেদের দলে কেনম খেলা দেখায়।

( বালক বেদের দলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

বেদে ও বেদনীয় দল নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল।

মহায়া নাচিয়া নাচিয়া গান ধরিল। )

গান

বলে রে বলে রে বলে রে—বাঁশী বলে রে ফুকারি

পথে পথে ঘোঁরাগি লাগি জনম তোমারি :

নাটরে তোমার ঘরের মায়া,

নাটরে থিরা দেহের চায়া,

মহায়া—হুমড়া-কর্তৃক অপরূপতা ব্রাহ্মণ-কভা,

পরে পালিত-কভা

পালক—মহায়ায় সখী।

অজ্ঞাত সখিপণ—

উইরা ঘুঁরা কির যেন বনের কৈতরী;

চল রে চল রে চল রে পথে ইনাম-ভিয়ারী।

( নদেরচাঁদ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। )

নদেরচাঁদ।—

আহা হা, হুংবের জনম তোমার বেদের কুমারী।

মহায়া।—

আইছ এবার বামনকান্দে,

তুবরা ঠাকুর নইবাচান্দে,

আবার ঘুরবা বনের পথে বেদের কুমারী,—

চল রে চল রে চল রে পথে ইনাম-ভিয়ারী।

নদেরচাঁদ।—

না, না, দিব না তোমার ঘুরতে বনে বনে,

ইনাম দিব রহ হোয়ার আননিত মনে।

মহায়া।—(নদেরচাঁদের দিকে অগ্রসর হইয়া)

ঠাকুর, তামসা করলাম শেষ এবার ইনাম চাই।

তার সাথে যেন প্রভু মনটি তোমার পাই।

বলছে বাঁশী বিদায় লইতে বলছে ফুকারি—

চল রে চল রে চল রে পথে ইনাম-ভিয়ারী।

( নদেরচাঁদের বহুমুখা শাল ও প্রচুর অর্থ দান।

এমন সময়ে হুমড়া বেদে অগ্রসর হইয়া বলিল : )

• ১৯২৫ সালে শ্রদ্ধেয় শ্রীকৃষ্ণ নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের নির্দেশে এবং নটশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ শিশিরকুমার ভাড়াড়ীর উপদেশে মৈমনসিংগ গীতিকবিতার একটা গাথা অবলম্বনে “ইটালীয়ান অপেরা”র ছাঁচে মহায়া রচিত হইয়াছিল। ইহাতে পূর্ণবয়স্কের ভাব ও ভাষা যতদূর সম্ভব অকুর রাখা হইয়াছে।

হুমড়া।—

ইনাম পাইছি বহুং ঠাকুর, পাইলাম টাকা কড়ি,

বসন্ত করতে বেদের দল যে চার একধান বাড়ী।

নদেরচাঁদ।—( হুমড়ার দিকে তাকাইয়া )

দিব তোমায় নূতন বাড়ী দিব নূতন ঘর,

হুংবে গিয়া নিভা যাও নিশ্চিন্ত অন্তর।

( মহায়ায় প্রতি )

পথে পথে না ঘুরিয়ে বেদের কুমারী

বাসা বাঁধ এবার তুমি বনের কৈতরী।

( চুপে চুপে মহায়ায় কাণে )

শুন শুন কভা ওরে আমার কথা রাধ,

মনের কথা কইব আমি একটু কাছে থাক।

সন্ধ্যাবেলা চল উঠে—হুংবা বসে পাটে,

হেনকালে একলা তুমি বেরো জলের ঘাটে।

মহায়া।— চল রে যাই, চল রে যাই, ঘোরাঘুরি শেষ

ধরু ধরু নদের ঠাকুর ধরু রে এই দেশ।

বনের পাবী ছিল বনে বাঁচার পশিছে,

এবার তবে বিদায় ঠাকুর মহায়া মাগিছে।

( গারিতে গারিতে সকলের সহিত মহায়ায় প্রস্থান। )

প্রথম দৃশ্য

জলের ঘাট—সন্ধ্যা।

( মহায়ায় জলের ঘাটে কলসী লইয়া প্রবেশ ও কলসী

ভরিতে ভরিতে গান )

মহায়া।—

গান

কে রে আমার এমন করি পুরাণ ভুলাইল?

কে রে আমার নয়ন হ'তে নিভা গুচাইল?

কে দিল রে ভাবনা শ্রু

বুকে আমার ব্যথা এত

এমন করি বেদের বাণীর কপাল পোঁড়াইল?

নদেরচাঁদ।—( অগ্রসর হইয়া )

জল ভর বেদের বালা জলে দিছ মন,

আমারে দেখেছ কতু পড়ে কি দ্বন্দ্ব?

মহায়া।— তুমি তো গো ভিন্নদেশী পথ ছাড় যাই,

তোমারে দেখেছি কতু মনে কিছু নাই।

নদেরচাঁদ।—

কতজনে ভুলেও তুমি ভোলো তোমার মন,

এরি মধ্যে ভুল আমার? হয় না কি দ্বন্দ্ব?

মহায়া।— ভিন্নদেশী পুরুষ তুমি, আমি একা নারী,

তোমার সাথে কইতে কথা লজ্জায় আমি মরি।

নদেরচাঁদ।—

জল ভর হুন্দরী বালা জলে দাও গো ডেউ

হাসিমুখে কও না কথা সঙ্গে নাই তো কেউ।

কেবা তোমার মাতাপিতা কোথায় তোমার ঘর,

জানিতে এসব কথা চাহিছে অন্তর।

মহায়া।— নাহি আমার মাতাপিতা নাহি পোষক ভাই,

শ্রোতের শেগাও হইয়া আমি ভাসিয়া বেড়াই।

কপালে লিখন ছিল বেদের সঙ্গে কিরি

ঘর নাই জন নাই দেখের ভিখারী।

দেশে দেশে ঘুরলাম কত কাঁরে কব কথা,

কোথা আছে দরদী সে বুঝে আমার ব্যথা!

মনের হুংবে আছ ঠাকুর হুন্দরী নারী নিরা

অভাগিনী আমার কথা কি হবে জানিয়া!

নদেরচাঁদ।—

কঠিন তুমি কভা তোমার শাশে বান্ধা হিয়া,

মিছা কথা কইছ কেন না করিছে বিয়া।

কোথায় আমার হুংবে রে কভা কোথায় আমার নারী,

তোমার মত নারী পাইলে নিভা যাই যে বাড়ী।

মহায়া।— লজ্জা নাই নিলজ্জা ঠাকুর করতে চাও বিয়া?

গলায় কলসী বাঁধা জলে ভুঁইয়া মর গিয়া।

নদেরচাঁদ।—

কোথার পাব কলসী কভা কোথায় পাব দড়,

তুমি হও গমন গান্ধা আমি ভুঁইয়া মরি।

( মহায়া ও নদেরচাঁদের প্রস্থান )

( পালক ও মহায়ায় প্রবেশ )

পালক।— মহায়ায় গলা ধরিয়া গারিতে গারিতে )

সখি কে রে তোরা মনচোরা



কে সে তোর প্রেমিক গোরা?

তোর মন হরিল প্রাণ কাড়িল,

জীবন পাশে চেঁচি তুলিল,

করল তোর প্রেম বিভেদা?

মাথা ষাও সখি কও না কথা

কি যে তোর মনের ব্যথা,

কেন করে গও বহি অশ্রু অকোরা?

মহা। — জানি না জানি না জানি না সখি এশা মোর কেন!

পালক। — কও না বইন সত্য কথা আমার মাথা ষাও,

একটা কেন সন্ধ্যাবেলা জলের বাটে ষাও?

সারা নিশি কইনা জাগ প্রহর প্রহর শুনি

একটার মনের কথা কও না কেন শুনি?

কুন্ডি না কি নন্দকুঠার পালক তোমার পাশে,

তাই গো বুঝি চাইয়া থাক ঠাকুরবাড়ীর পাশে।

মহা। — কি যে কইব বল না সই রে কি যে কইব তোরে,

মনের আশুন মিকিখিকি পুড়াইছে ঘোরে।

বুঝিলে কী বোঝে মন কি দিয়ে যে বুঝাই,

জানি না কি হইল আমার, সখি এ কোন্ বলাই।

পালক। — শোন তো বইন শোন লো কথা মনের বুঝান দাও,

সন্ধ্যাবেলা জলের বাটে আর না তুমি ষাও।

নদের ঠাকুর আসে যদি বইয়া দিব তারে

সুন্দরী সে তোমার নারী গেছে মরণ পারে।

মহা। — (হারে ধীরে)

কেমনে সই পারব আমি একথা রাখিতে

মুহুর্ত না বেধেলে তারে পারি না থাকিতে।

চন্দ্রহর্য সাক্ষী আছে, কই সত্য আমি,

নদের ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোহাগী।

কি করিব বল না সই বাচি কিবা মরি

ধনুকে কি লইয়া আমি হইব দেশান্তরী?

পালক। — অত না গো ভাবিয়ে সই মনের বাঁধি রাখো

কেউ না বেন জানে সুখি রাখাবনে থাক।

(কাহার নেন পদম্পর্ক)

এই বুঝি কে আসে রে সই চল ঘরে যাই

তোমার প্রাণের বল আমি কেমনে বুঝাই।

(মহা ও পালকের প্রস্থান)।

(মহা ও নদেরঠাকুরের প্রবেশ)

নদেরঠাক। —

মা ছেড়েছি, বাপ ছেড়েছি, ছেড়েছি পরবাড়ী

তোমার নিরা কড়া আমি হব দেশান্তরী।

মহা। — কেন তুমি বল ঠাকুর বল এমন কথা,

বেদের কড়া বিদায় হবে নিন্দা বখাওতা।

নদেরঠাক। —

কিসের আমার জাতি-গন্ধান, কিসের নিন্দা ভয়

তোমারে না পাইলে কড়া মরিব নিশ্চয়।

তুমি আমার নয়ন আসো, দেহের মধ্যে প্রাণ

স্বপনের দেবী তুমি জাগরণে ধ্যান।

বল বল বল কড়া মিলব নিত্যাঁ সাথে

আমার মরণ বাঁচন কল যে আছে তোমার মাঝে।

মহা। — (নদেরঠাকুরের গলা ধরিয়া)

তুমি আমার গলায় মালা নয়নের মদি

তিলেকমাত্র না দেখিলে হই পাগলিনী।

কি কহিব বান্ধা আমি পিঙ্গরের পাখী

বাহির হইব উপায় নাই রে মনের ভ্রমণে থাকি।

হইতে যদি বন্ধ তুমি হইতে বনের দুল,

বেগী বাঁহীকা রাগতাম তোমায় ঢাকা দিরা হুল।

আমি মরি জলে জুয়া আমার মাথা ষাও

ছাড়ান দিয়া আমার আশা ঘরে চম্বা ষাও।

যাই রে বন্ধ যাই রে আমি বেলা বইয়া যার

আমারে না দেখলে তারা ভাবিয়ে হেথায়।

নদেরঠাক। — (মুদ্রার হাত ধরিয়া)

কেমনে রে ছাড়ব তোমায় কিছুই বুঝি না

তোমায় ছাড়িঁ ঘরে আমি রইতে পারি না।

তুমি আমার নয়ন-তারার দেহের মধ্যে প্রাণ,

তোমায় লইয়া যাব কড়া যাব অন্তহান।

মহা। — (বৃক্সান্তরালে মন্থনের ছায়া দেখিয়া)

ঐ যেন কে গাছের পিছে আঁধারে মুকায়

আর না থাক ঠাকুর হেথায়, চাচি যে বিদায়।

ইচ্ছা করে শুনি তোমার বচন স্তম্ভমূর

কেমনে যে পুরবে আশা জানি না ঠাকুর।

(উভয়ের প্রস্থান)

(হমড়া, মণিক ও স্ত্রজনের প্রবেশ)

মহা। — মন দিরা শেন রে স্ত্রজ শেন রে মণিক ভাই

এবেশ ছাইছা চল রে আমরা অভ লেপে বাই।

কি হইবে রে বাড়ী ঘরে বাইব ভিকা মণি,

মহুরারে পাগল দেখি নদের ঠাকুর সাগি।

স্ত্রজ। — বুঝি এখন মহা ভাই নদীর বাটে যার

রাতেবেলা আইয়া কিরা প্রেমের গান গায়।

স্বাধার যদি নদের ঠাকুর বাটের পথে চলে

এই ছুরিতে মাইরা তারে কেলব নদীর জলে।

মণিক। — বামু রে স্ত্রজ বামু রে বাছা মুখের বড়াই রাখ,

সালের চিরায় দমি মাইখা বাইরা স্বপে থাক।

মহা। — কি করিতে ইচ্ছা এখন বল রে মণিক ভাই

মিরা কেন হেথায় থাকি' মনে ভ্রম পাই।

মণিক। — কি যে কথা বল রে ভাই কিছু বুঝে নারি

কেন তুমি ছাড়তে চাও সোণার জমী বাড়ী

শানে বান্ধা পুষ্করিণী গলায় গলায় জল

পাইকা আছে সালের দানে সোণার ফল।

মিরা তুমি মদ বল মহা বেতীরে

আনেনে সে থাকে, নিরা পালক সখীরে।

মহা। — পল্লব ঘোর গেছে বুড়ি রইব না এ দেশে

আর থাকিলে হারাই পাছে মহুরারে শেষে

দেখছি তারে সাক্ষর বেলায় নদের ঠাকুর সাগে

নিভা বুঝি তাহার পাশে যার সে গহন রাতে।

বাইব আমরা এবেশ ছাড়ি' প্রস্তুত হও হারায়

পলাইব সকল বেদে পড়ায় এই নিশায়।

(হমড়ার প্রস্থান)

মণিক। — হার রে স্ত্রজ কেমন করি বাড়ী ছাড়ব বল

এমন প্রাণ সালের চিরায় পুষ্করিণী জল।

করক গিরা নদের ঠাকুর মহুরারে বিয়া

স্ত্রজ বুঝি স্বপে থাক বাড়ী জমী নিরা।

অনেক কন্যা দিব তোমার থাকলে বাড়ী ঘর

পাকা চল রে দিব বাইতে আমার কথা ঘর।

১০২

স্ত্রজ। — (বিরক্ত হইয়া)

চল চল মণিক-গুচা চল এ দেশ ছাড়ি'

মহুরারে চাই যে আমি, চাই নে জমী-বাড়ী।

(মণিককে টানিয়া লইয়া স্ত্রজনের প্রস্থান)

(মহা ও পালকের প্রবেশ ও গীত)

পালক। — কি ভাবিছ বনের পাখী বসি পিঙ্গরার

বাদনা উড়িতে বৃষ্টি মনেতে জাগায়।

আমানেতে 'বউ কথা কও' ডাক দিয়া যার

সোণার কোকিল পাছে বসি কুহ কুহ গায়।

বুঝে জাগাতে বাঁধী তাঁরে কে বাজায়

কে তোর পালক করি ছুটীয়া পায়।

বান্ধা পাখী পাগলিনী ভাবিয়া লোটার

পিঙ্গরে বসিয়া নিশা কেমনে পোয়ায়।

মহা। — ভাবিয়া ভাবিয়া সখি হই যে আকুল

জরিয়া যেতেছে আমার জীবন-মুকুল।

পালক। — কি ভাবিছ বসি সখি বদন করি কালি

তোমার কথা বেদের দলে করে বলারলি।

নিভা নাহি ষাও গো সখি না ছোও ভাত পানি

পাগলিনী বলি গবে করে কানাকানি

মহা। — কি বলিব সখি তোরে আমার মনের ব্যথা

নদের ঠাকুর স্বামী আমার শোনেবে বলি কথা

তার বিহনে তিলেক আমি না পারি রহিতে

ভাবিয়া না দেখি উপায় বাতনা সহিতে।

পালক। — উঠ উঠ সখি তুমি স্বপে নিভা ষাও

ভাবিয়া ভাবিয়া কেন মনে স্বপ না পাও।

ভুলনে বিরলে বসি গাধি দুলের বালা

সন্ধ্যাইব যতন করি তোমার নাগর কালা।

(হমড়ার প্রবেশ)

হমড়া। — কই রে তোরা মহুরারে পাগল রে কই?

শেন রে আমি আমার কথা তোরা ছুটা সই।



যাইব আমরা এ গ্রাম ছাড়ি এই না গভীর নিশার  
তোরা ভ্রমণ প্রস্তুত থাকিস আমরা যাইব স্বরায়  
(হুমড়া ও পশ্চাতে পাগড়ের প্রস্থান)

মহয়ার গান

জনম গোঁড়াহ হুগে, কত না সহিব কুকে  
কেমনে গো জীবন ধরিব।

পরানে রহিল বাণ্য, স্বথ মোর গেল কোথা  
ঐশু লাগি গরম ভবিব।

ধু তরে আঁধি স্বরে, রহিতে পারি না ঘরে  
তারে ছাড়ি কেমনে যাইব।

তবু মোরে যেতে হবে পাখী যে গো বাণ্য তবে  
বাঁশী তার আর না শুনিব।

" (পার্শ্ব হইতে নদেরটাদের প্রবেশ)

নদেরটাদ।—

কি কথা শোনাও তুমি কি কথা শোনাও  
আমারে ছাড়িয়া তুমি কোনখানে যাও।

মহয়া।—উপার নাই রে বন্ধ আমার উপার যে রে নাই,  
এ গ্রাম ছাড়ি বেদের দল রে যাবে অন্য ঠাই।  
তোমার সঙ্গে বৃষ্টি আমার এই না শেষ দেখা  
কেমনে থাকিব বন্ধ তোমা বিনা একা।  
আর না তোমার বাঁশী আমার ডাকিবে নিশিতে  
আর না আইসা পাইব হেথার তোমারে দেখিতে।  
জাগিয়া না দেখব কত এই না সোণা মূখ,  
তোমার সাথে বসি হেথার আর না পাব স্বথ।

নদেরটাদ।—

কি শুনিরে নিষ্ঠুর কথা মহয়া স্বকরী  
তোমারে না দেখলে আমি যাব নিষ্ঠুর মরি।

মহয়া।—ভেব না ভেব না বন্ধ রাখ আমার কথা  
পাহাড়তলে খুঁজো আমার মনে জাগে বাণ্য।  
তোমারে কি বুখাব যে নিজেই বৃষ্টি না,

পরান ফাটি' কান্না আসে রয়িতে পারি না।  
ঐ বৃষ্টি গো আমার বোঝে আসে দল দল  
বিদায় বন্ধ বিদায় দাও, অশ্রু যে সখল।

(মহয়ার কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

(নদেরটাদ বিরল অবস্থার পর উঠিয়া)

নদেরটাদ।—

কোথার যাও মহয়া রে আমারে ফেলিয়া  
কি হবে সম্পত্তি নিশা তোমারে ছাড়িয়া।

(প্রবেশ)

(প্রস্থানোক্ত বদের দলের প্রবেশ)

গান

কমর কমর কমর বোলে  
রিঝিনি রিঝিনি বাজে চোলে  
তাগে-তাগে চরণ ফেলে নাচি রে  
বনে বনে ঘুরে ঘুরে  
পাহাড় পাহাড় চুরে চুরে

পথে পথে ভিখারী ইনাম যাচি রে।

হুমড়া।—চল চল মাখিক ভাই চল তাড়াতাড়ি  
আধার-নিশার পলাই চল বামনকান্দা ছাড়ি।  
পাছে আবার নদের টাকুর টের পাইয়া আসে  
মহয়ারে লইয়া যাব কুইড়া আপন বাসে।  
মাখিক।—এখন ছিল জমী বাড়ী এমন ফেতের ধান  
তারে ফেঁদায়া যাইতে প্রাণ করে আনচান।  
সানে বাবা পুধুরিণী, গলায় গলায় জল  
কাফচক্ষুর মতন পানি করে টলটল।  
একলে ছাইড়া যাইহত মনে হুগে পাই  
মহয়ারে সিয়া কেন এইখানে না রই।

জ্বলন।—চল চল মাখিক-খুড়া বুখা কও কথা  
মহয়ারে না ছাড়িব যাইতে যথাতথা।  
পালঙ্ক।—(মহয়ার হাত ধরিয়া)  
বন বল মহয়া সই ফিরা কেন চাও  
ছাড়তে বৃষ্টি নদেরটাকুর মনে ব্যাথা পাও।

মহয়া।—কি বলব তোরে সখি কথা নাইরে পাই  
মনে হয় রে বৃষ্টি আমার দেখে প্রাণ নাই।  
চলতে আমারে চরণ কাপে অন্ধ গরম  
এখন শুধু মহয়া চায় মরণ নিরন্তর।

হুমড়া।—(ডাক দিয়া)

কইরে তোরা মহয়া রে পালঙ্ক রে কই  
তাড়াতাড়ি আর না কেন তোরা ছুটি সই।

(সকলের প্রস্থান)

(মহয়াকে খুঁজিতে খুঁজিতে নদেরটাদের প্রবেশ)

গান

নদেরটাদ।—

কোথার ওরে বেদের বাবা কোথায় পরান প্রিয়া  
কোন দেশেতে গেলে সখি আমার জীবন নিয়া  
বিনা হস্তার পাখতা মাগা বনের কুহুম দিয়া

কণ্ঠে আমার দুলারে দিতা প্রেমে ভরি দিয়া  
আমার দুলার-পিক্সর তাকি উড়ল প্রেমের টিরা  
এমন পাগল করি কোথায় বাসা বাধল গিয়া।  
সকল তুলি মাতাল হইছি প্রেমের হুগা পিয়া  
কে নিল রে দুলার-চানে আধারিয়া দিয়া।  
সাক্ষী হও চল হুগা সাক্ষী হও তারা  
মহয়ারে খুঁজিতে আমি হবে গৃহছাড়া।  
ছাড়ব আমি স্বথের শয্যা ছাড়িব স্বপ্নন  
ঘর হইবে পাহাড়-পর্বত গহন কানন।  
বেদের কন্ডা পরান আমার জীবন সখল  
বিহনে তার মরব আমি ছাড়ি অরলন।

প্রস্থান)

ঘনিকা পতন

ক্রমশঃ

## চন্দ্রকোণা

ত্রিগুণাকনাথ রায়

বর্তমান যেমিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোণা একটা  
প্রসিদ্ধ নগর। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান অক্ষ-রেখা  
২১°-৪৪'-২০" উত্তর, দ্রাঘিমাংশ ৮৭°-০০'-২৫" পূর্ব।  
এখানে থানা, পোষ্ট অফিস, উক্ত ইংরেজী বিদ্যালয়,  
মিউনিসিপ্যালিটি, দাতব্যচিকিৎসাশালা ও সবরেজেন্টারি অফিস  
হইতে। পূর্বের প্রতিষ্ঠার নিদর্শন প্রাচীন মন্দির, দীঘি, গড় ও  
প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও অনেক বিদ্যমান আছে।  
১৮২ সালের আদমশুমারিতে ইহার লোকসংখ্যা ছিল  
২১,০০০ হাজার, ১৮৮১ সালে ১২,০০০, ১৮৯১ সালে  
১১,০০০, ১৯০১ সালে ৯০০০, ১৯২১ সালে ৬৪৭০ এবং

১৯৩১ সালে ৬০০০ আদিয়া ঠাকুরাইয়াছে। পূর্বে এখানে  
কাপড়, ঘৃত ও কাঁচার বাসন যথেষ্ট উৎপন্ন হইত এবং  
চতুর্দিকে রপ্তানি হইত; বিশেষতঃ কাপড় ও মটিক বিএর  
প্রসার যথেষ্ট ছিল। উড়িয়া ও মাদ্রাজে চন্দ্রকোণার  
কাপড়ের এখনও বেশ সন্ধান আছে, যদিও তালপত্রের  
তাগাছের একান্ত অভাব। হানীয় শিল্পক্ষেপে ও  
ম্যালেরিয়ায় চন্দ্রকোণা এখন মৃতপ্রায় কর্তালবিশিষ্ট।  
কথা, কিংবদন্তী ও কাহিনীতে চন্দ্রকোণার প্রাচীন  
ইতিহাসের অনেক উপকরণ রক্ষিত আছে। ইহার বৈশিষ্ট্য  
ও ঐক্য, রাজবংশের উত্থান ও পতন, শিল্পায়গীর ইতিহাস







কয়েক ক্রমে প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত পাঠান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। আকবরের সময়ে রাজা চৌদরখানের বিভাগাধীনায়ে সরকার মানসারণ অধিবাসীদের বীরত্ব জেতার অঙ্গুষ্ঠত ন্যায় হইতে আরম্ভ হইয়া বহুমান জেবার রাণীগঞ্জ, হুগলী জেলার জাহানাবাদ এবং হাওড়া জেলার পশ্চিমাবাদ হইয়া মৈনিনীপুর বিস্তার ও মহিষাদল পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হুলতান হুজা হুবা বাংলায় রাজ্যের এক হিসাব প্রস্তুত করেন। তাহাতেই বোধ হয় প্রথম রীতিমতভাবে চক্রকোণার নাম লিখিত-পরিচিতির মধ্যে আসিয়া পড়ে। মহাল হাতেলি মদারবের অঙ্গুষ্ঠত বরদা ও চক্রকোণা ভূভাগ সরকার পেসকোশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। “মৈনিনীপুরের ইতিহাসে” দেখি, সরকার পেসকোশ কোন সীমানির্দিষ্ট স্থানকে বুঝাইত না। বঙ্গের সীমান্তপ্রদেশের স্বাধীন হিন্দুরাজারা বহন মুসলমান-রাজ্যের নিকট পরাক্রান্ত হইতেন, তখন তাহারা কিঞ্চিৎ উপচৌকন, কখন বা কিঞ্চিৎ নজর পেসকোশ স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইতেন। হুবা বাংলায় তৎকালে বিষ্ণুপুর, চক্রকোণা, পক্ষকোট প্রভৃতি স্থানে এইরূপ যে সকল জমিদার ছিলেন হুলতান হুজা সেই সকল জমিদারিকে সরকার পেসকোশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। সরকার মানসারণ ও সরকার পেসকোশের কয়দংশ বর্তমান ষাটাল মহকুমা।

পূর্বোক্ত উক্তি হইতে ইহা অনেকটা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হইবে না যে, পুরাতন হুজা, উৎকল বা রাঢ় রাজ্যের অঙ্গুষ্ঠত চক্রকোণা নগর, এমন কি বর্তমান চক্রকোণা পরগণাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। বহু পূর্বে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে এবং অনতিপূর্বে অর্ধ স্বাধীনভাবে এই পরগণা ছিল। সে সময়ে ইহার একটা স্বতন্ত্র নাম ছিল। আমরা দেখিয়াছি চক্রকোণার নাম রাজা চক্রকোণার পূর্বে মানা ছিল। পরে মানা নামে একটা পরগণারও সৃষ্টি হয়। চক্রকোণার পুরাতন ইতিহাস অসম্ভবান করিতে করিতে একটা—নাগরী অক্ষরে লেখা পত্র প্রস্তুত হয়। শ্রীযুক্ত অম্বাচরণ-বিদ্যাবৃণ মহাশয় ইহার পাঠোক্তার বর্ণনা করেন এবং লিপিত্রির সমগ্রও নির্দেশ করেন। ইহা ১০৭৭ সালে চক্রকোণার “রাজা নিজামশাহীকর্তৃক শ্রীমুখ্যায় চক্রবর্তী পৌরাণিক ক। বেটা শ্রীগোবর্ধন চক্রবর্তী”কে দেওয়া হয়। ইহাতে

পরগণা মানা লিখিত আছে। স্বতরাং অনতিপূর্বে একেপক্ষে থানা বলিত।” এখানে এখনও কিম্বদন্তি আছে যে ইহা মল্লেশ্বর মহাদেবের উত্তর দিকে যে মুন্ডায়, গড়ের প্রাকারায় চিহ্ন পাওয়া যায় তাহা মানাদের গড় ছিল। মানারা খুব যোদ্ধা ও ছিল। তাহারা যে কি জাতি বা কোন দেশের ছিল তাহা এখনও জানা যায় নাই। এদিকে কবি মুহম্মদ তাঁহার ‘চট্টা-মঙ্গল’ে ব্রাহ্মণভূমির রাজধানী আড়রা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই আড়রা শব্দ অতীতের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। রাঢ়ের পাশে অতীতের অস্বাভি আশ্চর্য্য নয়। ব্রাহ্মণভূমির শেষ দক্ষিণাংশে নেড়া দেউল বা রাঢ়া দেউল বলিয়া শিব-মন্দির আছে। রাঢ়ের শেষ সীমা অরাঢ়েরও শেষ সীমা আবার তাৎকালিক উড়িষ্যারও শেষ উত্তর সীমা। এই ত্রিভূমায় শিবমন্দির স্থাপন বোধ হয় হিন্দুগণের অনেক বৃদ্ধ-বিশিষ্টের অবসান করিয়া দিয়াছিল; স্বতরাং সেকালেও এদেশকে অরাঢ় বলিত।

আরও একটা কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। চক্রকোণা প্রদেশ একসময় ভানদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। দেখাবলী বিহিত নামক একটি পুঁথিতে ইহা দেখা যায়। পুঁথিখানি মহামেধাপাধ্যায় রাধাবংশী মহাশয় আখ্যায়িকার কতক এবং তিনি অনুমান করেন ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথের পণ্ডিতের রচনা। ইহাতে তখনকার কতকগুলি দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ভান দেশের সংস্থান তাহাতে এতদূর দেখা যায়—

কংসবতী হি সরিত শিলাবতী হি ভূমি।  
উভয়মধ্যবর্তী চানকো বিস্তৃত্য ভূমি।  
বক্ষীপাং পূর্বকোণে মণ্ডলবর্ষট পশ্চিমে।  
ত্রয়োদশ যোজনৈক মিতোহি ভানদেশকঃ ॥

কাসাবতী ও শিলাবতী নদীস্বরূপ এবং বক্ষীপ (বর্ষট) ও মণ্ডলগাও এই সীমান্তবর্ত্তী স্থানকে ভানদেশ বলিত। চক্রকোণার ভানবাণীয়া রাজ্যধন অনেকদিন রাজত্ব করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের নামেই হয়তো তাঁহাদের রাজত্ব ভানদেশ বলিয়া ব্যাতি লাভ করিয়া থাকিবে। “মৈনিনীপুরের ইতিহাসে” দেখি—“ভানদেশে তিনটা প্রধান নগর ছিল। চক্রকোণা, তুরিষ্টেও ও বলিয়ার।” যদি ভান রাজ্যের রাজত্ব ভানদেশ বলিয়া ধরা যায় এবং তুরিষ্টেও (বর্তমান

বুর্গী) ও বলিয়ার ঐ দেশের অন্তর্গত হয় তবে ভানদেশের সীমা বহুর বিস্তৃত ছিল সন্দেহ নাই।

উপন্যাসের আশ্রয় এই কথা বলিতে চাই যে, চক্রকোণা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ চৌদ্দ, রাঢ়, ব্রজ, উৎকল প্রভৃতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কখনও ছিল না। এমন কি পাঠান বা মোঘল রাজত্বেও ইহা স্বাধীন বা স্বাধীনাব্যবস্থায় ইহার অস্তিত্ব স্বাক্ষর রাখিয়াছিল। এই প্রদেশের প্রাচীন কাহিনী, নির, বাণিজ্য, রাজবংশের উত্থান ও পতন এবং পার্শ্ববর্তী

রাজ্যগুলির সহিত ব্যবহার ইত্যাদি অনেক আগোচনা করিয়া আছে। আমাদের এই কার্য্যে চক্রকোণা মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জানকীপদ দত্ত ও শ্রীমান রায়চরণ সিংহের সাহায্য ও সাহচর্য্যে বিশেষ উপকৃত হইতেছি এবং সেখানে অতীত সম্ভব তত্ত্ব জনসাধারণও অসম্ভবান কার্য্যে ব্যস্ততা সহ্যতা করিতেছেন; সে জন্য তাঁহারা যথেষ্ট ধন্যবাদ।

## ব্যবসা বাণিজ্য

### জীবনবীমার সাংকেতিক

শ্রীমণ্ডল বৈদিক

(সম্পাদক, ইন্সটিটিউট এণ্ড ফিন্যান্স ইয়ারবুক এণ্ড ডিস্ট্রিবিউটর)  
অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানবজাতি সঙ্কলের আদর্শ ও পথ গ্রহণ করিয়াছে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে, দুর্বলশী ব্যক্তিত্বকেই সঙ্কলের পক্ষপাতী। বার্ষিক আয়ের অতি কৃষ্ণ অংশও সঙ্কর করিয়া রাখিলে ঐ সঙ্কিত অর্থব্যয় বিপদের দিনে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়।

মামুষের আয়কাল অনিশ্চিত, উপার্জনকম ব্যক্তি অকস্মাৎ মুহূর্ত্তেই পতিত হইলে—পোষাবর্গ জন্মের চর্চাপ্রাপ্ত হয়। কি ভাবে তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবন-ব্যয় নিরীহ হইবে, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না। ভারতে একাদমবর্তী পরিবারের সংখ্যা বেশ; কিন্তু, আজকাল একাদমবর্তী পরিবারভুক্ত পরিবারবর্গের মধ্যে দৃষ্টান্ত বহুল অনেকটা দৃষ্ট হইয়া পড়ায় নিজ নিজ জী, পুত্র-কন্যা যাহাতে নিজের অবস্থামানে পরিজনবর্গের অনাগরো দুরবস্থা পতিত না হয়, তাঁহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সঙ্কলের পক্ষেই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নিজের অবস্থামানে জী-পুত্র-কন্যা যাহাতে কাহারও পরগ্রহ না হয় তৎপ্রতি সঙ্কলেরই লক্ষ্য রাখা কষ্টব্য। তাহাতে ব্যক্তিগত

অভাব-অভিযোগ দূর হইবে, দেশেরও অনেকাংশে শ্রীযুক্ত হইবে।

একমাত্র জীবনবীমার দ্বারা বার্ষিকের বা নিজের অবস্থামানে জী-পুত্র-পরিজনের জন্ম একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান করা যায়; বীমাকারী সামান্য পরিমাণ অর্থ বার্ষিক প্রদান করিয়া একটা নির্দিষ্ট টাকা সঙ্কর করিতে পারেন; বার্ষিক্যে ঐ সঙ্কর ব্যয় করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকা-নিরীহ করিতে পারেন;—পুত্র পরিজনের পরগ্রহ হইয়া থাকার জালা ও লজ্জা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না। অতীতকালে, অসময়ে নিজের মুহূর্ত্ত হইলে আত্মীয়-স্বজন ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ বীমার টাকা পাইবে পারেন। পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎসম্পর্কে, চিন্তা শেষ নিঃশ্বাস পতনের পূর্বেও তাঁহার রোগ-বরণা বৃদ্ধি করিবে না।

—জীবনবীমা সঙ্কর ও পুত্রের সমগ্র সাধন করে।  
ধনী ব্যক্তিগণের নামও চিত্রপুস্তকের হিসাবে লিখিত হয়; কাজেই, অসময়ে সাহায্য করিতে ও অতীতকালে বিপদে বাঁচা



সিহে সক্ষম জীবনব্যয়কে তাহার উপেক্ষা করিতে পারেন না।

জীবনবিষয় বহুল প্রকারে সমগ্র মৃত্যু-জগতে পারিবারিক অনেক কষ্ট-কষ্টের সাধন হইয়াছে। ভাষ্যতবর্ষ যে জীবনবিষয়-ক্ষেত্র এখনও পিছনে পড়িয়া আছে, সে কথা আমি বলিতেছি না; কিন্তু আমাদের দেশে বিমা-ব্যবসার জড়ত্ব সত্যম্বেই এই ব্যবসারের মত প্রগতি লাভ করিতে পারে না।

পূর্বে আমাদের দেশে শুধু বিদেশী বিমা কোম্পানীগুলি ব্যবসার করিত; আজ এদেশে কোম্পানীর অভাব নাই। কিন্তু, দেশীয় কোম্পানীতে বিমা করা যে সম্পূর্ণ নিরাপদ, উপযুক্ত প্রকারে অভাবে আমাদের দেশবাসী এখনও তাহা বুঝিতে পারে নাই। অর্থব্যয়ের দ্বারা এই প্রকার কার্য্য হুত্বভাবে চলিতে পারেন না; ভারতীয় বিমা-ব্যবসারের ব্যক্তিগণ প্রকৃত পরিশ্রম এবং দেশবাসী স্বদেশী কোম্পানীর প্রতি সহানুভূতি না দেখাইলে ভারতীয় বিমা ব্যবসারের উন্নতি হইবে না;

বিমা কোম্পানীগুলি আজ-কাল বিমাকারীকে যে সব সুবিধা প্রদান করিতেছে তাহা প্রত্যেককে বুঝিয়া দিতে হইবে; নতুবা আমাদের মত গত্যভোগিক ধারার অসুসরণকারী জাতি জীবনবিষয় সুবিধা ও সুযোগ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিবে। পণ-পরিণামে বিমাপ্রদ-প্রত্যাপন মূল্য, স্বতন্ত্র নিয়ম, প্রসারিত বিমা, অকর্ম্মণ্যতা-হেতু বিমার টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিণামের ব্যবস্থা—ইত্যাদি সুবিধাগুলি প্রত্যেককে বুঝিয়া দিতে হইবে।

শুধু ব্যক্তিগত ও পরিবারিক জীবনে নহে—ব্যবসার-ক্ষেত্রেও বিমার উপকারিতা অত্যন্ত বেশী। ব্যবসারীকে অনেক সময় কোন কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিতে হয়; এই কর্ম্মচারীর অভিজ্ঞতা ও মতান্তর উপর অনেক সময় উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। অকর্ম্মণ্যতা তাহার মুহূর্ত্তেই ব্যবসারীকে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এ-ক্ষেত্রে, এই কর্ম্মচারীর জীবনবিমা করিয়া অনেকটা নির্ভর্য্যব্যবসার করিতে পারেন; মুহূর্ত্তকরণ হস্ত এই কর্ম্মচারীকে জিনাইয়া লইয়া গেলে তাহার অভাবনিবন্ধন যে কতি হইবে, তাহার অন্ততঃ একটা অংশ

জীমা কোম্পানী প্রদান করিবে। ব্যবসারের অসুবিধারূপে অনেক সময় যৌথ বিমা (জয়েন্ট লাইফ ইন্সিওরেন্স) করিয়া থাকেন। ভবিষ্যতে ব্যবসারীকে বিমার বহুল প্রচার খাটিলে দেশে আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হইবে।

### নেচেলের জীবনবিমা

ডাঃ ইন্ড্রেশচন্দ্র রায়

(নিউ ইন্ডিয়া এন্সিওরেন্স কোম্পানী, কলিকাতা-শাখার জীবন-বিমা-বিভাগের সেক্রেটারী)

নারী ও পুরুষের মধ্যে সমানায়িকার প্রতিষ্ঠার কথা আজকাল আমরা প্রায়ই শুনিতেছি; এ সময়ে বিমাকারী পুরুষের তুলনায় বিমাকারী নারীর জীবনে বিপদের সম্ভাবনা কতখানি তাহার আলোচনা উপভোগ্য হইতে পারে। সাধারণতঃ অতিরিক্ত প্রিয়ময় (বিমার বার্ষিক চাঁদা) না লইয়া ভারতীয় কোম্পানীগুলি ভারতীয় রমণীর জীবনবিমা করেন না। পাশ্চাত্যদেশে বিমা-কোম্পানীগুলি রমণীর জীবনবিমা করিতে বিশেষ বিধা বোধ না করিলেও এদেশে ভারতীয় রমণীর জীবনবিমা করিতে ভারতীয় কোম্পানীগুলি বিশেষ বিধা বোধ করে। এ-সম্পর্কে আমরা আমাদের গত্যভোগিকতা এখনও পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।

রমণীর জীবনবিমা করার কোম্পানিকে কিম্বদন্তিবিধি কোন অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় কি? রমণীর জীবনে বিপদ বেশী—এইরূপ একটা ভুল ধারণা আমাদের মনে বহুস্থল হইয়া স্রোতে; সেইজন্যই কি আমরা রমণীর জীবনবিমার ইচ্ছা:তঃ কি? ইহার পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে?

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় বিশিষ্ট চিকিৎসক বিভিন্ন বায়সে নারী ও পুরুষের মুহূর্ত্তার সম্পর্কে বীরভাবে অসুশীলন ও আলোচনা করিয়া অল্পমাত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, “পুরুষের জীবনবিমা করার কোম্পানির বিপদ ঘটুক, রমণীর জীবনবিমা করার ও বিপদ প্রায় ততটুকু।”

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিয়ার্স নামক একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক পুরুষ ও রমণীর মুহূর্ত্ত-হার-সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা

করিয়াছিলেন যে,—“যে কোন বয়সের নারী সমবয়সী পুরুষের অপেক্ষা বেশীকাল বাচিবে বলিয়া আশা করা যায়।” তিনি আরও বলিতেছেন,—“রমণী পুরুষের অপেক্ষা দীর্ঘকাল বাচে; আবার বিবাহিতা রমণী অববিবাহিতা বা স্বামিহীন রমণী অপেক্ষা বেশীদিন বাচিয়া থাকে।”

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ হোয়াস প্রাকৃতিক মৃত্যুর অধ্যয়ন করিয়া ইহার কারণ বিবেচন করিয়াছেন,—

(১) পুরুষ সাধারণতঃ রমণীর তুলনায় অধিকতর পরিমাণে মাংসভক্ষ্য-সেবী।

(২) রমণীর তুলনায় পুরুষকে অনেক বেশী ছুঃখ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়।

ইলগেও “দেগল এণ্ড এম্পায়ার” বিমা কোম্পানী ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রম্পেকচার প্রকাশ করেন তাহাতে লিখিত হইয়াছিল যে, রমণিগণ সাধারণতঃ পুরুষের অপেক্ষা বেশী বাচে বলিয়া পুরুষের তুলনায় রমণিগণের বিমার প্রিমিয়মের হার কমাইয়া দেওয়া হইল। নিয়ে আমরা পুরুষ ও রমণীর বিমা-সম্পর্কে প্রিমিয়মের তালিকা উদ্ধৃত করিতেছি:—

আজীবন বিমা—১০০ পাউণ্ড

বয়স	বার্ষিক প্রিমিয়াম			রমণী		
	পা:	শি:	পে:	পা:	শি:	পে:
১০	১	১২	৭	১	৮	১
১৫	১	১৭	৬	১	১২	—
২০	২	২	৬	১	১৫	১
২৫	২	৫	৬	১	১৮	১
৩০	২	৯	১০	২	৩	২
৩৫	২	১৬	৮	২	৮	৭
৪০	৩	৪	৮	২	১৫	—
৪৫	৩	১৫	৮	৩	৩	৪
৫০	৪	১২	৮	৩	১৫	০
৫৫	৫	১৩	৮	৪	১১	৮
৬০	৬	১৮	২	৫	১৪	৭

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলগের সরকারী এক্সচার্জার মিঃ জন

১৬৩

ফিনল্যান্ড পলিমেটের সমুদ্রে উপস্থিত এক রিপোর্টে বলেন,—“১২ বৎসরের নিয়ন্তর বা ৮৫ বৎসরের উচ্চতর পুরুষ ও রমণীর মধ্যে মুহূর্ত্তাহারের তারতম্য নির্ধারণের নাই, কিন্তু ১২ হইতে ৮৫ বৎসর বয়সের মধ্যে পুরুষের তুলনায় রমণীর জীবন অনেকটা নিরাপদ।”

“অনেকে মনে করেন যে, সম্ভাব্য-ধারণে রমণীকে অনেকটা বিপদ বহন করিতে হবে; কিন্তু, কাগজতঃ দেখা গিয়াছে যে, অববিবাহিতা বা বিবাহ রমণীর তুলনায় সম্ভাব্য রমণীর মধ্যে মুহূর্ত্ত হার বেশী নহে।”

ইলগেও, বার্ষিক ও জায়েন্টীতে পুরুষের সমান প্রিমিয়মে রমণীর জীবনবিমা হইতেছে; আমাদের দেশে ও নারী শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে জীবন বিমার রমণীকে সমান সুবিধা দিতে হইবে। অদূর ভবিষ্যতে রমণীর জীবন-বিমা করার জড় রমণিগণই যে বিমা কোম্পানী স্থাপন করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই, অদূরবর্তী সেই দিনের অপেক্ষায় না থাকিয়া আমাদের দেশে রমণিগণের জীবনে বিপদ কষ্টকটু তাহা নিবারণের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

### বিমা ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা

জীবনবিমা

কয়েক বৎসর কাল বাবত নিদারুণ অর্থসঙ্কটে ভারতীয় বিমা-ব্যবসার অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চারিদিকে আর্থিক অনাটন না থাকিলে এই কয়েকবৎসরে বিভিন্ন বিমা-কোম্পানী অনেক বেশী টাকার কাজ সাগ্রহ করিতে পারিতেন,—একমাত্র অর্থসঙ্কট ও রাজনীতিক অনিশ্চয়তার জড় বিমা কোম্পানীগুলি আশাহরুপ কার্য সাগ্রহ করিতে পারিতেছে না।

রাজনীতি ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা সর্ববিধ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিকর; ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে গত কয়েকবৎসর বাবত একটা অশান্তি দেখা দিয়াছে; তাহার ফলে, ব্যবসারিগণ সর্বদা সশঙ্কচিত্তে কালাপান করিতেছে; নিশ্চিন্ত মনে

• মূল ইংরেজী প্রবন্ধটি “ইন্সিওরেন্স ও ফিন্যান্স রিভিউ” ও “ইন্সিওরেন্স ওজাঙ্ক” পত্রিকার প্রকাশিত হইতেছে।



তাহারা কোন ব্যবসায় করিতে পারিতেছে না বা নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি করার জন্য বেশী টাকা খাটাইতেও সাহসী হইতেছে না।

আমাদের দেশে চাকুরীজীবী ব্যক্তিগণই সর্গাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় জীবন-বিমা করিয়া থাকেন। সন্তান-দুর্ভাগ্যের কোন বে কালের চাকুরী ঘাইবে তাহা বলা যায় না; ইতিমধ্যেই অনেকের চাকুরী গিয়াছে; অবশিষ্ট সকলের চাকুরী না গেলেও কেতন হ্রাস হইয়াছে।

সাধারণ চাকুরীজীবী ভারতবাসী কার্যক্ষেপে দিনযাপন করে; সন্সারের বিবিধ ব্যয় বহন করিয়া তাহার হাতে মাসের শেষে একটা পরমাণু থাকে না; অনেকের আবার কাহ্নীওলাশার বা আকিসে দরোয়ারনের নিকট হইতে অত্যধিক চড়া হুন্ডে টাকা ধার করিয়া অকথাৎ প্রজাবিনী ব্যয় বহন করেন। “হুন আনতে পাঠা জুরায়”

—বাহসে অকথা, তাহারা নামানভাবে অস্থিবাণ ভোগ করিয়া বিমার প্রিমিয়ম প্রদান করে; বর্তমান বৎসরে বেতন প্রিমিয়া বাগায় কিভাবে প্রিমিয়মের টাকা নিয়মিতভাবে প্রদান করিবে ইহাই তাহাদের নিকট বড় সমস্যা। নূতন বিমা করা দুরের কথা, প্রুতন বিমার প্রিমিয়াম প্রদান করাই অনেকের পক্ষে হ্রস্বসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে; ইহার ফলে অনেককে প্রিমিয়াম না দেওয়ার বহু বিমা পত্র বাতিল হইয়া গিয়াছে; অনেকের আবার প্রিমিয়াম দিতে অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়া বিমার পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছে; অসমর্থ আবার বিমা-পত্র গচ্ছিত রাখিয়া কোম্পানীর তহবিল হইতে টাকা ধার কার্যতেছে।

দেশের সর্বত্র “নিরাশ্রয় অর্থকষ্ট দেখা না গিলে অবস্থা আরও বেশোনির হইত না, ভারতীয় বিমা কোম্পানীগুলির কাজ বেভাবে কমিয়া গিয়াছে সেভাবে কামিতে পারিত না। এক্ষণে অসমর্থই দেশে বর্তমান চরমস্থায় স্থগিত করিয়াছে, এবং বিমা ব্যবসারে তাহার প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে প্রকট হইতেছে।

শ্রদ্ধেী-আন্দোলন প্রসারিত লাভ করার দেশীয় বিমা কোম্পানীগুলি বর্তমানে তত বেশী সন্তোষিত হয় নাই, বাকি মোট বিমার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে সত্য; কিন্তু, বিদেশী কোম্পানীগুলি ইতিপূর্বে প্রতি এসম সোটা কোটা টাকার নূতন কাজ সমগ্র করিত,—একদে তাহাদের কাজ শতকরা ৮০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে, এবং এই ৮০ ভাগের একটা অংশ শ্রদ্ধেী বিমা কোম্পানীগুলি গ্রাস্ হইয়াছে। ১৯৩১ সালে সমস্ত বিদেশী কোম্পানী ভারতে মত টাকার নূতন বিমা গ্রহণ করিয়াছে, মাত্র একটা ভারতীয় কোম্পানী তদপেক্ষা বেশী টাকাকার নূতন বিমা গ্রহণ হইয়াছে।

অতীত কালের বিষয়, জাতির হিতসাধনোদ্দেশ্যে বীমার টাকা যে ভাবে খাটান উচিত স্থবিকাংস কখনো কোম্পানী সেইভাবে খুব বেশী টাকা খাটায় না। অতীত কালে স্থানীয় দেশে বংশোদ্ভূত বিমা কোম্পানী তাহাদের মোট তহবিলের শতকরা ৬৫ টাকা খাটায়। দেশের উন্নতি সাধনোদ্দেশ্যে খাটাইয়া থাকে—কিন্তু, ভারতীয় কোম্পানীগুলি মোট তহবিলের শতকরা ৫ ভাগ মাত্র এই ভাবে বিনিয়োগ করে। জাতীয় বিদ্রোহান্ত সাধন কল্পে বিমাকোম্পানীগুলি আর একটু মনোযোগ দিলে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে।

ইপিওরেন্স র্যাও কিন্যান্স ইয়ার বুক  
(১৯৩০-৩১)

—শ্রীমতীমহোদয় মৌলিক সম্পত্তি ও কলিকাতা, ১৪ রাইড স্ট্রীট হইতে রায়চৌধুরী র্যাও কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত।—মুদ্রা তিন টাকা মাত্র।

ভাবনবিমা-সম্পর্কে বিবিধ তথ্যপূর্ণ একখানি নির্ভরযোগ্য পুস্তকের আভাবে বিমাসম্পর্কেই সকলেই এতদূর বিশেষ অস্থিবাণ ভোগ করিতেন। এতদূরই সেই অভাব দূর হইয়াছে। ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ স্বরেন্দ্রনাথ রায়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীমান্ মহাপ্রসাদ মৌলিক বিশেষ প্রমথহকারে বিমা-সম্পর্কিত মানাধিগ উল্লেখযোগ্য তথ্য সমগ্র করিয়া উপযুক্ত পুস্তক গানি রচনা করিয়াছেন।

আটটি অধ্যায়ে সম্পাদক পুস্তক ধ্যানিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন। ভাবনবিমা-সম্পর্কে প্রাথমিক ব্যক্তিগণের মতামত, বিমা-ব্যবসারে চণ্ডিত কথোপকথন তালিকা ও তাহার ভাবার্থ, ভারতীয় বিমা-কোম্পানীগুলির হিসাব কয়েকটা অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মেসেজের ভাবনবিমা-সম্পর্কে সম্পাদক মহাশয় বেশী নাটক অনেক কথা আলোচনা করিয়াছেন। যেমন্ত দুই ও ত্রিলাভী কোম্পানী কারবার গুটাইয়াছে, তাহার একটা বিস্তৃত তালিকাও পুস্তকে সাময়িকিত হইয়াছে।

বিমা-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের সমাধানে এই পুস্তক ধ্যানি একেটগণের নিকটে অপরিস্রাব্য বসিয়া বিবেচিত হইবে। আমার পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ স্বরেন্দ্রনাথ রায়ের আশ্রয়িতা ব্রাহ্মী এই মূল্যবান পুস্তকখানি প্রকাশিত হইতে পারিল। বিমা-ব্যবসায়-সম্পর্কে এতদুপেক্ষা নিকটই তিনি পৃথিব্যবাহ।

## কুমুদের কীর্তি

( গল্প )

শ্রীতাপাদ মজুমদার

রাতি একুশে পূর্ণিমার ঠাণ্ডা ঠেঁদন হইতে ছাড়িবার উদ্দেশ্য করিতেছে, মধ্যে মধ্যে ধোঁয়া ছাড়িয়া গর্জনও করিতেছে কম নয়, এমন সময়ে ব্যত-সমস্ত হইয়া সমুদ্রেই একখানি খাড়া ক্রাসের গাড়ী দেখিয়া উঠিয়া পড়িয়াস। গাড়ীখানির ভিতর দেখি, বাঙ্গালী একজনও নাই, মেনে একবার বাঙ্গালীকেই বর্জন করিয়া ভারতের প্রায় সকল জাতিরই মিলন-ক্ষেত্র হইয়াছে।

কোনক্রমে এক কোণে একটু বিনিবার উদ্দেশ্য করিতেই চারি হাত পরিমিত একজন কান্দী তাহার হস্ত-সমস্ত শ্রীকণ্ঠে উঠিয়া-সোহানে তুলিয়া দিয়া চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিল, ‘ইহার নেই বাবু, মেরা সোস্ত্র মায়ে গা।’

তাহার ভিত্তি বিবাহ কারণ কি না ভাবিতেছি, এমন সময় একজন বাঙ্গালী ভ্রমলোক সস্ত্রীক আসিয়া আমার পার্শ্বে ঠাঁইহইলেন। তাহাকে দেখিয়া একটু ভরসা হইল। কাম্বলির সহিত কিছুকল বাক-বিতণ্ডা করিয়া জায়গাটা অধিকার করিলাম। কিন্তু সেখানে বসিবে কে? আমার অস্থবাসনের ফলে স্থানটি অধিকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলে এই ভ্রমলোকটিকে পাঠাইয়া বুঝিতে হয়। ভ্রমলোকটীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, ‘ওঁকে এখানে বসিয়ে দিন, তাপস বা’ হয়, কারা হইবে।’

ভ্রমলোকটী একটু ইতস্ততঃ করিয়া, অজ্ঞ উপায়ও কিছু না দেখিয়া অবগুষ্ঠিতা মর্হিমাটিকে সেইখানে বসাইয়া দিলেন। আমি গুটী বৈকল্পে মধ্যস্থিত একটা ‘লাগেজের’ উপর কোনওরূপে দেহভার স্থাপন করিলাম। তিনিও কতকটা একটা ট্রান্সের উপর ও কতকটা আমার জীহ্ব উপর ভর রাখা-স্বতন্ত্রেই বসিয়া পড়িলেন।

গাড়ী ততক্ষণে ছাড়িয়া দিয়াছে। একুশপূর্ণিমা গাড়ী, যখন বেগে ছুটিতেছে। ওদিক্কার কোণে একজন হিন্দুস্থানী

একখানি হিন্দী “বিধামিত্র” পড়িতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে ঈর্ষ্য হাসিতেছিল, আমি বোধ হয় তাহার স্বপ্নবদন্তিত মন্তব্যগুলির সৌন্দর্যেই আকৃষ্ট হইয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম। কাগজখানি পড়িতে পড়িতে হঠাৎ সে যখন তুলিয়া পাশের লোকটিকে বলিল, ‘ভেইয়া দেখিবে দেখিবে, মজাদার ধবর দেখিবে, একটো বাংগালী সেমগালো জর লেকর ভাগ গিয়া ছার।’ পল্লি উল্লেখ পড়তি নিকান্বে নেই শব্দটা ছায়।’

পাশের ভ্রমলোকটী, এমন তাহাকে আমার সহস্রাঙ্গীই বলব, হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, ‘বৌটোফেলের ফুটীটা দেখুন একবার, বাঙ্গালীর একটা কলেজকারীর ববর পেয়েছে কি না?’

আমি বলিলাম, ‘হ্যাঁ, এ ব্যাপারটা তো সব দেশেই রয়েছে, তবে আজকাল আমাদের দেশেই বেশ একটু বেশি, অন্তত আমাদের চোখে তাই ঠেকে, আপনি বাবেন কন্দর?’

“আমি রাতি পূর্ণিমার রাতে, সেখানকার রেলওয়ের ‘বুকি’ জগিরের আমি একজন ‘হার্কার’, আপনি?”

‘ভালই ছল, এই লগা রাভাটা একা একা যেতে কি বিড়ম্বনাইটাই নী হোত; দেহহেমন তো? এই সব পাগড়ীর মধ্যে চাপা পড়ে যেতাম আর কি? আমিও আপনাদের মতের।’ একেবারে রাতি’ ওখানে আমার দাঙ্গা ‘দাঙ্গাইয়া’র ‘জাঙ্গুর’ টাইরী কাছে দিন কয়েক বেতুতে থাকি।’

‘বশ ভালই তো, গল্প করতে করতে দিবা যাওয়া বাবে ‘বন’ বলিগা তিনি পকেট হইতে বিভিন্ন কোটাটা বাহির করিয়া আমার সমুপে ধরিলেন। আমি ইংরেজের



অনুগ্রহে সেটা অস্বীকার করিয়া পকেট হইতে নতুন ডিবা বাহির করিলাম।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'ও তা' হ'লে চলে একটা, একেবারে নিরিম্ব ন'ন।'

ঈশ্বর হাসিয়া বলিলাম, 'আজ্ঞে না।'

গাড়ীখানি অতিরিক্ত বেগে যাইতেছিল বলিয়া চলিতেছিল, তজ্জ্বার একটা মাস্তাঞ্জীর মন্তক হইতে পাগড়ী বসিয়া পড়িল, এবং সে চমকিয়া উঠিয়া ভুলুপ্তিত শিরশাণীর প্রতিলক্ষ্য করিয়া তাহার মাতৃ-ভাষায় কি যে বলিয়া উঠিল তাহার একবিন্দুও বুঝিতে পারিলাম না। তাহার মুখাবয়ব দেখিয়া বৃষ্টিলাম, মন্তকাবরণটার পতনের জন্য সে আদৌ সন্দেহ হয় নাই; কারণ গাড়ীর মধ্যে কে জলকেশিয়াছিল এবং পাগড়ীটা মূল্য ও জলে মাথাখাষি হইয়া কিছুতরিকালোর হইয়া পড়িয়াছে। মাস্তাঞ্জীর পাগড়ীটা ভূগতি দেখিয়া আমার পারম্বিতা সেই মহিলাটি কিং করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলেন।

কোলাহাট ঠেঁশনের আগে আসিয়া আমাদের বাপ্পীর রথ ম্বরগতি হইল এবং ধীরে ধীরে ধারিয়া গেল। একজন উদ্ভিগা—চোরায়া দেখিয়া মনে হল, তবু শ্রেণীর লোক—ধীরে ধীরে সেখানে নামিয়া পড়িল। জনৈক মাজোরাড়ী তাহার সঙ্গীকে এক ঠেলা দিয়া দরবিকাশ করিয়া বলিল, 'ভাগ্যভাগ্যের দেখো।'

আমিও উদ্ভিগাটিকে লক্ষ্য করিয়া আমার সহযাত্রীকে বলিলাম, 'বেশই বেশ কিশোরীকে কেন্দ্রীকি দেখিছে।' এটা বোধ হয় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার—ভজলোকটা কোন উত্তর করিলেন না।

চলন্ত ট্রেনে অনেক সময় অনেকের বেশ ঘুম পায়। জানালায় ধাক্কা দিয়া চমৎকার হাওয়া আসিতেছিল, কখন তজ্জ্বা আসিয়াছিল, তেঁ পাই নাই। 'গোলামায়ে ঘুম ছাটো গেল; দেখি' বড়গুণের ঠেঁশন। আমার সঙ্গীটা উদ্ভিগা আমার বলিলেন, 'একটু বেগবনে একে, আমি আমার এক বস্ত্র-সঙ্গে দেখা করে আসি, বেশ দূর নয়, ঐ 'ওভার ব্রিজটার পরেই, ট্রাকটিক সেটেলমেণ্টে, ট্রেন এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে।'

আমি বলিলাম, 'বহুদনে বেতে পারেন।'...নহিলে জানালাম মুখ বাহির করিয়া বোধ হয় ঠেঁশনের জনতার পারম্বিক্ষেপ-পতন দেখিতে মাগিলেন ও খিরিগরাহার ডাকের তারতম্য ও বিশেষত্বের দিকে মনোযোগ দিলেন।

সমুদ্রের বেঙ্কের একটা হিন্দুস্থানী বাম হস্তের তালুতে 'তুখা' রগড়াইতে রগড়াইতে, তাহাতে এক ভাষি লাগাইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'আপু কাঁধত্ব যাইয়েগা বাবু।'

আমি উত্তরে বলিলাম, 'রাঁচি...আপু?' সে আরম্ভ করিল, 'হামতি রাঁচি যায়ে গা বাবু, হইসে হামারা একটো লেডকা কলকাতনে খিউ চান্না লাগাতা হায়া। গারু লোজ হো গিয়া হায়া, খিউচি আয়া নেই, লেডকাকা পাশে সে কুছ জবাব ভি আয়া নেই, উগি-গায়ে হাম এক লেড হই পর যাতা হায়া,... মুহুরমে হামারা একটো...'

হিন্দুস্থানীটা তাহার ব্যবসায়ের কথা শেষ করিয়া, বোধ হয় তাহার সঙ্গারের কথা পাড়িতেছিল, কিং 'আমার অত ধৈর্য ছিল না, আমি মুখ ফিরাইয়া ডাকিলাম, এই পান। পানওলাগা কাছে আসিয়া বলিল, 'জমদি নিকালাইয়ে বাবুজি, গাড়ী ছোড় দিয়া হায়া।'

তাড়াতাড়ি একটা পরয়া বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম, সেও ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে আমার হাতে পান দিয়া চলিয়া গেল। কলাপাতার মোড়ক খুলিয়া দেখি, পান ছুটীটার হলে একটা।

হঠাৎ খোয়াল হইল, সেই ভজলোকটা আসিলেন না তো। মহিলাটাও তখন আকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'ইন্স মইন-না' উঠতে পারলেন না?' বলিয়া গাড়ী হইতে অবতরণের উপক্রম করিলেন। গাড়ীখানি শুধন সবে প্রাটিক্সর ছাড়াইয়াছে।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'করেন কি? তিনি নিজেই তাড়াতাড়ি অত গাড়ীতে উঠেছেন।' অনন্তোপায় হইয়া মহিলাটি বসিয়া পড়িলেন। সেই অসময়ে দেখিলাম, তাহার সম্মুখস্থানী ভীতি ও উৎকণ্ঠায় ভরিয়া গিয়াছে। বলিলাম, 'কিছু ভয় নেই

হানাপ, পরের ঠেঁশনেই তিনি ঐ গাড়ীতে আসবেন, হামনি ততক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া বসিয়া থাকুন...হ্যাঁ ওর নম মইনবাবু? উনি, আপনার দাঁপা হন।'

মহিলাটি একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাথার ঘোমটাটা ফর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, 'না, উনি আমার স্বামী।' স্নানে শিকরের মুখের উপর কোন দ্বন্দ্ব ছাড়া পূর্ণ

হয়ে অতি অদ্রীল কথা বলিলে শিকরের মুখের ও মনের দ্বন্দ্ব যেমন বিম্বরে ভরিয়া যায়, মহিলাটার কথা শুনিয়া আমার কথাও ভাবি হইতে থাকিল। বিব্রিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখে দিকে চাহিলাম, কিন্তু মাত্র একখানি অঙ্গনত মুখ অবগুণে আরম্ভ দেখিলাম। বৃষ্টিতে পারিলাম, না, সেই অবগুণের মধ্যে কোন রহস্তের লীলা দৃষ্টিতে। তৎক্ষণাৎ হিন্দুস্থানীর সেই 'বিখামিতের' সত্যতা মনে পড়িয়া গেল। ভাবিলাম, সেই রকম কিছু নয় তো, কিংবা সেই আসামী হইতাই নহে তো। পরক-এই ভাবিলাম, করিতেছি কি, একটা ভজ-মহিলা-সম্মুখে মাক্ না জামিয়া শুনিয়া মিথ্যা দোষারোপ করিতেছি, যদি তাহারে এই সম্পর্কের মধ্যে কোনও যথার্থ থাকিয়া থাক। তবু ব্যাপারটা জানিবার জন্ম মনটা কেনে গাঢ় করিতে লাগিল। কিন্তু মনের আবদারে সব সময় কর্ণপাত করিলে ভজতা রক্ষা হয় না, তাই চুপ করিয়া গেলাম। আবার নিজের দায়িত্বের কথাও ভাবিতে লাগিলাম, ভজলোক যদি সত্য সত্যই ট্রেন ধরিতে না পারিয়া থাকেন! তবে? এই রাতে একটা সম্পূর্ণ ক্ষয়িচিটা তৎক্ষণকে সইয়া এতটা পূর্ণ! এতদ্বারা তাহারে সম্পর্কের মধ্যেও যেন কেমন একটা ঝটকা লাগিতেছে। শেষটা 'সিন্ধুর কোটা'র 'হুশী'র ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়ে না তো?

দেখিতে দেখিতে ট্রেনখানি একটা ছোট ঠেঁশনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই গার্ডের ধাঁধী বজিয়া উঠিল। ভজলোকটা আসিলেন না। মহিলাটি এবারে রীতিমত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। বিপদে পড়িয়া তাঁহার লজ্জাও জন্মঃ ভাবিয়া আসিতেছিল, বলিলেন, 'কই, এখনো তো উঠলেন না, তা' হ'লে নিশ্চয়ই ট্রেন ধরতে পারেন নি, বেশ কি।'

আমি সাধনা দিয়া বলিলাম, 'টাটোতে ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়াবে, সেইখানেই যা' হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে 'পন। একটা টেলিগ্রাফও করা যাবে ওখান থেকে।'

স্থানান্তরে ট্রাকের উপর বসিয়াই চলিয়াছিলাম। উৎসে উত্তরেই চোখে নিজ্ঞাও ছিল না। ট্রেনখানি গতি লঘু হইয়া আসিয়াছিল, যদি খুলিয়া দেখিলাম, রাত্রি হইত। কিছু পরেই একটা ঠেঁশনে আসিয়া গাড়ীখানি যেন আধমি নিটের জন্ম ঠেঁশন মাঠেরে সহিত আলাপ করিয়া আবার ছুটিল। সাগ্রহে মহিলাটি জানালায় মুখ বাড়াইয়া, আশা না থাকিলেও ভঙ্গলোকটার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু কোথায় সেই ভজলোক! আমি বলিলাম, 'আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি তো আর বনে বাছি না, না হয় আমার সঙ্গে গিয়েই আমার বোধির কাছে কালকের দিনটা কাটিয়ে দেবেন। তারপর তিনি এলে খোজ করে তাঁর কাছে আপনাকে পাইয়ে দেব 'পন।'

গাড়ীতে একটা ঢেকার উঠিয়াছিল, লক্ষ্য করি নাই। তিনি সটিকট হইলে আমার টিকিটুখানি দেখাইলাম। আমার টিকিটুখানি দ্বিগাহিয়া দিয়া গাড়ীখানি দিকে আবার নির্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনার ষ্ট্রীর টিকিটুখানি?'

ঢেকারাব্যব শেষ কথাটায় আমি একটু নড়িয়া উঠিলাম, বলিলাম, 'ওর স্বামী বড়গুণের' নেবে আর উঠতে পারেন নি, তাঁর কাছেই টিকিটু আছে, টাট-নগরে গিয়ে ব্যবস্থা করব।'

ঢেকারটা ওদিকে সরিয়া গেল মহিলাটি বলিলেন, 'এখন তো কোন রকমে পার পড়িয়া গেল, কিন্তু পরে?'

আমি বলিলাম, 'পরের ব্যবস্থা পরে, এখন তো যাওয়া যাক' বলিয়া আমার আড়ষ্ট পদগুলিকে টানিয়া একটু আরামে বসিবার চেষ্টা করিতে গেলাম, কিন্তু আরাম করা আর হইল না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বন্ধুর ভাবে ছিল, ঠিক সেইরূপ ভাবেই রহিয়া গেল।

মহিলাটি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, 'আপনি আমার জন্ম খুইয়া বসে হ'য়েছেন, দেখছি, আমিও যে হই নি, তা' নয়, কারণ আমার কাছে টাকাকড়িও নেই,



টিকিটও নেই, যেখানে যাচ্ছি, সেখানকারও কিছুই জানি না... তবে আপনাদের কাছে আর মুকোব না, আমি মোটেই ঘরে বাস করি না।'

ভাবলাম, হায় রে কোথায়ই বা 'সিন্দুর কোটা', কোথায়ই বা স্বামী! এতকণ কেন জানি না, মনটার বেশ একটু পুলক হইতেছিল, বোধ হয় একটা বিপদা যুবতী রমনীকে লইয়া বেশ একটা 'আড্ডাভোকার' কৃষ্টি হইবে ভাবিয়া। আমি একবারে শুন্ হইয়া গেলাম। একটু পরে বললাম, 'আপনি, তুমি এ রকম করে আসছ কেন?'

—ছেলোটা বলিল, 'ওই যে মনো-না' আসছিলেন না? ওর সঙ্গে কি খেলা হ'ল,—একবার 'রা'চিতে বেড়াতে যাব মনে করলাম। উনি এসেছিলেন, কলকাতার গুরু খবর বাজীতে, গুরু স্ত্রীকে নিয়ে যাবেন বলে। কোন কারণে গুরু স্ত্রী আসা হ'ল না। মাঝে থেকে আমি ছুটে গেলাম। মনোবাবুর 'পানু' ছিল সস্ত্রীক, তাই মাথা ঘামিয়ে এই বড়ফর। এগুন দেখছি 'ব' বিপদ, সেই বিপদ। কি ক'ব বন্ধন দেখি?'

ছেলোটার কথায় হাসি কি ছাপিত হইব ভাবিতে পারিতেনিলাম না। তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বললাম, 'বলিয়ারি যে ছোকা তোমার বাহুরি আছে, গরু গিলতে শুরু করে, নমি হ'বে।'

ও পাশের বাকের উপর একটা মাস্তাজী কুঠাছিল মাত্র, ঘুমায় নাই। আমার দিকে চাহিয়া মুখ হাসিল, অর্থাৎ বলিতে চায়, ইহার মধ্যেই জমাইয়া ফেলিলে?

আমি তাহার দিকে ক্রক্ষেপ না করিয়া ছেলোটাকে বললাম, 'তা'তো হ'ল, এখন 'পানু' পাকতেও ভাড়াটা শুণোগারি দিতে হ'বে, বাক অল্প উপায় নেই, তার কি হবে...তোমার নাম কি হে?'

'কুহু', বলিয়া সে তাহার অবগুঠন ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল।

আমি বললাম, 'উহ, এমন নয়, একেবারে বাসায় গিয়ে, নচেৎ সন্দেহের সম্ভাবনা আছে...তোমার মা' বানিয়েছে, তাই।' কোন ক্রমে পড়?'

'কোথ' ক্লাসে।'

'বিয়েটোরের সখ আছে, বোধ হয়?'

ছেলোটা হাসিয়া বলিল, 'তা' একটু আছে বৈ কি! সেবার 'রিজিয়া' যেতে আমিই নারিকুর পাট করেছিলাম...মাক' করলেন, আপনাদের নামটা?'

'আমাদের নাম পবিত্র রায়, আমার বাড়ী বর্ডমান কোল সীতাগিহি গ্রামে।'

'সীতাগিহি? আপনি উম্মেখ বাগটিকে তেনে ন?'

'সে কি হে, তিনি বই কি! তিনি তো আমার দাদার শালা।'

'আর আমিও তাঁর মাসুত ভাই।' বেড়ে একটা ময়র বেরিয়ে গেল, কিন্তু, যাক, দিদি ভাল আছেন?

'বৌদির কথা বলছ? তাঁর কাছেই তো যাচ্ছি। কিন্তু ভাই, একটা মজা করতে হ'বে। বাসার গিরেও তোমার এই মোহন মুষ্টিটার পরিবর্তন করা হবে না। বৌদিতে মা চিনে ফেলবেন না কি?'

'মোটাই না, বছর পাঁচেক আগে সেই তাঁর বিয়ের সময় আমার দেখেছিলেন, এতদিনে ভুলেই গেছেন।'

চক্ষাঙ্গ সমস্তই স্থির হইল। গাড়ীও তীরবেগে ছুটিতেছে, যেন বাঁচার পাবী মুষ্টির হর্ষে শিশাহারা হইয়া ছুটিয়াছে, কোথায় যে বিয়াম লইবে তাহা যেন সে নিজেই জানে না। বসিয়া বসিয়া বাসকের এই কাস্তির কথাগুলি ভাবিতে লাগিলাম, তাহার আর যে উদ্দেশ্য, যে উৎসাহ নাই। বাস্তব সেই মাস্তাজীও এখনও ঘুমায় নাই। এখনও মিটা মিটা চাহিতেছে, আর মুখ মুখ হাসিতেছে। ভাবলাম, একবার তাহাকে বলি যে ওহে গর্দভ, তোমার অম্মন একেবারে মিথ্যা।

টানগরে আসিয়া যাহ্নবাবুকে টেলিগ্রাম করিয়া দি। কিছু জলযোগাদি করিলাম। কুহুদের কালকাতা হইতে টানগরে পর্যন্ত ভাড়া আমাকেই মিটায়া দিতে হইল, কারণ সে শূন্যহস্তেই আসিয়াছিল।

পরের দিন রাঁচি গিয়া যখন পৌছিলাম, তখন কো প্রায় দুটা। বাসার গিয়া গাড়ী হইতে একটা জ্বালোককে নামিতে দেখিয়া বোদির জিহ্বাহ্রমে আমার দিকে চাহিলেন। বলিলাম, 'ট্রেনে একে হঠাৎ পেয়ে গেছি, বৌদি, আশা করি তোমরা একে পায়ে তেলবে না।'

বৌদি 'কিছুকণ অবাক' হইয়া আমার দিকে 'চাহিয়া' য়িলেন, তারপর কুহুদের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'এস' দিদি—গাই এস, বলিয়া তাণ্ডাকে লইয়া অন্তরে ঢুকিলেন।'

কুহু একেবারে তুণ্ডা—বিয়োটর করা—হেলেন। আমি হাসি চাপিতে না পারিয়া অস্থাপুরে প্রবেশ করিলাম না। বাহিরের ঘরেই বসিয়া রহিলাম। দাদা তখন ময়রার ঈদপাতালে গিয়াছেন। কিছুকণ পরেই বৌদির কিছুই আনিয়া উল্লু দিতে দিতে আমার মাথার ছড়াইয়া য়িলেন। একটা বুদ্ধাকার রগগোরা আমার মাথাভীত হইলও মাত্র গুই কামড়ে আমাকে শেষ করিতে হইল।

ময়র হস্তস্পর্শ করিবারাই বৌদির টের পাঠয়াছিলেন, ময়র হোক পুস্কের হাত তো! এখন অবিকল্প গণ্ঠাণ্য রগা গুঁহার পক্ষে স্বক্টিন হইল, আমার তো হাসির চোটে

বুখ ফাটিয়া বাইবার মত হইল। হজনেই তখন মুখ চাওঁয়া-চাওঁবি করিয়া একদিকে হাসিয়া উঠিলাম। কুহুও শান্ত স্ববোধ বাসকটার মত আমাদের পাশে আসিয়া পাড়াইয়া আমাদের হাসিতে যোগ দিল। হাসিও থামিলে বৌদির আমার বলিলেন, 'হাসি তামুদা করতে করতে বা' করে' ফেলবে ভাই, তার কতকটা বোধ হয় ভগবানের রূপার সত্যি হয়ে পড়বে। কুহুদের দিদির সঙ্গেই তোমার বিয়ের ঠিক করছি।'

কুহুদের বিকসিত কুহুদের মত মুখ থানির পাশে আর একথা বলি—কুহুদের কল্পনা করিয়া আমি আনন্দের 'আত্মশিষ্যে' নিমত্ত হইয়া সেই গুড-দিনের প্রতীকার চাহিয়া রহিলাম।

## বিবিধ প্রসঙ্গ

বারেতে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী :-

বহু-ব্যবহার্য কমিটি হইতে যে তদন্ত-কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে এক প্রস্তাব ওঠে যে, ব্যাবহার্যের কাপড়ের কলমুহ হইতে এক কোটি মিসরিক টোকা এবং এক লক্ষ তীত তুলিয়া দেওয়া যাক্। যে সমস্ত কারখানা অস্ত্রপূর্ণ কাপড়ের কল চলাইতে, তাহাদের উপর একটা কর বসান হইবে। এই কল হইতে ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে বিলাতী বস্ত্র-শিল্পের অধা কর্তৃপক্ষ। কাটতির অভাবেই এই কলগুলি বন্ধ হইবার ঈদৃশ হইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বেই ব্রিটনের বস্ত্র-শিল্পের বহুপ আদর ও কাটতি ছিল—যেপূর্ণ বাণিজ্যের প্রায় ছিল সেপূর্ণ অবস্থা আর নাই, এমন কি, সমস্ত

যে অবস্থা মিরিয়া আনিবার উপায়ও নাই। ইহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষ, জাপান ও সম্প্রতি চীনে বস্ত্র-উৎপাদন-শক্তি বাড়িয়া গিয়াছে।

ম্যাক্সওয়েলের অক কম্বাস-রিপোর্টে জানা যায় যে, কোরা কাপড়ের রপ্তানী প্রতি বৎসরেই অস্বাভাবিকভাবে কমিতছে। ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ বণিকগণ বাঙ্গালদেশে ৪৮ কোটি ২০ লক্ষ গজ, ১৯৩০ সনে ২১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ এবং ১৯৩১ সনের ১১ মাসে ২ কোটি ৬০ লক্ষ গজ কোরা কাপড় পাঠাইয়াছে।

গত ৩০শে 'ভাষ্যসারী' যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারতবর্গের বিভিন্ন বন্দরে কত ইঞ্জার গজ বিলাতী কাপড় আমদানী হইয়াছে, তাহার হিসাবও ১৯৩১ সালের অক্টোবর সপ্তাহের তুলনায় কি পরিমাণ



রুদ্ধি ও হার হইয়াছে, তাহার হিগাব নিয়ে প্রাপ্ত আমদানী করি। ১৯২৭-২৮ ও ১৯২৮-২৯ এই দুই বৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ স্বর্ণাক্ষি-স্রাব আদায় হইয়াছিল তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

কোম্বা কাপড়		হুয়াফিল তাহার একতা তালিকা দেওয়া গেল।		
১৯৩২	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩১	
কলিকাতা—	১২১৬ হাজার গজ	২২২৯ হাজার গজ	বাল্লাগা	৪১৬৮৫১
বোম্বাই—	৪০১	১০৫২	বোম্বাই	৩০০৩৩২
করাচী—	৪৪৪	১৭০২	সিন্ধ	৮৭২১১
মাদ্রাজ—	৩৯৯	১১০৮	মাদ্রাজ	৫৮৯৩২
রেশুন—	৩৮	২০১	ব্রহ্ম	৭৬৭৪৮

বোয়া কাপড়		এতদ্রূপে সুগন্ধ ও তৈল সুগন্ধ সুস্বাদুর আদান	
১৯৩২	১৯৩১	হইয়াছিল—	
কলিকাতা—	৯২ হাজার গজ	২২২ হাজার গজ	১৯২৭-২৮
বোম্বাই—	৬৫১	কর্ণুর তৈল	৩১৮৫৩
করাচী—	৫৩১	লবঙ্গ তৈল	২৬৫৩
মাদ্রাজ—	৩৩০	লেডেওর তৈল	২৮৩৩
রেশুন—	৬৭৮	লেবু তৈল	৩১৪৮৭

অজ্ঞাত কাপড়		অটোরোল		১২৩৬	৩৮১৭
		অজ্ঞাত		৬৫০৭১৩	৬৮২১৭১
১৯৩২	১৯৩১	এ ছাড়া স্বর্ণাক্ষরকারী মিশ্রিত নানা প্রকারের এসে			
কলিকাতা—	৫৮২ হাজার গজ	৮৮৭ হাজার	আমদানী হইয়াছিল—		
বোম্বাই—	৮৭১	৭০৮			
করাচী—	১৪৫২	৫৫২	১৯২৭-২৮ ১৯২৮-২৯		
মাদ্রাজ—	৪৩	৫২৯	৩৭২৮০৭ ৩২৭০৫৭		
রেশুন—	৭৪৩	৬০২	বাল্লাগা ৪৩৪৮৩২ ৭০১২		

১৯২৯-৩০ সনে ভারতে নানা প্রকার কাপড় আমদানী হইয়াছিল ৭৮ কোটি টাকার, আর ১৯৩০-৩১ সনে হইয়াছে মোট ৪১ কোটি টাকার। ১৯২৯-৩০ সনে মোট ১৯১, ৯০, ০০০০ গজ কাপড় ভারতে আমদানী হইয়াছিল, আর ১৯৩০-৩১ সনে তাহা পাঁড়াইয়াছে ৮১, ০০, ০০০০ গজ।

ভারত স্বর্ণাক্ষি-স্রাব :—  
বর্তমানে আর্থিক অবস্থলতা হেতু বাহ্যারে বৈরুপ প্রতিকূল ডেট উঠিয়াছে তাহাতে যে কোনরূপ বিলাসস্রাব পূর্ণের মত চলিতে পারে, তাহা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু মাৎসবের জীবন-বাহ্যার-নির্মাণের পক্ষে, স্বর্ণাক্ষি-স্রাবের ব্যবহার ও আদর থা আছে তাহাতে অসম্ভবতা সন্দেহ নাই। তবে যদি ভারতেই আমরা স্বর্ণাক্ষি-স্রাবের কেন্দ্র করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের দেশের এ বাবদ অনেক টাকা দেশে থাকিয়া বাইতে পারে, কিন্তু তাহা আমরা উপেক্ষা করিয়া প্রায় সকল প্রকার গুরুত্ববাহী বিদেশ হইতেই

আমদানী করি। ১৯২৭-২৮ ও ১৯২৮-২৯ এই দুই বৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ স্বর্ণাক্ষি-স্রাব আদায় হইয়াছিল তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

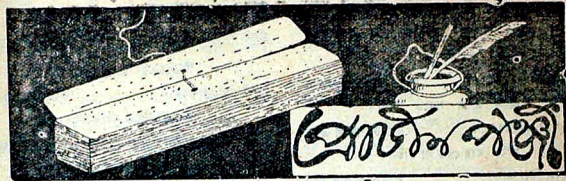
১৯৩২	১৯৩১
কলিকাতা—	১২১৬ হাজার গজ
বোম্বাই—	৪০১
করাচী—	৪৪৪
মাদ্রাজ—	৩৯৯
রেশুন—	৩৮

১৯৩২	১৯৩১
কলিকাতা—	৯২ হাজার গজ
বোম্বাই—	৬৫১
করাচী—	৫৩১
মাদ্রাজ—	৩৩০
রেশুন—	৬৭৮

১৯৩২	১৯৩১
কলিকাতা—	৫৮২ হাজার গজ
বোম্বাই—	৮৭১
করাচী—	১৪৫২
মাদ্রাজ—	৪৩
রেশুন—	৭৪৩

১৯২৯-৩০ সনে ভারতে নানা প্রকার কাপড় আমদানী হইয়াছিল ৭৮ কোটি টাকার, আর ১৯৩০-৩১ সনে হইয়াছে মোট ৪১ কোটি টাকার। ১৯২৯-৩০ সনে মোট ১৯১, ৯০, ০০০০ গজ কাপড় ভারতে আমদানী হইয়াছিল, আর ১৯৩০-৩১ সনে তাহা পাঁড়াইয়াছে ৮১, ০০, ০০০০ গজ।

ভারত স্বর্ণাক্ষি-স্রাব :—  
বর্তমানে আর্থিক অবস্থলতা হেতু বাহ্যারে বৈরুপ প্রতিকূল ডেট উঠিয়াছে তাহাতে যে কোনরূপ বিলাসস্রাব পূর্ণের মত চলিতে পারে, তাহা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু মাৎসবের জীবন-বাহ্যার-নির্মাণের পক্ষে, স্বর্ণাক্ষি-স্রাবের ব্যবহার ও আদর থা আছে তাহাতে অসম্ভবতা সন্দেহ নাই। তবে যদি ভারতেই আমরা স্বর্ণাক্ষি-স্রাবের কেন্দ্র করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের দেশের এ বাবদ অনেক টাকা দেশে থাকিয়া বাইতে পারে, কিন্তু তাহা আমরা উপেক্ষা করিয়া প্রায় সকল প্রকার গুরুত্ববাহী বিদেশ হইতেই



## ঠাকুরদাস দত্তের পাঁচালী

[ঠাকুরদাস দত্তের পাঁচালী এক সময়ে বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ আদৃত ছিল। কিন্তু তাহার পাঁচালী এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। প্রাচীনপাণ্ডা হিসাবে পঞ্চপুষ্পের করণে সংগ্ৰহ এই অপ্রকাশিত-পুষ্টি 'পাঁচালী' বাহির হইবে।—পঞ্চপুষ্প-সম্পাদক]

### ঠাকুরাণী বিষয়

অচিন্ত্য অমৃতাকারে  
পরাংপরা আত্মা সোনারিনী।  
বিজ্ঞান-বিধায়িনী  
নিবেশ্বরী বিশ্বপ্রাণিনী।  
বিধবীজ-প্রদায়িনী  
বিধানাথের হৃদয়বাসিনী।  
জগত-আনন্দ-কারিণী  
হে শিব শিব-মায়িনী  
নিস্তার পামরে তারা, নিস্তারকারিণী।  
পেয়েছি প্রপঞ্চ দেখে  
এ দেখের বহু সমন্বয়  
সেহ গদতরী তরি শিবের।  
বিতরিলে রূপাবিন্দু  
হেলায় তরি ভবসিদ্ধ  
দীনে দিনে দিতে তারা হবে।  
দিনে দিনে গেল দিন  
নিকট বিকট দিন  
দিনমণি-স্রুত ভয়ঙ্কর।

সে আসি বাসিবে কর  
সে ভয়ে মা মুক্ত কর  
দ্রবর ভাবরস্রবতের দ্রবত ক্রিষ্ণর।  
ভবে আসিয়ে শব্দরী  
ভ্রমিলম বিকল সংকর  
সঙ্গে রম্ভে দুরাইল কাল।  
কালাকালের হলে ঘটনা  
কাল গোঁত সে করেনা  
এরূপে কাটাব কত কাল।  
পেয়েছিলাম হীসাল হ্রদি  
লয়েছিলাম ভ্রমার কনি  
ভবু মা হলো না মালগুজারি।  
বিকল তলপ হ্রদ আর তথরচে  
বাকির মায়ে পড়ে মিছে  
ভবিল হলো ভাির।  
মন হলো না অবোধ কৃষ্ণাণ,  
সোনার জমী করলে মশান  
হরণো না এর চাষ।  
মনয়েতে চাষ না দিলে  
সে লম্বিতে কি ফসল ফলে  
দুরালে বরষ,  
ছটা রিপু প্রবল এড়ে  
জ্ঞান লাগলে তাদের ছড়ে  
বৃষ্টি চাষ দিতে।



তারানামের বীজ তার মিলে পুতে ফল রাখতে এভারতে  
জায়া কি মা হজো।  
আমি বার ভূতের মরণগতে পথ ছেড়ে এসে কুণ্ডে  
হতে বসলেম সার্ক।  
যারা আমার সাং দেখালে রদের সময় রাখা  
এখন ক্রমে সরছে তারা।  
পড়েছিলাম কামের দমে সে বোটা পলাণ ক্রমে  
মায়া মোহ কেহ না রহিল।  
আর বখন ছিল তাজা সকলে করেছে মজা  
মটকাটিক দেখে তারা সবাই কীক হলো।  
সকলে করে কারসাজি দেখালে মা ভোজের বাজী  
বাজী হারারে পড়েছি বিপাকে।  
এখন তারা হলো আম বাগির শয্যা কালীর নাম  
ভাই ডাকি মা'তাকে।  
মহামারীর মহিমা সবার জননী শ্রামা  
অপার মহিমা শুনি বেধে।  
রবিস্ত দূত-ভয়ে শরণ করি অতরে  
অভয়দান কর মা বিপদে।  
হইরে মা দায়বীকৃত শ্রীপদে করি দরখাস্ত  
রেতহীন বেশ শুভকরী।  
লিখিতঃ নিখিল দাসে সন্তানে তোষ সন্তানে  
শরীরী সারদা শুভকরী।

২নং

আমি গরজি হয়ে আরজি দিতে এলাম তোমার আদালতে  
আমার হাতে পড়ে পড়লাম গোলে।  
ফুল বাসা দিতে পারে হজুরেই দেয় গুজুরে  
তাদের মিছিল আগে ভাগে তুলে।  
এখন সকল হল আশু'বারা আপনার কাজ সারা  
সারা হলাম পড়ে তাদের হাতে।  
দেখে আমার দায়সিক্ত মিছিলেতে দেয়না হস্ত  
রাখে কেবল নবীর সঙ্গে গেঁথে।  
পরশেম বিষ্ণু পেখকারে যদি মিছিল পেখকারে  
শেষ করেন বীনের দুর্গতি।

তিনি ত একে চক্রে বেড়ান চক্রাকর করে  
চক্রে খেলেন সর্বদা তাঁর মতি।  
তুলসী পাতার হালদী গাঁথে এত ক্লিষ্টা তাঁর পায়েতে  
স্তীর রায়ের রা বৃদ্ধা হল ভার।  
ভেবে সেই কালবরণ কহেছি কাল হরণ  
আরজী দিতে মরজি হলনা তার।  
শুনন নবীস চক্রে ধরে ঠাড়ালাম তার সমুখে  
মুখতুলে একবার কি মা দেখে।  
যে বোটা মা দেয় শুনানি তারি মিছিল হয় শুনানি  
বাকির মিছিল বাগিরে তলে রাখে।  
সেরেস্তাদার সদাশিবে এককরে পরলাম গিরে  
শিব হতে শিব যদি হয়।  
যে নিজে খার মা দা সিদ্ধি তার কাছেতে কার্যসিদ্ধি  
হওয়া ভার হয়েছে সম্ভব।  
তিনটা আমলা তিনটা কাল, প্রবীণ যিনি মহাকাশ  
তিনকাল এদের কাছে গেল।  
আমি কাল পেশাম না আরজী দিতে কাল কাটলাম এইরূপে  
কাল পেয়ে শ কালের কাল এলো।  
কর্ম হলনা বিনে রেত করি নাই তায় উপদ্রু হস্ত  
দায়সিক্ত মনে মনে জানি,  
আমি সবদিকে মা হয়ে কাঁপার পেশে করেছি পাঁপর  
এখন তুমি যা কর ঈশানী  
থাকতে কড়ি করিনি নাশি তোমার আসনা তুমি শাপি  
তোমার পুণিষে তুমি দাও শাজা,  
দেখ না থাকে ত ডিক্রি পাখ কাপেরে কথা দেখাব  
ভয় কি করি অস্ত্রা যার রাজা।  
আমি মুখ ছেড়ে ভাত নাকে দিয়ে পেখকারের পেখমান হতে  
শেষ হওয়া থাক, পেখ হলোনা আরজী।  
মলম তুলে তুলসী পাতা দিলার করে হালদী গাঁথা  
তবু তার কিরণ নাকো মরজী।  
সে বোটা গঙা দূত সেরেস্তাদার চক্রে চক্রে  
চুকপ হন গাঁজায় দম লাগাতে।  
পেটে নাইক রত্ত গিছি স্বস্তর মধ্যে থান সিদ্ধি  
কর সাধি এর সওয়াল যোগাতে।

শুনন নবীস হাঁস পোঁপা চাপটে মুখ ক্লেবল মোদা  
আটটা চোখ থাকতে তিনি অন্ধ।  
লোকে বলছে কলছে ধ্যান আমি বলি তার নাইকো জান  
থাকলে বলতো ভাল মন্দ  
তিনটি থিথি তিনটা জন মনে ভাবলেম ওরে মন  
এমন করে কদিন আর কাটািব।  
আমি হলেম না পাখ থাকতে তরী মিছে কেন ভেবে যরি  
চল সে পাঁপরে আরজী দিবা।

নং

আমি অশীত লক্ষ্য ফেলে ভ্রমি বন্দোবস্ত নিলাম কমি  
ভাগ্যক্রমে শূন্য ভূমি হলো  
লুপ্ত ক'র অশ্রুতা হল না মা শুভ পূজা  
কেবল বাকি আশীর দিন এলো  
মনে করলাম করবো চাষ বাস জান লাগলে দিব চাষ  
তার নামের বীজ ছড়াব তার  
ভক্তি নদী করে সেচন ফলাব মনের মতন  
হাজাওকো না হতে যায় পার  
আর মনে মনে করলাম জারী নোটের আগে মালগুজারী  
করবো এবার করেছিলাম মনে।  
বোঝেই ছুটেই ছলনে ফাঁকি দে যিনি পতনে  
নোট করলে ভবের হাতে এনে।  
তার মলম আগে করে হাত তুলি করলে তচ্ছপাত  
হাত থাকতে পরের হাতে গিয়ে,  
হস্তিয়ে নান্দে সকল রেত হয়ে আছি মুক্তহস্ত  
আছি গো মা দায়সীক্ত হয়ে  
তাদের কিমা একটা মত ছ বোটার ছ রকম মত  
আসল পথ চলেনা মলে  
তার পাঁকা রাস্তায় চারনা ফিরে কাটা বনদে হাঁটা করে  
বিষম পেঠা ছ বোটার বাথলে  
যেখানেতে ফল ফলে তাতেই এসে গর্ত আগে খুলে  
শালী জমিতে বাগি এনে ফেলে  
কবার বেতে আবা দিলে পাঁশের বেতে ধান ছড়ায়ে  
লাঠে-মূলে আমারে মজালে।

বয় পাচ বোটারে পায়া যায় এক বোটার দায় বিষম দায়  
তার বাগ ক্রোশ বড় তার।  
সে পাঁচ বোটার উপরে বীর যেমন ধারা তিতুমির  
তার কোলা মারে শাধ্য কার।  
সকল বোটা তারি হাতে সে বোটাকে আনতে হাতে  
এত করলেম চেষ্টা  
ছই অকরে নাম ধরে সকল ঘরে ঘর করে  
তারে ধরে কার এমন লাগ্য।  
হরের যোগ সে করে ভদ্র অজ নাই তার এত রক  
যার কুহকে বাধ্য আবালগুহ।  
সে রাজার রাজ্য করে নাশ তবু কি তার মেটে আশ  
বাস ছোলায় সে হাতে খুপা নিয়ে,  
তবু কি সে কাশ পায় তার আশে গেতে চায়  
কাবু যাতে যত বাবুভয়ে,  
যদি বল সে পাশরী করে মাসিক আইন জারী  
তলীকরে হালীল করি কাষ  
তাদের পতনে কর্তন দিয়ে আপনার তালু আপনি নিয়ে  
ছজুরেতে হব সরকরা।  
তার বাস বাসস্থান নাইকো হলে নাইকো থান  
চাষ করেনা বলার নাম কৃষাণ।  
যেমন মা কোম্পানীর নোট কথায় নোট কাহ্নেতে নোট  
ধরতে গেলে কে কোণায় প্রশ্নান  
যেমন স্বককাটার শিরগীড়া এই ছয় ভেড়ের ভেড়ে  
মুটে ভেড়ে পেড়েছে আমাকে  
যেমন ধারা চুঁচড়ার মেকি যেমনি এরা কোঁপরা ঢেকী  
ধরতে গেলে ধরা পাইনে কাকে।  
আমি ত বামন নর, কবির স্ট্রেট পরাশর,  
তার শরতে তিনিও বিভোল।  
পদযোনাী হুরিবেশে ছুটেছিল সঙ্গে আসে  
সদ্যঃ আকিছ হুঁড়ে কুশল।  
তার ক্ষমতা বা কব কত ইঙ্গ হয়ে বুদ্ধিহত  
বলেন গিয়ে অহায়া পুঁচড়ে।  
শুধর ভাণ্ডী হরে শশী কলর অন্ধ প্রকাশি  
দোষী হয়ে রইল জগৎ ছুড়ে।



কমতা তার বলিহারি, নারীর পায়ে ধরেন হরি  
নারী বেশে নারীর মানের দার।  
কি কব তার বাণের কাণ্ড এমন বীর দশহুণ্ড  
লণ্ডও হয়ে সোণাক্ষ লজ্জা ছেড়ে যায়।  
দল তার শরের শক্তি দুই নারীতে করে যুক্তি  
জমায়ে এক পুত্র তগীরথ।  
কিচক চুকলে তার কৃৎসক ভীমকে নারীরূপ দেখায়  
তার কমতার করি দণ্ডবত।  
যার ঘরে করে বুদ্ধিবাস সে করে সেই দেখে বাস  
দর্শনাশ করেছে শঙ্করী।  
ধাকতে চকু হয়ে অন্ধ গুটীপোকাকার মতন বদ্ধ  
হয়ে আছি উপায় না হেরি।

৪নং

আমার জ্ঞান অন্ধ মন মারি ধরেছে মা হাল  
হনিড়ার মাঝে তোলে স্বাক্ষরূপ একপাল।  
এসেহনোকায় নর দিকতে কালাপাতি উঠে কত জল  
কলমে দ্রোষাই নৌকা করে উলমল।  
সদা কুশাতেতে নৌকা গরে মোর রাখে  
সেহের দাড়ী গুলা যেমন বোকা তেমন বোকা মারি।  
ছটা দাড়ী-জনঠাকুরে শুনে নাকো মানা  
পাকনা দেখে নৌকা নে যায় বেধামতে হানা।  
একটু ভাঁটিয়ে গেলে স্বাধাট মেলে তার হয় না মতি  
সদা টানে উল্লান কলন, কুলন হয় যায় দুর্গতি।  
ভাবের কুফান দেখে ভল লাগে মা, হয় পাছে বাণচাল  
নোকায় কালাপাতি সল হয়েছে হয়েছো আজকা।  
এসেহ নোকায় পেরেকগুলো হলো অরা  
তরুা হলো রদি।  
তবু বিষয় বুকে কাজ করেনা মা  
সুধাই প্রতিবারি।  
এতেই আছে রাজকচাচি, এতেই আছে গুলি  
এতেই আছে ধান পিড়ি করতে পাইনা লালি।  
তবে লালি যে কহতে পাইনা তারণ কারণ  
আশীর্ষক একটা আটমারি সঙ্গে সদাই থাকে  
মা সেটাও হলো বুঝেবো বেড়ার যুগের পাকে।

পরমিত একটা বসিয়ে দিলে থানা  
বলে হাসিল দিয়ে ব্যাপার কর  
গেতো মাঙ্গ ছুটনা।  
গোতো মালুটাই বাকি  
বুদ্ধিলাম স্বধা খেলে ক্ষুধা তার হয়না রত  
সদা মনে মন্ত মদুকা পান তাতেই বশীভূত,  
যেমন চাঁদপালের ঘাটেতে বিরা সামনে গিরিশ ব্রুি—  
তেমনি তোমার সামনে থিরা আমরা আয় বে মরি।  
শিবের বিবাহ  
১নং

দক্ষ যন্ত্রে যোজ্ঞেশ্বরী যোগ অবয়ব করি  
পরিহারি গেল নিজ কার্য।  
হিমালয়গের প্রসন্ন, হইলেন সুপ্রসন্ন  
মনেতে ইচ্ছিলেন মহামায়া।  
শিব হয়ে শক্তি শূন্য দশদিক দেখেন শূন্য  
কুল হয় বসিলেন বোণে।  
মনে রেখে সতীপক্ষ যোগে বসিলেন বিরূপাক্ষ  
জ্ঞানচকু সতীরূপ মনযোগে  
বদি যোগে বসিলেন বৃত্তাজয় হুটি সব হয় লয়  
স্বরচণে ভাবিয়া অস্থির  
শিব হলে শক্তি প্রাপ্ত সকলে হইবে কুণ্ড  
তবে জুড়াবে অপরাধর শরীর  
এখানে মায়ার মায়া পাযায়ে হয়ে সদয়া  
পাষাণীর গর্ভে অবির্ভারি  
রাণীর অশ্বতে উঠেছে শির স্তনেতে জন্মেছে ধির  
শকরীর কে বৃষ্ণিরে ভাব  
রাণী চতুর্ধ মাসে থান সাধ যতছিল মনের সাধ  
পোড়ামাচী স্বধাঃ অশ্বল  
শোন হয়ে ধরাসান দেখে বলে কুলারনা  
কড়া হবার লক্ষণ এক সকল  
রাণীর ক্রমে ক্রমে যায় দিন দশমাস দশদিন  
প্রসব বেদনা আসি হোল

১০১]

যেনশ বদনে থাম জপিতেছেন জুগীনাথ  
ধাত্রীবরল কড়া ত্বার হোল  
কড়ার কথা শুনে রাণীর হরিয়ে-বিবাহ  
সবীদের বলে হলো সকলি বিবাহ  
দীন যেমন হুটী গেলে বিস্তির আভরণ  
বেচবার সময় সন্ন মূঢ়া মচকে যায় মন,  
গর্ভ হয়ে তেমনি রাণী মনের স্বথে ছিল  
কড়ার কথা শুনে অমনি অঙ্গ জলে গেল।  
বলে গলিলে লালিলে অপরাধের তপন  
সে উচ্চ উদকে ধয় কি কানন দাহন  
দুর্কালে গভ হলে তার কি অক্ষয় কলে \*  
যেমন বিকারের পিপাসা যায়না গভুয়ের জলে  
এত আরামনা করে কড়াটা জমিল  
যেমন বামন নারিকেল রোপন করে আকাশ ফাটা হয়।  
বিদার ভাবিছে রাণী পড়িয়ে ধরায়  
কোন ধনী গিয়ে রাজ্যর সংবাদ জানায়।  
২ নং  
তনিয়ে ভূধর কয় ছিল সাধ হবে তনয়  
তা না হয়ে তনয়া জন্মিল।  
ভাতও হয়েছে সদ্ধ বৃষ্টিতে নারি ভাল মন্দ  
কেন এমন আশ্চর্য ঘটিল।  
একদম হুটী পরে বিবাতা স্বজন করে  
করে যায় জগৎ আলোময়  
তনি অসম্ভব কাণ্ড কি কবো সে শশীখণ্ড  
হয়ে হলো চরণে উন্নয়।  
বায় শশী উদিত তপায় শশী বিকসিত  
দেখিয়ে যে না প্রত্যয়  
ভূরষ ভেৎকতে বদ্ধ সলিল মায়ে অনলবিন্  
ইন্দু দেখে কমল প্রকাশ হয়।  
তখন বলিতেছে প্রহৃতী শুনেহ ভূধর পতি  
শশী আসি যে রয়েছে চরণে  
যে মেয়ে গঠয়ে বিধি দোনাতে করিল বিধি  
স্বধা রাধি ঐ চন্দ্রাননে।

স্বধাপাতি পূর্ণ সেবে ফেলে দিল মন্তলোকে  
ভেঙ্গে বিধু বিধগুতি হইল।  
এ নর সামান্য মেয়ে স্বধাঃ দশাংশ হয়ে  
পুনঃগে লয়েছে আশ্রয়।  
দিবারক্ত তা দেখতে পেয়ে চরণে শরণ আছে লয়ে  
তাতেই পানপত্র প্রকাশ হয়  
ভাবলে এক হার পৃথক ফল যে পানপত্রে মোক্ষ ফল  
সে ফল ছেড়ে বিফল বিমানে  
রাবি স্বস্থানে প্রহান হয়ে পানপত্রে স্থান লয়ে  
শশীভাষ আছে সঙ্গিলে।  
৩ নং

মুনি ত্যজে গিরিধাম মুখে শিব শিব নাম  
কৈলাসেতে হইলেন উদয়।  
হইয়ে পরম আচ্ছাদ শিবকে দিলেন সুসংবাদ  
সেরে গিয়ে সে নিমগণ।  
বিরের বড় হলুদ শিব হলেন বুদ্ধিভুল  
এলো মেলো সকলি বৈঠক  
একতে ভান্সা বুদ্ধি কবে থায় গাঁজা সিদ্ধি  
বুদ্ধি কেবল হয়েছে বাতিক  
আভরণ ধনসম্পদ গায়ে মেখে চিত্তাভঙ্গ  
বিবশোভা বলিহারি যাই  
বদ্র হলো বাঘের চামড়া শুকি হলো বুধ দামড়া  
হাতের শিপে বাজিছে নানাই  
বরবার শোজে ভূত কত শত অদ্বত  
অদ্বত বিদ্রুটে আকার  
কাল মুখে বৃণ ছটা পুটাই ছিনে চেপল মাথা  
আন্তু পাদ দেখতে কি বাহার  
খগেন্দ্র কমলাপতি হংসাপরে প্রজাপতি  
বুঝতেছে ভূতনাথ সঙ্গে ভূত নানা জাত  
নশী ভূশী দানা নানাভাতি,  
ভারা বম্ব বম্ব বাহার গাল ভূতে মের করতাল  
করে গান মালদাট মাঘে,



যত ভুতে ভুতে হয়ে গীত হয়ে সবে আমোদিত  
 বর হয়ে যায় আস্তে বরদারে  
 তারা দুভা করে দিয়ে লক্ষ্য দেখে হয় স্বাক্ষর  
 পদভরে কিত্তি কণ্ঠস্থান,  
 লক্ষ্যে স্বরাহর বান  
 হেসে হেসে লবেজান  
 শুনে সব ঐ ভুতের মুখে গান  
 আদনা ভাই বাবার বিয়ে দিতে তোরা কে কে যাবি  
 গিয়ে সেই গিরিপুরে উদরপুরে পুরী যাবি।  
 আসবে সব কুলবালা মাথায় লয়ে বরণ-ডালা  
 খেয়ে সেই ভাঙ্গার কলা আগের ভাগে রোজ পোষাবি,  
 মায়ের মা হুতোর ছুকে যখন লবে বাবাকে  
 ঐ হুতার কলা তুলবে মুখে, কেউ গিয়ে তার আবা দিবে,  
 তারা গান করে নানা করে তনিতেকে স্বরাহরে  
 গিরিপুরে হইল উদয়,  
 মিলি যত কুলবানী করিছে মদল ধনি  
 "চলু ধনি শব্দ সমুদয়,  
 জরাজীর্ণ বোরচালা বাজায় মেয়ে ধাকধাকি  
 ঢাকাঢাকি নাহিক সাসারে,  
 কেহ বাজায় জগদগুণ করে কত লক্ষ্যগুণ  
 শব্দ শুদ্ধ হইল চরাচরে,  
 কেহবা করে আঁকাড়া বাজাইছে রাম কাড়া  
 কাড়াকাড়ী করে দেয় কাঁপী।  
 কেহবা বাজায় বেহালা তনিয়ে স্বর বে-হালা  
 সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ রণধী  
 কেহ বাজায় রাম সিংহে রাম সিংহে রামসিংহে  
 কারবা পিতলের রামসিংহে।  
 যান যেতে হয় সিংহে বলে থাকে রামসিংহে  
 কিন্তু সিংহের সিংহে সেই শূদের শূদ্রে,  
 বাসিয়ে যত তরল বাজাইছে কত বোল  
 কত বোল বীলা-নার-না বোলে  
 সাবাস সেবেছে হাত বাজায় মেয়ে অফে হাত  
 কি করে হাত ফিরিছে তবলে  
 নবীন নবীন বিন বাজ কর নবীন  
 বাজায় বীণ বিনদিন স্বরে,

সবাই খুসি শুনে বীণ বালক, নবীন, প্রবীণ,  
 বিন শুনে মুখে বাক্য সুরে  
 সেতার সুরার করা তঁদুরায় তাদের পোরা  
 মনোহরা বাজিছে পাখোয়াজ  
 বাজিছে মধুর বীণা নাছিছে কত নবীন  
 গিরি বিনা কার এমন রাগ,  
 ঐক্য কার সপ স্বর বাজাইতেছে সপ স্বর  
 স্বরাহর দেখিতেছে রঙ্গ  
 তালে তালে মন্দিরে বাজে কত মন্দিরে  
 কেহ মন দিয়ে বাজায় যমঙ্গ,  
 বাজে কত করতাল কেহ দেয় কর তাল  
 নাচে তাল বেতাল দানা  
 মাথা যেন হেঁড়তাল নাচে তাল-বেতাল  
 গলে যাল অস্থি পাথা দানা।  
 বরযাত্র কস্তাযাত্র উভয় দলে একর  
 ধুমকেন্দ্র বাধিল তুমুল  
 দেখিয়ে ভুতের বুদ্ধি উড়ে গেছে ভুতহুতি  
 বুদ্ধি-হুতি হুলে হল তুল,  
 নাগে শিল মনে ভেবে কাণ্ডজ আটকে টাক লবে  
 বাঘের চামড়া দেখেই ত অজ্ঞান,  
 সেতো হয়েছে সতর্ক কে খোঁসে মধুপর্ক  
 পরমাণিক গৃহেতে পিটান,  
 গিরি আচমন করিয়ে জিজ্ঞাসেন প্রজাপতিরে  
 বল হরের বাপের নাম কি?  
 হেসে কন পঞ্চায়ানী পিতামহ জলপানী  
 হরের পুত্র দেও ওরে কি  
 শুধন স্থির করি মনগণ দেবগণে দেবগণ  
 বিচার কারলেন স্বরগণ।  
 গিরিধামের গিরিগণ উভয় পক্ষের বিপ্রগণ  
 নরগণ আদি জীবগণ সর্মগণ করে তারা  
 দিন শুদ্ধ চন্দ্র তারা  
 তারাপতি কোলে ত্রিলোকতার,  
 পূরনারী দেখিছে তারা চাঁদে যেমন বেরা তারা  
 তারা হেরে সলজ্জিতা তারা

দুস্তার শিস্তার তারা মেনকার নয়ন-তারার  
 তারার কাছে শোভা পায় কি তারার  
 মেন দুস্তর-নয়নের তারার তার কাছে মাঝারের তারার  
 তারা হেরে তুচ্ছ প্রায় তারার।  
 এইরূপে কর্য সেয়ে পাঠাইলেন অন্তপুরে  
 স্ত্রী-আচার করিবার তরে  
 আসি যত কুলবালা সাজাইছেন বরণডালা  
 নারদ দিলেন ইসের মূল রেখে এক ধারে  
 ঔষধের গন্ধ পেয়ে ফণে সব গেছে পলায়ে  
 থসিয়ে পড়েছে বাগাধর  
 নারী সব বর দেখে জিব কাটে অমৃতে  
 উলঙ্গ হয়ে পড়েছেন হর  
 তেনে ছাওয়া-তলা দাড়িয়ে বর বরের কঁতে নাই বাগাধর  
 দিগধর শূভ কটাদেশ,  
 বরের গলে দোলে রুদ্রাক ভস্ম-মাথা বিরাপাক  
 চক্ষুরির রেখে রাণী বেশ  
 বরের কপালে অমল অলে দেখে রাণী ক্রোধে অলে  
 জলে যায় ঝাঁপ দিতে বেদে  
 যশে বুদ্ধকালে একি সাজা বর এনেছে ভুতের রাজা  
 বোকা যায় না বলে  
 গালা পড়েছে বিপদে ওমা ওমা আই ভুতগুলো বলে আই  
 কি বালাই মরে যাই লাগে,  
 চতুর্দিকে নাচে ভুত মূর্তি গুলো অমৃত  
 মনুত প্লায় সহজে।  
 থায়র তবু করে এসে গলা বরণডালায় থায় কলা  
 একি আলা সবাই অমঙ্গল  
 বর হেসে নাড়ে হাড়ী ভয়েতে পাক পেলে হাড়ী  
 বাড়াবাড়ি আর করে বল  
 সাহসে বুর ছটা বের্ন ভাঙ্গনী খোলায় চুপের কৌটী  
 কান লোটকা উল্টো চেটায় চলে।  
 নাকের কাছে সাড়ে কপা কার নাকে গলে-সিকলী  
 হেসে হেসে আই আই বলে  
 থায়র কৌট চখে চক মটকার পলাতে যাই পথ আটকার  
 হরের মটকার ঠাণ্ডা পরেছে তুলে

হেসে হেসে পড়ে চলে মাথার ঘোমটা গুলে ফেলে  
 বলে যাও পৌঁদের তলায়ে গলে  
 নারদ ভাগ কবলি খটকালি এই বিয়েতে হাড়কালি  
 "নারদ গালে সিকি কালি চূণ।  
 গৌরী আমার স্বর্ণলতা এমন বুড়ে পেলি কোথা  
 কপালেতে জলতেছে আতন,  
 রাণিণী বিভাণ—একতাল  
 বর হেরে কলবর যে জলে দিগধর ভালে অনলজলে  
 "স্থবির খুঁজে বর না পাইয়ে যেমন দৈতের ঘরে কান দিলে,  
 অঙ্গ আভরণ, মেখেছে ভস্ম শুনের মধ্যে পেটসর্গর  
 সবাকার সব, সবেরি দৃষ্ট, শুঙ্গ ভঙ্গে পড়িছে চাল,  
 ঢং করে রঙ্গ-রমণা পাইয়ে কোথা ছিল মাগা এমন অলপেয়ে  
 গিরিবর খুঁজে বর না পাইয়ে এমন ছেঁয়ের ঘরে কড়া দিলে  
 রাণী আর আর জামাই দেখবি আর,  
 এমন ঘরে এমন ঘরে এমন ঘরে বেঁওয়া যায়।  
 অকলঙ্গ শশী সমারুণে গিরি বালা তার  
 হুহুড়ে মাগুড়ে বুড়ে ঘণ ঘণ গাঁবা যায়  
 তুলে দিলে চলে পড়ে বিভোলা সনা নেশার  
 দুগ্ধেতে কুসও পাকা ভস্ম মাথা পরকাক  
 উদর মোটা মাথার জটা ফনী বেড়া আছে তার  
 জলে ফেলে উমার দিলে কাণে গেলে সাপে ধার  
 গোলাপ ফেলে বিদলে পুঙ্খপে পরে কুঠি তার  
 হয়ে হরিষ বায় সনা বিয় রাগলে পরে খরিষ প্রায়  
 ভালে আঙন বিবি বিজুন পোড়া কপাল তার খটার  
 কর্ণে কুড়ে বলত চড়ে পোতাটা সিকি বোটার  
 "আবার উনি স্বরধনী বেণে" নাকি জাটার  
 হোক বালাই মরণ ত নাই, এই কোরে দেশটা আলায়  
 শুধন ভাবনী ভস্মিতে ভবে বগিলেন আভাসে  
 দেহস্থি হও দেব লৌকিতে কুভায়ে  
 ইজিতে সে ভস্মি, শিব পাইরি বেশ  
 মদনারি হলেন তখন মদন হতেও বেশ  
 দেখে মত রমণিগণ মদনে আসবে  
 বেশ দেখে সবাই বলে কি বেশ কি বেশ।



তবন মুকুটমণ্ডিত মনি, ফণা ধ্বংসেছে  
বিচিত্র প্রচিভাষর, বাগধরা পেছে,  
বর লয়ে বলছে বত গিরিপুর-নারী  
অপক্লপ রূপ দৈবে বলে একি হেরি।  
বিবাহ নিষিদ্ধ করি বর নিয়ে বাসরে  
হেরয়ে বরের রূপ মুখে বাক্য নাহি সরে  
কৌতুকে যৌতুক দিবা দেয় গিরি রাণী  
হরের বেশে হরে মন, ভোলে সব রমণী।

গান

নারী সব দেখে বর বলে কিছার ইন্দুর  
কিবা নাঙ্গা নাঙ্গা খণবর।  
গৌরীকে দিলে বর পেয়েছে মনোমত বর  
ভাব বর আনিলে গিরিবর।  
আমরা হেসেছিলাম দেখে বর ছান্দা-তলায় দিগধর  
এমন দেখি বিচিত্র অধর।  
আমরা যে পেয়েছি বর সে বর মাংগলে বর  
সদা পরিজ্ঞানধর দিতে পারে না অধর  
রক্তাধর কি ভাল পিতাধর।  
জননি কেবল বাকসরে ঘরে যেতে মনকি সরে  
অঙ্গে জরা পতির আঁখি সরে।  
হাতের জলকি ভূমে সরে কড়াকড়ি পাছে সরে  
অতীত পতিত নাম শুনে সরে।  
পিতা না হলে ভুগতি কতায় কি মেলে ভাল পতি  
তার সাক্ষী দেখ পশুপতি।  
হয়েছে পার্শ্বীর পতি, সবাই বলে জগৎপতি  
তার শুক গৌরী পেলে পতি।

আগমনী

১নং

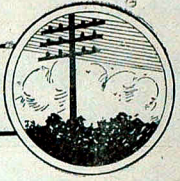
একদিন নিশি শবে গিরিরাণা নিদ্রাবেশে  
প্ৰথমেগে করে সন্দর্শন।  
স্বীর কড়া উমাশনী শিরে আসিয়ে বসি  
মুগ্ধবে বলিছে বচন।

শুনগো 'পাষণ-জায়া' কি তব পাষণ বার  
শশানবাসিনী করে যোরে।  
সমবৎসর তনয়ার তব না লইলে আর  
কি যারা না তোর শরীরে।  
পিতা আমার গিরিবর, দিয়ে বর দিগধর  
নিশ্চিন্ত আছেন বাসে  
শিখি ঘুটে চিরকাল অঙ্গ হলো আমার কাদি  
জননী গো কি হুং কৈলাসে।  
হায় সেই পাগলের নারী আর হুংগে সইতে নারি  
অভিশয় কটে প্রাণশেষে,  
শয়নে চম্ভ বিছাই সদা অঙ্গে মাখি ছাই  
তৈলাভাবে জটা বাঁধে কেন।  
পতি সেই মধুকাল ভিকাতে কাটান কাণ  
কটে কাল যায় কালকূট খেয়ে,  
গাঁজা ভাঙ্গে অভিকৃত সঙ্গে সদা ফেরে চু  
দর্পকের সর্পগুণো গায়ে।  
নাহি অন্ন অভিনয় কোনদিন যায় মি  
গদাঙ্গাল বিষদল আহারে  
ভেবে তবু হইল কুশ বিষয়ের মথ্যে  
দেখতে পাই বুড়াটার ঘরে।  
মা তোর কঠিন প্রাণ মরিজে করিয়ে নন  
কত্না জ্ঞান না ভাবিলি আর।  
এই হুংগে করে বর্ধন অমনি উমা অর্ধ  
নিদ্রাভঙ্গ হইল মেনকার।  
কাঁদে রাণী পড়ল দরা নয়নে বহে অশ্রুধর।  
কোথায় গো মা তনয়া তারা বলে।  
ধূলিতে ধূসর অঙ্গ উত্তাপ মায়া ভর  
মহামায়ার মাহার ডেউ উত্তাপ  
রাণীকে দেখে কাতরা পুরবাসিনী গণে ভর  
জিজ্ঞাসিছে করি জোড় পানি  
কেনগো মহিষী কুজিতা মহীতলে পুজি  
শুনে কৈদে কহেন পাষণী।

ক্রমশঃ



বিশ্ব-জগৎ



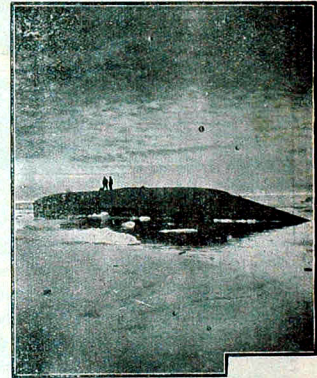
সাবমেরিগে উত্তরমেরু-অভিযান—

আটক মহাসাগরে অভিযান করা যে কিরূপ শক্ত ব্যাপসর  
তাছাড়া আরও অজ্ঞাত নাই। এক্ষণে ভরদ্বার বিপদসঙ্কুল  
মাগর আর নাই। চারিদিকে বড় বড় বরফের পাহাড় আর  
বরফের বীপ—চারিদিকে বরফেই পূর্ণ। অনেক অনেকবার  
এই স্থানে অভিযান করিয়াছিলেন কিন্তু সফলতা হ'ল  
নাই; কারণ এখানে জাহাজ চালান হুস্তর।

সম্প্রতি একজন সাবমেরিগে এই মহাসাগর অতিক্রম  
করিয়া উত্তর-মেরুতে হাইতে পারিয়াছেন। ইহার  
নাম স্তর হিউবার্ট উইলকিন্সে। পূর্বে কয়েকজন জায়েদী  
বেপারিদের সাহায্যে উত্তর-মেরু পরিদর্শনে সফল  
হইয়াছিলেন এবং নানা নূতন স্থানও আবিষ্কার করিয়াছিলেন,  
কিন্তু এবার উইলকিন্সে জলের ভিতর দিয়া মাগর অতিক্রম  
করিয়াছেন।

উইলকিন্সের সাবমেরিগের নাম নটোলাস্। নটোলাসের  
আরোহিণ আর্টিকের বিশাল বরফরাশির তলদেশে দিয়া  
বাগ্গা গুবই সৌভাগ্য বলিয়া জানিয়াছেন। এ সৌভাগ্য  
লাভ করিতে যে কিরূপ অসীম সাহসিকতা তাহাদের অর্জন  
করিতে হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়প্রদ।

সার হিউবার্ট 'নটোলাস' এ আরোহণ করিয়া উত্তর-মেরু  
শেষ সীমানা পর্যন্ত গিয়াছিলেন। এ পর্যন্ত আর কেহই



নটোলাসের বার্গেনে পৌঁছাবার সময়



— আটক-মহাসাগরের উপর নটোলাস —





—সাবমেরিন সমুদ্রের গর্তে নামিরা যাইতেছে—



—আটক-মহাসাগরের মধ্যে বরফের উপর হইতে যেতারাে অজ্ঞাহানে সাধারণ-প্রেরণ—



—বরফের উপর নটলাস-মাত্রিগণ—

এতদূর বাইতে পারে নাই। প্রথম যখন ইনি যাত্রা করেন, তখন কেহ ভাবিত পারে নাই যে ইনি কিরিয়া আসিবেন—হরতো বেশপায় বরফের তলার আটকাইয়া থাকিবেন—সেইখানেই তাহাদের মৃত্যু হইবে, কিন্তু সে আশঙ্কা হিউবার্ট রাণিতে দেন নাই। এই প্রথম অভিযান হইতে কিরিয়া তিনি জগৎকে মুক্ত করিয়াছেন।

তার উইলকিনসে কেবলমাত্র যে উত্তর-মেরু পূরিত্রম করিয়াছেন, তাহা নহে, নামা নূতন নূতন স্থানও আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই ভীষণ মহাসাগরের ত্রুণ্য পথ হইতে তিনি যেতারাে বহির্ভাগে সাবাস দিতেন।

জাপানের নূতন প্রধান মন্ত্রী—

মিঃ হামাগুচী জাপানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি পদত্যাগ করায় ব্যারন রেজিগো বাকাটচুকী প্রধান

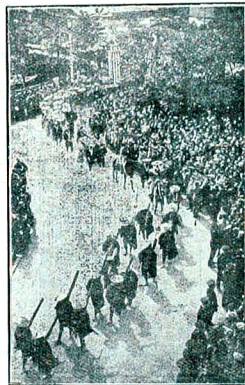


জাপানের নূতন প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সহধর্মিণী

নির্গমন হয়। আমরা নূতন-প্রিমিয়র ও তাঁহার সহধর্মীরা একখানি ছবি বিলাম।

জাপানের কয়েকটা রীতিনীতি—

ধর্মপ্রিয় জাপানের একটি অতি আদরের জিনিস। উয়া প্রকৃতিতে ধর্মপ্রিয়তা-কৌশল দেখান জাপানীদের



জাপানের একটি উৎসব  
একটা মত রীতি। পার্শ্বের ছবিতে একটি উৎসবে একজন  
ধর্মপ্রিয় প্রদর্শন করিতেছে—ইহার নাম মিঃ কাকো মেয়ো



গৌতমের স্মৃতিকল্পে দ্বলোৎসব

জাপানীগণ প্রতি বৎসর গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিরক্ষার্থ এক যোগ দিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই মাথায় টাক।

বরটি দ্বলোৎসবের অর্থদান করে। লক্ষ-লক্ষ নরনারী ইহাতে যোগদান করে। পূর্ণে উৎসবের বে ছবিটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা গত বৎসর জাপানের টোকিও শহরের হাচ্চিরা পার্কে অর্জিত হয়। ইহাতে শ্রাম-দেশের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী যোগদান করিয়াছিলেন।

উপাসনা-মন্দিরে যাহাদের মাথায় টাক আছে তাহাদের

মাথায় টাক-ওয়ালাদের উপাসনা  
আদর যুব বেশী। এই ছবিতে দ্বাহারা উপাসনার

জাপানী উৎসবে ধর্মপ্রিয়তা



পূর্ণ পুষ্টার প্রথমে যে দেওয়া গিয়াছে, উহা আপানের



—আপানের নৃত্য-রীতি—

একটি বিশেষ উৎসবের চিত্র। চানীডা পার্কে উহা সংঘটিত হইতেছে। ৩০০ বৎসর ধরিয়া আপানীগণ এই উৎসব পালন করিতেছে।

নৃত্য-রীতি আপানীরা পূর্ব ভাগবাসে। আপানের রাজ-অঙ্গনে অনেক যুবতী নাচিয়া রাজার মঙ্গল কাম্য করে—এটা তাহাদের রীতি। গতবৎসর যে নৃত্য হইয়াছিল তাহাতে প্রায় ৪০০ তরুণী যোগদান করিয়াছিল।



—আপান-ভাজগণের বোচ্ছসেবকতা—

আপানের বোচ্ছসেবক ছাত্র—

আপানের ছাত্রগণের অবস্থা বিশেষ সফল নয়, সেইজন্য অল্প উপায়ে বাহ্যতে তাহাদের ধোঁরাক-পোবাকের ব্যবস্থা হয় তাহা তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য। সম্প্রতি টেনেসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ একটি উপায় নির্ধারণ করিয়াছে।

সাগেয়ে একটি রীতি আছে—সেটা একটি পাহাড়ের চূড়ায় গঠা। পর পুষ্টার আমরা যে ছবিটা দিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে, একটি মন তরুণ যুবক পাহাড়ের শাখা বহিরা উপরে উঠিতেছে—উহার সকলই ছাত্র। পাহাড়ে উঠিবার সময় লাতিন ভাষায় তাহারা একটি সঙ্গীত করে। ঐ গান গাইবার যোগ্যতা অম্বাসের উহাদের পুস্তকায় দেওয়া হয়।

—সাগেয়ের হাট পিয়ার পয়েন্ট  
কলেজের ছাত্রগণ পাহাড়ে উঠিতেছে—



সাগেয়ের ছাত্র হিউরোপের সম্ভ্রান্ত ছাত্রগণের মধ্যে  
এই জাতীয় রীতি ও সঙ্গীতাদির প্রচলন আছে।

—শ্রীশৌরীন যোগ

## শ্রীমাক্ষর আশ্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(শিল্প কেন্দ্র)

শিক্ষা, সেবা ও প্রচার এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। এই

শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষা :—

ক। সেলা মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ও ২টা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়।

খ। নংউয়ার উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গ। মউল উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ঘ। উমুয়াই নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নৈশ বিদ্যালয়।

ঙ। বোয়াই নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইহা আপাততঃ বন্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৩০ নভেম্বর মাস হইতে ওয়ারসন গ্রামেও একটি বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই সমুদয় বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র-সংখ্যা (১৯৩০) :—

সেলা

৮০

মউল ৩৫

নংউয়ার ৪০

উমুয়াই ৩০

বোয়াই ৩০

এবং শিল্পক সংখ্যা :—বাগালী ১জন, বাগিয়া ৩ জন।

সেলা, হুনাগঞ্জ ও শিল্পে ৩টা বোর্ডিং পরিচালিত

হইতেছে। বর্তমান ছাত্র-সংখ্যা (১৯৩০) :—

সেলা ৮০ হইতে ১০০

হুনাগঞ্জ ৪০

শিল্প ৫

এখানে গরীব ছাত্রদিগকে মধ্যম সাহায্য দেওয়া হয়।

একটি গরীব ছাত্রকে বিনা খরচে কলিকাতা নিবেদিতা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়ান হইতেছে।



সেবা বিভাগ :—সেলা-আশ্রম-ঔষধালয় হইতে গত বৎসর মোট ১৩২৯ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। নূতন রোগীর সংখ্যা ৬৯২ ছিল।

রবিবারে, হরিশঙ্কর অবিবেশন হয়। গীতা, রামায়ণ, চরিতামৃত, কথাসূত্র প্রভৃতি শাস্ত্রীয় পুস্তক বাসীরা ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। জন্মোৎসব, কুলম, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, কালীপূজা



কয়েক জন কর্মী



সেলা মাইনর ইংরেজী বিভাগের কয়েক জন ছাত্র

প্রচার-বিভাগ :—সেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতি প্রভৃতি বিশেষভাবে ক্ষতধিত হয়। শত, শত বাসীরা

দ্রোপুষ্কর রানন্দে এই সব উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে। হইয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের ৩১৮ গানি এবং ম্যাট্রিক-লওনে বক্তৃতা :—‘শ্রীমদ্রামায়ণ’, ‘প্রজ্ঞান’, ‘শিশুপাঠ্য’ অনেকগুলি পুস্তক আছে। কথীদের দ্বারা স্থল-‘মালেরিয়া’, ‘সারাগুণ বাত্যা’, ‘জগতে ভারতের স্থান’, পাঠ্য ও দৃষ্টবিশয়ক গান গানি বই বাসীরা ভাষায় লেখা



সেলার সাপ্তাহিক হরিশঙ্কর একটা অবিবেশন

‘রামকৃষ্ণ’, ‘বিবেকানন্দ’, ইত্যাদি বিষয়ে সেলা, শিলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে। প্রভৃতি স্থানে ১০১৫টা বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বর্তমান প্রয়োজন :—আরও স্থল খোলা, সরকার এবং গড়ে ৫০১০ জন উপস্থিত ছিল।

গাইরেবী :—বর্তমানে সেলা আশ্রমের পুস্তকাগারে নানারূপ পুস্তক ২৭৯ বানি আছে। এতদ্ব্যতীত শিলা-আশ্রম-ক্ষেত্রে ‘বিবেকানন্দ লাইব্রেরী’টা পাঠ্যচালক-সমিতির হস্তে প্রদত্ত





### শ্রীমদ্ভাষ্য খোষ

১৯২১ বঙ্গাব্দের ৩রা আশ্বিন (ইং ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) বৃহস্পতিবার মহাশয় তিথিতে কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে মালুগায়ে শ্রীমদ্ভাষ্য খোষ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি “হিন্দু-পেট্রিট” ও “বেঙ্গলী” পত্রের প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক, বিখ্যাত বাম্বী ও দেশনায়ক গিরিনাথের ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র। ইহার পিতা (অনুনা অবসরপ্রাপ্ত সর্বজ্ঞ) শ্রীকৃষ্ণ অচ্যুতের ঘোষ মহাশয়ের ইংরেজী, বাঙ্গালী ও সংস্কৃত ব্যতীত অজ্ঞাত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাতেও যথেষ্ট অধিকার ও অহরহা আছে। ইনি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্ক বাঙ্গালী কবিসের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির যে ইংরেজী পড়াহাবা করিয়াছেন এবং বাহ্যর কতকগুলি মাত্র “ডেলেস-ডিটস” নামক কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার ইংরেজী পড়চরনার বিশেষ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। মাইকেল বুদ্ধদেব দত্তের প্রথম ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ “কাপুটিভ লেডী” ইনি স্থগলিত বাঙ্গালী পণ্ডে অল্পবাদ করিয়া বাঙ্গলা-সাহিত্যের একটি অভাব মোচন করিয়াছেন। ইনি কবি জয়দেব প্রণীত “প্রসন্ন-রাগব” নামক সংস্কৃত নাটকখানিও বাঙ্গলা ভাষায় যথেষ্ট রুচিতেব সহিত অল্পবাদ করিয়াছেন, উহা এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই (কিয়দম মাত্র ‘প্রবাসিনী’তে প্রকাশিত হইয়াছিল)। মদননাথের জননীও সুপ্রসিদ্ধ লেখক বাম্বী ও দেশনায়ক কিশোরীচাঁদ ব্রজের দৌহিত্রী এবং বিদ্বতী ও বুদ্ধিমতী রমণী। বাঙ্গলা-সাহিত্যে এমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নাই, যাহা ইহার অর্শপতি। মদননাথ বসন্ত তাঁহার জননী সঙ্গীত বিশ্বকোষ।

মদননাথ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে তাঁহার পিতার কর্মস্থল নগড়াতে (রাজসাহী জিলা) কৃষকদ হইতুলে

নবম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। সুপ্রসিদ্ধ গরুলেখক শ্রীকৃষ্ণ কলীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় এই বিদ্যালয়ে মদননাথের সহপাঠী ছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ডবল প্রমোশন পাইয়া মদননাথ পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেন। ঐক্যবন্ধের মধ্যভাগে তিনি “কলিকাতার সেন্ট্রাল কনিজিয়েট স্কুলে প্রবেশ লাভ করেন এবং উক্ত বিদ্যালয় হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যকালে চিত্রাঙ্কনে ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং প্রবেশিকা



শ্রীমদ্ভাষ্য খোষ

পরীক্ষার চিত্রাঙ্কন বিভাগে পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। অতঃপর ইনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলোনেব এসেমব্লিষ্ট ইন্সটিটিউশনে (একবেল হুটশ চার্ড কলেজ) প্রব্রিষ্ট হন এবং অধ্যাপক ডাক্তার মরিয়ন-গ্রন্থম ফুরোপীরগণের নিকট ইংরেজী

সাহিত্য, আচার্য্য পৌরীশ্বর দেব নিকট গণিত, আচার্য্য অরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট তর্কবিজ্ঞা ও ইতিহাস, অধ্যাপক জ্যোৎস্নাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ক্রোমেরপ্রণায় বিশ্ববিদ্যে, বঙ্গব্রত দত্ত প্রভৃতির নিকট পারার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন, পণ্ডিত নন্দলাল ভট্টাচার্য্য এবং বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সংস্কৃত-সাহিত্যে উপদেশ লাভ করিয়া বিশেষ উপকৃত হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি প্রথম বিভাগে এক-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী-রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে “বক্সিমচন্দ্র”-পদক প্রাপ্ত হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গণিতে সন্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার এবং ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। বি-এ রূপে স্বকবি-স্বতন্ত্র পদ, সমাধোক্তকণ্ঠে ৬ অঙ্কিত চক্রবর্তী ও সুপ্রসিদ্ধ কথানীতি শ্রীকৃষ্ণ পৌরীশ্বরদেব মুখোপাধ্যায় ইহার সহপাঠী ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলোনেব এডেমব্লিষ্ট ইন্সটিটিউশন হইতে বিজ্ঞ-গণিতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলোনেব এসেমব্লিষ্ট ইন্সটিটিউশনে এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজেও বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ডাক্তার সি-ই-কালিস মাহাশয়ের নিকট বিশ্রণপতি এবং সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক এইচ এম পানিভাল্লার নিকট ধনবিজ্ঞান শিক্ষা করেন। এই সময়ে কলিকতাস রিপণ কলেজেও স্বাধীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নিকট ব্যবসায়িক শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে ইহার বিবাহ হয় এবং উক্ত বৎসর জুলাই মাসে ইনি কট্টোলাব কলোনেবের অফিসে এন্সিষ্ট্রাট সুপ্রারিটেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতীয় রাজস্ব বিভাগে উচ্চতর কর্মের জন্য ‘এনারোল্ড স্মিথ’ পরীক্ষা দেন কিন্তু অকৃতকার্য হন। তখন উক্ত পরীক্ষা আই-সি-এম পরীক্ষার দ্বারা কর্তম ছিল। সেবারে ডই জন মাত্র ভারতবাসী (বাঙ্গালী নহে) সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন; যিনি যিহীত হইয়াছিলেন তিনি একবেল স্বর্ণপদক, যিনি প্রথম হইয়াছিলেন তিনি উক্ত কৃষ্ণপ্রাপ্তির পর রাজকর্তৃক স্বকোষ ত্যাগ করিয়া উচ্চতর কার্য্যে আশ্রয়নযোগ্য করিয়া আজ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন,—তিনি আর কেহই ননেন,—ডর চন্দ্রশেখর বের্ডট রমণ। ১৯০৮

খ্রীষ্টাব্দে মদননাথ আর একবার উক্ত পরীক্ষা দেন, সেবারেও দুইজন সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন বাঙ্গালী,—আচার্য্য পৌরীশ্বর দেব রূজামাতা প্রেমচাঁদ-সাহায্য বিহারী শ্রীকৃষ্ণ পুসিনবিহারী-দাস। মদননাথ যখন কট্টোলাব কলোনেবের অফিসে সুপ্রারিটেণ্ডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত, তখন রাজধানী এবং কট্টোলাব-কলোনেবের অফিস দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। কতিপয় ব্যক্তিগত কারণবশত ইনি দিল্লী বাইতে অস্বীকৃত হ'ন এবং দ্রুত পদোন্নতি আশার জ্বালালি দিয়া কলিকাতার ইণ্ডিয়া ট্রিভুনালী সুইচের কট্টোলাবের অফিসে সুপ্রারিটেণ্ডেণ্টের পদ গ্রহণ করেন। যে সকল কারণে আর্থিক উন্নতির প্রলোভন ত্যাগ করিয়া কলিকাতার থাকিতে তিনি কৃতজ্ঞপত্র হ'ন, তন্মধ্যে কলিকাতার জনকর্তার সুখি অস্তমত প্রদান কারণ। ইনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়্যাল হাট্টিক্যালগা সোসাইটী এবং রয়্যাল ইনস্টিটিউট সোসাইটীর ফেলো বা সদস নির্বাচিত হন। মদননাথ কিছুদিন একাউন্টেন্ট কলোনেব সেন্ট্রাল রেভিনিউজ অফিসে এন্সিষ্ট্রাট একাউন্টেন্ট অফিসার ছিলেন এবং পরে ‘গার্ভে’ অব ইণ্ডিয়ার ‘পে এণ্ড একাউন্টেন্ট’ অফিসারের মারিগুপ্ত পদে উত্তীর্ণ হ'ন।

মদননাথ কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন, ইটারমিডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালী রচনার পরীক্ষক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে এম-এ উপাধিপ্রার্থীর বিনিস পরীক্ষার জন্য তিনি একবার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিসাববিভাগের প্রশাস্য কার্য্য করিয়া সাহিত্য-সেবার যথেষ্ট অনসরণ পাঠ্য বার না বলিয়া মদননাথ গ্রন্থপ্রকাশ করিয়া থাকেন। বাঙ্গলা-সাহিত্যের জীবন-চরিত-বিভাগে যথেষ্ট কর্ম্য নাই দেখিয়া তিনি প্রধানতঃ এই বিভাগে তাঁহার শক্তি বিনিয়োগ করিয়াছেন। এই বিভাগে তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন সুবীৰণ তাহার উক্ত প্রশংসা করিয়াছেন। এই কার্যের জন্য মদননাথকে বহু অর্থব্যয়ে অনেক প্রাচীন ও গ্রন্থাপ্য গ্রন্থ ও কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থাগারে এমন অনেক গ্রন্থ আছে যাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

মদননাথের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা নিয়ে প্রস্তুত হইল —



Life of Grish Chunder Ghose. by one who knew him ... I. I. 1911

Selections from the writings of Grish Chunder Ghose. ... ১৯১৬. 1912

মহাশয় কালীপ্রসন্ন সিংহ ১লা আখিন ১৩২২

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১ই পৌষ ১৩২৪

হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড ১লা বৈশাখ ১৩২৬

Memoirs of Kali Prasanna Singh 24. 7. 1920

হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ১লা ভাদ্র ১৩২৭

হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০

নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৩৩০

সেকালের সোক ১লা বৈশাখ ১৩৩০

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র ১ বৈশাখ ১৩৩১

কণ্ঠারী কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৩৩৩

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ২রা ভাদ্র ১৩৩৪

বাঙ্গালী সাহিত্য ১ই শ্রাবণ ১৩৩৪

হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) ২৮শে কার্তিক ১৩৩৪

রত্নলাল ৩রা আখিন ১৩৩৪

মদনখানপের অবিকার্য রচনা এখনও সাময়িক পত্রাদিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে—গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার রচনাগুলির একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তালিকাটা সম্পূর্ণ নহে। উহা ব্যতীত তাঁহার অনেকগুলি বোনানী-রচনা এবং পুস্তক সমালোচনাদি সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রদান করা সম্ভব নহে।

১৩২০

ভাদ্র স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্রের

রোজনামচার একপৃষ্ঠা সাহিত্য

আখিন দারকতা শাল (গল্প) (৬)গিরিচন্দ্র ঘোষের

ইংরেজী হইতে অনুবাদিত) আখ্যাবর্ন্ত

অগ্রহায়ণ কিশোরীচাঁদ মিত্র (১) ঐ

পৌষ বাসনা (কবিতা) (৬)কালীপ্রসাদ

ঘোষের ইংরাজী হইতে) আখ্যাবর্ন্ত

কিশোরীচাঁদ মিত্র (২) ঐ

মাঘ কিশোরীচাঁদ মিত্র (৩) ঐ

কালন্দ দেশব্রত হরিশ্চন্দ্র

কিশোরীচাঁদ মিত্র (৪)

১৩২১

বৈশাখ কিশোরীচাঁদ মিত্র (৫)

জ্যৈষ্ঠ কিশোরীচাঁদ মিত্র (৬)

আষাঢ় কিশোরীচাঁদ মিত্র (৭)

শ্রাবণ কিশোরীচাঁদ মিত্র (৮)

ভাদ্র কিশোরীচাঁদ মিত্র (৯)

আখিন সেকালের শিক্ষা (১)

কার্তিক সেকালের শিক্ষা (২)

৫ম (কবিতা) (৬)কালীপ্রসাদ ঘোষের ইং হইতে)

রামমোহনপাল ঘোষ

অগ্রহায়ণ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দ্বিতীয়াভ্যাস

কিশোরীচাঁদ মিত্র

কিশোরীচাঁদ মিত্র (১০)

লালবিহারী দে

ফাল্গুন রামমোহনপাল ঘোষের দ্বিতীয়াভ্যাস কিশোরীচাঁদ

১৩২২

বৈশাখ দেশহিতব্রত গোপালকৃষ্ণ গোবলে

জ্যৈষ্ঠ স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র

শ্রাবণ স্বর্গীয় বরনারায়ণ মিত্র

ভাদ্র ডিগ্রিওয়াটার বেগুন ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

আখিন অথবা (সমালোচনা)

কার্তিক বিচ্ছেদ (কবিতা) (কালপ্রদ ডি, এল

রিচার্ডসনের ইং হইতে)

অগ্রহায়ণ প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয়াভ্যাস

১৩২৩

আষাঢ় প্রসন্নকুমার সর্গবিধিকারীর বালা রচনা

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র

শ্রাবণ মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু (১)

ভাদ্র মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু (২)

আখিন ভুল (গল্প)

কার্তিক নীরবকণ্ঠী রমা প্রসাদ রায় (১)

কালীপ্রসাদ ঘোষ

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]

[ মাঘ ]



শ্রাবণ	হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ৭ম পঃ (২)	মাঃ মঃ	শৌষ	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৭ম পঃ (১)	মাঃ মঃ
বিজ্ঞাপন	অঞ্জলি		অঞ্জলি	কিশোরীচাঁদ মিত্র	অঞ্জলি
পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্গাবিকারী (১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা			চৈত্র	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৭ম পঃ (২)	মাঃ মঃ
ভাত্র	পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্গাবিকারী (২)	ঐ		মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (৪) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	
আখিন	আন্তোভোব	অঞ্জলি		১৩২৯	
কার্তিক	আমার গুরু (গল্প)	যমুনা	বৈশাখ	তুহানল (হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের অসংকলিত-পূর্ণ কবিতা)	মাসিক বহুমতী
অগ্রহায়ণ	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ১ম পঃ	মাঃ মঃ	জ্যৈষ্ঠ	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৭ম পঃ (৩)	মাঃ মঃ
পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্গাবিকারী (৪) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা			আষাঢ়	হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৬) গিরিশচন্দ্র বোমের	
পৌষ	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ২য় পঃ	মাঃ মঃ		ইং হইতে	নব্যভারত
মাঘ	বর ও সঙ্গীত (কবিতা) (লাংকেলা হইতে)	অর্জুন	শ্রাবণ	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৮ম পঃ (১)	মাঃ মঃ
কানুন	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৯ম পঃ	মাঃ মঃ	ভাত্র	হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	অর্জুন
বাণী সেবার জ্ঞানশরৎ				মনীষা ভোলানাথ চন্দ্র (১)	মাসিক বহুমতী
মহাভাষ্য কালীপ্রসন্ন সিংহ		অঞ্জলি	আখিন	ভূষণেন্দ্রিনী (রহস্ত-সন্দর্ভ হইতে সংকলিত)	অর্জুন
চৈত্র	৬ভাকার জর রামবিহারী বোম		কার্তিক	ভারতবর্ষ (কবিতা) (৬) কালীপ্রসাদ বোমের	
বর্ষার দিনে (কবিতা) লাংকেলা হইতে		অর্জুন		ইং হইতে	নব্যভারত
মতিলাল শিল্প (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংকলিত)		ঐ		বিজ্ঞা (হেমচন্দ্রের অপ্রকাশিতপূর্ণ কবিতা)	মাসিক বহুমতী
সাহিত্য বিবরণ ও বিজ্ঞান বিকাশ (সোমপ্রকাশ হইতে)		অর্জুন		মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (৩) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	
১৩২৮			অগ্রহায়ণ	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৮ম পঃ (২)	মাঃ মঃ
জ্যৈষ্ঠ	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৪র্থ পঃ	মাঃ মঃ		হেমচন্দ্রের গল্পগদ্যনা (বঙ্গদর্শন হইতে সংকলিত)	অর্জুন
শ্রবণ	গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়	অঞ্জলি		মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (৬) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	
মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা			পৌষ	হেমচন্দ্র (৬) ৩য় খণ্ড ৮ম পঃ (৩)	মাঃ মঃ
আষাঢ়	বহুমতী চট্টোপাধ্যায়	অঞ্জলি	মাঘ	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৯ম পঃ (১)	ঐ
শ্রাবণ	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ১০ম পঃ	মাঃ মঃ		মনীষা ভোলানাথ চন্দ্র (২)	মাসিক বহুমতী
মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা			ফাল্গুন	রাজা ধার্মাচোদন মুখোপাধ্যায়	মাঃ মঃ
ভাত্র	ডেভিড হোয়ার	অঞ্জলি		মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (৭) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	
আখিন	কৃষ্ণদাস পাণ্ডা	ঐ		১৩৩০	
কার্তিক	মহাভাষ্য জ্ঞান এলিয়ট ডিক্‌সন ওয়াটার্স বেথুন	মাঃ মঃ	বৈশাখ	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৯ম পঃ (২)	মাঃ মঃ
গিরিশচন্দ্র বোম		অঞ্জলি		সেকালের কথা (১)	যমুনা
অগ্রহায়ণ	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৪ষ্ঠ পঃ	মাঃ মঃ	জ্যৈষ্ঠ	হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৯ম পঃ (৩)	মাঃ মঃ
মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (৩) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা				মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (৬)	
অমরেন্দ্র (কবিতা)		যমুনা	আষাঢ়	নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১)	মাঃ মঃ
টেকদাঁ ঠাকুর		অঞ্জলি	শ্রাবণ	নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (২)	ঐ

শ্রাবণ	হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিসভার রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	আষাঢ়	জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (২)	ঐ	
	নব্যভারত		নকুলবাবুর অনিন্দ্য শিক্ষা (গল্প)	রূপ ও রঙ্গ	
ভাত্র	সেকালের কথা (২)	যমুনা	জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (১)	তত্ত্ববোধিনী	
কার্তিক	সেকালের কথা (৩)	ঐ	শ্রাবণ	জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (২)	ঐ
অগ্রহায়ণ	৬অখিনীকুমার দত্ত	মাঃ মঃ	ভাত্র	স্বরেন্দ্রনাথ	মানসী ও মর্মবাণী
	ভারতমাতা	সচিত্র শিশির ( ৭ই অগ্রহায়ণ )		জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (৩)	ঐ
পৌষ	৬পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়	মাঃ মঃ		দাতার বিপদ (গল্প)	গল্পগহ্বরী
	মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		আখিন	মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের	
ফাল্গুন	বহুমতীচন্দ্রের রাজকর্মের ইতিহাস	সচিত্র শিশির		প্রথম কাব্যগ্রন্থ	সচিত্র শিশির
	১১ই ফাল্গুন			জ্যোতিষসিদ্ধান্ত ৩	তত্ত্ববোধিনী
	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	অর্জুন	কার্তিক	জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (৪)	মানসী ও মর্মবাণী
চৈত্র	সময়ের গতি ( কবিতা )	ঐ		গিরীন্দ্রমোহিনীর বাণ্য রচনা	ঐ
	মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (৩) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		অগ্রহায়ণ	জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (৫)	মানসী ও মর্মবাণী
	১৩৩১			জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (৬)	তত্ত্ববোধিনী
বৈশাখ	মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (১০) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		পৌষ	জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (৭)	মানসী ও মর্মবাণী
জ্যৈষ্ঠ	আবাহন	তরুণশিল্পি		জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (৮)	তত্ত্ববোধিনী
আষাঢ়	বিপদে (কবিতা) (রামশর্মা ইং হইতে)	নব্যভারত	ফাল্গুন	কলিকাতার প্রথম ইংরেজের দাঁনী	অর্জুন
	মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (১১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা			দুটি ( কবিতা )	ঐ
শ্রাবণ	চিত্তা ( কবিতা ) (তরুণদত্তের ইং হইতে)	নব্যভারত		জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (৯)	তত্ত্ববোধিনী
ভাত্র	মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র ১২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		চৈত্র	জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (১০)	মানসী ও মর্মবাণী
আখিন	মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৩ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা			জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (১১)	তত্ত্ববোধিনী
অগ্রহায়ণ	৬তম আন্তোভোব চৌধুরী ১	মানসী ও মর্মবাণী		১৩৩৩	
	মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (১১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		বৈশাখ	হীয়ার ক্রম ( গল্প )	গল্পগহ্বরী
পৌষ	৬তম আন্তোভোব চৌধুরী (২) মানসী ও মর্মবাণী		জ্যৈষ্ঠ	শ্যামাপীসার উইল (গল্প)	ঐ
	খিয়েটালী বিজ্ঞাপন (গল্প) রূপ ও রঙ্গ, ৫ই পৌষ			জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (৬)	তত্ত্ববোধিনী
মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৫) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা			আষাঢ়	জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (৭)	ঐ
ফাল্গুন	গিরীন্দ্রমোহিনীর শেষ রচনা	মানসী ও মর্মবাণী	শ্রাবণ	মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ	মাঃ মঃ
	হরিমোহন ঠাকুর	ঐ	ভাত্র	ত্রিশক্তি ( সমালোচনা )	অর্জুন
	রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম	অর্জুন	আখিন	বনস্তক	মাঃ মঃ
চৈত্র	কিশোর ( সমালোচনা )	সচিত্র শিশির, ৭ই চৈত্র	কার্তিক	বহুমতীচন্দ্রের বাণ্যরচনা	ঐ
	মনীষা কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৬) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		পৌষ	মুর্খির মৃত্যু (গল্প)	গল্পগহ্বরী
	১৩৩১		মাঘ	সাহিত্যিক বর্ণপরিচয় (কবিতা)	মাসিক বহুমতী
বৈশাখ	মৃণালিনী (রহস্ত সন্দর্ভ হইতে সংকলিত)	অর্জুন	চৈত্র	বহুমতীচন্দ্রের অপ্রকাশিতপূর্ণ কবিতাবলী	মাঃ মঃ
জ্যৈষ্ঠ	জ্যোতিষসিদ্ধান্ত (১)	মানসী ও মর্মবাণী	বৈশাখ	প্রিয়তমার প্রাণনাশ (গল্প)	গল্পগহ্বরী



জ্যোতিষ্মিন্নাথ (১০)	তত্ত্বাবোধিনী	উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ভারতবর্ষ
জ্যোতিষ্মিন্নাথ (১১)	ঐ	ভাস্কর	রঙ্গলাল ১১শ পঃ
জ্যোতিষ্মিন্নাথ (১২)	ঐ	আখিন	সংবাদিনী (৩)
মহাশয় কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বন্দীরা নৃসিংহালা	বাংলাগুরু (গল্প)	কাঙ্কির	পিতা
নাচঘর ১১ই আখিন	অগ্রহায়ণ	বঙ্গ-ইংরেজী	কাব্যসাহিত্যে
৬ জ্যোতিষ্মিন্নাথ ঠাকুর	আগমন	বঙ্গ-ইংরেজী	কাব্যসাহিত্যে
প্রায়শ্চিত্ত (গল্প)	গল্পগরী	পৌষ	বাণী
বুদ্ধিবিদ্যা বসন্ত (গল্প)	ঐ	Public characters of Calcutta 1838-45	The Calcutta Municipal Gazette 21. 12. 29
১৩৩৫	ঐ	মার্চ	II 11. 1. 30
বৈশাখ	রঙ্গলাল ১ম পঃ	মাঃ মঃ	III 8. 2. 30
জ্যৈষ্ঠ	রঙ্গলাল ২য় পঃ	ঐ	১৩৩৭
মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ভারতবর্ষ	বৈশাখ	গাটের রেখাচিত্রে
রঙ্গলাল ৩য় পঃ	মাঃ মঃ	জ্যৈষ্ঠ	শব্দে পূর্ণের কলেশ্বর ছাত্রের পঞ্চ রচনা
বন্দী (গল্প)	গল্পগরী	আষাঢ়	ভালবাসিতাম তোমা (কবিতা)
মনীষী কৌশলানাথ চন্দ্র	ভারতবর্ষ	ভারতবর্ষ	বহিষ্যতের গল্প
রঙ্গলাল ৪র্থ পঃ	মাঃ মঃ	শ্রাবণ	হিত্তরী (গল্প)
জন্ম পরীক্ষা (গল্প)	গল্পগরী	গল্পগরী	কাজী (কবিতা)
রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর	ভারতবর্ষ	ভারতবর্ষ	দীনবন্ধুর গল্প
ভাস্কর	রঙ্গলাল ৫ম পঃ	মাঃ মঃ	ভাস্কর
এসদ্রকুনার ঠাকুর	ভারতবর্ষ	ভারতবর্ষ	Forgotten citizens of Calcutta I ... Kasi Prosad Ghose ... C. M. G. 13. 9. 30
রঙ্গলাল ৬ষ্ঠ (২)	মাঃ মঃ	ঐ	কাঙ্কির শিবচন্দ্র দেব
কাঙ্কির	জননী	ঐ	অগ্রহায়ণ হেমচন্দ্রের গল্প
আচার্য লালবিহারী দে	ভারতবর্ষ	পৌষ	The Firs' memorial meeting in Calcutta
অগ্রহায়ণ	রঙ্গলাল ৬ষ্ঠ (২)	মাঃ মঃ	C. M. G 20. 12. 30
হরিশ্চন্দ্রের উইল (গল্প)	গল্পগরী	পৌষ	রাজা রামমোহন রায়ের
পুরুষাব (কবিতা) (মাইকেলের ইং হইতে)	নবযুগ	পৌষ	কলিকাতাবাসীদের প্রথম গাটের (১)
রঙ্গলাল ৭ম পঃ (১)	মাঃ মঃ	মাঘ	ঐ
মাঘ	রঙ্গলাল ৭ম (২)	ঐ	১৩৩৮
কান্দন	সংবাদিনী (১)	ঐ	বৈশাখ
চৈত্র	রঙ্গলাল ৮ম পঃ	ঐ	Forgotten citizens of Calcutta II. Muttay Lall Seal C. M. G. 25. 4. 31
১৩৩৮	ঐ	জ্যৈষ্ঠ	বিভূতিকা (গল্প)
বৈশাখ	রঙ্গলাল ৯ম পঃ (১)	মাঃ মঃ	ঐ
জ্যৈষ্ঠ	রঙ্গলাল ৯ম পঃ (২)	ঐ	বিষয়ভাষ্যর গল্পের একপৃষ্ঠা (১)
মহেশ্বর গুণ (গল্প)	গল্পগরী	আষাঢ়	ঐ
রঙ্গলাল ১০ম পঃ	মাঃ মঃ	শ্রাবণ	বঙ্গের মহিলা কবি
সংবাদিনী (২)	ঐ	আশ্বিন	কবি-পত্নী
শ্রাবণ	রঙ্গলাল ১১শ পঃ	ঐ	মাঘ
			বাটাতাড়া (গল্প)

## যৎকিঞ্চিৎ

গত মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে 'মধ্যম্যে দক্ষিণ-ভারতে বাঙালীর প্রভাব' নামে একটি উপাধেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি উক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, মহাশয়ের লেখা। এই সারগর্ভ প্রবন্ধটি আমরা বর্তমান সংখ্যায় 'জানবার কথা'-বিভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। প্রবন্ধটির কয়েকটি জায়গায় আমাদের কিছু বলিবার আছে। প্রবন্ধকার হৃদয়ের শিথিয়াছেন, 'বাঙালী বহুকাল দক্ষিণীদের নিকট যুদ্ধে ও কাজেই পুরাণিত হইয়াছে।' জয়-পরাজয় চিরকালই হইয়া থাকে। বাঙ্গালীরাই চিরকাল পরাজিত তাহা বলা চলে না। সেন ও বর্ধন-বংশ যেরূপ এদেশে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছে, তেমনিই বহু পূর্বে হইতে বাঙ্গালী বহুদিন দক্ষিণে রাজ্যস্থাপন করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের গঙ্গ-বংশ, গোড়ের রাজা শশাঙ্ক, ভগবত-বংশীয় ক্রীষ্ণ, কবংশ, তুঙ্গবংশ ও সোমবংশী গুপ্তবংশই তাহার প্রমাণ। ইহা ছাড়া বাঙ্গালী দাময়-সীতার করিয়াছে বলা যায় না। সেন ও বর্ধনেরা বাঙ্গালীই হইয়া গিয়াছিলেন।

প্রবন্ধ শৈব আদিভূক্ত নাম 'দ্রুপদী' হলে দ্রুপদী হইবে ও গোলাকি-মঠের আচার্য 'রামশঙ্ক' বামশঙ্ক হইবে। এতদুই সম্ভবতঃ ছাত্রের ভুল। বিবেচন শব্দর বাঙালী দক্ষিণ-রাষ্ট্রের পূর্ণগ্রামে। মুর্শিদাবাদ কিসকিন-রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। হুতরাং এই পূর্ণগ্রাম হগলী, হাওড়া বা মেদিনীপুর অঞ্চলে হওয়াই সম্ভব। প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে 'রুক, বজ্র ও সামবেদ অধ্যাপনার জন্য পাঁচ জন শিকর তিনি (বিবেচক) নিবৃত্ত করেন।' শুভসিদ্ধিতে পাঁচ জন অধ্যাপকের কথা নাই, তিন জন অধ্যাপকেরই কথা আছে। লেখক প্রবন্ধের শেষে পার্বত্যকায় ১১৭১ সালের সাউথ ইণ্ডিয়ান এগ্রিগ্রেসিভের বাণিক নিরপণ অবলম্বন করিয়া দিয়াছেন, 'বিবেচক শব্দর ক্রীষ্ণ-ব্রহ্মাণ্ড-মন্ত্রাঙ্কুর-গাটের জেলার অন্তর্গত মাঘবন-পুরম গ্রামে আবিষ্কৃত অপ্রকাশিত শুভসিদ্ধি অবলম্বন শিথিত। 'মাঘবনপুরম' গ্রামে সিপিতী আবিষ্কৃত হয় নাই,

গ্রামের নাম 'মল্লকপুরম', আর সিপিতী অপ্রকাশিতও নয়, বহুকাল হইল বিবেচক শব্দর এই শুভসিদ্ধি অক্ষ-হিষ্টরিক্যাল রিমাট-সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত হইয়াছে। 'বাঙ্গালীর বাহিরে বাঙ্গালীর প্রাচীন কীর্তি' শব্দকে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বোসের লিখিত আরও একটি স্থগিত প্রবন্ধ আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। কয়েকমাস পূর্বে এই প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হইয়াছিল।

গত পৌষমাসের 'শনিবারের চিঠিতে' দীনবন্ধু-সংকে নানাকথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনা-গুলি প্রণয়সার্থ। "দীনবন্ধু মিত্র-সংকে যৎকিঞ্চিৎ" নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। ইহাতে জানিবার, আলোচনা করিবার অনেক কথা আছে। প্রবন্ধটি চারিভাগে বিভক্ত—(১) অপ্রকাশিত বাণ্যরচনা (২) গ্রন্থাবলীর কালাহুক্ষমিক তালিকা (৩) দীনবন্ধুরচিত নাটক ও প্রকাশনের অভিনয় (৪) জীবনের উপাধান। প্রথম তিন দফা-সংকে আলোচনা আমরা পরে করিব। চতুর্থ দফা-সংকে এখানে কিছু বলিব। লেখক 'কৃষ্ণদাসের দীনবন্ধুর সঙ্কট' উদ্ধৃত করিবার পূর্বে সংকে যে অংশটি দিরাছেন তাহা ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ভারতী প্রকাশিকার প্রকাশিত হৃদনার হের-হের মাজ। ভারতীতে প্রকাশিত অংশ ও লেখকের প্রকাশিত অংশ তুলনায়—

"১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জুন তারিখে হিন্দুপেট্রিটের ব্রহ্মপুত্র সম্পাদক চিরস্মরণীয় হরিশ্চন্দ্র ব্রহ্মোপাধ্যায় ইহারক হইতে অগম্য হন। তাঁহার পরপরকগমনের সময় ভারতবর্ষ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল এবং তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ উপরুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য উৎসাহক হইয়াছিল। ...মহাশয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের বর্তাবস্থায় মহাশয়হারী স্মৃতিবাহাগান ষ্টীটে অবস্থিত দুই বিঘা জমি ও পঞ্চ শত মুদ্রা হরিশ্চন্দ্র স্মৃতি-সমিতির হস্তে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হ'ন...। ...এই সভার দীনবন্ধু একটি স্থগিত কণ্ঠস্বরসমূহ



বক্তৃতা করেন। ১২৬৯ অব্দে ২৭শে শ্রাবণ তারিখেই সোম-প্রকাশে প্রকাশিত জনৈক ক্লকনগরবাসীর পরে এই সভার কার্যবিবরণ বর্ণিত আছে। ‘আমরা সেই পত্রাবলি নিয়ে উকুত করিতেছি। চতুর্থের বিবদ, দীনবন্ধুর বক্তৃতা অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় সোমপ্রকাশ-সম্পাদক...কিয়দংশমাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।’— ভারতী ১৩২৬, শ্রাবণ, পৃঃ ২৯৮

“১৮৮১, ১৪ই জুন তারিখে ‘হিন্দু-পেট্রিট’-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। এই বর্ষেই বঙ্গীয় সম্পাদকের উপযুক্ত দৃষ্টিভিত্তি স্থাপনের জন্ত অনেকেই উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সুক্দিয়া স্ট্রীটে ইহা বিধা জমি ও পাঁচশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হ’ন। ১৮৮২, ২৬ জুলাই তারিখে ক্লকনগরে একটা সভা হয়। এই সভার দীনবন্ধু একটা দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ‘কত্বেচিৎ ক্লকনগরবাসিনঃ’ এই সভার বিবরণ ও দীনবন্ধুর বক্তৃতা প্রকাশের জন্ত ‘সোমপ্রকাশ’ পত্র প্রেরণ করেন। বক্তৃতাটি অতি দীর্ঘ বলিয়া ‘সোমপ্রকাশ’-সম্পাদক তাহার কিয়দংশ ১৮৮২, ১১ আগষ্ট (২৭ শ্রাবণ ১২৩১) তারিখের পত্র প্রকাশ করেন। তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল :—” (শনিবারের চিঠি, পৌষ, পৃঃ ৩৮০)

ভারতীয় প্রথম জ্ঞেয় বন্দনরত্ন গত পৌষের প্রবন্ধে ‘বন্দনবৎসল’ হইরাছে,—অবশ্য একটু হাটরা। ‘ভারতবর্ষ’ ‘অনেকে’ পরিগত হইরাছে। সোমপ্রকাশে প্রকাশিত পত্রের শেষে মোট ১০৪১০ টাকা নীচে ছিল—

“কত্বেচিৎ ক্লকনগরবাসিনঃ”; তাহা আলোচ্য প্রবন্ধে সেখানে হইতে অন্তর্হিত হইয়া এই প্রবন্ধের মূখ্যবন্ধে আবিস্কৃত হইরাছে এবং ‘জনৈক ক্লকনগরবাসী’ হ’ন মরণ করিয়াছে।

সোমপ্রকাশে প্রকাশিত ক্লকনগরে দীনবন্ধুর বক্তৃতা এই দফার বিশিষ্ট উপাদান। এই বক্তৃতা পূর্বে দুইবার বাহির হইয়াছিল। একবার ‘অর্য্যাবর্ত্তে’ (১৩২১ পৌষ সংখ্যার) ও আর একবার ‘ভারতী’তে (১৩২৬, শ্রাবণ)। বক্তৃতাটির প্রক পূর্বে দুইবার ভাল করিয়া দেখা হয় নাই।

এবার তাহা হইয়াছে। এতদিন পরে অ-পূর্ণ প্রকাশিত উপাদান না হইলেও দীনবন্ধুর বক্তৃতা পুনরায় নিভুল করিয়া প্রকাশের জন্ত আমরা লেখকের নিকট ক্ষতজ। বক্তৃতার শেষে বাহারা চালা দিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ও দানের পরিমাণ লেখক মসৃণভাবে ছাপেন নাই। সোম-প্রকাশের এবারটা নাম বাদ দিয়াছেন। মধেনচন্দ্র পাল বড় সাহিত্যিক ছিলেন, রামমোহন পাল, রামমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রান্তঃস্থরবীর ব্যক্তি ছিলেন। ইহাদেরও নাম বাদ পড়িয়াছে।

সোমপ্রকাশে প্রকাশিত বক্তৃতা এইবার লইয়া তিনবার ছাপা হইল। এবার পারদীকার একটু সম্পাদন (edit.) করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। বক্তৃতার আছে ‘তিনি অতি অল্প বয়সে টালার নিলামে এক পুত্র ক্রোশির কণ্ঠ গ্রহণ করেন।’ টালার নিলাম বলিলে লোকের এখন সহজে বুঝিতে পারিলে না—এখানে পারদীকার ‘Messrs. Tullah and Company, auctioneers in Calcutta.’র নাম ও পরিচয় থাকিলে ভাল হইত। বক্তৃতার আছে ‘গত ৫৭ সালের মিউটিনির সময় যে সময় সেপাইগণ রাজবিদ্রোহিতা করিয়াছিল’ ইত্যাদি। এইখানে হরিশ্চন্দ্রের হিন্দু-পেট্রিটে প্রকাশিত কয়েকটা লেখার ও ৩১এ ডিসেম্বর ১৮৫৮ সালের হিন্দু পেট্রিটে ‘মিউটিনি’ সংক্ষেপে প্রবন্ধের উল্লেখ থাকিলে প্রবন্ধটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইত। বক্তৃতার আছে, ‘শ্রীমুক্ত বাবু তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয় সভাপতি পদে ব্রতী হন’। এ নামটা ভুল, প্রকৃত নাম তারিণীপ্রসাদ ঘোষ। ইনিই ১০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। সোমপ্রকাশে ভুল করিয়া লেখা হইরাছে বাবু তারিণীপ্রসাদ সেন ১০০। ইহা যে ভুল তাহার প্রমাণ ১৮৮২ সালের ১১ই আগষ্টের হিন্দু-পেট্রিটে প্রকাশিত তালিকা। তাহাতে যে ৮৫ জন টাকা দিয়াছিলেন, তাহাদের সকলেরই নাম দেওয়া আছে। সংগৃহীত-মোট টাকা ১০৪১০ নহে—১০৪২ টাকা। হিন্দু পেট্রিটে তাহাই দেওয়া হইয়াছে।

• ঐ বর্ষে ‘হিন্দুস্তান’ সংবাদপত্রেও তাহা পুনরুক্ত হইয়া

শ্রীশৈলীকুমার ঘোষ কর্তৃক বিম্বাণ্ডার প্রেসে, ২১৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে মুদ্রিত  
এক পঞ্চপুস্ত-কার্যাদায়, ৩১ তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

পঞ্চপুস্ত —



জান্মিনী

শিল্পী—বন্দে অণী



কলিকাতা লিটেল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
ও  
গবেষণা কেন্দ্র  
৯৬/৬৬, চ্যামার স্ট্রেন, কলকাতা-৭০০০০৯



চতুর্থ বর্ষ

দ্বিতীয়াধি

জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮

শ্রাবণ সংখ্যা

## শক্তিপূজা ও বিবেকানন্দ

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ অন্নদিন আমাদের চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক লোক, বাংলার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁহার। এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার চরিত্র কোন পৌরাণিক গাথা বা গল্পের দ্বারা সমাচ্ছন্ন নহে। তাঁহার কার্যকলাপ অনেকেই বিদিত, আছেন। তাঁহাকে যিনি যে ভাবে দেখেন তিনি তাঁহাকে সেইরূপ বিশেষণে বিভূষিত করুন। আমরা সকলে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করি এবং সেইজন্য তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা নিদর্শন দেখাইতে উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু তাঁহার মহৎ কোথায় তাহা কি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি? তিনি যে মহান আদর্শ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, নিজেকে ও জাতিকে উন্নত করিতে হইলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া অগে সেই মহৎকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

কেহ কেহ মনে করেন, শিকাগোর ধর্ম-মহাসংমেলনে জ্ঞানবিজ্ঞানবিদ স্রসভ্য পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট তিনি

আর্য্যধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া আমাদের পতিত ও অবজ্ঞাত জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় এইরূপ ভাব-পোষণকারীরা তাঁহার প্রকৃত মহৎ অল্পই অহুত্ব করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ যদি কাহাকেও মহৎ বলে, তবে সাধারণতঃ তাহাকে মহৎ না বলিয়া থাকিতে পারে না। সে ব্যক্তি সত্যই মহৎ না হইলেও বড় লোকের কথার সমর্থন করে। আবার যখন অন্নদিন পরে সেই ব্যক্তিকে বড় লোকেরা জুড় বলিয়া ঘোষণা করে, তখন সেই সব লোকে তাহাকে জুড় বলিতে থিমা বোধ করে না। আমাদের জাতির অবস্থা ঠিক তাহাই হইয়াছে। আমাদের সঞ্চল মনোবীর্ষদেরই বর্তমান যুগের বড়জাতির নিকট মহত্বের চাপরাশি আনিতে হয়। ইহাতে আমরা মহত্বের মহিমা-বোধের পরিচয় না পিয়া আমাদের জুড়কে উজ্জলভাবে হুটাইয়া তুলি; যে ব্যক্তি মহিমার উপাসনা করিয়া মহৎ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মহত্বের মহিমা



বর্ষার উপলক্ষি করিতে পারে। স্বামীজী আর্থারের মহিমার সম্যক অন্বেষণ করিয়াছিলেন এবং স্বল্প স্বজাতর নিকট সে মহিমার পরিচয় না দিয়া আগ্রহ ও প্রাপন্য পাশ্চাত্য জাতির নিকট তাহা জানাইবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের ধর্মমতাদেশে বিচারের দ্বারা তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন

কেহ কেহ কুদের মত বড়লোকের কথায় যায় দিরা তাহারা সামান্য সংগৃহীত করিয়াছিল, অবিকার্যই বস-যোরে অথবা নেশার ঘোরে সম্মিমার আশ্রয় করিতেছিল। স্বামীজী আমাদের কুসৃতায় দৃষ্টি হইয়াছিলেন—আমাদের মততার মধ্যস্থিত বেদনা অন্বেষণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের উপাস্য মহিমা দি, কোথায় পাইয়াছিলেন এবং



স্বামী বিবেকানন্দ

তাহারা যে মহিমার উপাহক সেই অশ্রুজিহ্ন বড় উচ্চে এই মহিমা স্থাপিত। তাহারা এই মহামহিমাজ্ঞানের পরীকার জন্ত অশ্রুজনীয় পার্থিব সম্পদ তাহারা পরানত হইয়াছিল কিন্তু তাহারা তাগের আসন টলাইতে পারে না—তাহারা আরাধ্য মহামহিমাকে অন্বেষণ রাখিয়া তিনি আমাদের মধ্যে কিরিতা আসিয়াছিলেন।

কিভাবে তাহা পাওয়া যায় তাহা জানাইবার জন্ত বহুপরীক্ষার হইলেন। তিনি নিজে মহান, হইয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি সকলকে মহৎ করিয়া ভূমিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই পদার্থেই তাহারা প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ পাইয়াছিল। "ভায়েতে জগৎজুড়ে সমসার মকরকরাৎ মতিমহাভবভাবান অমৃতমুখ্যতে বলা।" মকরাদি গ্রন্থসমূহ সমসার সাগর হইতে অগাধ

বাসীকে উদ্ধার করিবার জন্ত মহাভবভবদিশের মত হইয়া থাকে, তাহাতেই তাহাদের মহত প্রচারিত হয়। স্বামীজী পাশ্চাত্য-জাতির নিকট তাহাদের নিজেদের বা কোন এক জন বিবেকানন্দের পরিচয় দিতে যান নাই। তিনি আর্থারের মহিমার পরিচয় দিতে গিয়াছিলেন। সেই ধর্মের উপাসক জাতি যদি মহত্বের পরিচয় দিতে না পারে, তবে তাহারা গৌরব করা বুঝা। ব্যক্তি বিশেষের মহত্ব দিয়া জাতীয় ধর্মের গরিমা প্রকাশ পায় না। তাই তিনি কত শত লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ গড়িতে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

তাহার উপাস্য মহিমাকে চেনেন কি?—তাঁহা আশ্চর্য। আশা তো সকলের আছে; তাহারা শক্তির বোধ করজনের আছে? আশ্চর্য, কুজর আশ্বাস নিরাশ্রয়! আমরা সর্বদা অন্বেষণ করি। আশ্বাস বাণ কর্তৃক গৃহ হ'ল সেই হেঁদা আশ্বাসকে ইচ্ছামার হত্যা করিতে পারে। উৎকলে, বিদ্য-প্রয়াগে, শ্রদ্ধাঘাতে, আগুনে পোড়াইয়া অথবা জলে ডুবাইয়া তাহাকে হত্যা করা যায় কিংবা কাততায়ীর আঘাতেও নিহত করা যায়; অথচ বাঁহারা আশ্বাসকি অবগত আছেন তাঁহারা বলেন, আশ্বাস অমৃৎ হইয়াও অধিল বিশ্বের আশ্রয়। তিনি আশ্বাস, অশ্রুজ, অশোমা—তিনি অমৃত-সকল। এইরূপ শুনা যায়, ইহার জান তো কখন হয় না। এইরূপ জ্ঞান থাকিলে আমাদের মধ্যে নিয়ত আশ্বহত্যার প্রবৃত্তি দেখা যাইত না।

তাহার এজ্ঞান কিরূপে আসিয়াছিল? একজন নিরীহ নিরক্ষর পাণ্ডা-প্রতিমার উপাসক ব্রাহ্মণের নিকট তিনি আশ্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহা বুঝ বিচিত্র কথা এবং আরও অমিতব্যয় বিশ্বরক্ষক যে, এই ব্রাহ্মণ আমাদের ভগবান রামকৃষ্ণদেব। তখন আমাদের ভগবান ছিলেন পুজারী ব্রাহ্মণ, আর স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন নরেন্দ্রনাথ মহিমার উপাসক, কুটাত্মিক এক দৃষ্ট যুবক। তিনি একদিন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে ঠাকুর, তুমি কি সকল মহিমার আকর পদার্থকে দেখিয়াছ?' ব্রাহ্মণ হত লোকের সাক্ষাতে জ্ঞান-বদনে বলিলেন, 'যেমন তোমাকে দেখিছি এবং ইহা অপেক্ষা আরও উজ্জ্বলতর।'

যুবক জিজ্ঞাসা করিল—'তিনি কে?'

ঠাকুর উত্তর দিলেন—'তিনি আমার মা।' যুবক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তিনি কোথায়?' ঠাকুর বলিলেন—'তিনি ঐ মন্দিরে আছেন।'

স্বাক্ষরগের অনেকই এতদূর মিথ্যা কথায় বিস্মিত হইলেন ও ভাবিলেন এ নিশ্চয় পাগল। বাঁহারা ঠাকুরকে মিথ্যাবাদী বা পাগল সিদ্ধান্ত বরীয়া ব্যাখ্যা পান, তাঁহারা ঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব দূর করিবার জন্ত মনে মনে মা'র নাম জপ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রের ঠাকুরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি ঠাকুরকে মিথ্যাবাদী বা পাগল মনে করিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন—'চল দেখি তোমার মা কেমন মহিমময়ী দেখিয়া আসি।' এই বলিয়া তিনি মন্দিরের দিকে গািবিত হইলেন। নরেন্দ্র মা'র মূর্তি দেখিয়া বলিলেন—'এই তোমার মা এ তো পাণ্ডারী?' ঠাকুর কান্দিয়া ফেলিলেন। 'এ্যা, তুই আমার মা'কে পাণ্ডারী বলিল—'মা যে আমার সিস্টারী, মা তুমি বল মা নরেন্দ্রকে আমি কেমন করে বুঝা।'

মা'র সঘন নিঃশ্বাসবহিতে লাগিল, নরেন্দ্র মুগ্ধিত হইলেন। তারপর নরেন্দ্রের চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি ঠাকুরের ত্রীচরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, 'গুরুদেব আপনাদি রূপায় আমার অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, আপনাদি রূপায় আমি জগৎজননীকে চিনিতে পারিয়াছি।'

অপূর্ণ দীক্ষা—পরম আশ্রয়—রমণীয় ইহার সন্ধান। গুরু যে জ্ঞান দিতেছিলেন তাহারা আর ভিত্তীয় ভাষা নাই। তাহাদের প্রতীক চিত্র অথবা ভাষা, জ্ঞানের প্রতীক উপাসনা, প্রেমের প্রতীক আচরণ। ভাষা না থাকিলে ভাবকে কিরূপ বুঝা যাইবে? অন্ধরণের একটা চিহ্ন বা শিগ্ন থাকে চাই জ্ঞানের স্বরূপ জানাইতে হইলে উপাসনা ব্যতীত অজ কি উপায় আছে? প্রেমিকের প্রেমের নিয়ন্ত্রণ তাহারা কণ্ড ছাড়া কিছু, কি হইতে পারে? কিন্তু ভাষা ভাষা নাহে, উপাসনা জ্ঞান নাহে, কণ্ড কিম্বদন্ত নাহে। 'যে ইহা বৃত্তিতে পারে না সে নিত্য ঠিকিয়া থাকে। জ্ঞাত্যচোরের দ্বিষ্ট কথায় সাধু বা বন্ধুর ভ্রম হয়। তাহার উপাসনা দেখিয়া মতের মোহান্তকে জানী বরীয়া ভ্রম হয়। কাতর আচরণ দেখিয়া লম্পটকে প্রেমিক বলিয়া মনে করে; কিন্তু উপায়ন্তর



নাই—বাহ্য প্রতীক দিয়াই অন্তরের ভাবকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

নরেন্দ্রের প্রথম প্রশ্নের উত্তর 'তুমি' 'তুমি' ইহার অর্থ 'তুমিই সেই' নহে—'তবু তুমি' 'তুমি'। তাহাতে তুমি আছে। তাই ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—'তোমাকে যেমন দেখছি এবং ইহা হইতেও উল্লসিত'। ইহার মর্ম তোমার মধ্য দিয়া তাহার স্বরূপ সম্যক দেখিতে পাইতেছি। হইতেও ভাস্ত শিবা প্রবৃত্ত হইলেন না। তখন গুরু তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন 'তিনি মা'। মাকে যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে না পাই তবে সন্তানকে দেখিলে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। যে দেখিতে জানে সে সন্তানের মধ্যেই মাতৃসম্পদের বিকাশ দেখিতে পায়। তবু নরেন্দ্রের হুল বুজিল না। এইবার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হইল, 'তিনি ঐ মন্দিরে 'আমনি'।' গুরু তাঁহার সমুৎপত্তি মাতৃশ্রুতি মন্দিরের নির্দেশ করিলেন, আর ভাস্ত নরেন্দ্রনাথ মহাবীর চিত্ত মন্দিরে মাকে দেখিতে ছুটিলেন। সেইখানে তো পাচপ-প্রতিমা আছে। নরেন্দ্র তাহাই দেখিলেন। এবার তাঁহার চতুর্থ প্রশ্ন তত্ত্বজ্ঞানের আকার ধারণ করিল। বাস্তুত্বজ্ঞান আচরণে গুরু বিবরণ হইলেন, বলিলেন—'মা যে আমার চিত্ত' তাহাকে পাখাণী বলি'। তাঁহার ভাষা যোগাইল না, বুক কাঁটা কাঁদা আসিল। তিনি মা'র উপর কুখাইবার ভাব দিলেন, কারণ বাস্কোর ধারা কুখাইবার চরণ হইয়াছিল।

গুরু অশ্রুতে শিষ্যের অহঙ্কারের মলিনতা দোহ হইয়া গেল। এই অহঙ্কারটা খনন ভাঙে তখন মাহাত্ম্য চেতনা হারায়। জীবন থাকিতে নিজের অর্থ সত্তার লয় করা কি স্বল্প ব্যাপার! নরেন্দ্রনাথ বিধমানবের মধ্যে বিশ্বজননী বাস্তুপ্রকাশ তনুতে পায়িয়াছিলেন—তাঁহার অঙ্গদর্শন হইয়াছিল। তিনি পাখাণীকে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম করেন নাই; তাহা করিলে তাহার পরবর্তী কার্যকলাপ ভিন্ন প্রকার হইত। তিনি বংশিত্ত জীবনটা প্রতিমার পূজার কাটাঠেন।

সেইদিন মর্ত্যে যে মথযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কখনো ঘটে। সন্মানের সন্ততি সিক্তির মহাশিল্প মথ্যচিত্ত হইয়াছিল। শিষ্য গুরুর মধ্যে স্তম্ভিত মানদানকে প্রত্যক্ষ

করিলেন; ফলে তাঁহার সকল অভিমান 'র হইয়া জীবন ধন হইল। গুরু-শিষ্যের মধ্যে চির-প্রাণিত সিদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া বস্তু হইলেন। বহুকাল পরস্পর পরস্পরকে খুঁজিয়া বেড়াইতে ছিলেন। আজ মিলিত হইয়া উভয়েই ধন হইলেন—শিষ্যের মধ্যে গুরু সমাধিত হইলেন। সমাধিতে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জীবন্তস্মৃতি স্বামী বিবেকানন্দ। 'আচার্য-পূর্ণকল্পে অন্তঃকরণ উত্তরকল্পে বিভাগিক; প্রবন্ধন সন্ধান'।' যে বিভা শিষ্যের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছিল, বাহার মধ্য দিয়া গুরু অন্তঃকরণের মধ্যে অক্ষুপ্রতি ধন সেই আত্মবিভার প্রতীক মাতৃশ্রুতি বিধান ছিল। 'সাধকানাং হিতার্থায় একগো রূপকল'। বিশ্ববিভার অনন্ত প্রতীক। ধারমান সাধকের অন্তরে একগোবোদের উৎকর্ষের জন্ম তাহার সমুদ্রে প্রতীক স্থাপিত করা হয়। শুধু প্রতীকের উপাসনার সিদ্ধিলাভ হয় না। প্রতীক থাকে জানার তাহাই ধ্যান, ধ্যান ও উপাসনা করিতে হইবে। রামকৃষ্ণদেব সকল ধর্মের প্রতীক অংশধন করিয়া উপাসনার দ্বারা এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আমাদের মাতৃশ্রুতি বিশ্বজননীর প্রতীক।

যে শক্তি এই বিশ্বরূপকে পরিচালিত করিতেছে, তাহাকে কি আমরা দেখিতে পাই? তাহার নিয়ম কি লঙ্ঘন করিত সমর্থ? সেই পাখাণ্ডম নিয়ম নিয়মী অদৃশ্য শক্তিকে যদি কোন মূর্তি দিয়া জানাইতে হয়, তবে ক্রুপ পাখাণ্ডমী মূর্তি তাহার যোগ্য প্রতীক নহে কি? শক্তির কাণ্ডী শক্তির পরিচায়ক। কার্যমাজেই হস্ত-সাপেক্ষ। স্মৃতি-হিত-লয় ধর্মসংরক্ষণ বাহার কর্ম সেই কর্মচতুর্ভুজকে কিরণে দেখাইব? প্রাণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বর হইতে পারে না, প্রাণই অঙ্গের বা উপজতির স্বরূপ। তাই মার এক হস্তে বর-মুদ্রা। হিতই আমাদের মুক্তাভর হইতে রক্ষা করে; মাতার দ্বিতীয় অভয়মুদ্রা হিতিকিরণ হইতেক। অক্সিম মুদ্রা অনিবার্য, তাই প্রলাম্বের ধ্বজা তাঁহার তৃতীয় হস্তে এবং বিনষ্ট অধর্মের প্রতীক ছিন্ন দৈত্যশির মাতার চতুর্থ হস্তে স্থাপিত। নিয়ম অদৃশ্য-শক্তির এই ক্রিয়া-চতুর্ভুজের অঙ্গব-কর্তা কে? তাহা কি জড় হইতে পারে? বাহার চেতনা আছে তাহাই এই শক্তির বোধ হয়। প্রাণই সেই চেতনার আধার। 'প্রাণৈশ্চিন্ত্য সর্বমোত্য প্রজানাম' যে প্রাণকে পাইবার

জন্ম সকলজ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচেষ্টা, বাহাকে রক্ষা করিবার জন্ম সকল বিজ্ঞান, সমস্ত নীতি ও ধর্মশাস্ত্রের উপলব্ধি, সেই সমস্তের সর্বকল্যাণনিদান প্রাণের ছবি দেখাইতে হইলে তদবিশেষ্যাত্তিকল্পে মুদ্রায় মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন প্রতীক কি অংশধন করা যায়? জানবস্ত প্রাণবস্ত অনন্ত জীবদ্বয়ই তামাশক্তির কীড়ার সংবেদন বিনা হইতেছে। ধর্মপতিতার বকে জগদ্রাতার নৃত্য তাহারই পরিচয় দিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ গুরুকৃপায় বিদ্যুৎদ্বয় হইয়া প্রাণ-প্রতিমার মধ্য দিয়া বিশ্বজীবের অন্তর্গত বিশ্বজননীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহার লোল রসনার মধ্য দিয়া, ধর্মপ্রতির অনন্ত ক্ষুধা বৃষ্টিতে পারিয়াছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিয়াছিলেন, জগদ্রাতা গলি চান। তাহাই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সিক্তর মধ্যে বাসিবিস্মর মত বিশ্বজীব বিশ্বজননীর বকে থেলা করিতেছে। বিদ্যুর মধ্যস্থিত মাতৃশক্তি স্বমহিমা জানাইবার জন্ম অহঙ্কার দিয়াছেন। যদি মাতার মহাশক্তি পাইতে চাও তবে অহঙ্কারকে বলি দাও। অহঙ্কার যেমন শক্তি দোষক, তেমন ক্ষুদ্রত্বের জনক। শক্তিসিক্তর মধ্যে ভাসমান বিদ্যুতী অহঙ্কার ছাড়িয়া শক্তি হারাইবে না, বরং মহাশক্তির গঠিত নিজেই লাইয়া মহিমাদিত হইবে। তাই স্বামীজী বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন 'ওগো কে কোয়ার মাতৃশক্তি' শক্তির হইয়াছে, আত্মবলি দিয়া মাতার পূজা কর। তাহাতে তোমার শক্তি ক্ষয় হইবে না, তাহাতে তুমি শক্তিময় হইবে। বিশ্বজননী বিশ্ববাসীর মধ্যে আছে, তুমি তাহারেই একজন। তুমি যদি ব্যক্তিরের মূণ অহঙ্কারকে ছাড়িতে পার, তবে কতটুকু তুমি কত বড় হইয়াছ বৃষ্টিতে পারিবে। তোমার বাহা কিছু আছে মাতার চরণে নিবেদন কর। সেই নিবেদনের নির্মল্য সেবা। দরিত্রের সেবা, অজ্ঞানীর সেবা, বাগানের মধ্য দিয়া অঙ্গের ক্ষুধা, শক্তির ক্ষুধা, জ্ঞানের ক্ষুধা জানাইয়া মাতার লোলদর্শন বাহির হইতেছে, জননী সন্মানকে আত্মশ্রদ্ধাশ্রদ্ধা করিয়াছেন, সেই মাতার সন্ধান বলিয়া যদি পরিচয় দিতে চাও, তবে মাতার মত শক্তির মান। দেবে কাহাকে? মা হাজা বিম্ব তো আর কিছু নাই। মাতারই চরণে মাতার দেওয়া সম্পদ নিবেদন করিতে হইবে।

মহাশক্তি হইতে বিন্দু বিন্দু বাহির উদ্ভিত হয়। সেই বিন্দু ভুবন ভুমিমা শেষে সিদ্ধিতেই দ্বিগিয়া আসে। তাহার ভ্রমণপথে মহারসেরই মাধাশ্রা প্রচারিত হয়। বিন্দু যদি চিরদিন বিন্দু থাকিত তবে বিন্দুর মহিমা কি প্রচারিত হইত? তাই বিদ্যুর সঠিত বিন্দু মিলিত হইয়া বরষার বারিধারা স্বরূপ করে। সেই ধারাশ্রুহ মিলিয়া ক্ষুদ্র শ্রোতবৃত্তী হয়। এইরূপ বহু শ্রোতবৃত্তী মিলিয়া নদী, বহু নদী মিলিয়া মহানদী, শেষে সকল মহানদী মহাগির্জিতে আসিয়া মিলিত হয়। প্রত্যেক মিলনেই রসের শক্তি প্রচারিত হয়। মাতৃশক্তির মহিমা যদি দেখাইতে চাও তবে, বিদ্যুর মত মিলিত হও। মাতার মাতার মিলিত হইয়া সমাজ, আর সমাজ মিলিত হইয়া জাতি। জাতি মিলিত হইয়া বিশ্বমানব। সেই বিশ্বমানবের মধ্যে মানবিকতাই মাতার বিগ্রহ। মাতৃশক্তিই আত্মশক্তি। আত্মশক্তির বোধই অহঙ্কার। এই অহঙ্কার না থাকিলে শক্তি চিরদিনই শ্রাণ থাকিত। আত্মশক্তির অহঙ্কার-বশেই সে বসিতে দেখে, ঠাঁড়াইতে দেখে, এক এক পা করিয়া চলিতে দেখে, শেষে সোড়াইতে দেখে। এই অহঙ্কারবশতই সর্ববিধ ঐশ্বর্য উপার্জন করিত সমর্থ হয়। আত্মশক্তির বোধ যে হারাইয়াছে সে মৃত জড়। আত্মতা আছে, জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া 'অমৃতত্ব লাভ করিতে হইলে আত্মশক্তিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাই স্বামীজী উপনিষদের বাণী যোগ্য করা বলিতে, 'উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাণা বরান নিবোধত, নায়ামায়া বসাইনেন লভ্য'। ধীরে ধীরে আত্মশক্তির 'অশীলগনে শক্তিময় হইয়া আত্মায় সমাধিত হইতে হইবে। মাতৃসন্ত অহঙ্কারে শক্তিময় হইয়া পরিশ্রমে যে সেই অহঙ্কারকে মাতার অহঙ্কারে মিশাইতে পারে সেই মহিমান্বিত হয়। বিন্দু হইতে মহাশক্তি পর্যন্ত যে সর্ববিধকে পরিচালিত করিতে পারে সেই রসকণী, আত্মাকে পূর্ণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। 'দেহাভিমানবর্নত: আমাদেব-সর্ববিধকে 'আমরা একহানেই আবদ্ধ করিয়া রাখি। আমরা জানি না কোথা হইতে এই দেহের 'শক্তি পাইয়াছি; আমরা জানি না আমাদের গতি কোথায়।

বিন্দু তাহার মধ্যে, যে আত্মশক্তির অহঙ্কার আছে, তাহা



বিসর্জন দিয়া প্রতিদিন-রাত জীবের শক্তি সৃষ্টি করে। দৈনিক সমাজ শক্তির অভিমানে জীব তাহার অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া দেহীর শক্তি বার্ত্ত করে। আমাদের অন্তরে এইরূপে শক্তির উপায়না চলিতেছে। ১° যখন যে কার্য্যটা করা হয়, অজ্ঞানকে ব্যক্তি তখন তাহার বশবর্তী হয়—বিনের স্বপ্নের জ্ঞান বাসনাশূন্য ও আলস্তপ্রায় হইয়া জীবনের সম্পদ নষ্ট করিতেছে বৃষ্টিতে পারে না, অগ্নিকের স্বপ্নের জ্ঞান শক্তির মূল ক্ষয় করিতেছে ধরিতে পারে না। পরিশেষে শক্তিরহীন হইয়া হাফাকার করিতে থাকে। যে দেহী আত্মশক্তি উপার্জন করিয়াছে, সে তাহার মনস্তর আত্মার উপলব্ধির জ্ঞান অহঙ্কার বিসর্জন দিবে। ইহাতে সমাজ বা জাতির শক্তি সৃষ্টি হইবে। জাতি বিঘ্নমানবের কল্যাণে মহত্তম আত্মার উপলব্ধির জ্ঞান তাহার অহঙ্কার বিসর্জন দিবে। মাতার এই আদেশ অলঙ্ঘ্য। অজ্ঞা করিলে মাতার নির্দম বজ্র তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিবে। আত্মবিশ্বাস-অর্জন ও রক্ষা এইরূপে হয়। ইহাই শক্তি-পূতা, ইহাই তপসা।

ব্রহ্মচর্য্য বিন্দুশক্তি অভিমানে জীবের তপস্যা। সেই তপস্যার দিন ভব জীব বীৰ্য্য লাভ করে। সত্যনিষ্ঠা দৈনিক বীৰ্য্যভিমানে জীবের তপস্যা। সত্যনিষ্ঠাই ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধকে সযত্ন, রাগে, নিগা নৃতন জ্ঞান ও সম্পদ আনয়ন করে। তাহাতে দেহাভিমানে জীব শক্তিমান হয়। আর সেবাই দেহাভিমানে জীবের তপস্যা, দেহী-সন্তান ও পরিজনদের সেবা করিয়া গৃহের শ্রীশক্তি-মাদন করে। গৃহস্থ সেবাধারা বহু গৃহস্থের কল্যাণ-সাধনে সমাজের শক্তি গড়িয়া তুলিবে। সমাজ-জাতির কল্যাণের জ্ঞান সেবাধারায় হইবে। তাহাভেই মহাশক্তির জ্ঞানপ্রদ হইয়া থাকে। এইরূপে আত্মজ্ঞানের প্রসারের সহিত

আত্মশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একই শক্তি সর্বত্র বিরাট করিতেছেন। যদি একের পূজা করিতে চাও, তবে ব্যক্তিগত অহঙ্কার ছাড়িয়া দেশের সেবা কর। দরিদ্রকে ছই মুক্তি চাউল দিলেই সেবার কার্য্য শেষ হইল না, তাহাকে অন্নদান ও ধনদান করিয়া তুলিতে হইবে। দরপাকে রক্ষা করিয়াই কর্তব্য শেষ হইল না, তাহাকে সৎল। করিয়া তুলিতে হইবে। অজ্ঞানীকে ছইটা জ্ঞানের উপদেশ দিয়া শাস্ত হইলে চলিলে না, তাহাকে কন্দী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিঘ্নাত্মকার ইহাই প্রকৃত পূজা, ইহাতে তাহার শক্তির মহিমা প্রচারিত হইবে। বামী বিবেকানন্দ প্রাণেই পূজার আচার ভাবিয়া দিয়া সত্য-পূজা দেখাইবার জ্ঞান নবীন বাঙ্গালীকে সত্য-মন্ত্রনের জ্ঞান অজ্ঞান করিয়াছিলেন, মঠের মহাশয় গড়িবার জ্ঞান নহে। এই-সত্য পূজার মাতা তুমি হইলে শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হইয়া বিশ্ববাসীকে বিশ্বস্ত করিতে পারিবে, ইহাই তিনি কল্পিয়াছিলেন। তিনি জাতিকে, শক্তিমান করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। অজ্ঞানী বালক গৃহের পূজা করিয়া জ্ঞানের পরিমা করে। অশক্ত শক্তিহীন পূজা করিয়া শক্তির পরিমা করে। কিন্তু-শক্তিমান শক্তির পরিমা বোধে এবং তাহার মহিমা দেখাইতে পারে। বামী বিবেকানন্দ যে মহিমার উপাসক ছিলেন, সেই খাখত মহিমাজয়ের মূল—আত্মশক্তির বোধ, ব্রহ্মচর্য্য বাধ্য ও তপস্যা তাহার কাণ্ড, সত্য তাহার শাখা, সেবা তাহার পত্র; আনন্দ তাহার ফল এবং জাতির মহিমা তাহার ফল। যে মহাপুরুষ নবীন বাঙ্গালীর মধ্যে এই মহিমাজয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন তাহার নাম জয়ন্ত হউক।

## ইংলণ্ডের সভ্যতা

শ্রীজীবনকৃষ্ণ গণ

ইংলণ্ডের সভ্যতার আদি প্রবর্তকগণের মধ্যে কে বা কখন অবিস্মৃত হইয়াছিলেন এতদিন তাহা অজ্ঞাত ছিল। উক্ত দেশের প্রাচীন ইতিহাস-লেখকে আমাদের কতকগুলি ভাষিগণকে ধার্য্য আছে; প্রথমতঃ বাহার্য্য জুলিয়ান সিয়ারের আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার্য্য অসত্য ছিলেন; দ্বিতীয়তঃ খৃঃ পূঃ ৫৫ বৎসরের পূর্বে ইংলণ্ডে এমন কোন সভ্যতা ছিল না বাহা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হইতে পারে। একজন সিদ্ধান্ত যে কিংম্যান অন্ডার্স পরিচায়ক তাহা আমার ভাঃ দী. এক. স্মি. ডেক্সটার মহাশয়ের "নিসিগিলিজেন ইন রুটম্, খৃঃ পূঃ ৪০০০" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে বৃষ্টিতে পারিবে। ডেক্সটার মহাশয় পুরাতত্ত্বের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অতঃপর ইংলণ্ডের ইতিহাস খৃঃ পূঃ ৫৫ বৎসর হইতে আরম্ভ না হইয়া আত্মবর্ত্তে, 'মেগালিথ' নির্মাণের মূল অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২০০০ হাজার বৎসর থেকে করিতে হইবে। যে সব উপাদানের দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার সম্পূর্ণরূপে বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। তবে প্রয়োজনীয় কয়েকটা বিষয় এখানে উল্লিখিত হইল। তিনি প্রথমতঃ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ৫৫ অব্দে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা অসত্য ছিলেন। মধ্য ও দক্ষিণ ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি প্রাচীন স্বর্ণ ও রুটির মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে সেগুলি পুরাতত্ত্ববিদদের মতে খৃঃ পূঃ প্রায় একশত বৎসরের, পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। মিনার কার্য্য প্রাচীনকালে ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল। 'বাটারসিয়া'তে প্রাপ্ত একটি কাংড়গুণের ('ব্রন্থ-এব') ঢালের উপর মিনার কার্য্য দৃষ্টিত হয়। ইহা খৃঃ পূঃ ২০০ বৎসরের পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। এমন কি ভাঃ এডারসন বলেন যে, ইংলণ্ডের মিনার কার্য্য এত হৃদয় যে সে গুণের কয়লাদেশে মিনারকার্য্য ইংলণ্ডের

সহিত তুলনা হইতে পারে না। এগুলি উক্ত সভ্যতার নিদর্শন নয় কি? 'গৌন-বিল্ড', 'মাতেরুই' প্রভৃতি স্থানে যে সকল ত্র্য্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রস্তর যুগের শেষভাগে কিংবা কাংড়গুণের প্রথম ভাগের অর্থাৎ খৃঃ পূঃ প্রায় ২০০০ হাজার বৎসরের পুরাতন বলিয়া ঐতিহাসিকেরা ঠিক করিয়াছেন। এ সকল স্থানে অনেক 'মেগালিথ' পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার একটি মানচিত্রে অতি হৃদয়রূপে দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডে যে সকল স্থানে তাম্র, স্বর্ণ, সীসা, জেট, টাল, মুদ্রা পাওয়া যায়, সে সব স্থানগত 'মেগালিথ'-এর আবিষ্কার দেখা যায়। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, বাহার্য্য এই সকল 'মেগালিথ' নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার্য্য এদেশে বাসবা-বাণিজ্য করিতে আসিতেন। এখন তাহার্য্য কৈ? তিনি 'মেগালিথ' কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এবং 'অজ্ঞাত' বিষয় হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাহার্য্য প্রাচীন মিশর হইতে আসিয়া-ছিলেন। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক স্ক্রুয়া ওয়েলস প্রদেশের নৃতত্ত্ববিদদের ফলে একটু মল্লা রঙ, সর্বল চওড়া মাথাবিশিষ্ট লোকের সন্ধান পান। ইহার্য্য সূত্রের ভিত্তিতে বসবাস করে এবং কখন কখন তাহাদের 'মেগালিথ'-এর প্রতি অস্বস্তিক দেখা যায়। ভাঃ স্ক্রুয়া মতে এই চওড়া মাথা-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাচীনকালে বাহার্য্য 'মেগালিথ' নির্মাণ করিতেন তাহাদের ত্র্য্য আছে। আর একজন পণ্ডিত, ভাঃ রেনডেল-হার্লিস লণ্ডনের ওয়াটলিং স্ট্রিটের 'ওয়ার্লিং' কর্ণাটা মিশর-দেশীয় কথ্য বলিষ্ঠ-টিক করিয়াছেন। প্রাচীনকালে ইংলণ্ড দেশে মিশর দেশীয় প্রভাব-সদৃশ অস্বস্তিক, পাঠিক-পাঠিক্য এই গ্রন্থ হইতে অনেক নূতন তথ্য পাইবেন।







শ্রমিক থাকে। ইহাকে পাঁচা বলে; চালকি=ইহাও অনেকটা পাঁচারই মত; ভাড়ানী=যে ক্রীলোক ধান ভাঙ্গিয়া দিয়া কীটিকা নির্মূহ করে।

(৪) রাধাবর ও পাকের সরঞ্জাম :-

হৈলেন=রাধাবর। (হাড়িশালা শব্দ হইতে); তেতেটে=হাড়ি তুলিয়া রাখিবার পাত্র; ভিউরি, চুলো, আখা=উত্থন, চুলা; বাড়া=উত্থল রাখিবার জন্ত ব্যবহৃত বাঁধের চুলা; বাঁড়ি=কোড়; শানকি=মাতার থালা ভাতা=হাড়ি মুছিবার ছাকড়া, পোচ=ঘর গোবর দিবার ছাকড়া। নিকানো=ঘর গোবর দেওয়া। কেটো=লবণ রাখিবার জন্ত ব্যবহৃত কাঠনির্মিত পাত্র। বেলেদন=মুড়ি প্রকৃতি ভাঙ্গিবার জন্য যে মৃৎপাত্রের বাঁধি রাখা হয়। পাটা=শিলা; তলো=মাতার বড় হাড়ি; পাভিল=মাতারী নাইজের মাতার হাড়ি; বলাকানো=চিড়া প্রস্তুত করিবার পূর্বে ধান বিশেষ প্রণালীতে সিদ্ধ করা; ভাবদেওয়া=কোনও জিনিস রাখিবার পূর্বে অতিরিক্ত একবার সিদ্ধ করিয়া লওয়া; উত্তে দেওয়া=জলে ভিজা কাটানি শুকাইবার জন্ত উনানের উপর রাখি করিয়া রাখা।

গাভাড়ির নাম :-

পাটা=অম্বল। হুতুম=মুড়ি; ভাঙ্গা=ভালনা; জাউ=পালাবার বিশেষ; গুড় প্রভি=মাছের বাটা চক্কড়।

(পিঠক)

পাকান=মাগপো গাভীর এক প্রকার পিঠক। তক্তি=মুগের ডাল হইতে প্রস্তুত হয়; আসকে=শুষ্ক চাউলের গুড়ার প্রস্তুত হয়।

সরোপিঠে; পাটা সাপটা; গুড়টিকরী; সর্ক চাকনী। ছাই বা ছেঁই=পিঠকের মধ্যে পুই দিবার জন্ত যে নারিকেল বাটা মিশ্রিত করি ব্যবহৃত হয়।

গৃহস্থালীর জব্য :-

টেবী, কুপা=কিরোসিন=ল্যাম্প; গাছা, দেলকো=দীপপানি; খেলই=মস্তথানী; কাঁকুই=চিরুণী(ককতিকা) শব্দ হইতে)। পাট টাকুর=পাটের দড়ি কাটিবার তক্তা; বাটা=মৃৎপাত্র বিশেষ; পালি=ধান মাগিবার জন্ত ব্যবহৃত বেত্র নির্মিত পাত্র; টুবি, বুচি=চিড়া মুড়ি বাইবার জন্ত

ব্যবহৃত বেত্রনির্মিত পাত্র; আবলা=ধান মাগিবার জন্ত ব্যবহৃত বেত্র নির্মিত পাত্র বিশেষ; ছুড়াইন=চাবি; কোটা নগা, হলকা=আকুদী; কোঠা=পাট।

খেজুর গাছ ও খেজুর গুড়-সংক্রান্ত :-

নলি=যে ককির নল দ্বারা খেজুর গাছ হইতে রস গড়ে। টিলে, গাছান, ঘপা=ভাও, ভাঁড়। ওলা=বিনামনের খেজুর রস; বাইন=যে উনানে খেজুর রস আশানো হয়; জালা=যে মৃৎপাত্রের করিয়া রস জাল দেওয়া হয়। ওড়=নারিকেল মালা দ্বারা নির্মিত যে গুড় নাড়িবার হাতা ব্যবহৃত হয়; কান্নাচ=ভাওর সহিত যে দড়ি সংলগ্ন থাকে; নলেন=স্বগন্ধ-যুক্ত গুড়; কুলাজ=গাছে উঠিবার সময় কোমরে যে চামড়া জড়ানো থাকে।

গরু-বিষয়ক :-

পলোটা=যে গাভী প্রথম প্রসব করিবে; কেলেন=যে গাভী প্রতিবৎসর গর্ভবতী হয় না; শড়কা=মৃত অবস্থার প্রহৃত গোবৎস। শুপাইল=মেষের অগ্রভাগের লোমরাশি। জাওল, শানি=বইল, বিচালী ও জল দিয়া একত্র মাখানো গরুর খাবার। নেদে, টাড়ী=যে মৃৎপাত্রের গরুর খাবার দেওয়া হয়। টাট=খোয়াড়। পিরাগা=রাধা রূপের গরু। হোলা=দাদা রূপের গরু; কুমলো=বাল্লু=কতি বা পালান=গাভীর গুন; শুভাগি=গরু মাটিতে যে লাগি মারে; ছাঁদ=সোহন করিবার সময় যে দড়ি দ্বারা গাভীর পা বাধা হয়; হুকা=দ্রুত বাহির করিবার প্রক্রিয়া বিশেষ; ফটক=দ্রুত গাভীকে সোহন করিবার ফটক। গাভ=গর্ভবতী; শ্বাট=গাভীর গুহদেশ; পাল পাওরা=বাঁড়ের সহিত গাভীর সন্ধিহন হওয়া; হেতো=যে গাভীর বৎস নাই অথচ কৃত্রিম উপায়ে দ্রুত সোহন করা হয়।

দুহু, গোময় ও গোমূত্র-সংক্রান্ত :-

সাজা=দধায়; ঘড়েন=দধিময়ন দগু। ভোগ=দুহুদের নবনীত্যাশ; ঘাসি=ঘুটে। নেদি=ঘুটে জাতীয়। নলী=গোবর; খেড়=পাতলা গোবর। ইহা গরুর অস্থ-তার চিহ্ন।

লাঙ্গলের সরঞ্জাম :-

মুড়ো=লাঙ্গলের ফলা বাদে যে বিভূত্বাকার কাঠখণ্ড থাকে; ইশ=লাঙ্গলের গায়ে সংলগ্ন দীর্ঘ কাঠখণ্ড;

জোয়াল=গরুর কাঁধে বাহা থাকে; নিজেন=লাঙ্গলের মূট; আউত=জুয়ালের সন্ধিত সংলগ্ন যে দড়ি গরুর গলায় পরাইয়া দেওয়া হয়; শোখালী=জুয়ালের সহিত যে ছুটী ধারণে খুটা থাকে।

হল-চালনার সময় ব্যবহৃত শব্দ :-

ভোইর ভর=গরুকে ঘুরিতে বলার সঙ্কেত। ইহার অর্থ “ঘুরিয়া যাও”। তেঁকো ভোইর=যেখানে আছে ঠিক সেইখান হইতে ঘুরিতে বলার সঙ্কেত; পারতলে, পাবতলে=একদিকের পক্ষ সাহায্য হইতেছে তাই নির্দিষ্ট স্থানে লাগল লাগিতকত নক, এজন্ত গরুকে অভিগমিত স্থান দিয়া হাইতে সঙ্কেত করা।

গো-শকটের সরঞ্জাম :-

ঘুড়ি=ঝুরার উপর যে কাঠখণ্ড থাকে। পুটে=চাকার পরিমিতি যে সকল ছোট ছোট কাঠখণ্ড সংলগ্ন থাকে। উলো=চাকার ছিদ্রে সংলগ্ন নৌহ বলয়। ছিমলে=জুয়ালের প্রান্তভাগের কাঠি ছুটী। হুলি=যে ডাঙ্গা গুলিল দ্বারা গাড়ীর বাঁশ ছুটী বোঁড়া হয় এবং বাহার উপর বসিবার চটা বিহান হয়। ফড় গো শকটের বাঁশ ছুটী। কলিকাভা=কাঠের ফড় ব্যবহার করিতে দেখা যায়। বেগবিল=ঝুরার প্রান্তে যে বিল দ্বারা চাকা আটকান থাকে। বুট=যে দড়ি দ্বারা জোয়াল বাধা হয়। দাবা=অত্যধিক ভারে যে গাড়ীর জুয়াল গরুর কাঁধে পুতিয়া পড়িতেছে। উলা পিছনে বেশী ভার হওয়ার গাড়ী উলটাইয়া হাইবার মত অবস্থা।

কুবক ও কুমিৎসংক্রান্ত :-

পানাই, বাধা=হল-চালনার সময় ব্যবহৃত কুবকের পাদকা, মাগাইল=কুবকের মাথার টোকা, নাপ্তা=প্রান্তকালীন আহা, হোহেওয়া=ভূমিতে বীজ-বপনের উপযোগী হওয়া, জাওলা=ধানের ছোট ছোট চারা। বানন=বীজ, মাতন হালা=কুবক ভাগার অগ্রভাগে প্রতিক্রিয়াশীল একদল ভোজ দিয়া তাহাদের দ্বারা জমি চমাইয়া লয়। ইহাকে মাতন হালা বলে। হাল-মাড়া=জমিতে কাদাল মায়া। গামার, খোলা=ধান মাড়িবার স্থান; গাতা=

কুবকগণ কার্যের সুবিধাবশত; অনেক সময় অনেকে একত্র মিলিয়া পালাক্রমে কার্য করে, ইহাকে ‘গাতা’ করা বলে। ছাটা=ধান মিড়াইবার সময় পালা করিয়া কাজ করাকে ছাটা বলে। কাঁকড়ী করা=বুটী অভাবে একরূপ কৃত্রিম উপায়ে ধানের বীজ বপন করা। পাইট=মজুর, দুনিয়=জন, ডাখা=হঁকা, বৃদা=তাখাক বাইবার জন্ত যে বিচালীর মশালে আগুন ধরাইয়া রাখা হয়; বাধারী=পাটন, বাইল=ধাত-মজুরী, গয়াল=ধানের ক্ষেতে উৎপন্ন আগাছা, বিশেষ; বতোর=শলা প্রাপ্তির সময়, বতোর ছুটী, যথা আহুনে বতোর ও আউলে বতোর। আউন=আঙু ধাত, আমন=দ্রুমন্তিক ধাত, বাহুই দেওয়া=ভূমিতে মই দেওয়া। মলোন-মলা=ধান মাড়াই করা; কাদুলু=ধান মাড়িবার সময় যে লৌহ ফলকযুক্ত বংশদণ্ড দ্বারা ধান নাড়িয়া দেওয়া হয়; পাতকুটী করা=ধান-মাড়া শেষ হইলে বড় ছাতিয়া ফেলা।

দান্দর নাম :-

মানিকমদো, বেরতকলা, কুমরো=হলে মাদল, পাঞ্জরা, লক্ষীকাজল, মেঘী, কেলো, সূর্য্যমণি, লক্ষ্মাই, আগুন-বাণ, মদল, (মহিষাদল) বাণমবিছে, গন্ধমুরারী, মোহাভটা, নোয়াশাল, কইজুরী, খেজুর ছড়া, কৈকো, কাঁচ কলম, বিবীতি, ডহর নাগ্রা, রোয়াকেলে, স্বন্দর শাল, মেঘনাল, ওড় কহু, গজালগুডো, লখনা, রাজা মণ্ডল, কালা মানিক, বাঁকুই, মেরফল, বাহাই ঘুরণ, কালা বররা, লীখে, রায়দা।

ধানের মাপ :-

আড়ি, শলি, বিশা, পোটা

ধান রাখিবার স্থান :-

গোলা=ধানের গোলা; আউড়ি=ঘরের মধ্যে মাচা ধানিয়া তাহার উপর চাটাই দ্বারা এক প্রকার মরাই তৈয়ারী করা হয়। ইহাকে ‘আউড়ি’ বলে; ভোল=বাঁশ হইতে নির্মিত ধাত রক্ষার পাত্র বিশেষ।

গৃহস্থালি পশুদি :-

বকরী=ছাগল, মেকুর=বিড়াল; খেড়=উদ-



বিভাগ; মাণ্ডার মঞ্চমার অনেক বানে জেলেরা মাছ ভাড়াইয়া জেলের মধ্যে আনিয়া বিহার জন্য উলবিড়াল শূন্যি থাকে।

বোড়ার বিভিন্ন প্রকার চলন :-

ধাপ। শোলক। কমদ। ছারতোক।

মাছ ধরবার যন্ত্রাদি :-

রায়ানী (বংশ-নির্মিত যন্ত্র); ছুয়াড়ী; বাড়; আটোল; বেগে; পোলো; স্বাকরি; পাউর; জোঁদরা; কোঁচ; চবাক; আতোর; ছুত।

মাছমুখার নাম :-

ঠেলাগালি; কইজালি; ফেপগা; ধরাঙ্গাল; বোশালি জাল; চটকাজাল; কচাল জাল; পাইত জাল;

মাছের মানের কয়েকটা বিশিষ্ট শব্দ :-

নওলা—বোহিত মন্য,নমনা—কাঁটাল কুশি, জিয়ল—সিদি মাছ, টাকি—শুশল জাতীয় একপ্রকার মন্য; বিয়া—এক জাতীয় ছোট মাছ; গরগতে—এক জাতীয় ছোট মাছ, টাটকিনী এক জাতীয় অতি সুবাস ছোট মাছ; রামেক—ইহারাও টাটকিনী জাতীয়; গরাজ—ইহা শুশল জাতীয় এক প্রকার মন্য। ইহা ব্রাহ্মণদিগের অস্বাদ্য।

কতিপয় সর্পের নাম :-

চ্যালা—এক জাতীয় কুড়াকার সর্প। ইহার বিষদর নহে; বরচিত—এ জাতীয়; লাইডগা—এ জাতীয়; শাখাবাটা—ইহার কুড়াকার হইবেও অত্যন্ত বিষদর। কানল—ইহার গড়ের ঢালে থাকিতে খুব ভালবাসে। বোড়া—এই জাতীয় সর্প খুব বৃদ্ধাকার। মশেরে জেলার নলডালা জকলে এক সময়ে এই জাতীয় সর্পের প্রাচুর্য ছিল শুনা যায়। বোড়া—এই জাতীয় সর্প বিষধীনা। ইহার জলে সাপ করে। পুং মাপ—ইহাদের আকার খটকোর মত।

বৃত্তিক

তোলা—বিহা।

কয়েকটা পাখীর নাম :-

ডাকু—আকারে খুব বড় নহে। ইহার উত্তরচর পাখী,

কৌপী—কুড়াকার উত্তর এক জাতীয় পাখী, কানাবোচা—এক জাতীয় কুড়াকার পাখী, কিলে—কুড়াকার কুক-বর্ষ পাখী, কাণাকুয়া—ইহার বোনের মধ্যে থাকিতে ভালবাসে, মমকুলি—কাল পেঁচা; কুয়ে—বাল্ল পক্ষী, বিলেহীস—শিকারের পক্ষে উৎকৃষ্ট পাখী।

বাগিচা সংক্রান্ত :-

অড়,বেড়—বাগীচা বা শস্যক্ষেত্র যে বেড়া দ্বারা বেষ্টিত হয়। খোপা—বেড়া বিহিন্যর জন্য যে বাঁশ পোতা হয়; বাতা—যে চটার দ্বারা বেড়া বাঁধা হয়; জাকসী—বেড়া বিহিন্যর জন্য ব্যবহৃত বাঁশের চটা; পোল—আমবাগান;

নারিকেল ও নারিকেল গাছ :-

মুচি—নারিকেল ফলের শৈশব অবস্থার নাম, বেগো—নারিকেলের ডাল; কৌপল—নারিকেলের ভিতর জল জমিয়া যে শীস হয়। নেওরাপাতি—অতি সামান্য শীসকৃত ডাল।

কলাগাছ :-

এটে—কলাগাছের গোড়; বোপা—কলাগাছের চারা। আবাদ ও আকারানুসারে কলাগাছের নাম :- শইলে—নয়া ধরণের আ। কাগমেরী—বৃক্ষেরা আম; জোয়ানে—যে আমের মধ্যে জোয়ানের মত গন্ধ আছে।

কাঁঠাল :-

পাতমুচি—অতি শৈশব অবস্থার কাঁঠাল ফল; ইচোড়—তরকারী বাহির উপকৃত কাঁচা কাঁঠাল; কলা, কোল—কাঁঠালের প্রত্যেকটা ‘শীস’; খাজা—রসহীন কাঁঠাল; তুয়ে কাঁঠাল—যে কাঁঠালের মধ্যে শীসের ভাগ কম; তুড়কা—কাঁঠালের খোলা।

শৈশব জাতীয় :-

নেকুড়—পাখিফল; দাম—এক জাতীয় শৈশব; ধাপ—জমাত বাধা খেওলা; পাটা খেওলা—এই খেওলা চিনি প্রস্তুত করিবার সময় গুড়ের উপর দেওয়া হয়। মনসা কচুড়ী—কচুরী পান্না; ইহার মধ্য হইতে অনেক সময় সাপ বাহির হইতে দেখা যায়, এজন্য ইহাকে মনসা কচুড়ী বলে।

রাজমিষি, অপর ১৪ ও দাগানের মাল মন্য :-

উবা—মালি কাশ করিবার সময় যে কাঠ বা শোহমসক দ্বারা মাজা হয়, ডগনা—ভাড়া বাধিবার সময় যে সকল ছোট ছোট বাঁশের খণ্ড দিয়া তাহার পর মাচা দেওয়া হয়, তাগাড়—যে গর্তে চূণ সুরকি ইত্যাদি মাখা হয়, বাঁশলে—ইট কাটিবার অঙ্গ; আঁজি বোর, দাগাবাঙ্গি—গাধারি ইটের মুখে চূণবালি দেওয়া, কাগা—সুরকি মাণিবার পাত্র, রান্ধা বা রেঞ্জ—মাহার সুরকি ভাঙ্গে।

ক্লবক ও পল্লী বাসীদিগের উদ্ভব ও পার্শ্বপাতি :-

(ক্লবক দিগের দ্বীতি :-)

বারুঙ্গ—নিড়ানের ক্ষেত্রে এই গান গায়িয়া থাকে; পুলাসারী—অনেকটা তরঙ্গার মত, হোইল-বোইল—পৌষ মাসে রাখাল বালকরা গান গায়িয়া গিরগী করিবার জন্য স্বপ্ন-এগ্রহ করে, নলে—অন্যুষ্টি উপস্থিত হইলে মুসল-মান্দা এই গান গায়িয়া খোদায় নিকট জল প্রার্থনা করে; বাপান—মনসা দেবীর মাধ্যম্য-বিষয়ক গীত। ঢাপান—কবি ভরতা প্রকৃতি গানে এক পক্ষ অপর পক্ষকে যে প্রশ্ন করে; ছড়াবার—কবি গানের প্রধান গায়ক; বাগাণি—গাধার পুজার সময় ভক্তরা যে হরপার্বতী-বিষয়ক গান গায়িয়া স্বপ্ন-এগ্রহ করে; দোয়ার—প্রধান গায়ক গায়িয়া দিলে পিছনে মাহার একজন গায়; গাইন—প্রাধান্য গায়ক।

বাণ্য যন্ত্রাদি-বিষয়ক :-

বাইন—বাদক; তালো—ঢাক, ঢোল প্রকৃতির ছাউনী; চাট—ঢাক বাজাইবার কাঠ; ঢাকী—ঢাক বাদক; কাশিবার—কাশিয়ারক; ঢুলি—ঢোলবাদক। তুড়—যে ব্যক্তি জয়চাক কাঁধে করিয়া রাখে; তুড়দার—যে ব্যক্তি জয়চাক বাজায়।

পার্বণিদি—তোড়—ফালগুন মাসের জ্যৈষ্ঠদশ দিনে রাখাগদিগের পার্বণ, থো কাণ্ডনে—স্বাদন সংক্রান্তির দিনে রাখাল দিগের পার্বণ; গারগী—আমিন সংক্রান্তির দিনে ক্লবক এবং পল্লীবাসীদিগের পার্বণ।

পল্লীতে প্রচলিত কীড়া কৌতুক :-

খোস্তাপুনি—বালক দিগের কীড়া বিশেষ; গাদন—কীড়া বিশেষ; গোলাছুট—কপাতি; ডুকুড়ি—হাড়ডুড; মাশা—কুণ্ডি; ভাঙগুণি—ভাঙগুণি।

বাগিকাগণ-কর্তৃক অস্থিত প্রতীতি :-

নবমুচী—এই ব্রত চৈত্র মাসে করিতে হয়। মমপুত্র—কর্তিক মাসে; গোলাস—বৈশাখ মাসে; সাকুই—জ্যৈষ্ঠ মাসে; এহো মজান্তি; ধন গছানে; পুনি পুসর।

কতকগুলি প্রচলিত গাথাগালি :-

খোলা ঝাড়া; হাড় পেকে; ঘর কুটনা; অনেকপেয়ে; ডেকরা; ভরাপরা; থাইকুড়ী; থাখা বাজানী; এতিব-বোধিতথাপা; ডুকনা; টোটা; ভাননী; টেকারী; পোতা মজানী; তলোহুবা; শূরের ভাতারী।

গ্রামের নামের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট শব্দ :-

কামতা; গাম; ওরাডিয়া; ভানডা; ভাটুই; নওদাপাড়া; কটেতলা, আরাগপুর, জাগলা; হুদড়া; বেতাই; গিলে পোল; বোড়াই; সগুনা; কামতা; জিলা; বোইরাগি; জিরনা; তুঁতি; পরটি; আশমতপুর; শাকটিয়া; ইকুড়ে; চুটগিয়া; কাদিরকোল; কুয়েগাছা; আবাইপুর।

গিরার নাম :-

বধিগিরে; কাঁদাল গিরে; মুট-গিরে; মরা-গিরে। কাঁস গিরে; খেরা টসি গিরে; কানাত গিরে।

নোকা ও তাহার সরঞ্জাম :-

বাদাম—পাল, থপা;—হরিনামের তরি হুল্ল কাণ্ডারী, বাদানামের বাদাম তুলে দাড়াল নিতাই হাল-ধরে; বটো—বহিড়; চইড়লাগি—যে বাঁশ দিয়া নোকা বাধে; গধুই—নোকার মাথা; আতাগি—নোকার মাচাতে যে সকল বাঁশ বা কাঠ গুণ থাকে; ভাঘের নোকা—প্রতিমা বনন করিবার জন্য জোড়া করিয়া বাঁধা নোকা; হেঁ—নোকার উপরের আচ্ছাদন; বাইচ—নোকা দোড়; মালো—মালা।

পাকী ও তাহার সরঞ্জাম :-

বাড়; বাট; আড়া; জাগী; কাহার—বেহারা; শূয়ারী—আরোহী।

প্রতিমা ও প্রতিমা গঠন সংক্রান্ত :-

দেউরী, কদমীকার—প্রতিমা গঠনকারী; চিয়াড়ে—



প্রতিমা সাফ করিবার চটা; ঘামদেওয়া—রাং করিবার পর গাখন তৈল দ্বারা প্রতিমা ধুমানো; পুতলে=মুষ্টি; লেখা=প্রতিমা চিত্রকরা।

কয়েকটা গহনার নাম :-

তাবিজ; বশম; হাফলি; পায়জোড়; বেকী; হুল; নলোচ (নোলক); কামরাশা মাহুলি; বাহু; মুকম্বিক; বোর; বাহু; দায়মন; পাঙলি; নোতাগি; বায়লা (বালা)।

অ

অকাতা=নির্মম; অকট্র=অকপে; অয়ে=ঐ দিকে।

জা

আওলা=মেঘবণ্ড; আড়া=নেলা; আক্তা=যে বোড়াকে কাটান দিয়া লওয়া হয়ইহা; আনকা=অনো। আনচান=ছটকট করা; আছুড়=অবসর; আরোমা=মাতামহী; আসানো=রোগে শুকাই। আমানি=পাখা ভাতের জল; আচাড=অস্মিরি বাট; আতাস্তর=সম্ভট; আকাড=কঠিন; আং=চৌকুর; আলকাহ=বেকুল, বুদ্ধিহীন।

ই

অবধি, পর্যন্ত।

উ

উছা=সরীসৃপেকা নির্কষ্ট; উগরা=খিচুড়ী; উয়ারো ॥ প্রশস্ত; উমি=অশিক্ষিত বা নিরক্ষর ব্যক্তি; উদরো=উট্টা; উনানো=গলানো; উপিতে=স্বতঃপ্রসূত রা।

এ

এগৌরিবিসি=বিশুদ্ধাল; এগোনো=আর্পণনা; একরার=বীরুতি, কড়ার।

ও

ওশ=শিশির; ওজোড়=আপত্তি; ওজু=আহারের সময়।

ক

কাচে=অনবরত বৃষ্টি-বাঙ্গা হইয়া বেরুণ অবস্থা হয়।

কাওচোল=বিবাহ; কাতর=নেত্রজল; কুরোয়=নেকরামি করা। কিত্তে=ধরণ; কেত্রে=হাস্তাঙ্গ, মারামতি, কামায়=বোজগার; কানি=নেকড়া; কসবী=বেশা; কাল্লা=মাথা, মুড়ো; যেমন ছাগলের কাল্লা। কুরো=কুরাশা; কয়ালী যে ব্যক্তি দ্বাভ প্রকৃতি শস্য মাপ করিয়া দেয়। ক্যালানো=কাঁক করা; কল্লা=বদমায়ে, কাওরা=বাহারা শূকর চরায়।

খ

খাল=চামড়া; খিজাল=উৎপাত; খিত্তা=অসীম গালাগালি; খিত্তোনী=গল্পনা; খিসা=নিদ্রা; খেই দড়ির মধ্যস্থ প্রত্যেকটা তার; খামাকা=হঠাৎ, আচম্বিতে; খিরকিচ=অনর্থক বাদ্যযন্ত্র; খানকা=বাহিরের ঘর (মূলমানবিরেগর), খোজোন=ছিন্ন, গহবর; খচাই=খুঁই ব্যক্তি।

গ

গন্তান=বেশা; গুদো=অকর্মণ্য; গিনোড়=অঙ্গল; গামাল=মাথায় করিয়া গ্রাসে গ্রাসে জিনিস-পত্র বিক্রয় করা; গান্ধি=অরুটো; গেজে=পরমা রাখিবার স্তর কাপড়ের থলি বিশেষ; গজাল=পেরেক; গেওয়াবী আঁন্দান; গুপিস খুব গুরু; গুছি=পরচুলি; গাওড়া গ্রাম।

ঘ

বাগি=হস্তী স্ত্রীলোক; ঘেড়ো, ঘাচড়া=অবাধ্য; ঘোতে=উপপত্তি; ঘাইট=অপরাধ।

চ

চাবা=চর্চিত তাখল, চশম=লজ্জা, চশমখোর=লজ্জাবীন, চারাবো=ধাক করা, চিন্তে=অগ্রশস্ত থও, চিলু=চিতা, চেডড়া=অন্ন বরষ, চুচি=নাব্যবিত্ত বন, চুকো=টুক, চাড়া=নখ, চুক=জুল, চিরাড়ে=প্রতিমা গড়িবার সময় যে বাঁশের চটা দিয়া সাফ করা ও মাঝা হু, চুকাড়=বায়ের মোটা কাটা, চেহ=শিশুদিগের লিঙ্গ, চুলো=আশ্রয়, যথা—"তর আর কোনও চাল চুলো নেই;" হুহ=যে ব্যক্তি জয়চাক কাঁধে করিয়া রাখে চুহাশর=যে ব্যক্তি জয়চাক বাজায়।

ছ

ছিককে=বুড়ির পশলা, ছাঁদগা=পালিত, ময়না ইত্যাদি ঘো=ছায়া, ছিয়ালো=লগ্না, ছ্যাপ=খুশ, ছ্যাচন=গ্রাহর, ছিনাল=বেস্তা।

জ

জুলি=গর্ভ, জিন্না=দ্বিধি, জাখা=শক্ত, ঢেঁকসই, জিরাগা=ঘেঁষে, জুচুর, জকার=চাঁৎকার, জাড়=শীত জোক=মাপ, জবর=খুব শোকে, জুত=জুখি।

ঝ

ঝাড়া=মল, ঝাপগা=আবছাড়াপূর্ণ, ঝিমান=বসিরা বসিরা ঘুমান।

ট

টোনে=শরতান, টাটানে=কতাদিতে যন্ত্রণা হওয়া, টেঙা=টুক, টোয়ানো=চুপি চুপি ভালভাবে লক্ষ্য করা, টিকলী=ইক্ষু প্রকৃতির বণ্ড, টোপলা=তলী, টাপর=ছাদলা, টিপিনি=অন্ন অন্ন বৃষ্টি, টোলা=পাড়া, যথা—"ছোট বোতুই যদি পেতেই তোমার টোপার বেড়াই, তবে আর সমসার চলে কি করে?" টিকরা=বাতবধ বিশেষ।

ঠ

ঠুল=ছাগ গোবৎস প্রকৃতি মাথা দিয়া যে আঘাত করে, ঠুনা=ঠোনা মরা, যথা "বাগুড়ী মারে ঠোনা শস্তর বাড়ী আর বাব না" ঠেকো=নিকটর, ঠেটী=অগ্রশস্ত বস্ত্রবণ্ড।

ড

ডাবরা=যে ব্যক্তি জানি হস্তের কার্য বাম হস্তদ্বারা এবং বাম হস্তের কার্য জানি হস্তের দ্বারা করে, ডাবরি=কলনী, ডোপা=হল ভূমি, ডাবি=খুঁবি, ডুমা=খণ্ড, ডাম=সর্প শিশু।

ত

তাউত=শুশ্রূষা, তলোক=তামাক প্রকৃতির তেজ, তকক=প্রান্তরগা, তারি=মাহুলি, কচ, তার=কৌশল; তেড়ি=কোষ, তবল=মুদ্রা, তবলদার=

যে ব্যক্তি খড়ি চোয়ায়। তেনা=নেকড়া, তোকড়=বুদ্ধিমান, তামান=সমস্ত।

থ

থাবা=চপেটাঘাত, থিরো=সোজা, থুবড়ো=আইরুড়ো।

দ

দিরাড়=নদীর ধার, দগি=কর্দমাখাঁ, দলক=বৃষ্টি, দোপ=বাগবৃক্ষ স্থান, দোয়াল=যে ব্যক্তি হুত্ব ধোহন করে, দেড়ী=মজুত, দাঁড়া=ধরণ, দাপানী=ছটকটানি দাগার=আওয়াজ, দোমত করা=বস্ত্রাদি ভাজকরা, দলা=খাদ্যাদির মুষ্টি, দুরা=দহ।

ধ

ধুকা=চালবাড়ী, ধাষ্ট্র=কাথার উপরিভাগস্থিত বস্ত্র বণ্ড। ধাগর=ধুত, ধাইউ করা=করাত দ্বারা কাঠ চেরা, ধাইদার=যে ব্যক্তি কাঠ চেরাই করে, ধুপ বোজতাপ, ধক তেজ, উগ্রতা যথা "এ তামাকে মোটে ধক নেই।" ধুকড়া=ছেড়া কাপড়, ধড়ি=কাঠা।

ন

নাকাল=দুর্গতি, নিওর=শিশির, নকুতো=নৌকিত্তা, নিপান=সমূলে বিনষ্ট, নাড়=নাড়ী, নেভিরে পড়া=অবসর হইয়া পড়া। নিটে=কমতাহীন, নোতানি=নথ, নোগুপি=গ্রাস্য, নেকরা=ঠাটকরা, নেতুর=অপরিকার।

প

পান=বংশ, পুর্ববকে প্রচলিত "পোশাপান" শব্দের "পান"ও এই ভাবই প্রকাশ করে। পিতে=নেত্রজল, পোয়াত=প্রভাত, পুয়ে=আমের অস্থিরকৃত ঐটি, পিড়ে=মাতীর বন্ধুর বারান্দা, প্যাভানো=গ্রাহর করা, পতানো=পক্ষীদ্বয় হওয়া, পিচে=মাছের পুচ্ছ, পনানো=বৃথা বাগাড়ান করা, পগার=গর্ভ, পয়ন=গাঁকো বা বাধান নোকা বাহির হইয়া বাইবার যে পথ থাকে পোক্ত=শক্ত, কদম্ব।

ফ

ফেলা=ময়লা; ফইড=চালবাড়ী



কড়=বাপারী; কাঁড়=উপর; কেট=কোড়া, কাশি=খণ্ড, ফেস=কুপারাম্ব, ফলদেখা=প্রথম রক্তবলা হওয়া। কাটা মাত্রা—কোনও জলাশয় শুকাইয়া একবারে শুক ভূমিতে পরিণত হওয়া। কাঁড়া—চেরাই করা, কুকাট=কোট, কুকাট মায়া=উঁকি মায়া, কাঁস করে=শীত করিয়া, কুল=সমুদ্রপ্রস্থত শিশুর নাভির সহিত যে নোড়া সংলগ্ন থাকে।

ব্যাকলা=খোলা, বক্সা=কল প্রভৃতি পাক্কাবার উপযোগী হওয়া, বায়না করা=আহার করা, বাইত=বসি, বন্ধই=কুন্দিত, বোড়া=অসত্য, বৈল্লা=বৈজ্ঞাত, বোচকা=গুঠি, বোকড়া=দুঃস্থান, বোকা=অবস্থা, বিউনী=চুলের বিনামি। বাও=বাতাস, বেজার=অত্যধিক। বেজার=দুঃখ, বিউলেশ=মজ্জাবান ক ব্যাপার। বিরিকিজি=বিশ্রী, বোগদা=দার বিহীন। বাতা=বোমি, বাঁক=নীর বাঁক।

ভাবন=দ্রোণাকদিগের বিলাস ভঙ্গী, ভোল-ছন্দ। ভোকছানি=কুখার পান্ডনবশতঃ অবস্থা।

বেনতা=নিষেধ, মন্ডারা=ঠাট্টা তামাসা, মিছা-

করা=ধাতিন করা, মুরাদ=সামর্থ্য, মেগা=অনন্ত, মজাড়=সমাপি, কবর, মেটী=মারী, মিয়াদ=নির্ধারিত সময়।

রোক=ক্রোধ, রপ=শিরা, রটো=নীচ, রোয়া=হাঁক, উক্সেরে টাংকার, রল্লা=পাহের লক ডাল, রায় মেগা=নিষ্কৃতি বা অস্বাভাবিক সেওয়া। রাঁড়=বিদ্যা, রকা=হাত চিঠি, রিক=গাড়ীর ঢাকার দাগ। রোজ=নিয়ম, প্রাণ ইত্যাদি, রোকড়=কমিবার পেরেবার পাতা বিশেষ, কচ=কচি।

শ, ব, স।

দিয়াটা=শীতকালে ঝুটি ও কুখাটিকা ইহা যে অব-হাওয়ার সৃষ্টি হয়। সাবকরে=যে ব্যক্তি রূপ নহে; শল=ঢিলা।

হাউল=সপ, হাউড়ে=পেটুক, হেজে=নির্দিষ্ট অংশ; হাবোড=কাবা, হিলে=আশ্রয়; হেকম=মনোযোগ; হামেসা=সদা সর্বদা, হাল=অবস্থা, হালি=নৃত্য, ঠটতে এক হালি।

## মুদ্রণতত্ত্বের ক্রমবিকাশ

শ্রীমদ্বিত্তি বাব

ভারতবর্ষে ছাপাখানা বড় বেশী দিন হয় নাই। ১৫৫৬ সালে সেন্ট হ্রাশ্মিস্ জেভিয়ার নামক একজন পর্তুগীজ পাদরী গোয়াতে একটি মুদ্রাঘর স্থাপন করেন। ইহা হইতেই হইল ভারতে ছাপাখানার স্বপ্নাভূত।

জেভিয়ার ১৫৫২ সালের ৬ই মে গোয়াতে অবতরণ করেন ও এই শহরেই তাঁহার একাধিপত্য বিস্তার করেন। গোয়া ছিল ভারতে পর্তুগাজদিগের উপনিবেশ ও বাণিজ্যের কেন্দ্র। এখানে পাদরীগণ তাঁহাদের দীর্ঘ, অসমাপ্য ও বিপর্যয়জনক জন্মের অবসানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কলেজ, বিদ্যালয় এবং অসংখ্য খৃষ্টধর্মীগণের হৃদয়দার জন্ত প্রাথমিক পাদরীগণ এইখানে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বিবেচনা করেন। এই প্রয়োজনের বশবর্তী হইয়া পাদরী জুয়ান-দে-বুণ্ডামাতে ইউরোপ হইতে ছাপাকল ও টাইপ লইয়া আনেন; ইহাই ভারতের প্রথম মুদ্রাঘর। ১৫৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর পোতাতে পৌছিয়াই অচিরে ইংরাজ কার্য আরম্ভ করা হয়।

আবিসিনিয়া পাদরীগণ ও কয়েকবার নিম্নেরের একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্ত শিশিবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহারা বোমের আবিসিনিয় প্রচার-সমিতির কার্ডিনাল গোটেজের নিকট পুস্তক ছাপাইবার জন্ত একটি মুদ্রাঘর, ইঞ্জিনিয়ার অক্ষর এবং কার্যক্ষম ছ'একজন লোক চাহিয়া এক আবেদন করেন। এই আবেদন বঙ্গাব-ভাবে গ্রাহ্য না হওয়ায় ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই পোষ্টার্ক আলফোনসো মেন্ডেজের পুনরাবেদনে ইহার ক্ষমতি পাওয়া যায়; কিন্তু ইপিগনিয়ার ইতিহাসে ফারাব মনোয়েল-দে-আলমেদা, পেড্রো পায়ের, মনোয়েল বারাদান্স ও আলফোনসো মেন্ডেজ প্রভৃতি ব্যক্তি বাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের এই মিশনের মুদ্রাঘরের উল্লেখ নাই।

আমরাকিও দেবি পর্তুগীজ পাদরীগণ আবিসিনিয় পাদরি-গণের এই অভাবপূরণের জন্ত তাহাদিগকে সাহায্য করিতে

থাকেন এবং পর্তুগীজ ভাষায় তাঁহাদের প্রয়োজনীয় পুস্তকাবলী ছাপাইয়া দেন।

ইহার পর ১৭৫৬ সালে আমরা মি: বোলটগের পরিচয় পাই। তিনি সাধারণ-জিহা-বে প্রভাব একপ্রশ্ন কাগজ ছাপিরা টাঙ্গাইয়া দিহেন; তাঁহার ছাপাখানা থাকাই সম্ভব। অতঃপর ১৭৭৮ সালে মাদ্রাস শহরেও একটি ছাপাখানা খোলা হয়। ঠিক ঐ সময়ে বাঙলা দেশে হলুদীতে চালস উইলকিন্স পঞ্চানন কর্মকার নামে এক মিস্ত্রিকে নিজে মুদ্রণ-বিজ্ঞা শিক্ষা দিয়া তাহার সাহায্যে বাঙলা অক্ষর প্রস্তুত করেন। অক্ষরগুলি কাঠের হইয়াছিল। উইলকিন্স বহুতে অক্ষর তৈয়ারী করিতা এবং এখানে ১৭৭৮ সালে হ্যাংগেডের বাঙলা ব্যাকরণ ছাপাইয়াছিলেন। অতঃপর পঞ্চানন শ্রীমামপুরে কার্যের অসমুদানে গমন করেন। ঐ সময় কেরী তাঁহার সাহায্য ব্যাকরণের জন্ত দেবনাগরী অক্ষর প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেছিলেন। পঞ্চাননকে পাইয়া তিনি কৃতকার্যের উপায় প্রাপ্ত হইলেন। পঞ্চাননের দ্বারা তিনি দেবনাগরী অক্ষর ও অজ্ঞান নানা ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

পঞ্চাননের পর তাহার শিক্ষানবীশ, মনোহর কর্মকার শ্রীমামপুর-মিশনের প্রচার, সাহিত্য ও খৃষ্টীয় সভ্যতার ক্রমোৎকর্ষের জন্ত সুপ্রকার ভাষার হৃদয় হৃদয় মুদ্রাক্ষরের সাট প্রস্তুত ও বিক্রেত করিতে থাকে। চল্লিশ বৎসরেরও অধিক সে এই কার্য করিয়াছিল। খৃষ্টধর্মের প্রচারে সাহায্য করিয়াও মনোহর হিন্দুধর্ম পরিভাগ করে নাই। ১৮৩৯ সালে ব্রহ্ম পাদকী দেভারেও জেমস কেনেডি যখন ভারতে আগমন করেন, তখন তিনি পঞ্চাননকে হিন্দু-দেববিগ্রহের তলে আসন গ্রহণ করিয়া 'ট্রাইবেল'এর জন্ত অক্ষর ও ছ'টি তৈয়ারী করিতে দেবিতাছিলেন।

১৮০০ সালে পাদরী ওয়ার্ড শ্রীমামপুর-ছাপাখানার মুদ্রাক্ষর হইয়া আসেন। তিনিই প্রথম বাঙলা 'নিউ ট্রোমেন্ট'



ছাপান। কেরী নিজে ইহা মূল গ্রীক হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ইহা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং রাম ব্রহ্ম-গ্রন্থ তৎকালীন সুখীজনবর্গেও সর্বসাধারণ লোকের সাহায্যে মূল গ্রীকের সহিত মিল রাখিয়া চারি বার সংশোধন করেন। ১৮০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই গ্রন্থের মাত্র ছই হাজার সাখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহাতে খরচ হইয়াছিল ৬১২ পাউণ্ড এবং ইহা ছাপিতে সময় লাগিয়াছিল ৯ মাস। কেরীর পুত্র ফিলিপ ও মুদ্রাকর ওয়ার্ড বহুতে ইহার অক্ষর সাধাইয়াছিলেন। ডাঃ জন্. মার্সমান তাঁহার 'লাইফ এণ্ড টাইমস্ অফ দি

নির্দিষ্ট অক্ষরে মুদ্রণ-তত্ত্বের বিশেষ বৃথের ইতিহাসে এই প্রথম বাতুনির্দিষ্ট অক্ষরে চীনা-পুস্তক মুদ্রিত হইল। ইহা চীনা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক শ্রণীয় ঘটনা।

১৮১২ সালের ১৩ মার্চ 'শ্রীরামপুর-প্রেসের এক শ্রণীয় দিন।' ঐদিন সন্ধ্যাকালে সমব্রাত কারখানার কাজ শেষ হইয়াছে, এমন সময় কারখানায় আগুন লাগিল। ওয়ার্ড ও মার্সমান উভয়ে তখন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আগুন নিবাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কেরী তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি তখন কলিকাতার কলেজে তাঁহার সাপ্তাহিক কার্যে ব্যাপ্ত ছিলেন।



ফ্রেডারিক কনিগ—

—রবার্ট মার্চ—

ইহার বেগেছেলার—

—উইলিয়ম্ কেষ্টন—

এডো মেহুজিও—

—জন্. ফাষ্ট

জন্. গুটেনবার্গ

বি' নামক পুস্তকে বলেন যে, 'শ্রীরামপুরের এই কারখানা মাত্র একশত পাউণ্ড অর্থে পরিমাণ দেবনাগরী অক্ষর নির্মাণ করিতে সমর্থ হইত, হুগেনের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাপার কারখানা 'ফ্রাই এণ্ড ফিজলু' সাত শত পাউণ্ড অর্থে তাহার অর্ধেকও পারিত না। ১৮১৩ সালে মার্সমান দ্বা-নির্দিষ্ট অক্ষরে চীনা ধর্মগ্রন্থ হুইজ, করেন। চীনের কাঠ

পরিদর্শন সকালেই মার্সমান, কেরীর নিকট এই শোচনীয় সংবাদ বহন করিয়া আনিলেন। কেরী এই সংবাদে অশ্রু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই—মার্সমানের চোখেও জল আসিয়াছিল। কেরী যখন ঐদিন সন্ধ্যায় 'শ্রীরামপুরে' পৌঁছিলেন, তখনও তাঁহার এই বাসের কারখানার ভগ্নস্থলে শ্রমোদ্যোগ হইতেছিল। তাঁহার প্রিয়

পুণিপাত্রাদি তখন প্রায়ই সব নিঃশেষ হইয়াছে। ওয়ার্ড ইতিমধ্যে অশ্রু পরিশ্রমে মুদ্রাকরের 'চাঁচ ও সট-গুলি ভগ্নস্থলের ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দৌড়াদ্যাবলম্ব্য ছাপাকরের কোন কতি হয় নাই। বাহা হউক আবার কোনক্রমে প্রেসের কার্য ও অক্ষর-নির্মাণ আরম্ভ হইল।

ইহার পর ১৮১০ সাল পর্যন্ত 'শ্রীরামপুরের' কারখানা প্রাচ্যে সর্বপ্রধান ছাপার কারখানা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইহার পরবর্তী নানা সর্বজনবিদিত বলিয়া স্থানভাব-বশতঃ লিখিলাম।

এই তো গেল ভারতে ছাপাখানার প্রথম ইতিহাস। এবার গতে ইহার আবির্ভাব ও ইতিহাস সংক্ষেপে কিছু বলিব।

মুদ্রণ করিবার প্রাথমিক দৃষ্টান্ত আমরা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিতে পাই। প্রাচ্য হইতেই ইহার প্রথম বিজ্ঞ অক্ষরিত হইয়াছিল। আমরা দেখি, অতি প্রাচীনকালে অসীরাণ্যগণ ইষ্টকের উপর সাংকেতিক লিপি ও মূর্তি খুঁধ ছাপিত। মিশরের ইষ্টকেও এইরূপ দেখা যায়। তৎকাল কতগুলি আবিষ্কৃত মোহর হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেই মোহরগুলি খৃঃ পূঃ ৩৭০০ অব্দে নির্মিত হওয়া সম্ভব। এই মোহর ছাপার কাজ হইত। একত্যাচারী ছাপাখানা যে সমস্ত ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে সেগুলি খৃঃ পূঃ ৫০০০ অব্দেও পূর্বের বলিয়া অনুমান করা যায়।

মূলতঃ ছাপিবার পদ্ধতি প্রথম অক্ষরিত হয় চীন হইতেই। প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে চীনারা কাঠের উপর সুন্দর অক্ষর ঠোঙা করিয়া পাতলা কাগজের উপর তাহা ছাপিত। ইয়াই নবম শতাব্দীর শেষভাগে 'পি-সিঙ' নামক জনৈক কব্ধকার প্রথম দ্বাত্বনির্দিষ্ট অক্ষর ('চীংবি') প্রস্তুত করিয়া ছাপা পুস্তকের প্রচলন করে, কিন্তু তাহা প্রথমতঃ পূর্বতন মুদ্রণ-পদ্ধতির অল্পকাল ফল দিতে পারে নাই; কারণ 'ব্রুক'এ খরচ পড়িত কম এবং শ্রমও হইত অল্প। বিশেষতঃ চীনা অক্ষর যেরূপ কদম্ব তাহার অল্পভায়ে অক্ষর প্রস্তুত করার অপেক্ষা 'ব্রুক'এ ছাপা সুবিধা হইত; বাহা হউক, পরে যখন পরিসরে চীনা অক্ষর নির্দিষ্ট হইতে থাকে তবে তাহা বাহির হইতেই হইয়াছিল।

প্রাচীন রোমীয়গণকে আমরা 'প্লাম্প' অর্থাৎ 'চাঁচ ব্যবহার' করিতে দেখি। তাহারা বিশেষতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাপারে ইহা ব্যবহার করিত।

কাঠের 'ব্রুক'এ ছাপা ইউরোপে প্রথম প্রচলিত হয় দ্বিতীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তখনকার ছাপাইবার পদ্ধতির আমরা সম্যক পরিচয় পাই আবিষ্কৃত বেলিয়ার 'তাস' হইতে। 'তাস' দ্বিতীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রথম প্রচলিত হয়। মুদ্রিত্রয়ের পুস্তকেই ইউরোপের প্রথম পুস্তক। চীনের অক্ষরকে উহা মূল্যিত হয়। প্রত্যেক পৃষ্ঠা একটী মাত্র 'ব্রুক'এ ছাপা হইত।

দ্বাত্ব চালাই করিয়া 'চাঁচ' অক্ষর প্রস্তুত করিবার প্রয়াস বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হার-লেমের লরেন্স, কশটার ও মেন্ডেলের জন গুটেনবার্গই ইহার প্রথম প্রচলন করেন। অনেকের মতে লরেন্স কশটার ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কাঠের অক্ষর প্রস্তুত করিয়া ছাপিতেন কিন্তু তাহার কোন বখাখণ্ড প্রমাণ আমরা পাই না। কশটারের পুস্তকাবলী ডেনমার্কের প্রাচীনতম ছাপার পরিচয় দেয়।



উপরি চিত্রমণ্ডকে সাউথজনের হাতে টাকা দিয়া  
গুটেনবার্গের চেষ্টা

কেবিজের ডাঃ বেগেলস্‌বের মতে হার্গেন্স ছাপা কার্যের জগদগুরু ও কশটারই ইহার জগদগুরু; কিন্তু গুটেনবার্গের মতসাপিগণের লেখনীতে সে কথা আমরা কোন মৌলিকতা



দোহতে পাই না। জাফেরনার ডাঃ ভ্যান ডার লিওণ্ড  
পুস্তকেও গুটেনবার্গের কথাই দেখা যায়।

গুটেনবার্গের অমর কীর্তি মুদ্রাণশিল্পের আবিষ্কার।  
তিনিই প্রথম উন্নত প্রণালীর যন্ত্র প্রস্তুত করেন। তাঁহার  
পূর্বে মুদ্রাণশিল্পের বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু পরে তাহা পূর্ণ হয়।  
যেদিকেই তিনি এই ছাপাখানাকে প্রতিষ্ঠা করেন। মুদ্রাণশিল্পের  
ইহাই প্রথম কথা। অবশ্য জাফের্নী ইহার জন্ম গৌরবান্বিত  
এবং জগতের নিকটে প্রকাশ্যমানীয়।

প্রায় ১৪০০ খৃষ্টাব্দে (কাহারও কাহারও মতে ১৪১০  
খৃষ্টাব্দে) গুটেনবার্গ মেনজে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার  
নাম গ্যাস্কেজ্জ্। গ্যাস্কেজ্জ্ জাফের্নীর একজন সমান্তরাল  
ধনী পুরুষ। গুটেনবার্গের বয়স যখন মাত্র দশ বৎসর তখন  
জাফের্নীর ধনী ও পরিবারে মধ্যে বিবাহ উপস্থিত হয়।  
এই সময় তিনি পল্যান্ডন করিয়া ট্রাস্কার্ভ নামক স্থানে গমন  
করেন। ১৫ বৎসর বয়সকাল হইতেই তাঁহার আবিষ্কারিক  
প্রতিভার বিকাশ হয়। এই সময় তিনি ডিউকেন নামক  
এক ব্যক্তির সহযোগে এক ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রায়  
১৫ বৎসর এই ব্যবসা চালাইবার পর দুর্ভাগ্যবশত তাহাতে  
বিশেষ লোকসান ঘাইতে আরম্ভ করে। অতপর তিনি  
ছাপার কার্যে হস্তপ্রসূ করেন। ইহাতে তাঁহার পুরাতন  
বন্ধ ডিউকেন ও অজ চইজনকে সহকর্মী করিয়া তিনি কার্য  
করিতে আরম্ভ করিলেন।

গুটেনবার্গের এই নূতন ব্যবসা কিছুকাল চলিবার পর  
ডিউকেনের মৃত্যু হয়। অতপর ডিউকেনের এক ভ্রাতা  
ডিউকেনের অংশ শীঘ্রী করিয়া গুটেনবার্গের নামে মামলা  
করেন। গুটেনবার্গ ইহাতে জরাজীর্ণ করিয়াছিলেন। ইহার পর  
ছাপাখানার ক্রমোন্নতির জন্ম গুটেনবার্গ বিশেষ চেষ্টা  
করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি ট্রাস্কার্ভ  
পরিভ্রমণ করিয়া জন্মান্ন মেনজে আসিয়া কলিলেন এবং  
নূতন করিয়া ছাপাখানার কার্য আরম্ভ করিলেন; কিন্তু  
তাঁহার অর্থের দুর্ভাগ্যবশত ইহা সৌভাগ্যবশত তিনি  
জন্মকাল নামক এক ধনী সঙ্গোপনের সাহায্যে আসেন।  
তাঁহার নিকটে তিনি তাঁহার ছাপাখানার ব্যবসায় জন্ম  
বাধা রাখিয়া কিছু অর্থ ধার করিলেন এবং অন্ধর প্রস্তুত  
করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অন্ধর কাঠের হইয়াছিল।

গুটেনবার্গ এখন পূর্ণাঙ্গপেশা অন্ধরের কথকিত উন্নতি  
সাধন করিলেন কিন্তু পুস্তক ছাপাইবার মত যন্ত্রোপকরণ  
তাঁহারকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার  
বিশেষ অসুবিধা হইল অন্ধর নইয়া, কাগজ কাঠের অন্ধর  
নীয়ই অসুবিধা। তাই তিনি প্রথম ধাতুনির্মিত অন্ধর  
প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইলেন এবং অবশেষে রূতকার্যে  
হইলেন। প্রথমই তিনি 'বাইবেল' ছাপাইতে মনস্থ করেন  
এবং বহু চেষ্টা অনুষ্ঠিত ও শেষেরে সহযোগিতায় ১৪৪৩  
সালে একদণ্ড ও ১৪৪৯ সালে আর একদণ্ড—এই দুই খণ্ড  
লাটিন ভাষায় 'মুদ্রিত' করিলেন। এইখানেই  
গুটেনবার্গের মুদ্রাণশিল্পের আবিষ্কারের সকল পরিশ্রম সার্থক  
হইল। কিন্তু এই সময় একটা অনর্থ আসিয়া জটিল। গুটেন-  
বার্গ সঙ্গোপনদিগের নিকট হইতে যে অর্থ ধন করেন, তাহা  
শোধ করিতে না পারায় উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত  
করিল। বিশেষতঃ সঙ্গোপনগণ ছাপাখানাটিকে হস্তান্তর  
করিবার জন্ম প্রদত্ত টাকার দাবী করেন। গুটেনবার্গ  
মুদ্রাণর রক্ষা করিবার জন্ম সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন বটে,  
কিন্তু রূতকার্যে হইতে পারিলেন না।

১৪৪২ সালে আডল্ফ-ভন-নাসাউ নামক একব্যক্তি মেনজের  
মুদ্রাণর হস্তপ্রসূ করিয়া তৎকালর শ্রমিকদের তাড়াইয়া দেন ও  
দূরদেশে উহার প্রসারকল্পে উৎসাহিত হইয়া যান।

জীবনের অধিকাংশ সময়ই 'গুটেনবার্গ' মুদ্রাণশিল্পে আশ্র-  
নিয়েগ করিয়াছিলেন। মুদ্রাণর হাতছাড়া হইলে তিনি যে  
মধ্যস্থতিক করি পাইলেন, তাহা 'বিশ্বাস' 'তাঁহার' সহ  
করিতে হইল না। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত  
হন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দীর্ঘ চারিশত বর্ষ পরে মেনজে  
নরনার্যাগণ তাঁহার স্বত্বিকর এক মধ্যস্থতিক প্রতিষ্ঠা  
করেন। ইহাই গুটেনবার্গের প্রতি জাফের্নীর শ্রদ্ধাঞ্জলি;  
কিন্তু জগতে তাঁহার কীর্তি অক্ষয় হইয়া রহিল।

মেনজে শহরে মুদ্রাণশিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়—গুটেনবার্গই  
ইহা করিয়াছিলেন। মেনজের পরে ট্রাস্কার্ভ এবং তৎপরে  
১৪৬১ খৃষ্টাব্দে শ্বিটটার-কর্তৃক বামবার্গে মুদ্রাণশিল্পের প্রচলন  
হইল। ইহাই ব্রাহ্মণ ইতিহাসের নানা দেশে ছড়াইয়া  
পড়িল। ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্সে মেনজের ও আর্নল্ড  
পানার্গ নামক দুইজন জাফের্নী-কর্তৃক ইটালীর ফ্লোরেন্স

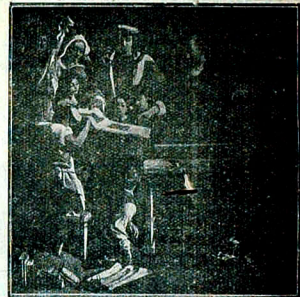
নামক স্থানে, ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে মার্টিন কান্স্, উর্বার্ক গেরিও  
ও মাইকেল ফিবুর্গের নামক তিনজন জাফের্নী কর্তৃক ফ্রান্সের  
প্যারী শহরে, ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে নিকোলাস্ কেটেলের ও পেরার্ড-  
ডে-মেল্পট কর্তৃক নিয়-দেশগৃহে, অতঃপর তিরো মার্টিনস্-  
কর্তৃক উট্রেখট ও আলোই নামক স্থানে, ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে  
জর্জেন অনান্স মুদ্রাণর-কর্তৃক স্পেনের ভালেয়াসিয়া নামক  
স্থানে, ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে জন্ দেল্ কর্তৃক ডেনমার্কের অডেন্স  
নামক স্থানে ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে লরবা ও এলীজাব্ কর্তৃক পর্চু-  
গালের লিসবন্ শহরে এবং ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্ ফেরি-কর্তৃক  
হাইডেনের ইঙ্কলমে মুদ্রাণর প্রচলিত হয়।

'সিয়ারো-ডে-স্বীজ' নামক পুস্তকে গ্রীক অন্ধরের প্রথম  
প্রচলন হয়। জন্ ফার্ট ও শফের ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে মেনজে  
উহা মুদ্রিত করেন; তবে সম্পূর্ণ গ্রীক ভাষার প্রথম পুস্তক  
ছাপা হয় মিলানে ১৪৭৬ সালে। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে উরটেম-  
বার্গের এলীনিজেন নামক স্থানে ফাইনার প্রথম দিক  
অন্ধর প্রচলিত করেন।

যদিও পূর্বে কয়েকখানি পুস্তক ছাপা হয়, কিন্তু সর্ব-  
প্রথম সম্পূর্ণভাবে 'টাইটেল'-পৃষ্ঠার পুস্তক মুদ্রিত করেন  
১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে ট্রাস্কার্ভ 'মার্টিন' ফ্যাচ নামক এক ব্যক্তি;  
হয়ত ভাঙ্গনের স্থিতির জন্ম প্রথম নূতনভাবে পুস্তক  
প্রকাশ করেন এলজাভ্, মাহ্সান্ নামক এক মুদ্রাকর;  
১৪৯০ খৃষ্টাব্দে কোলন্ নামক স্থানে এটোর, হোয়লেন্ প্রথম  
পুস্তকের পৃষ্ঠা-নং দিবার প্রচলন করেন। পুস্তক  
ছাপিবার প্রথম তারিখ দিয়া প্রকাশ করা হয় ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে  
শফেরের 'গামোরান' কোডেক্স নামক পুস্তকে; প্রথম  
চিত্র-প্রকাশন ব্যবহৃত হয় ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে; প্রথম  
বর্ণমাল্যকর চিত্রগ্রন্থ 'ইমেজেন্স অফ্ পিটি' নাম দিয়া  
প্রকাশিত হয় ইংলণ্ডে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে—তবে ইহার পূর্বে  
উইলিয়াম্ কেঙ্কটন্ ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে ওয়েটমিনষ্টারের 'দিভিন্টেস্'  
এও য়োইস্ অফ্ ফিলজফান্স' নামক পুস্তক প্রকাশিত  
করিয়াছিলেন।

উইলিয়াম্ কেঙ্কটন্ কেবল জন্মগ্রহণ করেন এবং  
প্রথমে লণ্ডনে বিদ্যালিকা করেন। ঐতৎপরে তিনি নিয়-দেশ  
স্থলে গমন করেন—সেখানে তিনি জিশ বর্ষ বাণক করিয়া-  
ছিলেন। অতপর ইংলণ্ডের রাজভগিনী ও বাগ্‌নামডার

চালুস্ দি বোন্ডের স্ত্রী মার্গারেটের আদেশে ট্রাস্কার্ভের  
কাহিনী ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং বাগ্‌সের কল্লাড



ওয়েটমিনষ্টারের ছাপাখানার কেঙ্কটন্

ম্যান্সান্ নামক মুদ্রাকরকে উহা ছাপাইতে দেন। ১৪৭৪  
খৃষ্টাব্দে 'রিব্রেল্ অফ্ দি হিষ্টোরিক অফ্ ট্রা' নামে এই  
পুস্তক মুদ্রিত হয়—ইহাই ইংরেজী ভাষার সর্বপ্রথম মুদ্রিত  
পুস্তক। অতঃপর ফ্রান্সী হইতে অহুসিত 'গেম্ এণ্ড্ পে  
অফ্ দি চিঞ্জ' নামক তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত হয়—ইহাই  
ইংরেজী ভাষার দ্বিতীয় মুদ্রিত পুস্তক। ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে  
তিনি ওয়েটমিনষ্টারে মুদ্রাণর প্রতিষ্ঠা করেন।

কেঙ্কটনের পরে রুম্যান্ডার-রিচার্ড পীনস্ ১৪৮৮  
খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম রোমীয় অন্ধরের প্রচলন করিলেন।  
ইহার পূর্বের মুদ্রাকর ছিলেন উল্ফকেন-ডে-ওর্ডাল্।  
এতদ্বা (যেহুজিও ইতালীয় আর একজন বিখ্যাত  
মুদ্রাকর। ইনি ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ভেনিস্ শহরে জন্মগ্রহণ  
করেন। ইনিই প্রথম 'ইটালিক্' অন্ধরের প্রবর্তন  
করিয়াছিলেন।

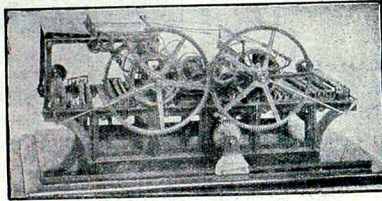
ষ্টুগায়েও মুদ্রাণশিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় ১৫০৮  
সালে। এওরু মিগার এডিনব্রার 'গাউণ-গেট'এ  
এই মুদ্রাণশিল্পে প্রথম প্রচলন করেন। এই সময় ফ্রান্স ও  
ষ্টুগায়েও ব্যবসা-স্বত্ব বৃদ্ধি প্রবল ছিল। এই স্থানে



মিলার কয়েনে বাইয়া মুদ্রাক্ষরের একটি ছাঁচ কিনিয়া এডিনবরাগ প্রত্যাবর্তন করেন। ইহা হইতেই তাঁহার মুদ্রালয়ের স্বরূপাত হইয়াছিল।

স্কটল্যান্ডের পর মৃত্যুত প্রসারিত হইল আয়ারল্যাণ্ডে। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে হ্যামফ্রে পাওয়েল ডব্লিউনে তাঁহার 'কমন প্রেসমার' নামক প্রথম পুস্তক মুদ্রিত করিলেন—ইহাই আইরিশ প্রেসের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক।

আমেরিকার প্রথম মুদ্রাঘরের আমদানী হয় ১৫৩৫ সালে। মেক্সিকোয় একজন স্পেনদেশীয় ব্যক্তি ইহা আনয়ন করেন। ১৫৩৮ সালে আমেরিকার প্রথম ইংরেজী পুস্তক ছাপা হইল—এই গ্রন্থ 'ক্যাড-কলেবো জা' ফিট হইয়াছিল। এই কলেবর একজন ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এক্ষণে ইহা হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত।



১৫১১ খৃষ্টাব্দের আবিষ্কৃত মুদ্রাঘর; ইহাতে ঘণ্টার ১৫০০ বার ছাপ দেওয়া যায়

ওটেনবার্গের ব্যবস্তু ছাপার কল পরবর্তীকালের উন্নত প্রণালীর মুদ্রাঘর অপেক্ষা অনেকাংশে হীন ছিল। উহা অনেকটা মাখন-ভৈরবীর ঘরের মতন। ইহাতে অক্ষর ভাসিয়া বাইত শুব এবং অস্থবিধাও হইত অনেক। বাহা হইক পরে নানারূপ উন্নত যন্ত্রের আবির্ভাব হইতে লাগিল এবং প্রায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যানথোপের তৃতীয় আর্ল চালস্‌ সাহন প্রথম স্বরূপে উক্তপ্রণালীর মুদ্রাঘর আবিষ্কার করিলেন। পূর্বের মুদ্রাঘরগুলি কাঠের হইত, কিন্তু মাখনের এই যন্ত্রের আরম্ভ হইল লৌহনির্মিত। ইহার পর এডিনবরাগ জন্মভূমিতে নামক এক মুদ্রাক্ষরছাপাক্ষরের আরও কিছু উন্নতি সাধন করেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মিলাডেউফিয়ার মিঃ জি. ক্লাইমার কলবার মুদ্রাঘর আবিষ্কার করিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনে তাহা প্রচলিত করিলেন। ইহার পর ১৮২০ সালে আর, ডব্লিউ, কোপ, নামক লণ্ডনের একজন ইঞ্জিনিয়ার 'আলবার্টন'-র আবিষ্কার করেন। ইহা পূর্বসূর যন্ত্রগুলির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নততর হইল।

স্বতন্ত্র আমরা দেখিতেছি মূলতঃ ছাপাকল পৃষ্ঠার ষ্ট্যান্ডন শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। যেটুকু বর্ণিতে গেলে উইলিয়াম্‌ নিকলসন্‌ ইহার প্রথম উদ্ভাবক। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি একটি 'ময় নিম্বাণ' করিবার প্রয়াস পান। তাঁহার প্রায় দশ বৎসর পরে ফ্রেডারিক কনিগ্‌ নামক সাক্সনীর একজন মুদ্রাক্ষর ছাপাকলের উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু যথেষ্ট

সাধাঘোর অভাবে তিনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে আগমন করিয়া একটা যন্ত্রের উদ্ভাবন করিলেন। ফ্রেডারিকের এই যন্ত্র অনেকটা নিকলসনের অনুরূপ। টাম্‌স্‌ বেন্দুলি একজন সুযোগ্য মুদ্রাক্ষরের সাহায্যে পাইয়া কনিগের যন্ত্র ব্যবহার করিয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কয়েকটা পুস্তক ছাপিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

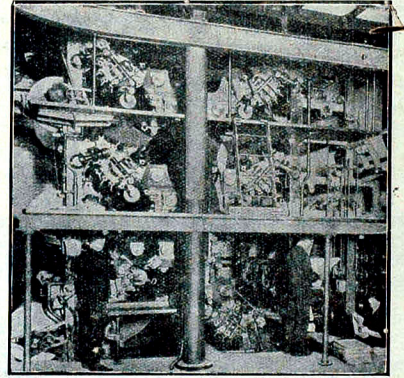
১৮১৪ খৃষ্টাব্দেই প্রথম বাষ্পচালিত যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকার মিঃ জন্‌ ওয়ালাটার তাঁহার পত্র ছাপিবার জন্য কনিগ-আবিষ্কৃত একটা যন্ত্র চাহিয়া পাঠান কিন্তু আলোচ্যাবধি ২৯ বৎসর তিনি যন্ত্র পাইলেন যে, একটা নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা

ব্যাপে পরিচালিত করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রটা ঘণ্টার ১৮০০ বার ছাপ দিতে পারিত। ওয়ালাটার উহাই তাঁহার ছাপার কার্যের জন্য গ্রহণ করিলেন।

'টাইম্‌স্‌'এর কর্তৃপক্ষ কিন্তু ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না, তাঁহার অধিকতর দ্রুত ছাপ দিবার জন্য উন্নত যন্ত্রের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অগাস্টাস্‌ অরোগাথ্‌ নামক এক ব্যক্তির দ্বারা একটা যন্ত্রের আবিষ্কার হইল—ইহাতে ঘণ্টার ১০,০০০ বার ছাপ দেওয়া যাইত।

'টাইম্‌স্‌'এর কারখানাতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাতে ৮০০ পাউণ্ড ওজননের চার মাইল লম্বা রোল করা কাগজ ব্যবহৃত হইত। একটা ছুরিকাও ইহাতে সংযোজিত থাকিত—ছাপার সঙ্গে সঙ্গে তাহা নির্দিষ্ট মাপে কাগজ কাটিয়া টিক করায়া রাখিত।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লিভারমুন্ডের জর্জ ডানকান্‌ ও আলেকজেন্ডার উইলসন্‌ আর একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেন; ইহার নাম 'ভিক্টরী'। ইহার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'মেসার্স' কন্‌স্টার এণ্ড্‌ সন্‌স্‌ কর্তৃক 'রোটোরী-



আধুনিক ছাপাকল—ইহাতে ঘণ্টার ১,২০,০০০ বার ছাপ দেওয়া যায়

ইহার পর 'দি টাইম্‌স্‌' রিভলুশ্যন্‌ ফাই প্রিন্টিং মেসিন্‌ আবিষ্কৃত হইল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের 'মেসার্স' হো এণ্ড্‌ কোম্পানী কর্তৃক। রিচার্ড্‌ মার্চ' হো ছিলেন ইহার স্বাধিকারী। এই যন্ত্রে ঘণ্টায় ছাপ দেওয়া যাইত ২০,০০০ বার। অন্ততঃ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের পেন্সিলভানিয়ার উইলিয়াম্‌ বুলক্‌ একটা যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন; উহার নাম হইল—'বুলক্‌-মেসিন্‌' যন্ত্রটি

মেসিন্‌ আবিষ্কৃত হইল। প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রমশঃ মিত্য নানা উন্নত ছাপার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। 'মেসার্স' হো এণ্ড্‌ কোম্পানী আর একটা নূতন যন্ত্রের জ্ঞানদানীর জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একেবারে নূতন একটা যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন। ইহা হইল 'মুদ্রণযন্ত্র' একটা অদ্ভুত উপাদান।



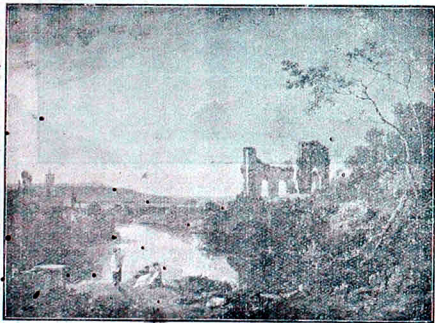
১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারগণ-কর্তৃক ইহার নানারূপে আরও উন্নতি করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। ইহাতে দুইটা মেশিন সহস্রভাণ্ডে একমুদ্রকে করিয়া একটা বয় করা হইল, উহা এক বিরাট যন্ত্রে পরিণত হইল। এই বয় ঘণ্টায় আট পুটার ক্ষম্যায় ৯৬,০০০ ছাপ, ১৬ পুটার ক্ষম্যায় ৪৮,০০০ ছাপ ও ২৪ পুটার ক্ষম্যায় ২৪,০০০ ছাপ দিতে সক্ষম হইল।

বর্তমান যুগে মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি যে কতদূর হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজকালকার 'ইলেকট্রিক' চালিত যন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহাষ্ট্রজগতে বিশেষ আসন পাইয়াছে। 'সরূপেকা' ক্রতচালনা ক্রিয়াকর যে যন্ত্রের খবর আমরা পাই তাহা ঘণ্টায় ১,২০,০০০ বার ছাপ দিতে পারে।

ছাপাকলের মধ্যে 'লিনো-টাইপ' যন্ত্রই জগতে বিখ্যাত। ইহার বেগ অতি দ্রুত এবং অতি অল্প খরচে ইহার ছাপাকার্য চলিতে পারে। জায়েদ্বীরা ঠমার মেগেদেলার ইহার আবিষ্কারক। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম ব্যবহার করা হয়।

পুরাকালে যখন ছাপাকল ছিল না তখন হাতে লিখিয়াই সমস্ত কাজ হইত, পুস্তকের অভাব ছিল খুবই—ছাত্রেরও অন্তরবিদা ছিল তদ্রূপ। আজকাল মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারে সে অভাব মোচন হইয়াছে। মুদ্রায়ন্ত্র এখন আমাদের মূল্য বিঘরেই প্রয়োজনীয়—অতি প্রিয় বস্তু। শিক্ষার প্রচারে, সাংবাদ প্রচারে, দেশ-বিদেশে পরস্পর মিলনের কেন্দ্রস্থলে ইহা সভ্যজগতের এক অপূরণ অত্যাবশ্যক দান।

—:—:—



## মহড়া

( দৃষ্টকাব্য )

[ পূর্বাভাস ]

শ্রীমহাকবিমহাশয় দান

( হমড়ার প্রবেশ )

হমড়া।—সেবে পালঙ্ক বেটা মহড়া কতারা?

কোথার যে রে গেছোঁকতা দেখি না তাহারে।

পালঙ্ক।—দেবি নাই তো মহরারে, জানি না সে কোথা।

হমড়া।—সেবি আমি কোথার গেল থাকে যথা-তথা।

পালঙ্ক।—আসমান ছুঁড়ি' মেথ এগেছে বর্ষা আসে পাছে

চল সবে দেখি গিয়া মহড়া কোথার আছে।

( পালঙ্ক ও বেদের মেয়েদের নাচিতে নাচিতে ও গারিতে গারিতে প্রস্থান )

গান

আকাশ-ভরা মেঘ জমেছে আঁধার আনি' সাথে

'নউ কথা কর' বলি পাখী কান্দে পথে পথে।

ওরু ওরু ডাকে দেয়া খিলিক দিয়া যারি

পূবেতে গজিয়া পরে পশ্চিমেতে ধার।

হাতে ল'য়ে সোপার বাহি বর্ষা নামে রথে ॥

( প্রস্থান )

[ বিশ্বজনন মহরার প্রবেশ ও একবানী পাথরে উপবেশন।

পরে মহরার মনের হুণ্ডে গান ]

গান

কোথার ভরে প্রাণের বঁধু আমার গলার মালা,

রেখ 'আমি' তোমার লামি' কান্দে বেদের বালা।

তুমি হও তরু বন্ধ, আমি হই লতা,

বেড়ি' তোমার চরণ যাব তুমি যাবে যথা।

তুমি আমার ক্রম-বদ্ধ আমি তোমার ফুল,

আমার মধু পিয়া তুমি হইবে অকুল।

নাহি দেখা দিবে যদি কেন দিলে আশা,

দেখ কান্দি' নিশা পোহার তোমার বেদের বালা।

দ্বিতীয় দৃষ্ট

[ পূর্ণহস্ত নিয়ে বেদের কুটারের নিকটব বনপ্রান্তর—

এক পার্শ্বে বেবে-মেয়েদের নৃত্যগীত ]

গান

মেখে করে খিলিমিলি সোপার বরণ ঢাকা,

সন্ধ্যাবেলায় চান্দনী উঠে গায়ে হলুদ-মাখা।

মেঘের গায়ে করে বেলা চাঁদের দেশের মেয়ে,

মেঘের উপর চড়ি' তারা নাচে মেখে মেয়ে।

চাঁদের রাগার নুপুর বাজে আসমান দেয় সাড়া,

মেঘের রঙে মেখে কেশ তার জলে আঁখিতারা।

নাচে নাচে মেঘের মাঝে মেলি' সোপার পাখা

চাঁদের কোলে পড়ে চ'লে মুখে সোহাগ আঁকা।

( পালঙ্কের প্রবেশ )

পালঙ্ক।—কোথার জান মহড়া সই? এখানে তো নাই।

কোথার থাকে আপন মনে খুঁজিয়া না পাই।

একজন বেদের মেয়ে।—কি জানি ভাই কি যে ব্যথা

মহরার প্রাণে,

মুখে নাই সে হাসির রেখা' বোগ দেয় না গানে।

একলা থাকে মুখটা বুজি' বনের কিনারে,

কাছে গিয়ে পাই না সাড়া যত ডাকি তা'রে।

পালঙ্ক।—জানি না ভাই কি যে তাহার মনে আছে ব্যথা,

ছাড়ি' অববি বামনকান্দি কয় না সে যে কথা।

মনে হয় সে নদেরকীর্ষের প্রবেশে পালঙ্ক,

তা'র বিহনে নিজা যায় দ্যা ছাড়ে অঙ্গুল।

ভইয়া থাকে ভূমির উপর আঁচল পাতিয়া,

সিন যায় যে রাজি যায় যে কান্দিয়া কান্দিয়া।



(স্বজনের প্রবেশ)

স্বজন।—শোন শোন মহায়া রে শোন আমার কথা,  
নন্দেরা কুর লগি' তুমি কেন পাগুরে ব্যাধ।

এতদূরে গমন বনে কেননে আসবে সে  
আমায় বিয়া কইরা কড়া থাক এই দেশে।

মহায়া।—বারে বারে স্বজন তুমি কেন আমার কালাও।

হুৎসের উপর হুৎস দিয়া কেন আমার কালাও।

স্বজন।—মিছা তোমার মনের ব্যাধ, মিছা জ্ঞানহারা,  
মিছা তুমি ঠাকুর লাগি' ভাবি হও রে সারা।

সে ছিল যে সপুত্র পরাণ খোলা শিকারী,  
তুমি ছিল ছা'নিমের-তা'র খেলার কৈতরী।

ভালবাসা বেদের বালাধ থাকবে কিসে তা'র  
জুগি' মধু কেইলা সিত বাসি ফুল হার।

মহায়া।—কেন আমার কালাও তুমি সমুখ হইতে বাও  
আপন বনে কান্দি আমি, আমার ছাইড়া দাও।

স্বজন।—আমার বিয়া করবা তুমি কহ একটি কথা,  
যাইব আমি যাইব নিশ্চয় বলবা তুমি কথা।

মহায়া।—বিব আমি গলায় দড়ি ভুব নদীর জলে,  
তবুও না ভুব আমি তোমার কথার জলে।

স্বজন।—কহ তুমি সত্য করি' করবা কি না বিয়া।

মহায়া।—তারার আগে মদব আমি গলায় দড়ি দিয়া।

স্বজন।—(সবোয়ে)

দেখব আমি থাকে কেমন তোমার এমন জেদ,  
ইহার তরে পকেতোমার করতে হ'বে খেদ।

আসে যদি নন্দেরা কুর পরাণে বধিব,  
সমুখে হারিয়া তারে আনন্দে নাচিব।

(স্বজনের প্রস্থান)

(পালকের প্রবেশ ও গীত)

গান

পালক।—গীত গুণ স্বজনের কড়া মালতীর মালা,  
আসে তোমার মনচোরা বকুলগাছের তলা।  
কোন বা দেশে থাকে কখন কোন বাগানে বসে,  
কোন বা ফুলের মধুর আশার কিরা কিরা আসে।

না ফুটিতে বনফুল রে তুণিতে সে কলি,  
মধু না আসিতে ফুলে কেন জুটে অলি।  
এসেছে তোমার বধু আধারেতে আলা,  
উঠ উঠ প্রাণসরি, উঠ বেগের বালা।

মহায়া।—(আবেগের সহিত উঠিয়া)

কি হেরিলি বল না সখি হেঁরাগি তোর থাক  
বল না সখি কি বলিলি আমার পরাণ রাখ।

পালক।—দেখিছি সখি নন্দেরা চলে যুগেতে বনের দ্বারে,  
তোমার পুঁজুতে আসছে ঠাকুর এই না নদীর পারে।

আর না থাক বিরস বদন হুৎস তোমার নাই,  
আসছে তোমার প্রাণের ঠাকুর আসছে তোমার ঠাই।

মহায়া।—(বাত হইয়া)

কই! কই! পালক রে নন্দেরা কুর কই?  
চল রে সাথে দেখব তারে নিয়া চল রে সই।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপর পার্শ্ব দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নন্দেরা প্রবেশ)

নন্দেরা।—দিন যায় মাস যায় বছর যুঁহা আসে,

মহায়া বেদের কড়া নাই রে আমার পাশে।

খুঁজছি তা'রে বনের দ্বারে খুঁজছি পাড়াভূতল,

তবু না মিলিল কড়া একেমন তা'র ছল।

বল বল তরু লতা বল দ্যা করি'

এই পাথে যাইতে কি দেখেছ মহায়া স্বন্দরী।

বেগের মতন কেশ রে তার তারার মতন আঁখি,

কোণার উইড়া গেল আমার পিঙ্গেরি পাখী।

বল বল কোণারি গেলে তা'র পাব মরশন,

তিসকে আর না হ'লে দেখা আমার নিশ্চয় মরণ।

(এমন সময় অজ্ঞাতর দিয়া প্রবেশাশ্রম মহায়ার গান

নন্দেরা তাদের কর্ণে পৌছিল)

গান

মহায়া।—যেদিন হ'তে দেখেছি বন্ধু তোমার চাঁদখুঁ,  
সেদিন হ'তে দীপাল আমি গিয়াছে মোর স্বপ্ন  
আঁধারে ভুবেছে যেন চন্দ্র, হৃদয়, তারা,  
তোমার ছাড়ি ছিছি আমি ছুটি আঁখিহারা।

কপালেদি দেখে বন্ধ নাহি বাপ ভাই,  
কোলের দরদী কেহ তুমি ছাড়া নাই।  
মুখ না ফুটে রে বন্ধ কেটে যাব রে বন্ধ,  
অলহ আশুনে মোরে আলায় পোড়া দ্বা।

(নন্দেরা চাঁদ দৌড়িয়া মহায়ার কাছে গিয়া তাহার কণ্ঠস্বর  
হইয়া)

নন্দেরা।—কার ভাবনার বিরস বদন ঢকে বহে পানি,  
চিনতে আমার পার কড়া আমার পরাণ-রাগি?

(মহায়া চমকিত হইয়া কিরিয়া ঈর্ষ হাসিয়া)

মহায়া।—তুমি যে বিদেশী ঠাকুর কেননে চেনা যায়,  
মহায়ার প্রাণ তবু লুটাইছে ঐ পায়।

নন্দেরা।—জানি জানি জানি কড়া জানি তোমার ছল  
পুঙ্খ বীথিতে তুমি জান কত কল।

আমার প্রাণটি চুরি ক'রি উড়ছ বনের পাখী,  
কান্ধতে কান্ধতে ঘুরি বনে অন্ধ হইছে আঁখি।

মহায়া।—মিছা কেন কও রে বন্ধ দেখ আমার পানে,  
তোমায় ছাড়ি ব'ল মলিন স্বপ্ন নাই মোর প্রাণে।

তুমি পার নন্দেরা কুর পাইতে কত নারী,

দয়া কইরা বাগছ ভাল বেদের কুমারী।

কিত্ত তা'র তো তুমি বিনা অজ কেহ নাই,

চরণ-তলে দিও হান রে আর না কিছু চাই।

নন্দেরা।—কি কহ যে বেদের বালা কি কহ যে কথা,

এমন কথা শুনলে আমার প্রাণে লাগে ব্যথা

তুমি আমার পরাণ-প্রিয়া নয়নে গিয়া আলো,

তোমায় আমার ক্রম দিয়া বাসিয়াছি ভালো।

আর তো তোমায় ছাড়ব না রে এই করেছি পুণ,

বনের দারা বাসা বান্ধা থাকব ছইজন।

(পালকের সহসা প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

গান

মিলেছে কি শুকের মাথেরে বিরহিনী সারী?  
বেথেছে কি বুকের মাঝে প্রাণবধু নারী?  
তোমার বন্ধু বনের পাখী উইড়া কিরা গুঞ্জে,  
এবার যখন পড়েছে ধরা বাঁধ প্রাণের পিঙ্গরে।

মধুলাতে আসছে অলি বনফুলে বিহঙ্গর,  
রাখ তারে রাখ ধরি রাখ হিয়া ভিতরে।  
শিকারে এসেছে আঁখি চতুর শিকারী,  
দেখ যেন পরাণ রাখ উড়ে না সে ছাখি'।

মহায়া।—মিছা কেন পালক সহি বাড়াবাড়ি করিস,  
বুঝি না রে তুই যে কত রসিকতা জানিস।

পালক।—থাক থাক চাটকিনী হুখাভাও নিয়া'  
নন্দেরা কুর রহন হেখাও তারি হেখাও হিয়া।

(পালকের প্রস্থান)

মহায়া।—(অগ্রসর হইয়া নন্দেরা দ্বারের হস্ত ধরিয়া)  
জালকের মত রহ ঠাকুর হিঙ্গল গাছের তলে,

কালকে বন্ধ তোমার লইয়া যাব অন্ধলে।

(মহায়ার অঙ্গল বিছাইয়া দেওন এবং নন্দেরা দ্বারের নুকতলে  
শয়ন ও নিদ্রা)

(অন্তর্গত স্বজনের গোপনে প্রবেশ এবং বিষমপূর্ণ  
দৃষ্টিতে মহায়া ও নন্দেরা দ্বারকে অবলোকন; পরে ক্রমশঃ  
করিয়া শাসাইয়া)

স্বজন।—এখানেও জুট ঠাকুর বেদের বালা তারে  
ভাবছ বুঝি মহায়া রে বিধবা প্রেমের বায়ে।  
চেন নাই কি স্বজন চাঁদে তোমার চুম্বন রে  
যাই যে আমি খবর দিতে বেদের মর্দার রে।

(স্বজনের প্রস্থান)

(দীপের দীপের মহায়া উঠিয়া একটু দূরে পাথরের উপর বসিয়া  
গান ধরিল)

গান

কতদিনে বন্ধ আমার আসবে স্বপ্নের দিন,  
তোমার লাগি' ভাবি আমার যৌবন হ'ল কণ  
আন চোপের জল আমার চোপের জোতিঃ হীন,  
মলিন হইছে ব'ল আমার যুগের হাসি লীন।  
কতদিনে বন্ধ আমার আসবে স্বপ্নের দিন।



(হুমড়া কৃত প্রবেশ)

হুমড়া। মহা যে এতরায়ে নিভা কেন না যাও,  
কিদের তোমার ভাবনা এত বাপকে কেন না কও।  
বোল বছর পাললাম তোমার কত দুখে করি'  
একটা কথা রাখবে আমার মহা হুমরা।

(দূরে নদেরচাঁদকে নিমিত্ত বৈখ্যা দ্রব্য হাসিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিয়া ও বন্ধের কাপড় হাতে ছুরি বাহির করিয়া)

এই ছুরি লইয়া তুমি যাওরে এই ঘরে,  
তাইয়া আছে নদেরচাঁদের মাইয়া আস তাহা।  
ভিন্নদেশী দুখমণি রে মর-তর জানে  
বুকে তা'রে মাইয়া ছুরি মার তাহা প্রাণে।  
আমার মাথা খাও রে কত আমার মাথা খাও,  
দুখমণের মাইয়া তুমি নদীর জলে দাও।

(মহা চমকাইয়া উঠিয়া তন্ত্রিত হইয়া বসিয়া রহিল)

[দূতের একটি পরিনর্তন। আকাশে তারা ছুবি,  
চাঁদ দেখা গেল না, ঘোণালী চাঁদিনি-রাত পাতলা  
মেঘে ঢাকা পড়িল]

হুমড়া।—কেন কত এমনভাবে আমার পানে চাও,  
এই লগ্নে রে বিয়ের ছুরি শীঘ্র তুমি যাও।

(তথাপি মহা নড়িল না, শুধন হুমড়া  
গর্জন করিয়া উঠিল)

না না আমি তখন নী রে নদেরচাঁদরে মার,  
মার্ব আমি নিশ্চর তাহাে নিতার নাই রে তার।

(হুমড়া মহার কপলে ছুরি দিয়া প্রস্থান করিল।)

মহা কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস  
কেনিয়া ছুরি হাতে লইয়া উঠিল। গাছের তলায়  
নদেরচাঁদ নিমিত্ত ছিল। চাঁদের আলো আহার যুগে  
পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে ক্রান্তিভঙ্গীতে ছুরিকা-  
হাতে মহা নদেরচাঁদে নিকটে গিয়া।

মহা।—ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর ফিলপাছের তলে,  
আসমানের চাঁদ যেন রে আধার রাতে জলে।

উঠ ভেদ বন্ধ আমার কত নিভা যাও,

অতীর্ণ মহা ডাকে আঁধি দেখি চাও।

পাখাণ বাপে দিল ছুরি তোমারে বখিতে,  
সেই ছুরি মাইয়া বুকে চাই গো পুরাণ দিতে।  
বিদায় দাও রে প্রাণের ঠাকুর মহা দাসীয়ে  
তোমার পদে মাথা রাখি জীবন ত্যজি রে।

(মহার নিজের বকে ছুরিকাখাতের উত্তোণ এবং  
নদেরচাঁদের সহসা জাগিয়া চমকাইয়া  
মহার হস্তধারণ)

নদেরচাঁদ।—কি কর কি কর কত শিরের আসিয়া,  
হাতে কেন ছুরি লইয়া কাঁদিত বসিয়া।

মহা।—তখন তখন প্রাণের ঠাকুর তখন মোর কথা,  
কতিন তোমার প্রাণ-প্রিয়ার কতিন বারতা।

নিষ্ঠুর আমার মাতা-পিতা পাখাণ-পরাণ,  
তোমার বখে আজ্ঞা দিল কহিয়া সন্ধান।

হাতে দিল বিবের ছুরি বখিতে তোমারে,  
নিজের বুকে মারি আমি, তুমি বাইও ঘরে।

তোমার পায় মাথা রাখি মহা মরিবে,  
তোমার সাপে দেখা বন্ধ আর না হইবে।

নদেরচাঁদ।—তোমার তরে ছাড়ছি বাড়া দিছি আতিকুল,

ভ্রমর হইয়া কিরি আমি তুমি বনফুল।

তোমার লাগি ছাড়ছি দেশ বেড়াই বিশেষে,  
তোমার ছাড়ি' মহারের না বাইব দেশে।

তোমার যদি না পাই কত মিথ্যা জমি বাড়ী,  
লও রে আমার পরাণ তুমি বুকে ছুরি মারি।

মহা।—পইড়া থাকুক মাতা-পিতা পইড়া থাকুক ঘর,  
তোমার লইয়া বন্ধ আমি বাইব দেশে।  
ছটা আঁধি বৈদিক যায় রে বাইব সেইখানে,  
আমরা দুজন মনের হুখে থাকব গহন বনে।  
কেউ না বলে সন্ধান সেখা না জানিবে কেহ,  
বনের মল রে হ'বে আহার বনে হ'বে গৈঃ;  
বাপের আছে তেজী ঘোড়া নদীর এই না ঘারে  
দুইজনেতে উঠি চল বাইব দেশান্তরে।

(মহার গলা ধরিয়া)

চল গবি চল শব্দ চল গবি বাই,  
বনে বনে থাকব আমরা দেখা হুথ হাথ।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপর পার্শ্ব দিয়া হুমড়া, মাণিক ও স্বজনের প্রবেশ)

হুমড়া।—কোণায় গেল নদেরচাঁদের এই না ছিল হেথা,  
আইল কত ছুরি হাতে সেই বা গেল কোথা।

মহা পলাইল রে নদেরচাঁদের সাপে,  
উড়ল আমার পোখা পাখী গভীর গহন রাতে।

কত যত্নে পাললাম আমি মহারেরে তোরে,  
এমন ব্যথা আমার প্রাণে কেন দিলি ওরে?

কেন কেন নদেরচাঁদের বেদের বাসায় পড়ি',  
মেহের শাবক কত আমার নিলি তুই রে বাড়ি।

কোণায় স্বজন, মাণিক তাই দেখা আমি হেথা,  
নদেরচাঁদের মহারেরে লইয়া গেল কোথা।

হুমরা।—আমি তা'রে আনব ধইয়া যেখা যেন থাক',  
নদেরচাঁদের শোণিত-পানে দ্রব্য জুড়ায় বাক'।

মাণিক।—যেখায় বাবে সেখায় বাবে তোমার সাপে তাই,  
মিথ্যা ছাড়িয়া জমি বাড়ী সকল হুখে চাই।

(স্মরণার্থে ধামিয়া)

বনের পথে চুড়ু আমি জলের পথে বাব,  
পাহাড়চূড়ায় চড়ব আমি, যেখা সন্ধান পাব।

নদেরচাঁদের বকে আমি এ ছুরি হানিব,  
কত আমার যেখা থাকে বাড়িয়া আনিব।

[সকলের প্রস্থান]

পট-ক্ষেপণ

## গৌরীর তপস্তা

ত্রিগুণিত্বয় রায়

বিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে বিখ্যাত মুটাইয়া তোলাই কবিত্ব  
—গবির। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের চির-অবস্থান ঘটনায়ে,  
কিন্তু কবি তাঁহার সমসাময়িক দৃষ্টিকোণে শাস্ত্র সৌন্দর্যে  
অভিব্যক্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পক্ষে প্রমুখ-  
গম্যের মত চিরকালের শোভার দেবীপায়ান হইয়া রহিয়াছে।  
সকল চিত্তেরই একটা “চির-সংস্থান” (ব্যাক-এন্ড-ও) পাকা  
চাই। সেই জন্ত স্থানকালাতীত যে সৌন্দর্য সত্য, তাহা  
প্রকাশ করিতে হইলে স্থান ও কাল দ্বারা বন্ধিত অবস্থা-  
বিশেষের পরিকল্পনা অবশ্যই করিতে হয়। কুমার-কাব্যের  
নাট্যিকার চরিত্র-চিত্রণে তাহাই আমরা লক্ষ্য করি; স্মৃতির  
বগি, বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগপ্ৰাণ্ডায্যাপী ধর্মের কথা মনে না  
রাখিলে গৌরীর “চরিত্র” আমরা বুঝিব না—দ্রুতিতে

পারিব না; কারণ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে বিশেষ কালের  
পক্ষেই চিরকালের পদ্য তাহার মূল গভীরভাবে প্রেরণ  
করিয়া থাকে।

কবি ও প্রকৃতি সৃষ্টি-ব্যাপারে অভিন্ন পদ্য অবলম্বন  
করে। “ভাব হ'তে রূপে অবিরাম বাওয়া আসা”—ইহা  
সৃষ্টিরহস্যের সংকীর্ণতম এবং শোভনতম সঙ্গীত নয় কি?  
মাহুয বলিলে—দ্রুপৎ দুইটা বন্ধনা আমাধিগের মনে আসে,  
এক প্রত্যক-মাহুয—অপর পরাক্ষ মাহুয; এক ভাব-মাহুয,  
অপর রূপ-মাহুয। ভাব-মাহুযকে বাদ দিলে রূপ-মাহুযকে  
গড়িয়া তোলা যায় না; রূপ-মাহুযকে বাদ দিলে ভাব-মাহুয  
অপ্রত্যক থাকিয়া যায়। এই জন্ত বিশেষ অবস্থার আবহু-  
গৌরীর চরিত্র যতদূর মুটাইয়া ব্রুতিতে হইবে, আবার



বিশেষ অবস্থাকে ছাড়াইরা যতখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে হইবে; তাহা হইলেই ভাব ও রূপের সুসামঞ্জস্য হইবে এবং আমরা গৌরী-চরিত্রের সর্বস্বার্থী সৌন্দর্য—সমগ্র সৌন্দর্য বুঝিতে সক্ষম হইব।

প্রথমতঃ বিশেষ কালের গৌরীকে বুঝিতে চেষ্টা করি।  
কুমার-কাব্যের এম সর্গের গৌরীর তপত্যা বর্ণিত হইয়াছে।  
মদন ভট্টকৃত হইলে—পূর—গৌরী মোহিত-মেখলা ধারণ করিয়া গৌরী-শিপের তপস্যার প্রবৃত্ত হইলেন (অনন্ত ও তপস্যার উদ্দেশ্যে নির্লাপ-যাত নহে—মদন-ভট্টকর্তার শিবের পত্নী-হাভাই 'তপস্যার উদ্দেশ্যে') এবং “মহাসারসীক-বাসকপরা” হইয়া “কল্প-সাধন করিতে লাগিলেন। তাহার সেই অতুতপূর্ণ তপস্যার আকৃষ্ট হইয়া শিব যথাক্রমে তপস্যার উদ্দেশ্যে সেইখানে উপস্থিত হইলেন এবং বাহা আশা করা যায় না (তৃতীয় সর্গের মদনভয়ের কথা মনে করিয়া) বিজয়ের মত গৌরীকে মুহুমত ভঙ্গসনা করিতে লাগিলেন। আমরা বলিব—শিবের অবশ্যই মদনভগ করিয়া সিংহাসন লাভ হইয়াছিল; তাহা না হইলে তিনি তপস্বী (১) গৌরীকে ভঙ্গসনা করিবেন কেন? সত্যি তো গৌরীর পক্ষে তপস্বিনী হওয়া বিতৃপ্তনা মাত্র—শস্যার শরান হইলে সর্বশক্তিগত গুণের আঘাতে যে চারুগাঢ়ি স্রিষ্ট হ'ন, তাহার পক্ষে তপস্যার মদনভগন যে অস্বাভাবিক তাহা সকলেই বলিবে। ছদ্মবেশী শিব চম্পু বামিতার সহিত তাহাই নির্ভায়ে বলিলেন। সেই বল-ভাণ হইতে দুই একটা কথার উল্লেখ এখানে করিব। শিব বলিলেন, কল্প-সাধনে আমনি সকলের গুরগণানীয়া হইয়াছেন সন্দেহ নাই—কিন্তু যে ক্লেশোবির, আপনি আত্ম-লোভনীয়া, আপনার “মনাবহঃ”—এবং আপনি রীক্ষপুত্রী—আপনি কিরূপে জ্ঞত তপত্যা করিতেছেন—বুঝি না—আপনার আবার কিসের উদ্দেশ্য?.....  
আদিম বসন্ত-প্রাতে উদয়ী বেদিল মস্থিত সাগর-তটে পদ-কোরকপ্রত পদ হাপন করিয়াছিলেন—সেদিন এই ছদ্মবেশী উদ্ভিহিত থাকিলে অল্পরূপ কথাই তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইত—হে সুন্দরী, আপনার আবার তপত্যা কি? রূপই তো আপনার তপত্যা—বৌদনই তো আপনার তপত্যা—আর আপনার প্রাণিত বসি কেহ থাকে—তবে তাহারই তো

তপত্যা করা উচিত; কারণ, “ন রম্যমুখ্যিতে মুখ্যতে হি তং (রমণীয় মনসহস্য বসেরই সখী—সাধনার দন)—রে সমতপাতি, আপনার পক্ষে তপত্যা করা কেবল রূপ না—অনাবগত” বাহ্য মাত্র..সুতরাংপরে পরে যেমন রূপকে আবে—গঠন-সুগের পরে তেমনই বিভা-মুগ আসে—“উজ্জ” সুগের পরে তেমন “অন্ত” মুগ আসে। মদন-ভগ্ন, গৌরীর তপত্যা—ইহা সম বিচারসুগের কথা—দ্বন্দ্ব-সুগের কথা—গঠনমুগ, রূপমুগ, সত্যসুগের কথা নয়। কুমার-কাব্যের গতি-ভট্টী কিং (সৌভাগ্যের কথা) এই মধ্য-সুগী মনোভায়ে পর্যবসিত হয় নাই—কবি এই বিচারসুগের মনোভায়ে সত্যসুগের (গঠন-সুগের) মনোভায়ে অনাবগত পরিবর্তিত করিয়াছেন। যে সময়ে উত্তর-কোশল হইতে দক্ষিণে অঙ্ক পর্যন্ত সহস্র সজ্জারামে শত সহস্র যুগ্মী “ভিক্ষুগাত” গ্রহণ করিয়া দণ্ডচর্চা করিতেছিলেন—সেইসুগে তপত্যানিরাগ গৌরীকে—জীবনের ভাঙ্গা—তনাইবার পক্ষা কবি বাহা হইলেন—গৌরীর সখী-মুখে কল্যাণাক্রমে বাহাইয়াছেন—গৌরী নির্লাপ-নাভের তপতা করিতেছে না। “পিনাকপাশিপতি বাহু: মিচ্ছতি”র তপতা করিতেছে; হৃতরাং বলিতে সাধ করি, মহাকবির জ্ঞত-তারিখটা পড়িলে সেই দ্বন্দ্বের তপত্যা—য শতাব্দীতে নির্লাপ-বাদ গভা ও গোদারী-ভীরে নির্লাপ-প্রাপ্ত হইতেছিল—আবার দেশে “জন্মের” হস্তের আরোহন হইতেছিল। সে বাহাই উটক ও কথার উত্তর প্রত্যাশিক দিবনে—ঐতিহাসিক দিবনে। আমার কর্তব্য কাব্যের মধ্যে জীবনের জয়ধ্বনি আবিষ্কার করা—বিশেষ কালের বিশেষ তথ্যকে উদ্ভাটন করির চেষ্টা করা।

তাই বলি—অবস্থা কিংবা উদ্ভ্রান্ত্রী কিংবা তপস্কার সজ্জারামে রজন মণ্ডিত শ্রোত্রী যে কল্পাটী (মানস সরোবরের স্বর্ণ-স্রোতঃ যে কন্ডার রূপভাষিতে হস্তান হইয়া যায়) ভিক্ষুগাত গ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি যখন আচাচ্চ-স্বাধ্য—

“বদ প্রভাবে স্মৃতিচম্বতাকা

নির্ভাবরী বস্ত্রগায়ক কল্যতঃ”

নিয়কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন—তখন যে তিনি অস্বাধ্যের “অজ্ঞাতা বুজিতচা” হইয়া পড়িলেন—তাহাতে আর কোন

সন্দেহ নাই। বৌদনে “বাহু-শোভি”—বস্ত্র-পরিহিতা সেই কন্ডাও চিত্রিত-দৃষ্টে হয় তো ইতস্ততঃ নির্লাপ করিতেন, তাহার জড়-কি কোনো ছদ্মবেশী আবির্ভব না; মহাকবির মহাভাঙ্গ কি তাহার দ্বারেরও পৌছিলেন না। জীবনের জন্মার্থ পথে পৌনঃপুনিক দৃশ্য করাই যে বেবেদেবের একান্ত স্বভাব। তিনিও কি কোনো বিশ্বরণের দৃষ্টে, অদতক “মুহুর্তে” “তনভিন্নবকলা” হইবার গৌরব লাভ করিবেন না...শরৎকালের সহিত বসন্তকালের যে পার্থক্য, ও সর্গের মহাদেবের সহিত এম সর্গের মহাদেবের সেই পার্থক্য লক্ষ্য করি—বোধ বেবতার সহিত হিন্দু-বেবতারও সেই প্রভেদ—ইহাই জে স্থলে মনে রাখিব; তবে, মহাদেব যে হিন্দু-বেবতা ইহার মধ্যেও কোনো সশব্দই নাই; কারণ তপস্বিনীর সঙ্গে যিনি প্রবেশ পড়েন—তপস্বিনীকে যিনি গৃহীণা করিয়া—তিনি যে বোধ বেবতা হইতে পানেন না—ইহা বালাই—ভাবনা। ভগ্নাথ শিবজটাজুটের এখিঘদন হইতে বাহুবীর মুক্তি-ধায়েক মুক্ত করিয়াছিলেন—মহাকবিও ভাষনধারাকে বিরুদ্ধ মতাদেশের জটিল এখি হইতে মুক্ত করিলেন—সেটামোরা এখনও বহিরা চম্বিয়াছে—শতধায়া উৎসাহে অকীয়াদিত্য—যামিরা পড়িবার “মহতো” ভয় হইতে মহাকবি চিরকালের জন্ত আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। বসন্ত: কুমারসম্বরের মত একখানি জীবন-কাব্য পৃথিবীতে নাই।

ইহােজ্ঞতে একটা কথা আছে—যাত এবং প্রত্নিতাত সমূহা কিন্তু বিপরীত। সত্যতঃবসের শিতপাঠা ইতিহাসে পড়া যায়—সুবেপ, স্বকুমার, স্বভোচিত যুক্ত শিলাকী কেমন করিয়া রম-বৃদ্ধ-মুক্তকে দেখিয়া জীবনে হতভাঙ্গ হইয়াছিলেন এবং গভীর বিশ্বাসে য় হইয়া সাধারণতঃ করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশী শিবকে গৌরীর সখী যখন জানাইলেন—গৌরী “পিনাকপাশিপতি পতিমামু মিচ্ছতি”—তখন ছদ্মবেশী ছদ্মপাঠায্যের স্বরে বলিলেন—বুদ্ধ-কল্প-মহানভারী শিবকে পতিয়ে বরণ করিয়া আপনার সখী—গাংর রূপ-বাব্যা জোংগার মত নেত্রোৎসবকারী, বুদ্ধদেবের শোচনীয় হইলেন। যেদন আঘাত—ভেমনি প্রত্নিতাত—জীবন পথে রম-বৃদ্ধ-মুক্তকে দেখিয়া বুদ্ধদেব জীবনের অন্তরঃ বুদ্ধিয়াছিলেন এবং অপরকে বুদ্ধিয়া-

ছিলেন—সেই রম-বৃদ্ধ মনশানারীকে মহাকবি গৌরীর পতিয়ে অনাবগত বরণ করাইলেন। বৌদনের একদেশ-দর্শিতা হিন্দুর সমর্থনিতার দ্বারা সংশোধিত হইল; কারণ, ছদ্মবেশীর ছদ্ম বামিতার উভয়ক হইয়া যখন গৌরী কোঁচের কণ্ঠে বলিলেন—“মদাং ভাবি করসং মনঃ স্তিতম্” (শিব রমাই হইলেন—বুদ্ধই হউন—মনশানচাইই হউন—তাঁহার উপরেই আমার ভাবিকরসং মনঃ স্তিতম্) তখন ছদ্মবেশ (অথবা প্রজ্ঞা বৌদনের) আর কিছু বিনিবার রহিল না; কারণ, ভাব বুঝাইলেনও যে মন বুঝিবে—তাহাকে বুঝাইয়া লাভ কি! বোধ-হিন্দু স্বদে হিন্দুর জয়লাভ হইল—গৌরী শিব-গৃহীণী হইলেন। এইরূপে বিশেষ কালের গৌরীকে আমরা বুঝিতে পারি। বিরুদ্ধ মতবাদের নিমিত্ত পাথরের উপর স্কট পর্ব-রোণার মত “যে কাঞ্চনবর্ণা তপস্বীকে মহাকবি কর্ণাবলি স্বজন করিয়াছেন—তিনি চিরকালের স্থগিত হইয়াও বিশেষ কালের মাধুরীতে অপরূপ শোভা লাভ করিয়াছেন। আজ বহুকাল পূর্বে—এই জরনীলা নারীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলেই আমরা আদ্যর আপ্যাদন লাভ করি। সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুতব করি কি মহা সামর্থ্য থাকিলে—এমন মৎসুপ্তি সাধারণত হয়।

পৃথিবীর মাথা কিছু মহাশক্তি, তাহাই বিশেষ কালে এবং অবস্থাকে অতিক্রম করে। কুমার-কাব্যের গৌরীর চরিত্রও তাহা করিয়াছে। এক সর্গের গৌরীর চরিত্রে বিন্যাসীয় স্মৃতিয়া উঠিয়াছে। এখন সেই চিত্রকালের গৌরীকে বুঝিবার চেষ্টা করি। কাব্যের নারীকা এবং সংসারের নারী হয় লতিকার মত নির্ভরশীল—না—যে নারীর মত দুর্ভজতা। কুমার-কাব্যে নারীকা লতিক-প্রকৃতি নহেন—নারী-প্রকৃতি। প্রত্যেককথা শিশুর শলাটা নিমিত্ত স্মরণ উচিত যখন মনকে নিম্নদেশে ভরীভূত করিল—তখন গৌরী আদ্যন: লতিকঃ বধুঃ ব্যর্থঃ সমর্থঃ—পিপাতালের কিরিয়ণ গেলে; প্রতিজ্ঞা করিলেন, রূপকে তিনি সক্ষম করিবেন—চাকাতকে সোজাভাবে করিবেন। এই প্রতিজ্ঞাতেই তাহার নারীপ্রকৃতি স্থিত হইয়াছে। সাংসার-ক্রম ভয় হইলে যে বারী “পতনার কলহে”—গৌরী জে বস্তরী নহেন; পরন্তু সহস্র যোজন দূরের সমুদ্রে মিশিবার উৎসাহ এবং একাত্মতা কুমার-কাব্যের গৌরীর আছে। প্রাণিত জন বড়ই দলভ

# Numbering Error



মহার্ণব রয়ের মত হুগাণ্ডা—কিন্তু তাই বলিয়া কি পাইতে হইবে না—কারণ প্রার্থিত জন যে “বচু”—প্রার্থিত জন যে হই। প্রার্থিত জনকে না শাইলে যে জীবনই রূপ। তাই সেই কুরুক-কৌমল্যী গৌরী কীর্ণ কটিতে মোড়ী-বেশনা দুট-শিনক করিয়া হুহুসহ কুরু-সাধনা এবং বৃহদ্রত তপস্চর্যা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই যে তপস্যা—ইহা হইল রূপের তপস্যা—জীবনের তপস্যা—মাতৃস্বের তপস্যা—যর বাঁধিবার তপস্যা—নির্ধা-নাভের তপস্যা, বৌদ্ধ ভিক্ষুর তপস্যা নহে। ইহাতে তাগ নাই—ছাড়িয়া দিবার কোনো কথা নাই—দান আছে—আত্মদান, আত্মোৎসর্গ আছে—কারণ বিবাহই বহু—সহিবহু। মুক্তি—জীবাশ্রয় সহিত পরমাশ্রয় মিলন ইত্যাদি কট-কলনা কুমার-কাব্যের হরগৌরী-মিলনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বলিতে গিয়া দেখে যেন না করেন। কুমার-সম্ভব-কাব্য আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ নহে। “ওথেলো”কে পাইবার ভুল যে একদিন হেন্সেমনা অভিনয় করিয়াছিলেন—তাঁহার মূলও নারীপ্রকৃতির এই চিরন্তন সত্য রহিয়াছে। গৌরী এবং হেন্সেমনা-গুণিণী—যর বাঁধিবার তপস্যাই ইহাঙ্গিণের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। কিন্তু ইহাদের প্রার্থিত সর্গবাহু দুঃস্বাদ; কিন্তু না পাইয়াও ইহারা ছাড়েন না। নবী যেমন সাগরে মিশিবেই—ইহারা তেমনি বহু কাব্যে বিধি অতিক্রম করিয়া প্রার্থিত জনের পার্বে আসিয়া পড়াইবেনই। তবে—সেকুপীয়ারের “ওথেলো” বিরোগাণ্ড বলিয়া গণিত-কাব্য, সব কথা বলিবার সুযোগ কবির ঘটে নাই; মহাকবির কুমারকাব্য পূর্ণাঙ্গের কাব্য—পূর্বকাব্য—আরও যবের কাব্য।

গৌরী একরূপ নবীপ্রকৃতি না হইলে—ওর সর্বের শিবের রূপ আচরণের পরে আমাদের আশা করিবার কিছু থাকিত না; কিন্তু শিবের অবমাননার গৌরী আপনাকে পরাজিত মনে করেন নাই, পরন্তু উৎকট তপসা করিয়া শিবকে পতিতরূপ লাভ করিয়াছেন—মদনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন—এবং বলিৎ কি—তক্ষণী ও বিক্রমপীলার লম্বারদেশের সমস্ত ভিক্ষুরা ব্রতকে—তপস্যাতে নিরবধি এবং অবহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সুচিত্রিত “চালি”র আবেশ না হইলে হুগাণ্ডারের, হুগাণ্ডারের রূপ খোলে না—বিশেষকালের অগুণনের তলে না দেখিলে গৌরীর রূপও গুলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে কি মনে রাখিতে হইবে—উমাচরিত্রের (নারীচরিত্রের) শাশ্বত মতের কথা—কেমন করিয়া সহজ বাধ্যনি অতিক্রম করিয়া নারী বহুলায়নে প্রাণিতিকে লাভ করে। মহাদেবে পাণ্ডা—ইহা চিরকালের কথা; বৌদ্ধ-বান্ধাকে দূর করা ইহা বিশেষকালের কথা—উমা-চরিত্রের অবস্থায়ও এই অবস্থাতীত সৌন্দর্য—উমাচরিত্র বৃত্তিতে গিয়া মনে রাখিবার।

উমার তপস্যা—বিবাহের তপস্যা। হুতরাং বিবাহের কথা মনে না রাখিলে—বলিবার কথার অসম্পূর্ণতা থাকিবে। বিবাহের কথা বলিতে গিয়া মহাকবিরও অস্তরের উন্মাদ লক্ষ্য করি। রত্নবংশে ইন্দুভীর স্বয়ংবর-কর্নি তাঁহার লেখনীযুগে সর্বব্যাপী বিস্তারলাভ করিয়াছে। মহাকবি অনেক কিছু দর্শনীয় সবিচার বর্ণনা করিয়াছেন—শৈল, গুহ, সাগর—আরও কত কি; কিন্তু বিবাহের মঙ্গল-বাড়া যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৃশ্য—“দর্শনীয়া নামকং”। কুমার-কাব্যে এবং রত্নবংশে বিবাহযাত্রাদর্শনোৎসাহ পুরস্করণীয়ের লোভতা তাই কি মহাকবি অভিন্ন স্নেহে বর্ণনা করিয়াছেন। বিবাহমঙ্গলের প্রতি মহাকবিরই যে আত্মাহুগাণ্ডা হিন—তাঁহাতে আর কোনো কান্দেব নাই। সে বাহাই হউক—হরগৌরীর মিলনের কথা বলিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি শেষ করিয়াছি। সম্ভবতঃ সখীদিগের সহিত গৌরী বাসবের প্রবেশ করিয়াছেন—লজ্জাশীলার লজ্জা ভাষাইবার স্বর, শিব নানাবিধ শূভার-চেষ্টার আবৃত্তি করিলেন—অন্ততঃবাণী হইবে বিটু মুগুডী আরম্ভ করিলেন—সকলেই হাসি উঠিল—গৌরীকেও হাসিতে হইল—তবে গুহুভাবে—গুহু হাসিয়া...এই হাসির উপরই গৌরীর তপস্যার বদনি পড়ুক। বহুকাল অতীত হইয়াছে—উৎকর্ণ হইলে তুমি সেই হাসি ক্ষণ-মোহের মত এখনও ঘরে ঘরে প্রবাহিত হইতেছে। কেন যে প্রবাহিত হয় কুমার-কাব্যে তাঁহা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ স্মৃতিক তত্ত্ব।

## পঞ্চ-পু

( উপন্যাস )

শ্রীমতী সোম্যাদা ঘোষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শব্দহীন মধ্যাহ্ন। প্রচণ্ডমার্তও প্রবল কিরণধারা ধরবার উপর অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিয়া গগন-বক্ষে অগ্নয়ের হইতেছিলেন। দাবিকর-ক্লগসিত তরুণজরাগি অবশ-স্রিয়মাণ বেহে প্রবল উৎপীড়নকাতর তরুণের মতই অগ্নহারভাবে আতপ্ত-সমীরপ্রবাহে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছিল। স্থানীল নভঃক্ষেত্রে দুই একখানি লঘু ক্লক মেঘ খণ্ড বিহঙ্গ-পক্ষের মত চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়াইতেছে। সৌন্দ-কীর্তিমালিনী বিশাল নগরীর হন-কলরোল তখন অনেকটা শুভগ্রায়। দাববদ্ধ জনপদ যেন অবশ রিগে ভেদে মুষ্টিচের মত এলাইয়া পড়িয়াছে। প্রাপ্তপ পবন ক্লকদ্বার-বাতায়নে আঘাত করিয়া সবগে বহিয়া চলিতেছিল। তাগরই শব্দ শব্দ একটা অশুভ হাচাকরের মতই অবিশ্রাম শ্রবণ-পটে আঘাত করিয়া একটা অবশ্রিত ভাব অন্তরে জাগাইয়া তুলিতেছিল।

রৌদ্রতপ্ত রাঞ্জণ্য একজন হুবেশ যুবক দ্রুত চলিয়াছিল। স্বেদধারাসিক্ত পরিচ্ছদ তাহার গায়ের ভিতরে সলগ্ন হইয়া ভিতরের প্রমুদিত গৌরবর্ণতা বাহিরে দেখা বাইতেছিল। একটা ক্লান্ত অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব তাহার আননে বিরাজিত। যুবক মধ্যে মধ্যে লগ্নাত্ত স্বেদ-বারি ক্রমশে মুছিয়া লইতেছিল। কিছুদূর আসিয়া সহসা সে ধাঁড়াইয়া বিমিত কোঁহল দৃষ্টিতে পথপ্রান্তস্থিত আবর্জনা-স্থূপের দিকে চাহিয়া রহিল। পারিকৃত গুলি ও জঙ্গলের উপর বরাবর তকি একটা জিনিষ যেন ধীরে ধীরে নড়িতেছিল দেখিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বহুকাল সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া যুবক তাহার সমীপবর্তী আসিল। আর একবার সেদিকে চাহিয়াই বরাবর ত্রব্যটি সে যুবকের উপর তুলিয়া লইয়া ব্রতপক্ষপে পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। অদূর ঘন নীপ-শাখা ভেদ করিয়া একটা কঠোর বায়ব-কর্ত তখন চরিত্রিক যুগলিত করিয়া ধানিত

হইতেছিল। কিছুদূর আসিয়াই একটা পুরাতন দরপের জীর্ণ অথচ রূপে অটালিকার সমুদ্রে যুবক ধাঁড়াইল। বাটার প্রবেশ-দ্বার ভিতর হইতে আবদ্ধ। হস্তহিত ত্রব্যটিকে এক হস্তে বক্ষের উপর ধরিয়া সে সম্বোধে বায়ের কড়া ধরিয়া শপ করিল। ভিতর হইতে রমণাকর্মে উত্তর আসিল, ‘কে হুকাণ্ড এলি না কি?’

যুবক উত্তর মিল, ‘হাঁ, প্রোটা খেলি না।’

হার উন্মোচন করিয়া প্রোটা রমণী বলিলেন ‘যে রত্ন-কষ্ট হয়েছে যুব তোর?’

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বক্ষস্থিত ত্রব্যটা তাঁহার সমুদ্রে রাখিয়া যুবক বলিল, ‘দেখ তো না এটা কি জিনিষ?’

জননী আন্তর একটা হাত দূরে সরিয়া ‘গিয়া বলিলেন, ‘একি রে যে একটা মেয়ে বেগছি।’ অতীতকু মেয়ে কোথা হ’তে নিয়ে এলি তুই?’

‘রাভা থেকে না। পথে জঙ্গলের উপর পড়ে ছিল।’

‘আর তা’কে তুই নিয়ে এলি?’ ওরে তোদের আগার কি আমি মাথা খুঁড়ে মরবে! কোন হতভাগীর পাশের চাচা পথে কেলি গেছে তুই তাকে বহুদনে বুড়িয়ে নিয়ে এলি, একটু আকল-বিবেচনাও কি তোর নেই রে একেবারে রোজ হ’য়েছিল। শীগগীর ওটাকে বেলে গলা নিয়ে আয়। যা, যা আর দেবী করিস নি।’

মাতার তিরস্কারে স্বকাতর রৌদ্র-তপ্ত রিগে হু-কাণ্ডি আরও বিমলিন হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যক্তি কর্তে সে বলিল, ‘ওকে পথ থেকে তুলে না আনলে তখনই মরে যেত মা।’

‘বেঁচে-বেঁচে? তোর-কি? ওপর ছেলে-মেয়ে মরবে না তো, কি হ’বে। মরবার জড়ী ওর আপনায় যারা তারা পথে-রেখে গেছে। তাদের তা’তে কষ্ট হ’ল না, যত দরদ উৎসে উঠল তোর। তুই কিম্বদ দেখি!’

‘আমি মায়ে মা। তাই একেও অবস্থায় রেখে থাকতে না পেরে তুলে এনেছি।’



‘তবে আর কি আমি কেতখ হ’য়ে গেলাম; তুই কি আর মাথব আছিল, তুই কৃত হয়েছিল। বোয়ের পরামর্শ তনে তনে তোতে আর তুই নেই।’

একটু বিব্রতভাবেই সুকান্ত বলিল, ‘অমর্যক সে শেঠারীকে দোব দিচ্ছি কেন না সে তো আর আমার বলে নি ওকে নিয়ে আসতে।’

‘বৌকে বলেছি অমনি গায়ে বেছেছে, না? আচ্ছা সে বাকু আর না বাকু তুই ওটাকে কেন আনলি। যা এখন এই দুপুর রোলে আর গঙ্গা নেয়ে, তবে ঘরে ঢুকতে পারি। যা বলছি নিগণহার।’

বয়ের উপরিস্থিত শিশুটা কীপকণ্ঠে কানিয়া উঠিল। বিব্রত দৃষ্টিতে তাহার দিকে ~~বলিয়া~~ হুকান্ত বলিল, ‘এখনি এটা ঘরে বসে না। বোয়ের কটুকেও বল একে দেখতে। দেখ না কি কবে কীদেহে।’

‘ওরে লক্ষ্মীছাড়া আমি যে বলছি ওটা ফেলে দিয়ে আর, সে বুকি তোমার কাণে যাচ্ছে না। আমি তো আর তোমার মত রেজ্জ হই নি যে বোদের বলব ওকে দেখ’বার জ্ঞ।’

‘হুকান্ত আমি কিছু না বলিয়া নিজেই তুমিতলে বসিয়া অন্ততঃ হতে শিশুটিকে তুমিতে চোঁটা করিল।’

জননী তখন দুর্গায়া হইয়া উঠিলেন। রক্তকণ্ঠে বলিলেন, ‘ওরে হতজ্ঞাড়া, ওটার গায়ে হাত দিতেও কি তোমার একটু লক্ষ্যে বোধ হচ্ছে না। তুই একেবারে অমণ্ডাতে গেছিলি। ওঠ বলছি যা ওটাকে পথে ফেলে আর। কথা শোন হুকান্ত শিগগিলে আমি মাথা কুটে মরব বলছি।’

স্নিহ অচল ঘরে, হুকান্ত বলিল, ‘একে এখন এনেছি মা তখন এর একটা ব্যবস্থা না ক’রে আমি ফেলব না, সে তুমি বাই বল না কেন? ওর বোধানোই ছুর হ’ক ও তো ঈশ্বরের স্তূত একটা জীব। ইচ্ছা করে মরণের হাতে ওকে কখনও আমি তুলে দেব না।’

বিব্রতের ঘরে জননী বলিলেন, ‘মন্ত পতিত হ’য়েছিল কি না তাই আমার বোঝাতে এসেছিল। যারা ওকে পৃথিবীতে এনেছে তারাই যদি ওকে পথে ফেলে দেয় তখন তুই কেন ঘরে আনলি।’

‘হুকান্ত একটু হাসিয়া বলিল, ‘এ তো তোমার বেশ বুদ্ধি মা। একজন অজ্ঞান করেছে বলে আমিও তাই করব।’

তারা ওকে মরণের মুখে ন’পে দিয়েছে সত্যি, কিন্তু আমি মাথব হ’য়ে তাই দেখব অথচ তার কোন প্রতীকার না।’

‘কি তুই করতে চাস তাই শুনি আমি? ওকে ঘরে রেখে পালন করবি না কি?’

একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস মধ্যাহ্নের তপ্ত সমীরণবাহে মিশাইয়া হুকান্ত বলিল, ‘না মা সে কথা আমি বলতে চাই না। পরীব কেরাণী আমি, এই গণে পরিতাপক শিশুকে পালন করে সমাজের বিকরে ঠাড়াবার মত শক্তি আমার নেই এটা ঠিক।’

‘একটু সমস্ত হইয়া জননী বলিলেন, ‘তবে কি করবি ওকে নিয়ে?’

উপস্থিত একে বাঁচাতে চোঁটা করব, তারপর যা ঘর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।’

‘তবনি ও তো এই বাড়ী কাকবে? না বাছা ওগব রেজ্জ-কাও এখানে চলবে না। আমার হিন্দু, হিন্দুর মতই আমাদের থাকতে হ’বে তো! তুমি বরং ওকে তোমার খবরবাড়ী নিয়ে যাও তারা রাখবে এখন।’

সুস্বভাবে মাতার দিকে চাহিয়া হুকান্ত বলিল, ‘তুমি মা হ’য়ে যখন আমার এইটুকু কাকবে সমর্থন করছ না, তখন তারা পর হ’য়ে কেন করবে মা? কিন্তু থাক অনেক কথা কাটাকাটি হ’য়ে গেছে। এতটা পণ এই রোলে এসে আমিও বড় ক্রান্ত হ’য়ে পড়েছি। যেদোটা হয় তো মরেই গেল; কি রকম নিজের হ’য়ে রয়েছে দেখছ মা?’

বিকৃত মুখে জননী বলিলেন, ‘ওগব তেলে-মেয়ে মরবার নয় বাছা, তা হ’লে জ্বলে একতণ পড়ে থেকে বাচত না। ও বেশ খুশীয়ে দেখছি।’

‘অতি সন্তপণে তারাকে বকের উপর তুলিয়া লইয়া হুকান্ত উঠিয়া ঠাড়াইল।’

‘হ্যা যা ফেলে দিয়ে গঙ্গা নেয়ে বাড়ী আর—’

উজ্জ্বল ঝারটা বন্ধ করিয়া ভিতরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হুকান্ত বলিল, ‘বলেছি তো মা একে ফেলতে আমি পারব না।’ জননীর পুশু দিয়া দীর্ঘ পাকক্ষেপ হুকান্ত ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল।

এতক্ষণের কোলাহলে বাটার পরিদর্শনগ্রাম সকলেই

সেখানে সমবেত হইয়াছিল। ‘একযোগে তারঘরে সকলে এইবার জীংকার করিয়া উঠিল, ‘সর্বনাশ করলে জাত-ধর্ম কিছু রইল না আর। ঐ ছেলেটা নিয়ে ঘরে যাচ্ছে একি হিন্দুর বাড়ী না আর কিছু—’

হুকান্ত একবার বিস্মিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিল, —‘দুপুর রোলে চৌচিরে কেন নিজেরা কষ্ট ভোগ করছ, যে যার কাছে বাও। তোমাদের জাত-ধর্ম থাক আর থাক, বাই হোক, একে আমি মরণের মুখে ফেলে কিছুতেই দেব না, তা তোমারা বাই বল না কেন।’

সকলে নির্লাক হইয়া এই রেজ্জাচারী অন্যাকরজ্ঞে নৃকলের দিকে চাহিয়া তাহার যে কি শাস্তিবিধান করা যার তাহাই বোধ হয় ভাবিতছিল। অদূরে খড়মের শব্দ উজ্জিত হইল। হুকান্ত গতিবেগ রুদ্ধ করিয়া আর একটা কিছু প্রতীকার বিহীন হইয়া ঠাড়াইল।

কখনোই হুকান্তর পিতৃদের রক্তভূমিতে দর্শন দিলেন।

পুত্রের এই নিম্নাঙ্ক অন্যাকরার সংবাদ বোধ হয় ওতক্ষেপে তাহার স্মৃতিগোচর হইয়া ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। এইবার হুকান্ত তাহার দৃষ্টতার প্রতিফল পাইবে নিশ্চয়। সত্যই তো এ কি আশ্চর্য। একটা পথের আবর্জনা—কোন-পাতকী বাহাকে জগতে আনিয়া কলকের ভয়ে ত্যাগ করিয়া পিরাছে, সেই দুখ্য জীব, বাহাকে দর্শন করিলেও মহাপাণ্ডব সন্ধ্যার হার, তাহাকে কি না পণ্ডিত পুণ্যের সন্ধ্যারে লইয়া আসা, দিনে দিনে এ সব হইল কি?’

হুকান্তর জনক অধিক বাক্য ব্যয় করা কোনদিনই পছন্দ করেন না, তাই পুত্রের দুপের দিকে একবার অলস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গভীরঘরে বলিলেন, ‘তুমি বেশা লেগাপড়া নিবেছ কি না, কান্টাই এমন ব্যবহার আমি তোমার কাছেরে প্রত্যাশা করি। আমার অজ্ঞ কোন ছেলে এ জিনিসটা ঘরে আনা দূরে থাক দেখলেও একমন্ত হাত ঘুরে সরে যেত কিন্তু তুমি বিবান ছেলে কি না আমার, তাই ওটাকে নিয়ে আসতেও একটু বিধা বোধ কর নি। তা যা করেছ বেশ করছে, এখন ওটাকে ফেলে ফাসবে কি না আমি তত্ত্ব চাই।’

নতমুখে, হিরকণ্ঠেই হুকান্ত উত্তর দিল, ‘এর যা অবস্থা

তা’তে একটু চেষ্টা না করলে একে বাচানই চরম। এখন যদি পথে ফেলে আসি তা হ’লে একুশি মরে যাবে।’

‘যাও যাবে সেজ্ঞ আমার তো দাঁক নেই।’

‘কতকটা দাঁক বৈ কি। একে এখন আমি চোখে দেখছি, তখন যাতে এ বাঁচতে পারে সেই চেষ্টা করাই কি আমার কর্তব্য নয়? একে আমি ফেলতে পারব না।’

পুত্রের চুসাহলে পিতা একেবারে প্রকল্পিত বিশিষ্টাধার মতই জগিয়া উঠিয়া বলিলেন, ‘হতজ্ঞা বাদর একটু লেগাপড়া শিখেছিল বলে একেবারে লম্বু গুচ্ছ মানিস না। আমাকে কর্তব্য দেখাতে এসেছিল। ওকে না ফেলেতে তোকে আমি ত্যাগাপত্ত করব জানিস। এখন বল ওকে ফেলবি কি না। এক কথা বল?’

সকলেই স্বচ্ছ-নিশ্বাসে হুকান্তর উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছিল, এই চুসাহসিক অপরিণামশী ছেলেটা কি কাণ্ডই না বাধাইয়া বসে। একটা পথের আপদ সূড়াইয়া আনিয়া এ কি বিরাট। এমনকার ছুঁলেওগার ঘটে কি বিন্দুমাত্র হুঁচি নাই, ওর আপনার বাহারা-তাহারাই যখন নিঃসংকোচে উঠাকে মরিবার জ্ঞ পথে আবর্জনার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে, তখন তোর সেজ্ঞ এ শরৎপীড়া কেন?’

শিশুটা কানিয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠের শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিবার উপস্থিতি সকলে দারুণ ঘৃণার নাশাপ্রভাৎ হুঙ্কিত করিল। কি নিঘূণা এই হুকান্ত ছেলেটা। ঐ অপবিত্র প্রাণটাকে কেনম অসংকোচে বুকের উপর ধরিয়া রাখিয়াছে দেখ দেখি। একটু বিধা পর্যন্ত নাই। না পৃথিবী সমান্তরে বাহবার আর অধিক বিলম্ব নাই দেখা যাইতেছে।

দীর্ঘে দীর্ঘে সন্ধ্যাজ্ঞাত-সন্ধ্যার পূর্বে হাত রাখিয়া হুকান্ত জননীর দিকে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা মা, তোমার বোদের মধ্যে একজন না হয় আর একবার হানাই করত, এই পরমের মধ্যে সেটা তো কিছু কষ্টকর নয়, কিন্তু এই অপসার জীবটা একটু পরিচর্যার অভাবে যে মসতে বসেছে, কেউ কি তার প্রতীকার করবে না। একটু বয়সে কি তোমাদের হচ্ছে না এর উপর।’

মাতা কিছু বলিবার পূর্বেই পিতা হৃদ্যার দিয়া উঠিলেন,



‘ওরে হতভাগা দয়া কর্তে খালি তুমিই জান। আমাদের মাঝামাঝি কিছু নেই? ওরে বাঁদর দয়ার ও পাত্রাপাত্র আছে। বয়ঃ ভগবান বা’র উপর নির্ভর্য তা’কে মাথেনে দয়া করে কি করবে।’ ওর অদ্ভুত বদী ভাষাই হ’বে তবে ও অনন্য স্থানে আসবে কেন! এখন ও সব জ্যাঠামি বন্ধ রেখে ওকে কেসে দিবে আর।’

‘না বাবা, ওর একটা কিছু ব্যবস্থা না করে আমি কেসতে পারব না। হাজার ততটুকু সময় দিন। ওকে তো আমি ঘরে রাখতে চাইছি না।’

‘কিন্তু কি ব্যবস্থা তুমি করবি তাই তুমি?’  
‘দেখি যদি আর কেউ ওকে নিতে চায়।’  
‘কে নেবে? তোর মত এমন বাঁদর আর কে আছে?’

স্বকান্ত কোন উত্তর না দিয়া ধীরপদে অঙ্গুর হইবার উপক্রম করিতেই পিতা বলিলেন, ‘খাচ্ছিস কোথা?’

‘আমার ঘরে।’  
‘হৈটকে নিয়ে। ওরে লেগা-পড়া শিবে কি এমন বাঁদর ওঠেই হয়। ওটাকে তুমি কোন আকসেলে ঘরে নিয়ে খাচ্ছিস বল দেখি। এটা হিন্দুর বাড়ী তো?’

হতাশভাবে স্বকান্ত বলিল, ‘তা হ’লে একে কোথায় রাখব?’

‘কোথায় রাখবি তা আমি কি জানি। ওটাকে নিয়ে ঘরে তুমি যেতে পারবি নি, এ আমি বলে দিলাম।’

মর্শ্যাক্ত স্বকান্ত তুমির উপর বসিয়া পড়িল। শিশুটী তখন কাঁদ ভাঙ্গা লাগায় কাঁদিতেছিল। এক বৎসরও নতী তরুণী অন্তঃপুরের দিক হইতে বাহির হইয়া আসিল; স্বকান্ত একবার তাহার দিকে চাহিল। তরুণী ধীরপদে অঙ্গুর হইয়া শিশুটাকে তাড়ান অর্ক হইতে তুলিয়া লইল।

আবার সকলে একযোগে কোথাহল করিয়া উঠিল, ‘এ্যা এ কি কাও বোমা ‘তুমি কোন’ আকসেলে ওটাকে ছুঁলে? এ্যা এবার কি রেজপণা কাও। তাই তো বাবী স্বকান্তর এমন মতি-পতি হ’ল কি করে? হাজার বো’ক সে তো এই বাড়ীর ছেলে। এবার তুমি ওই রেজ বোয়ের পরামর্শ। এমন তো কখনও দেখি নি, তুমিও নি। ঘরের কোঁ তুমি

হৈটকে কোঁলে নিয়ে বসলে একটু সুকোচও হ’ল না। রাম রাম মহাভারত!’

স্বকান্ত হর্ষ-বিষাক্ত দৃষ্টিতে একবার পত্নীর দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বধূর এই খেছাচার ও অসদ-শাসন দেখিয়া তাহার খন্তর-খন্ত ভক্তিত, বাক্য-সহিত হইয়া গিয়াছিল। কি এ কাণ্ড, বধূর এতবড় হুসোহস, একটু ভয় পর্য্যন্ত নাই। এও কি সহ্য করা যায়। উভয়ে এক-যোগে তাহার উর্দ্ধতন চরুদ্রু পুরুষ হইতে নিরন্তর মধ্য-পুরুষের গুণাবলী কীর্তন আরম্ভ করিলেন। অবশুষ্টিয়া বহুতী কোনও রূপ চাক্ষু্য প্রকাশ না করিয়া হিরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শিশুটাকে বকে লইয়া ধীরপদে অস্ত্রপূর মধ্যে প্রবেশ করিল।

স্বকান্ত জননীদর দিকে চাহিয়া বলিল, ‘ভর পেও না মা, ওকে আমি বাড়ী রাখব না, যেটুকু সময় ওর একটা ব্যবস্থা করতে না পারি ততটুকু তোমারা বেচারাকে থাকতে দাও। এতে তোমাদের জাত-ধর্মে কোনও আঘাত লাগবে না মা। বানিকী সময় তোমারা আমায় দাও।’

আর কিছু ভাবিবার অপেক্ষা না করিয়াই ত্রুণপদে স্বকান্ত পত্নীর অঙ্গনমত করিল। পণ্ডাতে বাড়ীর আর আর সকলে নিম্ফল আকোশে গর্জন করিতে লাগিলেন। সকলে একবাক্যে স্থির করিলেন বধূর নির্দেশমত চলিয়া স্বকান্ত একবাক্যে উৎসর্গ দিয়াছে।

কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বকান্ত ডাকিল, ‘শেকালী!’  
গৃহস্থলে বসিয়া একখানা তোরালে ভিজাইয়া শেকালী তখন অন্ধ শিশুর গায়ে মাঝিয়া করিয়া দিতেছিল। পাশেই একটা কাঁচের বাঁটতে কিছু মধু রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অঙ্গুরীর অগ্রভাগে ভাঙ্গা মাখাইয়া সে শিশুর ওষ্ঠাধরে দিয়া পুনরাবৃত্তি তাহাকে পরিকার-পরিস্কার করিতে নিযুক্ত হইল।

প্রাভ্রুত জামাতা তুলিয়া আলনার উপর রাখিয়া দিয়া স্বকান্ত রাস্তদেহে পত্নীর সন্নিকটে বসিয়া পড়িল; কিছু দূরে একখানা ব্যজনী পড়িয়াছিল। সেটা তুলিয়া লইয়া সন্ধান করিতে করিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া স্বকান্ত বলিল, ‘কি মনে হচ্ছে বাঁচবে?’

একটা ছোট জামা স্বর্যপন শিশুটাকে পরাইয়া দিয়া

বাঁদর দিকে দৃষ্টি দিয়াইয়া শেকালী বলিল, ‘তাইতো মনে হচ্ছে।’

‘কাক, ভাষণের ওর কি ব্যবস্থা করি বল তো?’  
‘বাক-গুণা ছিন্ন বর একত্রিত করিয়া একটা ক্ষুদ্র শয্যা প্রস্তুত করিতে করিতে শেকালী বলিল, ‘সে কথা আমি কি করে বলব। তুমি এনেছ তুমিই জান।’

‘তাই তো ভাবছি। আচ্ছা শেকা তুমি ওকে রাখ না কেন?’

‘আমি?’ বিষম-বিফারিত নেত্রে বাঁদর দিকে চাহিয়া শেকালী বলিল, ‘পাগল হয়েছে তুমি, আমি একে রাখব। তোমাদের বাড়ীর ভাব-গতিক কি তুমি জান না। একে আমি এই ঘরে নিয়ে এসেছি, তাই দেখ আমার স্বজ্ঞ কি শক্তির ব্যবস্থা হয়। কি করব, দেখলাম যখন তুমি এনেছ তখন গতি একটু পরিচর্য্যার অভাবে একটা ক্ষুদ্রের জীব মারা যায়—তুলে আনলাম। এখন কপালে কি আছে জা জানি না।’

মলিন হাসির সহিত স্বকান্ত বলিল, ‘বাই থাক, সেটা তোমায় সহ্য করে নিতেই হবে। বহুদিন মাত্রাটা হয় তো বেশী হবে, হোক ও তো গা-সওয়া হয়ে গেছে।’

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘবাক বকে চলিয়া শেকালী বলিল, ‘হী একরকম তাই বৈ কি।’

স্বকান্ত তুমিতলেই ভুইয়া পড়িল। শিশুটা মুখাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে ধীরে ধীরে শয্যার উপর স্থাপন করিয়া শেকালী বলিল, ‘একে কোণায় পাঠাবে এখন ব্যবস্থা কর। সত্যই আমি তো আর ত্রাভি-দিন একে নিইব বসে থাকতে পারব না।’

‘তাই তো শেকা কোণায় কার কাছে ওকে দিই? কে নেবে?’

‘অনাথ-আশ্রমে কি মিশনারীদের কাছে দিলে হয় না?’  
‘না, না, তাতে ওর জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে, অনাথদের মতই ওর জায়া জীবনটা কাটবে।’

‘আশালে তুমি, তা ভিন্ন ওদের আর কি গতি হবে তাই তুমি?’ বাচলে সে এই ওর পক্ষে যথেষ্ট।

‘তাই কি?’ স্বকান্তর মুখে চিত্তার ছায়া পড়িল।  
‘তা ভিন্ন আবার কি? ভয়-গৃহঘরের ঘরে ওর স্থান

হ’বে কি কখনও! না, না, বা বলছি তোমায়, তাই কর। কোনও অনাথ-আশ্রমে কি মিশনারীদের কাছে ওকে পাঠিয়ে দাও, দেরী ক’র না। আমি আর কতক্ষণ ওকে নিয়ে থাকব।’

স্বকান্ত উত্তর দিল না। নতুনজের সে কি ভাবিতে লাগিল।

শেকালী একটু ছোঁরের সহিত বলিল, ‘অন্ত ভাববার কি আছে। অনাথ-আশ্রম তো এদেশেই হচ্ছে হয়েছে।’

মিশনারীরাও ওদের স্থান দেবার ব্যবস্থা করবে।’  
সহসা উঠিয়া বসিয়া স্বকান্ত বলিল, ‘একটা কাজ করতে পার শেকা?’

‘কি আবার কাজ তোমার কুরতে হবে?’  
‘একবার নীরবার ওখানে গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে পার?’

‘নিরাজ? তাকে তোমার কি দরকার?’

স্বকান্ত হাসিয়া বলিল, ‘দরকার একবার আছে, তুমি একটু যাও দল্লাতী।’

‘দেখ পাগলের মত যা তা বকনা তুমি। এখন কি করে আমি বাই? কে নিয়েই যা যাবে। আর স্থান না কপালে তো এখন আমার ঘরের কোন ত্রুবাচী পর্য্যন্ত ছোঁবার উপায় নেই।’

‘বেশ, তুমি স্থান ক’রে এস, ও তো মুখাচ্ছে।’

‘কিন্তু শুধু শুধু নীরায়ে এনে কি হবে, সে কি একে নিয়ে যাবে ভাবছ তুমি। পাগল আঁর কি।’  
একটু গুস্তারভাবেই স্বকান্ত বলিল, ‘তোমার বোনটাকে তোমার চেয়ে আমি বেশী চিনি শেকা, সে নিশ্চয় একে রাখবে।’

‘চাইলেও সে তো স্থানী নয়। সেও গৃহস্থ-ঘরের বোঁ।’

‘বাই হোক তুমি একবার তাকে নিয়ে এস তো।’  
‘কিন্তু আমার বাবার কি দরকার, তুমিই বাও না।’

বাত্তভরে স্বকান্ত বলিল, ‘না, না, তুমিই বাও শেকা, আমি গেলে সে না আসতে পারে।’

‘বেশ, বলছ যখন আমি খাচ্ছি, কিন্তু সে যে একে নেবে সে আশা তুমি মনে স্থান দিও না, তার চেয়ে আমি বা বলছি সেই ব্যবস্থা কর। ও আশা ছেড়ে দাও।’



‘তোমার কাথামত কাজ ভেদ করবই, তার আগে শেফালী আমি যা বলছি তুমি একবার ‘কল’—যাও নীরজাকে ডেকে আন।’

‘আচ্ছা বাই। মাকে বলে দেখি তিনি কি বলেন।’

‘না কিছু বলবেন না, যদি কোনেন এতে ওটাকে বিধায় করবারই ব্যবস্থা হচ্ছে। তুমি আর দেবী ক’র না।’

শেফালী কক্ষের বাহির হইয়া গেল। সুকান্ত পুনরায় ভূমিতলে শুইয়া পড়িল। বাহিরে তখন একঘরে ঝড়ের অনেকগুলো কঠোর গভীর নিনাদ সমস্ত বাড়ীখানা মূগুর করিয়া তুলিয়াছিল; সম্ভবতঃ শেফালীর উপরই তাহা বর্ষিত হইতেছিল।

ক্রমশঃ

## নব-স্বন্দর্ভান

শ্রীশৌর্যনাথ ভট্টাচার্য

তোরা আর কে বাবি মর্ত্যের এই মুহূর্ত্তের নন্দনপুত্র,  
ওরে নবীন যুগের সেবা উঠলো নব চক্ষুহরে।  
আজি বিখ্যোজো নন্দলালার অমৃতের সিংহাসন,  
সেবে অমৃত এক জ্বাতির দেহে গড়লো নব-স্বন্দর্ভান।  
তার অক্লুরূপে বাধন-হারা ভাঙলো কোটি মনের কুল,  
সারা মর্ত্যভূতে ছুটলো তাঁহার রক্ত-চরণ-পদ্মকুল।  
ওরে সেই চরণের পদমে আজি আর রে মোরা রচনো ধাম,  
ওই জগৎ ভূতে-মুহূর্ত্তের গর্ভে হরেক্রক নাম।

ওরে জগদ্বাণের বন্ধে আজি জীবন-দোলা চলিয়ে দে,  
এই জীব-হিয়ার তুলন-কোলা চরণ-তলায় ফুলিয়ে দে।  
আজ বিখ্যোজো মানব-মেলায় শোনের ভগবানের গান  
ওরে মর্ত্যালোকে কর্পে সে আজ অমর নব-জন্মান।  
ওরে মৃত্যু তাহার চরণ-তলায় জীবন-স্বধার উঠছে ঢেউ,  
আজ মর্ত্যের এই নৃতন এগে রইবে না আর আর্ন্ত কেউ।

ওরে সব নিখিলের রাখাল নিয়ে গড়লো সে বে রাজ্য আজ,  
তোরা আর্ন্তজনের পুরিজাণের দেখি রে আর রাখাল-রাজ।  
ওরে এই মধুরার রক্ত-ধূলি স্বধার হ’বে দিলে আজি,  
ওই হৃৎকণ্ঠের মুহূর্ত্তের উঠছে মাঠে: বনৌ বাজি।  
ওরে রঙের ধূলি মাথরে গায়ে দিবে যে ভূই চিরন্তন,  
আর দেখি নব-রাখালগণে দেখি নব-স্বন্দর্ভান।

যদি তনের বোঁটার বিষ মেখে আজ পুন্না আসে ছদ্মবেশে,  
ওরে গরল হ’বে অমৃত তার এই শ্রীভগবানের দেশে।  
ওরে কালকালীন্দ্রের হিংসাবিষে মরুকেনা কেউ মরবে না,  
আর যদ্রাজেরি উদ্ধাতে ভর করবে না কেউ করবে না।

## ছড়া

শ্রীশুদীপকাস বহু

মাহুদের শিক্ষা অনেক রকমে হয়। পাঁচ রকম দেখিয়া  
তিনি এবং বিভাগগণে গমন করিয়া মাহুদে শিক্ষা লাভ করে।  
এই শেখোক্ত উপায়ে শিক্ষালাভ করিতে সকলের সৌভাগ্য  
হয় না। পূর্বকালে গুরুগৃহে এই প্রকার শিক্ষা লাভ  
করিতে এক ব্রাহ্মণ বা হিন্দু ব্যতীত কাহারও সৌভাগ্যে  
ঘটনা উঠিত না। তৎপরকালেও মুসলমান-ব্রাহ্মণকালে  
এমে এমে পাঠশালা, টোল প্রভৃতি:গ্রামস্থ অর্থশালী ব্যক্তি-  
বর্গই প্রতিষ্ঠিত হইয়াও দেশের সর্বসাধারণের শিক্ষা  
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ এই প্রকার শিক্ষা  
দিতে গেলে বহু অর্থের ব্যয় হয়; এককালে দেশের যাবতীয়  
বাণক-বালিকার শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই  
জন্য এখন এত অর্থব্যয় করিয়াও, রানি রানি পাঠশালা, টোল,  
মাদ্রাসা, ম্যাকল, স্কুল, কলেজ স্থাপন করিয়াও বাঙ্গালদেশের  
কেবল নামই-করিতে পারিবে এমন লোক লইয়া  
শিক্ষিতের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ১১ জন। জনসাধারণকে  
শিক্ষিত করিতে, বিজ্ঞানয় মাহুদ পঠিত বিজ্ঞান প্রচারে  
কোন যুগে, কোন দেশে কোন লোক বা কোন আতি পারিয়া  
উঠে নাই এবং কখনও পারিয়া উঠিবে কি না সন্দেহ।

মাহুদ দেখিয়া বা তনিয়া, অনায়াসে জ্ঞান লাভ করিতে  
পারে। এই পন্থায় আর আয়াসে, অম্বায়ে শিক্ষাদান হইতে  
পারে বিবেচনার পূর্ণ পূর্ণ যুগে-স্বাভাবিক দেশে তো ঘটেই,  
আজ ভেদও বিদ্যা দান করা হইত। বাঙ্গালদেশে  
পূর্বকালে অন্তঃদেশ অপেক্ষা এই বিষয়ে বহু অগ্রসর হইয়াছিল।  
ভারতে প্রথম পুস্তক শ্রুতি ‘আদিকালে বৈষ্ণবভাবে চলিত,  
দ্বিষ্ট সেইভাবেই বাঙ্গালার লোকসাহিত্য লোকে মুখে মুখে  
প্রচারিত হইত।

গণশিক্ষা সঙ্গীত, কাব্য, নাটক, কথকতা, তর্জনা, কবি,  
পাচালী, ছড়া ও রূপকথার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ  
করিয়াছিল। উৎসবে বৎসরান্তে বারোয়ারীতলায় এামের  
গান-দ্রবিত, ধনী, গৃহী প্রভৃতি সমাধিষ্ট হইয়া

লোকসাহিত্যের অর্জনা করিত। সঙ্গীত, কাব্য, নাটক,  
তর্জনা, কবি, পাচালী, কথকতা, আসরে আসরে গীত  
হইয়া ধনী, নিধন, ব্রাহ্মণ, হুতা, মেঘর ও মুন্সিফ-  
সকলেরই সমান ভক্তি, আনন্দ, আবেগ, কোহুল-প্রভৃতির  
উদ্দেশ্য করিত। এই সব আসরে কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ  
ছিল না। এমে এমে গৃহে গৃহে তিথ্যুরী, বৈষ্ণব, বাউল  
প্রভৃতি ‘ভজন’, ‘জাগ’ ‘ভাষান’ প্রভৃতি নান্যরূপ গান  
গায়িয়া বাহিত। নগরের ভেদ কখাই ছিল না—সেখানে  
ধনীর অভাব ছিল না এবং তাঁহারাও এই উদ্দেশ্যে অর্থদানে  
কুষ্ঠিত হইতেন না। তাঁহাদের অর্থদানে বাজা, কথকতা,  
পাচালী, কবিওয়ারার কণ্যায়ে আনপিপাসুর জ্ঞানপিপাসা  
বর্ধিত হইত। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহায়াই ভিত্তিভূমি।  
এই সহজ সরল ভিত্তিভূমি বুদ্ধিবা বর্ধিষ্ণু বাঙ্গালা সাহিত্যের  
প্রাচীরের আধরণে দুর্ভিত অগোচরে চলিয়া যায়।

তখন অরূপ করিয়া রাখাই ছিল। শিক্ষার মূল; স্বভাব্য  
সর্বলের দ্রবণশক্তিও ছিল অরূপ। এখন পুস্তকেই সকল  
জিনিস পাওয়া যায়; কালেক্টেই কথক করিয়া রাখিবার  
উপকারিতা কেহই বায়েন না বা আবশ্যক মনে করেন না।  
ঐ কালে অনেকই বিশেষতঃ অন্তঃপুরিকার চাচ, কাকি,  
পম্বা দিয়া বাউল, ফকির, বৈষ্ণব-গায়কদের ডাকিয়া নান-  
গান, কোঁর্তন, কথা প্রভৃতি শুনিয়া শিক্ষা করিয়া লইতেন।  
দ্রুতভাবে প্রতি গ্রামের অম্বায়ে বালক-বালিকা হইতে  
প্রাচীনো পর্যন্ত এই সব শুনিয়া শিক্ষা করিতে উৎসুক  
ছিলেন। বৎসরান্তে বা শারদীয়া পূর্ণাভে বা স্কোনে পূর্ণা-  
পার্বণ-উপলক্ষে অল্প গ্রামস্থ শ্রান্তানার গায়ক আনিয়া  
দেশস্থ ‘মৌবিক সাহিত্য’ সমুদ্র করা হইত।

আর একটি জিনিস লোক-সাহিত্য, চরিত্র, সন্ধ্যার ও  
সমাজ-গঠনে সাহায্য করিত—উল্ল ‘সঙ্গকথা’ ও ছড়া।  
এমন বালক-বালিকা ছিল না যে, সন্ধ্যার পরে গৃহের বহির্ভিত্তি  
রমণীকে না বিদ্যা বাখিতে পারিত—আহাশের পূর্বাঙ্কনের







## আলোচনা

### \*গোবিন্দ কবিরাজ

(পূর্ণাহুতি)

শ্রীমূলালকান্তি দোষ

এখানে গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্ত-সম্বন্ধে কিছু বলিব। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী ধারাবাহিকরূপে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে প্রেমবিলাস, ভক্তিরসাকর, কর্ণানন্দ, নরোত্তমচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা ইহার বিদ্য বাহ্য কিছু পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহার জীবনের কতকগুলি ঘটনা সাগ্রহ করা হইয়াছে।

গোবিন্দ কবিরাজ চিরজীব সেনের কনিষ্ঠপুত্র। তাঁহার বাড়ী ছিল কুমারনগরে। তিনি শ্রীপুত্রের নামোদার কবিরাজের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া খড়গালয়ে বাস করেন। খড়গ নামোদার ছিলেন শাক্ত এবং জামাতা চিরজীব ছিলেন বৈষ্ণব—মহাপ্রভুর অমৃতভক্ত। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহাদের কাহারও ধর্ম-সম্বন্ধে বিশেষ গোঁড়ামী ছিল না বলিয়া খড়গ-জামাই একত্রে সুখস্বপ্নে বাস করিতেন। জগদ্বন্ধুবাবু যদিও বলিয়াছেন যে, 'খড়গের সঙ্গে জামাতার কোন কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে তিনি দুই পুত্র লইয়া বৃন্দার গ্রামে বাইরা বাস করেন', কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ তিনি দেখাইতে পারেন নাই।

কনিষ্ঠপুত্র প্রসবের সময় গর্ভধারিণী অত্যন্ত রোগ পাইতেছিলেন। দাসী আসিয়া সেই রুগা দামোদরকে জানাইল। তিনি তখন পুষ্কার নিষেধ ছিলেন, কাজেই নুয়ে কোন কথা না করিয়া ইঙ্গিতে দাসীকে ভগবতীর মন্ত্র দেখাইলেন এবং নৈত্র্যে হস্ত ভঙ্গিয়ারা ইষ্টায়ার বলিলেন,—

“লয়ে বাহ ইহা শীঘ্র করিও দর্শন।

হইবে প্রসঙ্গ—দুঃখ হবে নিশাণ।”

কিন্তু দাসী এই তাঁরচোরে কথা বুঝিতে না পারিয়া, মন্ত্র সোত করিয়া সেই জল গর্ভিনীকে পান করাইল। ইহার ফলে তিনি এক পরম স্বন্দর পুত্র প্রসব করিলেন।

এই পুত্রই মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ। ইহার স্মরণ পদেই চিরজীবের মৃত্যু হইল। স্বতরাং ভাটসম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে মাতামহের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইল।

শাক্ত-মাতামহের প্রভাব সম্ভবতঃ রামচন্দ্রের উপর সেরূপ বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই; কারণ পরম-গৌরভক গিতার যখন মৃত্যু হস্ত, তখন রামচন্দ্র বেশ বড় হইয়াছিলেন,—তাঁহার আগেই তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছিল। স্বতরাং পিতার সমস্পর্শ থাকিয়া ও ভক্তবিগের সহিত তাঁহাকে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে দেখিয়া, স্বভাবতই রামচন্দ্র বৈষ্ণব-ধর্মের দিকে অনেকটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

কিন্তু গোবিন্দের কথা বস্তর। শৈশবাবস্থার তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। স্বতরাং রামচন্দ্র অপেক্ষা মাতামহের যেরূপ-ভালবাসা তিনিই অধিক পরিমাণে পাইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তিনি গুনিয়া আসিয়াছিলেন যে, ভগবতীর যন্ত্রণোত জল পান করিয়া তাঁহার মাতা স্বর্গেই তাঁহাকে প্রসব করিতে পারিয়াছিলেন। আরও তাঁহার মাতামহের মূখে সর্বদা শাক্তধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের কথা গুনিয়া তিনি ক্রমে শাক্তভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং মাতামহের মৃত্যুর পর পিতৃালয়ে গিয়াও শাক্তধর্মের সহিতই তাঁহার সৌহার্দ্য বেশী হইয়াছিল। বলা ভক্তিরসাকর—

“কুমারনগরে বৈসে জঁত শুদ্ধাচার।

ভাবতী বিনা কিছু না জানয়ে আর।

গীতাত্মে করে ভগবতীর বর্ন।

তনি বর্ষ শক্তি-উপাসক সঙ্গিণ।”

গোবিন্দ ছিলেন স্বভাবকবি। তিনি যে শাক্তধর্ম সম্বন্ধে অনেক গদ্য রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রন্থের বিষয় সে সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে,

এবং আর তাহা উদ্ধার করিবার উপায় নাই। তবে প্রেমবিলাসে তাঁহার একটা পদ্যে নিম্নলিখিত দুইটা মাত্র চরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

“না দেব কাহুক

না দেবী কামিনী

কেবল প্রেম-পরকাশ।

গৌরী-শঙ্কর

চরণে চন্দ্রবর

কহই গোবিন্দদাস।”

মাতামহের মৃত্যুর পর ভাটুর মাঝালার হইতে পৈতৃক বাসস্থান কুমারনগরে আসিয়া বাস করেন। ইহার কিছুকাল পরে রামচন্দ্র শ্রীনিবাসপ্রভুর নিকট রাধাকৃষ্ণ-লীলায় দীক্ষিত হ'ন। সে সময় শ্রীনিবাস আচার্য এবং ঠাকুরমাধবের গৃহে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অনেক স্থান ভরিয়া গিয়াছিল। তখন শ্রীপদ, বাজীগ্রাম, কটকনগর, খেচুরি, বৃন্দার প্রভৃতি স্থান নুয়ে প্রায়শই মহোৎসব হইত। এই সকল মহোৎসবে অনেক গোবান্দ-সন্যাস, মোহন ও সাধারণ বৈষ্ণব যোগদান করিতেন। নরোত্তমের দপের 'গড়েরহাটী-কীর্তন প্রায় সকল স্থানেই হইত। আর সে সকল মহোৎসব-সম্বন্ধে আলোচনা সর্বস্থানে সকলের মূখে শুনা বাহিত। তেঁসিয়া-বৃন্দার বৈষ্ণবগণও এই সকল মহোৎসবে যোগদান করিতেন এবং গৃহে কিরিয়া এই যজ্ঞকে আনোনা করিতেন। কাজেই গোবিন্দের কাণে সেই সকল কথা এবং মহোৎসবের বিষয়বারি পৌছিত। তাহা ছাড়া তাঁহার চোখে রামচন্দ্রের ভজননিষ্ঠা, শালালাপ ও বৈষ্ণববিগের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী দেখিয়া গুনিয়া গোবিন্দের হৃদয়ে ক্রমে এক নতুন-স্বগতের নব-আলোকে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। তখন আর মাতামহের তাঁহার নবযৌবনকে তৃপ্তিপান করিতে সর্মথ হইত না,—ক্রমে নবীন-নটবরের নৃতন সোহাগের জু তাঁহার কবি-হৃদয় ভরপুর হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ তেঁসিয়া-বৃন্দার গিয়া নরোত্তমের প্রেমরাগের দ্বিষ্ট, সুবিমল ও সুশীতল সখীস্বরূপের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রেমলিপিরূপে স্বপ্নে নব-নব ভাবের নতুন-নতুন কবিতা সৃষ্টিয়া উঠিতে লাগিল,—তখন শ্রীমাতাচার্যপ্রভুর পরম্পর গ্রন্থের জলু তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কাজেই ছোঁচের চার সখী স্বভাব তিনি বিশেষভাবে অমৃত করিতে লাগিলেন। সে সময় রামচন্দ্র

শ্রীসুন্দারন হইতে আচার্যপ্রভুর বিরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু বাচিতে না আসিয়া বাজীগ্রামে গুরুগৃহে থাকিয়াই ভজনসাধন ও ভক্তিগ্রন্থারি আশ্রয়ন করিয়া দিবানিশি এরূপ বিস্তার হইয়া রহিয়াছেন যে, অনেক সময় আহার-নিদ্রা পর্যন্তও তিনি ভুলিয়া যান।

এই সময় একদিন গোবিন্দের নিকট হইতে একখানি পত্র লইয়া একজন লোক বাজীগ্রামে আচার্যপ্রভুর গৃহে আসিল। পত্র গোবিন্দ ছোঁচের গিদিয়াছেন,—“আমার দেহ দুর্বল, শীঘ্র আসিলেন,—না হয় দুই চারি দিন থাকিয়া আবার যাইবেন। আপনার শ্রীচরণ-দর্শনের জন্ত মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে।” রামচন্দ্র “অবসর নাই” বলিয়া সে লোককে বিদায় করিয়া দিলেন।

ইহার পর আরও বেড়ে মাস ত্রাটীয়া গেল। আবার লোক আসিল। হাত গোবিন্দ লিখিলেন,—“প্রহ্লাদ-রোগগ্রস্ত হইয়াছি। হাওয়া দুঃস্বাদে। দেহ আর বহে না। ব্যাধি ক্রমে প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃপা করিয়া ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তাঁহার শ্রীপদসম-দর্শনের জন্ত মন অস্থির হইয়াছে।” এই পত্র পাইয়াও রামচন্দ্র তাঁহার গুরুদেবকে পত্রের সর্মথ জানাইলেন না। এমন কি, ঠাকুর নিগ্ন হইতে কিজাসা করিলেও সমস্ত কথা তাঁহার নিকট পৌছিতে পারিলেন।

এই পত্র পাইয়াও যখন রামচন্দ্র আসিলেন না, কিংবা গুরুদেবকে সঙ্গে লইয়া সত্বর আসিবার কোন আশাও দিলেন না, তখন গোবিন্দ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার রোগ উন্নতির সুখি পাইতে লাগিল। ইহাতে তিনি ভীত হইলেন এবং আর বেশী দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, পরকালের ভাবনা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি তখন অন্তঃপ্রাণ হইয়া মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া মহামায়ী-শক্তির উপাসনা করিতে লাগিলেন। তখন (যে প্রেমবিলাসে) —

“নরসিং করিলেন—ইষ্ট হইল সাঙ্গ।

মরণ সময়ে পদে করে প্রপাতি।

‘লীলনে মরণে মাতা আর নাই গাঢ়।

ভব তরিবার তরে বৈশি গোঁড়ম্বী।

হেনকাল গেল,—আত্মে বুলি দেহ যোরে ন



তোমা' যিনে গোবিন্দেবেরে রূপা কেবা করে।

কাতর হইয়া ডাকে—“কর প্রণীড়াণ।

জীবনে মরণে তোমা' যিনে নাহি আন।”

তখন দৈববাণী হইল,—

“রাধাকৃষ্ণ-ময়-সর্গ-পায়া হার হয়।

সেই পাদময় ভূমি করহ আশ্রয়।”

এই কথা শুনিয়া গোবিন্দের প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি তখনই নিমগ্ন পুথিসিংহকে ডাকাইয়া, অতি মিনতি করিয়া রামচন্দ্রকে এই ভাবে পত্র লেখাইলেন—“জীবন সময়। প্রভুকে এক্ষণে দেখিবার জন্ত এখনও প্রাণ রহিয়াছে। রূপা করিয়া তাহাকে আনিবেন।” এই পত্র ও ধরঙ্গ পঞ্চজন লোক তখনই যাজ্ঞিক্যে পাঠান হইল। তাহার বিবারণ চমিয়া পরদিবস বেলা আশাঙ্ক চারি দণ্ডের সময় যাজ্ঞিক্যে আসিয়া পৌঁছিল। শেষে আচার্য্য-গুরুদের বাটতে গিয়া রামচন্দ্রের হাতে পত্র দিল এবং কানিতে কানিতে গোবিন্দের অবস্থা জানাইল।

লোকদিগের মুখে সমুদ্র শুনিয়া ও পত্র পাঠ করিয়া রামচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই গুরুদেবের নিকট বাইয়া তাঁহার পাদপরে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন এবং আবেগভরে বলিলেন—

“মোর গোষ্ঠী প্রতি কর সঙ্গীকার।

তোমার সাক্ষাতে কি করিব মুখি ছার।”

রামচন্দ্রের মুখে সব কথা শুনিয়া এবং তাঁহার আন্তি-ভাব দেখিয়া আচার্য্য-প্রভুর হৃদয়ে করুণার স্ফূর্তি হইল। তিনি সেইদিনই আহার্য্যে রামচন্দ্রসহ যাত্রা করিলেন এবং পর-দিবস তেলিয়া-বুধিতে উপনীত হইলেন। বাটতে পৌঁছিয়াই রামচন্দ্র গুরুদেবকে লইয়া গোবিন্দের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন—

“দুই চারি লোক দল্লি বসুইল তাঁরে।

মুখে বাক্য নহি,—চক্ষুে বসন নিহায়ে।

করমুড়ি করে,—মুখে বাক্য না সরয়।

ঠাকুর চক্ষু মিলা তাঁহার মাথায়।”

এই দিবস বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। গোবিন্দের এত আনন্দ হইল যে, তিনি আপনার গুরুতর পীড়ার কথা

একবারে ভুলিয়া গেলেন। পরদিবস আচার্য্য-প্রভু সহস্র-বন্দনে রামচন্দ্রকে বসিলেন, “গোবিন্দকে খান করাইয়া দাও; তাহাকে লীলা দিব।” রামচন্দ্র ভক্তসংখ্যা নিম্নহস্তে গোবিন্দকে ভাল করিয়া খান করাইয়া দিলেন এবং শুক্লবস্ত্র পরিধান করাইয়া নিজের তাহাকে কোলে করিয়া বসিলেন।

এমিকে আচার্য্য-প্রভু মানাদি মারিয়া সেই ঘরে আসিলেন এবং গোবিন্দের সমুখে দিয়াগদনে উপবেশন করিয়া তাঁহার কর্ণে “হরিনাম” মহামন্ত্র দিলেন। তখন কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই কীর্ত্তন শুনিতে-শুনিতে গোবিন্দের নয়নস্থ স্রিয়া অনবরত শ্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তাঁহার পরে আচার্য্য-প্রভু তাহাকে রাধাকৃষ্ণ যুগলময়ে দীক্ষিত করিলেন। তখন গোবিন্দ গুরুদেবের চরণতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর গুরুদেব শিখের মস্তকে পদস্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। গোবিন্দের মনে হইতে লাগিল তাঁহার সিংহপ্রায় বল হইয়াছে। তিনি দ্বন্দ্ব উবাড়িয়া কান্দিত-কান্দিত প্রাণে ছোঁতের এবং পরে অজ্ঞাত বৈষ্ণবগণের পদপ্রান্তে পতিত হইতে লাগিলেন। তার পর ভাবাবেশে প্রথমে বলিলেন,—“তিনিবাস মার প্রভু তার কি আছে দায়।” শেষে গুরুদেবের উদ্দেশে বলিলেন—

“এবে নিবেদন কর্ণে। শুন প্রভুবর।

নিবেদিত বাসি ভূত কাঁপয়ে অন্তর।”

ইহা বলিয়া গোবিন্দের বদন হইতে নিরলিখিত হুমি অমৃতকূলা পট্টা বহির্গত হইল :—

ভজহ রেমন শ্রীনন্দনন্দন

অন্ত চরণারবিন্দ রে।

ছন্দ মানব দেহ সাধুসঙ্গ

তরাহিতে এ ভববিস্তার রে।

শীত-আতপ বাত বরিষত

এ দিনমিনাী জাগি রে।

বিফলে সেবিহ রূপ পুরজন

চলন্ত শ্রম লব লাগি রে।

এ দন-যৌবন পুত্র-পরিজন

ইথে কি আছে পরতীত রে।

নলিনী-মল-জল

জীবন টামল

ভজহ হরিপদ নিতি রে।

শ্রবণ-কীর্ত্তন

স্বরূপ-বন্দন

পদ-বেশন দাসী রে।

পূজহ সর্বাণ

আম্র নিবেশন

গোবিন্দমাস অভিলাব রে।

তখন গোবিন্দের আবেশবহা। তিনি যেন এক স্বপ্নময় জগতে বিচরণ করিতেছেন। এই প্রকার বিভোরভাবে গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া গোবিন্দ বলিলেন—

“এবে সে জানিছ পদ জীবন আমর।

আজ্ঞা হয় কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিবার।

গৌরাস্কের লীলা বর্ণি সাধ হয় মনে।

সর্বসিদ্ধি পরাংপর সাধার বর্ণনে।”

এই কথা শুনিয়া গুরুদেব বিশেষ প্রীতিভাজ করিলেন এবং সম্মুখে বলিলেন—

“গৌরপ্রিয় বাহুবের খোব মহাশর।

নির্ধাস বর্ণন কৈল যত গুণগাম।

হুতরাং—“সম্মুখে বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণ-লীলা।”

গোবিন্দ ক্রমে ব্যামুখ হইয়া স্বাস্থ্যভাবাজ করিলেন। আচার্য্য-প্রভু বুধির থাকিয়া তাহাকে গোবামি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করািলেন। গোবিন্দ অন্নাদির মধ্যে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন এবং রস-সিদ্ধান্ত ভাব দশা সমস্তই হৃদয়রূপে আত্মস্থান করিলেন। এইরূপে—

“কতকে সাধন কৈল কতকে বর্ণন।

এইরূপ ছত্রিণ বন্দর করিয়া যাপন।

সেই দিনে হইতে লীলার করিয়া ঘটন।

গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা করিয়া বর্ণন।”

এইরূপে গোবিন্দ গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলার বহু পদাবলী রচনা করিলেন। ক্রমে ঠাকুর-মহাশয়ের ভাতা রাজা সন্তোষ দত্তের সহিত তাঁহার সখ্যতা হইল এবং তাঁহারই ইচ্ছামতে গোবিন্দ সন্তোষ-ভাষার রাধাকৃষ্ণ পূর্বরূপ-সংক্ষেপ “সঙ্গীত-মাধব-নাটক” রচনা করিলেন।

ক্রমে তাঁহার কবিত্ব ও বর্ণনাসক্তির গুণগাম চারিদিকে

ছড়াইয়া পড়িল। তিনিবাসাচার্য্য তাঁহার কবিতাপাঠে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ‘কবিরাজ’ উপাধি প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি লাক্ষ্য ঠাকুরাণীর সহিত বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে শ্রীজীব প্রভৃতি গোবামিাদর্শণ তাঁহার বিরচিত “সঙ্গীত-মাধব-নাটক” প্রবণ এবং তাঁহার অলৌকিক কবিত্বশক্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধকণ্ঠে বীকার করিলেন যে, তাঁহার কবিত্বশক্তি বিভাপতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। গোবিন্দ দেশে ফিরিয়া আসিলে শ্রীজীব গোবামী মধ্যে মধ্যে তাহাকে পত্র লিখিয়া তাঁহার রচিত নূতন পদ পাঠাইলেন অমরোচা করিলেন। শেষে গোবামিপাদম অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে ‘কবিরাজ’ উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

যথা ভক্তিরসাকারে—

“গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রজ তত্তময়।

সর্বশাস্ত্রে বিদ্যা কবি সবে প্রণয়সর।

শ্রীজীব গৌলোকনাথ আদি নৃপাবন।

পরমানন্দিত ষার গীতামৃত পান।

‘কবিরাজ’-খ্যাতি সবে গিলেন তথাই।

কত লাক্ষ্য কৈল মোকে অম্বল গোশাকি।”

তথা ‘অম্বরগবতী’ গ্রন্থে—

“হৃদ-কবিরাজ-ভাতা গোবিন্দ-কবিরাজ নাম।

সদেক্ষেপে করিয়ে কিছু তাঁর গুণগাম।

বিশিষ্ট গীত পাঠাইয়া শ্রীজীব-গোশাকির হান।

তাঁহা শুনি ভক্তগণেরে মুগ্ধার পরণ।

গোশাকি সগল তাহা কৈলা আবাদন।

বিচারিয়া দেখে দিগা নিজ নিজ মন।”

গোবিন্দকে ‘কবিরাজ’ উপাধি প্রদান করিবার সময় গোবামিপাদমো ‘নিরলিখিত মোকটী’ লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। যথা—

“শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র-চন্দনগিরে-চক্ষু-সদ্বাক্য-নি-

নামিতা: কবিতাবলী-পরিময়া: কৃষ্ণেন্দু-সম্বদ্ধতা:।

শ্রীমজ্জীব-স্বরাঞ্জি-পাশ্র্বে-ব্রজ-ভূমি-সমুদায়-দ-

সর্বসিদ্ধি চমৎকৃত্তি ব্রজবন চক্রে কিমন্তং পঞ্চম।”

যদনন্দন দায়ের ‘কর্ণানন্দ’ গ্রন্থে আছে, তিনিবাস-প্রভু



শিষ্টাঙ্গের মধ্যে প্রধান হইতেছেন—

“অঃ কবিরাজ আর চক্রবর্তী ছয়।  
পৃথিবীতে ব্যাক্ত ইহা—সবাই জানে।”

এই অজ্ঞান কবিরাজ-শিষ্যের মধ্যে সর্বপ্রধান ইহারাই দুই  
জাত। যথা—

“কবিরাজের ছোট রামচন্দ্র কবিরাজ।  
ব্যাক্ত হৈয়া আছেন বিশেষ ভগবতের মত।  
তাঁহার অল্পতর কবিরাজ গোবিন্দ।  
ইহার চরিত্রে দেখে জগৎ আনন্দ।”

আর, যে সংকট-লোক হইতে যখনমান দাস উল্লিখিত পদ্য-  
বাদ করিয়াছেন তাহা এই—

“ত্রিরাশচর্য-গোবিন্দ-কর্ণপুর-মৃগিহকাঃ।  
ভগবান বরদ্বীপো গোপীময় গোবিন্দো ॥  
কবিরাজ ইমে খ্যাতা অমৃত্যুঃ মনোহরঃ ॥  
উত্তমা ভক্তিভরমণালান-বিতরণাঃ ॥”

প্রথম ক্রমে বড় হইয়া যাইতেছে, অতঃপক্ষে  
আবলকীর কথা বলা হয় নাই। এই প্রথম এখানেই  
শেষ করিয়া। গোবিন্দ কবিরাজের পলাবলী আলোচনা  
পরবর্তী প্রবন্ধে কবিরাজের ইচ্ছা রাখল।

## কবিচর্যা

### ঐশোকনাথ ভট্টাচার্য

কবিরাজ রাজশেখর কাব্যমীমাংসার রূপ ও রসে সমুজ্জ্বল  
কবিত্বাবলীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সমুদ্র-সাহিত্য ও  
তাহা অভূতনবী যথা চলে। তিনি কবির শিক্ষা-দীক্ষা,  
সম্পর্ক ও সংস্কার, স্রোত ও স্বভাব, তাঁহার বাসভবন ও  
অন্তঃপুরিকা, নিজ ও পরিজন, তাঁহার কবিতা-রচনার  
আসবাব, দৈনন্দিন জীবনযাপন-পদ্ধতি, কবির মনস্তত্ত্ব,  
জনমত ও ক্রীশিকা-সংকেত এত স্বন্দর স্বন্দর কথা-সুত্রাকারে  
গুছাইয়া লেখিয়া গিয়াছেন যে, বর্তমান যুগের কবিগণ-প্রার্থী  
নবীন লেখকদিগের এ সকল বিষয়ে আলোচনা করিবার  
জন্ত কোমল হওয়া স্মৃতি পাতাভিকি।

কাব্য রচনার প্রবৃত্তি ইহার পূর্বে নবীন কবিকে গুরুতর  
নিকট হইতে বঞ্চিত বিজ্ঞা ও উপবিজ্ঞা এখান করিতে  
হইত। নামধাতুপরাশ, অভিধানকোষ, ছন্দোবিধি  
ও ভূষণসংগ্রহ—এইগুলি কাব্যের উপকারী বিদ্যা-  
নামধাতুপরাশ বসিতে মোটামুটি ব্যাকরণের অংশবিশেষকে

ব্যবহার। যে শাস্ত্র দ্বারা কেবল নামান্বিত নামের ব্যুৎপত্তি  
ও রূপসিদ্ধি শিখা করা যায়, তাহার নাম ‘নামপারায়ণ’;  
আর যে শাস্ত্রে ধাতুগণের ব্যুৎপত্তি, রূপ প্রকৃতি বিবৃত আছে,  
তাহাই ‘ধাতুপারায়ণ’। অতঃপক্ষে নামধাতুপারায়ণ বলিতে  
শব্দরূপ, ধাতুরূপ, দ্বীপ্ত্যর্থ, ভক্তি, ক্রু, কারক ও যাস—  
এ সমস্তই বুঝিতে পারি। ‘অভিধানকোষ’ অর্থে  
‘ভিন্নানারী’—পর্যায়ক্রমে বা বর্ণনাক্রমে বা অজ কোন  
ক্রমাবলীতে সংজ্ঞিত শব্দসমষ্টিতে ব্যাখ্যা। ‘অভিধান’ শব্দের  
অর্থ নাম; ও ‘কোষ’ শব্দের অর্থ সমূহ। অতঃপক্ষে অভিধান-  
কোষ বা নামমালা বলিতে ইহা বুঝিতে ‘এ কলেকসন্ অক্-নেমস’  
বুঝাইয়া থাকে। ‘ছন্দোবিধি’ শব্দটার অর্থ একটু

• আমরা চলাতি ভাষায় ‘অভিধান’ শব্দের অর্থ বলিয়া  
থাকি ‘ভিন্নানারী’ কিন্তু শুধু কয়েকটা অভিধান বা নামে  
‘ভিন্নানারী’ হয় না। উহাকে ‘অভিধানকোষ’ বলা  
উচিত।

গোণমেলে। কেহ বলেন যে, ইহা একধর্মনিবিশিষ্ট প্রাচীন  
ছন্দোবিধির গ্রন্থের নাম। আবার কেহ বলেন যে, তাহা  
নহে ছন্দোবিধিচিহ্ন সাধারণ ছন্দ-শাস্ত্রেরই পর্যায়। ছন্দঃ  
সম্বন্ধে বিশেষরূপ চিহ্নি অর্থাৎ চারন (‘কলেকসন্’) ইহাতে  
আছে বলিয়াই ছন্দশাস্ত্রের নামস্তর বিচিহ্ন। অতঃপক্ষে,  
ছন্দোবিধিচিহ্ন বলিলে যে কোন ছন্দোগ্রন্থই বুঝায়। আর  
অবশিষ্ট রহিল ‘অঙ্গকারতর’ বা অঙ্গকার শাস্ত্র। ‘তর’ শব্দটা  
বিতার অর্থ বুঝাইয়া থাকে। মোটামুটি ধরিতে গেলে ব্যাকরণ,  
অভিধান, ছন্দঃ ও অঙ্গকার—এই চারটি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান  
থাকা উচিত; কারণ, এগুলি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।  
তারপর উপবিজ্ঞা। চতুঃষষ্টি ললিতকলা উপবিজ্ঞা  
বলিয়া বিখ্যাত। চতুঃষষ্টি ললিতকলায় নাম নিয়ে দেওয়া  
গেল। (১) দীপ্ত, (২) বাধ্য, (৩) নৃত্য, (নাট্য) ইহারই  
অন্তর্গত বলিয়া বাস্তবতার ধরিয়ে নে; অপর কেহ কেহ  
নাট্যকলাকে পৃথক করিয়া ধরেন), (৪) আলেখ্য, (৫)  
বিশোধকল্পে, (৬) তত্ত্বসমুদয়লিখিকার, (৭) পুণ্যাত্তরণ,  
(৮) দর্শনবসনানুগারণ, (৯) মণ্ডিকাকর্ম, (১০) শব্দরচনা,  
(১১) উদ্বকবাদ, (১২) উদ্বকবাদ, (১৩) চিত্রযোগ, (১৪)  
মালাগ্রন্থবিকল্প, (১৫) শেখরকাণ্ডীভূষণেন, (১৬) নৈপথ্য-  
প্রেরণা, (১৭) কর্ণপটভঙ্গ, (১৮) গদ্যভিহী, (১৯) ভূষণবোজন,  
(২০) হস্তকলা, (২১) চৌচুরাংগ, (২২) হস্তাঘব, (২৩)  
বিচিত্র শাকমুদ্রকব্যাকারক্রিয়া, (২৪) পানরাগাসব-  
বোজন, (২৫) যুগ্মবানকর্ম, (২৬) হস্তকলা, (২৭) বীণা-  
ভঙ্গকব্যায়, (২৮) প্রেলিকা, (২৯) প্রতিমালা, (৩০)  
দ্বন্দ্বীকরণে, (৩১) পুস্তকরচনা, (৩২) নাট্যকাব্যাকারদর্শন,  
(৩৩) কাব্যমণ্ডাপুণ্ডর, (৩৪) পট্টিকাভেদবানবিশেষ, (৩৫)  
তরু কর্ম, (৩৬) তরু, (৩৭) বাস্তববিজ্ঞা, (৩৮) রূপারত্নপরীকা  
(৩৯) ধাতুবিদ্যা, (৪০) মণিরাগাকরজান, (৪১) রূপায়ুর্ধে-  
যোগ, (৪২) মেঘকুন্ডলাবকব্যকবিধি, (৪৩) শুকসারিকা-  
প্রণালী, (৪৪) উৎসাদনে, সমাচরণ ও কেম্মধর্মে কোশল,  
(৪৫) অক্ষরমুক্তিকাব্যন, (৪৬) চৈত্রিককবিকার, (৪৭)  
বেশভাষাবিজ্ঞান, (৪৮) পুণ্ডরীকটিকা, (৪৯) নিমিত্তজ্ঞান,  
(৫০) যম্যাকৃত্য, (৫১) ধারম্যাকৃত্য, (৫২) সপাঠ্য, (৫৩)  
মানসিকাব্যাকৃত্য, (৫৪) অভিধানকোষ, (৫৫) ছন্দোজ্ঞান,  
(৫৬) ক্রিয়াবাক্য, (৫৭) চলিতকরণে, (৫৮) বঙ্গদেশে,

(৫৯) দ্বাতবিশেষ, (৬০) আধ্বকীড়া, (৬১) বাসুকীড়নক,  
(৬২) বৈদ্যিকী, (৬৩) বৈজয়িকী, ও (৬৪) বৈদ্যিকী।  
এই চৌষট্টি কলাই কাব্যের উপবিজ্ঞা। কবির ইহাতেও  
সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ বলা বাহুল্য মাত্র।  
স্বজনগণের উপলব্ধি ব্যবহার সাধারণ, নানা দেশের  
সংবাদ রাখা, বসিক ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ-আলোচনা,  
সাধারণের জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখা, ও বিদ্যানগণের  
গোষ্ঠীতে যোগ, আর প্রাচীন কবিদিগের রচনাসমূহের  
আলোচনা—এগুলি কাব্যের অত্যন্ত উপকারক। কবিরাজ  
বিশিষ্টাচরণ যে, স্বন্দর ‘বায়’, প্রতিভা, বিদ্যাভাস্য,  
পুণ্ডরীকগণের প্রতিভা, বিদ্যানগণের সহিত আলাপ, প্রকৃত  
পাতিভা, দৃঢ় মতিশক্তি ও অতীত বশ না পাইলেও যনের  
নিরুপায় ভাব—এই আটটি কবিবির মাতৃস্বায়ী।  
কবিকে সর্বদা শুচি থাকিতে হইবে। চৌচি ক্রিয়  
—ব্যাক্তি, মনঃশোচ ও কাংশোচ। প্রথম দুইটির বিষয়  
শাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে। তৃতীয় কাংশোচের মনসা  
হইতে—হাত-পাদের নবগুলি পরিকারভাবে কর্তৃত্ব,  
মুখে তাৎপর্য, দেহে চন্দনাদির স্বর অঙ্গলগণ, মহার্ষি  
অথচ আড়ম্বরবিহীন পরিচ্ছদ, মনকে কুহুমবান ইত্যাদি।  
সর্বদা পরিকার থাকিলে সরস্বতী প্রীত হন বলিয়া প্রসিদ্ধি  
আছে। পরিচ্ছদতার উপর এতটা জোর দিবার কেন্দ্র এই  
যে, সাধারণতঃ কবির যেমন স্বভাব, তেমনি তাঁহার কাব্য  
হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ পরিকারপরিচ্ছদ হইলে  
কাব্যও সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায়। সেই স্বভাব  
রাজশেখর নবীন কবিকে নিরাসিত নিম্নগুলি পালন করিতে  
উপদেশ দিয়াছেন। সর্বদা প্রমত্তভাবে থাকা, কথা  
বলিবার সময় মুখ হাস্য, ব্যঙ্গনাময় শব্দ ব্যবহার, সকল

• ইহা-ইহা বাসায়রানক চতুঃষষ্টিকলা। শৈবতন্ত্রে,  
ভাসবতন্ত্রে চাকাওগিতে, শুকনীতিগার প্রকৃতি এখো ইহার  
কিছু কিছু ইতরবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও  
বা চতুঃষষ্টি অথবা তিন চারিটি অধিক কলাই নামও পাওয়া  
যায়। যেগুলির সহিত একব্যাকৃত্য করিলে ৫৪ ও ৫৫  
সংখ্যক উপবিজ্ঞার বিভাগ ও তৃতীয় সংখ্যক বিজ্ঞার যে  
সংখ্যকগুলি বাটগিহে তাহা নিম্নলিখিত হইতে পারে।



বিষয়েরই রহস্য-অন্বেষণ, না জিজ্ঞাসা করিলে অপরের কাব্যের দোষ বাহির না করা এবং জিজ্ঞাসা করিলে যথার্থ পক্ষপাতশূন্য সমালোচনা—এইগুলি কবির সত্যত পালনীয়।

কবির বাস্তবন সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যে রাজপ্রাসাদকেও হার মানাইত। গৃহটি উত্তমরূপে চূর্ণকাম করা হইত; ধূলিকণার লেশমাত্র থাকিতে পাইত না। ছয়টি গুরুত্রে বাসের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন মহল থাকিত। বহু তরুমূলে নির্মিত বেদী, বৃক্ষবাটিকা, কৃত্রিম জীড়পর্দার দীর্ঘিকা, গুরুশিলা, কৃত্রিম নদী, খাল, হিল, সমুদ্রের মত বিশাল হ্রদ এই ভবনের মধ্যে শোভা পাইত। ময়ূর-মহুরী, হারীত, সারল, চক্রবাক, রাজহাস, টেকো, জৌক, কুরুর, শুক সারিকা প্রভৃতি পালিত পক্ষিপাণের মধুর কলতানে ভবনের চারিপ্রান্ত সুবিস্তৃত হইত। উদ্যানে মৃগ চরিত, তরুলতায় ফল ফুটিত, মধুরকণ্ঠধ্বনে কর্ণ ভূর্ণ হইত। গ্রীষ্মের তাপ অধিক হইলে শিঙগ্রামছায়ায় লতা-মণ্ডপের মধ্যে ধার-বয়োখিত স্থলিতল জনকপাণ্ডুরিতে কবির রাস্তি বিদূষিত হইবার উপায় থাকিত। কখন বা চিত্ত ভারাক্রান্ত হইলে কবি দোলারোহণে মানসিক খেদ দূর করিতেন। আর যখন হইতেও নির্বেদ দূর হইত না, তখন কবি বিজনে লুকাইতেন; অথবা তাঁহার আশ্রমে পরিজনবর্গ বাক্যলাপ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া মুকভাব অবলম্বন করিত। কবির বাস্তবনের এই যে চিত্র কবিরাজ আঁকিয়াছেন, তাহা সেকালের কবরাজ সৌভাগ্যবান কবির ভাগ্যে বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল—তাহা প্রাচ্যবিদ্যাবিশ্বাশের গবেষণার বিষয় সন্দেহ নাই। আজকাল পাশ্চাত্যের কয়েকটা বড় বড় ষায়রোপ-কোম্পানীর রঙ্গভূমিতে এই সকল কৃত্রিম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সমাবেশ আছে বলিয়া শুনা যায়।

কবির ভবনে ভাষাব্যবহারেরও একটা নিয়ম থাকিত। পরিচারকেরা শুধু অপরাধ ভাষাতেই কথাবার্তা করিত। পরিচারিকাদের অপরাধ ভাড়া মাগধভাষাও জানিতে হইত। অন্তঃপুরিকাগণ প্রাকৃত ও সংস্কৃত—এই দুই ভাষা শিখিতেন; আর কবির মিত্রগণের সুকণ্ঠভাষাই অধিবস্তুর জানা থাকিত। কবি কখন নিজ হস্তে কবিতা লিখিতেন না। তাঁহার যিনি লেখক থাকিতেন, তাঁহাকে বাকুপট সর্গভাষাবিং,

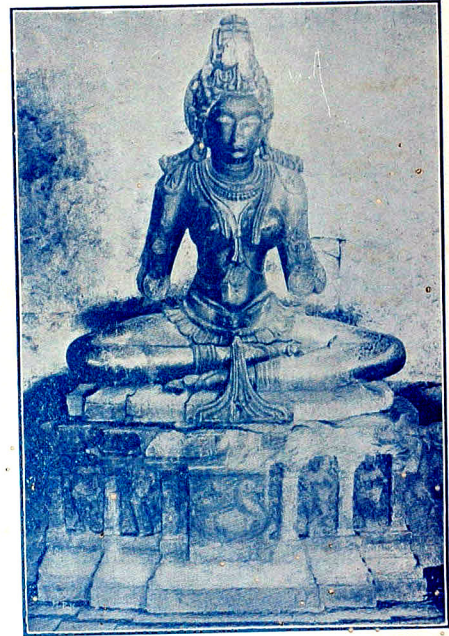
ইন্দিতাকারজ, নানালিপিতে পারদর্শী ও কবি হইতে হইত হস্তাকর হৃদয় একান্ত আনন্দক ছিল। অবশ্য গভীর বাজিতে বা অন্তঃপুরে লেখকের অল্পপস্থিতিতে কবির মিত্রগণ বা অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে কেহ কেহ লেখকের কাজ করিতেন। কোন কোন কবি আবার নিজের অন্তঃপুরে নৃতন রকমের ভাষাও চালাইতেন।\*

কবিতা রচনার আদ্যাবের মধ্যে—একটা ছোট স্রষ্টা পেটিকার মধ্যে একটা কাঠের ফলক বা শেট ও ছোট কোটায় গড়ি, দোয়াত ও কলম, তালপত্র, তুলুঙ্গু ও তাক্দিগর (তেরেট পাতা), লোহকটক ও (‘গাইলো’) চকচকে পলিশ করা পিতলের ফলক সরল কবির কাছে থাকিত। পিতলের ফলকে কবিতা লেখা বা চূর্ণকাম করা দেওয়ালের উপর কবিতা লেখা তখনকার দিনে খুব প্রচলিত ছিল। এখনও দক্ষিণের কোন কোন দেশে বোকাশনদারেরা পিতলের ফলকে হিরাব কসিয়া থাকে। রাজশেখর এমনকি বাহু আদ্যবাদের প্রতি অনাগ্রা দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, এ সকলে কবিত্বশক্তির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হয় না। যিনি প্রতিভাবান্ তাঁহার এ সকল বাছাড়পের কিছু না থাকিলেও চলে। খুব সত্য কথা!

যে সকল কবি পরের অগ্রহপ্রার্থী, তাঁহাদের প্রথম কয়েকটা বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। তাঁহার নিজের সংস্কার ও শিকা কতদূর, কোন্ ভাষার তাঁহার অধিকার বেশী, সাধারণের রুচি কোন্ দিকে, তাঁহার প্রকৃৎকিরণ পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়া প্রতিপালিত, তাঁহারই বা অভিকৃতি কীদূর—এই সব আলোচনা করিয়া কবি ভাষাবিশেষ অবলম্বনে কবিতা রচনা করিয়া মনোনিবেশ করিবেন। তবে এ সকল নিয়মই পরমুখ্যাপেক্ষী কবির রজ্ঞ। যিনি স্বাধীন,

\* রাজারাও অনেক সময় এইরূপ নিয়ম চালাইতেন, ইতিহাসে তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মগধের রাজা শিশুনাগের অন্তঃপুরে ট, ঠ, ড, চ, শ, ষ, হ ও ক ব্যবহৃত হইত না। শূরসেনরাজ কুবিন্দের অন্তঃপুরে পদম-সংযুক্ত বর্ণ ব্যাধ দেওয়া হইত। কুন্তলপতি সাতবাহনের অন্তঃপুরে সকলেই প্রাকৃতকে কথোপকথন করিতেন; এবং উজ্জয়িনীর অধিপতি সাহসার (বিজয়াদিত্য) অন্তঃপুরেও সংস্কৃত চালাইতেন।

পঞ্চপুণ—



গণেশের সুরভা

JUNO PRINTING WORKS, CAL.



\*তিনি যে কোন ভাষায় ও যে কোন বিষয়ে কাব্য রচনা করিতে পারেন—ইহা বলাই বাহুল্য।

কখন আধাআধি কিছু লিখিয়া অপরের কাছে পড়িয়া জ্ঞান উচিত নহে; তাহাতে সে রচনার আর সমাপ্তি হয় না। কোন নূতন রচনাও একাকী কাহারও সম্মুখে পড়িতে নাই; কারণ, শ্রোতা যদি উহা তাঁহার নিজের বলিয়া দাবী করেন, তখন সাক্ষ্য দিবার কেহ থাকে না। আপনি আপনার রচনার গৌরব করাও উচিত নহে; কারণ, নিজের প্রতি পক্ষপাত গুণকে ঘোর ও ঘোষণা গুণ করিয়া দেখায়। কদাচ দর্প করাও অতুচিত; কেন না লেশমাত্র দর্পও সকল সঙ্গুণকে ক্ষয় করিয়া দেয়। এই সকল কারণে "কবিতা রচনা করিয়া বিখ্যাত গুণবান বন্ধকে দিয়া ঘাচাই করা ইহা লইতে হয়; যেহেতু নিরপেক্ষ ব্যক্তি যে সকল দোষ দেখিতে পান, তাহা প্রায়ই কবিতার চক্ষুতে পড়ে না। বন্ধদের মধ্যে যদি কেহ কবিসম্মত থাকেন, তাঁহার সমক্ষে কবিতা পাঠ করিতে নাই; কারণ আত্মভিমানবশতঃ কবিবন্ধু বন্ধুর কবিতার প্রশংসা মুখ চুটিয়া করিতে পারেন না, অথচ সুবোধ পাইলেই উহা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন। নবীন কবির মর্মে মর্মে অমৃতব করিতে পারিবেন যে, রাজশেখরের এই উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কবির সময় বাহাতে বুঝা না নষ্ট হয়, সে জ্ঞত কবিরাজ দিবা ও রাত্রিকালে প্রহরাহুসারে ভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে বলিয়াছেন। দিবাভাগের কর্তব্য নিয়মিত ভাবে স্থির করা যাইতে পারে। প্রথমে ব্রাহ্মমুহুর্তে গাজোখান। প্রাতঃস্তুতা, সন্ধ্যাপুঞ্জাদি সমাপনাতে বৈদিক মারবৃত্তস্কৃতি পাঠ (ঋ, বে, ঐ, ঐ, ৩৩)। পরে বিভাগীর্থে উপবেশন করিয়া প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত কাব্যের সহায়ক বিজ্ঞা ও উপবিজ্ঞাগুলির অধ্যয়ন। প্রতিভা যুতই থাকুক না কেন, নিত্য নূতন সংস্কার না করিলে প্রতিভার ওজস্বী হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সে জ্ঞত নিত্য অধ্যয়ন আবশ্যক। বিতার প্রহরে কাব্য-রচনা। প্রায় মধ্যাহ্নের কাছাকাছি সময়ে রান ও তৃপ্তিপূর্ব্বক লঘুপাচা ভোজন। ভোজনাতে কাব্যগোষ্ঠী অর্থাৎ অভ্যাস বসিয়া কাব্যশালা। কখন কখন প্রশ্নোত্তর আলোচনা। উহা নানা রকমের আছে—সমজাপূরণ, অক্ষরের বেলা, প্রাচীনিক, চিত্রকাব্য ইত্যাদি।

এগুলি সবই বলিতকলার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত এইভাবেই কাটিবে। চতুর্থ প্রহরে একাকী অথবা কয়েকজন নির্দোষিত বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত পূর্ণাহ্নে রচিত কাব্যের পরীক্ষা। কাব্যরচনার সময় তাঁবের আধিক্যবশতঃ শোষণ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না; সেই জন্ত পরে আর একবার উহা পরীক্ষা করিতে হয়। বাড়তি আশের বর্জন, কবিতা আশের পূরণ, বাহাতে ঠিক অর্থবোধ হয় না তাহার পরিবর্তন, ও বিশ্বস্ত আশের সাংযোজন—ইত্যাদি দ্বারা কাব্য সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। এইজনে দিবাভাগ অতিবাহিত হইলে সায়াংকালে সন্ধ্যা ও বেদী সরবস্তীর উপাসনা সর্বাঙ্গ্রে কর্তব্য। তাহার পর প্রথমপ্রহর পর্য্যন্ত দিবাভাগে পরীক্ষিত কাব্যাংশের পুনর্লেখন, বাহাতে কোন ভ্রম-প্রমাণ না থাকে। তাহার পর ভোজন ও শ্রম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে নিদ্রা। স্থনিদ্রা বাহ্যের প্রধান সহায়। চতুর্থ প্রহরে নিদ্রান্তর ও শয্যাভ্যাগ। প্রথম প্রহর ইহা অভ্যস্ত কষ্টকর বোধ হইলেও চেষ্টা করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে; কারণ, ব্রাহ্মমুহুর্তে নিদ্রান্তরের ফলে মল স্ত্র-প্রসার ও সকল কার্য্য স্থনিম্পন্ন হয়। ইহাই হইল কবির অহোরাত্রিক কার্য্যোপলব্ধি।

রাজশেখর চারিশ্রেণীর কবির উল্লেখ করিয়াছেন—অহর্য্যপঞ্জ, নিবর, দস্তাবসর, ও প্রায়োজ্ঞনিক। যিনি ওহাগর্ভে কিংবা ভূমিগৃহে থাকিয়া দৈনন্দিক কৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কাব্যরচনা করেন, তিনিই "অহর্য্যপঞ্জ"। কাব্যরচনার তিনি এক্ষণ একনিষ্ঠ যে স্বর্গের মুখ দেখাও তাঁহার ঘটনা উঠে না। যিনি কাব্যরচনার বিশেষ অভিনিবিষ্ট, কিন্তু অহর্য্যপঞ্জের মত একনিষ্ঠ নহেন, তিনিই "নিবর"। যিনি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে অবহেলা করেন না, অথচ অবসরমত কাব্যরচনাও করেন তিনি "দস্তাবসর"। আর যিনি কোন উপস্থিত, উৎসব উপলক্ষে কাব্যরচনা করেন, তাহাকে "প্রায়োজ্ঞনিক" কবি বলা যায়। প্রায়োজ্ঞনমত কবিতা লেখাই তাঁহার কার্য্য।

সারবস্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহুর্তে গাজোখান, লঘু আহার, মনের প্রশস্ততা, ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তের একাগ্রতা ও শিবিকা করিয়া ভ্রমণ—এই সকল বিধি-ব্যবস্থা কবিরাজের একান্ত



পালনীয়। উহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুস্থির পরিপকতা—এ উভয়ই হইয়া থাকে।

যে কোন কাব্য রচনার পর অনেকগুলি আদর্শ উৎসাহ নকল করিয়া রাখিবার কথা কবিরাজ বৈষ্ণব বলিয়াছেন। একখানি মাত্র আদর্শ থাকিলে উহা সহজেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পরহতে ভ্রাস, দান বা বিক্রম, কবির দেশভাণ্ডার বা জমাদান এবং অসিদ্ধি বা বজার প্রকোপে প্রায়ই বহু মূল্যবান রতন নষ্ট হইয়া থাকে। কবির মারিয়া অথবা ব্যানাসিকি, পুষ্ঠপোষকের অবজ্ঞা, শত্রুর অথবা বিশ্বস্ত শয়্যেব বন্ধকে বিশ্বাস—এই কয়টা কাব্যের মহাপদ বলিয়া গণ্য। পরে শেষ করা যাইবে, পরে সংস্কার করিলেই চলিবে, বন্ধুগণের সহিত পুরামর্শ করিয়া লিখিতে হইবে—কবির এইরূপ মনোভাব এবং রাষ্ট্রবিষয় কাব্যের উচ্ছেদের কারণ হইয়া থাকে। অতএব, নবীন কবির যথাসাধ্য এই সকল ব্রহ্মত, পরহতে ও আকস্মিক দোষ পরিহার করা কর্তব্য।

ত্রীশিকা-সংকে রাজশেখর অতি উদার মনোভাবেরই

পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যমীমাংসার বহু স্থলে কবির সংধিক্ষিণী 'চৌহানকুলমৌলিমালিকা' অস্তিত্বস্বরীর মত প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিরাজ বিশ্বাস করেন যে, পুরুষের মত নারীও কবি হইতে পারেন; কেন না স্বাস্থ্য, স্বাভাসময়েত—উহা ত্রী-পুরুষ-বিভাগ বিচার করে না। শোনা যায় যে এককালে রাজকতা মহামাত্রহস্তিতা, গণিকা ও তৌকিকিভাণ্ডাণগণ মারজ্ঞানবিশিষ্ট ও কবি হইতেন। স্বক্তি-মুক্তাবলীতে রাজশেখর এইরূপ চারিজন স্ত্রী কবির প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম শীলাভট্টারিকা, বিকট-নিতা, বিজয়া ও প্রভুদেবী। বিজয়া নামে আরও একজন স্ত্রীকবির দগ্ধোক্তি এখনও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—

“নীলোৎপলদলক্রমাৎ বিজ্ঞকাম মামজ্ঞানতা।

রূপের দণ্ডিনাপ্যন্তঃ সর্গস্তুরা সরস্বতী ॥”

দণ্ডী যদি নীলোৎপলদলক্রমাৎ বিজ্ঞকাকে জ্ঞানিতেন তবে সরস্বতীকে সর্গস্তুরা বলিতেন না।

রাজশেখরের কবিত্বচর্চায় ইহাই সাক্ষিপূর্ণ পরিচয়।

## গোবিন্দ-ভজন

শ্রীভক্তগুণের রায়চৌধুরী।

[মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তীর্থভ্রমণকালে দাক্ষিণাত্য হইতে “রুক্মণীশঙ্কু” ও “এক-সংহিতা” নামে দুইখানি অমূল্যগ্রন্থ আনেন। তন্মধ্যে একজিজ্ঞাসার পক্ষ অধ্যায়ের ২০-২৬ পর্যন্ত ২৮টা প্রোকে গোবিন্দ-ভজন লিপিবদ্ধ আছে। তদবলম্বনে বর্তমান কবিতাটি রচিত হইল।]

সেই গোকুলে গোদন যিনি  
লতার মত লক গোপী  
পদম সেই পুরুষবর  
ভূতা সম নিতা তাঁরে  
ভজন করে মন।

বদনে যার কণিত বেণু  
আয়ত ধীর লোচন যুগে  
অঙ্গ যার বিজলিত-ভর  
মাধুরী যার মদন কোটা

স্বরের তুলে ল'র কমলদলগোভা  
অসিত জলধর  
জিনিয়া মনোলোভা

চিত্তাশি  
খিরিয়া কোটা  
বচিঃ মতি  
কমলতর  
গোকুল মহাধাম  
তাহার চারিদ্বার,

বাঁহার মাথে ময়ূর-চুড়া  
চিত্ত মম ভূত সম  
কণ্ঠে বন-হার  
ভজন করে তাঁর।

নাচিলে যে বা ধোতল দোলে  
হাতের বাঁধী গলার মালা  
অঙ্গ ভিরি ভঙ্গ য়িরি,  
অঙ্গদ্বারে রক্ত হারি  
প্রণম-কেনি-  
চিত্ত মম নৃত্যভরে  
চুড়ার শিখি-পাখা  
নুপুর বাজে পায়,  
নয়নে দিগ্ধি বাঁকা,  
নবনারীপ কার,  
নিতা লীলা ধীর  
ভজন করে তাঁর।

সর্গেরিয় বৃত্তি ধরে  
নয়ন শোনে প্রবণ হেরে  
বাঁহার বাণী চরণ-পাণি  
সকল দিশি জুড়িয়া করে  
মুগ্ধিত বাঁর সব-চিলা-  
চিত্ত ভরে নিত্য তাঁরি  
নাহিরে চ্যুতি অনন্ত নাহি বার  
অমূল যিনি সবার যিনি মূঢ়,  
পূর্ণাশ যিনি পুরুষবর  
কারণ-হীন কারণ যিনি  
বেদের অ'খি পার না ধীরে,  
চিত্ত মম নীর মত  
সেই সাগরে ধায়।

জিনিয়া বায়ু হৃদয়গতি  
বতনে যারে ধরিতে নাহে  
গোবিন্দকিরি সেই সে গদ-  
কি অচিন্ত্য।  
ভাব কি ভাবা কেউ না তারে জানে।  
তুচ্ছ আমি, উচ্চ মোরে  
চিত্ত মম নিতা ভজে  
কর আকর্ষণ  
রূক্ষ প্রাণধন।

একই যিনি করেন কোটি  
বাঁহার মাথে ইচ্ছা রূপে  
ব্রজাও রচন  
জগত কোটি ভায়।

বিশ ব'ারে ধরিতে নাহে  
বাঁহার কোটি জগত অহ  
পরম সেই পুরুষবর  
চিত্ত মম ভক্তিতারে  
বিশ্বাভীত র'ন,  
চরণ-বেণু প্রায়, —  
রূক্ষ প্রাণধার  
ভজন করে তাঁর।

গোষ্ঠ মাঝে গোপাল যত  
বাঁহার বেণু নাচার মেহ  
রূপের ধ্যানে রূপটা বাঁহার  
অঙ্গে ধরে— চক্রে বেন  
খিরিয়া যারে ভক্তগণে  
চিত্ত করে নিতা তাঁরি  
বাঁহার ভাবে ভোর  
উড়ায় শিখি-চুড়া  
ভ্রমের বত চোর  
মৃগ্যালোক শুভা  
করেন বের পান  
উজ্জ-স্বপা পান।

বাঁহার চিলা নন্দ-মন  
গাহন করি বদ্যবীরা  
নিখিলে যিনি আত্মা, বোগ-  
লক্ষ্মী মনে মল্লোচী বাঁর বশে,  
পরম সেই পুরুষবর  
ভূতা সম নিতা তাঁরে  
ভজন করে মন।

অমল হিয়া তরুত সাধু  
মধুরাতে প্রোবাজন  
চিত্তা ব'ারে চিন্তে নাহে  
নয়ন ভরি মানস-পটে  
পরম সেই পুরুষবর  
মুগ্ধ মম চিত্ত করে  
ভজন অবিরাম।

রামাধি নানা মুরতি মায়ে  
ভুলে অব-ভারিগা যিনি  
গোকুলে শেষে যদ্র ফুলে  
উদিলি নিজে উজ্জল রূপে  
ক্লেমরূপে পশি  
বিবিধ অবতার  
ইহা কালো শশা  
কংস-কারাগার,

পদার্থ হইতে পদ বেনম পৃথক অকৃত-তদ্বার  
মতিত, তজ্জপ।



পরম সেই ভূতা সম	পুরুষবর নিত্য তাঁরে	কৃষ্ণ প্রাণধন ভজন করে মন।	বঁাহার লীলা স্বজন করি	পোষণ তরে পালন করি	চন্দ্রচূড় জায়া করেন শোষে লয়,
	১২		পরম সেই ভূতা সম	নিত্য তাঁরে	ভজন করে মন।
বঁাহার জ্যোতি লক্ষ কোটি	হৃদয়ে ধরি অগত ধোরে	উজ্জলি মহাকাশ চক্রে অনিবার		১৭	
সত্তা বারি বহুধা-যুকে	সদ-রজ- চেতনে জড়ে	তমসে পরকাশ, নিহিত নানাকার,	দ্বন্দ্ব বধা কারণ বধা	বিকার যোগে কার্য রূপে	দবির রূপ ধরে আপনি পরকাশ
অনন্ত সে, চিত্র মম	নিদ্রল সে, সেই ভূমারে	ব্রহ্ম সনাতন, ভঙ্গে অহুঙ্কণ।	ত্রিগুণাতীত তমস-যোগে	কৃষ্ণ তথা মহেশ্বরূপে	প্রায়-লীলা তরে পুরাণ বালিলা।
বঁাহার মায় ভিনটা শুণে	প্রসব করে ধাঁধন দিয়ে	জগতে কোটি অণু নাচার চ্যাতর,	পরমযোগী ভূতা সম	শব্দরূপী নিত্য তাঁরে	ভজন করে মন।
সেই মায়। বে মন তা জানে, নাইক রস, বিশুদ্ধ সে	বঁাহার হাতে বেদের তাহা নাইক তম, গোবিন্দে	কৃষ্ণক বাহু দণ্ড নয় গো অগোচর। সহ নিমগ্ন ধোয়।ই পদতল।	১৮		
	১৪				
বাহার চিহ্ন- জীবের হিয়া মধুর বারি	নন্দ-নন্দ আত্মদিয়া	বিন্দু পরিমাণ মদন করে জর			
নমিত-রূপ পরম সেই চিত্র মম	প্রেমের লীলা ফণীর মত পুরুষবর নিত্য তাঁরি	জগত তলে রয়- কৃষ্ণ প্রাণারাম ভজন করে নাম।	২২		
	১৫				
গোলোক নামে বাহার তলে তাঁহার জ্যোতি- স্বরূপে	স্বধাম তাঁরি দুর্গা-পূজী, নটীট সবে যেন রে গাঁপে	নন্দ-নিকেতন মহেশ-হরি-ধাম, করিয়া কেঁদে মাগিকা অহুঁপাম।	২০		
দীপের আলো চিত্র মম	আত্মা দেখে নিত্য লীলা	কৃষ্ণ প্রাণধন করেন অহুঙ্কণ।	২১		
	১৬				
বিনি গো কুসার, ইচ্ছা বারি	বঁাহার ছায়া শক্তিরূপে	দুর্গা মহামায়া, মায়ের কুণ্ডে রয়,	২৩		

১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বিরাপ্পতি বিত্তির যুকে জ্যোতির জ্যোতি ব্রহ্ম বেদ- বিহাতা বঁারে কৃষ্ণ মম	হৃদয় বধা উজ্জল করে ভেদনি ভাঙ্গর বিধান দানে বরণ করে চিত্র-তম	বিন্দু নিজ কর তপনমণিচর, তেননি ভাঙ্গর ভুবনে সমুদ্র। সেই সে প্রাণারাম হরেন অবিরাম।	২২	২৩	২৪
এতিন লোকে জগতর বঁাহার পান- বৃগাল-বোল সেই সে বর- চিত্র মম	বির রানি বির-হর পদম ছুটি শুণে চুমি অভয়-দাতা নিত্য ভঞ্জে	নাশিতে মন করি গণেশ গণ-নাথ দন্ত যুগে ধরি করেন প্রাণপাত সদ্বট-হরণ কৃষ্ণের চরণ।	২০	২১	২২
অনল মই আত্মা মন সে তিন লোক বঁাহারে আসে, পরম সেই চিত্র মম	গগন বারি মিলনে বেই প্রচনা করে বঁাহারে আসে, পুরুষবর নিত্য করে	পবন দিক কাল উমিলে বেই বঁাহার মাহাজাল, বঁাহারে ভাসে, কৃষ্ণ প্রাণধন তাঁহার আরাধন।	২৪	২৫	২৬
সকল সুর- ব্রহ্মত-আধি গুরিছে কাল- নিরন্তর পরম সেই কৃষ্ণপদে	স্বাতি-ধর মুখিতা ওই চক্র ধরি আদেশে বঁার, পুরুষবর, চিত্র মম	সকল গ্রহরাজ জ্যোতির ঘনাকার অগ্নীম নভ মাঝ চকু যিনি তার, জ্যোতির সেই জ্যোতি নিত্য করে নতি।	২৪	২৫	২৬
প্রভাব বঁার ধরমে বঁার	কৃতির পথে শক্তি, অলে	বিভূতি তপে রয়, পদপের মাঝে আধি,	২৪	২৫	২৬



## গীতার অক্ষয় বীজ

শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানবহ

গীতা কেবল সম্ভবত মোক্ষকুলে গ্রহণ নয়; ইহা প্রাচীন কালের দ্বন্দ্ববৎ হৃৎপতির অক্ষয় ও অব্যয় বাণী, আর এই অমোঘ বাণী একদিকে যেমন নরনারায়ণের যোগ-কৌশল শিক্ষা দিয়া থাকে, অপর দিকে তেমনি গুরু-শিষ্য সংবাদ আমাদের অন্তরে প্রকাশ করিয়া দেয়।

ইহা স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মূখের অমৃততাত্ত্ববর্ণিত মালময়, ইহার দ্বারা শ্রীভগবান সেই যোগ-কৌশললাভের সঙ্গপার প্রদর্শন করেন। "ইহা শ্রদ্ধা করিয়া শ্রবণ ও মনন করলে, জীব ব্রাহ্মী-স্থিতিলাভ করে। এই বাণী শোক মোহনাশের অমোঘ মহোষধি। সেই প্রস্ফাট ফলে, দ্বন্দ্ববৎ নারায়ণ জীবের অজ্ঞানজন্ম, তাহার জ্ঞান-প্রাপ্তি জালাইয়া দূর করেন।

তৎসাম্যবাহুস্পর্শার্থং মহমজ্ঞানজং তমঃ।

নাশদ্যাব্যাহতাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাষ্যতঃ। গীতা ১০।১১

তিনিই দ্বন্দ্ববৎরূপে সাধকের দ্বন্দ্ববৎমোহই জ্ঞানালোকের বিকাশ করিয়া দেন। তিনি দয়া করিয়া দেখা না দিলে কোন কৌশলেই কেহ তাঁহাকে দেখিতে পার না। বাহ্যের চিত্ত ভগবানে একাগ্র হইয়াছে, সেই ভক্তগণের প্রতি ঈশ্বরের রূপা দৃষ্টি হয়।

"শিষ্যস্তেহং শাশ্বি মাং স্বাং প্রপন্নম" বলিয়া, তাঁহার অন্তর চরণে পর লইলে, তোমার বিশিষ্ট বোধশক্তি প্রকাশ পাইবে এবং তোমার প্রত্যক্ষ অহঙ্কৃত ফুটিয়া উঠিবে। তুমি বুদ্ধিতে পারিবে যে ভগবানই সৎগুরু। সংশিষ্ট হইলে তিনিই সৎগুরুরূপে দ্বন্দ্ববাহুস্পর্শের দীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষা প্রাপ্তের ভিতরেই হয়। দীক্ষা মানে মন্দের সহিত প্রাণের যোগ। ইহাই একান্ত দীক্ষা।

গীতা কি, তাহা ভাব্যাব ব্যক্ত করা অসম্ভব। গীতাকৌল সম্ভবত মন্দের সন্ধানীয় সিদ্ধিলাভ করিলে, তুমি মুক্তি-মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

গুরুমুখ হইতে গীতাময় শ্রবণ করিয়া, তাহা দ্বন্দ্ববৎ প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। সেই মন্ত্রকে, দ্বন্দ্ববিত্ত নারায়ণে অনাইতে হয়, তাহা হইলে, তুমি তাঁহার পাকজন্ত শঙ্খনি বা প্রণবধ্বনি, তোমার দ্বন্দ্ববৎ মধ্যোই শুনিতে পাইবে। তখন তোমার দেহমধ্যস্থ চক্রে চক্রে কমল সকল ফুল উঠিবে। সেই ফুলদল দ্বন্দ্ববিত্ত নারায়ণের চরণে স্পর্শ করিয়া পূজা করিলে, তবেই পূজা সার্থক হয় এবং সেই ভক্তি-প্রদত্ত ফুল ভগবান গ্রহণ করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোরং বা মে ভক্তয়া প্ররমজ্জতি।

তদ্বৎ ভক্ত্যপকৃতমন্নানি প্রবতাম্যমঃ॥

গীতা ৯।২৬

সরলতা, ব্যাকুলতা ও সর্বালাপে সদৃশতা আছে। ইহার দ্বারা তুমি যোগমায়ার রূপালাভ করিবে। তাঁহার রূপালাভ করিলে তোমার চক্রে কমল দল ফুল উঠিবে।

যোগসাধার কর্তব্যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া, পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে অভ্যাগ্য করা, তখন বুদ্ধিতে পারিবে, যে কোন অজ্ঞের শক্তি তোমার সকল বাধা বিয় বিদূরিত করিয়া দিতেছেন।

মাত্র-কর্তৃত্ব বিশ্বাসবান সাধকের, ব্যবহারিক জীবন যাত্রাও বিয় পুষ্ট হইয়া যায়।

যতদিন যোগমায়া দয়া করিয়া জীবের মোহ-নিরাসিয়া না দেন, যতদিন নিরাস্যরূপা মা প্রবেশরূপে প্রকাশিত না হন, ততদিন জীব বিয়রজালে জড়িত ও কর্তব্যে পতিত থাকে। তারপর আরাধনার দ্বারা তাঁর রূপালাভ হইলে গাতা-জ্ঞান উন্মোচিত হইলে, জগৎময় সত্য দর্শন হয়।

মায়াজয় অবস্থার ভগবানের পরপক্ষে অহঙ্কৃত করা যায় না; বিজ্ঞা বধন অবস্থাকে নাশ করে, তখন ঐ মায়ার

বহিনী অগণিত হয় এবং সংসারের সকল কার্যে ভগবানের বরপ বহুত্ব হয়।

এই নাট্যগীতার লীলা-হৃত, তাঁর রূপা না হইলে, কাহারও জানিবার সামর্থ্য নাই।

ভাবানু আশ্রিতবৎসল, তিনিই শরণাগত ব্যক্তির চিত্তে অবিচার উপস্থাপন করেন।

শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণই জীবের একমাত্র মুক্তির উপায়।

গীতার প্রত্যেক শ্লোক ময় বরপ পবিত্র।

উপাসনাকালে বিশেষ বিশেষ ভাব উদ্ভূত করিয়া, তেনাকে সম্যকরূপে ভাব করিবার জন্ত, বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের ব্যবহার।

অহঙ্কৃতই জীবচেতনার বরপগত ধর্ম। অহঙ্কৃতিকে হৃদয়ে আকারে বর্ণনাক্ষিত দ্বিধা রাখিতে হইবে এবং উপাত্তের ভাবগুণি স্থিতিতে জগায়াই রাখিতে হইবে।

শব্দভূত ভাব হয় না। বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাব, বিশিষ্ট বিশিষ্ট শব্দ দ্বারা দ্বিধা রাখিতে হয়।

এইরূপ বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দগুণিকে আমরা মন্ত্র বলি। মন্ত্রের মাহাত্ম্য অহঙ্কৃতিকে তম্রাভ্যাস দিতে চেষ্টা করি; ইহাই মন্ত্রের উদ্দেশ্য।

কিন্তু মন্ত্রের অর্থজ্ঞান না থাকিলে এবং সেই অর্থজ্ঞানের অহঙ্কৃত ফুটাইতে না পারিলে, মন্ত্রোক্তারণ বুঝা যায় না। মন্ত্রের ভাববোধের জন্ত, মন্ত্র পাঠের সঙ্গ সঙ্গে সাধনা হয় অবশ্যক। সাধনার দ্বারা মন্ত্র উপস্থিতি তব সকল, সাধকের মন ও মুক্তির অসীম হইয়া যায়।

যে মন্ত্র পাঠের দ্বারা এইরূপ নবজীবন লাভ করা যায়, সেই পাঠই সার্থক, নতুবা অজ্ঞতার পাঠের নামে অহঙ্কৃত মাত্র; চরিত্র গঠন করিয়া, মানবকে নবজীবন বেধার করাই, গীতার মন্ত্র সকল উক্ত হইয়াছে।

জাপ এই শব্দটি মুখে শুভ সহস্রবার উচ্চারণ করিলে, যেমন পিপাসা মেটে না, তেমনি শুষ্ক মুখে গীতার শ্লোক-বহু শুকের জার শব্দময় আশ্রিত করিলে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না।

মায়াজয় ভূদয়ীসার তাঁহার রায়ময় বহিরাগে—

উভা নাম জপং জগ জ্ঞানং  
বাণীকি হুয়া ঈশ সমান।

উভা নাম নাম জপ করিয়া, বাণীকি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা শতবার রামনাম উচ্চারণ করিয়াও, ব্রহ্মজ্ঞান হুয়ে থাকুক, মনে একটু শান্তির উদয় হয় না, ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ সৎগুরুর অভাবে ও যোগ-কৌশল শিক্ষার অভাবে আমরা মাত্র শব্দময় উচ্চারণ করি এবং নামে শক্তি সঞ্চার করিতে পারি না।

বেদন মন্দের দ্বিধা, দেবতা, ছন্দাদি আছে, গীতারও সেই রকম আছে।

গীতার দ্বিধা বেদব্যাঙ্গ, কারণ তিনিই মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন। "কবয়ো মন্ত্রভট্টারকঃ"। যিনি সর্বত্র সর্বা-বাহ্য, আত্মাহুত্বিত অত্যাভ, তাঁহার সেই অহঙ্কৃতগুণি বধন ভাবার আকারে বাহিরে আসে, উহাই তখন মন্ত্র নামে অভিহিত হয়। সেই মন্ত্রভট্টারক সাধকই জ্ঞান।

বেদব্যাঙ্গ মনন করিয়া, বিশ্বদীপী শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে ময়মালাটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, হুত্বস্তা তিনিই গীতার দ্বিধা। "শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা" অর্থাৎ তাঁহার বিশেষ বিষয় সেই মন্ত্র রচিত হইয়াছিল।

"অহঙ্কৃৎ পুং ছন্দঃ"—অর্থাৎ এইরূপ ছন্দে মন্ত্রের ভাবা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

যেমন সমস্ত মন্ত্রে বীজ আছে, গীতারও বীজ আছে। যেমন বীজ হইতে প্রত্যেক গুলকের উৎপত্তি হয়, তেমনি গ্রন্থ মধ্যে এমন একটা বিষয় থাকে, যাহা অবলম্বন করিয়া, বাকি সমস্ত বিষয়টি লেখা হয়।

গীতার বীজ কি?

"অশোচ্যানবর্ণোচ্চং প্রজ্ঞাবাধ্যং ভাষ্যতঃ"।

গীতা—২।১১

এই মন্ত্রটি গীতার অক্ষয় বীজ। এই বীজকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, ইনি অক্ষয় কবচ রূপে জীবকে "জ্ঞাততে মহাতভ্যায়ং"—অর্থাৎ সাধক জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় হইতে দক্ষা পাইয়া থাকেন। এই মহামন্ত্র জগৎময় দ্বিধাকেশের পাকজন্ত সমের অব্যয় অক্ষয় বাণী, ইহাই তাহার স্থিতিকে প্রবৃত্ত করিয়া সর্বাঙ্গ বহিঃতে, যে "জীব তোমার শোক করিবার কিছু নাই, আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে—



জীব হইরাছে—“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” (নীতা—১৭৭), তুমি অশোকাহাঁ, অশোকাহাঁ আশ্রয় জন্ম রূপা শোক কথা তোমার পাশে না।”

ঐক্যবিদ্যারূপ যোগ শাস্ত্রের মধ্যে ইহাই প্রবেশ দ্বার। এই বীজময় জন্মে ধারণ করিলে, তুমি ঐক্যবিদ্যাবিকার প্রাপ্ত হইবে।

এই মহাময়ের আরম্ভের নাশ নাই, ইহার বিপরীত পরিণাম নাই। এই ময় সামান্য করিলে, তোমার অন্তরে জ্ঞানাপি অজ্ঞিত হইবে, এবং ইহাই তোমার কৰ্ম্ম বীজকে দগ্ধ করিয়া দিবে এবং তুমি আয়ত্জান লাভ করিবে। এই ময় নিবন্ধ সত্যকে দর্শন করিলে, তুমি আয়ত্জিৎ হইবে এবং তখন তুমি বোধশক্তি লাভ করিবে এবং তখন বোধেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই তোমার সকল পুণ্য হইতে মুক্ত করিবেন, কারণ তখন বোধমাবার প্রত্যয়, তুমি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইবাছ। একত্ব মস্তের শক্তি আছে। গীতারও শক্তি আছে; এই শ্লোকে তাহা নিবন্ধ—

সূর্য ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অং বাং সৰ্পপাণেভ্যো মোক্ষয়িষ্যমি মা ভয়ঃ ॥

গীতা ১৮।৬৬

শ্রীকৃষ্ণ জগতের নিয়ন্তা। তুমি সব ছাড়িয়া দিয়া তাঁর শরণাপন্ন হও, তোমার সব ঠিক হইয়া যাইবে। তিনিই কাল-রূপ ধারণ করিয়া, বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার লীলা করিতেছেন।

তিনি সৰ্ব্ব নিয়ন্তা, তিনি নিজের শক্তির প্রভাবে, জীবের মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিকে, সৰ্ব্ব ইন্দ্রিয়কে, এবং হৃদয় ও হস্ত সকল বস্তুকে পরিচালিত করিতেছেন। তিনিই বহু-রূপ ধারণ করিয়া নিজের বিশ্বমুখি প্রকটিত করিতেছেন।

আমাদের সামান্য ভক্তি এবং জ্ঞান, মহামায়ার একটি ক্ষুণ্ণকারে কোণায় উড়িয়া যাইবে; অতএব আমাদের কণমণ্ড আশ্রয়শক্তির উপর নির্ভর করা উচিত নয়, এই জন্ম ভগবানের আশ্রয় লওয়াই মুক্তিসঙ্গত। লোকে বিপদে পড়িলে, সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার পথ শ্রীভগবানই তাহাদিগকে দেখাইয়া দেন।”

তিনিই আমাদের অন্তরে পরমাত্মারূপে বসিয়াছেন,

তিনিই মাঘবের গুণ, তাঁহার প্রেরণাতেই ‘লোমে বিজাতি’ জ্ঞান লাভ করে।

মন্তঃ স্বভিজ্ঞানমপোহাং চ।

গীতা ১৭।

অতএব তুমি ক্রতি, দৃষ্টি, বিনি-নিষেধ প্রভৃতি পরিজ্ঞা পূর্ণক তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাঁহার ইঙ্গিতমত চল, তুমি সৰ্পপ্রকার ভয়ের হাত হইতে পরিব্রাজ্য পাইবে মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। তুমি কৰ্ম্মযোগ, আত্মে মন্ত্রযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম উপেক্ষাকর কেবল ভক্তিযোগনিরত থাকিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। যিনি এই ভাবটা মনে দৃঢ় রাখিতে পারেন, তিনি মায়ায়া রূপায় মহাশক্তি লাভ করেন। তাঁর অহংকার দূর হইবে জ্ঞান আসে।

ঈশ্বরের অংশ জীবরূপে জীবদেহে বর্তমান এবং জীবদেহেই পরমাত্মাও অস্তিত্বানুরূপে আছেন। একই তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, “হে পিতা, পরমা আমাদের অন্তরে থাকিয়া আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন; তিনিই জগতের গুণ; তিনি ছাড়া কে ব্যক্তি উপদেশ দিতে পারেন?”

শান্তা বিকুরনেশময়া জগতো যো দ্বিস্থিতিঃ।

তস্মৈ তে পরমাত্মানং তাতকঃ কেন শাস্য তে ॥

বিঃ পৃঃ ১০।

ইহাই সৰ্ব্বসিদ্ধিলাভের মূল ও সৰ্ব্বগুহ্যতম মন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় গ্রহণই সৰ্ব্বসিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়।

তিনি আমাদের অন্তরে সৰ্ব্বগুণ বলিতেছেন—

“মামেকং শরণং ব্রজ।”

কেবল মাত্র আমাদেরই শরণাপত্ত হও। যিনিই নিরস্ত্র ভাবে এই বাণী শুনিতে চাহেন, তিনিই ইহা শুনিতে পাবে এবং তদনুযায়ী চলেন। ইহাই মহাপুঙ্খ ও মহাশাস্ত্রের মন্ত্র অতএব আমরা শ্রীকৃষ্ণের পানমূল আশ্রয়মণ্ড করিয়া বিনাময়ো পুঙ্খম্ স্বাস্থ্যমীশ্বরং প্রকৃত্যে পদম্।

অলক্ষ্যং সৰ্ব্বভূতানামন্তরীকিরনস্থিতম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৬  
হে শ্রীকৃষ্ণ আপনি আদি পুঙ্খ, এবং সকল বস্তুর ক্ষর এবং বাহিরের অবস্থান করিয়া, তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন অথচ আপনি কি রূপে কার্য্য করিয়া থাকেন কেহ তাহা দেখিতে পায় না। আমি আপনার তত্ত্ব অজান, কিন্তু ভক্তির সহিত আপনাকে প্রণাম করিতেছি এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

## বিদূষী

( গদ্য )

### শ্রীভট্টবিহারী মুখোপাধ্যায়

একদিকে হেলে পড়ল। পাড়ার বুড়োরা সশঙ্কিত হ’য়ে রইল—এইবার বুড়ি ছেলেগুলো সত্যিই ব’য়ে যায়।

পাড়ার প্রবীণ নারায়ণবাবু অনেক পরমায় মালিক, পাড়ার মধ্যে তাঁরই কথা প্রায় সকলেই মজা করে। ‘এক দিন সমস্ত ‘ইয়াম্যান’দের ডেকে চা আর হালুয়া বাইয়ে বললেন—‘দেখ বাবুগা, কি নরকারের ঐ ক্রীষ্টান বেরেদের সঙ্গে মিশে, আমরা গরীব গেরম্বরের ছেলে, ওরকম জীলাকের সঙ্গে আমাদের পক্ষে বড়ই অসুভ। ওদের মধ্যে অনেক চা, অনেক কারপাশি, ওদের চরিত্র প্রায়ই—‘বাক্ পে সে সব অনেক কথা, মোট কথা মিথো না—’ এই সব ছেলেদের বাপেরা নারায়ণবাবুর কাছে অনেক রকমেই কণী। তাই অনেকেই নারায়ণবাবুর কথাতোই সাবধান হ’য়ে গেল। ‘হ’ল না কেবল হুতিন জন। গদাই নারায়ণবাবুর কথার মাথানোই মুখের হালুয়া পু. পু. ক’বে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

গদাই সেদিন একবারে তার কাকন-দির কাছে এসে বললেন—‘এসব একেবারে অসহ্য!’

কাকন-দির হাতের বিধানা আঙুলের মধ্যে হুড়ে হাসতে হাসতে উঠে এসে গদাইএর কাঁধে হাত রেখে বললেন—‘কি অসহ্য গদাই?’

গদাই এক মিনিট চুপ ক’রে থেকে বললেন—‘ঐ সব ওয়া আপনার নামে’বা তা’ বলে।’

—‘তাতে তোমার অসহ্য কেন?’

গদাই গভমত খেয়ে কাকন-দির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—‘বাঃ তা কেন, আমারও তো—’

এই কারোই পাড়ার ছেলেরা গদাইএর সঙ্গে কথা বলে, গদাই নাক-সিঁটিকা। গদাইএর তাতে কিছু এসে যায় না।



সেরিম পার্কের মধ্যে গদাইএর হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে কাঞ্চন-দি একটা বৈকিণ ওপর বসালে। গত রাত্তরে বই এর মধ্যে পড়া কতকগুলো কথা মনে পড়তেই গদাই একবার নাড়ুড়ে শিখের-হায়ে বসে ফন্স ক'রে ব'লে ফেললে—  
—‘আচ্ছা, কাঞ্চন-দি, আপনার কি মনে হয়, একনিষ্ঠ প্রেম ব'লে কোনও জিনিষ পৃথিবীতে বাস্তবিকই আছে, না শুধুই মানুষের উন্নত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র।’

গদাইকে কাঞ্চন-দির কেমন ভাল লাগত। তার পাগলাটে ভাব, তার আলগোছা চিলে চিলে কথা, তার কথা বলার সহজ-সরল ভঙ্গী, অথচ বিচার-বুদ্ধির প্রগতিতা, সুখের একটা স্বাভাবিক ‘কাক্ষ্য’—সব জড়িয়ে কাঞ্চন-দির চোখে বড় মধুর ঠেকত। গদাইএর কথায় কাঞ্চন-দি প্রথমটা একটু অবাক হ'ল, পরে আর একটু হেসে বললে—  
‘গদাই, ব্যাপার কি, কেউ ছেনোমাহব পেয়ে তোমাকে ঠকালে না কি?’

গদাই একটু সন্তুষ্ট হ'য়ে বললে—‘না, এ কোনও ঘটনা-সম্পর্কে নয়, কদিন রাতে একটা বই-এ পড়ছিলাম—  
কাঞ্চন-দি গদাইএর ডান হাতখানি নিজের সূতোর মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—

‘ও তাই ভাল।’ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—  
—‘কি জানা গদাই, ব্যাপারটা কিছু গুরুতর। প্রথম কথা, একনিষ্ঠ-প্রেম বলতে তুমি কি বোঝ?’

গদাই অবিরাহিত, অল্পবয়সী যুবক প্রেম-সংকল্পে বই-এ পড়া ছাড়া তার কোন অভিজ্ঞতাও নেই, খুব বেশী ভবে কথা বলার অভ্যাসও তার নেই। গম্ভীরভাবে বললে—  
‘আমি বুঝি এই যে—যে প্রেমে একজন, আর একজনের জন্তে সর্বদাই উত্তম হ'য়ে থাকবে, বেদে, মনে, প্রাণে, কণ্ঠে, চিত্তায়—’

কাঞ্চন-দি হঠাৎ বিশিষ্ট ক'রে হেসে উঠল। পরে গদাইএর হাতের ওপর হাত বুলাতে, বুলাতে বললে—  
‘সর্বদাশ! এ প্রেম তুমি পেলে কোথায়। এ যে ঐকর-দেবতার ব্যাপার।’ এ বে একেবারে নীরঙে বাঁটা গোপা কোথাও থাক নেই, কোথাও থাক নেই, এসবে কোথাও চাঙাও নেই, অক্ষা-কান্দেই, বিরাই নেই, হা হুতাশ নেই, এসবে নিজের আন্তরিক পর্যাণ গোপ পাও, এ শুধু দেবতার-সম্পর্কে কাজে লাগে, মানুষের কাজে লাগে না।’

গদাই ‘একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললে—‘তা হ'লে কি বলি, ওটা মানুষের শুধু কল্পনা, অথচ এই কল্পনার পেছনেই মানুষ যুগ যুগ ধরে ছুটছে, আর এই কাল্পনিক ভিত্তির ওপরেই আমাদের দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য খাড়া হ'য়ে আছে।’

কাঞ্চন-দি একটু চুপ করে থেকে বললে—‘লেখ গদাই এতদূরে আমাদের বেশী কিছু জানা নেই, তোমার কথার ঠিক জবাব দিতে পারব না জানি না তবে আমার মনে হয়, তুমি যা বলতে সচি। যুগ যুগ ধরে মানুষ এই কল্পনার পেছনে ছুটছে এবং হতাশার দুঃখভোগও কচ্ছে-এমনই এর মোহ। যারা ছুটছে তাদেরও দুঃখ ভোগ হ'চ্ছে, আর যারা না ছুটছে তাদেরও আরো সত্তর্য্য থাকার এবং জীবনের সম্পূর্ণভাবে ভোগ না করার দুঃখভোগ হচ্ছে। তবে সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে—আমরা দু দল লোক দেখতে পা। যারা চালাকের দলে তারা ছোটো না, তারা একদিক দিয়ে প্রেমের নামে যেতুক পায়, তাইতেই সন্তর্ভ, ব্যাকটিকুর জন্তে গোল বাধায় না। আর যারা গোল বাধায় তারা ই মরে,—হয় আত্মহত্যা করে, না হয় জী-হত্যা করে, না হয় পুত্র-হত্যা করে, না হয় উদ্বার হ'য়ে পড়ে, সসারের বিরাগত হ'য়ে চলে যায়। আর যারা খুব বেশী সহিষ্ণু তারা সারা জীবনই ভেতরের ভেতরের পড়ে মরে, বাইরে আঁধার বন্ধ, সমাজ, সকলের চোখে ঠিক থাকে।’

এই গেল একদল লোক। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা, ‘দব পেয়েছি’ এবং ‘বেশ আছি’ ব'লে, নিজেরের অজ্ঞাতসারে প্রবঞ্চিত হয় এবং সুখেই জীবন কাটায়।’

‘আমি ঠিক বুঝলাম না কাঞ্চন-দি। ধরুন, আপনার কথায় ঠিক কথা ‘লোক’ যারা, তারা প্রেমের নামে কি ক'রে কটকট হ'ব পা যায়, আর কটকটুর জন্তেই বা গোপ বাধায় না।’

কাঞ্চন-দি পাশের একটা বাহারি-পাতার গায়ের ডায়েরি ভূরুয়র কচি তুলেপে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে অক্ষমস্ব ভাবে গদাইএর হাতের ওপর বুলাতে বুলাতে বললে—

‘বেশ গদাই, আমরা সাধারণতঃ যাদের ‘হাসি কপু’ (সুখী-দম্পতী) ব'লি তারা ই হ'চ্ছে চালাক লোকের দল। তারা মনে মনে বেশ বোঝে যে,

অনেক কিছুই তারা অপর পক্ষ থেকে পায় না এবং সুখেও সৌন্দর্য্য জ্ঞাপে করে না, চোখ বুজে থাকে। এই দলের লোকেরা যা পায় তা অনেক রকমের হ'তে পারে; কেউ কেবল ‘ইন্টেলেকচুয়াল সেরা’ (বুদ্ধির উপভোগ্য সুখ) পেলেই সন্তুষ্ট, কেউ ‘কিরিচাল’ (বৈহিক), কেউ ‘সার্সন’ (কাজ); কিন্তু বেশীর ভাগ লোক ই যা পায় তা হচ্ছে—কিছু কিছু করে এই তিনের সমিশ্রণ। এই তিনের সামগ্রিকের মধ্যে কোথাও প্রেমের ছোঁয়াচ থাকে, কোথাও বা তাও থাকে না। অথচ চালাক লোকের দল এই নিয়েই গর্গ করে এবং প্রেমের ছোঁয়াচ থাকে না ব'লে দুঃখ করে না। তুমি যাকে একনিষ্ঠ-প্রেম বল তা পেতে হ'লে, কোনও পক্ষেরই কোনও দুর্বলতাও থাকে না, অথচ মাহব যাকেই দুর্বলতার ভাঙি,—হয় গুস্তিতে, না হয় অর্থে, না হয় শরীরে, না হয় নৈতিক-সম্পর্কে এবং তোমার একনিষ্ঠতা পেতে হ'লে সবার ওপরে থাকা চাই স্বাভাবিক মানসিক সংগঠন, যার ওপর প্রেমের স্রুত ছাপ সহজেই পড়তে পারে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব দেখা যায় না স্তরতঃ সে কথা এখন ক'র। তবে এই সব চালাক লোকের দলকে আমরা যতই ‘হাসি কপু’ বলে বাহবা দিই না কেন, তারা বাইরে সুখের ভাগ কবলেও তাদের মনের মধ্যে কোথায় বেন থেকে থেকে হঠাৎ একটুখানি অবসত্তর হ'য়ে বেজে ওঠে। অথচ যে চালাক লোকের মনের এই গুস্তিরে কখনো অবসত্তর হ'য়ে গিয়েছিল তাদের মত বড় হ'য়ে থেকে ওঠে তারা ই আবার বাকার দলে পড়ে যায়।’

পায়ের ওপর কাপড়ের জলজলে লালী রংব পাড়টিকুর ওপর একফালি রোদু'র এসে অনেকখ থেকে সেয়ে সেয়ে কাঞ্চন-দির পা হঠাৎ তেতে উঠেছিল, পা হঠাৎ সরিয়ে নিয়ে কাঞ্চন-দি একটু অজমস্ব হ'য়ে বললে—‘এই ধর, অন্তরে ক'র-আমার স্বামী—তাকে তুমি দেখ নি। আমরা জিম্মা পাজার মধ্যে ‘আইডিয়াল কপু’ (আদর্শ স্বামী-স্ত্রী); বিশেষ থেকে ব্যারিষ্টারি পাপ ক'রে ঐল, বিভিন্ন অশা-চওড়া স্বপ্নস্বপ্ন, প্রদূর অর্থ—কোথাও কোন খুবই নেই। আমি তাঁকে কোনদিন তাঁর বিশেষত্ব জীবনের ঐশা জিজ্ঞাসা করি নি, তিনিও আমার বিবাহের আগেই খবর জানাবার চেষ্টা করেন নি; অর্থাৎ আমরা জিম্মা-বাক্সে বলে চালাক লোকের দলে।

নিজের হাতে চা, কটা, পাওয়া-নাওয়া মায় বেকবায় সময় তাঁর জুতোর কিস্তিটা পর্যাণ বৈদে দিখু, তিনিও তাঁর প্রতিদান যথেষ্টই দিয়েছেন। সমস্ত আশোষ-প্রমোদে সর্বদাই দুঃখের বেকবায়, যখন একলা বেকবতেন, বিচ্ছেদটুকু পুথিয়ে গিঠেন, আলিঙ্গনে আর চুষেন—বাক সে তুমি বুঝবে না—মোট কথা বাকের বলে আদর্শ চালাক। কিস্তি শব্দে বোধ হয়, তুমি চেন, লগা জিপছিপে লোকটা, মাহে মাহে এখনও আমার বাড়ীতে আসে, সে আমার ছেলে বেলার স্বপ্ন। বিয়ের পরও বরাবরই এসেছে, তাঁর সঙ্গেও বেশ সন্তান ছিল। কে জানত বিয়ের পর পাঁচটা বছর ধরে’ অকপের মনের মধ্যে কোথায় এক অবসত্তর হ'য়ে একটু একটু ক'রে ঘনিষে উঠছে। একদিন সন্ধ্যার সময় কিস্তি-আর আমি পাশাপাশি ব'লে গল্প করছি, তিনি কান থেকে ফিরলেন। আমি তখন কিস্তিদের সঙ্গে এক তর্ক মেতে উঠছি। তাঁর শরীরটা ছিল অস্বস্থ। কি বললেই শুনেতে পাই নি। ব্যু সেই অবসত্তর দাহ—যা এতদিন শুনিয়ে শুনিয়ে এসেছিল, ঠঠাং দাঁট দাঁট ক'রে জ্বলে উঠল। সেই রাতেই নিজের মাথায় গুলি মেরে আত্মহত্যা করলেন।

কাঞ্চন-দির গাল বেয়ে ছুকেটা চোখের জল টপ টপ করে তার পায়ের ভেলভেটের তালেওলের ওপর পড়তেই গদাই চমকে উঠল। অথচ কাঞ্চন-দির গাল আওরাজের মধ্যে কোথাও কানার দেশমামা ছিল না। গদাই তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হ'য়ে হঠাৎ বললে—‘হীম, চুপ করুন, চুপ করুন, আর আমি শুনেতে চাই না।’

সেদিনের আর কুলাসা ভেন ক'রে আসা সকালের প্রথম রোহটুকুর মত একটুখানি হেসে কাঞ্চন-দি বললে—‘অথচ এই অবসত্তর হ'য়ে আমার মধ্যেও ছিল না তা নয়—কারণ তাঁর গুস্তিগে ছোঁই চামড়ার ব্যাকসর মধ্যে যে ক'খানি বিশেষত্ব ফটে আছে তা যে কোনও স্বীক পক্ষেই সত্যিসত্যিই অবাসত্তর হ'তে পারে। কিন্তু আমি ব'লে গেলুম চালাকের দলই, তিনি শুধু..... ক'খাটা অসমাপ্ত রেখেই কাঞ্চন-দি চাইয়ে উঠে বললে—‘উঃ গদাই বড় দেরী হ'য়ে গেছে, তাঁদের সময় হ'য়ে গেল।’

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়তেই কাঞ্চন-দি চাঁচকার



করে উঠল এবং গলাইএর হাত ধরে প্রায় ছুটতে আরম্ভ কর'লে গিলে। গলাই জোরে জোরে চলতে চলতেই বললে—  
'ব্যাপার কি?'

কাকন-দি সেই রক্তম ভাবেই গলাইকে টানতে টানতে অন্ন একটু হেসে বললে—'চটপট চল, আমার বাড়ী গেলেই সব ব্যাপার বন্ধতে পারবে।'

হুই

গলাই কাকন-দির বৈঠকখানার চুকই অন্ন হেসে তাকে কি বলতে বাঙ্ছিল, কোণের চোয়ারে উপবিষ্ট উজ্জল গ্রাম্যকর্ণের এক তরী স্বর্বাঙ্গকে দেখে পেমে গেল। ঘরের মধ্যে এদের আগমন টের পেয়েও যুবতীটা মুখ তুলে চাইলে না, হাতের ধবরের কাপোরে যেমন নিবিষ্ট ছিল তেমনই রইল। কাকন-দি হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে সময়েই রেগুর যুবতী তুলে ধরে তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নীচু গলার ধলে—'নো, অন্ধিমান রাধ, ধন মিনিট দেবী হ'য়েছে তো যেদের রাগ দেখে আর বাঁচি না।' বলার সঙ্গে সঙ্গে কাকন-দি রেগুর হাতের কাগধখানা কেড়ে নিলে।

রেগু কি ক'রে হেসে কেলে বলল—'আধখণ্ডার ওপর বসে আছি তা জানা হ'।

'খু জানি। আর তাকে আমার এক অকৃত্রিম বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই' বলে রেগুর হাত ধরে টেনে এনে গলাইএর সামনে পাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে—'গলাই! ইনি হচ্ছেন আমার বোন, পরম বন্ধু—'

রেগু কাকন-দির হাতের উপর একটা চিম্টা কেটে বললে 'আজ কি ক'র কাকন-দি, তের হেয়েছে।' আর ওঁর পরিচয় তোমার চিঠিতে, মুখে অনেকবারই শুনেছি; গলাই! রাব' নমস্কার।'

গলাই ব্যস্ত হ'য়ে দ্বিতহাস্যে হাত তুলে নমস্কার করলে। কাকন-দি বললে—'ইনি—বি-এ, পাস ক'রে রেগুকে মাঠারি করতে যান, উনি বা কিছু ভাল, সবইই য়গার চ'বে দেখেন, ভালবাসার ওপর ওঁর বিশ্বাস নেই, রেগুগে থাকতে এক ডাক্তার'ওকে বিবাহ করবার মতে প্রায় পাণ্ড হ'বার উপক্রম হ'য়েছিল, তারই আশার ও পলাতে পথ

পায় নি, তাই আশ্বর্যকণ্ঠে কলকাতার পাগিয়ে এসেছে। এখন এখানে 'লোন আফিস' (কর্ক দেবার আফিস) খুলে দিবি ব্যাসা চালাচ্ছে।—আজ্ঞা ততক্ষণ হজনে গন্ন কর, আমি চায়ের জোপাও লেখি—' বলে কাকন-দি ভেতরের নিকে চলে গেলেন।

রেগু মেয়েটার প্রথমদিক মুখে-চোখে ফুটে বেরকছে, যুব যুবতী না হ'লেও সে মুখ, সে চোখ একবার দেখলে কিছুতেই ভুলতে পারা যায় না, ঠোঁটের সুকন্মকুতে এমনি তার করণ-বাক্সনা। সে যতবারই একটু চক্কল, বেশী কথা বলে। আবার তার কথা বলার মধ্যে একটু তিক্ততা মেদান পাঁহবেই, লোককে হঠাৎ অপ্রতিভ করতে সে অধিভীরা। তবে তার বাচালতা কোনমনি সভ্যতার গভী পার হ'য়ে চলে না।

গলাইএর হাতের ওপর নজর পড়তেই রেগু বললে—  
'আপনার আঙুর গটা কি পাগর, 'কাটুই আঁই' (বৈদ্যু-মনি) না?'

গলাই আঙুই পরে, কোন্টা কি তা' তার জানবার দরকার লাগে না। গভমত খেয়ে বললে—'কি জানি বোধ হয়—'

রেগু প্রায় ধমকের মত হুয়েই বললে—'খরি জানেনই না তবে 'বোধ হয়' বলে কেন আর বিভ্রম্না করছেন, আন্দাজে কিছু বলার চেষ্টা না করাই ভাল।'

গলাই অবাক। গলাই কখনও ভায়েতে পারে নি, এক যুহুর্ন্তের আলাপে কোনও যুবতী ঠিক এই রকমভাবে কোনও পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারে। তার মনে মনে হুগাও'ল, ভয়ও'ল। যুব পাকটের কলমটার স্ক্রিপ এ ছোট্ট একটু গাল রংএর পাখর বসান আছে মনে পড়তেই, গলাই আঁকে আঁতে কলমটা গুলে পকেটের মধ্যে ফেলে দিলে। রেগু আড়চোখে দেখে নিয়ে অন্ন একটু মুগাটপে হেসে বললে—'কাটাস আঁই' পাখরগুলো কিসের পরিচয় হয়ে জানেন? জানেন না বোধ হয়, জানলে পরতখন না।'

গলাইএর ভারি রাগ হ'ল, তার ইচ্ছা হ'ল বলে,—  
আপনি যে বোধ হয় বলছেন; কিন্তু বিব্রিত চাপা দিয়ে বললে—'কি আপনিই যখন না।'

'জগাশি—হিসা।'

'এরি ভেতর তাদের মধ্যে হিসা প্রবেশ ক'রে গেছে দেখছি যে' ব'লে কাকন-দি সরু খন্ডের পর্দা টেলে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সামনের টপগের ওপর হাতের আধাঘা-নামিয়ে রেখে বললে—'সকালের এই আধাঘাঙুলি আকারে এবং প্রকারে অর্থাধ্যাপ না হ'লেও অগ্রচুর নয়। হু, চা, ককি, বিষ্টু, পাপরভাঙ্গা, মদন। তিন জনে মিলে এক সঙ্গে যথোচিত সযাবহার করতে লাগল। কাকন-দি পাপরভাঙ্গার এক টুকরো মুখের মধ্যে পুড়ে দিয়ে বললে—'বেখ, রেখী, আজ সকালেই গলাইএর সঙ্গে একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা হ'ছিল।' তারপর সমস্ত আলোচনা টুকু রেগুকে ব'খিয়ে দিয়ে বললে—

'এখন 'গারা সব পেরেছি' বলে নিজেরের অজ্ঞাতসারেই প্রবন্ধিত হয়, অথচ আমরম শান্তিতেই জীবন কাটার তাদেরই কথা বলে। শুনেছি বাবার দেশ-সম্পর্কে এক বুড়ো ছিলেন, তিনি দেশেই থাকতেন, ডকে কাজ করতেন মাহিনা ছিল তাঁর সাতাশ টাকা; বাবার বুড়ীর হাতের ধগাছি শীঘ্রা হুজান সোণার পাতটুকু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁদের আর্থিক অভাব ছিল চরুদ্রুদ্র, কিন্তু মনের অমিণ একধিনের তরেও হয় নি।' সাত আটটা ছেলেপুলে হ'য়েছিল। বুড়ো রাবা গেলেন ৭৩ বৎসর বয়সে, বুড়ী মারা গেলেন ৬০ বৎসর বয়সে—তবে একই দিনে। বুড়ো অনেক দিন থেকেই রোগে ভুগছিলেন; বুড়ী জানতেন, বুড়ো আর বেশীদিন বাঁচবেননা—তাঁরও কাঁধ হ'ল—অনাধারে অনিগ্র্যার থাকা। বুড়ী ইদানীং বুড়োর পাশেই শু'য়ে থাকতেন, নুড়ার পর্যন্ত তাঁর আঁর ক্ষমতা ছিল না। সে না কি এক দেববার দৃত ছিল। পাড়ার লোকে এসে হুজেনেই মুখে জল দিয়ে যেত। বুড়ো মারা গেলেন সকালে, বুড়ী মারা গেলেন রাত্রে। তিনি তাঁর ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাভনী কারও মুখ তারিহেই বাঁচলেন না।' একটু থেমে কাকন-দি হেসে বললে—'গলাই! তুমি যে একনিষ্ঠ-প্রেমের কথা বলছিলেন তার এদের সুখ-পাইছোঁতার অনেকটা মিশ আছে বলতে হ'বে।'

গলাই একপক্ষ প্রশংসমান দৃষ্টিতে কাকন-দির সমস্ত

কথাগুলি উদ্গ্রাব হ'য়ে শুনছিল। কাকন-দির কথা প্রচুরায়ে বেশ একটু উত্তেজিত হ'য়েই বললে—'কি বলছেন, বাইরের মিশ? শুধু বাইরে কেন, ভেতর-বাইরে সব দিক থেকেই একনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে।' কে বলে অসম্ভব? এই তো মাহুয়ের মধ্যেই সম্ভব হ'য়েছিল এবং হ'বেও। এ ছাড়া আর কোথায় যে একনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে আমি তো ভেবেই পাই না কাকন-দি। এ তো শুধু মাহুয়ের কল্পনা নয়, এ যে মাহুয়ের অভিজ্ঞতা, তা যদি না হ'তো মাহু এর পেছনে আধাঘন্ডের মত যুগ-যুগ ধরে কিছুতেই ছুঁত না।'

কাকন-দি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—'পাঁড়াও পাঁড়াও, এখনও সবটুকু বলা হয় নি। এদের হ'জনেরই বুদ্ধি ছিল একেবারেই ভৌঁতা, 'ইন্টেলেকচুয়াল মেসার' বলে কোনও জিনিসের খানই এরা জীবনে পায় নি, আত্মীয় 'মেকানিক্যালি' (যন্ত্রের মত) চলে এসেছে, ঢাক্কী করা, রাওাধারা করা, সেবা-কুশ্রবা করা, আর সংসার করা, এ ছাড়া—'

গলাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—'তাদের জীবনে ওর চেয়ে বেশী দরকার ছিল না 'ইন্টেলেকচুয়াল' আদান নাই বা হ'ল। সংসারের গরলার হিসেবে, হুদির দেখানো, ছেলের অন্নপ্রাশনের ফর্দ, 'যেদের বিবাহে উপবাস—তাই ছিল তাদের 'ইন্টেলেকচুয়াল' আদান, তার মধ্যেই তারা প্রচুর রসাহুতি পেয়েছেন, নাই বা আলাদা করে আঁটের চর্চ্কা করলেন, নাই বা আলাদা করে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করলেন—তাতেই বা কি এসে যায়।'

কাকন-দি অন্ন-একটু হেসে বললে—'পাঁড়াও, পাঁড়াও গলাই! অত উত্তেজিত হ'য়েনা, এখনও বলার একটু ধানি বাকি আছে। একে এক্ষি প্রেমের নির্খত ছমির অন্তরালে বিশেষ রকমের একটু যে বুঁত ছিল তার প্রমাণ খুঁজলে এখনও পাওয়া যায়।'

গলাইএর মুখের সমস্ত রক্ত এক নিমিষেই কে যেন শুখে নিলে, সাপের গায়ে পা পড়তে মাহুই যেমন আতঙ্ক এবং যুগার শিউরে উঠে পাহিয়ে আসে, গলাই তেমনি করেই টেবিল কেড়ে উঠে, টোসান গিলে।



রং গদাইএর মুখের দিকে তাকিয়ে সকলের অলক্ষ্যে একটু ফিক করে চেয়ে ফেলেন বললে— “তাতে কি এসে যার কাফন-দি, তবুও তো ওরা চাখাক লোকের দুসেই ছিল, সারাঞ্জানটা বেশ হুখেই কাটিয়ে গেল।”

কাফন-দি তাড়াতাড়ি বাধা গিলে বললে—“উঁহ, এরা নিজেদের ‘অজ্ঞাতসারে প্রব্রুতি’ এবং ‘দৈব পেরেছি’— বলে সম্বোধন। তবে তোর শেষ কথাটা ঠিক, বরাবর হুখেই কাটিয়ে গেল। তবে তাদের ধারণায় যতটুকু স্বপ্ন, ততটুকুই।”

কাফন-দির একটু আগেকার বর্ণিত দেশদশপক্ষে বাপের ‘পুছা-পুছা’র ব্যাপারটা গদাইএর সহজ-সরল নিমগ্ন চিত্তকে অত্যধিক ক্লান্ত করেছিল, যে তদবস্থার ঐকান্তিক নিমগ্ন হ’য়ে ‘ব’সে রইল, সেখানের কথোপকথনে তার যোগ দেবার আর প্রগতি রইল না। হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়তেই কাফন-দির একটু গিহে হ’য়ে বসে বললে—“আচ্ছা কাফন-দি—”

সেই তার মুখের ওপর বড় বড় উজ্জ্বল টানা চোপ ছুটাকে একাগ্রভাবে নিবদ্ধ করে রেখেছে। গদাইএর কথা অসমাপ্তই রয়ে গেল। গদাই তাড়াতাড়ি হাত তুলে নমস্কার ক’রে চলে গেল।

তিন

গদাইএর মাঝ বড়কালও নয় গরীব লোকও নয়, তবে তার ভিতরকূলে গদাই ছাড়া আর কেউ নেই, নিজেও অব্যাহতি। কল্যাণতরু-ছোট বাড়ী। কিছু মদার টাক, তারই হুসে গদাইএর পড়ার বরড, বাগ্গা-সাদা, বেশে স্বচ্ছলগায়েই চলে। গদাইএর মাঝা হেমন্তবাবু নিজে খুব গরীব হ’লেও গদাইএর প্রতি তাঁর ‘হেই-পল্লী’র এবং অকৃত্রিম। গদাই বড় হওয়ার পর থেকে তার কোনও কাকের ওপর তিনি কোনও কথাই বলেন না। আর কোনও কিছু বলেন না বলেই গদাই হেমন্তবাবুর একটু বেশী করেই ভয় করে। হেমন্তবাবু এম-এ পাশ করে নেই যে বসে রইলেন, তাঁকে আর কেউ ঘরের বাইরে দেখেন না। তিনি বড় অল্পত বাস্তবিকপ্রস্ত মাহুর। তিনি বসন্তের মধ্যে মাত্র একবারই ঘান করেন, আহার করেন প্রচুর, তাঁর নির্ভর ছোট্ট লাইব্রেরীটাই তাঁর সঙ্গ।

লাইব্রেরীর মধ্যে না কি গণিতশাস্ত্রের বই বেশী। তাঁর বরাবরের অভ্যাস, ঠিক মশটার সময় তিনি গদাইকে নিয়ে যেতে বসতেন। গদাই যেখানেই থাকুক, ঠিক মশটার মধ্যে এসে হাজির হয়। আগে তিনি কাফন-দির বাড়ী থেকে আসতে দেবী হওয়ার গদাই ঠিক সময়ে এসে হাজির হ’তে পারেনি। মাঝা একবার মাত্র গদাইএর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—“কোথার বাও?” গদাই বাড়ি ছেঁটে করে মাঝা চুলকে অস্পষ্টভাবে কি একটা জবাব দিয়েছিল, তারপর আর কোনও কথাই হয় নি।

সে দিন গদাই কাফন-দির বাড়ী থেকে বেরিয়েই স্নাত্তার আসপাশের দোকানের ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে চলল। হঠাৎ সুদূর দোকানের একটা ঘড়িতে নক্তর পড়তেই দেখলে—নাড়ো দশটা। তার মনে মনে ভাব হ’ল, অতঃপরও হ’ল—অকারণেই সে তার মামাকে অসম্বদ্ধ করছে। মাঝা তার জন্মে নিচয়ই অপেক্ষা করছেন। গদাই তার সমস্ত শক্তি জড় করে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে। সেদিনও তার দেবী হ’য়েছিল, সেদিনও তার ভয় হ’য়েছিল কিন্তু কেন সে জানে আজকাল এই দেবী হওয়ার মধ্যে কোথায় বেন একটু আনন্দের স্বর বাজছে। অত এই আনন্দ কিসের, এর উৎসই বা কোথায়—তা’ তিনি দেখেবার তার অসম্বদ্ধ হ’ল না। হঠাৎ গেষ্টের সন্ধ্যা মামাকে কোমরে হাত দিয়ে ঠাড়িয়ে থাকতে বেধে সে চমকে উঠল। তার এই ছাত্রিশ বসন্তের জীবনের মধ্যে সে তার মামাকে বাড়ীর বাইরে এতদূর এগিয়ে আসতে আজ এই প্রথম দেখিলে। সে মামার সামনে এসে পাঁচ ছোট্ট ক’রে থমকে দাড়িয়ে পড়ল। হেমন্তবাবু কোনও কথা না ব’লে সটান বাড়ীর মধ্যে ঢুকে ফেলল। কোথায় কোথায় ঘরটা চিরকাল তালাবদ্ধ থাকে। গদাই মামার সঙ্গে এক কাল এই গাড়ীতে বাস করেও জানে না সে ঘরে কি আছে।

আজ হঠাৎ হেমন্তবাবু যখন গদাইকে সঙ্গে ক’রে এনে সোতলায় কোমরে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, গদাই এক অজান্তে ভয়ে মনে মনে শিউরে উঠল—তা’ স্বল্পজীবী গরীব-প্রকৃতি মাঝা হয়তো অত্যধিক চটেছেন—হয়তো বা এই ঘরে ভালো বন্ধ করে রাখবেন, হতো বা এই ঘরে খোঁজার চানুক আছে।

কিন্তু বিয়ের মধ্যে ঢুকে এবং মামার মুখের কথা শুনে, আর দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সে কেঁদে ফেলল। কি অপরাধ সে করেছে বাহু-এতদূর শপথ তাকে করতে হ’ল। ঘরের দরজা খুলতেই ছ তিনটা চামড়িকে উড়িয়ে পেল। হেমন্তবাবু সমস্ত জানালা খুলে দিয়ে বললে—“তাকাও দিকিন, দেওয়ালের দিকে।” গদাই ঘরের চতুর্দিকে তাকিয়ে জ্বাক হ’য়ে গেল—দেওয়ালের কোথাও ফাঁক নেই। তার মামার এবং তার অসম্বদ্ধ আত্মীয় ও আত্মীয়্যার ছোট ছোট আশ্রয়পত্র। এক দিকের একটা মাঝারি ছবির দিকে আত্মলু দেখিয়ে হেমন্তবাবু বললেন—“মিলনী, তোমার মা, নিনতে পার?” গদাই এর মনটার ভেতর ছাঁপ করে উঠল। তার ভেতর ছুটো চলে ভ’রে এল, বাড়ি নেড়ে বলল—“হ্যাঁ—”

হেমন্তবাবু বললেন—“দিয়ে কর, আর যাবে না।” গদাই বাড়ি হেঁট করে বললে—“কোথায়?”

“তা জানি না শপথ কর।”

গদাই এবার বিরক্ত হ’ল—এ মন্ডা কথা নয়, কি জন্মে শপথ করব তা জানব না, অথচ শপথ কর।—বিরক্ত হ’য়ে বললে—“মাগ করুন মাঝা—কোথায়, কেন, কিসের জন্ম—না জানলে অকিন শপথ করব না।”

গদাই আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে গেল। হেমন্তবাবু মিনিটটাক চুপচাপ ঠাড়িয়ে থেকে, পুনরায় ঘরটাকে তালা বন্ধ করে নীচে নেমে, গেলেন।

লোকে বলে, হেমন্তবাবু লোকটা না কি একটু পাগলাটে ধরনের, আর গুঁই সম্বন্ধশী হ’বার তাঁর স্ক্রেড কেউ অজ্ঞ কথা বলেন। তাঁরা বলেন—যে বহুর গণিতশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাঙ্গ হান অধিকার করে বেরিয়ে এলেন হেমন্তবাবু, সেই সময়ে তাদের সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণের পুত্র, সে না কি প্রায় বুদ্ধিমান এবং স্বন্দর। হেমন্তবাবু তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেন। হেমন্তবাবু এম্‌টি অজমন্ডর ধরনের লোক হ’লেও জীবনে ছুটা ভিনিসি অকৃত্রিমভাবে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন—এক গণিতশাস্ত্র, ওপর—সেই ব্রাহ্মণ। সেই মেয়েটার লোভ ছিল কিন্তু ঠিক হেমন্তবাবুর ওপর ততটা নয়, যতটা হেমন্তবাবুর বিদ্যার ও বুদ্ধির ওপর; তাই তার ভালোবাসা হ’ল অসম্পূর্ণ। বছর

ছ’রেকের মধ্যেই মেরে মেরে হেমন্তবাবু বিদ্যার সাক্ষর্য নিয়ে বেশ ক্লান্তির সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হ’ল এবং সেই সঙ্গে হেমন্তবাবুর কাছে সে হ’য়ে গেল দল্লভি এবং ছাত্রপ্রাণ। তারপর শোনা গেল সে অপর একজনকে বিবাহ করে বেশ সুখেই আছে। এই দুঃখের হেমন্তবাবু কিন্তু অনেক কিছুই ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বাঁধা-ধরা চলা-ফেরা, আহার-নিদ্রা—সবই উলট পালাত হ’য়ে গিয়েছিল। তাঁর মা তখন জীবিত। তাঁর মার প্রতিদিনের নিবেদনসত্ত্বেও সে খোজা ছাড়া মার মত বেরিয়ে যেত। তখন সে কোনও দিকে, কোনও কথায়, কোনও জন্মেবে কাশ দিত না, আপন মনে ছুটে যেত। নিজের জীবনের এই সব দুঃখসময় দিনগুলির কথা তাঁর মনে পড়ত, ভয় হ’ল, পাছে গদাইএর যৌবন বৃদ্ধিবা কোনও এক বিপরীত লোভে পড়তেই পড়ত, পড়তেই পড়ত। তাই গদাইএর প্রতি তাঁর এত সাবধানতা, তাঁর তার শপথের জন্ম এত আয়োজন।

গদাই কিন্তু অনেক ভেবেও এতবড় শপথের প্রয়োজনীয়তা কোনও দিক থেকেই বুঝে পেলেন না। তাই সে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলেন না তার স্বল্পজীবী এম-এ মামার হঠাৎ এত বেশী রকম বিচলিত হ’বার কারণটা কি। সে হঠাৎ এক সময়ে আপন মনে ঠিক করে নিলে তাঁর আহারের সময় অল্পপরিমিত তার বেধেপরাণ মামার বুক বড় বেশী করেই বা বৃদ্ধি বাজছে। তাই সে তাঁর আহারের সময় সম্বদ্ধ খুব বেশী সতর্ক হ’য়ে উঠল এবং পূর্বের মতই কাফন-দির বাড়ী যাওয়াত করতে লাগল।

কাফন-দির বাড়ীর ফটকে ঢুকই বা-দিকে কামিনীফুলের গাছ, তাইই একটা ছোট কোণ এবং তারই গায়ে ছোট ছোট সীন্দ্র ফাণ্ডারের গাছে নানা বিচিত্র রংয়ের ফুল ফুটে আছে। তাদের প্রতি প্রতিপাঙ্কির ওপর গাভের শিশির পড়ে ফুলগুলিকে স্তিমিত্য করে তুলেছে। গদাই অজমন্ডর ধরনের পাণ্ডিত্যগুলির ওপর হাত দিয়ে নিয়ে আসুলের ডগায় শিশির বিলুপ্তি স্পর্শ করতে লাগল। পরে কি ভেবে সেইখান থেকেই ডাকলে—“কাফন-দি—”

বাইরের দিকের জানালা থেকে কাফন-দির উৎফুল্ল মুখখানি বেরিয়ে এল—ব’লেন—“এই যে আমিও ঐশ্বর্য, লল,



এক মিনিট।' তারপর কান্নন-নি বিরিয়ে এসে গদাইএর হাতখানি ব্যাড়াভাবে নিয়ে মূঠার তের নিয়ে বললে—'ভূমি আজ একটু শীর্ণগিরি উঠেছি গদাই।'

গদাই একটু অশ্রমবস্ত্রায়ে দ্বাব-বিলে 'হ্যাঁ।' তারপর ছলনাই পারেনি দিলে চলল।

কিছুক্ষণ বেড়াবার পর অন্ন একটু রোগ উঠতেই গদাইএর অশ্রমবস্ত্র তার কাপটিকে লক্ষ্য করেই কান্নন-নি বললে—'চল গদাই আজ রেগুর ওখানে যাওয়া থাক। তারপর অশ্বখণ্টা পরে ছলনে যখন রেগুর বাড়ী এসে হাজির হ'ল রেগু তখন তার আশ্বখণ্টে মহাব্যস্ত। আশ্বিন-কোয়ার্টারের একটা বাড়ীর নোতানর কথানি ধর; কোমের থাননি তার নিজের ব্যবহারের, পল্লের থাননা বড় বড় ঘর তার অফিসের 'গ্লোর রুম' (গুদামঘর)। তার পরের থাননি তার অফিস ঘর।

রেগু অফিস-ঘরের টেবিলের সামনে চেয়ারের ওপর ব'সে আসন মনে কি কাঙ্ক্ষ করছে—তার সামনে বড় বড় থানা খোলা ও ছড়ান। কান্নন-নি ঘরে ঢুকেই বললে 'ওরে বাবা, কি কাও তোমার, এত সকালেই এ সব কি কেঁদেছিলি?—'

রেগু অশ্বখণ্টাখানি মুখ তুলে আবার কাছে মন দিয়ে বললে—'আর কল কেন? ইনকমের (আয়ের) নামে অশ্রমবস্ত্রা এদিকে ট্যান্স দাও—রিটার' তৈরী করছি, যদি কিছু কম করতে পারি।'

সামনের টেবিলের ওপর এক কাপ চা খোঁরা উড়িয়ে স্বপ্নন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ওদিকের দৌড়ে একটা কেবলি চাপল। কান্নন-নি চায়ের বাটটার দিকে তাকিয়ে বললে—'চা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে দেখছি।'

—'আর চা—এখন আমাকে না তা'রা ঠাণ্ডা ক'রে দেয়, কান্নন-নি। বা শ্রুততা করছে তা আশ্রয় বদলার নয়—' তারপর গদাইএর দিকে তাকিয়ে বললে—'কি বলুন—উঃ কি ক্যাসাম, কান্নন-নি নামটাও ছাই তুলে গেলুম, মাথা একদম গোমাল হ'য়ে গেছে—পাঁচান, পাঁচান, অপানার নাম 'ক্যাট-সু-আই' না?'

কান্নন-নি রেগুর ছুঁমি বৃষ্টিতে পেরে তাড়াতাড়ি বললে—'গদাইবাগ, গদাইবাগ।'

গদাই 'স্বপ্নন ও কল্লান করতে পারে নি যে, বাস্তবিকই বাপানীর ঘরের কোনও অরবাসী বুঝতী মেয়ে টিক এ তাবে অফিস গুলে ব্যবসা চালাতে পারে। সে কিছুতেই বিশ্বাস করত না আজ যদি না সে নিজের চোখে দেখত। গদাইএর মন এই কর্তৃত্বশীল মেয়েটার প্রতি শ্রদ্ধা মাথা নীচু করলে। রেগুর কথাবা মোটেই সুর হ'ল না।

একটু পরেই একজন বলিষ্ঠ স্বপুরুষ যুবক হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। তার শাটের হাত গুটোন, মাথকোটা মাথা। সে রেগুর দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কার ক'রে কোমের টেবিলের সামনে গিয়ে বসল। সামনের টাইপরাইটারের চাকনাটা খুলতেই রেগু বললে—'দেখুন, একটু সাবধানে টাইপ করবেন, একটু শীর্ণগিরি চাই, আরকে শেষ তারিখ—' বলে হাসের একতড়া খমড়া কাঁজ তার দিকে এগিয়ে দিলে। তারপর একহাতে কান্নন-দিকে আর এক হাতে গদাইকে ধরে বললে—'চল আমদা ওখরে যাই।'

কান্নন-নি এতদূর যেতে যেতে বললে 'ই হুঁমি তোব টাইপিষ্ট, চেহারা-খানা তো দিবা যমাকারী কান্নকর্ণে কেমন? বোধ হয় একেবারে নীরবে।'

রেগু বললে—'না ভাই, টিক উঠেটা খুব চটপটে, বুদ্ধিমানও বটে, তবে—'রেগু থেমে গেল।

কান্নন-নি ব্যগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলে—'তবে কি?'

রেগু হাসতে হাসতে বললে—'সব শিরালোর যা—ওরও তাই। ওর আগে আর একটা ছোকরা ছিল—সে ছিল যেমন বুদ্ধিমান, তেমনিই 'ওতাল—সে ছিল আমার ডানহাত, অর্ডার শ্রোগাড় করতেও যেমন, টাইপ করতেও তেমনি, ছ' মাসের মধ্যে আমার ব্যবসার অনেক উন্নতি করে দিয়েছিল আমার কিছু দিন থাকলে, আমার বড় উপকার হ'ত। কিন্তু তা তো হবার নয়, বাধ্য হ'য়ে তাড়াতে হ'ল। আমি কোথায় কিরিশি বদলের সন্ধ্যা কথা কইছি, তা তাঁর সহ হ'য়ে না। বড়ানি 'চ্যাপ্যান' কা'র কাগজ বাগবার জন্তে তার বড়ানির সঙ্গে একদিন বায়কোপে গেছি—তার রাগ, চোপ রাস্তানি। অ'র যোগে বা—তোরা তাতে কি, তুই মাইনে পাবি কাঙ্ক্ষ করবি, তোমার অত গান্ধবাহ কিসের, তুই কি এখানে 'লভ' (প্রেম) করতে এসেছিল না কি? আমি হ

একদিন গদাইভাবে বারগ স্বপুরুষ, তৃতীয় দিন এক মাসের মাইনে গিয়ে বিদায় দিলাম। সে মাইনে ফেলে রেখে চলে গেল। ইনিও দেখছি—আজ ক'দিন হ'ল একই রোগে আক্রান্ত হ'য়েছেন—এরা শুধু নিজেদের সমাজকে দেখে দেখে দৃষ্টি ছোট করে ফেলেছে, নতুবা এদের বেশ বুদ্ধিও আছে, ভরও বটে—মোট কথা আর সব দিকেই ভাল।'

গদাই রেগুর নির্ভীক কথাগুলো শুনেই মনে মনে একটু চকল হ'য়ে উঠল। মনে মনে সে সাবধান হ'ল—সে যেন ঈহুটো বেকুবের মত এমন কিছু না বলে বসে যার ধারা রেগুর মনে অশ্রদ্ধা ধাপে।

পারের ঘরের টেবিলের সামনে বসে তিনজনে যখন চা আর রুটার সহ্যাবহার করতে লাগল, হঠাৎ রেগু হাতে থানিকটা পাউকটার টুকরো নিয়ে মাড়াচাড়া করতে করতে অশ্রমবস্ত্র-ভাবে বললে—'আজ কান্নন-নি—সেদিনের তোমাদের তর্কের কথা মনে আছে তো। রেগুকে থাকতে যেমনকার একটা ঘটনা আমাদের বারবার মনে পড়ছে, তোমাদের কাছে গিয়া, গদাইবাগ আর তুই, ছলনাই বিচার ক'রে বল—সেটা একনিষ্ঠতা, কি দ্বিনিষ্ঠতা, কি শতনিষ্ঠতা?—' বলে রেগু টোলের কোণে হাসি টেনে একটু থেমে আবার বলতে লাগল—'কোন্স বিশেষ কারণে আমাদের দিনকতক রেগুবাগীসপাতালে থাকতে হ'য়েছিল—সেখানকার একটা নাম, নাম তার গদাই হ'ল—তার কিছু রূপ ছিল, শুণও ছিল যথেষ্ট। প্রত্যেক রোগীটিকে সে তার নিজের ছেনে-ময়ের মত করেই দেখত, শুশ্রূষা করত—আর সব চেয়ে মহা ছিল এই যে, তার হাতের সব রোগী সেরে উঠত—এক বছরের মধ্যেই ইংল্যান্ডে নাম করেছিল যথেষ্ট। সকলের মুখেই তখনভা—সে না কি এক বা, ঘরেই যে, কোনও এক বিশেষ কারণে সে তাঁর বাপ, 'পা, ভাই-বোন সব ব্যাগ' করে ইচ্ছা করেই ইংল্যান্ডে সেবার অত অলম্বন করেছে। তার চোখে-মুখে, চলনে বেশ একটা 'রোমাণ্টিক' ভাব হুটে উঠত। সত্যিই হুটে উঠত 'না জানি না, তবে আমার ঐরকম মনে হ'ত এবং সেই কারণেই আমার তাকে বেশ ভাল লাগত।'

একদিন ভাগ্য তার সময় বারান্দায় ওদিকে একখানা ইঞ্জিনগারে ব'সে আছি, সামনে উল্লার এক বিকৃত মাঠ,

তারই শেষপ্রান্তে লাল আকাশের গায়ে হৃদয় অত বাজে—সন্ধ্যার অন্ধকার সারা আকাশের গায়ে একটু একটু ক'রে তার ডানা খেলছে, আমি একলা ব'সে ব'সে তাই উল্লোপ করছি, কোঁদের উপর বইখানা বন্ধ হ'য়ে পড়ে আছে, হঠাৎ মনে হ'ল পাশেই কোথায় যেন চাপা গলার কান্নার আওয়াজ হুদয়ে। আমার ভাবি কেঁতুল হ'ল। আমি আন্তে আন্তে পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তা বলবার নয়। সেদিন সারারাত ঘুগুতে পারি নি, আমার সর্কাস ঘুগার যিনিম্ন করতে লাগল।'

গদাই একাএমানে রেগুর সমস্ত কথাই শুনছিল, এখনই হয়তো এই ছুঁব নির্ভীক মেয়েটা কোনও এক বিশিষ্ট অঙ্গত বীভৎস রসের বর্ণনার অবতারণা করবে তবে সে একবার শিউরে উঠল।

রেগু ছলনের মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে ইচ্ছা করেই সেই বর্ণনাটুকু বাব দিয়ে বললে—'তার পরদিন সকালবেলা নাম'টা যখন আমার টেবিলের ওপর আমার দৈনিক প্রাপ্য হুদয়ে কাপটা বসিয়ে দিলে, তখন আমি যুগায় হুঁব পর্যন্ত তুললাম না।

নাম'-মেয়েটার গত সন্ধ্যার বিশৃঙ্খল অলম্বন অবস্থায় এক হতভম্বি বিগত-সৌন্দর্য মধ্যপারীর গলা জড়িয়ে কান্নার বিশিষ্ট হুর তখনও আমার কাছে বাজছে।

—'হাতবিক কান্নন-নি, সে রকম সোচ্চ তোমার চোখে কখনও পড়েছে কি না জানি না, কিন্তু সে রকম পুরুষ ব্যক্তি কখনও তোমার চোখে পড়ে তো দেখবে সমস্ত পৃথিবী নিমিষের মধ্যেই তোমার কাছে কানো কুছী হ'য়ে দেখা দেবে, পুরুষটা যেমন শীর্ণ তেমনি তার পোষাক কুচ্ছিত পূর্ণ। মাথায় লম্বা গলা রক্ত চুল সামনের দিকে উঠে এসে পড়েছে, শরীরে কোথাও মাস নেই, মুখের হাড়গুলো পর্যন্ত ঠেলে উঠছে, হাতে মুখে ব্যাধির চিহ্ন বর্ধমান, টোলের ছুটো কোণে থা, মনে হয় থা জিহ্বাকালি আছে, সারো না, দাঁতগুলো অপরিস্কার, পানের লাল ছোপ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে জমা হ'য়েই আসছে, চোখ ছুটো ঘোলাটে, দৃষ্টি কোথাও স্থির হুদয়ে দাঁড়ায় না—সে কি বীভৎস—'



কাকন-নি তাড়াভাঙি বললে—‘থাক! থাক! ও আর বলিস নি বাপু—তারপর কি তাই বল।’

রেগু বললে—‘আমি যে কাল তাদের ঐ অবস্থায় দেখেছিলাম সে তা বৃত্তে পেরেছিলাম। ছুসের কাপটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে ঘিরে অন্ন একটু হেসে বললে—‘আপনি কালকের কথা মনে করে আমার ওপর খুব রাগ করেছেন—না? আচ্ছা, আমি আপনাকে’ বলে চলে গেল। একটু পরে ঘিরে এসে বললে—‘থাক, আমার উপস্থিত সব কাছ সারা হ’ল, শুধু তিন নম্বরের একবার স্পষ্ট সিতে হ’বে, তা আপনার কাছে একটু কল্যাণ করে গেলেই হ’বে, সে এখন ঘুমাচ্ছে—আপনি কি আমাকে আপনার বাটের একদিকে একটু বসতেও আজ বলেন না কি?’

দ্বীলোক ঠিক কড়াট নিলজ্ঞ হ’তে পারে তা সেদিন প্রথম জানলাম। চূপ করে রইলাম। হ, না, কিহুই বললাম না দেখে সে আপনা হ’তেই মেয়ের একদিকে বসে পড়ে বলতে লাগল—‘বেগুন কাল খাঁকে দেখলেন উনিই আমার বামী—আপনি অবাক হ’লেন, তা আর আশ্চর্য কি, কেন না আমি দ্বী হ’য়ে নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হ’য়ে যাই। ঠিক যে ওঁকে আমি ভালবাসি তা আমি বলতে পারি না—কেন না আমি নিজেই জানি না। অতঃ এটাও খুব সত্যি যে, আমি আমার বাপের সমসারের হৃৎ-স্বাচ্ছন্দ্য সমসাই ত্যাগ করেছি ওঁরই জন্তে। অতঃ তার চেয়েও সত্যি—যে ওঁর সঙ্গ স্ত্রীমি বিবাহের আগে থাকতেই রূপা, কপ, আর ঘুগা কপির বগেই ওঁর রাজপ্রাসাদের মত অট্টালিকায় একদিনের সেরেও পা ফিড়ে পারলাম না। জানি না ওঁর মত ত্যাগ আর অস্বস্তি, খেণে আমাকে আকৃষ্ট করেছে কি না। আমার মনে হয় ঠিক তাই। উনি রেগুদের মধ্যে সব চেয়ে ধনী এবং বিদ্বান বৈজ্ঞানিক হ’য়েও আমার মত এক সামান্য নারীর জন্তে সমস্তই খোয়ায়েছেন—তার বশ, অব, মান, রাজপ্রাপতি, বিজ্ঞা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য—কি ময়? সমস্ত—সমস্ত—যা কিছু মানুষের কাছাকাছি হ’তে পারে...’ বলতে বলতে মেয়েটার ছুটা চোপ জলে টলমল করে উঠল, দেখতে দেখতে গাল বেয়ে ছু ছ করে গড়াতে

লাগল—তার তুলনায় আমি আর কি করলাম বলুন, একটু জপ আমার আছে—এই যা। তারপর চুপি চুপি তা’র বামীর নাম যা বললে ভোমরা শুনে চমকে উঠবে—’

কাকন-নি আর গলাই দুজনই প্রায় সমবয়সেই উত্তেজিত হ’লে বললে—‘ন—’

রেগু বাড় নেড়ে জানালো—ঠিক তাই।

রেগু একটু থেমে বললে—‘কাকন-নি, এদের তুমি কি বল?’

গলাইএর গাল বেয়ে কখন দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল গলাই জানতে পারলে না, তাড়াভাঙি বলে উঠল—‘এদের একনিষ্ঠতা-সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কাকন কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না—’

রেগু আপন মনেই বলে যাচ্ছিল। গদাইএর নির্মল স্বভাবের গুণের ওপর ছুটা সঙ্গ বললেও দেখতেই তার বুকের মধ্যে ছাড়া ছাড়া হ’তে উঠল, তার মুখে সেই চাক্ষুণ্য, চোখের সেই ছুটি মিস্ত্রী হাসি নিমিত্তে কোথায় মিশিয়ে গেল, সামান্য দুটা নির্মল জলবেগ বুকের কোন্ দুর্লভ জায়গায় মুহূর্তের মধ্যে কি ভাবে যে বেগপাতি করলে তা কে বলতে পারে, তার মুখে এক অপকৃষ্ট গুণীর লাবণ্য ফুটে উঠল। নিঃশব্দ বর্ণিত মিথ্যা কালম্বিক ঘটনা এতকণ তার কাছে মিথ্যা ঘটনাই ছিল, কিন্তু গলাইএর সহজ-সরল, নিঃসংশয় নির্মল প্রাপ্তের কান্না এবং জলবেগীয় তার প্রকাশভঙ্গি, তার মিথ্যা গল্প তার নিঃশব্দ কাছেরে মুগ্ধমান সত্য হ’য়ে উঠল। নিজের মধ্যে এক অননুভূত আনন্দ এবং গদাইএর প্রতিও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সে পরিপূর্ণ হ’য়ে উঠল। রেগু তাড়াভাঙি গাড়িয়ে উঠে বললে—‘উ, অনেক কাছ বাকি আছে কাকন-নি, এবার ভোমরা ওঠ।’

কাকন-নি কি একটা বলতে যাচ্ছিল, রেগুর হঠাৎ এই বাপু ভাড়া গাড়িয়ে ওঠায় এবং তার, ঘুমাতেও হঠাৎ এই পরিবর্তনে কাকন-নি দিকবার চমকে উঠে থেমে গেল। তারপর তিনজনই উঠে পড়ল। কাকন-নি আর গলাই যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, তাদের পায়ের আগুয়াজ শেষ হ’তেই রেগু ছুটে গিয়ে তার বিদ্বানার ওপর জুড়ু হ’য়ে শুয়ে কোঁপাতে লাগল।

গলাই মনে মনে রেগুর প্রতি যত আকৃষ্টই হ’ক না কেন,

তার মনের মধ্যে কেবল একটা কথাই বার বার তোলাপাড়া করতে লাগল। অস্বস্তি! অস্বস্তি মেয়ে এই রেগু! রেগু গলাইএর মনে কেবল চমক লাগিয়ে দিয়েছে কিন্তু মনের উত্তর কোথাও রেখাপাত করতে পারে নি। গলাই অনেক দেবী করেই বাড়ী কিরল। হেমন্তবাসু সেই যে সেদিনের জন্তে ঘরের তালাবন্ধ করলেন, সেই সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের মুখটাও বন্ধ করলেন, আর কোনও দিন গলাইকে কোনও কথাই বললেন না।

বেগে মেয়েটা নিজে আঁকবন বেশ-নিঃশেষ স্বাধীনভাবে ঘুরে পৃথিবীকে একটু ভিন্ন চর্চাই দেখতে নিচ্ছে। তার এই আটপাল বৎসরের জীবনে সে আশা বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করে ফেলেছে, তাই সে কোনও জিনিসকেই ঘেঁষে চর্চা দেখতে পারে না, কোনও কিছুই দেখেই অভিনবর গুঁহে পায় না। তার মধ্যে এখন একটা কাঠোরতার আয়তন করেছে যা প্রত্যেক সাহসকে তার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়, সহজ জিনিসও কঠিন হ’য়ে ঠেকে। কিন্তু সে তার নিজের দিক থেকে সত্যতা রক্ষা করেছে চলে, কারকে প্রবন্ধনা করে না। তার অফিসের প্রত্যেক কর্মচারী স্বীকার করেছে যে তাদের পরিশ্রমের একটা পরমাণুও তুলচুক তার কাছে হয় না তবে তার সহ্যহুতি কেউ বড় পেত না। মোট কথা রেগুর মধ্যে অবিবাহ করা একটা ধর্ম এবং তার মধ্যে ‘সেক্টিমেট’র উচ্চাঙ্গের অস্বস্তির স্থান নেই। নিজের মধ্যে অবিবাহের এই মেয়াজুই সে মাঝে মাঝে অহতব করে বটে, কিন্তু তার জন্তে সে ছুঁতিন নয়; কেন না তার ধর্মসা, পৃথিবীর অনেক গোলমাল অনেক জটিলতা এড়াবার এই একটা মাত্র উপায়।

তাই সে কোনদিন কারকে ভালবাসতে পারে নি, আপনার করতে পারে নি, এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কোনদিন তা পারবে না।

কিন্তু সেদিন গদাইএর মুখের দিকে তাকিয়ে, অকৃত্রিম বিশ্বাসের স্বপ্ন যে কি, তা সে জীবনে, সেই প্রথম বুঝলে।

তার এত কালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মূল গদাইএর চোখের ছুটা ময়ূরপুঞ্জ জলবেগা গীমার গভী টেনে দিলে। ফুটো আঁহাজ তলিয়ে যেতে সময় নেয়, কিন্তু রেগু বিশ্বাসের সমস্ত তলিয়ে যেতে ছুটা মাসের বেশী সময় নিলে না। তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন হ’য়ে গেল। রেগু-ইসপাতালের কালম্বিক মেয়েটার কথা একদিন সে শুধু গল্প জমিয়ে তুলতেই বামিরে বলেছিল আর তাই সে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করলে। সেদিনের কাকন-নির দেশের বাপের খুঁটাটার একান্ত আত্ম-তাপের কথা আজ বিশ্বাস করতে তার একটু বাধল না। তার চাক্ষুণ্য, তার বাচালতা, যা তার একমাত্র সঙ্গর এবং গর্ভ ছিল সবই তার কাছে অতি হেয় হ’য়ে ঠেকে। তার মনে হ’ল, তার জীবনের স্বর্গীয় বৎসরগুলি বুখাই সে কাটিয়ে এসেছে। জীবন, তাকে আবার নতুন করে হুক করতে হ’বে। সে হ’ল গুণী, অল্পভাবী এবং নিঃশঙ্কিত। কিন্তু গদাইএর কাছে সে ধরা দেবে না, কেন না কামনার কাছে কোনওদিনই সে মাথা নীচু করে নি, করবেও না।

তাই সে একদিন হঠাৎ আপিস তুলে দিয়ে তলী বৈধে বেরিয়ে পড়ল, পৃথিবীর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করবে।

গদাই সেদিন আপন থোয়ালে রেগুর আপিসের সিঁড়ির ওপর উঠে এসে দেখে সব দরজাই বন্ধ, সিঁড়ির একদিকে একটু চেপে ব’সে একটা নিঃশব্দ ফেলল বললে—‘উ: আচ্ছা অস্বস্তি তো!’ কাকন-নি গদাইএর অজ্ঞাতশাসের পেছনে পেছনেই এসেছিল। গদাইএর হাত ধরে বললে—‘চল, গদাই বাড়ী চল—’

কাকন-নির ঠোঁট ছুটা একবার কেঁপে উঠতেই কাকন-নি বাড়ী কিরিয়ে নিলে।



## পুস্তক-পরিচয়

চলন্তিকা—আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান—শ্রীরাঙ্গেশ্বর ব্রহ্ম-সঙ্কলিত। মুদ্রা ২৫০

বাংলাভাষার যে একটি ছোট বাটো অথচ মোটামুটি কাছ চলে এমন একটি অভিধানের দরকার আছে—এসময়ে, বেশ হয়, চলন্তিকার বিজ্ঞ সরলমতিতার সহিত সকলেই একমত। এই উদ্দেশ্যে চলন্তিকার প্রকাশ হইয়াছে এবং কতক পুরিমাণে এই উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছে। আলোচ্য অভিধান-বানিতে বিস্তারিত চলিত শব্দ ও বাক্যাংশের পরিচয় আছে, গ্রাম্য অথবা ভাষার প্রচলিত বাহ্য (মোড়) তাহাও বড় একটা বার যায় নাই, অথচ বেশ স্বরচিত পরিচয় দিয়া একাধিক সম্পন্ন করা হইয়াছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে আবার কতকগুলি সুপ্রযোজক শব্দের তালিকা, কতকগুলি ব্যাকরণ-বর্ণ ও অন্তর্ভুক্ত শব্দের তালিকা, কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের পরিচয় থাকিতে গ্রন্থের উপযোগিতা আরও বদ্ধিত হইয়াছে। ইহার উপর বাঙালী সাহিত্য ও কবিতা ভাষার ব্যবহৃত অনেকগুলি শিল্পপ্রয়োগ-সম্বন্ধ বাক্যাংশ ও প্রচলিত বিশেষীয় শব্দের পরিচয় দিয়া সুসংলগ্নতা বহাশর যে সাহিত্যাদুর্গাশ্রমের ধন্যবাদই হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের আকার ঝাঁঝি (গেট আপ) প্রকৃতি ভালই হইয়াছে; দামও যুব বেশী হয় নাই।

এ তো গেল এইধারনি গুণের কথা, কিন্তু অভিধান-বানিতে জটিল বড় কম নাই। ভূমিকার লিখিত হইয়াছে—“বাহার আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্কা করেন, উচ্চাঙ্গ প্রাধান্য যে প্রয়োজনে অভিধানের সাহায্য লইয়া থাকেন, বিনা বাছিয়া তাহা সাধিত করাই এই অভিধানের উদ্দেশ্য।” এখানে আধুনিক সাহিত্য বলিতে কি বুঝিব? আধুনিক সাহিত্য বলিতে যদি মধুসূদন, হেমচন্দ্র, সিরিনন্দ্র প্রকৃতিকে বাদ দিতে হয়, তাহা হইলে অবশ্য কিছু বলিবার নাই। আবার, ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’, কাশীমাদানন্দর বাংলা মহাভারত ও কৃত্তিবাস-প্রণীত বাংলা রামায়ণ, কালীপ্রসন্ন সিংহ-কর্তৃক অনূদিত ব্যাসের মহাভারত প্রকৃতি বাদ দিয়া যদি কেহ

বৃষ্টির বিশ শতাব্দীতে রচিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করিতে চান, তাহা হইলেও কোন কথাই বলিবার নাই। কিন্তু যদি কেহ সংস্কৃতভাষারী তথাকথিত ‘সাধু’ভাষার লিখিত কোন বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে চান, বা কোন শব্দবিশেষের (যথা, নম্রা, গায়ত্রী) গুণ প্রচলিত অর্থ ছাড়া অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত অর্থ শিল্প-প্রয়োগসম্বন্ধ কোন অর্থের পরিচয় লাভ করিতে চান, তাহা হইলে চলন্তিকা অনেক সময়েই অচল হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—“অধাশন,” ইহা ‘ইজা’ ‘ঐবিক’ প্রকৃতি স্বপ্রচলিত শব্দগুলির অর্থগতক্কে যদি কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রের খটকা লাগে, তাহা হইলে বেচারীকে স্বস্বলক্ষ্য মিত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রকৃতির সাহায্য লইতে হইবে, কিংবা বৈদ্যমামব গাঙ্গুলী-সঙ্কলিত বাঙ্গালা ইংরেজী অভিধানের পাতা হাততাইতে হইবে। অথচ এই চলন্তিকাতে অলাভ (অসন্ত অসার), মনসা (সোনার পাত মোড়া), গরুদ্বী (পালওয়ালা নৌকা) হৈয়দ্বীনি (মানব [?]) প্রকৃতি বহু অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দের পরিচয় আছে।

শব্দের অর্থের দিকে আভিধানিকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। চলন্তিকার ‘অজ্ঞ’ শব্দের অর্থ ‘দেওয়া হইয়াছে ‘মুহূ’। বন্ধনীতে যে ‘অজ্ঞাণাওয়া’ আছে তাহার মানে ‘মরা’ হইবে। কিন্তু ‘অজ্ঞা’ শব্দের অর্থ ‘মাতা’। ‘কুম্ভাণাওয়া’, ‘গঙ্গাণাওয়া’ মানেও ‘মরা’ কিন্তু ‘কুম্ভ’ বা ‘গঙ্গা’ মানে ‘মুহূ’ নয়। ‘অজ্ঞাপ্রাণি’, ‘গঙ্গাপ্রাণি’=জগন্নাথপ্রাণি, কুম্ভাপ্রাণি=জগদ্বিপিতৃপ্রাণি। সকলগুলিরই মানে ‘মুহূ’। ‘চন্দ্রশাশা’র অর্থ ‘দেওয়া হইয়াছে’—‘ছাদের উপরে বিলাস-গৃহ’; কিন্তু ছাদের উপরে যে কোন গৃহকেই ‘চন্দ্রশাশা’ বলে।

‘চকুদান’র ‘চুরিকদা’ একটি অর্থ দেওয়া উচিত ছিল। ‘চকরীক’ শব্দের দ্বীলিঙ্গে ‘চকরীকা’ হয়—‘চকরিকা’ নয়।

১০৩৭]

পুস্তক-পরিচয়

১০৩৭

‘গন্ধর্ব’ শব্দের নীচে ‘গন্ধর্ববিদ্যা’, ‘গন্ধর্ববৈদ্য’ আছে, বেশ। কিন্তু ‘গন্ধর্ববিবাহ’ না হইয়া ‘গান্ধর্ব বিবাহ’ হইলেই ভাল হইত।

‘গায়ত্রী’র অর্থ ধরা হইয়াছে ‘ত্রিপর ময় বি’—‘গায়ত্রী বলিতে কি শুভু এইটাই বুঝায়?’ ‘নম্রা’ মানে ‘রসিকতাপূর্ণ গল্প’ বাদ পড়িয়াছে। ‘অক্রেদ’ সাধারণতঃ বিশেষণ, বিশেষ্যও হয়। বিশেষ্যের মানে দেওয়া হইয়াছে, বিশেষণের মানে বাদ পড়িয়াছে।

‘অপর্যাপ্ত’ শব্দের সাধারণ অর্থ ‘অন্ত’, ‘খাণ্ড অপেক্ষা পর্যাপ্ত নাই’ অর্থও হয়। কিন্তু শব্দের অর্থ ধরিয়াই ‘প্রচুর’, ‘প্রয়োজনবশত অধিক’ দেওয়া হইয়াছে। ‘মেরেরা’ ‘পাতত’ অর্থ যেমন অপরিত বসে, ‘পর্যাপ্ত’ অর্থ ‘অপর্যাপ্ত’ ও বলে; এইরূপ অনেক আছে।

‘অপারক’ অর্থ প্রয়োগ। প্রথমে ‘অপারগ’ লিখিয়া পরে ‘অপারক’ লিখিলে ভাল হইত।

কতকগুলি শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থবিধাজনক হয় নাই। যেমন ‘আলাল’ শব্দ ফার্সী লেখা হইয়াছে। ফার্সী ভাষায় এরূপ শব্দ নাই। ‘তবক’ শব্দকে তুর্কী লেখা হইয়াছে, অথচ মানে দেওয়া হইয়াছে শুক, হর, পাত, থাক। পাত প্রকৃতি অর্থ হইলে শব্দটা আরব্য হইবে। যদি শুধী চুড়িবার বন্ধুকেই হইত তাহা হইলে তুর্কী ভূপক হইতে ব্যুৎপন্ন করা যাইত।

কয়েকটা অন্তর্ভুক্ত বানানও চোখে পড়িল। ‘ব্যবহারিক’ ‘ব্যবহারিক’ হইবে। ‘বাস্ত’ শব্দের অর্থ ভ্রমক্কে ‘পৈত্রিক বাস্তুহা’ হইয়া গিয়াছে—‘পৈত্রিক’ হইবে।

‘সাবরণ’ শব্দের ‘বর’ ‘অন্তঃস্থাব’—‘বর্গীয় ব’ নয়। অর্থ ‘স্বায়ংব’ ‘স্বয়ংব’ ঠিকই আছে। এখানে ‘বর’ বর্গীয় ও অন্তঃস্থাব দুইই হয়।

যদিও ‘চলন্তিকা’র ছাপির ছাড়া রের অধিক শব্দ আছে, এবং এই গ্রন্থে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে স্বপ্রচলিত শব্দ-কেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তথাপি বাক্যের কয়েকটাই হইবে যে, সাহিত্যে ও বৈদ্যমনি বাক্যাংশে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এমন বিস্তার প্রচলিত সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দ এই গ্রন্থে বাদ পড়িয়াছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মাইকেল মধুসূদন-ব্যবহৃত, অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত ‘বরীয়র’

‘প্রক্কেডন’, ‘হুনানীর’, ‘পূর্ণাশা’ ‘বীতিহোর’ প্রকৃতি শব্দগুলি না হয় বাদই দেওয়া গেল, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের খাতিরে না, হয়—‘সেবনাদ-বধ’ উপভোগ ছাড়িয়াই পৈত্রা গেল, কিন্তু তাই বলিয়া স্থল-পাঠ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বাঙ্গালীর মূলে মূলে প্রচলিত—ও যমের বরে প্রবচনকূলা ব্যবহৃত মাইকেলের কয়েকটা বাক্য কিং করিয়া আধুনিক বাঙালী সাহিত্যের অনুরোধেও বাদ দেওয়া যায়। কুলের কোন ছাত্র যদি আকৃতি করিবার সময় ‘স্বয়ং-অন্তঃস্থাব’, ‘পশে যদি কাকোদর গরুদের নীড়ে’ প্রকৃতি বাক্যাংশগুলির অর্থ বুঝিতে চায়, ‘উড়িল কামধেনু অমর-প্রদেশে’ কিংবা ‘নাশিলা ভৈরবের মেষোদন’ কিংবা ‘স্বাপিলা যিধুরে বিধি হামর লগাটে’ প্রকৃতি স্বপ্রচলিত বাক্যাংশগুলির অন্তর্গত কয়েকটা শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে ‘চলন্তিকা’ তাহাকে এক কিছুই সাহায্য করিবে না?

আবার, ভারতচন্দ্রকে আধুনিক মূল-কলেপের ছাত্রগণ ভুলিয়েও তাহাদের পাঠ্যপুস্তকে ভারতচন্দ্রের প্রণবীক হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটা অংশ, পাঠ্যপুস্তকের সমলয়িতগণ ও শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ পাঠ্য বসিয়া দ্বির করিতে ছাড়েন নাই। এখন যদি একজন ‘আধুনিক’ যুগের ছেলে ‘অদ্বার জরতী বেশে ব্যাসে চলনা’ কিংবা ‘অদ্বার ভবানন্দ-ভবনে বাজা’ পড়িতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে চলন্তিকা তাহাকে আশঙ্করূপ সাধিয়া করিতে পারিবে কি না কেহ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। আবার, ধরা থাক, মূলী হর করিয়া কাশীনাথী মহাভারত পড়িতেছে,—

“হরবাক্য শুনি হাসি বলে হরবীর।  
অপ্রাণ দ্রব্যেব কেন বাধা কর শিব।”

কিংবা,—  
“নেউটিম্ম মের পানে চাহ চারু মূখ,  
হের মরি ত্রিশূল মারিয়া নিজ যুগ।”  
কিংবা,—

“যে উশার মূল ধরিয়াছে সর্বজননে।  
মূখিক বুড়িছে মূখ না দেখে নমসে।”  
পড়িতে পড়িতে খোলাবশতঃ ‘হরবীর’, ‘নেউটিয়া’ ও ‘উশা’ এই কয়টা শব্দের মানে সঘর্ষে তাহার কোতুল হইল



এবং পার্শ্বে উপস্থিত পূজকে তাহার সম্বন্ধীত 'চলন্তিকা' হইতে শব্দ কটায়র মানে দেখিতে বলিল। ইহার উত্তরে ছেলে কি বলিল? চলন্তিকা চলতি খাতায় শব্দ কয়টা নাই বলা ছাড়া তাকর আর উপায় কি? \*

আর উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। ঘরে বসিয়া অন্ন চেষ্টায় একটু বাহির করা শব্দ হইবে না। কিন্তু সহস্র সমালোচক মাত্রেরই মনে রাখিতে হইবে যে, ক্রটি বাহির করা এক কাজ, আর অভিধান প্রণয়নকৃত্য দুরূহ স্বরূপ

ব্যাপার আর এক কাজ। এক্ষণ অধ্যয়শাস্ত্র-সংক্ষেপে দ্রুত ব্যাপারে ক্রটি ঘটা ও ছাড় পড়িয়া যাওয়া অনিবার্য। তবে আশা করি, এই অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার সময় সুশুভিত ও 'পরস্ফুট'রূপে সাহিত্য-সমাবেশে সুপরিচিত সম্বলযুক্ত মহাশয়, ক্রটিগুলির প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিবেন, বাহাতে এই গরীব দেশের লোক ছই তিন টাকা মূল্য দিয়া বইখানি কিনিয়া একটু কম হতাশ হয়, ও অভিধানখানি হইতে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী সাহায্য পায়।

## শান্তিপুত্রের লেখকগণ

ঐক্যবাহিনী ভট্টাচার্য

বঙ্গের শান্তিপুত্র, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেণী, পূর্ববঙ্গী ও বিক্রমপুরের পাণ্ডিত্যের খ্যাতির কথা আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে। এসম্বন্ধে প্রথমতঃ সাধাৰণভাবে কতিপয় মন্তব্য ও ঘটনার উল্লেখ করিয়া মূল প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করা বাইবে। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোষাধী ভট্টাচার্য, 'বাস্থদেববিজয়'-প্রণেতা ৮রামনাথ তর্কর, 'কাকিল দূত'-লেখক কবি ৮হরিমোহন প্রামাণিক, কবি শ্রীমদেয়ারীলাল গোষাধী, সুকবি শ্রীকৃষ্ণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমোহনেন্দ্র হক, ঐগণ্যসিক ৮রামোদার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকটকজ্ঞ চট্টোপাধ্যায়, 'সম্বন্ধনির্ঘ'-প্রণেতা ৮গঙ্গামোহন বিদ্যামণি ভট্টাচার্য, 'কুলার্ণবকারিকা'-রচয়িতা ৮রামগোপাল সার্ক-ভোম, 'প্রকৃতিবৈবেক'-সম্বলিত ৮রামকমলা বিভাজনস্বায়, সম্পাদক ৮শুভচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'গোবিন্দ দাসের করতা'-প্রকাশক ৮জয়গোপাল গোষাধী, ভাগবতরত্ন ৮মদনগোপাল গোষাধী ও ৮সারিকানন্দ গোষাধী, সাধক পণ্ডিত ৮অম্বৈতাচার্য, ৮ব্রজবল্লভ গোষাধী ও ৮অযোয়নাথ গুপ্ত প্রকৃতি মহাবল্লভের কথা সাধারণ পাঠকের নিকট উপলোভ্য হইবে আশা করা যায়। নিম্নের শ্রেণীবিন্যাসে কতকটা

প্রসিদ্ধি-সম্ভাবী করা হইলেও, প্রধানতঃ গোষাধি-বংশ, কবি, ঐগণ্যসিক, সাধাবল্লভসম্বী ও বিবিধ এই ভাবেই করা হইয়াছে। সমস্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এ কথা বলা যায় না। প্রচারিত লেখক ব্যতীত অজ্ঞ পণ্ডিত ও সাহিত্যিকসমূহের সমগ্র পরিচয় ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া বাইবে না। শান্তিপুত্রের শিক্ষার কথা অজ্ঞ লিখিত হইবে।

(এক)

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে, ৯৭ সাহেব লিখিয়াছিলেন, "এখনও ৩০টার অধিক চতুর্থা দী আছে, পূর্বে অবশ্য আরও বেশী ছিল।" (১)

'বেঙ্গল পাঠ' ও 'প্রজেক্ট' ভলুম ৬, ১৯১১, ৩৪ ৭৩ (পৃ: ২২) হইতে জানিতে পারা যায় যে ত্রিবেণীর উত্তরে ২০ হইতে ৩০ মাইলের মধ্যে হিন্দু শিক্ষার প্রসিদ্ধ তিনটা স্থান বা সমাজ হইতেই গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুত্র, নবদ্বীপ।

(১) দি ক্যালকটটা রিভিউ ভলুম ৬; 'দি ব্যাল্ড অফ দি ভাগীরথী'

একবার দাশরথি রায় ছড়কোড়াঙ্গার পাচালী-গান য়তেছিলেন। লোকের বুদ্ধিতে না পারিয়া তাঁহাকে গান দ্রুত করিতে বলিল। তিনি উত্তর করিলেন,—

যনি ভাগ্যবতী গঙ্গা আনুলেন জিতুবন দ্বন্দ্ব।

তাঁর আবার খেব রইলো পুত্র প্রতীতির জন্তে ॥

তার বিরহেতে কুলো খ'মেনে বয়ঃ লম্বী আসি।

ভার বিরহেতে এরা হ'লো না আকালে হাড়ীর মাসি ॥

ন'দে শান্তিপুত্রের বার জয় জয় রব।

ছড়কোড়াঙ্গার হার হ'ল তার হরির ইচ্ছা সব ॥ (১)

একবার কাশীধাম হইতে শ্রামদাস নামে ব্রাহ্মচর্যদেপাণ্ডিত এক সর্বনাশ বিপারদ দ্বিধিজয়ী পণ্ডিত শান্তিপুত্রের প্রখ্যাত বঙ্গমণ্ডল-বঙ্গবন্ধুগণের (অম্বৈতাচার্য) নিকট উপস্থিত হইয়া তুলসী ও ভাগীরথীর মহিমা বর্ণনা করিলেন এবং জীবনকে 'নিগুণ' নিরাকার অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী ব্রহ্ম' বলিয়া বিশিষ্ট করিলেন। অম্বৈতাচার্য ইহা শুনি 'গঙ্গার স্বত্বের' অম দেখাইয়া পরমজ্ঞকে 'শ্রীসচ্চিদানন্দময় অনাদি শাকর সর্বশক্তিমান' অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বেরা' বলিয়া সিদ্ধান্ত দান করিলেন। এই ঘটনা হইতে তাঁহার 'অম্বৈত' নাম হইল। তখন তিনি শ্রামদাসের 'ভাগবতভাষ্য' নাম দিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতায় দীক্ষিত করিলেন। (২)

অম্বৈতাচার্যের সময় শান্তিপুত্রের অঙ্গরূপ আর একটা টানা ঘটনাছিল। এমন প্রসিদ্ধ পদকর্তা সন্তোজ মহা প্রায় সাধারণতঃ বলিয়া গণ্য ৮ব্রহ্মনাথ দাস মহোদয়ের ঐগণ্য ৮ব্রহ্মনন্দন আচার্য তর্কচূড়ামণি অম্বৈতাচার্যের দ্বিতীয় নামসম্বন্ধে বহু প্রকার হরিদাসের হাবভাব দেখিয়া তাঁহাকে 'বৈতা বাউন' প্রকৃতি মেঘে বিশেষিত করিলেন। ইহাতে অম্বৈতাচার্য-দ্বিতীয় ভূতপূর্ব 'উজ্জ্বলপতি কুলদাস হরিদাসের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করিয়া রাখিলেন। ইতি-যথ্যে হরিদাসের কীর্তন সমাপ্ত হইল। তখন তর্কচূড়ামণি হরিদাসকে, 'এক সাধক কি নিরাকার' 'নামি কার্য কি', 'জ্ঞান শ্রীকে', 'স্বপ্নি বহু প্রকার কন', 'স্বপ্নজন্মের ভারত্যা হেহু ঈশ্বরের কবুথে পক্ষপাত-সৌম্য বিরূপে

বঞ্চিত হয়', প্রকৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিদাস সন্তোজ প্রশ্নান করিলেন। এমন সময়ে অম্বৈতাচার্য আদ্যোদেব এবং তর্কচূড়ামণির ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতায় দীক্ষিত করিলেন। (১)

১১২৮ সালের ১৭ই ফাদন তারিখে মূর্শিবাবাদে আহুত সভায় লিখিত পরকীরামত-সিদ্ধান্তমূলক দলিলে শান্তিপুত্রের পণ্ডিতের নাম স্বাক্ষর রহিয়াছে। ঘটনাতী এইরূপ হইয়াছিল। জয়পুরজাঙ্গা দ্বিতীয় জয়সিংহের সময় ব্রহ্মদান ও জয়পুরজাঙ্গা পরকীরামতবাদী বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ স্বকীরামত-কীরামত-মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে অসমর্থ হইয়া (সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া) স্বকীরামত-দ্বন্দ্বত করিয়া দেন। তাঁহাদের প্রার্থনামুত্বারা জয়পুরজাঙ্গা দ্বিধিজয়ী সভাপণ্ডিত কুলদেব ভট্টাচার্যকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ণবগণ ও স্বকীরামত-স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। বঙ্গদেশেও দ্বিধিজয়ীর জয় হইতে লাগিল। কেবল শ্রীং ও জাজিগ্রামে আপত্তি উঠিল। শান্তিপুত্র, নবদ্বীপ, ধর্মহর, বহ্মদান-কাটোয়া নিকটবর্তী স্বপুত্র, কানাইভাঙ্গা ও লুতা, স্বপুত্রগ্রাম, কাশী এমন কি স্বপুত্র তৈলঙ্গ হইতেও পণ্ডিত আহুত হইলেন। নবাবের আহুকূলে মূর্শিবাবাদে সভা হইল, এবং সেখানে শ্রীনিবাস আচার্য তাঁহাদের বঙ্গদেশ পণ্ডিত-প্রবর রাধামোহন তাঁহাদের বিচারে দ্বিধিজয়ীকে পরাস্ত করিয়া পরকীরামত স্থাপন করিলেন এবং দ্বিধিজয়ীকে নিষিদ্ধ করিলেন। পুনরায় ব্রহ্মদানবাসি হাদে পরকীরামতের জয়পতাকা উড়িল ('চাণ্ডা গারার পেন')। স্বকীরামত স্বাক্ষরকারী বৈষ্ণবগণ পরকীরামতবাদীদের পক্ষ-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইন্তকাজ লিখিয়া দিলেন। (২)

'ভারতবর্ষবাসি' ও 'কুলপঞ্জিকা'-প্রণেতা সুবিখ্যাত উদয়নাথ্যের (৩) বংশসূত্র-শান্তিপুত্র 'কাদপ' ভট্টাচার্যের বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া এককালে শান্তিপুত্রকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য চার পুত্র ও ছই ছই লইয়া অম্বৈতাচার্যের সময় শান্তিপুত্রে আসিয়া বসবাস করেন। তিনি অম্বৈতাচার্যের পৌত্রোচিত্য করিতেন। তাঁহার বংশে ৮মুকুন্দদেব

- (১) অম্বৈতাচার্য, ৭ম অধ্যায়
- (২) কাশীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস (নবাবী আমল) ; নদীয়া কাহিনী ;
- (৩) 'কুলহাজি-প্রণেতা' ১৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'কুলপঞ্জিকা-



সার্কভোম জয় পরিগ্রহ করেন। ইনি শান্তিপুত্রের এক দিগ্বিজয়ী দত্তাকে শাহ-বিজ্ঞানের পরাভব করায়, দত্তাকে দত্ত কান' ১৩১২ খৃষ্টাব্দে হত্যা করেন।—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণশাস্ত্র, ২য় অংশ

কেহ কেহ বলেন, কুশনারবিশারদ উদয়নাচার্য ভাট্টাইই 'কুশনাঙ্গলি'র প্রণেতা। উদয়নাচার্য ভাট্টক অষ্টম গোবামীর বুদ্ধ প্রপিতামহ নৃসিংহ লাড়ুলীর সমসাময়িক লোক। ইঁহার নিবাস নিমিনা গ্রাম, বিলা রাজসাহী। খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর লোক। কাউয়েন 'কুশনাঙ্গলি'কে খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীর লিখন বলিয়াছেন। 'কুশনাঙ্গলি'-প্রকাশক উদয়নাচার্য কাঞ্চনগোত্রীয় বাল্লভ-কুলের লাড়ুলীগোত্রীয়মহত।

—সম্বন্ধনির্ণয়

রাঙ্গেশ্বরলাচার্যগণের মতে বাল্লভশ্রেণীতে পরিবর্তন ঘটানার প্রতিষ্ঠাতা উদয়নাচার্য ভাট্টাইই এগুরু ন্যায়গ্রন্থ 'কুশনাঙ্গলি'র প্রণেতা। এক পক্ষ ইঁহার জন্মস্থান নিমিনা, অল্প পক্ষ মানিকগঞ্জের বলিয়াচাঁতে ছিল বলেন। ইনি খৃঃ ১৪শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

—চরিত্রাভিনয়

বসন্ত উদয়নাচার্য হইলেন—একজন 'কুশনাঙ্গলি'-রচয়িতা যৈশিণ উদয়নাচার্য (১০শ শতাব্দী); দ্বিতীয় বাঙ্গালী উদয়নাচার্য (উদয়ন ভাট্টাই); ইনি ১৪শ শতাব্দীতে (মতান্তরে ১২শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধবোধ (৫) যৈশিণ উদয়নাচার্যের ধর্ম্মনিকক করেন। 'বসন্ত-রচয়িতার মতে, ইনি তীর্থযাত্রণকালে 'কুশনাঙ্গলি' গ্রন্থ প্রাপ্ত হন।

—স্বপ্ন মিত্রের 'অভিধান'

১২শ শতাব্দীতে বসন্ত (৫) জৈশির অন্তর্গত নিমিনা গ্রামে উদয়নাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বৃহস্পতি আচার্য বোদ্ধাচার্য জিন্মির সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া লঙ্কায় প্রাণত্যাগ করেন। উদয়নাচার্য এই ঘটনার ক্রোধে হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তীর্থযাত্রণকালে পরাভব করেন।

তাহারই ফলস্বরূপ 'কুশনাঙ্গলি' গ্রন্থে একদিকের প্রকাশ ও আতিক্রান্ত প্রতাপন করেন।

—সাহিত্য, পৌষ ১৩০৮

ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইনি গুণধার সার্কভোমের 'ভায় কুশনাঙ্গলি'র চীকা দেবিগা' অবলম্বণে স্বরে 'গদাই-পাতি কালে চলিলে' বলিয়াছিলেন। মুকুন্দবৈষ্ণব ভিটার তাঁহার অদ্বতন ১ম গুরুব কলিকাতার হিন্দু স্থলের ভূতপূর্ব সহকারী প্রধান শিক্ষক ও মাজেদারী বিতরণন সমস্বতী বিভাগয়ের অধ্যক্ষ ওরামবাড় ভট্টাচার্য্য বি-এ বাস করিতেন। এই ব্যক্তের বারান বাজাভাটপতি, মহেশ তর্কপকানন, নন্দীনারায়ণ ভায়পকানন, চাঁদ তর্কবাণীশ, ব্যাসদেব সার্কভোম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক সময়ে বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। একদা নবদ্বীপরাজের সভায় সর্গনারবিশারদ এক উদারী নবদ্বীপস্থ সকল পণ্ডিতকে পরাভব করেন। তখন মহারাজ শম্ভুচন্দ্র নাটোরাধিপতির সহায়তার পুরস্কার লক্ষ্মীনারায়ণ ভায়পকাননকে সভাপণ্ডিত করিয়া আনয়ন করেন। এক সপ্তাহ বিচারের পর উদারী পরাভব হন। (১)

শান্তিপুত্রের অষ্টভাচার্য্য, বরভী, সর্গানন্দী, চৈতন্য, নপাটী, আগমনবাণীশ ভট্টাচার্য্য, উজ্জিয়া গোবামী প্রভৃতি ব্যপে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত একত্রিত করিয়াছিলেন। "শান্তিপুত্রের লক্ষ্মীতলা পাড়ায় প্রজন্ম নৈয়ায়িক পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিভাবাণীশ মহাশয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ডাক ছিলেন। কোন কারণে মহারাজের সহিত মনোমালিঙ্গ হওয়ায়, তিনি তাঁহার সাহচর্য্য ত্যাগ করেন।" (২) ইনি সর্গানন্দী বংশে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার প্রপিতামহ বা পিতামহ বৈষ্ণবাচার্য্য হইতে লক্ষ্মীতলা বা সর্গানন্দী-পাড়ার উত্তীর্ণ আসিয়া বদমাশ করেন; এই বংশের কয়েকজন শান্তিপুত্র বাঙালী পণ্ডিতও বাস করেন। বরভীবংশের ৬গোপীনাথ সার্কভোম বোধ হয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অষ্টভাঙ্গশ্রেণীর নাটোর-রাজগুহ ৬রাধামোহন বিভাগাচম্পতি গোবামী ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণনগররাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি একবার ব্রহ্মীম-কোটের জয় উই'রায় জোন্স মহোদয় কর্তৃক আহৃত হইয়াছিলেন। নাটোর ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হই'কে জয়

পণ্ডিতের পদ দিতে চাহিলেন। কিন্তু ইনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে, সাহেব বলিলেন,

অনকরে বীক্ষা মহাধনিবৎ

তাজানবন্ধা কৃত্তিভিনবিভা।

স্বর্ণবাস্তবাস্য কুটোয় সযীক্য

কুশস্ত্রিয়ঃ কিং কুশোভ ভবেয়ঃ ॥ (১)

"এই গোবামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাটোরের। সিংহপতি মহারাজ বিশ্বনাথ রায়ের সভায় অক-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সৌরাষ্ট্র-মগধ-কর্ণাট প্রভৃতি দেশীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতবর্গকে বিচারে পরাজিত করিয়া অল্প দেহভার ময় ত্যাগ করাইয়া উপবেশিত ব্রাহ্মণ নৃপতিকৈ ত্রীকুল ময় দিয়া বিকৃত্তিক জয়পতাকা গ্রহণ করিয়া, ইনি নাটোর রাজবংশের 'বহু রত্নমণি' প্রবর্তক। "মহারাজ বিশ্বনাথ পূর্বে শাক্ত ছিলেন, পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মহারাজী নৃতন ধর্ম্মগ্রহণে অস্বীকার করিয়া বসন্তের সম্পত্তি লইয়া সুশিবা বাস জেলার বড়নগরে গঙ্গাবাসস্থলে গিয়া বাস করেন। তখন বিশ্বনাথ কৃষ্ণমণিকে বিবাহ করেন।" (৩) বিশ্বনাথ ও কৃষ্ণমণি শান্তিপুত্রের গমন করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের 'বিশ্ব' ও রাধামোহনের 'মোহন' লইয়া গোবামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় মিলি বাটতে 'বিশ্বমোহন' বিগ্রহ স্থাপিত করেন। মহারাজী শান্তিপুত্রের ব্রতপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ৫০০ টাকা তৈলবাট স্বরূপ দান করাইয়াছিলেন এমিত্রি আছে; তৎকালে মহারাজী অতুটি হওয়ার এবং পণ্ডিতমণ্ডলী আপত্তি করায় গোবামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'অনবিশ্বঃ পবিত্রো বা সর্গাবস্থাপি গতোপি বা। যঃ যতঃ পুণ্ডরীকাকং স বহাভাত্তরে গুচিঃ ॥' এই শ্লোকের বলে ব্রত কার্য্যে বাধ্য ছিলেন। কৃষ্ণমণির আক্রমিতা শান্তিপুত্রের মহাসমারোহে নিমগ্ন হয়।

(১) যুবক, আষাঢ়-প্রাণ ১৩২১

(২) মাধিকানাথ গোবামী—বর্ত্তিপর্ণ বা ময়্যাস

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ

কাণ্ড, ২য় অংশ

চৈতন্যবংশের শীতাবধি তর্কবাণীশ জয় আদালতের পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া 'জয় ভট্টাচার্য্য' নামে খ্যাত ছিলেন। কবি হরিমোহন প্রামাণিক একবার কুশাবন হইতে জয়পুর মহারাজের সভায় 'জৈনক শৈব-জৈনক বৈষ্ণববংশের' পরাজয় সম্বন্ধীয় জয় রাধাকান্ত দেব বাহাজর-কর্তৃক আহৃত হইয়াছিলেন; ছাংখের বিষয় ইনি সেবার কুশাবনে নাইতে পারেন নাই। 'বিভাগাগর মহাশয়ের সহিত ইঁহার পরাগাণ হইত। ইনি একবার রথপ্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে পাকুড়-রাজবাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তজাপ্রত কালী, কালী জাতি প্রভৃতির পণ্ডিতমণ্ডলী একটা শাখার মীমাংসায় অসমর্থ হওয়ার, হরিমোহন তাঁহার সহজ্ঞের দিয়াছিলেন। (১)

মনমোহন গোবামী একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। ভক্তপ্রধান পণ্ডিত রাধানাথ গোবামী তাঁজারের কুশামী রাজর্ষি বনমাকিছুব রায়, শিশিরকুমার বোম প্রভৃতি মহোদয়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন। ইনি পিতৃশিষ্য একদলগণের পক্ষ রাজবড় চক্রবর্তীর আগ্রহে ব্রহ্ম গিয়া রাজপণ্ডিত হন এবং অষ্টরাজ ইঁহাকে 'শ্রীগোবামী পণ্ডিত রাজগুরু' উপাধি দিয়া তাহা স্বর্ণপত্র দিয়া দান করেন। 'বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের আর্থ্যবর্গের আবাস্তর, রাজাও আপনাকে স্বর্গ্যবাসী করিয়া বর্গের ধ্যান করিতে, স্বতরাং আমার দৃশ্য একজন ব্রাহ্মণের বৌদ্ধ নৃপতির নিকট 'রাজগুরু' উপাধিলাভ আশ্চর্য্য নহে। উক্ত উপাধি-লিখিত স্বর্ণপত্র আমাদের গৃহে অধ্যাপিত আছে। কিছুদিন পরে ২০ ভরি স্বর্ণের মুকুট ও ৪০ ভরি স্বর্ণের যজ্ঞোপবীত আমাকে প্রদান করেন।" (২) এই সকল মহাশয়ের বিষয় পরে লিখিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে শান্তিপুত্রের ভাবার স্থখ্যাতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেছেন যে নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুত্রের লোক বিতুক্তম বাঙালী ভাষায় কথা কহে। একবার ঢাকা ধামরাইয়ের কোন লোক শান্তিপুত্রের আসিয়া বসবাস করে। বহু বর্ষ পরে সেই বংশের একজন শান্তিপুত্র হইতে ঢাকা অকলে যায়। তখন সেখানকার

(১) শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক—শান্তিপুত্র-র

(২) যুক্তিপর্ণ



লোক নাকি তাহার মুখ হইতে শাস্তিপুত্রের ভাবা শুনিবার  
কল্প তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে। (১) এই ভাবার বিস্তৃত  
কতকুর বিস্তৃত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা  
হইয়াছে। (২) 'বৃগুদির শাস্তি'র ভাগে নন্দীশ্রী অর্কলে নানা  
স্থানে হইতে লোক আসিয়া গল্পাচারে বসত করিয়াছিল।  
তদন্ত এই স্থানে বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয় ভাষা-মিশ্রিত  
হইয়াছিল। এই স্থানে সংস্কৃত ভাষার চর্চা অধিক হওয়ায়  
এখানকার প্রাকৃত ভাষা সমধিক মার্জিত হইয়াছিল।  
সেই হেতু নন্দীশ্রী শাস্তিপুত্রের প্রাকৃত ভাষাই সমস্ত বাঙ্গালা  
দেশের আদর্শ ভাষা হইয়াছিল। তাহাই এক্ষণে বাঙ্গালা  
ভাষা নামে পরিগৃহীত হইয়াছে। এখন বাঙ্গাল গদ্যে  
যেপ্রকার ভাষা সর্বত্র ব্যবহৃত হয় তাহা নন্দীশ্রী শাস্তিপুত্রের  
সাধু ভাষা। কিন্তু সাধারণ কথাপকথনে এই সাধু ভাষা  
কুরাপি ব্যবহৃত হয় না। রূঢ় ও বাস্তব ভূমিতে গৌড়ীয়  
ভাষা, পূর্ব-বাঙ্গালার বঙ্গভাষা এবং কলিকাতার নিম্নতর  
স্থানে 'কলিকাতা'ই ভাষা সাধারণ কথাপকথনে প্রচলিত  
আছে। (৩)

কবির নবীনচন্দ্র সেন ও দীনবন্ধু মিত্র, মনসী  
ভোলানাথ চন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,  
শ্রীমদ্যোগেশ বিদ্যাবৃন্দ, শ্রীহরির শেঠ, কাশীপ্রসাদ মিত্র,  
শ্রীমদেবচন্দ্র সেন, শ্রীস্বননাথ মল্লিক, শ্রীসুন্দরনাথ মল্লিক,  
মহা ও হসেনেল প্রভৃতি 'শাস্তিপুত্র'-সম্বন্ধে অসংখ্য  
গিথিয়াছেন। ব্রজানন্দ, কেশবচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত,  
রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরেন্দ্রনাথ সমাধ  
পতি, অক্ষয়কুমার বড়াল, শ্রীজগদীশ সেন, মহামহোপাধ্যায়  
শ্রীপ্রবন্ধনাথ তর্কভূষণ, শ্রীমতী সরলা দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি  
কত প্রবন্ধ সাহিত্যিক শাস্তিপুত্রের পদগুলি, দ্বিতীয় শাস্তিপুত্রকে  
কৃত্য করিয়াছেন তাহার একরূপ ইয়ত্তা নাই। ললিত-  
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দ্বাত্রীবিদ্যা' প্রভৃতি-গ্রন্থেও বহুনাথ  
মুখোপাধ্যায়, লাহিড়ী কোশ্মানীর জগদীশ লাহিড়ী  
সম্বন্ধ-কলেজের অধ্যক্ষ নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার,

বাগাচড়ার কবিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক  
শ্রীমদেবচন্দ্রনাথ রায়, কলকাতা ভাষা-রমণাশ্রম, ডাঃ  
বহুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমদ্যোগেশ সেনগুপ্ত প্রভৃতি  
মহোদয়ের শাস্তিপুত্রের সঙ্গে কখনোই ঘনিষ্ঠতা ছিল।  
আধুনিক কৃতবিদ্যাপণের মধ্যে শ্রী জগদীশ চট্টোপাধ্যায়  
ও তাঁহার চারি ভ্রাতা, শ্রীরাধবিনোদ গোস্বামী, কলিকাতা  
কর্ণপাঠশালার ডেপুটিমেষ্টার আবদুল রজ্জক ও তাঁহার ভ্রাতা,  
মিঃ রাউল এন-এ বি-এল বার-নাট্যাল, অধ্যক্ষ হরিশ্রম  
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম সর্বোদরে উল্লেখযোগ্য।

(ছ)

অদ্বৈতাচার্য্য

প্রণাত গ্রন্থ—যোগবান্ধিত ও শ্রীমদগুণবাহিনীর চক্রবর্ত্ত  
ভাষা (সম্বৃত্ত)। এক সময়ে চৈতন্যদেবকে শাস্তিপুত্রের  
আনন্দন করিবার জন্য অদ্বৈতাচার্য্য বাহ্যতঃ ভক্তিমার্গ তাগ  
করিয়া জ্ঞানমার্গের আলোচনা করিয়াছিলেন। তখন  
চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত আসিয়া যেরূপ ভৎসনা  
ও মুষ্টিবর্ষণ দ্বারা অদ্বৈতাচার্য্যকে আত্মায়িত করিলেন।  
তাহার পরই আচার্য্য উক্ত গ্রন্থের বাহির করিয়া আনিয়া  
চৈতন্যদেবকে দেখাইলেন। ঈশান নাগর লিখিতেছেন—

শ্রীযোগবান্ধিত আর শ্রীগুণবাহিনী।

এই দুয়ের ভাষা যোর প্রভুর রচিত।।

ভক্তিবর্ষ ভাষা সেই অতি চমৎকার।।

গোরে বেখাইয়া প্রভু করিয়া পার।।

শ্রীগোবিন্দ সেই দুই ভাষা পাঠ করি।

শুদ্ধ প্রণমে আর হৃদয় করে মুকারি।।

এই দুই ভক্তিবর্ষ ভাষা যে রচিল।

সেই অপ্রাকৃত ভক্তিশাস্ত্রের মণি।।

সেই কৃষ্ণের আরাগ ভক্ত অবতার।

তাঁহার চরণে যের কোটি নমস্কার।।

উদ্ধার হইল হৃদয় কৃষ্ণ নিত্যানন্দ।

এই ভাষাকার হয় প্রগতিতে বদ্য। (১)

(১) অদ্বৈতপ্রকাশ, ১৪শ অধ্যায়

অদ্বৈতাচার্য্যের বিস্তৃত জীবনী নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে  
পাওয়া যায়—বীরসের প্রামাণিক (শাস্তিপুত্র নিবাসী  
ব্রাহ্মদ্বন্দ্বজ্ঞান) —অদ্বৈতবিলাস (২য় খণ্ড); ঈশান নাগর  
—অদ্বৈতপ্রকাশ; হরিশ্রম দাস—অদ্বৈতমঙ্গল; শ্যামদাস  
—অদ্বৈতমঙ্গল; কৃষ্ণদাস—বাল্যলীলাসুত্র।। শ্রীহরির  
প্রাচীন লাউড় রাজ্যের রাজা বিদ্যাসিংহ শেখ বরসে  
শাস্তিপুত্রের আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য হইয়া কলকাতা  
লাউড়িগ বা একদারী নামে পরিচিত হন; তিনি শাস্তিপুত্র  
বাস করিবার সময়ে ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে 'বাল্যলীলাসুত্র'-প্রণয়ন  
করেন (২); অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা কুবেরাচার্য্য ইহার সখী  
(মতান্তরে সভাপণ্ডিত) ছিলেন।

শ্রীমদ্বিষ্ণু ছাড়া গোপালমতের দীক্ষা নিল।

কলকাতা নাম তার অদ্বৈত রাখিল।।

বৃন্দাবনে চলিলেন হইয়া ভিখারী।

কলকাতা একদারী বৃন্দাবনে থাকিত। (২)

অদ্বৈত শিষ্য ঈশান দাস বা নাগর জীবনের সারাকে  
শুদ্ধর আদেশক্রমে শাস্তিপুত্র হইতে লাউড়ে পমন করিয়া  
১৪৮৬ (৩) খৃষ্টাব্দে 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থ লেখেন। 'হরিশ্রম  
দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থ 'অদ্বৈত-প্রকাশেরই' অপরূপী—  
অতিরিক্ত বাহা আছে, তাহা অমাহত্বী তথ্যে পরিপূর্ণ।'  
(৪) অদ্বৈতাচার্য্য সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যগণপত  
প্রভৃতি চৈতন্যলীলা-প্রচারক গ্রন্থেও উল্লেখ।

মহাদ্বা বিজয়কুমার গোস্বামী

প্রণাত গ্রন্থ—যোগদান, আশাবতীর উপাখ্যান,  
ধর্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর, ধর্মশিক্ষা, গ্রন্থ-সম্বন্ধের বর্ত্তমান  
অবস্থা ও আমাদের জীবনে পরীক্ষিত বিষয়, ব্রাহ্ম ব্রহ্মদিগের  
প্রতি নিবেদন, শোকাপহার (বঁচিয়া), বহুভাবনী ও  
উপদেশ। ইহার প্রথম ধর্মতত্ত্ব, 'ব্রাহ্মবোধিনী' প্রভৃতি  
পত্রিকার অঙ্কে শোভা পাইত। ইহার রচিত সমীচ ও  
লিখিত প্রবন্ধ উক্ত ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যাতক।

(১) শ্রীমদুরিগাল অধিকা (১)—বৈষ্ণবদিগদর্শনী।  
ইনি বিষ্ণুরূপীকৃত সম্বন্ধে 'ব্রাহ্মবল্লী'র বঙ্গাঙ্গর্য্য করেন।

(২) প্রেমবিলাস

(৩) ১৪৬০—দীনেশচন্দ্র সেন—'চৈতন্য এও হিঙ্গ এজ'

(৪) সতীশচন্দ্র মিত্র—হরিশ্রম ঠাকুর।

ইহার বিস্তৃত জীবনী ও উপদেশ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে  
লিপিবদ্ধ আছে—কলকাতা একদারী—সমুদ্রসঙ্গ (৫খণ্ড);  
সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—আচার্য্য-প্রসঙ্গ; বরদাকান্ত  
বন্দ্যোপাধ্যায়—বিষয়মঙ্গল; হরিশ্রম বহু—মহাপ্রাণতরী  
জীবনে সঙ্গুদলীলা, সঙ্গুদর ও নান্দনতর (২ খণ্ড);  
নবকুমার বাগ্‌চী—বিজয়কথামৃত (২ খণ্ড); বহুব্রাহ্মারী  
কর—মহাদ্বা বিজয়কুমার; জগদ্বন্ধু মৈত্র (গোস্বামী) মহোদয়ের  
জামাতা)—প্রতাপদ বিজয়কুমার গোস্বামী, কলকাতা;  
শ্রীসীতানাথ গোস্বামী (ভ্রাতৃপোত্র, 'শাস্তিপুত্র' মিউনিসি-  
প্যালিটার ভাইস চোরাম্যান।)—বালক বিজয়কুমার;  
অমৃতলাল সেনগুপ্ত—বিজয়কুমার জীবনী, সাধনা ও উপদেশ,  
যোগমায়া ঠাকুরাণী; জিতেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত—অমৃত-প্রসঙ্গ;  
মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—মনোরমার জীবনচিহ্ন (২ খণ্ড);  
শরৎকামিনী বহু—বঙ্গদুঃ কথাসুত্র, সংস্কার; নগেন্দ্রনাথ  
রায়—বহুভাষা ও উপদেশ ইত্যাদি। (২)

মহাদ্বা বিজয়কুমার অদ্বৈতাচার্য্য-পোত্র দেবকীনন্দনের  
শাস্তিপুত্রের আত্মবুনিয়োগ গোষামি-সাধারণ প্রবৃত্তিক) অতদন্ত  
যত পুঙ্খ। তাঁহার সহধর্মিণী স্বর্গীয়া যোগমায়া ঠাকুরাণীর  
লিখিত একটা হৃদয় করিতা—'স্বাম্যমের চরণায়  
প্রার্থনা'—গ্রন্থও হওয়া গিয়াছে। (১) বিজয়কুমার-শিষ্য  
শাস্তিপুত্রসংক্রান্ত লালবিহারী বহুরও একটি পার্শ্বনিক  
প্রবন্ধ ও কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। (২)

এখানে মহাদ্বা বিজয়কুমারের ভগিনীপতি কিশোরীলাল  
মৈত্র মহোদয়ের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক  
হইবে না। ইনি প্রথমে শাস্তিপুত্রের বাস করিতেন।  
ব্রাহ্ম বিজয়কুমারের শাস্তিপুত্রের নির্যাতন-সময়ে ইনি  
তাহাকে লইয়া সীতারগড়স্থিত আসেন। ইনি সাধারণ  
ব্রাহ্মদ্বন্দ্বজ্ঞান ছিলেন, এবং 'ভক্ত মহাদ্বা গোষামি'  
নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইহার ৪ পোত্রই  
কৃতী—নিভায়নন্দ কলিকাতার অকল-শিল্পের কার্য  
করেন, সত্যরঞ্জন, এম-বি, ডি-পি এইচ (লণ্ডন)

(১) পঞ্চপুণ্ড, শ্রাবণ ১৩৩৬, পৃষ্ঠা ৫৪৮

(২) নবকুমার বাগ্‌চী—বিজয়কথামৃত, ২য় ভাগ

(১) দুবক, ফাল্গুন ও চৈত্র—১৩২৪

(২) ভারতবর্ষ, ফ্রেব্রু, পৃ ৭৬৬ ও আশ্বিন, পৃ ৫১২,

১৩২৫

(৩) হরিশ্রম দাসনাথ—বাঙ্গালার প্রামাণিক ইতিহাস



গয়ার ভক্তারী করেন; বিশ্বমোহন,—বি-এসি, বি-এল  
হইয়াছেন; এবং মনোমোহন,—বি-এসি ( লণ্ডন ও  
মানচেষ্টার ) হাতোয়ার স্টেট এজিনীয়ারের কার্য করেন। নিজ  
শাস্তিপুরে অল্প বে ছই চারি ঘর গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে  
লোক স্বর্গীয় বিবেখের প্রামাণিক, শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক ও  
শ্রীকালচাঁদ দাসাশয়ের কথা পরে উক্ত হইবে।

স্বর্গীয় রাধিকানাথ গোষাধী ও শ্রীনিভাষক ব্রহ্মচারী  
গোষাধী মহাশয়ের সম্মত গ্রন্থ :—

যতিপদ্য বা সঙ্গীত ( আত্মজীবনী ও সন্ন্যাসের ঐতিহ্য-  
স্থাপক ব্যাখ্যা )। প্রকাশের তারিখ বাৎ ১৩৩৭ সাল।  
বিনামূল্যে দেয়।

বিনামূল্যে চক্রবর্তীর 'শ্রীকৃষ্ণভাস্যামৃত',—বঙ্গাহ্বাদ।

ঐ 'সংস্কৃতশিক্ষা'—বঙ্গাহ্বাদ; ইহাতে  
সমগ্র ভিত্তিক সরিষাশিত আছে।

সন্ন্যাস গোষাধীর 'শ্রীরহস্যগণতামৃত',—বঙ্গাহ্বাদ।  
চৈতন্যচরিতামৃত—পয়ার ও ত্রিশদীর কঠিন কঠিন  
স্থলের বৈষ্ণবশিক্ষিতমুখ্যমিত ব্যাখ্যা ও টীকা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত',—বঙ্গাহ্বাদ।  
হরিশঙ্কর-কণ্ঠহার ( কবিতা )—'প্রেমভক্তিক্রমিকার'  
অভিনব সিদ্ধান্তমোহিত সাধন বা রাগাহ্বাদ গ্রন্থের  
উপযোগ্য ব্যাখ্যা।

রঘুনান্দ দাস গোষাধীর 'স্বপ্নপুঞ্জাঙ্কিত',—বঙ্গাহ্বাদ।  
রায়চন্দ্রসেনের 'পদাবলী'—টীকা।

জীব গোষাধী-কৃত 'সর্বগণাধিনি'র ব্যাখ্যা—সম্বন্ধ-  
কল্পকর্ম, ইহাতে 'শ্রীভগবান মনমোহনের মানবলীলা ও  
'নিচানীলাসম্মত অশুভ সিদ্ধান্ত বা স্বকীয়াবাদ স্থাপন করা  
হইয়াছে।

'কৃষ্ণপ্রিয়া' মাসিক পত্রিকা ( সম্পাদন )।

ইহার মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতের ও গোবিন্দলীলামৃতের  
সম্বন্ধে এবং হরিশঙ্কর-কণ্ঠহারে শাস্তিপুরের 'শ্রীনিভাষক  
ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পরামর্শগিতা ছিল।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রণীত অজ্ঞানগ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবতমুখ্য  
পঞ্চ পর্যন্ত ও ১২ স্বক ( ভাষাবোধিনী সমেত ) ; ভগবান্দী-  
কবিতা; ব্রহ্মবৈবর্তপুর্ণাশয়ের সম্বন্ধে ( কিয়দংশ ) ; শ্রীকৃষ্ণ-  
বাদলীলা; ব্রহ্মবৈবর্ত পরিচয়; গোবিন্দবাদলীলা; প্রেমাসনন্দ

দাসের মনঃ শিক্ষা ( কবিতা ) ; শ্রীকৃষ্ণাঙ্গীতচিন্তামণির সম্বন্ধে ;  
ভক্তজীবনে বৈদ্য, শিখরিত্তি ( কবিতা ) ; দাস আশি;  
ইত্যাদি। ইনি চৈতন্যভাগবত, হরিশঙ্করচরিত, ভক্তি-  
রাসমৃতগিষ্ঠ এবং শাস্তিপুরে গোষাধী ভট্টাচার্য মহাশয়ের  
তত্ত্বমন্ডের টীকা সম্পাদিত করেন; ভাগবতের কিয়দংশের  
ও নির্যাকের 'ব্রহ্মজ্ঞের' হিন্দী অনুবাদ করেন, শেখর  
পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য। ইনি শাস্তিপুর  
স্বয়ংকল্পে মাহুলায় গাওয়া বাল্যকালি বিদ্যালয়  
করিয়াছিলেন। তখন ইহার নাম ছিল 'ভিনকড়ি  
সান্যাল'। তার পর গৃহহস্তম ত্যাগ করেন। ইনি  
প্রথমে বৈষ্ণব ধর্মে আত্মবান্ধ ছিলেন, পরে 'নিরঞ্জনানন্দ  
তীর্থ' নাম গ্রহীত শঙ্করমঠে প্রবেশ করেন। বর্তমানকালে  
নাইনিজালে বন্দারোগার জন্ম তিনটি আশ্রম স্থাপন করিয়া  
তথায় বাস করিতেছেন। এই হজ্রে তাঁহাকে বহু ভাষার  
রাজভগবৎ ও উরুপাশ্ব বাক্সির সম্বন্ধে আসিত হই।

প্রতাপ রাধিকানাথ অষ্টম-প্রণীত বাদবজের  
( মনমোহন গোষাধী-নাথার প্রবর্তক ) বঙ্গমহুত।  
ইহার জন্ম বাৎ ১২৬১ সালে, মৃত্যু বাৎ ১৩১৮ সালে ২১শে  
বৈশাখে। ইহাকে দেখিয়াই কবির নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার  
শিষ্যপুত্রগণন মাসিক হইল' বলিয়াছিলেন। ( ১ ) ইহার  
পিতামহ আনন্দচন্দ্র তর্কভূষণ 'গোষাধী ভট্টাচার্য'  
মহাশয়ের সর্বপ্রধান ছাত্র ছিলেন। ইহার পিতা শ্রীরাম-  
চন্দ্র গোষাধী নৈয়ায়িক ছিলেন। রাধিকানাথ প্রু  
লিখিতছেন—“আমার পিতামহের জীবনকালে শাস্তিপুরে  
৪০ বানি ভায়শায়ের চতুর্শাখি হিঁস তাহার মধ্যে আমার  
পিতামহের চতুর্শাখি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং তিনি শাস্তিপুরের  
প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। পূর্বে আমাদের বঙ্গদেশের  
নবীণাধিপতি নৃপতিগণ সমাজপতি ছিলেন। তাঁহাদের  
শাসনে কেবল ভায়শাখি ভিন্ন অন্য শাসনের অধ্যাপকগণ  
অধ্যাপনার নিমিত্ত/চতুর্শাখি করিতে রাজ্যভা পাইতেন  
না। তৎকালে স্বর্গিত শাসনের অধ্যাপকগণ ঘরে  
বসিয়া অধ্যাপনা করিতেন এবং তাঁহাদের অধ্যাপকের  
পরিবর্তে অধ্যাপককল্পে ব্যাতি হইত। গীতাচন্দ্র ভূপতির

( ১ ) নবীনচন্দ্র সেন—আমার জীবন; দ্বক,  
আষাঢ় ১৩৩৭

রাধাকালে স্বর্গভগণ এক মুকুরে টোল ( এক ঘর, চতুর্শাখী )  
করিতে রাজভূমতি প্রাপ্ত হন এবং অধ্যাপক ব্যাতিও  
লাভ করেন। তাহা হইলেও নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের  
মনন অজ্ঞাত শাস্তবতা পণ্ডিতগণের অপেক্ষা অনেক  
অধিক ছিল। চতুর্শাখী শব্দের অর্থ চারি দর্শন অধ্যয়নের  
বিভাগ। গীতাচন্দ্র ভূপতির পূর্বে ভায়শায়ের টোলে  
অবশ্য মত ধর্মশাস্ত্রাদির অধ্যাপনা হইত। আবার শ্রীপাদ  
পিতৃদেব শ্রীরামচন্দ্র গোষাধী প্রু নৈয়ায়িক পণ্ডিত  
ছিলেন। তাঁহাশায়ের সময় হইতে বঙ্গদেশের গৌরবব্রহ্ম  
শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা দেশের লোকের প্রথম শিখিল  
হইতে আরম্ভ করে। স্তবরাং আমার পুত্র্যাদ পিতৃদেব  
ভায়শায়ের অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া মাঘ-নৈমধ্য-প্রভৃতি কাব্য  
ও কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি অলঙ্কার, পিঙ্গবাহি চন্দ্রশাস্ত্র,  
শ্রীমদ্ভাগবত ও বঙ্গপ্রাচারী যটসম্বর্তপ্রভৃতি গ্রন্থের অধ্যাপনা  
করিয়া বিখ্যাত অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কৃতী  
হাজের মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিলাম—  
শাস্তিপুরের মন গোপাল গোষাধী মহাশয়, শ্রীকৃষ্ণানন্দ-  
নাথের নীলমণি গোষাধী মহাশয়, হুর্শিবাণের কৃষ্ণচন্দ্র  
গোষাধী মহাশয় ও ঢাকার দীনবন্ধ গোষাধী মহাশয়।”  
( ২ ) প্রু রাধিকানাথ মনমোহন গোষাধী মহাশয়ের  
নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। ইহার কল্পের  
গমনের কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। ইনি বুদ্ধানন্দ  
বাইলে ভক্তিশ্রোতাবি গৌরিকেশের দাস ও গৌরহরি  
দাস মহাশয়ের ইহাকে গিরিধারী জীউসেবার ভায়  
কর্ণ করেন। সেখানে ইনি হরচন্দ্র গোষাধী, গল্পজী  
গোষাধী, নিত্যানন্দ দাস বাবাজী, জগদীশ দাস বাবাজী  
প্রভৃতি বৈষ্ণবচতুর্শাখিগণের সাহচর্যে পরম ভাববত-  
জীবন যাপন করেন। ইনি ৩৬ বৎসরে পরমহন্ত সন্ন্যাস  
গ্রহণ করেন। “পূর্বে স্বর্গোপাশ্রমে ক্রমিক অষ্টাদশাব্দ  
শ্রীগোপাল মন্ডের চারিটি পুস্তকরণ করা হিঁস এবং বুদ্ধানন্দ  
একটি বখাবিদি মহাপ্রসঙ্গের করি; হিঁস, তাহার কলেই  
সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিলাম ইহা; আমার ধারণা।

নাহং যত্মো ন চ দেববলকো  
ন ভ্রাতৃপক্ষজিবৈবকশুদ্রাঃ।  
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো  
ভিক্ষুর্যচাং নিম্নোবদেহগঃ।  
নাহং যোগো ন চ নরপত্তির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো  
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নাপি বনস্থো বখাবি।  
কিঞ্চ প্রোক্তবিলিপনরামনন্দপুর্ণমৃত্যুকে  
পৌণ্ড্রভৃত্তঃ পদকল্পনমোহাদিদাসাহ্মদ্যঃ।

উপরোক্ত শ্লোকসমূহে অর্থবা লাভ করিতে পারিলে  
সন্ন্যাস-গ্রহণ করা দিল হইল মানব।” ( ১ ) বুদ্ধানন্দ  
প্রু রাধিকানাথের কল্প বা পরমানন্দ্রম ভক্তগণের  
শাস্তির আশাস হল ছিল। ইহার পূজো বুদ্ধানন্দে বাস  
করিতেছেন।

স্বর্গীয় মনমোহন গোষাধী ভাগবতবক্ত

প্রণীত গ্রন্থ :—চৈতন্যচরিতামৃত, লণ্ডনাগবতের ও  
হরিশঙ্করবাস্তবের সম্বন্ধে, রাসপঞ্চাখ্যাং, কৃত্ত-সংহার  
( কবিতা )। কাগিদাসের সম্বন্ধে গ্রন্থ 'কৃত্ত-সংহারের'  
বঙ্গাহ্বাদ। ইহার বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, “নহাকবি  
কাগিদাস-প্রণীত সম্বন্ধে মূল গ্রন্থের অধিক অধ্যয়ন নহে।  
তাহাতে যে সকল শ্লোক অঙ্গীল ছিল তাহা একেবারেই  
পরিভাষা করা গিয়াছে। আবশ্যকবোধে কোন কোন  
ভাব পরিপূর্ণিত বা কোন কোন ভাব নূতন সরিষেণিত  
হইয়াছে। ইতি—২৪শে শ্রাবণ, ১২৬৭ সাল।” কিন্তু  
ইহা কলিকাতার ১৯১৭ সনতে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া  
লিখিত আছে। এই গ্রন্থের কবিতার নির্দশন নিয়ে প্রদত্ত  
হইল :—

ভূবিত চাতকদল নিরন্তর বাচে জল  
জলভারে লখনা জলধরচাঁদ।  
সহপ্রোজহরব বর্ষে নবজলব  
আর মদ বায়ুলে মনুদেখ ধায়।  
জগদবিস্তৃপ আকাশে সফরে ঘন  
সহসৌমিনী দাম শঙ্করমুদ্রা।



তীক্ষ্ণ জ্ঞান ধারাদেশ বিয়োগীর প্রাণ হয়ে  
স্বপ্নের সাগরে ভাসে অপ্রবাসিচিত ॥

অবগুণিচিত তল • গৈরিক-মিশ্রিত জল  
মুদিত-শিখুরাশ জ্বিত তার রাগে ॥

মন্দ-পনন-হিলোলে উদ্ভিন্নাধা হেলো দোলে  
কামিনী রমণী যেন যায় অসুরগো ॥

ইনিও পূর্বোক্ত যাবেস্ত-শাখার অন্তর্গত। ইনি  
প্রসিদ্ধ বক্তা, পণ্ডিত ও মনোময়ক ভাগ্যভ-পাঠক ছিলেন।

স্বর্ণীয় রাধামোহন গোষামী ভট্টাচার্য্য বিভাচ্যপতি

এই মহানবীর কণ্ঠ পূর্বে উক্ত হয়ছে। রাধিকা-  
নাথ গোষামী ইহাঙ্কে 'তর্কবাচপতি' উপাধিতে অখ্যাত  
করিয়াছেন। (১) ইহার ত্রুটিত গ্রন্থ—মুন্যনামের অষ্টা-  
বিশপতি তথের টীকা; কুহুমাজলির টীকা (২ খণ্ড);  
ভাগবতের আশ্বিন ব্যাখ্যা; বটসম্বর্ধের আশ্বিন টীকা;  
নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমের পদ্য-দ্বুতের (১২০ খণ্ড);  
(২) টীকা; তৎসংগ্রহ প্রভৃতি। এই শেরোক গ্রন্থাশ্রিত-  
সংঘে শান্তিপুত্র 'দুর্গা-পরিবর্ধের' প্রাণধরকণ ত্রীঅজিত-  
কুমার দ্বিতীয় লিখিতছেন—'গোষামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়  
অষ্টতৎসং শান্তিপুত্রে প্রায় ১১৫ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ  
করিয়া সহ গ্রন্থের টীকা ও অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা  
করিয়াছিলেন; তাহার কতকগুল প্রকাশিত ইয়াছে এবং  
কতকগুল লোকোচ্চারণের অন্তর্গলে কণ প্রাণ হইয়াছেন।  
গোষামী ভট্টাচার্য্য-রচিত জীব গোষামি-রত তৎসম্বর্ধের  
টীকা শান্তিপুত্রের কোনও গোষামী-পরিবার ইহতে সংগ্রহ  
করিয়া নিত্যরূপ একচারা মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) বহির্দর্শন। (২) নাটোরেব রাজা রামজীবনের  
সভাস্থ প্রসিদ্ধ মৈত্রায়িক শ্রীকৃষ্ণ শর্মা ১৮৪৫ শকে (বাং.  
১৩০০ সাল) পদ্যভূত রচনা করিয়া শেষ যুগের বারোজন  
ব্রাহ্মণের প্রতিভা দেখাইয়া সিঁধ্যাছেন—সহিত্য, চৈত্র ১৩০৫;  
রাজশাহীর বিবরণ। পানবা কৈশোর অন্তর্গত ব্রহ্মা গ্রামে  
ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিমাব জঙ্গ আদালতের পণ্ডিত  
সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র দ্বায়পকানন তাঁহার পোতা। এই কৃষ্ণ-  
নাথের শিষ্য লঘুভীতপ্রণেতা গোবিন্দকান্ত বিভাচ্যপতি।

—সাহিত্য, জ্যৈ, ১৩১৮

আলোচ্য ঐতিহাসিক ও আশ্রিত শান্তিপুত্রের কোনও গোষামী  
বাড়ী ইহতেই সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা গোষামী ভট্টাচার্য্য  
কৃত 'তৎসংগ্রহ' নামক দার্শনিক গ্রন্থ...তৎসম্বর্ধের  
টীকার সহিত মিলাইয়া দেখা গেলে যে, ইহা তাহা ইহতে  
সম্পূর্ণ পৃথক। এই গ্রন্থে মঙ্গলাচরণে আছে—শ্রীমদেবত  
বংশেন রাধামোহনশর্মা। প্রথম রাধিকাকান্ত্য ক্রিয়তে  
তৎসংগ্রহঃ ॥ এই পুঁথি ৫৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ...শ্রীমদেবত বংশেন  
শ্রীমতঃ শর্মা। অলেখি পরমোহিত তৎসংগ্রহ নামক।  
শ্রুতান্ত শকাব্দ ১৭২৪ চৈত্র ৮। (১) এসংঘে  
রাধিকানাথ গোষামী একটু ভিন্ন রকম লিখিতছেন (২)  
'অষ্টেত প্রভু ইহতে সত্তম পর্য্যয়ে (৩) রাধামোহন তর্ক-  
বাচপতি গোষামী ভট্টাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। এই সর্বদর্শন  
বেত্তা সাক্ষ্যৎ বৃহৎপতিতে অজ্ঞাপিত ও বহুদেশের কোন  
দার্শনিক পণ্ডিত না জানেন? মৈত্রায়িকপণ্ড তৎসংগ্রহ  
কুহুমাজলি প্রভৃতির টীকা নব্যভারতের ভোক্তাভূত (পাঠ্য)  
অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ বিচারকম হইয়া থাকেন।  
মার্ত্তণ্ড্য তাঁহার রচিত একদশীত, দ্বারভাগ প্রভৃতির টীকা  
অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মমীমাংসার বিশেষরূপে পটুতালত করিয়া  
ছিলেন। ভক্তিশাস্ত্রবিজ্ঞপণ তাঁহার রচিত ভাগবতের প্রথম  
বন্ধের ও একাদশ বন্ধের এবং প্রতিভা ও প্রজ্ঞারতির  
দার্শনিক ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করেন।  
ভক্তিনিধি মধ্যমায় তৎসংগ্রহ ও ভক্তিরহস্ত প্রভৃতি নিবন্ধ-  
গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া বটসম্বর্ধের অমীমাংসিত হলের মীমাংসা  
অবগত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকেন।' কবি  
হরিমোহন প্রামাণিক লিখিতছেন—'বাণ ও ইনি কেবল  
জ্ঞান, দ্বিত ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন,  
কাত্যায়নে তাহা বিখ্যাত ছিলেন না, তাহা পি দাদরহস্তের  
টীকা প্রভৃতি ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন, তাহা চুই করিলে

(১) শান্তিপুত্র, আষাঢ় ১৩০৬ (২) বহির্দর্শন  
(৩) অষ্টেত—কুমার—মধুসূদন (গোষামী ভট্টাচার্য্য  
শাখার প্রবর্তক)—নরোত্তম—শ্রীমদ—রামানন্দ—রাধামোহন  
বহেরজাতীয় ইতিহাস, বারোজন ব্রাহ্মণ

কণ্ড, ২য় অংশ

ইহাঙ্কে কবিশ্রোবীর মধ্যে গণনা করিতে হয়। ইনি শকাব্দ  
১৩০৭ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।' (১)

ইহার ব্যক্তিগতক লিখিত হয়ছে—'মহারাজ কৃষ্ণ-  
চন্দ্রের অধিকারকালে নবদ্বীপের হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত,  
কৃষ্ণানন্দ বিভাচ্যপতি (২), গুপ্তিগাড়া প্রসিদ্ধ স্বকবি  
বামেশ্বর বিভাচ্যপতি, ত্রিবেণীর জগদ্রাণ তর্কপকানন এবং  
শান্তিপুত্রের রাধামোহন গোষামী প্রভৃতি স্থপণ্ডিতগণের  
বংশোদ্ভূত বহুতমি আশ্রিত হইতেছিল।...রাজা  
বিক্রমের সভার পঞ্চাশ, দ্ব্যন্তরী, অমরসিংহ, শম্ভু, বেতাল  
ভট্ট, বটপকর, কানিন্দাস, বরাহমিহির ও মরগচিহ্ন নব;  
হরের যেমন সমবেশ ছিল, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাও  
তদ্রূপ নবদ্বীপের ভায়বিং হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, রামকন্ড  
বিজ্ঞানিধি, কৃষ্ণানন্দ বিভাচ্যপতি, বীরেশ্বর ভায়পকানন,  
বটসম্বর্ধ-বৈরাগিন-রাম বাচপতি, রামকন্ড বিভাচ্যপতি,  
হরাম তর্কবাসীশ, শরণ তর্কলঙ্কার, মধুসূদন ভায়লঙ্কার,  
বাত বিভাচ্যপতি, শরত তর্কবাসীশ, ত্রিবেণীর জগদ্রাণ  
তর্কপকানন, শান্তিপুত্রের রাধামোহন গোষামী-প্রমুখ  
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণ ও গুপ্তিগাড়ার সুপ্রসিদ্ধ বামেশ্বর  
বিজ্ঞানিধি, ভারতচন্দ্র রায় ভট্টাকর ও হালিশ্যন-বৈরাগী  
রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি স্বকবিগণ এবং মুকুতারম মুখোপাধ্যায়,  
গোপালভাঁড় ও হাত্যবর্ধ প্রভৃতি অসাধারণ হাত্যবর্ধিক ও  
ঐতিহ্যিক বক্তা প্রভৃতির অসুখ লোভিত্তে সমুচ্ছন্ন  
ছিল। (৩)

রাজা রামমোহন রায় গোষামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের  
সঙ্গে সাক্ষ্যৎ করিবার জন্তই শান্তিপুত্রে আসিয়াছিলেন।  
শান্তিপুত্রবাসী পণ্ডিত রামনাথ তর্করত্নের 'বাহুদেব  
বিজ্ঞান' নামক মহাকাব্যের সঙ্কে 'হানীয় পদ্যে (৪)  
ঐতিহ্য করা হইয়াছিল যে ইহার শেষ ৩ পৃষ্ঠা গোষামী  
ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরে আছে এবং তাহাতে নাম সহী

আছে, অতএব প্রকৃত গ্রন্থকার গোষামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়,  
ইত্যাদি। এই কথাই আশ্রিত হওয়ার, পরে (১) প্রকৃত  
কথা খোঁজা হইয়াছিল। এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের বিষয় আর  
একবার বর্ণনাযে উঠিলে।

শান্তিপুত্রে আর একজন গোষামী ভট্টাচার্য্য ছিলেন।  
ইনি রাজা শ্রীরামপ্রসাদ-পরিবারভুক্ত উড়িয়া গোষামি-  
বংশের কৃষ্ণদেব গোষামী। ইনি বহু দর্শনে পণ্ডিত ছিলেন  
এবং কৃষ্ণনরায়ণ রঘুরাম রায়ের নিকট 'মহামহোপাধ্যায়  
ভট্টাচার্য্য' উপাধি ও ব্রহ্মোক্তার ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।  
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও ইহাঙ্কে ১৪০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে  
১৪১ বিধা ব্রহ্মোক্তার ভূমি ব্রহ্মরূপ দান করিয়া  
ছিলেন। (২)

এখানে 'ভট্টাচার্য্য' পদবীর তাৎপর্ঘ্য লিখিত হইল।  
'ইহার (অষ্টেতের) ছয় পুত্র। তন্মধ্যে ৪ জন নির্ধিক হইয়া  
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দুই জন মাত্র গৃহে থাকিলেন,  
ইহাদের নাম কৃষ্ণ মিশ্র ও বদরাম মিশ্র। এই 'মিশ্র'  
উপাধি বর্তমান সময়ের উত্তরপশ্চিম দেশের বাঙ্গল  
বিদ্যেগর ভায় কেশবমার বাঙ্গলভার পরিচারক নহে, পূর্বে  
প্রসিদ্ধ বটসম্বর্ধনের মধ্যে বাহার ছুটী দর্শনে পূর্ণ পাণ্ডিত্য  
প্রাপ্তি তিনি 'মিশ্র' উপাধি পাইতেন।...কৃষ্ণমিশ্র  
গোষামীর পুত্র রঘুনান চক্রবর্তী এবং বরাম গোষামীর  
পুত্র মধুসূদন চক্রবর্তী। ইহাদের উভয়ের 'চক্রবর্তী' উপাধি,  
আধুনিক বাঙ্গল ব্রাহ্মণবিদ্যেগর ভায় বাঙ্গলভার পরিচারক  
নহে। পূর্বকালে তিন হইতে চারি বা পাঁচ দর্শনের  
পণ্ডিতগণ 'চক্রবর্তী' এবং 'সার্বভৌম' উপাধিপ্রাপ্ত হইতেন,  
এবং সর্ব দর্শনে অধ্যাপকের 'ভট্টাচার্য্য' পদবী লাভ হইত।  
এই বংশে রামেশ্বর-চক্রবর্তী নামক সাগবেদবেত্তা এক  
মহাভূত জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার সমস্ত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ  
তাঁহার সন্ততিদিগের মধ্যে অখ্যাপি প্রচলিত আছে।' (১)  
এখানে প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য যে উক্ত মধুসূদন চক্রবর্তী প্রসিদ্ধ  
মৈত্রায়িক ছিলেন; তাঁহার তিন পুত্র—রামবংশ, যনভাণ ও  
রামেশ্বর—যাঁহাদের শান্তিপুত্রের বড় গোষামী, মধ্য বা  
হাটখোলা গোষামী এবং চাক্ষুরা গোষামি-শাখার

(১) ভারতবর্ষীয় কবিগণের সম্মিলনপণ

(২) মশোহর জেলার মহেশপুরের

(৩) নদীয়া-কানহীন

(৪) যুদ্ধ, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩২৪

(১) যুদ্ধ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

(২) যুদ্ধ, আষাঢ়, ১৩২৭ (৩) বহির্দর্শন



প্রবর্তক; তাহার 'কালিকাতোত্র' টাকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে; রাণেশ্বরের 'সন্ধ্যা' স্থবিখ্যাত; এবং মধুপুনের অল্পমত ভ্রাতা কুমারানন্দ শাস্তিপুত্রের পাণপা গোবামি-শাখার প্রবর্তক।

পূর্ণের বাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে গোবামী ভট্টাচার্য মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও জীবিত ছিলেন দেখা যায়। তিনি মহারাষ্ট্র কৃষ্ণাঙ্গ ও ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে রাজসভাপতি ছিলেন। (১) মহারাষ্ট্র ঈশ্বরচন্দ্র ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। আর এক কথা। ইনি জর উইলিয়াম জোন্সের সুহিত সাক্ষাৎ করিয়া জল্পপণ্ডিতী প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণে উল্লিখিত হইয়াছে। জোন্স সাহেব ১৭৮৪-৮৪ খৃঃ স্ত্রীম কোর্টের বিচারক ছিলেন।

গোবামী ভট্টাচার্য মহাশয়কে 'হাঠ' বলিয়া অনেকে অজ্ঞাতবশতঃ নিন্দা করিয়া থাকে। ৮দীপবন্ধ মিত্রের কবিতায় প্রকৃত ব্যাখ্যাসহ ইহার শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবে ভক্তির এবং 'বিষমোহন' বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কথা পূর্ণে ও অজ্ঞাত লিখিত হইয়াছে। (২) "তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন তাহা ত্বরিতচিত্তে যে কোনও গ্রন্থের মধ্যপাঠের পাঠেই অবগত হওয়া যায়। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের টাকার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—

তরিত্বীতে মীলাধুরকিরূপকর্তৃলে  
দময়ন্তীনাভামৃত নিকরবর্ষী প্রিয় সখি।  
নবীন্দ্রোদয় কিংবে রচয়িত্ত দ্বীতীপিত্ত কণা  
মৃদুপলা রাধা ভয়ত বকস্রোদ্ধপিত্তা ॥

(১) কিতীশবাবালাচরিত

(২) পঞ্চপুণ, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃঃ ৫৭৮

মুদ্রিত প্রারম্ভিতত্ত্ব ব্যাখ্যা মোহন শর্মা  
ক্রিয়তত্ত্ববিশেষণ গোবিন্দরজিকামা ॥" (১)  
'তদঙ্গগ্রন্থ' গ্রন্থের প্রারম্ভেও ইনি 'রামিকাভাষ্য'কে প্রণতি করিয়াছেন ইহা পূর্ণে লিখিত হইয়াছে।

ইহার বিখ্যাত চতুষ্পাদীর নিয়ম ছিল এই যে, বহি কোন প্রবেশার্থী ছাত্রের মতক অনবধানতাবশতঃ চতুষ্পাদীর ক্রম দ্বারে তিন বার আহত হইত, তাহা হইলে তাহাকে চতুষ্পাদীতুল্য করা হইত না। এই 'এক হুসুয়ে টোল'-সম্বন্ধে পূর্ণে লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার চতুষ্পাদীতে শাস্তিপুত্রের বাহির হইতেও ছাত্র আসিত।

শাস্তিপুত্রের কবিরাজ রঘুনন্দন সেন উড়ুটসাগর মহাশয়ের সহৃদয় একটা আখ্যায়িকা শোনাইতে। গোবামী ভট্টাচার্য মহাশয়ের মত পণ্ডিতের পক্ষে এইরূপ ক্রম না হওয়াই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। একসা পিওশান করিবার সময় পুরোহিত ময় পড়াইলেন, "পিতা রামানন্দ ইত্যাদি", পিও তখন গোবামী ভট্টাচার্য মহাশয়ের হস্তে। তিনি আগন্তি করিয়া "পিতঃ রামানন্দ ইত্যাদি" হইবে বলিলেন। মীমাংসার ভজ প্রতিবেশী সর্গানন্দবংশীর প্রণত রামানন্দ তর্কবাণীশের নিকট লোক গেল। ইনি তখন আহারান্তে অচমন করিতেছিলেন। ইনি অন্তরিক্ত পাঠের জ্ঞ অজ্ঞ ইহা গিয়াছিলেন, কিন্তু এমন শূন্যস্থিতি যে অতীত পূর্বকরে কোন পটায় কি আছে বলিয়া দিতে পারিলেন। ইনি বিসর্গ-সন্ধির নিয়মাহুসারে পুরোহিতকেই সমর্থন করিলেন। এই গোবামী ভট্টাচার্য মহাশয়ের অজ্ঞত শাখার পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণগোপাল তর্কর মহাশয় জয়গ্রন্থ করিয়া শাস্তিপুত্রের মনজ্ঞত করিয়াছিলেন।

ক্রমঃ

(১) শাস্তিপুত্র, আষাঢ় ১৩৩৪

## বিবিধ এসঙ্গ

বাঙ্গালী-সরকারের আদ-ব্যয়ের হিসাব :—

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ-সভায় রাজস্ব-পরিষদ মিঃ এ মার বাঙ্গালা-গভর্ণমেণ্টের এক বজেট-উপস্থাপিত করেন—উহাতে বাঙ্গালার আদ-ব্যয়ের হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। গত বৎসর, বর্তমান বৎসর এবং আগামী বৎসর এই তিন বৎসরেরই হিসাব ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাব আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৩০-৩১ সালের আদ-ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর বাঙ্গালা-সরকারের আদ হইয়াছিল ১০ কোটি, ৫৭ লক্ষ, ৯০ হাজার টাকা, আদ, ব্যয় হইয়াছিল ১২ কোটি, ১৩ লক্ষ, ১ হাজার টাকা। ১ কোটি, ৯৪ লক্ষ, ৭৮ হাজার টাকার মজুত তহবিল নইয়া এই বৎসর আদ-ব্যয় হইয়াছিল এবং শেষে মজুত রহিল ৩১ লক্ষ, ৬৭ হাজার টাকা। বাঙ্গালা সরকারের অস্থমান ছিল যে, এই বৎসরের শেষে ৩১ লক্ষ, ১৬ হাজার টাকা মজুত থাকিবে, কিন্তু পরিমাণে উহা ৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা আরও বেশী হইয়া পড়াইল।

বর্তমান বৎসর অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সালের অস্থমিত হিসাবে দেখা যায় যে, এই বৎসরে মোট ১১ কোটি, ৫৮ লক্ষ, ৮ হাজার টাকা ব্যয় হইবার কথা ছিল কিন্তু বর্তমান ব্যয়-পত্রের নিত্যবিস্তার কার্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, উহা আরও কমিয়া ১১ কোটি, ১৩ লক্ষ, ৮৯ হাজার টাকা হইবে; অর্থাৎ বরাদ্দ অপেক্ষা ৪৪ লক্ষ, ১৫ হাজার টাকা কম ব্যয় হইবে। এ বৎসরে অস্থমান রাজস্ব পাওগা যাইবে ১ কোটি, ৬ লক্ষ, ৩৯ হাজার টাকা। পূর্ববৎসরের রাজস্বের আদে আমরা দেখি ১ কোটি, ৬৬ লক্ষ, ৩৪ হাজার টাকা, আদার ১৯২২-৩০ সালের হিসাবে অদ্য দেখিতে পাই ১১ কোটি, ৩১ লক্ষ, ৮৭ হাজার টাকা। স্বতরাং ১৯২২-৩০ সালের তুলনায় এ বৎসর রাজস্ব বাবল ১ কোটি, ৭৭ লক্ষ, ৮৪ হাজার টাকা কম পাওগা যাইতেছে।

ব্যয়ের দিকে যদিও গত বৎসরের ত্যাহই অল্পকম ব্যবস্থা

করা হইয়াছে, অধিকন্তু কন্সটারীদেবর ব্যত বেতন প্রভৃতি শুল্ককরা দশটাকা হারে হ্রাস করা হইয়াছে, কিন্তু হাফের তহবিল হইতে ঐ ১১ কোটি, ১৩ লক্ষ, ৮৯ হাজার টাকা ব্যয় হইবেই—অর্থাৎ বর্তমানে ২ কোটি, ৭ লক্ষ, ৫০ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে। এতদ্ব্যতীত ব্যয়বৃদ্ধির কারণও মিঃ মার দেখাইয়াছেন। গত আগষ্ট মাসে কাশিমবাজার ওয়ার্টস এন্ট্রেক্টেজ জ্বাড়াই লক্ষ টাকার কর্জ দেওয়া মজুর, রাজনৈতিক চাকরা, বিদ্যব, জেল-পুলিশের বৃদ্ধি প্রভৃতির ব্যয়ে ধরচের পরিমাণ এইরূপ পড়াইয়াছে। মোটামুটি বাঙ্গালা-সরকারের ২ কোটি, ১০ লক্ষ, ৯৪ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে। দ্বির হইয়াছে এই টাকা ভারত-সরকারের নিউট হইতে কর্জ লওয়া হইবে এবং বার্ষিক ১৪ লক্ষ, ৩৩ হাজার টাকা হিসাবে ৫০ কিস্তিতে তাহা শোধ করা হইবে।

এইবার আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ সালের হিসাব। ইহার হিসাবে মিঃ মার বলেন যে, এ বৎসর মোট ১২ কোটি, ৪৯ লক্ষ, ৮৪ হাজার টাকা আদ হইবে অর্থাৎ বর্তমান বৎসর তুলনায় ৪৩ লক্ষ, ৪৫ হাজার টাকা বেশী।

আগামী বৎসরের মোট ব্যয় দ্বারা হইয়াছে ১১ কোটি, ১২ লক্ষ, ৯৮ হাজার টাকা অর্থাৎ বর্তমান বৎসর অপেক্ষা ৯১ হাজার টাকা কম। বর্তমান বৎসর যে ব্যয় সংকোচ করা হইয়াছে আগামী বৎসরেও তাহাই চলিবে। ১৯৩১-৩২ সালের যে কন্সটারীদেবর জ্ঞ এই ব্যয় হ্রাস করা হইয়াছে, তাহাতে ৯ লক্ষ, ১০ হাজার টাকা বাঁচিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছে। স্বতরাং দেখা যাইতেছে ১৯৩২-৩৩ সালে কার্যতঃ ২৭ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা বেশী বাঁচিতেছে। এতদ্ব্যতীত যদিও আরও অনেক উপায়ে ব্যয়-সংকোচ করা হইবে, কিন্তু তাহা জেল, পুলিশ, কর্জের কিস্তি, রোড-জও প্রভৃতি ব্যয়ে ব্যয় হইয়া যাইবে।

১৯৩২-৩৩ সালে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যে বিভাগে যে ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটা বিভাগের টাকার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল—



প্রাথমিক-বিভাগ	৪১,২৫,০০০	টাকা
আবগারী-বিভাগ	১৭,৮০,০০০	"
ট্যাক্স আদায়	৫,৩৩,০০০	"
বন-বিভাগ	১১,১০,৫০০	"
স্বাস্থ্যবিভাগ	১৮,৯০,০০০	"
সাধারণ শাসনকার্য	১,৮৮,১০,০০০	"
বিচার-বিভাগ	৯৭,০৫,০০০	"
স্বল্প-বিভাগ	৫০,৫১,০০০	"
পুলিশ-বিভাগ	২,২০,১০,০০০	"
শিক্ষা-বিভাগ	১,১৭,৪৩,০০০	"
মেডিক্যাল	৫,১৮,০০০	"
শিল্প-বিভাগ	১১,৩০,০০০	"

মোটক, বিবেচনা করিয়া দেখিবে যেথা যায় বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আশা প্রদ নয়। ইহার অর্থনৈতিক অবস্থা যে ক্রমশঃ কিরণ সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে, তাহা বাস্তবিকই তাহার দৈনিকার বিবক্ষ। পৃথিবীর ব্যস্পা-পাণ্ডিত্যের যদি উক্তি হয়, 'তবে রাজ্যের বাড়িবে এবং ভারতের অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার অবস্থারও পরিবর্তন হইবে। প্রথমতঃ ১৯২২-৩০ মাসের শেষে অনেক বাড়ি (তা পড়িবেই, উপরন্তু সেই গুণগত) শোধ করিতে গিয়া ১৯৩০-৩৪ মাসের শেষে যে কল্পিত অবস্থা ধারণ করিবে, তাহা বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিবার কথা।

মি: মার তাঁর রিপোর্টের উপস্থাপনে বলিষ্ঠাভূত—  
‘আমি আর যে বর্ণনা দিলাম, তাহা বাস্তবিক নৈরাশ্রজনক।  
বহুদূর থেকে গুরুদ্বারের অর্ধনৈতিক ব্যবস্থা-বিষয়ক কতিপয়  
অভিবেশন হইতেছে। আমি শীঘ্র এই কতিপয় নিকট  
সাধ্য দিতে যাব। এই কতিপয় ব্যক্তি বাঙ্গালার প্রাচীন ভূবিভাগ  
না করেন, তাহা হইলে আমি বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কোন  
আইদা দেখিতেছি না। লর্ড অ্যালেনের ব্যবস্থার মধ্যে বাঙ্গালার  
প্রতি যে অবিশ্বাস করা হইয়াছে, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া  
বাঙ্গালার-দেশের অর্থগতভাবে অবস্থা হইয়া যাবে, ইহাই  
আমি প্রত্যাশা করিতেছি।’

ଡାକ୍ତ-ବିଭାଗର ସମସ୍ୟା :-

স্বাধীন সরকারের ডাক ও তাল-বিভাগের ১৯৩০ ৩১

শাবের ঘিণোটে প্রকাশ—এই বৎসর এই বিভাগে গার্ডমেন্টের মোট ৩২ লক্ষ ৯ হাজার ৭ শত ১২ টাকা ক্ষতি হইয়াছে; ইহার পূর্ববৎসর অর্থাৎ ১৯২৯-৩০ সালে মোট ক্ষতি হইয়াছিল ২১ লক্ষ, ৪০ হাজার, ৩শত ৩০ টাকা। এই বৎসরে ডাক ও তার-বিভাগে সরকারের মোট ৭ কোটি, ৫০ লক্ষ, ৯১ হাজার, ৩ শত, ৭১ টাকা আয় ও ৮ কোটি, ১৩ লক্ষ, ৫ শত, ৮৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

রিপোর্টে প্রকাশ, আনোচাবর্ষের শেষে ভারতবর্ষে শীট  
 ২৪ হাজার, ১ শত, ৭৪টি পোষ্ট অফিস এবং মোট ১ লক্ষ,  
 ৫ হাজার, ১ শত, ৬ জন কর্মচারী ছিল। এই বৎসরে  
 ৫ কোটি, ৪০ লক্ষ রেস্তোরাঁর জিনিস লইয়া মোট ২০  
 কোটি ২৯ লক্ষ জিনিস ভাড়া-ভিজোর মারফতে বিক্রি  
 হইয়াছে, ৩৩ লক্ষ টাকার ডাকটিকিট বিক্রয় হইয়াছে,  
 ৩ কোটি, ২০ লক্ষ নথি-অর্ডারে ৮ কোটি, ৪৩ লক্ষ টাকার  
 নথি অর্ডার হইয়াছে এবং ৩৮ শিঃ পার্শেলের মারফতে  
 ২৪ কোটি, ৭০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত  
 ৪০ লক্ষ 'হিসদিওরে' মোট ১০০ কোটি, ৭৪ লক্ষ টাকা  
 বিক্রি হইয়াছে। এই বৎসর অস্থায়ীভাবে নূন পোষ্ট  
 অফিস ১০৬টি খোলা হইয়াছে। এই পোষ্ট অফিসগুলি  
 এবং গত বৎসর যত পোষ্ট অফিস অস্থায়ীভাবে খোলা  
 হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ৪০০টি স্থায়ী করা হইয়াছে।

বাধা হউক, দেশের অর্থনৈতিক সবটো ব্যবসা-বাণিজ্যের  
মন্যার জন্যই এই দ্রুতি হয়। তাহাই কতৃপক্ষের মত  
কিন্তু ইহার জগাই কি এইরূপ হয় তাহা ৭ ডাকমাস্তলের হার  
বৃদ্ধি করা ও ইহার একটা অপর কারণ। আমরা দেখি,  
ডাকমাস্তল বৃদ্ধি করিবার পূর্বে ডাক-বিভাগের বেরদার  
হইত, তাহার পরে তাহা অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া  
গিয়াছে।

ভাৰতে স্বৰ্ণ-ৰোপোৰ আমদানী গুৰুত্বানী :—

বর্তমানে বাণিজ্যের স্বর্ণের অন্বেষণ যে কিরূপ, তাহা  
কাহারও অজ্ঞাত নাই। ভারতের স্বর্ণ ক্রমে ক্রমে  
অস্বাভাবিকরূপে বিকতে রূপানী হইতেছে। পূর্ববঙ্গ  
ও বর্তমান বর্ষের আমদানী-রূপানীর তুলনা করিলে সকলেই  
সম্যাকরূপে ইহা বঝিতে পারিবেন।

গত ৩০শে জাহ্নাবী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে এবং পূর্ণবঙ্গের অসুখ সপ্তাহে ভারতের বিভিন্ন বন্দরে কি পরিমাণে স্বর্ণরৌপ্যের আমদানী-রপ্তানী হইয়াছে তাহার তালিকা এখানে হাজার করা প্রদত্ত হইল—

আমদানী		রপ্তানি		আমদানী		রপ্তানি	
১৯৩২	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩১
কলিকাতা	১১৪	৮৪	২১৪	১২০৫	১২০৫	১২০৫	১২০৫
বোম্বাই	১১৪	৮৪	২১৪	১২০৫	১২০৫	১২০৫	১২০৫
করাচী	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪
মাদ্রাস	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪
রেশম	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪	৮৪

ডারতে জাপানী দ্রব্যের প্রসার :—

রপ্তানি	আমাদের দেশে নানাপ্রকার জাপানী জব্য ক্রমশঃ		
	ছাইয়া পড়িতেছে; বিশেষতঃ মোজা, গেঞ্জি, নানা প্রকার		
	২৫৯২৯	৭৩৮	১৫
১৯৩১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩২ সালের এবং	বস্ত্র, সাবান, খেলনা প্রভৃতি এত প্রচুর পরিমাণে আমদানী		
১৯৩০-৩১ সালের অক্টবর সময়ের হিসাব—	হইতেছে যে, তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করা ভাল-ত-		
	বায়ীর পক্ষে একান্ত অসম্ভব। আমরা যদি গণ কয়েক		

আমদানী				বৎসরের আমদানী জুতার আমদানীর তুলনামূলক হিসাব	
১৯৩১—৩২		১৯৩০—৩১		দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে উহা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা দেখি,	
বর্ষ	রোপা	বর্ষ	রোপা		
কসিকাতা	৩১	১২৪৯	৮৬০	২৬৮২৪	১৯২৬—২৭ ১৯১০০০ টাকা
বোম্বাই	১৫৯৬	২৭৩৭	৮৪২১০	৬৩৪০১	১৯২৭—২৮ ২৭৭৩০০ "
করাচী	৩৬৭	৭৫২	৪১৫	২৩০১	১৯২৮—২৯ ৩৩২০০০ "
মাদ্রাস	১৪৮৭	৩২১	২১৮৫১	৬১২	১৯২৯—৩০ ৬৭৭১০০ "
রেশূ	২৫০	৩৩৭	১০৪৫	১১১১	১৯৩০—৩১ ১০৯২১০০ "
রপ্তানি				এতদ্বারা ১৯৩১ সালের এপ্রিল:হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে	
				আমিরাছে ৭৩৪০০০ টাকা। এই সমুদয় জুতার মূল্য	
৪৬৩২৫৫	১৫২৫৮	৩৭২৪	৪৩৯৯	১০ টাকা হইতে ১৬০ টাকা পর্য্যন্ত।	

১০ টাকা হইতে ১৫০ টাকা পর্যন্ত।

তিন মাসের হিসাব এইরূপ সকল জাপানী দ্রব্যই বাজারে বেশ প্রদার লাভ  
 গত অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাস এবং এপ্রিল করিতেছে। এই প্রশ্নের মূল কি?

*[Faint handwritten notes at the bottom of the page]*







এ। বেদ

কিন্তু বত রকমেরই প্রমাণ প্রস্তাব হোক না কেন, অলৌকিক বিষয়ে বেদই স্বতঃপ্রমাণ। বাহ্য মনের অতীত সত্যকে ও স্বর্গীয় লোককে জানতে গেলে ঐতিকে মানা ছাড়া এবং তার অস্থূল নুষ্টি ছাড়া উপায় নেই। তাপসের ক্রটি যে সাধনের উপদেশ করেছেন, গ্রিক সেই সত্য নিয়ে গেলে সত্যের উপলব্ধি হবে। প্রত্যক্ষমূল্য করে পারতে গেলে তুল্য হ'বে। প্রত্যক্ষ জিনিসটা আমাদের পাচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবদ্ধ। সেই প্রত্যক্ষের জ্ঞানবাহু রকমের বোধ রূপে পায়, তাও আমরা দেখিয়েছি। প্রত্যক্ষমূল্য অস্থান করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, এক একজন দার্শনিক, এক এক নৃপতি সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছেছেন। এখন কার অসুস্থিটিক ঠিক? পরন্তু বেদের সিদ্ধান্ত এক অবশ্যবোধেই সমীচীন। সকল সমাধিমান ব্যক্তি সেখানে থেকে ফিরে এসে সেই অবস্থারই সম্মান দিয়েছেন। পুরুষের-গ্রাহ্য জগতে যুক্তিচরক দ্বারা কতকটা সত্য নির্ণয় করতে পার, কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে ক্রতির উপদেশ ও সাধন ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে? তবে বৈদ্যাসিকেরা যে যুক্তি করে থাকেন, সে হ'ল নিজেই মত দৃঢ় করার জ্ঞান ক্রতির অস্থূল নুষ্টি। সে যুক্তির অভিত্রাণ, বেদের সত্যকে মানলে জগতের সকল সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু এ ছাড়া আর বা কিছু কেনে জগতের তত্ত্ব সমাধান করতে পারে তাইতেই গোল মেখে বাবে এবং পদে পদে স্ববিচার এসে উপস্থিত হবে—এইটে বোধ্যমান। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভাষার অর্থবাহু বত রকম ইচ্ছা বাড়িয়ে গেলে ক্ষতি নেই, কিন্তু পারমাণবিক সত্যকে বুঝতে গেলে অধ্যারোপ অপবাস-ভাষার দিয়ে বুঝতে হবে। অধ্যারোপ মানে এই জগতটা অন্ধের উদার দেশ-কাল-নিমিত্ত বা নাম রূপ দিয়ে বর্ণিত। এই অধ্যারোপ ভাষা দিয়ে জগৎ-রহস্য বোঝা আরও পরিবোধী কথা বা কিছু তাতে অপবাস নিয়ে আর তুল দেখিয়ে দেওয়া—এর উদাহরণ হচ্ছে রজুতে সর্প ভদ্র।

এখন তোমারা যে এই উদাহরণের তুল্য ধরেছিলে যে, পূর্ণ সর্পজ্ঞান না থাকায় রজুতে সর্প-ভ্রান্তি হ'তে পারে না। আবার এই সর্পজ্ঞান প্রত্যক্ষমূল্য। ব্রহ্মতে জগৎ-ভ্রান্তি হ'বার পূর্বে জগতের জ্ঞান থাকা চাই, আর সে জ্ঞানও

প্রত্যক্ষমূল্য, তা হ'লেই জগতের পূর্ণ বৃত্তিই মানতে হয়; কিন্তু আমরা বলি, কোন বিষয়ের ধারণা হ'তে পারেই যে (১) একটা বাহু বস্তুর প্রত্যক্ষ করা চাই বা (২) একটা বাহু বস্তুকে প্রত্যক্ষ করলেই যে ঠিক সেই বাহু বস্তুরই প্রমাণ জ্ঞান হ'বে, বা (৩) অস্থান দ্বারা প্রত্যক্ষ শোধান করে নিলেই প্রমাণ জ্ঞান হ'বে—তার কোনও মানে নেই। এ যুক্তির তুল্য আমরা দেখাচ্ছি।

তোমারা বলেছিলে কোন বাহু বস্তুর প্রত্যক্ষ ছাড়া কোনও সত্যের হ'তে পারে না এবং সে সত্যের বৃত্তিতেও উন্নত পারে না। সাপ দেখেছিলাম, তার সত্যের ছিল, রজুতে এখন সেই সত্যের বৃত্তি এসে আরোপিত হ'য়েছে। আমরা বলি এ সত্যের অনাগি, রজুকে উপলব্ধ করে বর্তমানে বৃত্তি পড়ে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। জ্ঞান জিনিসটা বাইরে থেকে এসে আমাদের ভেতর ঢোকে না, ও ভেতরেই আছে, জ্ঞাত বাহু বস্তুর সাধ্যতে সে তার নাম-রূপ বলাচ্ছে মাত্র, বা বাহু বস্তুকে উপেক্ষা করেও নিজেই মনে ইন্দ্রপূরী গড়ছে। • দেখ, তোমারা বলেছিলে দেহের অতিরিক্ত আত্মা তোমারা বেশ বোঝ, দেহে ও আত্মতে ভ্রম হবার কোনও হেতু নেই। যুক্তিতে বেশ বোঝা গেল বটে কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে রাস-ভ্রাম কি ঠিক চেনা আত্মকে দেখ থেকে পৃথক করে ভাবতে পারে? তুমি যখনই বল, 'আমি ঘর শুয়ে আছি, এখন আমি বাইরে যেতে পারব না'—তখন কি দেহের অতিরিক্ত চেনা আত্মার কিংবা তোমার মনে ছিল। বলতে পার ওটা আমাদের গৌণ প্রয়োগ করেছিলাম—'বীরাঙ্গি' মানে গৌকটা বার্থা সিংহ নয়, সিংহের মত বলমান—কিন্তু গৌণ প্রয়োগের কথা ব্যবহার মনে থাকে না, আমরা তখন দেখেই আত্মা বলে বৃষ্টি। মাহুয়ে সিংহের গৌণ-প্রয়োগ হ'তে পারে—সিংহের ভাষা বলমান মাহু, কিন্তু আত্মতে দেহের গৌণ প্রয়োগ কি করে হ'বে? দেহের কোনটার মত আত্মা?—ব্যবহারিক কালে দেখেই আত্মা এইরূপ প্রমাণা নিশ্চয়-জ্ঞান হ'য়ে থাকে। এমন বল দেখি, দেখেই যখন আত্মার অধ্যারোপ করছি, তখন

The Phenomenon is the product of reason; it does not exist outside of us, but in us; it does not exist beyond the limits of intuitive reason, —Kant.

আত্মকে কেবে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, এবং সেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান চেননের সাধারণ আশা দেখেই অবগদন করে বৃত্তি-রূপে উদ্ভিত হয়েছ?

আমরা এটিকে নিয়ে ভাষা শৃঙ্খল সামাজিক—  
দেহ ও আত্মা পৃথক  
কারণ, দেহ জড় এবং আত্মা চেতন  
কিন্তু দেহেতে আমাদের ক্রান্ত-ভ্রম হচ্ছে  
যেমন রজুতে সর্প ভ্রম  
কিন্তু রজুতে সর্প ভ্রম হ'তে গেলে বাহ্য প্রত্যক্ষমূল্য পূর্ণ সর্পজ্ঞান বা সত্যের থাকা চাই  
এখন দেখেতে আত্মভ্রম হ'য়েছে  
তখন আত্মার পূর্ণজ্ঞান থাকা চাই  
পূর্ণজ্ঞান বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ থেকে হয়  
যেমন পূর্ণ সাপ দেখেছিলাম তাই এখন সাপের সত্যের আছে।

তা হ'লে আত্মকে কেবে প্রত্যক্ষ করেছিলাম বা সত্যের জ্ঞান বৃত্তিপক্ষে আরও হ'য়ে দেহের ওপর আত্মার অধ্যারোপ করেছে।

আত্মা বাহু বস্তু নয় আত্মা আছেন বলে বাহু বস্তু আছে।

বা বাহু বস্তু নয় তা প্রত্যক্ষ হয় না  
স্বতঃপ্রসব আত্মার পূর্ণজ্ঞান প্রত্যক্ষমূল্য নয়  
অস্থানমূল্য ও নূন [চক্রক লোভ হইবে]

কারণ অস্থানও প্রত্যক্ষমূল্য  
অতঃপর আত্মার জ্ঞান আনন্দি সত্যের  
তখন আবার বেশ, কাল নির্মিত এসকলের জ্ঞান কোথা থেকে এল। প্রত্যক্ষ করতে গেলে ও ঐ শুভোকে আগে ধরে নিয়ে তবে বাহু বস্তুর জ্ঞান হয় • বোম্বাটো, বেশকেই আকাশ বলেছেন, আকাশের চেয়ে বড় জিনিসের মনে মাহুয়ের হ'তে পারে না। অনন্ত বলতে সাধারণ মাহুয়ে আকাশকে বুঝে। এই আকাশের বা দেশের প্রতিযোগী জ্ঞানের তুলনা থেকে মাহুয়ের সাধারণ সীমাবদ্ধ

জিনিসের জ্ঞান হয়। এই দোহাটোর জ্ঞান হ'তে গেলে পোয়াতের পারিপার্শ্বিক সমস্ত জ্ঞানকে 'না' করে দেওয়া চাই। পোয়াত কি? যা বিদ্যমান নয়, মেয়ে নয়, বই নয়, কলম নয়, বাতাস নয়, এই রকম করে সমস্ত দোহাটোর সমস্ত প্রতিযোগী দেশ-জ্ঞানকে নিরাস্ত করে একটা বিশেষ গুণ (রূপসাদৃশ্য) বিশিষ্ট এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধরূপ সীমাবদ্ধ যা পূর্ণের দ্বারা ও বাহিরে অস্থান কালে একত্রকার দেশে অবস্থান করছিল, এখন এইরূপে বা দেশে অবস্থান করতে, হেঁটে বা ওয়াড়া পর আর একত্র করে বিভিন্ন দেশে ও কালে অবস্থান করবে। মাত্র একটা জিনিসের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'তে পারে না। বহু বস্তু থাকলে তাদের মধ্যে তুলনা করে তবে আমাদের জ্ঞান হয়। একটা বিশেষ বস্তুর জ্ঞান হ'তে গেলেই তার একটা বিশেষ দেশের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধের জ্ঞান চাই, এই-ভাবে সীমাবদ্ধ করতে গেলেই অপর জিনিস মানতে হয় না তাকে সীমাবদ্ধ করবে। যদি মাত্র একটা জিনিস থাকে, 'তাকে দেশে আছে বলা যায় না, কারণ তাকে দেশে আছে বলতে গেলেই সীমাবদ্ধ করার জ্ঞান দ্বিতীয় বস্তুর দরকার হ'য়ে পড়ে। কিন্তু যখন বলছ এক জিনিসই আছে আর কিছু নেই তখন তাকে সীমাবদ্ধ করার জ্ঞান দ্বিতীয় জিনিস কোথায় পাওয়া যাবে। আর যে জিনিস সীমাবদ্ধ হ'ল না তা অনন্ত সর্বব্যাপী হ'য়ে পড়ল। ইনিই হ'লেন যাদের অর্থব্রহ্ম। ব্রহ্ম যখন অস্থান তখন তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁরই ওপর আনন্দি সত্যের, দেশ, কাল, নির্মিত জগৎ-প্রবাহ চিত্রিত করেছে। এ জগতটা কেবল কতকগুলো কালক্রিয়ের প্রবাহ বা পরিবর্তন মানে এই আনন্দি দেশ-জ্ঞানের বিভিন্ন আকার পূর্ণ-পর-রূপ আনন্দি কারণে সত্যের দিয়ে নির্মিতের কালক্রিয় পৃথক জুড়ে গেছে। পরিবর্তন জাহাই হ'তে পারে না যদি পূর্ণজ্ঞান জ্ঞান না থাকে। আগে এই রকম ছিল, পরে এই রকম হ'য়েছে, এই জ্ঞানের নামই পরিবর্তন। • কাহাজেই পরিবর্তন জ্ঞানের আগে কারণের জ্ঞান থাকা চাই। 'দেশের জ্ঞানও কারণকে অপেক্ষা করে। কোনও দেশের জ্ঞান হ'তে গেলে যখন তার প্রতিযোগী

The modification of extension are motion and rest. —Spinoza.

One event follows another, but that we can observe any idea between them. They seem conjoined, but never connected. —Hume.  
Absolute mind cannot unconditionally subject itself to anything but mind. —Hegel.

Space and time are original intuitions of reason, prior to all experience. —Kant.



জ্ঞানের সহিত তুলনা করতে হয়, তখন আগে পূর্ণাঙ্গার জ্ঞানের প্রয়োজন।

নিমিত্তও আমাদের একটা সমস্যা। এও প্রত্যক্ষমূলক নয়। ঘটনার পারস্পর্য দেখে আমাদের হৃদয়ামিত কার্য-কারণ সধক নির্ণয় করা। হৃদয়ের পর হৃদয় ঘটে গেছে আমরা বলছি হৃদয়—কারণ, হৃদয়—কার্য। হৃদয় থেকেও হৃদয় হচ্ছে, তখন হৃদয়—কারণ, হৃদয়—কার্য, এও তো বলা যেতে পারে? কারণ অধিক বেশ বোঝে যে থাকবেই সেটা হৃদয় সম্বন্ধেও ঘুরিয়ে বলা চলে। বাজের কারণ অঙ্কুর, না অঙ্কুরের কারণ বাজ তা অধ্যাবসি নির্ণয় হয় নি। কারণ সং, 'কার্য' অন্য—যে হেতু তার নাশ হয় এবং পুনরায় স্বরূপ কাগজকেই প্রাপ্ত হয়—এরূপ কথাও বলা যায় না। তেমনি বাক্যে কারণ বলত তাও যখন পরিণাম প্রাপ্ত হয়ে কার্য হচ্ছে তখন তাকে সং কি করে বলতে পার? তা হ'লে কারণও তো কার্যের ছায় পরিণামী এবং অসং হ'য়ে পড়ে। যদি বল নিরবয়ব নিত্য পরমপুণ্য সংযোগে হতুতাবির সৃষ্টি—তাও হ'তে পারে না—নিরবয়ব থেকে সাববয়ের সৃষ্টি অসম্ভব। যদি বল অপরিণামী নিত্য কারণের ওপর কার্য বিবর্ত বা অধ্যাস—তা হ'লে হির হ'ল কার্য-কারণ-সম্বন্ধটা একটা কাল্পনিক সম্বন্ধ। শুক্তি না থাকলে রজতের ভ্রম হ'ত না, সেইরূপ শুক্তি রজতের কারণ। কিন্তু বাস্তবিক সৃষ্টির সত্ত্বার আর রজতের সত্ত্বার সম্পূর্ণ পৃথক কারণও সত্ত্বা কারণও সম্বন্ধ নেই, কেবল উভা একটা সত্ত্বার কারণ আর একটা সত্ত্বার দ্বিগে ঢেকে ফেলেছে, আর নিমিত্তরূপ সত্ত্বার দ্বিগে তাদের মধ্যে সধক নির্ণয় করছে। নিমিত্তকে কেউ প্রত্যক্ষ করে সত্ত্বার পাই নি।

আবার সত্ত্বার (কলা-মার্য) রয়েছে, উভা (অংগ উপহিত চৈতন্য) খণ্ড-সত্ত্বার (কলা-মার্য) দ্বিগে, স্বরূপ ব্রহ্মতে (পারমাণবিক সত্ত্বা) রজ্জু ভ্রম (ব্যবহারিক সত্ত্বা) করতে, আবার সত্ত্বাতে সর্বভ্রম (প্রতিভাসিক সত্ত্বা) করতে, কখনও বা আকাশ-কুণ্ডলের (কুণ্ড-সত্ত্বা) রচনাও করেছে। উভার অধিষ্ঠানও বিনি, রজ্জুর অধিষ্ঠানও তিনি, সর্বের অধিষ্ঠানও তিনি। আত্মাতেই অংগের ভ্রম হয়েছে, আত্মাতেই রজ্জু ভ্রম, আত্মাতেই সর্বভ্রম। কাজেকাজেই রজ্জুর সর্বভ্রম হয় না, পৃথক সত্যীয় ব্যক্তির কল্পনা করতে হয়—এসব এসেই ওঠে না। আর সত্ত্বার যখন আনি,

তখন আর প্রত্যক্ষমূলক বাহ্য জগতের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। জগৎটা ব্রহ্মের ওপর দেশ-কাল-নিমিত্ত সাধারণতঃ সত্ত্বার আনি অনন্ত-প্রবাহ।

সমগ্রি অজ্ঞান বা অনির্বাচনীয়া মূল্য মার্য জগতের সত্ত্বার আনিদিকাল ধরে রয়েছে। এই অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর। তিনি সমগ্র মার্যকে জ্ঞানেন তাই তিনি সর্বজ্ঞ। জীব ব্যক্তি মার্যকে জ্ঞানেন বলে অজ্ঞ। বেদই হচ্ছে ঈশ্বরের জ্ঞান। বেদ মানে বানকতকই নয়। ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ বলে, সে জ্ঞান সেও মায়ান বলে লাভ করে গুণি হয়। গুণিই আবার মানবকেই অপেক্ষা করে। উপবৃত্ত আহার হ'লে যে কোনও দেশে কালে বা পায়ে গুণিষের আবির্ভাব সম্ভব। গুণি আদিত্ত ময় বা অলৌকিক সত্যই বোঝাত (জ্ঞানার শেষ)। এই জ্ঞান সাধন-সাপেক্ষ। এই সাধনা আনোচনা, বিচার, তত্ত্বা, মনন, ধ্যান, বিভাগপ্রভৃতি নামে পরিচিত কঠোর চিন্তা বিশেষ। আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক সত্য হঠাৎ বিভ্রান্তের মত মানব হৃদয়ের প্রতিভাত হয় ঈশ্বর রূপার, ইহা ঠিক—কিন্তু সেই রূপা কখনও পণ্ড বা বর্ণেরের খণ্ডে প্রকাশ পায় নি—ঈশ্বর-রূপা চিরকালই মার্জিত হৃদয়েই অপ্রতিকলিত হয়েছে। সাধনা আবার উপদেশ (গুরু-বোধ্য) সাপেক্ষ। ব্যবহারিক জ্ঞান প্রত্যক্ষও অধ্যান সাধনায় হ'তে পারে কিন্তু স্টোিক নিত্য সত্য ব্রহ্মতে পারি না। আজ পর্যন্ত বৃত্তি-তর্ক করে কেউ কোনও নিত্য সত্য বের করতে পারেন নি। তাত্ত্বিকদের জগৎকারণ অনন্ত প্রকারের। অজ্ঞোবাসীদের অবস্থা সাধারণ লোক-দের চেয়ে বিশেষ উন্নত বলে বোধ হয় না, কারণ তাঁরাও বনেন, জগৎকারণ আমরা জানি না এবং জানবারও উপায় নেই। কাজেকাজেই বৈদ্যাস্ত্রিকদের যে প্রয়োণের দিক অর্থ্যাৎ অহিন্দা, অপ্রতিকার, প্রীতি এবং ত্যাগ এই জিনিস-গুলির মূল্যও তাদের কাছে খুব কম।

• বাচপতি বিশ্বকৃত শব্দের ভাষ্যের টীকা 'ভামতী' ও গোবিন্দানন্দ-কৃত 'রত্ন-প্রভা' টীকা স্বাক্ষরন এই অদ্বৈত-বাদের উপভাস মাত্র লিখছি। পাশ্চাত্য ব্যক্তদের মতে বাচপতি মিশ্র সপ্তম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ণ

পূর্ণের পূর্ণ-পক্ষও সিদ্ধান্ত-পক্ষের যে বাদাত্মবাদ হ'ল সেগুলি আমরা ভাষ্যের অবশেষে দেখবার চেষ্টা করব। এতে পাঠক-পাঠিকার বোধবার আরও সুবিধা হবে।

পূর্ণ-পক্ষ—

ব্রহ্ম অজিজ্ঞাত

যেহেতু, তাহা নিশ্চয়োজন ও অসনিদ্ব

যেমন, ক্ষীতালোক মধ্যবর্তী সমনন্ত ব্যক্তির

ইন্দ্রিয় সন্নিবিষ্ট পদ অবশ্য বায়দ দন্ত

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—(১) ব্রহ্ম অজিজ্ঞাত

যেহেতু, তাহা সপ্তয়োজন ও সনিদ্ব

যেমন, স্বর্গাদির সাধক ধর্ম সকল

(২) ব্রহ্ম অজিজ্ঞাত শাস্ত্র সপ্তয়োজন

যেহেতু, ইহা বদন-নিবর্তক জ্ঞানের হেতু

যেমন, রজ্জুতে সর্গপ্রাপ্তি যুক্ত ব্যক্তিকে

বলিয়া দিতে হয়

'ইহা রজ্জু সর্ব নহে'

(৩) বোধ্য শাস্ত্র আরম্ভনীয়

যেহেতু, ইহা আত্মাত্মিক নিবৃত্তিরূপ সপ্তয়োজন

যেমন, সুরিগুরুপ্রাপ্ত ভোজনাদি ক্রিয়া

(৪) ব্রহ্ম সনিদ্ব

যেহেতু, ব্রহ্ম-বিষয়ে বহু বায়ীর বহু প্রকারের

বিপ্রতিপত্তি বা সিদ্ধান্ত খণ্ডেতে পাওয়া যায়

যেমন, দেহই আত্মা, মনই আত্মা

এই ছায় গুলির দ্বারা সিদ্ধ হ'ল ব্রহ্ম অজিজ্ঞাত।

পূর্ণ-পক্ষ—

প্রাপক মিথ্যা নহে অর্থ্যাৎ অধ্যাত্ত নহে

যেহেতু, তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ

যেমন, আত্মা

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—

প্রাপক মিথ্যা অর্থ্যাৎ অধ্যাত্ত

যেহেতু, ইহা জ্ঞান-নিবর্তক (জ্ঞানের দ্বারা নাশ হয়)

যেমন, শুক্লিতে রজত বা রজ্জুতে সর্ব ভ্রম

এর দ্বারা বোঝা গেল, অধ্যাস অধ্যানের সপক্ষ (পূর্ণাঙ্গ) প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। পূর্ণের দেখান হয়েছে, সত্ত্বার প্রত্যক্ষমূলক নয়, আনি, প্রত্যক্ষ কেবল তাহা বৃত্তি ভাগিয়ে তোলে। অংগ, দেশ, কাল, নিমিত্ত, ঈশ্বর, ভূত, দেব প্রভৃতি কত জিনিসের আবাদে সত্ত্বার রয়েছে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তা হ'লে কেউ বলতে পারেন না কবে তাঁরা এসব জিনিস পুরোভাগে দেখেছেন? তারপর দেশ, দেশ, কাল, নিমিত্ত, অংগ যখন প্রত্যক্ষমূলক বাস্তব সত্ত্বার নয়, তখন আর জগৎকে বাস্তব ও প্রত্যক্ষমূলক বলব কি করে। দেশ, কাল, নিমিত্ত, অংগ ছাড়া কেউ কখন জগৎকে ত ধারণাই করতে পারে না। দেশ-কাল-নিমিত্ত-অংগ যখন কাল্পনিক তখন জগৎটা আর বাস্তব হ'বে কি করে? কাল্পনিক স্বপ্ন যেমন সত্য বলে বোধ হয়, ব্রহ্মের ওপর জগৎটাও ঠিক তেমনি কল্পনা। দেশ-কাল-নিমিত্ত-অংগ হ'ল আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু আপেক্ষিক সত্য মনতে গেলেই নিত্য-সত্য অর্থ্যাৎ ত্রিকালে যা অবিচারী তাকেও মানতে হ'বে। এই নিত্য-সত্যই ব্রহ্ম। এটা একটা অবস্থা। যেখান থেকে, 'ভালে বোঝে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চারার।' অয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়ে। বোধ হয় যেন তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব আছে কিন্তু স্পর্শের দ্বারা তা কিছুই বোধ হয় না। চরিতে দেখুগুন গাছের অনেক দূরে যমুন, কিন্তু সেটা চ'ণের ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই অবস্থার জগৎটা ঠিক ঐ রকম বোধ হয়। যে অবস্থা থেকে নামলেই আবার এই দেশ-কাল-নিমিত্ত-অংগ-এর গভী—এই প্রত্যক্ষ-মূলক ব্যবহারিক সত্ত্বা। ঐ অবস্থার ওপরে উঠলে জগৎ মিশে যায়, জগৎ না থাকলে অংগ ও থাকে না। তখনকার অবস্থা মুখ্য বোধ যায় না। যুগে যুগেতে গেলেই আপেক্ষিকের রাজ্য এসে পড়বে।

যা থাকে, এখন আত্মা-সম্বন্ধে কত রকমের মত দেখে—



১। সাধারণে	আমাকে	দেহ	বলে থাকেন
২। চার্লস	"	ঐ	"
৩। ভিন্ন-চার্লসেরা	"	ইন্ডিয়	"
৪। নৈয়ারিক-প্রভাকর	"	মন	"
৫। যোগাচারী	"	ক্ষণিক বিজ্ঞান	"
৬। মাধ্যমিক	"	শুভ	"
৭। সৌমত (ভায়)	"	দেহাতিরিক্ত, কঠী ভোক্তা	"
৮। কদাম (বৈশেবিক)	"	ঐ	"
৯। ঈশ্বর রক্ত (সাংঘা)	"	অকর্তী কিন্তু ভোক্তা	"

আত্ম-সংঘর্ষে যখন এত মতামত তখন আত্ম অশুভ  
বিচার। এই বিচার আরম্ভ করবার পূর্বে আচার্য শঙ্কর  
উহার শারীরিক উপাধায়ে নিম্নলিখিত পূর্ণ-পূর্ণ ও তাহার  
সিদ্ধান্ত করেছেন—

পূর্ণ-পূর্ণ—‘আমি’ এবং ‘আমি বা নই’ অর্থাৎ ‘তুমি’  
ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। ‘আমি’ হ’ল বিষয়ী এবং ‘তুমি’ হ’ল  
বিষয়। ইহারা আলোক ও অন্ধকারের দ্বারা বিরুদ্ধ-বস্তাব।  
চেতন-আমিও জড়-বস্তুও সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব অমহৎ-  
প্রত্যয় গোচর-চিদাশ্বক বিষয়ীতে, যুগ্ম-প্রত্যয়-গোচর  
বিষয়ের এবং তাহার ধর্মের অধ্যায় হ’তে পারে না।

সিদ্ধান্ত-পূর্ণ—তারা সত্ত্বের, এক রকমে অপর বস্তুর ও  
ধর্মের অধ্যায় করে, ইহা ইহেত্তর (বিষয় ও বিষয়ী) অবিকল-  
বশত, তারা অত্যন্ত বিভিন্ন (বিরুদ্ধ) বস্তাব হ’লেও, অজান-  
বস্তু: সত্য এবং অসত্য একত্রে গ্রহণ করে ‘আমি এই’,  
‘আমরা ইহা’ এইরূপ ঈদগিক (সহজাত) লোক ব্যবহার  
সেবা যায়।

পূর্ণ-পূর্ণ—এই অধ্যায় কি?

সিদ্ধান্ত-পূর্ণ—বহুত্ব: পরস্পর পূর্ণ দৃষ্টবাস:—ইহা  
অপর বস্তুতে পূর্ণদৃষ্ট বস্তুর দ্বারা (বৃত্তিরূপ) আর একটা  
বস্তুর জ্ঞান।

[আমরা পূর্বে বলেছি যে বৃত্তিরূপ যে সাধারণতঃ আনাদি  
এবং ইন্দ্রিয়-সদৃশই বাহ্য বস্তুকে অপেক্ষা করে না। আনাদি  
সদৃশ্যের দ্বিগে আমরা সাক্ষিয়ে-গুণিয়ে একের ওপর নানা  
রস-বৈশিষ্ট্যের ছবি আঁকছি।] আর বাহ্য বস্তু দেখলেই যে  
টিক তদাকার জ্ঞান হ’বে তারও কোনও মানে নেই। হরফ  
গুণো প্রত্যক্ষ করছি তাদের কোনও অর্থ নেই, অর্থ মনের

মধ্যে উঠছে অজ বস্তুর হরফের সঙ্গে ও অর্থের সঙ্গে কোনরূপ  
সাদৃশ্যও নেই। বাসিতে যখন জলের তরঙ্গ ভঙ্গ দেখা যায়  
সেখানে আরোপ্য অধিষ্ঠানে কোন সমানাকারিতা বা সাদৃশ্য  
থাকে না। অধ্যায়ের আর একটা ব্যাপার আমরা দেখছি  
পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা বর্তমান আরোপ্য-জ্ঞানের বাধ  
বা নাশ হয়। যেই অধিষ্ঠানের (রজ্জুর) বরূপ জ্ঞান  
হ’ল, অমনি আরোপ্যের (সর্পের) জ্ঞান নাশ হ’ল। আর  
একটা ব্যাপার হচ্ছে, আরোপ্য (সর্প) তখনকার মত  
প্রকাশমান (সত্য) বলে বোধ হ’লেও বাস্তবিক অম।  
স্রোতীকার জল যদি সত্য হোত তা হ’লে হরিণের পিপাসা  
মিটত। তেমনি দেশ কাল শিরে গড়া কাম্যকাকনের রসে  
বস্তুর পিপাসাও কখনও মিটেবে না।

পূর্ণ-পূর্ণ—কিন্তু আত্মব্যাতিবাধী—বৈভাবিক, সৌভা-  
স্তুিক ও যোগাচারী এবং অসংখ্যাব্যতিবাধী মাধ্যমিক  
বোদ্ধেরা বলে থাকেন (১) অজ্ঞানত্বের অন্তর্য ধর্মের  
আরোপকে অধ্যায় বলে। আবার অব্যাব্যতিবাধী প্রভাকর-  
দের মত (২) যেখানে বাহার অধ্যায় হয় সেখানে তাহাদের  
বিষয়ের অগ্রাহ-নিবন্ধন বলন, (৩) তাহােই অধ্যায় এবং  
অনির্বচনীয় ব্যাব্যতিবাধী জ্ঞান মনে, (৪) যেখানে বাহার হয়  
হয়, তদ্যার তার বিপরীত ধর্মের কল্পনা করা অধ্যায়।

[বৈভাবিকদের মতে আন্তর জ্ঞান ও বাহ্য বস্তু উভয়ই  
সং। বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। যা দেখছি তা ঠিক দেখছি।  
সৌভাস্তুিকদের মতে বাহ্য পদার্থ সং কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় না।  
ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে আসে বলে সম্মতান করে নিতে হয়।  
যোগাচারীরা বলে থাকেন, আন্তর জ্ঞানই সং, বাহ্য বস্তু  
বলে কিছু নেই। বাহ্য বস্তু জ্ঞানের বিভিন্ন আকার মাত্র।  
মাধ্যমিকের মত, আন্তর জ্ঞানও অম। বিভিন্ন জ্ঞানের  
আকার ও তাহার পরিবর্তন ছাড়া অম ও জ্ঞান বলে কিছু  
নেই; শুধুর ওপর এই বিভিন্ন জ্ঞানের আকার  
প্রবাহাকারে চলেছে, কিন্তু অলাত চক্ষে সমস্ত তাতে একটা  
অপভোগ মিথ্যা জ্ঞান হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত পূর্ণ—কিন্তু ‘অনন্ত অজ্ঞানবাস্যতাং না ব্যতিচারি’  
—সকল মতেই’ অন্তোতে অজ ধর্মের আবেশ অধ্যায়ের  
এই লক্ষণটার ব্যতিচার (বিরোধ) হয় না। যখন

ওক্তিকার রক্ত-অম, এক চক্রে বিভ্রান্ত জ্ঞান, রক্ততে সপ-অম  
মরুভূমিতে জলের অম-ইহা আদি।

পূর্ণপূর্ণ—অবিষয় প্রত্যগাঘাতে বিষয় ও তাহার ধর্ম  
সংঘের অধ্যায় কি করে সম্ভব? তোমারা বল যুগ্ম  
প্রত্যয়ের স্রীতি যে প্রত্যগাঘাত তা অবিষয়। যা বিষয়  
তা পুরোভাগে অবগান করে। এই পুরোভাগে অবস্থিত  
এক বিষয়ের আর এক বিষয়ের অম হ’তে পারে। কিন্তু  
অবিষয়ে বিষয়ের অম হ’বে কি করে?

[অজ্ঞান-ব্যাতিবাধী নৈয়ারিকেরা, বিষয় হ’লেই তা  
বাহিরে থাকবে, এইটের ওপর যে জোর দিচ্ছেন, তার দ্বারা  
তাদের মতে জীবাত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হ’লে চৈতন্য  
ধর্মের আবির্ভাব হয়, তখন বাঁটা ও কর্ণ উভয়ই এই চৈতন্য  
বা জ্ঞানের বিষয় হয় এবং তখন এক বিষয় (কর্তা) আবার এক  
বিষয়ে (কর্মে) অম হতে পারে। কিন্তু আত্ম যদি নিজেই  
চৈতন্য বা জ্ঞানবরূপ হয়, তা হ’লে তিনি অবিষয় বলে  
বিষয়ের সহিত তাঁর অধ্যায় হতে পারে না। কারণ বৈদ্যাস্ত্রীরা  
যে অধ্যায়ের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, তাতে রজ্জু ও সর্প দুইই বিষয়  
এবং সেইরূপ একের ধর্ম (সর্পত্ব) অপরের ধর্মে (রজ্জুত্ব)  
আরোপিত হ’তে পারে। এর মধ্যে একটা অবিষয় হ’লে  
অধ্যায় সিদ্ধ হয় না। তারপর বাহ্যবিষয় প্রত্যক্ষ করতে  
গেলে একজন দ্রষ্টা চাই, বাহ্য বস্তু চাই এবং এই উভয়ের  
সমযোজক কারণ বা ইন্দ্রিয় চাই। এই সমযোজকে ইন্দ্রিয়  
সম্বন্ধি বলে। এই সম্বন্ধি কালে যে সম্বন্ধ ঘটে তা  
হ’ল রস—(১) যৌকিক ও (২) অলৌকিক। •]

সিদ্ধান্ত-পূর্ণ—আত্মা, একেবারে অবিষয় নহে, কিন্তু  
প্রত্যক্ষও নহে। ইহা অম প্রত্যয়ের বিষয় এবং অপরাধ।  
ইহা সকলের নিকট প্রত্যগাঘাতরূপে প্রসিদ্ধ। আর এরূপ  
কোনও নিয়মও নেই যে পুরোভাগে বা সমুদ্রে অবস্থিত এক  
বিষয়ের অজ বিষয়ের অধ্যায় হয়। দেখে আকাশ অপ্রত্যক্ষ  
কিন্তু উগ্র অজ লোকের নিকট নীল এবং কড়ার মত বলে

বোধ হয়। এই হেতু প্রত্যগাঘাতে অনাঘ্যার অধ্যায়  
অযৌক্তিক নহে।

[নৈয়ারিকেরা যে বলেছিলেন, আত্মা একেবারে অবিষয়  
তাও নয়, কারণ আত্মা অম প্রত্যয়ের কিঞ্চিৎ বিষয়, প্রত্যক্ষ  
বস্তুতেই অন্য গুণের অধ্যায় হয়, তাঁরও নয়, কারণ অপ্রত্যক্ষ  
আকাশে নীলহাতির অধ্যায় হয় এবং বিষয় হ’লেই যে  
পুরোভাগে থাকবে, তাও নয়, কারণ নৈয়ারিকদের  
অলৌকিক প্রত্যয়ের কোনটাই পুরোভাগে হয় না। এই  
জ্ঞান তাঁদের বৃত্তিই সুব্যভিচার-হেতুভাস-দোষহী।]

সিদ্ধান্ত-পূর্ণ—পণ্ডিতগণ উক্ত লক্ষণপূর্ণ অধ্যায়কে  
অবিধা বলে থাকেন এবং বাহার দ্বারা বস্তুর বরূপ  
অধারায় করা যাবে তাহকে বিধা বলে থাকেন। এবং ‘বতি’  
বহু বদ্যগা: তৎকর্তন দেষণ গুণেন বা অম্মত্রেণ অপি স  
ন সম্বন্ধতে ১” রক্ততে সর্পের জ্ঞান হ’লে তা সর্পের দোষ গুণে  
যেমন রজ্জু যেমন দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ অবিধাকৃত জ্ঞানের  
দোষ-গুণে এক ও কিঞ্চিৎ মাত্রও দৃষ্ট হয় না। এই  
অবিধা আত্ম-অনাঘ্যার পরস্পর অধ্যায়কে অবলম্বন  
করেই সমস্ত লৌকিক, বৈদিক প্রমাণ, প্রমেয়, ব্যবহার ও  
বিধিনিষেধগণ সমস্ত শাস্ত্র প্রবৃত্ত হ’য়েছে।

পূর্ণ-পূর্ণ—প্রত্যক্ষানি প্রমাণ এবং শাস্ত্র অবিধার বিষয়  
কি করে?

সিদ্ধান্ত-পূর্ণ—দেহ এবং ইন্দ্রিয়তে যদি ‘অম’ এবং ‘মম’  
অভিমান না থাকে, তা হ’লে কর্তৃকের উপস্থিতি হয় না।  
‘আমি প্রমাণ কর্তা’ এইরূপ অম-জ্ঞান যদি না ওঠে, তা হ’লে  
প্রমাণ-প্রবৃত্তিও সম্ভব নয়। আবার বেধ ইন্দ্রিয় সকলকে  
অবলম্বন না করে, প্রত্যক্ষানি সম্ভব নয়। আবার অধিষ্ঠান  
ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার সম্ভব নয় এবং যে দেখে  
আত্ম-ভাব অধ্যাত না হয়, সে দেখের দ্বারা কেউ কার্যও  
করতে পারে না। এ সকল ব্যাপার যদি না ঘটে তা হ’লে  
আত্মার প্রবাহিত্য সম্ভব হয় না আর প্রমাণ্য যদি না থাকে  
প্রমাণ-প্রবৃত্তিও সম্ভব নয়। সেই জ্ঞান অবিধা পরিকল্পিত

বিষয়ই প্রত্যক্ষানি প্রমাণ ও শাস্ত্রের বিষয় হ’য়ে থাকে।

এর পর আচার্য বলছেন, যে পণ্ড পণ্ডী ও জ্ঞতিবৃত্ত  
পণ্ডিতে বাহ্যের একই রকমের। বাহ্য পণ্ডিতে যখন বৃত্তি  
করছেন, তখনও যে দেখাভিমান, আর পণ্ড যখন আহায়ে

• শৌকিক—সংযোগ, সংস্কৃত সমবায়, সংস্কৃত সমবেত  
সমবায়, সমবায় সমবেত-সমবায় এবং বিশেষণতা এই ছয়টি।  
লৌকিক—সামান্য লক্ষণ, জ্ঞান-লক্ষণ ও যোগজ—এই  
তিনটি।







হইতে বন্দুক কাড়িয়া লওয়াতে গৃহস্থগণ নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন, অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দস্যুদিগের বন্দুক, তরবার পিস্তল প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রসমূহের অভাব হয় না।

—হিতবাদী

## শিক্ষা-বিভাগের অর্থসঙ্কট

কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশের কলেজ মাত্রই প্রবল অভাবেরে প্রসিদ্ধি হইয়া কোনওরূপে আয়রূপ করা আসিতেছিল। বহু কলেজেই ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকাশ, সম্পত্তি বন্ধায় সরকার অর্থভাবের জন্ম বহু বিভাগের ও কলেজের সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবে। ইহার ফলে বহু বিভাগের ও কলেজের আয়রূপ করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

—পুলনাবাসী

## কলিকাতা শহরে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমোন্নতি

পূত ১৯২০ সাল হইতে কলিকাতা করপোরেশন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। ক্রমশঃ এই ব্যবস্থার যে উন্নতি হইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে:—

১৯২০ সাল	১৯৩১ সাল
মুন্সের সংখ্যা ২১	২২০
ছাত্রসংখ্যা ২৪৬৬	২৭৮০২
ঘর ১৪৮০০০	১০৬০০০

মুন্সের ও ছাত্রের সংখ্যা বাড়িতেছে বটে কিন্তু ঘরসমূহের দিকে মনোযোগ দেওয়া হইতেছে কি না, তাহাযে অনেক সন্দেহ করেন। অনেকগুলি বিভাগের অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণকে পক্ষকাকিত শুণ দেখিয়া নয়, কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত তাহা দেখিয়াই অনেক সময় নিম্নুক্ত করা হয়। মূলগুলি নানা কারণে অনেক সময় বন্ধ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীগণকে অসহায়ই যে তপস্ত, তাহা শিক্ষা না দিয়া গোপালকরিতে দেওয়া হয়। এই সকল বোধ ও ক্রটি সম্বোধন করিবার স্বতন্ত্র চেষ্টা না করিলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ভাঙ্গ হইবে না।

—সঙ্গীতবদী

## পরলোকে ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন

বাসণ্ডা নিবাসী বঙ্গদেশবিখ্যাত প্রসিদ্ধ লেখক ৬৩তীতরণ সেন মহাশয়ের কণা, কলিকাতার ধ্যানানামা এডভোকেট শ্রীমত নিমিগচক্র সেন মহাশয়ের ভগিনী, ডাঃ কুমারী যামিনী সেন কিছুদিন হইল কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেশ-বিদেশে বর্ণিমাল জিলায় বহু কৃতী সন্তান আছেন, বাহাদের মধ্যে বর্ণিমালার সাধারণ কিছুই জ্ঞাত নহেন। সেই কারণে, এই স্থানে কুমারী যামিনী সেনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম। শ্রীমতী যামিনী সেন ভারতে ও বিলাতে উভয়স্থানে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করিবার জন্ম তিনি দুইবার বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন অতিশয় সম্মানের সহিত নেপাল গভর্নমেন্টের ডাক্তারী বিভাগে চাকরী করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান উইমেন মেডিক্যাল মার্চেন্ট দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। তত্পলকে আগরা, সিমলা, শিকারপুর, আকোলা প্রভৃতি স্থানে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎপরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পর তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং হাওয়া-পরিবর্তনের জন্ম পুরীতে গমন করেন। তিনি ডাক্তার হিসাবে এবং বিশেষতঃ দেশোৎসেবিকা হিসাবে এক গুণ্য অর্জন করিয়াছিলেন যে পুরীতে থাকা কালীন তথাকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাগিষ্ট্রেট বিশেষ অস্বাস্থ্যে ভাঙ্গিয়া পুরীর জেনারেল হাসপাতালের ভার গ্রহণ করাতে, তাহাকে বাধ্য করা হইয়াছিল। দূর্ভাগ্য-বশতঃ কিছুদিন পরে তাহার শরীরের অবস্থা এত খারাপ হইয়া পড়ে যে, বাধ্য হইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং তিনি কলিকাতায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ হরীপ্রসন্নকুমার সেনের বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। ডাঃ কুমারী যামিনী সেনের মৃত্যুতে সত্য সত্যই বর্ণিমালার নী-তাহাদের একটি কৃতী সন্তান হারাইল। বর্ণিমাল জিলায় পাণ্ডাঘর ৬৩তীতরণ সেনের অতিরিক্ত পরিচয় বাহ্যিক মাত্র। কবি শ্রীমতী কামিনী রায় ডাঃ যামিনী সেনের জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

—বর্ণিমাল

## মাধবী হাটে তাঁতের কাপড়

টাকা জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী মাধবী হাট হস্তপরিচালিত তাঁতে নির্মিত কাপড়ের জন্ম স্থবিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। এই হাট সাধারণতঃ ‘বাবুর হাট’ নামে পরিচিত। ইহা টঙ্গি ভৈরব রেলওয়ে লাইনের জিনাঙ্গি স্টেশন হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমান বেশব্যাপী অর্থদুরত্রে তাড়ানায় এই হাটের চতুষ্পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের ইতর-ভর সর্বপ্রকার অধিবাসীই নিজেদের জীবিকাার্জনে জন্ম দ্বিত্ব হস্তে তাঁত পরিচালনা দ্বারা বস্ত্র নির্মাণের ব্যবসায় অগলন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈজ্ঞ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ ও এই প্রকারে বস্ত্র বয়ন দ্বারা অর্থোপার্জনে অগলন বোধ করেন না। দেশীয় কলের বিশেষতঃ ‘ঢাকেশ্বরী’ কলের প্রস্তুত হুতাংরা এই বয়ন কার্য্য নির্বাহিত হইয়া থাকে। এইভাবে নানাপ্রকার রঙীন এবং সাদা ধুতী, সাড়ী, চট্, পুতী প্রভৃতি বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া প্রভেদে স্থানোরে সোমবার এই হাটে বিক্রয়ার্থে আমদানী হয়। ময়মনসিংহ, ব্রিগুনা, রংপুর প্রভৃতি জেলা হইতে বস্ত্র ব্যবসায়ী বৈপারীণ এই হাটে বিক্রয়ার্থে বিভিন্ন স্থানের রঙীনী করিয়া থাকে। এবংসকালে প্রতি হাটের নিয়ম প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের বস্ত্রের খরিশ-বিক্রয় হয়।

সাধারণতঃ প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে অন্তিমিক ৫০০ মূল্যের একটি দেশীয় তাঁত ব্যবহৃত হয় এবং তৎপরিচালনার কার্য্যে পরিবারের আত্মা-বৃত্ত-কিনিত সকলেরই অঙ্গের সমর নিয়োজিত হইয়া থাকে। সমৃদ্ধ পরিবারের মধ্যে অন্তিমিক চারিশত টাকা মূল্যের জাপানী তাঁতেরও প্রচলন আছে। এই সমস্ত তাঁতের প্রস্তুত কাপড় কলের কাপড় অপেক্ষা অধিকতর স্বলভ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে এবং তাহাদের হারিও অপেক্ষাকৃত অধিক। সাধারণতঃ পাঁচশিকার মূল্যে এক জোড়া পরিধান প্রয়োজী ধুতী এবং সেড টাকা মূল্যে এক জোড়া সাড়ী বিক্রীত হইয়া থাকে। একামাত্র পরিবারের সকলেই অবকাশ কালে এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতে, কলের কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায়ও

তাহারা এই ব্যবসারে লাভবান হইতে সমর্থ হইতেছেন।

পাটের আবাদ মূল্য প্রায় হওয়াতে এই বয়ন শিল্পী উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া এতদকালের বেকারসমতা সমাধানের একটি সমপ্রভ উপায়স্বরূপ পরিগণিত হইতেছে। এতদ্বারা শ্রমশিল্পের প্রতি সমাজের উচ্চপদস্থ উদ্যমশীলগণেরও অস্বাভাব্য বৃদ্ধি হইতেছে।

প্রত্যেক জেলার প্রধান প্রধান হাট বাহাতে এইরূপ বাণিজ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়, তৎপ্রতি সকলেরই সচেত হওয়া কর্তব্য।

—চারুসিহরি

## গঙ্গার নিরে স্বতন্ত্র

বহু ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া ছিলেন যে, কলিকাতার মাটি অত্যন্ত নরম। সে জন্ম মাটির নীচে দিয়া খেল লাইন করিয়া সহরে ও সহরতলীতে যাতায়াতের জন্ম টিউব রেল করা সম্ভব হইবে না। কলিকাতার ইলেক্ট্রিক পান্সাই কর্পোরেশন এই কথা অসত্যতা কার্য্যে দেখাইয়াছেন। উক্ত বিভাগ কোম্পানীর গার্ডেন রীচে বিভাগ-উৎপাদনের এক বৃহৎ কারখানা আছে তথা হইতে অপর পায়ে শিবপুর ও হাওয়ার বিভাগ সরবরাহের হাবিয়ার জন্ম গার্ডেন রীচের কারখানা হইতে স্বতন্ত্র ফরিয়া গঙ্গা নদীর তলার নিম্ন দিয়া অপর পায়ে বোতানিকেল গার্ডেন পর্যন্ত স্বতন্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন। এই পথ ১৭৩৫ ফুট লম্বা এবং ব্যাস ৬ ফুট। গঙ্গার গর্ভের মাটির ৪০ ফুট নীচে দিয়া এই পথ তৈয়ারী হইয়াছে। প্রাচ্য দেশের কোথায়ও মাটির নীচ দিয়া একপ স্বতন্ত্র পথ নাই। এই পথ দিয়া বিভাগের তার শিবপুরের পায়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এবং উহা দ্বারা পূর্ণাঙ্গ স্থান সমুদ্রে বিভাগ সরবরাহ করা হইবে।

এই স্বতন্ত্র পথ তৈয়ারী করিবার জন্ম তিনি বৎসর পূর্বে গঙ্গার কয়েক স্থানে মাটির শক্তি পরীক্ষার জন্ম খনন করা হইয়াছিল। মাটির বহু নীচে বাগি ও মাটি বাহির করিয়া দেখা গিয়াছে যে এক সযত্রে শুদ্ধপদ নদী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত। ইহার বিশদ বিবরণ সঙ্গীতবদী প্রকাশিত হইয়াছিল।

—সঙ্গীতবদী



## যজ্ঞার প্রকাশ

বাড়ীতে হুবহু যজ্ঞার রোগের রোগ সারিয়ে না, বরং বাড়ী শুদ্ধ সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হইবে। ইহা অবশ্য খুবই ভয়ের কথা। কারণ এখন কলিকাতার নগর, মক্কেলগে যজ্ঞারোগের প্রাচুর্য্য দেখা যাইতেছে। ম্যালেরিয়াই এদেশের প্রধান ব্যাধি; এই ব্যাধি যতই পুরাতন হইতেছে, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ততই মন্দ হইতেছে এবং সেই হুবহুবে আরও নানা উৎকট ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করিতেছে। ডাক্তার অধিকাচরণ উকীল আরও বলিয়াছেন যে, যজ্ঞারোগীর গুহা হাঁসপাতালে ছই লক্ষ শয্যার প্রয়োজন; হয়ত আর এক বৎসর পরে তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, ছই লক্ষ শয্যাই কুলাইতেছে না। কিন্তু ক্রমেই যদি সর্বাপেক্ষ ক্ষত বিসর্পিত হয়, তবে প্রাণে বিবেদ কোথায়?

—বঙ্গবাসী

## লাভ-ক্ষতি

শ্রীঅম্বিকুন্ডার সেন

কেহ বা ভিড়েছে নিকটে বাসিয়া ভালো, ফিরিল কেহ বা ব্যঙ্গের হাসি হেসে; —  
কেহ বা আলিল প্রেমের আলো,—  
বেদন-বন্ধি জ্বালিল হৃদয়-বেশে!

কাহারো মরিদ নয়ন-চুলিকা পাত্তে—  
শত কলন-ছবি জাগে অন্তরে;  
কাহারো বা কঠোর নির্মথ সংযতে—  
অবদানে হিয়া টুটিয়া পুটিয়া পড়ে।—

কেহ বা পুড়ায় পরাণো বরণ-মন্ডা,  
ধরিল হৃদয়ে মান-অর্জনা ডালি;  
কেহ কেড়ে নিরে স্বে উপহার-ডালা—  
জ্বর হাতেতে ভূমি-তলে দিল ঢালি!

রাগ-বিরাগের উদ্ভি-ভঙ্গ-মায়ে,—  
প্রেমের তেলার আলোক-ভায়ায় তলে—  
উল্লসিত মোর সান্নিধ্য চিত্র-সাজে,—  
জীবন-স্রবী নাটিল কোঁচুহলে!

আখার ঘনায়,—নাহিছে সন্ধ্যা ধীরে,  
পারাপার ঘাটে অন্ধার বোয়াল তরী; —  
বিকিনিকিন শব্দে, অতীতের পানে ফিরে—  
লাভ ও অলাভ ব'লে পঙ্কিয়ান করি।

এই যে কেহ বা দুহি মোর দিল ভরি'  
প্রেমের প্রীতির আশ্বাস বর্ষাধানে,—  
হৃদয় দ্বারে অস্তর গর্জরি—  
এই যে কেহ বা বিপিন বেদন-বানে;

জীবনের মোর তারা যে আলোক-তবি  
তারের মাঝারে উঠিল আমার দুটি'  
যা কিছু অর্থ, যত বার্থতা সবি,  
পদম যে লাভ, চরম যা কিছু জুট!

আজ দেখি—বারা ভিড়িল প্রাণের পরে,  
জীবন-পাতাল তারা শুধু আছে জমা  
উল্লসিত আলো দেখা ধরতের ঘরে—  
কারা ফিরে গেল না পারি' করিতে ক্ষমা!

## মীমাংসা

( গল্প )

শ্রীমতী বিহঙ্গবালা চন্দ্র

( ১ )

মাতা যজ্ঞপাথক অশুট শব্দ করিয়া অতি কীর্ণকণ্ঠে  
কতাকে ডাকিল, “বাসন্তী!”

শিয়রে উপবিষ্টা অর্দ্ধ-তন্দ্রাভিত্তিকা বাদ্য বাসন্তী  
বাসন্তী মাতৃ-আহ্বানে সচকিতভাবে মায়ের মুখের উপর  
সুঁত্টিয়া পড়িয়া গায়েবে বলিল, “কেন মা?”

মা বলিল, “রাত কি পুড়িয়ে গেল?”

ছোট টাইমসিটার দিকে চাহিয়া কত্যা বলিল, “না মা,  
তার হ'তে এখনও অনেক দেরি আছে।”

“অনেক দেরি আছে। আমার যে-জার দেরি নয় না মা?”

বাসন্তী কুসারিয়া কানিয়া উঠিল, “ও মা, ভূমি ওসব  
কথা বলছ কেন? আমার যে বেজ ভর করছে মা।”

জননীর চক্ষুও শুক রহিল না, তাহার শার্শ গও বহিরা  
প্রবল বেগে অশ্রু বরিয়া পড়িতে লাগিল। মৃত্যুপথ-বাঞ্জীর  
একমাত্র ভাবনা কাহার হস্তে তাহার অসহায় ছোট কন্যাকণ্ঠে  
সদর্পণ করিয়া যাইবেন। কিছুকণের মধ্যেই মাতা আত্ম-  
সংবরণ করিয়া কতকো কুখাইয়া বলিল, “কানিয়া কেন মা?  
তার ভাবনা কি? তোকে বার হাতে দিচ্ছি, যে তোকে  
কখনও অহুযী করবে না। কিন্তু আমার বিজ্ঞ—

তারার কণ্ঠ বন্ধ হইয়া আসিল; কিছুক্ষণ নিস্তর থাকিয়া  
হরিমতি পুনরায় কতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “বাসন্তী, আর  
একবার ঘড়ীটা দেখ না মা, এককণে হয় তো রাত শেষ হ'য়ে  
এল। মোহন যে এই ভোরের ট্রেণে আসবে। তার সঙ্গে  
দেখা না হ'লে আমি যে ঘরেও স্বস্তি পাব না।”

বাসন্তী অধীরভাবে মাতাকে বলিল, “ভূমি অত কথা  
কেন কইছ? ডাক্তাররাই যে বাস্তব করেছে। তোমার  
অহুযী এত বেড়ে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে কষ্টও বেড়ে  
যাবে মা।”

“না মা আজ আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না। হাঁ। রে  
তার কিছুদূরটা টেনিগেরাপখানা ঠিক করেছে তো  
মোহনকে?”

বাসন্তী সলজ্জভাবে বলিল, “হ্যাঁ।”

“তবে কেন আসতে দেরি হচ্ছে বল রিকি? তার বাপ-  
মা তাকে যদি আসতে না দেয়, তা হ'লে—? না, এমনই  
কি হ'বে? মোহন তো আমার ভেমন ছেলে নয়। না না,  
সে ঠিক আসবে, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখাটা—”

কন্যা জননী ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিত লাগিল দেখিয়া  
বালিকা বাসন্তী ভয়ে অতিক্রান্ত হইয়া পড়িল।

ছই বৎসর ধরিয়া হরিমতি অল্পে অল্পে ভুগিতেছে। বাড়িতে  
বাড়িতে রোগটা যে এখন কোথায় আসিয়া ঠাঁড়াইয়াছে,  
বালিকা তাহা অবগত ছিল না। গৃহে ছোট বোন শশুম  
বয়ীয়া বিজ্ঞা আর মাতা ছাড়া আর তাহাদের আপনানর  
বলতে কেহ ছিল না। মার অশ্রু যে অবধি বাড়িয়াছে,  
সেই অবধি প্রতিবেশিনী ন'কড়ির মা রাতে তাহাদের ঘরে  
আসিয়া শুইয়া থাকিত। আজও সে আসিয়াছে।  
পরোপকারিণী বসিয়া পাড়ায় তাহার খ্যাতি আছে। কিন্তু  
হইলে কি হইবে, নিজাদেবী তাহার প্রতি অত্যন্ত সদয়।  
হরিমতির এই বাড়াবাড়ির ক'দিন পরে তাহাদের ঘরে সে-  
অকাতরে ঘুমাইলেও তবু একটা লোক ঘরে থাকিলে  
তাহাদের অন্যকটা সাহস ছিল। ইহাই তাহাদের পক্ষে  
যথেষ্ট লাভ বা পরম উপকার।

মায়-রাতি মায় বুকুনি শুনিয়া বাসন্তী ন'কড়ির মাকে  
ডাকিতে বাধ্য হইল। তাহার প্রাণটা যেন কেমন  
করিতেছে। মার ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা  
যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক  
ডাকডাকির পর উঠিয়া ন'কড়ির মা বলিল, “ক্যানো গা  
মাসী, ডাকিল ক্যানো?”



“মাকে একবার দেখ না মাসী, মা আজ সারা রাত একবারও ঘুমায় নি, খালি বকেছে, দেখবে এল না মাসী, এই দেখ না—” বলিয়া বাসন্তী ন’কড়ির মাকে টানিয়া মার নিকট লইয়া গেল।

হরিমতি তখনও মোহনের নাম করিতেছে, “হাঁ রে আর সে কখন আসবে? তবে বৃষ্টি তার সঙ্গে দেখা হ’ল না।”

পূর্ণাঙ্কেই সকলেই হরিমতিকে দেখিয়া বুঝিয়াছিল, অবস্থা ভাল নহে। সেই জন্তই তাহারা তখনও প্রচণ্ডশব্দ একমাত্র জামাতা মোহনকে টেলিগ্রাফ করিয়াছিল। কিন্তু রাত্রে থাকিবার জন্ত এক ন’কড়ির মা ব্যতীত আর কাহারও অবকাশ ঘটে নাই।

ভোর হইতেই ন’কড়ির মার ভাড়াডিকিতে খটনাহলে অনেকেই আসিয়া জুটিয়াছে এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবহারের জন্ত অনেকেই ব্যতিব্যস্ত হইল। এমন সময়ে জ্ঞপদে একজন শ্রামবর্গ সোমামুণ্ডি যুবক উৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহে প্রবেশ করিল। সকলেই বলিয়া উঠিল, “ও গো তাঁর মোহন এসেছে।”

উপস্থিত শান্তিবর্গের মধ্যে একজন মহিলা বলিলেন,—  
“একটুকু এলে বাছা, তোমাকে দেখবার জন্মেই মাসীর প্রাণটুকু এখনও বৃষ্টি বেরায় নি।”

অপর একজন বলিল,—“সারা রাত মোহন মোহন করেছে, বৃষ্টি কি বলবার ছিল।”

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—“বাহা ওর ছেলে নেই, তুমিই ছেলের পরামর্শ কর।”

মোহন তাহাদের মধ্যে কোনও রকমে একটা আয়গা করিয়া লইয়া বশষ্ঠাকরনের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। বাসন্তী ও বিভা তখন মায়ের বুকের উপর জুটিয়া পড়িয়া অধীরভাবে প্রোদন করিতেছে।

মায়াজন জীবের পক্ষে মায়-পাশ ছেদন করা বড়ই কঠিন। তাই বাসন্তীর নননী তাহার সঁময় তাই বনাইয়া আসিতেছে ততই তিনি কড়াহুটীকে আকুল আবেগে ছই বাহর পেটেন নিবিড়ভাবে ধরিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না, শক্তি তখন রহিত হইয়া আসিতেছে। শুধু পারিলেন শীর্ণগণ ও দিয়া অশ্রু অজ্বর ধারার করিয়া পড়িতে দািল।

মোহন ভাবিল, “মা, আমি এসেছি, তোমার দেখুন।”

সে মধুর কণ্ঠস্বরে মুমূর্ষু মূখ মুহূর্তের জন্ত বড় উজ্জ্বল বড় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রসন্নপট্টনে জামাতার মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘকণ্ঠে বলিল, “এসেছ বাবা।”

অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি আর কোন কথা বলিতেছেন না দেখিয়া মোহন বলিল, “মা আমাকে কিছু বলবেন কি?”

হরিমতি বাড় নাড়িয়া জানাইল,—“হাঁ।”

তারপর অতিকণ্ঠে বিজ্ঞান একটা হাত মোহনের হাতে দিয়া বলিল, “বাবা, আমার ছেলে নেই, তুমিই আমার ছেলে। ছোট বোনের প্রতি বড় ভায়ের কর্তব্য পাগন করো। আর কিছু বলবার নেই। শুধু এইটার জন্ত আমিই পাণ্ডা এখনও বেরায় নি—”

এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে তিনি চকু মুদিত করিলেন।

( ২ )

দরামরী ভাঁড়ার গুহাইতে গুহাইতে আপন মনেই গজ গজ করিয়া আঙড়াইতে ছিলেন—“দেখ শুনে অস্বাভব হয় যে। আমারও এক কাল পেতে, তাই তো বলছি—এ সব হ’ল কি। কালে কালে আরও কত দেখব। খাজুড়ীও মরে ঢের লোকের, টেলিগোরাপ বানা পেতেই রাত দুপুরে দৌল সেই ধাপখাড়া পোষিবপুত্র। এত করে মানা করলুম, কাণেও শুনল না, যাওয়াটাই বড় হ’ল। আর কি মিনসের হয়েছে তোমাক খাওয়া, দিন রাত্তির এক অলুপ। মুখখানিতে তালা ঢালি দিয়ে ভুজুক ভুজুক ভুজুক—খাবার সময় ছেলেটাকে একবার খাণ্ডও করলে না। আমার যেমন অড়ট।”

কর্তা অদূরে বারানামা উড়ু হইয়া বসিয়া অপর মনে তোমাক টানিয়া বাইতেছিলেন। সৎসা গৃহবীর তর্জনে গজ্ঞন জুনিয়া মিনিট কয়েক চুপচাপ থাকিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন—“তাই তো, তাই তো, ছেলেটা বাড়ী এলে হা।

করাটা গৃহবীর কাণেও পৌছিল এবং ক্রোশে লাগিল। স্বামীর রুখার সহসা সত্বেন হইয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস কেগিয়া বলিল, “হাঁ, তাই বটে, ভাইনিদের মুখ থেকে শব্দের ছেলে এখন ভালয় ভালয় বার এলে বাচি।”

পুত্রের বিষয় আলোচনা আজ আর বেশীদূর পড়াইল না, এইখানেই স্থগিত রাখিল।

চতুর্থ দিনে মোতার চতুর্থা ক্রিয়া শেষ করাইয়া মোহন পত্নী বাসন্তী ও শ্রাণী বিজ্ঞাকে লইয়া বাড়ি ফিরিল। বিদায়কালে বাসন্তী মাতার প্রত্যেক জিনিগট লক্ষ্য করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। দিদির কান্দা দেখিয়া বিজ্ঞাও কাঁদিল। মোহন তাহার শব্দবহুলত শ্রুতিষ্ট স্বরে সাক্ষা দিয়া ভগিনীর ঘেঁহে বিজ্ঞাকে বসে তুলিয়া লইল। বাড়ী আসিয়া মোহন বিজ্ঞাকে মায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল, “এই নাও মা।”

মা বিশ্বসের সহিত পুত্রের মূখের দিকে চাহিয়া বলিল, “এ আবার কে?”

পুত্র একটু ইতস্ততঃ করিল মাত্র, বলিল, “এ—”

“ও বুকেছি আর বলতে হবে না। বোমার বোন বৃষ্টি? এখানে থাকবে না কি?”

“হাঁ, ওদের থাকবার স্থান কোথা?”

মায়ের মুখ গভীর হইয়া উঠিল। মোহন তাহা লক্ষ্য না করিয়া সমস্ত সন্ধ্যা সরাইয়া দিয়া বলিল, “এখানে না আনা ভিড় আর তো তেমন উপায় দেখলুম না কাঁধে সেখানে, আর সে রকম আপনাদের বলেও কাউকে দেখা গেল না কায়েই—”

মা মনে মনে বলিল, “হু, তাই আপন করে নিয়ে এলে। দরদু হতে খুব দেখছি।” বলিলেন, “তা’ হলে চিরকাল পুহতে হবে বল।”

মোহন সে কথায় কণ্ঠপাত না করিয়া বলিল, “তুমি তো মা স্বপ্নের মেয়ে ভালবাস, তা’ মেয়ের মত মাঝে করে না। আহা বেচারী! বেশ দেখতে না মা।”

দরামরীরও মনে হইল, আহা দিখি মেয়েটা। কিন্তু, প্রকাশে ঝটকাবে বলিলেন, “তা বলে রূপ দেখে তো পেট ভরে না মোহন। আর তোমার শত্রু বাসন্তীর গোন্ধিকে যে পুহতে হবে এত আমার জ্ঞাত নেই বাহ।”

মা নিজমুণ্ডি ধারণ করিল দেখিয়া মোহন মন্তক অননত করিয়া আঁতে আঁতে সরিয়া গেল।

পুত্রকে না পাইয়া দরামরী কর্তাকে লইয়া পড়িলেন, “বলি শুনছ মা।”

কর্তা আশ্চর্যবোধে মাঝে। তিনি চকু মুদ্রিয়া ঝিমাইতে ছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে বলিলেন,—“কি হ’ল আবার।”

“হ’ল বেশ। ছেলের কাঁটিয়া দেখেছ একবার, না, আশ্চর্য খেয়ে খালি ঝিমুতে লেগেছে। ওমিকে ছেলে যে পর হয়ে বার গো।”

স্বামীর নেশা ছুটয়া গেল। সত্যিকৃতভাবে পত্নীর মুখের দিকে অর্ধ নিমিলিত আঁখি বিক্ষারিত করিয়া বলিলেন, “পর হয়ে বার?”

“বায় ঝৈ কি। সেই রকমই তো গতিক দাঁড়াল।”

সেই রকম গতিক দাঁড়াল—কর্তা শিরেখরের মনে পড়িল, পুত্র কিছুক্ষণ পূর্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছে, এক তাহার প্রশান্ত মুখে ‘পর’ হইবার মত কোনও লক্ষণ তো প্রকাশ পায় নাই; হুতরাং তিনি নিঃশ্বাস কেগিয়া পুনরায় আরামে ঝিমাইতে শুরু করিলেন। দেখিয়া দরামরীর ঈর্ষ্যাচ্যুতি ঘটিবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন, হুতরাং টাংকার করিয়া অবস্থা কি ছিল, এখন কি দাঁড়াইল এবং পরে কি দাঁড়াইবে—তাহা সালসানে, সন্ধ্যার এবং সন্ধ্যার পরে বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলেন, “দেখেছ তো।”

নিরুদ্ভি স্বামী উদাসীনভাবে উত্তর করিলেন, “দেখছি, দেখছি গিলি, সব দেখছি।”

“দেখছ আমার মাথা আর আমার মুখ। কি দেখছ ছাই তব।”

কর্তা হাই তুগিতে তুগিতে বলিলেন, “কলিকাল, কলিকাল।”

দরামরী রাগে অশ্রিধারা হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “আঃ আমার কলিালানা। মিনের ভীমুতি হয়েছে গো—একে নিয়ে আমার কি অলন হ’ল গো। চোখবুকে বুকে কলিকাল দেখেছি কি হবে। ওমিকে যে উপর্গ গলগর জুটলো।”

কর্তা শিবের শান্তিগিরি লোক। তাহাতে শোকসন্তপ্ত চিত্ত, অকাল-বার্দ্ধক্যের লক্ষণ সকল দেখে পূর্ণমাত্রার বিরাগিত, উগ্ৰচিত্ত পেনর্নন লইয়াছেন, কিন্তু হৃগৃহীর হিচাব-নিকাশের জাগর তাহাকে শান্তিতে থাকিতে দেয়



কাহার সাধা। গৃহীণীর হিসাবের খাতায় বরচের মাত্রাবিকা খটিলেই আর রক্ষা নাই। তাঁহার চাঁৎকারে বাড়ীখানি মুগ্ধিত হইতে থাকে।

স্বামীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া দয়াময়ী হতাশ-ভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিল, “না, এ সংসারে থাকা আর আমি সুখিয়া বৃদ্ধি নাই। হ্যাঁ গা, এতক্ষণ ধরে যে ঠায় বকে শব্দ, তা একটা কথারও কি কর্পাত কর্তে নেই?” শিবধর এবার একটু অপ্রতিভ হইলেন, পত্নীকে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলছ বল দেখি ভাল করে, স্পষ্ট করে। এত রাগছ কেন?”

“রাগি কি আর সন্তে, অনেক ভ্রমে রাগি। বলে যার আশা সেই জানে। লোকে দেখে মাগী মুখি খালি চোঁয়ার। চোঁচাই যে কোন লোকেরা তা' বোঝে না। ছেলের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে, বো নিয়ে ঘর করব। হইলের সঙ্গে উপসংগ জুটবে তা তো জানি না।”

শিবধর এতক্ষণে কুল পালিলেন, বলিলেন, “ও, বোমার বোনের কথা বলছ?”

দয়াময়ী “ককার দিয়া বলিল, “হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার যেমন সবচাউতে অজ্ঞান। কোনও কথা তো সহজে শুনতে চাও না, তা বুঝবে কি?”

শিবধরসহ্যাত মুখে বলিলেন, “ও হরি, তাই বল। আমি মনে করি আর কি।” তারপর গৃহীণীর কাছে কাছে অনেকগুলি খরিদা কি বলিলেন; শেষে বলিলেন, “বুঝলে তো গিন্নি।”

ভবিষ্যতের প্রাপ্তির আশার আনন্দে এই লোভাতুরা নারীর মন সফা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দয়াময়ী একপাল হাসিয়া বলিল, “আহা তাই কি আমি বলছি গা। আর মেয়েটির বিয়ে বা—”

কর্তা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “সে সব বন্দোবস্ত ভাল রকমই করে গেছে। এতে তোমার সিকি পয়সার ক্ষতি নেই, বরং বৃদ্ধের লাভ আছে। বৃদ্ধকে পাগলে তো?”

দয়াময়ী বুলিল এক মনে মনে বলিল, “হু, মোহন আমার এমন কাঁচা ছেলে নয়।”

পূর্বের গুণগরিবায় শায়ের মনে সফা বেন বান ডাকিয়া উঠিল।

( ৩ )

দয়াময়ীর সংসারে আপন পুত্র-কন্যা ও স্বামী ব্যতীত আর কেহ ছিল না। ছিল না বলিয়াই কোনও অশান্তি ঘটে নাই। থাকিলে দিবানিশি আশ্রয় অজিত। দয়াময়ী এতদিন বাড়ীতে অপার কাহাকেও না পাইয়া স্বামী ও পুত্রকর্তার উপরই কার্যে-অকারণে গাল খাড়িতেন। তাহারের উহা সফায়া গিয়াছিল। কিন্তু অনভ্যস্ত বিজয়া ও বাসন্তীর পক্ষে উহা মাঝে মাঝে বিরক্তিকর হইয়া উঠিত। বিজয়া বালিকা অল্পবুজি, সে অনেক সময়েই বড় ক্রন্দন পান্ধিত না; কিন্তু বাসন্তীর বৃষ্টিবার মত বয়স হইয়াছে, কাজেই এর স্রুমে মরিয়া থাকে। বিজয়া ক্রমে বড় হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে মেয়ে আবার তেমনি চঞ্চল, সেই লজ্জা আরও তাহাকে সর্বদা স্মৃতিতে হইয়া থাকিতে হয়।

এই ছুটী বোন আপন সহোদরা ভগিনী হইলে কি হইবে, দুইটার আকৃতি এবং প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের ছিল। বাসন্তীর তেমন রূপ ছিল না। সে ভামাঙ্গী, শান্ত-প্রকৃতি, স্নেহ-স্বভাব, লজ্জাশীল। বিজয়া স্বন্দরী, চঞ্চল, নির্ভীক। বাসন্তীকে বাহা আছে, তাহা বেনে একটু অশ্পট—বিজয়াতে বাহা আছে, তাহা স্পষ্ট—কোথাও জড়তা নাই—সরল, স্বচ্ছ, পরিষ্কার। লজ্জাশীল বাসন্তীর প্রকৃতি পত্নীর—সে বাড়িয়া কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতে চায় না। বিজয়ার প্রকৃতিতে এমন কোন কোনও গুণ আছে, যাহাতে প্রথম দর্শনে লোকে তাহাকে ভাল না বাসিলেও সে আপন কেমন করিয়া ভালবাসা আদার করিয়া লইতে হয় তাহা জানে। ক্রমে দয়াময়ীর মত লোকেরও—মহার হনিয়াতে কাহাকেও কখনও ভাল লাগে নাই, তাহাকেও ইহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে হইল। ক্রমে সে আপন পুত্রবধু অপেক্ষা এই স্বন্দর মেয়েটির অধরুণ হইয়া পড়িল। ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু ছিল না। রূপ কে না ভালবাসে? ক্রমে যে মত একটা আকর্ষণী শক্তি আসে।

মোহনও সৌন্দর্য-প্রিয় এবং গুণপ্রার্থী। সে রূপেরও আদর করিতে জানে এবং গুণেরও সদর যত্ন। বাসন্তীর রূপ ছিল না, কিন্তু তবু সে তাহাকে কম ভালবাসিত না—পত্নীর ক্রম আকর্ষণের নিম্নে যে যতাব শ্রুতার সরলতায়

অন্তঃকরণখানি ছিল তাহারই প্রকৃত পরিচয় পাইয়া সে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

দিন কাটিতে লাগিল। বিজয়া এখন বেশ বড় হইয়াছে। ভগিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বাসন্তীর বুক তকাইয়া উঠে। সে ভাবে হতভাগীর বয়সের চেয়ে শরীরটা বেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। কথটা স্বামীর নিকট পাড়িয়ে পাড়িয়ে করিয়াও পাড়িতে পারে নাই, কেমন লজ্জা করে। সকল দায়িহই যে তাহার আদর বদনে বহন করিতেছেন। কিন্তু মেয়েটা যে ক্রমে বড় হইয়া উঠিতেছে। সে বিষয়ে তাহার মনোযোগ করেন না কেন? স্বামী আধুনিক শিক্ষার শিক্তি যুবক। তিনি অগ্রগতা করিতে পারেন, কিন্তু স্বাস্থ্য-ভী তো তাহার অপেক্ষা ‘বিল্লি’কে যথেষ্ট ভালবাসে, তবে তিনিই বা কেন উপাশনা। তাহার আশানুরায়ি যদি কথটা উত্থাপন করিতেন তাহা হইলে বেশ শোভন হইত, সে স্রোযোগ পাইত। বিবেচককে বিবেচনা করাইয়া দেওয়া—মাগো ছি! বড় লজ্জা করে। লাজুক মেয়ে বাসন্তী স্নেহেচ কাটাঁইয়া উঠিতে পারে নাই। স্বামী সর্বদা কাজে ব্যস্ত। কি এত কাজ? সে বুঝিতে পারে না। সে দিন বাসন্তী কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া স্বামীকে বলিল, “দেখ একটা কথা বলছিলাম—”

মোহন কি একখানা বট নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল। “বল”—বলিয়া চোখ তুলিয়া পত্নীর দিকে চাহিল।

বাসন্তী তেঁবিলের উপরস্থিত কাগজপত্রগুলি গুছাইতে লাগিল। মোহন তাহার কার্যকলাপ উৎসাহের দৃষ্টিতে চাহিয়া একটু অপেক্ষা করিল, তারপর বলিল, “কি হ'ল? কি বলবে বলছিলে বল?”

পত্নীকে তথাপি নিরন্তর থাকিতে ও এটা-সেটা নাড়িতে দেখিয়া মোহন হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা আমি একটু পড়ে নিই। হা যো ছেপ বৃদ্ধি, তুমি ততক্ষণ কথটা ভেবে নাও।” বাসন্তী এবার অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, “ভাববে না হাতী রবের।”

মোহন হাসিতে হাসিবে বলিল, “ঐ তো ভাবছ।”

“ভাবছি বৈ কি।”

“আচ্ছা না ভেবেই বল, তা হ'লে হ'বে তো।”

“ঐ বলছিলাম—”

“কি?”

বাসন্তী মুখ হাসিয়া বলিল, “ওই বিভিন্ন কথা বলছিলাম। বিয়ের বোয়াি হ'ল তো—”

মোহন-হাঁক ছাড়িয়া বলিল, “ও, এই কথা। এর লজ্জা এত, বাসরে বাস!”

“কথটা বুঝি বড় সহজ হ'ল।”

“এর ভেতর শক্তটা কি, সেটা তো আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শালীর বিয়ে এতো মজার কথা।”

“আজকালকার দিনে বর বোঁজাটা বুঝি খুব মজার কথা হ'ল।”

“হুহুম, কম হুহুরের কাছে হাসির—”

বাসন্তী মোহনের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “আ, কি যে ছাই বল তোর ঠিক নেই। ওকথা কি বলতে আছে?”

মোহন পত্নীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিম্নদৃষ্টিতে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, “বলতে নেই? বললে কি হয় বল?”

“জানি নি অর, যাকে তাকে আমিই বা-তা বললেই হ'ল কি না।”

“ও তুমি তা হ'লে আমার যা-তা—” বলিয়া মোহন খুব হাসিতে লাগিল।

স্বামীকে হাসিতে দেখিয়া বাসন্তীর ডারি রাগ হইল, বলিল, “অমন করলে আমি থাকতে চাই নি।”—বলিয়া সে গমনোন্মত হইল।

মোহন বাহা বিয়া বলিল, “না না বস, আর কিছু বলব না। আচ্ছা ওসব কথা—বাস পে।” একম লেখা-পড়া কি রকম হচ্ছে বল তো।

“ছাই হচ্ছে।”

“কেন ছাই হচ্ছে। বিজি তোমার চেয়ে কত ছোট। ও কেনম টপ টপ করে এগিয়ে যাচ্ছে দেখ দেখি। হুঁজনে এক সঙ্গে দরলে।”

বাসন্তী লজ্জিতভাবে মাথা নত করিয়া বলিল, “আমার দ্বারা কিছু হ'বে না, আমার আশা তুমি ছেড়ে দাও।”

মোহন সম্বোধকঃ বলিল, “তোমার আশা কি এত সহজে ছাড়তে পারি?”

বাসন্তী অপরাধীর মত ক্ষুদ্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।



মোহন এ দুষ্টির অর্থ বুঝিল। সে জানিত বেচারীর অবসর বড় কম। আর সে নিজেও তার প্রতি বড় বেশী মনোযোগ দিবার সময় পায় না। বিজয়া স্কুলে যার, নির্মিত পাঠে কোনও ব্যাঘাত নাই, স্তব্ধতাও সে যে আগ্রসর হইবে, তাহাতে আর বিচি কি! তাই কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, “তারপর কি হ’ল? চুপ করে আছ যে, রাগ হ’ল বুঝি?”

হাসিয়া বাসন্তী বলিল, “হ্যাঁ গো, তুমি গালি রাগ করতেই দেখে সবাইকে।”

“তবে কি ভাবছিলে?”

“ভাবছিলুম—সত্যি বলছি, আমি তোমার একেবারে অস্বাভাবিক।”

সুখা দরজার সম্মুখ দিয়া বিজয়াকে ছুটয়া মাইতে দেখিয়া মোহন ভাবিল, “এই বিজি, বিজি, শোন শোন একটা খুব ভাল ধরন আছে।”

বিজয়া গৃহের মধ্যে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিল, “কি দাৰা, কি ভাল ধরন?”

বিজয়া বড় ভায়ের মত মোহনকে দাৰা বলিত। মোহন বলিল, “তোমার যে বিয়ে হ’বে সে রাস্কুসি।”

“বাও?”

“বাও কিরে পোড়ারমুখী!”

“আমি বিয়ে করব না।”

মোহন হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তারপর হাসিতে হাসিতে পছন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “তুমিছ তে বোনের কথা।”

“তুমিছ!”—বলিয়া বাসন্তী মুখ ঘুর হাসিতে লাগিল।

ভগিনী এবং ভাগিনীপত্যকে হাসিতে দেখিয়া বিজয়া মহা অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বুঝিল কথাটা বলা ভাল হয় নাই। কিন্তু সে বড় চতুর মেয়ে, কথাটা মনুশোধন করিয়া লইয়া চটুল চপে ভগিনীপতির দিকে চাহিয়া সমপ্রতিভকণ্ঠে বলিল, “জামি তো ও কথা বলি নি কখনো!”

মোহন এবার হারির মাজাটা একটু বাড়াইয়া দিয়া বলিল, “আমি কি বিবাসন করছি তাই? তা ভয় কি বিজি আমি তোমার খুব শীগগির বিয়ে দিয়ে দেব, বলিয়া থপ করিয়া বিজয়াকে পাকড়াও করিয়া ধরিল। সে দুই হাতে

মুখ ঢাকিয়া আকিরা-রাকিরা আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

বোনের দুর্দশা দেখিয়া বাসন্তী শ্রীমাকে হাসিয়া বলিল, “ছেড়ে দাও না, পোড়ারমুখী যে ম’ল।”

“পোড়ারমুখী এমন মরে না গো তোমার মত। বিজি, বলত ভাই কার মত বর চাস? আচ্ছা আমার কাণে চুপি চুপি বল কার মতন?”

“কারণ মত চাই নি বাও।” বলিয়া বিজয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া একছুটে গৃহ হইতে নিজস্ব হইয়া যাবের আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, “কেমন দাৰা, হারিয়ে দিছিছি—কেমন লজ্জা করছি।”

“একটা নিমন্ত্রণ ফেলিয়া বলিল, “তোমাদেরই আজকাল জ্বিতের পালা রে”—বলিয়া পছন্দ প্রতি মধুপূর্ণ দৃষ্টিতে আনাইল—“কি বল।”

“আহা” বলিয়া বাসন্তী স্তিতহাস্তে চরকার নিকট গিয়া হতা কাটিতে বলিল।

“উত্তর দিলে না যে?”

“জানি না। সব কথাই উত্তর দিতে হ’বে—না?”

“বিজি কেমন হারিয়ে দিয়ে পালাল দেখলে তো।”

বাসন্তী হাসিয়া বলিল, “পোড়ারমুখী যেন গিগি-বিজয়ী।” বলিয়া সে চরকার পাক দিতে লাগিল।

“তা বলে তোমার দিকটা জর করতে পারছে না গো। আজকাল চরকাকাটার খুব উৎসাহ দেখছি। পেশের কাজে তা হ’লে সেগেছ বল।”

“না লাগবে না। বেশ যেন ওনারেই একলাকার একচেটে।”

মোহন মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল, আর তদন্তভাবে পছন্দ চরকা কাটা দেখিতে লাগিল।

(৪)

তারার মা বাড়ী ঢুকিয়া বলিল, “কই গো মোহনের মা, কি হচ্ছে?”

দয়াময়ী সহাস্তমুখে অত্যাধন করিয়া বলিল, “কে তারার মা, অনেক দিনের পর, কি ভাগিয়া যে, এস দিদি, বস বস।”

তারার মা বসিলে বসিতে বলিল, “ওমা, এই যে বামুন-দিদি ও যে, কলঙ্কণ?”

বামুন-দিদি বলিল, “বৈশাক্ষণ নয় বোন, এই এসে মাত্র এসেছি। মোহনের মা রোজ বলে—বামুন-দিদি এস এল। আসবার কি বো আছে বোন, পোড়া সঙ্গার নিয়ে হ’য়েছে জলন, দুখও কি বেরোবার বো আছে তাই।”

আজ দয়াময়ীর দালানেই মজলিস বিদ্যায়ছিল। দয়াময়ীর পিসীমা ও বাড়ী হইতে আসিয়াছে। বলিল, “তা বা বলেছ বামুন-মেয়ে। দয়াও আমাকে বলে আসতে, তা সঙ্গার হ’য়েছে পায়ের বেড়ি। ভাগিয়া এসেছি, তাই সবাইকার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হ’ল। আমাদের মুখ কপাল জোর মর্যাদা।”

দয়াময়ী পিসীমার কথাই সাধ দিয়া সহাস্তমুখে বলিল, “টিক বলেছ পিসীমা, যেদিন আসে না তো কেউ আসে না। একদা দম দফেট মরি ছুটে কথা বলবার জন্তে। ও বোমা গোট কত পান সেজে নিয়ে এস গো।”

বধূ পান আনিয়া খাণ্ডড়ার হস্তে দিল। খাণ্ডড়ী ইঙ্গিত করিতেই বধূ একে একে সকলকে নমস্কার করিল।

বামুন-দিদি বলিল, “এস মা এস, হয়েছে, আমি অনন্যি আশীর্বাদ করছি—জয়-এশ্বরী হও, হাতের নোয়া বজ্রের হুক।”

তারার মা দুই আঙুলে চিবুক স্পর্শ করিয়া চুষন করিয়া বলিল, “বস মা বস, শীগগির শীগগির বোটা বিয়ের দাও বাহা।”

বাসন্তী সন্তুচিতভাবে একপার্শ্বে উপবেশন করিল দেখিয়া তারার মা বলিল, “বউটা বড় লম্বী, না দিদি?”

দয়াময়ী ডিবা হইতে পান বাহির করিয়া সকলকার হাতে দিতেছিল। একটা পান আপনার মুখের মধ্যে পুরিয়া বলিল, “ওই দেখতেই লম্বী”—বলিয়া বোটা হইতে খানিকটা বোক্তার খুঁড়া বাহির করিয়া—“দোস্তা পাও তারার মা। ওমা সত্যি, তোমার ওসব বলাই নাই—এটো নাও বামুনদি।” বলিয়া বামুনদিকে খানিকটা এবং আপনার মুখে আগাগোড়া খানিকটা ফেলিয়া দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আপনার অঙ্গসম্পদে কথার পামপূর্বব করিয়া একটা নিমন্ত্রণ ফেলিয়া বলিল, “শুভে তো অগ্নিষ্ঠা বোন, ছেলে তো হ’ল না।”

তারার মা প্রতিবন্ধি করিল, “তা সত্যি, ছেলে না হ’লে ঘর-সংসার সব অন্ধকার।”

বামুন-দিদিও সাধ দিল, “মেয়ে-জন্মটাই মিথ্যা।” তারপর বাসন্তীর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, “তা এখনও হ’বার সময় আছে।”

গৃহিণী দয়াময়ী ঝাঁকিয়া উঠিয়া বলিল, “তুমি কি বল বামুন দি আরও হ’বার সময় আছে। তোমার মাগিকের বলে এই তিন বছর পেরোয়া নি বিয়ে হয়েছে কয়েক নেই, তোমার বো কেমন পুট পুট করে ছুটা সোপার চাঁদ বিয়ে দিলে। আর আমি কি বিয়ে দিয়েছি আদ্যকে! সে যে একগুণ হতে চলল।”

বামুনদিও তেমনি স্বরে বলিলেন, “তা হ’লে কি হ’বে বল। আমি যে তেমনি বিশ্বাসী বো এনেছি। বাবা, এসেন যেন পুণ্ডরিক সেপাই, মানোয়ারি পোরা।”

“তা হোক মানোয়ারি হ’ল তো বয়েই গেল। বোয়ের কথা ছেলে বুঝক গে। তোমার তো বুক ঠাটা হ’ল দিদি, সোপার চাঁদ বশুধরটা পেয়ে।”

তারার মা বলিল, “তা মোহনের মা বা বলেছ, কথাটা একেবারে মিছে নয়। ছেলে হ’লে তবেই তো বো, তা না হ’লে কিসের বো? তার আর কি বোকে ভাল লাগে। আমার তারাও ছেলে ছেলে করে গালা হ’য়ে আছে। তোমার মত তারও একটা ছেলে, বস রক্ষা করা তো চাই। শুনেছি আবার বিয়ে দেবে।”

দয়াময়ী খুব সমর্থনের স্বরে বলিল, “দেবে না তো কি করবে। আটকুতো সঙ্গার—বলে যার ভালো সেই জানে। এই হুগুগে কাশী চলে গেদুম, মনের হুগুগে বনে গিয়েও শান্তি পেদুম না বোন।”

“তা কি করে পাঁবে দিদি, তোমার সঙ্গারের সার হ’ল মোহন। তার ছেলে-পুত্র হ’বে তাদিক নিয়ে লাগন-লাগন করবে। সঙ্গারী মাহুয—এখনই তোমাদের কি কাশীবাস করার সময়।”

দয়াময়ী মহা খুশী হইয়া বলিল, “বল দিদি, তোমরাই পাচছনে বল—সময় কি? না-ভাল পাগে?” বিবেচনার আমার মাথায় থাক—বলিয়া দয়াময়ী দুই হাত জোড় করিয়া লগাট স্পর্শ করিল।



পিসীমার একমুখ তব্রা আসিয়াছিল তিনি ইহারই মধ্যে সেই খানে আঁচল বিছাইয়া বেশ খানিকটা ঘুমাইয়া গইলেন। সহসা কেমন করিয়া তাহার তব্রা ছুটিয়া গেল—বোধ হয় তাহারের আলোচনা কিছু কিছু কাশে গিয়াছিল। তিনি সবলে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'ছেলের আবার বিয়ে দিবি দয়া? তবে আর এত ভাবনা কিসের? দিয়ে দে চুকে যাক ল্যাটা।'

পিসীমা যত সহজে ল্যাটা চুকাইতে চায়, কাষটা যে তত সহজে নয়, দয়াময়ী তাহা জানিত। পুঙ্কটা তাহার নিতান্ত আনন্দিক। তাহাকে বিবাহ নাই। ইহা জানিত বলিয়া সে বিষমভাবে উত্তর করিল, "বিয়ে তো দোব পিসীমা তোমার নাতিকে তো ভূমি জান, এখনকার ছেলে।"

পিসীমা হাই তুলিতে তুলিতে বলিল, "তা আর জানি নি। তা বলে ছেলেকে আবার কিসের ভর ওনি? তোর পেটে সে হয়েছে তো—"

পিসীমার কথায় দয়াময়ী উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বিষয় মুখে প্রবৃত্ততা কিরিয়া আসিল।

বামুন-দি বিজ্ঞাসা করিল, "ছেলে কি বলে?"

"ছেলে আর কি বলবে, কথাটা তো তার কাছে পষ্ট করে বলি নি; তবে পিসীমাকে দিয়ে কতবার বলিয়েছি। তা সে ছেলের দস্ত পাওয়া ভার।"

"আর কত? কতবার কি মত?"

"তার কথা বলছ? তার আবার মতামত বলে কিছু আছে কি বামুন-দি। স্নাতেও নেই পাঁচেও নেই। তোমাদের পাঁচবনের আশারগায়ে তিনি আমার তোলানাথ।"

স্বামি-গর্বে দয়াময়ী বক স্বীত হইয়া উঠিল। এমন সময় অকস্মৎ ঘুমাইতে ঘুমাইতে ঢকলা হরিণীর ভায় বিজয়া তাহার নয়ন দুটিতে হাসি উদ্ভাসিত করিয়া তাহার দিকিকে কি একটা মজার কথা বলিবার ভ্রত তথায় ছুটিয়া আসিয়া সহসা সকলকে দেখিয়া থামিয়া গেল।

তখন সকলকার দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ হইল। তারার মা কিছুক্ষণ বিমিত্ত দৃষ্টিতে বিজয়াকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল, "ওমা, বোয়ের বোনটা তো খুব বড় হ'য়ে উঠেছে গো।"

দয়াময়ীর হইয়া পিসীমা উত্তর দিল, "হ'বে না, বয়সটা বাড়ছে না কমছে?"

"বিয়ে-খার কথা আসছে তো?"

দয়াময়ী একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল, "হাঁ না, এখনও বিয়ের কথা কই নি। আমাকেই তো বিয়ে দিতে হ'বে।"

"তোমারাই হ'লে ওর বাপ-মা। তা মেয়েটাকে তো দেখতে-ওনতে মন্দ নয়।"

বিয়ের নামে বিজয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বামুন-দি সহসা একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি যেমন ফেঁকরেছি।"

দয়াময়ী জবাব দিল, "তোমার আবার মন্দটা কিসের দিদি। আমার বোয়ের চেয়ে তা বলে শত গুণে ভাল। এমন পেলে আমি বস্ত্রে বেতুম।"

পিসীমা স্পষ্টবাদী লোক, তিনি সাক বলিয়া দিলেন, "ভূই তো আবার ব্যাটার বে দিবি বলছিলি বাপু, তবে আবার খুঁতখুঁত কেন? এবার ভাল দেখে মনের মত করে বৌ আনিব চুকে যাক ল্যাটা।"

বামুন-দিও বলিল, "আর খুঁজতেই বা হ'বে কেন? মেয়ে তো দিদির হাতের মুঠোর ভেতর, খালি মালা-বদলের অপিকে।"

পিসীমা বলিল, "বা বলছে বামুন-মেয়ে। সেই তো খরচ-পাও করে মেয়েটাকে পার করতে হ'বে। তার চেয়ে এ হ'ল ভাল, লাতে-থাকতে মনের মত বৌ হ'বে, লোককে বলবারও একটা অছিলি পাবি।"

দয়াময়ীর মন খুসীতে এবং মুগ্ধ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। এতদিন যে কথাটা মনের কোণে লুকান ছিল, আজ বামুন-দি ও পিসীমা তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিয়া ফেলিল।

বাসন্তী বারান্দার একধারে বসিয়া তাহারের সকল কথাই শুনিতেছিল। সহসা সে শিহরিয়া উঠিল; তাহার চক্ষুর সমুখ হইতে একখানি বনিনী সরিয়া গেল।

দয়াময়ী খুসীভরা অথচ নিঃশব্দে বলিল, "আমি অনেকদিন আগে থেকেই এরকম আঁচ করে রেখেছি বামুন-দি। আজ তোমরা আমার মনের কথা টেনে বার

পঞ্চপুস্ত—



মহেশ্বরের সন্তস্তুতি

JUNG PRINTING WORKS, CAL.



করেছ। তাই তোমাদের কাছে বগছি—আমাদের মোহনেরও মনে মনে ওকে বড় পছন্দ।”

‘মনে মনে ওকে বড় পছন্দ!’ শুনিয়া বারান্দার ধারে একেবারে পাথরের মত নিশানভাবে বসিয়া পড়িল।

আরও কত আলোচনা হইয়া গেল। তাহার এক বর্ণও বাসস্তীর কর্ণকূহরে প্রবেশলাভ করিল না। তারপর কখন সভাভঙ্গ হইল, বেগা পড়িয়া আসিল, স্বর্ণ্যদের পাটে বসিল, সন্ধ্যারতির শঙ্খ-বণ্টা চতুর্দিকে বাজিয়া উঠিল, তাহা সে কিছুই জানিতে পারিল না।

বধুর দিকে তাকাইয়া আজ দরামরীও বেনে একটু ভীত হইয়া গেল। তাহাকে সন্ধ্যা দিবার লজ্ঞা আদেশ পর্যন্তে করিতে পারিলেন না।

তারপর অনেকখানি রাত হইয়া গিয়াছে। মোহন

বাহির হইতে বেড়াইয়া আসিয়া বারান্দা দিয়া বাইতে বাইতে পল্লীকে চূপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া পাঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “একি একখাটী এখানে এমনভাবে বসে কেন?”

বাসস্তী উত্তর দিতে পারিল না। জন্মদে কষ্ট যে তাহার রক্ত হইয়া গিয়াছে। সে নতমুখে বসিয়াই রহিল। বামীর এই ঘেহ সন্তানবৎ মৌখিক শিষ্টতা বলিয়া মনে হইল। অভিমানে বামীর মুখের দিকে পর্যন্ত চাহিতে ইচ্ছা করিল না। উত্তর না পাইয়া মোহন হস্তস্থিত বইখানা দিয়া নামের পতীর পৃষ্ঠে মুহু মুহু আঘাত করিয়া চলিয়া গেল।

এতক্ষণ পরে বাসস্তীর রক্ত বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। অশ্রু উৎসরূপে হু হু করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল—আর বৃষ্টি তাহা যৌগ করিতে পারে না, না কিছুতে না।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

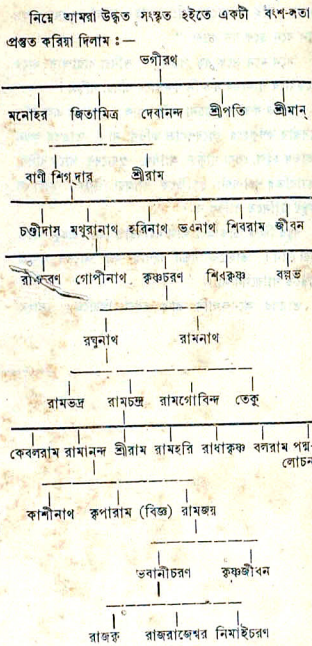
## ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমাচার-চলিকার সম্পাদক ছিলেন। তাহার জীবন-সংক্ষেপে অতি অল্প উপাদানই পাওয়া গিয়াছে। সম্ভ্রান্তি হলদে তুলত কাগজে পুথির আকারে ছাপা মনস্বিতার একখানি গ্রন্থ আশার হস্তগত হইয়াছে। এই মন্তব্যসিদ্ধি ১৮৫৪ সনের

(১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের) ২০এ ফাল্গুন কলিকাতার সমাচার-চলিকার সঙ্গে মুদ্রিত হয়। পুথিকার এই সংগ্রহ দেওয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশ-তালিকা সংযুক্ত দেওয়া আছে। বংশ তালিকাটি পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—



“বন্দ্যে বন্দ্যচীবাশে জাতঃ খ্যাতো ভগীরথঃ।  
বহুবৃদ্ধস্য সংপুত্রাঃ পঞ্চ পঞ্চাননোপমাঃ ॥১৥” জ্যোষ্ঠো  
মনোহরো বীমান্ ক্রিতামিত্রশ্চ মধ্যমঃ। দেবানন্দপুত্রীয়ো-  
জুজুর্ষঃ ত্রীপতিঃ কৃত্য ॥২৥ আখ্যায় পঞ্চমঃ ত্রীমানেতে  
পঞ্চ সহোদরাঃ। ক্রিতামিত্রস্য পুত্রৌ যৌ খ্যাতৌ  
বন্দ্যচীকুলে ॥৩৥ বাণীশিঙ্গারকো জ্যোষ্ঠোহম্বুষঃ ত্রীগ্রাম-  
নামকঃ। জ্যোষ্ঠস্য শিকরারস্য পুত্রাঃ বহু ভূবি বিকশতাঃ ॥৪৥  
চতীরাঙ্গম্ মধুরানাথক হরিনাথকঃ। ভবনাথকঃ বিখ্যাতঃ  
শিবরামকঃ জীবনঃ ॥৫৥ মধুরানাথতো জাতাঃ পুত্রাঃ পঞ্চ-  
কুলোচ্ছলাঃ। প্রথমো রামচরণো গোপীনাথকঃ মধ্যমঃ ॥৬৥  
তৃতীয়ঃ কৃষ্ণচরণঃ শিবকৃষ্ণকৃষ্ণকঃ। বয়স্তঃ পঞ্চমশ্চৈতে  
সর্বশারবিহাররাঃ ॥৭৥ রঘুনাথো রামনাথো যৌ কৃষ্ণ-  
চরণাশ্রমৌ। রঘুনাথস্য চত্বারতনুজা অভবন্ ভূবি ৮।  
রামভদ্রোহভবজ্ঞানায়ান্ রামচন্দ্রঃ মধ্যমঃ। তৃতীয়ো রাম  
গোবিন্দকৃষ্ণশ্চৈকুসংজ্ঞকঃ। রামচন্দ্রস্ততাঃ সপ্ত সপ্তদগ্ধি-  
সমপ্রভাঃ। জ্যোষ্ঠ কেবলরামশ্চরামানন্দকঃ মধ্যমঃ ১০।  
তথ্যো তৃতীয়ঃ ত্রীগ্রামজন্তব্যো রামহরিঃ কৃত্য। রাধাকৃষ্ণ  
পঞ্চমশ্চ বলরামশ্চ বটকঃ ১১। পরলোচননামা যঃ সপ্তমঃ  
সোহত্র কীর্তিতঃ। রামানন্দস্ততা এতে কুলশীলসমব্রিতাঃ  
১২। কাশীনাথকুপারামবিজ্ঞরামজ্ঞারামরাঃ। বহুবৃদ্ধ  
রামজ্ঞারামরাঃ দয়াম্বোদয়ৌ যৌ তনরৌ নরাধিতৌ। ত্রীমান্  
ভবানীচরণশেখরজ্ঞারামানন্দকুলীনাথকৃষ্ণজীবনঃ ১৩।  
ত্রীগ্রামকৃষ্ণঃ প্রথমো দ্বিতীয়ঃ ত্রীগ্রামজ্ঞারামজ্ঞারামকৃষ্ণকঃ।  
ত্রীগ্রামকৃষ্ণচরণতৃতীয়ো ভবানীচরণস্য পুত্রাঃ।



## বারা কুল

ত্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

প্রতিদিন বেশ শেষে, আসন্ন সন্ধ্যায়,  
পরবিত বনানীর নিতুজ ছায়ায়,  
এই যে স্বরিদা যায় সংখ্যাতীত কুল—  
অপন সৌন্দর্য ল'রে, বেদনা-ব্যাকুল,  
চঞ্চল স্বরতি রাগে, মোন নতমুখে—  
স্নেহীন, স্বকণ্ঠ, ধরণীর বুকে ;  
হে নিষ্টুর, ভাব' সে কি নিতান্ত নিফল !  
হিলোলিত প্রভাতের আনন্দ উজ্জল  
ভাগেরো কি বরে নাই নিমেষের তরে,  
চির অমরতা দিয়ে ? তুলি প্রেম-ভরে  
জ্ঞান অকল প্রান্তে কেহ গাঁপে নাই  
মধুর-মিলন-মালা, তারা বুণা তাই !  
বজ্রল বীধিকাতলে, ক্রান্ত বায়বশে,  
নিঃশব্দ সঙ্কোচ ভরে, দিবসে দিবসে  
ভেলার খরিয়া গেছে, কেহ কোন দিন—  
ধূসর, উদর, সেই ব্যথিত বিলীন  
জন্মের দীর্ঘধাস শোনে নাই ব'লে,  
ভাব' তারা বুণা তাই অরথের কোলে  
প্রভাতে মুষ্টিগা ওঠে, গাঁয়ে স্ব'রে যায়,  
বিপুল এ প্রকাশের কিবা কতি ভায় ?  
অতি কুদ্র, অতি ভুজ, তাহাদের সাপে  
ধরণীর অন্তর্লীন জীবন-সভাতে  
ভাব' বুঝি জীবনের নাহি কোন যোগ ?  
তাদের বিকাশ শুধু নিফল হুঁচুগ ?  
হার ভ্রান্ত ! ওই তুচ্ছ ছোট মূল গুলি,

কোণা হ'তে এল' ওরা ? শব্দ বাহু তুলি,  
এক দিন সাথি বিশ্ব এস' এস' ব'লে  
কেচেছিল তা সবাই, বসন্ত-হল্লোলে  
রোমাক্তিক বনাকুল, ব্যথিত বিদুর,  
অভাগ্য সঙ্কেত ভরে, কল্পণার স্বর  
তুলেছিল তা-সবার মঙ্গল আশানে—  
তাই তারা ছায়াছন্ন নিশি-অবসানে  
সহসা উঠেছে দ্বীপ, হালোকে-ভুলোকে  
অগণ্ড সৌন্দর্যছটা ছড়িয়ে পুলকে ;—  
দিবস চলিয়া যায়, মোন অন্ধকার,  
অবসন্ন কলরব, বিতীর্ণ পাথার—  
কেহ তো বোঝে না কোন প্রজন্ম আশায়,  
মুহূর্তের সময়েল জীবন-লীলায়  
মদির-বিহ্বল প্রাণে দ্বীপ ওঠে তারা,  
অজানিত অসীমের মাঝে হ'তে হারা !  
উষার শিশির-স্পর্শ, অরুণ কিরণ,  
উত্তলা দক্ষিণ-বায়ু, শিশীল-শুভ্রন,  
অদ্ভুত কাকলী-গান, মর্দর সঞ্চারণ—  
অব্যক্ত ব্যথার মত শুধুরার বার  
বেছে ওঠে তল্লাহত তাহাদের ঘানে।  
সেই নিমেষের সংজ্ঞা, বিপুল সংসারে  
দিয়ে যায় যে বুগাণ্ডের শূন্যতার বুকে  
একটা প্রাণের বাঁধা, কত মুখে-মুখে  
কত যুগ যুগান্তের তপস্যার ফলে,  
কোটে মূল উজ্জ্বলিত আকাশের তলে !





### শিবিরতন মিত্র

শিবিরতন মিত্র বীরভূম জেলার অন্তর্গত থরারশোল থানার অরীন্দ্র বড়দা গ্রামে মিত্র-বংশে বাঙালী ১২৭৮ সালের ১লা চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৬ইশ্বর চন্দ্র মিত্র এবং মাতার নাম নিত্যসবী দাসী।

ঐশ্বর চন্দ্রের ছই বিবাহ প্রথমা পত্নী নিত্যসবী গর্ভে ৫ কণ্ডা ও তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ শিবরতন মিত্র মহাশয় ঐশ্বরচন্দ্রের পঞ্চম সন্তান ও কোষ্ঠপুত্র ১২৮৩ সালের ১৯এ চৈত্র (ইং ১৮৭৭ খৃঃ) নিত্যসবী পরলোক গমন করিলে ঐশ্বরচন্দ্র দ্বিতীয়বার দার গ্রহণ করেন। এই পত্নীর গর্ভে অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল; কিন্তু কেহই জীবিত নাই।

পঞ্চমবৎ বয়সে বখারীতি হাতে বড়ি হইলে শিবরতন সিউড়ীতে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎকালে জেলা স্কুল হইতে তিনি ইংরাজী ১৮৯১ জীর্ণদে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময় তাঁহার বিবাহ হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে হইতে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ক্রেনোরেলে এসেমব্লিজে (বর্তমান রকীশচার্লস কলেজ) বি-এ অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি ওলাউতী দিবার জন্ত লন্ডনে ছই বৎসর কাল আইন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় তাঁহার পিতা নিজে কর্ণ হইতে অঙ্গর গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে অফিসের কোষায় কর্ণে নিযুক্ত করিয়া দেন।

কলেজে অধ্যয়ন কালে শিবরতন প্রেসিডেন্সী কলেজের

দ্বিতীয় বর্ষ হইতে বহু ইংরেজী সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজী সাহিত্যে যথেষ্ট অঙ্গর হন। এই সময় তিনি মাদ্রাগ হইতে প্রকাশিত “গ্রোপ্রে” নামক ইংরেজী মাসিক পত্র, কলিকাতার অমুন্যগুপ্ত “হোপ” নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক-পত্রে এবং “নব্যভারত” নামক মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। সময় সময় ইংরেজীতে বক্তৃতাও দিতেন। কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বাবতীর ছাত্রগণের মধ্যে ইংরেজী প্রবন্ধ রচনার প্রতি যোগিতার ইনি সূচকোচ্চায়েন অধিকার করিয়া পুস্তক লাভ করেন। কলে অধ্যয়ন কালে তিনি তাঁহার কবিত্ব ৬আজীজ উদ্দৌ শোভানের সহিত একত্রে বহুবিধ ব্যায়াম কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ইনি উত্তরকালে যে স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন তাহাতে ইহাকে স্বাধীনকাল সাহিত্য-চর্চা করিবার “অবাস্থ্যিক” ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিয়া ইনি চাকুরীর ভার গ্রহণ করেন। এখন তিনি বীরভূম কালেক্টরীর হেড এ্যাসিস্ট্যান্ট-এর পদে নিযুক্ত আছেন।

১৩০৪ সালে চাকুরিতে প্রবিষ্ট হইবার সময়ে ইহার ভ্রাতৃবিয়োগ হইলে ইনি বহু কবিতা রচনা করিয়া তদনীন্তন কালের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটা কবিতা ইহার “দুর্লভ” নামক কবিতাপুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্টগুলি এখনও অপ্রকাশিত। ইহার ছাত্রজীবন হইতে ইনি কবিত্ব আজীজ উদ্দৌ শোভানের সহিত একযোগে মহরমের ইতিবৃত্ত অলখনন করিয়া বাঙালী ভাষায় একধাণ কাব্য লিখিবার কল্পনা করিয়াছিলেন।

ইহার কবিত্বের পথ্যতনা বা আলোচনা করিয়া কিছু দেখার যথেষ্ট ছিল না, স্বতন্ত্র মিত্র মহাশয়ই এই কাব্যের উপালা-না-এক-সংকল্পে বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এবং সেই সময় গ্রন্থ অধ্যয়ন কালে ইনি কতকগুলি মূলমূল্য ঐতিহাসিক বিষয় অলখননে স্বাধীন কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ইহার কবি বন্ধকে দিয়া বহু কবিতা রচনা করাইয়াছিলেন। সেগুলি সাংগৃহীত হইয়া কয়েক বৎসর পূর্বে “কুরব” নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় ইনি বন্ধুর উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাব অঙ্গলি প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সন্দেহ ব্যতিরিক্ত চিত্র অব হইয়া যায়।

১৩০৬ সালে কর্ণাহার হইতে ৬নৌলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় “বীরভূমি” প্রথম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে ইনি এই মাসিক পত্রিকায় (১) বীরভূমির ইতিবৃত্ত, (২) বীরভূমির প্রাচীন পুঁথি, (৩) ঐতিহাসিক ছড়া নামক তিনটি বড় প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু প্রায় চারবৎসর কাল “বীরভূমি” প্রচারিত হইয়া বন্ধ হইয়া গেলে ইহার প্রারম্ভ প্রবন্ধগুলিও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

১৩১১ সালে ইহার আবল্য বন্ধ লর্ড এন্স লিখের ভ্রাতৃপুত্র শ্রীকৃষ্ণ চারুকর সিংহ মহাশয়ের আর্থিক সহায়তায় ইনি “সোপান” নামক একধাণ নিগিত বহু মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐষ্ট সময় “প্রোপ” নামক চারি মাসিক পত্রিকার সহকারী ৬নৌলরতন দাস মহাশয় ইহার সিউড়ীর বাটীতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহারই সহায়তায় ও পরামর্শে এই “সোপান” সিউড়ী হইতে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প হয়; কিন্তু বৈবক্ষিপাকবনত মাত্র একবৎসর প্রকাশিত হইয়া “সোপান” বন্ধ হইয়া যায়। এই সোপানেও মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

মিত্র মহাশয় ছাত্রাবস্থা হইতেই বহু পুস্তক সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইবার পরে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ কার্যে প্রবৃত্ত হন। ইনি ইতিপূর্বেই কলিকাতার বকীয়া-সাহিত্য পরিষদের সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। এই সময় বাঙালী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আলোচনা কালে ইহার মনে বাঙালী সাহিত্যে কত সেরক আজ পর্যন্ত আশ্রয়িত্যোগ করিয়া ইহার সৌভব সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারের

একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে ইহার আকাঙ্ক্ষা হয়। এই তালিকা সংগ্রহ করিতে ইনি প্রায় ছই বৎসর কাল পীরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ইনি প্রায় সাাত্তশ গ্রন্থকারের নাম তালিকাভুক্ত করিতে সক্ষম হন। এই নামের তালিকা সাংগৃহীত হইলে ইনি ইহা অভিনয় আকারে পরিণত করেন। বঙ্গ-সাহিত্যের মনবিগণ এবং হিতৈষী বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকেই ইহাও এই বিপুল ব্যয় ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইবার উপদেশ প্রদান করেন; কিন্তু তিনি যৌবনোচিত আশাপূর্ণ হৃদয়, প্রবল উৎসাহ ও বিপুল অশ্রমপরায়ণতা মাত্র সঞ্চল করিয়া এই বৃহৎ কার্যে নিমগ্ন হন। ফলে ইহার “বকীয়া সাহিত্য-সেবক” নামক বঙ্গভাষার পরলোকাগত বাবতীর সাহিত্য-সেবক গণের স্বরূপে চরিতা-ভিনয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনার ইনি অজ্ঞাবধি প্রায় ৩৬ বৎসর কাল অনন্তমনে পিরিশ্রম করিতেছেন। ফলে এই গ্রন্থে এখন প্রায় পাঁচ সহস্র পরলোকান্ত বকীয়া গ্রন্থকারগণের রচনারূপে বর্ণনাত্মক চরিত-কথা রচিত হইয়াছে। ছাপের বিবরণ এই বহুগ্রন্থ গ্রন্থ অর্ধভাবে সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশিত হয় নাই।

১৩১১ সালে “বীরভূমি” পত্রিকা পুনঃপ্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে ইনি সর্ব প্রথম ইহার বকীয়া সাহিত্য-সেবক গ্রন্থ এই পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে “আরম্ভ করেন। কিন্তুদশ মাত্র প্রকাশিত হইলে পূর্ব “বীরভূমি” পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপে মাত্র ছইবৎসর সাহিত্য সেবক প্রকাশিত হয়। তাহারপর বন্ধবর্গের সহায়তায় আর ছই বৎসর সাহিত্য সেবক প্রকাশিত হয়। পরে হেস্ত্রমের বহাঙ্গ-কুমার ৬মহিমারিষজ চক্রবর্তী মহাশয়ের সহায়তায় ৫ম হইতে ১২ম বৎসর প্রকাশিত হয়। ইহার পর জৈন-বন্ধুর সহায়তায় ১২ম হইতে ১৪ ম বৎসর প্রকাশিত হয়। কিন্তু অর্ধভাবে সাহিত্য-সেবকের ধরনবর্তী বৎসর প্রচার হগিত রহিয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ অপ্রকৃতিত থাকে নিত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

সাহিত্য-সেবক রচনা কালে মিত্র মহাশয় দারিদ্ৰ্যের কঠোর বয়োগ উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইনি স্বয়ং লিখিয়াছেন—

“ইহীব্রবনের সর্ববিধ আশা আকাঙ্ক্ষার অক্ষাণ্ডি দিয়া।



লক্ষ্যই হইল। সেখানেও পরিহার করিয়া দ্বন্দ্ব রূপ ও মারিয়ারকে চিরবধন করিয়া অনুভবনে এই গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত হইয়াছিল। সত্যায়ের কত অল্পবয়স্ক যুগের উত্তর দিয়া বহিরা গেল—কত দিব্যরাশি সপরিবারে উপবাসে কাটাইলাম—কতদিন এক অশনে, এক বসনে অভিবাহিত কলিমা, কত দিন, কত বারমাস এই ভাবে চলিয়া গেল তাহার স্মৃতি নাই।

মাহুব সংগে এমন দিন অতিক্রম করিয়া ভিটিতে পারেন না, এমন দারিদ্র্য-পীড়া মাহুব সংগে সহ্য করিতে পারেন না, কিন্তু এই “স্মৃতি-সেবক” আমার দ্বয়ে মত হইয়া অমাহিমিক বুল সন্ধান করিয়া দিল বলিয়া আমি কোনরূপ বাধাবিঘ্ন বা অজ্ঞা-বাস্তার প্রতি ক্রোধে পরি নাহি। উপবাস ক্রিষ্ট দেখে সমগ্র বিশ্ববাসী চাকুরীর কঠোর পরিশ্রমে পর কোন একসঙ্গে হেলের পরমা সন্ধান করিয়া মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর নিম্নমিতভাবে রাত্রি তিন ঘণ্টা পর্যন্ত ‘সাহিত্য সেবক’ের কার্য করিয়াছে। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিয়াছি উপবাসকাল পরিবারবর্গ ও শিশুসন্ধান-গুলি অথবা নিদ্রার অভিকৃত রহিয়াছে; কিন্তু তাহাতেও বিচলিত হই নাই।

দরিদ্র আমি সন্ধানপথের হৃথের গ্রাস কাড়িয়াও সাহিত্য-সেবকের রচনার সৌকর্য্যার্থ পুস্তক জয় করিয়াছি—শরীরের কেশ কেশ বলিয়া মানি নাই। শেখ-বিদেশ ঘুরিয়া প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। এইভাবে এখন আমার একার চেইর ফলে মধ্যস্থলের এক নিম্নত গৃহে ‘রতন-শাহীয়ে’ নামক যে গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে প্রায় ছয় সংখ্য প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি, তাত্ত্বিক মুদ্রিত গ্রন্থ এবং বাহুবলে ও হৃথ্য নৈমিক ছুইটি প্রাচীন মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। ফলতঃ এই সকল গ্রন্থ হইতেই এবং যেখানে বাধা কিছু সম্ভব সেই হীন হইতেই আজ প্রায় ৩৬ বৎসর কাল ধরিয়া জগৎগত অবিরাম পরিশ্রমের ফলে এই গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

১৩১৫ সালে ইহার পিতৃ বিয়োগ ও তাহার অনাবহিত পরেই ইহার ভিত্তি পুঁথি গিরিগ হইলে ইনি একবৎসর কাল অবসর গ্রহণ করিয়া এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেসের সর্বাধিকারী-কর্তৃক বঙ্গভাষার শব্দাভিধান সঙ্গলনজ্ঞ

অজ্ঞত সঙ্গলনরূপে কলিকাতার নিম্নলিখিত ইনি প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য হইতে শব্দ ও উদ্ভরণ সঙ্গলন করেন। অজ্ঞাত সহকর্মীরা গল্প ও পদ্য সাহিত্য হইতে এই ভাবে শব্দ ও তৎপরিপাক উদ্ভরণ সঙ্গলন করেন। এইরূপ প্রায় এক বৎসরকাল কার্য করিবার পর বখন অভিধান প্রেসে দিবার মত প্রস্তুত হইয়া উঠিল তখন সর্বাধিকারী মহাশয় ইহাঙ্গিকে বিপায় দিয়া অভিধান সঙ্গলন কার্য হস্তিত রাখেন। পরবর্তীকালে ইহাদের সঙ্গলিত এই অভিধান শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময় কলিকাতার অবস্থানকালে ‘মানসী’ নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। মিজ মহাশয় এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক চতুইয়ের মধ্যে অঙ্গতম ছিলেন। ‘মানসী’ প্রথম প্রকাশকাল হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার বহু রচনা উদ্ধাতে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার অবস্থান কালে ইনি ‘হস্তলিপি লিখন প্রণালী’ নামক বালকগণের হস্তলিপি লিখিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত উপদেশমূলক সচিত্র পুস্তক এবং বিজ্ঞাপন মহাশয় প্রণীত ‘শব্দকোষ’ ও ‘সীতার বনবাসের সটিক ও সচিত্র সংস্করণ সর্বপ্রথম প্রকাশিত করেন।

ছুটি হুইয়াইলে পুনরায় সিউড়ী আসিয়া কর্ণভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইনি ইহার অন্তরঙ্গ বন্ধ ত্রীকুলনাশ্রয়াল মলিক মহাশয়ের সহযোগে সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ইহার প্রথম সম্পাদক মনোনীত হন। এই সাহিত্য-পরিষদ হইতে মলিক মহাশয়ের সম্পাদকভার পুনরায় নব-পর্যায় ‘বীরভূমি’ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই বীরভূমিতেই ইনি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ রচনা ও প্রকাশিত করেন। মিজমহাশয় যে সকল বাঙালী গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সমগ্রাক্রমিক একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

পুস্তকের নাম ও প্রকাশকাল—(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক ১৩১১ সাল; (২) দুর্দী ১৩১৩ সাল; (৩) বর্নমালা (প্রথম ভাগ) ১৩১৩ সাল; (৪) হস্তলিপি-লিখন-প্রণালী ১৩১৫, (৫) শব্দকোষ ১৩১৬; (৬) সীতার বনবাস ১৩১৭; (৭) বিজ্ঞাপন ১৩১৭; (৮) প্রথম কলিকাতা ১৩১৭; (৯) রতন

১৩২৩; (১০) রতন পাঠ ১৩২৩; (১১) সচিত্র আরব্য উপজাতি ১৩২৩; (১২) গোপীচন্দ্র ১৩২৬; (১৩) চিত্রমালা ১৩২৬; (১৪) প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ১৩২৬; (১৫) সাজের কথা ১৩২৭; (১৬) ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৩২৮; (১৭) রত্নকণা ১৩২৮; (১৮) সাগর স্বধা ১৩২৯; (১৯) কুরঙ্গ ১৩২৯; (২০) আরব্য উপজাতি (১ম ও ২য়) ১৩৩০; (২১) শিশুতোষ ভারত ইতিহাস ১৩৩০; (২২) মোহন স্বধা ১৩৩০; (২৩) অক্ষয় ১৩৩১; (২৪) সাগর কথা ১৩৩১ (২৫) ভারত কথা ১৩৩১; (২৬) উজ্জ্বল চম্ভিকা ১৩৩৩; (২৭) প্রদগ্ন কোরক ১৩৩৭; (২৮) প্রদগ্ন কলিকাতা ১৩৩৭; (২৯) প্রদগ্ন মুকুল ১৩৩৭; (৩০) প্রদগ্ন মালিকা ১৩৩৭; (৩১) প্রদগ্ন চম্ভিকা ১৩৩৭; (৩২) ভারত কথা ১৩৩৭; (৩৩) প্রদগ্ন কুলুম ১৩৩৭; (৩৪) কল্পকণা ১৩৩৭। এতদব্যতীত তাঁহার “লাউসেন”, “বঙ্গ সাহিত্য”, “নিশির কথা”, “বিদ্যাপতি”, “বনের কথা” প্রভৃতি পুস্তক অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। সম্ভ্রুতি ‘বঙ্গ লক্ষ্মী’তে ইহার “বঙ্গ সাহিত্য” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইনি “হিতবাসী”, “বঙ্গবাসী”, “মোহনা” “নবভারত”, “প্রবাসী”,

‘ভারতবর্ষ’, ‘বঙ্গবাণী’, ‘মানসী’, ‘বীরভূমি’, ‘শিশু’, ‘শিশুসাধী’, ‘যশসী’, ‘গল্পবহরী’, ‘নবযুগ’, ‘বাসন্তী’, ‘সচিত্র শিশির’, ‘শক্তি’, ‘বীরভূমি হিতবাসী’ প্রভৃতি পত্রিকার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন।

১৩২৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে তাঁহার ‘টাইপস্ অফ্‌ আর্লি বঙ্গলী প্রোজেক্ট’ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় ও ১৩৩১ সালে তিনি ‘ইঞ্জি-পোয়েমস্’ নামে আর একখানি ইংরেজী কবিতার বই প্রকাশ করেন।

ইনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কার্যকরী সমিতির অঙ্গতম সদস্য ছিলেন। ১৩২৫ সালে হেতুমপুর কলেজে বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে এবং হেথিরা গ্রামে বীরভূম-সাহিত্য-সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশনে ইনি সভাপতির কার্য করিয়াছিলেন। ইনি বীরভূমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশনে (১৩২২ সাল) সম্পাদক মনোনীত হইয়াছিলেন। ইনি ইংরেজী ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী ভাষার অঙ্গতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।



## সম্মোহিতা

(উপভাস)

(পূর্ণাহরতি)

শ্রীমতী উষা শিখ

সাতর

“বুঝ না?”

কুন্তলা কথা কহিতে পারিল না।

“চল বৌ দেখবে, কিন্তু নান্দা কি তোমায় নিজে গিয়ে ডেকে এনেছেন?”

কুন্তলা অব্যর্থ ব্যাপার খানা কতকটা বুঝিয়া বলিল, “না বিয়ের কথা কিছুমাত্র জানি না, আর আমাশয়ে কেউ ডাকেও নি।”

“জব?”

“ঠাকুরপোর কাছে একটা জরুরী কাজের জন্ত এসেছিলাম—জিতেনের মর্কদ্দমার দিন তো ঘনিষে এস।”

“বেশ তো চল।”

উভয়ে সিঁড়ি বাহিয়া ঘিতলে এক সজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিল। নবধূত শ্রুৎতা ধারের দিকে মুখ করিয়া চিঠি লিখিতেছিল। বধূর মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতে কুন্তলা স্বাধুৎ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া পড়িল ও তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অহতাপ ও অশ্রুশোচনায় চিত্ত ভরিয়া গেল।

ইহা যে তাহারই অপরিণামদর্শিতার বিষময় ফল ইহা বুঝিতে বিশদ হইল না, কেন সে উঠাকে পুরুষের দ্বান করিতে লইয়া গিয়াছিল, কেন তখন দেখার ব্যর্থতার প্রশ্ন সবেও

চূপ করিয়াছিল, কেন তখন দেবরের সত্য পরিচয় দিতে কুণ্ডাবোধ করিয়াছিল। সেই কবিত্ব দ্রষ্টার পূর্ব করিয়া দিল।

এক নারী-জীবনকে ব্যর্থ হাধাকারে পূর্ব করিয়া দিল।

গবাকের গোপন মর্ককে কুন্তলা যে দেখিয়া ছিল তাহা জানিয়াও কেন তখনই সকল কথা বলিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দেয় নাই, আর তাহা যদি নাই করিল,

তবে কেন, কিসের জন্ত সে সখী-কন্ডার বিবাহে

এত দিন দিবা আরাধে কাটাইয়া আসিল, কি এম

প্রয়োজন ছিল তাহার, বাহার মাথার উপর বিপদের শানিত ছুরিকা দ্রুতিতেছে, যে কোন মুহূর্তে উহা আমূল বিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা—সেও পারে নিশ্চিতভাবে আমোদে যোগ দিতে। নিজের ব্যবহারে হাসি আসিল।

শ্রুৎতা উঠিয়া শ্রদ্ধাভরে কুন্তলাকে প্রণাম করিল। একটু দ্রো দিয়া ইলা বলিল, “ছোট-বৌদি যে প্রণাম করলেন বড়-বৌদি।”

অপর্যায়ী তার কুন্তলা মন্তক নত করিল।

“বৌদি অ বৌদি কি হয়েছে তোমার?”

ইলার বাক্যে কুন্তলা কিঞ্চিত্ত প্রকৃত্তি হইয়া লেখার প্রতি চাহিয়া বলিল, “বিয়ের আগে বাবা যদি একবার জিজ্ঞাসা করতেন?”

“কিন্তু তার যে আর সময় ছিল না দিদি।”

আতর্ধ্যভাবে ইলা বলিল, “তুমি একে কেন?”

“হ্যাঁ ও আর বাবা কদিন ছিলেন আমার কাছে।

তোর তখন অর, এ জিতেনের বোন হইলো।”

“জিতেনদার বোন?”

“হ্যাঁ।”

“কিন্তু এত শীগগির কি দরকার ছিল লেখা?”

“ছিল দিদি, জানাই তো দাদার জন্মে এমন কত টাকার দরকার, হাতে কিছু ছিল না সেই জন্মে—”

“চূপ করো না বল লেখা।”

“পাঁচ হাজার টাকা এরা মিলেন; বাবা রাজি হন নি, আমি জোর করে এ কাজ করেছি দিদি, কিন্তু তুমি এমন কাঁপছ কেন?”

পড়ে যাঁবে যে বসো।”

লেখা উঠাকে জোর করিয়া বসাইয়া দিল। কুন্তলার নিজের হাতে চুলগুলো ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

কাহার দোষে যে শাস্ত পাইল, অপর্যায়ী যে সফটু তাহারই, সে যদি জিতেনকে সে দিন ঠেলিয়া পঠাইত। জিতেন কিরিয়া যখন শুনিবে তখন কি উত্তর দিবে সে।

“দিদি দিদি ও কি।” কুন্তলা চলিয়া গড়িল, ঘরে উঠার মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়া অঞ্চল সিয়া বাতাস করিয়া ইলা ও শ্রুৎতা উঠাকে সহ করিয়া দুলিল।

উঠিয়া বলিয়া কুন্তলা বলিল, “ঠাকুরপোকে ভিতরে ডাকতে পারিল?”

“আনছি ডেকে, কিন্তু তুমি আমার এখন এমন করে না বৌদি।”

মলিন হাসিয়া কুন্তলা বলিল, “না রে পাগল তখন মাথাটা কেমন করে উঠেছিল, মার বার কি আর হয় তুই যা।”

ইলা চলিয়া গেলে কুন্তলা বলিল, “তুই আর জিতেন কোন দিন কমা করতে পারবি না আমার?”

“কি বলছ দিদি এত সবে আজ সামান্য আঘাতে শুভে পড়তে চাইছ কেন?”

“সামান্য নয় বোন জানতিসু যদি কত বড় অপরাধ করেছি, জানতিসু যদি সেই অপরাধের দণ্ড সারা জীবন-ভোর কি ভাষনভাবে তোকে ভোগ করতে হবে,

জানতিসু যদি আমার অপরাধের শাস্তিগ্রহণ কাকে বরণ করে নিয়েছিল তুই—”। কুন্তলার গলা বুকিয়া আসিল।

বিষয় হাসি হাসিয়া লেখা বলিল, “জানি দিদি জেনেই দিয়ে রয়েছে।”

“জানতে তুমি? ঠাকুরপোর সব কথা শুনেছিলি?”

“জানত মন্তকে লেখা বলিল, “কিন্তু অত ছুপ করছো কেন?”

দাদার কাছে আগেই শুনেছিলাম দিদি।”

অবাক-বিশ্ময়ে কুন্তলা বলিল, “তবু জেনে শুনেও—”

“হ্যাঁ উপায় যে ছিল না।”

“কেন উপায় ছিল না?”

“আমি কি বলি নি চোটা করবো।”

“কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ লাভ হ’ত কি না তারও তো স্থিরতা ছিল না দিদি।”

“না তা ছিল না কিন্তু ছদ্মনি অশেখা করলে চলতে পারত তো? দ্বিভূতা যে ছিল না এমন কথা মনে

করি না, ঠাকুরপো যত বড়ই অমায়ুষ হোক আমার বিশ্বাস অন্তরে তার এখনও আমার প্রতি এতটু ভক্তি, শ্রদ্ধা, কাজ আছে।”

আর আমার দুটি কন্যা আমি তার কাছে মৌদে বলে আমার কথা হয় তো রাখতেন। দোষ সব আমার, যদি না এ কদিন বাইরে থাকতুম, কেন সেদিন পুরুষপাড়ে তার কাছে লুকুতে গেলুম, আমি তাকে দেখেও

চূপ করে গেলুম।”

মলিন হাসি হাসিয়া শ্রুৎতা বলিল, “তুমি

নিকট প্রাণের জটিল সখীর কন্ডার বিবাহে গিয়া তিন দিন পরে করিয়া দ্বাশিয়া কুন্তলা স্বল্প ধারের তালা খুলিতে গুলিতে অধুকার ব্যস্তের স্থানিট নব শুনিয়া যাব-পর নাই বিমিত্তা হইলেন। তিন দিনের মধ্যে কেন যে হঠাৎ প্রাণখানি কোলাহল-বুধিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা তিনি ভাবিয়াই পাইলেন না। কি-প্রহতে গৃহের কর্ম সমাপন করিয়া জমিদারের বাটার অভিমুখে চলিলেন, যদিও তাহার হাইবার ইচ্ছা—আদৌ ছিল না, কিন্তু না গিয়া উপায় ছিল না, কারণ জিতেনের মর্কদ্দমার মাত্র ৭৫ দিন অবশিষ্ট। অন্তমকভাবে ধীরে ধীরে জমিদার-তবনে প্রবেশ করিলেন। কি এক অব্যর্থ ব্যাপার তাহার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, কোন কিছু দেখিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না, না হইলে কয়েক দিবসের মধ্যে যে বৃহৎ পরিবর্তন ঘটনাছে তাহা তাহার চক্ষুকে প্রত্যক্ষিত করিতে পারিত না। লৌহ ফটকের দুইদ্বারে বাজকরণ বাজঘর হস্তে বসিয়া গিয়াছিল,—প্রাসাদের বালক-বালিকা, বৃক-বৃত্তী, বৃক-বৃদ্ধার অন্তর-বাহির ভরিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ চমকিত হইয়া বিষমভরে কুন্তলা দেখিলেন, মাত্র তিন দিবসের মধ্যে বহু কালের কালো দেয়ালগুলো সাদা ধূবনে হইয়া উঠিয়াছে—পরিদ্রার পরিচ্ছন্ন অট্টালিকা-প্রাসাদের জায় শোভা পাইতেছে। তিনি ভাবিয়া পাইতেছিলেন না কোন মাদারাবীর কৃষ্ণ শূর্ণে এত শীঘ্র এমন পরিবর্তন সম্ভবপর হইল। তাহাকে একান্তে লইয়া গিয়া ইলা বলিল, “দাদা বিয়ে করেছেন বৌ দেখে চল বৌদি। আজ বৌ-ভাত।”

কুন্তলা অবাক-বিশ্ময়ে ইলার কথা শুনিবামাত্র অঙ্গল দ্রুতত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।



তো কিছু লুকাও নি দিদি তোমার এ চুপ করে থাকই যে ইঙ্গিতে আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছিল।”

কুন্তলার সমস্ত মুখের পানে চাহিয়া হুলেখা পুনরাবলম্বিত, “কেন তুমি তুল বৃদ্ধ দিদি, কেন তুমি বলছ না যে আজ তোমার বোন হ’বার অধিকার পেয়ে, সতি আমি ধজ, কৃতার্থ হয়েছি, হাসিতত্ত্ব পায়ের ধূলা দাও, আশীর্বাদ কর দিদি যেন তোমার পাশে ঠাঁড়িয়ে থাকতে পারি—আর তোমার বোন হ’বার দাবী যেন কোনদিন হারিয়ে না বসি।” লেখা কুন্তলার পায়ের কাছে কুঁকিয়া পড়িল। হই বাগ্ন বাহুর ফুটনীর মধ্যে টানিয়া কুন্তলা কি বলিতে চাহিয়া “কিন্তু জমিদারকে দ্বার-সুরিদানে পাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া উত্তর সরিয়া দাড়াইল।

হাসিয়া রমেন বলিল, “এ সময়ে এখানে এসে ভাল করি নি।”

শ্রিতহাস্তে কুন্তলা বলিল “তোমার ভেঁকে পাঠিয়ে তুলেই গেলাম—অত্ন ঘরে চল তোমার বিশেষ করে কিছু বলবার আছে।”

“তার কি এমন দরকার আছে বোঁঠান।” কথাটা বলিতে না বলিতে ইলা হুলেখাকে লইয়া সরিয়া গেল। কুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল, “জিতেনের মোদদর কি হ’ল ঠাকুরপো?”

অক্ল ভাবে রমেন বলিল, “তার আমি কি জানি?”

“তুমি জান না তবে কে জানে?”

বাত্তভাবে রমেন বলিল, “এ সব কথা বিনয় জানে, শুনেছি সেই এক অকদম্ব প্রণাম সাক্ষী।”

“নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপাতে একটুও লজ্জা করছে না?”

বিভ্রণ করিয়া রমেন বলিল, “লেকচার দেবার জন্তে ভেঁকেই জানলে আসিতুম না, তাই তোমার দোষ, এই লজ্জা না তোমার উপর রাগ করি।”

দৃঢ়কণ্ঠে কুন্তলা বলিল, “দাড়াও যেও না, যত বড় জমিদারির মালিক হও তুমি, যত বেশী ক্ষমতা থাক তোমার হাতে, কিন্তু ঈশ্বর বলে একজন কেউ আছে, যার কাছে একদিন সকলকে বিচারপ্রার্থী হ’য়ে দাড়াতে হ’বে। তাঁর

সলা-জাজ্ঞত চকু দিয়ে সবই দেখেন—এ কথা ভুলে যেও না, সব জেনে শুনেও নির্দোষীর প্রাণ নিও না।”

“নিখোই যে বলছি এই বা জানলে কি করে?”

“আমি সব জানি, সব শুনেছি, শিবানীর অপহারককেও জানি, সে এখন কোথায় আছে জানি, আরও অনেক জানি ঠাকুরপো, সব জেনেও আর্জ তুমি নিজের দ্বার ভাইকে, একমাত্র সহোদরকে, বিনাযোযে ফাঁসি কাটে তুলে দিতে বাছ আর আর—।”

“না, না তুমি চুপ করো বৌদি আমার কমা কর—আর একটা কথা বল এ কথা কি সত্যি যে, সে নতুন বোর মার পেয়েছে তাই?”

“হ্যাঁ সত্যিই সে লেখার আপন ভাই।” অজিত রমেন মন্তক তুলিতে পারিল না।

“ওগো কি জানে সব?”

“না এ কথা বোঝে হয় জানে না—যে তারই রানী দেবতা নিজের পাপ তার ভাইয়ের মাথায় তুলে দিয়ে তাকে ফাঁসি—।”

“চুপ কর বৌদি এখন আমার কি করতে হ’বে শুধু সেইটুকু বলে দাও।”

“তাকে বেকসুর খায়াস দিয়ে দাও।”

“কিন্তু তা হ’লে যে তার পরিবারকে আমাকে ফাঁসীকাটে তুলতে হ’বে—বৌদি সব প্রকাশ হ’য়ে পড়বে যে।”

একটু ভাবিয়া কুন্তলা বলিল, “এই পাণ্ডা বিনয়কে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করে দাও। পুরুষ তুমি, তোমাকে আর কি উদ্দেশ্য দেব, তোমার উকীলদের পরামর্শ নিয়ে বা ভাল হয় টিক করো; আর একটা কথা শিবানী,—হ্যাঁ তাকে—তার মায়ের ঘরে পাঠিয়ে দাও, আমি কথা দিচ্ছি সে কিছু প্রকাশ করবে না।”

অপ্রতিভ রমেন দ্বারে দ্বারে বলিল, “কিন্তু সে বোঝে হয় যেতে চাইবে না।”

“কে শিবানী নিয়ে?”

“কি বলছ ঠাকুরপো তুমি?”

“টিক বলছি বৌদি বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়ে দেখে এস।”

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কুন্তলা বলিল, “সে যা হয় হ’বে তুমি কিন্তু কথা দাও ঠাকুরপো।”

“আমার কথায় বিশ্বাস করবে তুমি?”

“পরবো ঠাকুরপো।”

“তবে কথা দিখি: যাতে জিতেনবাবু নির্দোষী প্রণাম হ’রে খালাস পান তা করবই।”

“বাবার আগে আর একটা কথা বলে বাই, বিনয়কে তুমি চেন না, তার অন্তর নয় অবস্থার দেখতে পাও নি, তাই জান না সে কি ভীষণ প্রকৃতির শিশু, তার অসাধা কিছু নেই, লেখার ভাই যে জিতেন, সে জানত তবু কিছু বলে নি।”

“সে জানত?”

“হ্যাঁ, তাই, তুমি জান না যে জিতেনকে কত বেশী স্নেহ করে, কি ভীষণ সে বিশ্বাস।”

“জিতেনবাবু সঙ্গে বিনয়ের শত্রুতা বৃদ্ধি আশংকার?”

“মোটেরে নয়, জিতেন বোধ হয় তাকে আগে কোন দিন দেখেও নি।”

“তবে?” ইয়ালি ছাড় বৌদি, পরিহার করে বলে ফেলি না কিছু।

“সে কথা যে বলবার নয় ঠাকুরপো।”

“কেন?”

“এই ‘কেন’র উত্তর দেওয়াই তো শত্রু ভাই।”

অত্যন্ত বিম্বিতভাবে ধৈর্যশালা বৌদির মুখের দিকে সে বাগ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

“তবে বাই ঠাকুরপো।”

“বেও না,—তবে না বা বৌদি।”

অশ্রদ্ধ হইয়া কুন্তলা তাহার মুখের দিকে চাহিল।

“বিয়ের কথা তোমায় বলি নি, ডাকি নি বলে ভ্রম হয় নি একটু?”

শান্তকণ্ঠে কুন্তলা বলিল, “না।”

“কিন্তু কেন হয় নি?”

হাসিয়া কুন্তলা বলিল, “আমাকে জানাবার যে তোমার উদ্যম ছিল না, এ কথা তোমার চেও আমি বৃদ্ধি ভাল—

আমাকে জানালে কি এ বিয়ে হ’তে পারত?”

“তবে বাবার আগে আরও একটা কথা বলে যেতে চাই—

‘যে অসুখ রমণীরকে আজ পত্রীতে বরণ করবার অধিকার পেয়েছে, ছেনো তোমার প্রকৃতি জেনেওনি যেহেতু

তোমাকে বরণ করেছে—স্বাধরা হ’য়েছে। যে বংশে তুমি জন্মেছ—যে বংশে তোমার স্বর্গীয় দাদা জন্মেছেন—সে বংশের দুখ যাতে উদ্ভল হয়—এই প্রেমময়ী ভাগ্যপাত্রা রমণীর মর্দ্যাদা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে—তাঁর চেষ্টা করো ভাই। জগদানন্দ তোমাকে বল দেবেন—পত্নীর নির্দল প্রেম তোমাকে সত্যের পথে চালিত করবে।”

রমেনের ইচ্ছা করিতে লাগিল যে বোড়িয়া গিয়া এই মহিমাময়ী রমণীর চরণে দুটাঁইরা পড়িয়া সকল অপরাধ, সব শত্রুতার শেষ করিয়া গর; কিন্তু আত্মাভিমান আশিয়া উহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

অন্ততাপানন ভুবানলের তার রমেনের হৃদয়ে দিকি দিকি জ্বলিতে লাগিল।

আঠার

কজা ও কামাতাকে পাঠাতে তুলিয়া দিয়া ব্যক্তি, মর্দ্যাহত ভক্তারবাবু সেই যে শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, অত্ন ছই দিগম বাবৎ আর উঠেন নাই, বৃদ্ধ কামাউতার এবং হানৌর ডাক্তারের শত অহনর-বিনয় সন্তোষ তিনি একটু বলপূর্ণও করেন নাই। তীতচকিত ডাক্তার স্থপীকৃত টাকান্তাকে অতুলি সন্তোষে কামা ডাক্তারকে দেখাইয়া উহার দ্বারা বাধ্যতে জিতেনের তবির ভাল করিয়া হয়, তাহারই অভাস মাত্র দিয়াছিলেন।

এই প্রভুত্ব বৃদ্ধ প্রভুর অন্তর-বাতনা সম্যকরূপে বৃদ্ধিতে পারিয়া টাকা গুলি উহার দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া, জিতেনের জন্ম বংশাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। এ টাকা, উহার একমাত্র আদারী কজা-বিক্রয়ের অর্থ ভাবিয়া উহার দিকে চাহিতে অসহায় পিতার সাহস হইতেছিল না।

ডাক্তারের মনে-পড়িল কত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সহধর্মিণীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে-দেটাকে মাছুর করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তার পর সত্যীশাশ্রী স্ত্রীকে বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রাইন হইতে হইল, স্বপ্ন-মুহুর সন্ধিকণে আশিয়া পুরুষে দাঁড়াইতে হইল; অবশিষ্ট রহিল মাত্র উহার একমাত্র বেহের করণ। তিনি পরম আগ্রহে উৎসাহে জীবনের আশ্রয় ভাবিয়া সবলো চাপিয়া ধরিল, সন্দেহ, যকল কামাতা চাকিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভোক্তারবীর ভ্রায় কি এ



হইয়া গেল। প্রিয়দর্শন চরিত্রবান্ আমাতার পরিবর্তে, এক কুলশ্রম, চরিত্রহীন মাতাল আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিল—অর্থাৎ পরিবর্তে কতকৈ বিকৃত করিয়া আজ তিনি রিক্তস্বর্গপাশ্বে। আজ চিত্তা করিবার বল পর্যাপ্ত তাঁর নাই, কিন্তু কি এ করিয়াছেন তিনি শীঘ্র কাল কত্কার সৌন্দর্য্য প্রীতির আহার যোগাইয়া শেষ মুহুর্তে কোন গভীর দুর্গন্ধপূর্ণ কক্ষের মধ্যে উঠাকে চেষ্টা করিয়াছেন। উহার সৌন্দর্য্য-সুখার খোরাক যোগাইবে কে? কল্যাকার, হৃদয়স্তম্ভ লজ্জিত গম্ভীর ভবিষ্যৎ? আর ডাক্তার ভাবিতে পারিতেন কিনে না—তিনি কাতরভাবে ভগবানের নিকট চাহিলেন—সবই যখন কাড়িয়া লইয়াছে তখন এইটুকু নাও প্রভু, চিত্তা শক্তি, হ্যাঁ ঐটাকেও কাড়িয়া লইয়া রিক্ত, অসিঙ্গ ও অস্বত্থ জীবনের শেষ করিয়া দাও প্রভু—মৃত্যু দাও, মৃত্যু দাও। ভাবনার, চিন্তার, অন্তরিক্ত আত্মনির্দোষে ডাক্তারের ভগ্ন-স্বাস্থ্য আর সহ্য করিতে পারিল না তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

কম্পাউণ্ডার বাত হইয়া ডাক্তার আনিলেন কিন্তু ঔষধ সেবন করাইতে পারিলেন না। কেমন করিয়া তিনি কত বিকৃতের অর্থে ঔষধ সেবন করিলেন। ডাক্তার সেদিন গুস্তার মুখে বলিয়া গেলেন অবস্থা খারাপ, ঔষধ বা চিকিৎসার হইবে না শুক্রবাত প্রয়োজন। অতঃকর্তে বাইবার মিন কিছু হইবে একলা রাখিয়া কম্পাউণ্ডার যান কেমন করিয়া। একটা টিকা গাড়ী ঘারে আসিয়া ঠাঁড়াইতে কম্পাউণ্ডার উদ্বিগ্ন মুখে ঘারে আসিয়া ঠাঁড়াইয়া দেখিলেন থান পরিহিতা, হৃদয়ী স্বভাবী শার্পরী দেববাণীর ছায় গাড়ী হইতে নামিয়া মুহুর্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা এখন কেমন আছেন?”

“ভাল নয় মা আপনি কি নিরাশ-গী থেকে এসেছেন?”  
“হ্যাঁ কিন্তু লেগা আসতে পারল না। এ অস্থিরের কথা শুনেও এসে না।”  
“কিন্তু আপনি যে ভুলে যাচ্ছেন তার মতান্তরে এখন এসে যায় না।”

বুদ্ধ নীরব রহিলেন।

রমণী বলিলেন, “আপনি কোঁটে বান, আমি বাবার কাছে বসছি; তাহির সব চিকিৎসা হ'য়ে গেছে কেবলার সময়

জিতেনকে বেশ করে সব কথা বুঝিয়ে বলবেন নইলে হঠাৎ এ অবস্থার একে দেখলে সে হয় তো মাথাগাতে পারবেন না। তা হ'লে বাবার রোগ আরো বেড়ে যাবে।”  
“তার যে ছাড়বার সম্ভাবনা নেই শুনিছা মা। ও তারকের সমস্ত ব্যক্তির মাফা দিবেন, ভবিষ্যৎ না কি পেছনে আছে।”

সাক্ষেপে কুন্তলা বলিল, “আপনি ভাববেন না কিছু, যা শুনেছেন সব ভুল। আজই নির্দোষ সবাত হ'বে—জিতেন-ভাই বেকসুর খালাস পাবে।” উহার কথার ভিতর এমন কি ছিল কে জানে বুদ্ধ অসহ্যে ক্রোধিত চিত্তে কথাগুলো বিবাক্য করিয়া লইলেন।

সন্ধ্যাবেলা তিনি গুনগার বলিলেন, “তুমি তা হ'লে হাত-মুখ ধুয়ে একটু গিরিয়ে নাও কোঁর্টে বাবার দেবী আছে।”  
“আমার ভক্ত ভাববেন না একটুও। তা হ'লে একটা ট্যাগি করেই আনবেন, যাতে শীঘ্রগীর ফিরতে পারবেন।”

“বাই, বুকের মালিসের ওণ্ডু এই শেলেক রইল।”  
ব্যথিত কুন্তলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল “বুকে মালিস কেন?”

“নিউমোনিয়া হয়েছে যে কুস্তার।”

উৎক্ষেপে বিদায় দিয়া কুন্তলা মাগবনে ডাক্তারের শিরে আসিয়া বলিল। সন্ধ্যাপরে লগাট স্পর্শ করিয়া জ্বরে তাপ দেখিয়া ভীত হইল। নিশ্চলে উঠিয়া কুন্তলা গৃহের ইতস্ততঃ বিকম্প বস্তন্তা বধ্যস্থানে শুছাইয়া রাখিয়া ঔষধের শিশি-মাস স্বেদ্যামত একটা টিপয়ে রাখিয়া টেবিলের উপর আত্রে পতিত চাবির সিং তুলিয়া অঙ্গে রাখিল। কাঙ্ক্ষণা বধ্যাসম্বত ক্ষিপ্ততার সহিত সারিয়া ডাক্তারের শিরের এইবার নিশ্চলে বসিয়া পড়িল। বহুকাল পরে বরণের সহিত ঘোঁরা আসিয়া গৃহঘরে থামিতে কুন্তলা পম্পিত বক্ষে ব্যাকুল দৃষ্টিতে বার প্রান্তে চাহিল, কিন্তু জিতেনের বিবর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতে তাহার হৃদয় আত্মনিতে ভরিয়া গেল—মস্তক নত করিয়া লইল। একটা সম্ভ্রামণ পর্যাপ্ত করিতে পারিল না। জিতেন পিতার মধ্য-পার্শ্বে স্থিতি পড়িতে কুন্তলার সম্ভ্রা ফিরিয়া আসিল, উহাকে আকর্ষণ করিয়া মৃত্তরে বলিল, “চুপ কথা বলো না।”

জিতেন কি বলিতে চাহিল, হস্তবারা নিষেধ করিয়া কুন্তলা বাহিরে বাইতে ইঙ্গিত করিল। উহাদের বাহিরে আসিতে দেখিয়া কম্পাউণ্ডার বলিল, “মা সেই একভাবে বসিয়া আছে, কাপড় পর্যাপ্ত ছাড় নি? আমি ততক্ষণ বসছি তুমি ততক্ষণ হাতে মুখ জল দিয়ে এস।”

“তার দরকার নেই, কতদিন আপনি পরিশ্রম করছেন, এখন গিরে একটু বিশ্রাম করুন। আমি রান্নার উত্তোগ করি।”

“তা হ'লে কুস্তার কাছে কে বসবে মা?”

“জিতেন।”

বুদ্ধ কম্পাউণ্ডার চলিয়া গেলে জিতেন বলিল, “আমার তবে বাইরে ডাকলে কেন?”

“হঠাৎ তোমার দেখলে উত্তেজনার হার্টফেল করতে পারে, আগে তোমার আসবার কথা বলি, তার পর যেও জিতেনে।”

“না রিমি কিছু বলবার দরকার নেই সব শুনেছি তাইতে আসবার দেবী হলো, কিন্তু একটা কথার এখনও বীমাশা হয় নি, তুমি থাকতে এ বিষয়ে কেমন করে হলো?”  
কুন্তলা সাক্ষেপে সকল বলিয়া অবশেষে বলিল, “আমার অপরাধের শাস্তি পূর্ণাবিভে নেই জিতেন—ভাই আজও তা মইতে পারছি, আবার নিরঞ্জন মত তোমাদের সামনে—”

“চুপ করো তুমি, অনর্থক নিজকে অপরাধী ভেবে কষ্ট পেও না, মিথ্যে করে আমার তুমি ধাঁক দিতে পারবে না। তোমার যে অনেক দিন আমি চিনে নিয়েছি।” এমন সময় ডাক্তার কি বলিয়া উঠিলেন। বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া কুন্তলা তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বলিল।  
এবার ডাক্তার বলিলেন, “কে আমার লেগা ফিরে এলি মা?”  
এমন আশায় উৎকর্ষ রোগীকে নিরাশায় পরিণত করিতে কুন্তলার প্রবৃত্তি হইল না, কাজেই তিনি কোনও রূপ উত্তর না দিয়া নীরবে রহিলেন।

“না লেগা, মা আমার।”  
“বাবা বাবা একটু ছুপ থাকে কি?”  
“তুমি লেগা নও?” নিরাশায় অবসাদে ডাক্তার নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলেন।

“বাবা থাও একটু ছুপ।”  
“আবার বাবা, কে তুমি?”  
“আমি, আমি বাবা, তোমার বড় মেয়ে কুন্তলা।”  
“এসেছা মা, কি'ন্ত লেগা?”  
কি একটু বাব্বা কুন্তলা বলিল,—“তাকে অস্থিরের কথা

বলা হয় নি বাবা।”  
“বল নি, ও তাই।” তুস্তির নিঃশব্দ ফেলিয়া ডাক্তার গুনগার বলিলেন, “ওনলে সে-বে কেঁদে-কেটে অস্থির হ'ত নয় মা?”

“হ্যাঁ বাবা সেই জন্তে না জিতেন বাব্বল তাকে জানাতে।”

“জিতেন? জিতেন?” ডাক্তার উত্তীয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

“ও কি এমন করছ কেন বাবা তুমি?”

“জিতেন আমাদের জিতেন, তবে কি আমি স্বপ্ন দেখছি মা?”

“তাই হ'বে বাবা।”

“কে তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় গেল জিতেন?”

“এই যে ডাকি বাবা।” পদতলে জিতেন আসিয়া বসিতে ডাক্তার আবার চপল হইয়া উঠিলেন দেখিয়া কুন্তলা বলিল, “তুমি উঠতে যেও না বাবা।”  
“কই মা আমি উঠি নি, জিতেন একবার সামনে এসে বসো, কতদিন যেন দেখি নি।”

• • •  
মাস যানেক তুগিয়া ডাক্তার আরোগ্য হইয়া উঠিলে, জিতেন একদিন স্কুটলাকে বলিল, “জান দিদি, যখন এর শিকিভাগ টাকা পেলে কত অভাব মোচন হ'ত তখন নয়, এখন সব যখন গেল, তখন এল কি না একরাশ টাকা।”  
ভান্ডের কেন পাগ্লিতে পাগ্লিতে কুন্তলা বলিল, “টাকা কোথায় পেয়েছ?”

“সে এক ভারী মজা। মার দূর স্পর্শকে বড় বোন ছিলেন তিনি বাগ-বিধবা তিনি শা'কি মাকে বলেছিলেন জিতেনকে আমি নেবো, তাই বরণের সময় আমার নামে উইল করে গেছেন।”



“কত টাকা পেলে তা হ'লে?”

“সে অনেক দিদি মন্ত জমিদারী—”

“ভালই হলো, বাবার বাবুপরিবর্তনের দরকার ছিল, আমার বা ভাবনা হ'তছিল, যাক্ আর দেবী শ্রীয়ে না ভাই বত শীগদীর পার তাকে নিয়ে যাও।”

“নিয়ে যাও মানে?”

“নিয়ে বাবে তার আবার মানে কি।”

“তুমি যাবে না বুঝি?”

“আমি কি করে যাব ভাই?”

“তবে থাক।”

কুন্তলা হাসিয়া বলিল, “যাক্ কি?”

“তোমার মত প্রশ্ন ঢেলে বর করতে পারব কি? সেবা করতে পারব? যে কিছু সেরেছেন তাও যে নষ্ট হ'য়ে যাবে দিদি।”

“কিন্তু আমার যে এখনও মন্ত এক কাজ বাকি।”

“বেশ তো সেবে ফেল।”

“হর তো তাতে মাস বানেক লাগতে পারে।”

“তো ঈদী একা আমি যেতে পারব না তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।”

“একবার তাকে—”

“বল দিদি খেঁচ না।”

“না কিছু নয়।”

“আশ্চর্য—এখনও আমাকে পর ভাব? এখনও সচেতন?”

“লোভিলুম, নরেনকে যদি একবার ডাকিয়ে দিতে পার।”

“এই কথা, এর জন্তে এত সেরেচ, এত ইতস্ততঃ করছিলে কেনে দিদি? সব সময়ে মনে রেখো তোমার একটু আজ্ঞা পালন করতে পারলে, হিন্দুরা মধ্যে আমার চেয়ে হুদী কেউ নিজেকে ভাজতে হয় তো না ও পারে।” ভাল কথা সে দিন পেছলুম লেখাকে দেখতে; আশ্চর্য তার পরিবর্তন হয়েছে। এত শীগদীর যে মাছেরে এত বড় পরিবর্তন হ'তে পারে চোখে না দেখলে হয় তো আমি-বিবাস করতুম না।

“ওর কথা বলা না জ্বিতেন, বড় ব্যথা পাই।”

“এখনও এ চরুলাতা, কিন্তু এ যে তোমার মানদ্য না দিদি।”

কুন্তলা কথা কহিতে পারিল না।

উনিশ

কাল্পেন নরেন দান খেলিতে গিয়াছিল। খেলা হইতেছিল একদল ভারতবাসী এবং অপর দল ইংরেজ। দুই দিকেই দর্শকের অভাব ছিল না, গড়ের মাঠের ধানিকটী অংশ নানা বেশধারী দর্শকে ভরিয়া গিয়াছিল। খেলার বধন ভারতীয় দলের জয় হইল এবং ভারতীয় দর্শকগণ বধন বিকট চাঁৎকারে জয়ের উল্লাসটুকু উপভোগ করিতে বাস্তব, তখন নরেন প্রকৃত পূর্ণভরা বেগে জয়ধারী দিকে চাহিতে গিয়া মানে হইয়া উঠিল, দর্শক দিগের মধ্যে দুই উজ্জ্বল চকুর—

“কিন্তু পতিত হইবামাত্র সে আপনাকে জনতার মধ্যে ঢুকিতে চাহিল। কিন্তু তাহার মনোভাব সম্বন্ধে

ঐ বাস্তব অগোচর গ্রহণ না, তাই মাঠের বাহিরে আসিয়া নরেন বধন কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ততা অহুতব করিতেছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জ্বিতেন উহার পথ আঙুলিয়া ধাঁড়াইয়া বলিল, “মাদ্ করো নরেন, দিদির হুকুম তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে

যাবার।”

“কিন্তু এখন তো পারব না।”

“বেশ তবে এই কথাই তাকে বলি গিয়ে।

“তুমি কি আজকেই যাবে?”

“তিনি যে কলকাতায় আছেন।”

“বৌদি কলকাতার?”

“আমি তবে যাই, সময় মত এস এসুন।”

“একটু ধাঁড়াও তিনি কোথায়, কার কাছে আছেন?”

“আমাদের বাগান, কিন্তু সে খাগার আমার নেই—

নরেন বাসার টিকানা লিখে নাও।”

নরেন চমকিত হইয়া উঠিলেন, জ্বিতেন পাগল হইয়াছে

না কি, এমন প্রাণদ্রব্য জটিলিকা পরিত্যাগ করিল কিম্বা

জড়। অসহিষ্ণু নরেন জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা ঐ বাড়ী

ছেড়ে নতুন বাড়ী তৈরি করেছ বুঝি?”

শান্তকণ্ঠে জ্বিতেন কহিল, “ভাড়াতে বাড়ীতে আছি

ভাই, বাড়ী পুড়ে গেছে কি না।”

আপন মনে নরেন বলিল, “বাড়ী পুড়ে গেছে আর—আর

না একদল জানবার? অধিকার তো আর নাই সব

যে শেষ করিয়া দিয়াই আসিয়াছি, তবে আজ এখানে এ

১৪৮

সাহিত্য

১৪৯

কিম্বা প্রেরণা, কিম্বা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল—  
ছোট একটা কথায়।”

নিজের ওপর নরেনের বিরক্ত হইয়া উঠিল অস্ততঃ দূর হইতে সংবাদ ও লইতে পারিত।

অল্পকণে পরে জ্বিতেন বলিল, “টিকানাটা লিখে নাও নরেন।”

“হ্যাঁ নি, না—না আমি যাব তোমার সঙ্গে।”

সকল পলির মধ্যে জ্বিতেন বধন নরেনকে লইয়া কুন্ত এক গৃহঘরে কলকাতা করিল, নরেনের তখন সত্যই বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিল, এত শার কল্পে কল্পনাভীত ঘটনা সত্যে পরিণত হইতে পারে ইহা উহার বুদ্ধির অধ্যম।

কুন্তলা দ্বার উন্মোচন করিয়া লগ্ন পণ্যার নরেনকে ভিতরে আহ্বান করিলেন, “এস ভাই এস।”

নরেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাহা হইলে কোন কিছুই কৈফিয়ত দিতে হইবে না, আশায়ে উগার বৃক্কের গুহুভার কিঞ্চিৎ শাশব হইল।

“এস ঠাকুরপো ধাঁড়িয়ে থেক না, অহা তোমার বাবা মারা গেছেন সুনন্দম, তাই বাইরে ঘুরে ঘুরে কি বিশ্রী চেহারা হই না হ'য়ে গেছে, এখন বাড়ীতেই আছ বুঝি?”

“বাবার মৃত্যুর পর দাদা আমার আলাদা করে দিয়েছেন, এখন অজ বাড়ীতে থাকি।”

“বিশ্বয় ঠিক মত পেরেছ তো?”

“হ্যাঁ, অর্ধেক পেয়েছি, কিন্তু তুমি কেমন করে এখানে এলে বৌদি কিছু যে বুঝতে পারছি না।”

মুহ হাসিয়া কুন্তলা বলিল, “নন্দুর করা, দীর্ঘের দীর্ঘে সব শুনবে।”

“না মদুর করতে পারছি না বৌঠান।”

“এতদিন! কিন্তু—” কুন্তলা খামিল, নরেন কজ্জার মুখ ফিরাইল।

“হ্যাঁ শোন তবে ঠাকুরপো সে কিন্তু মন্ত কাহিনী তোমার মধ্যে থাকবে কি?”

নরেন নীরবেই রহিল—দম্ভ্য-কর্তৃক শিবানীর অপহরণ হইতে লেগার বিবাহ পর্যন্ত সকল কথা কুন্তলা দীর্ঘের দীর্ঘে বলিল।

সহসা কুন্তলার পরদৃশ্য বেষ্টন করিয়া নরেন কাঁদিয়া বলিল, “কমা—কমা করো বৌঠান।”

“তোমার ওপর রাগ যে কোন দিন করতে পারি না ভাই।”

“তা জানি কিন্তু—”

“ধাক্কাও ও সবের কোন দরকার নেই, তবে বাবা বা জ্বিতেনের কাছে ক্ষমা চাইতে যেও না, মাছুর বা পাবে না তাঁদেরও সেটা পারা সম্ভব হয় তো নাও হ'তে পারে। কিন্তু একটু তোমার বন্ধ, জানি এ এখন—”

বাধা দিয়া নরেন বলিল, “খেয়াল না, বল বৌদি যদি তা ত বুকের ভারী পাখরখানা নেবে না যাক্ অস্ততঃ একটু সরে যাব।”

“শোন ঠাকুরপো ধোয়ার বশে যে অমূল্য রত্ন হারিয়েছে তার কতি পূরণ হ'বে না কোনদিন, কিন্তু তোমার এমন বিবাহী হ'য়ে থাকা চলবে না।”

“কি করতে হ'বে বৌঠান?”

“আমার একটা কথা রাখবে বল?”

“আজ তুমি অহরেখা কেন করছ?”

“বল রাখবে?”

“তোমার আজ্ঞা প্রাণ দিয়েও পালন করবো বৌঠান।”

“যদি সে অহরেখা রাখা তোমার কাছে শরৎ হয়?”

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া নরেন বলিল, “তবুও।”

“তোমার বিয়ে করতে হ'বে।”

নরেন স্তম্ভভায়ে বসিয়া রহিল। হাসিয়া কুন্তলা কহিল

“এই না তুমি দিদির জন্ত প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জিত চাইছিলে?”

“জোর করিয়া হাসিয়া নরেন বলিল, “জান না তুমি

তোমার এই ছোট ভাইটো তোমার কত ভালবাসে,

তোমার জন্তে কি না করতে পারে? যে দিন হুকুম

করবে বিয়ে করবো। কিন্তু মেয়ে কি ঠিক হ'য়ে গেছে?”

“হ'য়েছে, তাকে তুমি জান।”

“আমি, আমি জানি? কে সে?”

“আমার নন্দম ইলা।”

হতবুদ্ধির ভাষা নরেন চাহিয়া রহিল।

জ্বিতেনকে ডাকিয়া কুন্তলা বলিল, “তবেছিলুম আমার



যেতে হয় তো দেবী হ'বে কিন্তু তা হ'বে না ভাই দিন  
পনেরোর মধ্যে আমার কাজ হ'য়ে থাকে।"

প্রকৃত চিত্রে জিতেন বলিল, "মাসীর দরখ যে গ্রাম  
পেরেছি বল তো একবার বুকে আসি।"

"বেশ বাও না।"

নরেনকে লক্ষ্য করিয়া জিতেন বলিল, "জান নরেন,  
কীকি দিয়ে মন্ত জমিদারী আর অনেক টাকা পেয়ে গেছি,  
কিন্তু টাকার জন্তে একদিন আমারে কি সর্বনাশই না  
হ'য়ে গেল।"

ব্যথায় জিতেনের গলা বুলিয়া আসিল। লক্ষ্যর ফোটে  
নরেনের বক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল।

কুন্তলা বলিল, "বাক, সেজ্ঞ হুংখ করা না ভাই।"

নরেন বলিল, "কিন্তু সে... জন্ম দোষ আমি জিতেন,  
মাছুষ যে কত সহজে কত বড় ভুল করে বসে, সে তো আমি  
বুঝি কিন্তু..."

"বাক্সে ও কথা, দিদি খাবার খরি থাকে নরেনকে  
দাও, ওকে মাঠ থেকে ধরেছিলাম এক কাপ চাও বেচারী  
থেতে পার নি।"

"জানি এত বড় অপরাধকে কেউ কোনদিন ক্ষমা  
করতে পারে না জিতেন, কিন্তু সে সময়ে আমার মনের  
অবস্থা..."

হাসিয়া জিতেন বলিল, "তবে কি এই মিথ্যেবাক্যেই সত্যি  
বলে মনে নিতে বল ভাই যে ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা না করা  
বড় গর্বের, বড় গৌরবের বিষয়। দিদির হাতে নব-  
উদ্যানে গড়ে তোলা নব-জীবনগ্রাণ্ড তোমার বন্ধকে  
এত হীন ভেব না নরেন।"

জিতেনের গলা কেঁটন করিয়া আবেগবদ্ধ কর্তে নরেন  
বলিল, "তবে কি আজ ও সমান..."

"তখনই ভালবাসি তোমার, শৈশবের সহোদরভৃত্য  
বড় ভূমি এমন সহজেই কি ভোলা যায় রে? এমন মাছুষ  
কি দেখতে পার ভূমি যার মধ্যে দেখে নেই, জীবনে ভুল  
করে নি একটাও।"

"কিন্তু তবুও অপরাধের লব-গুরু আছে তো?"

"তা ঠিক এমনও কি হ'তে পারে না যে, মাছুষ যখন  
ভুল করে তখন তাকেই সত্যি বলে ধীরে, তখন তার  
বিচার-বুদ্ধি নিয়ে থাকাই সম্ভব হ'তে পারে না কি? ভুলই  
খিঁচি আমরা না করতুম তবে হয়তো জগতে সুখী হুখী  
হতুম, হুংখ-বলে জগতে কিছুই থাকত না। আমার মতে  
ভুল করাই মানবের স্বভাব, তাই ভুলকেই সাফাৎ মেনে  
তাকেই বড় করে আবার নতুন ভুলের অবতারণা করে।"

মৃদুদৃষ্টিতে কুন্তলা বন্ধুরের মিলন দেখিতেছিল,  
হাসিয়া বলিল, "ভুল, ছুক সকলেরই হয়। ভূমিও একটা  
ভুল করে ফেল না জিতেন? নরেন রাজী হয়েচে, বেশ  
একদমে গুই ভাই বিয়ে করো, গলদের কীক পুরতে  
যেটুকু থাকি আছে তাও ভরে বাক।"

কথাটা শুনিয়া জিতেন এমনভাবে চমকিত হইয়া  
উঠিল যে, উহা নরেন ও কুন্তলার দৃষ্টিতে অনেকখানি  
বিষয় ফুটাইয়া তুলিল।

"অমত করো না ভাই, কাল থেকেই মেয়ে খুঁজতে লেগে  
মাই, কি বল?"

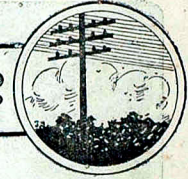
তীক্ষ্ণ কর্তে জিতেন বলিল, "সে পরে দেখা যাবে দিদি,  
তা হলে কালকেই যাই?"

"তাই যাও।"

ক্রমশঃ



## বিশ্ব-জগৎ



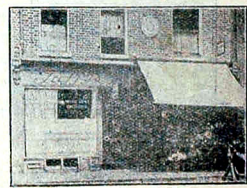
বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফেরাডেঃ—

মাইকেল ফেরাডের নাম জ্ঞানেন না এরূপ লোক খুব  
কমই আছে। ইনি একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ইহার  
কতকগুলি আবিষ্কারের পরিচয় আজ আমরা দিব।



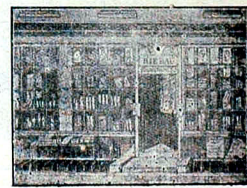
মাইকেল ফেরাডে

ইংরেজী ১৮৩০ সনে অর্থাৎ ঠিক একশত বৎসর পূর্বে  
ফেরাডে 'ইলেক্ট্রো-মেগনেটিক ইন্ডাকশান' আবিষ্কার  
করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে আজ 'রেডিও', 'টেলিফোন',  
'টেলিভিশন' প্রভৃতি সম্ভব হইয়াছে। 'আমরা তাঁহার  
কতকগুলি সহস্র-সংখ্যক পরীক্ষাকারীণ গবেষণার ভিত্তি  
সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম।



দপ্তর বাড়ী

যে বাড়ীর ছবিটা আমরা উপরে 'মিখাইল তাহাতে  
মাইকেল ফেরাডে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা-  
লাভ করিবার পূর্বে থাকিতেন। এখানে তিনি এক  
দপ্তরীয় 'এপ্রেন্টিস' ছিলেন।



'রীক' দপ্তরের দোকান

উপরের চিত্রটা রীক নামক রেওফোর্ড স্ট্রিটের একটা  
পুথকের দোকান। এইখানেই ফেরাডে কোন এক-এন্-

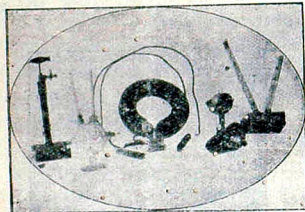


সাইক্লোপিডিয়া'র একটা প্রবন্ধ পড়িয়া 'তত্ত্ব-বিজ্ঞান'এর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হ'ন।



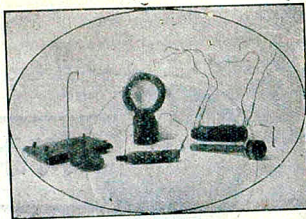
হর্স-শুইলেক্টো ম্যাগনেট

এই চিত্রটি ফেরাডের অমর আবিষ্কার 'হর্স-শুইলেক্টো-ম্যাগনেট'। ফেরাডের এই আবিষ্কারে জগতের বৈজ্ঞানিক-মহলে বিশেষ উপকার হইয়াছে।



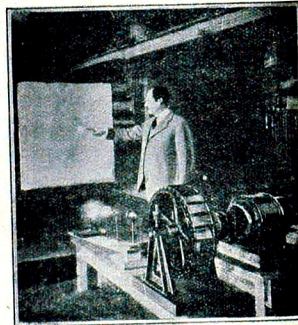
ফেরাডের একটা পরীক্ষা

নিম্নের ও তৎপরবর্তী চিত্রটি ফেরাডের ছোট পরীক্ষার চিত্র।



ফেরাডের আর একটা পরীক্ষা  
বেতার ও টেলিফোনে প্রতিক্রিয়া :-

কয়েকমাস পূর্বে বেতারে প্রতিক্রিয়া ওঠা-সম্বন্ধে আমরা অজবিত্তর আলোচনা করিয়াছি। ডাঃ ই, এফ, ডব্লিউ আলেকজান্ডারসন নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বচ দর দেশের



আলেকজান্ডারসন প্রতিক্রিয়া দেখাইতেছেন কোন দৃষ্ট, কথা কহিবার সময় অথবা গান বা নৃত্য করিবার সময় সমুদয় দৃষ্টপটে প্রতিক্রিয়া করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উপরের ছবিতে ডাঃ আলেকজান্ডারসন তাহার নিজ আবিষ্কৃত যন্ত্রের দ্বারা দৃষ্ট প্রতিক্রিয়া করিতেছেন এবং অল্পকালি মধ্যে তাহা দেখাইতেছেন।



টেলিফোনে বজ্রের চেহারা দেখাও সম্ভবিত সম্ভবপর হইয়াছে। একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক এই যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। উপরে চিত্রে কিরূপভাবে টেলিফোনে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দেখান হইতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধের হতাহত :-

বিগত মহাযুদ্ধে কত লোক যে প্রাণ দিয়াছে, আর কতই বা আহত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পৃথিবীর প্রায়

সকল দেশই ইহাতে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই যুদ্ধে যে, রাজ্যের বর্ত লোক হত ও আহত হয়, তাহার একটা মোটামুটি হিসাবের তালিকা নিয়ে দেওয়া গেল, অবশ্য ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের হিসাব ইহাতে নাই।—

দেশ	হত	আহত
ফ্রান্স	১৩,২৩,৩৮৮	১৪,৯০,০০০
বেলজিয়াম	৩৮,১৭২	৪৪,৬৮৫
ইটালী	৪,৩০,০০০	৯,৭৭,০০০
পোর্টুগাল	৭,২২২	১৩,৬০০
রুম্যানিয়া	৩,৩৫,৭০৬	প্রকাশিত নাই
সার্বিয়া	১,২৭,৩৫৫	১,৩৩,১৪০
ইউনাইটেড স্টেটস	১,১৫,৬০০	২,০৫,৬০০
জার্মানী	২,০৫,৭৬৬	৪২,০২,০২৮
অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী	১২,০০,০০০	৩৩,২০,০০০
বুলগেরিয়া	১,০১,২২৪	১৫,২৪,০০০
তুরস্ক	৩,০০,০০০	৫৫,৭০,০০০

## কৈকেয়ী

(নাটক)

প্যারামোহন সেনগুপ্ত

চিত্র-পরিচয়

পুরুষ

ধর্মাজিৎ

হুময়

সিদ্ধার্থ

দ্ব্যন্ত

ইষ্ট

বিষয়

বিশিষ্ট

কৈকেয়ীর ভ্রাতা

দশরথের সারথি ও মন্ত্রী

দশরথের মন্ত্রী

ঐ

ঐ

ঐ

দশরথের কুল-পুরোহিত।

বামদেব

জীবালী

দশরথ, রাম, লক্ষণ, ভারত, শত্রুঘ্ন, অবোধানাসিগণ,

হুময়ান, বিজয়ান।

নারী

উষ্মিলা

মাণ্ডবী

শতকীর্তি

কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী, সীতা, মন্দোদারী, বান্ধিনীগণ।

বশিষ্ঠের পুত্র

দশরথের পুরোহিত

লক্ষণের স্ত্রী

ভারতের স্ত্রী

শত্রুঘ্নের স্ত্রী

কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী, সীতা, মন্দোদারী, বান্ধিনীগণ।



প্রস্তাবনা

[ গান করিতে করিতে বৈভাণিকগণের প্রবেশ ]

গীত

রঘুকুলপুলক রঘুকুণ্ডলিক অম্বর-বিনাশক রাম হে।

নবনীত-কোমল কুলম-মুকুটোর পাপিজন-পাবক গ্রাম হে।

চারুচন্দ্র-মুখ,

মুগ্ধ হরদ-সুখ,

ধরণী সমান দীপ,

পারাবার-গভীর,

ভার্গবরাসক দয়াদ্রিতিকরণ-ধাম হে।

জয় জয় রাম

নয়নাভিরাশী,

দশরথ-অস্তিত্ব

উজলিয়া রক্তিম

ভাস্কর-সুন্দর বিভাসো নরবর অতুলগুণভাষিগ্রাম হে।

[ সকলের প্রস্থান ]

[ বশিষ্ঠ ও বামদেবের প্রবেশ ]

বশিষ্ঠ। বৎস,  
সুভবাচী শুনেছ নিশ্চয়—  
কাল প্রাতে  
রামচন্দ্র জন্মিবেন রাজ্যসংস্থান।বামদেব। শুনেছি জনক।  
অভিষেক-মঙ্গল্যের তরে  
আদেশ করুন  
কি করিতে হ'বে মোরে।বশিষ্ঠ। বৎস,  
জাযালি পঙ্কতি পুরোহিতে  
জানায় সংবাদ,  
করো অধ্বরাভন যথাবিধি।  
যজ্ঞযুগে সকলের করহ আহ্বান,—  
আমিও রাইব তাই।

বামদেব। যথা আজ্ঞা, দেব।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

প্রথম অঙ্ক

[ অধ্বরাভন-প্রাসাদের এক অংশ। গভীর রাত্রিকাল।  
শোভনরূপে কৈকেয়ী পদচারণা করিতেছেন। অপুরে দশরথ  
স্বপ্নের উপর হাহাকার করিতেছেন। ]

কৈকেয়ী।

ঠিক কথা,

মহারা বলেচে ঠিক।

ভরত আমার

সে কি কেহ নয়?

রাজ্য পাথে রাম

স্বপ্নী হ'বে কৌশল্যা মহিবি।

আর আমি?

আর ভরত আমার?

কোনো হুখে নাহি অধিকার?

হ'বে না তা,

কোনো মতে নয়।

আমার ভরত, আমার দলাল,

তারে রাজসিংহাসনে দেখে

জুড়াব নয়।

এ হ'তে আনন্দ নাহি আর,

কাম্য কিছু নাহি মোর।

এ পরম সুখ,

এ পরম সুখের সৌরভ

আমার আমার শুধু।

ভরত আমার রাজ্য,

আমি রাজমাতা—

এ যদি না ঘটিল, কৈকেয়ী, অগো তোর,

কথা জন্ম তবে।

সত্য কথা বলেছে মহারা—

কেন রাজ্য

ভরতে রাখিল দূরে আজ?

কেন রাম-অভিষেকে

ভরতে হ'ল না আনা?

অভিসন্ধি আছে এর পিছে।

দশরথ,

যুগেছি কৌশল তব—

পাছে আমি চাচি পূর্ণ বর,

পাছে চাচি ভরতের সুখ,

তাই এই কৌশল তোমার

কিন্তু, কেনো—

বার্ষ হ'বে জন্মিলাস তব।

দশরথ,

সত্য তব করাব সাধন।

ভেনো ছির,

কৈকেয়ীর পণ

অচল হিমালি সম;

এব তাহা

প্রভাতের স্বর্ণোদয় যথা।

[ দশরথ দীর্ঘ দীর্ঘ উঠিয়া কাতরভাবে কৈকেয়ীর দুই  
হাত ধরিলেন। ]

দশরথ। কৈকেয়ী, কৈকেয়ী, প্রিয়া,

কমা করো, করো কমা।

রাজরাণী তুমি,

জানো রাজকুলনীতি।

ইক্ষ্বাকু-বংশের ধারা—

জ্যেষ্ঠ-স্বত লভে সিংহাসন।

তুমিও তো কতবার বলেছ আমারে—

'ভরত যেমন প্রিয়

রাম মোর প্রিয় যে তেমনি।'

আজ তুমি হ'রো না বিশ্ব

গুণবান সে রামের 'পরে।

কি আশঙ্কা তব

তার কাছে?

কৈকেয়ী। মহারাজ,

সত্য তব করহ পালন।

ধার্মিক বলিয়ে

ধ্যাত ভূমি ভূমওলে।

দর্শ তব করহ রক্ষণ।

সত্য রক্ষা তরে

অলঙ্ক নৃপতি

নিজ চক্ষু উপাড়িয়া

ব্রাহ্মণেরে করেছিল দান।

শিবিরাজ নিজ বৈ হ'তে

মাগে কাটি

ভ্রমেন সিল উপহার,

দশরথ।

তব সত্যে করেনি বর্জন।

মনে রেখ তাহা।

( বিমূঢ় বিষয়ে ) এত নীচ,

এত ক্রুরমন, কৈকেয়ী মহিবি তুমি?

জান তুমি—

রাম হ'তে অধিক ধার্মিক

ভরত তোমার।

কোটা-ভক্ত রাজ্য কত

ল'বে না ভরত।

কি অধ্যাতি রাগে তোমার তরে!

কি বলিয়ে কৌশল্যা; স্বমিষ্টা,

আর পুরবাসী যত?

রাম বনে গেলে

অনাথা হ'বেন রীতা

বালিকা কোমলা,

পুত্রবধু তব।

আমি বাচিব না কণতরে

রামে দিগে বনে।

স্বামীহীনা হ'তে হবে তোমা।

বোম্ব, রাণী।

ভেবে দেখ—

কি কঠোর দুরবস্থা ঘটবে তোমার।

কৈকেয়ী। আমারে তো মহারাজ,

করিতে চাহিনি স্বপ্নী।

ভরতও তনয় তব;

তারেও তো স্বপ্নী করিবারে

বাসনা রাখিছ তব।

রাজ্য হ'তে দূর দেশে পাঠিয়ে তাহারে

প্রোপনে সাধিতে চাও

রাম-অভিষেক।

মহারাজ,

পণ তব, সত্য তব

করহ পালন।

দশরথ। অজ্ঞাযা, পাশিভা, কুহা

দুরদৃষ্ট মোর—



যরে এনেছিল তোরে বলহিতে রথকুল ।  
কুষ্ঠা নাহি তোর  
মান দিতে স্বামী-শিরে ?  
ভরভেগে ইজ্ঞা যদি—  
রাম বাক বনে,  
মৃত্যু হ'লে মোর  
শ্রেষ্ঠকৃত্য বনে নাহি করে দেখে ।  
হায়, হায়,  
হৃদগণ যারে নিত্য  
উপায়ে ভোজ্য দিতে আগ্রহে আকুল,  
সেই রাম

তিক্র ও কমলা কলমূলে  
যাপিবে জীবন ?  
রাজপুত্র বহন-বসন  
তৃণভূমি শয্যা তার ?  
বিক্র তোরে পাপিনী কৈকেয়ী,  
যেই জিহ্বা তোর  
এই থাক্য করে উচ্চারণ  
এখনও তা খণ্ড হ'য়ে পড়ে না মাটিতে !  
বিষ বাস,  
কিঞ্চিৎ কর আঙনে প্রবেশ,  
বাক্য তোর রাখিব না কত ।

( কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর কৈকেয়ীর চরণ স্পর্শ করিয়া )

কান্ত হ'ও,  
কান্ত হ'ও, কৈকেয়ী মহিলা,  
স্বামী হ'য়ে চরণ পরশি' তব  
করো কমা ।

কৈকেয়ী । ( সরিয়া গিয়া )

মহারাজ,  
অভ্যাস প্রার্থনা কর  
কৈকেয়ী না করে ।  
তব পূর্ণ রাধো ভূমি,  
চতু কর স্থির ।

দশরথ ।

কৈকেয়ী, কৈকেয়ী,  
মৃত্যু মোর কাম্য তোর ।

হে ধরণী অমৃতভিত্তীনা  
বিমূঢ়া, নির্দোষ,  
এখনও কেমনে  
বহন করিছ এই পাপ-পূর্ণা অজ্ঞায় প্রতিমা ?  
দীর্ঘ হও হে কল্যাণময়ী,  
প্রাণি' লও বন্ধে তব  
গরলপূরিতা এই সর্বনাশিনীকে  
কৈকেয়ী, কৈকেয়ী,  
বুধেচ্ছি বুধেচ্ছি—  
এ চবির তোর জন্মগত ;

মাতুরক সাধে  
লভেচ্ছিস পাপ বাধা ।  
পিতা তোর দায়িত্ব মহান অখণ্ডিত  
জানিতেন পক্ষীভাবা ।  
বিনি তাঁরে শিখলেন এই ভাষা  
নিবেধে আছিল তাঁর—  
কাহারও না জানাইতে ইহা,  
জানালে ঘটবে মৃত্যু ।  
মাতা তোর জানিত এ নিবেদ-বারতা ;  
সেই ভাষা শিখিবারে তব  
অজ্ঞার আগ্রহ তার এমন প্রবল  
বারংবার পীড়িল পিতারে তোর  
স্বামী মরে যদি  
কুষ্ঠা নাহি তব ।

কৈকেয়ী,  
সেই মাতৃস্নাতা তুই,  
তোর এ আগ্রহ বিস্ময়  
মাতৃযোগ্য তোর ।  
রাম, রাম, নয়নের মণি,  
তোরে দিতে হ'বে বনে !  
পারিব না, পারিবে না দশরথ কত !  
দৌবারিক, দৌবারিক,  
নিয়োগ এসো অগ্নি, তীক্ষ্ণ অগ্নি—  
খণ্ড খণ্ড করি আমি পাপ-জিহ্বা কৈকেয়ীর,  
সর্বজিহ্বা বিকলিঙ্গ—

ওই জিহ্বা, খণ্ড খণ্ড করি'  
খাওয়াই কুকুরে ! ( উদ্ভ্রান্তভাবে )  
কই তরবারি কই ?  
কি ? পণ ? সত্য ? শপথ আমার ?  
সে শপথ রাখিতে হইবে আজ !  
বিক্র বিক্র তোরে দশরথ  
রপাক্ষ কামান্দ্র নরপতি !  
দুগ্ধা-মারী-পদে উচ্চশির দিলি বিকাটা  
তুচ্ছ করি'

রত্ন-কুল-গৌরব-মহিমা ।  
না, না, অসম্ভব,  
অসম্ভব পালনীর সত্য এই ।  
কৈকেয়ী, কৈকেয়ী,  
কমা করো ।  
কমা, কমা কেন ?  
কর কাছের কমা ?  
কমা চাহে দশরথ !  
কমা চাহে দশরথ রাজকুলপতি !  
কমা চাহে পাপিনীর পদে !  
দণ্ডবতা আমি মহারাজ মানব-শাসক ।  
কৈকেয়ী, কৈকেয়ী,  
জীবন-সরণ তোর এই হস্তে মোর,  
জানিস নিশ্চয় ।  
দণ্ড দেবো, দণ্ডযোগ্য তুই !  
দৌবারিক !

কৈকেয়ী । পাপী নহ,  
দণ্ডনীয় নাহেক কৈকেয়ী, মহারাজ !  
সত্য মাগে সেই ।  
মাগে অসীকারের পূরণ ।

দশরথ । বিক্র তোরে কাপটা-কোশলা, কুঁহা,  
দুগ্ধা, পাপময়ী !  
কুঁহ অসীকারে বন্ধ করিয়ে স্বামীরে  
বলি দিতে চাস  
দুগ্ধকাঠে ছাপ মম !  
হস্তময়ী কামিনীময়ী দুগ্ধা অযোগ্য

শশানুকরিতে চাস !  
কুষ্ঠা নাহি, লজ্জা নাহি !  
রাম, রাম,  
প্রিয় মোর প্রাণাধিক,  
প্রাণ যার, প্রাণ যার ।

কৈকেয়ী । ( জনান্তিকে ) দৃঢ় হ'ও মন,  
চিত্ত দৃঢ় হ'ও !  
ভরত, ভরত, আমার ভরত,  
সিংহাসনে তোরে বস,  
হরিব নিশ্চয় ।  
তা হ'তে নাহিক কাম্য মোর—  
সে যে মোর শ্রেষ্ঠ অভিলাষ,  
আনন্দ-স্বপন ।

দশরথ । রাম, প্রিয়-মোর !  
তোরে দিতে হ'বে বিসর্জন ?  
শিরায় শিরায় মোর  
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা তুই প্রিয়তম ।  
পারিব না তোরে বিসর্জিতে ।  
অগ্নি, অগ্নি, বৈশাঘর,  
এস এস দগ্ধ কর পাপি দশরথে ।  
এম মৃত্যু শাস্ত্রিম,  
স্বলীতল, আলাহারী, ব্যাধানিবারণ !  
নিয়োগ শাস্ত্রিধামে ভূষিণ্যমে মোরে ।  
অসহ্য বেদনা এই মর্ঘভেদী !  
ভেঙ্গে যার, পুড়ে যার, শুভা হ'য়ে যার  
চিত্ত মোর !

তুহো, অসহ্য দশন !  
দংশন করেছে মোরে শিখিনী কৈকেয়ী !  
জালা, খড় জালা !  
অ'লে যার গরলে এ বৃক !

কৈকেয়ী । মহারাজ,  
রাত্রি ওই অবসরপ্রায় ।  
কথা দাও,  
করো তব প্রীতিজা পালন ।  
দশরথ । ওই ওই ঈশিছে আবার



হৃদয়ে নাগিনী !  
রাখিবে রাখিবে সত্য,  
দশরথ তোমো নাহি কর্ত্ত অবেহো !  
কিন্তু তা কেমনে ?  
সত্য আজ একি ভয়ঙ্কর ;  
একি সত্য সর্গদ্বন্দ্বসকর !  
কৈকেয়ী, কৈকেয়ী,  
বর লবি ভূই ?  
কুঠা নাই, লজ্জা নাই ?  
যাবে রাম বনবাসে ?  
বাক্য তবো,  
হোক মেরি সত্যের সাধন ।  
মিক বিচ্ছিন্ন মোরে,  
মিক রাজা দশরথ !  
কৈকেয়ী, কৈকেয়ী,  
ভাণ্ডা তুই ন'স মোর,  
ভরত সে প্রজা নয় ।  
রাম বনে গেলে  
সুভা যবে হ'বে মোর  
করিস না তোরা কিছু ;  
বশিষ্ঠ করিবে শেষ ক্রিয়া !  
[ প্রভাতের আলোক দেখিতে পাইয়া ]  
এ্যা, এ্যা, ওই যার,  
ওই রাজি হর শেখ !  
এ্যা, ক্রো, রাজি কেটে গেল ।  
রাজি রাজি, শাস্তিময়ী জননী আমার,  
হ'য়ো নাকো অবদান,  
কোন্ দাঁও, রাণে চোকে-ছেয়ে,  
তাপিত-এ দশরথে !  
দশরথ, দশরথ, দশরথ  
মাগে জোড়-কুরে—  
দীর্ঘ হও দীর্ঘতর দীর্ঘতম আজ !  
প্রভাতা হ'য়ো না আর,  
হ'ও চিত্তের অক্লান্ততা !

তপন, তপন;  
হে পূর্ণপদুম যোগ পূজনীর,  
সন্ধান তোমার রাজা দশরথ  
মাগে আজ—  
হ'য়ো না উদয় ।  
তব উপরেই সাধে  
দীপ্ততম পুত্ৰতম রাম রামি তব  
মলিন হইয়া যাবে ।  
দেব,  
হয়ো না উদয় ।  
কিন্তু এ কি !  
হৃদ্যদেব তুনিবে না অমুনয় ?  
রজনী র'বে না ?  
এ্যা, র'বে না, র'বে না ?  
আসিবে প্রভাত ।  
তারি সাথে কে জানে অন্তর্ভ কিবা !  
না, না, যাও, যাও চ'লে  
শীঘ্র চ'লে যাও !  
আর নারি হেরিতে এ পিণ্ডাচার মুখ !  
দশরথ, দশরথ,  
কোন্ পাশে, কোন্ অপরাধে  
এ দ্বর্ভাগ্য ঘটে তোর ?  
করেছিলি কোন্ অপরাধ ?  
ভগ্নো মনে পড়ে,  
মনে পড়ে আজ—  
দিক, দিক,  
পুণ্যময় অন্ধ মূনি,  
নিঃপথায় ছিলে তুমি একক-সন্ধান !  
তোমার সে অন্ধ-যাত্রী  
তোমার সন্তানে  
মেরেছিল এই দশরথ  
এ ব্যাত-বার্ষিক দশরথ  
এই হাতে হতীকৃত শায়কে ।  
ঐ ঐ সিদ্ধ হাঙ্গ,  
মুখে বসি হাঙ্গ—

আমি জলি, দেবে হাঙ্গ—

ঐ বলে—

‘উপযুক্ত পুরস্কার পেলে তুমি রাজা !’

উপযুক্ত, উপযুক্ত, উপযুক্ত বটে !

কমা করো,

কমা করো, অন্ধ মূনি ।

কিরাও বচন ।

এ্যা, এ্যা, কমা নেই ?

কমা নেই মোটে ?

( নতমস্তকে )

দশরথ,

সৌভাগ্য-গরব চূর্ণ আজি তোর ।

দুখ্যা, দুখ্যা

অমি সাক্ষী করি' বই করযুগ তোর

করিছ গ্রহণ

তাজি তাহা, তাজি তোরে আজ ।

তাজি তোরে পূত্র ভরতের ।

[ ইহা বলিয়া দশরথ নতমস্তকে বসিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । চতুর্দিকে বৈতালিকগণ গান করিয়া উঠিল, হুময় গান করিতে করিতে থামিলেন । ]

গীত

উদিত সূর্য্য-জগজননমুখা ।

জাগো, জাগো, দশরথ রথকুলস্থান্য ।

প্রভাতরশ্মিসম

তব যশ অমুগম

দিকে দিকে ভাসিত বাজে জয়-কৃত্য ।

দশদিকে দুর্য্যায়

তব রথ চুড়ায়,

দশ-দশ-রথো তুমি রবি হ'তে উজ্জ ।

কল্যাণে জাগো বীর,

সত্যোত্তে জাগো দীর্ঘ,

নাশো শাসন বলে সুদতা কুজ ।

হুময় । প্রভাত হয়েচে, মহারাজ ।

অভিযেক-আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত

দশরথ

হুময়, হুময়,  
বাক্যে তব দীর্ঘ হ'য়ে যার মর্ম্ম মোর ।

( হুময় আশঙ্কায় সরিয়া দাঁড়াইলেন )

কৈকেয়ী । হুময়,

গতরাত্রি অনিত্যায় কেটেছে রাজার

রাম-অভিযেক তরে আনন্দে অধীর

পরিশ্রান্ত এবে তিনি ।

বাও তুমি বরা,

রামচন্দ্রে আনো একবার ।

দশরথ । হুময়, হুময়

কোথা রাম, কোথা রাম মোর ?

ব্যাকুল যে আমি দেখিতে সে প্রিয়মুখ ।

হুময়, হুময়,

আমি রাজা দশরথ ?

শত-দশ-জয়ী ?

শত-রাজশির চুড়িত-ভরণ ?

গর্ভোদত এই শির

বাধা বিহু কপট নারীর পরে ?

বিক মোরে ।

হুময় । মহারাজ,

বুঝিতে না পারি কিছু ।

কেন এত বিব্রল আগনি

হলু আমার ।

দশরথ । বলি, বলি, তোমা ?

কি বলি বলা ?

শুভ নহে এ সংবাদ ।

চলো, চলো, নিয়ে চলো মোরে

শ্রীরামের কাছে ।

এ দুখ্যা আবাসে আর না চাহি থাকিতে ।

[ হুময়ের হাত ধরিয়া দশরথের প্রস্থান ]

কৈকেয়ী । দুখ্যা এ আবাস আজ,

দুখ্যা এ বৈকেয়ী !



এত বেশ এত বাধা সত্যের পালিতে !  
মহারাজ  
বাহিন্য তোমার  
শৈলি এনেছে মনে ।  
কিন্তু যেমন হির  
কৈকেয়ীর নাহি শিখিতা ।  
দুলাল আমার  
ভরত নয়ন মণি,  
তারে দেখে ঘুরে  
গোপনে সাধিতে চাও রাজ অভিষেক ?  
ভরত সে শত্রু তব ?  
শ্রিতমা চিরদিন কৈকেয়ী মহাবী  
আর আজ ?  
আজ তার বাধা পুরাবারে  
এত বেশ, এত কাতরতা !  
সত্য তবু করিতে সাধন  
মাহস নাহিক মনে !  
বিক তোমা বিক

[ মধুর প্রবেশ ]

মধুরা। রাণীমা, ধবরবার তোমার পণ ছেড়ানা। মন  
খুশ শত্রু করে রাখে। রামের জুই সকলে আকুল  
আর ভরত কি রাজপুত্র নয় ?  
কৈকেয়ী। ভরত ও রাজার ছেলে।  
অযোধ্যার সিংহাসনে।  
ভ্রাতা দাবী তার রামের যেমন।  
ভরতের অভিষেক  
কিসের আক্ষেপ,  
কিসের আপত্তি এত ?  
রাম যদি স্বপন  
পিতৃসত্য করুক পালন।  
ভরত তো অমূল্য তাহার  
অজ্ঞেয়ে দিতে সিংহাসন  
কাতর হওয়া তো তার নরেক উচিত।

মধুরা। রাণী, শব্দ অম্লের সঙ্গে রাজার হৃদয়ের কথা  
ভুলো না। তখন কোণার ছিল কৌশল্য, কোণার

ছিল হুমিতা ? ভূমিই তো রাজাকে বাঁচিয়েছিলে।  
আর আজ তোমার একটা সাধ মেটাতে রাজার এত  
আপত্তি !

কৈকেয়ী। যুদ্ধ-কর্ত  
কৈকেয়ী তা সারাবে ঘটনে।  
সেবা, দাসীপণা—  
কৈকেয়ী করুক চিরদিন।  
প্রতিদান চাবে নাকো কিছু !  
চায় যদি  
অনর্থ ঘটবে চারিদিকে।  
কিন্তু হবে না তা,  
কৈকেয়ী পেয়েছে চিরদিন  
যা চেয়েছে।  
আজও তার কাম্য লবে সেই  
মধুরা,  
পুরাব সাধ  
আর সাধে মোর।

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

[ রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ]

রাম। (শান্ত নয়নে) লক্ষ্মণ,  
ঐ দেখ মালিক করিছে রচনা  
শত শত পুরনারী ;  
অভিষেক-উৎসবের যত আয়োজন  
সস্তর সস্তারে  
হতেছে সজ্জিত দেখো।  
ভাই, এ অযোধ্যা প্রতিময়ী  
আনন্দ উৎসব ওই  
জনক-জননী  
সব ছোড় ঘেতে হবে ? (ক্রন্দন)

লক্ষ্মণ। আর্ঘ্য,  
স্বার্থলুকা গর্ভিতা রমণী করিছে আদেপ  
অদর ক্রীতদাস তার দশরথ  
সে আদেশে নতশির,  
ছোট পুত্রে করে নির্দাসন,—  
এ আমার মার্জনা-অতীত

রাম। ভাই,  
মার্জনা-অতীত বটে !  
কিন্তু জেনো মনে  
সত্য পাশে বন্ধ পিতা।  
সত্যকথন হ'তে তাঁরে করিতে উদ্ধার  
সন্তানের কর্তব্য নিশ্চয়।  
লক্ষ্মণ। সত্য, সত্য তুমি বল কারে ?  
কোন যুগে ক্ষতদেহ দশরথ  
পরিচণ্ডীা লভি'  
করিলেন পণ  
মহিীর সাধিতে সন্তোষ।  
ছোট পুত্রে বনে দিতে  
সত্য বাক দেন নাই রাজা।  
সত্য তবে বল এয়ে কেন ?  
ছোট পুত্রে বিবাহিতে,  
মহারাজ্যে করিতে অশান  
শপথ ছিল না কত।  
আজ বৃদ্ধ রাজা শিথিল-মানস,  
তাই প্রেমসী তাঁহার  
অজায় উপায় সত্য সাধিবারে চায়।  
বৃদ্ধ দেখে ভূমি,  
জা'র নহে পুত্র-নির্দাসন  
জায় নঠে স্বীয় রাজ্য বিনাশ-সাধন।

রাম। বৎস, শোন,  
রাজ্য এক দিকে  
আর ধর্ম এক দিকে  
এ রাজ্য গ্রহণ মোর পিতৃ-অপমান।  
রাজ্য-ত্যাগ পিতৃসন্তোর পালন  
আর ভেবে দেখ—  
কৈকেয়ীর যেহ ছিল না পক্ষিল কত,  
চিল উভমুখী—  
আমার ও ভরতের প্রতি।  
আজ যে সে মেহ  
বিমূগ্ধ আমার প্রতি  
জেনো ইহা দৈবের বিধান

লক্ষ্মণ। আর্ঘ্য, কমা কতো—  
যে দৈব-বিধান-বোধ  
বুঝি তব কয়েছে বিশোপ  
যুগা তাল মোর কাছে।  
পিতা সে তো কৈকেয়ীর ক্রীড়নক  
বৃদ্ধিশূজ প্রাণশূজ মর্যাদাবিহীন  
আর কৈকেয়ী সে  
স্বার্থলুকা পাপ-বিধারিণী।  
এ দৌহার কার্যবিধি  
নহে পালনীয় কত।  
পালন সে অধর্ম-সাধন।

রাম। কল্যাণ-সুখতি  
সেহমর অমূল্য আমায়,  
পিতৃব্যকো অবস্থিতি  
সাধু আচারিত পণ  
জানি আমি—  
কি হয়ে এ প্রারোচন।  
ছোট বৃত্ত বাহে  
বিবাসিত নির্যাত্তি  
কিন্তু ভাই,  
পলে বন্ধ ছিলেন জনক।  
যতপি সে পণ রক্ষা হয় দুকঠোর  
হয় যদি মর্ঘভৌ,  
তবু তাহা পালনীয়,  
পালনীয় সন্তানের তাহা  
হয় তো এ দৈবের বিধান,  
লজনের নাহিক উপায়।  
লক্ষ্মণ। আর্ঘ্য,  
বুদ্ধিমান ওপনাম ভূমি  
ভুলনা-অতীত।  
আজ এ কি বুঝি তব ?  
কোন বুঝি-বলে  
অধর্ম মানিছ ধর্ম ?  
অজারে বলিছ জার অতি  
হীনবীর্য বাবা জানাইন



তারাম দৈব বলি,  
অজ্ঞাত অদৃষ্ট কোন সংসার আধারে  
দৈব!

সে তো দুর্গালের একান্ত শরণ,  
বুদ্ধিহীনের আশ্রয়।  
শক্তিমান দুঃখের সূচি,  
তোমার সে পাশা নয়।  
তব মতে

যেই দৈব বিরূপ তোমার প্রতি,  
আমি তারে কুরিব নমন  
সুতীক্ষ্ণ শাযুকে;  
আর সাধে তার  
কৈকরী ও ধনরঞ্জে।

বাহুঘর যের  
শোভার্থে স্বজিত নয়,  
মহ নহে জগদার;  
অসি নহে কটির বন্ধন,  
শারক নহে শুণ্ড শুভ্রনের তরে।  
দশরথ-প্রভুরের করিয়া বিশোপ  
দৃঢ় করির স্থাপন  
তোমার প্রভুকে আজ।  
আজ্ঞা দাও।

রাম। (লজ্জণের পূর্বে হাত দিয়া)

মেঘের লুপ্ত,  
শুভাঙ্গি আমার।  
কান্ত হও,  
চিত্র কর ধীর  
যে বেদনা তোমারে বিবল করে,  
আমারও পীড়িত হে তু,  
জানিও নিশ্চয়।  
তবু ভাই,  
পিতা সে যে জন্মশাস্তা;  
ওর আশ্বাসের।  
সিক্তশ আশ্বাসেরা ণ।  
হৃদ্য ভাই জননী-সকলো

কৌশল্যা-স্বমিত্রা লোহে করি গে বন্দনা ॥

[উভয়ের প্রস্থান]

[রাম বনে বিদ্যাসিত হইবেন স্ত্রিয়া করেকজন প্রধান  
নগরবাসী প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্ত প্রাসাদের ভিতর  
আসিয়া পড়িয়াছিল। চারজন নগরবাসীর প্রবেশ।]

প্রথম। ধবর নেবার জন্ত লুকিয়ে-চুরিয়ে রাজ বাড়ীতে  
তো ঢোকা গেল। কিন্তু কিছুই তো বোকা  
গেল না, ভাই।

তৃতীয়। আর বুঝে কি, দাদা?

চতুর্থ। কলকাঠি যে টোপ-সার সে টিক টিপেছে।  
ছোটরাণা কেমন বুকে বুকে টোপটি ফেলেছে,  
দাদা? বুড়ো গিলেছেও তো টিক।

প্রথম। ছোট রাণী ছোট রাণী বলে যে বুড়ো পাগল  
একদণ্ড সে হুণ না দেখলে যে পজান।  
কল মথের কাছে কিছু নয় বাবা। সব ভুলিয়ে  
জ্ঞার। হাতখানি নেড়ে আর হুণটি বৈকিয়ে  
ছোটরাণী যখন বললে যে, রামকে বনে দাও,  
ভরতকে রাজা করো,—দশরথের মাথা কি বাবা  
সে কথা ঠেলে!

দ্বিতীয়। দাদা, এ যে একেবারে শাস্তরের কথা, ভাই।

সেই যে কি বলে, মিথ্যা নয় বাবা,  
বেদশাস্তরে স্বয়ং ভগবান বলেছেন—  
বিশ্বের যে ভরণী ভাঙো—বাঁবা গাটে গাটে  
সত্যি কথা। বুড়ো ব্যসে রাজা হুণ একবারে  
মাত্ ক'রে দিয়েছে।

তৃতীয়। হুণ মাত্, একেবারে সারে-মারে মাত্।

প্রথম। ওঃ! কি রকম চালটি চেমেছে, ভাই!

ভেবে ভেবে একেবারে সব টিকাক'রে রেখেছিলো।  
যদি শুনেছে রাম রাজা হ'বে  
একেবারে ছুটি ছোবল একসঙ্গে।

দ্বিতীয়। একেবারে কেউটের ছোবল। আজ্ঞা, দাদা  
তুমি তো অনেক জানো, শিরোমণি-দাদ'র কাছে  
অনেক বই পড়েছ। ঠাকুরপু রামের কি মা হ'ল,  
দাদা?

দ্বিতীয়। সে কথা কি জানি, দাদা? বলি ভাল শাস্তরের প্রথম। এই, এই বাবা। শিরোমণি-দাদ'র আসছেন। ও'কে  
কণায় কি বলে?

তৃতীয়। বিমাতা বলে রে বিমাতা।

দ্বিতীয়। বিমাতা হ্যাঁ হ্যাঁ টিক বটে। আজ্ঞা, দাদা,  
কইকই যখন রামের বিমাতা হ'ল দশরথ তখন  
ভরতের বি-পিতা হ'বে তো?

তৃতীয়। দূর বোকা তা হ'বে কি ক'রে?

দ্বিতীয়। হ'বে কি ক'রে? বললেই হ'ল? আলবৎ হ'বে।  
চুটো যে উলটো হচ্ছে বাবা! রামের বেলায়  
কইকই যেমন হ'ল বিমাতা, ভরতের বেলায় দশরথ  
বিপিতা হবে না? চালাকি না কি? এই শেখালে,  
আবার উলটে নিজে কেন বাবা?

(সকলের হাস্য)

চতুর্থ। ভূই একেবারে হক বোকা! তোর মাথায় ওসব  
চুকবে না।

দ্বিতীয়। নাঃ! চুকবে না! আর তোমাদের কথাতেই  
বুঝি সাতটা ছোঁপা আছে যে ছোট বড় এড়া বাজা  
যত বুঝির কাঁড় আছে পিলপিল ক'রে চুকবে।  
বাবা আমি কি ক'রে চলে গে? শাস্তরের কথা  
আমিও জানি। আমার জ্যেষ্ঠমশাইকে দেখে-  
ছিলি তো? বাবা এত মোটা মোটা বই সব  
একেবারে হজম! জ্যেষ্ঠমশাই বলতেন "শরীরে  
অনেক খার আছে, কখন কোথা দিয়ে প্রাণটা  
বেরিয়ে যাবে কে জানে।" বাবা গুরুজনের কথা,  
শাস্তরের বাক্য সে তো আর মিথ্যা হ'বে না।  
আর সে ছোঁপা কেবল তোমার শরীরেই তো নেই।  
আমারো আছে। বুদ্ধি কেবল তোমার মাথাতেই  
চুকবে বুঝি?

প্রথম। হাঁ রে হাঁপা কার গায়ে কটা বুদ্ধি যাবার ছোঁপা  
আছে রে? ভূই তো পণ্ডিত মাহুয়।

দ্বিতীয়। কেন এই যে ছুটো কান আর নাক গুরুমশাই  
যখন পড়ায় তার বুদ্ধি চন্দ্র করে। কান আর  
নাক দিয়ে জেলের মাথার মধ্যে ঢুক যায়।

(সকলের হাস্য)

[শিরোমণি পুরোহিতের প্রবেশ]  
সকলে। পেদ্রাম হই শিরোমণি ঠাকুর। কি ধবর,  
দেখলেন কি?

শিরোমণি। আর কি দেখে-বো বল? অব্যাহা এবার  
দশান হ'ল। রাণীরা সব কাঁদছেন, কি-চাকর  
কান্দছে রাজা। দশরথ তো একেবারে পড়াগড়ি  
দিচ্ছেন। ওঃ কি সর্বনাশই করলে।  
প্রথম। আজ্ঞা দাদা কৈকরী ঠাকুরণই তো সব ঘটালে?  
কি মেয়ে-মাহুয় দাদা?

শিরোমণি। তা বই আর কি? রাজবাড়ী একেবারে  
ছারখার ক'রে গিলে। এ রকমটা কখনো  
শুনিনি।

তৃতীয়। দাদা, ভূমি যাই বলো, ভরত আর ছোট রাণীতে  
এ সব যড়যন্ত্র টিক ছিল। কেমন তুলে রাজাকে  
ঠকালে বলো?

শিরোমণি। কি জানি ভাই বড় ঘরের বড় কথা।  
মনে তো হয় অসেক রকম।

কি বলা যায় বলো?  
তৃতীয়। আজ্ঞা দাদা, ছোটরাণীর কথা শুনেই হ'বে, এ  
কেমন কথা। বুড়ো রাজা একেবারে ছোটরাণীর  
দাস। অমন এক কুণ্ডার রামকে বনে পাঠাবে?

শিরোমণি। আরে ভাই, তোরা বুঝি কি করে বল? এ  
রাজা ধার্মিক লোক। বর দিয়েন বলেছিলেন  
তখন জ্ঞার না করেন কি ক'রে? ছোটরাণীরই  
মনটা দেখ, রাজার আর দোষ কি?

দ্বিতীয়। দোষ-নেই? রেখে দাও তোমার ধন্যমো, দাদা।  
নেই শাস্তরে বলে, জ্যেষ্ঠমশাই বলে ছিল—গুরু  
জন হ'বার-মোটি নেই—মেয়েমাহুয় ছুঁ হ'লে—

প্রথম ও তৃতীয়। এই, এই আস্তে। বড় চালাকি পেয়েছিল  
নয়? আজ বাদে কাল ভরত যখন রাজা হ'বে, তোমার  
একেবারে টোট পাইয়ে দেবে। একি তোর ঘর  
পেয়েছিল না কি যে পেপের বড়াই করছিল?



দ্বিতীয়। আজ্ঞা বাবা আজ্ঞা। চুপ না হয় করলুম।  
হোক না ভরত রাজা একবার। যদব একদিন চুপি  
চুপি ঐ জন্তু ঘরের দরজা খুলে—বত কুকুর আর বাব  
হাই হাই করে একেবারে সিঁদুরজী দিয়ে চুকে ভরত  
তো ভরত—সব একেবারে শেষ ক'রে দেবে।

প্রথম। শিরোমণি-না ধমক দাও তো এই বোকাটাকে  
একবার, কি কাও বাধাবে।

শিরোমণি। ( দ্বিতীয়ের প্রতি ) এই থাম্ রাজবাড়ীর  
ভেতরে গোলমাল করিস নি।

দ্বিতীয়। হক্ কথা বলব তার গোলমাল কি দাদা? হা  
দাদা, তুমি যখন এয়েছ একটা কথা জিগগেন্স করি।  
দাদা, তুমি তো শাস্তির পড়েছ। বসো তো দাদা কইকই  
যদি হয় রামের বিমাতা—তো দশরথ ভরতের বিপিতা  
হয় না? আর যেন এরা আমাদের বোকা পেয়েছে!

শিরোমণি। এই এই চুপ পালা পালা। ঐ ঐ, কে  
আসছেন একিকে। চ, চ পালা পালা।

[ সকলের সেই নিক দেখিবার প্রস্থ ]

[ দ্বারে দ্বারে কৈকেয়ী ও মদ্রার প্রবেশ ]

মদ্রা। যজ্ঞটি দেখো, রাণীমা। রাম রাজা হ'বে তো  
স্বপ্নের আর শেষ নাই। আর বেই বলা হয়েছে ভরতকে  
রাজা করা হোক, অমনি সব হা-হুতাশ, কায়া, রাগা-  
রাগি। যজ্ঞটি দেখো। আর এই একটা স্থিতি, এবার  
সকলেই তোমার মন্দ বগতে শুরু করবে।

[ চারিদিকে পুরবাসীদের জন্মন ও দশরথের অস্ত্রনাদ শোনা  
গেল। কৈকেয়ী ও মদ্রা চকিত হইয়া উঠিল ]

কৈকেয়ী। মদ্রা, শোন

ঐ শোন রাম বনবাসভরে

কত না বিলাপ।

এ অযোধ্যা, এ ঐক্য যেন

রাম তরে শুধু

জানি আমি

আমার দুর্গানে

ছেড়ে যাবে রাজপুত্র,

ছেড়ে যাবে অযোধ্যানগরী।

কিন্তু মোর লজ্জা নাই,

ভর নাই তাতে।

বাসনাব জর বেথা

মান-অপমান অতি তুচ্ছ সেথা।

এই মোর রূপ,

এই মোর তীর তীক্ষ্ণ রূপ

রাজারে করেছে জয়।

চিত্র মোর হ'বে জয়ী এমন নিচর।

পরাজয় জানে না কৈকেয়ী;

পরাজয় লভে নি সে কভু।

কৈকেয়ীর বাসনার শ্রোতে

কবিবার শক্তি আছে কাহ্ন?

মদ্রা। রাণীমা, রাজার ব্যবহারটা দেখলে তো? কত

গালাগালিই তোমার না দিলেন।

কৈকেয়ী। দেখলি মদ্রা?

অপবাদ ঘৃণা মোর তরে সব।

কৈকেয়ী-গারাবে বুদ্ধকত।

পরিচর্যা করিবে কৈকেয়ী।

আর পুরস্কার তার

ঘৃণা, অপমান।

আমারে বলিলে "দেবো,"

তাই তো চেয়েছি।

এখন কপট আমি?

পরায় তাহিবে মোরে?

ত্যাগে, হৃৎ নাই,

কৈকেয়ী যে মনে না শাগন।

সে পেয়েছে স্বপ্নের সন্ধান,

স্বপ্ন, অদূরত্ব-স্বপ্ন—

সন্তানের স্বপ্ন স্বপ্ন তার।

স্রেহস্বপ্নে পাগল কৈকেয়ী।

কৈকেয়ী সে দাসী নয়,

রাজকন্যা রাজরাণী সে যে,

কেন সে হ'বে না রাজমাতা?

মদ্রা। সেইজন্মেই তো তোমার আমি এত ক'রে বুঝি

ছিলাম, রাণী-মা।

কৈকেয়ী। মদ্রা,

ঠিক বলেছিনি তুই।

শাসন করিবে মোরে—

সাধ ছিল তাই সবার।

সব হিংসা লবে শোধ।

হ'বে না হ'বে না তাহা।

ইচ্ছা মোর হ'বে সর্বজয়ী,

সর্বজয়ী চিরদিন।

চাকুরী তোমার, দশরথ,

কৈকেয়ী বুঝিছে সব।

ভরতে রেখেছ দূরে ঠেলে,

কণ্টক ভেবেছ তাকে রাম-স্বপ্নে।

সরাবে কোথায় তাকে?

আমি আছি কাটা

জননী তাহার।

ভরতের রাজ্যগাত কে করিবে রোধ?

অযোধ্যার সিংহাসনে

একজন্ম ভরত আমার রাজা,—

সে কি-হুখ সে মহা উল্লাস

সে স্বপ্নের পাশে

নগণ্য এ অপমান

নগণ্য এ ঘৃণা দীর্ঘকাল।

## প্রেমিক

( রিচার্ড আলভিউটনের অনুবাদে )

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

যদিও বন্ধুরা আছে,

আর আছে হৃদয়ী প্রেমসী,

সবার উপরে তবু আছে আর কেহ,

আমি তা'রি প্রতীক্ষায় আছি।

কোমল 'প্লামে'র ফুল ছুটিবে যখন,

পাখীদের গানে হ'বে বাতাস ঢকল,

আকাশে জাগিবে মুখ, যুগল আরাধ—

সে তখনো আসিবে না।

সে আসিবে স্থবিপুল কলরোল হ'তে,—

তারার রহস্ত-জ্যোতি চারিপাশে নিয়ে,

পুঞ্জ পুঞ্জ ধূম-কুণ্ডলিতে

আবরিবে ধাবমান অশুভলি তা'র।

অকস্মাৎ নত হ'বে সে আমারে জড়াবে ধরিবে—

আমারে ব্যাকুল করি' জীষণ সে বাহুর বন্ধনে,

আমারে করিবে বিদ্ধ একটা চুমায়!

তীর তা'র জালা হ'তে

দীপে দীপে গুঁঠ বাধি' ঝরিবে কবির।

উদাস আনন্দ-ভরে সে আমারে করিবে আঘাত,

তা'রপরে যখনে মুড়াবে আঁখি,

গুঁঠ হ'তে রক্ত মুখি' ল'য়ে

আমারে সে ঘিরে ল'বে স্বপ্নহীন প্রহস্তির মাঝে

চিরকাল তরে।



## সত্যব্রত

( গল্প )

শ্রীমতী চিত্রা রায়

এক

সমস্ত দিন অনাহারে সোঁতে ছাড়ে ছাড়ে চাকুরির সন্ধানে ঘুরিয়া বিকাশের দিকে বার্থ মনোঃ সত্যব্রত রাস্তাসেই শিথিল চরণ দুখানি কোন মতে চলিয়া গিয়াছিল নিজের ঘরে কিরিতেনি, কিন্তু আজ একমাস নিঃশব্দভাবে চাকুরির সন্ধানে ঘুরিয়া তার সারা দেহ-মন যেন একান্তই অবশ হইয়া পড়িতেছিল।

অল্পমাত্র ভাবে পথে চলিতে চলিতে সে একেবারে একখানি চলন্ত মোটরের সামনে গিয়া পড়িল। সন্ধ্যা রাস্তার গাড়ীর গতি চালক সংঘত করিবার আগেই সত্যব্রতের দেহ গাড়ীর নীচে গিয়া পড়িল। রাস্তার লোকগুলি চিৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিবার পূর্বেই গাড়ী চালক আহত ব্যক্তিকে কোনরূপ সাহায্য না করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে দ্রুতবেগে ছুটিয়া পলাইল। পথে পড়িয়া রহিল রক্তাক্ত কলেবরে মুচ্ছিত মৃতক।

তিন দিন পরে সত্যব্রতের জান হইলে সে চোখ মেলিয়া দেখিল। সে একখানি খাটের উপর শুইয়া রহিয়াছে চারিদিক চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিবারামাত্র তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। হার্নটি তার সম্পূর্ণ অপরিস্ফুট। কেন বা কি ভাবে সে এখানে উপস্থিত হইয়াছে স্বরূপ-পথে আনিতে পারিল না।

উঠিয়া বিসবার চোঁটা করিবারামাত্র তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, সমস্ত শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা যত্ন আর্জনা করিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়িয়া গেল যে একদিন সন্ধ্যার সময় মোটরের নীচে পড়িয়া গিয়া সে আহত হইয়াছিল, বোধ হয় সে হাঁসপাতাল চিকিৎসার জন্য নীত হইয়াছে। সত্যব্রতকে আর্জনা করিতে দেখিয়া একজন নারী ছুটিয়া আসিয়া তাকে ভাল করে শুয়াইয়া দিয়া বলিল, “আপনি অত্যন্ত বাস্তব, হ’লে উঠে স্বপনে না, চাকুরিবাস্তু রাখ করে গেছেন।”

সত্যব্রত বিব্রল দৃষ্টিতে নাসের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, “আমাকে ক’দিন এখানে আনা হ’য়েছে?”

“তিন দিন” বলিয়া নারী সত্যব্রতের জন্য কিছু খাবার আনিতে চলিয়া গেল। সত্যব্রত তার সমস্ত শরীরের মধ্যে জান হাত বানিতে অধিকন্তর যন্ত্রণা অনুভব করিল। তার চোখ চুটি জলে ভরিয়া আসিল, সে নিজের চরিত্রের কথা ভাবিয়া চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল, —তার জন্য চোখের হ’লেটা জল বেশিবার কোন আত্মীয়-স্বজন আসে নাই। এ জগতে তার মত নিঃশব্দ ও আত্মীয়-স্বজন-রহিত আর কেহ নাই।

ঠিক একটা মাস পরে সত্যব্রত তার ভাঙ্গা ডান হাত নিয়ে, হাঁসপাতাল হইতে মুক্তি পাইল। তার মনে হইল, এই এক মাস কাল সে বেশ নির্ভরশীল ছিল, এখন আবার তাহাকে বিবাদের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে—আবার অল্পমাত্রের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। সে ভাবিল গাড়ী থানা একেবারে তার বুকের উপর থিয়া চলিয়া গেলেই ভাল ছিল, তা’ হইলে আর তাকে হাঁস পাতাল থেকে বাহির হইতে হইত না—অভিসপ্ত জীবনের শেষ হইয়া যাইত। সে যে যথাযথ নিরাশ্রয়, নিঃসঙ্গ এইবার তার ভাল করেই মনে হইল। নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখিল এখন তার যেটুকু হাতে অর্ধমণল আছে, তাহাতে তার ভাড়া করা ঘর বাসির ভাড়া শোধ করিয়া থিয়া পনের দিন কোন রকমে কষ্টেই চলিতে পারে। এর মধ্যে তাকে বা হোক কোন একটা চাকুরীর উপায় করিয়া লইতেই হইবে।

দুই

হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া সত্যব্রত প্রথমে নিজের ঘর ভাড়া শোধ করিয়া ঘরখানি ছাড়িয়া দিয়া অন্য জায়গায় শাশত ভাড়া এক থানি ঘর ভাড়া করিল।

সত্যব্রতের পাশাপাশি ঘরে যারা বাস করিত তারা সকলেই নিম্ন শ্রেণীর, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী।

সত্যব্রত নিজেই ঘরে বসিয়া দেখিত তাদের দিন কি স্বন্দরভাবে কাটিতেছে, সেই শুধু তহসীলের ছেলে হইয়া নিজের অল্পের ভাবনায় ভাবিয়া মরিতেছে, কত জায়গায়ই তো সে চাকুরীর সন্ধান ঘুরিল; কিন্তু একটা সামান্য চাকুরীও সে জুটাইতে পারিল না, আজ তিন মাস সে বেকারভাবে বসিয়া আছে। আর এই যে লোকগণা এদের দিন তো বখ হাসিয়া দেখিয়া কাটিয়েছে, এরা দিন আনে দিন ধার—ভাবনা নেই, চিন্তা নেই—যেন তারা সত্যব্রতের জগতেরই মাছব নয়। সমস্ত “দিন” মন চলে যায়, কে জানে কোথায়, আর সন্ধ্যাবেলা এসে সব জড়ো হয় তাগের আড্ডায়। বেশ আছে এরা; এক একবার তার মনে হইত, সেও ঘর এদের মত নির্ভাবনা জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিত।

সত্যব্রতকেও তারা নিজেদের আসরে নিমন্ত্রণ করিত, কিন্তু সে প্রায়ই যাইত না বটে, তবে মাঝে মাঝে গিয়া তাদের আসরে যোগ দিত।

একদিন সত্যব্রতের এক বন্ধু প্রতিবেশী সাংসারে তাহাকে নিমন্ত্রণ দিল, “বাবু! আপনি কেন এভাবে বসে পাজেন, আমাদের মধ্যে আহন, কোনও কষ্ট থাকবে না আপনায়, একটা হাতে না হয় আপনায় কেছে, কিন্তু আপনায়। কাজ করবার জন্য—” বলিয়া বন্ধু তাহার কাপের কাছে থুখ আনিয়া ঘুরঘুরে আরও কত কি বলিল।

সত্যব্রত চমকিয়া উঠিল, বলিল, “ছি: ছি: অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন, এ বড় অশ্রদ্ধ!”

বন্ধু বলিল, “ছি: কিসে বাবু, ধর্ম ধর্ম করে যে আপনায় লাফান, ওটা তো আসলে কাঁচিকি। ভগবান কি নিজেব-হাতে লিখে দিয়েছেন, কোনটা ধর্ম আর কোনটা অশ্রদ্ধ? তবু হাত দিয়েছেন, বা দিয়েছেন করে খাবার জন্য। পেটের জন্য আমরা কাজ করে থাকি এতে ধর্ম আর অশ্রদ্ধ কি বাবু? স্বাধীন ব্যবসা, এর চেয়ে কি আর স্থল আছে?”

“আজ্ঞা তববে দেখি” বলিয়া সত্যব্রত নিজের ঘরে গিয়া বিদ্যানার শুইয়া ভাবিতে লাগিল, বন্ধু সন্দর্ভীয়ের কথাগুলি। বেতারা ভাবিতে লাগিল,—কি করাই বা যায়—

হাতের সযলও তো হ’য়ে এল—আজ্ঞা ধর্মটা কি সত্যই কাঁচিকি, শুধুই কি চিটা চরলতা মাত্র! আজ্ঞা ধর্মবিশ্বাস সত্যব্রত মুহূর্তের জন্য নিঃসরিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সন্দর্ভীয়ের কথাগুলি মাথা ঠেঁলিয়া উঠিল— সে ভাবিল এতে বোঝাই থাকি; এই যে সে এতদিন ধর্ম-পথে চলিয়া আসিল, তাহাতে ফল হইল কি—চলবে! তুমি পেটের আর সংলগ্নে থাকিয়া তো সে জুটাইতে পারিতেছে না। এককল্প বিবেশের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে অধ্যবসায় হয় হইল। ভবিষ্যতের উপায় স্থির করিবার জন্য নিজের মনে ভাবিতে ভাবিতে সে কখন ঘুমাইয়া পড়িল। তাহা সে জানিতেও পারিল না।

তিন

সত্যব্রত ভাবিল, লোকের সহানুভূতি উল্লেখ করিবার জন্য বিখ্যাত আশ্রম হইয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করা তাহার পক্ষে বোধ হয় সম্ভব হইবে। এতবড় বাঙ্গালী-দেশে দয়া-প্রণয় পুরুষ বা রমণীর অভাব নাই। পুরুষেরা যদিও দয়া দেয়াইতে কৃপণতা করিতে পারে, তথাপি সত্যব্রতকে কোমল জননীর ভাতিয়া হৃদয় ব্যক্তিরা প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া থাকিতে পারিবে না। তাই সে ঠিক করিল দ্বিপ্রহরে যখন পুরুষেরা বাড়ীতে থাকিবে না, সেই সময়ে রমণীদের নিকট গিয়া সে বলিবে দেখ-সেবার কল-স্বরূপে সে নির্ভাষিত হইয়া হাত ভাঙ্গিয়া করিয়া আছে। এখন দেশে বাইবার গাড়ী-ভাড়া নাই—“বদলি” বলিয়া আসিল অঙ্কলে সে চাকুরী জুটাইতে সে পারে নাই। এখন সাহায্য পাইলে সে দেশে চলিয়া যায়।

এইরূপ স্থির করিয়া সে একখানি খবরের পত্র ও পাঠাইয়া খবর করিয়া আসিল। তার পর নিজের উদ্ভাবিত জোচ্ছুরী কলিতা সন্দর্ভীয়কে বলিল।

সকল কথা শুনিয়া বন্ধু ব্যতিকল্প খুব হাসিয়া বলিল, “বাবু, তুমি বদলির জন্য খেল গেছলে আর তোমার ডান হাতপান, দেখে তারা তোমাকে এল থেকে ছেড়ে দিয়েছে, একথা না হয় লোকে তোমার অবিশ্বাস করিবে না; তোমার খবরের জায়া কাপড়ও একবার যেন দেখায় হ’লে মানস, কিন্তু বাবু, এতে তোমার লাভ হ’বে কি?”



সত্যজ্ঞ উত্তরে বলিল, “কেন আমি বলবো, আমার বুজা যা দেশে না যেতে পেয়ে আমার জন্ম ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে, কিন্তু আমার কাছে সামান্য গাড়ী-ভাড়াটাও নেই যে, বেশে না’র কাঁইয়ে যাই, অগ্রহে করে আপনাদের কাছে কিছু সাহায্য করুন এই বলবো। সর্দিরাজী তুমি দেখো, এই বলে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বেশ সাহায্য চাইতে পারবো—এতে কান্সর সাধ্য নেই যে আমাকে ধরতে পারবে।

বুদ্ধ একটু ভাবিয়া বলিল, “তা এ নেহাৎ মন্দ হ’বে না।” তারপর সত্যজ্ঞকে নৃতন পণের গোটা কয়েক উপদেশ দিয়া বিদায় করিল।

আজ্ঞর চুপচাপালিত সত্যজ্ঞের দিনগুলি এখন মন্দ কাটিতেছিল না। নিছক মিথ্যাকে এতটা সত্যের আবরণে ঢাকিতে তার কিছুমাত্র বিবেকে বাধিলা না বরং আজ্ঞর বুদ্ধির সহিত উৎসাহ বাড়িয়াই চলিল, বেশ কিছু ধার্য হইতে লাগিল। দূর্য্য পড়িবার ভয়ে সে রোজ জন্মের যাইত না। ভিন্ন ভিন্ন রাস্তার বাড়ীগুলিতে ঐ একই কথা বলিয়া ভিক্ষা চাহিত।

### চারি

সেদিনও সত্যজ্ঞ এক বড় বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। তপস্বেশা, বাড়ীতে বোধ হয় তখন বাবুসাহেবই ছিল না, সে চারিদিকে চাহিয়া বাবুরিগের মধ্যে কাহারও দেখিতে না পাইয়া ‘বেহারী’ ‘বেহারী’ বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। এমন সময় বাড়ীর এক বুজা বি কিসের জন্ম বাহিরে আসিতেছিল, ‘আপনাকে উদ্ধ-সন্তান দেখিয়া বিজ্ঞান করিল, কি চাই বাবু?’

সত্যজ্ঞ নিব্বের তৈরী হাংগের কুণ্ডলিন এক টুকরা কাগজে লিখিয়া কিসের হাতে দিয়ে বলিল, “কি, এই কাগজ-পানী মাকে দাও, আর বলবে যে আমি বড়ই অভাব-গ্রস্ত, যা বেন সামান্য কিছু দিয়াও এই গরীব সন্তানের অভাব পূরণ করেন।”

কিছুক্ষণ পরে সত্যজ্ঞর চিঠির জবাব এল এক থালা-পূর্ণ দানারকর জলখাবার আর একখানি মদ টাকার

নোট। কি সে সব তার সামনে রাখিয়া বলিল ‘বোমা তোমার জন্ম এই সব দিলেন।’

সে অব্যাক-বিষয়ে কিসের মূখ্যানে তাকাইল। সেই মহিমময়ীর অপরিসীম দায় তার হৃদয়বিবেক আজ সর্বদা মাথা নাড়া দিয়ে উঠিল, ‘এত দয়া কর গো, যে তার মত এমন প্রতারককে এত দয়া করেছেন।’ কৃতজ্ঞতার তার চোখের জলে তরিয়া আসিল। বিবেকের বুদ্ধি-দানশনে আজ তার মন জরুরিত হইয়া উঠিল—সে মরমে মরিয়া গেল—সব-দোষে আজ তার কত দুঃ অধঃপতন হইয়াছে। সেদিন রকমে করুণাময়ী মাতার দান বলিয়া সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া নোট খানি হাতে লইয়া বাড়ীর বাইরে আসিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে দোতাশার জাননার দিকে চাইতেই তার চোখে পড়িল একখানি অতি করুণ, সমবেদনা-ভরা হৃদয় মুখ। বৌটার বয়স অল্পই, তার বাবা-ভাই উচ্চ চোখ ছাড়া সত্যজ্ঞের উপর রক্ত মিল, অপরাধী সত্যজ্ঞ সে দৃষ্টি থেকে নিজের চোখ ছাড়া আস্তে আস্তে নামাইয়া লইল, তার মনে হইল ছুটিয়া গিয়া এখনই ঐ জননীর পাড়টা ধরিয়া কমা চাহিয়া বলে, ‘মাগো তোমার এত করুণার উপবৃত্ত সন্তান আমি নই মা, আমি অপরাধী, তোমাকে প্রতারণা করিয়া অর্থ্য করেছি, মাগো আমাকে ক্ষমা কর।’ কিন্তু লজ্জা আসিয়া তার সে স্তম্ভ ইচ্ছাকে বাধা দিল।

### পাঁচ

সত্যজ্ঞের নিজের উপর অত্যন্ত দুঃখ হইল, কিছুতেই যেন তার আর ভাল লাগিতেছিল না, শেষে সত্যই সে একদিন বহুকাল পরে নিজের দেশে চলিয়া গেল। দেশে তার আকর্ষণের কেহই ছিল না। বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কেবল মাত্র তার বাবাবুজ্ঞ হুণীল ছাড়া। হুণীল তখনও তাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত।

অনেকদিন পরে সত্যজ্ঞকে পাইয়া হুণীল বড় খুশী হ’ল।

সত্যজ্ঞ দেশে আসিয়া দেখিল দেশের সর্ববিধ মঙ্গল-জনক কার্যে হুণীলই হইতেছে অগ্রাণী। দেশ হইতে ম্যোরেদিকে তাড়িয়ার জন্ম সে মল-বাধিয়া কার্য্য

করিতেছে। পুকুর-ভোবার পঙ্কাজ্জার করিতেছে, বন-জঙ্গল কাটাইতেছে চাষাও অমৃতত জাতিবিগকে লেখা-পড়া শিখাইবার তাহার উৎসাহ দেখে কে? ভাল বীজ আনিয়া সে দান করিতেছে—জমীর উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্ম ক্রমাগত উদ্দেশ্যে কার্য্যকর করিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। অমৃতত জাতিদের ভিতর গিয়া কুপ্রথাগুলির উচ্ছেদ করিতেছে। এক কথায় দেশের লোকের নৈতিক, চারিদিকে ও সাংসারিক উন্নতির জন্ম সে আশানার প্রাণকে নিয়োজিত করিয়াছে।

দেশের কাজে তার অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া সত্যজ্ঞের বড় আনন্দ হইল। হুণীলও বন্ধুর মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, ‘তুইও চলে আস, সত্য, আমাদের এ পথে, দেখবি কত আনন্দ এতে। অবশ্য তোর সসারের জন্ম আমাদের কাছ থেকে কিছু কিছু সাহায্য পাবি ভাই। তা’তে মোটা ভাতকাপড় চলেবে।’

সত্যজ্ঞের ভারাক্রান্ত মন প্রায়চিন্তই করিতেই চাহিতেছিল। এই-ই হুজোবে সে ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিল—তার স্বরচিত মিথ্যা আজ সত্যে পরিণত করিয়া দাও ভগবান সে যেন নিজ কৃতকর্তার প্রায়চিত্ত-স্বরূপ নিজেকে দেশের কাজে মন-প্রাণ দিয়া উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে। পরদিন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সত্যজ্ঞ নিজের সমস্ত অপরাধ অক্লান্ত চিন্তে স্বীকার করিয়া সেই ঐক্যে নব্বুতীকে একখানি চিঠি লিখিল পরের শোষণে লিখিল :—

“মা করুণালী মা আমার—তোমার অপরিসীম দরোহেই নিজের অপরাধের মাজা বুঝিতে পারিয়াছি মা—তোমার প্রদত্ত আনন্দ সেদিন আমাকে ইঙ্গিতে এই কথাই জানিয়ে

দিয়েছিল। যদি বশেন-সেবার ভাণ করে এত দয়া পেতে পারি, তখন প্রকৃত স্বদেশ সেবা করে দেখ্বে আমার অম-কষ্টের অভাব দূর হয় কি না—অভাবের তাড়নার আমার স্বভাব নষ্ট হইয়াছিল মাত্র করে কিসেরই জন্ম—সেই নষ্ট-গোবর ফিরে আনবার জন্ম দেবীস্বপ্নিনী আমার মা’র আশীর্বাদ চাই। তুমি এই অশ্রম সন্তানের সব অপরাধ ক্ষমা করে তার এই দেশ-সেবারত গ্রহণে আশীর্বাদ কর মা। আমার মন বলে মিছে দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবার আগে তোমার ক্ষমা পাবই পাব।”

সেই বউটার নাম জানা না থাকিলেও বাড়ীর ঠিকানাটা সে দেখিয়া আসিয়াছিল। গানের উপর শুধু “মা” লিখিয়া বাড়ীর ঠিকানার চিঠিখানি পাঠাইয়া দিল।

চিঠিখানা হুলেগার হাতে এখন পৌছাইল, তখন সন্ধ্যা আগন্তপ্রায় সে চিঠিখানি পড়িয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, “আমার এক নৃতন ছেলের চিঠি এই মাজে পেয়েছি পড়ে দেখ।” স্বামী রণজিৎকুমার নিবিষ্ট চিত্তে একখানা বই পড়িতেছিল, চিঠিটা পড়িয়া বলিল, “দিন কতক আগে হুণীলের কাছে ঐ নামে একটা ছোড়োয়ের নাম শুনেছিলাম বলে মনে হচ্ছে, তা ও সব পাশা ছোড়োর, ওদের আবার দয়া করে।”

উত্তরে হুলেগা বলিল, “দেখ, আমি তো’তাকে পাকা ছোড়োর ভেবে দান করি নি, আমি করেছিলাম সংউদেগে, আমার সংউদেগে আমার দয়ার দানের পাজকে সংগণে ফিরিয়ে এনেছে, এই কি, মথেষ্ট নয়? আশীর্বাদ করি সত্যজ্ঞের ‘সত্যজ্ঞ’ নাম মফল হোক।” হুলেগার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—সেই হাত-ভালো ছেলটার অস্তি করণ মনিন মুখখানি।



## সূর্য্য প্রণাম

ঐহবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সরস্বতীর পবিত্র নীরে পূর্ণ শয্যে, ধনিত সাম—  
সন্ত-কুপ-রক্ষিতে তব চিহ্নিত 'ঐনি-বিজয়' নাম।

শ্রামণী ধরার তুণ-পরায়ে,  
অরুণ-বন ঘেঁষে-সৌরভে,  
মৃত্তিকা হ'তে বহা-গৌরবে

গুপ্ত ওজস্ব—কি অভিরাম,

শূণ্যপাবন, আদিত্যদেব, হে বিকার তাহ—সহ প্রণাম।

ভীষণ, করাল ঘনতমিস্রা শাসিত রূপাণে দীর্ঘ করি,  
হিরণ্যশাশি, ভেসে ওঠে দেব উদার মধু-মুহূর্ত্ত পরি!

আজি দুর্ঘ্যোগে, সূর্য্য তোমার,  
কিরণ-পথতে হানো উজ্জ্বল—  
উদয়াচলের গলিত নৌহার,

শিহরি উঠিছে তোমারে 'অরি'  
মেরু-তিমিরের বক্ষের মাঝে প্রথম চেনা!—  
প্রণাম করি।

ভাস্কর তুমি, দেবতা জ্যোত, নেত্র-মণিকা তুমি সবার,  
সন্ত-নিষ্ঠ মেঘলা-শোভিত লহ বিম্বের নমস্কার।

মর্ম্ম-শোণিতে এ কি ক্ষুদ্রতব,  
সমিধ, হবির দাধ-দৌরভ,  
দকিণ-মুগ্ধে, প্রসাদ-বিভব

উদ্ভাসি' তোলা অগ্নিত মানর,  
তোমারি প্রণামে অক্ষত কত ঋণ-দেবতার সহস্রার।

ছায়াবন কোন্ প্রদোষ-কালের প্রথম আলোর প্রতীক তুমি;  
হে সখি, তোমার জ্যোতি-সঙ্কারে, কাঁপে নৈমিষ-কানন-ভূমি!

বনে-পূর্ণিতে সোম-বরষা,  
কণ-রোমাঞ্চে উঠিছে 'শিহরি';  
গুপ্ত চেনার সৌরভে 'ভরি'

প্রত্যাতা ফুলেরা উঠে 'সুখনি'—  
পূর্ণ-তোরনে 'সু-ভূ-ব'-প্রাণ; অরুণ তোমার চরণ চুমি।

## আলাপ-আলোচনা

'নীল-নাগিনী বেণা'

প্রেম ও অহিংসা একদিন জগতে জয়লাভ করিবেই।  
গন্ধীজী বৃদ্ধার তাহার নীতি প্রচার করেন নাই।  
ইহার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন  
গ্রাসের হিন্নোমিত পোষাকে সজ্জিত, তখনকার মত  
'স্যাণ্ডাল'-দ্বারা আবৃতপদ হৃন্দরী ও তরুণী একজন  
আমেরিকার মহিলা বোম্বাইয়ের লোকবহুল রাস্তা ত্যাগ  
করিয়া আবু-পূর্ণিতে গন্ধীজীর মুক্তি অপেক্ষা  
করিতেছেন।

ভারতবর্ষীয়ারা তাকে বলে 'নীল-নাগিনী দেবী'।

তার বর্ধাধ নাম 'নীলা জ্যাম কুক'। পার্গাসাস্ পাহাড়ে  
গ্রীসের রাবাণদের মাঝে যিনি বসবাস করিতেছেন  
এবং লেখানোই যিনি লোকান্তরিত হ'ন, আমেরিকার  
কবি সেই জ্যাম কুক ছিলেন ইহার পিতা। ইহার বয়স  
মাত্র একশ বৎসর। ত্যাগ, সেবা ও সন্ন্যাসধর্ম্ম-পালন-  
মানসে ইনি গ্রীস হইতে গন্ধীজীর আশ্রম-অভিমুখে  
তীর্থযাত্রা করিয়াছেন।

চতুর্দশ শিবসম্মানী উপবাস ও প্রার্থনার দ্বারা ইনি  
প্রাণশিষ্ট করিয়া শুদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন,  
গন্ধীজীর বাহা আদর্শ, সেই আদর্শের সন্ধানে পঞ্চদশ  
বর্ষ বয়স্ক হইতে ইনি সন্তুত গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া  
আসিতেছেন। সাংসারিক জীবন কেবলই মায়া—তিনি  
তাই সেই জীবনধারা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইনি অমিক্ত বলিয়াছেন, যে গন্ধীজী তাহাকে  
দেখিলে উপশান্তি করিবেন যে, তাঁর আদর্শ-সম্মুখে তাহার  
অহুতি ও শ্রদ্ধা খোয়াল বা জীহ্বলত অকারণ ভক্তি  
বাহ্য-প্রসূত নয়। তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য

ত্যাগ ও প্রেমের সনাতন পথ অঙ্করণ করা। তিনি  
একথা বুঝেন যে প্রেমের, নরতার ও সত্যের সাহায্যে  
গন্ধীজী জগতে মুক্তির পথ দেখাইবেন। গন্ধীজী  
কোন ঐক্সজালিক ব্যাপার নহেন। বেদের বে বানী  
চিরদিন সত্য, শাস্তি ও প্রেমের পথ। নিদর্শন করিয়া  
আসিয়াছে—তিনি তাহাই শিক্ষাকে সুখক করিতেছেন।

শ্রেষ্ঠতর ও মহত্তর জীবনের সম্বন্ধে তাহার যে  
ধারণা স্থাপন ছিল, গন্ধীজীর মধ্যে তিনি তাহাকেই মূর্ত্ত  
দেখিতেছেন। তিনি একজন গুরু পাইবার লজ্জা  
উদগ্রীব ছিলেন। গন্ধীজীর ভিতর তিনি তাহার বর্জন  
পাইয়াছেন। তিনি মহাত্মাজীকে চোখে না দেখিয়াই  
শুধু তাঁর অনুভবের দ্বারা তিনি গুরুপদে বরণ  
করিয়াছেন। ভবিষ্যতে গন্ধীজী হইবেন তাহার প্রথমদর্শক  
ও পিতা, তিনি হইবেন তাহার শিষ্য ও কন্যা। গ্রীসে  
অবস্থানকালে শ্রীমতী কুক সেখানকার 'সিগটার্ন্স অফ  
চারিটি'দের মধ্যে এবং কুবকদের মধ্যে বহনের প্রচলন  
করাইয়াছিলেন। তিনি এখন এই কার্যকে দরিত্রের  
মোক্দের উপায় বলিয়া প্রচার করেন, তখন লোকে  
বলিয়াছিল ওই বিদ্যাকে তিনি একটা ধর্ম্মমতে পাড়  
করাইবার বাতুলতা পোষণ করেন।

স্বয়ং ও বয়ন-সম্বন্ধে গন্ধীজীর 'কি গভীর বিশ্বাস  
আছে তিনি তাহা অবগত। গন্ধীজীর নাম শুনিবার  
পূর্বে হইতেই তাহার নিম্নের ও সেই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল  
ব্যক্তিগত অবিজ্ঞতার ফলে। ইহা সর্বাধারগত কারখানার  
কবল হইতে মুক্তি দিবে' এবং তাহাদের ক্রীতদাস-  
জনিত দরিদ্র দূর করিবে।



ভারতবর্ষের কুটিলত্ব একা-সময়ে শ্রীশুক বেষ্ট রমণি

ভারতবর্ষের কুটিলত্ব একা-সময়ে পক্ষি ভারতের প্রাণক গ্রন্থকার ও কবি শ্রীশুক বেষ্ট রমণি বাহা বলিয়াছেন তাহা অস্বাভাব-যোগ্য। তিনি বলেন যে, তিনি বতই ভ্রমণ করিতেছেন হুবাক্ষেপ হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কুটিলত্ব ও ভাবগত একতার বিষয় ততই তাহার দৃষ্টিতে মুক্ত হইতেছে। সর্বসাধারণের লোকের লক্ষ্য ও স্বভাব একই প্রকারের। তাহা হইতেছে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের প্রতি, বিশেষতঃ পাতী ও নদীর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা। যে নিকট আশ্রয় ভারতবর্ষের রাজ-নীতিগত একাকার ও ঋতনপ্রায়ী তাহার মূল আছে কাহনের মধ্যে চুনি বনাইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে বর্তমান প্রয়োজন-অনুসারে পূর্ণ-করিয়া তুলিবার প্রকৃতি।

কিন্তু নূতন শিল্পীতে, হৃদয় প্রায়সতঃ নবজীবনের এই ছন্দের মৃত্যু ও নাড়ীর স্পন্দনের পরিচয় পাওয়া যায় না। সেখানে তরুণত্ব পরিবেশ নাই। নূতন শিল্পী যেন বহা-বাসেযোগ্য অস্তিত্বের ঐক্যবন্ধকপূর্ণ একটা যানমাত্র। তরুণের জীবনের বৈচিত্র্য ও ঐক্যের সেখানে নাই; জরিপ-নিবন্ধের ন্যায়কাঠি তাহাকে বিশেষ পরিমাণে অস্বাভাব্য একধারে করিয়া তুলিয়াছে। ভারতীয় জীবনের বিবিধ ও বিচিত্র মনুনা ও রঙ্গের খেলা সেখানে নাই।

সেখানকার আশিস-বাড়ীর যে কাঠিগের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা বার দিলাম। তিনি অতঃপর বলিয়াছেন, জাতীর নাড়ীর সঙ্গে হৃদয় দিল্লীর কোন ঘোষণা নাই। জাতীর জীবনের শোক্ষময় বা হর্বোৎসব কোনো অস্বাভাব্য পরিচয়ই সেখানে পাওয়া যায় না। তিনি দিল্লীতে পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া অনেক বাক্য শুনিয়াছেন, কিন্তু সে সব বাক্যের মধ্যে ভারতবর্ষের বর্তমান চাক্ষুষ্যের কোনো ভাণই ছিল না।

হৃদয় দিল্লী এখন কেবল রাজনীতিরই কেন্দ্র। ইহাকে ভাব ও কুটিল কেন্দ্র করিতে হইবে, কারণ রাজনীতির চোরা-বালির উপর কুতুবের মত কোন জিনিস গঠিত হইতে পারে না। নূতন দিল্লীতে এমন কিছু থাকি চাই ইয়া অস্বস্তঃ সময়ে সময়ে ভারতের ও জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার ও শ্রেষ্ঠ চরিত্রের লোককে আকৃষ্ট করিবে। যখনকো নগরীর মধ্য দিয়া বহাইতে হইবে, আর উহার কূপে থাকিবে ব্যাধ, এছাড়া, সঙ্গীতালয়, নাট্যমন্দির এবং সাধারণের মেলা-মেশার আনন্দজনক প্রতিষ্ঠান। জানি না শ্রীশুক বেষ্ট-রুমগিরি নূতন শিল্পীকে আকর্ষণীয় করিবার কামনা সকল হইবে কি না। যদি হয় তাহা হইবে এবং ও বিলম্ব আছে এমন ভবিষ্যদ্বাণী আমরা নির্ভয়ে করিতে পারি।

প্রথম ভারতীয় রমণী ডি-পি-এইচ (লণ্ডন)

বোম্বাই শহরের মিউনিমিপ্যাল মাড্রমন্দিরের প্রধান কর্মচারী ডাঃ জ্যাকোব মাটোলে, এম-পি, বি-এস, ডি-পি-এইচ (লণ্ডন) সেখানে হইতে সাধারণ বাগ্ম-সম্মেলন লণ্ডন-বিখ্যাতালয় হইতে ডিমোমা ও উপরি পাগু হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। রমণী ডাঃজ্যাকোবের ভিতর তিনিই সর্বপ্রথম এই প্রণাম্যর্ক উপাধি গ্রহণ হইয়াছেন। আশা করি নূতন অভিজ্ঞতার সহিত মাড্রমন্দিরের কর্ম তিনি স্বচ্ছন্দরূপে চালাইতে পারিবেন। এই সময়ে বিশেষজ্ঞের অপ্রাণন অভ্যস্ত বেশ। এখনও এদেশে অশিক্ষিতা ধার্মীদের জন্ম প্রকৃতি ও জাতকেন্দ্র যে কত বিদার ঘটতেছে তাহার সংখ্যা কয়া যায় না। অবশ্য তাহারও কারণ কতকটা অর্পের অনাতি।

চৈনিক কবির শোচনীয় মৃত্যু

চীনের কবি-সন্ন্যাসী হু-সি-মউএর অপভ্রান্ত মৃত্যু ঘটিল। চীনেদের সাহিত্যিক যে নব-জাগরণ দেখা দিয়াছে, তিনি ছিলেন তার অজ্ঞতম নেতা। ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদপত্র হইতে জানা যায়, যখন তিনি আকাশ-পথে গির্জা, অভিমুখে বাতাস করিতেছিলেন, তখন বাতাস এদেশে যন্ত্রণানি ঘটায় ভয়ানক হইয়া যায়।

তাগাতেই তিনি ও ভয়ানক হন। তাহার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় নাই। মৃত্যুকালে তাহার বয়ঃক্রম, হইরাছিল মাত্র ৩৪ বৎসর।

এই অজ্ঞানের ভিতর জাতীয়-জীবন-গঠনে তিনি যে সহায়তা করিয়াছেন তাহা চিরদিন চীনারা মরণ করিয়া রাখিবে। তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাঃ পু-সি-মএর অধিনায়কত্বে সাহিত্যে নূতন পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—কবিগুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈনিক প্রসিদ্ধ-ছাত্র। তিনি জগতের রক্তের সন্ধান পাইয়া অস্বাভাব্য করিয়া সেই সকল তাহার দেশপুত্রীয় নিকট উপস্থাপিত করিতেছিলেন। সেন্সপীররের অস্বাভাব্য অন্ধর নাটকের তিনি অস্বাভাব্য করিয়াছিলেন; কিন্তু হৃদয়ের বিষয় তাহার আরও কার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

ছিলেন। তাহার জানপট কবিতা ও প্রবন্ধাদি চীন-দেশের সাহিত্য বিষয়ক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইত।

‘জয়শ্রী’-পত্রিকার পুস্তকপ্রকাশ

মাসিক ‘জয়শ্রী’-পত্রিকার কুমারী লীলাবতী নাগ ও কুমারী দেবুলা সেন সম্পাদিকাভ্যে নিকট হইতে পত্রিকা-প্রকাশের জন্ম জামিন চাওয়ায় পত্রাধীন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি ঢাকা হইতে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যে, লীলাবতী সর্বস্বত্ব জামিনের আদেশ প্রত্যাখার করার পুনরায় শীঘ্র পত্রিকা প্রকাশিত হইবে; কিন্তু হৃদয়ের বিষয় সম্পাদিকা উভয়ে অভিজ্ঞদের আশাশীল বরূপে হুদী বেগে আশঙ্ক আছে সেখানে হইতে পত্রিকা-সম্পাদন ব্যাপার সহজ হইবে কি ?

আকাশপথে রবীন্দ্রনাথ

গত ২১ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ডাচ দেশের এ. ফন ডাইক-এর ‘রেনে’ ২০ মিলিট আকাশপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার সহযাত্রী ছিলেন ডাচ কলাল ও তাহার পত্নী। এতদিন কবি মানস-লোকের বিরণ করিয়া কতক নূতন ভাণের সন্ধানই না দিয়া আসিয়াছেন, এমন এই বৃদ্ধ বয়সে আকাশপথে বাতাসে তিনি যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকি যায় না। ইহার পূর্বে তিনি একবার ক্রমেশ্বর হইতে গিয়াছিলেন আকাশপথে গিয়াছিলেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ মরণ করিয়া শিল্পী ডাঃ অরুণোদ্রনাথ যে অনিন্দ্যময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমরা পাঠকবৃত্তিকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। শীঘ্রই তিনি পারস্তরাজ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া পারস্তে আশাপথবে-গমন করিবেন, ভগবান তাহার যাত্রা-পথ সুগম করিয়া দিান।

বেংল-কলেজের শেঠী-শ্রীশিখার কবি

গত ২৮শে জানুয়ারী বেংল কলেজের কয়েকজন ছাত্রী বিভাগের উপস্থিত না হইবার কারণে শেঠী-শ্রীশিখার শ্রীমতী রাজকুমারী দাস এম. এ., মহোদয় বিভাগে কবিতা না কি একজন ছাত্রী উত্তর দিয়াছিল ‘হরতাল বন্ধ’

পৃথিবীর বহুদেশ তিনি ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। মানব-চরিত্রে তাহার দৃষ্টি ছিল, তিনি চীন দিখবিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করিয়াও বাংলা দেশে হইয়া-



আমরা আশিতে পারি নাই। ইহার জড়ই নাকি এই ক্ষেত্রায়ী তারিখে তাহাকে কলগে হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। ঐ ছাত্রী প্রতি সমবেশনা দেখাইবার জন্ম ছাত্রীয়া নিবিত হইয়া রিত করে যে, অধ্যক্ষ "মহাশয়ার নিকট তাহার অসুস্থতার করিবে যেন তিনি অসুস্থগ্রহ করিয়া তাহাকে এখানে মত সতর্ক হইতে আদেশ করেন ও তাঁহার আশে প্রত্যাগার করেন; কিন্তু তাঁহাদের বিষয় তিনি এ কার্যে স্বীকৃত না হইয়া যে সকল সপ্ত দেন তাহাতে ছাত্রীয়া রাজী হইতে পারে নাই, ফলে বহু ছাত্রী তাঁহার এই আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। কপে শ্রীমতী দাস বহু ছাত্রীকেই বিদ্যালয় হইতে নাক কাটিয়া দেন। ইহার ফলে সারা কলিকাতা শহরে বেশ কয়েকদিন চাক্ষুষ দেখা গিয়াছিল। সন্যাসদের মারকত জানিতে পারা যায় যে, বিবিদ্যালয়ের পূর্বতন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রক্রেয়নাথ সরকার মহাশয় কোন এক বিতাক্তি ছাত্রীর জন্ম দেখা করিতে গিয়াও তাঁহার সহিত দেখা করিতে অসম্মত পান নাই।

অল্প অসম্মতি না দেওয়া যে কোনরূপ বোঝের কার্য তাহা বলি না। শিলা বিষয়ের বহুবাহু তাঁহার অপেক্ষা অধিক দিন ব্যাপ্ত ছিলেন। বিবিদ্যালয়ের কর্ণার জপেও তিনি ছাত্রদের সহিত অনেকদিন কার্য করিয়াছেন, এখন তাঁহার জায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করিলে বোধ হয় কোনরূপ ক্ষতি হইত না, বরং দাস মহাশয়া যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার একটা সরল পথ দেখিতে পাইতেন। যাহা হউক তাঁহার পর ব্যাপার গুরুতর হইয়া পড়াইল। ফলে 'ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের' উপর ভরস্বে ভাব পড়িল। বিবিদ্যালয়েও এ বিষয়ে আলোচনা হইল। এ দিকে বাস্তবিকগত বিনাসপ্তে টাঙ্ককার পত্রসংগ্রহায় গোমোযোগের মায়াংসা হইয়া গেল।

আমরা এই মায়াংসা-ব্যাপারে বাস্তবিকই সুখী হইয়াছি। তবে শিকড়িতী প্রিন্সিপাল দাসের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। যদি পূর্বে হইতই তিনি একটু সাবধানতার

সহিত কার্য করিতেন, তাহা হইলে এতদূর গড়াইত না। ছাত্র-ছাত্রীয়া যদি তাহাদের পিতৃ-মাতৃকুল্যা অধ্যাপকদের প্রতি কষ্ট হয় তাহা হইলে কি হুজিতে হইবে না যে উভয়ের ভিতর শ্রীতির বন্ধন যে কোনও কারণে শিথিল হইয়াছে? একটু সহ্যভূতি দেখাইলে কত অল্প সময়ের মধ্যে গোলযোগ মিটিয়া যাইত। একদিন ছাত্রীয়া না আসায় যত তাহাদের ক্ষতি হইয়াছিল বহুদিন বিদ্যালয়ে না আসায় তাহাদের কি অধিক ক্ষতি নাই? যে সকল শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদিগকে আপন পত্র কলার জায় ব্যবহার করিতে -। পাত্রেম তাঁহাদের এই গুরু-পারিত্রিক ব্রত গ্রহণ না করাই উচিত। হয়তালে প্রৌণধান কোনরূপে সমর্থন-যোগ্য নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত একথা আমরা কোন মতে কোন ক্ষেত্রেই স্বীকার করি না, তথাপি বলিতে বাধ্য যদি কোন বিশেষ কারণে চিত্তের সরসতার দরপ কিংবা ভাবপ্রবণ বলিয়া তাহারা যদি বিদ্যালয়ে একদিন নাই বা থাকে তাহা হইলে তাহাদের সেই পিতামাতার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা কি উচিত নয়। পিতা মাতার অপেক্ষা অধিকতর দরদ দেখাইতে গেলে বাংলা-দেশের সর্বজনবিদিত প্রবচনের কথাই মনে পড়িয়া যায়।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, এই সকল ছাত্রীকে যদি ভালবাসিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়া আপন করিয়া লইতে পারিতেন, তাহা হইলে বৃত্তিমতা তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষারত্নী— তাহাদের শেখ বা ক্রটি-কিছুভিত্তি যদি সাপেধন করিতে পারিতেন তাহা হইলে শুধু ছাত্রীদের নয় বা তাহাদের অভিভাবকদের নয়—সমগ্র দেশের মঙ্গল-সাধন করিতে পারিতেন। 'ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন' মহাশয়ের মধ্যস্থতার যদি ছাত্রীদের ও শ্রীমতী দাসের মনোমালিঙ্গ দূর হইয়া সত্য বাস্তব হইত তাহা হইলে, তর্কহীন ধরিতা লইয়া ভ্রান্ত ছাত্রীদের চরিত্র সাপেধনও হইতে পারিত। এক্ষেত্রে অধ্যক্ষ মহাশয়া আপনায় জেব বলার রাখিলেন সত্য, কিন্তু বাস্তবতার ছাত্রীদের জ্বর জ্বর করিতে পারিলেন না।



শ্রীশৈলীশঙ্কর দাসের বক্তব্য বিশ্বভাষার প্রেস, ২১৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে মুদ্রিত

এক পঞ্চপুণ-কার্যালয়, ৩১ তেলিপাড়া স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

সর্বপ্রকার

শিল্পী—প্রতাপচন্দ্র বসু



কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি  
গবেষণা কেন্দ্র  
১৮/এম, ট্যামার সেন, কলকাতা-৭০০০০৯



চতুর্থ বর্ষ  
দ্বিতীয়ার্ধ

ভৈষজ্য, ১০০৮

সংস্কৃতি

## বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর রাজ্য-সংস্থাপন

ত্রিযোগেশ্বর প্রবোধ

'ঘরমুখো বাঙ্গালী' বলিয়া বাঙ্গালার একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। জমি না কোন সময়ে এবং কি কারণে এই প্রবাদের উৎপত্তি। ইতিহাস কিন্তু ইহার বিপরীত সাক্ষ্যই প্রদান করিতেছে। বাদলাদেশ নদীমাতৃক এবং সমুদ্রতীরবর্তী। সমুদ্রতীরের অধিবাসিগণ যে নৌবিভা-বিভাগ হইবে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাঙ্গালীর পক্ষে এই সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। বাঙ্গালী যে জাতি প্রাচীনকালে সমুদ্রে যাত্রারত করিত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাঙ্গালার প্রাচীন বন্দর তায়-লিখ। বাঙ্গালী যে ধর্মপ্রচার, বাণিজ্য এবং বিজয়-অক্রি-যানের জন্য প্রবাসিত: সমুদ্রযাত্রা করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কালিদাস বাঙ্গালীগণকে 'নৌসামনেজিত' বলিয়া গিয়াছেন। ফরিদপুর জেলার ঘুঘরাহাটিতে প্রাপ্ত যট শতাব্দীতে প্রদত্ত মহারাজ ধর্মদামিত্যের তাম্রশাসনে

'নাবাতাকেনি' ও 'নৌগণ'-শব্দের ব্যবহার দ্বারা ঐ স্থানে জাহাজ নির্মিত হইত এবং বন্দর বা পোতাধিষ্ঠান ছিল তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। মোঘল-রাজ ঈশান বর্ধা-কর্তৃক প্রদত্ত ষট শতাব্দীর দ্বারা-লিপিতে গৌড়বাসিগণকে 'সমুদ্রাশ্রয়ান্' অর্থাৎ সমুদ্রতীরবাসী বলা হইয়াছে। মুঘলমান-রাজত্বকালেও দেখিতে পাই বাঙ্গলা বা চকরাপাতিপতি (বর্তমান বরিশাল, ফরিদপুর ও খুলনা) মহারাজা পরমানন্দ রায় ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজদিগের সহিত স্বাধীন রাজ্যের ছায় সন্ধিস্থজে আবদ্ধ হইতেছেন। এই সন্ধির একটি সর্ভ এই যে, পর্তুগীজগণ আর বাণিজ্যের জন্য চট্টগ্রাম বাইবে না। বাঙ্গালার উপকূলেই তাঁহাদের বাণিজ্য আবদ্ধ থাকিবে এবং বাঙ্গলাবাসিগণ পর্তুগীজদিগের অধমত:পাত্র লইয়া গোরা এবং ভারত-সমুদ্রে অর্ধাস ও মলকায় বাণিজ্য করিতে যাইতে পারিবে। বেনারসিদের কথা নহে,



ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম ভাগে (১৭৬২ খৃষ্টাব্দে) বরিশাল জেলার বালাকাঠী বন্দরের অপর তীরস্থ মণিপুর বন্দরে ৬০০ টন অর্থাৎ ১৬০০ মণ বোকাই হইতে পারে এরূপ জাহাজ প্রস্তুত ও বোকাই হইয়া সমুদ্রে বাণিজ্য করিতে গিয়াছে। এই মণিপুকে পূর্ববঙ্গের নাওদার-মহলের নৌকা প্রস্তুত ও সেরামত হইত। কেমানক দাস-বিরচিত 'মনসার ভাসান' ও বাঙ্গাল নাটকগণের উল্লেখ আছে। নৌদারবাণী ও চট্টগ্রামের সমগ্রণ এবং বিলাতি জাহাজে কাণ্ডা করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্ম সমুদ্রব্রাজ্য করে মত তথাকাক্ত হব্যকব্বে বর্ণন করিতে নিবেদ্য করিয়াছেন—(৩য় অধ্যায়, ১৪৮ পৃষ্ঠা)। যেখানে মহ 'সমুদ্রব্রাজ্য' লিখিয়াছেন, মহাভারত সেইখানে 'সামুদ্রিক' অর্থাৎ পদ ও কর্তন্যারি রেখা বিচার দ্বারা বাহারা কীবািনসীর্ষা 'করে তাহাদিকিবেই অণাত্তের বসিয়াছেন (অনুগমনপর্ক, ২০ অধ্যায়)।

সমুদ্রব্রাজ্য-সম্বন্ধে স্মৃতি কিংবা পুরাণের নিবেদ্যবিধি যে ক্ষুণ্ণ; বাঙ্গালারূপে প্রতিপালিত হইতে না তাহার প্রথম চারদিকের ইত্যারি বর্ণিবার্থ সিংহল ইত্যাদি দেশে গমনাগমন। বঙ্গদেশীয় সওদাগরগণ যে দক্ষিণ ভারতের নানাহাদে বাণিজ্য করিতে বাহিত ভারতও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সীমোগে জেলাধি সিকারপুর তালুক প্রাপ্ত ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপিতে দেখিতে পাই লাল (রাঢ় চাঁ), গোল (গৌড়), কৰ্ণাট, বঙ্গাল, কান্দীর প্রভৃতি নানাদেশের গ্রাম, নগর ইত্যাদি হইতে আগত সন্ন্যাস বণিকগণ তথায় বাস করিতেছেন।

কত প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গবাসিগণ অজস্রমতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ডাক্তার গঙ্গাধর মিত্র 'সিঁথিরাচন' যে, প্রশাস্ত মহাপ্রাণের পলিনেসিয়ার অধিবাসিগণের চেহারা সতি বাঙ্গালীর চেহারা আশ্চর্য্য মাত্র মত্টিরাছে। হাওয়াই ও নিউ-জিল্যান্ডের লোকগণে তঁহাকে অনেক পলিনেসিয়ান বলিয়া বলা করিত। নিউ-জিল্যান্ডের প্রথম যাত্রার মধ্যে কলা একটা। তিনি মনে করেন অই কলুগাছ পূর্ববঙ্গ হইতে নীত হইয়াছে। তাহাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর মধ্যে মুরক ও মুরগী। ডাক্তার মিত্র মনে করেন, ইহা পূর্ব-ভারত অথবা ব্রহ্মদেশ হইতে আশ্রয়িত হইয়া থাকিবে। পৃথিবী-

সম্বন্ধে তাহাদের প্রাচীন বিশ্বাস ক্ষুণ্ণবাদের নাস্ত্যাহক ও ও মৃত্যুপুরাণের অঙ্গরূপ।

নবম শতাব্দীতে জনপদবাণী হিরণ্যদাম নামক এক ব্রাহ্মণ কাথোভিত্তিতে তত্ত্ব প্রচার করেন। ডাক্তার বিজয়-রাজ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন, হিরণ্যদাম কর্তৃক প্রচারিত তত্ত্বগুলি বাঙ্গালার বিশিষ্ট তত্ত্ব। জৈন ভগবতীহুত্কাহ্মায়ে বহু যৌক্তিক মহাজনপদের অঙ্গতম। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বাঙ্গালারূপে দামপদবীর্ষিষ্ট ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল কারণে হিরণ্যদামকে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ মনে করা বাইতে পারে। ইহা ভিন্ন নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ উচ্চিষ্ঠা ও দক্ষিণ ভারতের বহুস্থানে বাসস্থান করিয়াছেন দেখিতে পাই। তাহাদিগকে যে তদেশীয় ব্রাহ্মণ ভূমিদানে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহা তাহাদের প্রদত্ত তাম্রপাত্রাদি হইতে জানা যায়। ইহাদের মধ্যে একজনকে—বিবেশ্বর শিবচাণ্ডীর কীর্তিবলা আমরা গত মাঘ মাসের পঞ্চমশ্রেণে প্রকাশ করিয়াছি।

অমরা এখন বাঙ্গালার বাহিরে কয়েকটা বাঙ্গালীর রাজ্য-সংস্থাপনের কথা বলিব।—

বিজয় সিংহ

বাঙ্গালী রাজপুত্র 'বিজয়সিংহ' যে সিংহল-বিজয় করিয়া তথায় রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা অনেকেরই জানেন, হুতরাং সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না।

মহাবলি বা বাণরাজ্যবংশ

ইহার মৌর্যের অকলে রাজত্ব করিতেন। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই বংশের প্রাচীনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন গঙ্গ, কন্ব ও চোল রাজবংশের দ্বিতীয় শতাব্দীর লিপিতেও এই রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার বলি বা মহাবলি পুত্র বাণের বংশধর বলিয়া পরিচিত। বাহুপুরাণে লিপিত আছে, মহাবলি পুত্র অশুর বাসে অশুর বলি পুরুষেশ্বরী রাজ্য হেমনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা বলি চৈতন্যচরিতামৃত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, হুজ ও গুণ্ড নাম পাঁচটা ক্ষেত্র পুত্র লাভ করেন। তাঁহার পুত্রগণের নামানুসারে

• বিজয়-সিংহ যে বাঙ্গালী ও সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

—পঞ্চপুশ-সম্পাদক

পাঁচটা স্বতন্ত্র জনপদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আবার বিষ্ণুপুরাণে লিপিত আছে যে, বলিপুর বাণের রাজধানী ছিল শোণিতপুরে। 'অধ্যাপক ভাণ্ডারকর দেখাইয়াছেন যে, মেঘদেশের আভিমান-ভিত্তিমণিতে বাণপুরের অঙ্গ নাম—শোণিতপুর, দেবীকোট, কোটাবর্ষ ও উদ্যান। বিনাঙ্গপুর জেলার বাণগড়ে বাণরাজ্যের বাড়ী ছিল বলিয়া প্রবাদ। এই বাণগড় দেবীকোট নামেও পরিচিত। দামোদরপুরে প্রাপ্ত পঞ্চম শতাব্দীর তাম্রপাত্রে কোটাবর্ষের উল্লেখ পাওয়া। হুতরাং নানা প্রমাণেই দেখা বাইতেছে যে, বলি ও বাণের রাজ্য ও রাজধানী বঙ্গদেশেই ছিল। এই বাণের বংশধর কেহ কোন কারণে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রথম শতাব্দী কিংবা তৎপূর্বে রাজ্যস্থাপন করিয়া থাকিবে। সেখানে গিয়াও ইহার রাজধানী দেবীকোটের নাম বলিতে পারে নাই। ইহার উপকূলে কোলাবন নদীর মোহানায় দেবীকোট তাঁহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

গঙ্গ-রাজবংশ

ঐতিহাসিকগণ গঙ্গরাজবংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য। পাশ্চাত্যগণ মৌর্য, কুর্প, উত্তর অস্কি, তাভোর ও বেলগন অঞ্চল এবং প্রাচ্যগণ পুণ্ড্র ও উচ্চিষ্ঠার রাজত্ব করিতেন। পাশ্চাত্য গঙ্গরাজবংশ ইকুংবংশীয় এবং কাশ্মির-গোত্রীয় এবং প্রাচ্যগণ তুর্গহ-বংশীয় ও অত্রের-গোত্রীয় বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্যগণ বলেন, ইকুংবংশীয় ভরত রাজার রাজ্য বিজয়মহাদেবী গর্ভাবস্থায় গঙ্গাধার করিয়া গঙ্গাধর নামে পুত্রলাভ করেন। এই গঙ্গাধরকে বংশীয়রাই গঙ্গবংশ নামে ব্যাভ করেন। গঙ্গাধরের পুত্র বিষ্ণুগুপ্ত। ইহার দুই পুত্র শ্রীকর্ত ও ভগদত্ত। শ্রীকর্ত পৈতৃক রাজ্য এবং ভগদত্ত কলিঙ্গ রাজ্য প্রাপ্ত হন। শ্রীকর্তের বংশে পরজাত উজ্জয়িনীরাজ, মহাপাল-কর্তৃক আক্রান্ত হন। ইহার পুত্রদেব দিগ্ধি ও দাবর (কাশ্মিরবংশ) দক্ষিণে গিয়া 'উনোচ্যার্য' সিংহনরীণী সাহায্যে দ্বিতীয় শতাব্দীতে গঙ্গাবাদী নামক রাজ্য কুলপাল নামক রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার বাণরাজ্যগণকে পরাভব করেন এবং কোলনদেশ জয় করেন। ইহার দশম শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন।

প্রাচ্যগঙ্গগণ বলেন, যথারিত পুত্র তুর্গহগঙ্গার আরাধনা করিয়া গঙ্গের নামে পুত্র লাভ করেন। এই গঙ্গের হইতেই 'গঙ্গাবংশ'-বংশ নামের উৎপত্তি। গঙ্গদেশের বংশে কোলাবন গঙ্গাবাদী রাজ্যে কোলাহলপুরী স্থাপন করেন। কোলাহলের বংশে বীরসিংহ জয়গ্রহণ করেন। বীরসিংহের পঞ্চপুত্র—কামার্ব, দানার্ব, গুণার্ব, মারসিংহ ও বহুহর কামার্ব পিতৃব্যকর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া গঙ্গাবাদী ত্যাগ করিয়া পূর্বদিকের আসিরা মহেন্দ্রসিংহের রাজত্ব করিয়া গিয়া। এই বংশে গোপের বাণীরা আসিরা করিয়া কলিঙ্গ রাজ্য লাভ করেন। ইহার পঞ্চম শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। প্রাচ্যগঙ্গগণ একটা 'সংবৎ' প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন 'গঙ্গের সংবৎ'। আমরা ইহার আরম্ভকাল ৪৯৪ খৃষ্টাব্দ অবধারণ করিয়াছি।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের ধৃ: পু: চতুর্থ হইতে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে লিপিত বিবরণে গঙ্গ-জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার গঙ্গরিডি প্রদেশ-বাণী ছিল। টলেমীর ম্যাপে গঙ্গরিডির অবস্থান গঙ্গার মোহানার নিকট দেখান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, গ্রীকগণ গঙ্গরাজ্যকে গঙ্গরিডি করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার এই দেশকে গঙ্গ-কলিঙ্গও বলিয়াছেন। দক্ষিণ বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া এই দেশ সমুদ্রবন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেট মাটিন বলেন, দক্ষিণ বিহারের গুল্টি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গঙ্গারী এবং পূর্ব-বঙ্গের গুল্টি জাতি, এক গঙ্গ জাতিরই বিভিন্ন ছিল। গ্রীক হুকাব ও সেনে যে, গঙ্গগণ গঙ্গারীরাব্দী ছিল বলিয়া ইহার 'গঙ্গ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার বাঙ্গালী ও বিহারের গঙ্গের প্রদেশে বাস করিত, পরে ক্রমে ক্রমে কলিঙ্গ পর্যন্ত ইহাদের উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার 'যন' দক্ষিণ ভারতে মুাইয়া রাজ্য-স্থাপন করিল, তখন ইহার ইহাদের নৃত্য রাজ্য ও রাজধানীর নামকরণ গুরাতনের নামেই করিয়াছিল। বাওবিকপকে উজ্জয়, দলের বিবরণেই দেখিতে পাই ইহার গঙ্গের প্রদেশের সঙ্গে সামিল ছিল। রাজধানী নামেও সমৃদ্ধ রহিয়াছে। আমাদের মনে হয় ভাগলপুর জেলার কোলপাণ্ডাই (ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লুপ-সাইবর্গ কলগুও জৈন প্রাচীন কুলপাল বা কোলাহল-



পূর। এই স্থানে এখনও একটা প্রাচীন শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। এই স্থান পদাতীতে রাস্তা প্রাপ্তে অবস্থিত। যোগলিশের সময়ও এই ব্রহ্মকে বাঙ্গালার প্রবেশের দ্বার বন্ধ কর মনে করা হইত। ইহার, নিকটই 'তৈলিগাড়া' বা গটিকে প্রথম প্রাচীন ইতিহাসিকগণ শিবদ্বারের সাহায্যে স্বর্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সাহায্যের জন্য যেমন শিব-প্রবেশের প্রবেশদ্বার বন্ধ, পাচ ও ভক্তগণ বন্ধের প্রবেশদ্বার বন্ধ ছিল।

চিদি বিলাস গ্রামে প্রাপ্ত ৩৯৭ গজ-ব্যবতে (৬৩২ ফুঃ) প্রাপ্ত পাচাতা গজ মধ্যাঙ্গ দেহের বর্ধনের তত্ত্বাদানের কথা বার বার, তিনি ভগ্নাঙ্গ-মোক্ষের বেদবেদবাক্যে-অতি-মুদ্রাণিত বর্ধক অশ্রিতা ভূতি, যজ্ঞভূতি ও বর্ধিতবে ভূতি প্রাপ্ত করেকজন বর্ধক তত্ত্বাদন করিয়াছিলেন। অশ্রুতগের বিষয় গঙ্গারাগণের স্বর্গমুদ্রাণিতক 'বঙ্গ-পরক' বলা হইয়া থাকে। এই মুদ্রাণি বেদগণ-বিভিন্ন ভাষা জুর। 'গঙ্গ' হলে সম্ভবতঃ ছাপার ভুলে 'বঙ্গ' হইয়াছে প্রথমতঃ এইরূপ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন হইয়াছে বর্ধক 'হিটানিক' অক্ষরে 'বঙ্গ-পরক' পাইতেছি, তখন আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

#### কর্ণধ্বংস রাজ্য-শাঙ্গদেব

কর্ণধ্বংস রাজ্য-শাঙ্গদেবের কথা অনেকই জানেন। মাজার-প্রবেশের প্রথম জেগার মধ্যাঙ্গ শাঙ্গদেবের মহামাতৃ সৈন্তীত মাধ্যাঙ্গের ৩০০ গুণ্ডাভে (৩১৯৬ঃ) প্রথম একস্থান-তত্ত্বাদন-পাওয়া গিয়াছে। হা হা হা প্রমাণিত হইতেছে যে উক্তল ও কলিঙ্গের শাঙ্গদেবের সাত্ত্বাঙ্গ ছিল। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, মুরশিদাবাদ জেগার অন্তর্গত রাঙ্গামাটী মধ্যাঙ্গ শাঙ্গদেবের রাজধানী কর্ণ-ধ্বংস। রাত প্রদেশ-বে-কর্ণ-ধ্বংসের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার অজ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গবেদবাক্য-তত্ত্বাদন নামে পরিচিত 'বঙ্গ-শতাব্দীর তত্ত্বাদন' দেখিতে পাওয়া-যায়-মধ্যাঙ্গাঙ্গাঙ্গ-পদ-ভাগত-শ্রীমদ্রামের, কর্ণধ্বংসকে অবস্থানকালে ঐক্যবিক বিবরণে সামন্ত নারায়ণভক্ত ভট্ট একবীর পানীকে-বঙ্গবেদবাক্যে নামক গ্রাম দান করিতেছেন। এই শাসন-বাদি মালিয়া গ্রামই নীলভূতের প্রাণগণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই তত্ত্বাদনের সম্পাদক বাটে সাহেব মালিয়া গ্রামের অবস্থাননির্ণয় করিতে না পারিয়া প্রদত্ত গ্রামের নামাঙ্কসারে 'বঙ্গবেদবাক্য-তত্ত্বাদন' নাম দিয়াছেন। আমরা অঙ্গকালে আনিত পালিয়াই এই মালিয়া গ্রাম হাবী জেগার সিংহর থানার অধীন একটা গ্রাম। পূর্বে এই স্থানে একটা নীলভূতি ছিল। এই সিংহকে অনেক বিজ্ঞা সিন্ধের তৈলক রাজধানী সিংহের মনে করেন; হতরাং এই সিংহর অতীত প্রাচীন স্থান সন্দেহ নাই। ইহার সহিতকই মালিয়া গ্রামে বঙ্গ-শতাব্দীর বহু হওয়া অঙ্গদ্বংস নাই। এই স্থান কর্ণধ্বংস হইতে বহুদূর এইস্থানে এই তত্ত্বাদন ভক্তগণকে কর্ণধ্বংসের নাম উল্লেখ করার সার্থকতা দেখা যায় না। উদ্বাহর বিষয় যে আইন-ই-আক-বায়তে উল্লিখিত সরকার উদ্বাহর তথ্যেরও সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ইহা হায়া রাষ্ট্রই প্রমাণিত হইতেছে কর্ণ-ধ্বংস রাজধানী রাত প্রদেশেই অবস্থিত ছিল।

মধ্যাঙ্গ শাঙ্গদেবের পরে তাহার রাজ্য কর্ণধ্বংসের হতগত হয়। আবার কর্ণধ্বংসের পরে কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্ধকে কর্ণধ্বংসের অধিপতিরূপে দেখিতে পাই। ইহার পরে ভগদত্ত-বংশীয় রাজা শ্রীধর্ববৎসকে 'গৌড়োদ্ভাদিকলিঙ্গ-কৌলদাণিপতি' রূপে দেখিতে পাই। ইহাকে কেহ কেহ কামরূপের শাঙ্গদেব-বংশীয় শ্রীধর্ব মনে করেন। ভগদত্ত-বংশীয়দের প্রধান রাজ্য কামরূপ, হতরাং কামরূপের নাম উল্লেখ না করার ইহাকে কামরূপবাস মনে করিতে দিখ উপস্থিত হইতেছে। আমাজ উপরে দেখিয়াছি গঙ্গ-রাজবংশেও কলিঙ্গের রাজা একজন ভগদত্ত ছিল; কিন্তু ইহার অস্তিত্ব সন্দেহ অজ কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এই শ্রীধর্ব ভৌম ভগদত্তের বংশ হইলেও হইতে পারে; কেন না ইহার পরেই আমরা উড়িষ্যা জৌমকর-বংশকে রাজ্য করিতে দেখিতে পাই।

উড়িষ্যার তত্ত্বাদনকে ও কামরূপের শালভূত, বিগ্রহ ও স্তম্ভাদির বাশের সহিত সম্বন্ধক বলিয়া সন্দেহ হয়। কামরূপের তত্ত্বাদন আপনাদিগকে রেখ ও ভৌম উভয়ই বলিয়াছে, কিন্তু ইহাদের অব্যবহিত পরবর্তী কামরূপের ভৌম-শাল বংশ ইহাদিগকে রেখই বলিয়াছে—ভৌম

বলিয়া স্বীকার করে নাই। উড়িষ্যার তত্ত্বাদন আপনাদিগকে 'শুকিৎসং-বংশ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। ৬৭৭খাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই শুকিৎসং মৌবিরাজ ঈশান বর্ধনের উত্তরাধিকার হারা-শাসনের শুলক একই বংশ, কারণ এই উক্ত বংশকে একই স্থানে দেখা বাইতেছে। ৮মমোহন চক্রবর্তী এই শুলকে চাণুকের অঙ্গদ্বংস মনে করিয়াছেন। প্রাচ্যবিজ্ঞানমহাবীর শ্রীকৃষ্ণ নগেন্দ্রনাথ বহু এই মত পোষণ করেন। আবার ভাস্কর প্রবেশকল্প হাবী দেখাইয়াছেন যে, সাংখ্যের জেগার এক শ্রেণীর ক্লমক শুকী নামে পরিচিত। তিনি বলেন যে শুলক ও চুলিক একই শব্দের বিভিন্ন রূপ। তিনি দেখাইয়াছেন, মহাভারতে চুলিক, তুষার, বন ও শুলক এক সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। মন্ত ও বায়ু-পুর্বে লিখিত আছে ইহার কলিঙ্গকে ভারতে রাজ্য করিবে। মন্ত-পুর্বারের মতে ইহাদের বাসস্থান চকু-প্রবাহিত দেশে, বায়ুপুর্বারের মতে ইহার উত্তরদেশবাসী, আবার বহুংসহিতার মতে ইহাদের বাস উত্তর-পূর্বে। চরকে ইহার বালিক, পুষ, চীন, বন ও শুকদিগের একত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়-পুর্বারে ইহাদিগকে লম্পাক, কিরাত ও কামদ্বীপসিংহের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছে। ভাগ্যবান বাগী এই সব এবং অজ কতকগুলি কারণে সেগুড়িয়ানবাসী বলিয়া মনে করেন। তারানাম বলিয়াছেন, শুলক দেশ ভোগের (তুষার?) অঙ্গ প্রাপ্তে অবস্থিত। হা হা হা হা ইহার ভারতের বাহির হইতেই আসিয়াছে; হতরাং ইহার কামরূপে রেখ বলিয়া পরিচিত হওয়া অঙ্গদ্বংস নহে। এই কারণে বিশেষতঃ বন ইহাদিগকে কামরূপ ও উড়িষ্যার ভৌমদিগের সহিত একত্রে দেখিতে পাই তখন স্বতঃই সন্দেহ হয় কামরূপের ভৌমগণ ও তত্ত্বাদন উড়িষ্যার পিরা রাজ্যবাসন করিয়া থাকিবে না। শালস্তম্ভ নামের 'শাল' এর সন্দেহ শুলিকের 'শূল'এর কোন সম্বন্ধ নাই? ইহার বাদ্যনাগ লোক না হইলেও বাঙ্গালার প্রান্তর কামরূপের অধিবাসী।

#### তুঙ্গরাজ বংশ

উড়িষ্যার তুঙ্গরাজ-বংশকেও বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। ইহার বঙ্গের চক্ররাজ-বংশের ছা' 'রাহিত্যগিরি-

নির্ভক' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই রাহিত্যগিরি কোথায়? অনেকেই ইহাকে মাধ্যাঙ্গ জেগার গোটাঙ্গা বলিয়া মনে করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মলিনীকান্ত ভট্টাচার্য মনে করেন এই রাহিত্যগিরি ত্রিপুরার মনামতী পাড়ার নিকটই লালমা ইপাড়া। একটা কারণ এই মত আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হইতেছে। ত্রিপুরার লোকনাথের তত্ত্বাদন দেখিতে পাই, লোকনাথের সহিত জয়তুল নামক এক রাজার বৃদ্ধ হইবাছিল। শ্রীকৃষ্ণ রাধা-গোবিন্দ মঞ্চ একই রাজার নাম জয়তুল বলাইয়াছেন। এই পাঠ ঠিক কি না সন্দেহ হওয়া অধ্যাপক ভাণ্ডারকরকে দেখাইতে তিনি ইহা 'জয়তুল বর্ধ' পাঠ করিয়াছেন। বাস্তবিক বলাক কাশ্যর হা হা 'দ' পাঠ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই 'দ'। আমরা 'জয়তুল বর্ধ' পাঠ ঠিক মনে করিয়া ইহাকে তাহাৎ-উল্লিখিত 'বর্ধ' সঙ্গে এক মনে করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি 'রাজার নাম জয়তুল। এই জয়তুল সম্ভবতঃ ত্রিপুরা-জেগার মনামতী অঞ্চলে রাজ্য করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার চক্র-রাজগণও এই স্থান হইতে আসিয়া নিকটবর্ত্ত চক্রবর্ত্ত রাজ-বংশন করিয়াছিলেন। লোকনাথ সম্ভবতঃ ত্রিপুরারাজ্যের স্বরূপ নামক অটবিক প্রদেশে রাজ্য করিতেন। এই স্বরূপ সম্ভবতঃ কোলা শব্দের নিকটই উল্লেখিত। ইহার প্রাচীন নাম স্বয়ভাইলু। এই স্থান এখনও অঙ্গদে পূর্ণি পোষিত আছে। এ হা হা হা হা অঙ্গদে বৈশুধি আছে। ইহার বিষয় 'আর্কিওলজিকেল মারভের বার্ষিক রিপোর্ট' প্রকাশিত হইয়াছে।

তুঙ্গরাজগণ বঙ্গের, স্বাভাবী এবং পুণ্ডবর্জন হইতে আগত তত্ত্বাদনগণকে জমি দান করিয়াছেন।

#### জিকলিঙ্গের গোমবংশীয় গুপ্তরাজগণ

এই রাজবংশের প্রথম রাজা মার্বিনগুপ্ত 'কলিমমহার-পূর্ণভক্ত' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন; হতরাং এই বংশ যে বঙ্গ হইতে গিয়াছে তাহা এই পরিচয় দ্বারা প্রমাণ হইতেছে। এই বংশীয় রাজগণ রাত, শাংখী ও তর্কারি হইতে আগত তত্ত্বাদনগণকে জমি দান করিয়াছেন। উত্তর-বঙ্গে যে শ্রাবস্তী ও তর্কারি নামক স্থান বর্ত্তমান ছিল তাহা আমরা গত বৎসরের জাহাঙ্গীর নামের 'ইতিহাস-একিকৌরী' নামক পত্রিকায় দেখাইয়াছি।



এই রাজবংশের আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের সভার বোধ, দর্শ, আদিতা ও নাগ পদবীসহ সাক্ষিবিগ্রহিক ও কাহ্নগণকে কাজ করিতে দেখি, যথা মহাসাক্ষিবিগ্রহিক পারদ-সুভার্যাক শ্রীমত দক্ষমহাসাক্ষিবিগ্রহিকরাক্ষ শ্রীচান্দন, সাক্ষিবিগ্রহিক শ্রীসম্মদন্ত কাহ্নর বরজবোধবহুত কৈ বোধ, কাহ্নর প্রিয়বরাদিত্যহুত শ্রীমাহক, কাহ্নর মঙ্গল দত্ত ও মঙ্গলপটলিক শ্রীজ্ঞব নাগ। এই পদবীগুলির দ্বারা ইহাদের বঙ্গালীত্ব স্থানা করিতেছে। এই রাজগণ বঙ্গবাসী বলিয়াই বোধ হয় তাহাদের প্রধান কণ্ঠস্বরূপকেও বঙ্গালী দেখিতেছি। এই শাসনগুলির সম্পাদক শ্রীকৃত নিম্নরূপে মহুমদারও ইহারিগকে বঙ্গালী মনে করেন।

#### দক্ষিণ কানাদার বঙ্গরাজবংশ

দক্ষিণ কানাদা জেলার পুটুর তাম্রকে কয়েকখানি প্রাচীন প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। উহার একখানিতে দেখা যায়, কানিয়ার অরঙ্গ ওরুফ বঙ্গ নামক একব্যক্তি বঙ্গবাসী (বর্তমান নাম 'ইন্দ্রবেঙ্গ') নামক স্থানের বীরভদ্রের পুত্রের জন্ম দান করিতেছে। আর একখানিতে নরসিংহবঙ্গ জৈন মন্দিরের জন্ম দান করিতেছে। অপর একখানিতে দেখা যায় নারায়ণ সেন বোব (সেন ভোগিক) নামক এক বীর নরসিংহপুত্রের ওরুফ বঙ্গরাজ-ওরুফের রাজ্যকালে নামকেশ্বর বিগ্রহ স্থাপন করিতেছে। এই লিপিগুলির সময় ১০১৯ হইতে ১০১২ শকাব্দ। ইহাদের 'বঙ্গ' নাম এবং স্থানের নাম 'বঙ্গবাসী' দ্বারা মনে হয় ইহারা বঙ্গদেশ হইতে গিয়া দক্ষিণ কানাদার গিয়া রাজ্য-স্থাপন করিয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ ইহারা বিজয়নগর-রাজ্যপের সামন্ত রাজা ছিল।

কানাদার আর এক বঙ্গার (বঙ্গাল ?) রাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেল্লাঙ্গী-বংশীয় রাজা প্রথম কেঙ্গল-নায়ক বঙ্গার-রাজ্যের বিকল্পে এল নামক স্থানের রাণীর পক্ষ অবলম্বন করার দ্বারা সর্বত্র পর্তুগীজদিগের সতর্ক উপস্থিত হয়। পর্তুগীজগণ এইদেশকে কানাদার রাজ্য বলিত। ইহান ১৪৮২ হইতে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। এই বঙ্গাররাজ সম্ভবতঃ উপন্যাসিক বঙ্গরাজ-বংশীয়।

#### গৌড়-রাজবংশ

দক্ষিণ ভারতে গৌড় নামে একটা জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকাল হইতে নানা স্থানের লিপিতে ইহাদের নাম পাওয়া যায়। ইহারিগকে কখন-কো-কখন গৌড় বলা হইয়াছে। ইহারিগকে রুক, বোকা, গ্রামের প্রধান দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠাতা ইত্যাদিরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ আবার রাজ্যও স্থাপন করিয়াছে, যেন অবশিষ্ট নাড় প্রভৃৎ। ইহারা পঞ্চম শতাব্দীতে বিজয়নগরের অবধি পূর্ব-মহাসাগরে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। এই বংশের যে লিপিশিলা পাওয়া গিয়াছে তাহার সময় ১৪৮৮—১৪৯২ খৃষ্টাব্দ। ইহারা পরিচরে আপনাদিগকে চতুর্থ গোত্র বলিয়াছেন। ইহাদের একটীর নাম বেলহন-নাড় প্রভৃৎ। ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দেও ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইহাদের মধ্যে কেমেগ গৌড়ই সুমণিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই ব্যক্তি ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে স্থাপন করেন। ইহারা প্রথমে 'চতুর্থ-গোত্র' বলিয়া পরিচয় দিলেও পরে আবার সপাশি-গোত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই গোত্র-দিগের সহিত বঙ্গালার গোত্রের কোন সম্পর্ক আছে কি না জানিতে পারি নাই।

#### আরাকানের চঙ্গরাজবংশ

আমরা গত বর্ষের মার্চ মাসের 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি' নামক পত্রিকার দেখাইয়াছি, যে আরাকানের চঙ্গরাজ-বংশ খুব সম্ভবতঃ বঙ্গালার, চঙ্গরাজ-বংশের শাখা। উক্ত রাজবংশই বৌদ্ধ, 'কিছু উক্ত বংশই ব্রাহ্মণদিগকে কুলদান করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের সহিত বঙ্গালার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শ্রীকৃত নীহাররঞ্জন রায় দেখাইয়াছেন যে, নির ব্রহ্মের মহাবান বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গালার সহিত হইতে নীত হইয়াছে। ইহার মূল কতক পরিমাণে এই বৌদ্ধ চঙ্গবংশের প্রভাব দ্বারা বুঝি সম্ভবপর।

বৃহত্তর ভারতে যে সব বৌদ্ধ ধর্ম-সেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে পৌণ্ড্রবাসিনী ও চুটাদেবের মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। পৌণ্ড্রবাসিনীর মূর্তি যে পৌণ্ড্র বা বঙ্গালার গৌড়-দেশে পুত্রকামিত হইয়াছে, তাহা অব্যাকার করিবার খবর নাই। আবার তারানাথ লিখিয়াছেন, বঙ্গ

পালরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব চুটাদেবীর উপাসক ছিলেন। পাল-বংশের প্রথম অত্যাচার সম্বন্ধে। প্রথম মহাপাল দেবের ৩৭ বর্ষে প্রতিষ্ঠিত একটা মূর্তি তিপুরা-জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবভিঙ্গনে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ঐ স্থান সম্বন্ধে অশ্রুত বলা হইয়াছে। ঐ নবভিঙ্গনে চুটাদেবী নামে একটা বুদ্ধিগ্রাম এখনও বর্তমান। এই চুটাদেবীর নামাঙ্কণের এই গ্রামের নাম হওয়া অসম্ভব নহে। আমাদের অহুযনে যদি কোন সত্য থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে বৃহত্তর ভারতে পৌণ্ড্র-বাসিনীর ও চুটাদেবী-মূর্তির আবিষ্কার দ্বারা ঐ দেশ-সমূহে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারে বঙ্গদেশবাসীর আশিক কৃতিত্ব রহিয়াছে।

দেখা যাইতেছে, যে সকল বঙ্গদেশবাসী উড়িয়া এবং

দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে তাহারা অন্ততঃ কিছুকাল আপনাদের পূর্ব নিবাসস্থান ভুলিতে পারে নাই। তাহাদের পূর্বনিবাসের পরিচরে যেন একটা গর্ভের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতিতে অনেক প্রভেদ পরিস্ফুটিত হয়। এইজন্য বোধ হয় কিছুকাল তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার চিন্তিতে হইয়াছে। সেইজন্যই তাহারা পূর্বনিবাস সহজে ভুলিতে পারে নাই বলিয়াই মনে হয়। বাঁহারা দক্ষিণ ভারতে বহুল পরিমাণে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন তাহারা যে পশ্চিম-ভারতেও উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই তাহা বিবাস করিবার কোন কারণ নাই। আরি গোড়, শ্রীগোড় ও গৌড়তাল্লা ব্রাহ্মণ, গৌড়রাজপুত্র ও গৌড়কায়স্থগণ সকলেই বলেন যে বঙ্গের গৌড়ই পূর্বনিবাস।

## চাবীর গোছা

( গল্প )

শ্রীকণ্ঠকৃষ্ণ রায়

প্রায় দু-এক আশির্ষ শহর—হাঙ্গর-জল-রসিদের বোণদেশের মতন গল্পের শহর; হরেক রকমের গল্প শোনাবার এমন ভায়াগা পুথিবীতে আর নাই। তাই যে মুহুর্তে "ক্লক-টাওয়ার"এর নীচেকার ছোট "কাফে"তে ঢুকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা—তখনই মনে হ'ল একটা না একটা নতুন গল্প আজ শুনেই হ'বে। কাফে ভর্তি তখন। আশির্ষ শহরের রসিক-হজনদের গর-না শুনে কি আর নিস্তার আছে—তাহ'লে তো "পোপদের" আশির্ষে এসে পড়াই বুঝা...

এদের অনেকেই আমি পুরাতন বঙ্গ-স্বতন্ত্র। বৃহত্তর

পাঠের অভ্যর্থনার খটটা শ্রি রকম হ'য়েছিল—আমি

কিছু ঘট। কয়েকের জন্ম এসে পড়েছি—রোনি নদীর বুকে প্রকাণ্ড দীপটা আর একবার চোখের দেখে নেবার জন্ম। ...কেউ এগিয়ে এসে বললেন—এতদিন আস নি কেন? খুব অহুবাগের হ'য়ে—কেউ বা আমার পারিবারিক জীবন-শব্দকে মজাদার প্রশ্ন করতে লাগলেন—কারও বা অভ্যর্থনা কেবল মুখের কথাতেই পর্যবসিত হ'ল না—যত রাজ্যের "পানীয়"-মাগের পর মাস আমার ওঠের দিকে শোভা-বাজা করে আসতে-লাগল। তবে জ্ঞাত্যর্থনার আভিশংঘ্যে অনেক মাসই উটে গেল—আর হাতে পায়ে গড়িয়ে পড়ে' সব "তজন্য" হ'য়ে গেল। ব্যক্তি-বাস্তবের ইষ্টমাশের অভ্যর্থনার আমি খুব অভিনীত হ'য়েছিলাম—সন্দেহ নাই।

• প্রসিদ্ধ ফরাসী কথাসাহিত্যিক গুস্তাভ মারের 'লে রেল' যে মাইতের জোনের মূল গল্পের অবসাদ।



আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে গেলে, পর—ওরা সকলেই মৈলেন ব'সে পড়লেন—আবার রাসগুণ্ডা ভর্তি করা হল—তারপর বহুদিনের পরে দেখা-সাক্ষাৎ হ'লে যেমনটা হ'য়ে থাকে—সকলেই যে বাঁধা কথা আলোচনা করতে শুরু করে মিলেন। তবে সকলেই এখন "কলাও" করে ব'সলেন—যে জনেই অবাধ—

আমার বন্ধ "বেঙ্ককে"—হ'লেন একাধারে—কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ; এমনকি কথা ওর পেটে জমেছিল আমাকে ব'সার জন্য—এমন ক্রমাগত ভড়, ভড়, করতে লাগল। আর কারও সঙ্গে কথা বলবার সাধ্য কি। গল্পের কি তোড়, কি গুণা পাড়ি—আরম্ভ হ'লে শেষ হ'বার নামটা নেই... সে এক নিম্নোপে সব বলে যেতে লাগল—সম-সাময়িক সাহিত্যের কথা, স্থানীয় রাজনীতির কথা, ছোট বড় মায়া, রস ঘটনা, ছুঁতানির কথা—সে বলতে "দাঁড়ি, কমা" নেই—হাত নেড়ে—নানান প্রকার অজতরী করে—"উনারা" থেকে "মুদারা", "মুদারা" থেকে "তারার" উঠে... আমাকে অবশেষে হাতঝোড় করে বলতে হ'ল—বন্ধুতোমার মত বন্ধি অর্নগল ভাবা আমার থাকত তা' হলে তোমাকেও আমি শোনাতাম—তোমাকেও শোনাতাম...

বন্ধু বেঙ্ককের কথা শোনে কিংবা ভাঁটা পড়ল না। অবশেষে তার কথার তোড়ে অতিবড় সমাজদারও রণে ভঙ্গ দিল—তাদের মধ্যে একজন থলি হ'তে বের করে এক গোছা চাবী সেই বাগিচাঘরের হাতে দিল।

বাগিচাঘর কিন্তু অবজার ভকীতে হাত নেড়ে চাবীর গোছা কিরিয়ে দিল—চাবীর গোছা দেওয়ার মধ্যে সে যে কি অসঙ্গতি আবিষ্কার করল—গুণাবান্ধি জানেন। পূর্বদ্বার বন্ধুতার গুরে বলতে শুরু করল—সে কি শ্রুতগুণ "পাক দিয়ে হুতো লগা করাম কায়া"—একবারে অস্তিত্ব—বাপু, তখন আর একজন উঠে—আবার চাবীর গোছা টেবিলের উপর রাখল এবং ঠোলে ঠোলে বেঙ্ককে মিকে দিয়ে সন্ধ্যা ঘরে বলল—"নাও না, নাও না..." হ্যাঁ মেরে গোছাটা নিয়ে—ক'ন করে মাটিতে কেলে গিল—তারপর পা দিয়ে চেয়ারটা উল্টিয়ে দিয়ে বেঙ্ককে বেরিয়ে গেল। রাগে তার হ'চোখ ফেটে পড়ছিল—কার্কেও কোনো সম্ভাব্য পণ্যায় করে গেল না... এই হাস্যকর দৃষ্টে আমি একেবারে চমকভৃত হ'য়ে

গোলাম—ভাবলাম, এ কোন নাটকের প্রস্তাবনা দেখলাম। আমি বেঙ্ককে কি চিন্তিতাম—অমন গল্পের মাঝখানে আর অমন শ্রোতৃমণ্ডলী ছেড়ে সে যে উঠে বাবে—তার গুণ্ডতার কাগজ থাকা চাইই চাই।

বেরিয়ে গিয়ে তাকে আনবার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু গুব গভীরভাবে—প্রথমে দৃষ্টিতে আমাকে আঘাত করে অহত আনন্দধানের মধ্যাদার সে চলে গেল। একবার বলল না কিংবা তার এক রাগ হ'ল। মূহুরে কথাটা একবার বার করল না—বুঝলাম তার হৃদয়কণ্ঠ নিশ্চয়ই খুব গভীর।

"এই যে 'চাবীর গোছা'—মহা রহস্যময় প্রহেলিকা হ'য়ে উঠল—দেখছি অথচ এর বিবাসভাতকতার বন্ধ বেঙ্ককের বিবিক্রম আর অস্বাভাবিক, আমার কাছে তখনও প্রতিক্রমণিত হ'ছিল—নাও না, নাও না—নিশ্চয়ই কোনো প্রকল্প কৌতুকের ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে... পরে আমি গল্পটা ওদের মধুর কনবিশিলা—বন্ধু হয় তো আমার উপর চটেই থাকবেন তবুও না বলে পারছি না...

নাইম্ শহরে উৎসবের সময় যেদিন ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে বাড়ির লড়াই আর হ'ত না—সেদিন অনেকই শহরতলীতে—খোলা মাঠের ধারে ধারে ছোট ছোট বর ভাড়া করে গল্প-গুজব গান-বাজনা করত। স্থানটা পছন্দসই—"পাইন" গাছের ওড়নার ঢাকা; তার মধ্যে 'মহিহর' জোয়ের ভাড়াটে ঘরখানা চাষুটে "সাইপ্রেন্স" গাছের তলায় বলে—ভারী নিৰ্জিন, ভারী শীতল—ভারী মনোহর।

গ্রীষ্মকালের বিবির—অপরূহে করেকজন বন্ধু মিলে মাইতর জোয়ের ঘরে এসে জুটল। সাংকোভাজ শেষ হ'লে—সন্দের সঙ্গীত আরম্ভ হ'ল—সকলেই থালাসা গান করল। "কুম্ভ-সুখারী হাওয়ার তাদের উৎকৃষ্টতা খিগণ বর্জিত হ'ল—দূরে, ভকুনো কোপ-কোড়ে—যথো যিহীর অশ্রুত কলনান তাদের সঙ্গীতের সঙ্গে একাতনে বাজতে লাগল—হেলে একজন—নাম তার মারিযু—এই একা-সঙ্গীতে যোগ দেয় নাই—কারণ জীবনে তাকে গান করতে কেউ এ পর্যন্ত বলে নাই। আমি একদানা গানই জানি—না, না মোটে দুইখানা—বড় লিখা গানগুলো—

সকলেই তাকে গাইতে অস্বস্তি করল—মাইতর জোয়

নিজে তাকে গাইতে বললেন—মারিযু তখন গান ধরল। একটানে ছয় "কলি" গৈয়ে—সে বলে উঠল—বড়ই মুগ্ধিল তো। ব্যাপার কি—এর পরে আর মনে আসতে না।

মনে করবার জন্য অনেকক্ষণ মাথা ঘামাল—আগের, আগের "কলি"গুলো বার বার গাইতে লাগল—কিন্তু মনে কি আর পড়ে ছাই।—কিছুতেই মনে করতে পারল না।

—দূর হোক গে—আর একখানা যে গান জানি—তাই শোনাইছি।

মারিযু তখন তার দ্বিতীয় গান থানা ধরল—ইনিরে-বিনিরে বহুগুণ গাইতে লাগল, ইতিমধ্যে ছ'একজন করে শ্রোতা আসতে আসতে টুপি ছাড়া নিয়ে সরে পড়তে লাগল—একজন—দু'জন—তিনজন—

কিন্তু গায়ক নিজের গানে নিজেই বিভোর হ'য়ে পড়েছিল—সে' তো আর বাহবা পাবার জন্য গাচ্ছিল না—সে গান গাচ্ছিল—আন্তরিক প্রেরণায়—যেমন করে বুক-শাখা ধীরে ধীরে কপিত হয়—গাছের পাতার পাতার পুলাকের চেউ ছোট—বল্লরী বিনত-সংকারে বৃষ্টিপতি হয়—

মারিযু গাচ্ছিল—কারণ সারাদেশ—শান্তিবিধি গ্রীষ্মের অপরূহে তখনকার মনে "মুমগাডানি" গানে ঘুরিয়ে পড়েছিল।

এই যে মনোহারী কাহা য়া' তার সঙ্গীত দূটে উঠেছিল—শ্রোতাদের পক্ষে তা' যে চিত্তবিন্দী ছিল না তা' নয়। যখন কাকের কাকলী আরম্ভ হয়—তখন কি পক্ষ বিবদল অন্তরে অন্তরে তৃপ্ত হয় না?

গানের বিশ "কলিতে" পৌছে মারিযু দেখলে—কেবল একজন মাত্র শ্রোতা তখনও রয়েছেন—ঘরের মালিক মাইতর জোয় ষয়—সে মহা উৎসাহে গান গেয়ে চলল।

তখন মাইতর জোয়ও উঠলেন—আসতে পকেট থেকে চাবীর গোছা বের করে নিয়ে তার হাতে দিয়ে বলেন—

চাবী রইল—জানই তো বুড়োমাহু'আমি বেশী রাত হ'লে খারাপ রাতা দিয়ে যেতে পারব না—থাকাই উচিত ছিল—যথোক—চাবীর গোছা নাও না—নাও না—যখন তোমার সঙ্গীত শেষ হ'লে—দরজার চাবী লাগিয়ে যেও।

শিশিরের ভেতর দিয়ে নান্দশ পদসঙ্কারে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

## গ্রন্থকার গোবিন্দের সন্ধান

শ্রীমদ্রতনর চৌধুরী

শ্রীচৈতন্য-ভৃত্য গ্রন্থকার গোবিন্দকে লইয়া বৈকুণ্ঠ সাহিত্য-ক্ষেত্রে বহু আলোচনা ও বিচার হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন—গ্রন্থকার গোবিন্দ বলিয়া কেহু ছিলেন না, গোবিন্দের কড়চা-গ্রন্থ জাল; কিন্তু কড়চার রচনা এমন মোহময় ও মনোমোহকর, বর্ণনা এমন দ্ব্যতাত্বিক ও মর্দঙ্গপূর্ণ—হাস্যকাণ্ডাসির পরিবেশ একদা ঠিক ও জমার মাসিনী যে, অপরোহা কিছুতেই কড়চার অমৌলিক বীজের সমত নহেন। তাঁহার বৃত্তিতে ঐরবৈ না, (এই জাল হইলে) এমন প্রাণমাতানে চিত্তাঙ্কনের বর্ণণার বর্ণের অন্তরে

বাড়ে চাপাইয়া গ্রন্থকারের লাভ কি? কি স্বার্থে তিনি মিথ্যার আশ্রয় লইয়া আপন কীর্তি অপরে ম্রিত হইবেন? তর্কহীনে যদি স্বীকার করা যায় যে, কোন কৌশলী পুরুষ ইহা জাল পরিচালন, তবে সহজেই মনে হয় তাহা হইলে সুপ্রচারিত গ্রন্থের সহিত ইহার অমিল ধর্মিক না। জানি-যাক্তো সত্যক; কোন অপ্রচলিত রোবানী কথা বলিয়া সহজে তাঁহার অন্তর সমালোচনার বিষয়ীভূত হইতে চানেন না। এ সব কারণে অপরোহা কড়চার বিপক্ষে আলোচন-কারীদের কথার বিশেষ গুরুত্ব বোধ করেন না।



বাগলা রামাধ্ব-মহাভারত হইতে ক্লান্ত করিয়া বহুতর প্রাচীন গ্রন্থই মুদ্রিত হইয়াছে, প্রত্যেকের সঙ্গেই পুথি-নকলকারক অথবা সম্পাদকের কৃত অন্তরাগ দৃষ্ট হয়। এই-জন্মই মুদ্রিত পুস্তকে পাঠান্তর ঘোষণা করা হইয়া থাকে। গোবিন্দদাসের কড়চার তাহার অন্তরাগ হওয়া সম্ভব নহে; কিন্তু সেই দোষে কেবল কড়চাখানা বাতিল করিতে গেলে অবিচার হয়।

শ্রীমহাপ্রভুর সকল কথাই পৃথাহপুস্তকগণে একই গ্রন্থে থাকিবে, এমন আশা করা অজ্ঞান। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগোবিন্দের দক্ষিণ-সম্মুখার্দ্ধ নাই, চৈতন্যচরিতামৃততে আছে। কবি পূর্ণপুর বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ-সম্মুখকালে শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে গোদাবরী পর্যন্ত কোন কোন গ্রামগণ গিয়াছিলেন, তারপর প্রভু তাঁহাদের স্মিতহিয়া বেন। কাজেই ক্লদাদল করতল মাত্র তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, কবিকল্পপুত্রের কথায় তাহা বলিতে হয়। গোবিন্দের কড়চাতেও ঐ কথাই প্রতিফলিত—“সারণ করিয়া সুখে”—আছে। যলন্তঃ ইদৃশ অনেকে হুলে সামাজ্য রক্ষা করিয়া লীলাক্রম বৃত্তিতে হয়। কোন এক প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনার সহিত অল্প গ্রন্থের সেই বিষয়ে পুস্তকরূপ বর্ণনা দেখিলেই যে একতর গ্রন্থ একবারে অস্বাভাবিক হইবে, এমন মনে করিলে “কল্ম লালি” হইয়া পড়িবে।

যে বাহা হউক, শ্রীমহাপ্রভুর একটুকালে তাঁহার অঙ্গশূন্য ও পার্শ্বগণের মধ্যে যে যে গোবিন্দ ছিলেন, এক সময় তাহাদের পরিসর বিস্তার করা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-গ্রন্থে পাঁচজন গোবিন্দের নাম পাওয়া যায়। এই পাঁচজনই শ্রীমহাপ্রভুর সম্মানময়িক। তন্মধ্যে চারিজন তাঁহার পার্শ্ব ও একজন নিত্যানন্দের পার্শ্ব ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর সন্ধ্যা গ্রহণান্তর যখন নীলাচল গমন করেন, তখন ইহাদের মধ্যে কেহ যে তাঁহার সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন, এমন কথা পাওয়া যায় না।

তবে চৈতন্যভাগবতে এই গোবিন্দের নামোল্লেখ আছে—বিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে পোড় হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন। “তিনি স্মিহাস পুনর্বার দেশে আসিয়াছিলেন, এমন কথা কিন্তু ভাগবতে লিখিত নাই। জ্ঞানদাসের চৈতন্য-মঙ্গলে ভাগবতের উক্তির পোষক বাক্য দেখেও আছে।

এখানে ঐ গ্রন্থের হইতে দেখিতে হইবে, শ্রীমহাপ্রভুর সহিত কোনও গোবিন্দ পোড় হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন কি না এবং গিয়া থাকিলে তিনি কে? এতদ্ব্যতীতে আমরা দেখিব—

- (ক) নবদ্বীপ-নীলার গোবিন্দ-সংস্রব।
- (খ) কালোয়ার নীলার গোবিন্দ-সংস্রব।
- (গ) নীলাচল-বাক্সার গোবিন্দ-সংস্রব।
- (ঘ) ক্ষেত্র হইতে গোড়াগমনকালে ও গোড়ো অবস্থানকালে গোবিন্দ-সংস্রব।
- (ঙ) দক্ষিণ-সম্মুখার্দ্ধ নীলাচলে অবস্থিতি-কালে গোবিন্দ-সংস্রব।

এ সব নীলার পুরোক্ত গোবিন্দ পুস্তক ছাড়া অপর কোন গোবিন্দের সংস্রব পাওয়া যায় কি না? পাওয়া গেলে—সে কোন কোন সময়ে তাহা দেখিতে হইবে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গোবিন্দ-পত্রিকার ১৯৩৮ বাংলার আখ্যায়িকার কঠিক মুখ শাখায় আমি উক্ত গোবিন্দগণ-সংস্রব এই বিবরে আলোচনা করিয়াছিলাম।

ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃততে মহাপ্রভুর পার্শ্ব চারিজন গোবিন্দ ও নিত্যানন্দের পার্শ্ব একজন গোবিন্দের নাম আছে। চারিজনের সমুদয় শাখা বর্ণনে (১০ম পরিচ্ছেদে) ও অপর একজনদের নাম নিত্যানন্দ-শাখা বর্ণনে (১১ম পরিচ্ছেদে) আছে। শ্রীচৈতন্যপার্বদ চারিজনদের মধ্যে—

- (১) “প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।”
- (২) “প্রভুর কীর্তনীয় আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত।”

(চৈঃ চঃ ১০ম পরি)

এই দুইজন প্রভুর কাষ্ঠন-পায়ক ও নবদ্বীপবাসী ছিলেন।

- (৩) “গোবিন্দ মাধব বাহুদেব তিন ভাই।  
যা সবার কীর্তনে মাচে চৈতন্য পোঙ্গারি।”

(চৈঃ চঃ ১০ম পরি)

যোব-বংশীয় এই গোবিন্দ মহাপ্রভুর আক্রান্ত গোপী-নাথ-বিগ্রহে যোবায় আত্মনিয়োগ করিয়া অগ্রদ্বীপে চিরকাল অবস্থিত করেন।

- (৪) “শ্রীগোবিন্দ নাম তার প্রিয় অমৃত।”  
“অমৃতলা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।”

(চৈঃ চঃ ১০ম পরি)

ইনি ঈশ্বরপুত্রীয় শিষ্য : গুরুর অগ্রকটে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর আশ্রিত হ'ন।

- (৫) “গোবিন্দ শ্রীঃ মুকুন্দ তিন কবিরাজ।”

(চৈঃ চঃ ১১ম পরি)

শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য এই গোবিন্দ কবিরাজের নামের পরিচয় বাতীত আর কোন কথাই জানা যায় না। এখন গৌরাঙ্গপার্বদ পুরোক্ত গোবিন্দ চরিত্রের মধ্যে প্রথমতঃ—

[ক] নবদ্বীপবাসী ইজন গোবিন্দের নামোল্লেখ পাই, যখন প্রভু পূর্বদ্বীপ-গমন-প্রাকালে প্রতিবীর্ঘ-সংস্রব তাহা প্রকাশ করেন তখন জ্ঞানদাসের চৈতন্য-মঙ্গলে নবদ্বীপ-বাসী বহু ভক্তের নামের সহিত এই নামগুলি আছে, যথা—  
“গোবিন্দ কাশীনাথ মিশ্র শেখক জগাই।

গোবিন্দ সঙ্গয় মুকুন্দ স্মরিত।”

পূর্বদ্বীপ-প্রত্যাগত গৌরাঙ্গের সঙ্ঘে মঙ্গলালোচনা সভায় নবদ্বীপের বহু ভক্তের সহিত ইহাদের একজনের নাম আছে, যথা তত্রৈব—

“গোবিন্দ নন্দনাচার্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর।

একত্র বসিয়া সবে করেন মঙ্গলা।”

তাৎপর্য্য শ্রীগোবিন্দের পরামর্শাভার সঙ্গীদের মধ্যেও চন্দ্র-শেখর আচার্য্যদ্বয়ের নামের সহিত নবদ্বীপের ঐ গোবিন্দের নামোল্লেখ আছে; যথা তত্রৈব—

“জ্ঞানানন্দ গোবিন্দ আচার্য্যর সঙ্গে।

গুয়া যাত্রা করিলেন নবদ্বীপ যতঃ।”

শ্রীমহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে শ্রীবাগুর্থে সতত নৃত্যকীর্তন করিতেন, ইহাতে নবদ্বীপের ঐ গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দানন্দ নিয়ত উপহিত থাকিতেন যথা চৈতন্য ভাগবত মধ্য-খঃ ৮ম অঃ—

“গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই।”

এতদ্ব্যন্থক জ্ঞানানন্দ ও নিজগৃহে বিধিরাছেন—

“শ্রীগুপ্ত পণ্ডিত, মুরারী, গোবিন্দ, শ্রীধর।”

এবং “শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর চারি ভাই।

বাহুদেব মুকুন্দদত্ত আর গোবিন্দাই।”

জ্ঞানানন্দ গোবিন্দানন্দকেই “গোবিন্দাই” বলিয়াছেন, যেমন নিত্যানন্দ—নিতাই, জগদানন্দ—জগাই ইত্যাদি।

নবদ্বীপের নন্দনাচার্য্যগৃহে সঙ্ঘ-সমাগত নিত্যানন্দকে দেখিতে প্রভুর সহিত এই গোবিন্দানন্দও গিয়াছিলেন, যথা, তত্রৈব—“দামোদর গোবিন্দানন্দ শ্রীগুপ্ত বক্তেশ্বর।”

নবদ্বীপের জগাই-মাধাই-উদ্ধার, কাজি-দলন, শ্রীধর-গৃহে বিজয়াদি প্রত্যেক প্রধান ঘটনার এই দুইজনের নাম চৈতন্যভাগবতে আছে।

জগাই-মাধাই উদ্ধার—

“গোবিন্দ শ্রীধর ক্লদাদল কুশিধর।

জগদানন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর।”

(চৈঃ ভাঃ মধ্য-খঃ ১৩ অঃ)

কাজিধন প্রসঙ্গে—

“রামাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর।

বাহুদেব শ্রীগুপ্ত মুকুন্দ শ্রীধর।

গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন আচার্য্য।

শ্রীধর আদি যে যে জানেন এই কার্য্য।

(চৈঃ ভাঃ মধ্য-খঃ ২৩ অঃ)

শ্রীধর-গৃহে বিজয়কালে—

“গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীগুপ্ত, শ্রীমান।”

(ইত্যাদি চৈঃ ভাঃ মধ্য-খঃ ১৩ অঃ)

শ্রীমহাপ্রভুর ভাবাবলী বহুতর হইয়া তাহার কুণ্ডলাবী তদঙ্গরাজি যখন তাঁহাকে অকুলে লইয়া বাইতে উভয়, যখন প্রতিবেশী ভক্তবর্গের কাছে এসিলেন তিনি বৈরাগ্য-মহিমা কীর্তন করেন, তখনও এই দুই প্রতিবেশীকে সেইক্ষেত্রে উপহিত দেখা যায়। যথা জ্ঞানদাসের চৈতন্য-মঙ্গলে—

“গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ আর বনমালীনা।” ইত্যাদি।

(এই সম্বন্ধে আর এক পৌরানিক-সংস্রব-হয়, তাহা গোবিন্দের কড়চার গোবিন্দ নিজেই বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে প্রভুর সন্ধ্যায়ের কিছুকাল মূর্ছে ভিত্তি নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগোবিন্দ-গৃহে আশ্রয়প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাহা এ হলো অসত্য নহে।)

[খ] অন্তর্য্য গৌরাঙ্গের সন্ধ্যা-গ্রহণ-উপলক্ষে



কাটোয়ার গমন-সম্বন্ধে লীলায় এক গোবিন্দের নাম পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের সম্বন্ধ হির কল্পিয়া সরপ্রথমে, তাহার নিত্যানন্দকে বলেন এবং মাত্র নিম্নোক্ত পাঁচ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ভক্তের কাছে উহা প্রকাশ না করিতে বলিয়া দেন। যথা—  
“আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অপর মুকুন্দ?” (চৈঃ ভাঃ)  
শ্রীনিত্যানন্দ এই আশে পালন করেন। ইহারা ছাড়া আর কাহাকেও বলেন নাই। এই গোপন কথাটা নিত্যই শটীমাকে বলিলে, তাহার বিরাধ-বাক্যাদি শ্রবণে গৌরমুখের সকলই শোহা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। তখন গৌরমুখে আর কে কে ছিলেন? ছিলেন—গৌর-পুত্রী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, প্রাচীন পরিচারক দ্বৈশন, আর (কড়চার) নব নবগত গোবিন্দ ভূতা। (ইহার আগমন ও কাটোয়ার-গমনের সংবাদ একমাত্র কড়চারে আছে।)

এখানে দেখা যাক, কড়চার ছাড়া অন্য বৈষ্ণব-গ্রন্থে পুরোক্ত গোবিন্দগণ হইতে পৃথক কোন (৩ষ্ঠ) গোবিন্দের প্রসঙ্গ আছে কি না?

শ্রীমহাপ্রভু শেখরদে উঠিয়া সন্ন্যাসোদ্দেশ্যে কাটোয়ার প্রভুকে প্রহরান করিলে, তাহার অম্বদান করিয়া যে যে ভক্ত কাটোয়ার গমন করেন, তাহাদের নাম চৈতন্যভাগবতে পাই, যথা :—

“অবধূত চন্দ্র, গদাধর, মুকুন্দ।

চন্দ্রশেখরচার্য আর ব্রহ্মানন্দ।

আসিলেন প্রভু কথা কেশবভারতী।”

পূর্বে কথা হইয়াছে যে, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে, তাহার জননী শটীমাকে, যেসে চন্দ্রশেখরচার্য, যথা গদাধর, মুকুন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই পাঁচ জনকে সন্ন্যাস-সম্বন্ধের কথা বলিতে বলিয়াছিলেন। কাজেই শটী-পুত্রের কামদন ও এই চারিজন এবং নিত্যই তাহা জ্ঞাত থাকায় সতর্ক ছিলেন বলিয়া, প্রভুকে গৃহে না পাইয়া, এই পাঁচজনই ভারতীর হানে উপস্থিত হইলেন।

প্রভুর প্রতিবেশী গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দানন্দ এই সন্বাদ জানিলেন না বলিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে

পুরোক্ত নিত্যানন্দের অঙ্গদ্বীপে গোবিন্দ কে? কেবল চৈতন্যভাগবতে নহে, জ্ঞানানন্দ ও বলিয়াছেন যে, নিত্যানন্দের সহিত কাটোয়ার এক গোবিন্দ গমন করিয়াছিলেন। যথা :—  
“মুকুন্দ গোবিন্দানন্দ সঙ্গী নিত্যানন্দ।”

জ্ঞানানন্দ এই ব্যক্তিকে কখন গোবিন্দ, কখন বা গোবিন্দানন্দ বলিয়াছেন। প্রভুর প্রতিবেশী গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দানন্দ হইতে পৃথক এই গোবিন্দানন্দের বিশেষ পরিচয় ও কাটোয়ার-গমন কথা জ্ঞানানন্দ আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, ইহাতে তাহার জ্ঞাতি জানা যায়। যথা—  
শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য,—

“গঙ্গাপার হৈয়া আগে বৈলা নিত্যানন্দ।

মুকুন্দ দত্ত বৈষ্ণব গোবিন্দ কর্মকার।

মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপার।”

(জঃ চৈঃ মঃ)

অতঃপর প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ। তৎপরে ভক্তগণসহ কাটোয়ার প্রভুর-কীর্তন ও নৃত্য-প্রকটন; জ্ঞানানন্দ তৎকালেও এই গোবিন্দের নামোচ্চয় করিয়াছেন। তদনন্তর প্রভু বাহজ্ঞানবিরহিত হইয়া ক্রুদ্ধের উদ্দেশ্যে কৃন্দাবন যাইলেন বলিয়া পশ্চিমমুখে ধাবিত হইলেন। চক্ষু মুদ্রিত জ্ঞান একরূপ নাই, কোথায় পা কেনিভেদে জ্ঞানেন না। করককোপীনাতির প্রতি লক্ষ্য নাই। জ্ঞানানন্দ লিখিয়াছেন যে, কাটোয়ার প্রভুর অঙ্গদ্বীপে এই গোবিন্দ তখন করক-কোপীনাতিবাহী অঙ্গদ্বীপী। যথা—

“আগম নিগম গীতা গোবিন্দের কাছে।

করক কোপীন কটিকুহ তাহে বাজে।

(জঃ চৈঃ মঃ)

এই ধাবনশাল উদ্ভ্রান্ত নবীন উশাসিনের সহিত ভারতীও কিয়দূর গিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে জ্ঞানানন্দের উল্লিখিত কোপীন-করকবাহী গোবিন্দও ছিলেন, কৃন্দাবন দাঁস হানাস্তরে তাহা বলিতেছেন, যথা—

“নিত্যানন্দ গদাধর, মুকুন্দ সহস্রাতি।

গোবিন্দ পশ্চাতে অগ্রে কেশব ভারতী।”

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য-খঃ ১ম অঃ)

(কড়চার গ্রন্থে টুকু এইরূপ কথাই আছে, যথা—

“তারপর নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।

ভারতীকে ল'য়ে চলিলেন নানা রঙ্গে।”

পেচনে ছেঁদেন আঁধি খড়ি লয়ে যাই।

সে যাহা হউক)

তাঁহার পরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে পথ তুলাইয়া কোশলে শান্তিপুরে আনিলেন; তখনও এই গোবিন্দ (সন্ন্যাস-ভাগ করেন নাই) প্রভুর সহিত শান্তিপুরে উপস্থিত হন। প্রভুর তখন গোড়ায় ভক্তবর্গসহ সন্নিহন হইবে ভাবিয়া ভূতা গোবিন্দ পরম আনন্দিত হইয়াছেন। যথা—

“শান্তিপুরে গেলা গোবিন্দানন্দ আনন্দিত হৈঞা।”

(জ্ঞানানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল)

[গ] শান্তিপুরে হইতে প্রভুর নীলাচল-যাত্রা। যে যে ভক্তগণকে নিত্যানন্দ পূর্বে, প্রভুর সন্ন্যাস-সম্বন্ধের কথা জানাইয়াছিলেন, তাহা অবগত হইয়া বাঁহারা কাটোয়ার গিয়াছিলেন এবং কাটোয়া হইতে তাঁহার সঙ্গে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, এই সময় শান্তিপুরে হইতেও প্রভুর নীলাচল যাত্রার সেই তাহারাই সঙ্গী হইয়াছিলেন, মাত্র তাঁহার যেসে চন্দ্রশেখর নাম নাই, তিনি শটী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তত্ত্ব-বধানের অঙ্গ নবদ্বীপে থাকেন, তাহার পরিবর্তে গৌরাঙ্গের সঙ্গ জ্ঞানানন্দ নিত্যানন্দাদির সহিত গিয়াছিলেন; যথা বাছল্য যে গোবিন্দও সেই সঙ্গে ছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্য-খঃ ২য় অঃ—

“নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ

সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ।”

তৎপরে প্রভু এই ভক্তগণসহ নীলাচলে গিয়া পৌছিলেন। তখনও করকবিবাহী ভূতা গোবিন্দ সঙ্গে। জ্ঞানানন্দ লিখিয়াছেন যে প্রভু—

“ইন্দ্রদ্রায় সুরাবরে জলে করি মান।

রক্ত বস্ত্র করক কোপীন কটিকুহ।

মায়া চন্দনাগুরু পরেন শটীপুণ্ড।

সঙ্গে গোবিন্দানন্দ সিংহদার তলে।

পাদ প্রকালন করি করকর জলে।

দণ্ডবৎ হৈয়া সিংহদারে অবৈশি।

একশত দণ্ডবৎ গোবিন্দ লোথিল।”

শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রভু-সঙ্গ-ভ্রমণে গমন করেন। (কড়চার তাহা বর্ণিত আছে, এ-স্থলে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক।)

[ঘ] তারপর প্রভুর নীলাচলে অবস্থিতি ও তথা হইতে গোড়দেশে আগমন।

প্রভু নীলাচল হইতে শান্তিপুরে উপস্থিত হইলে, নবদ্বীপের সকল ভক্তই তথায় গিয়া সন্নিহিত হন। নবদ্বীপের গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ (দত্ত)ও তখন তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং আনন্দের সহিত উভয়েই শুভ-সংবাদন করিয়াছিলেন; যথা জ্ঞানানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে—

“গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শমী বাজায়।

বৃক্ষমস্ত পান যেইচন্দন দেখে পায়।”

[ঙ] তদনন্তর মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে নীলাচলে অবস্থিতি—

মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের বার্তা চরিতামৃত-গ্রন্থে আছে। দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে মহাপ্রভু নীলাচলে আসিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া গোড়ায় ভক্তবর্গ প্রায় সকলই (সংখ্যায় প্রায় ছই শত হইবে) রথযাত্রা সমুদে করিয়া ক্রন্দন-দর্শনে নীলাচলে যাত্রা করেন। তখন নবদ্বীপের অপর্যাপ্ত ভক্তের সহিত (নবদ্বীপবাসী) গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্ত-নীলাচলে চলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে অন্ত্য-খঃ ৮ম অঃ—

“চলিলা গোবিন্দানন্দ প্রেমযতে বিহ্বল।”

“চলিলা গোবিন্দ দত্ত মহাধর্ম মনে।”

নবদ্বীপবাসী প্রভুর প্রতিবেশী এই ছই গোবিন্দ যাত্রীত গোবিন্দ বোধও এই সময় অপর্যাপ্ত ভক্তবর্গসহ প্রভু-দর্শনে গিয়াছিলেন। কলতঃ প্রভু-দর্শনবাণী যাত্রীদলসহ যে যে গোবিন্দ তখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তাহাদের নাম চৈতন্য-চরিতামৃতে একত্রে পাওয়া যায়। যথা—

“শ্রীধাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ।”

হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ।”

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য-খঃ ১৩ পুরি)

এই শেরোক্ত “মাধব, গোবিন্দ” বোধ ভ্রাতৃত্বের। মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেই নীলাচলে চলিলে, নিত্যানন্দাদিসহ এক গোবিন্দ তাহাদের অঙ্গদ্বীপে ছিলেন



এবং নীলাচলে গিয়াছিলেন, ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; সেই ব্যক্তি যে এ (নব্বীপের) গোবিন্দ (দত্ত), গোবিন্দ-দত্ত ও গোবিন্দ ঘোষ হইতে গৃহক একজন, তাহা স্পষ্টই। যাহা হউক, ইহার নীলাচলে রথের সময় নৃত্য-কর্তাদি করিয়াছিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃত অস্ত্য-খঃ ১১ পরি :—

“গোবিন্দ, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ।

রাঘব পণ্ডিত আর গোবিন্দানন্দ।

অদ্বৈত আচার্য্য তাহা নৃত্য করিতে দিল।

গোবিন্দ ঘোষ কৈল আর সম্ভাষণ।”

চারি মাস ইহার নীলাচলে থাকার পর মহাপ্রভু গোড়ায় তাবৎ ভক্তকেই বিদায় দেন, সকলেই তখন চলিয়া আসেন। নিত্যানন্দকেও গোড়ৈ নাম-প্রেরণ প্রচারার্থ ঘোষ গোবিন্দাদি জনসঙ্গে ভক্তসহ বিদায় দিয়াছিলেন, ইহার নিত্যানন্দের কীর্তিনায়া। যথা—চৈতন্য-ভাগবত মধ্য-খঃ ৫ম অঃ

“শিতানন্দ বরুণের মহাপ্রিয় ধাম।

মাধব গোবিন্দ বাহুদেব তিন ভাই।

গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই।”

যাহারা গোড় হইতে রথের পূর্বক্ষেপে নীলাচলে গিয়া ছিলেন, চারি মাস পরে তাহার একসঙ্গে চলিয়া আসিলেন, নিত্যানন্দ পর্যন্ত আসিলেন,—পূর্বেকৃত গোবিন্দদত্ত ও আসিলেন। তাহার গোড়ৈ চলিয়া আসার পরে নীলাচলে গোবিন্দ একজন কিছুই জঁন ছিলেন, তাহা দেখা কর্তব্য।

একজন গোবিন্দের নাম অন্ত্যলীনার বাহুল্য ভাবে চৈতন্যচরিতামৃতের সর্বত্র পাওয়া যায়, ইনি ঈশ্বরদুর্দার কৃত্য নীলাচলে নবাগত গোবিন্দ। এথা চৈতন্য চরিতামৃত—

“ঈশ্বরদুর্দার কৃত্য গোবিন্দ ঘোর নাম।

দুরী গোমোক্ষির অভ্যাসে মহাপ্রভু ইহাকেই “ব্রজসেবার

অধিকার দিয়াছিলেন। বন ভক্তগণ প্রথম নীলাচলে প্রদর্শনকালে আসন করেন, চৈতন্যচরিতামৃত শিখিত আছে যে মহাপ্রভুর আশ্রয় ইনি বরুণ, গোমোক্ষীর স্বয়ং

ভক্তবর্ণকে কৈলেন নীলাচল। অর্থাৎ, করিয়া ইহা গিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতেও এই অভ্যর্থনার কথা আছে, যথা—

“পার শ্রীপরমানন্দ রায় রায়ানন্দ।

চৈতন্যের ধারণাল স্রুতি গোবিন্দ।”

গুস্তীরা-পরে মহাপ্রভুর রাসে শয়ন করিলে ইনি হারে শয়ন করিতে নবিল। “বারপাল গোবিন্দ” নামে ব্যাত হন। যথা—

“গুস্তীরা হারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অস্ত্য-খঃ, ১৭ পরি।

একাধিক ব্যক্তি একজনে থাকিলে, বিশেষ বিশেষ পরিচয়ের প্রয়োজন হয়। নীলাচলে একাধিক রমুনাথ থাকার নবাগত রাস রমুনাথ “বরুণের রমু” বলিয়া ব্যাত হন।

এসঙ্গেও একজন গোবিন্দ বসাবর মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন নবাগত (দুরী) সেবক। গোবিন্দ “বারপাল গোবিন্দ” নামে ব্যাত হইয়াছিলেন।

অতএব নীলাচলে দুইজন গোবিন্দের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না কি?

নীলাচলে ছই গোবিন্দ

পূর্বে দেখিয়াছি যে, নব্বীপের গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ ঘোষ ছাড়া আর এক গোবিন্দ (সম্যাকালে) নিত্যানন্দসহিত সইতে কাটোয়ার গিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ)। আর কাটোয়ার এ গোবিন্দই সমাদী প্রভুর কৌশল-কর হইয়া নবীন সমাদীর পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়াছিলেন (জঃ চৈঃ মঃ); তাহার পর প্রভুর শাস্তিপূরণায়ন কালেও ইনি সমাদী এবং তথা হইতে তৎপরে প্রভু নীলাচলে চলিয়া আসেন, তখনও ইনি প্রভুর সহী (চৈঃ ভাঃ) এবং নীলাচলে পৌছিয়া ইন্দ্ররাস সানকালে এ গোবিন্দই প্রভুর করক-কৌশল রক্ষা করিতেছেন (জঃ চৈঃ মঃ)। এই গোবিন্দ পরে কোথায় ছিলেন?

ইনি আর কোথায় থাকিবেন? যিনি একবার শ্রীকৃষ্ণের সহ-নাচের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কি তাহা ছাড়িতে পারেন? এই নিশ্চয়ন ভক্ত প্রভুকে ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই, যাইতে উচ্ছা হয় নাই,

নীলাচলেই তিনি ছিলেন—ইহাই কি বোধ হয় না? অতঃপর অতঃপর কোর্নেই সমাদার পাওয়া যায় না। অতঃপর সমাদ কোর্নেই প্রভুর শ্রীচরণ-বর্নন মাজই ছিল, যাহাদের একবার কাজ, প্রসঙ্গভাবে এতদপরে তাহাদের বিবরণ বৃদ্ধি হয় নাই।

উদাহরণস্বরূপে বলভদ্র ভট্টাচার্যের কথা বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবন-ভাটায় প্রভুর অঙ্গদে এই বলভদ্রের কথা বাহুল্যরূপে মিলে। প্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যায়ন করিলে পরে ইহার কথা তেমন পাওয়া যায় না। বলভদ্র কোথায় তখন ছিলেন?—আর কোথায় যাইবেন? তিনি নীলাচলেই ছিলেন ও প্রত্যহ প্রদর্শনকালে কীর্তাই হইতেন। তবে বিশেষ বিশেষ লীলার অঙ্গসংস্থে বলিয়াই প্রসঙ্গভাবে এতদে নাম তেমন পাওয়া যায় না। পরে মাত্র একবার ইহার নাম পাওয়া যায়—সনাতন গোমোক্ষী নীলাচল হইতে বনংগে বৃন্দাবন যাইতে উচ্ছা করিয়া, ইহার নিকট হইতে, প্রভুর গমন-পথের পরিচয় লিখিয়া লইয়া-ছিলেন। ইনি যেমন নীরবে নীলাচলে ছিলেন, তদ্রূপ যে গোবিন্দ গোড় হইতে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তিনিও নীরবে নীলাচলেই ছিলেন; ইহাই কি মনে হয় না?

যদি তাহাই হয়, তবে নীলাচলে হারীভাবে ছিলেন গোবিন্দ দুইজন।

(১) একজন প্রভুর সঙ্গে গোড় হইতে আগত।

(২) অপর ঈশ্বরদুর্দার সেবক ও নবাগত।

এখন দেখিতে হইলে এক সময় এই দুই গোবিন্দের নীলাচলে অবস্থিতি ইঙ্গিত গ্রহণের কিছু আছে কি না? জ্ঞানন্দের চৈতন্যমণ্ডলে কবিত মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার এই কয়েক পংক্তি বিবেচ্য :—

“প্রতাপরস মহারাজা দেখিলেন অন্তরঙ্গ।

বাবীনাথ (পট্টনায়ক) উপরে ছিলেন পদাঙ্গ।

বড় অগ্রহণ পাণ্ড প্রহার কানাই।

যার কোলে নিভা গেলো চৈতন্য গোমোক্ষি।

সিদ্ধপুত্রী নামোদার আর বিধেবর।

গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ সর্বের নিরস্তর।”

নবাবদের গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দানন্দ (বিজ) ছাড়া

অতঃপর এক গোবিন্দকে জ্ঞানানন্দ কখন কখন গোবিন্দানন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন পূর্বে বলা হইয়াছে। এই উক্ত ব্যক্তিকে পুরী গোমোক্ষিগণ সেবক গোবিন্দ ও সেই গোবিন্দ এই দুইজনেরই পণ্ডি-উল্লেখ করা হইয়াছে না কি? ইহার দুইজনই নিরস্তর প্রভুর সঙ্গে থাকিতেন।

শ্রীচৈতন্যচরিত দুই গোবিন্দের এক সময়ে নীলাচলে অবস্থিতির ইঙ্গিত জ্ঞানানন্দ ছাড়া কৈশবের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতও একটু যেন আছে, তাহা এই :—

একদা জ্ঞানানন্দ প্রভুর ভক্ত কিছু যুগ্মজি তৈল গোড় হইতে নিরাগত; ইচ্ছা—প্রভু ইহা মাধার দেন, বাতাল থাকিলে রাজে হুজিরা হইবে। “প্রভু তাহা শুনিবেন কেন?” বলিলেন—জ্ঞানানন্দ প্রবীণ লগিলে, ভাগাই হইল। শুনিয়া জ্ঞানানন্দ তৈল ভাঙতা আনিয়া প্রভুর সমুখে আছাড় মেলিয়া ভাঙিয়া বলিতেছেন—“কে বলিল তোমার তরে তৈল আনিয়াছি আমি?” তৎপরে একপ্রসঙ্গ সম্ভবিত করিয়া জ্ঞানানন্দ সেই মুখেই নিজঘরের গিয়া ধারকৃত করিয়া উপবাস করিতে লাগিলেন। দুইদিন জ্ঞানানন্দ বলবিন্দুও এতদে করিলেন না। ইহা শুনিয়া তৃতীয় দিনে প্রভু স্বয়ং গিয়া রন্ধঘরের সমুখে পাঁজায়া বলিতেছেন—“পণ্ডিত! ওঠ, রান করিয়া রীথ; আচ্ছ তোমার ওখানে আমার নিমন্ত্রণ। একবার পর আর কি জ্ঞানানন্দের ছুৎ, রাগ থাকিতে পারে? জ্ঞানানন্দ উঠিলেন, রান করিলেন, এবং তাড়াভাতি আদার পাক করিয়া প্রভুকে সৎকার দিলেন। প্রভু যথাকালে আসিলেন এবং আহার করিলেন। প্রভু পুনঃ পুনঃ পাকের স্বভাবিত করিয়া বলিতেছেন, “রান করিয়া রন্ধন করিলে এত উপায়ে হয়, আগে জানিতাম না।” অনন্তর যথা চৈতন্যচরিতামৃত অস্ত্য-খঃ ১২ পরিচ্ছেদে—

“তবে প্রভু উঠিয়া করিলা আসন।

পণ্ডিত আনি বিন্ধ খুবাস মালা, চন্দন।

চন্দনানি লইয়া প্রভু বসিলা সেই ঘানে।

“আমার আগে আঁজি তুমি করহ বজায়ে।”

পণ্ডিত কহে—“প্রভু যাই স্বকন বিশ্রাম।

হুই এবে প্রাদান লইবু করি সমাধান।

রহইয়ের কার্য্য করিরাছে রাবীই রতুন।

ইহা সবার দিতে চাহি কিছু ব্যয়ন ভাত।”



প্রভু কহে—‘গোবিন্দ তুমি ইহাই রহিবে।  
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কষ্টের।’  
এত কহি মঙ্গল প্রার্থনা করি। শব্দ—  
‘গোবিন্দের পণ্ডিত কিছু কহেন বচন।’  
‘তুমি শীঘ্র বাই কর পায়সস্বাদনে।  
কহিও—পণ্ডিত এবে বলিয়া ভোজনে।  
তোমার তরে প্রভুর শেখ রাবির ধরিয়া।  
‘প্রভু নিম্না গেলে তুমি বাইও আসিয়া।’  
(তৎপর) ‘রামাই নন্দাই গোবিন্দ আর রঘুনান।

সবারে বাঁটিয়া পণ্ডিত দিল ব্যঞ্জন ভাত।  
আপনি প্রভুর প্রণাম করিল ভোজন।  
তবে গোবিন্দের প্রভু পাঠাইলা পুনঃ।  
‘শেখ জগদানন্দ প্রণাম পাও কি না পার।  
‘নয়ন সমাচার আসি কহত আমার।’  
কহিল গোবিন্দ দেখি আসি পণ্ডিতের ভোজন।  
তবে মহাপ্রভু বাহ্যে করিয়া শয়ন।’

এই উক্ত বাক্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে  
১। ‘প্রভু কহে গোবিন্দ তুমি ইহাই রহিবে।  
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে।’

প্রভু যে গোবিন্দকে কহিলেন—‘গোবিন্দ! তুমি এখানে  
থাকিয়া বেধে জগদানন্দ আহার করেন কি না, আহার  
দেখিয়া গিয়া আমারে কহিবে।’ সেই গোবিন্দ ধরল,  
ঈশ্বর পুরীর সেবক অঙ্গ সেবার অধিকারী গোবিন্দ।

প্রভু চিন্তিয়া গেলে জগদানন্দ ইহাকে বলিতেছেন—  
২। ‘তুমি বাই শীঘ্র কর পায় সন্ধান।’  
কহিও পণ্ডিত এবে বলিয়া ভোজনে।

তোমার তরে প্রভুর শেখ রাবির ধরিয়া।  
প্রভু নিম্না গেলে তুমি বাইও আসিয়া।’  
ইহা বলিয়া পণ্ডিত এই গোবিন্দকে পাঠাইয়া দিলেন।

তাহার পর জগদানন্দ কি করিলেন? তিনি—  
৩। ‘রামাই নন্দাই গোবিন্দ আর রঘুনান।  
সবারে বাঁটিয়া পণ্ডিত দিল ব্যঞ্জন ভাত।

(৩) আপনি প্রভুর প্রণাম করিল ভোজন।’  
এই যে গোবিন্দ ভোজনে বসিলেন, ইনি কিন্তু প্রভুর  
পায়সস্বাদনে যান নাই, ইনি এইখানেই ছিলেন।

যিনি জগদানন্দের কুখ্য পান সম্বাদনে প্রভুর পায়স  
চলিয়া আসিয়াছিলেন, প্রভু পুনর্বার তঁাহাকে কিরীয়া  
পাঠাইলেন, বলিলেন জগদানন্দ প্রসাদ বাইতেছেন কি না,  
তাহা দেখিয়া আসিয়া আমারে বলিবে।

৪। ‘তবে গোবিন্দের প্রভু পাঠাইলা পুনঃ।  
দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়;  
শীঘ্র সমাচার জানি কহত আমার।’

এই বিষয়ের জটাই প্রথমের। প্র তঁাহাকে জগদানন্দের  
ঘরে রামাই গিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দের ‘সেবা যে নিয়ম’  
—সেবাই তঁাহার জীবন ত্রি ভিল। বশ্যমাত্র তাই তিনি  
‘প্রভুর কাছে চলিয়া গিয়াছিলেন। এখন প্রভু তঁাহাকে  
পুনর্বার পাঠাইয়া দিলে, তিনি জগদানন্দের ঘরে গিয়া  
দেখিলেন যে রামাই, নন্দাই, গোবিন্দ ও রঘুনানসহ  
জগদানন্দ ভোজন করিতেছেন। দেখিয়া গোবিন্দ প্রভুর  
কাছে গিয়া তঁাহা কহিলেন এবং কহিয়া প্রভু নিশ্চিত  
হইয়া শয়ন করিলেন।

৫। গোবিন্দ দেখি আসি কহিল পণ্ডিতের ভোজন।  
তবে মহাপ্রভু বাহ্যে করিয়া শয়ন।’

এই দশক গোবিন্দ, ও রামাইদ্বয়ের সহিত ভোজন-  
কারী গোবিন্দ, এই দুই গোবিন্দকে এক সময়েই  
নীলাচলে উপস্থিত দেখা বাইতেছে। ইহাদের মধ্যে  
একজন সম্যক প্রবেশকালে কাটোয়ার প্রভুর অস্থায়ী  
এবং সম্যাস্ত্রে প্রভুর নীলাচলে সহযোগী গোবিন্দ,  
তাহা স্পষ্টতর। অপর প্রভুর ‘পাদস্বাদন’কারী  
গোবিন্দকে ঈশ্বর পুরীর সেবক ও কেহে নবগণত  
গোবিন্দ বলিয়াই জানা যায়।

যদি তাহাই হয়, তবে নীলাচলে প্রভুর সহযোগী  
কৌপীন-করমহাশী সেই গোবিন্দই প্রভুর দক্ষিণ-বাঁজ-  
কালেও কৌপীন করকে বহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে  
গিয়াছিলেন—‘পেছনে পেছনে আমি গড়ি গয়ে যাই।  
পেছনে থাকাই ইহার বভাব—ছায়ার ছায় প্রভুর পাছে  
থাকিতেন। বৃন্দাবন দাগও বলিরাছেন—‘গোবিন্দ  
পঞ্চাত্তে আগে কেশব ভারতী।’ দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে  
ইনি প্রভুর সহিত নীলাচলে আসিয়া! নীরবে বাস  
করিতেছিলেন। ইনিই যে কড়াকার গোবিন্দ অবস্থায়

তাহাই কি বোধ হয় না? অতএব কড়াকার নন্দে—  
মৌলিক ও প্রাণাণ্য গ্রহ।

গোবিন্দের কড়াকার যে সব জীবন্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে  
তদ্বিষয়ে পূর্বে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কড়াকার  
সম্পাদক নৃতন সাক্ষরগের দীর্ঘ ভূমিকায় প্রত্যেক বিষয়ের  
সমস্তর গিয়াছেন। কড়াকার বিরুদ্ধে প্রকাশ করা ছিল,  
সম্যাসের মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে প্রভুর জটীর উল্লেখ  
অসম্ভব। ‘অসম্ভাব্য ন বক্রব্যম।’ এ সোভা কথাটাও  
কি জালকারী জানিত না? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত  
হইতে, কড়াকার সম্পাদক অনেক অসম্ভব ঘটনা,  
অসৌক্যিক লীলা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি যে তাহাই  
উদ্ধৃত করুন, বৈকল্যভর উহা অবিশ্বাস করিবেন না।  
চরিতামৃতের এতটা অসম্ভব কথা বিশ্বাস করা হইলে  
—পাঁচ মাসে প্রভুর জটা হইয়াছিল, তাহাই বা অবিশ্বাস  
হইবে কেন? ইহা বলিবার অধিকার তঁাহার থাকিতে  
পারে; কিন্তু তিনি শ্রীমহাপ্রভুর জটার একটা ব্যাখ্যাও  
ভূমিকায় দিয়াছেন।

সম্যাসিগণ দীর্ঘভ্রমণকালে কৃত্রিম জটা ধারণের  
কথা আছে। সম্যাসিগণ সত্য মন্তক হুণ্ডন করিলেও ভ্রমণ-  
কালে কৃত্রিম জটাদ্বারা করেন। সম্যাসীর প্রথামত  
মহাপ্রভুও জটা ধারণ করিয়াছিলেন। ত্রোতাগুণেশ্বরকর্ত্তে হরি  
দক্ষিণ-ভ্রমণকালে যেমন কৃত্রিম জটা ধারণ করিয়াছিলেন—  
‘জটা চীরব্রহ্মে রাজ্যে ত্রিভুজামহাপ্রাণন’  
এবারেও হরি সেই দক্ষিণ-ভ্রমণকালে তেমনই কৃত্রিম  
জটা ধারণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ-প্রেমের প্রাবল্যে মহাপ্রভুর জটা বসিয়া পণ্ডিত  
বসিয়া কড়াকার লিখিত আছে। জটা স্বাভাবিক হইলে  
বসিয়া পণ্ডিত না, বসিয়া পড়াতেই প্রমাণ হয় যে, জটা  
কৃত্রিম ছিল। এ সম্বন্ধে ১৩৩৭ সালের আষাঢ় মাসখা  
‘ঐবিশ্বপ্রদা’ গৌরাঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত সংখ্যায়  
‘নীরাবন্ধ’ প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

ভাব-বিশেষের আভিপ্রাণে, বদন রাগরঞ্জিত হয়।  
কোমরে ভান্ডারন বিচলিত ব্যক্তির বদন রক্তমাংসকার  
ধারণ করে বলিয়া জোমেরে প্রতিশব্দ হইয়াছে ‘রাগ’।  
রসশাস্ত্রের রাগ আভিপ্রাণে প্রথমবাটী শব্দ। কোন যুবতী

যদি প্রেমাসক্ত হয়, তবে তাহার প্রণয়ান্বিতের প্রসঙ্গ  
করিলে, প্রেমের উত্তরে বদন কি হৃদয়ের পোহিত রাগ-রঞ্জিত  
হইয়া উঠে। প্রেমের গাঢ়তাবশতঃ তাহা নবনবায়মান-  
রূপে প্রোভিত হইয়া থাকে।

‘প্রেম বুদ্ধি কমে নাম—বেগ, মান, প্রণয়।  
রাগ, অহরুগ, ভাব মহাভাব হয়।’ (চৈঃ চঃ)  
প্রিয়তমের বৃত্তি-উদ্দীপক ভাবের বৈকল্যশাস্ত্রে এক  
পারিতোষিক নাম আছে, উহাকে ‘উদ্দীপন’ বলে।  
পলচিহ্ন, নৃপুংস্বান, বংশীধ্বনি প্রভৃতির মধ্যে বংশীধ্বনিই  
এখান উদ্দীপন অর্থাৎ বংশীধ্বনিতে শ্রীমতীর সত্যত  
কৃষ্ণবৃত্তি উদ্দীপিত করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য-পঃ  
১৭ পরিঃ—ব্যাখ্যা—

‘মোহা বৈষ্ণবকলধনি একবার তাহা শুনি  
ব্রজনারী চিত্ত আউলার।  
নীরাবন্ধ যায় যদি বিনামূল্যে হয় দাসী  
বাউলি হর্দ্যে কৃষ্ণ পাশে যায়।’

অতঃ চরিতামৃততে ব্যাখ্যা—  
নীরাবন্ধ গুরু আগে লজ্জা দর্শন করার ত্যাগে  
কেশে ধরি যেন লজ্জা যায়।’ ইত্যাদি

‘নীরাবন্ধ’ বস্তুবন্ধন-গ্রহি। যেসেরা তাপড় পরিয়া  
শান্তির খোঁটে কোমরে যে গ্রহি বসিয়া বসন আটকাইয়া  
রাখে তাহা। বৃন্দাবনের যেসেরা ঘাঘরা পরে এবং  
কোমরে বেঁধেই ধারা তাহা আইকাইয়া রাখে; নীরা  
ইহারই নাম। গোপীপুত্রের এই নীরা বসিয়া পণ্ডিত—  
বেণুধ্বনি-স্বরণে কৃষ্ণপ্রেমের প্রাবল্যে। বেণুধ্বনিতে নীরা  
বদন উন্মোদন হয় কেমন করিয়া?

সেহ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে নীরা উন্মোচিত  
হইতে পারে না। যদি কোন বাহ্যমুখে দেখানো হঠাৎ  
অপেক্ষাকৃত ক্লান্ত প্রাণ হয়, তবে সেহ হঠাৎ সর্ক হওয়ার  
কোমরের বদন শিথিল হইয়া পড়িতে পারে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে হরি-বিরহ দশার দশটি অবস্থা হয়, তন্মধ্যে  
ক্লান্ততা বা অকর্ণীকতা একটা, ব্যাখ্যা—

‘অশেষু তাপ ক্লান্তা জাগর্যাসাধক্লান্তা।  
ইত্যাদি ভক্তিরসাস্বাদন



তাপের প কৃশতা। সত্যচর অরে শরীরে তাপ  
তারও কল কৃশতা। সে কিন্তু ক্রমে ক্রমে, প্রেমজ্বরের  
অর্থাৎ বিবাহের তাপের কৃশতা বৃদ্ধি নিম্নেবের মধ্যে হইয়া  
যায়। অত্যধিক ক্রম হইলে—রাগ হইলে, খর্য হইয়া “কাহারো  
কাহারো পরিহিত বস্ত্র দেখে যায়, কেমনে খসে বুঝা যায়না।  
বিরহিনী ব্রজকিশোরীদের কৃশতা (অঙ্গকীর্ণতা)  
বশতঃ অঙ্গস্ফোট ঘটয়া নীবা বসিত—কটবেষ্টনী আলগা  
হইয়া পড়িত। তখনকার বাহ্যময় ছিল বংশীধ্বনি।

গোষ্ঠী হয় তো গুরুজনের কাছে আছেন—নিশ্চিত  
মনে রাখিছেন; হঠাৎ মধুর রবে বিখ-বিমোহন বংশী  
বাজিয়া উঠিল, বায়ুস্তর শুষ্ক হইল, যমুনার স্রোত রুদ্ধ  
হইল। তার আগেই শৃঙ্গাপকুমারীর প্রাণ আনন্দান করিয়া  
উঠিয়াছে, তাঁহার জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। গোষ্ঠীর নীবা  
যে কখন বসিয়া পড়িয়াছে, বুঝেন নাই। পার্শ্বচারিণী  
সহচরী বদি কারণাধীনে তদবস্থ না হইয়া থাকেন তবে  
তিনিই সখীর কটবেষ্টন বসন ঠিক করিয়া দিলেন।

বেগুনি শ্রবণে শ্রীমতীর প্রাণ নাচিয়া উঠিত; পাগলপারা  
শ্রীমতী-দেহে নানা ভাববিকার বিকসিত হইত। কেবল  
অশ্রু-পুলক নড়ে, কেবল উৎকণ্ঠা উল্লস্যা প্রবেদ  
নড়ে, হাঁহাতে দেহে কখন কখন বিকৃত, স্ফোটিত,  
ক্লান্তিরিত হইত, সখীরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেন।

কৃষ্ণ-প্রেমের প্রাবল্যে শ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গকীর্ণতা ঘটত,  
যথা—“কণে অঙ্গ কীর্ণ হয় কণে অঙ্গ ফুলে।” প্রবেদানন্দ  
সরসভী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামুতে শিখিয়াছেন—“কণা কীর্ণা পীনঃ  
কণিধে মাস্ক” ইত্যাদি। আর তাহাতেই কখন কখন  
অঙ্গ-স্ফোটের আতিশয্যে অঙ্গ ওপ্তিবশতঃ তদীয় কুণ্ডলক্লান্তির  
অকৃত বর্ণনা অল্প অল্প করে চরিতামুতে রহিয়াছে। কি এক  
অমৌলিক বিধারে তাঁহার হস্তপাদি দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া  
বাসিত।

এই অপরাধ আকৃতি বিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তিনি  
(বসুন্ধরা) লিখিয়াছেন—

“কমঠ ইব ক্লোকবিরাহাৎ বিযাজন গোরাঙ্গ।”

প্রেমের স্রোত যেখায় প্রবেশে প্রবাহিত হয়, অমটন-  
প্রায় কত তথায় নিমেষে সংঘটিত হয়,—নীবা খসিবে  
বিদ্রিষ্ট কি?

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে যে, একদা শ্রীমিতা-  
নন্দ গোরাঙ্গ-দর্শনে শ্রীবাঙ্গ-গৃহ হইতে চলিয়াছেন।  
গোরাঙ্গ দৃষ্টিতে গোরাঙ্গদেহে প্রেমাত্মাচিহ্ন নিভাই টালিয়া  
টালিয়া চলিয়াছেন। নিজগৃহে গোরাঙ্গ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া  
সহিত বিরাজিত। নিভাইএর যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল, বিষ্ণু-  
প্রিয়া-বিষমস্তরের দর্শনে, গৌর-প্রেমের ভীমাবর্ত্তে পড়িয়া  
বিলুপ্ত হইল; অঙ্গকীর্ণতাবশতঃ জ্ঞানহারা নিভাইএর নীবা  
খসিয়া গেল। দেবী পলাইয়া গেলেন। শ্রীগোরাঙ্গ তাড়া-  
তাড়ি প্রেমপাগলকে বসন পরাইয়া দিলেন।

গোবিন্দ দাসের কড়চার এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের হরি-  
“দ্বিভূতিতে কৃত্রিম জটার বকন খসিয়া পড়ার উল্লেখ আছে,  
স্পষ্টই লিখিত আছে :—

“প্রেমভরে খুলে গেল জটার বকন।

চরণে চরণ বাধি পড়িল তখন॥

মুখে লাল্য বহে কত জল নাসিকায়।

জড়ের সমান পড়ি রহে গৌর রায়॥”

যেদেরা যেমন চুলের বেণী বাধে, জটার সেইরূপ। বেণীর  
গুলার কথা হইতেছে না। বংশীধ্বনিতে ব্রজকিশোরীর  
কেশ গুলিত না—নীবা গুলিত। শিরঃ (কেশ) কৃত্রিম  
নহে—স্বভাবজাত; নীবা কৃত্রিম—অঙ্গকীর্ণতায় তাহা  
গুলিয়া যাাইবে।

বংশীরব ও হরিপদচিহ্নাদি উদ্দীপন ইহা বলা হইয়াছে।  
পদচিহ্ন-দর্শনে ক্লান্তদৃষ্টিতে শ্রীমহাপ্রভুর জটাবকন ও নীবা-  
বকন একসময়ে গুলিয়া পড়িবার কথাও কড়চার আছে।  
নীবা বকনের জায় জটাবকন একই প্রকৃতির, অর্থাৎ  
উভয়ই কৃত্রিম; একত্রে বর্ণিত হইয়াছে কি তাহাই বোধ  
হয় না?

গোবিন্দের কড়চার লিখিত আছে যে, গুণার গিরির  
উপরে হরিপদচিহ্ন-দর্শনে ক্লোকাধিপনে এবণ প্রেমের  
শ্রীগৌরাঙ্গের জটা খসিয়া পড়িয়াছিল। কেবল জটা নহে—  
“জটাবক” এবং “কটাবক” অর্থাৎ নীবা খসিয়া পড়িয়া  
ছিল। যথা :—

“চরণ পরশি—প্রভু ময়ন মুখিল।

জয় বাহিরা অশ্রু পড়িতে লাগিল॥

পদ প্রাক্ষিপ করে করতালি দিয়া।  
কটাবক, জটাবক পড়িল খসিয়া॥”

সন্ন্যাসীর দণ্ড গ্রহণ প্রথা—শ্রীমহাপ্রভুর তাহা ছিল।  
সন্ন্যাসের রীতামুসারে তাঁহার ভ্রম্মহৃদ-বর্ণনে যাওয়ার কথা

আছে; তখন তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে ধড়ম দিয়াছিলেন।  
সন্ন্যাসীরা যেমন ধড়ম ব্যৱহার করেন, তাঁহারও ধড়ম না  
থাকিলে দিবেন কেমন করি! কড়চারও ধড়মের প্রলঙ্গ  
আছে; তদবস্থায় কৃত্রিম জটা ধারণ এমন অদৃষ্টবই কি?  
একথা বলা বাইতে পারে।

## মহুয়া

(পূর্বাঙ্কুরভিত্তি)

শ্রীমহাপ্রভুরজন দাস

তৃতীয় দৃষ্ট

প্রথম লোক।

এক ধারে পার্কতা নদীর পার—বনপথ,  
অপর ধারে ভগ্ন মন্দির।

(পারে একটা লোক জ্বলন্ত বুনিতে বুনিতে গান গারিতেছে)

গান

কানা মেঝারে তুইনি আমার ভাই,  
একটুখানি পানি সে রে মাইলের চিরা খাইঃ।  
শুকহিল ক্ষেতরে আমার আসিল জ্বাল,  
কি দিয়া পানিব আমার প্রাণের ছাওয়াল।  
দেখে পানি, দেখে পানি, একটুকু পানি চাই,  
পানি দিয়া বাঁচারে প্রাণ কানা মেঝা ভাই।

(আর একটা লোকের প্রবেশ)

দ্বিতীয় লোক।

আরে বন্ধু, থামা এখন তোরনা গানের পালা,  
ঐ দেখে নার আসে ভ্রজন দিয়া পাছের তপা।  
আম্বরে বৃষ্টি হুদিন এলো পথিক আসে তাই,  
ছুরিখানি শানায় লই আড়ালে আয় তাই।

দ্বিতীয়। রাখ রে তোর এই ধর্মের বড়াই আড়ালে আয় তরা,  
গোল করি না, নইলে দেখবি ছাওয়ালের মুখ মরা।

(প্রথম লোকটাকে দ্বিতীয় লোকটা টানিতে টানিতে  
অন্তরালে লইয়া গেল। প্রথম লোকটা রাগে  
প্রহান করিল)

আর এক দিক হইতে মহুয়া ও নদেরটানের প্রবেশ)

মহুয়া। পাছাড়ীয়া ভীষণ নদী ডেউয়ে মারে, বাড়ি,  
কিবা যত্ন আছে মোদের কেমনে দিই পারি।  
চড়না পড়ি যাওরে নদী হটার দণ্ডের লাগি,  
পারে উঠি যাইব মোরা এইত জিন্দা মাগি।

নদেরটান।

ভাসিয়োনা মহুয়ারে তোকা হাতে দেখি,  
মাখির হইলে দয়া মোরা পারে গিয়া ঠেকি।



(দ্বিতীয় লোকের প্রবেশ। নমেরটাদ তাহাকে  
সম্বোধন করিয়া) ০

শুন শুন শুন অসি এই যে ভিক্ষা মাগি,  
নৌকাখানি বাওনা তুমি একদণ্ড লাগি।  
গভীর দেখি নদীর জল যে উপায় নাচি জানি,  
পার করিয়া দিলে বাটে এ দৃষ্টি পরাণী।

দ্বিতীয় লোক।

কোন আসমানের চাঁদ গো তোমরা কোন আসমানের তারা?  
নমেরটাদ। আমরা দৃষ্টি বনবাসী আমরা গৃহহাড়া।

দ্বিতীয় লোক। (একান্তে)

এইনারেক্ষমতায় দেখি সোণার বরণ,  
পাইতে তারে মনু তো আমার করে উঠান।  
কাল কাল ভাগ্যে আঁধি লগ্না মাথার চুল,  
বিধি না মিলাইল আজি মধু ভরা ফুল।  
লইয়া যাইত নদীর পাড়ে এখন এই বেলা,  
পুরুষটারে হঠাৎ দিব জলে এক তেলা,  
ডুববে গিয়া জলের তলে কিসের আর ভয়,  
কড়া তখন আমার ঘরে যাইবে হৃনিশ্চয়।

মহায়া। (চুপে চুপে নমেরটাদকে)

মানুষ তবু দেখি আমার মনে শকা আগে,  
নৌকার উঠি কাজ নাই চল পলাই গিয়া আগে।

নমেরটাদ। (চুপে চুপে)

কোথায় আর গো যাবে কড়া উপায় কিছু নাই,  
মাঝির খোঁজ পায়ে চল যা করেন গোগাই।

দ্বিতীয় লোক।

আস তবে নদীর পায়ে নৌকার চড়ি গিয়া,  
বোনেনে বলিবে আমি দিব পৌছাইয়া।

(সকলে অগ্রসর হইয়া জলের কাছে পৌছিতেই মাঝি  
নমেরটাদকে ধাক্কা দিলে জলে ফেলিয়া দিল। নমেরটাদকে  
ভাসিয়া বাইতে দেখিয়া মহায়া ঝাঁপ দিতে গেল, মাঝি অসিয়া  
তাহাকে কোর করিয়া ধরিল)

মহায়া। (কাঁদিতে কাঁদিতে)

যে ডেউর কাশায়ে নিল আমার নমেরটাদ,  
সে ডেউরে ডুবিয়া আমি তাজির প্রাণ।

মাঝি। কেন কড়া পরাণ দিবে যথা স্ফারণ,  
আমারে ভজিয়া তুমি রাখ আমার মন।  
এখন সোণার পানসী তুমি তাতে মাঝি নাই,  
যৌবন চলি গেলে কড়া কেউ না দিবে ঠাই।  
ফুলে ভরা মধু তুমি ফির একেশ্বরী,  
তোমারে লভিয়া আমি বাহা পূর্ণ করি।

মহায়া। আমি বড় অভাগিনী তোমার দয়া মাগি  
পরাণ আমার ফাটি যার রে প্রাণের স্বামী লাগি।  
মাঝি। ধর তোমার মুখা কড়া আস আমার সাথে,  
ঠকুরাগী হ'বে তুমি রবে আমার মাথে।  
বদন-ভূষণ দিব আমি দিবি নীলাধরী,  
নাচক কাশে দিব ফুলের কাঁচা সোণার গড়ি।  
চম্ভসার গড়িয়ে দিব নাচক দিব নথ,  
নুপুরে বুনুননি কড়া দিব মনোমত।  
গন্ধতলে বাকি দিব তোমার কাশো কেশ,  
সাথে রবে দাসীবাধী নাহি কিছু রেশ।

(একটু ধামিয়া) এই নাগোণে পানের বাটা পান সাজিয়া বাও,  
আর ঐ হাতে বানানো পান আমার একটা দাও।  
(মহায়া উপায়ান্তর না দেখিয়া পান সাজিল, মাথার  
পাছাটীয়া তক্ষকের বিয়ের বড়ী ছিল, পানের চূণ ও থয়রে  
বিব নিশাইল।)

মহায়া। (একান্তে)  
এইবার যুগ্ম আমার পরাণ রাখেন ভগবান  
চূণ-থয়রে বিব দিয়া ভোঁ মাঝি দিছি পান।

মাঝি। (পান বাইতে বাইতে)  
কি পান দিছ কড়া আমার শুণেরে অস্ত নাই।  
তোমার কোলে মাথা রাখি হৃথেকে নিভা যাই।  
(বিষপান খাইয়া মাঝি চলিয়া পড়িল, কড়া ছাড়া পাইয়া  
মাঝিরে জলে ফেলিয়া গিয়া পৌছাইয়া পলায়ন করিল।)

(কিয়ৎকাল পরে হুমড়া ও মাণিকের প্রবেশ)  
হুমড়া। এত তুরলাম তবু তো রে মহায়া মিলিল কই?  
আছে কি সে জলের তলে? ওই বুঝিবে ওই!  
আহা ওরে বাহা আমার, কে জলে ডুগল,  
নমেরটাদ কি ভুজি মধু বাসি ফুল ভঙাল?

পাণিষ্টরে বন্ধে তোর দিব বিয়ের চুরি,  
কেমনে রে করিল দেখি বেদের মেয়ে চুরি।  
ওই বুঝিবে জলের তলে মহায়া কাঁদিয়া ভাকে,  
বাই, বাই, বাই রে মাণিক, তুলি আনি তাকে।  
কোথায় ওরে মোর হল্লাণী-গভীর জলের তলে,  
তোমার আনতে বাপের কোলে পড়ব আমি জলে।

(স্বপ্ন-প্রদানের উত্তোণ এবং মাণিকের হস্তধারণ)  
মাণিক। কি হ'বে ভাই তাজিলে প্রাণ নদীতে ডুবিল,  
পাবে কি মহায়া সেখা আপনি মরিয়া।

হুমড়া। দিব আমি মাণিক ভাইয়ের নদীর জলে ঝাঁপ,  
মরি যদি জুড়ায় তবে যত প্রাণের তাপ।

(আবার স্বপ্ন-প্রদানে উক্তত)  
মাণিক। (ধরিয়া লইয়া)  
চল ভাইরে খুঁজি গিয়া মহায়া যে কোণা,  
নমেরটাদের সঙ্গে আছে আমার যাব সেখা।  
এস এস বেদের রাজা ত্যারে আমি কিরা,  
নমেরটাদের বন্ধ ভেরি শাবক আনব ছিড়া।

(হুমড়াকে টানিয়া লইয়া—মাণিকের প্রস্থান)  
(অপর ধার দিয়া ভয় মনিরের কাছ দিয়া নমেরটাদকে  
অঙ্গদন্ধান করিতে করিতে মহায়ার প্রবেশ)  
মহায়ার গীত—  
কোনু পূর্ণনে ঘোটে ফুলের কোথায় জলে মগি,  
কোথায় আমার প্রাণের রাজা অস্তল প্রেমের ধনি।  
বনের পাখী কওনা কণা,  
কওনা কণা তরলতা,  
টেউরে ভাসি ঝুঁ কোথা পেল বাল শুন।  
বেধ কেঁদে কেঁদে ঘুরি,  
ওগো মধুর ময়ূরী,  
কওনা কণা দয়া করি তুলি মধুর ধনি।  
ধরিয়ায় গলিয়া পড়ে আমার গলায় মগি,  
কোথায় আমার প্রাণের রাজা অস্তল প্রেমের ধনি।  
(অঙ্গদন্ধান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইতে)  
নাইরে নাইরে বন্ধ আমার, নাইরে পরাণ তার,  
বিধাতা করিল হৃদয়ী হৃদয়া করে আর।

মহায়া। আমার লাগি ছাড়ল বন্ধ সকল যুগের আশা,  
আমার লাগি নদীর কূলে করণ আমি বাগা।  
ঘর-বাড়ী ছাড়ল বন্ধ আমার লাগিয়া,  
পরাণ হারায় আসি হেথায় জলেতে ডুবিয়া।  
এই না নদীর জলে ডুবি আমিও মরিব,  
বুকচালে কাঁদ দিয়া কি পূরণ তাজির।

(হাটতে হাটতে ভয় মনিরের দিকে গমন এবং  
মনিরের নিকট মৃতপ্রায় নমেরটাদকে দর্শন)

মহায়া। (চমকাইয়া উঠিয়া)  
হোথায় কেঁদে, হোথায় কেঁদে ঐ না নমেরটাদ!  
কোথায় তাহার সোনার বরণ হুম্বর বহান।

(নমেরটাদের পরপ্রান্তে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে  
সেবা করিতে লাগিল)

(এমন সময় এক জটাভূটাদার সম্মানীর প্রবেশ)

মহায়া। (সম্মানীকে দেখিয়া মহায়া সম্মানীর চরণ ধরিয়া)  
কে আপনি গহন বনে প্রবীণ সম্মানী,  
দয়া করি অনাগীরে দেখুন হেথা আসি  
স্বামী আমার চেতনহারা বিবম জরে কাতর,  
বাঁচান ত্যারে দুর করিয়া দাসীর হৃদয়ে পাথর।  
সম্মানী। কৈশোনা কৈশোনা কড়া উঠ ছাড়ি চরণ,  
রক্ষা করি দিব আমি তোমার পতির জীবন।

(সম্মানী একটা বৃক্ষের পাড়া তুলিয়া ধীরে দিয়া চিবাইয়া  
নমেরটাদের রূপাণে ও বৃক্ষে প্রলেপ দিলেন। অঙ্গদন্ধ  
পরে নমেরটাদ চেতনা পাইয়া উঠিল মনির-বারে ঠেস দিয়া  
বসিল।)

সম্মানী। শুন কড়া শুন কণা এস বনের মাঝ,  
প্রাণে বাঁচল তোমার পতি, আছে তবু কাজ।  
পূর্ণিয়ার আঁধ নিশিদেশে শনিবারের দিন,  
ওঁধ তুলতে যাবে কড়া থাকতে দণ্ড তিন।

(সম্মানী শব্দে মহায়া অগ্রসর হইল, বনের অপর ধারে  
—নমেরটাদের দৃষ্টির বাহিরে গিয়া সম্মানী মহায়াকে  
বলিল)

সম্মানী। তোমার রূপে শোন কড়া যোগীর ভাকে যোগ  
এই কারনে হ'ল তোমার এত কষ্ট ভোগ।



হৃৎকের দেখা এ জীবনে মিলিবে না আর,  
সেখী তোমার নিজের কপাল খোঁচার সাধা কার।  
মহা। (সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া) ॥

অভাগি হুখিলী আমি ছেড়েছি সব আশা,  
স্বামী পরাণ রক্ষা করুন করুণানিবাশ।

সন্ন্যাসী। (মহাচারে তুলিয়া করুণাব্যঞ্জক স্বরে)

জন্ম হ'তে মন্মতাগা মহা তোমার,  
ব্রাহ্মণকতা বাস করিলে বেগের মাঝার।  
অন্ততঃ হুহুর্থে হ'ল বামনকান্দে গতি,  
কি কুঞ্জে হ'ল তোমার নদেরচাঁদের মতি।

মহা। স্বামীয়ে বাঁচাতে চাহি গভা কহি বাণী,  
তার তুলনায় পরাণ আমার অতি তুচ্ছ মানি।

সন্ন্যাসী। এম কথা আমার স্মরণে বলি ছুটি কথা,  
দেখি যদি খোঁচে তব প্রাণের কাতরতা।  
ভাগ্য তোমার রোধ করিতে সাধা বৃষ্টি নাই,  
যোগের ফলে তথ্য কিছু দেখি যদি পাই।

(সন্ন্যাসীর সহিত মহাচারে চলিল। নদেরচাঁদ  
পূর্বকেন্দ্রনা লাভ করিয়া মন্দিরের দ্বারের নিকট নিঃসন্ন  
হইল)

(হমড়া, মাণিক ও পাগলের প্রবেশ)

হমড়া। বল বল, তরলতা বল পশুপাখী,  
নদেরচাঁদ সে মহাচারে কোথায় নিল রাখি।  
জান না কি জান না গো কোথায় বেদের বালা!  
কোথায় আমার ঘরের দীপতা বনের কোণে আলা।

(চারিদিকে চাহিয়া)  
ও পথেতে গেছে কি সে ঐ বনের ধারে,  
নদেরচাঁদ কি রাখে ধরি আমার মহাচারে?  
ঐ উঠে কি কামার ধনি, মহা কি কাঁদে?  
হুঃখ সিঁচে নদেরচাঁদ রে ছলে ধরি কাঁদে।  
বাইরে কথা বাইরে আমি আনব তোমারে কাড়ি,  
এই ছুরিতে নদেরচাঁদের বক্ষ বিব কাড়ি।  
(হমড়ার প্রস্থান)

মাণিক। (পালঙ্কের দিকে চাহিয়া)

কি ভাবিস পালঙ্ক বেটা একা বসি বসি,  
নয়ন হ'তে দুটি নয়ন পড়িতেছে পসি।

পালঙ্ক। কি হ'বে মহা সখীর ভাবি বসি তাই,  
বেদের হাতে পড়লে তাদের রক্ষা বৃষ্টি নাই।

মাণিক। যে ভাবে কেশেয়ে হবে মহা বৃষ্টিতে,  
কি হ'বে যে নদেরচাঁদের পারি না বৃষ্টিতে।  
আন কি পালঙ্ক বেটা উপায় কিছু জান,  
মহা আর নদেরচাঁদে রক্ষা করি আন।

পালঙ্ক। উপায় কিছু জানি না তো বৃষ্টিতে পারি না,  
কেনে সখীয়ে বাঁচাই আমি তো জানি না।  
সখীয়ে বসেছি পথে বাঁশী বাজাব,  
তা হ'তে বিপদের কথা তাহারে বোঝাব।  
সখীর তরে দিবারাত্তর আমার কাঁদে প্রাণ,  
ভাবি সইই বাঁচান তাদের সদয় ভগবান।

মাণিক। চল তবে পথে ভূমি বাঁশী বাজাবে,  
সে রবে বৃষ্টিবে বিপদ এসেছে ঘনায়।  
হয় তো বৃষ্টি এ বন ছাড়ি যাবে পলাইয়া,  
এ হ'তে কি উপায় আছে দেখি না ভানিয়া।

(মাণিকের প্রস্থান)

পালঙ্ক। চল যাবে বনে বনে সখীয়ে বৃষ্টিতে,  
পরাণ আমার আকুল কেন পারি না বৃষ্টিতে।

গীত

পড়ে ক্ষণে ক্ষণে সে বদন মনে,  
পরাণ আকুল ধায়।

হৃদয়ে ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া

নিয়ত বাসনা চায়।

তাহারি বিহনে আঁধার জীবনে

আর কিবা আসে যায়,

সে অমিয় হাসি হেরি সুখে ভাসি

পুনেনা এ আশা হয়।

তাহারি পরশে মোহের আবশে

পরাণ কি স্বপ্ন পায়,

সে মোর বাসনা প্রাণের কামনা

আর নাশিলা হয়।

(পালঙ্কের প্রস্থান)

(ভোর হইয়া আসিল। মহা নদেরচাঁদের ঔষধ  
আনিয়া তাহার নিকট উপবেশন করিল। নদেরচাঁদ নিদ্রা  
হইতে জাগরিত হইয়া মহার হাত ধরিয়া বসিল। মহা  
গান ধরিল)

গীত

বনে বনে ফিরি মোরা বনে বনে রই,

দেহার প্রেমে হুখী তনু যতই ছব সই।

মোদের নাইরে কোনও ঘর,

মোদের নাইরে আপন পর।

পুত্র সাপে ফিরি মোরা বনে বনে ধাই,

পানী সাপে কণ্ঠ মিলাই কুণের মধু খাই।

আমি জানি শুইই জানি

ভূমি আমার নয়ন মণি।

আমি তোমার চরণ বাঁশী, চরণ তলে ঠাই।

নদেরচাঁদ গায়িল—

আমি তোমার একলা রাজা, রাণী তুমি তাই।

পরে, নদেরচাঁদ। (সমুখের দিকে তাকাইয়া)

সামনে দেখ পাহাড়-নদী সাতার বিয়া যায়,

বনের কোকিল “বউ কথা কও” ডালে বসি গায়।

এইখানেতে বাঁধি এসে নিজের বাসা ঘর

এইখানেতে থাকব মোরা প্রকৃত অন্তর।

সামনে দেখ নদী বুক ডেউরে খেলি পানি,

এইখানেতে সব মোরা দিগন্তরজনী।

চৌকিকেতে রাধা ফুল ও ডালে পাঁকা ফল,

এইখানেতে আছে কথা মিঠা স্বপ্না-জল।

(কিয়দূর অগ্রসর হইয়া উভয়ে মালাম পাথরে

উপবেশন করিল, নদেরচাঁদের কোলে মাথা রাখিয়া মহা

শয়ন করিল। এমন সময়ে অকস্মাতঃ দূরে বংশীধ্বনি হইল,

মহা চমকিয়া উঠিয়া বসিল)

মহা। ওকি, ওকি, ওকি ধনি বাজল বনের ধারে,

কি যেন গো ভীষণ শব্দা বাজাল অন্তরে।

নদেরচাঁদ। কি কারণে কথা তুমি হ'তেছে চঞ্চল,

কি কারণে বদন তোমার হ'তেছে বিকল।

প্রকাশ করি বল তোমার জন্ম-বিবরণ  
বেদের সঙ্গে কেন তুমি কর বিচরণ  
শুনালে তো কতক কথা সেদিন বিজনে,  
ছোটকালে হুমড়া বেদে চুরি করি আনে।

মহা (কানিয়া)।

আজি যদি বাঁচি বন্ধু কহিব সে কথা,  
শুন শুন হরাৎ কেন বাজল প্রাণে বাধা।

দূর বনে ঐ বাজল বাঁশী শুনছ তুমি কানে,

আমছে ছেনো বেদের সঙ্গে বসিতে পরাণে।

আমার যে গো পালঙ্ক সেই বাঁশী বাজাইল,

সামান্য দিতে পরাণ মোদের ইসারায় করিল।

আজকে তুমি থাক বন্ধু আমার বুক শুইয়া,

আর না দেখব হুমড়া তোমার পরে ত উঠিয়া।

বনের বেলা সাঙ্গ হল যাব যমের দেশ,

বিদায় দাও গো, বিদায় এবার, বলি যে বিশেষ।

(শিকারী কুকুরের সহিত হুমড়ার দলের প্রবেশ)

(নদেরচাঁদ ও মহার সঙ্গবে হুমড়ার ছুরি হস্তে অবস্থান।)

হমড়া। এই তো পেরেছি এই নাহি রে নিভার,

বিষাক এই ছুরি দিয়া হুমণেরে মার।

প্রাণে যদি বাঁচবি কথা আমার কথা ধর,

নদেরচাঁদে মারি তুই রে স্বজন বিদায় কর।

মহা। কেনে এই ছুরি দিয়ে পড়িলে বধ করি,

মেরোনা মেরোনা তারে, আমি আগে মরি।

কেনন করি বাঁধব দেশে বন্ধুরে মারিয়া,

অন্ত কোন জনে আমি না করিব বিয়া।

আমার বন্ধু চন্দ্র হুখ্য কাপা সোনা অলে,

তাঁহার কাছে স্বজন বেদে ছোঁনি, হেন চলে।

নদেরচাঁদ। মিছে কেন তাঁব কথা আবারে তুমি মার,

তুমি নিজে হুখ্য থাক আমার কথা ধর।

মহা। না, না, যাব না দেশে বন্ধুরে মারিয়া,

তাঁহার আগে প্রাণ দিব, ছুরিতে মরিয়া।

(হুমড়ার পদতলে পড়িয়া)

আমার চন্দ্র নিয়া তুমি একবার দেখি যাও,

এমন সোনার চাঁদে তুমি কেন মারতে চাও



হুমড়া (গঞ্জিরা)।

না, না, না, শুনব না আশা, \* নে রে ছুরি হাতে,  
ইহারে মাথিয়া এখন চূরে আমার সাধে।

মহা। (একবার পতির পানে চাহিয়া; একবার স্বপার  
পানে চাহিয়া)

শুন শুন প্রাপ্তপতি বলি যে তোমারে,  
জন্মের মত বিদায় দাও হে তোমার মহার।

শুন শুন পালাও সেই শুন বলি কথা,  
তুমি তো জানগো আমার প্রাণের যত ব্যথা  
শুন শুন হুমড়া বেদে বলি হে তোমার,  
ছোটকাঁপের ধনরে আনেছিলে হার।

জন্মিয়া না দেখি কতু বাবা আর মায়ের,  
কর্ম্মদোষে এতদিনে পুরাণ স্মারার যার।

(হুমড়ার হস্ত হইতে ছুরি লইয়া নিজের বক্ষে আঘাত ও  
পতন)

নন্দেরচাঁদ। কই কই কোণার বাও গো নন্দেচাঁদে ছাড়ি।

(মহারার বক্ষের নিকট উপবেশন)

হুমড়া। (দৌড়াইয়া আসিয়া)

না, না, হুময় ছাড়বে কেন? বাও তো সঙ্গে তারি।  
(মদেচাঁদের বক্ষে ছুরিকাঘাত এবং নন্দেচাঁদের মহারার  
বক্ষে পতন)

## মন্তকাবরণ

### শ্রীবিবেশ্বর ভট্টাচার্য

মন্তকাবরণ দুই শ্রেণীর—এক শ্রেণী শোভার জন্ত,  
অপর শ্রেণী মন্তকটাকে শাতাতপ হইতে রক্ষার জন্ত।  
শ্রীকৃষ্ণের মোহন চূড়া, রাজার মুকুট ও বিবাহের টোপের  
প্রথম শ্রেণীর; বাঁশ ও খড় দ্বারা নির্মিত কৃষকের  
“মাথাইন” দ্বিতীয় শ্রেণীর।

এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত যে কত বিভিন্ন প্রকারের  
মন্তকাবরণ পৃথিবীতে প্রচলিত আছে তাহা ভাবিলে  
বিস্মিত হইতে হয়। রুচির বিভিন্নতা ও প্রয়োজনের  
বিভিন্নতা মানুষের মন্তকাবরণে এত বিভিন্নতার সৃষ্টি  
করিয়াছে যে মাথারও বোধ হয় সৃজন তত বিভিন্ন নহে।  
মন্তকাবরণ দেখিয়া প্রাচীর জনসমূহের মধ্যে ইচ্ছা হইতে লোকটী  
কোথাকার আধিপত্য তাহা নির্ণয় করা চলে। বাঙ্গালী  
বাবুর বোণার অর্ধ বেল একটু মুদ্রিল ঘটে, কারণ বাঙ্গালী  
সাধারণতঃ—“নেসা শির”, আর স্থবিধা বা খেলালের বশে

অথ যে কোন জাতির পাগড়ী বা টুপী ব্যবহার করিতে  
সিদ্ধহস্ত। উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী চিরকাল এমন ছিল না,  
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পাগড়ী ব্যবহারের অনেক প্রমাণ  
আছে। কিন্তু এখন যে কারণেই হউক বাঙ্গালীর জাতীয়  
মন্তকাবরণের অভাব সকলেরই দৃষ্টিতে পড়ে।

মন্তকাবরণ আধিকার করিতে সম্ভবতঃ আদিম মানবের  
অধিক দিন লাগে নাই। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে যে মাথাটা  
বাঁচান আবশ্যক সে জান খুব শীঘ্র হওয়াই স্বাভাবিক।  
প্রথমতঃ লতা-পাতা, গাছের বকল কি ঐ রকম কিছু দ্বারা  
মাথাটা ঢাকা হইত এইরূপই মনে হয়। ক্রমশঃ কাপড়,  
চামড়া, শোলা ইত্যাদি কাজে লাগান হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে  
পাখীর পালক ও নানা রকমের বাহারের উপাদান ও  
ব্যবহারে আসিয়াছে। “আর জিনিসটা বাহাতে মাথার উপর  
সজ্জাভাবে শাণিয়া থাকে, বাতাসের সঙ্গে উড়িয়া না যায়

তাহারও নানা রকমের ফিকির আবিস্কৃত হইয়াছে।  
তবে কোন উপাশাসনই এ পর্যন্ত সেই আদিম-যুগের লতা-  
পালকে সম্পূর্ণ হুমচুতা করিতে পারে নাই। মুকুটের  
প্রচলনের আরম্ভ হইতেই বোধ হয় রাজ্য-রাণীদের মুকুটে  
বাহার চলিয়াছে। প্রাচীন মিশরের বিখ্যাত রাজা  
তুতান খামেন ও তাঁহার রাণীর ছবিতে যে বিভিন্ন  
কাকাকার্য্যবচিৎ লতা মুকুটের সমাবেশ দেখা গিয়াছে তাহা  
অবশ্য এ যুগের জিনিস নয়, আর মুকুটও হঠাৎ ধরাবাসে  
দেখা দেয় নাই।

ইউরোপের লোক সকলেই টুপীওয়াল হইলেও টুপীতে  
টুপীতে অনেক পার্থক্য। ইউরোপ জড়ান কাপড়ের ভর্ত্তি  
নয়, পাগড়ী সেখানে অপরিচিত। ইউরোপের টুপী  
সাধারণতঃ ‘হ্যাট’ ও ‘ক্যাপ’ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।  
‘ক্যাপ’ অপেক্ষা ‘হ্যাট’-জাতীর টুপী যে অধিক  
কার্য্যকর—অন্ততঃ দিনের বোণার তাহা অস্বীকার করিবার  
যো নাই। তাই আজ দেশবিদেশে—প্রাচী ও প্রতীচীতে  
—হ্যাটের এত প্রচলন; কেবল পুরুষদিগের মধ্যে নয়  
স্ত্রীলোকের মধ্যেও। সেকালে কিছু হানে হানে ‘ক্যাপ’—  
এর একটা বিশেষ প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ছিল। রোমে  
ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়ার সময় তাহার মাথার বাহীনতার  
ক্ষণাকার ‘ক্যাপ’ পরাইয়া দেওয়া হইত। রোমান  
ক্যাথলিক ধর্ম্মধারকদিগের গুড় ইটালীর পোপ-রাজারাজড়-  
দিগকে সম্মানের চিহ্নরূপ ‘ক্যাপ’ উপহার দিতেন।

‘হ্যাট’ ও ‘ক্যাপ’ এর ব্যবহার একই জাতির মধ্যে যে  
কত বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত অব্যাসঙ্গীরা পক্ষে তাহার  
হিসাব দেওয়া কঠিন। সকাল বেলা টুপীর ব্যবহার  
হইবে, সন্ধ্যায় কোন টুপী, মণ্ডলিমে কোন টুপী পরিয়া  
বাইতে হইবে, ভোজনের নিমন্ত্রণে কোন টুপী ইত্যাদি  
সম্বন্ধে ইউরোপের সম্রাট সম্রাজ্ঞী এবং বাহাবাদি নিয়ম আছে  
যে বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা ভালরূপ জানিতে হইলে  
বীতমিত্ত গুরুমহাশয়ের প্রয়োজন।

প্রত্যেক প্রকার টুপীতেই আবার দেশকাল-পাত্র-ভেদে  
কত বৈচিত্র্য। কোন হ্যাট কেবল মাথার উপর ধরিবার মত  
স্বল্পায়তন বিশিষ্ট, কোথাও বা উঁচু-খোলের উপরি ভাগে  
প্রকাণ্ড লতা, কোথাও বা মাথার চারিদিকে সামান্য বিস্তৃত,

কোথাও বা বিস্তারিত এত বেশী যে হ্যাটের পাশটিকে  
কোঁকড়াইয়া ছোট করিতে হয়। ‘ক্যাপ’ কখন মাথার  
গুলীটা জড়াইয়া থাকে বীজ, আবার কখন উর্দ্ধ দিকে,  
কখন অধোদিকে কখন পার্শ্বদেশে নানা আকার শোভাতে  
বহুর তুলিয়া ধরে। আর পাগড়ী? তিনিই কি কখন বাবার  
পাঞ্জ? গাছের পাতা ও পাহীর পালক হইতে আরম্ভ  
করিয়া কোন জিনিসই বা তিনি কাজে না লাগান? আবার,  
তাঁর ভদ্রিহাই বা কত রকমের?

যে সকল হ্যাটে সৌন্দর্য্য জান ক্রমেজানিত্যতার জ্ঞান  
বেশী তাহার ‘মধ্যে’ উল্লেখ করা হইতে পারে কোরিয়া  
ও মেক্সিকো দেশের হ্যাট। দুটাই পাশে বেশ চওড়া—  
—রৌদ্রগতির সময় বৃষ্টিতে পান্না যার যে হ্যা মাথার কিছু  
আছে; আমাদের দেশের কৃষকদের ব্যবহৃত “মাথাইন”—  
এর সঙ্গে এ গুলির বেশ সাদৃশ্য আছে এবং আমাদের  
“মাথাইন”, এগুলি দেখিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অভিযুক্ত  
হইতে পারে।

টুপীর বাহারে পুরুষের উপর মেয়েরাই বিচিত্রাছে  
—কোন বাহারেই বা নয়? ইংরাজী কবিতায় আছে—  
কোন রমণীর অঙ্গকরণ সোণাকে দ্রব্য করিতে পারে—  
বাস্তবিক সোণামণিহীন। যে একবারেই অবতার  
জিনিস নয়, মাথার টুপীকে পর্যন্ত স্পন্দন করাইবার জিনিস  
তাহা মেয়েরাই ভাল বোঝে। রাজা-রাণীদের গভীর  
বাহিরে যে সকল স্ত্রীলোক চক্চকে মণি-মাণিক্যবচিৎ  
মন্তকাবরণ ব্যবহার করে তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-  
যোগ্য মঙ্গোলিয়ার উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোক। এক দিকে  
গোলা-মহি-মাগিক, অজ দিকে কাপড়ের উপর শিল্প-কার্য্যের  
বাহারে ইহারদের টুপী অশ্রুশ। মাঙ্গোলিয়ার স্ত্রীলোকদের  
সুষ্ঠান মন্তকাবরণ ও ইহারদের কাছে বিশেষ হার মানে না।  
ব্রাহ্মের আদ্যশাস্ত্র প্রদেয়ের রমণীগণের টুপী কাপড়ের  
বাহারে তাহাদের, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও ফুটাইয়া  
তোলে। হর্ল্যাণ্ডের স্বন্দরীদের পাণ্ডওয়াল ও লেন্স দেয়ণ্ড  
টুপী সম্বন্ধে ঐ কথা। “প্যালেস্টাইনের মাথার টুপীর উপর  
যেখানে বিবাহের যৌতুক পাণ্ডওয়াল সাহাইয়া জন্মল  
ভাবে রাস্তার বাহিরে হয়। চিলির মেয়েদের গির্জায়  
বাওয়ার সময় মাথা ও শরীর ঢাকিয়া যে আবরণ ব্যবহার  
করিতে হয় তাহা আজকালকার অর্ধ নয় নারীদিগের



নিকট হস্তাকর মনে হইতে পারে কিন্তু বাস্তবিকই বেশ শোভা। উত্তর আফ্রিকার অনেক মেয়ে শেছন দিকে লম্বা কাটা সূন্যান যে পাগড়ী ব্যবহার করে তাহা দরবারী ব্যবহারের হিমাংস উল্লেখ করিতে পারে।

আমাদের প্রতিবেশী কান্টোয়া যে মাথার পরিমিতির মত ক্রমশঃ সফটুপী ব্যবহার করে ও চারিদিক কাপড় দিবা জড়ায় সেও টুপী-জগতে একটা দর্শনীর জিনিস। মণিপুরের মাক্দিদের গালপাটী বান্ধা পালক-গাণান পাগড়ী আর একটি।

কতগুলি অসভ্য জাতির টুপী অদ্ভুত রকমের। যুদ্ধের সময়, নৃত্যের সময়, বৎসরের সময়, কার্য-বিশেষের সময় ইহারা লতাপাতা, কাপড়, পালক, শামুক, কড়ি ইত্যাদি জড়াইয়া এত রকমের টুপী ব্যবহার করে বাহার কথা সত্য নাহয় দেখা যায়ই অনেক সময় ঢোকে না। চীন-দেশে মত নামক এক আদিম জাতি আছে তাহাদের বয়েসের মাথার গণ্ডা চুলের সূত্র রংকরা পশম জড়াইয়া এমন এক অপূর্ণ টুপী তৈয়ারি করে বাহা আর গুলিয়া রাখার যোগাধে না—সিদ্ধবাদ নাবিকের বোকার মত সর্দাদি মাথা আঁকড়াইয়া থাকে। অনেক অসভ্য জাতি লতাপাতা দিয়া এমন করিয়া মাথা ও গা ঢাকিয়া বীভৎস বেশ ধারণ করে যে দেশিগে দূর হইতে সেলাম করিয়া পৃষ্ঠচর দিতে হয়।

জল-বায়ুভেদে ও ব্যবসায়ভেদে টুপীর কি বৈচিত্র্য! লাপ্পান্ডোর উত্তর গ্যাটাবান্কা টুপী ও এন্টিমোর চামড়ার টুপী দেশের অবস্থারই উপযোগী; যোদ্ধাদের লৌহনির্মিত শিরাস্রা চির-প্রসিদ্ধ। কত প্রাচীন কাল হইতেই উহা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রীক ও ইহুদীদের হেল্মেটট সেকালে যুদ্ধের সময় উহাদের কস্তই উপকারে দ্রুপিত। আমাদের দেশেই কি দেশোপ-বোদী শিরাস্রাণের অভাব ছিল? ধর্মযাজকদিগের টুপীর মতোই কি বৈচিত্র্য কম? বৌদ্ধ লামাদের তো কথাই নাই। ব্রূটান পাহাড়ীদের মস্তকরণেরই বা পদমধ্যান্ধারের কত রকমের বিভিন্নতা ও কারুকর্ম!

বিচারক দিগের 'উইগ' ও ব্যবসায় ভেদে মস্তকারণের বৈচিত্র্য। চতুর্দশ শতাব্দীর সুখ্যাতি পূর্ণটক

ইবন-বতুতা লিখিয়া গিয়াছেন যে আফ্রিকান্ত্রিয়ার কাজীরা মাথায় যে প্রকাণ্ড পাগড়ী পরিতেন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য জগতে এত বড় পাগড়ী তিনি আর কোথাও দেখেন নাই। পাশ্চাত্য বীরণ ও 'নাস' মিগের টুপী প্রাচীন কাল হইতেই কিছু বিভিন্ন রকমের। নাবিকদের টুপী, পুগিশের টুপী সম্বন্ধে এ কথা। বিশ্ববিজ্ঞানগণের 'গ্র্যাডুয়েট' বা যে মেটের মত জিনিস মাথায় পরিয়া উপাধি হইতে যান সেও তা জীববিশেষের জন্ত আবিষ্কৃত মস্তকারণ নৈসর্গিক।

এক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ও জাতির দিকে তাকাইলেই মস্তকারণের কত বৈচিত্র্য দৃষ্টিতে পড়ে। যক্ষ-মানের ক্ষেত্র, তাজ, সাদাকাপড়ের গোল টুপী, জিরির টুপী ইত্যাদি, বেহার ও যুক্তপ্রদেশের নানারকমের গোল টুপী, পাঞ্জাবী ও মাদ্রাজীর পাগড়ী, মারহাট্টা ও সিন্ধীর মস্তকারণ, পার্শীর গণ্ডা টুপী ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমের যে কি আছে তাহার টিকানা নাই। এগুলির উদ্দেশ্য কতক অঙ্গসৌভব, কতক শ্রী-প্রভাভ হইতে মস্তকটাকে রক্ষা করা। সুতরাং ইহারা প্রথমেই দুই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। রাসাদের—তথা রাগিদের—মুকুটই বা কত প্রকার। হোয়, মল্লি, ব্রহ্মার বহুর তো তাহাতে থাকিবেই। দরবারের সময় রাজা মাথায় বাধা পরেন যুদ্ধের সময় তাহা না পাতাইয়া চলে না। কামল জিনিসের পরিবর্তে তখন শূক জিনিস আবশ্যক। কিন্তু বাহারটা একেবারে যায় না। যুক্ত প্রদেশে এখন এক রকম উড়িয়া গিয়াছে, তবে ভড়ুটী আছে।

বিবাহের সময় বরকনেকে আমাদের দেশে কতকটা রাজ্য-রাণী সাজিতে হয়; কাজেই তখন তাহাদের মাথার গাণে মুকুট—বিমুক্তার অভাবে সোনার মুকুট। মুকুটে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় কি হায্যের উল্লেখ করে তাহা বিশেষজ্ঞেরা বলিতে পারেন।

এবার একটা কাজের কথা বলিব। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অবিবাহিত জাতিতেই মস্তকারণ দেখিয়া ধরিতে পারা যায়, ধর্ম মায় না বাসালীকে। ইংরাজের হ্যাট, ইহুদীদের বা পাঞ্জাবীর পাগড়ী, মুসলমানের তাজ, পার্শীর লগাটুপী, আকালদারী গ্যাটুপী—সবই সময় বা অবস্থা বিশেষে বাসালীর মাথার বিরাজ করে। বাসালীর এই

সার্বজনীনতা যথেষ্ট ক্রি কোভের বিষয় তাহা বলা কঠিন। তবে বাসালীর বেশীর মস্তকারণ গুলি কিছুকাল পূর্বেও এক ছাচে ঢালা ছিল এ অভিযোগ তাহার প্রতি কেহ জানিতে পারিবে না, ইহা ঠিক। কতক গুলি ছবি দেখিলেই বোঝা যাইবে বক্রিমবাসু ও দীনবন্ধু মিত্র একসময়ের মস্তকারণ ব্যবহার করিতেন না। ধারকানাথ ঠাকুরেরও তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথের (অন্ততঃ মর্হাট্ট ইহার পূর্বে) মস্তকারণ ভিন্নরকমের দেখিতে পাওয়া যায়। আর বিখ্যাত বীরদ্বন্দ্বীনাথের মস্তকারণ অল্প রকমের। এটা ঠিক যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসী বাসালীরও একটা মস্তকারণ আবশ্যক। যখন গা গুলিয়া ক্ষীত উন্নর হইতে কৌচাটী নামাইয়া বাসালী তাস কি পাগা-খোয়ার প্রবৃত্তি বন তখন মস্তকারণের প্রয়োজন না হইতে পারে, লাট সাহেবের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময়ও ক্রমশঃ নাবিকের দরবারী মস্তকারণ চলিতে পারে কিন্তু যখন তাহাকে যথেষ্ট বাহিরে কোন শ্রমসাধ্য কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়—বিশেষতঃ সৌজের মধ্যে—তখন একটা মস্তকারণ যে আবশ্যক তাহা চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। এই আবার কাপড়ের অবস্থা হইতে পারে, তবে সোনার হইলেই বেশী কার্যকর হয়। ইংরাজ নিজের দেশে সোনার টুপীর স্তম্ভ নয়, ফেল্ট কি অল্প কোন উদ্ভৃষ্ট কাপড়ে সাধারণতঃ মস্তকারণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই গম্ব দেশে আশিয়া দেখিতে পায় যে দেশ-শাসন অপেক্ষা মণাটা বাচান কথ স্বতন্ত্র ব্যাপার নয়। তাই সৌন্দর্যের স্বজ্ঞ না হউক মানে পড়িয়া সোনার টুপী ব্যবহার করে। কেহ কেহ সোনার গির মোটেই কাপড় লাগায় না। কিন্তু সেগোটা থাকে মাই। ইহা দেখিতে হ্রস্ব হয় না বটে কিন্তু কাজে ক্ষমত্ব হয়। কোন কোন বাসালী বাবুকে আকালপ বাইসাইকাল চড়িয়া বুঝিবার সময় বুড়ীর উপর সোনার টুপা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। বুড়ীর কৌচা বাইসাইকেলের সূত্রে বেশ বাপ ঝায় না, একটু উপভ্রমের স্বষ্ট করে। কিন্তু বিশেষী গোপাকের উপর প্রকাশ্যেই বুদ্ধি [বুঠী সামান্যই লম্বা মাথার সোনার টুপী পরিয়া বাহির হইলে সে গোষাট দেখিতে কিছু অদ্ভুত রকমের হইলেও কাজে বিশেষ ব্যাপার হয় না।

সোলা এদেশেই ক্রমে, সোনার টুপীও এদেশেই প্রস্তুত হয়। দামী কাপড় না লাগাইলে উহাতে বরচও বেশী পড়ে না। সাদাসিধে রকমের সোনার টুপীর ও দেশে প্রচলন হইলে মণজটা অনেক বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। ছাতার বরচও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়। আর আমাদের চাচায়া যে 'মাথাইল' ব্যবহার করে তাহার পরিবর্তে একটা হালকা রকমের মস্তকারণ পাইয়া হাক ছাড়িতে পারেন। বাহারা 'মাথাইল' এর সঙ্গে ও অপরচিত, জমিতে কাজ করিবার সময় শুধু একথানা কাপড় মাথায় জড়ায়, তাহাদের তো কথাই নাই।

একজন পদস্থ বৃটিশ কর্মচারী এদেশে সৌজের মধ্যে সোনার টুপীর ব্যবহার-সম্বন্ধে লেখকের 'সাক্ষাতে বিজ্ঞপের স্বরে মস্তব্য প্রশংসা করিয়াছিলেন যে, ইহা না হইলে একোপেরই চলে না, এদেশের লোকের সোনার টুপী এগলেনের জন্ত বৃটিশ জাতির নিকট স্তম্ভত থাকে উচিত। আমরা যে অল্পতজ্ঞ জাতি নই, আমাদের অনেক আচার-ব্যবহারই তাহার প্রমাণ। তবে এই দরকারী বিষয়টোতেই বা পশ্চাত্যগণ ইবন কেন? চীন ও জাপানের লোক ক্রমশঃ আধামস্তক বিলাতী পোষাকে আবৃত হইয়া আসিতেছে দেখা দিচ্ছে, পোষাকটা—অন্ততঃ বাহিরের কাজের পক্ষে—সুবিধাজনক বলিয়া। কোথায় আজ সেই চীনার পিছন-দিকের সর্পাক্রান্ত লম্বা চুল? নাকটা আর একটু অল্প রকমের হইলে চীনাতে আর চীনা বলিয়া। চেনাই বাইত না (দাঁড়ি, গৌণ—সে তো এখন অনেকেই রাখে না)। চীনের সেকালকার ক্রমকদের টুপীও আমাদের ক্রমকদিগের মস্তকারণ অপেক্ষা কাজে সুবিধাজনক ছিল। বিসিপর্যাইনের লোক ও গতা পাতার বদলে সভ্যবর্ষের টুপীর পরিবর্তে আরম্ভ করিয়াছে—ক্রীষেণে পূর্ণগুণ। আনামের ও নোপাঁওর বীরের টুপীও আমাদের 'মাথাইল' অপেক্ষা সভ্য রকমের। তিস্ততে অনেক পদস্থ লোক হাটব্যবহার করে; ভূমিাদেবের মাগার পূর্ণগুণ উহা বোঝা যায়। অধুকারের অদ্যদ্য এইরূপ যে আমরা আধামস্তকারণ বাসালীর জন্ত একটা কার্যোপযোগী মস্তকারণ টাঙ্ক করা হইতে পারে ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ না হয় বাহাই-দিশান; সে সমাজ নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিতে সমর্থ।



বাঙ্গালী পুরুষের জন্ম তো বাহা হষ্টকি একটা ব্যবস্থা মনে  
আসিল। এখন, গৃহলক্ষীদের বেলা কি হইবে? যতদিন  
তাহারা অস্বপুস্কারিণী ও অবগুণ্ণবতী ছিলেন ততদিন  
ইহা নহীরা মাথা ধাবহীবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এখন  
তাহারা অবগুণ্ণ পুণিয়া দিয়া সর্বজ বাহির হইতেছেন;

সুতরাং বেলা জারগার শীতগ্রাম হইতে মাথাটাকে রক্ষা  
করা তাহাদেরও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সমস্তটা জটিল  
কিন্তু আমার মনে হয় ইহার জন্ম ব্যক্ততা-প্রদর্শন লেখকের  
পক্ষে দৃষ্টতা মাত্র; তাহার নিগেরাই চিত্রা করিয়া একটা  
উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

## বাবাজী

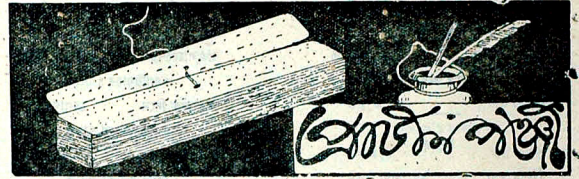
শ্রীশৌর্যনাথ ভট্টাচার্য্য

চিত্ত চিনানকে বোলে কবে কোণা ভিকা করি',  
আহুতাগে চলে কে এ কুকনামে বক্ষ ভরি'।  
রাক্ষসখেরি বাজী-ভিত্তে বন্ধ নাহি নেত্র তার,  
ভক্ত-প্রেম-সিক্ত আঁখি রিক্ত চলে নিসিকার।  
বাংলা দেশের এ বাবাজী মাত্র ছ'টি ভিকা চার,  
চালছে হিমরম-সুখা বলছে মুখে জয় নিতাই।

করছে সে যে নিত্য কেরি কুম-পরমায়-সুখ,  
নিত্য তারি শিত্ত লভি' তৃপ্ত হ'ল চিত্ত-কুখ।  
অর্থে সে অনর্থ ভাবি' সার করেছে ছিম-কোলা,  
একটু মুষ্টি ভিকা লভি' আনন্দে সে আনন্দোলা।  
নাম বিলাসো ভিন্ন যে তার আর যে কোন বাহা নাই,  
বিষ-চিত্তে কৃষ্ণ সিত্তে বলছে নেচে-জয় নিতাই

ব্রহ্মাবন-বাস্তী গিতে বিধে শুধু বার্থ তার,  
কালা সেজে বাঙাল্যেতের গুরে সে যে স্বর্গদার।  
বদ্রাজেরি ধুমকানিতে চমকে না সে ভক্তবীর,  
রাগার বাণী টপ্তে পারে, টপ্তে না সে শক্ত-বীর।  
ধর্ম-বীধন সমাজ-শাসন-দস্ত-ভাতি' হণ্ডে চার,  
কুম তারি বকে বীধা বলছে জয় জয় নিতাই।

বিষ তাহার খোঁজ রাখেনা নাই তা'তে তার কষ্ট মনে,  
উপেক্ষারে বকে করি' বিলার সে যে কুম্ভধনে।  
নিত্য দিনের বন্ধ সে যে কর্ণ-পরমার্থ চালে,  
হস্তে গোপীঘর বাজে ভূতা নাচে নৃত্য তালে।  
গৃহহেরি শান্তি মাগে বাণ' রাখাকাজ-পায়,  
বলছে নেচে গৌরহরি বলছে নেচে জয় নিতাই।



পুণিনা-মিলন

বর্গীয় ব্যোমকেশ মৃত্যু

প্রকাশকের কৈফিয়ৎ  
সাহিত্যের আসর বসে ছিল বনে  
সেটা তেরশ তের শাল,  
আজকে হ'ল তেরশ উনিশ  
যায়ে ছটা বছর খাল!  
এদনি করিতকর্মা আমরা সবাই  
খোলা কিছুতে হ'ল না।  
সে আসর জুড়িয়ে বহদিন গেছে  
খরণ কিছুই ছিল না।  
কবি ধুর্জটী শর্মা তখন তখন  
কলমের ছটো খোঁজায়।  
নিয়েছিলেন তুলে ত্রিক্ ঠাক্ 'স্বৈত'  
এতদিন ছিল চাপার।  
চৈতালি ঝাড়পোছ করিতে সেদিন  
ভেক্স থাক্সর ভিতরে,  
কাগজ এক তড়া ফিতে দিয়ে বীধা  
হঠাৎ পড়ে গেল নজরে।  
গুলে দেখু হু তবে সেইগুণো সেই  
ধুর্জটী শর্মা নক্সা।  
ভাবলম এবারে সাহিত্যের খেলায়  
আমারি কিতটে ওঠস।  
আসর হ'তে শু দেখি জনা কত  
গেছেন চলে পরলোকে।

আরও দেবী হ'ল যদি আর কেউ  
পাছে আবার গিকে কোঁকে!  
তাই বুঝা বিলম্ব নাহি করে আর  
ভাবহু ছেপে ফেলা যাক।  
পুণায় সে দিনের পুরাতন কথা  
সবই আছে ঠিক ঠাক।  
যেই কথা সে কাছ সাহিল না ব্যাজ  
দিলাম ছেপে দেখেছেন।  
সাহিত্যের আসরে রগড়-চাও বার  
দ্বিগত নিয়ে বাও কিনে।  
মঙ্গলাচরণ  
বাঙলা সাহিত্যের আসন পেতে  
বীরা পগার পার।  
এই আসর বন্দনার আগে  
তাদের মনস্তার।  
মুন্নি ভাঁসের অপর পাতে  
দিলেম আজ সাহিত্যে,  
সবাই সবার জানান্তনা  
দিতে হবে না চিনিয়ে।  
গুদের পায়ে গড়টা করে  
আমরে নাম ভাই,  
বীরা বীরা আজ হাজির বেলা  
তাদের মঙ্গল চাই।



দর্শ আয়ু আনু বশ নিরে সায়দা যদি লেখের নিজে  
হবে থাকুন সবে। তবুও শেষ নয়,  
সাহিত্যের আসর- মঙ্গল গীত বাঙলাদেশের সাহিত্যিকদের  
গেয়ে যাও তবে ॥ গুণগরিমাচর ॥  
—  
উৎসর্গ খেলাগ হুরে  
যাঁদের কথা লেখা আছে ধরিয়ে দিও না মাথা,  
এই কয়টা পাত্রে, আদরের ধন  
তুলে সিঁছি গো আদর করে বিশ্বাস করগো কথা ॥  
আজ তাঁদের হাতে।  
হ'ল গো বস। যাদের কথা  
হয় তো সবে জঁরা, মুখবন্ধ ও নায়কবর্ন  
আনেন নাইকো। সভার মাঝে সাহিত্যিকদের পূর্ণিমা-মিলন  
কেল লিখেই সারা। সেটা ছধর যেতে না যেতে  
কিছুই ক্ষতি নাইক তাতে একটা বছর সেটা ভুবে গেল ॥  
সবাই সাহিত্যিক, নগেন বোস  
কেনি-না-কোন কালের তরে বরাহ অবতার।  
আসা হয় নি ঠিক। ভাগ্যটা ভাল হেমন্ত হে  
খেপে শুনে হয় এতে যদি কেউ তোমার পূর্ণিমা ॥  
হ'তে না পারে ভূট, উদ্ধার করা কাজটা কিছু  
বলতে পারি শুধু এইটুকু তার নূতন নয়।  
হবে না কেউ কষ্ট। তার নূতন নয়।  
তবে যদি কেউ একান্ত ইথে পাতা ভরাতে  
খুঁজে খুঁজে ধর ছল, দেয় নৈমিত্তিক  
আমার পক্ষে বিড়ম্বনা বটে পুণ্ড্রীক কয়ে  
সেইটাই আসল।  
নামটি ধরে যাদের কথা  
কিছু হ'ল না বলা, শুনতে ভাল  
ভীরা হয় তো পাবেন ইথে জোটা-জোটাট বেশ ॥  
বোশামোদের গলা। পূর্ণিমা-মিলনে মিশিয়ে দিলে  
কল্পতরুর জালের কলস নবগৃহ প্রবেশ ॥  
সুসজ্জার গুল বুলি, বড় সেদানা বোস কাগর  
বিপুল ধরার পিঠ টে ভ'রে আগলে ধাঁকি দিল।  
রাতদিন ধরে থালি, পাওনা হ'ল চটো খাওয়া  
রাতিদিন ধরে থালি, একটায় সারিল ॥

নূতন হ'ল 'এ নূতন তর  
এবার আয়োজন,  
আজ নভাতে আছেন ব'রা  
তাদের নিবেদন।  
হেথায় আল প্রবীণ-নবীন  
সাহিত্যিক গবে,  
পরস্পরে মিলে মিলে  
আলাপ করতে হ'বে।  
এমন সভায় ছোট-বড়  
আলাপ করা চাই,  
না হ'লে ভাই এ মিলনটার  
উদ্দেশ্য কিছু নাই।  
সুবে হেথায় সবাই মিলে  
করুন আলাপন,  
গল্পের ছলে সাহিত্য-কথা  
হোক না আলোচন।  
এমন মিলন আমোদে শুধু  
কেবল পণ্ড হর,  
গান বাজনার ব্যঙ্গগো ভেসে  
এমন হচ্ছে নয়।  
অনেক আশায় আজকে আবার  
করছি অভ্যর্থনা,  
মিনতি এই কেউ যেন ভাই  
খোশামোদ ভেব না।  
আমরা গবে পরস্পরে  
যেমন যারে জানি,  
তেমনি করে করব আদর  
না শুনি নিম্নাবাগী।  
—  
অথ আসর বন্দনার আরম্ভ  
দেবদেবী বন্দনা  
গণেশ বন্দনা।  
ধ্যাক ইউ গণেশ দাদা  
তোমায় নমস্কার।

বিয় দূর করলে ভাল  
মিলন-পূর্ণিমা  
বিয় দূর আরও কর  
আজকের আদর  
নায়কের দাও গো বর  
কহে কবি সাদরে।  
তব তরে অগ পুঞ্জার  
শালের ব্যবস্থা  
ভাল করে করে দাওগে  
জলযোগের ব্যবস্থা।  
—  
সর্বদেবদেবী বন্দনা।  
তোমার নমি বীণাপাণি  
তোমার জন্তে সব।  
নমি তোমায় মা ভগবতী  
সর্বকাণ্ডেয় মাধব ॥  
নমি তোমায় পকানন্দ  
বাড়ি চেপোনা আর,  
ভৈরব মূর্তি ছেড়ে দিয়ে  
শিবস্ত কর সার।  
—  
অথ মিলনের মূল্যহর  
ভোজ্যবন্দনা  
নমি তোমায় লুচি মোঙা  
জাগ্রত দেবতা বট,  
তোমার জন্তে চেকছে মিলন  
তুমি মঙ্গল ঘট।  
তোমায় দেবতা জগৎপালক  
সবগুণা নারায়ণ  
সুধার পীড়নে অনান্ অর্দ্রতি  
ভোজনচ বন্দনা  
প্রসন্ন খেক দহাও রেব  
তোমার ভক্তের প্রতি,



হেমা করিতে যদিও তোমার  
কবির নাই শক্তি ।  
তবুও তোমার "আরতি আগে  
সাহিত্যের আসরে,  
কারণ যদি পেটটা জলে  
কবিতা কোথা কাতরে ?  
তাইতে নমি সবার আগে  
ভোজ্যদেবের পার ।  
সর্বগ্রন্থে বিনশ্রুতি  
বাচার কুপার ॥

— — —  
অথ আশ্রয়

আসর শোভা মনোলোভা  
তার আর বর্ষি কি ?  
চাঁদোয়া আলুর নিশান মালা  
সর্বত্র সমান দেখি ।  
চৌদিকে তাকিয়া ঢালা বিছানা  
রূপার পানদান  
আতর-গোলাপ শীকা গড়গড়া  
"অমুরি খাবিা গান ।  
বৈঠকে...হকা চুফট সিগারেট  
যে যায় রাখে মান  
আশটে আছে দেশালাই সাথে  
পুরী হাল ফ্যানান ।  
এদর আর বেশী বলব কি  
যেমন সর্বত্র রর  
প্রাণের যতন কোথায় কেমন  
সেইটে বুঝতে হয় ।

অথ সূতা-বর্ণনা

( ১ )

আত্মন আত্মন সবার আগে  
মহারাজ ঠাকুর ।

ব্যাকিয়ে বসলে সত্যুর মাঝে  
সভা ভরপুর ।  
তোমার মত আজকের দিনে  
প্রাচীন সাহিত্যিক,  
আছে কি কেউ বাংলা দেশে  
জানিনে তা টিক । \*  
সেকাল-একাল ভরের মাঝে  
তুমিই ব্যবধান,  
বাঙলা ভাষার পঠন-মার্জ্জন  
দেখলে বিস্ময়ান ।  
তোমার সামনে বিজ্ঞানাগর  
রামমোহনের ভাষা,  
চেঁছে-ছুলে মেজে ঘোষে  
দাঁড় করলে খাঙ্গা ।  
তোমার সামনে টেকচাঁদ খুঁড়ে  
এনে দিলে নভেলে,  
তোমারি হাতে দিলে মাইকেল  
তিলোত্তমা ফেলে ।  
তোমার সামনে নাটকে নারায়ণ  
নাটকে দিল টান,  
তুমিই নিজে কলম ধরে  
দিলে "চক্ৰবান" ॥  
"উভয় সঙ্গট" "বিজ্ঞানন্দর"  
তোমার কাণ্ডি ভাল,  
তোমার রূপার বাংলা ভাষার  
কার্য প্রথম হল ।  
তোমার সামনে আঁকা হল  
হুতমের নকশা,  
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা কণাপ  
মজার দিক ফরসা ।  
তোমার সামনে রবীন্দ্র নাথ  
কবীন্দ্র হয়ে বসে,

\* আজ আর কেই নাই । গত...পৌষ তারিখে  
মহারাজ-বাহাজর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বর্গগত হইরাছেন ।

বাঙলা দেশটা ডুবিয়ে দিলে  
সিরিকের রনে ।  
তোমার সামনে বক্তিমচন্দ্র  
বিস্তরক বসিয়ে,  
নুতন কল ফসিয়ে দিল  
ইংরাজী ভাব মিশিয়ে ।



যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর  
দেশের দোষ দুঃ কতা যায়  
সাহিত্যের মধ্য দিয়ে,  
দেখিয়ে দিলে নীলবন্ধ  
নীলবর্ণপর্ণ আনিয়ে ।  
নিজে তোমার সরসভার  
বিশেষ রূপাবলে,  
ইংরাজী বাংলা সংস্কৃততে  
সমান কলম চলে ।  
জ্ঞানগভীর বিজ্ঞান বীর  
তোমার সম কেব,

মিষ্ট বচনে তুষ্ট আলাপনে  
তোমার খোঁজে বেবা ।  
"সঙ্গীত-নায়ক" কনিষ্ঠ তোমার  
"তুমিও পটী তায়,  
কতই সাহিত্য হয়েছে রচিত  
তোমাদের রূপার ।  
বাঙলা ভাষার বচকৃতজ্ঞতা  
ঠাকুরগোষ্ঠী কাছে,  
সকল দিকের সাহিত্যসেবক  
ঠাকুর বন্দেই আছে ।  
প্রার্থনা করি, আরও কিছুদিন  
রাখুন তোমা বাঁচিয়ে,  
পূর্ণিমা-মিলনে করিব আনন্দ  
নবীন-প্রবীণে মিশিয়ে ॥

( ২ )

বিজ্ঞানবুদ্ধি জমাট বেঁধে  
গোট সোটটা হয়ে,  
সার গুরুদাস এলেন ধরায়  
খাটো দেহটা লয়ে ।  
কপাল ভাল বাঙলাবাসী  
তাই তোদের দেশে,  
জন্ম নিলেন অমর গুরু  
সার গুরুদাস বেশে ।  
ছোটটোখাটো মামুষটা বটে  
হুহুস্বন্দর, পরিসি কিছু  
বিজ্ঞানবুদ্ধির কেমনে পাবে গুর ।  
শান্ত দান্ত কামাবস্ত  
শোক বাছের বাছ ;  
স্বাদে-গন্ধে মধুর যেমন  
গুজরাটী এলাচ ।  
রাজার হারে খাতির ছিল  
ধর্মাবিকার ভায়,  
ধর্মের মত ভায় বিচারে  
উপাধি হল "সার" ।



সারা জীবন শিক্ষাটা নিয়ে  
করলে নাড়াচাড়া,  
বুঝলে শেষে এমনি শিক্ষার  
মাতুর হয় না খাড়া।  
দেশের মাঝে শিক্ষার নারে  
তাই ধরেছ হাল,  
উত্তরে যাবে খোদার রূপায়  
স্বযোগ দেশকাল।



গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচনাতা বড়ই তীক্ষ্ণ  
একটুও হেলে না,  
বাঙলা লেখনি পরিবদে তাই  
সত্যপতি হলে না।  
আচার নিষ্ঠার আদর্শ তুমি  
“বদার সাক্ষী” তার,

স্বর্গগ্রাণে দেবতে গিরে  
কদিন নিরাহার।  
অকৃতকর্ম্য তোমার মত  
শাস্ত্রবিধি পালনে,  
আজকের কালে বাঙলা মাঝে  
পড়ে না ত নয়নে।  
সত্যাপতি হয়ে বিতর্ক মেটাতে  
তোমার গিমিপান,  
ভাজে না লাঠি মারা যায় সাপ  
এমনি মুনশায়না।  
প্রার্থনা এই তোমার মত  
আদর্শ লোকটাকে,  
অকৃতি ভেবে দক্ষিণের প্রভু  
ফেলিয়ে যেন রাখে।

( ৩ )

তুমিও এস দাদার পাশে  
সঙ্গীত-সঙ্গ-শ্রী,  
পূর্ণিমা মিলন উজ্জ্বল কর  
সভার মাঝে বসি।  
ছোট্টটা খাট্টো ঠাকুরটা বট  
লোকটা কিন্তু সেরা,  
তুমিও একটা গুজরাটী এলাচ  
গন্ধে ভরনভরা।  
সঙ্গীত-বিজ্ঞান বাতির তা  
জগৎ জুড়ে আজ,  
উপায় দেছে সকল দেশের  
গুণজসমাধ।  
রাজ্যরাজ্যের তকমা জাঁটা  
তোমার পরিচয়,  
টাইটেল যজ্ঞ করলে থতম  
যশে অগঞ্জর।  
যজ্ঞ-তন্ত্র সঙ্গীত ময়  
শাস্ত্র আদি যজ্ঞ,

কিছু ছিল না বাঙলা দেশে  
উদ্ধার করলে কত।  
গান বাজনা শেখার তরে  
সঙ্গীত বিজ্ঞান,  
স্থাপন করলে আপন ব্যয়ে  
ধন্যবাহ তোমায়।  
দেশের না কি দুর্দশা বড়  
তাইতে কিছুদিন,  
চলতে চলতে ইকুলটার  
নাড়াটা হ'ল কীণ।  
তোমার রস শুকিয়ে রেতে  
সোটা গেল মরে,  
সঙ্গীত শেখা চলেছে এখন  
যাত্রা-বিদ্রোহ করে।  
বাহির করলে কৌশল তাল  
রলিপি রচনা,  
গুরুদাস রূপায় সহজ হ'ল  
স্বর-স্বর-সাননা।  
'ভায়োলিন' ভেঙে 'বাহলীন' করে  
বেহাগার দিলে নাম,  
কাহুন হল কচ্ছপী বীণা  
বাহবা তোমার কাম।  
হারমোনিয়মটা যত কিছু নয়  
হিন্দু-সঙ্গীত বাজাতে,  
হাতে কলমে দেখিয়ে-দিলে  
ধামতি আছে তাতে।  
নমি তোমায় ঠাকুর মশায়  
বেরে থাক গো তুমি,  
অনাথ হবে না গাওনা বাজনা  
ধন্য বঙ্গভূমি।

( ৪ )

আত্মন আত্মন এগিয়ে বহন  
পঙ্কিত শিরোমণি,

প্রাচীন তবে অতুল্যদশ  
বহু বিজ্ঞান ধনি।  
খাতির বড় রাজার ঘারে  
ভারই টোলের গুরু,  
মিষ্ট বচন সদাই মুখে  
আওরাহটুকু সধ।  
'বাক্যিকির জর' লিখলে ভাল  
জয় জয় তোমার,  
মহামহোপাধ্যায় শাক্তী হর  
তোমায় নমস্কার।  
বাঙলা ভাবার মীন জবতার  
সবে তোমায় পুজি,  
করলে উদ্ধার বাঙলা পুণি  
সারা দেশটা বুজি।  
অস্তিত্ব কবিতাশাস্ত্রে  
তোমার বেশ আছে,  
রস বুরুতে রস বোঝাতে  
কেবা তোমার কাছে।  
চের শিখেছ চের লিখেছ  
কিন্তু এটা হ'ল কি,  
চোরের পরে রাগটা করে  
তুকে আহার দেখি।  
বাঙলা লেখা বাঙলা দেখা  
ছেড়ে দিবেছ হায়,  
তোমার মতন মহাজনের  
এটা কি শোভা পায়।  
নানান দেশে নানান ভাষা  
কোন যেটোনা আশা,  
যুচবে তায় পিপাসা 'তাই  
বিনে মাতৃভাষা।  
বিজ্ঞান ভারে গম্ভীর সদা  
লোকে বলে গুণমণি,



যে মেশে নি সে বুঝে না  
ভিতরে কত মিথ।

কমলাকান্তের দপ্তরের মাঝে  
চলতো ভাল হাতটা।



হরপ্রসাদ-শাস্ত্রী

তোমার হাতে ধর্মের গারুন  
বুড় উৎসব হ'ল,  
পূর্ণিমা সভায় একপাশে কেন  
আগবাড়িয়ে চল।

( ৫ )

আত্মন আগে বহু চন্দ্রনাথ  
তবু নিচ্ছেন তুলে,  
সাবিত্রী আর শঙ্কুগার  
বিউটা দেছেন গুলে।  
পদ্মপতির কেজা লিপেছিলে বেশ  
সরস ছিল হাতটা,



চন্দ্রনাথ বসু

তবু চিন্তা উঠল পেকে  
“কং পদ্ম”র ভাবনা,  
“হিন্দুত্ব” ছোটো মিথারা হ'য়ে  
চিন্তাটা কৈ গেল না।  
প্রবীণ গভীর লেখক দলে  
খাতির আছে ভাল,  
ছেলের জন্ত এখন আমার  
নাটক ধরতে হ'ল।  
এগিয়ে বস সভার মাঝে  
বোসজা মহাশয়,  
পরিসরের পূর্বসভাপতি  
তোমার জয় জয়।

( ৬ )

সাহিত্যক্ষেত্রে মাতৃগণ্য  
হে মাননীয় মিত্র,  
তোমার কুপায় প্রথম পেলেম  
বিদ্যাপতির চিত্র।  
অনেক প্রবন্ধ লিখেছ সেকালে  
কোড নাইক আর,  
এখন কেবল চোঁটা উঠে পেড়ে  
একগিপি বিস্তার।  
তুমি বর্ণদার  
চলছে ভাল হাংল,  
সমান নজর দ্রুতেই অছে  
বাছ ডিমে তালে।  
বেগ এও বার দুই ছেড়ে দিয়ে  
সালিনীতে গেছ মন,  
বড় বড় ঘর দিলে গো বাঁচিয়ে  
যাদের হ'ত পতন।  
স্বদেশী-ব্যাপারে যারা এসে ঘরে  
সবার ভাল গুঁজে,  
পরামর্শ দিতে হচ্চ ডিরঙ্গর  
চলা ভাল কিন্তু মুখে।

স্বদেশের টান এতই প্রবল  
জুজবার হ'লে,  
যা কেন হ'ক না পানশিয়ালার  
হাওয়া চাই টলে।  
সভায় বস উজ্জল করে  
তোমার আগে চাই,  
পরিসরের ভূমি সভাপতি ব'লে  
সাহিত্যের হ'লে চাকী

( ৭ )

হাত পাকামে নভেল লিখে  
ও ১২গুণো মশায়,  
তিন তিনবার জীবন প্রবাহে  
জোয়ার বহালে হায়।  
কাঁচা বরষের ধরণ-ধারণ  
আবার কিরিয়ে নিলে,  
গীতার ব্যাখ্যা হাঙ্গল ভাল  
সেঁপা পামিয়ে দিলে,  
হাসি মুখে তুমি দুই গুঁয়ার সাপে  
“মা ও মেয়ে” নিয়ে,  
সারা জীবনটা সাহিত্য-সেবায়  
দিলে বেশ কাটিয়ে।  
শেষ দশটার বিদেশিনী গ্রেম  
কলিঙ্গের ঘরে চুরি,  
“মুদ্রারী” গেল জানলে ঘরে  
ওরু-বসনা সুন্দরী।  
একদিন দেশে উঠেছিল কণা  
উঠেনি তখনো রাবি,  
তুমি কি রমেশ নভেলের কেবা  
হবেগো দ্বিতীয় কুবি।  
ক্ষীণ দুটি তবু দামোদর বাবু  
সরুজ দেখা পাই,



পূর্ণিমা-মিলনে বড়ই আগ্রহ  
এসিয়ে বস ভাই।

দণ্ডবত হই পাড়ে ঠাকুর গো  
কেন হ'ল না আসা।

( ৯ )

দেব কি অই দীর্ঘ জীব দেও  
পণ্ডিত জ্ঞান বুদ্ধ,  
সাবিক আচার তন্ত্রির পাজ  
ভাবটি পরিত্যক্ত।  
অনেক তরে দোজ রাপেন  
পণ্ডিতজী পাড়ে,  
“মানবত্ব” সেজ, চেপেছেন এবারে  
হিন্দুধর্মের ঘাড়ে।  
“ব্রাহ্মী”র জলে “সহচরী” নিয়ে  
সেকালে কত বেলা,  
“বজ্রান-দর্পণে” নিত্য মুখ দেবা  
ব্যাকরণ ছিল বেলা।  
ধর্মের সঙ্গে অর্ধের নিন্দা  
সবক যে আছে,  
বুঝতে সে তব পাণ্ডের পণ্ডিত  
বুড়ের হাতি খুলেছে।  
লেনেন ভাল বুঝেন ভাল  
কিছু নাট ভাষায়,  
বেদ-পুরাণ কথা নিয়ে নাড়া চাড়া  
কেউ কি শুনতে চায়।  
বুড়ার উনিশ শতাব্দীর মাঝে  
নবীন মহাভারত,  
নবীন ব্যাসের নবীন ব্যাখ্যা  
আরে ছা! মহাভারত!  
তারই গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে দিয়ে  
নামটা নিলে গো বেশ,  
তুমি সে ভারতের নব নীলকণ্ঠ  
টাকায় মোহিত দেশ।  
নটনট নিয়ে ছেলেটা তোমার  
অধিকারী গিরি পেশা,

মহাপ্রভুর বড়ই ভক্ত  
হ'লিলে যান উড়ে  
শিশিরবাবু গুণগরিমার  
বহুদ সত্য জুড়ে।  
বরষ হয়েছে সাহস রয়েছে  
কলম চলে জোরে,  
অমৃতবাক্যের হাট করে সতি  
দাদার পদ্ম ধরে।  
নিমাই-চরিত পড়ে পড়ে পড়ে  
“অমিয়-চরিত” হ'ল,  
বোয়ের হাতে আঙটান দুধ  
কীর হ'য়ে পাড়াল।  
মহাজনদের পদাবলীতে  
পড়ে গেল দৃষ্টি,  
বলরাম দাস নামটা চালিয়ে  
পদ করেন সৃ।  
গোরাঙ্গের ধর্ম এতটা দিন  
নেড়ানেড়ার হাতে,  
সংজ্ঞ ভাবে হাঙ্কিল সারা  
বট্টী খুঁজাড়াতে।  
শিশিরবাবু তুলেন তারে  
সকীর্জন ধরে,  
শিকিতের মাঝে পসার হ'ল  
গোরাঙ, সত্যার জোরে।  
তলক মালা কাছা খোলা  
না হলো হায়,  
হল লোকে ভেক না নিয়ে  
গোরাঙ, ভজা যায়।  
নবদ্বীপের নদের চাঁদটি  
লুপ্ত গোরাঙ, সেজে

অঃশ্রুতদেব হাতটি ধরে  
বিশেষ গেলেন তেজে।  
মহাপ্রভুর জন্ম উৎসব  
তুমিই চালিয়েছিলে  
আছত তুমি, জন্মতে না জন্মতে  
হালটি ছেড়ে দিলে।  
নিমাই পেয়ে নিমাই সন্ন্যাস  
গোঁসাইরা বড় হ'ল,  
তাড়িয়ে নিমাই রাগতে নিমাই  
তোমার ভেসে গেল।  
নূতন ক'রে সইবে দেশে  
লোভ পাবে ঢের,  
পুণাতন কোঙে নূতন করা  
সে চিড়ের বাইশ ফের।  
ঘোষকা মশাই বহুদ এসে  
আমরা বেঁচে যাই,  
সাহিত্যের হাটে একটা নাগ্নয়  
সবাই দেখুক ভাই।

( ১০ )

কালীর বরণ সহাস বদন  
বিহারী দাদা কই,  
বসছে এসে তাকিয়া ঠেসে  
তামাকু সাঙ্গা অই।  
প্রভাতী হ'তে তোমার চিনি  
ছাপাখানার কুঁড়,  
বঙ্গবাসীর আঁকুড় ঘরে  
পকানদেব দূত।  
বিজ্ঞানগর চিরজীবী  
বিধবার আশীর্বে।  
তাহার কীর্তি প্রকাশ করে  
তুমিই বা কম কিসে।

হ'ত যে ভাল নিজেহে যদি  
পুণিপের চাকুরী,  
ধরে দিলে খুব শকুন্তলা-তব  
কালিদাসের চুরি।  
নারকেলবেড়ের তিক্তবীর  
বেশে বাঁশের কেলা,  
গোরা পটন তাড়িয়ে দিলে  
‘গোলা তো বা ভাল’।  
কোথার লাগে প্রতাপাদিত্য  
কোথার লাগে সোভে,  
জিনিসটা ভাল খুঁজে পেরেছ  
ছেতের পরচে দিতে।  
সবার চেয়ে তোমার গুণ  
এইটে বেনী পাই,  
বাঙ্গালীরা যে মিটিটারী সব  
প্রমাণ করেন তাই।  
সকল কথা পোরার সত্যি  
বিখাস করে নিলে,  
মাঝে থেকে অন্ধকুপটা  
কোথা উড়িয়ে দিলে।  
সাবাস দাদা ইতিহাসেও  
পাকিয়ে নিলে হাত,  
বাদের শিল তাদের নোড়া  
তাদের ভাঙ্গলে হাত।  
গান বাঁধতে উত্তোর গাইতে  
তোমার আসে বেশ,  
মনমোহন আছে হাক আখড়াই নেই  
নইলে জমে যেত শেখ।

ক্রমশঃ



## বীমাংশ

( গ র )

[ পূর্ণাহুতি ]

শ্রীমতী বিহঙ্গবাগা চন্দ্র

( ৫ )

ও বিজ্ঞ, বিজ্ঞা, ও রে কোথা গেছি।"

নেপথ্য হইতে উত্তর শাসিল—“কি—রে।"

“আর মা আর, সেই দেখে ডাকতে নেগেছি, চুলটা  
বেধে দি আর। সেই অবধি চুলগুলো বে হুতোহুড়ি হচ্ছে।"

বিজ্ঞা সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল—হাতে তাহার  
তকলি ও তুলা। প্রবলা এক কাকরানি দিয়া সাবান-  
বদা দীর্ঘ কেশের বামি চুলাইয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল,  
“আমি এখন বাঁধব না হু।” বলিয়াই সে তকলি কাটতে  
মনোযোগ দিল।

বিজ্ঞা দরামতীকে মা বলিত। দরামতী আদর করিয়া  
বলিল, “লক্ষী মা আমার আর। ‘না’ কি বলাতে আছে?”

“আমি দিদির কাছে বাঁধব এখন।"

“হ্যাঁ দিদির কাছে বাঁধবে। সেই দিদি কি না  
তোমার? বোমাই যে চুলের বোকা নিয়ে সারাদিন  
এলোথেলো হ’য়ে বেড়াচ্ছে, তা দি তো একবার চুলটা  
বেঁধে। সারাদিন কাজ দিয়ে উম্মত। কি এত কাজ  
রে বাপু?”

“দিদি এখন চরকার হুতো কাটছে যে। দিদির কেমন  
শীগগির শীগগির হুতো হ’য়ে যাচ্ছে। আমার তকলি  
আদবে এগোচ্ছে না।"

“তুইও চরকা কাটনা।"

“হ্যাঁ, আমি চরকা কাটতে পারি কি না, তা হ’লে আর  
ভাবনা কি ছিল। বাঁপি পট পট করে ছিড়ে যায়। দিদির  
কেমন হুল্লর হুতো হ’য়েছে। এই দেখ না মা কেমন  
চমৎকার দিদি হুতো। আর আমারটা—মাগো, যেন  
নারকম হুড়ি।"

“কেমন এই তো তোরও বেশ শক্ত হুতো হ’য়েছে।"

“ও তো তকলিতে। চরকার বৃষ্টি তোমার।"

“তোমার ভাল হ’বে গো, তোরও ভাল হ’বে, তুই চট্টা  
কর না।” তোর দিদির চেয়ে বরাবর আরও তোর ভাল হ’বে,

“তোমার মাথা আছে। আর দিকনি এখন চুলটা বেঁধে দিয়ে  
গাই, আর মা আর।"

“না মা, তোমার চুল বেঁধে দিতে হ’বে না।"

“কেন রে?”

“সে বিচ্ছিরি হ’বে।"

“না আমি ভাল বসে দেবো এখন।"

“তোমার যে ভাল, সেই তো এটে-সেটে মাথার  
বেজতলোয় একটা গোঁজ বসিয়ে দেবে। বিচ্ছিরি হ’বে,

দাদা ঠাটা করবে।"

দরামতী হাসিয়া বলিল, “আজ্ঞা একটু না দিয়ে দেব  
এখন, তা হ’লে হ’বে তো?”

“একটু আলগা করে দিও। ঐ দাদা আসছে, ঠাটা  
করবে যখন, তখন বেশ হ’বে। দাদা এরকম চুল বাঁধা  
আদবে পছন্দ করে না।"

দরামতী মনে মনে হাসিয়া বলিল, “ও তাই।"

“কি রে, নাকে কাঁপতে আরম্ভ করেছিস কেন”—বলিতে  
বলিতে মোহন প্রবেশ করিল।

“এই দেখ না বাছা, আমার চুল বাঁধা ওর কিছুতেই  
পছন্দ হচ্ছে না, তাই।"

মোহন হাসিয়া বলিল, “তা না হ’বারই কথা। তুমি  
যে করে দাও মা, ওর হুল্লর মুখখানা পর্য্যন্ত কুণ্ডলিত  
হয়ে যাবে।"

“তা বাছা, আমরা হ’লুম সেকলে লোক, এখনকা  
মত জ্ঞত কি পারি ফ্যানান-ম্যানান কেটে চুল  
বাঁধতে।"

“তা খোলাই থাক না, ও তো বেশ।” মন্দ দেখায়  
না তো।"

দরামতীর মুখখানা এক অজানা পলকে উজ্জ্বল হইয়া  
উঠিল, হাসিয়া বলিল, “বিজি কি আমার মন্দ রে।” বলিয়া  
তাহার মুখখানা বেশ করিয়া হুছাইয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল,  
“দেখ দিকনি।"

মোহনও মায়ের হাসিতে হোগে দিয়া বলিল, “কে বলে  
মা তোমার বিজিকে মন্দ।"

“এমন সব বৌ-কি না হ’লে খর মানায়।"

সহসা পিসিমা সেখানে প্রবেশ করিয়া বলিল, “তা  
মানান-সই করে নে না বাপু। কি বলিস তাই মোহন।"

মোহন হাসিয়া বলিল, “নিশ্চয়।"

“এক ছেলের ছুটা বৌ হ’তে দোষ কি? আগেকার  
সব রাজাদের হ’ত না?”

“হঁ, আমিও সেই রকম এক মন্ত রাজা, না দিদিমা?”

“তা না তো কি? আর তোমার ছুটাই হই গিয়া—একজন  
হুয়ো আর একজন হুয়ো।"

মোহন চলিয়া বাইতেছে দেখিয়া দরামতী ডাকিল,  
“ও মোহন ঢলে বাছিন যে, জল থেয়ে যা।"

“না মা এখন জলখাবার সময় হ’বে না, অনেক কাজ  
আছে।"

“বাবা, দিন রাত কি কাজ রে? থাওয়া-দাওয়ার সময়  
নেই, হুটো কথা বদলার সময় নেই। কে জানে বাপু, কি  
কাজে তোরা এক-ব্যস্ত। বাস নি মোহন, যা হোক একটু  
কিছু মুখে দিয়ে যা।"

মোহন হাঁহিতে বাইতে বলিল, “আমার এখনই  
বেরাতে হ’বে যে। আমি বাইয়ের ঘরে আছি, দাও  
তো বিজিকে দিয়ে যা হোক পাঠিয়ে দিও।"

পিসিমার সহিত দরামতীর একটা ইঙ্গিতমূলক কটাক্ষ  
বিনিময় হইয়া গেল। “তবে যা মা বিজু দৌড়ে তোর  
দাদার জলখাবারটা দিয়ে আর।"

বিজ্ঞা তখন একাএমনে তকলিতে হুতা কাটতেছিল।  
সে ঝাঁকিয়া বলিয়া উঠিল, “বাবা রে বাবা, বালি তোমাদের  
ফরমাস, আমি এখন পারি না।"

পিসিমা হাসিয়া বলিল, “পারি নি কি লো। এখন

দেশ-উজার করা রাখ, লো হুড়ি, এখন নিজেকে উজার  
করবার চেষ্টা দেখ।"

দরামতী পুনরায় অহরোধ করিল, “মা মা, মা চট করে।  
সে আবার যে ছেলে, এখনই বেরিয়ে যাবে, যুথের খাবার  
যেমন তেমনি পড়ে থাকবে।"

“কেন দিদি দিয়ে আনুক না।"

“দিকিকে কি দিয়ে আসতে বললে, তোকেই তো  
বলে গেল।"

“বদুক গে, আমাকে বললে বলে, আমাকেই যেতে  
হয় না? দাও কি দেবে দাও।” বলিয়া গদগদ করিয়া  
জলখাবারের পাতাখানা মোহনের পাশে গিয়া বসাইয়া দিয়া,  
বলিল, “এই নাও ধর। বাবুর আর একটু তর সইল না,  
আমি যেন কি।"

মোহন পাঞ্জাবিতে বোতাম দিতে দিতে হাসি চাপিয়া  
আড়-ঢোপে তাহার দিকে একটু চাহিয়া বলিল, “একবারে  
মিলিটারি মেজাজ যে। কি তোমার কে বলে? তুমি  
হ’লে রাজারানী, এবার পাটনারানী হ’বে আবার।"

আড়াল হইতে দেখিয়া পিসিমা ও দরামতীর মধ্যে  
আবার একটা সহাতপূর্ণ কটাক্ষ-বিনিময় হইয়া গেল।

বিজ্ঞার হাতে তখনও তকলি চলিতেছিল। দেখিয়া  
মোহন বলিল, “বোনে বোনে ভারী দেশভক্ত হ’য়ে উঠলি  
যে। তোরা স্বরাজ না নিয়ে ছাড়বি নি দেখছি। দিটিটা তো  
অলং-মহলে বসে গভীরমুখে চরকাই চাটিয়ে যাচ্ছে।  
কাণ্ড পানো কিরেও চায় না একবার।"

“ও তাই এত দুঃখ! বিদেশী বলে ‘বরকট’ (বর্জন্ম)  
করেছে দিদি তোমার। ও মা গো!”—বিজ্ঞা হাসিয়া  
একবারে লুটাইয়া পড়িল।

“সেই রকমই তো পতিক।” বলিয়া মোহন জলযোগ  
সমাপ্ত করিয়া তাড়াতাড়ি বাইরে হইয়া গেল।

মোহনও করদীন সভ্য-সমিতি লইয়া অত্যন্ত  
ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে—আহার-বিজ্ঞা ত্যাগ—বিশ্রাম  
করিবারও অবকাশ নাই। কাজের চাপে পতিপতির  
বিস্তালাপও করদীন ধরিয়া বন্ধ। একপ-অবধার বাসস্তীর  
মনের অবস্থা যে কল্পনাই হইল, ভাঙা তাহার অন্তর্ধ্যায়ী  
বাস্তব কেহই জানিল না। তাহার দেহ দীর্ঘ হইল,



চোখের কোলো কালি পড়িল, মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, কাজে উন্মাদ নাই, বহে এলাইয়া পড়িতে উঠে।

সেদিন মোহন শরণগৃহে প্রবেশ করিতেই দেখিল সমুখে বিল্লা। বেশে সেদিন তাহার একটি বিশেষ পারিপাট্য ছিল। তাহাদের স্থলে প্রাইজ, কি এমনই একটা কিছু—সেই জন্ত।

শেখরা মোহন চক্ষু বিফারিত করিয়া বলিল, “উঃ—বাস রে! একেবারে মুন-মানোভা। সাধে কি আর আমার হুই ঘুরেছে, তবে আমি কি, আজই তা’লে মালা-ঘলগা হ’য়ে যাক না। আর দেরি কিসের?”

বিল্লা চুপ করিয়া থাকিবার ভয়ে নয়, সে টপ করিয়া উঠর দিতে জানে। কিন্তু সে কয়দিন হইতেই শেখরা আসিতেছে, তাহার দিদি যেন কয় দিন হইতে ত্রিযমণ। তাই তাহাদেরও যেন কিছু ভাল লাগিবেছিল না; হুতরাং সে দিদিরই লগ্না করিয়া বলিল, “দেখ না দিদি।”

“দিদি কি করবে, আমি অমন কাউকে ভয় করি নি রে—” বলিয়া মোহন কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া গষ্ঠীর-মুখে বীরপুরুষের মত চটপট জামা-কাপড় ছাড়িয়া এবং চৌকুতার চটপট মস্ত শব্দে রথগয় ঘোষণা করিয়া গৃহ হইতে নিজস্ব হইয়া গেল।

বাসন্তী বস্তুর একবারে ঝাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানে তেমনি ভাবেই ঝাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীর এই সঙ্গল পরিহাস আজ তাহার কাছে যোরা নিলজ্জতারূপে দেখা দিয়া তাহাকে যেন একেবারে মাতীর সহিত মিশাইয়া গিল। সারা অন্তরমুখ তাহার দিকারে—আত্মদামিত্তে তরিতা উঠিল। বায়কাল হইতেই গুপ্তের ক্রোড়ে লালিত সে, হুতরাং মৈত্র্যাগুণ তাহার যথেষ্ট ছিল; কিন্তু আজকাল কেমন করিয়া কেন সে তাহা সীমা লম্বন করিয়া ঝাঁড়াইল, তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পায় না। এ কি হইল তাহার? তাহার মন এমন ব্যাকুল হইয়া উঠে কেন? কে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে?

সে দেখিল বিষয়ই নয়। যার জন্ত সে চোরা সাধিয়াছে, সেই বৃষ্টি আজ চোর বলিয়া ধরাইয়া দেয়। কাহার জন্ত সে শব্দ-শাউড়ী-স্বামীর কাছে ভাল করিয়া হুই ফুটিতে পারে না? তাহার সঙ্গারের কাহার জন্ত

সে এত অস্বাভাবিক ব্যাপার করিয়া আছে? কাহার জন্ত সে সবার কাছে এত ‘কিন্তু’ হইয়া থাকে? কই হইয়া তাহার এতটুকুও সমতা নাই কেন? কিন্তু বিজয়ার একে দোষ কি? সে হেনোমাম্ব, সে তো কাহাকেও গবরদত্তি করিয়া কাড়িয়া লইতেছে না। তবে—এ তাহার পোড়া অদুরেরই দোষ। তা না হইলে স্বামী তাহার দেবতাতুল্য। তাকে কি অবিবাহ করা যায় কখনও? তার মত লোককেও যদি অবিবাহ করা যায়, এ লগ্নতে তবে কাকে সে বিবাহ করিবে? এত মেহ সব মিছে? তার কি সব ছলনা এও কি কখন হ’তে পারে! এত ভালবাসা তাও কি সব—মুখের? ওগো কেন সে এত ভালবাসলে? দাসীকে দাসী না করে কেন সে রাজসিংহাসনে বসালে। আজ অনেকদিনের পর তাহার মাকে মনে পড়িয়া গেল—না মাগো, কোথা আছে মা, একবার এসে দেখে যাও মা। বাসন্তী হুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সেইখানে বলিয়া পড়িল। তাহার হুই চক্ষু উল্লসিত অঙ্গল ধারায় অশ্রু বরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া মনটা হুই হইলে ভাবিল—না, তার ভো দোষ নাই এতে, সে যে মাংয়ের এক ছেলে। আমি পুত্রহীনা বন্ধা নারী, আমার আবার এত কেন! যদি বিভিন্ন পদেই ছেলে হয়, বেশ তো সে আমার মা বলে ডাকবে। রবিও হুই হ’বে, আমি না হয়—আবার তাহার চোখ ছাপিয়া উঠিল, আবার অশ্রু প্রবলবেগে ফরিতে লাগিল। আবার সে চোখ মুছিয়া ভাঙিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কিছুই নিপাতিত করিতে পারিল না। স্বভাবই সে শান্ত ও স্নেহ-সুন্দর। অবশেষে সে সহিবার জন্তই ধানিকটা প্রব্রত হইল।

( ৬ )

মাংয়ের কথা শুনিয়া মোহন তত্ত্ব হইয়া রহিল। বন্ধুরা বলিয়া থাকে তর্কে না কি তাহাকে কেহ পরাভব করিতে পারে না। সেই মোহনের মূণ হইতে প্রতিবাদের একটা কথা পর্যন্ত উজারিত হইবার ক্ষমতা রহিল না। বিদ্রোহ যে একেবারে হতবুদ্ধি, নির্ভর্য। সে কাদিল ধরিয়া মিটিং করিয়া, সভা-মিটিং লইয়া, টাণা ভুলিয়া দেশের কাছে মহা-উন্মাদেও উন্মাদে মগন হইয়া রহিয়াছে। বাহিরের বিরাট কর্ণকন্ডের বিশালা ব্যাপারের মধ্যে সে নিমগ্ন-চিত। এদিকে যে তাহার জ্বর গুণের অশ্রুপূর্ণের অভ্যন্তরে কত

বড় ংয়ের মেঘ পলুভিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা সে আদৌ অবগত নহে। সে এমনই আত্মবিশ্বস্ত। সঙ্গারের ছোট-খাট কর্তব্যগুণা তাহার চোখের সমুখ হইতে যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি তখন অস্বাভাবিকস্বরূপ উজ্জ্বল হইয়া বৃষ্টিয়া ফিরিতেছে—উন্নতি আর উন্নতি; এই জাতীয় উন্নতি—আর্থিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, নৈতিক উন্নতি।

মা কয়দিন ধরিয়া কয়েকটা কথা আভ্যন্তরীণ হইতেছিল। তখন সেটাকে সে এগারের মধ্যে গণ্য করে নাই; কিন্তু মা যে মোন সমস্তির লক্ষণ বলিয়া বৃষ্টিয়া লইয়াছে তাহাও সে জানে না। আজ পৃষ্ঠভাবে কথা পড়িতেই বিদ্রোহ-বিদ্রল পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া দয়াময়ী থামিয়া বলিলেন, “কি রে তা হ’লে কি বলিস?”

পুত্রের বলিবার মত তখন বোধ হয় কিছুই ছিল না। সে নিরুত্তরাভাবে কিছুক্ষণ তত্ত্ব হইয়া বসিয়া রহিল। পরে আস্ত আস্তে উঠিয়া চালাই গেল, বোধ হয় নিরুদ্দেশ-গৃহে চিত্তা করিতে।

সমস্যা ঝটিল হইলেও উপায় তাহারি হাতে, কিন্তু জননীকে বোঝান একটু কঠিন—একটু কেন হয় তো যথেষ্ট। তবু সে মনে মনে হির করিয়া রাখিল, মাকে দাঁক বলিয়া দিবে—না না সে হইতে পারে না—হ’বে না। কাগাটা সে যত সহজ মনে করিয়া গেল, কার্যতে যথেষ্ট তাহা অনেক বিলম্ব হইল। তাহার স্বভাবটা এমনই অদূত ধরনের। দৈহিক শক্তিতে তাহাকে বলিষ্ঠ বলিয়াই বোঝা যায়, কিন্তু মনটা তাহার কুসুমদুর্গ স্বকোমল, আর স্বভাবও তদুচ্চল যুগ। হঠাৎ সে কোরও কাজ করিয়া ফেবিত্তে অনেককালি ইতস্ততঃ করে; হুতরাং সে কাহারও প্রাণে এতটুকুও আঘাত করিতে বা ব্যথা দিতে নিতান্তই নারাজ।

শোকাতুরা জনক-জননীরা একসঙ্গে সে একমাত্র সন্তান ও সন্তানের হুল। ভগিনীও খন্তগৃহে। অনেককালি পালনকে বিসর্জন দিয়া মাতা-পিতা—এ তাহাকে মাতা অবলম্বন করিয়া ঝাঁড়াইয়া আছে, হুতরাং তাহাদের সেই শোক-দীর্ঘ জ্ঞান-জীর্ণ বান্ধবা জীবনের মাঝখানে একটা জ্বর স্কুমরা চঞ্চল শিশুর যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা সে

বেশ বুঝিত। এ আশা তাহাদের জ্ঞান নয়, এ দাবী তাহাদের অমূলক নয়। একটা নবজাত অতিথির কলহাস্যে তাহাদের নীরস নীরব জীবনকে সার্থক মতেভন করিয়া রাখিবে, ইহা তাহাদের একমাত্র অভিলাষ। তাহাদের সেই হৃৎকের স্বপ্নলোককে কেমন করিয়া সে ভাবিয়া দিবে! আজ মোহনের মাঝে বাহাকে সে যোরা জ্ঞান বলিয়া মনে করিতেছে, হয় তো সে মোহ একদিন কাটিয়া যাইবে, হয় তো মাতা আজ যে অভাবে ক্ষুর একদিন তাহাদের সেই অভাবের জন্ত জীবনটাকে মকতুমি জ্ঞান করিতে থাকে। কিন্তু নিরপরাধা বাসন্তী তাহার, কোন দোষ নাই; তাহার উপর এ অবিচার কেন? ক্রমে সমস্যা জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। বাহাকে সে এক কথার সীমাংসা করিবে ভাবিয়াছিল, ক্রমে তাহার স্বত্ব হারাষ্টয়া ফেলিল। সে কাহারও উপর দোষারোপ করিতে ভালবাসে না। সন্দেহ ভ্রমিগণিত্য সে এমনই চিরদিন যুগ। কিন্তু এবং সমস্ত বিষয়কে হস্তগুহির দ্বারা বিচার না করাই ছিল তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এইরূপ স্বস্ত বিচার সিয়া—পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়া নিজের ভীকৃত্যায় সে নিজের কাছেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। হইলেও এ লজ্জা তাহার একবার মনে। রামভঞ্জে যুগ হইতে যে দেশের সমস্ত পিতামাতার জ্ঞানকে নির্ভর্যের পাখায় করিয়া বহন করিয়া আসিতেছে, সে দেশের পুত্রের পক্ষে এ ভীকৃত্য বা কাপুরুষতা তাহার একার নহে, তাহার দেশেরই। হুইটা নারী সমুখে—একজন জননী আর একজন ভায়া। একজনকে স্বামী করিতে হইলে আর একজনকে গৃহ দিতে হয়। আজ-কালকার ছেলেরের পক্ষে পরা স্বহঃ। মোহন পৌরাণিক যুগের মাহুঘ নহে, তথাপি সে সহজ পথ ধরিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে চলিতে পারিতেছিল না।

( ৭ )

টিক এই সময় মোহন বাহির হইতে তাহার ছোট বোন বৌর যগা শুনিতে পাইল, “হ্যাঁ মা, দাদার না কি আবার বিয়ে দেবে?”

মা বলিল, “হ্যাঁ, কেন?”

“ওমা ওঁক গো! লোকে বিয়ে কি?”



মা বিরক্তির স্বরে বলিল, “আেকের কথাই আমি ধার ধারি না।”

“না দাদা! যা না তাই বলছে হ’ল কি না। তোমার বাপু সব গায়েদের জোয়ের কথা। আবার না কি নিমন্ত্রণ সঙ্গে নিয়ে দেবে বলছ?”

মা বলিল, “হ্যাঁ তা কি হ’য়েছে?”  
“তা কি হ’য়েছে; আবার কথা; দাদা যাকে বোনের মত করে মাছব করেছে, তারই সঙ্গে—মাগো! তুমি মা যেন কি হয়েছে বাপু। আর দাদাই বা কি রকম মাছ গা? অমনি বলে এসল ‘হ্যাঁ’।”  
মা বলিল, “দাদা তো তোমার মত ভাতা-গলায়াম নয়!”

দেবী সবেগে বলিয়া উঠিল, “না হোক। দাদাকে ভাল মাছ পেয়ে ভেবেছ, বাতা অমনি করিয়ে নেবে। না তা বলে রাগছি, আমি সে কখনও হ’তে দেব না। এ তোমাদের হুকুম পেয়েছে কি না, অমনি মুড়িকির মত আচলে গাঁটছড়া বেধে দিলেই হোল।”

মা মুখের হইলেও এই মার্জিত-রুচি একালের বাচ্চুরা কতটা কাছে চিরদিনই পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হন; সুতরাং আজও তাহাই করিতে হইল। শুধু অস্বাভাবিক বসন্ত উষ্ণ বিরক্তিতে বলিল, “কি গো, তুই কি বলিস বল তো স্ত্রী? আমার খুত্তরের বাশে কি কেউ এক গরু জল পাবে না? বলতে চাস, তাঁদের বাশের নাটাও রক্ষা করতে হ’বে না? তুই ছেলে-মাছব, ছেলে মাছবের মত থাক দেবী। তোর অত হুড়ুপনা আমার আবেদন ভাল লাগে না, এই আমি বলে গিলাম। বোমার বয়সী বৌ-খিয়া চার ছেলের মা হ’তে গেল—আবার কি এতদিন আমি অপেক্ষা করিছি। সকলে বলছে—ছেলের বিয়ে দাও, ছেলের বিয়ে দাও। তুই ‘না’ বললেই অমনি ‘না’ হ’বে।”

দেবী মাের কথাই আর প্রতিবাদ না করিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, “আজ্ঞা মা বৌদির বয়স কত হ’ল? কুড়ি? একশ? না, অত হ’বে না।”

মা মুখ ভার করিয়া বলিল, “না, তোমার ভাঙ খুঁকি।”

“দেব মা, আমার ভাণ্ডার এই বাইশ বছর বয়সে কেনম হলুর ছেলে হয়েচে। বৌদির বয়স সবে উনিশ-কুড়ি—চের সময় আছে। আমার শাশুড়ী গল্প করে মা, তাঁর পচিশ না ছাশিশ বছর বয়সে আমার ভাণ্ডার হয়, তারপর দেব মা, পর পর এতগুলি। এখন দেব মা তাঁর বাড়ীতে ছেলেপুলে নাতি-নাতিনি ধরে না। আমার দিদিশাশুড়ীও সেকলে মাছব, কই আমার খুত্তরেরও বিয়ে দেন নি, আর তুমি অমনিতেই অর্ধেক হ’য়ে উঠেছ। আজ্ঞা আমি দাদাকে জিজ্ঞেস করি তোর কি মতামত,—‘বলিয়া হুয়ের উত্তরের অপেক্ষা মাতা না করিয়া দৃষ্টপদে দেবী দাদার ঘরে প্রবেশ করিস। ডাকিল, “দাদা অ দাদা—”

দাদা তখন ঘরের মধ্যে বিজ্ঞানার পড়িয়া লজ্জার কটকটি হইয়া উঠিতেছিল।

দেবী বিজ্ঞানার উপর দাদার পাশে উপবেশন করিয়া বলিল, “হ্যাঁ দাদা, এসব তোমাদের কি হচ্ছে স্ত্রী?”

দাদা তখন উঠিয়া বলিয়া পাশস্থিত বইখানা—বাধা এতক্ষণ অপাঠ্যভাবে পড়িয়াছিল—তাড়াতাড়ি কোলের উপর তুলিয়া গাইয়া তাহার উপর মুঁকিয়া পড়িল।

“জ দাদা।”  
“কি হ’বে রে?”

“কি হ’বে বৈ কি? আমি যেন কিছু স্ত্রী নি। ওখানা কি বই দাদা?”—বলিয়া দেবী দাদার হাতের বইখানা আকর্ষণ করিল।

বইটা মুড়িয়া দাদা মুখ তুলিয়া বলিল, “ও তুই বৃকতে পারাবি তো। ও একখানা ইংরেজী বই। তোরা সব ভাল আছিস মিতা।”

“হ্যাঁ।”  
“কতক্ষণ এলি?”

“এই তো আসছি সব। এসেই মাের সঙ্গে এক পাগা বগড়া কর্ণম।”

“তারপর আর তোমার সঙ্গে একপাগা হ’বে। হ্যাঁ দাদা, অ দাদা, আবার বই খুলছ কেন? পোড় এখন বাপু।

তোমার পড়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না, আর কেউ কেড়ে

নিচ্ছে না। আগে আমার পোটা কত কথাই উত্তর দাও।”  
মোহন হাছমত স্নেহে দৃষ্টি ভগিনীর মুখের উপর রাখিয়া বলিল, “কি ব’লিস বল?”

“আমি জিজ্ঞেস করছি, তোমার মতামত কি?”  
“কি মতামত রে?”

“না, মতামত আর নেই একটা মাছবের। জানি নি। তোমাদের কথাই কেউ অস্ত খুঁজে পাবে না। এই ওনছি তুমি আবার বিয়ে করবে ছেলে হ’ল না বলে। হাঁদাদা, সত্যি?”

সত্যি তুমি বিয়ে করবে বলছ? সত্যি বলতে কি কথাটা যদিও আমার বিশ্বাস হয় নি—। আজ্ঞা দাদা বৌদি কি বলে? খুব রাগ করে? করে না? বৌদির মত আছে? দায় পড়েছে থাকবার আছে। বৌদিও যেন মাটার চিবি, তুমিও তেমনি মাটার সেবতা। তা না হ’লে আর এ পোল বাধে। বৌদি কেথা গেল দাদা? ও ঘরে বসি। ও বৌদি, বৌদি, মৌগুগিস কেন যাও, একটা বারী দরকারি কথা আছে। ও বৌদি।”

মনদের ভাষাভাষির চোটে বৌদির পরিবর্তে বিজয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া দেবী কলহাতে গৃহপানিকে মুগ্ধিত করিয়া বলিয়া উঠিল, “ওমা! তুই এরই মধ্যে আমার বৌদি হ’য়ে পড়েছিল না কি! ওরে তোকে নয়, তোকে নয়, নতুন বৌদিকে নয়—আমার সেই মাতাতার আমলের পুরানো বৌদিকে ডাক কি।”

বিজয়া অপ্রতিভ মুখে দিগিকে ডাকিয়া দিতে পুনরায় কিরিয়া গেল। মোহন এবার যথাসাধ্য বলে সন্কেটটাকে সরাইয়া কেদিয়া সহসা আনন্দপানিকে পাঠ্যগোচ্যে ঢাকিয়া প্রসন্নমুখে বলিল, “কেন পাগলামি করছিস দেবী?”

“আমি মুখি পাগলামি করছি—বাঃ। তোমাদের বলে সব ঠিককর হ’য়ে গেছে, আমি এলুম নেমস্তম্ভ খেতে।”  
মোহন হাসিতে হাসিতে ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “তুই বুদ্ধিমান কোনও জনমেও তোর মায়ে না খেছি। চিরকাল কি ছেলে মাছব থাকবি?”

দেবী সে কথাই উত্তর না দিয়া বলিল, “আজ্ঞা দাদা, বৌদি আগছে না কেন বল দিকি নি? বাধ হয় রাগ হয়েছে—না?”

“রাগ হ’বে না তা কি হ’বে বল। তোরা চার দিক

থেকে তোকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে যে রকম কাণ্ড-কারখানা বাধিয়ে তুলেছিস।”

দেবী বাড় নাড়িয়া সোজা হইয়া বলিয়া দাদার দিকে চাহিয়া বলিল, “আমরা—না? নিজের পোড়া পুরা বাড়ি চাপাতে পারলে কেউ আর ছেড়ে কথা বল্ল না গো।”  
এই প্রপল্ভা ভগিনীটাকে আটখা ওঠা ভার। ব’হাই হউক দেবীর হেফাজতে মোহনের বুক হইতে পাগলের মত ভারি একটা বোঝা নামিয়া গেল।

দেবীর এই অনর্গল বিশ্বখল কথার জ্বল সে কতবার তাহাকে শাসন করিয়া দিয়াছে, সেই কথাগুলো আজ তাহার কাছে বহু মূল্যবান বলিয়া মনে হইল। মোহন দেখিল, দেবী আজ একটা বির্যটি সময়্যাকে তাহার সরল বুদ্ধির সাহায্যে অতি সহজে মীমাংসা করিয়া দিল। এমনি স্বাভাবিকভাবে ইহা প্রকাশিত না হইলে মনের মধ্যে একটু একটু পুঞ্জীভূত হইয়া একদিন তাহা বির্যটি বজ্রের স্বটি করিত। অন্তরের এই নিশাঞ্চল অনল কি অসহনীয় না হইয়া উঠিত। ইহা স্বরূপ হইতেই সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

মোহনকে নিমন্ত্রণ থাকিতে দেখিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিল, “কি ভাবছ দাদা?”

মোহন সে কথার কোনও উত্তর দিল না, শুধু সেই হৃগ্ধগির নয়ন ছাটা ক্রীতিতে পূর্ণ করিয়া স্নেহভরে ভগিনীর মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। সে চাহনি নীরবে তাহাকে আশীর্বাদ করিল। দেবী সে চাহনির অর্থ গ্রহিল।

কোলের শিঠের ভাই-বোন তাহারা। তাহাদের মধ্যে গুরু-সম্ভাব্য কোনও কাহলি ছিল না, আজও নাই এবং ছেলেবেলা হইতে সেই যে তাহাদের মধ্যে সহযোগিতা স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, আজও তাহা তেমনি আটুটি বৃহিয়াছে।

দেবী বলিল, “অ দাদা, বৌদির কি হোল গো, এখনও আসে না যে?”

মোহন হাসিয়া বলিল, “কি করবি তাকে আনিবে?”  
দেবী যথান্থা গম্ভীর করিয়া বলিল, “আমি মুখি এলুম খালি তোমাদের সঙ্গেই বগড়া করতে।”

মোহন দ্বিতহাস্যে বলিল, “ওরে এবার কি মনন-ভাঙে



কৌলব পাকতে হ'লে? ভারি কুঁহলি হ'লেইহিস তো! ছুই মেয়ে কোথাকার।"

এই সময় বাসন্তী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমায় ডাকছিল ঠাকুর-সি?"

"হ্যাঁ ভায়া মহাশয়!"—বলিয়া দেবী সহসা পাখিয়া গেল। তাহার শীর্ণ, রান মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখের কথা মুখেই বাঁধিয়া গেল—“এ কি বৌদি?” বলিয়া দামার দিকে কিরিয়া প্রশ্ন করিল—“কি দশা হয়েছে দায়া? এর নাম তোমাদের দেশের সেবা করা। দেশের সেবা করা মানে ঘরকে ছেড়ে আর সবুহিকে সেবা করা—না?”

দেবী গালে হাত দিয়া ক্রন্দনের স্বরে বলিল, “না গো। তোমরা একেবারে মাহুয় খুন করতে পার।”

বাসন্তী অন্তরাগ হইতে সমটই শুনিয়াছিল। মোহন কথার উত্তর দিবার আগেই হাসাখুশে নন্দিনীর কণ্ঠ থেকে করিয়া সম্ভাবণ করিল, “তারপর দেবীর আজ হঠাৎ আবির্ভাব নে? কি মনে করে?”

দেবী হুহু হাসিয়া বলিল, “মনে একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে। তা না হ'লে আমার সাক্ষাৎ পাও?”

“সে তো দেবতাই পাচ্ছি, দেবী আজ আমার প্রতি বড় সদয়া।”

“তোমার প্রতি নিদ্রা সে কোনও দিনই নয়। অতএব হে ভগ্ন—” বলিয়া দেবী আড়-চোখে একবার দামার প্রতি চাহিয়া লইল। দেখিল, দায়া তখন ঘাড় ভুজিয়া সেই বইটা লইয়া পড়িয়াছে।

এস তখন বৌদির দিকে ফিরিয়া বলিল, “একবে বর গ্রহণ কর।”

বাসন্তী উপস্থিত সাধিকা-উপাখ্যানটা পড়িয়াছিল। সে হাসিয়া নন্দকে উত্তর করিল, “কেন, তুমি কি আমার ঘম এলে?”

দেবী বৎসায় মুখখানা গভীর করিয়া বলিল, “ঘম তো ভাই সাধিকাকে ম্রিন বর দিয়েছিল, আমিও তোমাদের মোটে ছুটি দিছি।”

“তোমাদের মানে?”

দেবী বৌদির কাশেকণ্ঠে বলিল, “তোমাকে একটা, আর তোমার বোনকেও একটা বর—এখন বুঝলে তো!”

বাসন্তী সহস্য়ামুখে “এইবার তা হ'লে উঠি ভাই” বলিয়া সে গমনোচ্ছত হইল।

দেবী বৌদির আঁচল চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “বা কোথায় যাক?”

“রাস্তাঘরে।”

“কেন এরই মধ্যে?”

“দেব-দেবীর যুগল-পুজার আয়োজনে।”

“শুভোচ্চা দায়া, তবে না বৌদি কথা জানে না?”

দায়া পতীর প্রতি একটা অর্থপূর্ণ গোপন কটাক করিয়া বলিল, “জানেন যে জানেন; সব জানেন, শুধু থরত করে না।”

অপব্যয় হ'বার ভয়ে।”

মোহন একটা স্বতন্ত্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “বাক, বাচা গেল।”

দেবী বলিল, “সেই জন্তে আরও আমার আসা। ছেলেটা বেশ দান্য। আমার মেজ জ্বায়ে ভাই হয় কি না, ভাই ও আমাদের বাড়ি যাওয়া-মাসা করে। আমারও বাপু ছেলেটাকে বেশ লাগে। তোমাদের মতই বুন্দেদী গো, বুঝব পরে, চেহারাও মন্দ নয়, তবে একটু কালো। তা তোমার বিজিকে বেশ মানাবে গো, বেস বেথের কালে বিজলী।”

“তা হ'লে”—নিভাত অল্পগত হোটে ভাইটি তার দিককে ঘেমনভাবে জিজ্ঞাসা করে মোহন তেমনি স্বরে বলিল, “তা হ'লে শুভ কাল শীগগির ঘরে ফেলাই ভাল—কি বলিস্ দেবী?”

“আমি বলি এই সামনেই যে গম্ভীরা আছে, সেইটেতেই দিয়ে ফেল—কেমন?”

মোহন তৃপ্তির সহিত বলিল, “বেশ।”

“দেবী আবার বৌদিকে লইয়া পড়িল, “তা হ'লে বৌদি আমাকে বিটকালি ধেনে ভাই দাও। কি বল দায়া? ভাল কর্ণেই তো খুসী করা উচিত—ওর হোগ বোনের বিয়ে।”

দায়া হাসিয়া বলিল, “নিশ্চয়।”

আর বৌদি বুকভরা আনন্দ, বুঝরা হাসি; আর চোখ-ভরা কৃতজ্ঞতা-মাথানো জগ লইয়া নন্দিনীকে একটা ছোট কিল দেয়াইয়া রান-ইল, “এই তোমার বিটকালি-বিদায়।”

পূত্রকন্তার ব্যবহারে দরমাই একেবারে তাহজব বলিয়া গিয়াছিল; হুতরাং সে পুনরায় সাংসারের বেড়াভাঙ্গ ছিন্ন করিয়া, পিনীমার বাড়ী জীবনোন্মতে গিয়া বাস করাই

মনস্ত করিল। কিয় ক্রিষ্টদিন বাস করিবার পর শরতের এক স্রমবুধ প্রভাতে যখন শুনিতে পাইল, তাহার বধূমাতা একটা রাষ্ট্রা প্রোথ রেছেছে করিয়া বসিয়া আছে তখন দুহুতকাল বিগড় না করিয়া বৃক্করে দ্রিবেদী তীরের পায়ে প্রণাম করিয়া ছুটিতে তাহার স্তম্ভবর্কে দেখিতে বাড়ী ফিরিল।

## শব্দব্রহ্ম

ত্রিহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

ভঙ্গা মনে এই কাণ্ড শ্রুজলনেও পায় লাভ  
তাই বুঝে আর্থা করেছেন দাখ্য এই জরিমানা  
ভূতার চরিতে গোলাকপতে। (তোমার)  
করতে হ'বে আনাগোনা।

মহাপুজার তিনটা দিন আজটা ঠাটা ছিল। বিজয়ার দিন মহাসমারোহে বিজয়োৎসব হইয়া গেল। কোজাগরী পুর্নিমার দিন পাশার পিতৃশ্রাদ্ধ ছিল। সভাশরণ পুণ্য শকুনি হইয়া বসিয়াছিলেন। তবে, ‘ছত্র-তিন-নর’ পেয়ে কেউ নুতন ঘরে উঠিবেন, আর কাহারও পুরাতন ঘর ‘তিন-তিন-নর’ হইবে তার উপায় ছিল না। কাহার টাকা জমকালী পুজার জন্ত জমা থাকিত। এইরূপে কটা মাস কাটিয়া গেল। একদিন কনকনে শাতের রাতে, আজ্ঞার আড়ষ্ট হইয়া সব একরূপগার জমাট বেধে বসিয়াছিল। আর বোসেদের পুত্রে সেই শীতে কে কটা ডুব দিয়ে আসতে পারে তারই তরু আর রকমারি বুকুনী চলিতেছিল। মাষ্টার সকলকে সতর্ক করিয়া পাশের ঘরে ঢুকিলেন। এমিকে অট্টা সর্দিতে টল টল করিতেছিল। নষ্টামি করিতে নয়া লইয়া জটনার মধ্যে গিয়া এমন হাঁচি জুড়িল যে কাহারও কাহারও পুত্রে বাইবার প্রয়োজন হইয়া উঠিল।

অট্টা বলিল—বাবা, শব্দ, ব্রহ্ম, এই শীতের রাতে গরম গরম হুটির আলোচনা না, করে কেন পুত্রে ডুব পাড়বার কথা! আমি সর্দিতে সেঁজিতে উঠেছি।  
ইতমধ্যে মাষ্টার ডাশার করিয়া গরম খুণী আর মুড়ি-

শব্দ-ব্রহ্মের প্রদানে আজ্ঞার দ্বিতীয় প্রভাব লোপ পাইয়াছিল। মাগ, ভিলি, বায়ের বালাই ছিল না। যখন যে দেবতার পূজা করিবার ইচ্ছা হইত, তাগ-মান-লয় স্বরে তাহার আবাহন ও বিসর্জন হইত। বাহিরে দেবান্দনার কলসর উঠিলে আমাদের আজ্ঞা বন্ধ থাকিত। সাধারণের কোণাহলে গর ভাসাইলে চলিত না, বার যেমন যোগ্যতা সেই রকম কাজে লাগিয়া বাইতে হইত। কাহারও কোন আবেদন থাকিলে তো কথাই ছিল না। মাষ্টারের এসব বিষয়ে খুব কথা আশেপ ছিল। তবে, আজ্ঞার আঘাতে অধিকার আবাহন, যেমতে ‘হোমি, শীতে শরভূতীর অর্চনা করিতে কোন বাধা ছিল না। বগন্তে বরযাত্রের রথযাত্রার হুড়াহুড়ি লাগিত। মাষ্টার রথযাত্রায় না মাতিলেও, বামন-নর্শনে বিশেষ বাগ হইতেন। বালন্তেন ‘রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনঃ জন্ম ন বিভতে’। আজ্ঞার তরুণদের কেউ যদি বামন হইতেন, তবে মাষ্টারের আনন্দের নীমা থাকিত না। তিনি নবদম্পতিকে বুঝেই সর্পন করিতেন, বহুতে খুশের মাগা পরাইয়া দিয়া বামনের কাখে কাখে বলিতেন ‘বোন বিয়ে করেছিল, জমকালীর নিকট জরিমানা দিয়ে বাখ। জরিমানার টাকাও একদিন জমাটা মছলিস হইত। মাষ্টার পারিতেন :—

ছি হি লাকে মরি হরি”

জনক-হিতা তোমার পিতার



কড়াই প্রভৃতি মাড়ে বরিণ রকম ভাজা কাল-নব-তৈল সম্বলু আমিয়া হাজির করিলেন, আর বলিলেন—তোদের যুগ্মে আমি বরকে উপর হাড়ুতু \*খেলকুম, আর তোরা একবার জড়-ভরত মেরে গিয়েছিলি? \*আয় সব, ভাজা খেয়ে তামা হ'বি আর।

সতে সেতার ছাড়িয়া তব্‌লার হাত গরম করিতেছিল; যুগ্মিলনার নাম শুনিয়া তব্‌লার তেহাই ডিগবাজী দিয়া শেব করিল অটলার সামনে পড়ে। আর ছিরে চমকাইয়া যুগ্মীর ঠোঙা হাত থেকে ফেলিয়া দিল। সতে সটাত শুয়ে মুখে পুরিতে লাগিল। আড়ট ভাঙা সকলের কাটিল। হাত, মুখ, বুক, পেট, গলা ক্রমে সকলের গরম হইয়া উঠিল। হারু মঠীরের জরনিনীতে ঘরও গরম হইয়া গেল।

সতের ডিগবাজীতে অটলার ঠোঁটতে একটু লাগিয়াছিল; এতকম কোন কথা কয় নাই, খাওয়া-দাওয়া শেব করিয়া সকলে স্থির হইয়া বসিলে অটলা সতেকে বলিল—ওহে বাণীর বরপুত্র! বরমর 'মঠার' বাণী রূপে প্রকাশ পেয়েছিলেন; কিন্তু তোমার ঐ কোটা শরীর কি করে প্রকট হয়েছিল বল তো তুমি।

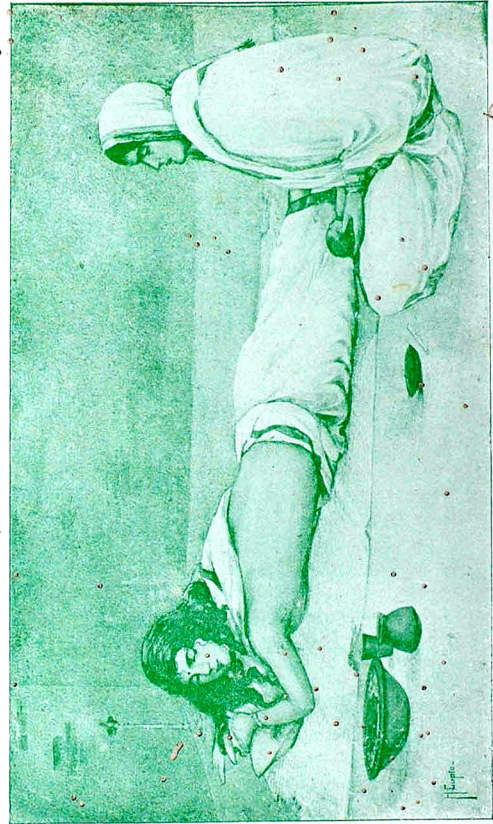
শুক শরীরের উপপত্তি সহজে হয় না, যদি তোরা বুঝতে পারিস তবে তোরা শক হতে পারবি—এই বলে সত্যশরণ বলতে শুরু করল।—সে অনেক কথা তোদের বৈয়্যের উপর জুগ্ম হ'বে। পুরাকালে ধন্য নামে এক ডোম ছিল সভা-সমাজের সীমান্তে তার দেখা পাওয়া যেত। কাজ ছিল তার কুলো বোনা। বীজ বাতাই করত, তার ধুলো আগুড়া ঝাড়তে লোকে কুলো কিস্ত। কখন কখন সে বীধত হুড়ি। আলু জিনিস আটক রাখতে লোকে হুড়ি বাড়ী নিয়ে যেত। ধন্য, রাতে খেত তাড়ি, আর চৌকি দিত লোকের বাড়ী বাড়ী। বিপদের সময় সে খরত লাঠি, কথা বলত খাঁটা খাঁটা। পরীর নশল শ্যাম-শঙ্কর রক্ষা করত—জড়াত প্রুত তাড়্য করত। দানা, ভাই, বুড়ো-ঝাটা-সম্বোধনে প্রোকের কাছে আবার পেত।

ধর্মার বদ্র ছিল কথা বুটী। সে মহাই শুচি কারণ জানের গরব তার পাশে পুশে চাই, মায়ার খোর তার কাছে বেঁধে নাই। মরন-শেরা জীবের চরু, কখন বর্ষ, কখন ঢোল তৈয়ারী করত। অন্ন শুকিয়ে তত্ত্ব করত।

কখনও 'ছিনে' করে ধরকে চড়াই, কখন ঘরে বেঁধে সুর সিত। এই রকম করে সমাজে বাঁচবার উপায় ও সুখের ব্যবস্থা করে দিত। ধন্য বাজাত ঢোল, কন্যা বাজাত সানাই। মায়ের মঙ্গল আরতিতে গৃহস্থের মঙ্গল শব্দের সঙ্গে ঐ ঢোল ও সানাই সমান বাজত। ঢোল কোন দিন করত না গড়গোল, বরং বিজয়ার দিন গৌরবে কুলে ঢাক হ'ত। সেই ঢাক বাজত শিবের গাজনে—যখন জীব শিব হ'য়ে নৃত্য করত।

কালের প্রভাবে সোনা শুচি হ'ল, সুখের বাঁধন বাড়ল কথাটুকু অতৃষ্টি হ'য়ে মরণ বরণ করলে। হুমখমোচন করত কেহ থাকল না। ছোট লোকের আদর গেল, ধন্য লজ্জার লুক্কো। কুলো, কাঁদার পরে পড়তে লাগল। ভেজাল বাছা দার হ'ল। হুড়ি বাড়ী ছাড়ল। জড়করা জিনিস ছড়িয়ে পড়ল। সুখের নিজস্ব ভেদে গেল। বিপদে লাঠি দুয়ের কথা, একগাছা কাঠিও নিয়ে কেহ বাধা দেয় না। সম্পদ সপাট শরন করলেন, শয্যা পাটে পরিণত হ'ল। সেই পাট বাঁচাতে ছাড়া ছাগল তাড়াবার লোক থাকল না। সানাই, কানাইয়ের বাণী হ'য়ে বিদেশী বঁধুর মন-ভোগাতে গল্লল গাইতে শিখল। গৃহস্থের ঘরে মঙ্গলশব্দের নিনাদের স্থলে ক্রন্দনের রালে আর কলহ-কোনাহলে পূর্ণ হ'য়ে উঠল। মা'র মঙ্গল আরতি বন্ধ হ'ল। পাড়ার পাড়ায় ভোট-মঙ্গলের ভেরীর বাজনা শুরু হ'ল।

ধর্মার সঙ্গে সঙ্গে জয়ঢাক বহুদিন অস্ত্রহিত হ'য়েছে। ঢোলের অনেক রূপান্তর ঘটেছে। অলুগা প্রাণ আগলান যায় না। আগে চামের খোলের মধ্যে তাকে ভরে ধরতে হয়; তারপর তাকে যেমন নাচাবে তেমন নাচবে। বরই প্রাণ, প্রাণই শব্দ, সেই শব্দজগৎ ধর্মার স্বজিত ধর্মার ঢোলের মধ্যে ভরা হ'য়েছিল। কত মরা জীবের আঁত ও আবার গিয়ে ধর্মার পাকে বাঁধা ঐ ঢোলের সৃষ্টি। তরুচূড়ামণি ঢোলে বসে বিচার করে বললেন, মড়ার চামড়া, ওর স্পর্শে সব অতৃষ্টি। শুচিবাহুগ্রস্ত প্রবীণরা 'রাম রাম' বলে শান্ত হ'লেন, যখন না চামড়ার ময় বাজিয়ে কাহাকেও ধান করে কোন দিন শুক হ'তে হয় নাই। সবুজপ্রিয় নবীনরা 'আরে ছ্যা' বলে মা'র ময় শাখনের একমাত্র উপায় সজীব স্বরকে মৃত ও গলিত বলে প্রস্তাধান্য করলে।





বুকে না শব্দরঞ্জের স্পর্শে মৃত ও সজীবিত হয়ে ওঠে, জীবন পেলে সমাই পবিত্র ও সকলের নিকট আদৃত হয়।

শব্দ-একবে এসাদে চোল অমর হ'লেও স্মরণাবে শুকিয়ে উঠল। বহুকাল গড়িয়ে গড়িয়ে পেটও সমান হ'য়ে গেল। তিনি মাদলের রূপ গ্রহণ করলেন। তিনি যে শব্দরঞ্জের পুত্র সে জানও হারালেন। তাঁর কদাকার রূপ ও কুংসিং শব্দে স্মরণাবে সমাজে তাঁর স্থান হ'ল না। মাদল জগলের পথে গড়াচ্ছিল, মাতাল গাঁওতাল মাথায় করে নিয়ে ঘরে গেল। অসং সপ্তে পড়ে মাদল ধরল মদ, শিখল কৌদল।

সভা মাহুয়েরা নিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষণ-দর্শন প্রভৃতি শাখার গৌরব করে। মাদল তাদের অস্বাভাবিক পরিচর পেরে মর্মে মর্মে চটেছিল, কিন্তু অলপ্য ছাড়তে পারেনে নাই। পরের কথায় তালি দিলে ছ'দিন খেতে পাওয়া যায়, বারমাস কেউ খেতে দেবে না। মাদল তা' বুকে ও চ'টেই থাকল। কিন্তু করবার কিছু উপায় নেই। মেড়া লড়ে বোটার জোরে। তার বেথানে বোটা, সেটা সভা সমাজের আঁতাকুড়। সভাদের সহিত সংঘর্ষের সংযোগ হ'ত না। তাই বিধির বশে যে দিন লাগত বাদল, সে দিন তার কুইত বোল। বলত—

ধরতো খেড়ে দেতো ধাতাং

খাচ্ছে দহী বলচে চাটাং

মরতে মৌরা ধরতে কাতাং

ধরতো খেড়ে দেতো ধাতাং ॥

খাঙ্গ-খাঙ্গুদীনা শুনে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ত, আর মদ খেয়ে খুব নাচত।

ছিরে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল। অটলা হেসে কেসে অস্থির হ'য়ে পড়ল।

একদিন দেবর্ষি দারদ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গাঁওতালদের মদ খেয়ে হুড়োহুড়ি করতে দেখে তাঁর দম্বা হ'ল। তিনি বলেন, 'শব্দ বিধে অমৃত পুত্রাং'। ছোটলোক, তারা কিছুই বুঝে না; ভাবলে রাজার দূত এসেছে, এমনি ব্যাগারে বাটাতে ধরে নিয়ে যাবে। পরপর দুখ চাওবাচাওয়ি করে সব সবে পড়ল। একজন ক্রীলোক মাদলকে বলে, 'ওরে, বাঙ্গার দিনে তো খুব লাকা-

লাকি কারদ, যা নারে, এইবার হু'কথা তনিয়ে আর। মাদলা এগিয়ে আসতেই দেবর্ষি তাকে চিন্তে পারলেন, বলেন—ওরে তুমি একার বরপুত্র, চাড়াগ পাড়ায় এসে বাসা নিয়েছ।

মাদলা বলে—কিসের ব্রহ্মা, কিসের পুত্র, আমি ধানড় বেড়ের পুত্র-পুত্র। সরে পড় এখন থেকে ঠাকুর, নইলে গারে এটো বল ছিটিয়ে দেব।

নারদ বলেন—আরে তুই একেবারে অসংপাতে গেছিস যে! মদ খেতে শিখেছিস, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছিস দেখছি।

মাদলা বললে—বাও যাও, ঠাকুর, আর ভদ্রগিরি ফলাতে হ'বে না, তোমাদের তো কেবল বাক্যি; বাগদী, চাড়াগ, ধানড়, ছোটলোক হ'লে হয় কি, ওদের ক্ষম আছে। বাগ, ওদের দরতে এখনও বেঁচে আছি।

নারদ বলেন—বেশ তো বাবা নিজে মাহু হ'লে, ওদের কাছে কৃতজ্ঞতা দেখাবার ও ক্ষমতার কাছে গৌরব করবার অনেক অবদর হ'বে। রামচন্দ্র বানরের সাহায্যে সীতা উদ্ধার করে বানরদের জগতের নিকট মাহু অপেক্ষা গৌরবান্বিত করেছিলেন, বার জন্ম এখনও সভামাহুয়ে হুমানজীর পূজা করে। মাহুয়ের কাছে সাহায্য না পেয়ে তিনি বানরের দলে মিশে বানর হ'ল নি। ভাল চা'স তবে ওখান থেকে বেরিয়ে আর।

মাদল বলে—বেরিয়ে এসে কি হ'বে? আমার বদ চেগারা আর বেজার আওরাছে, সভাসমাজে স্থান হ'বে না।

নারদ বলেন—আমার কথামত যদি কাজ করিস তবে শরীরে বৈকুণ্ঠে স্থান হ'বে। আর যদি দেহান্তর চাগ, তবে নিজের সাধনায় মাহু হ'তে হ'বে, আর, মাহু হ'লেও পুরাতন পরিচর থাকবে না।

মাদল বলে—নাও, আর লগা লগা কথা বলতে হ'বে না, স'রে পড়।

নারদ জুড় হলে মাদলকে এক আছাড় মেরে ঢলে পেলেন। ছিল এক, হ'ল দুই। 'মাদলরূপ হারিয়ে তবলরূপ হ'লেন। আর আধখানা হ'লেন তার প্রেমী বামাকপিনী, নিতমহীনা মূলোদরী ঐবভদ্রা, তাকে কোলে বসিয়ে আদর করলে তবে তাঁর হেড়ে গলার বোল হুটবে। সে বোলও আবার তবলার কোড়ন।







## পঞ্চপুণ

(উপাঙ্গ)

[পূর্বাহ্নসময়]

শ্রীমতী জ্যোৎস্না-বাঁশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাণীজগের এক প্রকাণ্ড রাজপথের উপর একখানা প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বাটীখানির দিকে একবার চাহিলেই সোঁত যে কোন প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির গৃহ তাহা সহজে প্রতিপন্ন হয়। গৃহস্থানী রম্যাকান্ত রায় সত্যই বিপুল বিস্তার অধিকারী। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলেও রোজতপ্ত ধর্ম্মীর উত্তাপ তখন হ্রাস হয় নাই, পশ্চিম গগনে প্রৌঢ় রবির ক্রান্ত মুক্তি হেলিয়া পড়িয়াছে। অপরাহ্নের সমীরণ তখনও মিষ্টতা প্রাপ্ত হয় নাই। রম্যাকান্তের বিশাল ভবন মধ্যাহ্নের বিশ্রাম-শেষে তখন সবে জাগিয়া উঠিতেছিল। বাটার সমুখস্থ পুষ্পলতা-সমাকীর্ণ বিস্তৃত ছাৎগের উপর রক্তকন্দর-মণ্ডিত পাপে একটা প্রকাণ্ড 'রৌপ্য রয়েন্ড কার' কাহারও বাহির-গমন প্রতীক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিতেছে। সোকার অধীনভাবে বার বার ভিতরের দ্বারের দিকে চাহিতেছিল। উদ্ভানরুদ্ধক পুষ্পবৃক্ষে ঞ্জল-সেচনের উত্তোষ করিতেছিল। আতপ্ত অনিল অদ্রব্ধ গদ্যরাজ গাছ হইতে কলিকার মোটা শুষ্ক ফুলের বন্ধ-নিরুদ্ধ বাসি সুবাসটুকু বাহিরে আনিয়া ছড়াইয়া দিতেছিল।

এক দ্বার ও বাতায়নবিশিষ্ট এই বাটার একটা কক্ষমধ্যে সুশীতল মর্দর-নির্মিত গুরুকূটমে 'শাহিতা নীরজার বর তজ্জটুকু বহুক্ষণ ভাসিয়া গিয়াছিল।' আশ্রয়-বিজড়িত বেতে তখনও সে শয়নঘর ত্যাগ করে নাই। সুবহু জটিলিকা প্রায় নীরব। মধ্যে মধ্যে শুধু কণ্ঠনিরত ভূতবর্ষ ও পলিভাটিকাগণের মৃদু কণরব কণেক ক্ষনিত হইয়াই পুনরায় শুকতার সহিত মিলিয়া বাইতেছিল।

বিচক্ষণ পার্শ্ব-পরিবর্তনের পর নীরজা উঠিয়া বসিল। অদূরে টপরের উপর সংরক্ষিত বাটিকার পাচটা শব্দ ধ্রুপিত হইয়া একটা মধুর স্বাক্ষরে গৃহখানি পূর্ণ করিয়া দিল।

আপন মনেই নীরজা, 'পাচটা বাজল' বলিয়া স্বল্প দ্বার উন্মুক্ত করিল। এমন সময় দ্বারস্থিত ধন-ধনের বহনিকা সরাইয়া একজন দাসী কক্ষে প্রবেশ করিয়া মূহুর্তে ভাকিল, 'বৌদিমণি'।

বয়োজ্ঞান দ্বৈশিখা অক্ষকামর গৃহের বন্ধ দীর্ণ করিয়া নিম্ব পটে কনক-রেখার মত হাসিয়া উঠিল। চোখের উপর একটা হাত রাখিয়া উজ্জ্বল আলোক হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া বিরক্তভাবে নীরজা বলিল, 'কি চাই?'

ভিত্তিপ্রান্তসংলগ্ন মর্দর-নির্মিত ত্র্যাক্ষরে উপস্থিত একটা ছোট শিশি তুলিয়া দাসী বলিল, 'আপনার গুরু পাবার সময় হয়েছে।'

'থাক থাক, ও আর ভাল লাগে না, তুই দোরটো বন্ধ করে যা এখন। আঁজ গুলু আর থাও না।'

কুন্তিতভাবে পরিত্যক্তা বলিল, 'না খেঁয়ে কি করবেন বৌদিমণি, অস্থব্ব যখন—'

'তা হোক তুই যা, ও আর ভাল লাগে না।'

কণেক ইতস্ততঃ করিয়া দাসী প্রস্থানের উপক্রম করিল। নীরজা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, 'মা উঠেছেন রে? খোঁকা কি করছে?'

'কৈ মা তো ওঠেন নি এখনও। খোঁকাকে নিয়ে দাদাবাবু গল্প করছিলেন দেখলুম। বাবুও গুলুচ্ছেন।'

'খোঁকা তুই যা।' নীরজা পুনরায় শুইয়া পড়িল।

কক্ষের বাহিরে মৃদু অঙ্গদার শিঞ্জনের সহিত কোমল নারী-স্বর্গের আস্থান আসিল, 'নীরজা'।

নীরজার আনন্দে আনন্দের বেধা দুটিরা উঠিল। এতদে উঠিয়া বলিয়া মূহুর্তে সে বলিল, 'সেজদি!'

হাস্যবিজড়িত আনন্দে শেকানী কক্ষে প্রবেশ করিল।

অঙ্গদার হইয়া তাহার পশ্চিমে গ্রহণ করিয়া নীরজা বলিল, 'এস তাই সেজদি, তুমি যে আসবে এ আমার আশাতীত। আজ একি ভাগ্য স্ত্রপ্রণয় আমার।'

সরেয়ে তাহার কণ্ঠশে একটা মৃদু চপেটাঘাত করিয়া শেকানী বলিল, 'পাম, খুব জ্যোতিষী হ'য়েছে। এখন কেমন আছি'ব বল?'

দাসী কক্ষে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থলে কোমল গালিচা বিস্তৃত করিয়া দিল। তরুণীর হাত ধরিয়া উপবেশন করিয়া দাসীর দিকে চাহিয়া নীরজা বলিল, 'পাখাটা চালিয়ে দিয়ে যা।'

ঐচ্ছান্তিক পাখার বোতাম টিপিয়া দিয়া দাসী প্রস্থান করিল।

তরুণীর দিকে চাহিয়া নীরজা বলিল, 'তারপর সেজদি কি বলছিল? কেমন আছি?'

'হ্যাঁ কেমন আছি, অর কি হয় এখনও?'

'হরু হচ্ছে বৈ কি? রোজই হয়। বেশ আছি তাই।' আকারের সহিত মনিন হাসির রেখা নীরজার ক্রান্ত অংগে বিভাসিত হইল।

বেদনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া শেকানি বলিল, 'স্নাত্য নীরা কি বন্ধ হ'য়ে গেছিল তুই বল দেখি। দেখলে যেন চেনা যায় না। ডাক্তার দেখেছে তো?'

'তার কিছু কট্ট নেই সেজদি।' কিন্তু আমার এ অস্থব্ব ডাক্তারের শক্তির বাইরে। ডাক্তার কি করবে?'

গভীর বেদনা উভয়েরই আনন্দে ছায়া ফেলিল। গাঢ় কণ্ঠে শেকানি বলিল, 'বৃহতে পারছি সবই নীরা, এই বয়সে এতগুলো আঘাত সহ করা তোর পক্ষে যে কত কঠিন তো নিজেই মন দিয়েই বৃষ্টি; কিন্তু ভগবানের বিধান, এর ওপর আর তো বলবার কিছু নেই। এতগুলো শোক কি করে যে তুই সহিষ্ণু ভাবেও অস্থির হ'য়ে পড়ি।'

শরীরও একবারে ভেঙে গেল। 'কি করে যে সারবে?'

'সারে সক্ষম, না সারে ভাতও গ্রহণ নাই সেজদি। এই বয়সেই এই আরও বেশীদিন যদি বাঁচে হ'লে

আরও হয় তো কত কষ্ট সহ্য করতে হ'বে। তার চেয়ে বত শীঘ্র বাঙালি যার তাই কি ভাল নয়? তাই মনে করি সে

ওটার চেয়ে এখন যদি মরি তাই ভাল।'

একটা দীর্ঘশ্বাস-বন্ধ মধ্যস্থে নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যথিত কণ্ঠে শেকানি বলিল, 'কি বলিস তোরার তার ঠিক নেই।'

অন্তরবিরহান হাসির মতই একটু হাসিয়া নীরজা বলিল, 'জ্ঞান কিছু বলি নি সেজদি। আমার পক্ষে এখন মরলে কোন দিক দিয়ে কোন কড়িই তো আমার নেই। ছোট ছেলে-মেয়ে নেই যে তাদের কষ্ট হ'বে। মা-বাবা নেই যে কেউ চোখের ঞ্জল ফেলেবে।'

'তুই হাসালি নিরু, মা-বাবা ভিন্ন কেউ কি মরলে আর কাঁদে না? তোর স্বামী রয়েছে, ছেলে—'

'তুমি পাম সেজদি, জী মরলে স্বামীর যা কষ্ট হয় সে আমি বেশ জানি। একবার মরলে হয়, তারপর ভিতর

আগুন নিবতে না নিবতে স্বামীর বিয়ের বাঁজনা আমার বেছে ওঠে। আমার মনে হয় 'প্রত্যেক স্বামীরই উন্মূহ হ'য়ে থাকে করে স্বী মরবে, সে আমার বিয়ে করে। নতুন একটা বো আনবে। যে স্বামীর দুর্ভাগ্যক্রমে স্বী না মরে সে যেন মনে মনে অস্থির হ'য়ে ওঠে।—এমনই বাঙ্গালী পুরুষদের মনোভাব—'

শেকানি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল, 'যা কি পাগলামি করিস নীরা, তাই না কি সবাই মনে করে।'

সবাই করে কি না তা অবশু আমি জানি না সেজদি, তবে যেমন দেখতে পাই স্বী মরতে না মরতে অমন স্বামী আবার বর সাংকে, ভাতে তো আমার তাই মনে হয় যে পুরুষের চায় বো মরুক আমার বিয়ে করি, জীবনে একটু নুতনও আনুক।'

শেকানি হসিয়া উঠিল। একটু চোখের সহিতই নীরজা বলিল, 'তাই মনে হয় জীরা যেমনি অস্থব্ব হয় স্বামী অমনি আশাবিত হ'য়ে উঠে। এইবার হয় তো ভগবান মনে হ'য়েছে। তারপর যদি সে-যাভা সে বেচারীর ইলোলা শেষ না হ'ল, তা হ'লেই স্বামীর মনে মনে পুরুষের সীমা থাকে না। মনে মনে বলে একটা সুযোগ হারানাম।'



‘বা বা ভূই আর পাগলের মত বক্সি নি; সে যে মনে করে সে মনে করে বিজন তো আর সে রকম মনে করে না, তবে আর তোর কি? ভূই এখন শাগণীর সেরে ওঠ।’

‘না সেজদি তিনি যে আমার মুচু-কামনা ক’রেন না এটা নিশ্চয়। তবে যদিই আমি মরি তা হ’লেও তাঁর পক্ষে এমনই বা কতি কি? এটা অবশ্য আমিই বলছি।’  
‘তোতা বুঝেই পাওছি। ভূই কি ভাবিস পুরুষরা সত্যিই এমন নিষ্ঠুর ছদ্মহীন—তা নয় রে।’

‘অমিকান্দেই তাই সেজদি, ছদ্ম বলে কোন বস্তু পুরুষদের মধ্যে অজই আছে। স্বামী স্ত্রীকে কখন প্রকৃত ভালবাসে জান, যখন তার বয়স বাড়েই যের পড়ে; অর্থাৎ যখন বৌ মরলে কেউ আর মেয়ে দেবে না, আর স্ত্রী বিনা তার সে রকম সেবারত্বও কেউ করতে পারেন না, সেই সময় তার স্ত্রীর উপর সত্য একটু টান আসে, তখন স্ত্রী মরলেই তার সত্যিই বোনের খবর হয়, নহে তেই স্ত্রী মরে আর বাস্তব মনটা আনন্দে আঁধার হয়ে উঠে, এইবার নতুন একটা বৌ পাওয়া যাবে। অনেকে আবার লোক-দেখান কাগাকাটা করে, সেই ভণ্ডগলা হচ্ছে আরও বেশী নীচ, যুগে স্ত্রীর মজা সে কি হাহতাশ তার অর্শচায়া হ’তে তার মা না অমনি একটা বৌ আনা হ’ল। এমন ছদ্মহীন পুরুষগণ্ডার মধ্যে কি করে তার দারগা হ’তে পারে বল দেখি? আজি তুমি দেখাও আমার ক’টা পুরুষ স্ত্রী-বিরোধের পর বিয়ে না করে শুধু স্ত্রীর হুঁতি মগল করে ভালভাবে থেকে দিন কাটাচ্ছে। এরকম লোক দেখতে পাবে না। এ জাতের মধ্যে অতটা ছদ্মের পরিচয় পাওয়া দুশ্চল।’

‘তা হ’লে তোর মনে পুরুষ মারেই ছদ্মহীন?’

‘অমিকান্দেই তাই’ সেজদি। ছদ্ম থাকলে কখনও যে লোককে নিয়ে একসঙ্গে পাঁচ দশ এমন কি কুড়ি বৎসর পর্যন্ত দিন কাটিয়েছে সেই লোক গুণিকি ছেড়ে যেতে না যেতে কেমন করে তারা তার স্থানে অস্ত্রকে এনে প্রতিষ্ঠিত করে? আমার স্ত্রী মরবার সঙ্গেই বিয়ে করবার মজা তার সপক্ষে কত গুণিকি দেয়; যার ছেলে মরে নেই, সে বলবে বাপ-দরকার কত বিয়ে করা দরকার, যার সন্তান আছে সে বলবে পাকি কি বিয়ে না করলে চলে না ছেলে-মেয়েগণ্ডার, কষ্ট হচ্ছে বড়, নইলে এ বয়সে বিয়ে কি আর সে করে? তখন

শুধু ছেলে-মেয়ের জুই বিয়ে করছেন। নতুন স্ত্রী এসে ছেলে-মেয়েকে তো কতই দেখবে? মা-সারা অভ্যাগদের দুখ ও হুবিধা তাতে আরও বেড়ে ওঠে। তারপর প্রথম স্ত্রী হয় তো স্বামীর কাছে কখন মিষ্ট কথাটা পর্যন্ত শোনে নি, বেচারীর ভাষে ছিল কেবল স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত লাঞ্ছনা আর পীড়ন; কিন্তু বিতায় পক্ষের বা তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী অপমান বা লাঞ্ছনা করলেও নীরবে সহ করেন। বেচারী প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ভাষে হয় তো কখনও একখানা ভাল কথাপড়ও শোনে নি আর বিতায় পক্ষের স্ত্রীর মজা বাড়ী বীধা দিয়ে গরনা তৈরী হয়।’

‘ভূই তা হ’লে বলতে চাষ পুরুষরা স্ত্রীকে ভালবাসে না; কিন্তু স্ত্রীর মজা তারা বাপ-মা-ভাই-বোকেও পর করে দেয়, তাদের সঙ্গে পৃথক হয়ে যার সে তো শুধু স্ত্রীর জুই, এতইই দেব পুরুষদের মন কত নীচ, কত সৎকারী। স্ত্রীর পারমাশ্রিত্যই অতি আত্মীয়কে পর ভাবতে শেখে।’

‘সত্যি কিন্তু সেটা স্ত্রীকে বেশী ভালবাসে বলই নয় ওটা তাদের নীচ মনের পরিচয় মাত্র। বাদের প্রকৃত প্রাণ বলে তিনিদ আছে তারা কারোর উপরই অস্ত্রায় করতে পারেন না। বাপ-মা, ভাই-বোন বাদের চেয়ে বেশী আপন কেউ নাই, স্ত্রীর কথাই অমনি তাদের বিশ্বাস্যে বেধে, এর চেয়ে হীনতা আর কি হ’তে পারে? বড় ভাই যথাসম্ভব খরচ করে পালন করে কত ছোট ভাইটিকে মায়ায় করলে, বিয়ে দিলে, বৌটা ঘরে এল ভাই অমনি পথ বেধলে। বড় ভাই মরুক আর ঠিকের কদক তাতে তার কি যেতো, তখন নিজেই কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। এমনি বাদের ব্যবহার এমনি বাদের মন তারা যে একটা স্ত্রী মরতে না মরতে আবার বিয়ে করবার স্বযোগ এসেছে বলে উৎসাহ হ’য়ে উঠে এতে আর বিচিরা কি।’

শেকালি সময়েই ভগিনীর পুটে একটা করাঘাত করিয়া বলিল, ‘আচ্ছা ভাই তাই না হয় স্বীকার করে নিচ্ছি পুরুষরা অতি ছদ্মহীন, অতি পায়ও তা হ’লেই হ’ল তো। মেয়েরা তো খুব ভাল।’

নীরদ্বাও হাসিল, ‘না সেজদি মেয়েরা যে ভাল তা আমি বলছি না, আজগাব্য দিন দিন মেয়েদের বা ভাব গতক

অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খলতা—সেচ্ছাচার—হচ্ছে তাদের কাম্য। একাধ-বর্তী সংসারে স্বামীর পরিজনদের মধ্যে থেকে সেটা পাওয়া ছুর বলেই এখনকার মেয়েরা বিয়ে হ’তে না হ’তে স্বামীকে তার আত্মীয়ের কাছ থেকে পৃথক করে নেয় এরকম তো প্রায়ই দেখছি। দেশ আমাদের ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলেছে কি না তাই দেশের নয়-নারীর মনের অবস্থা এই রকম হচ্ছে। তাই আমাদের দেশে একাধবর্তী সংসার বিরল হয়ে আসছে। বাঙ্গালী স্বামী-স্ত্রীর বিবাহচ্ছেদের মর্কদমা কোটে উঠেছে। ভদ্র কুমারীরা ‘ফ্রি লভ’ চালাচ্ছে আর কিছু কন্যেচাঁও—তারপর সাহিত্য-ক্ষেত্রে—

বাধা দিয়া সম্রাসে শেকালী বলিল, ‘রকে কর নীরা থাম ভাই ভূই, সেই থেকে কেবল যত বাজে কথা বলে চলেছি এ পর্যন্ত একটা দরকারী কথা আমি বলতে পারছি না।’

নীরদ্বাও অপ্রতিভভাবে হাসিল, ‘সত্যি ভাই সেজদি, আমার অভায় হয়েছে। কতদিন পর তুমি এসে কোথায় তোমার আদর-বড় করব’ তা কি সব বকে চলেছি। এই সব কথা উঠলে আমি বড় উত্তেজিত হ’য়ে পড়ি। আজ-কাল সব বা বাপার দেখি চারিদিকে তাতে সত্যিই বেনে একটা ঘুণা লগ্নে রয়েছে এদের উপর। দিন দিন এসে হীন হ’য়ে পড়ছে এই আমাদের দেশটা। স্ত্রী-পুরুষ সব সমান—এরা যেমন হীন তেমনই স্বার্থপর, তেমনই অকৃতজ্ঞ। বৌয়ের নীচতা এদের মধ্যে কি বারং বার ‘আগে শাড়ীরা’ বৌয়ের উপর আত্যাচার করতো তারা, নীরবে নিজেদের প্রাণ্য মনে করে সেটা সহ্য করত। আর এখন নতুন বৌ বাড়ীতে পা দিয়েই তারা এতটুকু অস্ববিধা যোক দেখি, তখনই সে তার প্রতিবাদ করবে, ক্রোর করে বলবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। নিজের স্ব-স্ববিধার এতটুকু কষ্টী তারা সহ্য করতে পারে না আর স্বামীর পরিজনবর্গকে তারা চুষকের বিষ দেখে।’

‘সেটা কি জানিস আগে আমাদের দেশের মেয়েরা স্ত্রান উন্মোচের সঙ্গে জান বাপ মা যার হাতে মর্মে দেবে সেই তার একমাত্র উপায়া ইষ্ট দেবতা। তার কোনও দোষ সে দেখতে না—বিয়ে হওয়া পর্যন্ত আত্মীয় বৈবতা-জ্ঞানেই সে স্বামীর অর্জনা করে বেত। তারপর বিধা স্বামী

বা যন্তর বাড়ীর লোক অত্যাচারী হ’ও সেটাও সে সহ্যে পারত ওইটুকুর জল, স্বামী দেবতা যে, তিনি বা তার পরিজনবর্গ বা করেন তার প্রতিবাদী করা চলে না। এটা ভাল কি মন্দ সে আলোচনা আমি করতে চাই না। তবে তাতে যে সাংসারিক অসাহিত্য এখনকার মত বেশী হ’ত না এটা ঠিক।’

‘ঠিক বলেছ সেজদি। হয় তো তখনকার দিনে বৌদের কারো কারো অসুখে কিছু লাঞ্ছনা কিছু কষ্টপ্রেম হোত, কিন্তু তা হ’লে এখনকার দিনের মত সারা সংসারটা ছার খার যেত না। এই দেখ কটা ভাই একসঙ্গে দেখ আছে গার থেকে বৌরা এমন আঙুন জাগিয়ে দিলে কোথায় থাকি বলিল তার ঠিক নাই। সংসারটা উছন্ন পেল—এখনকার মেয়েরা স্বামীকে ভাবে তার খেলার সঙ্গী—ভোগের বস্ত্র। তার স্ব-স্ববিধা বোগাবার উপাদান। আর স্বামী ভাবেন স্ত্রী তার ইষ্টদেবী—বর্জ, অর্থ, মোক-সব। আর তাও বগিহ সেটা যে হয় সে শুধু একটা মোহের জল, স্ত্রীকে প্রকৃত ভালবাসে যে টা রকম ভাবটা দেখায় তা নয়। তাই বা বলে সেটা তার বৈবত্যা। বাপ-মা-ভাই-বোন সব পর। একমাত্র উপায়া স্ত্রী। আর স্ত্রীর হচ্ছে তার স্বজনরা। এই যে জ্ঞা সে মরুক। আবার দেখ বিতায় স্ত্রীর আরাধন তার চেয়েও অনেক বেশী। এমনি লগ্নেচোটা হীনমনা এই পুরুষরা।’

‘ভূই সকলের মনের খবর রাখিস কি না? কিন্তু থাক এসব কথা আর আমার সময় নাই তোকে আমি নিতে এসেছি নীরা ভূই চল ভাই।’

‘আমার নিতে এসেছ, কেন বল তো?’

‘দরকার না থাকলে কি এই নৌয়ে এসেছি ভাই, দরকার খুবই আছে। ভূই যদি তো তার শান্ত্তীর কোন আপত্তি হ’বে না তো?’

‘না সেজদি তিনি কোন কিছুই আপত্তি করেন না, কিন্তু আজই যেতে হ’বে কেন বল তো, তুমি কতদিন পর এসে। ভূমিই আজ এখানে থাক।’

যন্তভাবে শেকালী বলিল, ‘না ভাই তোকে একবার যেতেই হ’বে, বড় দরকার, ভূই তৈরী হ’য়ে নে।’

‘নিভাতই যেতে হ’বে লীড়াই তবে মাকে বলে আসি। বলে আর আসতে হ’বে না মা আসছেন।’



সহায়ত্বে স্বরাসী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শেকারী উঠিয়া তাহার পদগুণি গ্রহণ করিতে করিতে বলিল, 'ভাল লাগেনে তো মা।'

গাশিরার একাংশে 'বসিয়া পড়িয়া' স্বরাসী বলিলেন, 'এতদিন মা'র কথা মনে পড়েছে তোমার। একদিনও তো এস না শেকা। বোমার এত অস্থখ থাকে তাও তো কৈ দেখতে এস না। আমি প্রায়ই তোমাদের কথা বলি।' অপ্রতিভ নতমুখে শেকারী বলিল, 'কি করব মা সময় পাই না একটুও, জানেনে তো আমাদের কত বড় সমস্যা, চাকর-দাসীও তো বেশী নাই, সব কাজই নিজেদের করতে নাই।' তার মধ্যে থেকে অবসর করে নেওয়া বড় কঠিন। আসন সব সময়েই মনে করি হ'য়ে ওঠে না, নীরার অস্থখ তো সারো নি দেখছি মা, ভাক্তার কি বলে।'

বধুর অস্থখের কথা স্বরাসীর মুখে বেদনার ছায়া পড়িল। চিন্তিতভাবে তিনি বলিলেন, 'ভাক্তার বেশী ভদ্রতা কেন না মা, তিনি বলেন মনের কষ্টই রোগের উৎপত্তি, মন না ভাল হ'লে শরীর সারবে না, কিন্তু মন ভাল করা সে যে আমাদের অসাধ্য এ ভগবানের দেওয়া বাখার প্রতীকার করি কি করে।'

স্বরাসীর চোখের পাতা ভিজিয়া ভারী হয়্যা আসিল। নীরজা উদাস-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে অগুণাণী রবিরশ্মির দিকে চাহিয়া রহিল। গাঢ়কণ্ঠে স্বরাসী বলিলেন, 'তোমাদের মা থাকলেও দিন কত তাঁর কাছে গিয়ে একটু স্থখ হ'য়ে আসতে পার তো, মার কাছে গেলে সন্তানের সমস্ত ব্যথাই একটু কমে যায়। জগতে মার মত এমন পবিত্র বাথলেশ্বরী হাঙ্গিন্দেহ তো আর কেউ সিতে পারবে না, বড় বেশী পোষে মার কাছে গেলেও মনে শান্তি আসবে; যার মা তারে তাকে কিছু না থাকিলে অনেক আছে, যার মা নেই তার কেউ নেই।' এই আমি তো এক রকম বুজাই হ'য়েছি তবুও মার কথা মনে উঠলে আশ্রয়-মনটা হাফাকারে ভরে ওঠে। তোমাদের দুর্ভাগ্য তাই এত অল্প-বয়সে মা হারিয়েছে।'

সিকনের মধ্যে গাঢ়কণ্ঠে শেকারী বলিল, 'সে কথা একশ বার সত্য। মা কথাটা মনে করলেও মনটা শান্তিতে ভরে আসে। সত্যের যত দুঃখ-বেদনা পাই মার কাছে গেলে

সেটা ভুলে যেইম। আর এখন—' অশ্রু-প্রবাহে তাহার কণ্ঠ কঁক হইয়া আসিল।

সাম্বার স্বরে স্বরাসী বলিলেন, 'থাক মা ওসব কথা মনে না করাই ভাল। যে কতি কখন পুণ্য হয় না সেটা ভুলে যাওয়াই উচিত। ওকথা থাক আর হঠাৎ কি মনে করে শেকা। বোমাকে নিয়ে বাখার জন্য বোধ হয় কেমন তাই নর কি?'

অশ্রুশ্রিত অকিপ্রান্ত মুহুরী অল্প হাসিয়া শেকারী বলিল, 'কেন মা কোন কারণ না থাকলে কি আসতে নাই।'

সম্মুখের তথ্যসাধারণটা শেকারীর দিকে সরাইয়া গিয়া স্বরাসীও হাসিমুখে বলিলেন, 'এস না তো মা, তাই বলছি। সত্যি কি না বল দেখি তুমি।'

সহায়ত্বে শেকারী বলিল, 'হ্যাঁ তাই। নীরাকে আজ আমার সঙ্গে যেতে দিন মা।'

'তা বেশ তো যাক না বোমা। আমি তো বলিই একটু বেড়াবার জ্ঞ। তা বোমা কিছুতে কোথায় যেতে চান না। কি যে করব' ওকে নিয়ে—সামার বড় দুর্ভাবনা হ'য়েছে। মনটা একে ওর ভাল নেই।'

নীরজা ধীরপদে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

স্বরাসী তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বিমর্ষ-ভাবে বলিলেন, 'শরীর ওর ক্রমশাই ধারাপ হ'য়ে পড়ছে, সব সময়েই বোমা যেন কি রকম গভীর হ'য়ে থাকে। হাসে অতি অল্পই। কথাও খুব বেশী বলে না। কান্নাকাটি করা যে তাও নয়। সেইটাই যে আরও ধারাপ। চোখের জল ফেললে মনের ভারটা অনেক হাল্কা হ'য়ে যায়; কিন্তু তাও করে না কি রকম যেন শুষ্ক গভীর হ'য়েই থাকে। কখনও হয় তো কোন কিছুর আলোচনায় হ'চরটে কথা বলে তারপর আবার চুপ চাপ বলে থাকেন। এবার ছোট খুকীটা মারা যাওয়ার পর থেকেই এমনই হয়েছিল।'

চিন্তিতভাবে শেকারী বলিল, 'তাই তো এরকম হ'লে বাচবেই বা কদিন।'

'তাই' ভাবছি তো কি করব।' স্বরাসী আরও কি বলিতে বাইতেছিলেন। নীরজাকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি নীরব হইলেন।

একখানি সাধারণ লাল পাড় শাড়ী পরিয়া নীরজা আসিয়া দাঁড়াইল। একবার তাহার দিকে চাহিয়া স্বরাসী বলিলেন, 'এ আবার কি একটা পরণে বোমা। শেকারী তোমার নিতে এসেছে যে। একটু নীলগৌর ক'রে কাপড় জামা পরে বাও ওর সঙ্গে ঘুরে এস একটু।'

আপনার পরিবেশনার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া নীরজা বলিল, 'এই তো কাপড় ছেড়ে এলুম মা। চল সেজদি।'

'এই পরে যাবে। না না ও কাপড় ছেড়ে এস।'

'না মা আমার আর অত সারজে ভাল লাগে না, সুন্দা-সিবেভাবে থাকতেই ভাল লাগে। বাইরের আড়ম্বরটা যত কমান বার ততই ভাল। এখনকার মেয়েদের মত বেশভূষা নিজেই তরুণ হ'য়ে থাকতে আর ভাল লাগে না। ঘরে ভাত থাক আর না থাক বাইরের সম্ভার আড়ম্বরটা ঠিক আছে। ভিতরের ধর তো ভাঙে মা ভাবনা।'

স্বরাসী হাসিয়া বলিলেন, 'কিছু তোমার ঘরে ভাতের অভাব নেই মা তুমি কি দুঃখে ভাল কাপড়-জামা পরবে না।'

'দেখে দেখে যুগা জমে গেছে মা, তাই পরতে ইচ্ছা হয় না। ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীর জীরও সাজ দেবে মনে হ'য়ে কোন মহারাবী এসে দাঁড়িয়েছেন। ওদিকে ঘরে হয় তো বুড়ো শাওকী ছেড়া নেকড়া পরে লজ্জা নিবারণ করছেন, কাবলীওলালা দেবার দায়ে ঘাটবাটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্বামী-বেচারী বেতে পাচ্ছে না, রোগে ছেলেদের ওষু-পথ্য জুটছে না, কিন্তু স্ত্রীর একখানি গয়নার হাত দেবার অধিকার নেই। তাঁর অন্তরটা গোঁয়ার অন্তর গোঁড়া পাচ্ছে। এই সব দেখে আর বেশ-ভূষা করতে ইচ্ছা করে না। চল সেজদি।'

স্বরাসী বলিলেন, 'পাগলী মার আমার কেবল ঐ সব কথা। তা বেশ বাছা তুমি সাজসজ্জা কিছু কর' না। এমনই মার আমার রূপে ঘর আলো, সাম্ভার সজ্জারও হয় না। সঘরেই তিনি বধুর চিবুকে হস্তার্পণ করিলেন।

নত হওয়া শরীর পদযুগল লইয়া নীরজা বলিল, 'তা হ'লে আসি মা।' 'এস মা। হ্যাঁ বোমা গৌতম যাবে না?'

আপত্তির স্বরে নীরজা বলিল, 'না না যে লক্ষ্মী নাতিটা আপনার। ও থাক।'

বিরক্তভাবে শেকারী বলিল, 'ও আবার কি কথা, ছেলে-ছন্ত বলে-স্তাকে নিয়ে যাবি না আর এতো পুত্রের বাড়ী নয়, কৈ সে নিয়ে চল তাকে।'

'তা হ'লে তাকেই নিয়ে যাও আমি থাকি।'

'কি জানি বাবু সবই তোমের অনাস্থি। মেন-সাহেবী—ছেলে নিয়ে কোথাও যাবে না। চল তবে।'

স্বরাসীকে প্রশাম করিয়া ভগিনীদেহ শেকারী কক্ষ ত্যাগ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীরজার সহিত শেকারী যখন আপন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যার মর্ম্মি ছায়া ধরণীর উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম আকাশের এক প্রান্তে তৃতীয়ার ক্রীম শশাক শিখ হাসির মত ছুটিয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার ভিত্তিতে ভরে করিয়া তাহার কীপ জ্যোতিঃ অস্পষ্টভাবে বিধ পূর্ণ করিয়াছে।

একখানা ছোট কার্পেট বিছাইয়া ভগিনীকে বসাইয়া শেকারী বলিল, 'একটু একা থাক ভাই নীরা আসছি আমি।' 'কিছু আমায় হঠাৎ নিয়ে এসে কেন তা? তো বলো না সেজদি।'

'বলছি রে বলছি, এত ব্যস্ত কেন? বস একটু কথা-বাড়ী বল; তোর জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করবি না?'

'নিশ্চয়, কোথায় তিনি ভাক্স না তাঁকে।'

'তাঁকেই খবর দিতে বাচ্ছি, তুই এসেছিস জানতে পারেনে নি এখনও, তাই আপনেন নি; নইলে এখনিই আসতেন।'

সুস্থভাবে নীরজা বলিল, 'আসতেন বৈ কি একটা বারও তো আমার বাড়ীতে যেতে পারেন না। এত আমার অস্থখ, যাচ্ছে তাও তো গিয়ে দেখে আসেন না মরেছি কি? বৈতে আছি।'

'সময় পান না বলেই যেতে পারেন না তাই নয় তো এমন একটা দিন যার না রে তোর কথা না বলেন, 'তা হ'লে আসি মা।' 'এস মা। হ্যাঁ বোমা গৌতম যাবে না?'

'নীরা কখন এলে? খবর ভাল?'



স্বাস্থ্য কক্ষে প্রবেশ করিল। নীরজা উঠিয়া তাহাকে প্রণাম করিবার উপক্রম করিতেই স্ত্রীস্বাস্য কয় পদ সরিয়া গিয়া সে বলিল, 'না তোমরা দেখছি দেখা স্বাস্থ্য করার পথ পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিতে চাও। ওরূপ করে পায়ের তলার এনে পড়লে তো দেখছি আমার স্থান ত্যাগ করত হয়।'

উঠিয়া হাসিমুখে নীরজা বলিল, 'বা রে প্রণাম করাটা কি সোপানের।'

'পায়ের তলার মাথা লুটান আধুনিক সভ্যতা-বিরুদ্ধ, বড় কোর হাত ছুঁতো জোড় করে কপালে তুলতে। তার বেশী নয়, বাক বস তুমি।' কেমন আছ নীরা।'

একটা চেয়ার টানিয়া স্বাস্থ্য বলিল। নীরজাও কার্পেট ছাড়িয়া ভূমিতলেই বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'ভাগ্যে আজ আপনার বাড়ী এসেছিলাম জামাইবাবু তাঁই কেমন আছি সে সংবাদটা জানবার আগ্রহ হ'ল আপনার, নইলে তো এ গরিবের কথা মনেও পড়ে না। হুগেও কোন দিন তো একবার আমাদের বাড়ীতে পা দেন না আপনি।'

হাসিয়া স্বাস্থ্য বলিল, 'হাঁ সে দোষ তুমি দিতে পার, কিন্তু সত্যি কথা যদি শুনেচো চাও সে দোষ তোমার ঐ বিস্মিত।'

'ভাই কি সেজদি?' জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে নীরজা জ্যোতার দিকে চাছিল।

সুভদ্রা কোণ-কটাঁকে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া শেকালী বলিল, 'দেখ নিশ্চয় কথাগুলো বলা' না। আমি তোমার যেতে বাধা করি।'

'ক'র না, যেতে চাইলেই তো তুমি বল বড়-লোকদের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা গরীবের পক্ষে শোভন নয়, তাতে তার আশ-সম্বন্ধের লাফাই হয়। বল না কি তুমি?'

স্বামীর অকপট সত্য-ভাষণের উপযুক্ত প্রতিবাদে শেকালী সম্মত কিছু হুঁজিয়া নী পাইয়া আনতমুখে রহিল।

নীরজা ব্যথাহত দৃষ্টিতে ভগিনীর দিকে চাছিল।

স্বাস্থ্য পুনরায় বলিল, 'ভিনি কি বলেন জান নীরজা? বলেন, আমার বা বৈধব্য তোমার বাড়ীর চাকরদের কাপড়ও তার চেয়ে ভাল। আমার তারা অবজার

চোখেই দেখবে। তারপর বিছান যখন বেশী আসে না, তখন আমারও বেশী যাওয়া ভাল নয়।'

সুভদ্রা-কণ্ঠে নীরজা বলিল, 'আমার-এতটা পর ভাবতে পারলে সেহরি? বিয়ে হ'য়ে গেলে কি ভাই-বোনের মধ্যে এতটা ব্যবধান আসে—এতদূর বিচার করে তখন চলেতে হয়!'

ধীরকণ্ঠে শেকালী বলিল, 'এইটাই জগতের নিয়ম, ব্যবধান একটি আসবেই। তা বলে দেহ অবশ্য হ্রাস হয় না। তারপর গরীব-বড়মাহুষ বেশী ঘনিষ্ঠতা সত্যি শুভকরক নয়, তাদের সম্বন্ধ যতই নিকট হ'ক না কেন দরিদ্রকে ধনী একটু রূপার চোখে দেখবেই। সেইজন্য দূরে থাকাই সব কি দিয়ে ভাল।'

'ওঃ তাই তোমাকে কেউ আমার বাড়ী যাও না; তোমাদের কাছ থেকে এত দূরে যে আমি চলে গেছি তা জাননতুম না' বলিয়া সুভদ্রাও নীরজা অভ্যর্থিত চাছিল।

তাহার স্বকণ্ঠে উপর একটা হাত রাখিয়া দেহ সরসকণ্ঠে শেকালী বলিল, 'কেন অনর্থক মন খারাপ করছিস নীল, আজার কিছু আমি বলি নি ভেবে দেখ। দরিদ্র যদি ধনীর সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করত যার সোটা ভোবাচোদের রূপান্তর হ'য়ে দাড়ায়। আর ধনীভাবে নিশ্চয় কিছু মতলব আছে, গরীব-বড়মাহুষে এ পার্থক্য বাধার নয়।'

একটা সুস্থ রীতি-বাস ত্যাগ করিয়া নীরজা বলিল, 'সংস্কার ভাই-বোনদের মধ্যেও যে এতটা বিবেচনা করে চলা হয়, এটা আমার তুমি জানিয়ে দিলে সেজদি, আমি জানতুম না। তোমরা কেউ যাও না দেখে দুঃখ হ'ত—অভিমান হ'ত, আমি জানি নি তখনও যে বড়-মাহুষের বড় হওয়ার অপরাধে তোমরা আমার ত্যাগ করছে, আজ সেটা জেনে গেলাম।'

বিরক্তভাবে একবার স্বামীর দিকে চাছিল শেকালী বলিল, 'কি ছেলোমাহুঁরী করিস নীরা, তোকে আমার ত্যাগ করেছি?'

'তাগ করা ভিন্ন একে কি বসা বার বল তুমি। আমি বড়-মাহুষ বলে তোমরা যখন এত দূরে থাকতে চাও, তাকে পরিচয় ভিন্ন আর কি বলা।' শেষ আমিও

এবার হ'তে দূরেই থাকব। তোমাদেরও আর যেতে বলব না।'

বিরক্তভাবে স্বাস্থ্য বলিল, 'দেখ নীরজা রাণী, তুমি একটা আত্ম পাগল। তোমার ঐ সেজদির মন্তব্য শুনে মন খারাপ করছ। ওকে তো আমি মাহুষ শ্রেণী থেকে বাদই দিয়ে রেখেছি। ওর কথায় মন খারাপ করতে হ'লে আমার এতদিন 'লোটা-কলম সলম ক'রে' বেয়িয়ে পড়তে হ'ত। ওর মত অত জিহা-বিবেচনা করে চলতে হ'লে সমস্যা ছেড়ে বাইরে থাকতে হয়। ওর কথা বাদ দাও।'

নীরজার মেঘাচ্ছন্ন মলিন মুখশ্রীর উপর দিয়া রবিশ্রব্দ লেবার মত হাতদীপ্তি বারেক ছুটিয়া উঠিল। দুই উন্নত চক্ষুর দিকে বলিল, 'বাই বসুন ওরই স্বপ্নামিত আপন চরিত্র না। বল তো ওর নিষেধ-অগ্রাহ্য করে একদিনও আমার ওখানে যেতে পারতেন। এক জায়গায় এই কলকাতার মধ্যে সব কটা ভাই-বোনই আছি, কিন্তু কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বছরে একদিনও হয় কি না সম্ভব; নিজে যখন বার বাড়ী যাব তখন দেখা হ'বে, নয় তো কেউ আসে না, আমার একমাত্র অপরাধ আমার বড়-মাহুষের বাড়ী নিয়ে হয়েছে, এই জন্ম যদি নিজের ভাই-বোনের মধ্যেও এত পার্থক্য আসে, তা হ'লে এ ঐশ্বর্য্য আমার থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।' ব্যাকার সঙ্গেই কয় বিন্দু অশ্রু নীরজার কপালে বহিয়া ঘরিয়া পড়িল। হাসির মধ্য দিয়া বাহার আরম্ভ হইয়াছিল তারপর অল্প পরিশ্রুতিতে শেকালী ও স্বাস্থ্য উভয়েই ব্যস্ত ভবিষ্যৎ হইয়া পড়িল।

সময়ে অল্পকালে বাহ-বেঠেনে জড়াইয়া ধরিয়া শেকালী বলিল, 'কি বলছি তুই নীরা। সাধারণতঃ ধনী-দরিদ্রে ঘনিষ্ঠতার যা পরিমাণ হ'য়ে থাকে তাই আমি বলুম এতে তুই কেন ব্যথা পাচ্ছিস—তোকে আমরা পর করেছি এও কি সম্ভব?'

অশ্রু হইয়া অভিমান ক্ষুব্ধকণ্ঠে নীরজা বলিল, 'বাই বল সেজদি তোমাদের মনের ভাব এখন বেশ বুঝছি, কিন্তু থাক এখন ওসব আলোচনা, আমাদের হঠাৎ নিয়ে এলে কেন কি দরকার আছে বল? আমাদের আর যেতে হ'বে।'

হাসিয়া স্বাস্থ্য বলিল, 'এই দেখ নীরজামনি, তোমার রাগ হ'য়েছে নইলে এখন যেতে চাইছ কেন, এই তো সমঝোতা এসেছে।'

গভীরভাবে নীরজা বলিল, 'না, জামাইবাবু আমি বেশী দেবী করতে পারব না কাজ আছে।'

শেকালী হাসিয়া বলিল, 'খাম, খাম কত কাজ তা আমি জানি, নডেল পড়া, যা গরু করা এইতো কাজ—এর জন্য এত ব্যস্ত হ'য়ে খাবার কোনও দরকার নেই।'

আরক্তমুখে নীরজা বলিল, 'বা রে আমার বুনি নডেল পড়া ছাড়া আর কিছু কাজ নেই—আমাদের তোমরা কি ভাব বল তো।' রাগ ক'র না সেজদি, তোমার আশ্রি বলছি না কিন্তু আমিও দেখছি বড়-মাহুষের উপর গরীবদের কোন একটা ঘ্রন বিজ্ঞাতীর আকোশ থাকে। তাদের সব জ্ঞান, সব বোম, সব খারাপ।'

সম্বন্ধকণ্ঠে শেকালী বলিল, 'ওটা জগতের নিয়ম নীরা, একজন তার সম-অবস্থার লোক ছাড়া আর কাউকেও ছুঁতেও দেখতে পারে না। ধনীরা দরিদ্রকে ঘৃণা-তাক্ষিয়া করে। দরিদ্রেরা যখন অজ উপায় নেই তখন সে দূর হ'তে তাদের উপর একটা জাতকোষ অন্তরে পোষণ করে, প্রতিযোগিতা নিতে চায় এটা উভয়েই পক্ষে বাস্তবিক, কাজেই তাতে কারো রাগ করা উচিত নয়।' বস আপন আপন মনোভাব গোপন রাখতে দূরে থাকা ভাল।'

'দেখ তো ভাই সেজদি তুমি দূরেই থেকে, আমি কিছু বলব না, এখন আমার যেতে দাও।' কথটা বলিয়াই নীরজা উঠিয়া পাড়াইল।

ব্যস্তভাবে তাহার হাতপালা ধরিয়া কেলিয়া শেকালী বলিল, 'বোস নীরা অনেক কথাস্তর হ'য়ে গেছে আর না, এবার আপোষে মিটিয়ে ফেলা যাক; সত্যি ভাই তুই যদি এমননি রাগ করে চলে যাস তা হ'লে আমার হুঃখের সীমা থাকবে না।'

অগ্রতিতভাবে বসিয়া পড়িয়া নীরজা বলিল, 'ভারী তো দুঃখ আমি আর তোমার কে? পর বৈ তো নয়।' 'হাঁ ভাই বল তুই, আমি আসছি।' শেকালী কক হইতে বাহির হইয়া গেল।

জ্যোতার সহিত এই সামান্য বাস-প্রতিবাদে মানসিক



উমা প্রকাশ করিয়া নীরজাও অত্যন্ত অশ্রুত বোধ করিতেছিল। এই প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করিবার জন্ত হুকাবুতর দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'আপনি যে বড় এমন দাঁত, দাঁত, গুণীয়া নীরব, নিবৃত্ত, নিশ্চল হইলে গেলেন জামাইবাঁহু?'

হুকাবুতর হাসিয়া উঠিয়া সন্মানে বলিল, 'ওরে বাবা তুমি যে একবার থেকে অনেক বড় বড় কথা বলে গেলে, আমরা হুকাবুতর মাহুত অস্ত্র সাধুভাষা বুঝ না তো!'

'কেন জামাইবাঁহু আপনার নামের সঙ্গে এম-এডিত্রী তো জোড়া আছে, আপনি সূর্য হলেম কি করে!'

'আর এম-এ। কেরীগিসির চাপে পড়ে সে এম-এ টুক বহনিন নিশ্চেষ্ট হ'লে গেছে, এখন আমরা গাধা-গরুয়া সমান। মাহুতের বাইশ—'

'তাই না কি নিজের সখ্যে এত বড় সিদ্ধান্ত করে উপনীত হলেন?'

'বে দিন থেকে কেরীগিসিরিতে আত্মনিরোগ করেছি সেইদিন।'

'কেরানীর কাজের উপর আপনার দেখছি বড় বিষয়, তা হ'লে ও কাজ করেন কেন? এম-এ, পাশ করেছেন আর কি কাজ মেলে না?'

'হর তো চের্ন করলে মেলে। কিন্তু সে দৈর্ঘ্য আর আমায় বোঁহে।'

'তাই বসুন আপনি যেমনি অলস তেমনি অধৈর্য।'

'টিক বলেছ নীরা তোমার ভাস্কর অমৃতব-শক্তি প্রশংসা করছি।'

এক হস্তে স্ফূর্তিত চায়ের 'কাপ', অপর হস্তে একটি কাঁচের ভিলে কতগুলো মিষ্টান্ন লইয়া শেকালী দানি দিল। নীরজা তাকে 'কি একটি বলিবার উপজন্ম করিতেই বাধা দিয়া সে বলিল, 'চট করে খেয়ে নিলে চা, তোকে একটি জিনিস দেখাব।'

পতীর দিকে দৃষ্টিপথ করিয়া হুকাবুতর বলিল, 'সেটাফে দেখে এলে কি করছে সে? কাঁচছে না কি?'

'কে সেজন্য—জামাইবাঁহু কুর কথা শুনিয়ে হ'ল?'

একবার 'বানী'র দিকে চাহিয়া শেকালী বলিল, 'তুই খেয়ে নে না, এখন সেখন্ত পাখি।'

নীরজা আর কিছু বলিল না।

হুকাবুতর লক্ষ্য করিয়া শেকালী বলিল, 'তুমি বাও না এখান থেকে ও খেয়ে নিক।'

উঠিয়া দাঁড়াইয়া হুকাবুতর বলিল, 'কেন আমার সামনে কি ও খেতে পারবে না। আমরা কি বাই না? তবু দেখে এইগুলো তোমাদের ভারী অন্যান্য, খায় তো সকলেই, তবে এর সামনে খাব না, ওর সামনে খাব না এগুলো করা কেন? আর একটি লেবে আমাদের ঘেরের মেয়েদের বাবার সময় নিজেই জ্ঞান বড় কিছু তাদের থাকে না, অতর্কিত সব দিয়ে অনেক সময় হয় তো বিনা উপকরণেই তারা খায়, যদি বামীর সামনে খায় তা হ'লে বামী যেতারা সৌভাগ্য প্রতীকার করতে পারে, তা ছাড়া বামী-প্রী একসঙ্গে বসে খেলে বেশ একটু গল্প করে গাওয়া যায়। কেন যে তোমারা সেটা কর না তা আমি বুঝতে পারি না।'

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে শেকালী বলিল, 'আজ্ঞা, তোমার কি আর কোনও কাজ নেই? তাই খত উল্টে আলোচনা করতে এলে। পোড়া কপাল গাওয়ার। কার পলার দেবার দড়ি জোটে না যে ভাল গাওয়া হয় কি না বামী দেখেবে বলে তার সঙ্গে বসে বাবে। মেয়েরা এমন বাঙার জন্ম মরে না। অপরকে বাইয়ে তারা আনন্দ পা, নিজে খেয়ে নয়। যাও তুমি, এমন অনাস্থিত কপা আর বলতে হ'বে না।'

'আঃ রাগ কর কেন শেকা। ঐ তো ভাল কথা। নিজেরের স্ব-স্ববিধার দিকে মেয়েরা লক্ষ্য রাখতে চায় না, বলেই তো তাদের ঐত দুর্দশা এবং সেইজন্মেই আজকাল পুরুষদের চেয়ে মেয়ে বেশী বলি।'

বিরক্তভাবে শেকালী বলিল, 'আরও বেশী বেশী মরে মেয়ের বংশ ধরে হ'ক। আমার তাতে একটুও আপত্তি নেই, তুমি বাও দেখি। নীরা খেয়ে নিক। আমরা এখনও ঐত উত্তির আলোকে আসি নি যে গুরুজনদের দৃষ্টি একসঙ্গে খেতে বাব।'

না এদের কোন মঙ্গলের আশা নেই—ভাল বয়েও শোনে না' বলিয়া হুকাবুতর কক্ষ ত্যাগ করিল।

নীরজাকে লইয়া শেকালী কক্ষের বাহিরে আসিল। তাহার স্বস্ত-স্বস্তায়া তখন প্রশস্ত বারান্দার একাংশে

বসিয়া হরিনামের মাল্য কিরাইতেছিলেন। মাশাটা তাহার হস্তে দ্রুত ঘুরিতেছিল ঘটে, কিন্তু মুখে হরিনাম উচ্চারণের পরিবর্তে বৃন্দের কাণের নানাকণ সমালোচনা চলিতেছিল।

এবং এই সময় অনাচারী বধু ও তাহারদের পরামর্শ-জুট পুত্রদের লইয়া তিনি যে একেবারেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন উক্তকর্তে তাহারই বার বার ঘোষণা করিতেছিলেন। এই অন্যচাচরজ্ঞ পঙ্গার ছাড়িয়া বুনাবনে গমন এখন তাহার পক্ষ শ্রেয়, পারিতেছেন না শুণু ইহারা তাহাকে ছাড়ে না বলিয়া। হরি মৃদুত্বদন কবে যে তাহাকে কৃপা করবেন তাহা তিনিই জানেন।

নীরজা তাহাকে প্রণাম করিবার উত্তোগ করিতেই শব্দবাহে তিনি বলিলেন, 'দেব বাহা ছুঁয়ে ফেল না যেন। এখন আর নাহিতে পারব না।'

সমুচিতভাবে নীরজা ভূমিতে শির স্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অগ্রসরমুখে বধুর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, 'বলেছ তোমার বোনকে? নেবে তো? বা হ'ক একটা কর বাবা, আমি আর সহিতে পারছি না। কি আপদেই যে পড়েছি ত সব যেক্ষে ঘরের মেয়ে এসে সংসারটা আমার উজ্জর দিলে।'

নীরজা বিস্মিত দৃষ্টিতে ছোটোর দিকে চাহিল। ভগিনীর সমুখে এই লালমার কোভে-দ্রুখে শেকালী অতিকৃতপ্রায় হইয়া পড়িল।

শব্দ পুনরায় বলিলেন, 'দিনে দিনে এম হ'ল কি? লঘু-গুরু বিভা বকে বলে না? ছেলেগুলার দৌ বা বসুবে তাই একেবারে ইষ্টম হ'বে।'

শেকালী সন্তোষভরে নীরজার হস্তে একটি মুহু আর্কণ করিয়া বলিল, 'ভাউ এখান থেকে।' চলিতে চলিতে শব্দর দিকে চাহিয়া বিনীতভাবে সে বলিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন না। ওর বা হয় ব্যবস্থা এখনই করছি।'

বারান্দা অতিক্রম করিয়া একটি ছোট ঘরের মধ্যে উভয়ে প্রবেশ করিল। ঘরের সমুখের কতগুলো ছিদ্র-দ্বারের উপর শেকালী কুলের মত ক্ষুদ্র শিঙটা পড়িয়া হাত-পা নাড়িতেছিল। অদূরে একটি কোষাগারের আলো ফণভাবে জ্বলিতেছিল। শেকালী অগ্রসর হইয়া তাহার শিঙাটা উজ্জল করিয়া দিতে দীপ্ত-আলোক-রেখা পূর্ণ ভাবে শিঙর উপর পড়িল।

মুখেরে সেদিকে চাহিয়া নীরজা বলিল, 'বা: কি চমৎকার, একে সেমিবি?'

'ওরই জন্তে তোকে নিয়ে এসেছি ভাই।'

'এর জন্তে—তার মানে? কে এ তোমাদের বাড়ীর কারো মেয়ে বৃদ্ধি?'

'না যে এ বাড়ীর কারো নয়। তুই একে নিবি নীরা?'

শেকালী অজ্ঞার বিষয়-জড়িত নয়নের উপর উৎসুক-ব্যাগ দৃষ্টি স্থাপন করিল।

নীরজা ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ঘরের ঘরের বেহতরে যে শিঙটাকে বকে তুলিয়া গেল। বেনীদিনের কথা নহে বঙ্গসাদিক পূর্ণে তাহারও অন্ধে এমন একটি কুহুম-কোর-কৃত্য শিঙ জপনীত হইয়াছিল। কলের কঠোর হস্ত মাত্র করমাস পূর্ণে তাহাকে বৃহত্যা করিয়া দিয়াছে। মাহুতকে উত্তেজিত আশ্রয় সে অভাবের যেননা দূর হই নাই। কুহুম তনয়ার দৃষ্টি এখনও গুরুর গুরুর সেখানেই অস্তিত ব্রহ্মাছে

তাহার হাসি-কারার সঙ্গ ইতিহাস আশ্রয় জননী-দ্বার দীপ করিয়া প্রতি কার্ণে আগিয়া উঠে। সেই বৈদ্য-জড়িত দৃষ্টি স্থপরিচুত হইয়া নীরজার নয়নপ্রান্তে কম বিদ্যুৎ অক্ষ হুটীয়া উঠিল। শিঙটাকে নিবিষ্ট বৈদ্যে বকে জড়াইয়া সে বলিল, 'সেটা একে আমায় মেয়ে দিগি? না তাঁটা কছা তুমি নিশ্চয়, বার মেয়ে যে দেবে কেন, এখন স্বস্তর মেয়ে আমি তো পেলে একুনি নিয়ে বাই, কি চমৎকার কেন একরাস টাঙ্গা ফুল।'

'সত্যিই মেয়েটা বড় স্বন্দর কিন্তু সব কথা শুনে তুই কি নিবি গুকে।'

'বর কথা, কথাটা আবার কি? কার মেয়ে এ?'

'কার মেয়ে তা জানি না তাই, তোর জামাইবাঁহু একে পণ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন।'

'পণ পেছে?'

'হ্যাঁ পণ থেকেই, বৃহতে পারছিল তো কোণা থেকে তা হ'লে ওর উত্তর। তুই একে গুকে, নিতে পারবি?'

দ্বিধা ন্যসনে অক্ষম শিঙর দিকে চাহিয়া নীরজা বলিল, 'নিশ্চয় নেব, একবার যখন একে বকে তুলে নিরেছি তখন আর না বাব না। আর এর কি দোষ, সদ্যজাত শিঙ মাত্র।'



‘কিছু ও তো হুজাতা নয়।’

‘নাই বা হ’ল; জন্মের অপরাধ তো ওর নয়।’

‘সোটা জানি তবুও আজকের মধ্যকারের বিরুদ্ধ দাঁড়াতে পারি না। ওর রক্ষণ-হেলে-মেয়েকে কি করে ঘরে বান দেব। তারপর আমার খবর-শান্তি তাঁদের আচার-নিষ্ঠা হ’তে এক পা এমিক-ওমিক হ’ল না, ওকে তুলে আনার অপরাধে তোর জামাইবাবুর আর সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবহারের প্রদর্শনাজী আমার জন্ত যে সব ব্যবস্থা হচ্ছে সে সব না পোনাই ভাল। কিন্তু ঘরে এতবড় দুর্গতি অনাচারের আর্জিত হ’লে যে সমসার উৎসর যায় তাতে আর কারো ক্ষম্বেই নেই। ওকে এখনই পথে ফেলে আসবার আদেশ হ’য়েছিল। উনি ছেলে করে ওকে ঘরে রেখে তোর কাছে আমার পাঠিয়েছিলেন। ওর ধারণা তুই একে নিয়ে যাবি।’

‘নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। সত্যি সেজন্য, জামাইবাবু এরকম ধারণা করে আমার আনতে পাঠিয়েছিলেন এতে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কি স্থলর মেয়েটা, একে গেয়ে আমার এত আনন্দ হচ্ছে।’

গভীরভাবে শেকালী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, ‘কিন্তু নীরাভের ও খবর-শান্তি জীরাহে, তাঁরা কি এতে মত দেনে? শেষে এই পথের আবর্জনার জন্ত তোর শান্তির ঘরে কি অশান্তির শিখা অলে উঠবে। এই জন্তই তোকে একথা বলার ইচ্ছা আমার ছিল না। তোর জামাইবাবুর জেরেই কেবল তোকে নিয়ে এমেছি। ভেবে দেখ তুই।’

দৃঢ়ভাবে শিক্তাক্ষে বকে ধরিয়া নীরজা বলিল, ‘একে বধন বেছেছিস তখন ছাড়তে কিছুতেই পারব না।’

‘কিন্তু যদি তোর খবর-শান্তি রোগ করেন, তার চেয়ে ওকে কোনও অনুখ-আশ্রমে পাঠিয়ে দিত্তে বলি।’

ব্যস্তভাবে নীরজা বলিল, ‘না! তাই সেজন্য না, একে নাও আশার; সেখানে যে-ভাবে ছেলেরা, মাছ হই আমি দেখি; তবু জন্মের অপরাধে এমন উকটা নির্দল জীবন ব্যর্থ হ’য়ে যাবে।’

অন্ন হাসিয়া শেকালী বলিল, ‘জন্মের অপরাধটাও অন্ন নয় নীরা, ওর অর্ধে যদি দুখ থাকত ভগবান তা হ’লে ওকে তো স্থানে পাঠাতে পারতেন। না! এ’লোই দুখ

হ’বে এই ওর অদৃষ্ট-গিণি, তার পরিবর্তন করতে যাওয়া মানে বিধিগিণির উপর হস্তক্ষেপ করা।’

কিছুক্ষণ নম্রমে চিন্তা করিয়া নীরজা বলিল, ‘হয় তো তাই কিছু মাছের ঘটুক্ষ মাখা ততুই চোঁকা করা। উচিত এ না হ’লে তো কাকেও কষ্ট ভোগ করতে দেখলে তার প্রতীকার করতেও ভগবানের বিধানে হস্তক্ষেপ করা। না ভাই ও কথা বলে নিচেই থাকা চলে না। একে আমি নিজের সন্তানের মতই পালন করব, তারপর ওর ভাণ্যে যা আছে।’

‘কিন্তু তোর বাড়ীর লোক যদি এতে বিরক্ত হ’ন?’

‘হ’লে আর কি করছি বল। বো বলে একটা ভাল কাণ্ড যদি শাশীনাভাবে করবার ক্ষমতা আমার না থাকে, তা হ’লে সমসার ছেড়ে সর্গতোলা হ’য়ে যাওয়াই ভাল।’

মান হাসির সহিত শেকালী বলিল, ‘তা কি হয় যে, ক্রীতাকের আবার শাশীনাভাবে কাজ করবার অধিকার কি? জন্মের সঙ্কেই সে পরানী।’

সবেগে শির-সালান করিয়া নীরজা বলিল, ‘না! তাই সেজন্য তোর একথা আমি মান্তে পারদুম না, পরানী বলে একটা কাণ্ড যদি আপনার ইচ্ছামত করবার ক্ষমতা আমারে না থাকে, সব বিষয়ে যদি অপূরণে মতাহুই হ’য়ে থাকত হয় তা হ’লে সমসার ছেড়ে বনবাসী হওয়াই শ্রেয়। আর না ভাই আপন ইচ্ছামত সব কাজ না হোক কিছু যে আমার করতে পারি না সত্যি। এতটা অসীম আশা নাই।’

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেকালী বলিল, ‘সকলের তো সমান নয় ভাই, তুই হয় তো আপন ইচ্ছামত কাজ করতে পারিস, আমার সে উপার নেই; কিন্তু নীরা, এ একটা সামাজ্য কাজ নয়। হয় তো তোর খবর-শান্তি এতে রাষ্ট্রী হ’বেন না। ঐ মেয়েটার জন্ত যে তোরের সাম্যাদিক একটা অশান্তির সৃষ্টি হ’বে, তার উপলক্ষ্য হ’ব ত্রান্নি, সোটা আমার পক্ষে বড় অসম্ভবিক হ’বে। তুই ভাল করে দেখ ওর জন্ত যদি তোকে কিছুনা বিব্রত হ’তে না হয় তবেই তুই ওকে নিয়ে যা, নয় তো থাক।’

শিক্তা কানিয়া উঠিল, সতর্পণে তাহাকে বন্ধের উপর হইতে অকে লইয়া দুই দোল দিতে দিতে ভগিনীরা দিকে চাহিয়া

নীরাঙ্গা বলিল, ‘একে কি বেতে মিছে সেজন্য, বোধ হয় কিছু বেতে চায়—একটু দুখ এনে দাও না ভাই। আর আমার খাবার ব্যবস্থা করে দাও।’

‘এর মধ্যে যাবি ভাই। আর একটু থাক না।’

‘না আজ বাই আর একদিন আশ্ব, তুমি দেখে আমার গাড়া এল কি না, আর একে একটু দুখ এনে দাও।’

‘দেখি যদি আনতে পারি।’

‘যদি আনতে পারি তার মানে?’

অতি মগ্নভাবে হাসিয়া শেকালী কক্ষ ত্যাগ করিল। শিক্তা তখনও কাঁদিতছিল। নীরজা তাহাকে বকে লইয়া গৃহে পাচরাণা করিয়া ক্রিান্তে লাগিল। শিক্তার এই অমহার দুঃখবা একটা করুণার দ্রাবন তাহার অন্তরে বহায়া দিল। দুর্ভাগ্য শিক্ত কেন যে এমন স্থানে আসিয়াছে। তাহার জন্মের মানি গোপন করিবার জন্ত যাহারা তাহাকে মরণের ঘবে অর্পণ করিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই—তাহারা কি মাছ বা পশুরও দ্বিধা বোধ সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না ইহার জননী কোন্ প্রাণে তাহাকে পথের ধূলায় বিসর্জন দিয়া গিয়াছে। যে তাহাকে আনিয়াছে সে কি ইহার জন্ত বিমুখতা বাধা অজ্বল করে নাই। কি কর্ণে মা হইয়া সে তাহার মাতৃকৃপে পরিহার করিল। কি কঠিন অস্তর তাহার! জ্ঞাপিনী যদি ইহাকে পৃথিবীতে আনিয়া তবে বর্জন করিল কোন্ অধিকারে। একটা নির্দল জীবন এভাবে ব্যর্থ, বিফল করিবার কি প্রয়োজন ছিল। এ মানি বধন করিবার শক্তি যদি নাই তবে এ নিষাপ শিক্তকে ধরাতলে লইয়া আসিল কেন? আর না জানি কোন মহাপানী সে যে জনক হইয়াও ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিল না। সমাজ-অঙ্গের দুঃ-ত্রণ স্বরূপ এই সব নন্দনীর পার্শ্ব প্রায়শ্চিত্ত নয়। একটা জীবন এইভাবে গভীর অন্ধকারে বিসর্জন দিয়া তাহার উদ্ভিন্নের সমাজ-বক্ষে বিচলন করিতেছে, কেহ তাহাদের অগ্রাধী করিবে না?

তাহাদের অপরাধের গুরুত্ব কত অধিক তাহাও ইয়া তো কেহ জানে না। তাহাদের জন্ত একটা কিংবা আরও কত কলুষপেশীন জীবন এইভাবে মুহূ বা আঞ্জীবন-দ্যাপি ঘৃণ জীবনকে বরণ করিয়া লইতেছে। অথচ

তাহাদের জন্ত কোন শান্তির বিধান নাই; লোক-চক্ষুর অন্তরালে কি মহাপাতক তাহারা লিপ্ত রহিয়াছে কে তাহার সন্ধান যাবে?

নীরাঙ্গার মেঘমর্শে শিক্তা কিছুক্ষণ নীরব হইয়াছিল। আবার মুহূর্ত্তে সে রোদন আরম্ভ করিল। তাহাকে ভুলিয়া ধরিয়া সয়েছে নীরাঙ্গা তাহার অদৃষ্ট কমল-কোরকের মত কপোলে মেঘ চূষন করিল। অহা এটা যদি তাহারই অন্ধে আসিত তাহা হইলে এর আদর-বহের সীমা থাকিত না। ভগবানের বিচিত্র লীলা তিনিই বুঝেন। যাহারা সর্গাঙ্ক-করণে কামনা করে তাহাদের কাছে না পাঠিয়া কেন ইহাকে এমন স্থানে পাঠাইলেন যে, ইহার খবরে কলঙ্ক গোপনের জন্ত ইহার জন্মভাড়া ইহাকে পথের আবর্জনার ভিতর বিসর্জন দিতে কুঠা বোধ করে নাই।

কক্ষের বাহিরে একটা কঠোর কষ্ট ধনিয়া উঠিল। সচকিতে নীরজা সেই দিকে মনঃসংযোগ করিল। শেকালীর পক্ষ তীব্রতরে বলিতেছিলেন, ‘এই তো ধনির আগে একবার ছোট বোয়ের কাছ থেকে দুখ নিয়ে গেছ, আবার বলছ দুখ চাই। তা হ’লে আর লোকে ধানে কি, বলি আক্কেল-বিবেচনা একটু করতঃ নেই কি? সর, সর, সরে মাড়াও ওপিকে, সব ছুঁয়ে আমার ছিট একাকার করে দিও না, যাও চান করে রান্না পরে দাও। সেই থেকে তো ওটাকে নিয়ে উদ্ভ্র হ’য়ে রয়েছ, একটা কাজে হাত দাও নি, যাও এবার কাজ কর সে।’

শেকালী মুহূর্ত্তেই কি বলিল শোনা গেল না। বৃশ-ঠাহুরাণী এবার সর্গন্ধে বলিয়া উঠিলেন, ‘বিরক্ত কর কেন বাহ! একটুখানি ছুইয়া আসে কোথা থেকে, ছুইয়ে দাখ নেই; টাকায় তিনসের করে দুখ সে বরাব রাখ, একটু জল বাইরে রাখ যে বরাবর ছেলে ও নয়। পথে পড়ে থেকেও যে মরে না, সে না সেবেও মরবে না। দুখ পাবে না। বাপের বাড়ী থেকে জমিদারী সঙ্গে করে আস নি তো বাহা যে যত আশ-বালাই ছুঁতে আনবে তার দুখ বোগাব আমি।

অত বেগী দরদর হইয়া বাপের বাড়ী থেকে দুখ এনে বাধাও। আমি কথটা বলব না। তোনার বোনকে বল সে নিয়ে যাব থাক, না হয় আমার পক্ষে ফেলে আসি এ আপন কতকম ঘরে রাখব। আ এক কথা কতবার বলছ, দুখ হবে না।



কীদে? তার আমি কি করব? মাথার করে বসে থাকব। শরীরে শিঙি এসেছে। আমার—আগিয়ে খেলে। যেমন বৌগুণা তেমনিই যেনেছে ছেলেকটা, সুকান্ত হতভাণা সেই থেকে পাগিয়ে পাগিয়ে বেড়াচ্ছে আমার নামনে পর্যন্ত আসছে না। যাও বাপু কালো মন দাও। আমার তো বড়মহাশয় নই যে গায়ে হাওয়া পাগিয়ে বেড়ান আমাদের ঘরে চলবে?'

আর কিছু শুনা গেল না। ঠাকুরাণী বোধ হয় নীরব হয়েছেন। নীরজা তত্ত্বভাবে বসিয়া রহিল। কি ক্ষণস্থায়ী ইচ্ছা, যাহা হইতে মুক্ত হইতে চাহিত। পৃথগ্য় ইহার দিকে আসিত। হ'লেই বা সে পথে পরিত্যক্ত, কুহীন-উদ্ভূত, একটা জীব তো সে? তারার উত্তর এই অত্যাচার। অন্ধ আচারনিষ্ঠা মাহুকে এত বিবেকহীন করিয়া তুলে। এই দুঃখ বহুমান শিশু ইহার উপরও লোক কটন হইতে পারে?

নীরজা পুনরায় তাহাকে চুপন করিল। কি সম্ভবান পরম এই শিশুর—কি স্বন্দর এই শিশুর আকৃতি। তারার সেই নিষ্ঠুর পিতামাতা হয় তো খুবই স্বরূপ। মুহূর্ত্তেই শিশুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া করবিন্দু অন্ধ নীরজার কপোল বহিয়া করিয়া পড়িল। তারার মনে হইল শিশুগুণা সবই যেন এক ধরনের তারার সেই পোশাকোচ্ছাদিত ছবিয়া হইয়া প্রতি ছন্দা বেন এই শিশুর সঙ্গে বহন করিয়া আনিতেছে। অতঃপর আশ্চর্য্য, কত দূরে। পুনরায় করবিন্দু অন্ধ শিশুর সঙ্গে পড়িল। পাগে বারিষ্পর্শে অবস্থি হওয়ার শিশু কক্ষকে কীদ্বি উঠিল। তাহাকে বন্ধে লইয়া নীরজা উঠিয়া দাড়াইল। চিত্তার কটীট ধোয়া তারার আননে পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শিশুরে সে লইয়া বাহিরে গিয়া কিন্তু তারার শাস্তির নীড়ে সেজ্ঞা কেন গিয়া উপস্থিত হইবে না তো? তারার পশুর-শাস্তি যদি সমস্ত না হন, তাহাদের বিরুদ্ধাচার সে তো করিতে পারিবে না। অন্ধ তারার কোনদিন তারার কোন কার্যে বাধা দেন নাই, কিন্তু সেও ত অসন্তুষ্ট কোন কাজ এ পর্যন্ত করেন নাই, তাহার না রাখিলে শিশুর কি উপায় হইবে? অনাথ-অশ্রমে কিংবা দুঃখান মিশনারীদের কাছে

পাঠাইতেই হইবে? না না তাহা হইবে না, জীবনের কোন মাঝকটীই সে তাহা হইলে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সে শিশুকে আশ্রয় দিবে, এজ্ঞ তাহাকে যে কোন শাস্তি সহিতে হয় তাহা সে মাথা পাতিয়া লইবে।

সন্তানের জননী হইয়া অন্ধ শিশুকে আর গুণ-বেদনার মধ্যে সে নামাইয়া দিতে পারিবে না। আশা অসম্ভব অথবা, কি মোহ তারার—স্বপ্নের অপরাধের জন্য সে দাবী নড়ে, তারার উপর কেন সমাজের নিষ্ঠুর উৎপাদন হইবে। সমাজ তাহাকে অন্ধে স্থান দিবে না, অন্ধ প্রকৃত দোষী বাহুগুণা তাহারের কেশাধ পূর্ণ করিতে পারিবে না, বিনিময়ে শাস্তিকোণ করিবে এই নিম্পাপ শিশু। একি অত্যাচার!

শেকালী ককে আসিয়া বলিল, 'তোরা পাড়ি এসেছে তাই।'

'চমু মতা হ'লে সেজদি, আর একদিন আসব।'

'ওকে তা হ'লে নিয়েই যাবি।'

'হ্যাঁ ভাই নিয়েই গেলুম।' ছোটরা পদগুলি লইয়া নীরজা কক্ষ ত্যাগ করিল।

শেকালী ঘরে ঘরে তারার সঙ্গে আসিল। শাস্তিভীর তীর বাকাবাগুণা তারার মধ্যে মগ্নে বিদ্ধ হইয়া তাহাকে পালনায় অভিজ্ঞ করিয়া দিল। কোন কথা সে বলিতে পারিল না।

স্বকান্ত কি কাজে এদিকে আসিবেছিল। গমনোচ্ছিন্ন নীরজার দিকে চাহিয়া বিস্তৃতভাবে সে বলিল, 'একি তুমি এখানে থাক কেন নীরা, এই তো এলো এর মধ্যে খাবার জল ব্যতঃ হয় কেন?'

কেন যে ব্যত হইয়াছে নীরজা তাহা বুঝিয়া বলা সম্ভব মনে করিল না। স্বপ্নাতুর শিশু কীদ্বি করিয়া তারার আশ্রয়ের উপর ঘুরাইয়া পড়িয়াছে। শেকালীর বিস্তৃত রান মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় ছদ্ম চাষিয়ার কথা সে গুটীয়ে আনিতে পারে নাই। কোনরূপে বাটা গিয়া শিশুকে খাওয়াইবার জ্ঞান সে উগ্রীয়া হইয়া উঠিয়াছিল। স্বকান্তের প্রশ্নে বিনীত-কণ্ঠে বলিল, 'আজ খাই জামাইবা, পোতম হয় তো কীদে?'

'ওঁ তা হ'লে আর কি বলব কিন্তু তাকে কেন আন নি নীরা?'

কিছু না বলিয়া নীরজা অগ্রসর হইল। শেকালীর প্রশ্ন

কিঞ্চিৎ দূরেই দগায়মান ছিলেন। দূর হইতে তাহাকে প্রণাম করিয়া নীরজা বলিল, 'বাঁজি না তা হ'লে।' গুস্তারমুখ তিনি বলিলেন, 'মেটোকে তুমি নিয়ে যাও।'

'হ্যাঁ না নিয়েই গেলুম, ও আমার কাছেই থাকবে।'

'ভাল তা তোমার শাস্তি কিছু দলবেন না?'

'বোধ হয় না।' দূতবরেই নীরজা উত্তর দিল।

বিরক্তি-ক্লান্ত মুখে স্বকান্তের জননী বলিলেন, 'তা হ'লে একটা কথা তুমি জেনে যাও, ওটাকে যদি তুমি ঘরে রাখ, তা হ'লে আমাদের কারো সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ থাকবে না, বোমাকেও আমি তোমার ওখানে যেতে দেব না। তুমিও আমাদের ওখানে আর এস না। তোমরা বড়-মহাশয় আমাদের সবই শোতা পায়, কিন্তু আমরা গরীব, আমাদের তো সমাজের ভয় করে চলতে হ'বে বাহা।'

নীরজা তবু হইয়া রহিল। এই অপরাধে তাহাকে স্বাধীন-স্বজন হইতে দূরে থাকিতে হইবে। বেশ! দরবারে সে বলিল, 'বেশ, আপনারা আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখবেন না।' বলিয়াই ক্রতপদে সেস্থান ত্যাগ করিল।

স্বক-ব্যথিত চিত্তে নীরজা আপনায় স্রুত্ব মেটরের মধ্যে উঠিয়া বসিল। স্বকান্ত নিরুদ্বেষে দাঁড়াইয়াছিল, জননীর ব্যবহারে সে অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। অতঃপর নীরজাকে কি ব্যাখ্যা তারাগে ভাবিয়া হির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। শেকালী অর্দ্ধপূর্ণ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াই বিদায় লইয়াছে। বাহির-বারপ্রান্তে আসিবার অধিকার এরাটার বৃ-কর্ত্তাদের নাই।

শোকার নীরজাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, 'চালাব তো?'

'হ্যাঁ চালাবে বৈ কি, আসি তা হ'লে জামাইবা! আর কি বলব, আমার বাড়ীতে যেতে বলবার অধিকার তো আর নেই। তবে যদি কখনও দ্বারার ওখানে গেলে দেখা হয়।'

ব্যতভাবে স্বকান্ত বলিল, 'না না তা কেন? আমি নিচুই তোমার ওখানে যাব।'

'না জামাইবা দরকার কি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে?'

অভিমান তারার কণ্ঠ ভারী হইয়া আসিল।

দুষ্টিভাবে স্বকান্ত বলিল, 'নীরা লক্ষীটা ভাই, তুমি কিছু মনে কর না। আমার অবস্থা কি রকম বুঝতে পারার তো তুমি।' 'আমি নিরুপার।'

'স্বকান্ত স্বধা শুনিয়া নীরজা চমকিয়া উঠিল। সত্যই ইহার নিকট এ ক্ষুভ্রতাব প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই, উনি কি করিবেন। নিষ্ঠাবান পিতামাতা। হইলেই বা অন্ধ আচার-পরায়ণ, তবু পিতা-মাতা তো সন্তানের নিকট শুধু জনক-জননী ন'ন, পুত্রা দেবতা। তাহাদের দোষ-গুণের বিচার সে তো করিতে পারে না। কষ্টে হাসিয়া আপনাকে প্রব্রুত করিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, 'না জামাইবা আমি কিছু মনে করি নি। আপনি কি আমার এতই ছেলোমহাশয় ভাবছেন। না ও কথা বলেছেন, তা'তে আর আশ্চর্য্য কি, গুস্তা সেকালের লোক একটু অহীচর হ'বেই তো।' এখান থেকেও আপনি যাবেন একদিন।'

স্বকান্ত স্বকান্ত নিঃশাস ফেলিয়া বলিল, 'হ্যাঁ যাব বৈ কি, নিশ্চয় যাব।' হ্যাঁ, একটা কথা নীরা ওটাকে তো তুমি নিয়ে যাও কিন্তু ওর জ্ঞান তোমাদের বাড়ীর সকলে বিরুদ্ধ হ'বে না তো? তুচ্ছ বিষয়ের জন্য বাড়ির স্বর্গ হইয়া উচিত নয়। সেটা বুঝে তুমি ওকে নিয়ে যেও।'

ব্যথা-কাতর মুখে নীরজা বলিল, 'একটা মাহুদের জীবন কি তুচ্ছ জামাইবা! আমি অশাস্তির ভয়ে একে না নিই যদি তা হ'লে এর কি উপায় হ'বে, আপনি তো রাখবেন না।'

'না নীরা সে উপায় আমার নেই। সেইজন্যই তো তোমার নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু এজ্ঞ যদি তোমার কোন কষ্ট হইতে হয় সেটা আমি সহিতে পারব না।'

'একটা জীবন সেজ্ঞা ব্যতঃ হ'তে দেব না। নিজ সন্তানের মতই একে পালন করব।'

'কিন্তু ওর সত্য পরিচয়ই যেনে তো?'

'নিশ্চয়, আপনি কি যেনে করেছেন এর পরিচয় গোপন রাখব আমি, না জামাইবা! অজ্ঞাত কাজ করার চেয়ে সোচ্চার গোপন করা আমি আরও বেশী দোষের মনে করি। প্রত্যরূপ আমি করব না; কিন্তু ও অজ্ঞাত



তার অশ্রির কার আমি করতে চাই না। এর সত্য পরিচয় আমি কেব তাতে বসি সকলে বিরক্ত হ'ন তাও ভাল।'

স্বকর প্রাপ্যদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, 'তোমার আমি তিনি দ্বারা'।

আপেনপ্রাপ্ত চাপক তখনও মোটার চালাই নাই, জিজ্ঞাসনেনে সে পুনরায় নীরজার দিকে চাহিতেই অপ্রতিভভাবে হাসিয়া নীরজা বলিল, 'হ্যাঁ এইবার বাজী চল।'

আলোকমানা-শোভিতা নগরীর বকের উপর দিয়া তাঁর গতিতে মোটার ছুটীয়া চলিল। স্বপ্ন শিক্তকে বকে জড়াইয়া কোমল আসনের উপর দেহভার এলাইয়া দিয়া নীরজা ভাবিতেছিল—সমাজের একি জ্ঞান উৎপাদন—

একটা আশ্রয়হীন অসহায় শিক্তকে গৃহে স্থান দিবার অপরাধে তাহাকে বজন-পরিভাজ্য হইতে হইবে। ক্ষুদ্রশিক্তর জাতিধর্ম-ভিত্তির করিয়া না চলিলে কি একটা মধ্য অপরাধ হয়? বাহারা এই শিক্তর সঙ্গে অপবিত্র হইবার আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া ঘুরে সরিয়া বাইতেছেন, হয় তো তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এমনই কত শত অপরাধের সীত বিদ্রুতিত রহিয়াছেন; অথচ তাঁহারা

বখন অস্ত্রের বিচার করিতে বসেন তখন সে কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইন। উজ্জ্বলতা ও অসংযমের দিন দিন বেরূপ প্রাচুর্য্য হইতেছে, তাহাতে পরিণামে এক ঠাড়াইবে তাহা বলা দুরূহ—তাহারই তো পরিণতি এই সব শিক্ত কিস্ত, তাহাদের জন্য কোন সুব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। কি ক্ষয়হীন সমাজ! যদি কেহ দয়া করিয়া এই সব শিক্তকে আশ্রয়দাতাই কর্তৃক আশ্রয় দেন তাহাতে তাহাদের নিরুত্তি নাই, প্রতিফলে শান্তি ভোগ করিবে। হয় তো অপরাধীই বিচারক সাজিয়া দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছেন। চমৎকার! স্বপ্ন শিক্তকে নীরজা বকে জড়াইয়া ধরিল। বাহাই হইক সকলে ত্রাণকে বসে যুগো তিরসার করুক, যতই তাহার উপর বিরক্ত হ'ক শিক্তকে সে ভাগ্য করিতে পারিবে না, তাহার জীবনটা বাহাতে ব্যর্থ ও বিফল না হইয়া যায়, প্রাণপণে সে চেষ্টা করিবে। মানব-জীবনে তাহার মত তৃষ্ণ নারী ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক কার্যের অবসর পাইবে। একটা জীবনও সে যদি সার্থক আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারে, তাহাই যথেষ্ট। এ শিক্ত তাহারই সম্ভান। সকলের ঘৃণার অন্তরালে বসুপুটে ইহাকে আবরিত করিয়া দে রক্ষা করিতছে।

ক্রমশঃ

## ভিন্ ডাশের বধু

বনে আলী মিয়া

আধার রইতে কান্দে মরে

পড়নজা ইয়ার ধুখে

ক্যাম্বে কইরে কিসের লাইখা

কোনবা-বদর-ধুখে—

মনের মণি রইল মে-ধন

বেথ্যা-কিনা পারহু কেন্দ

জরা ঢালা কান্দে বেমনে

আমাকায়ার যুক্ত।

যার না লাগ্যা দিন পৌঁছায়

বদ্যা ত্রিধির তলা

উজান গাঙ্গে পড়বার চর

স্বক হইয়া ঢালা,—

মাইনু ঢালা কোন না দ্যাশ

নেইরে বন্ধু গুণের শ্রাব

হায়রে দ্রবমণ রইছো বেথেন

\*পাকো মনের স্বখে।

ভূপে—(সুধার) জজ।



## বাঙ্গালী দেশে ধাত্তের চাষ

এ বৎসর অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সালে বাঙ্গালী দেশে ১,৫৫,১১,৪০০ একর জমিতে আমন ধাত্তের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ১,৫১,২০,৩০০ একর জমিতে আমন ধাত্তের চাষ হইয়াছিল। বেরূপ আব-হাওয়া গিয়াছে, তাহাতে শতকরা ৯০ ভাগ ফল হইয়াছে। প্রতি একরে ১২০০ মণ ধাত্ত হইবে এই হিসাবে ধরিলে এই বৎসর ২০,০২,২৮,০০০ মণ ধাত্ত হইবে। গত বৎসর ১,৫৫,৪২,০০০ মণ ধাত্ত হইয়াছিল। সমগ্র ভারতে যে পরিমাণ জমিতে আমন ধাত্তের চাষ হয়, তাহার শতকরা ১৭ ভাগ জমি বঙ্গদেশে।

—নীহার

## বিধবা-বিবাহ

১৯৩১ সালে কলিকাতার বিধবা-বিবাহ-সংসারক সভার দ্বারা বাঙ্গালী দেশের ৫৬টা জেলায় ৫৬টা এবং শাখা-গুলির দ্বারা ৫৬টা বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। ইহা বাতীত ৭৯৩টা বিধবা-বিবাহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে অর্থাৎ বাঙ্গালী দেশে মোট ৯০২টা বিধবা-বিবাহ হইয়াছে।

বাঙ্গালী দেশে কত বিধবা-বিবাহ কোন বৎসর হইয়াছে তাহার এক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

সাল	সংখ্যা	সাল	সংখ্যা
১৯২৪	৩২	১৯২৯	৪০
১৯২৫	২৯	১৯৩০	৪৬
১৯২৬	৬১	১৯৩১	৯০২
১৯২৭	৪০		
১৯২৮	৩৫	মোট	২৭৩৪টা

কোন জাতির মধ্যে কয়টা বিবাহ হইয়াছে তাহার তালিকা এই :—

নাম:শ্রে	৪৬৯	মালিকার	১৫
রাজবংশী	২৮৭	তিলী	১০
কায়স্থ	১৯৩	কুস্তকার	৬
নাথিত	১৫৩	স্ববর্ণবিশিক	৭
ব্রাহ্মণ	১১৭	বাসুজীবী	৬
স্বত্বের	৮৭	পৌণ্ড কজির	৬
বৈজ	৯৮	গোপ	৪
সাধা	৮৫	সরগোপ	৩
মাখি	৩২	বিরিধ	১১২
কাপালী	৩২	মোট	২৭৩০

বিধবা-বিবাহ-সংসারক সভা পাক্ষাবের পরলোকগত স্ত্রর গঙ্গারাম-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালী দেশে ইহার ২৫টা শাখা আছে।

১৯৩১ সালে এই সভার ১৪টা বিধবার বিবাহের আবেদন আসে, তন্মধ্যে ৪২ জনের বিবাহ হইয়াছে। বাকী ১০৬ জনের বিবাহের চেষ্টা হইতেছে। এই সকল পাক্ষীর মধ্যে—

কায়স্থ	৩২	মাখি	৬
বৈজ	৩০	সরগোপ	৩
মোদক	১	বৈজ	৩
কাপালী	১০	স্ববর্ণবিশিক	৬
ব্রাহ্মণ	২৫	তিলি	২
গোপ	১	নাম:শ্রে	৪
বেহার	১	কর্তৃকার	১
যোগী	৫	কুস্তকার	১
সাধা	৫	স্বত্বের	১
তাম্বুলী	১	পৌণ্ড কজির	১
কজির	১		
নাথিত	২	মোট	১০৬



১৯৩১ সালে ৩৪৬ জন বিধবা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া পত্র দিয়াছে। তন্মধ্যে কায়স্থ ১৯৯, ব্রাহ্মণ ৮৭; বৈজ ১১ ইত্যাদি।  
এই সভা শুণ্ডার হাত হইতে ১১ জন স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিয়াছে।

— সঙ্গীতবী

বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের অদলবদল

মিঃ প্রেস্টিস হোম মেম্বর নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে মিঃ হপকিন্স বাহীভাবে চাক্ সেক্রেটারী কার্য করিতে ছিলেন। তিনি হরদীপ ছুটা লইয়া দেশে যাইতেছেন, এই ছুটা শেষ হইলে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। চট্টগ্রাম-বিভাগের কমিশনার মিঃ রীড তাঁহার স্থলে চাক্ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। হানীয় স্বায়ত্বশাসন-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ গার্নারও দীর্ঘ দিনের ছুটা লইয়াছেন। তাহার স্থলে মিঃ টাউনসেণ্ড অস্থায়ীভাবে কাজ করিবেন। সেক্রেটারীগণের মধ্যে আপাততঃ আর কোন অদলবদল হইবে না।

গবর্ণরের শাসন-পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে মিঃ মায়ের স্থলে মিঃ উল্লেভ রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। জর প্রভাসেন্দ্র মিত্র ছুটা লইয়াছিলেন, তিনি শীঘ্রই কার্য্যে যোগদান করিবেন এবং এখন তিনিই শাসন-পরিষদের প্রাচীনতম সদস্য হিসাবে ভাইস প্রেসিডেন্ট হইবেন। মিঃ প্রেস্টিসের কার্য্যকাল এখনও শেষ হয় নাই। তথাপি তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনিও দীর্ঘ ছুটা চাইয়াছেন। মিঃ প্রেস্টিস ছুটা লইলে নূতন চাক্ সেক্রেটারী মিঃ রীড অস্থায়ীভাবে হোম মেম্বরের কাজ করিবেন।

— সঙ্গীতবী

হঠযোগীর মৃত্যু

হঠযোগী নরসিংহ বাবী সম্প্রতি রেঙ্গুণ-বাসীপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ২৪শে মার্চ বৃহস্পতিবার অপরাত্তকালে তিনি বহু ব্যক্তি সম্মুখে কুঁচিয়া বিধ,

বিবাক্ত এসিড, অল্প নানা প্রকার সাংঘাতিক বিধ ও কাচপত্র প্রভৃতি ব্যবহারিভ ভঙ্গণ করেন। উহার কয়েক ঘণ্টা পরেই তিনি অস্থব্ধ হইয়া পড়েন। প্রকাশ প্রহরবারই বিধ ভঙ্গণের পর উহার জিহ্বা নিবারণের জন্ত তিনি কিছুকাল



হঠযোগী নরসিংহ

ধরিয়া হঠযোগ-সাধনা করিতেন। গত ২৪শে মার্চ এই বিধ-ভঙ্গণের পর রাত্রিতে যোগসাধনায় বিলম্ব ঘটায় তাঁহার শরীরে বিঘের ক্রিয়া দেখা যায়। তখনই তাহাকে হাঁস-পাতালে পাঠান হয়। তাঁহার শরীরে ক্রীড়নামূলক বিঘের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কলিকাতায় এই যেমী ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যেদিন বহু সাংঘাতিক বিধ, কয়েকটা বিবাক্ত এসিড, কাঁচা পান্না, গোহার পেরেক ও কাচপত্র ভঙ্গণ করেন তখন আবার তাঁহার অতি নিকটে থাকিয়াই উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কি উদ্দেশ্যে তিনি ঐরূপ করেন, ইহা জিজ্ঞাসা করার তিনি বলিয়াছিলেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যোগের শক্তিতে বিশ্বাস করেন না বলিয়া যোগের শক্তি প্রদর্শন করিবার জন্ত তিনি ঐরূপ করিয়া থাকেন। যোগের শক্তি যে আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্তই তাঁহার আগ্রহ ছিল। তিনি উপযুক্ত আশ্রয় হইতেও পাশ্চাত্য ও আমেরিকা বাইরা এই শক্তির পরিচয় দিয়া পাশ্চাত্য

বৈজ্ঞানিকগণকে বিব্রিত করিবেন, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। যে উদ্দেশ্যে তিনি হঠযোগের শক্তির ব্যবহার করিতেন, ভারতীয় সাধকগণের মত তাহা বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে কোনও আলোচনা এখন এখন নিষ্পন্ন, তবে পাশ্চাত্য জগৎ অস্থাবরিত্ব, তথায় ঐরূপ অনাধার শক্তির পরিচয় পাইলে অনেককেই ভারতীয় হঠযোগ-সাধনার মূলতত্ত্ব জানিবার জন্ত চেষ্টা করিত, একথা বলাই বাহুল্য।

— হিতবাহী

অর্থ-সঙ্কটের পরিণাম

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক প্রস্তাবের ফল বি, বি, যোগ বলেন যে, ১৯৩১ সালের জুন, সেপ্টেম্বর ও ১৯৩২ সালের জাহারারী মাসের কিস্তীতে মোট ১৩,৪৭৫ জন জমিদার রাজস্ব দিতে পারেন নাই। ১৯৩১ সালের জুন ও সেপ্টেম্বর মাসের রাজস্ব না দেওয়ার ৫৮৮টা জমিদারী বিক্রয় হইয়াছে। ১২২টা জমিদারী বিক্রয়ের জন্ত নীলাম করিয়াও ধর্মিদার পাওরা যায় নাই। আরও প্রকাশ যে, গত সেপ্টেম্বর মাসের কিস্তীর বাধনা না দেওয়ার বাঙ্গলা দেশের ২৫১টা জমিদারী নীলামে বিক্রয় হইয়াছে; তন্মধ্যে যেমিনীপুর জেলায় ১৩টা জমিদারী আছে।

—নীহার

সম্পত্তি নীলাম

গত সেপ্টেম্বর মাসের কিস্তীর সদর বাধনা না দেওয়ার কোন জেলায় কতটা সম্পত্তি নীলামে হইয়াছে তাহার তালিকা—

বর্ধমান	৪	রাজশাহী	২
গীরভূম	২	দিনাজপুর	৬
যেদীনাপুর	১৩	রাঙ্গপুর	৩
হুগলী	২১	বগুড়া	৩
হাওড়া	৪	পাবনা	১
২৪ পরগণা	৬১	মালদহ	১
নদীয়া	৭	ঢাকা	৩৮
মুর্শিদাবাদ	৮	ময়মনসিংহ	১০
ফরিদপুর	৫	চট্টগ্রাম	৭
চট্টগ্রাম	১৪	বাংলাদেশ	১৮
খুলনা	২	তিশুরা	১৮

—বরিশাল

বাঙ্গালার যৌধ-কারবার

১৯৩২ সালের জাহারারী মাসে বঙ্গদেশে ২২টা নূতন কোম্পানী রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছে। এই সমস্ত কোম্পানীর মোট মূলধন ৪৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হল—

ইনডেস্ট্রিট এণ্ড ট্রাষ্ট ২টা	১ ০০০
প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স ১টা	১২ ০০০
ছাপাখানা প্রগতি ১টা	১০০০
রাসদর্শক ১টা	১০০০
ক্যানিংস ও রবার ১টা	২০ ০০০
এক্সেল ১টা	৫০০০
ট্রেডিং এণ্ড ম্যানফ্যাকচারিং ৫টা	১০০০০
কলার বনি ১টা	১০০০০
অস্ত্রা বনি ১টা	১০০০০
চিনির কারখানা ১টা	২০০০০

—আনন্দবাজার

মাদকস্বত্রের পরিণাম

বঙ্গীয় আর্থারী-বিভাগের ১৯৩০-৩১ সালের বর্ষকল প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে প্রকাশ যে, আলোচ্য বর্ষে ১১৫৫ মণ ৯ সের গাঙ্গা বিক্রয় হইয়াছে, পূর্ণ বৎসর হইয়াছিল ১৫৫৯ মণ ৭ সের অর্থাৎ বৎসরের ৪০৩ মণ ৩০ সের হ্রাস পাইয়াছে। মাদক-বর্জ্য-আন্দোলন ও পিকেটাই এই হ্রাসের কারণ। আলোচ্য বর্ষে গাঙ্গার দর ছিল প্রতি মণ ২০০ টাকা।

ভাগ-পূর্ণবৎসরের লোক ভাগ বাণ্যায় ত্যাগ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ ভাগ বিক্রয় হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৩৩৪ মণ ৫ সের ভাগ কাটুতি হইয়াছে, পূর্ণ বৎসর হইয়াছিল ৩৩৭ মণ ২ সের অর্থাৎ ৩২ মণ ৩৭ সের কমিয়াছে। চরম-আলোচ্য বর্ষে ৩৩ মণ এবং পূর্ণ বৎসর ৫৩ মণ ১৮ সের আদানী হইয়াছে। আকিম—১৯৩০-৩১ সালে ৮৮৫ মণ ১১ সের আকিম কাটুতি হইয়াছে, পূর্ণ বৎসর হইয়াছিল ৯৯০ মণ ২১ সের অর্থাৎ ১০৮ মণ ১০ সের হ্রাস পাইয়াছে। কোন জেলায় কত হ্রাস পাইয়াছে তাহার হিসাব যথা—বর্ধমান ১২ মণ ১১ সের, বীরভূম ৩ মণ ৩৬ সের, ঝাড়ুড়া ৪ মণ ৩৫ সের, যেদীনাপুর



১০ মণ ১৭ সের, হাওড়া ৪ মণ ৩০ সের, নদীয়া ৫ মণ ৬ সের, হুগলীবাড় ২ মণ ৩৭ সের, যশোর ২ মণ ১৯ সের, মুন্সি ৪ মণ ২৩ সের, ঢাকা ৩ মণ ৯১ সের, ময়মনসিংহ ৫ মণ ৮ সের, ফরিদপুর ২ মণ ২০ সের, বাথরগঞ্জ ৩ মণ ১ সের, নোয়াখালী ১ মণ ২৭ সের, ত্রিপুরা ৩ মণ ৩০ সের, রাজশাহী ১ মণ ২৪ সের, দিনাজপুর ৩ মণ ২৯ সের, জলপাইগুড়ি ১ মণ ১৭ সের, রাণপুর ৫ মণ ৩২ সের, বগুড়া ১ মণ ২০ সের, পাবনা ২ মণ ১১ সের, মালদহ ৩ মণ ২২ সের এবং দার্জিলিং ৩৪ সের।	নোয়াখালী রাণপুর হাওড়া বরিশাল ময়মনসিংহ যশোর দার্জিলিং সিউটী মালদহ চট্টগ্রাম	৫৩ ৫০ ৩৩ ২৩ ১৮ ১১ ৮ ৭ ৫ ১
--	--	--

—হিতবাদী

দত্তিত নরনারীর সংখ্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ প্রেন্সটন আইন-অমাত্র-আন্দোলন-সম্পর্কে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দত্তিতের তালিকা দিয়াছেন; তাহা নিয়ে প্রকাশিত হইল।

জেলা	সংখ্যা	তদাধো স্ত্রীলোকের সংখ্যা	বাংলার শুদ্ধ
কলিকাতা	৫১৭	৫৫	গত বৎসর (১৯৩১-৩২ বৃষ্টাব্দে) বাংলাদেশে মোট ৩৭৬২০০ টন শুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছে (তদাধো ২২২৮০০ টন ইক্ষু-শুদ্ধ এবং ১০৪০০০ টন খেজুর, তাল প্রভৃতি পাছের রসে প্রস্তুত শুদ্ধ)। একমাত্র কলিকাতাতেই বাসসরিক ৩২৫০০০ টন শুদ্ধ বাহির হইতে আমদানী করা হয়। এই শুদ্ধ-আমদানী বাংলাদেশ শুদ্ধ দিয়া বদ্ধ করিতে হইলে, মোট উৎপন্ন শুদ্ধের অবশিষ্ট রহিবে ৫১২০০ টন মাত্র। বাংলাদেশের অত্যন্ত জেলাতেও যে বহুপ্রতিমাণ শুদ্ধ আমদানী করা হয়, অংশ দ্বারা হইল না; কিন্তু তথাপি, উক্ত ৫১২০০ টন শুদ্ধে বাংলাদেশের কৃষিকর্মী পাঁচকোটি (দেশীয় রাজস্বমতে) লোকের একমালও চলিতে পারে না; সুতরাং অভাব-বন্ধ নয়—অত্যন্ত অভাব। গত বৎসর সমগ্র বঙ্গদেশে ২৩৪০০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। ইহার ৫৭৭ গুণ অধিক জমিতে ইক্ষুর চাষ না হইলে, বাংলাদেশে শুদ্ধও চিনির জন্ম পরের কাছে হাত পাতিতেই হইবে।
বরিশাল	২৩০	৬	
ফরিদপুর	২৪২	১২	
কুমিল্লা	৭৪৭	৩	
হুগলী	২৩০	১৮	
মেদিনীপুর	২১৮	৮	
ঢাকা	১৯৩	৬	
দিনাজপুর	১৩৭	১৪	
বর্ধমান	১৩৬	১৪	
বরেন্দ্রপুর	১৩৪	১৪	
জলপাইগুড়ি	১১৯	১৮	
পাবনা	১০৪	১৮	
ককনগর	৯৬	১৮	
রাজশাহী	৭৮	১৮	
বাঁকুড়া	৭৪	১৮	
খুলনা	৬০	১৮	

—কৃষি-সম্পদ

## চিত্রকর

(চিত্র)

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

—তিন—

সে ছিল চিত্রকর। দিল্লীতে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে তখন তার মত চিত্রকর ছিল না। তার নাম আগার বাবশাহের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সেদিন সে একটা ছবি নিয়ে চিত্রের বুকে হুলির মোহন স্পর্শ বুগিয়ে দিচ্ছে— এমন সময় সাবান এল তার নিয়ন্ত্রণ—আগার বাবশাহের কাছে সংবাদ এসেছে। বাবশাহের এক ওমরাহ নিজে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উপস্থিত।

আগার নাম শুনেই তার বুকের পাঞ্জর মণ্ডিত করে এক দীর্ঘ-নিঃশ্বাস উঠে শূভে মিলিয়ে গেল। দূরে আকাশের দিকে সে চেয়ে রইল।

তারপর তার দিমীর চিত্রশালায় লজ্জা দরকারী সব শুধিয়ে নিয়ে আগার রওনা হল।

—ছই—

বাবশাহ তার চিত্রের নমুনা দেখল—সেথেকে তাকে বলল—“হাঁ দখল তুমি।” আবার ওমরাহ সকলেই তারিক করতে লাগল।

বাবশাহ পাত্রমিত্র, আবার ওমরাহকে বিদায় দিয়ে বললেন, “লেখ চিত্রকর, আমার অন্তরে নিয়ে তোমাকে আমার ‘জগদগুরু বেগমের’ ছবি আঁকতে হবে। শুনেছি তোমার বাঁকীও ঐ দিকেই। তোমার হাতও আছে; তোমার হাতকে চিত্রে জগদগুরু-হাবভাব যেমন সুউৎসে অজ্ঞে তা তো আর পারবে না। তাই তোমাকে ডেকেছি।”

চিত্রকরের হুঁটো কাণ পর্যন্ত রক্তের প্রবাহ হয়ে গেল, সে শুধু মাথা নিচু করে সমস্তি জানাল। সে শুধু জানাল, “আমার চিত্র সম্পূর্ণ না হ’লে, কেউ দেখতে চাইবেন না, —এইটুকু চাই।”

বাশাহ—“আজ্ঞা তাই হ’বে।”

ঠিক হ’ল—অন্দরে জগদগুরু-বেগম একথানা সুবৎ আয়নার সম্মুখে বসলেন। আর অজ্ঞ কোঠায় চিত্রকর বসে সেই আয়নার ছবি দেখে তার ছবি আঁকবে আর পটের উপর রাখার ছবি বুগিয়ে যাবে।

চিত্রকর তার বিচিত্র রং মিশিয়ে মিশিয়ে ছবি চাণিয়ে চিত্র আঁকছে, মাঝে মাঝে সে এমন রং দুটিয়ে তুলছে যে তা সাধারণ চিত্রকরে চলত।

বেগম শুধু নিশ্চল হয়ে বসে আছে। ও ঘরের চিত্রকরের দীর্ঘ-নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত তার কাণে এসে পৌঁছায়—বেগমের বক্ষ মণ্ডিত করে তার একটা প্রতিফলন আকাশে মিলিয়ে যায়। দর্পণে প্রতিফলিত চিত্র যেন একটু কাঁপতে থাকে।

—চার—

চিত্রকর আঁকে আর ভাবে, বাবশাহের ঐ ঐশ্বর্যের ছবি না দিয়ে সেই রাজপুত্রনার পরর্তের ছবি, সেই বরণ-তাপা উজ্জ্বলিত স্বর্ণার পাঁশে প্রাণাণ-বদীর উপর বসে জগদগুরু বেগমের ছবি। আর সে আঁকলও সেই রকম। দূরে হৃদয়ে অবতারণে, তার মান রক্তাভ কিরণ এসে বেগমের চিত্রকে এক স্বর্ণের সৌন্দর্য দান করল।

চিত্র শেষ হ’লে—চিত্রকরের চকু কেটে ছ’কোটি তপ্ত অশ্রু এসে চিত্রের চরণে ধরে পড়ল।

চিত্রকর ভাবল—আর কেন? বেগম চিত্রলেখাও পেরেছেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে গেল।

কিন্তু এ কি! চিত্রকরের যে সাহায্যকারী অমৃত ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করত—সে চাঁৎকার করে উঠল,—চিত্রকর মুহূর্তে সেই ছবির নিচে পড়ে আছে।



বাদশাহের কাছে সবাদ বেতেই—বাদশাহ চুটে এসে বললেন “ও, বড় পরিশ্রম গেছে—তাই মুজী গেছে।” চুইজন বাঁদীর উপর শুক্রবার তাঁর দিলেন বেন কোনরকমে অবতর না হয়।

### — পাঠ —

বাদশাহ ছবি দেখে সমস্ত হ'লো—অমন গভীর হ'লেন কেন? ছবিতে এমন রং ফলান তো দেখি নি। বেগমকে প্রণত-উজ্জ্বলে আলিঙ্গন করলে তার মুখে যে রং ফুটে উঠে এবে সেই রং—সেই ছবি! এ কি করে চিত্রকর সৃষ্টিয়ে তুলল।

স্বহ চিত্রকরকে—বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন।

সে শুধু বলল, “আমার নাম পানামালা, বাবী জরপুর, আর কিছু জানি না।” বাদশাহ বহু প্রশ্ন করেও আর কোন

উত্তরই পেলেন না। বাদশাহের ক্ষোভ ও জ্যোষ হ'তে নাগাল—এমন বোয়াদব তো দেখি নি।

হুস্ব হ'ল—বন্দী করে অন্ধকার কারাগারে নিকপ কর। বাদশাহ জরপুরী বেগমকে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি জরপুরের পানামালাকে চেন?”

বেগম একটু বিম্বিত হয়ে বলল—“জরপুরের পানামাল সে কোথায়? সে কোথায়?”

বাদশাহ বলল—“সে সেই বেতমিল চিত্রকর।” আমি তাকে আজীবন বন্দী করে রেখেছি—অন্ধকার কারাগারে—সে তোমার কে?”

বেগম—“সে আমার বাগাবদ্ধ।” বললই মুজিত হ'য়ে পড়ে গেল। তখন আগ্রার চর্প-প্রাচীরে পশ্চিম গগনের আলো ক্রমে অন্ধকারে ভুবে বাজিল।

সে চিত্রকরের নাম মার কেউ শোনে নি। শুধু তার হাতের আঁকা ছবি আগ্রার প্রাসাদের দেয়ালে আজও তার অস্তিত্বের ইতিহাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

## আদি পরিণয়

শ্রীহরনার সরকার

আদিম রূপের স্বয়ং-সমুদ্রে উঠিয়াছে হলাহল।  
কামনার নগি মদন করে ভোগের অমৃত লাগি;  
নিবিড় আধার অধীর আবেশে হ'য়ে ওঠে চকল  
প্রবাল-শরনে কামনা-লক্ষী কাঁপিতে সহসা জাগি।  
স্বয়ং প্রথম আলোক-ওঠে চুপিছে নীলিনারে।  
মাতীর বক-ভেদিয়া উঠিছে প্রথম-প্রমাণধর;  
প্রথম প্রাণের স্পন্দন শুধু সন্মীরণে সকারে  
পরাধি-অর্পণে স্পর্শন মাগে রহস্য-বন্ধুর।  
নরোক্তা হ'য়েছে নবীন ধরনী অদ্বি-বেদের সাগে।  
বিরহ-তিমির-তোষণ-ব্রহ্মারে মিলন-দীপালি অলে;  
না-কোটা তারকী প্রকাশ ব্যাধার প্রথম পূসকে মাতে  
শাশা স্থতির তরুর অমৃত মদিরোৎসব চলে।

আদিম কবি ভিহ্ন সে মহামিলনে প্রথম মিলন-ভোর।  
বস্তু ক্রমহে হ'য়েছিহ্ন মালা অদ্বা-লোকে বসি।  
প্রথম-প্রাণাত পরাগ-মন্ড্রে ক্রম-কণ্ঠ ঘোরা  
বিবাহ-লোকে পুরোহিত সম উঠেছিল উজ্জ্বল।  
সে দিন আছিহ্ন অশরীরী স্বর নবীন স্বরন সাগে।  
সে দিনের কবি শরীরী হ'য়েছিহ্ন যুগ যুগান্ত পরে;  
তবুও মনের আধ-বিস্তৃত স্বপন-গভীর রাত্রে  
আজো হেরি যেন আদিম দেবতা আসি পরিণয় করে।  
পুরানো যুগের বাসর-বস্তু আজো যোর চোখ ভরি'  
\* ভিত্তিম দীপের এ সাধ আধারের রহস্য হ'য়ে ভাগে;  
পুরানো জগতে ভায়া হ'য়ে বেন কিরিতজিহ্ন সফরি  
বিরাগ পরোষি গেরি বিশি দিশি তরল উজ্জ্বলে।

## বিষাদ-যোগ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বহু

গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপুস্তক। ইহা প্রতি জীবের জীবনের পথপ্রদর্শক, ভাবাবির দিগদর্শন বয়।

অনেকে গীতার অনেক রকম পাণ্ডিত্য-স্বর্ণ টাকা লিখিয়াছেন, অনেক বড় বড় পণ্ডিত গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এমন সময় কখন আসিবে না, যখন গীতার মূল ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না। গীতা জগতের সমস্ত মানাঙ্কপে রঞ্জিত।

গীতার বহু বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন টাকা রচিত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে। ইহার দ্বারা এই বৃদ্ধা বয় যে, গীতা-কথিত দার্শনিক তত্ত্বগুলির ঠিক অর্থ কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের দ্বারা সম্ভব নহে, ইহা একমাত্র সাধনার দ্বারা অনেকাংশে বা কতকাংশে সম্ভব।

গীতার বর্ধার অর্থ বৃষ্টিতে হইলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই বাণীর অমূল্যদান করা উচিত, তাহার বাণীই গীতার প্রধান টাকারূপ।

বিষয়সমাজে অনেক সময় গীতার তাৎপর্য্য লইয়া গোলাগোলা উপস্থিত হয়।

এই অবস্থার গুণা কি বলেন, তাহা গীতাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত, কারণ এইরূপ অর্থই সর্বাঙ্গের সমস্ত জগতি মনে হয়। এই সহজ স্বরূপ পথ ধরিয়া চলিলে গীতাই প্রকৃত গীতার্থ সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবে। সত্য সর্বদাই স্বয়ং প্রকাশ।

গীতা “যোগ যোগোপধায় কৃৎসং সাংক্য কথ্যত স্বয়ম্।” গীতা—১৬/৭৫

“কৃৎসং ভগবান স্বয়ম্।”

শ্রীমদ্ভাগবত—১৩/৩২৮

স্বয়ং স্ববৎসা কৃৎসং পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।

জগত্বেদো হতরাণি বিধুনোক্তি স্বয়ং সত্যম্।

শ্রীমদ্ভাগবত—১২/১৭

বাহ্যরা শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথা শ্রবণ করেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই এই শ্রবণকারীদিগের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহাদের কাম-ক্রোধাদি অমঙ্গলকর বস্তু সকলকে বিশেষরূপে শিথিল করেন, অর্থাৎ তখন সাধকের চিত্তের উপর আর কাম-লোভাদির প্রভাব থাকে না।

সেই শ্রদ্ধার বলে, সাধকের তত্ত্বাণুদের তিরোভাব হয় এবং সেই সত্ত্বে সর্ববিধ সংশয় দূর হইয়া, নিঃসাম্যিক বুদ্ধির উদয় হয়, বধ্যা—

“ভগবন্তঃ বিভ্রান্য.....জায়তে।”

গীতা জীবের জীবনব্যাপার সম্বন্ধে অজ্ঞেয় সমস্ত রাখিয়া, সাধকের মনে প্রত্যক্ষাভূত হুটিয়া তোলে।

গীতার উপদেশে ভারতের চিন্তাধারাকে একটা সংহত সূত্র দান করিয়াছেন, বাহাতে জীবন-সমস্যার সমাধানের উপায় পরিষ্কার করিয়া বলা আছে।

স্বতরাং আমাদের চক্ষে, অর্থের তর্ক অপেক্ষা আত্মিক বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া, সাক্ষাদ্ভগবৎপূজনাৎ মুখ-বিনিঃসৃত বাক্যের অমূল্য গণনা, সাধক শ্রেষ্ঠ অজ্ঞানের মত সমস্ত সংশয় ছেদন করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া বসিতে পারি—

“নশ্রো মোহঃ স্থূলভিলা হংপ্রসাদানমরাচ্যুত।

হিতোহি গত সন্দেহঃ কথিতো বচনঃ তব ॥

—গীতা-১১/১৩

শ্রীভগবানের বাক্য নিঃসন্দেহরূপে শ্রবণের ফলে, অজ্ঞানের আয়তনবন্ধন দৃষ্টি উদিত হওয়ার, তাহার মোহময় বিকার্য্য বিদূরিত হইল এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবনে ভগবান্ভা কখনও লঙ্ঘন করিবেন না।

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণকর্তে সমাধান এবং জীব তাহার ক্ষেত্রসঙ্গে দণ্ডায়মান আছে।

জীব দীর্ঘের দীর্ঘে যে প্রকারে মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়, কৃষ্ণকর্তৃত্ব আদর্শ রণাঙ্গনে আদর্শ-পুণ্ডরী শ্রীকৃষ্ণ



আদর্শ শিখা অর্জনেকে তাহারই একধাণি আদর্শ ছবি দেখাইয়া গিয়াছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ জাতিহত্যার সম্ভাবনা দেখিয়া অজ্ঞানের মনের ভিতর অনেকরকম প্রশ্ন উদ্ভিত হয়। তাহার দ্বন্দ্বক্ষেত্রে বিশ্বাশ করিয়া ফুলি।

বিবাদে, সন্দেহে, আশঙ্কায়, জীবন-মরণের সন্ধিরূপে সাধকের প্রাণ যখন বিশালাঙ্গী হয়। তখনই সে বিবাদ-ভাষা রাস্তা, দিগ্‌মাত্র ছন্দটুকু লইয়া ভগবানের দ্বারস্থ হয়। বলে—

কার্পণ্য দোষাপহৃত স্বভাবঃ

পূজ্যমি বাঃ ধর্ম সমুচ্চ চেতাঃ।

যজ্ঞোঃ শ্যাস্তিক্রিতাঃ ক্রিহি তদ্রূপে

শিষ্যোঃ হংস শাস্তিঃ বাঃ প্রণয়ঃ ॥

—গীতা—২।৭

সাধকের চিত্ত ধর্মসমুচ্চ হয়। গিয়াছে। ধর্ম কি অর্থ কি, কর্তব্য কি, অকর্তব্য কি, বিচার করিবার শক্তিকে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কার্পণ্যবোধে, তাহার শক্তি, উৎসাহ, উত্তম দৃষ্টি হইয়াছে। নিজের ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা, বিশ্ব সমুচ্চ হইতে পরিমাণের উপায় নাই দেখিয়া, বিরাট শক্তির নিকটে সাধক সাধায়া প্রার্থী হয়।

ভগবান প্রত্যেক জীবকে মুক্তির দিকে লইয়া বাহিবার জন্ত তাহার দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জীবের সারথী স্বীকার করিয়া তাহাকে মুক্তিমার্গে লইয়া যান।

বিপদের ভিতর সম্পদ লুক্কায়িত থাকে। অমঙ্গল সাধনের দ্বারা ভগবান কাঁহাকেও বিপন্ন করেন না। বিপন্ন দ্বারা মতি-ভগবতী হয়। অধর্মশ্রম লাভ হয়। অশ্রদ্ধা আশ্রিত ও অশ্রদ্ধাবির মধ্যস্থলে সাধক বিশ্বাসধির সারথী স্বীকার করিয়া, সফলমনে তাহার ইচ্ছের দিকে চাহে ও তাহার চরণে হুটাইয়া পড়িয়া বলে, “হে প্রভু, আমি তোমার শিষ্য-শরণাগত, আমি অজ্ঞ কাঁহাকেও জানি না, তুমি আমার শিষ্য দাও ও কো কর।”

অর্জুন একদে ভ্রূপানকে দীনভাবাপন্ন জানিয়া জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণের সখ্য ছাড়িয়া, শিষ্য স্বীকার করিলেন। একরূপ দেহভাব না। পুণ্ড্রিকের শ্রীভগবানের মরণ গ্রহণ করা একপ্রকার মৌখিক ব্যাপারে পরিণত হয়; হস্তরাং

শ্রীভগবানের অমুগ্রহ লাভ করা যায় না। এমন কিয়া যতদিন না নিজের জীবভাবকে নিজের একভাবের শিষ্যে নবিত করা যায়, ততদিন সাধনার পথ বন্ধ থাকে।

নির্ভরতা না আসিলে শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাণে যখনই সংশয় আসিলে, তখনই হৃদয়স্থ গুরুকে সে সংশয়ের মীমাংসা করিবার জন্ত প্রার্থনা করিলে।

জীব, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্ত কাতর হইলে, শ্রীভগবান তাহাকে গুরু বেধাইয়া দেন, যিনি সাধকের তৃপ্তা ও ও ব্যকুলতা অনুযায়ী তাহাকে শক্তি ও জ্ঞান দান করেন। গুরু ভগবৎশক্তি আকর্ষণ করিয়া

শিষ্যের হিতার্থে তাহা নিরন্তর দান করেন। জীব যখন জীবন-মরণের সন্ধিরূপে আসিয়া বিশালাঙ্গী হয়। আপনাদে জীবন বুধা হয়। যার দেখিয়া ব্যাকুল হয়, রণক্ষেত্রে মধ্যস্থলে শুদ্ধদ্বন্দ্বের গাড়িয়া জীবনে জয় পরাজয়ের আশঙ্কায় সন্নিভভাবে অপেক্ষা করে, তখনই তাহার চৈতন্য প্রবৃত্ত হয় এবং সে নিজের কর্তৃত্বরূপ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্ব নিরন্তর নিকট কামিয়া বলে— “প্রভু, জগৎগুরু, আমি বিপন্ন, পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমাকে সাহায্য করিবার কেহই নাই, আমার রক্ষা কর, আমার পথ দেখাইয়া দাও, আমার কর্তব্য নির্ধারিত করিয়া দাও।”

সেই মহামুহুর্তে সাধকের হৃদিস্থিত নারায়ণ জাগ্রত হইয়া উঠেন এবং তাহার নিকট স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলেন—

তে ব্যাণা বা চ বিমুক্ত ভাবো।  
ভক্তবাহ্যাক্তরূপ ভগবান তখন দেহপূর্ণক সাধককে বলেন— “তুমি পৃথিবীর বিকট রূপ দেখিয়া ভীত হইও না, তুমি তোমার দৌর্লভ্য পরিভাগ্য কর, আমি তোমার সর্গায়। তুমি যাহা এখন সমুচ্চ বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, উহা বস্তুতঃ সমুচ্চ নহে, উহা দৌর্লভ্যমাত্র ও অনিত্য, ইহাতে তুমি অভিভূত হইবে না।”

ইহাই বিবাদ যোগ। এইখান হইতে গীতার আরম্ভ। সাধক মাঝেরই প্রাণে সর্ব প্রথম এই ভাব উদ্ভিত হয়। এইখান হইতে সাধক তাহার মনোমর্মেক্ষেত্রে গীতা শুনিতে পায়।

ভগবৎসাধকের জন্ত প্রাণের বিবাদময় ভাব হইতে সংযুক্ত

ভাব অবশি গীতা। বিবাদ হইতে মুক্তি পর্যন্ত অবিকার প্রাপ্ত হয়। তখন সে জগতের সমস্ত বিষয়ে—শব্দে, স্পর্শে, রূপে, রসে, শীতে, উষ্ণে, আলোকে ও

জীব যখন এই ধরনি শুনিতে পায়, তখন সে বুদ্ধিতে পাবে যে, তার মুক্তিপূর্য আর অধিক বিলম্ব নাই। ইহাই বিবাদের গূঢ়ত্ব। সাধক তখন আপনাকে আপনাদে ভিতর খুঁজিয়া থাকে।

তখন সহসা বিদ্রাভের মত, অজানাত্তর জীবের আশ্চর্য শক্তি জাগিয়া উঠে এবং সে সম্মা যোগ শিবিবার

## সম্মোহিতা

( উপভাস )

[ পূর্ণাহরতি ]

শ্রীমতী উমা মিত্র

বিশ

গীতের মধ্যাহ্নে মাসীমাতা দালানের উপর আত্মত মাহুরে দেহভার ত্রুস্ত করিয়া আরামে শুইয়াছিলেন, দাসী পারে মাগিপের তৈল মর্দন করিয়া দিতেছিল। কয়েকজন প্রতিক্ষিপিনী তাহার নিকটে বসিয়া পান চিবায়েতেছিলেন। প্রত্যহ উহার দরবার এইরূপে ভরিয়া থাকে এবং রমণের অন্তরে আসিবার পূর্বে ভাঙ্গিয়া যায়। এই দরবারে পাড়ার বধু হইতে বালিকা কস্তার চাল চলন, হাব-ভাব, চরিত্রের সমালোচনা হয়। থাকে। যে দিবস কোন বিশেষ কার্যে এই বৈঠক বসিতে পার না, শুনা যায় সেদিন মাসীমাতার আহার্য বস্ত্র পরিপাক হয় না। অজ্ঞ আলোচনার বিষয় ছিল হুগেল। যদিও তাহাকে লইয়া আলোচনা প্রত্যহই কিছু না কিছু হইত, তথাপি উহার অজিকার অপরাধের গুরুত্ব অজানি অপেক্ষা অনেক বেশী, সেইজন্য মিষ্ট রসের প্রাচুর্যটুকু মাসীমাতা

সম্পূর্ণ উপভোগ করিয়াও তৃপ্ত হইতেছিলেন না। বাসনের সিন্দুক হইতে কি বাহির করিবার নিমিত্ত হুগেল চাচি চাহিয়াছিল। প্রথমে তিনি কথাটার কর্পাত করেন নাই, কারণ আপনাদে অধিকারকে অজ্ঞ রাধাবার জন্ত তখন অভিমানের ব্যথা ছিলেন, কিন্তু হুগেল ও বসন ছাড়িল না তখন দস্তর মত বকুনীর পর তাহাকে উহা দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল— কিন্তু মাসী এ অপমান সহজে ভুলিতে পারিতেছিলেন না। এমনই করিয়া না কি প্রত্যেক কার্যের স্বরূপাত হইয়া থাকে, এই তো আশ্রয় বাসনের চাচি চাছিল, কাল হয় তো ভাড়ারের চাচি চাছিল, পরন্তু হয় তো উহাকে চৈলিয়া সকল কর্তৃত্বের দ্বাবী করিয়া গৃহিণীর আসন গ্রহণ করিলে—বৈঠকে তিনি এই মর্মে কথাটা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, ‘এ মনে তোমার দরবার’ কি, কমিশনের বো হয়েছিল এই মনে করে যুগী হ’য়ে থাকবে না’ চাচি চাছিল। বসিল।’ গৃহিণী রমান দিয়া বলিয়া বাইতেছিলেন সোতারাও মাধুর্য সম্পূর্ণ উপভোগ করিয়া গইতেছিলেন।



পালে হাত দিয়া জটন করিয়া বলিলেন, “বল কি দিদি সে দিন ঘরে উঠেছে আজ চাইণ কি না চাবি। কি কাণ্ড, কালে কালে কতই না লেখ, কিন্তু তোমায়ও বলি এমন খেঁচে বো আনলে সেকি পোষ মানো।”

অপর একজন মতব্য প্রকাশ করিলেন, “ভুলেরও ওতে শোখনি আছে ভাই, নইলে বোর সাখি কি চাবি চাইবার।”

রমেনের মাসীমাতা বলিলেন, “এমন ছনই শব্দেও আবার রমেনকে দিতে পারে না ভাই, ওকে সে পাঁচো না কি! তা ছেলে আমার পুত্র ভাল দিদি, বোঁচকের বশে করলে বটে বিয়ে, কিন্তু ওকে যবে যবে শুতে কেউ দেখে নি।”

সবিস্ময়ের সার্থের মাতা বলিলেন, “ও মা সে কি কথা গো বড় গিল্লী নতুন বিশি একি কাণ্ড একদিনও রমেন বোমার বাহির যায় না।”

হাসিয়া মাসী বলিলেন, “না মা ছেলে আমার বড় ভাল একদিনও যায় নি, বরং এ কালাহুতী দিনরাত ওর পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়, জলটা, পানটা, খাবারটা সব নিজের হাতে করে নিয়ে যায় মাগো যেমার বাড়ি না এ কি বেহায়াপনা।”

“কেন মাসী ছেলের হাতে হাতে যদি সব শুছিয়ে দেয় সে তো ভাগ্যই। শুনেছি বৌটা না কি বড় কষ্টটি, লজ্জা।”

মুখ বিকৃত করিয়া মাসী বলিলেন, “এত দিন যে সে ছিল না, তা বাড়ীতে বাজারের খাবার কি চ্যাত? কি জানি বাপু ওঁর আদিকৈতা দেখতে পারি না, ভাড়া কষ্টটি কৈ এই কতকণ ভোমরা রয়েছো দিলে একটা পান দেবে।”

“কেন এই মাত্র যে ডিবে ভরে দিয়ে গেছল, চাপলের মত চিবুলে সে বেঁচারী কি করবে।”

“কেন করবে না। তবে যে খি পান যাজত তাকে ছাড়িয়ে দিলে কেন, যদি নিজের যোগ্যতাই নেই, সার্থে কি পাল বেড়ায়। বলি ও নবাবকলে শুনে তো পাছ? এ গাল বেড়ায় ওঁর বসিয়া হুলোপ ননদের ভেত উল্লর কোট বুনিতেলিল, শাকড়ীর মিষ্ট সস্তায়ণ কর্ণে প্রবেশ করিতে বিলম্ব হইল না, কারণ ইহা প্রাত্যহিক ঘটনা। প্রথম প্রথম

অম্বল হইলেও এখন উহা প্রায় সহিয়া গিয়াছিল। না সহিলে চলিবে কেন, যেছার যে সে উহা বরণ করিয়া লইয়াছে। নীচে নামিয়া শাকড়ী লেখা জিজ্ঞাসা করিল, “ডেকেছেন মাসীমা?”

মাসীমাতা উত্তর দিলেন না।  
কতকণ পবে পুনরায় বলিল, “আমায় ডেকেছেন।”  
বাক্য করিয়া মাসীমা বলিলেন, “হাঁ গো হাঁ ডেকেছি, ডেকেছি, কতবার বলব? একটু দাড়তে পার না, টেরের ফেল হ'য়ে যাবে না কি। চোখের মাথা খেয়ে খেতে পুচ্ছ না, পান যে নেই।”

লেখা নীরবে পানের কোটা হাতে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে উঠিতে জনিতে পাইল, “হা ঘরের মেয়ে কি না জমিদার-বাড়ীর কথা কি বুঝবে। একবার পান দিয়ে মনে করলে, কি ক'মই না সরেছি।”

কোটা শুধু সাজা পান রাখিয়া ফিরিতে গিয়া মাসীমাতার ভীত মন্তব্য শুনিয়া অহত অস্তর করণে লেখা ফিরিয়া দাড়াইল।

“বলি নবাব-কলে রাতদিন কেতাব নিয়ে বসে না থেকে ঘরসামানগুলো দেখ এক একবার।”

অন্তেষ্টকি কঠে লেখা বলিল, “এখন তো কোন কাজ নেই, তাই ওপরে গেছলুম।”

মুখ বাকিয়া মাসীমা বলিলেন, “খাবার করা হ'য়েছে।”

“হা।”

“তবে আর কি উদ্ধার করে দিচ্ছে আমার।”

বধুর মুখ দেখিয়া রমেন মা হ্রস্বিত হইলেন, এমন স্তব্ধপ্রতিমা কষ্টটি শান্ত যেহের অদ্বৈতে বিনা অপরাধে এ কি লাঞ্ছনা; কথাতিকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঁ মা তোমার বাবার বড় অম্বল ছিল না? এখন একটু সরেছেন।”

পিতার কথার উত্তর নেত্র অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। উত্তরে বলিল, “একটু সরেছেন কাকীমা এইবার হাওয়া বদলাতে যাবেন।”

মাসীমাতা কিং কারণে রাগিয়া উঠিলেন, কেহ যদি লেখাকে একটু সরেছে বাক্য বলিত, তিনি সহিতে পারিতেন

না। কর্তৃকশে মাসীমা বলিলেন, “ওর কথা শোন কেন হাওয়া বদলাতে যাবে না হাতী। মেয়ে বিক্রী করে তো পাঁচতাল্লার টাকায় মিলেগ তো মিনসে খুব সেরা না আছে, কিন্তু সে টাকা কি আজও বসে আছে।”

একথা বহুবার স্বামী ও মাস-শাকড়ীর মুখে শুনিয়া শুনিয়া লেখার একরূপ সহ্য হইয়াই গিয়াছিল, কিন্তু আজ এতগুলো লোপের সামনে, পিতার এ অপমানের কথা শুনিয়া বেচারী মর্দাংগ হইয়া পড়িল। কোন কিছু বদন সীমারপরে ডিঙাইবার উপক্রম কতে তখনই উহা অসহনীয় হইয়া ওঠে। লেখার আজ হইয়াছিল তাহাই। কোন দিকে না চাহিয়া লেখা উপরে উঠিয়া আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ হইয়া বিছানার কইরা কানিয়া ফেলিল। সে যে নিম্নের মনের সঙ্গে অনেক সাগ্রাম করিয়া ইহাদের সংসারে মানাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে, তবে বাবের বারে আঘাতে তার সেই সাধনকে লুপ্ত হুটাইবার এ প্রয়াস কেন ইহারা করিতেছে প্রভু। স্বামীকে লেখা চিনিয়া লইয়াছিল সেই দিন যে দিন পিতার অম্বল সংবাদ শুনিয়া উহাকে দেবিয়ার আকুল আগ্রহ লইয়া তাহার অম্বলি চাহিতে গিয়া বাক্যের নিষ্ঠুর কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। আর সে দিন মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কোন দিন পিতালগ্ন হইবার ভয় অম্বলোপ করিবে না। ধরিত্রীর ভ্রাস সননশীলা বাঙ্গলা দেশের নারীর পক্ষে এই স্পৃহাটী মমণ করা কি এতই শক্ত। উহার ভাব্য অবস্থারূপে স্বামী যে দিন চোখে আকুল দিরা দেখাইয়া দিয়াছিলেন, জমিদার-বধু, কালস কড়া-বিক্রেতার কাছে যাইতে পারে, না। ইহাতে জমিদারের মাত্রেয় লাভ্য হইবে। সে যে জমিদারের বধু হইবার তোড়ায়া বিভ্রান্তার নিকট উত্তরে কামোদী করিয়া আনিতে পারিয়াছিল ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়া তাহার খুশী হইয়া থাকা কর্তব্য, ইহার অধিক কামনা করা কোন মতেই উচিত নয়। সত্যই কি তাহাই। হুলোপা জোর করিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, সত্যই তো তাহার কামনার কিছুই না—থাকিতে পারে না। কামনা বাসনা আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতের রজনী চিত্র, গুপ্তিত করনা ভাঙার উদ্ধারকরে যে দিন যেছার দুঃস্বাদ খসিয়া দিয়াছে, তাহার ভাবপ্রণব, সৌন্দর্য্যপিম্বা ছায় ও নির্মল চরিত্র এই লম্পট মন্য

কদাকার জমিদারের চরণে নিবেদিত করিয়াছে—জীবন-মরণে তাহার সহিত অচ্ছেদ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে সে কি জমিদার-বধুরা হইবার ভ্রাতা। এতদূর তাগ-বীকারের পশ্চাতে কি তাহার কোনরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। হুলোপা আশনার মনের গোপন কোণগুলি তর তর অন্বেষণ করিয়া দেখিল এখনও তাহার ছদ্ম মনোভাব মত ধু ধু করিতেছে না—এখনও তাহাতে প্রেমের ক্ষমত বহিয়া যাইতেছে—এখনও তাহার দৃষ্টিভঙ্গ্য আকুল নিপাতারিহায়ে। জোর করিয়া স্বাকার করিতে চাহিলেও যে উত্তর নিবৃত্তি নাই—শেষ নাই। যুক্তকরে সে ভাব্যবানের নিকট বল চাহিল—বল দাও প্রভু, শক্তি দাও। মর্তের দেবতা, আকাশের দেবতা, যে যেখানে আছে আজ তাহার সহায় হও, মনে বল দাও সে মনে স্বামীকে ভালবাসিতে পারে তাহার শত অভ্যাস অভ্যাসের সর্ব করিয়া প্রভা ভক্তি দিয়া একমাত্র উহাকেই দেবতার আসনে বসাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ উহারই চরণে অর্পণ করিতে পারে। শক্তি দাও প্রভু সকল সহিবার সহিষ্ণুতা দাও। স্বামীকে ভক্তি করিতে ইইবে তিনি যাহাই হউন, ভালবাসিতে ইইবে কেন সে পারিবে না, তাহাকে নিশ্চয় পারিতে ইইবে, কুস্তখার পার্থ দাঁড়াই-বার স্থান করিয়া দিতে ইইবে।

হঠাৎ হুলোপার চিত্তের বাধা পড়িল, ইলা আসিয়া বিষয়ে উহার অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কাঁদে কেন বৌদি ম সী মুখি বকেছে?”

কি প্রহসন্ত অকুল দ্বারা চকু মুছিয়া হাসিবার চেষ্টা করায় লেখা বলিল, “এতকণ কেশ খসিছে ইলা?”

“তুমি মুখিও না, বুকেছি, আবার বকেছে আছা দাও তো দাদার খাবার।”

অপর গৃহ হইতে খাবারের থালা ও জল আনিয়া হুলোপা ইলার হস্তে তুলিয়া দিল। দিবানিত্রা সাধু করিয়া রমেন অন্তরে আগিঠেছিলেন, ইলা পথ আঙুলিতে বলিল, “এখন ভেতরে যেতে হ'বে না এই ঘরে বসো, খাবার বেতে দেবে আমার কথাগুলো শুনবে।”

“তোমার আমার কথা কি রে?” বলিয়া রমেন হাসির উঠিল।

“তোমাগা নয় দাদা ও ঘরে চলে।”



ঘরে লইয়া একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট করাইয়া ইলা বলিল, “বড় বৌদিকে তুমি ঠাই করায়” বিয়ের করে দিয়েছিলে, তাহার বাইরে গিয়েও সে চোরাশ নিক্তার নাই, বাস্তবিক রকমে শেষ পর্যন্ত ছাড়ালে, এমনভাবে করে এনেছো আমি বতুর বুঝি এও তোমার ঐ মাসীর জায়া কোন দিন গণ্যার হুঁজি দেবে, এ যদি না হয় তবে আমার সব কথা মিথ্যা।”

উপেক্ষাকরের রমেন বলিল, “বায় কেন মাসীর সঙ্গে লাগতে?”

“কি দাদা, এত যে ওর ওপর অত্যাচার হচ্ছে, কিন্তু কেউ কোনদিন ওর বুৎ থেকে টু শব্দ শুনতে পেয়েছে? এমন শিক্ষিত মেয়ে তার কুপালা কি না এই হৃদয়।”

“তাই না কি রে।”

উত্তেজিত ইলা বলিতে লাগিল, “নয় তো কি। প্রবেশিকা পাশ করেছে, কি চমৎকার গান করে—”

বাধা দিয়া বিমিত রমেন জিজ্ঞাসা করিল, “লোপা পড়া জানে না কি? কে জানে, এক রাত্তা চাড়া আর যে কিছু জানে এ কথা জানিও না, বেশ তো শোনা না একদিন গান।”

“ওরে বাপের ছোট বৌদি গাইলে মাসী কি আর রকে রাখবে। তখনই হয়তো গলা টিপে ধরবে, আর গান দাড়া ও হাথের মধ্যে নয় ওদের সব ছিল।”

ব্রহ্মপুত্র কষ্টে রমেন বলিল, “তবে কোন রাজা-রাজ্জার ঘরে মেয়ে কে? সেই জন্তে বুজি গুঁর বাবা পাঁচ হাজার টাকার মেরে বিক্রী করলে?”

পান লইয়া হুলোপা আসিতেছিল কথটা শুনিতে পাইল, কিন্তু এই মাসী না কি নিজের সঙ্গে বোখাপড়া শেষ করিয়া স্বামীকে তরিত করিতে, ভালবাসিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, তাই এই আবারের উগ্রতা দৃষ্টিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। যে মাটিতে সীতা সাবিত্রী জন্মিয়াছিলেন এবং তারা দিদি-কুন্তলা জন্মিরাছেন, ভারতের সেই মাটিতে যে ভাণ্ডারও গন্ধ তখন এই কুন্তলা, সামান্য আবারে সে এত অসহিষ্ণু ও অশ্রুণী হইয়া উঠে কেন। না, নারী সে অশ্রুণী হইলে চলবে না হৃদয়ে প্রকৃতির হইয়া পানের ডিবা টেবিলে রাখিয়া হুলোপা করিল।

অন্ত রমেনের চিত্ত কিছু প্রসন্ন ছিল, যদিও একটা উত্তেজনা এবং খোঁজালের বশে ইটাকে বর্ণনা করিয়াছিল, কিন্তু ভালবাসিতে পারেন নাই।

সাময়িক উত্তেজনা না কি অবসাদের বিস্তীর্ণ বাসুকার অস্থিত হইতে বেশী সময়ের অপেক্ষা করেন না, মুহূর্তমাত্র সময়ই তাহার গকে মথিল। তাই সেই উত্তেজনার বজা অস্থিত হইয়া গিয়াছিল বহুদিন পূর্বে, কোন এক ক্ষুদ্র মুহূর্তে। দ্বীপ বিশ্ব রমেন চিন্তামাত্র করে নাই কোন দিনই, দ্বীপ অস্ত্রপুণ্ডে থাকিলে, এক আধদিন হয় তো একটু কথা বলিলে, বাসু কর্তব্যের তো ঐক্যনেই সমাপ্তি। দ্বীপ গোলাপী হইয়া কি জমিদারের মানায়। তবে আজ না কি ইলার নিকট ঐ মুক নারীর কতকগুলো জীবন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাই রমেন স্বীয় স্বভাববাহিত সন্ধান সামান্য একটু অগ্রহ জানাইয়া বলিল, “চলে যাচ্ছ কেন ছোট বোঁ, বাস না একটু।”

অবাক-বিময়ে হুলোপা ইলার নিকট বসিয়া পড়িল।

“তুমি না কি লোপা পড়া বেশ জান? গান বাজনাও জান, এ কথা আমার বল নি তো কোন দিন।”

“তুমি তো জ্ঞানতে চাও নি কোন দিন দাদা।”

“তা বটে, তা হলে একদিন শুনিবে যে ইলা।”

“তাই দেখো” বলিয়া ইলা উঠিয়া দাড়াইল। “তুমি বস, বৌদি আমি এলুম বলে” বলিয়াই কিপ্রপদে সে চলিয়া গেল।

এত বড় গুণের মালিককে ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া রমেনের শিরায় শিরায় অশ্রুধন ধরিয়া উঠিল, “তোমাকে না হাজার বার ব্যর্থ করছি এমন মোটা বিনীত কাপড় ব্যবহার করতে।”

মহাকণ্ঠে লোপা বলিল, “কিন্তু এ বেদেশের তৈরি, পরতে আমার কষ্ট হয় না।”

“তোমার পরতে কষ্ট না হ’তে পারে, কারণ বাপের ঘর থেকে তা অভ্যাস আছে, কিন্তু এত আমার মাথা হেঁট হয়। বড় ভুলী তুমি।”

“দাদা না হয় পরব না, তবে এ শাড়ীগুলো পরতে আমার বড় ভাল লাগে।”

“আবার সেই কথা, বুঝি, সেই জন্তে মাসীর তোমার

সঙ্গে বসে না, এর জন্তেই না মেয়েদের লোপা পড়া শোখান ভালবাসি না। লোপা পড়ার গুণ তো এই জেনে আর স্বাধীনতা।”

লোপার মুখ ক্রমশঃ পাত্তপর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, প্রত্যেক কার্যেই প্রত্যেক কথায় কি নীচ ভাবের ইঙ্গিত, অপমান, কি ভীষণ; কিন্তু এত যে জানা কথা তবু আজ কিসের এ জালা অস্বামানের কেন এত ভীত বাধা। হুলোপা উঠিয়া দাড়াইল।

কি ভাবিয়া রমেন সহসা দ্বীপ হাত ধরিয়া কিংকিং অস্থত্বপুণ্ডে বলিল, “রাগ হলো বুঝি?”

স্বামীর স্পর্শে আড়ষ্ট হইয়া লোপা দাড়াইয়া রহিল।

দ্বীপ কণ্ঠ, রান মুখের দিকে চাহিয়া রমেন বলিল, “তুমি দেখতে তার চেও তের সুন্দর, কিন্তু তোমার মধ্যে প্রাণ নেই, শিবানীর মধ্যে তা আছে।”

লোপার লেগার নেত্র দীপ্ত হইয়া উঠিল।

“আজ্ঞা বোঁ তোমার বাবা তো গরীব, তবে তোমাকে লোপা পড়া কখন করে শোখেন?”

সংকট লোপা উত্তর দিল, “আগে ছিলেন না।”

“ওই তো তোমার সঙ্গে বসে না, তার কারণে বড় মাহুরী না জানালেই নয়, পাঁচ হাজার টাকা যে আমিই তাঁকে দিয়েছি এতো আর মিথ্যা হ’বার নয়।”

লোপার শাস্ত্র মেজ উৎকট বেদনার জ্বলিতে লাগিল—মন্তক পুড়িতে লাগিল।

রমেন পুনরায় প্রশ্ন করিল, “কি আর যে বড় কথা কহে না?”

“বলবার যে আমার আর কিছু নেই।” লোপা পুনরায় উঠিল।

“যেও না শোন।”

লোপা বলিল, “ভরকারী কুটবার সময় হ’য়েছে” বলিয়াই বাহিরে হইয়া গেল।

রমেন কোষে ক্লান্তি লাগিল, দরিদ্র কভার এত বেজার কিসের? আজ উদ্যোগ সহিত ভাল করিয়া কথা কহিয়াছিল, কোথায় খুসী হইলে, না অবজ্ঞাভরে চলিয়া গেল।

এমন সময় রমেনের বৌদি আসিয়া ডাকিলেন, “দাদাপুত্রো।”

“কে বৌদি? এতদিন পরে?”

ভূমিকামাত্র না করিয়া কুন্তলা বলিল, “ইলার সম্বন্ধ ঠিক করেছি, বিয়ের উদ্যোগ করো।”

প্রচুরমনে রমেন বলিল “আমি কি জানি, যে সব তোমরা ঠিক করো।”

“বেশ তাই। ভট্টাচার্য্য তা হ’লে ডেকে পাঠাই।”

“পাঠাও সব ঠিক হ’লে আমার বোলা।”

“তুমি বরের কথা কিছু জিজ্ঞেসা করলে না যে?”

তরলকণ্ঠে রমেন বলিল, “জানবার দরকার আছে বলে মনে করি না।”

“কিন্তু আমার তো জানাবার দরকার থাকতে পারে।”

নির্ণিষ্টের ভার রমেন বলিল, “তবে বল।”

“মরেনের সঙ্গে বিয়ের ঠিক করেছি।”

রমেন শুদ্ধিত হইল, কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া বলিল, “বেশ।”

“এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই?”

“একটুও না।”

“মরেনকে তুমি ভাল চাও—”

—হ্যাঁ শেবা না বৌদি তবে এটাও ঠিক জানি ইলার ভাল-মন্দর কথা তুমি বত ভাবেই আমরা তা ভাব’না, শুকে যে সত্যিই তুমি ভালবাস—ওকে যে তুমি মার পেটের বানের মতই মাহয় করছ; আর শরীর কর্তব্য শায়ের শেষ অহরোহতা তো আমি উপেক্ষা করতে পারি না—আমি যত বড়ই অত্যাচারী, স্পানী হই না—ইলার বিয়ের তার তিনি তোমার ওপরই দিয়ে গেছেন—আবার ওপর নয়।”

একুশ

ক্রমে ইল্লুর বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। ইলাকে সম্বত করাইতে কুন্তলাকে অনেক ধানি বেগ পাইতে হইয়াছিল। কুন্তলা ইচ্ছা করিয়া একদিন জমিদার গৃহে রহিয়া গেল। মাসীমাতা ইচ্ছাতে অসম্মত হন নাই বরং আগ্রহই দেখাইলেন এবং তাঁহার পণ্যের কটকটক যে স্বানান্তরিত করিতে উদ্যত, সেই কুন্তলার প্রতি তাঁহার কঠোর চিত্ত ইচ্ছাতে কিংকিং প্রসন্ন হইল। কুন্তলা



এবং ইহার আগ্রহে রমেন বাধ্য হইয়া হুলেখার পিতা ও জাতকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইল।

কথায় কথায় একদিন রমেন জিতেনকে জিজ্ঞাস্য করিল, “বিবাহের পরে উহার কোথায় যাইবে; কি করিবে।”

উত্তরে জিতেন বলিল, “সম্পত্তি বাবাকে চেঞ্জ নিয়ে যাই; সেখানে বাবা আর দিলিকে রেখে আমি দেবীগারে ফিরে যাব।”

“আপনার আর কোন আছেন না কি? কই একথা তো ভনি ভি।”

হাসিয়া জিতেন বলিল, “আমার আপন সহোদরা নন, আমার দিদি আপনার বৌদি।”

“ও” বলিয়া তৎপরেই অভমনম্বভাবে রমেন জিজ্ঞাস্য করিল, “দেবীগারে আপনি কাজ করেন?”

“সব দেখা-শুনা করতে হয়।”

“নায়েব আপনি?”

“না।”

“তবে?”

“ও গা টুকু আমাদের কি না তাই দেখা পোনা সব করতে হয়।”

অদৃশ-বিষয়ে জমিদারের চক্ষুয় বিফারিত হইয়া উঠিল, এ বলে কি। পাগল না কি। যে গোঁকরে বাবা টাকা নিয়া কত্কার বিবাহ দেয় তাহার এখন জমিদারী থাকা কি সম্ভব? তাঁর জমিদারীর মত তিনিটা সিরাজ গা একত্র করিলেও যে দেবীগারের সমকক্ষ হয় না।

“দেবী গা সবটাই না।”

“না সবটুকুই।”

এই তো পরিকারভাবে বলিল, ভাবিল তবে শব্দর মহাশয় পাচ হাজার টাকা লইয়াছিলেন কেন? কে এ প্রোজেক্টর উত্তর দিবে। রমেন স্থির করিল উত্তরমুখে সন্ধান লইতে হইবে। কিন্তু ইলাকে আশীর্বাদ করিবার সময় যখন তাহার শব্দর মহাশয় পাচ হাজার টাকা বা তাহার অধিক হুলেখা একত্বে কর্তব্যের হার বাহির করিলেন তখন আর কোন সন্দেহ রহিল না এবং সেই সঙ্গে সে পিতা-পুত্রের আত্মর্থনার পার্থক্যও পরিপাকিত হইল—শব্দর ও জ্যোতি শ্যাপকের জায়-সঙ্গত আত্মর্থনা চমিত্তে লাগিল।

বাহনা ও আলো করিয়া বসু বিবাহ করিতে আসিল। মেসোরা বর দেখিতে ছুটিল; কিন্তু কানের মধ্যে ডুবিয়া মুহূর্ত মাত্র হুলেখার অবসর হইতেছিল না বর দেখিবার। বরবেশ সময় লেখার ডাক পড়িল, হুলেখার বেশের দিকে চাহিয়া মায়ীমাতা তীরকণ্ঠে বলিলেন, “ভিদি দেখ, কি আকোল গা, যেন কিছু নেই, কোন গরীব হুসী ঘরের বৌ।”

লেখার গতি রুদ্ধ হইল। কথটা শুনিতে পাইয়া কুন্তলা বলিল, “ছেলে মানুষ কি জানে। চট করে বোনারদী খানা পরে নাও লেখা।”

শুধু বোনারদী পরবে কি গা, গহনা-উপনা—”  
যাইতে যাইতে কুন্তলা বলিল, গহনাগুলো পরে নিম্ন; একটু শিপাবীর করিস বোন।”

অলঙ্কারে ভূষিতা বসু বসে বোনারদীর অঙ্গ সামলাইতে সামলাইতে মাদোমাতার সহিত হুলেখা গ্যালালোক্তিক প্রশস্ত অঙ্গনে বরের সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কুন্তলা বরণ ডালা উহার হস্তে তুলিয়া দিয়া বরণ-প্রবালী দেখাইতে লাগিল। বরের মুখের দিকে চাহিতে গিয়া লেখার উত্তোষিত হৃৎকর অবশ হইয়া পড়িল। অতীত, অভাবনীয়, বিস্ময়কর ব্যাপারে উহার বোধশক্তি পর্যন্ত মূগ্ধ হইল। হস্ত কাঁপিয়া উঠিল, অশ্লিত বরণ ডালা কিপ্রকার সহিত ধরিয়া কুন্তলা উহার সমাজনীনে দেহ জ্বালাইয়া ধরিল। কোহুগীয়া স্ত্রী-পুরুষ উদাহরণকে বিস্মিয়া দাঁড়াইল। অপরের হস্তে বরণের ভার দিয়া কুন্তলা উহাকে লইয়া ভিত্তি তৈরীয়া যাইতে যাইতে বলিল, “সারাদিন যা পরিশ্রম পেছে, এতখানি আঙুনতাত্ এ ছেলেমানুষ পারে কি সুইতে।”

নরেন একবার মাত্র ঐ স্ত্রীস্বরী কীবাঙ্গীর তরঙ্গীর দিকে চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছিল। বৃকের কোথায় যেন কিসের তীর ব্যাধা জাগিয়া উঠিতেছিল। একদিন যে উদাহাই হইতে পারিত, তাহার চিত্তও যে এখন পাপ, সে যে এখন পরের স্ত্রী। চক্রে নেনা ভাবিয়া যাহাকে অববেশা করিয়াছিল কুন্তলা হুলেখার মধ্যে যে বাস্তবতা কিছু ছিল, কে উহা ভাবিয়াছিল, না তো এখন ভুল করে কেহ!

তবে কি সত্যই যে উহাকে ভালবাসিয়াছিল। আর

এখন, এখন—নরেন শিরিগা উঠিল। উহাকে দেখিয়া লেখা অমন হইয়া পড়িল কেন? কিন্তু সত্যই যদি সে ভালবাসিত তবে পূর্বে সেই অস্বীকারের দিবস, লেখা কিছু বলিল না! কেন এতটুকু—একটুখানি ইঙ্গিতও নয়, তখন উহার মুখ-ভাবেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইতেও দেখা যায় নাই। কিন্তু আজিকার লেখার বিবর্ণ বেদনা-ভরা কাতর দৃষ্টি যেন তার অন্তরল পরিকারভাবে দেখাইয়া দিল।

বাসর-ঘরে নরেনের আকুল নের কাহাকে অবেশণ করিতে পারাণ্যার ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত লাগিল; কিন্তু আকুলিত মর্দন আত্ম ভগ্নত হইয়া উঠিল। তাই শূন্যবৃত্তিতে নিরীশ-হৃদয়ে বেগারা শুদ্ধভাবে বসিয়া রহিল। রমণীদলের হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ-বাণ তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না—তাছাড়াও সঙ্গীতের উদ্দামতাও তাহার শ্রোণে রেগা টানিতে পারিল না। তাঁহারা একব্যাকে মস্তব্য প্রকাশ করিল জামাতা যেমনই অধঃকারী তেমনই গোঁয়ার—জী-লোকদের মান রাখিতে জানে না।

### বাইশ

“তা হলে তোমার সঙ্গে শীগগীর দেখা হ'বে না?”

“না।”

কথা হইতেছিল নরেন ও জিতেনের মধ্যে।

“বৌদি কি আর এখানে ফিরবেন না?”

“সে তাঁর ইচ্ছে সত্ত্ব্যতঃ দেবীগারেই থাকবেন।

সামান্যত তিনি যাতে একটু শান্তি পান তাই করে দেবো ভাই।”

“অর্থাৎ?”

“এগুলি কি বলা যায়।”

“একটুও কি না?”

“মহাশয় বা ভাবে সব সময় সে কি ঠিক হয় নরেন?”

“তবুও বল বিরা বা না থাকে।”

“বাবা কি, তোমার কাছে, দেবীগা খুব বর্ধিত গ্রাম, লোকজন বিস্তর, কিন্তু অন্তর্য গ্রামে একটা মেয়ে মূল বা ডাকারখানা নেই, তাই ভাখছি ভাল কয়জন নাস নিয়ে যাব, শিক্ষিত্রীও নেবে, এ ছাড়া যদি করে উঠতে

পারি, তবে দিলিকে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী করে রাখবার ইচ্ছা আছে। এই নিরূপে বেশ শান্তিতে জীবন কাটান যাবে কি বলিস?”

“তা তো বৃহদুয় কিন্তু যখন সবই হলো তখন তুমিই বা অবিরাহিত থাক কেন জিতেন?”

“কি অর্থাত্মব সে তুমি, তুমি যে তাই করলি সাত কাও রাখার পড়ে জিজ্ঞাস্য কচ্ছিস সীতা কার বাবা।”

“হেরালি ছাড় জিতেন।”

“সত্যই বসুজি ভাই এখন বিয়ে আমি করবো না, এক-শুলো কাজ চোখের সামনেই পড়ে আছে, জীবনটা কি ঐ দিয়ে ভরে উঠবে না?”

“কিন্তু বিয়ে করলেও গুলো সব করা যায় মধ্যে থেকে তুমি সংসারী হ'য়ে স্বামী হ'বি?”

“কিন্তু আমার মানসিক পুঞ্জো যদি মনেই করি।”

“সে আবার কি?”

“বলেছি আমার মতের সঙ্গে তোর মত কোনদিন মিলবে না, মিথো মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই কিছু।”

“লোকমানও নেই, সত্যি তোর কথা শুনে অবাক হচ্ছি বিয়ে করলে বৃদ্ধি মানসীর পুঞ্জো করা যায় না?”

হাসিয়া জিতেন বলিল, “বলেছি আমার মত জ্ঞান রকম, আমার মতো তা যায় না। যে দেবী, যে পবিত্র তাঁকে কি পাঁকে ভোবান যায়? কেমনে দেখাই দিয়ে ইঙ্গিত-শালসার ভূমি তো চাটনা কোন দিন। প্রাচ্যের কবিতা যার মহিমা গানে দিগদিশন্ত মাতিয়ে তুলে বরণ কুতূহল হ'য়ে গেছেন, যার রস ও মাধুর্যে সাহিত্য আজও অমন, সে প্রেম কি একটু আলিন্দে আর ক্ষুদ্র এক চুপনেই তৃপ্ত হ'তে পারে? সে কি এত ক্ষুদ্র যে সীমার মধ্যে সীমা দিয়ে তাকে আটক করা যায়? না নরেন তার জ্ঞান সাদনা চাই, একুপ্রান্তর দরকার। সে যে অবিনাশী, অমর। তুমি এ বুঝবে না, আমার মানসী কত উঁচুতে ছনদ্যার বাইরে যে, তাঁকে কাছে ভাববার মত স্পষ্টা কল্পনাত্তও করি না, শু্যতে তাঁকে ছোট করা হয়। আত্মতৃপ্তির জ্ঞ প্রেমের সৃষ্টি হয় নি বরং তার জ্ঞান নিজকে নিঃশু উজাড় করে বিলিয়ে দেবার জ্ঞতে।”



বিস্মিত নরেন নীরবে বসিয়া রহিল।

আহার্যারি পর শাক্শলোচনে জিতেন ও কুন্তলা  
হুলেবার নিকট বিশাল লইল। কান্দিয়া কান্দিসুলেবার  
চোখমুখী তই হইয়া উঠিয়াছিল—সে পিতার বকে দুষ্ট  
শিশুর দায় স্বাপাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কান্দিতে  
লাগিল। উগ্রকে শাস্ত করিতে বৃদ্ধ ব্যাধ হইয়া পড়িলেন।  
বাহির হইতে হুলেখাকে স্ববী বলিয়া মনে হইয়াছিল,  
তাই পিতা যেন বড়ই সাহস পাাইয়াছিলেন। কতকণ  
কান্দিয়া একটু শান্ত হইয়া লেখা বলিল, “বাবা এই কি  
শেষ দেখা?”

রোমান-বিকৃতকণ্ঠে ভক্তার বলিলেন, “তোকে নিয়ে  
যাব না।”

পঞ্চম মধ্যো সর্গে সর্গ দেখিলে পথিক যেরূপ ভয়ে,  
শঙ্কায়, বিবর্ণ, ভীত হইয়া উঠে লেখাও সেইরূপ সর্প-  
দুষ্ট ব্যক্তির দ্বারা চকিতে পিতার বকে হইতে মুখ ফুলিয়া  
আঁকিতে বসিয়া উঠিল। “না—না—তুমি মিথ্যা মিথ্যা  
অপমান হ'রো না বাবা আমি সব পারি, সব পারব,  
তুমু এইরূ—তোমার অপমান সহিতে আমি পারব না।  
ডেক না আমার, কখন ডেক না।”

মুদ্রের দ্বারা ভক্তার কজার বিবর্ণ মুখের দিকে  
চাহিয়া রহিলেন। আজ লেখার কথার ভক্তারের চমক  
ভাঙ্গিল, তাহা হইলে সকলই স্থল, কজার মনে কিছুমাত্র  
স্বপ্ন নাই। গম্ভীর জামাতা অল্প লেখার সহিত  
আদ্যাবধি করে। তিনি প্রশ্ন করিলেন, “লেখা না  
কি বহনস্থি তুই?”

পিতার বাক্যে লেখার গুপ্ত সজ্জা কিরিয়া আসিল,  
নিজের দুর্লভবাস্তু বহিতে পারিয়া সে লজ্জিত হইল।  
পিতার বকে নুতন করিয়া বাঁধা জাগাইয়া তুলিয়াছে  
বুঝিয়া অসত্য হইল। এ কয় দিন দুর্লভতার সহিত  
জুজিয়া সে প্রায় সজলকাম হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শেষে  
মুহুর্তে এক বিভ্রান্ত বাবাইরা ফুলিল। বলিল হাসিয়া লেখা  
বলিল, “তুমি আজ চলে যাচ্ছ কি না তাই আজ না তা  
বলে কেনেছি।”

কখন হাসি হাসিয়া ভক্তার বলিলেন, “বাগের

চোখে দেখা গিতে পারবি না মা, সত্যি বল লেখা  
রমেন কি তোকে পাঠাতে আপত্তি করেন?”

ইতস্ততঃ করিয়া লেখা বলিল, “এদের বাড়ীর বোদের  
না কি বাগের বাড়ী যাওয়ায় নিয়ম নেই।”

“ও তাই।” বৃদ্ধ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

ভাবিলেন তবে লেখাকে এরা কষ্ট দেয় না।

লেখা স্ত্রিভাষা করিল “বাবা দাদা না কি অনেক  
বড় জমিদারী পেয়েছেন?”

“হ্যাঁ মা, দেবী গা পেয়েছে আর নয়গণ অনেক টাকা।

বোদের এক মাদী ছিলেন ছোট বোয়ার তাকে,  
দেখাছিল মনে না থাকাই সম্ভব।”

“থাক, তা হ'লে টাকার জুড়ে আর ভাবতে হবে না  
তোমার, নয় বাবা?”

গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভক্তার বলিলেন, “এখন আর  
এতে লাভ কি মা? আমার সব কেড়ে নিয়ে তোকে—”

“চুপ করো বাবা তা হ'লে দিগিও যাচ্ছেন? তাকে  
কিন্তু আমি আসতে বিও না তুমি।”

“পাগলের কথা শোন, জোর করে কি তাকে  
রাখতে পারি।”

“জোর করে নয় বাবা তোমার তিনি বড় ভাগবাসেন,  
তুমি না বেরে কখনও আসবেন না, তিনি না থাকলে  
তোমার বড় কষ্ট হবে যে বাবা।”

জিতেন আশিয়া বলিল, “আর দেবী করণে ট্রেন  
পাব না।”

কুন্তলাকে প্রণাম করিয়া লেখা পিতার হস্ত কুন্তলায়  
হস্তের উপর রাখিয়া বলিল, “আর থেকে বাবাকে  
তোমার হাতে নিয়ম, বল দিদি এর সব ভার তুমি নিলে?”

অক্ষ মুহুর্তা কুন্তলা বলিল, “সে যে অনেক আগে  
নিজেছি বো—তোমার দেবারও অপেক্ষা করি নি।”

কুন্তলাকে জড়াইয়া ধরিয়া ইলা উভয়ের কান্দিয়া  
উঠিল, “দিদি দিদি, আমার বৌদি কোথায় যাচ্ছে? পাখি  
আমার ফেলে থাকতে পারবে তুমি?”

বাহুদ্বাণে আবদ্ধ করিয়া আবার করিয়া কুন্তলা বলিল,  
“কেনে যাচ্ছি না ইলা, স্বদেশবার কাছে তুই বেশী যত্নে  
থাকবি, অশীর্বাদ বরি তুই বারী নিয়ে স্ববী হ'।”

কতকণ পরে কয়েকখানা পাকী জমিদারের লৌহ  
ফটক পার হইয়া সাব্বার পড়িল। হুলেখা কিতলের  
দবাকের গরাদে শ্রিয়য়া বিষয় অপগক নেজে চাহিয়া  
রহিল।

পশ্চাত হইতে নরেন ডাকিল, “বৌদি, লেখা?”

স্তুতি লেখা ফিরিয়া দাড়াইল।

“তোমার কি বলে ডাকব? বৌদি, না লেখা  
বলে?”

“বা বলে আপনরা ইচ্ছা হয়?”

“বা: তুমি জমিদার বাড়ী এসে যে অনেকখানি  
সভা হয়ে পড়েচো, এর মধ্যে আপনি বলতে শিখে  
নিরছে?”

হাসিয়া লেখা বলিল “আপনি বলা কি থারাপ?”

“না থারাপ নয় তবে তুমি'র চেও মিঠেও নয়।”

“তা হ'বে কিন্তু স্তন্যম আপনারা না কি আজ  
যাচ্ছেন?”

“আপনি বলে যে আমি কথার উত্তর দেবো না,  
লেখা।”

“বড় ভাইকে যে আপনি বলতে হয়? তারপর  
এখন আপনি আমার পুজনীয় বস্তুর মহাশয়ের  
জামাতা।”

“কিন্তু জিতেনকে মহাশয়ার তুমি বলতে একটুও  
আপত্তি হয় না, তবে যে কি তোমার চেও ছোট; আর  
এ নতুন সবজের খোর ভোমাকেই আমার মাজ করা উচিত।

কিন্তু তা বলে রাখছি আমি আপনি বলতে পারব না।”

“বেশ, তুমিই বল—আজই বাবে কি? ইলা বড়  
কাচছে, দিদি চলে গেছেন কি না।”

“না হয় আজ নাই বাব।”

উভয়ে নীরব হইল। হঠাৎ নরেন বলিয়া ফেলিল,  
“এখানে বেশ স্বপ্নে আজ তো লেখা?”

এক প্রশ্ন? লেখা কথা কহিল না।

প্রশ্নের আশেবশ উপলব্ধি করিয়া নরেন অগতঃ  
অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, এই স্বপ্নে ঠিক এই প্রশ্ন করা সমীচীন  
হয় নাই এবং ইহাও তো যে জিজ্ঞাসা করিতে চাহে নাই।

তাড়াতাড়ি এই অপরূপ খ্যাগনের মানসে অপর একটা দোষের

স্বপ্নন করিয়া ফেলিল, বলিল “স্বপ্নি রমেনবাবু না কি  
তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না। একি সত্য?”

এ কি মুদ্রের দ্বারা প্রশ্ন, এ প্রশ্ন করবার তাহার  
অধিকার কি?

“তুমি একটু বস নরেননা, আমি রাগায়র থেকে ঘুরে  
আসি।” হুলেখা চলিয়া গেল। জড়ের দ্বারা নিশ্পল

আড়ষ্ট নরেন ভাবে বসিয়া রহিল।

তৈশ

ইলার বিবাহের প্রায় ত্রি বৎসর সুখিয়া গিয়াছে; ইতিমধ্যে

ভক্তার একবার কুন্তলার সহিত হুলেখাকে দেখিতে আসিয়া  
ছিলেন। প্রায় মাশাবধি পিতা ও ভক্তার নিকট হইতে

কোন পরামি না পাওয়া হুলেখা বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল,  
কোন কাহে চিত্ত হির করিতে পারিতছিল না, মধ্যাহ্নের

দীর্ঘ অবসর যেন কাটিতে চাহিতেছিল না, বৃৎ ভবন  
নীরব নিস্তাভ। দাম-দাসী যে বাহার গৃহে গমন করিয়াছে

গারারাজি জাগরণের রানি দূর করিবার জ্ঞ জমিদার  
বাহিরের গৃহে সিংহা নিভার ময়। রাজে পুনরায় বন্ধ-বান্ধব

ইলা মুতা-নীতের মজলিসে জাগিতে হইবে। নানীমাতা  
নেপালের বধু দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। হুলেখা

শোমি করিতে বলিল, কিন্তু মন লিতে পারিল না; বিরক্ত  
চিত্তে উঠা পরিত্যাগ করিয়া বহিঃবস্তুর পরিত্যক্ত এদ্যাহ্নের

কাণ মোচড়াইতে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু মরিচাতার তার মিলাইতে  
গিয়া বধন সব কটাই প্রায় ছিঁড়িয়া গেল তখন এ অসাম্য

সাধনে নিয়ত হইয়া অর্গামের ডাঙা ফুলিল, অক্ষল দ্বারা  
দুখা কাড়িয়া হুলেখা বহনিন পরে বাজাইতে বলিল।

বাজাইতে, বাজাইতে কখন গান ধরিয়াছিল, লেখা নিজে  
সে কথা জানিত না, যদি না রমেন বাহ্যত দিয়া আর একটা

গাইতে বলিত। লজ্জা পাওয়া হুলেখা উঠিয়া পড়িল, মুদ্র-  
খিতরে জমিদার বলিলেন “বা: এমন স্বপ্নর গাইতে

পার তুমি? কোণার লাগে এর কাছে বোলজান।”

বিবাহের পরে অজ রমেন হুলেখার বাটে বলিল।  
উঠা লেখা একাই ব্যবহার করিত। ইতিপূর্বে রমেন কোন  
দিন লেখার সহিত একসঙ্গে এখানে-বসে নাই।

“বন্ধ করলে কেন, গাও না নতুন বৌ।”



ত্রীভাবনতা লেখা বলিল,—“স্বামীমার ফেরবার সময় হয়েছে।”

সহসা রমেন উঠাকে ছই হাতে আকর্ষণ করিয়া নিজের পাশে বসাইয়া বলিল,—“সত্যি বল—তুমি কি আমাকে একটুও ভালবাস না?”

হুলোখা শিথিয়া উঠিল।

“চুপ করে থেক না—বল! জানি—আমি শুনেছি, হৃদয় জিনিস তুমি ভালবাস, কুসংসিত বলে কি—”

আত্মকণ্ঠে লেখা চাঁচকার করিয়া বলিল, “নাথ, থাম তুমি চুপ কর।”

ঠোং রমেন গাভীরোর সহিত লিঙ্গাসা করিল—“নরেনবাবুর সঙ্গে বেদি বিয়ের ঠিক হয়েছিল, তবে হয় নি কেন?”

লেখা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, দীর্ঘ ছই বৎসরের পর আজ এ কি প্রশ্ন! শান্তির এ কি ব্যবস্থা, সে তো ভাবিয়াই ছিল স্বামীর পাদনিরে বসিয়া অভিশপ্ত, বিকৃষিত, জীবনের কাহিনী অরুণটে শুনাইবে, তারপর স্বামীর দেওয়া শাস্তি মথার তুলিয়া লইবে। কুসংসিত হোন, তিনি স্বামী—পিতার বিপদের ত্রাণকর্তা, সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া উঠাকে পুষ্টা করিবে। কিন্তু বলা হয় নাই কিছুই। স্বামী সন্ধ্যায় হইয়াছিল এক বিচ্ছিন্নভাবে, রূপিত আবরণের মধ্য দিয়া। সেই আবরণ সরাইয়া স্বামী কোন দিন নিকটে আসিয়া দাঁড়ান নাই, সে যে কথাগুলো বলিবারও সময় পায় নাই। কিন্তু আজ যখন স্বামীর প্রসঙ্গ উঠবে সে কথা বলিবার সুযোগ উপস্থিত হইল, তখন তাহার মনের ভাব পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, কল্পনার সবটুকুই নিশেব হইয়া গিয়াছে।

উত্তর না পাইয়া রমেন পুনরায় বলিল,—“চুপ করে থেক না আমি সব শুনেছি, অবশ্য নরেন বলে নি, ও তাই বুঝি বিদ্রুপ সিন ঝাঁক দেখে অজনি হয়ে পড়েছিল?” হুলোখার পুষ্টাবর্ণের মুখের প্রস্টি চাহিয়া গুঁহ কপিত করিয়া রমেন হাসিয়া উঠিল, বিদ্রূপ করিয়া বলিল, “এটা তা হ’লে শুধু কাস নয়, টায়েজী কি বল? কিন্তু ভদ্রলোকের ঘরে এমন অভিনয় বড়

একটা দেখা যায় না, তা হলে আমি খুব ভাগ্যবান ঘরে বসেই এমন চিত্তাকর্ষক অভিনয় দেখে নিলাম।”

স্বামীর কুসংসিত ইঙ্গিতটুকু লেখার বুকে বিবিয়া উঠাকে আশ্বির করিয়া তুলিল; কিন্তু তাহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না। এত বড় নিলজ্জতার উত্তর আছেই বা কি। লজ্জায় অসমানে হৃদয় খুব থানি আরক্ত হইয়া উঠিল। দ্বার দিকে চাহিয়া চাহিয়া রমেন বলিল, “আমি জানতে চাই যে এখনও কি তাকে তুমি তেমনি ভালবাস?”

চুপ করিয়া থাকিলে স্বামী কপটাকে অধিকতর কুসংসিতাবে লইবেন ভাবিয়া, অভমান-হতা লেখা বাগদাদগদ কণ্ঠে সত্যভাবে উত্তর দিল, “কিন্তু মাহুৎষক অপমান করবারও একটা সীমা আছে।”

একটা পতীর নিঃশব্দ দেগিয়া জমিদার বলিলেন, “বেশ তাই আমি দিন কতকের গজ কলকাতার বাড়ি, জান বোপ হয় বাবার সময় আমার না জানিয়ে বৌদি শিবানীকে নিয়ে গেছেন, সে দেখতে ভাল না হলেও তোমার মধ্যে বা নেই, তার মধ্যে সে জিনিস ছিল। আহা—বেচারার!”

দুগার ও বিরক্তিতে হুলোখার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল, এই স্বামী! বাহিরের আচরণ বাদ দিলেও ভিতরের দিকটো তাহার কি কুসংসিত—অস্বাভে আপনায় বিবাহিতা পত্নীর সহিত একজন পবিত্রার যে স্বামী তুলনা দিতে পারে, তাহাকে ভালবাসিতে, ভক্তি করিতে সে বাস্তব। ছিঃ ছিঃ তার আত্ম-সম্মত কি একটুকু নেই। কিন্তু কুজগাধি ও দাদা যে উঠাকেই ভক্তি করিতে, শ্রদ্ধা দিয়া মনের সকল কানী খুঁজা ভালবাসিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। অন্তর মধ্যে মহিয়সী চিরস্থরগীয়া রমণীপথের পুত্র চিত্র আঁতু করিয়া দিয়াছেন। রমেন আবার বলিল, “নিরৈই যখন পেছে ওকে, বৌদির হাতে যখন গিয়েই পড়েছে, কিরে পাবার তো আর উপায় নেই। তাই বাড়ি কলকাতার মতিবিধিক এনে রাখব। দেখি তাকে কেমন করে ত্যাগ্য। তোমার দাদা আর বৌদিক লিখে দিও, ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে বৌদের গোলাম

হ’তে পারব না, তারা যত চেষ্টাই করুন। শিবানীকে যদি ফিরিয়ে দেয় তা হ’লে শক্তিকে আনব না, লিখ সব কথা বুঝেছ?”

দস্তে অধর চাপিয়া হুলোখা মন্তক হেলাইয়া সম্মতি জানাইল। নিয় হইতে কয়েকবার ডাকিয়া হুলোখার উত্তর না পাইয়া স্বামী উপরে উঠিলেন কিন্তু লেখার গৃহে গিয়া তত্ত্বিত হইলেন, এ কি সর্বনাশ! ওই মায়ারী মেয়েটার ঘরে চেলে? আবার যিনের বেশা—বয়সছে কি না খাটের ওপর, তার ওপর আবার বৌকে কাছে বসিয়ে সোহাগ জানান হচ্ছে।

ঠোং স্বামী ডাকিলেন “বৌ।”

অন্তে ভীতভাবে স্বামীর দিকে চাহিয়া ব্রত চরণে লেখা বাহিরে গেল। ভিতরে উপবি? রমেন শুনিতে পাইল “ও মা অবাক হোনা। কি বোহারা গো, যিনের বেশা বরের কাছে বসে হেসে কথা বলতে লজ্জা হ’ল না তোর? তখন জানি ছোট-বয়ের মেয়ে আর কত ভাগ হ’বে।”

## গ্রামের বধু

ত্রীকনকদূষণ খোঁচাপাখার

আজি নরনের নীরে—  
পল্লীর পানে দ্রষ্টা আঁখি মোর চাহে খালি ফিরে ফিরে।  
জ্যোৎস্নের দিনে তুমি যে সেখায় পথে বিলাহেছে মায়—  
মাঠের ওপর পড়িয়াছে ঘেঘে আবার ঘেঘের ছায়া।  
গ্রামের বাসিকা গাগরী ভরিতে চলছে দীঘির জলে,  
অঙ্গ চরণে আপনার মনে হ’পায় তুলেয়ে দলে।  
নীলাম্বরী বধু পাশে চলে তার লাজের মহিমা নিগা—  
স্বরণে সহজ লীলার স্বহা পল্লীর পথ দিগা।  
ক’ চলে দীর্ঘে দেখলতটীরে সমাজ বসনে ঢাকি—  
আবার কখনো থমকি দাঁড়িয়ে চাহে মেলি ছই আঁখি।

ডাকারের অর্থের কথা, দেবীগ্রামের জমিদারীর কথা প্রকাশ হইবার পর হইতে রমেন ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্মান করিত। মাসীমস্তার এই অথবা ঘোষারোপ তার ভাল লাগিল না। যাহা কোন দিন করে নাই অজ তাহাই করিয়া ফেলিল। নীচে নামিয়া মাসীকে বলিল, “ওতো ইচ্ছে করে আমার কাছে যার নি আমিই তেঁকেছিলাম।”

পুত্রের বিরক্তি বুঝিয়া সহসা মাসী বানিকটা কল্পন রসের অবতারণা করিয়া ছলছল নেত্রে বলিলেন, “তোমার কাছে বসে, সে কি আমার অসাধ বারা, তবে না কি মেয়ে মাহুৎষকে বেশী নাই গিতে নেই—মাধার উঠে বসবে, তাকে বোমা যে রকম বেহুয়া, তাই বলি বারা বুঝে স্বকে—”

রমেন হাসিয়া বলিল, “সে ভয় করো না মাসী, বৌর গোলাপ হ’বে না। দিন রাত বাইরেই পাকি—আচ্ছা শোন কাল আমি কলকাতার বাড়ি ফিরতে তব তো বৌরী হবে।”

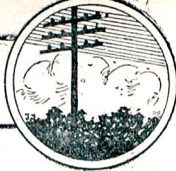
ক্রমশঃ

হৃদয় হইতে পথিক দেবীয়া ভাবে বুঝি আসে গ্রিহ,  
বাতাস উড়ায় এ না তাহার শুভ উত্তরায়?  
তারপর হার সে হতাশার তাহার বুকের আশা—  
যখন ঘের সে নিকটে পথিক, মিছা হ’ল ভালবাসা!  
অন্য কিশোরী কলস ভরিয়া সখী সাথে চলে ঘরে  
জানিনাকি তাই নরনে তখন গুর কি বাসল করে?  
ওর যেন হার আঁখিগুল শুধু জানে “প্রিয়-পরিচয়”—  
নরনের জলে বরিয়াছ তাই প্রিয়তমে অক্ষর  
উদ্ধার অক্ষর সনে—  
যোর মন যেন ফিরে যেতে তার গ্রামের কুজঘরে।

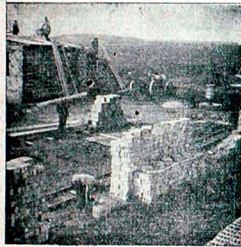




# বিশ্ব-জগৎ



জাৰ্ভেনীৰ বেকাৰ-সমতা :—  
জাৰ্ভেনীৰ বেকাৰ-সমতা-সমাপ্তিৰে জন্ম আৰম্ভণ  
খুবই চেষ্টা হৈছে। কৃষি-মহাসভা ইহাৰ সমাপ্তিৰে



ফাৰনিউকিনেৰ কৃষি-উপনিবেশৰ একটা দৃশ্য  
জন্ম বালিনেৰ ফাৰনিউকিন নামক স্থানে এক উপনিবেশ



টেগেলৰ সাম্প্ৰদায়িক ভোজনালয়

স্থাপন কৰিছে। সেখানে পাথৰেৰ কাজ কৰা হয়।  
বেকাৰ পোকসকল সেখানে কাজ কৰে। এইখানে  
কেবলমাত্ৰ পাথৰেৰ কাঠো নিপুণ লোকসকল নেওৱা হয়  
এংগ তাহাদেৰ বাসস্থান দেওৱা হয়। বাৰিনেৰ টেগেল



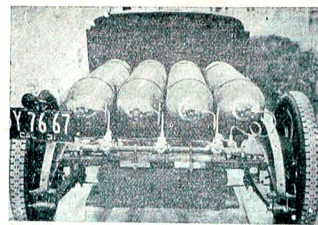
এমীয়া কৃষি-মহাসভাৰ অধিবেশ্য নৃতন "উপনিবেশৰ  
বেজাৰ বহু কৰা হৈছে।"

নামক স্থানে সাম্প্ৰদায়িক ভোজনালয় আছে, সেইস্থানে  
তাহাদেৰ কম খৰচে ভোজন কৰিতে দেওৱা হয়।

নবনিৰ্মিত মোটাৰ :—

এ পৰ্যন্ত আমাৰ জানি, পেটোলেই মোটাৰগাড়ী  
চালিত হয়; কিন্তু এখন একপ্ৰকাৰ মোটাৰগাড়ী  
আবিষ্কাৰ হৈছে, তাহাতে পেটোলেৰ মোটেই আবশ্যক  
হয় না। তেলেৰ পৰিবৰ্তে বাতাসেৰ সাহায্যে ইহাৰ কাজ  
চলে। এই গাড়ী প্ৰথম আবিষ্কৃত হৈবাৰ অব্যাহত পৰেই  
লম্বা এলেকাদে ইহাৰ কাৰ্য্যক্ৰিয় পৰীক্ষা হৈছিল। এই  
গাড়ীৰ পিছনে বাতাস রাখিবাৰ ব্যবস্থা আছে। মিঃ ৱয়,  
জে, মায়াস ইহাৰ আবিষ্কাৰক। আজ প্ৰায় ছয় বৎসৰ ধৰিয়া

তান এই গাড়ী নিৰ্মাণ কৰিবাব চেষ্টা কৰিৱা আৰম্ভিতহে।



বাতাসে চালাইবাৰ মোটাৰ  
মায়াসেৰ এই চেষ্টাৰ ফল জগতেৰ মোটাৰেৰ প্ৰসাৰে বে  
এক অভিনব অবদান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

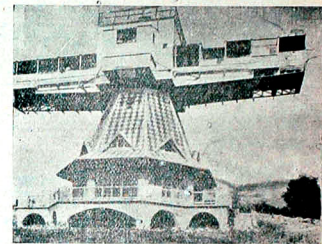
মাছবেৰ বাজৰেৰ পৰিমাণ-নিৰ্দেশক যন্ত্ৰ :—  
মিউনিকৰ মিউজিয়ামে একটা যন্ত্ৰ আছে, তাহাতে  
মাছবেৰ বাজৰেৰ পৰিমাণ জানিতে পাৰা যায়। এই যন্ত্ৰে



মাছবেৰ বাজৰেৰ পৰিমাণ জানিবাৰ যন্ত্ৰ  
নিৰ্মেৰ ওজন ও বয়স লিখিয়া দিবাৰ ব্যবস্থা আছে।  
তাহাতে বয়স ও ওজন লিখিয়া যন্ত্ৰেৰ উপৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানে  
শৰীৰেৰ ভাৰ অৰ্পণ কৰিতে হয়। তাৰো হইলে সেই মাছবেৰ  
শৰীৰেৰ অৱস্থাপ আৱশ্যকীয় বাজৰেৰ পৰিমাণ জানিতে  
পাৰা যায়। আমাৰ এই যন্ত্ৰেৰ একটা ছবি দিলাম।

খৃষ্ণেৰ ৱশ্মিতে চিকিৎসা :—

এই-সাঁ-বেন নামক স্থানে খৃষ্ণেৰ ৱশ্মিতে ৰোগ  
চিকিৎসাৰ জন্ত এক অভিনব ঘৰ প্ৰস্তুত হৈছে। এই



খৃষ্ণ-ৱশ্মিৰ চিকিৎসালয়  
ঘৰটো পূৰ্বতেৰ উপৰ অবস্থিত। ইহা একটা অষ্টকোণ  
ঘৰেৰ মাঝাৰ উপৰ সৰুৰা ঘূৰিবাৰ জন্ত প্ৰস্তুত কৰা  
হৈছে। চিত্ৰে পাঠকগণ ইহাৰ নৃতনত্ব ও আশ্চৰ্য্য গঠন

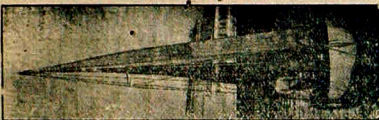


খৃষ্ণ-ৱশ্মি-চিকিৎসালয়ৰেৰ একটা বাওৰ ভিতৰেৰ দৃশ্য  
কৌশলতা দেখিতে পাইবন। ইহাৰ দুই দিকে দুইটা বড়  
বাৰ ও আৰ, দুই দিকে দুইটা ছোট বাৰ আছে। দীৰ্ঘ  
বাৰতক ঘৰেৰ মধ্যে খৃষ্ণ-ৱশ্মিতে চিকিৎসা কৰিবাৰ  
জন্ত ছোট ছোট ঘৰ আছে। ডাঃ জিন্ ৱেডম্যান ইহাৰ  
আৱিষ্কাৰক।

পালেৰ সাহায্যে পৃথিৱী-ভ্ৰমণ :—  
এ, বাটোৰ ও জে, বাটোৰ নামক দুই ভাই সম্ভ্ৰান্ত  
২৪ ফুট উচ্চ পালেৰ সাহায্যে সমগ্ৰ পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰিবাৰ



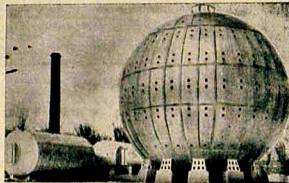
সম্বন্ধ করিয়াছেন। ছবিতে আমরা তাহাদের নৌকার  
ছবি দেখিতে পাইব—টোবাকোর বন্দরে ইটা গৃহীত।



ইহার সাহায্যে তাঁহারা অতিশক্তি মঙ্গলদায়ক পার হইবার  
চেষ্টা প্রস্তুত হইয়াছেন।

অভিনব বাহ্য-নিবাস!—

ছবিতে গোলাকৃতি স্তম্ভং বে জিনিসটা আমরা দেখিতে  
পাইতেছি, উহা একটা বাহ্য-নিবাস। ইহাতে মোট  
পাঁচটা ঘর আছে এবং ৩৩ জন রোগী তাহাতে রাখা  
বাইতে পারে। ইহার মধ্যে অক্লিষ্টকেন গ্যাসের সাহায্যে  
নানাবিধ রোগের চিকিৎসা করা হয়। রক্তহীনতা, বহুমূত্র,  
রক্তের চাপ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাই এখানে করা হইয়া  
পাকে।



কানিংহাম-নির্মিত বাহ্য-নিবাস  
স্থানে উহা নির্মিত করিয়াছেন। সেইজন্যই ইহার নাম  
দেওয়া হইয়াছে 'কানিংহাম হেল্প টাঙ্ক'।

সম্প্রতি কানিংহাম নামক এক ব্যক্তি ওহিও নামক

## মহাত্মা গান্ধী

ঐতিহাসিক মুণ্ডোপাধ্যায়

রক্ত মাংস দেখে এক  
মহাত্মা মহান

দেব নয়—ধরাতলে,

মুণ্ড ভগবান।

## স্বরেশচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তি

শ্রীমদ্রথনাথ ঘোষ

মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত স্বধীশ্বর!

সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতি অজকার সাংসদগণক অধিবেশনে  
আমাকে আমার স্বর্গীয় সাহিত্য-গুরু স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি  
মহাশয়ের সাহিত্য-কীর্তি-গুরু কিছু বলিবার জ্ঞানে  
প্রদান করিয়া আমাকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়াছেন।  
বাগ্যকান হইতে যে একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবকের নাম আমি  
শ্রদ্ধা করিতে উপদিষ্ট হইয়াছি, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঁহার  
অনহুকরণীয় ভাবময়ী ভাবার গহিত পরিচয় লাভ করিয়া  
আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি, বাঁহার একান্ত নির্ভীক ও  
পক্ষপাতশূন্য সাহিত্য সমালোচনামুহূর্ত আমাকে বহুদিন  
বিষয়-বিবৃত্ত করিয়াছে এবং আমার সাহিত্য রচিৎ সংগঠিত  
করিয়াছে, বাঁহার ওজস্বিনী ও আবেগময়ী বক্তৃতায়  
মাগর তরঙ্গ-গর্জন শূন্য ধ্বনি ধ্বংসে কত উন্নত ভাবের  
তরঙ্গ তুলিয়াছে, এবং জীবনের শেষ দশ বৎসর বাঁহার  
পরপ্রাপ্ত উপনিষ্ট হইয়া তাঁহার উপর ধ্বংসের স্মৃতি ও  
মেঘলাভ করিয়া দগ্ধ হইয়াছি, তাঁহার সাহিত্য সাহিত্যমোচনা  
করিয়া, তাঁহার গভীর পাতিভার পরিচয় এবং বহু স্তম্ভদেশ  
লাভ করিয়াছি, তাঁহার স্মৃতি পুঞ্জায় শ্রদ্ধাপূর্ণাঞ্জলি প্রদান  
করিতে অস্বীকার করা অসম্ভব ও অসম্ভবতার নিদর্শন  
বলিয়া গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে, মানুষ অস্বস্তি ব্যক্তির  
পক্ষে তাঁহার বিরাট সাহিত্য-কীর্তির পরিচয় প্রদানের  
প্রয়াস যে উচ্চতর শাণ্ডালিগণিত কদাচরণে উদ্ভূত উদ্ভূত  
বাৎসবের ক্ষম্য প্রচেষ্টার হাঙ্গাম্পন হইবে, সে জানও  
আমাকে প্রবিক্ষণ পীড়িত কারতছে। তবে আশার  
কণা এই যে, সমবেত স্বধীশ্বর ও শ্রীমদ্রথনাথ ঘোষ  
সাহিত্যচর্চার জীবনব্যাপী সাহিত্যচর্চার সুবিকৃত  
ইতিহাসের গহিত সুপরিচিত, তাঁহার কীর্তি-স্বর্গের অপরি-  
রান জ্যোতির স্মৃতি এবংও অনেকের মানসপটে বিভাসিত।  
সুতরাং ভাষ্য, বর্ণে সে গৌরবময় চিত্র রঞ্জিত করিবার

বিশেষ প্রয়োজন নাই, আমার পক্ষে অধিক কিছু বলিবার  
আবশ্যকতা নাই। কবি বর্ধাধি বলিয়াছেন :—

আগ্নিয়ে যুজতে বাতি প্রধর ভাঙর ভাতি,  
বুজি করা চুয়াশ কেবল।

স্বরেশচন্দ্রের বশঃস্বর্গের আলোক দেখাইবার জন্য আমার  
শ্রদ্ধায় এই স্তিমিত প্রদীপ ধারণ করিবার আবশ্যকতা  
কোণায়?

কিন্তু ছাণ্ডের বিষয়, সমাজপতি মহাশয়ের অধিকাংশ  
রচনা চুয়াশা সাময়িক পত্রের মধ্যে ইত্যতঃ বিক্ষিপ্ত  
ধাকায় তরঙ্গবয়স্ক বিক্ষিপ্ত তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা  
ও সমসাময়িক সাহিত্য-সমাজের উপর, অনন্তসাধারণ  
প্রভাবের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছেন বা কখনও পাইবেন  
কি না সন্দেহ। সেইজন্য যে সকল কার্যের জন্য আমরা  
স্বর্গীয় সাহিত্য গুরু স্বরেশচন্দ্রের স্মৃতি স্মরণবাসী  
চিরদম্পত্যনীর বিবেচনা করি, যাক্ষেণে তাহা বিবৃত  
করিবার প্রয়োজন আছে।

আমার বিবেচনায় সমাজপতি মহাশয়ের জীবনের  
সর্বপ্রধান কার্য—বিভাসাঙ্গ-কল্প-কল্প-বন্ধন-বন্ধন-বন্ধন-বন্ধন  
প্রভৃতি সাহিত্য-মহাবীর-সেবিত বাসনা-সাহিত্যের  
সর্বোচ্চ আদর্শ আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া  
সেই উজ ও মহান অকর্ণের অধুনা আমাদিগকে নিরন্তর  
প্রবৃত্তি দান। সাহিত্যের উন্নতি-সাধন তাঁহার জীবনের  
একমাত্র প্রতীক্ষা। তাঁহার একাক্ষিক বিশ্বাস ছিল  
সাহিত্যের উন্নতির উপরই প্রাচীর উন্নতি নির্ভর করে।  
সেইজন্য, জীবনের প্রথম প্রভাতে, যখন তিনি সাহিত্য-  
সেবার প্রতীক্ষা করেন, তখন সাহিত্য-সংগঠক এইরূপ  
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

“ভাষ্য উন্নতি সাহিত্য-সংগঠক  
সমত। সাহিত্য দেখিয়া ভাঙর ভাঙর ভাঙর ভাঙর  
সমত। সাহিত্য দেখিয়া ভাঙর ভাঙর ভাঙর ভাঙর



করা যায়। যে জাতি যত উন্নত, সে জাতির সাহিত্য তত শ্রীলপায়। যে জাতির সাহিত্য নাই, মানব জাতি-গণের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অতি অল্প। সাহিত্য সাধারণ মানব-মণ্ডলীর সাধারণ-সম্পত্তি, কিন্তু সাহিত্য সাধারণের সহজ-লব্ধ সম্পদ নহে। পুণ্য-শ্রম প্রতিভার সাহিত্যের উৎপত্তি, সেই প্রতিভার অশ্রুশালনে সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণি, সেই প্রতিভার ক্রমবিকাশে সাহিত্যের ক্রমপরিণতি। যখন প্রতিভা পূর্ণ বিকসিত হইবে, তখন মানব-সাহিত্যও চরম পরিণতির উচ্চতম, পূত সোপানে আরোহণ করিবে।

মানবের ক্ষুদ্রতা সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহিত্য ক্ষুদ্রতার পোষক বা সর্কারী পথের পথিক নহে, সাহিত্য সপ্তাঙ্গারগত-মতাবসরে চর্যে বন্দী হইয়া থাকিবার বন্ধ নয়। উদার পথের পথিক সাহিত্য অতি মহান, তাহা মানবকে বিস্তারিত পক্ষে, অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যায়। সাহিত্য অনন্ত উন্নতির সহায়; মহত্ব তাহার উপকরণ; মহত্বই তাহার ক্ষেত্র, মহত্বই তাহার আদর্শ; সাহিত্যের যেখানে ক্ষুদ্রতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্ষুদ্রতার বা সর্কারীতার পোষক নহে; সে ক্ষুদ্রতা, তুলনার মহত্বের মহিমা পরিস্ফুট করিয়া দেয়, এই মাত্র। সাহিত্যের মহত্ব প্রবর্তক—সাহিত্যের ক্ষুদ্রতা নিবর্তক। সাহিত্যের মহত্ব মানবের অনন্ত উন্নতির প্রতি পথ, সরল উদার দেবদাহি দেয়; আর, সাহিত্যে ক্ষুদ্রতার ছবি দেখিয়া আমরা তুলনার মহত্বের সৌর্য বহুিতে পারি। সাহিত্য অপকৃপাত বিস্ময়াই আমরা তাহাতে ক্ষুদ্রতার স্তম্ভ দেখিতে পাই—কিন্তু সাহিত্য কখনও ক্ষুদ্রতার, সর্কারীতার, অবনতির পক্ষপাতী নহে।

এই উন্নত সাহিত্যের নিমল বিভার মানব-হৃদয় আলোকিত হয়, এই আলোকে মানবপ্রতিভা-বীরে বীরে বিকসিত হইয়া উঠে এবং এই সাহিত্যের প্রভাবে মানব ক্রমে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে।

অতএব, যদি-কিন্তু মানবের আর্থনীর থাকে—অম্ভা সাহিত্য, যদি মানবের কিছু বরণ্য থাকে, তাহা সাহিত্য। যদি মানব-জাতির উন্নতির কিছু সহায় থাকে এবং তাহার অশ্রুশালন মানব-সাধারণের হিতকারী, উপকারী ও ধর্ম-স্থান হয়, তাহাও সাহিত্য।

সাহিত্য একটা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য লইয়া অগ্রসর হয় না, বিবিধবিভিন্ন উদ্দেশ্য তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। কেন না, সাহিত্য স্বাধীনপ্রকৃতি, সর্বভোগ্যামিনী, স্বৈচ্ছাময়ী প্রতিভার স্বপ্রকাশ-পরিণাম। সে কাহারও অধীনতার ভার বহন করিতে পারে না। আনন্দময় হৃদয়ের যথেষ্ট অশ্রুশালনে, স্বাধীন আলোচনায়, তাহার সবার দেখিতে-পাওয়া যায়। জগতে যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্য কোনও সত্য ও সৌন্দর্যের চর্চা করিয়া, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও সৌন্দর্যকে পূর্ণ বিকসিত করিয়া তুলে। সত্যের প্রতিষ্ঠার ও সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশেই তাহার স্বপ্ন ও পরিণতি। তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে সে সম্মত নহে। কেন না, অল্পদীর্ঘ-জন্ম স্বপ্ন ভিন্ন তাহার অল্প উদ্দেশ্য সাধারণের চক্ষে বড় একটা প্রতিভাত হয় না। অশ্রুশালনের যে স্বপ্ন অহুস্তর করিতে পারে, তাহা প্রত্যক্ষ; কিন্তু এই প্রত্যক্ষ অবাস্তব লক্ষ্যই সাহিত্যের একমাত্র ফল নহে। সাহিত্যের যাহা পরোক্ষ ও অবিনশ্বর উদ্দেশ্য তাহা অশ্রুশালন-জন্ম স্বপ্নের মত লক্ষ্য নহে। মানব-সাধারণের অক্ষর, অব্যয়, ক্রমিক উন্নতি, ও অমর বিশ্বপ্রেম, তাহার অন্ততম, অবিনশ্বর লক্ষ্যলক্ষ্য। সাহিত্যের এই উন্নতিই লক্ষ্যলক্ষ্য; কেন না, এই উন্নতিই মানবের ধর্ম এবং এই বিশ্বপ্রেমই পূর্ণ মানবের আদর্শ ও লক্ষ্য। এই দুই বস্তুই মানবকে মানবত্ব প্রদান করিয়াছে, এবং ইহাদের চরম উৎকর্ষেই মানব ক্রমে দেবপদ লাভ করিবে।

সুতরাং, সাহিত্য সকলেরই আরাধ্য দেবতা।

কত, প্রতিভাশালা মানব-দেবতা প্রতিভার প্রত্যগ পূর্ণ দিয়া সাহিত্যের পূজা করিতেছেন। আমাদের সে মহনীর উপকরণ নাই বলিয়া, আমরা বিরত থাকিব কেন। স্বর্ঘ্যের আলোক সবেও জগতে থলোত্তের ক্ষীণ ভ্রান্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তি ক্ষুদ্র হউক, কিন্তু উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র করিবার প্রয়োজন কি? শক্তির হীনতাবশত আমাদের সাধনা সিদ্ধ হউক না হউক, আমরা কাহ্মন্যবানপাশে জঙ্কিতভরে এই মহান ও পবিত্র সাহিত্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছি।

এই কঠোর সাহিত্য-ব্রত স্বরেশচন্দ্র আজীবন একনিষ্ঠ সাধকের ছায় পালন করিয়াছিলেন। সাহিত্য বাস্তবিকই

তাঁহার আরাধ্য দেবতা ছিল। যেমন নিষ্ঠাবান পুজারী দেবমন্দির অকৃতি বস্ত্র দ্বারা কণ্ঠবিত্ত হইতে দেখিলে ঘৃণা হস্ত নহে, সাহিত্যের পুরোহিত স্বরেশচন্দ্রও সেইরূপ প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল সাহিত্য-দেবতার মন্দির দ্বারে সমালোচনার কুঠার হস্তে অস্বপ্ন্য, দুর্নীতি ও যথেষ্টচারিতার প্রবেশপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

বাঙ্গলা-সাহিত্যে স্বরেশচন্দ্রের পূর্বেও অনেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-বিশীল সমালোচক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রবর্তিত 'বিবিধার্থ সমগ্র' ও 'রহস্য সন্দর্ভ', পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিজ্ঞানসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ', বঙ্গিমচন্দ্রের 'বঙ্গবর্নন', কালীপ্রসাদের 'বান্দব', যোগেন্দ্রনাথের 'আর্যদর্শন' প্রভৃতি বহু সাহিত্যচর্চকের স্বাধীন সমালোচকবল উচ্চশ্রেণীর সমালোচনার দ্বারা সাহিত্যকে উন্নত ও সংশোধন নিয়ন্ত্রিত করিয়া সাহিত্যের মহত্ত্বপ্ৰকাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্বরেশচন্দ্রের 'সাহিত্য-সমালোচনার একটু বিশিষ্টতা ছিল তাঁহার সমালোচনা যে সত্যপ্রিয়তা ও অকৃতোভয়তা পরিপূর্ণ হইত, তাঁহার অভিমত সমূহ যে উদারতা ও আত্মবিক্রিত লক্ষিত হইত, তাঁহার বিশ্লষণ যে নিপুণতা ও হৃদয়ঙ্গমতা প্রকটিত হইত, দুর্নীতি, অসংমত ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে তাঁহার যে সকল তীব্র শ্রেণিবাদ নিষ্ফল হইত, তাহা তাঁহার সরল সমালোচনাগুলিকে একটা বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছিল এবং 'সাহিত্যের' এমন পাঠক ছিলেন না যিনি মাসের পর মাস সেই বহুবিক্রিত সাময়িক পত্রের ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত শব্দে স্বয়ং পৃষ্ঠা পাঠ করিবার জন্ম সাধনে প্রতীক্য করিতেন। মানবজাতি মনোহরদের এই গুণ ছিল যে তিনি কখনও ব্যক্তিগত বিবেচনের বশবর্তী হইয়া কাহারও রচনার নিন্দা করিতেন না। যদি তিনি তাহা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সমালোচনার কোনও মূল্যই থাকিত না—তাহা সাধারণের কখনও সমাদৃত হইত না। আশি স্বয়ং অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, যে লেখককে তিনি কিয়দশ মাত্র পূর্বে তীব্র মেঘবায়ু জর্জরিত করিয়াছেন আমাদিগের নিকট তাঁহারই প্রশংসাবোধ্য অল্প রচনার উচ্চ সূচ্যাত করিতেন। বাস্তবিক কোনও লেখকের প্রতি তাঁহার ব্যাকগত বিবেচ ছিল না—বিবেচ ছিল রচনার অসংমত, উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি ও যথেষ্টচারিতার উপর—সে

রচনা বাহারই হউক—তথাকথিত সাহিত্য-সমালোচক হইক বা বহু ভুল-পন্থিত লুপ্তি করিবে হউক। যদি কখনও তাঁহার আক্রমণ অতি মার্জার তীব্র হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বপ্ন রাখিতে হইবে তিনি সাহিত্য মন্দিরকে দেব-মন্দির বলিয়াই বিবেচনা করিতেন এবং সেই জন্ম দেব-মন্দির উপকরণগরি বাহ্যতে পবিত্র ও নির্দোষ হয় তাহায়ে সত্যক দৃষ্টি রাখা তিনি কর্তব্য জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং মন্দিরের শবিত্তা রক্ষার আন্তরিক ও ঐকান্তিক আগ্রহই সেই আক্রমণের তীব্রতার একমাত্র কারণ; কিন্তু আমরা ভনিয়াছি তাঁহার সমালোচনার জন্ম অনেক বড় তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষিয়া দেখেন নাই যে সাহিত্য-প্রেমী স্বরেশচন্দ্রের ধর্ম ছিল—সাহিত্যের উন্নতিসাধনেই তাঁহার একমাত্র কাম্য বিষয় ছিল এবং যেখানে সেই ধর্মের তিনি অবমাননা দেখিতেন, সেইখানেই তিনি সমালোচকের মত হস্তে কঠোর কর্তব্যপালনে অগ্রসর হইতেন। সে অবমাননাকারী তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তু হইলেও তাঁহার নিস্তার ছিল না।

স্বরেশচন্দ্র আধুনিক সমালোচকগণের মধ্যে একরূপ বিশাল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—তিনি সাহিত্যসমাজের সমাজ-পতি ছিলেন। তাঁহার আদর্শ (আমরা পূর্বেই বলিয়াছি) অতি উচ্চ, অতি পবিত্র, অতি মহান ছিল এবং সেই উচ্চ আদর্শ অনেকেরই অধিগম্য ছিল। এই আদর্শের জন্ম তিনি তাঁহার পুণ্যপ্রাক মাতামহ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রভৃতি পূর্ণগামী পণ্ডিতদিগের নিকট লবী ছিলেন।

'সাহিত্য' নামক মাসিকপত্র-সম্পাদনে তিনি যে অসামান্য কৃতিত্ব, প্রশ্রয় করিয়াছেন তাহার মূলেও সাহিত্যের এই উচ্চ আদর্শ। 'সাহিত্যে' সর্বদা প্রথম শ্রেণীর রচনা প্রকাশিত হইত। বাঁহারা সাহিত্যের সর্বপ্রধান লেখক ও স্বরেশচন্দ্রের সর্বপ্রধান সহায় ছিলেন তাঁহাদেরও কোনও রচনা আদর্শের স্তরে না পৌঁছিলে কেহ্যে বিতেন। ইহা অনেকের আত্মাভিমান আঘাত করিত এবং সময়ে সময়ে বহুদ্বার বন্ধন শিথিল করিত। স্বরেশচন্দ্রের নিজস্বত্ব ভনিয়াছি একবার বাঙ্গালার অভিজাত সপ্তাঙ্গারের শীর্ষস্থানীয় এক ভূম্যধিকারী তাঁহার



সহস্রাব্দীর কতকগুলি কবিতা সংগ্ৰহণ করিয়া সাহিত্যে মজিত করিবার জন্য যথেষ্ট আর্থিক প্রয়োজন দেখাইয়া ছিলেন, কিন্তু 'হারিহর'ের মৃত্যু গর্বে চরিত্র হ্রাস, কষ্টেও চির-অবহিত হরেশচন্দ্র সেই প্রস্তাব গ্রহণসমীচীন দৃষ্টিতে সঠিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সেই সাহিত্যের একাগ্র সাধকের নিকট পার্থিব স্বপ্ন, ঐশ্বর্য্য, সম্মান সকলই তুচ্ছ ছিল।

কিন্তু হরেশচন্দ্রের সেই অজ্ঞাত আদর্শ আত্মমিগকে অল্প পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত করেন নাই। তাঁহার উচ্চ আদর্শে উপনীত হইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি স্বকীয় অনেক রচনা নির্মমভাবে ধ্বংস করিয়াছেন। তত্ব্য রচনা প্রকাশিত করিয়া হস্তান্তর অনেক প্রথম প্রণেয় লেখক গৌরব অক্ষত্ব করিতে পারিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে মৌলিক স্থায়ী রচনা তিনি এই জ্ঞাত অতি অল্পই দান করিয়া গিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধে বহু শ্রীকৃষ্ণ হেমচন্দ্রপ্রসাদ যথেষ্ট মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, হরেশচন্দ্রের যে গল্পগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহারও অধিকাংশ তিনিই ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া মুদ্রাযন্ত্রাগারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হরেশচন্দ্রের কত প্রতিভাদীপ্তা ভাষ্যবর্ণনা ময়ী রচনা হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি, তাহিলে হৃৎ হঃ; কিন্তু ইহা হইতে নবীন লেখকগণ অনেক শিক্ষা আশ্রয় করিতে পারেন। অনেকে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক লিখিয়া গর্ব প্রকাশ করেন। ইহাতে বর্ষা গর্ভপ্রকাশের কিছু আছে কি না ভাবিয়া দেখা উচিত। বাঙ্গালা-সাহিত্যে আন্তর্জাত দেশের সম্ভিত্য অপেক্ষা দরিজ হইলেও উহাতে কত প্রথম প্রণেয় রচনা আছে। তত্ব্য বা তলপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা যদি প্রকাশিত না হইল তবে নিরুপ্ত গ্রন্থের সংখ্যাভুক্তি কমিয়া গাভ কি? রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা করিলেই সাহিত্য উন্নত হয় না, জীবনব্যাপী সানান ধারা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা যায় এবং ভগ্নস্তর সাহিত্য-সমাজে জাতীয় সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। ঐক্যবীর রামায়ণ, মেদবাসের মহাভারত এইগুলি সাধনার ফল। কবিত আছে এমিক এমিক চিত্রকর আশেকদাসকে কেহ তাঁহার চিত্রসংগার নুনতা সন্দেহ অগ্রহণ্য করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন

‘আমি অনন্তকালের জন্ম চিত্র অঙ্কিত করি’। প্রসিদ্ধ নাট্যকার যুরিপিডিসকে তাঁহার সমসাময়িক কোনও নাট্যকার একদা গর্ব করিয়া বলেন যে, তিনি দিন দিনে তিন শত লোক রচনা করিয়াছেন, তত্বত্রে যুরিপিডিস উত্তর দেন যে তাঁহার তিনশত লোক লোক খোঁট তিনদিন মাত্র পড়িলে, পঞ্চাশত্রে, তিনি তিন দিনে যে তিনটা মাত্র লোক রচনা করিয়াছেন তাহা লোক তিনগুণ দিয়া পড়িলে। সকল লেখকেরই এইরূপ উচ্চ আদর্শ সমুখে রাখিবা কর্তব্য।

অনেকের বিশ্বাস, হরেশচন্দ্র সাংস্কারসাহারী সাংস্কারী পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া সরল ও সহজ ভাষার বিরোধী ছিলেন। হরেশচন্দ্র গম্ভীর-বিষয়ক রচনার সাংস্কারসাহারী ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু গম্ভীর ও সহজ ভাষার বিপক্ষ ছিলেন না। তিনি চলিত ভাষার সহিত দীর্ঘ সমাসভরাক্রান্ত সাংস্কার পদ্যবলীর সম্মিশ্রণ দেখিতে পারিতেন না। তিনি গুরু-ওগুণী ভাষার নিন্দা করিতেন। নূতন সাংস্কারগণের সঙ্গে তাঁহার এই ধানে মতান্তর দৃষ্টি হইত। নতুন তিনি নূতন সাংস্কারগণ অপেক্ষা অধিকতর অগ্রগত ছিলেন। তিনি কেবল ভাষার সরলতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিতেন না, ভাষার সহিত ভাবও যথেষ্ট সহজ দৃষ্টদৃশ্য হইত তদ্বিত্তে লেখকগণকে অবহিত হইতে উপদেশ দিতেন। কেবল “হজি,” “কজি” ইত্যাদি কথা-ভাষা ব্যবহার করিলে রচনা সহজ বোধ হয় না। অনেক সময় সহজ কথা ব্যবহার করিয়াও লেখকগণ ভাষার মর্য্যদা হ্রাস করিতে পারেন না। তিনি ভাব ও ভাষা উভয়ই যথেষ্ট সরল ও বোধগম্য হয় তজ্জন্ত লেখকগণকে অগ্রাহ্য করিতেন। তিনি যে “সরল ও সহজ ভাষার কতদূর অগ্রগামী ছিলেন তাহা আমি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা সন্দেহ তাঁহার অভিপ্রায় শ্রবণে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তিনি এক দিন বলিলেন “দেখুন, শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঙ্গালা আমার খুব ভাল লাগে—উহা গাঁটা বাঙ্গালা। অত বড় সাংস্কার পড়িত অথচ উহার রচনার সত্ত্ব শব্দ কিংবা দীর্ঘ সমাসভরাক্রান্ত শব্দ প্রায়ই দেখা যায় না। কেমন সহজে বক্তব্যটা বলিয়া দান। যদি ভাষার ন্যায্যসাংস্কারগণ

ইহার পথ অগ্রহণ করেন, তাহা হইলে কোনও কলহের কারণ থাকে না।”

শেষ-জীবনের হরেশচন্দ্র ‘বহুমতী’ ‘সন্ধ্যা’ ‘নারক’, ‘বাঙ্গালী’ প্রভৃতি সাংবাদ পত্রের সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকল সাংবাদ পত্রের রচনার ভাষা বিশ্বাস্যমানের কোথাও গম্ভীর, কোথাও প্রাঞ্জল, কোথাও গজবিনী, কোথাও আবেগময়ী, কোথাও সরল ব্যঙ্গরহস্যসমৃদ্ধ। কাব্যিকভাবে ও শব্দচয়নে নৈপুণ্যে তিনি বিরলপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার রচনার এমন একটা বিশিষ্টতা আছে যে সাংবাদ পত্রের শুভ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কোন প্রবন্ধগুলি তাঁহার রচিত অনায়াসে ধরদ্রব হয়। এই সকল রচনার মধ্যে কতক গুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের গম্ভীর ভাষার রক্ষিত হইবার যোগ্য এবং সমাজপতি-স্বত্ব-সমিতি হরেশচন্দ্রের অনগ্রসরীয় রচনাগুলির একটি সংগ্রহ পুস্তক প্রকাশ করিতে পারিলে উত্তরবঙ্গীয়গণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

হরেশচন্দ্র ভাষা ও ভাবের প্রসাধনে অত্যধিক ব্যস্ত হইতেন। তাঁহার গল্প পত্রের ভাষা প্রতিমুখ্য, ও আবেগময়ী; হরেশচন্দ্রের সন্দর্ভগুলির একটি রচনা গুলি—আসাধারণ সাধম। তিনি অবাস্তব কথা প্রবন্ধের কলহের বুদ্ধি না করিয়া অতি সাধেপে বক্তব্য বিষয়টি এমন ভাবে বলিতেন যে, তাহা পাঠ করিলে পাঠকের মনের উপর তাহার আচ্ছাদ্য ক্রিয়া ঘটিত। তাঁহার লিখিত কোন কোন পরলোকগত মহাত্মার মৃত্যু-বিবরণ ক্রম প্রবন্ধ পাঠে তাঁহাদের বিস্তৃত জীবনচরিত পাঠ্যবেশ্য অধিক বল পায়। জীবিত হ্রসবে সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্ণারোহণের পর তৎসময়ে

হরেশচন্দ্র বাহা গলিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া একদা আমি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলে হরেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, তিনি উহার এক একটা প্যারাগ্রাফে কতকগুলি মন্তব্য একত্র ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে উহার প্রত্যেকটিতে ক্রমেবের ভবিষ্যত চরিত্রকার এক একটা পরিচ্ছেদের রচনার উপকরণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এদেশের অধিকাংশ লেখকের একত্র ভাবার ও ভাবের বদীকরণের প্রতি লক্ষ্য নাই।

হরেশচন্দ্রের তির্য্যোনে আজ বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা পুনরায় হতোম-বর্ণিত বেণাবিশিষ্ট মরদার অবস্থার পরিণত হইয়াছে। সাহিত্যে দৃষ্টি, উচ্ছ্বলতা ও যথোচ্ছারিতা উন্নততার বুদ্ধি পাইতেছে। কোথার আজ বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচক-সমষ্টি, যাহার উন্মত্ত মস্তিষ্ক সমুখে সাহিত্যের যথোচ্ছারিতা ও উচ্ছ্বলতা অবনমিত ও উৎসাহ হইবে? হরেশচন্দ্রের তাক সিংহাসন আঁচিও মূল রহিয়াছে। তাঁহারই ভাষার আজ তাই আদর্শ, করিতেছি:—“কে আছে মনসাতি, তাঁহার গাভী বড়াইয়া দাও।” তাঁহার জীবন-প্রাণী ত্রুত উদ্যোগন কস, তাঁহার জীবনের বঙ্গ সকল কর:—“যাহার অনাবিল দৃষ্টি ত্রুত পবিত্র কিরণে, যীরে যীরে সমগ্র শিশু মানবগণের ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব ক্রমে বিকসিত ও মহাবে অগ্রপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার প্রসাদে আমাদের সাহিত্য ক্রম-বিকসিত হইক; সত্য ও সৌন্দর্য্যের দীপ্ত প্রতিভা আমাদের বীন সাহিত্য আলোকিত হইক।”

সমাজপতি-স্বত্ব-সমিতির উদ্যোগে সমুদ্রিত হরেশচন্দ্রের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।



## পূর্ব ও পর

( গর )

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বৈশাখের দ্বিতীয় বেল।

তপ্ত পথে ঘূষা উড়াইয়া বাবু ছুটিয়া চলিতেছে। মনোহরতা পাইয়া রহিল এক ক্রোশ পিছনে। ধূলিমালায় আর তাহাকে দেখা যায় না। বামদিকে বোগসোয় শত-শত শুক প্রান্তর, স্তম্ভার পরে কালিগঙ্গা। দক্ষিণে সালুতিপুর; আর সমুখে চারকোণের মাথার তালবেড়ে, বেন বহু দূরের কর্ননা—বাগসা অগচ্চ করে কটা স্থল রেখাবৎ।

বাসপানি ব্যাক্তপূর্ণ কিন্তু সকলেই বসিবার মত ঠাই পাইয়াছে। তাহাদের শনিমাসে ও দেহের তাপে ভিতরে জ্বলহ গরম। তাহার উপর আবার হু' পানের পর্দা কলো। মাঝে মাঝে পর্দা হু'খানি উড়াইয়া তপ্তকে কলকে প্রান্তরের তপ্ত হাওয়া প্রবেশ করিতেছে। বাহিরের প্রকৃতি তুচ্ছ। কোথাও একটি মাছব নাই, শুক আকাশ-পথে একটি পাখীও উড়িয়া বাইতেছে না। দরিত্র বেন স্বরূপ পিণ্যায় স্কন্ধ ও রান।

হঠাৎ সালুতিপুরের প্রান্তরীয়ায় জোড়া বটশায়ার বসপানি ধামিল। বটের ঠাঁয়র একটা লোক পাড়াইয়া ঘামে তাহার সর্গাঙ্গ সিজ। সমুখে মাটিতে এক কানি কচি ডাব ও হু'টা বৃহৎ কালো রংয়ের তরমুজ পড়িয়া আছে। বাসপানি তাহারই জন্ত ধামিয়াছিল। কিন্তু কন্ডাটার একবার তাহার দিকে, একবার ডাব ও তরমুজগুলির দিকে তাকাইয়া বলিল, “ভায়গা হ'বে না।”

লোকটা ক্রতপটে বলিল, “দোহাই ভাই, বড় দরকার—”

“কোথা যাবে?”

“তালবেড়ে।”

“না—হ'বে না। এই ছাড়—”

তাহার অজ্ঞায় বাসপানি একটু নড়িল মাত্র, কিন্তু চলিল না।

ডাইতার বলিল, “নে তুলে। কিন্তু ভাড়া লাগবে হু'জের।”

লোকটা মাথা নাড়িয়া জানাইল, তাহাও সে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু বাসের মালিক পূর্ণ রাত্রি কন্ডাটার ও ডাইতারকে পৃথক ভাবে গোপনে ডাকিয়া তাহাদের হাতে গাড়িখানি ও পরস্পরের ভার তুলিয়া দিয়াছেন। কন্ডাটার ইকিয়া বলিল, “না, নেব না। চালাও গাড়ি—”

ডাইতারও চাঁৎকার করিয়া বলিল, “তোকে নিতেই হ'বে।” বলিতে বলিতে সরোবে নামিয়া ছুটিয়া আসিল। কন্ডাটারেরও শিয়ার বদবীরের রক্ত; সেও এক প মটিতে নামাইল।

“কি হ'বেছে রে?” ভ্রমলোকটা বসে উঠিবার পথে এক প্রান্তে বসিয়া এতকম তত্ত্বাচ্ছন্ন হিলেন। ধব-রোলে তত্ত্বা ছুটিয়া গেল। কিন্তু তাহার প্রসঙ্গ উত্তর দিল নীচের সেই লোকটা। বলিল, “আজ্ঞে কর্তা, ভায়গা বেই-বলে আমার উঠতে হবে না।”

“দেবেই না তো। বসবে কি লোকের মাথার ওপর?”

“আমি পাড়িয়ে যাব।

• “কোথায়?”

• “তালবেড়ে।”

• “কার বাড়ী?”

• “ঈশান ডাক্তারের—”

• “কেন?”

• “আমার অস্থ—”

“হঁ।” ভ্রমলোকটা আরও রক্ত হইয়া উঠিলেন।

বলিলেন, “অস্থ তো হু' ডাবগুলো আর তরমুজ হুটো কি করবি? গুলিবি না কি?”

১৩০৬]

“তার জন্তে নিয়ে যাচ্ছি—”

“তবে আর উঠে।”

লোকটা উঠিয়া ভ্রমলোকটার পায়ের কাছে ডাবের কানি ও তরমুজ হু'টি ফেলিয়া রাখিল। গোছারও আর পাড়াইল না, আশ্চর্য করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল।

আবার বাগ ছুটিয়া চলিতেছে। ভ্রমলোকটা বলিলেন,

“ঈশান ডাক্তারকে আগে কখনও দেখিছিন?”

লোকটা বলিল, “দেখি নাই কিন্তু নাম শুনেছি।”

“আমারই নাম ঈশান ডাক্তার—”

তালবেড়ের ঈশান ডাক্তারের নাম পাচ-সাতখানা গ্রামের মধ্যে কে না জানে? লোকটার গলা মেজাজ ও বিজ্ঞা পরিচয় করিলে মাথার মাথায় হয়। তাহার নামে মরা মাছবও না কি হঠাৎ উঠিয়া বসে।

ডান-তরমুজ লইয়া ঈশান ডাক্তারের পায়ের কাছে মাথা হুটতেছিল। সেগুলির পানে তাকাইয়া তিনি বিজ্ঞা করিলেন, “তোমার কি অস্থথ রে? আচ্ছা ওসব এখন থাক পরে হ'বে। একটা ডাব খাওয়াতে পারিস? তেষ্টার গলা শুকিয়ে কাঠ—”

লোকটা একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, “কাটারী নেই বৃষ্টি? বোটা ডাব আন্নি আর কাটারীর কথা মনে রইল না?”

বাসের আর এক প্রান্ত হইতে একজন বলিল,

“কর্তা কাটারী আমার কাছে আছে। এই নাও গো—”

বলিয়া কাটারীখানা আগাইয়া দিল।

ডাক্তারবাবু বিজ্ঞা করিলেন, “তোমার নাম কি রে?”

• “চৈতন্য।”

• “কৈবর্ত—”

• “আজ্ঞে।”

• “নে—কাট—কাট—”

চৈতন্য কাটারীখানি প্রথমে নিম্নের চাদরে বেশ করিয়া মুছিয়া লইল। তারপর কচি দেদ্রিয়া একটা ডাব বাড়িয়া লইয়া কাটারী-খুব ছাড়াইয়া ডাক্তারবাবুর হাতে তুলিয়া দিল। ডাক্তারবাবু জলটুকু নিম্নে পান

পূর্ব ও পর

১৪৬৭

করিয়া শূণ্ণ ডাবটাকে বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া একটা পরম চতুর উপায় ছাড়িলেন। তারপর চাদরে খুব মুছিতে মুছিতে বিজ্ঞা করিলেন, “তোমার কি অস্থথ রে? উঠেছ?”

“আজ্ঞে কর্তা দেখুন” বলিয়া চৈতন্য হাত হু'খানা তাহার সমুখে প্রদর্শিত করিয়া দিল—“এ কিছুতেই সাবছে না।”

ডাক্তারবাবু চৈতন্যের নখগুলির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এবার দেখিলেন, হৃৎকের দুই কোণেও ক্ষুদ্র ছটা ক্ষত চিহ্ন। “এ যে কুঠ! কি করলি? এ হাতে আমার ডাব খাওয়ায়?”

ছট বাধির নাম শুনিয়া চৈতন্যের খুব ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। কুঠ! সে অসহায়ের স্তব বলিতে লাগিল, “দোহাই ডাক্তারবাবু, আমার রক্তে করুন।”

ঈশান ডাক্তারের পাকস্থলীটা তখন ঘৃণার উত্তিয়া আশিবার উপক্রম করিতেছে। জোব ও আতকে সারা মন আচ্ছন্ন। তিনি ক্ষিপ্তের মত বলিতে লাগিলেন, “নামে বা। নাম শীগিরি। এই মাখন ধাম। বাসু—”

বাসু ধামিল। চারিদিকে ছায়াহীন, জলহীন, শুক বিস্তীর্ণ প্রান্তর। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

“নাব, নাব।”

“ডাক্তারবাবু—” চৈতন্য তাহার পা ছটা জড়াইয়া ধরিল।

ডাক্তারবাবু দারুণ ঘৃণার পা ছটা ছাড়াইয়া লইতে লইতে বলিলেন, “নাব আগে—”

• “চৈতন্যের চোখ ছাপাইয়া বর বর করিয়া জল বরিতে লাগিল। “ডাক্তারবাবু—”

• “ও রোগের অস্থ আমার কাছে নেই।” ঈশান ডাক্তারের ইচ্ছা করিতেছিল, নিম্নের ভিতরটা টানিয়া তিঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া বেন L- তাহার বিজ্ঞা ও টোট-ছটা আলা করিতেছে। গলার ভিতর অজানা কি বেন কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে। নিখাসে এখনও চৈতন্যের হৃৎকের হৃৎক পাইতে লাগিলেন।

চৈতন্য তখনও পাড়াইয়া আছে। ঈশান ডাক্তার



সকলোকে ভাবের কান্ডি ও তরঙ্গ ছুঁটা দিয়া নৌচে  
‘কেলিয়া দিতে দিতে বলিলেন, “এখনও নামিল নে?  
সকলকে মারিছ?”

চৈতন্য মাথাটা ‘ঝিম্-ঝিম্ করিতেছিল। সে ‘অভি-  
ভূতের’ মত নৌচে নামিতে নামিতে শুনিব, বাসের  
‘কল’ হইতে সেই কাটার মালিক তাহাকে বেন  
বলিতেছে, “ঐ কালিগঙ্গার ওপারে শিবতলীর ঘাটে  
শান্তিনাথ তনায় হতো দিয়ে আমাদের—” বাকিটুকু  
আর শোনা হইল না। বাবখানি তাহাকে সেই রিজন  
প্রান্তরে একলা কেলিয়া আবার ছুটাতা চলিতে লাগিল।

সপ্তাহ ছই পরে—

তিনখানা গ্রামে তখন কলগঙ্গার মড়ক লাগিয়াছে।  
চিরাবুখা আকাশ ধান। আচম্ভিত আন্তনাদে পল্লীবাট  
সচকিত হইয়া ওঠে। ঈশান ডাক্তারের মরিবারও সময়  
নাই। সান্মুদিনমান গ্রামে গ্রামে ঘোরাঘুরি  
‘চলিতেছে, এমন কি, রাতেও নিভার নাই। সকলেই  
বলে, এখনই যাইতে হইবে।

সেদিন তিনি গিয়াছিলেন সেই কালিগঙ্গার ওপারে  
শিবতলী ছাড়াইয়া সাহুড়ে। কিরিবার যান-বাহনের  
ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। বেহায়াও বাকিয়া বসে।  
অগত্যা একাকী পথরহে ফিরিতেছেন। ইচ্ছা, শিবতলীর  
ঘাট হইতে নৌকার গৃহে যাইতেন।

তরুণীপিতল দিয়া পূর্ণ। কোপে কোপে শালাকাটা  
ও কলিকায়নীর হসদে মূলগুলি দুটুরা আলো করিয়া  
কহে। মাঝে মাঝে ‘ভটি-জলদ, মাদা ফুল, ধান গন্ধ।  
মাথার উপর ফলভরা তরুণা—আম, জাম, ‘ও’  
চারটা ‘আমরুল গাছ’ও দেখা যায়। তৎপার মূলগুলি  
খুব খুব করিয়া করিয়া পথের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে।  
পাকা গোলাপ জামের ‘গোলাপীকণ্ঠে পথতল তরুণ।  
দূরে কোথায় পাতার তলে বসিয়া একজোড়া কুড়া পাখী পান্না  
দিরা কল-তরঙ্গের ‘বঁয়ের নকল’ করিতেছিল।  
বাখিরা বাখিরা দোহলের শিব ‘উদিয়া আসিতেছে।  
ঈশান ডাক্তারের পা দুটা যেমন জড়াইয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু ওমিকে বেলাও পড়িয়া আসিয়াছে, গৃহও বন্ধদূর।  
অঙ্গল ভাবটা বাড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত পায়ে চলিতে  
লাগিলেন। কিছুকণের মধ্যেই শিবতলীর শান্তিনাথ-  
মন্দিরের ত্রিমূল দেখা গেল—গাছ-পালার মাথা ছাড়াইয়া  
উঠিয়াছে বেন কালো তিনটা সাপ। একটা নীলকণ্ঠ পাখী  
তাহার উপর বসিয়া ক্রুদ্ধ স্বর ছড়াইতেছিল। ঈশান  
ডাক্তার মন্দিরের দিকে না গিয়া দক্ষিণে কুমোর পাড়ার  
কোল দিয়া বাঁশতা ঘুরিয়া ঘাটে নামিলেন।

কিন্তু শূন্য ঘাট। কোথাও একখানি যাত্রী-নৌকা  
চোখে পড়িল না। কেবল একখানি ছোট পান্নী কিছু  
দূর দিয়া বীরে চলিতেছিল। আব দেখিয়া মনে হইল,  
তখনই কাছে কোথাও হইতে ছাড়িয়াছে। তাহার মুখও  
তালবেড়ের দিকে।

তিনি সেখান হইতেই হাঁকাহাঁকি দর-দস্তর শুরু  
করিলেন। মাঝি প্রথমে আসপ্তি করিল। কিন্তু ব্যাপারও  
অসম্ভবিত, ভাড়াও লোভানীও। পরিশেষে রাজী হইয়া  
ডাক্তারবাবুকে তুলিয়া লইল। বলিল, “যাত্রী আছে একটা  
মাগও আছে জ্ঞান। একটা নামিবে সালুতিপুর, আর  
একটাকে নায়াইতে হইবে, তালবেড়ের ওপারে, তাই।  
নতুবা—”

ডাক্তারবাবু ছইয়ের নীচে মাগ ও যাত্রীর দিকে  
মনোযোগ দিলেন না; হাতের ব্যাগটা পটাবনের উপর  
রাখিয়া ছইয়ের উপর উঠিয়া বসিলেন।

পরস্রোতা নদী; পূজীর তাহার জল। মধুর বাতাসে  
ছোট পালখানি তুলিয়া ‘পানসী উজানে চলিতে লাগিল।  
একটা বাক ছাড়াইয়া যাত্রীটা আরও প্রশস্ত হইয়াছে।  
একখানি পিটুটি চর; তাহার বুক জড়িয়া বিরাট ঝাঁউ  
খন গড়াইয়া উঠিয়াছে। আর একদিকে হ্র-উচ্চ তীর।  
চলিতে চলিতে সন্ধ্যার কাজকাড়ি সালুতিপুরের তরুণো  
দেখা গেল। সমুদ্রের বাতী ছাড়াইলেনই তাহার  
‘ভাড়াবাট। হঠাৎ উত্তর-পশ্চিম কোণে ‘ও’ স্বরক নিভাৎ  
বেলিয়া গেল। সকলে ভাবিয়া বেগে, সৈনিকবাহন  
আকাশখানি রক্তমেঘে লেপিয়া বিথাকে। বাতাসও স্থির,  
নদী শান্ত।

মাঝি তৎক্ষণাৎ পাল নামাইল; পাড়িয়া পাড়বলিল।

কিন্তু পানসী হাত কয়েকও যায় নাই, হঠাৎ এক বিপুল  
দোলায় ঘুরণী তুলিয়া উঠিল। স্বপ্নার হুহ শব্দ কাণে  
আসিতেছে। ‘আকাশময় মেঘের জটাজাল ছড়াইয়া তীরের  
গাছ-পালা ভাঙ্গিয়া নোয়াইয়া ধুলা-বালি উড়াইয়া বৈশাখী  
ঝড় ছুটিয়া আসিল। সেই সঙ্গে নদী-রাশ্বণীও নাচিয়া উঠিল  
লক্ষ জিহবা বেলিয়া। আবর্তপথে এক একবার হাঁক ছাড়ে।  
নৌকাখানিকে নাচায়, আবার সোঁতে টানিয়া লয়, পরকণ্ঠেই  
আবার থাকা দিয়া সরাইয়া দেয়। কখনও কখনও হাত  
দিয়া লোকগুলিকে স্পর্শ করে।

ডাক্তারবাবু ততক্ষণে পটাতনের উপর পাড়াইয়া  
মাস্তল আঁকাছাইয়া ধরিয়া চাঁৎকার করিতেছিলেন, “চালাও,  
মাঝি চালাও—”

কিন্তু তীরের দিকে নৌকার মুখ ফিরাই মাঝির  
সাধ্যাতিত। সালুতিপুরের যাত্রীটিও তখনই ছইয়ের মধ্য  
হইতে সরবে বাহির হইয়া তাহার একেবারে গা বেঁধিয়া  
পাড়াইয়াছে। তাহারও একখানি হাত মাস্তলের গায়ে।  
সে বলিল, “সব মিছে কর্তা। এখন ভগবান যা  
করেন—”

ডাক্তারবাবু কিরিয়া দেখেন চৈতন্য! কিন্তু ডাক্তারবাবু  
সুরিয়া গড়াইলেন না, বলিলেন, “কি হ’বে চৈতন্য?”

চৈতন্য হাত তুলিয়া আকাশ পানে দেখাইল। তাহাতে  
কেহই ভরসা পাইল না। বাতাস আরও জোরে বহিতেছে  
রুটও শুরু হইল। ‘আকাশের গাঢ় হইয়া আসিল। তীর-তট  
মুছিয়া গিয়াছে। বিজাতের স্বরকে স্বরকে ঝুজির  
ভরস্বরী মুষ্টি প্রকট হইয়া ওঠে; মনে আতঙ্ক জাগাইয়া  
দেয়। হঠাৎ বাতাসের প্রবল শাস্ত্রের নৌকাখানি উটাইয়া  
মাঝিরা কে কোথায় ভাসিয়া গেল। ঈশানডাক্তার এক  
টোক জল থাইয়া ডেউয়ের উপর ভাসিয়া উঠিলেন। চৈতন্য  
পড়িয়াছিল তাহার পানে। তিনি ছই হাতে তাহার গলা  
জড়াইয়া ধরিলেন। সেই সঙ্গে তাহার কি বেন বলিবার ইচ্ছা  
ছিল, কিন্তু জলের গাঢ়তার মুখের কথা বাহির হইল না। চৈতন্যও  
নিম্নকে তাহার কণ্ঠ হইতে মুক্ত করিবার প্রাণপন প্রয়াস  
পাইতে লাগিল। কিন্তু, ঈশানডাক্তারের আঙ্গিনন জমে  
মুহূর্তময় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ‘টানটানি করিতে করিতে  
উভয়েই জলাইয়া গেল। আবার ভাসিয়া উঠিল। চৈতন্য

তখন মুক্ত। ডাক্তারবাবু এবার তাহার কোমর জড়াইয়া  
ধরিলেন। ‘বালকজ হইয়া আসিতেছে; সারা দেহ ভারি  
হইয়া উঠিয়াছে; হাত-পা আর চলে না। তিনি হাঁকাইতে  
হাঁকাইতে বলিলেন—“চৈতন্য, বাঁচা—এক শো টাকা—”

অর্ধের বিনিময়ে বাঁচান অপেক্ষা বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা  
চৈতন্যের প্রবল। তাহারও হাত-পা অবশ হইয়া আসিয়াছে—  
সে আবার ডাক্তারবাবুকে ছাড়াইয়া বাঁহবার চেষ্টা করিল।  
প্রবল কাশখানি দিয়া নিঃস্বাসে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে,  
ডাক্তারবাবু তাহাকে আরও জোরে আঁকাছাইয়া ধরিলেন।  
সে সেই অবস্থায়ই এতাকে লইয়া বীরে সাতারাইয়া চলিল।

কিন্তু তাহাদের চলাইতে লাগিল স্রোত ও ঢেউ। জল কিছুদূর  
গিয়াই তাহারা শুনিতে পাইল, সমুদ্রখণ্ডে স্রোতবারা বিকট  
শব্দ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কোন আবর্ত ভাবিয়া  
উভয়েই প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু শব্দটা ক্রমে  
কাছে আসিয়া দৃষ্টকে বেন সন্ধ্যা চাপিয়া ধরিল। পাছটা  
পড়িয়াছিল কিছুক্ষণ আগে; নদী তখনও তাহাকে টানিয়া  
লয় নাই। সেইটী ধরিয়া হ’লেন কুলে উঠিয়া পড়িলেন।

এদিকে স্বড়-গুটির একটুও বিরাম পড়ে নাই। মাঝে মাঝে  
ভয়শাখার আন্তনাদ শোনা যায়। হ’লেন কুলেই এক  
জায়গারে গুড়ি-ভুড়ি মাঝিরা বসিয়া রহিলেন। তারপর  
আরও কিছুকাল হাঁকাহাঁকি মাতামাতি করিয়া স্বপ্না যেমন  
আচম্ভিতে আসিয়াছিল, দলবল লইয়া তেমনি হঠাৎ চলিয়া  
গেল।

ঈশানডাক্তার সেই রাতেই, চৈতন্যের চেষ্টার গৃহে রওনা  
হইলেন। যাইবার কালে বলিয়া গেলেন, “চৈতন্য, কাল  
সকালে বাস, ওদূর দেব—”

পরদিন তখন বানিক বেলা উঠিয়াছে। ঈশানডাক্তার  
চিন্তাপুন্ডারী বসে বসিয়া কল্যাণভাণ্ডারের সৈনিকবাহন  
‘বাজাঘের দক্ষিণে বুঝাইয়া দিতেছেন। বায়ান্দার তাহার  
ছোট ছেলে ভোঙ্কল জীড়ায় রহে। চৈতন্য গিয়া দরজার  
বাঁহিতে দাড়াইল। তাহার হাতে ছেলে-সাল একখানি  
বাঁশের লাঠি। সেখান হইতেই নমস্কার করিয়া বলিল,  
“কল্যাণ?”







“জারামুত” নামক কুটকটকিত একখান গ্রন্থ রচনা করেন। মধুসূদন ও তাহার উপস্থিত প্রভাতর প্রাণার্থ “অম্বৈতসিদ্ধি” নামক ন্যায়বোধাসংগ্রহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে জাতব্য বহু বিষয় যুগ্মশ্রেণীবাস্থ প্রথমভাগের ভূমিকার গ্রন্থকার পরিচয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভূমিকার সর্গাংশেও প্রয়োজনীয় অংশ হইতেছে গ্রন্থ পরিচয় (অর্থ্য—গ্রন্থমধ্যে যে যে প্রতিপাত বিষয় দার্শনিকভাবে আলোচিত হইয়াছে, সে সকলের একটি সারন বিবরণ) ও অবৈতচ্ছিন্নাশ্রোতের ধারাবাহিক ইতিহাস। অবৈত-বোধান্তর চিন্তাধারায় অবৈতসিদ্ধির স্থানে যে কত উল্লেখ, তাহা এই ভূমিকা পাঠ করিলেই সর্বসমেত অবগত হওয়া যায়। ভূমিকার এই অংশটা সত্যই নূতন—রাজেন্দ্রবাস্থর মৌলিক গবেষণার ফল। ভবিষ্যৎ গবেষণায় যে ইহা পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা ছাড়া রাজেন্দ্রবাস্থ ভূমিকামধ্যে বিস্তৃতভাবে জার-শাস্ত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অবৈতসিদ্ধি পাঠের কিঞ্চিৎ কাল, তাহার ইঙ্গিত করিতেও হইতেন নাই। • পারশেষে তিনি মাল-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত-গুলির একটি সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিয়া সাংসারিকতাবিরুদ্ধ পৃষ্ঠাবলী ভূমিকাটিকে সমুদ্র করিয়া তুলিয়াছেন।

দ্বিতীয়ভাগের ভূমিকাটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিমিত। ইহাতে রাজেন্দ্রবাস্থ অবৈতসিদ্ধি পাঠে প্রবৃত্তির প্রতি আধুনিক বাধ্যপক্ষের নিরাকরণ করিয়াছেন। ক্রমোন্নতি-বাল, যৌবনের পৌরষেরতাধার, বোধোক্ত পরম্পর ও বুদ্ধ-মত সমূহের সত্যতাবাদ, মনস্বিনীর জাত্যতাবাদ ও জীব-জ্ঞানের বোধ্যপতিবাধ—এই মতবাদগুলি রাজেন্দ্রবাস্থ স্বকৌশলে অপরোচীয় যুক্তিপ্রয়োগে একে একে নিরাকৃত করিয়াছেন। বর্তমানে আমাদের মধ্যে একমাত্র শক্তিকৃত ব্যক্তি বৈথিত্য পাওয়া যায়, বাহ্যার জ্ঞানপরিদর্শকে বাহিরে—অবৈতবোধান্তর অধ্বাণী বসিয়া প্রকাশ করিলেও প্রাক্তন-ভাবে ক্রমোন্নতিবাদেরই পৌরষকতা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য ধর্মের প্রভাব ও সম্প্রদায়িক শিক্ষাভঙ্গর নিকট অবৈতবোধান্তর শিবির অভাবপ্রাপ্তক অবৈতবোধান্তর নিষ্কৃতি সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে গভীর জ্ঞাতব্য—ইঙ্গিতগকে পবনিত করিয়া দিয়াছে। অতঃ ইহার নিম্নের নিম্নের নিকটও

এই জটীকৃত স্বীকার করিতে সক্ষম হন। ইহা একরূপ আশ্ব-প্রভাতরাম্য। আর সাধারণ ব্যক্তিগণও এই সকল ব্যক্তির পাশ্চাত্য শিবির বাহ্যভঙ্গকে বিদ্রুত হইয়া ইহাদের প্রদর্শিত প্রকল্প ক্রমোন্নতিবাদের পক্ষেই অবৈত-জ্ঞানবার্গ বসিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ক্রমোন্নতিবাদের অসারত্ব ও উহার সহিত অবৈতমতের পার্থক্য যুক্তিবলে প্রতিপাদনপূর্বক রাজেন্দ্রবাস্থ এই সকল কণ্ঠ বৈমাত্রিকের প্রভাবের ভাষা করিয়াই দরিয়া দিয়াছেন। বোধোক্ত-শিক্ষার্থী মাত্রেরই এ জ্ঞাত রাজেন্দ্রবাস্থর নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ইহা তো মৌল ভূমিকার কথা। এইবার মূলের পান। অবৈতসিদ্ধির তিনটা প্রাচীন টাকাই বর্তমানে বিখ্যাত—বলভঙ্গের সিদ্ধিবাধ্যা ও প্রদ্বানন্দ্যের লঘুচক্রিকা (গৌড় প্রদ্বানন্দ্য) এবং বুদ্ধচক্রিকা। ইহাধিগের মধ্যে বুদ্ধচক্রিকার সম্পূর্ণ অংশ বর্তমানে চল্লিশ বই উঠিয়াছে। লঘুচক্রিকার একটি টাকা আছে—বিটুলেশোপাধ্যায়ী। মূখ্যতঃ পরমতত্ত্বগুণের উদ্দেশ্যে এই টাকাগুলি রচিত হইয়াছিল। সেইজন্য ইহাধিগের সাধায়ে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে মূলের আশায় সম্যকরূপে দ্রবদ্রব করা একরূপ দ্রব হইয়া উঠিত। সমগ্রতঃ নানানির্ধারণমার্গার্থ্য্য করণপণ্ডিত-প্রবর পরমপুজ্য ত্রীকৃত বোধোক্তগণের তর্কসাধ্য-বোধান্তরীর্থ মর্শেদর উক্ত বোধ নিরাকরণের জন্ম “বাল-বোধিনী” নামে একটি নূতন টাকা রচনা করিয়া মূখ্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। টাকাটা এতই প্রাণক যে, ইহা হইতে মূলের আশ্রয় অতি অস্বাভাবিকই বুঝা যায়। অতঃ ইহাতে পক্ষ প্রতিপক্ষের যথাযথ হস্তান্তরিত বিচার-বিবরণও বাপ পড়ে নাই। জারামুত, অবৈতসিদ্ধি, তদ্রসিনী, সিদ্ধিবাধ্যা, লঘুচক্রিকা, বুদ্ধচক্রিকা, বিটুলেশোপাধ্যায়ী প্রকৃত মাল ও অবৈতসিদ্ধান্তের গ্রন্থসমূহ মতন করিয়া এই টাকার রচিত হইয়াছে। ইহার অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রবণতঃ বাঙালী মধুসূদনের অবৈতসিদ্ধির উপর ইহাই প্রথম বাঙালী-রচিত টাকা। • প্রথমভাগে—

• কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে বলভঙ্গ বাঙালী ছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন উপসূক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মিথ্যাত্ব নিরূপণের প্রথম লক্ষণ পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয়ভাগে—মিথ্যাত্বের শেষ চারটি লক্ষণ (অর্থ্য্য দ্বিতীয় লক্ষণ হইতে পঞ্চম লক্ষণ) ও মিথ্যাত্বসামাজ্যোপপত্তি (অর্থ্য্য মিথ্যাত্বটি মিথ্যা কি সত্য)—এই পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই মিথ্যাত্বসামাজ্যোপপত্তি পর্য্যন্তই হইতেছে মূলের অত্যন্ত দ্রবত্ব অংশ। অতঃ, এই পর্য্যন্ত বিস্তৃত-ভাবে আলোচিত হওয়ার বিচারার্থিবরণের যে অনেক অভাব দূর হইল, ইহা বলিতেই হইবে।

টাকা বাতীত মূলের অম্বদ্য, টাকার অম্বদ্য ও টাকার সুবিস্তৃত ভাষ্যগণ বাঙালী ভাষার প্রদত্ত হইয়াছে। অম্বদ্য ও ভাষ্যগণ অতি প্রাচীন অথচ প্রাচীন। পড়িলে মনে হয় না যে এরূপ দার্শনিক গ্রন্থের অম্বদ্য পড়িতেছে। দার্শনিক গ্রন্থের এরূপ সরল অম্বদ্য ইহার পূর্বে আর দেখা যায় নাই। বাঙালী ভাষার উপর অম্বদ্যের পড়িত মহাশয়ের অসামান্য অধিকারই ইহাতে সূচিত হইতেছে।

অবৈতসিদ্ধি যে জারামুত গ্রন্থের প্রত্যক্ষর প্রতিবাদ, সেই জারামুতের মূল ও মূল্যবাহারী অম্বদ্য গ্রন্থের প্রতি ভাষার শেষ দিকে পরিস্ফুটকারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থ মূলের পক্ষে যে বিশেষ অস্বকুলতা ইহা যে বিষয়ে বিদ্যমানও সন্দেহ নাই।

মোটের উপর গ্রন্থখানি সর্বদা মূল্যবান হইয়াছে। তবে সমালোচনা করিতে বসিলে উহার দুই একটা জটিল দেখাইলে চলিবে না; সেই জন্ম দুই একটা দোষের কথা উত্থাপন করা টাকার পায় গেল না।

প্রথমতঃ গ্রন্থের মূল ও টাকার দ্বন্দ্বমূল্যে সূচিত না করিয়া নাগরাকরে প্রকাশ করিলে বাঙালী দেশ ছাড়া অন্যত্র দেশের ছাত্র ও তত্ত্বজ্ঞানস্বপনের নিকট নবীন টাকার আশ্রয় লাভ করিতে পারিত—সন্দেহ নাই। পণ্ডিতমহাশয়ের বাঙালী। তাঁহার টাকা অবাঙালী পণ্ডিত-সমাজে আদৃত হইল, একরূপ সমগ্র বাঙালী আভিউ তাঁহার পৌরষে পৌরষের সহিত পারিত। রাজেন্দ্রবাস্থর উদ্দেশ্য এই যে, বাঙালীর লেখা অবৈতসিদ্ধি বাঙালী অক্ষরেই ছাপা উচিত। অবাঙালী কেহ উহা পড়িতে চায় তো বাঙালী অক্ষর শিখিয়া উহা পড়ুক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে

তাহা ঘটনা উঠে না। দুই চারিজন অস্বদ্বিহীন ছাত্র নাগরাকর অবাঙালী পাঠক নাগরাকরের সহায়তা ছাড়া বলাকরের সম্ভবন কিছুতেই কিনিবে না—ইহা প্রব সত্য কথা। আর ইহার জন্ম গ্রন্থ আশ্রয়পত্র বিক্রীত হওয়ার পক্ষে সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়তঃ, টাকার সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া সূচিত করা অতি অস্বাভাবিক হইয়াছে। বাহ্যার অবৈতসিদ্ধির মত দ্রবত্ব গ্রন্থ পাঠে সাহস করিয়া অঙ্গের হইয়াছেন, তাহার যে সামান্য বস্তুনা অতি অসম্ভব। পঞ্চাংশদ হইলেন—একরূপ সন্ধি অসম্ভব। এই বিশদ্বিধোচীত শুধুই শ্রুতিকটু ঠেকে নাই, অনেক স্থলে টাকার গাঠন্যও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভ্রাস করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, প্রথমভাগের ভূমিকামধ্যে মধুসূদনের একশত, দুই পৃষ্ঠাঙ্গণী জীবনীটা বাঙালী দোষভুক্ত। চতুর্থতঃ, এ ভাগের ভূমিকা মধ্যে যে চল্লিশ পৃষ্ঠা বাঙালী ভাষায় প্রদত্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকিলেও বর্তমান গ্রন্থকালের উহা অস্বাভাবিক বিষয়ক্ষেত্রে পরিণতি হইয়াছে। ইহা পুথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিলে বোধ হয় শোভন হইত। পঞ্চমতঃ, টাকার অম্বদ্য ও ভাষ্যগণ উ উভয়ই প্রবৃত্ত হওয়ার প্রব-কণের অস্বাভাবিকরূপে বুদ্ধি প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তন মূলের ভাষ্যগণসম্বন্ধে ধারাবাহিক অম্বদ্য দিলে বোধ হয় গ্রন্থের ভার কিছু লঘু হইতে পারিত। এই সকল অতি-বিস্তৃত বাদ দিলে হয় তো গ্রন্থখানি এক গণ্ডেই সমাপ্ত হইতে পারিত, ও উহার মূল্যও অন্ততঃ কিঞ্চিৎপরিমাণে ভ্রাস প্রাপ্ত হইত। আজিকার, দ্বিতীয় বাঙালী ভাষ্যগণ (বিশেষতঃ তিনি যদি আবার চিরদিন গ্রন্থক্ষেত্রে পণ্ডিতের সম্মান হন) দশ টাকা দিয়া পুথক ক্রয় করা যে কতদূর বর্তন ব্যাপার, তাহা সকলেই অম্বদ্যন করিতে পারেন। যতঃ, যে মাল-সিদ্ধান্তের সহিত অবৈতসিদ্ধির অন্তর্দর নিকট সম্বন্ধ, সে মাল মতের আরও, একটু বিস্তৃত প্রসঙ্গ ও মাল সিদ্ধান্তের একটি বিস্তৃত ইতিহাস ভূমিকায় সংগৃহীত হওয়া উচিত ছিল। আশা করি, পরবর্তী সম্বন্ধে রাজেন্দ্রবাস্থ এ বিষয়ে একটু বিশেষ বিশেষতা স্থাপন।

পরিষেবে অম্বদ্য এই যে, একদিন বাঙালী সম্রাসী



মুহুরনের রচিত অষ্টতসিক্তি যেমন বাঙালীকে ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিল, আজ বাঙালী পণ্ডিতের রচিত এই নবীন চাকাও তেমনি বাঙালীর সে পূর্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

অষ্টতসিক্তি বাঙালীর গৌরবের বস্তু। অঞ্চ কিছদিন পূর্বে এই বাঙালী দেশেই এই অষ্টতসিক্তির পঠন-পাঠন লোপ হইবার উপক্রম ঘটাইয়াছিল। পরম-পুণ্ড্র্যপাদ ধ্বিকল্প পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় লক্ষণ শাস্ত্রী জীবিত মহোদয়ের প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থের এ দেশে পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। তাঁহারই চেষ্টায় এই গ্রন্থ স্বল্পতঃ পরীক্ষার বন্দোস্তের উপাধির পাঠ্যরূপে নিক্ষেপ হইয়াছে। তথাপি অধিকাংশ বৈদ্যাস্ত্রী পরীক্ষার্থীই এখনও অষ্টতসিক্তির বিস্ময় অপেক্ষাকৃত

সরল শ্রীভাষ্য পড়িয়াই বৈদ্যাস্ত্রী পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে চাহে। কেবল পুণ্ড্র্যপাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের কৃত্তবিত্ত বিদ্যাধিরূপই এখনও এ গ্রন্থের আলোচনাদি করিয়া থাকেন। তাঁহার সহযোগী অষ্টতসিক্তিগণের মধ্যে বোগেন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাণপণ পরিশ্রমে ও প্রজ্ঞাপ্রদ রাজেন্দ্রবাবুর ঐকান্তিক আগ্রহে প্রথম শিক্ষার্থীগণের অষ্টতসিক্তি আলোচনার পথ বিশেষভাবে প্রশস্ত হইয়াছে। বাঙালীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ঘরে ঘরে আবার নব্য-বন্দোস্তের চর্চা নব্যোদ্যমে জ্বালিয়া উঠুক—শ্রীভগবানের চরণে ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আর প্রার্থনা করি, রাজেন্দ্রবাবুর এই অষ্টততত্ত্ব প্রচারণার প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ হউক।

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য

## মরণ

ক্রীমনোমোহন ঘোষ

পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের পর আরও কিছু আশ্চর্য্য আছে কি না কেউ বলি প্রশ্ন করে আমার, তার উত্তরে আমি বলি, “হ্যাঁ, তা মরণ।” আমার মনে হয় মুহূর্ত্তই পৃথিবীর প্রথম আশ্চর্য্য ও শেষ আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো। মানুষ পৃথিবীতে এসেছে বৃক্ষ-বৈধ ভালবাসা নিয়ে, আর তারই সঙ্গে ক্রমেই কীটের মতন প্রবেশ করেছে মুহূর্ত্ত। মানুষ জানে মুহূর্ত্তকীট দর্শন করবেই একদিন তাকে, বাধা দিতে পারবে না কেহই—ধনী, দীন, রাজা, প্রজা সকলকেই প্রাণ হারাতে হ'বে তারই দশনেনে। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, এতই অনিশ্চিত যখন পৃথিবীতে বাস আমাদের, যে কোন মুহূর্ত্তেই সকল ছেড়ে বাসস্থান বনন সম্বাদনা আছে আমাদের, তখন কি নির্ভাবনা, কি ভীষণশূন্য হ'য়েই সমসার আবদ্ধ থাকি—যেন চিরকালের জন্যই থাকতে এসেছি এখানে। গৃহ আলোকিত করে জ্বলি, উৎসবের দীপালী আলিয়ে, আমাদের মধুর রাগিনী বেঞ্জে উঠে ছলরে প্রাণপ্রিয়

পরিজনদের সম্মিলনে, আবার কলহের সৃষ্টি করি আত্মীয়-বন্ধনের মধ্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে—মনোমালিন্যের গভীর কুরাসা আচ্ছন্ন করে সকলকে।

এই বিরাতী অনিশ্চয়তার উপর গড়ে উঠেছে, ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা। স্বল্পমুহূর্ত্ত প্রকাশ করবে এই অনিশ্চয়তা একদিন আমাদের বিরাতী ভুল প্রমাণ করবার জন্যে, তা আমরা বেশ জানি। ইতিহাস নীরবে বহন করছে তারই সাক্ষ্য। কোথায় সেই প্রাচীন বিশ্বাস, কোথা? সেই প্রাচীন ব্যাবিক্রম, কোথায় সেই ভারতের প্রাচীন মনোভাৱো। তারা বহন গৌরবের উচ্চ সীমায় মনোভাৱো। তারা বহন গৌরবের উচ্চ সীমায়, মুহূর্ত্ত ধর্মমুহূর্ত্ত ধারণ করে—বিস্মৃতির অতল তলে তারা তলিয়ে গেলো। এই তো শোচনীয় পরিণাম মানবের কর্ত্তি! কিন্তু আশ্চর্য্য যে—সৃষ্টি আবার গড়ে উঠেছে, মাথা তুলে দাঁড়াতে নতন ধর্ম, নতন সভ্যতা, নতন

সমাজ এই অনিশ্চয়তাকেই ভিত্তি করে। ক্ষুদ্র মানবের কার্য্যাবলী বেধে আগন্তো বসে কেবলই হাসে মুহূর্ত্ত।

পৃথিবীর প্রারম্ভে, বনে বনে, পর্বতে পর্বতে হুবে ঘুরে বেড়াত যে প্রথম মানব-দম্পতি, তাদের দীর্ঘায়িত চঞ্চল চরণের নৃত্য হৃদহীন করে নি জীবনের জটিলতা; হৃৎ, রোমাক্ষিত, পুনর্জিত করে কৃত্ত বাদের প্রকৃতির নব নব রূপের বিকাশ, আনন্দের বেশ ঘরে প্রবেশ করণ জুখে তাদের উভয়ের জীবনে। নারীর কোলে দেখা দিল একটি শিশু প্রকৃতির এই অপরূপ খেলালে আশ্বাস ছিল, তারা। সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ়হস্তানভিজ্ঞ সরল দম্পতি সেই দিন প্রথম অহতব করছিল এই নুবজাত শিশুটার প্রতি তাদের অন্তরের আকর্ষণ—এতদিন অপূর্ণ ছিল যেন তাদের জীবন, ফুলের মতন শিশুটা এসে তাদের অন্তরের শূন্য হান পূরণ করলে। আনন্দে রতীন হ'য়ে উঠল তাদের উভয়ের জীবন। কিন্তু একদিন অতি চুপি চুপি চোরের মতন চুরি করে পালাল মায়ের কোল থেকে তাদের আনন্দের পুতুলিকে মুহূর্ত্ত। প্রথম মানব-দম্পতির প্রাণ প্রথম কঁদে উঠেছিল, চোখের জলে বুক ভেসে গিয়েছিল তাদের। তারপর মুহূর্ত্তকে কত বিভিন্ন রূপেই তারা দেখেছিল। সেই দিন থেকে প্রকৃতির সন্তানদের প্রাণে মুহূর্ত্তভয় এসেছিল—বিপদের সমুদ্রীন হ'য়েই মুহূর্ত্তর কথা তাদের মনে পড়ত।

তার পর কত শতাব্দী কেটে গেল, কত যুগ কেটে গেল, প্রকৃতির সন্তান পৃথিবী ছেড়ে ফেলল। মুহূর্ত্তর উদ্দেশ্যকে বার্থ করলে তারা জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান-ভিত্তির দূর করে। এই পার্থিব সেহের উপরই মুহূর্ত্তর প্রাপ্ত্য মাহুয় হুত্বতে পারলে কিন্তু দেহের মধ্যে অন্তরতম যে মানবতা আছে তাকে সংহার করা মুহূর্ত্তর তিলমাত্র সাধ্য নেই। মানব গুণে গণভঙ্গুর তার এই পার্থিব দেহ, ধর্মসং ইহার অবগুণ্ণাবী আর যে মানবতা অন্তর মধ্যে গোপনে রয়েছে সে অনন্ত, অমর—অমর হ'লেই তার স্মৃতি-কর্ত্তার জ্যোতির্ভি এক কণিকার। সেই অন্তরের মানবতা স্পেতে চায় মুক্তি, ক্ষিরে যেতে চায় তার সেই সৃষ্টি কর্ত্তার কাছে, মিশে যেতে চায় সেই বিশ্বজ্যোতির্ভি

কিন্তু অবরোধ করে রেখেছে তাকে তার পার্থিব দেহ। মুক্তিদান করে মুহূর্ত্তই তাকে, তাই মুহূর্ত্তকে শত্রু বলে মনে করে না মানব, মুহূর্ত্ত এখন তার পরম মিত্র। মুহূর্ত্ত আছে বলেই আবার সেই অজ্ঞাততার কাছে দিয়ে যাবার পথ মুক্ত হ'য়ে আছে। সমসারের মারাত্মক আবদ্ধ থাকে বলেই তুলে যায় মাছুব তার ক্ষিরে যাবার কথা—মুহূর্ত্ত পরম মিত্রের জায় এসে তাকে সরণ করিয়ে দেয় সেই কথা। মুহূর্ত্ত তাই এখন মানবের কাছে বিজীবিক, হারিয়েছে, মানবের মনে আর কিছুমাত্র ভয়ের উদ্রেক হয় না মুহূর্ত্তর নামে।

মানবের জ্ঞানের বুকির সঙ্গে সঙ্গে আলোকিত আরও বার্ষ হয়েছে। সংহার রূপ ধারণ করে পৃথিবীকে সকল চিহ্নই ধুণ করতে চায় মুহূর্ত্ত কিন্তু বাস্তবিকই সে কি লক্ষ্য হয় সে কারে? রক্ত মাংসের দেহকে ধ্বংস করে মুহূর্ত্ত কিন্তু মানবের সৃষ্টিকে সে যে সজীব হয়ে উঠে পুনরায়—মানবের সৃষ্টিকে পুছে ফেলতে পারবে না মুহূর্ত্ত কখনই। নিহ্নর মানবের মতন মায়ের কোল থেকে বহন মুহূর্ত্ত ছিনিয়ে নিয়ে যাব শিশুকে, মণিহারা ধ্বনির জায় পাগলিনীকে সাননা দেয় সৃষ্টি। কাহানীন শিশু এসে তার কাশে কাশে চুপিচুপি বলতে থাকে “এই তো মা রয়েছে আমি তোমার অন্তরে, আর তো আমার হারাবার ভয় থাকবে না তোমার।” শোকাক্ত মাতা চোখ বুজে দেখতে চায় তার শোকাক্ত—তাই সে চোখ খুলে দেখতে চায় তার পুছে তার শোকা পালিয়ে যায়। নব-পরিণীতা বধুর বুক থেকে তার প্রেমের রতনটিকে দহ্যের মতন চুরি করে নিয়ে যখন মুহূর্ত্ত পালায়, তার প্রেমের স্বপ্নজাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে একবেলায় অসহায় করে দিয়ে যায় যখন মুহূর্ত্ত, সেই মরণ। অবশ্য বাসিন্দার শোকের তুফানেই সামনে, আগ্রসর হতে কেহই যখন সাহস করে না, তখন সৃষ্টিই তার। প্রথম শোককে শান্ত করে, দীর্ঘে দীর্ঘে অতি কোমলভাবে লাবণ করে তার শোকভার। স্বপ্নে তার প্রিয়জন যেন আগিল্লন করে বলতে থাকে “ভয় কি আমরা তো! স্বপ্নের রাজ্য গড়তে চেয়েছিলাম, এখন থেকে স্বপ্নের রাজ্যেই আমাদের দেখতে পাবে। আমি



তো তোমার ছেড়ে যাই নি তোমার সঙ্গে সল্লকণ থাকতে পারব বলেই আমাকে কারা ত্যাগ করে ছাড়া হতে হয়েছে।" প্রতি আছে বলেই পৃথিবীতে বাস করা সম্ভব হ'য়ে উঠেছে মানবের। নীরব রাত্রে নির্জন গৃহে মৃত আত্মীয় প্রিয় পরিজনকে ডেকে আনে স্মৃতি, তাদের কলরবে গৃহ যেন আবার মুগ্ধিত হয়ে উঠে। মানবের স্মৃতি বতসিন থাকবে, ব্যর্থ হবে মৃত্যুর সকল চেষ্টা।

এই যে পঞ্চভূতে মানবের দেহ স্থিতি হয়েছে, মৃত্যুর পর এই দেহ আবার সেই পঞ্চভূতেই মিশে যাবে। মানুষ জানে তার প্রিয়জনকে যদিও সে আর পঞ্চভূতের সমন্বয়ে বেধতে পাবে না কিন্তু প্রকৃতির পঞ্চভূতের প্রত্যেক উপাদানে তার প্রিয়জনের চিহ্ন বিজ্ঞমান থাকবে। তাই মানব প্রিয়জনকে হারালেও সমগ্র বিবে তার রূপ দেখতে পায়। প্রকৃতির প্রতি বস্তুতেই সে জানে তার প্রিয়জনের অস্তিত্ব মুকান আছে। তাই নদীর

জলে অবগাহনকালে মানব অমৃত্যব করে তার প্রিয়জনের কোমল আলিঙ্গন; স্থলের বন লুটে পালিয়ে যাবার সময় বাতাস যখন তাকে স্পর্শ করে শায়, সে অমৃত্যব করে তারই প্রিয়জনের অঙ্গসৌরভ, তারই প্রিয়জনের শাস-প্রশ্বাস; পাতার মর্ম্মর ধ্বনি তাকে চমকিত করে তোলে প্রিয়জনের পদধ্বনি শ্রবণ করিয়ে দিয়ে। বিবের প্রতি অণু পরমাণুতে প্রিয়জনের চিহ্ন আছে তা মানব অমৃত্যব করে তাই যে মেহ-ভাগবাসা কেবলমাত্র এক জনকে কেন্দ্রীভূত করে থাকে তার অবর্তমানে সারা বিবে তা ছড়িয়ে পড়ে—সারা বিব তার প্রিয় হ'য়ে উঠে, কারণ সারা বিবে তার প্রিয়জনের প্রকাশ সে দেখতে পায়। বিনবর দেহকে ধ্বংস করে বিবের প্রতি বস্তুতেই মৃত্যু তাকে অমরমান করে। মৃত্যু তাই তার উদ্দেশ্য হারিয়েছে, মানবের কাছে শক্তিহীন হ'য়েছে—পরাজয় হ'য়েছে তার সম্পূর্ণ

## যাবেই যদি

শ্রীমতী আশাশাণী দেবী

যাবেই যদি জোর কি আছে?

থাকতে যদি না চাও কাকে,

কিরেও যদি না চাও পাছে,

রাখবে না আর তোমার ধরে।

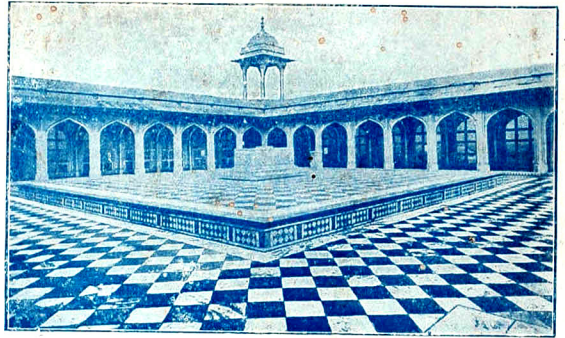
ভাগ্য আখির নীরব ভাষা,

রাগা টোটে মুচকি হাসা,

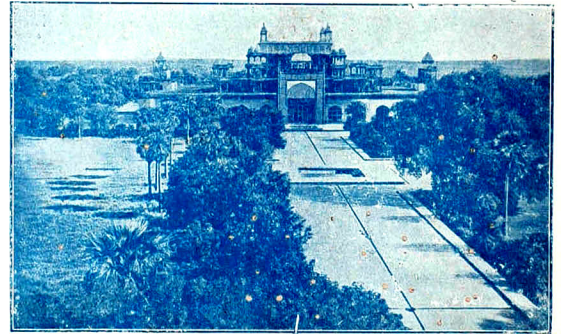
গোপন পদে কাছে আশা,

—স্মৃতির মাঝে রাখবে ত'রে।

—বসন্ত ক'রে ॥



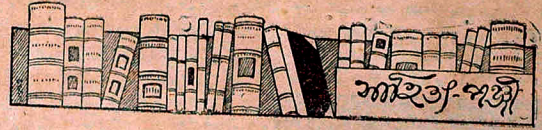
আকবরের সমাধি উপরের দৃশ্য



আকবর-সমাধি উত্তান

আকবর সমাধি—সেকেন্দ্র, আগ্রা





### শ্রীমতীজ্যোহন বাগ্‌চী

নদীরা জেলায় জমশেদপুর গ্রামের বিখ্যাত জমীদার-  
বংশে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে সুকবি মতীজ্যোহনের জন্ম হয়।  
ইনি স্বর্গীয় হরিমোহন বাগ্‌চী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র;  
যুব অম বয়স হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার  
অমুরাগ দেখা গিয়াছিল। চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময়  
তিনি সমগ্র স্ক্রুতিবাগী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত,  
পড়িয়াছিলেন; হেমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের  
রচনার সহিতও তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন; অবশ্য  
এই মনোবিগিরের রচনার সর্বত্রই যে তিনি অব্যবহা-  
রিত পারিতেন তাহা নহে, কিন্তু পঠন লিখা তাঁহার এত অধিক  
ছিল যে যাহা তিনি পাইতেন তাহাই পড়িতেন। উত্তরকালে  
এই পাঠ্যগ্রন্থাগ তাঁহার অধিকতর বর্ধিত হইতে দেখা  
গিয়াছিল। বাংলাকালে কবিগণের নিকট হইতে তিনি ধর্ম,  
ছন্দ ও গানের প্রতি যে অকৃত্রিম অমুরাগ লাভ করিয়া-  
ছিলেন, উত্তর কালে এগুলির সাধনা করিয়াই তিনি  
প্রতিভাশালী কবি হইয়াছেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের  
অনবচ্ছিন্ন কবিতা ও গানের মাধুর্য্যে মুগ্ধ ভাব-বিহীন  
যতীজ্যোহন একলাগের ছাত্র তাঁহাকে গুরুপদে বরণ  
করিয়া সাধনা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত  
কবিতা বাহির হয় ১৮৯১ সালে, স্বর্গীয় বিভাসাগর মহাশয়ের  
পরলোক গমন উপলক্ষ্যে। তখন তিনি হোমার  
স্কলের পঞ্চম শ্রেণীর 'বি' বিভাগের ছাত্র। প্রথম  
শ্রেণী হইতে উইট কবিতা প্রকাশিত হয়। 'এ' বিভাগের  
ছাত্রগণের ভিতর শ্রীমতীজ্যোহন বয়স কবিতা প্রকাশিত  
হয়। হুগ্‌বের বিদ্য কলেজের পাঠ্যবহুদায় উক্ত ননী-

পোপাল মারা বান—কবি-যশোলাভ তাঁহার ভাণ্ডে ঘটিয়া  
উঠে নাই।

এটে গা পদ্যাকার উত্তীর্ণ হইয়া কবি মতীজ্যোহন  
পুরান্দমে সাহিত্যচর্চা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার  
গুণমুগ্ধ বক্তৃতা-বাক্যেরা তাঁহার সাহিত্য-সাধনার যৎপরোনাস্তি  
আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার তখনকার কবিতার  
রবীন্দ্রনাথের ভাব ও শব্দ-সম্পদের বিশেষ প্রভাব দেখিতে  
পাওয়া গেলেও তাঁহার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তাহা তাঁহার অনেক  
বড়ই বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন—তিনি যে সাহিত্যে একটা  
বিশেষ স্থান অধিকার করিবেন তাহার ইঙ্গিত সেই সময়কার  
তাঁহার রচনা হইতে পাওয়া গিয়াছিল। প্রকৃতির নিষ্ঠুর  
ছবি আঁকিতে তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় সে সময়েই তিনি  
পরিচালিত। মাসিক 'সাহিত্য' ও 'ভারতী' তখন প্রথম  
শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা। উভয় পত্রিকাতেই তাঁহার  
রচনী নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত। ইহা তাঁহার  
পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা ছিল না, কারণ ইহা হইতেই  
১৮৯৬ সালের কথা। সে সময় শ্রদ্ধেয় হুগ্‌বের  
সমালম্পতি মহাশয়ের সম্পাদিত 'সাহিত্য'-পত্রিকার রচনা  
প্রকাশ হওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। বাস্তবিক  
প্রথম শ্রেণীর রচনী না হইলে কোন কিছুই উহাতে  
পত্রিত হইত না। এ সময় রাজসাগর 'উৎসাহ' অপর  
একখানি ছন্দার পত্রিকা ছিল। তাহাতেও মাঝে মাঝে  
কবি মতীজ্যোহনের কবিতা বাহির হইত।

১৮৯৮ সালে ২৪ পরগণার বনহুগলী গ্রামের প্রসিদ্ধ  
জমীদার ৬মিষ্টার মৈত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী



ভাবিনী দেবীর সহিত কবি পরিণয়-স্বরে আবদ্ধ হন। কবির দাম্পত্য-জীবন বড়ই মধুর। শিকিতা উন্নত-কন্যা পত্নীর অল্পপ্রেরণায়ও তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। বহু কবিতার উৎস যে তিনিই একথা বলিলে অস্বীকার হইবে না।



যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

১৯২২ সালে বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া গজ ও পদ্ম প্রদনার যতীন্দ্রমোহন ব্যাপ্ত হন। সেট সময় হইতে আর পর্যন্ত তাঁহার অস্বাভাবিক বহু কবিতা প্রসূর করিয়াছে, তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি সর্বত্র 'অদ্বিত'। ভাব ও ভাষার সাবলীল গতি তাঁহার রচনায় বৈশিষ্ট্য। চিরকালের পুণ্ডরীক কলনার দীপা ও অস্বাভাবিক এবং সমভাবে চলিতেছে, এখনও তাঁহার

রচনা বাঙ্গালীর আশা-অকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া তুলিতেছে, উন্নত চিন্তা ও ভাবের প্রবাহ যথাস্থানে দিতেছে, প্রকৃত রসের স্ফূর্তি করিয়া নিরানন্দ বাঙ্গালীর প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করিয়া দিতেছে। তাঁহার কবিতাগুলি বাহ্য পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে পর্যায়ক্রমে তাহারদের নাম উল্লেখ্য কারণতঃ—রেখা (১৩০৩), লেখা (১৩০৭), অপরাধিতা (১৩০৯), নাগবেশন (১৩০৪), যন্ত্র দান (১৩০৪), ভাগ্যবতী (১৩০৯), নীহারিকা (১৩০৪), পাকজল (১৩০৭)।

• • • রাগা বা কবিতার কাহিনী লিখিবার স্বন্দর কলা। কবি যতীন্দ্রমোহনের আছে। এই ক্ষমতার বিকাশ আমরা পেরত বয়সে তাঁহার 'পরের মাথা' উপন্যাসে বেশ দেখিতে পাই।

গজ-সাহিত্যে তাঁহার সর্বপ্রথম দান 'পল্লীকথা' (ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ)। এই পুস্তিকাখানি এখন আর পাওয়া যায় না। নীচই তাঁহার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। পুস্তকখানি যন্ত্র দান। বাঙ্গালীর প্রায় অধিকাংশ মাদিক পত্রিকায় তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

'মানসী' পত্রিকার সম্পাদন-কালে তাঁহার সমালোচনা ও আলোচনা-মূলক কয়েকটা হুচিহিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি হইতে তাঁহার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি, বিচার-পদ্ধতি ও রসাত্মকতার সমগ্র পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পাঁচ বৎসর কাল 'শ্রীকৃষ্ণ' পত্রিকায় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমুখ প্রবাসচন্দ্র শ্যোনাধ্যায় প্রভৃতির সহযোগিতায় এই পত্রিকা স্বতন্ত্ররূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি 'ময়ূর' পত্রিকাও শ্রীমুখ যতীন্দ্রনাথ দাসের সহিত একযোগে প্রকাশ করেন।

• এমনও তাঁহার এত অধিক সাব্যস্ত মাদিক পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা আছে যারা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেও আরও তিন কিংবা চারিখানি স্বন্দর কাব্যগ্রন্থ হইতে পারে। এগুলিকে নীচই পুস্তকাকারে দেবিবার আশা আমরা রাখি।

কবির সাহিত্য-সাধনা এখনও পনভাবে চালিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি যে বেশের অধিকারী হইয়াছেন তাহার নূতন পরিচয় তাঁহার রচনার সহিত পরিচিত হইবে। পাঠকবর্গকে

দিতে হইবে না, তত্ৰাত্ত হইবার, তাঁহার ভাষায় যে যথোপযুক্ত খটখাটে তাহার উল্লেখ না করিলে চলিতেছে না। ১৩০৩ সালে কাশীধামে সন্ন্যাস-পূজা-উপলক্ষে যে সাহিত্য-সম্মিলন হয়, তাহাতে তিনি সভাপতির আসন অঙ্গুষ্ঠ করিয়াছিলেন। অবশ্য সাহিত্য সভার সভাপতির আসন ইহার পূর্বে ও পরে বহুবারই তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কিন্তু এই উপলক্ষেও তিনি যে অভিজ্ঞতা ও কবিতা পাঠ করেন তাম্র শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত-সভায় যাবৎনের তর্কবর্জ-গ্রন্থ উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাকে 'কবিকুলেশ্বর' উপাধি দিয়া আশীর্বাদ করেন। তর্কবর্জ মধাশর দণ্ডায়মান হইয়া মুগ্ধ হইয়া কবিতা রচনা করিয়া উপাধি দান করেন। কবিও নত মস্তকে তাহা গণ্য করেন কিন্তু কোন দিনই তাহাকে এই উপাধি

ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই। বোধ হয় যতীন্দ্রনাথের কৌতুক্য এই উপাধি পাইবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই বলিয়া তিনি ব্যবহার করেন না।

১৩০৭ সালের ডিঃ ভাদ্র তারিখে 'রস-চক্রের' উদ্ভোগে অস্বস্তি দাগার সাহিত্য সভায় কবি যতীন্দ্রমোহনকে যে সাংবাদ দান করা হয় তাহার কথা গুলি আমরা মাসের 'উপাসনা' পত্রিকার বিশিষ্ট যতীন্দ্রমোহন-সাংবাদ ব্যতিরেক হইয়াছে। বাঙ্গালী বেশের কবিদের এইরূপ সাংবাদ হইতে দেখিলে বাস্তবিকই প্রাণে আনন্দ হয়। 'রস-চক্রের' এই সাধু অস্বস্তিই আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশা করি শাহই আমরা অস্বস্তি কবিরেণ যথোচিত সম্মান ও সাংবাদ দেখিতে পাইব।

## পরলোকে প্রভাতকুমার

শ্রীচাক চন্দ্র মিত্র

গত ২২শে চৈত্র মৌসমার রাত্রি পোনে ছই ঘটিকার সময় বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক কথা-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন প্রভাতকুমার যথোপাধ্যায় মধাশর অত্যধিক রক্তের চাপে ইহলোকে ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় রক্ত চাপের পরিমাণ ছিল ২৬। তাঁহার হৃৎপিণ্ডই কলিকাতার কৃতী চিকিৎসক। রাত্রি ১২ টার সময় তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িয়া যান ও পোনে ছই ঘটটার ভিতরই ইহলীলা সাধ করেন। তাঁহার আকস্মিক 'নিয়োগ-ব্যথার' আমরা অধীর। তিনি ছিলেন আমাদের পরমাধীশ—অগ্রগুরু 'প্রভাত'। তিনি ছিলেন আমাদের বন্ধু, পরামর্শদাতা ও গণ-প্রদর্শক। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল ৬০ বৎসর ছই মাস।

তাঁহার সন্দেহ আর কেবল মনে পড়িতেছে তাঁহার চরিত্রের মহাশুদ্ধতা, উদারতা ও বাণীর ঐকান্তিক সৌহার্দ্য। যৌবন কাল হইতে যে বাণী-সেবার তিনি

আমরা প্রায় নিয়োগ করিয়াছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অকুণ্ঠিত সে সেবা করিয়া গিয়াছেন—এ আশনার কোন দিন তাহাকে কেহ বিরত হইতে দেখে নাই। বাণীর চাপে প্রভাত পূর্ণাঙ্গ তিনি প্রভাতই দান করিতেন, তাহা বিবাহাই হউক—আর পুস্তক-পাঠে আপনার জ্ঞান-সম্ভার বাক্তি করিয়াই হউক, যে কোনো ভাবেই তিনি করিতেন। তাঁহার জ্ঞান-নিরঙ্কর, অস্বাভাবিক বাহ্য বড় কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জ্ঞান রসাত্মক, মিষ্টভাবী, সদাশর বুদ্ধির বিরোধ অশ্লিষ্টতারের চাইই আমাদের নিকট আসিয়াছে, কারণ রশ মিনিটের ব্যবধানের মধ্যে থাকিয়াও জ্ঞানের মত তাঁহাকে 'শেষ দেখা' দেখিতে ও তাঁহার চরণে কলি-শব্দার প্রবন্ধন দিতে পারি নাই, এ হৃৎসের তীব্রতা এখনও কমে নাই।

১৯০৮ সালে তিনি পাটনা কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষার



উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন সরকারী টেলিগ্রাফ অফিসে চাকুরী করেন। ইহার পূর্বেই তাঁহার অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯১ খ্রিঃ ১৮৯২ সালে আচার্য্য কৃষ্ণকমল-প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকায় তাঁহার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁহার পর 'দানী', 'প্রীতি', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল।

চাকুরী ছাড়িয়া তিনি বিদ্যভ্রমার করেন এবং ব্যক্তিগতী পাশ করিয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম দাখিলি, তৎপরে রঙ্গপুরে ও শেষে গয়র ব্যক্তিগতী করিতে থাকেন। বিদ্যভ্রমার পূর্বেই তাঁহার পত্নী-নিয়োগ হয়। তাহার পর আর তিনি বিবাহ করেন নাই।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে গয়র তাঁর প্রসার ও প্রতিপত্তি বেশ হইয়াছিল। কৌশল্যারী মোকদ্দমার বেশ চুপচাপ পাইতেন; কিন্তু সাহিত্য-সাধনার এমনই মগন হইয়া থাকিতেন যে অনেক সময় মজলের কাজে মনোযোগ হিতে পারিতেন না। সে সময় কয়েকদিনের জন্ত বন্ধুর করুণাশ্রয় বন্দোপাধ্যায় গয়াধামে গিয়াছিলেন, তাহার একখানি পত্র হইতে জানিতে পারি, সে সময় তিনি প্রায় সারারাত্রি মরিয়াই মত্ত-সাহিত্যের আলোচনার ব্যস্ত থাকিতেন। রস-শাস্ত্রের আলোচনার জন্ত বোম্বাই শহর হইতে বহু পুস্তক ও পুঁথি আনয়ন করিয়া পাঠ করিতেন, এই সময় উদ্ভট-রোকেস যে সাগ্রহ তাঁহার নিকট ছিল তাহা দেখিয়া কবি করুণাশ্রয় জানেন তা বিস্ময়-বিবুধ হইয়া পড়েন ও তাঁহার নিকট হইতে বহু শ্রদ্ধা কনিয়া অল্পবাদ করিতে বসিয়া বান; কিন্তু এই সময় তাঁহার জননীরা তাঁরদর্শন করিবার উদ্বিগ্ন বান। হঠাৎ করুণাশ্রয়ই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িতে বাধ্য হন; কাজেই ঐ অল্পবাদ-কার্য্য অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই।

তাঁহার পর যখন স্বর্গীয় মহাশয় জগদ্বিশ্বনাথ বন্দুর অসুস্থতায় বিস্তাভুত-পরে গয়াগিরা ১০ সালে সাহিত্য-বিষয়ক সচিত্র 'মর্যাদা' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন তখন প্রভাতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের বহু রচনা বিদ্যা-ছিল। 'কুমার-পত্রিকা' নামকখানি তাঁহার রচিত। ছয় মাস নিয়মিতভাবে 'মর্যাদা' বাহির হইবার পর

অষ্টম বর্ষে 'মানসী' ও 'মর্যাদা' যখন একত্র হইয়া মহারাষ্ট্র ও প্রভাতকুমার সম্পাদনে বাহির হইতে লাগিল তখন হইতে পত্রিকার শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি সম্পাদক-গুরুত্বের অধন করিয়া আসিয়া পত্রিকাখানিকে রমণিপাশ ব্যক্তিদের মনোমগ্ন ও চিত্ত-বিনোদন করিবার জন্ত চেষ্টার কটা করেন নাই। এই সময় হইতে তিনি আইন-ব্যবসাকে একেবারে ছাড়িয়া দেন কিন্তু কবিতা-কাব্য-বিদ্যার



পরলোকে প্রভাতকুমার

আইন-কলেজের অব্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ছাত্রদের অব্যাপনা করিয়া তাহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

বহু বৎসরের পরিত্যক্ত ভিতর বিদ্যাত ফেরৎ প্রভাত-কুমারকে কোন দিন সাহেবী আনা করিতে দেখি নাই; বিদ্যাতের অভিজ্ঞতার তিনি বিদ্যাতের লোকের দোষ ও গুণের লব পণ্ডিত পাইয়াছিলেন তাহার নিষ্ঠুর চিত্র তাঁহার 'দেশ-বিদ্যাতী' পুস্তক-ও বহু গল্পে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার গল্পগুস্তিতে দেশীয় আদর্শের দিকে যে একটা

অসাধারণ 'টান' ছিল তাহা বেশ উপলব্ধি করা যায়। তাঁহার কথা-সাহিত্যে 'অন্যায়'র বেশ মাত্র ছিল দেখিতে পাওয়া যায় না—জন্যতির প্রশংসা তিনি কোন দিন দেন নাই। হাজারসের ও 'হিমায়ের' দিকটা তাঁহার রচনার যেমন পরিপূর্ণ, সেইরূপ গাভীর দিকটাও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত।

তিনি ছিলেন সাধারণের নিকট গভীর প্রকৃতির লোক; কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের নিকট তাঁহার ছাত্র বসাবাসী লোক ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই রসের ভিতর 'মি' তিনি শিক্ষা, জ্ঞান ও সত্যি-সত্য প্রসারতা বৃদ্ধি করিতেন—তিনি ছিলেন একরূপ উপদেশ—কিন্তু যথাক্রমে তিনি বৃদ্ধিতে দিতেন না যে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপদেশ দেওয়া। কোন ব্যক্তির চরিত্রের উপর কোনদিন তাহাকে বোঝাবার করিতে শুনি নাই।

তাঁহার ছাত্র মত-মিহু বন্ধু ও বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা কালে দেখিতেছি তাঁহার মতের বিরুদ্ধ-সমালোচনার কারণে কোন দিন তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার ছাত্র চিন্তাশীল

সাহিত্যিকের তিরোধানের বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

প্রভাতকুমার জননীরা একমাত্র সন্তান। তাঁহার জননীরা বয়স এখন ৮২ বৎসর। মৃত্যু কিছুদিন পূর্বে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'দাদা এবার গ্রীষ্মের চুটীতে কোথায় বেড়াতে যাবেন?'

উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন 'এবার মার শরীয়াটা ভাল নেই, বোধ হয় কোথাও যাওয়া হবে না—মা ভাল হইলে নিশ্চইই কোথাও না কোথাও যাব।'

'মা' এখন একটু ভাল হইলেন, কিন্তু তিনি বেথার গেলে সেখান হইতে কোন যাত্রাই আর ফিরিয়া আসে নাই—রাখিয়া গেলে অচল-বশ আর ৮২ বছরের বুঝা জননীকে ও ছদ্ম পুর শ্রীমান অরুণকুমার ও প্রশান্তকুমারকে। তাহাদের গুণে রহিল পিতার শেষ সময়ে তাহারা কিছুই করিতে পারিল না—আর তাহার বুঝা জননীকে কি বলিয়া সাধনা দিব তাহার ভাবা আমরা বুঝিয়া পাইতেছি না—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাহার শোক-বিষম চিত্তে শান্তি দান করেন।

## অমরবতী

( সঙ্গন )

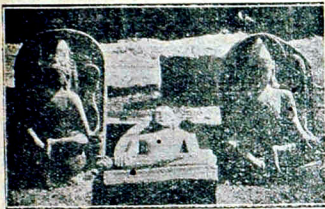
শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী

অমরবতী বৌদ্ধদের একটা প্রাচীন প্রসিদ্ধ তীর্থ। অমরবতী স্থপের কথা ক্ষুদ্র, বর্গ, 'সিউল', 'দুরে। অমরবতীস্থপ আঙ্গ রাজ্যেরই অন্তর্গত। স্থপের গ্রন্থভেদে, মূশে, ভিন্দেট শিখ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আর্কিওলজিক্যাল রিপোর্টে ও (যে ৭৩, ১৮৭) ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। অমরবতী স্থপ বেল-গাড়ার প্রায় ৩ কোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থপটা পুরাতন ধর্মগোষ্ঠী বা ধাতুচক্রের দক্ষিণে; মাজাজে ক্যান্টনীর দক্ষিণ

তীরে—এই নদীর মোহনা হইতে ইকা জুনান ৩০ কোশ। অমরবতীস্থপের কথা ক্ষুদ্র, বর্গ, 'সিউল', 'দুরে। অমরবতীস্থপ আঙ্গ রাজ্যেরই অন্তর্গত। স্থপের গ্রন্থভেদে, মূশে, ভিন্দেট শিখ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আর্কিওলজিক্যাল রিপোর্টে ও (যে ৭৩, ১৮৭) ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। অমরবতী স্থপ বেল-গাড়ার প্রায় ৩ কোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থপটা পুরাতন ধর্মগোষ্ঠী বা ধাতুচক্রের দক্ষিণে; মাজাজে ক্যান্টনীর দক্ষিণ



ঐতিহাসিক তারনাথের লিখিত বৃত্তান্তে সনিত ও ইহার বেশ মিল আছে। নাগার্জুন ধনশ্রীযুগ বা আধাত্মকটকের চৈতন্য চারিদিক বেষ্টিত দিয়া বিস্তারিত ফেলেন। নাগার্জুন ছিলেন কণিকের সমসাময়িক। কণিকের রাজ্যকাল ছিল



সপার্বন বুদ্ধমূর্তি

১২০—১৫০ খ্রীষ্টাব্দ। স্তম্ভেরা বলিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকে ১৪০ হইতে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাহিরের রেলিং নির্মিত ও অলঙ্কৃত হয়। ভিতরকার রেলিংএর নির্মাণকার্য শেষ হইতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাহা শেষ হয় নাই।



বৌদ্ধগণের স্থাপত্য নির্দেশক শূন্যমূর্তি

স্থাপত্য-কলার যেই পাত্র-দ্বারা নির্মিত। তাহার ছই ধারে ছইটা রেলিং, তাহাদের মধ্যে বাহিরের দিকে যেটা তাহা ১৩ ফিটা ১০ ইঞ্চি উচ্চ এবং ভিতরেরটা ৫ ফুট ৫ইঞ্চি রেলিং এর পাথর ও স্তম্ভগুলি ইত্যাদি উল্লত ভাস্কর-কার্যের দ্বারা অলঙ্কৃত।

স্থপটীর ব্যাস ১৩৮ ফুট, ভিতরের রেলিংএর পরিধি ৪২১ ফুট এবং বাহিরের রেলিংএর পরিধি অনান ৮০ ফুট,



শিলাস্তম্ভ হইতে বোদিত সর্প মূর্তি

বাহিরের রেলের মাথায় ১২,০০০ হইতে ১৪,০০০। হস্তদ্বয়ে কাজকরা ভিতরের রেলের মাথায়ও অনেক।



দাক্ষিণাত্য হইতে সর্প পূজার নিদর্শন

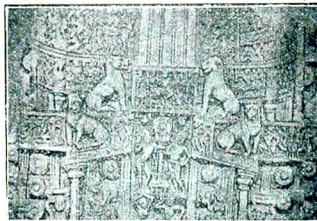
বাহিরের রেল বেশ খাড়া খাড়া শিলাস্তম্ভের দ্বারা নির্মিত। বাহিরের দিকের প্রত্যেক ফলকের মধ্যস্থলে একটি কবরী পূর্ণ

গোলাকৃতি চক্র এবং সেই ফলক, গুনির উপরে এবং নীচে অঙ্ক গোলাকৃতি চক্র ছিল—এবং তাহাতে আরও ছোট ছোট বোমাইকার্য ছিল। তাকগুলিতে কতকগুলি



অথ

মাত্রের মূর্তি, কতকগুলি ডেউ বেগান গুল বসিয়া আছে। স্তম্ভগুলি গুলিতে নানারকম ভঙ্গিতে জন্তু ও ছোট ছোট ভেলেদের মূর্তি কোদিত করা আছে। ভিতরের যে ভাস্কর্য



গ্রীক আদর্শের নিদর্শন

শিল্প তাহা বাহিরের অপেক্ষা অনেক ভাল, এবং শিল্প-নৈপুণ্য অনেক শ্রেষ্ঠ।

ভারতীয় কলা ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য-শিল্প সম্বন্ধে অমরাবতীর গোদন প্রদীপিত।

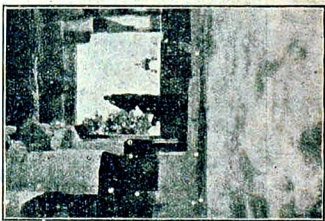
বৈদেশিক পণ্ডিতগণ বলেন, ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্প ছই স্থান হইতে প্রভাবান্বিত হইয়াছে, আলেকজান্দ্রিয়াও এশিয়া মাইনর। ঐতিহাসিকগণ অস্বাভাবিক বলেন যে,

অমরাবতীর শিল্পকার উপর গ্রীক ও পারস্যের প্রভাব আছে। ভারত, পার্শ্ব, বোধগয়ার শিল্প কার্য আলেকজান্দ্রিয়া হইতে আসে—ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবে নির্মিত। ইহা এমন ভাবে তৈয়ারী হইয়াছে যে কোন উপায়ে বুঝিবার যে নাই যে, ইহার মূলে বৈদেশিক দিকা আছে। রাজা অশোকের রাজ্য কাল হইতে খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে পর্যন্ত



দিক্ মূর্তি অঙ্কিত অমরাবতীর স্তম্ভ

ভিতরে এইবিজ্ঞার যথেষ্ট চলন ছিল। গাফার, পেশোয়ারের যে ভাস্কর্য-শিল্প তাহার মূলে আছে পারস্যের এবং এশিয়া মাইনরে কতকগুলি শিল্প-শিল্পার ডেউ। অমরাবতীর যে ভাস্কর্য-শিল্প তাহাতে আছে আলেকজান্দ্রিয়ার শিল্পের



অমরাবতীর হিন্দু-মন্দিরের বৌ

নিকট অঙ্কিত। এ গুলি প্রমাণ সাপেক্ষ। এই সিদ্ধান্ত গুলি একেবারে মানিয়া লওয়া যায় না। যথেষ্ট দিক্ দিয়া ও দৌন্দর্যের দিক্ দিয়া অমরাবতীর স্থান



সাকী ও গান্ধারের মাঝামাঝি। পূর্বাঞ্চলের শিল্পীরা কিন্তু গান্ধার-শিল্পে বুদ্ধদেবের নান্দ্র্য কল্পন করত ত্রিভুজের মূর্তি বড় একটা আঁকিতেন না—যুগ্মাশু আসন, পদচিহ্ন এবং আরও অজ্ঞাত প্রতীক খোদাই করিতেন।



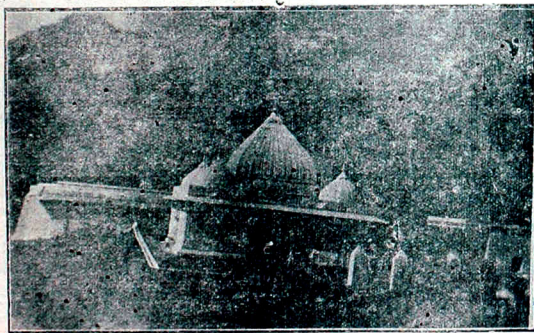
অমরাবতীর হাগতা-নিদর্শক বুদ্ধের বিশিষ্ট আসন

কিন্তু গান্ধার-শিল্পে বুদ্ধদেবের নান্দ্র্য কল্পন করত ত্রিভুজের মূর্তি পাওয়া যায়। অমরাবতীর শিল্পে খুব কমই সাকী বা ভাষহস্তের মত প্রতীক মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের নান্দ্র্য ভঙ্গীর মূর্তি অমরাবতীতে খুব কমই আছে।

অমরাবতীর অসীত গরিমা কেবল কল্পনা করিতে পারা যায়। অমরাবতীতে অসংখ্য ভগ্নাবশেষ আছে। শিলা-লিপি আর ফোদিত মূর্তিও অসংখ্য আছে। পালি ভাষায় শিলালিপির ফোদিত কথা হইয়াছে। ফোদিত মূর্তি বুদ্ধ এবং অপর ঐক্য-বর্ণ-বিষয়ের মূর্তিগুলি বেশীর ভাগ ভগ্ন অবস্থায় আছে।

অমরাবতীতে একটা হিন্দু-মন্দির আছে তাহা অনুমান চারি হাজার বৎসর পূর্বে নির্মিত হয় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

আমরা এই নিম্নে অমরাবতীর শিল্পেতিহাসের নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটা চিত্র প্রদান করিলাম। এইগুলি হইতে নৌদগুপ্ত, লিপপুত্র, বৈদেশিক প্রভাব ইত্যাদির উদাহরণ পাওয়া যাইবে।



## তৃতীয় প্রস্তাব

গত আশ্ব মাসের "পঞ্চপুস্তক" প্রকাশিত "পরকীয়া" সহকীয় দ্বিতীয় প্রভাবে আমরা দেখিয়াছি যে, "পরকীয়া" শ্রীধার ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত দেহই হইতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। ইহা সকল গোষ্ঠীতেই সন্মত। মহাজ্ঞানী বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও এই মত। শ্রীকৃষ্ণগোদামিপাদের কড়চার লিখিত একটা মোকে এই কথা সন্দেহ-ভাবে বলা হইয়াছে। এমন অনেক মহাজ্ঞান-বাক্য আছে। কথিত মোকটা এই—

রাগ কৃষ্ণ-প্রণব-বিকৃত ছাদিনীশক্তিরদ্বা  
দেকাভ্রনাবাপি হুবি পুরা দেহভেদং রক্তে তে।  
চৈতন্যধাম প্রকটমধুনা তদ্ব্যং চৈক্যমাপ্তং  
রাগা ভাব-দ্ব্যতি-বলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

অর্থাৎ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভেদের চেদের বিকার বা বিলাস-রূপী শক্তি শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভোদার হইলেও, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-কালের পূর্বে পর্যন্ত তাঁহাদের উভয়ের দেহ-ভেদ ছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে তাঁহার দেহে তাঁহাদের উভয়ের শরীরের একা সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীরাধার ভাব-কাক্ষি-বলিত সেই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে (শ্রীচৈতন্যকে) আমি মনস্কর করি।

এখন আমরা কথা এই, যদি এই রূপ মিলিত-দেহই শ্রীগৌরাঙ্গ হ'ন, তবে শ্রীচৈতন্যরূপে কেবল শ্রীকৃষ্ণই অবতীর্ণ একথা বলা হয় কেন—শ্রীরাধা অবতীর্ণ, একথা অন্ততঃ একবারও কহাকে বলিতে স্তম্ভিত হইতে পারেন? অথচ শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্যদেহ শ্রীরাধা এবং অন্তর শ্রীকৃষ্ণ একথা সর্ববদী-সম্মত; তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যে শ্রীরাধারই বিশেষভাবে অভিব্যক্তি, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরাও পূর্বে প্রস্তাবে দেখিয়াছি এবং ইহাতেও দেখিব যে, শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীরাধারই সম্বন্ধিকভাবে প্রকাশমানা; অন্তরকথা, তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণাংশের শ্রীরাধারই অবতারিত ভাব দৃষ্টব্য: খুব বেশী। উক্ত মোকে "রাধা-ভাব-দ্ব্যতি-বলিতং" কথা-গুলিতে তো তাহাই বুঝায়, অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার বাহ্যে (দ্ব্যতিতে) এবং কার্যে (ভাবে বা স্বভাবে) শ্রীরাধা; অথবা

## পরকীয়া

(শ্রীগৌরাঙ্গ-বাহ্যে পরকীয়া শ্রীরাধার অবতারিত)

### শ্রীজ্যোতিষ্মত চট্টোপাধ্যায়

অজ্ঞ প্রকারে, দর্শন-শাস্ত্রের সহিত এই কথা একা রাখিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, শ্রীচৈতন্যের স্থলাভিষেকের উপাদান-রাধাশক্তিই হইতেছেন শ্রীরাধা। শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে "অন্তর কৃষ্ণ বহিঃ রাধা" বৈষ্ণবধর্মের এই সাধারণ ভাবের উক্তিও এই সব কথার পোষকে যায়। ইহাতে বুঝ, শ্রীগৌরাঙ্গ অপর কৃষ্ণ; যেমন স্থলভাবে বলিতে গেলে সকল জীবের অন্তরে পরমাৎমরূপী শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি, কতকটা যেন তেমনি ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গেরও তাঁহার স্থিতি; আর বাহিরে—স্থূল দেহে—শ্রীচৈতন্য হইতেছেন শ্রীরাধা। এক কথাগুলো শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ তেমনি কারণ হইতেছেন না, যেমন কারণ হইতেছেন শ্রীরাধা। যে হেতু অবয়ব এবং স্বভাব সর্বত্র ব্যক্তিগত আর ইহাদের মধ্যবর্তিত্বই একে অপরকে চিনে ও বুঝে—এই চিনা ও বুঝার "অন্তর-রূপে"র প্রয়োজন হয় না। তাই, শ্রীগৌরাঙ্গকেও এই প্রকারে ব্যক্তিগতভাবে—অর্থাৎ অবয়বে ও স্বভাবে—চিনিতে ও বুঝিতে গিয়া তাঁহার বাহ্যাবরণ শ্রীরাধাকেই আমরা তাঁহাতে দেখি ও বুঝি শ্রীকৃষ্ণকে তো দেখি না বা বুঝি না। তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার বলার কারণ হয় তো দর্শন-শাস্ত্রের বিষ্ক হইতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পরম-পুরুষ—তব্রাতীত—এবং তিনিই পরমা-প্রকৃতির আশ্রয়; সুতরাং গৌরাঙ্গ-দেহে শ্রীরাধাংশের শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাধান্য, অতএব গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার বলা হয়; কিন্তু দর্শনের কথা উজ্জল-রসের ব্যাপারে কতটা খাটে তাহা আমি ঠিক জানি না, আর তাই রাধাকৃষ্ণকে মাংসা-দর্শন প্রভৃতি দ্বিক ধরিতে পারি কি না তাহাও আমি ভাল বুঝি না। উজ্জল-রসের অভিনয়ে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণাংশের প্রাধান্য রসিক ভক্তেরা সর্বদা স্বীকার করেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এক প্রভাবের কথা অনেক আছে। শ্রীচৈতন্যের দেহ ও ভাব সেই উজ্জল রসেরই, তিনি উজ্জল রসেরই অবতার; সুতরাং শ্রীরাধা তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণাংশের স্বপ্নভাবের ক্ষুদ্র বটে।

এখন পাঠককে বলিতে হইবে না, এই প্রস্তাবে আমরা



বুঝাইবে যে, ঐতিহ্যে অবতারিক সম্বন্ধে ঐক্যমতের যে দাবী, তাঁহার আদর্শবী পরকীয়া শ্রীরাধার দাবী তপস্৷। অদিকতর হোৱের; এ সম্বন্ধে কিছু ঈশ্বরে বলিরাহি। অবশ্য আমি বাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা একেবারে নূতন কথা, বাহা বোধ হয় কলিকালে কেহ বলেন নাই। তবে ইহা নিশ্চিতই কেন? উত্তর—আমরা প্রাণে শ্রীরাধার ঐ দাবীর কথা নিম্নতই উল্লেখ, আর অবশেষে আমাকে অধির করিয়া তুলে। যদি সে কথার বিস্তৃতিতে আমার দোষ হয়, তমিক ভক্তগণ আমাকে মাৰ্জনা করিবেন।

ঐতিহ্যকে প্রজ্ঞানবতার বলা হয়ই থাকে। “প্রজ্ঞা” কিনা “গুণ” —“আত্মত্ব”। এখানে অর্থ হইতেছে, ঐতিহ্য-দেহে ঐক্য বস্তু শ্রীরাধার দ্বারা আত্মত্ব। এ অর্থেও শ্রীরাধার সেই প্রাণাভূই দেখি—অর্থাৎ বাহ্যতঃ শ্রীগোরাঙ্গ নারী, শ্রীরাধা। এতদ্ব্যতীত, আমার মনে হয়, পুরাণে ঐতিহ্যের অবতারণা কথা নাই; কারণ পুরাণে পরমা-পুরুষেরই অবতার স্বীকৃতি হইয়াছে; তৎকথিত সকল অবতারই সেই পুরুষের। কিন্তু পুরাণ আদিতের পক্ষে না হইলেও, অর্থাৎ পুরাণে পরমা-প্রকৃতি বা নারীর অবতারের কথা না থাকিলেও, অস্তুত শ্রেষ্ঠ শাসন-শাস্ত্র শিব-কথিত ভয়ে তাহার উল্লেখ দেখি। তন্মতেও সকল অবতারই চিন্ময়ী পরমা-প্রকৃতির; কারণ অবতারের ভগ্ন-কর্ম্মারি প্রকৃতির নিম্নের, পৃথকে সে সব থাকে না। তাই যেন গীতার ঐক্য বলিরাছেন—

প্রকৃতিং বাসিন্দীং সন্ত্যাবান্ময়ায়া।

অর্থাৎ, আমি নিম্নের প্রকৃতিতে অগ্নিতে হইয়া আপনায় মায়ার দ্বারা আবৃত্ত হই। এই ব্যাপারে, পুরুষের সে দিব্য আর থাকে না—তাৎক্ষণিক যাই, অজ্ঞ কথায় সাংখ্যকথিত তাঁহার সে “অসীমোহমপূর্ণত্বঃ” ভাব আর থাকে না। গীতার উক্ত ত্রৈলোক্য শ্রীগোরাঙ্গের পাঠে। পুরাণোক্ত দশাবতারের কথা তেঁজিল তখনে দশম উজ্জাসের শেষে এইরূপ আছে—

০ নারীকে পুরাণাধিক শক্তির বিস্তৃতি-মূর্তির আদর্শবোধে কথা আছে; কিন্তু সে সকল ঘটনা মনব-সমাজের বাহিরে।

শ্রীশ্রী উবাচ।

তারাদেবী যীনরূপা বর্ণনা কুর্ম্মমূর্তিকা।  
দ্ব্যবতী বরাহঃ শ্রাব হ্রিমমতা বুমিহিকা।  
ভুবনেশ্বরী বাননঃ ত্রাণাত্তরীঃ রামমূর্তিকা।  
ত্রিপুরা জামমধ্যঃ ত্রাণং বনভক্ত্যন্ত ভৈরবী॥  
মহালক্ষ্মীভবৈবন্ধো গো ত্রাণং কবিরূপিকা।  
স্বয়ং ভগবতী কালী কুম্মমূর্তিঃসমুদ্রবা।

অর্থাৎ, তারা হইতেছেন যীনাবতার; বর্ণনা কুর্ম্মমূর্তি; দ্ব্যবতী বরাহঃ হ্রিমমতাঃ অবতার বুমিহঃ; ভুবনেশ্বরী বামনাবতার; মাতঙ্গী রামমূর্তি; ত্রিপুরা বা বোধেশ্বরী পরমায়; ভৈরবী বলরাম; মহালক্ষ্মী বুদ্ধাবতার; ত্র্যম্বক কবিরূপা, আর স্বয়ং ভগবতী কালী ঐক্যরূপে অবতীর্ণা।

তন্মতে বনন অবতারই নারীর—পরমা-প্রকৃতির—তখন তন্মতের theory অস্বাভাবিক শ্রীগোরাঙ্গের শ্রীরাধার অবতারিকই সম্ভবপন হইতে পারে, কিন্তু আমি যতগুলি তত্ত্বে উপলব্ধি হইয়াছি, তাহাদের মধ্যে শ্রীগোরাঙ্গের উল্লেখ দেখি নাই। নাই বা উল্লেখ থাকিল? পুরাণ কিংবা তন্ত্র সকল অবতারের কথা তো বলেন নাই; বরং তন্ত্র ঐ দশাবতারের মিলিত অল্প কোন অবতারের কথাই বলেন না। কিন্তু ঐতিহ্যগত একদম আছে দেখি—

০ পাঠক সেবিতেন, বাহরতের “কৃষ্ণকৃত্যবানু বহুঃ” এ কথা জোলের সহিতই “স্বয়ং ভগবতী কালী” ইত্যাদি মোকাবেলা করিয়া মইরাছেন। অনেক তন্ত্রাচাৰ্য্য দশমাবতারের মধ্যে কালীই পূর্বতম পদ্যগতী; তাই দশাবতারের মধ্যে তন্ত্র ঈশ্বাকে দশম অবতার বলি, তাঁহাকে—পুরাণের কথায়—অবতারী বলিরাছেন আর তাঁহার পরিত্রৈ দশমাবতারের বাহিরের ত্র্যম্বকে দ্বিজ দশাবতারের মধ্যে পূর্ণ করিয়াছেন। কালী ও কৃষ্ণের ত্র্যম্বক একতরের দ্বারা অনেকের দেখা যায়। রামপ্রসাদ গাখিরাছেন—

০ বংশলা নাচত গোৱে বরো বীময়ী বনি।  
কেশব কৃষ্ণালি কোথা কাজ বনি।

আবার কমনাকান্তের একটি পদে দেখি :—

গান মা রে মদন কারন স্নান্য ভো নামনা মেয়ে নয়।

শ্রীমা মেয়ের স্নান করিয়ে দানন কখন কখন পুরুষ হয়।

মহাভারত উপদ্রবন। তাহাতে দেখি কল-কথাবারের অবতীর্ণা জামাই কুম। মদন মৌলি-দ্বারীর গারে উচ্চ ভাবগত নিদিত হইয়াছে।

অবতারঃ যমগোরাঃ হুয়ে শ্রবনিদোদিকাঃ।

অর্থাৎ স্রবণী হরির অবতার অম্বাধ্য। সেই সকল অস্তুত অবতারদের মধ্যে শ্রীগোরাঙ্গ অস্তুত হইতে পারেন বটে, তবে ইহাতে তিনি যে অবতারী ইহা প্রতিপন্ন হয় না। না উল্লেখ, কতি নাই।

ঐতিহ্যে নারী-ভাব-প্রাণবল সম্বন্ধে আরও কথা বলিব। ঐতিহ্যের জিজ্ঞাস্য দেখুন; দেখুন সে যুগ—তাঁহাতে পুরুষ-ভাবের কিছুই নাই, তৎপারিতের তাহাতে যে কমনীয়তা ও কামলতা দেখা যায় তাহা সম্পূর্ণভাবে নারীজন্যে। আর সে মধ্য? তাহার কামলভবের তুলনা পুরুষে কোথাও পাইব? আবার সে আনন্দমাধা করণ-কণ্ঠের গীমন বন্ধার—তাঁহার সেই ভাবের হ্রস্ব, হয়ত যে ভাবের হ্রস্ব পাখীর গানে তুলিয়া চাকিত হইয়া সে দিন Coleridge বলিয়াছিলেন—

০ “ভক্তজি ভগবত উক্তকর্ম্মান বসু এক” “ভক্তমালে” হুত এই গোৱার কথা হইতেছে আমাদের শাস্ত্রের কথা। অর্থাৎ ভক্তজি, (ভক্তিমূল্য) ঐতিহ্যবান বসু আর ঐতিহ্যবান এই চারিটা নাম একেরই—অন্ত কথাই এই চারিটির বহে একই। তম্বক-পুরাণাধিকার ভক্ত আর ভগবতের প্রভেদ বহু মনে না, বরং ভগবানে অলপা শার ভক্তেরই প্রাধান্য বহে। ব্যাপি-পুরাণে ভগবতাকা এই—

০ যে ভক্তজন্যে পার্থন সে ভক্তাক্ত তে জনা।

মহাভারতের ভক্তজ্ঞে সে ভক্তজন্যে মর্য্য।

অর্থাৎ আমার ভক্তজন্যে আমার ঘরবার ভক্ত মর্য্য। ঘরবার আমার ভক্তজন্যে ভক্ত তাঁহাকে আমার ভক্তজ্ঞে। আবার পদ্যমূল্যে নিবাক—

০ বিকাসারাবান পরম।

তন্মত পদ্যতঃ সেবি ত্রীমায়ঃ সন্ন্যাসিনঃ।

অর্থাৎ যে সেবি, বিদ্যার ত্রীমায়ঃ তেই, কিন্তু তদগণনা তাঁহার ভক্তজন্যে অর্চনা স্বাক্ষরতঃ তাঁহাকে সেবি, ভগবান বলিতেছেন—

মন্তব্যপূর্ণাভাবিকা

অর্থাৎ আমার পূর্ণাভাবিকা আমার ভক্তের পূর্ণা অভাবিকা। এতদ্ব্যতীত হইতেছে এই যে, যখন এককথক ভক্তের পরাকাল হইতেছেন ঐতিহ্যে, তখন কারোই এ যেন তিনি ভগবান বৈ আর কি হইতে পারেন? আর উপরে কথাগুলোই আমি যদি এমন কথাও বলি, যে তিনি ভগবান অলপাও সন্তোষ, তাহাতেই বা সেবি কি? অবতার ইহাও পদ্য পুরাণ বা তাদৃশিত তাঁহার উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক, সে যোঁয়ের আঁক এমন বরকরা নাই। কেহ কেহ তাঁহার অবতারিক প্রাণ কবিরার ভক্ত পুরাণাধিক হইতে প্রস্তুত স্নেহ হই একটি অম্বক তুলিয়া থাকেন।

And is she sad or jolly?

For ne'er on earth was sound of mirth

So like to melancholy.

আর Shelleyও একদিন সম্ভবতঃ যে ভাবের হ্রস্ব পাখীর গানে তুলিয়া বলিয়াছিলেন যেন সে গানের হ্রস্ব—

There is some hidden want.

—সে করণ কণ্ঠের স্বাক্ষর, নারীকণ্ঠের বৈ আর কি হইতে পারে? তবে সে কণ্ঠের যে পুরুষাভিত গাষ্টাধ্যও ছিল, ইহাও লেখাপড়ায় দেখি, সম্ভবতঃ ভগবদ্বিহ-জনিত আত্মিকালে সে কণ্ঠ নারী-কণ্ঠ হইত।

নারীই সর্বজ্ঞ সর্বস্বত্ববাদিনী; ভক্তিমার্গে পায়মাধিক বিবেকে তাই। ঐতিহ্যভক্তচরিতামতে দেখি—

ভগবতঃ স্বতঃ দিতে জ্ঞানিনী

স্বয়ং সেই ভক্তস্বত্ববাদিনী জ্ঞানিনীই ঐতিহ্যভক্তের দেহ। যদি জ্ঞানিনী শ্রীগোরাঙ্গের অধিষ্ঠিতা না থাকিতেন, তবে তাঁহাকে “গুহিত” কে? এখান থেকে গোরাঙ্গ-দেহে কাগীর প্রাণভক্ত—ঐক্যমত না শ্রীরাধার?।

আবার জাগতিক ব্যাপারেও নারীই শ্রেষ্ঠতা। Montgomery লিখিয়াছেন—

Here woman reigns; the mother,  
daughter, wife,  
Strew with fresh flowers the  
narrow way of life.

রাধাক্ষয়ের পার্থিব জীলাতও সেই নারীই রাজত্ব দেখি। শ্রীদামাবতঃ রাণী কে? ভক্ত্যে ঐক্যকে কাহার

ঐচ্ছিক ইচ্ছারী কবিতার অংশগুলিই তাঁহাদের হ্রস্বের মাঝে পড়ন্ত ইচ্ছারী বাধ্য। বুঝা যায় বাহ্যভূত আনন্দ-সিদ্ধি কণ্ঠবোধে এবং কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত তাঁহার কখন-কখন-কণ্ঠের অস্তুতের কণ্ঠবোধের বহু প্রথম হইত হয়। তাঁহার অস্তুতজন্য নী কি বিবিধ-রসপূর্ণ সে কণ্ঠের কলহান গোলাবদে। তন্মতে, আর তাহাতেই না কি তাঁহার কণ্ঠবোধের মজান পাইয়াছিলেন। বাহ্যভূত বহু কণ্ঠন কবিরার সম্মত—তৎকালীন চরিত্রাণ, বিখ্যাত, অতঃপর প্রকৃতির পর পাইবার সম্মত—কোন ভাবের হ্রস্ব অবলম্বন করিলে, তত্ক্ষণাৎ কামি। এমনও ভাবতত্ত্বের সর্বজন্য ভাবের বান হয়, কিন্তু একমাত্র বাহ্য বাহ্য অনেক যাহেই তাহা এখনকার জগতের কণ্ঠের হ্রস্ব হয় না।



কোটাঙ্গ সাজাইয়াছেন? তাহা হইলে এখন প্রাধান্য  
কাহার? সেই আমার বুদ্ধাবশেষী রাধা-রাণীর না?  
তাহার দেখে, সেই রাণীর অবিষ্টানের "পরবেই" তো  
ঐচ্ছিকের "গরব" বলুন না কেন শতবার  
ঐচ্ছিকচরিতামৃতকার—

নন্দমত বলি যারে ভাগবতে গাই  
সেই কুম্ভ অবশ্য চৈতন্য গোমাই।  
তাহার সে কথা বেন-আন-ভাবে আমি কখনই  
মানিব না। এটা কোন আমার অগড়া করা—  
শুক বলে আমার কুম্ভ মন্দে আইন।  
শারী বলে আমার রূপ বামে বতকল।  
—নইলে শুধুই মন্দ—

সেইরূপ।

এখন আর একদিক হইতে আমার বক্তব্য বুঝাইব।  
ঐচ্ছিকচরিতামৃতে এই সকল কথা আছে—  
শ্রীকুম্ভ-চৈতন্য-নয় করহ বিচার।  
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।  
বহু জন্ম করে বরি শ্রবণ কর্তীন।  
তবু নাহি পায় কুম্ভপদ প্রেমধন।  
কুম্ভ যদি চুটে ডক্তে ভক্তি মুক্তি দিবা।  
কহু প্রেম-ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া।  
হেন প্রেম ঐচ্ছিক বিল যথাস্থা।  
জগাই মাধাই পূর্য্যজ্ঞের ক কথা।  
অজ্ঞানিহ দেব চৈতন্য নাম সেই লয়।  
কুম্ভ-প্রেমে পুলকান বিলল সে হয়।  
কুম্ভ নাম করে অপরাধের বিচার।  
কুম্ভ বলিতে অপরাধি ন হয় বিকার।  
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।  
কুম্ভ নাম-বীজ তাহা নী হব অধুর।  
চৈতন্য নিষ্ঠারানন্দ নাহি এ সব বিচার।  
নাম লৈতে প্রেম দেন বহু অশ্রুদার।

বস্ত্র ষষ্ঠর প্রভু অত্যন্ত উদার।  
তীরে না ভজিলে কহু না হয় নিতার।  
এই কথাগুলিতে শ্রীকুম্ভের ও ঐচ্ছিকের গুণগত  
বিভেদ বেশ দেখান হইয়াছে। উহাতে দেখি যে, শ্রীকুম্ভ-  
ভজনে প্রেম পাওয়া বড় কঠিন; তিনি প্রেম দিতে চাহেন  
না, ভক্তি-মুক্তি দিয়া ভক্তকে দ্বারি দেন। আবার তিনি  
ভক্তের অপরাধও গ্রহণ করেন। অপরাধী ভক্তের তাঁহার  
নামে সাত্বিক বিচার হয় না। একদল স্থলে সে ভক্তের  
প্রচুর অপরাধ থাকে বৃত্তিতে হইবে; সে জন্যই উদার-ভূমিগুণ  
তাঁহার দ্বয়ে কুম্ভনাম-বীজ অধুরিত হয় না। কিন্তু  
ঐচ্ছিকন্যায় এ সকল কিছুই নাই; তিনি অত্যন্ত উদার—  
নাম-গ্রহণেই তিনি নির্বিচারে ভক্তকে প্রেম দেন।  
তাহাতে ভক্তে সাত্বিকভাবে বিকাশ হয়—চোখে অশ্রু  
ধরে।

এখন দেখিতে হইবে যে, শ্রীকুম্ভ ও ঐচ্ছিকন্যায় একই  
বস্তু হইলেও কেবল ঐচ্ছিকন্যায়ই এ উদারতা—ভূমিনায়  
প্রকাশ্যভাবে এ প্রাধান্য—কেন? উত্তর, ঐচ্ছিকন্যায় যে  
শ্রীকুম্ভ ছাড়া ত্রীরাণ্যও অবস্থিত; এ উদারতা, এ কোমলতা,  
যে তাঁহার সেই নারী-ভাবেরই ফল। প্রেম যে নারীরই  
নিগূঢ়—তাঁহার সর্বস্ব। এ সকল কথাই শ্রীগোরাব-দেহ  
শ্রীকুম্ভাপেক্ষা ত্রীরাণ্যের প্রাধান্য তো খুব বুঝা যায়। তবু  
ঐচ্ছিকন্যায় কেবল শ্রীকুম্ভেরই অবতর। বাহবা!

ঐচ্ছিকন্যায় মিলিত-তত্ত্বর ন্যায় যে এক প্রকারের পুংস্ত্রী-  
ভাবের সাম্যবিক্রম দেখে হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে,  
একটি আমরা এখন আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বলিব;  
এবং আরও দেখিব যে, ঐক্য শরীরে স্ত্রীত্বের আধিক্যও

১. বীতরও ঐক্য উদারতার কথা বাইবেলে আছে। কোন এক  
হিব্রু কবি হইতে কিছু উদ্ধৃতি—  
Wanderer from thy Father's home  
Hasten back—thy errands own;  
Turn—thy path leads not to Heaven;  
Turn—thy sins will be forgiven,  
Turn—and let thy songs of praise  
Mingle with angelic lyres. (নাম-কীর্তন)  
Wanderer, here is bliss for thee;  
Leave them all to follow Me

ধাকিতে পারে বা থাকে, যেমন আমাদের মতে  
উহা ঐচ্ছিকের শরীরে ছিল। যৌন-রহস্ত-বিশারদ  
(Sexologist) Dr. Magnus Hirschfeld হইতেছেন  
এখনকার যৌনতত্ত্বের Einstein। তিনি বলেন—

The fact is there is no such thing as an  
absolute man or an absolute woman. When  
you bear in mind the fact that science can  
change the sex of guinea pig, or cause other  
animals to manifest the characteristics of the  
opposite sex, it will not be difficult for you  
to apprehend that there is or may be such a  
thing as relativity in sex. The effeminate man  
or the masculine woman is, to the sex-scientist,  
but expressions of "biological variations." The  
surprising fact is that you bear certain charac-  
teristics of the opposite sex in more or less  
extent whether you like it or not.

আবার এতদ্বারাও পুরোক্ত পণ্ডিতের—

It is a scientifically established fact that  
about three per cent of the population are of  
the intermediate sex, in other words, there  
are more than ten millions of them in China.

তিনি আরও বলেন—

If you are married or are going to be  
married the chances of your finding happiness  
in life with your mate depends largely, though

President of the Sex Science Institute in Berlin  
and one of the Presidents of the World League for  
Sexual Reform on a Scientific Basis.

আমাদের শাশুরের কথাতে সকল জীবের পুরুষ-প্রকৃতি  
নাহয়ও মতে তিনি কখনও পুরুষ কখনও না নারীভাবে আদিত  
হ'ন। ঐচ্ছিকন্যায় একবারের সেই পুরুষ ও নারী; তবে তাঁহাতে  
নারীবোনের আধিক্য এই মাত্র বিশেষ। প্রচলিত নামেই আছে—  
"ভরা পরমেবরী।" কখনো পুরুষ হও না কখনো নারী।

not entirely, upon how closely the bi-sexual  
characteristics in you complement those in your  
mate. The perfect sexual union is the perfect  
complementing of these qualities on the part of  
the couple concerned.

এই কথাগুলোতে বলা যায় যে, ঐচ্ছিকন্যায় ছিলেন  
বিজ্ঞানের ভাষায় "effeminate man," তবে স্ত্রী  
তাঁহাতে পরিতুষ্টভাবেই (Predominating ছিল, এবং  
তিনি উক্ত ভাষায় পণ্ডিত-প্রবরের কথা মত "Inter-  
mediate Sex" এর (পুংস্ত্রীর মধ্যবর্তী) হইতে পারেন  
ঐচ্ছিক-সম্বন্ধে এসব লেখা গুস্তা। তবে তাঁহার রচনামত  
লৌকিকভাবে কতকটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। স্ত্রী-  
প্রধান ভাবের জন্যই যে ঐচ্ছিকন্যায় প্রেমের ঠাকুর—  
ভয়ের ঠাকুর (কাঁচা-খেণ্ডা দেবতা) নহেন। বৈদেশিক কবি  
Lyte এর ষষ্ঠের উল্লেখ কাতর আহ্বানের ভাষা তাঁহার  
প্রতি বেশ খাটে—

Come, not in terrors, as the king of kings,  
But kind and good with healing on thy wings,  
Tears for all woes, a heart for every plea:  
Come friend of sinners thus abide with me!

"পরকীয়া" যথাক্রমে আরও লিখিবার প্রবল। এখন এস  
একবার ত্রীরাণ্যের পাশ্চাত্য-সম্প্রতি-প্রবেশ রাস-তপস্বীর  
শ্রীকুম্ভচৈতন্যগণিণি ত্রীরাণ্যে। ভূমি আমাকে বাহা  
লিখাইয়াছ, তাহাই লিখাইছি। এখন একবার এ পাণ্ডিত্যকে  
এতটুকু রূপা করিবে না কি বুদ্ধাবশেষ? এস এস  
প্রেমঘরি! তোমার শ্রীকুম্ভচৈতন্যরূপে আমার কাণের কাছে  
নিমিত্ত শুনাও—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীতি বিহততে তুণ্ডবিনীলকায়ো।  
কর্ণকোড়কম্বিনী গঠয়তে কর্ণশিখোদ্যো: পুংহাম্।  
তোতা প্রাঙ্গনাস্ত্রিনী বিজয়তে সর্দৌল্লিখাণাক্তিত।  
নো জানে জনিতা কিমস্তিরমুতৈ: কুম্ভেতি বসন্ত।  
যে দিন আমার কাছে হবে তো?।

১. ভগবান্ সন্যস্তে কৈবল্যে "আপাণাণ" "পতিতাপাণ" প্রকৃতি ভাবই  
এই। বলা অন্যত্রও স্ত্রীলবধি আশ্রিত ভাবেই কৈবল্যবর্ধ।



## অভিভাষণ

শ্রীহরেন্দ্রনাথ কুমার

আজ আপনারা আমার মত নবগা ব্যক্তিকে যে সমানে সম্মানিত করিয়াছেন, তার হয়তো যোগা আমি নই—কিন্তু আপনাদের এই উদারতার জন্ম আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ হুগলি-জেলার গ্রন্থাগারসমূহের অধ্যক্ষ ও গ্রন্থককদের সম্মেলনে বোধ হয় অনেকের অনেক কিছু বলিবার আছে এবং তাহার জন্ম প্রস্তুত হইয়াও আসিয়াছেন। আমি আজ তাই শ্রোতা হইয়া শিক্ষণীয় হইয়া আপনাদের ধারগ্রহ হইয়াছি। আজ আর এখানে গ্রন্থকফা ও গ্রন্থাগারের সৌষ্ঠব-সম্পাদনের ব্যবহারিক বিদ্যা অস্বীকৃত কোনো বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমার নাই। এই সম্মেলনে আপনাদের আলোচনা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমি রাখি।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থকফা, সাধারণ গ্রন্থাগার, জনসাধারণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ও আয়োজন এই সব ভাব ও কথাগুলো সম্পূর্ণ নাই—হইবে, প্রধানতঃ প্রতীচীর ও আধুনিক। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রত্যেক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থকফার কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ব্যক্তি, বংশ ও সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি ছিল। মধ্যযুগের প্রতীচীর দেখাপটী—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা—ব্যক্তি ও মঠবাসী বৃত্তির মোহাশ্র ও ঈশ্বরীশ্রের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের কথা আমরা মধ্যযুগের শেষ পাকে—যুগ পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাকে—প্রতীচীর সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাই। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে নিকলো নিকলি তাঁহার নিজের সংগৃহীত হস্তলিখিত গ্রন্থসমূহ ফ্রান্সের জনসাম্রাজ্যকে দান করিয়া গিয়াছিলেন। নিকলো নিকলির এই দান অবলম্বন করিয়া যোগ্য হয় ইংলণ্ডের প্রতিভাশালী লেখিকা জর্জ এলিয়ট তাঁর 'রমলা' উপন্যাসে বার্ডার দান্নার চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁর উপন্যাসেরও যুগ হইতেছে ইতালীর পুনরুজ্জীবনের

(Renaissance) সময়ে—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা আধুনিক যুগের প্রারম্ভে। যুগ পঞ্চদশ শতাব্দী ইউরোপের একটা ঘটনাময় যুগ। আমেরিকার আবিষ্কার (১৪৯২), বাইজান্টাইন-সারাজের পতন (১৪৫৩), রামাকটুক ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার (১৫৯৮), মুসলিমের উত্থান, মধ্য-ইউরোপের পুনরুজ্জীবন, ফ্রান্সে রমলো-রোবোর প্রভাব (১৪৫২—১৪৯৮) আর ফ্রান্সের প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠা সবই এই যুগ পঞ্চদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল।

এই তো গেল ইউরোপের কথা। ভারতে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধবর্ণের প্রভাবের সময়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, পণ্ডিত-পাঠন জাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, আর মুসলমান-সাম্রাজ্যের পর যে অনেক অমুদ্রা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ ভারতবর্ষ থেকে অদৃশ্য হইয়াছিল ও এখনো লোপ পাইয়া, দেশান্তরিত হইয়া বিদেশ ও বৈদেশিক ভাষায় সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহার অন্ততম সৌণ কারণ হইবে, শিক্ষা-দীক্ষার এই রকম একটা একতর ব্যবস্থা।

গ্রন্থ লেখার প্রারম্ভ অতি প্রাচীন যুগে হইয়াছিল। সে যে মানব-মনোবিশিষ্টানের ইতিহাসের কোন ভাগ-মুহুর্তে হইয়াছিল—সে যে কতদিন আগে—আর কোন দেশে তার হ্রস্বপাত সে বিষয়ে ঠিক কিছু বলা হুকরিন। তবে ছবি আঁকা ও লেখা দুইই যে একসঙ্গে বিকাশ পাইয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। প্রাচ্য ও প্রতীচীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন প্রস্তর-যুগে ক্রুহ-গায়ে চিত্রিত অনেক ছবি আঁকিত হইয়াছে। এই সকল চিত্র তখনকার দিনে লেখার কাজ করিত। এই সকল ছবি আঁকিবার উদ্দেশ্য যে কোনও একটা বড় রকমের ঘটনার দৃষ্টিকে জগাইয়া রাখা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এই যুগের অনেক পরে

যোগ্য হয় লৌহযুগের প্রারম্ভে অক্ষরের সৃষ্টি হইয়া ছবির হইত, আর তাঁর জন্ম কোনও কোনও দেশে গ্রন্থ-কাগজ অক্ষরে নিবদ্ধ করিবার প্রথা যুগ হইয়াছিল। এই লিখন-প্রণালীর সৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভাষাতার বিকাশের সহিত বিভিন্ন সময় হইয়াছিল।

আমাদের দেশে ভাষার বুলারের মতে লিখন-প্রণালী খৃঃ পূঃ ৮০০ বৎসরের যে অনেক পূর্বে প্রচলিত ছিল, এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার হারাল্ড ও মাহেন্ডারারের প্রমাণস্বাক্ষর এই প্রারম্ভ আরও অন্ততঃ ৫০০ বৎসর পঞ্চমতে সরিয়া গিয়াছে। এ তো গেল লিখন-প্রণালীর কথা। পুস্তক-রচনা বোধ হয় লিখন-প্রণালীর প্রারম্ভের প্রায় সমসাময়িক। 'শরীর' লেখেন বেণী ভুল হইবে না। এই গ্রন্থ-রচনা-প্রথা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও সভ্যতার স্তর বিশেষে বিভিন্ন আকারে ধারণ করিয়াছিল। প্রাচীন হ্রস্বস্বরীপদের মধ্যে বাবিলের ও 'আলেক্সান্দ্র'র মাত্র লেখকে লিখিয়া আস্তে পড়াইয়া কঠিন করিয়া আধুনিক পুস্তকের পাতার মত ব্যবহৃত হইত। উর ও নিনেভের খনন করিয়া এরকম অনেক খোদিত মূল্যকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের দেশেও যে এইরূপ যলদের ব্যবহার ছিল তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। পরে আমাদের দেশে গাের র পাতা, বহল ও কাঠের ফলক গ্রন্থ-রচনার উপকরণ যোগাইত। প্রাচীন পাশ্চাত্য-জগতের স্থান-বিশেষে বৃক্ষপত্র, বহল, পত্রা, ধাতীর পাতের ফলক ও কাঠের পাতায় গ্রন্থাদি লিখিবার পদ্ধতি ছিল। কাগজের ব্যবহার প্রাচীনকাল মিশর দেশেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়—প্রাচীন মিশরে Cyperus papyrus নামক Cyperaceae শ্রেণীর জলজ উদ্ভিদ হইতে পাপিরাস কাগজ প্রস্তুত হইত—প্রাচীন গ্রীস ও রোম মিশরীয়দের নিকট পাপিরাস কাগজের ব্যবহার ও প্রস্তুত-প্রণালী শিখিয়াছিল। আধুনিক উপায়ে ব্যবহারযোগ্য কাগজ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনদেশের দ্বারা প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। কাগজের বহল প্রচার মুসলমান-প্রণালীর উত্থানের সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল। চীনদেশে ছাপা ও কাগজ উভয়ই বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

ছাপার অভাবে প্রাচীনকালে গ্রন্থ সকল হাতে লেখা

হইত, আর তাঁর জন্ম কোনও কোনও দেশে গ্রন্থ-লেখকের দল গঠিত হইয়াছিল; তারা নানা রকম সৌষ্টব সম্পদ ও স্বন্দর অক্ষরে পুঁথি ও কেতাব নকল করিতঃ আরও প্রায় পঞ্চাশ দেশে ইহার একটা বেশ বড় রকম মণ্ডল গঠিত করিয়াছিল। তাদের হাতের লেখা এখন তারিফ করিবার জিনিস হইয়া পড়িয়াছে; আর সেমতীয় লিখন-প্রণালীসমূহও তাহাদের ইতিহাস-লেখকদের ব্যাপারে পরিচিত হইয়াছে।

শ্রীম পূর্বেই বলিয়াছি যে, যখন অপর সকল জাতি হাতে পুঁথি নকল করিয়াই সমস্ত পাকিত, তখন কেবল একমাত্র চীন দেশেই গ্রন্থ ছাপার কাজ প্রচলিত ছিল। এখন এই বর্তমান যুগে বই-ছাপা পোতাভা একটা অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। বই ছাপার কাজ আমাদের দেশে ইংরেজ-রাজত্বের অধ্যুয়ানের সঙ্গে আরম্ভ হয়। ছাপা-খানার প্রতিষ্ঠা থেকেই আমাদের দেশে জ্ঞানের আলোক উজ্জলভাবে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এটা ইংরেজ রাজত্বের একটা সৌরভয় দান—পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা বিষয় রশ্মি যা আজ ভারতের জাতীয়-সমাজের অনেক অন্ধ-তমসায়ুত দূর ও কন্দরকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। তবু এখনও অনেক বাকী আছে—এখন সমস্যা আমাদের জাতীয়-জীবন জ্ঞানের সমুদ্র-সেচনে অধুনিত—ভারতীয় জাতীয়-জীবনের আলোকে এ সমুদ্র আরও অনেকদিন ঘুরিয়া ঘেটন করিতে হইবে। আমাদের সর্বাঙ্গ বর্ধনশীল—আমাদের অজ্ঞাভিত্তিক কৃষ্ণবস্ত্র—আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত ও বর্ধনত ক্ষুদ্র ও জড়—বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া একটা মিথ্যা আড়ম্বরময় বস্ত্রের সৃষ্টি—এ সকলের মূল এই এক জ্ঞানের অভাব। জ্ঞান আমাদের সত্যক দৃষ্টি দেয়—চিন্তাশক্তির বিকাশ করে—অধিবিশ্বাসের মূল কুঠারীঘাত করে—প্রাণে সন্দেহ জাগাইয়া দেয়।

“বিশ্বাসে মিথ্যার বস্ত্র তর্কে বস্ত্রের”—এটা আলেক্সের কথা—মানসিক জড়তার কথা।

আজকাল কেহ কোনও দেশের বা জাতির সভ্যতার নিদর্শনের কথা তুলিলে আমরা প্রথমই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি—আজ এটা একটা প্রধান নিদর্শন—যে যে দেশের



বধা বলিতেছে—যে জাতির সভ্যতার এক সৌরভ করিতেছে, সে দেশে বাসে জাতির মধ্যে বসবাস করত বই ছাড়া হয় আর কত বইই বা পারে? এই ক্ষুধাধরে যদি আমরা আমাদের জাতীয়-সভ্যতার বাড়াই দ্বি-তরি তাহা হইলে বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে আমরা ইউরোপের অনেক শিখনে গড়িয়া আছি। আমাদের দেশে বই পড়িবার সখ, আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণার এখনও বড়ই অভাব। এই আকাঙ্ক্ষাকে জাতির মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই পিপাসা মিটাইবার বাস্তুল্যতার সঙ্গে আমাদের জাতীয়-জ্ঞানের পরিচি বাড়াইয়া দিবে। চিন্তা-শক্তি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে—জাতির জীবন অভিব্যক্তি নিয়মিত হইবে—একটা নতুন প্রণালীতে প্রবাহিত হইবে।

জাতির মধ্যে বা দেশের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার ও জ্ঞানের পিপাসা বাড়াইবার একটা অকৃত্রিম উপায় স্থানীয় গ্রন্থাগার-গঠন ও সাধারণের বিনা খরচায় পঠন-পঠনের সুবিধা বিনাম করা। কোনও কোনও দেশে স্থানীয় পল্লীবাসীদের অধ্যয়নের সুবিধা-সম্পাদনের জন্ত শহরের কেন্দ্র গ্রন্থাগার থেকে পল্লীতে সংস্থাপিত শাখা-গ্রন্থাগারসমূহে নতুন প্রকাশিত গ্রন্থসকল নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত পাঠাইয়া দেওয়া হয়—এ ব্যবস্থায় হ্রদ্বয় গ্রাম ও পল্লীবাসীদের নতুন বইও সকল পড়িবার বড় সুবিধা হইয়া থাকে। অবার কখনও কখনও এই সকল পল্লীর শাখা গ্রন্থাগারে শহরের কেন্দ্র থেকে লোক পাঠাইয়া বহুতা ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অনেক ভুল-বিষয় সংশোধন পল্লীবাসীদের বোধসম্মত করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণের জ্ঞানের পিপাসা বাড়াইবার আর তার পরিচি প্রসারিত করিবার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে বাঙ্গালা দেশে এ রকম কেন্দ্র ও শাখা গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয় নি।

আজ আপনারা স্থাপনাবাদের হুগলী জেলার যে এই রকম একটা প্রস্তাব গঠন করিতে পারিয়াছেন, এটা বড় আনন্দের কথা—আপনাদের জেলার, পল্লীতে-পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে যে একটা সড়ক পথ আছে—এতে আমরা সকলেই উৎসাহ ও উৎসাহিত হইয়াছি, আর তার জন্ত বাঙ্গালা

দেশে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা সকলেই আপনাদের এই প্রবাসের সাক্ষ্য কামনা করি।

অনেক দিনের সাহচর্যে পরস্পরের মধ্যে একটা সৌহার্দ্য ও প্রীতি জন্মে গুঁঠে। সে প্রীতিটা অহেতুকী অর্থাৎ এ ভালবাসাটা ভালবাসবার জুই এই ভেতরের জন্ত কোনও উদ্দেশ্য থাকে না। আমি এক রকম আশ্চর্য এই বৈ-কৈত্যের সাহচর্য করে থাকি—আমার জ্ঞানের উদ্দেশ্য থেকে এদের সঙ্গে আমি। পরস্পর—আর আজ এই স্থলী ২৫ বৎসর বইয়ের মূল্যে খেড়েই আমি জীবিকা-অর্জন করি—হয় তো বই-কৈত্যকে আমি একটু বড় করে দেখে থাকি। কিন্তু আমার মনে হয় যে এর এদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—যিনি মানুষের মধ্যে মানুষের মনের মহত্ব স্বীকার করেন—যিনি জ্ঞানমার্গকে প্রকৃষ্ট মার্গ বলে মনে করেন—তিনি অসন্দ্বিগ্ধ চিন্তে বলিনে যে, মানুষের জীবনে এই ছেঁড়া পুঁথিগুলার ভাব খুব বড়। এরা মানুষকে মানুষ করে তোলে—তার পতন ঘটিয়ে দেয়।

আর এই সব গ্রন্থ থেকে আমরা যে কত মনোবীর পরিচয় পাই তার সংখ্যা করা যায় না। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কত আলাপ হয়। যাদের আমরা কখন দেখি নি—যাদের সঙ্গে আমাদের আলাপের কোনও সম্ভাবনাই নাই—তাঁরা আমাদের আপনার জন্ম হয়ে পড়েন—তাঁদের গুণের প্রীতি জন্মে গুঁঠে—তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের কোনও একটা নির্দিষ্ট সময় নাই—আলাপ করিবার জন্ত চিঠি লিখে সময় নিষ্কান্ত করিতে হয় না—কার্ড পাঠাইয়া আরম্ভের শব্দ করে ডাকে বহু অপেক্ষা করিতে হয় না—তাঁদের সঙ্গে আলাপ খট্টা মিনিট ও মেকের গুণীর সীমায় আবদ্ধ থাকে না। আমার গ্রন্থাগারে বসিয়া প্রিয় বন্ধদের সঙ্গে আমার বক্তব্য ইচ্ছা আলাপ করিতে পারি—তাঁদের কথা শুনিতে পারি—তাতে তাঁদের বিরক্তি নাই—চিরকালই সঙ্গমসময়ে তাঁরা আলাপের জন্ত প্রস্তুত। কালিদাস চিরকালই পুরানার কনককরনের শিখনে; তাতে তাতে ভবন শিবীর নৃত্যের ললিতকাহিনী শুনাবেন, তাতে তাঁর রাস্তি নাই—সেখানকার গিয়ারের মুকভাঙ্গা ছাংয়ের চিত্র দেখাবেন—

অতীতের আত্মকে এরা সক্রিয় করে রেখেছে। অতীতের সব চলে গেছে—আজ ছেঁড়া কাহিনীর অমৃত বাজনা আর বিলুপ্ত রাগের অমরী মূর্ছনা। এই অতীতের আত্মার আলোকে আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে গঠন করে তুলি। কত দুঃস্বাদি, নীচর ও মধুর, সাক্ষ্য ও উদারতা, লজ্জা ও গৌরবের কত চিত্রই না আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইবে শুভে। অতীতের শিক্ষার আমাদের জাতীয়-জীবন সম্যকরূপে গঠিত হইবে শুভে।

যথোপযুক্তরূপে সংগঠিত গ্রন্থাগারগুলি এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করে। যদি সুসিদ্ধান্তিত গ্রন্থ-মূল্য একটা স্থানীয় ও স্থানীয়গণিত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত থাকে তাহা হইলে অনেকে মানুষ হইবার সুবিধা পায়—উচ্চ শিক্ষার অভাব জনসাধারণের অজ্ঞত করিবার সুবিধা পায় না। যারা কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে বাবার সুবিধা পান না, তারা এই সকল গ্রন্থাগারে নিরমিতভাবে কোনও একটা বিশেষ বিষয় অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান লাভ করেন এমন কি উচ্চতর পারদর্শিতা অর্জনের পর নতুন সত্যের আবিষ্কার করে ধন্যবাদ হ'ল। জু-এর মত যারা অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা লইয়া হতাশভাবে ঘুরে বেড়ান—বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের স্থান নাই—তাঁদের পিপাসা মিটাবার এই গ্রন্থাগার-গুলিকে একবার উদয়।

মানুষের জীবনটা ও তো চিরকাল নিছক স্বপ্নের নয়—অজ্ঞতা, ধৃগ, রাহিদ্দা, রোগ, শোক—সবই তো আছে—তার মধ্যে যদি একটু আনন্দ, একটু প্রীতি লাভ করা যায়, সেটা কি বড় কম লাভ? অন্ধকারাঙ্কে ভাসমান রজনীতে যদি ছায়া ছিন্ন মেঘের প্রায় দিয়ে একটু নির্মল স্রোতঙ্গা আসিয়া পড়ে—তবে সেটা কি স্বপ্নের লাগে না? সেটুকু উপভোগ

করার কি কম আনন্দ? এই সকল পাঠাগার যদি মানুষের মনোনিব জীবনের শোভা ছাপ ফির্কিরে জন্ত তুলিয়ে দিতে পারে—সেটাও তো একটা বড় কথা? যারা এই প্রীতি ও আনন্দ উপভোগ করেননি তাঁরাই বলতে পারেন যে আনন্দ কিরণ—এ মাদকতা কেমন—শোক ছাপ তুলিয়ে দেয়, প্রাণে বল সঞ্চার করে—এ অসুখের সোমরস দেবতার বাহিত—যারা এই অমরবাহিত স্বপ্ন-পানে ধজ হইছেন তাঁরা কি আজ এটানি ঘবিরের সঙ্গে বলতে পারেন না?—

স্বাদোন্নতি বয়সঃ সুখেণাঃ  
স্বাধো বরিবো বিস্তরতঃ  
বিশে যং দেবা উত মর্ত্যাসা  
মধু ক্রবন্তো অস্ত্রিমচরন্তি ॥  
স্বপ্নের সহিত আমি এই স্বপ্নটি আত্মাগ্রহণ করিয়াছি, এতে হুজিরা জাগিয়ে দেয়, চিন্তিতা দূর করে দেয়, দেবতা আর মানুষ এক মধু একত্রে উপভোগ করেন।

আমি সোমসমূহা অহম-  
গম জ্যোতিঃবিদ্যাম বোবান-  
কিং নুমম্বাঙ্কপাদরাধিতা-  
কিং যুতিঃসমুত মর্ত্যজঃ ॥

আমরা সোম পান করিয়াছি; আমরা অমর হইয়াছি; আমরা জ্যোতিতে গমন করিয়াছি, আমরা দেবগণের সহিত পরিচিত হইয়াছি; শত্রু আমাদের কি করিতে পারে? যে অমর, মানুষের হিসাই বা আমাদের কি করিতে পারে? যে এই সোম পান করিয়াছেন সেই অমর হইয়াছে—আপনারাও উল্লা পান করিয়া অমর হ'ন।

• বাশবেড়িয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার-সংস্থাপনের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।



## শান্তিপূরের লেখকবর্গ

(পূর্বাঙ্গস্বত্ব)

শ্রীশান্তিপূর ভট্টাচার্য

৬জয়গোপাল গোষাধী

প্রাণীত গ্রন্থ—কায়দর্শন, বাসবদত্তা, সীতাহরণ, চাপলাবা, সংসদর্শ, শৈবলিনী, রত্নগুণ (এই দুইখানি উপভাষ্য), আটাকাট, মদনমালা, লঘুব্যাকরণ, অঙ্কমণিকা (সংস্কৃত ব্যাকরণ), ঋগ্বেদবিজ্ঞান, গৌরবিন্দ দাসের কব (ডাটা) এবং কতকগুলি অপ্রকাশিত গ্রন্থ।

‘কায়দর্শন’ ক্রিষ্টিয়ঙ্গ ৭১ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়; তখন বাঙ্গালা ভাষার অলঙ্কার গ্রন্থ ছিল না; ইহা গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ‘আটাকাট’ পড়ে শান্তিপূরের তদানীন্তন ‘মুদ্রাণ’ পত্রিকার সহিত মমীযুগের কল। ব্যাকরণ দুই খানির অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল।

‘করচা’ সংক্ষেপে বিস্তৃত বিবরণ পরে লিখিত হইতেছে।

‘শান্তিপূরের অষ্টোত্তমশল (মদনগোপাল শাখাচক্ৰ)

গোষাধী বাম্পে গৌরব, বনামধন্য সাহিত্যসেবী, সুপণ্ডিত ৬জয়গোপাল গোষাধী মহাশয় অনীতিবর্ষ বয়সে বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ দ্রবিরার পূর্ণমাসে সৌখিন্যে আত্মীয়স্বজনের মুখে হরিনামমঙ্গলীর্জন শুনিতে শুনিতে সন্ধ্যা ৬খণ্ডলাভ করিয়াছেন। তিনি সন্ধ্যা এবং বাঙ্গালা ভাষার অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ৩০-৪০ বৎসরাদিককাল শান্তিপূর (মিউনিসিপ্যাল) ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; স্বতরাং তাঁহার অসংখ্য ছাত্রবর্গের মধ্যে অনেকেই সংসারে নানাব্যাপ্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি সেকালের একালের সংযোগ-গ্রন্থিত মত বিভ্রম্যন ছিলেন। ‘কিাত’ অর্দ্ধশতাব্দীর অবিস্মৃতাঙ্গ তিনি সাহিত্যচর্চায় ব্রতী ছিলেন। এত দীর্ঘকাল একপ একনিষ্ঠভাবে মুহুরিতাধনা-করিতে সাধারণতঃ দেখা যায় না।...এমন মধুর ৬ উল্লিখিত, নিরীহ, নিরীহাধী, অমারিক, অমর, সন্ত, দেহময় মনবী আমার অঙ্গই দেখিয়াছি। তিনি স্বকবি ও ভাষুক ছিলেন; এবং ইমানী

অনেক নূতন পালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুই পুর (শ্রীমোহনলাল ও শ্রীবাহুবল্লভ) সেইগুলি আশ্রয় করিয়া কথকতার দশবী হইয়াছেন। বাঙ্গালা-মুদ্রিতোত্তর প্রচলিত কবি শ্রীবেণোদারীলাল গোষাধী পিতার সাহিত্যপ্রিয়তার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। (১) ইহার বিস্তৃত জীবনও প্রকাশিত হইয়াছিল। (২)

গোবিন্দ দাসের করচা প্রথম ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীবেণোদারীলাল গোষাধী প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ইহার প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে দুইবার যোরতর আন্দোলন হইয়াছিল—একবার গোষাধী মহাশয়ের জীবিতকালে, এবং অন্যবার কয়েক বৎসর পূর্বে। নব সংস্করণের ভূমিকায় দীনেশবাঁবু বিরুদ্ধমতবাদীদেব মত বণ্ডন করিবার প্রচারা পাইয়াছেন। ‘সেই স্বল্পবী ভূমিকা পাঠ করিয়া বহু গোষাধী ও পণ্ডিত আমাকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে এই অমূল্য পুস্তক-বানির সংক্ষেপে তাঁহাদের সমস্ত ঝিগা দুর হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে অজিতীয় পণ্ডিত ৬মশীচন্দ্র রায়, এম-এ, শ্রীযুক্ত গৌরমুখ অচ্যুতচন্দ্র তবনিবি, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, শান্তিপূরনিবাসী ভূতপূর্ণ অম-এ, রত্নপূরের সরকারী উকীল শান্তিপূর-সন্তান স্বয়ং বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ঐতিহাসিক ৬খাণ্ডলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পণ্ডিতবর মনোমোহন চক্রবর্তী এবং শ্রীযুক্ত মুদ্রাণিলাল অধিকারী গোষাধী প্রভৃতি বহু মহোদয় এই পুস্তকের পক্ষপাতী।’

(১) ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২২।

(২) বঙ্গভাষার লেখক, ১ম ও ২য় ভাগ।

১৩৩৮]

শান্তিপূরের লেখকবর্গ

১৫২৫

(১) করচার নব সংস্করণের ভূমিকার লিখিত আছে—  
উপকরণ নলিনীমোহনবাঁবু ও শরৎবাঁবু পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন। ‘আরোপিত অভিযোগের উত্তরে’ যে ৬জয়গোপাল গোষাধীকে শান্তিপূরে ‘একঘরে’ করা হয় নাই এবং তাঁহাকে শরৎবাঁবু পুরাতন করচার পুঁথি নকল করিতে দেখিয়াছিলেন। ঐ সময়ে শান্তিপূরস্থ কবি শ্রীকীর্তীচন্দ্র গোষাধী ও ৬হরিলাল গোষাধী মহাশয়দ্বয়ের পত্রও উদ্ধৃত হইয়াছে। কীর্তীশবাঁবু শান্তিপূর মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীরামচন্দ্র গোষাধী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়াছিলেন এবং ৬হরিলাল গোষাধী মহাশয় লিখিয়াছিলেন, ‘করচার পুঁথি জয়গোষাধী গোষাধী মহাশয়ের নিকট ছিল ইহা অনেকেই জানেন। কিন্তু ইহার যোগ আনা মৌলিকতা সংক্ষেপে আমার সম্মুখে আছে।’ (২) দীনেশবাঁবু লিখিতেছেন, ‘তাঁহার কেন? আমি নিশ্চয়ই জানি যে মুদ্রিত বোল আনা বঁটা নহে। ৬জয়গোপাল গোষাধী মহাশয় নিজের ও আমার নিকট একথা স্বীকার করিয়াছেন। অপরাধ প্রাচীনপুঁথি সম্পাদকগণের ভাষা প্রাচীন বর্ণবিজ্ঞানের প্রাকৃত রীতি কতকটা বদলাইয়াছেন; তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে অপ্রচলিত শব্দও পরিবর্তন করিয়াছেন; পয়রা ছন্দের বোধান ব্যতিক্রম পাইয়াছেন, দুই একটা শব্দ কমইয়া বাড়াইয়া নিয়মিত করিয়াছেন। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকর্ণ ও কামিনীদাস দাস প্রভৃতির পুথিতে বৈষ্ণব পরিবর্তন করা হইয়াছে করচায় ততদূরও করা হয় নাই।...কৃত্তিবাসাদি-সম্বন্ধে ঘটনাক্রমে প্রকাশকগণ বাহা করিয়াছেন করচা সম্বন্ধেও তিনি কতক পরিমাণে সেই রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না পুথিতে বৈধী কোন পরিবর্তন করা। মাঝে মাঝে প্রাচীন শব্দ বদলাইয়া তিনি পুস্তকখানিক সংক্ষেপে বাহা করিয়াছেন।...তিনি প্রাচীন জটিল শব্দ পরিবর্তন

করিয়াছেন, হয় ত কোন কীর্তীচন্দ্র ছাত্রাংশ হওয়াতে তাহা পুরণ করিয়া দিয়াছেন।’

নব সংস্করণে পুঁথীকার অপ্রচলিত শব্দ পরিবর্তনের স্থানে শ্রীবেণোদারীলাল গোষাধী প্রাচীন পুঁথী রক্ষা করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় ইহার বয়স প্রায় ৪০ ছিল (এখন বয়স ৭৫) এবং ইনি পিতার দক্ষিণে বস্তু স্বরূপ ছিলেন। ইনি এবং ইহার অল্প জ্যৈষ্ঠমোহনলাল গোষাধী (বর্তমান বয়স ৭৫) করচার প্রাচীন পুঁথি দেখিয়াছিলেন। দীনেশবাঁবু লিখিতেছেন, ‘বেনোদারীলাল বকীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার রচিত ‘খিচুড়ী’, ‘পোলাও’ প্রভৃতি গ্রন্থ বকীর কাব্যসাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার সরল ও তেজস্বিতা-পূর্ণ প্রকৃতি, কঠোর সত্য বলিতে মাইয়া তিনি সময় সময় মনুক সাধনাতাও রক্ষা করিতে পারেন না।’ এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন শ্রীবেণোদারীলাল গোষাধী মহাশয় লিখিতেছেন, ‘প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্বে শান্তিপূর-নিবাসী ৬কালিদাস নাথ কয়েকখানি বৈষ্ণব পুঁথি পিতার নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ‘করচা’ ও ‘অষ্টোত্তম-বিকাশ’ ছিল। বাবা কয়েকদিনে ‘করচা’খানি নকল করিয়া লইয়া উহা কালীদাসকে দেয়ত দেন। প্রায় ৩০-৪০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অল্পমিত। পরমভাগবত ৬মদণ্ডগোপাল গোষাধীর (১) সাহায্যে ইহার নষ্ট লিখন উদ্ধার হয়। (ইহার ৮৯ বৎসর পরে সন্ধ্যা প্রেস ডিপ্লিটরী হইতে ইহা প্রকাশিত হয়।) প্রায় ৪৫ বৎসর পরে কলিকাতায় ভক্তবর ৬শিশিরকুমার ঘোষাকে দেখিতে গিয়া বাবা অঙ্করু হইয়া স্বহস্ত-লিখিত কয়েক পৃষ্ঠা (২১০ কণ্ড) উহার নিকট রাখিয়া আসেন। শিশিরবাঁবু গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে বাবা নিজেই প্রকাশ করিবেন বলেন। মেরাদান্তে বাবা অনেক চিঠি লিখিলেন এবং

(২) শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৫ম সংস্করণ। এম-এ বহু বৈষ্ণব ও পণ্ডিত উক্ত করচা ও অ্যানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ের মৌলিক প্রামাণিকতা স্বীকার করেন।

(২) করচার ২য় সংস্করণ।

(১) ইহার কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমুকুলক গোষাধী মহাশয় চৈতন্যভাগবতের শৈল্যে ইহাকে ‘কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমহাভাগবত পণ্ডিতাগণ্য’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।



উত্তর না পাওবার শিশিরবাবুর নিকট গমন করিলেন। তিনি বলিলেন, “বৈহঙ্গ এও রাহস্তের সৃষ্টাদিক জাঃ শৃঙ্খল হুগোপাধ্যায়কে (১) ঐ ‘কয় পৃষ্ঠা পড়িতে দিয়াছিলাম, তিনি তাহা হারাইয়া কেনিয়াছেন।” ইতিমধ্যে কাশিলাস নাথ মালিককে ঐ পুথি ফেরত দিয়াছিলেন। স্বতরাং উহা আর পাওয়া গেল না। সৈবক্রমে দেখা গেল যে শাস্তিপুত্রের পাগলা গোষামীদের হরিনাথ গোষামীর নিকট একপাঠ ‘করচা’ আছে। উহা অসম্পূর্ণ ও পাঠ্য-বিস্তারিতোপে হইল। বাবার নিকট যে নোট ছিল ‘উহার সাহায্যে ঐ পুথির লেখা মিলাইয়া নষ্ট পত্রখানির পুনরুদ্ধার হইল, এবং ঐ পুথি ফেরত দেওয়া হইল। শিশিরবাবু গোবিন্দদাসকে ‘করচা’ বলিয়াছিলেন, এবং ২২৭ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫১ পৃষ্ঠার (২) ‘হাঁটু ধরি মন রার করেন কখন’ পর্যন্ত (নষ্ট অংশ) প্রগ্রামিণীক বলেন, কিন্তু তিনি ‘অমির নিমাই-চরিত, ৪ষ্ঠ বর্গে’ চৈতন্যচরিতের দাক্ষিণাত্য-সম্বন্ধ ‘করচার’ বর্ণনা অবলম্বন করিয়াই নিখিয়াছেন। পরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীনগেন্দ্রনাথ বহু ও ৬ কাশিলাস নাথ-কর্তৃক সম্পাদিত ‘অন্নানন্দে চৈতন্যমঙ্গল’ গোবিন্দদাসকে ‘করচার’ বলিয়া উল্লেখ থাকায় সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইল। ৬মতিলাস ঘোষ ও ‘বিষ্ণুপুঞ্জ’ পত্রিকার ‘করচার’ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত করিয়াছিলেন। এখন আবার সমগ্র পুথিখানিকে জাল প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। অনুবাদকার অক্ষিৎ হইতেই এই আন্দোলনের আরম্ভ, পরে শাস্তিপুত্র ও অজ্ঞাত হলে ইহার বিবৃতি হইয়াছে।”

নব সত্যব্রতের ভূমিকায় শাস্তিপুত্র-গৌরব শ্রীরাধাবিনোদ গোষামীর ও প্রধান শিল্পক ঐশ্বর্যবোধ দায়, বি-এ, (ইহার স্পষ্ট নামোচ্চের নাই) মহোদয়ব্রতের উপর অঙ্গত প্লেব থাকায় আক্ষেপের কারণ হইয়াছে। জমিত রাধাবিনোদ না কি চাক্ষু প্রকাশ্য সত্যায় বলিয়াছিলেন যে করচা জাল করার কথা তিনি নিজে জানেন এবং ৬৩য় গোপাল গোষামীর তচ্ছদ ‘একধরে’ হইয়াছিলেন। (পূর্বে এই শেষ কথাটির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।) শ্রীবেণী-রাধালাল

গোষামীর লিখিতেছেন, “রাধাবিনোদ তখন অজ্ঞান নাই, অথবা ঘৃহস্থনে হাণ্ডাওড়ি দিতেছিলেন।” বোধ হয় রাধাবিনোদ শোনা কথাই বলিয়াছিলেন; বিবেচনাব্যব-সম্বন্ধেও সঠিক সংবাদ বাহির হয় নাই। ঢাকা স্বর্ণগামের যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় (বিক্রম বালীর মতো কলৈক প্রবান স্থানীয়) ১৯২৫ ও ১৯২৬ পৃষ্ঠাগুলির ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’য় করচা ও নীনেশবাবুর বিরুদ্ধে বহু কথা লিখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন (১) যে নবপীপে ১৩১ মাঘ ৬ অমৃতবাধাসম্বৃত্ত প্রবানব গোষামীর ভবনে বিবেচনাব্যবসর সহিত তাহার প্রমাণ হইয়াছিল; এবং ‘বিবেচনাব্যবসর তাহাকে করচা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। বিবেচনাব্যবসর যোগেন্দ্রবাবুর কতিপয় কথা আপত্তি করেন। (২) যোগেন্দ্রবাবু ও উহার প্রতিবাদ করেন। (৩) সংক্ষেপতঃ এইরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল—বিবেচনাব্যবসর পূর্বে অন্নগোপাল গোষামীর দ্বারা ছিলেন; পড়িত মহাপ্রাণ প্রধান শিল্পক রামহরজত বী, বি-এল, সত্যীচন্দ্র রায়, এম্-এ, ও আন্তর্যে বন্দোপাধ্যায়, এম্-এর অধীনে প্রায় চল্লিশ বৎসর কার্য করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অবসর গন; এবং বিবেচনাব্যবসর তাহার চতুর্থ শিল্পক পাকা কালে শ্রীগোবিন্দ-সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাওয়া, পড়িতমহাশয় তাহার ‘হৃদয় হৃদয়’ দ্বারা লিখিত অসম্পূর্ণ ‘করচা’ বানি তাহাকে দিয়া ছিলেন। ১৮৫ তারিখের পত্রিকায় আরও লিখিত আছে যে পড়িত মহাশয় না কি প্রথমতঃ বিবেচনাব্যবসর বলেন যে, রাধাবিনোদ যজ্ঞবল্ক্য ঘোষ ঐ পাতাগুলি হারাইয়া ফেলেন, পরে বলেন যে ৬শিশিরবাবুর ঘোষই উহা হারান এবং অন্ততঃ বলেন যে পুথিখানি তিনি রাত্রেই হইতে পুথিখানি হারাইয়াছেন; আরও লিখিত আছে যে, বিবেচনাব্যবসর না কি ‘অসম্পূর্ণ অংশ’ বানি গোষামীর মহাশয়কে সম্পূর্ণ করিতে বলিয়াছিলেন; ইত্যাদি।

নীনেশবাবুর ভূমিকায় লিখিত পূর্বোক্ত অঙ্গত স্নেহ উদ্ধৃত হইল—“শাস্তিপুত্রবানী আর এক মহোদয় বলিতেছেন,

- (১) অমৃতবাজার পত্রিকা। ১৮৫/১৯২৬
- (২) অমৃতবাজার পত্রিকা। ১৯১৫/১৯২৬
- (৩) অমৃতবাজার পত্রিকা। ১৯১৫/১৯২৬

‘গোষামীর মহাশয় পুথির কয়েক পৃষ্ঠা হারাইয়া বহুজাল নিষ্ঠেই হইয়া বসিয়াছিলেন, আমিই তাহাকে সে কয়েক পাতা জাল (১) করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।’ বালক বেকপ মহাশয় দোকানের মিঠাই পাইলে তখনই তাহা গলাগল করণ করে, গোষামীর মহাশয়ও না কি সেই ‘স্বপ্নপরামর্শ’টা তখনই গ্রহণ করিয়া ঐ কয়েক পৃষ্ঠা জাল করিয়া ফেলেন।” স্বপ্নপটভাবে লিখিত তাহার একই বর্ণনা একান্ত অস্বাভাবিক।

উপর্যুক্ত ভূমিকায় লিখিত আছে যে প্রাক্তন যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় বিরুদ্ধ লেখা ব্যতীত নানা-প্ৰতিবাদ সভাসমিতিও অবদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাহার ‘গৌরব ও তাহার ধর্মগৌরব’ পুস্তকে ‘করচা’ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রামবাহাদুর চৌধুরায় মিত্র মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “৬৩য় গোপাল গোষামীর ‘করচা’কে বিভাগ-পাঠ্য করাইবার জন্য আমার নিকট আনিয়াছিলেন। আমি তাহাকে প্রকৃত কথা বলিতে বলি। তাহার আকার-ইদিকে তিনি কয়েক পাতা জাল করিয়াছেন বলিয়া আমার স্পষ্ট ধারণা হইল।” ইহার উত্তরে শ্রীবেণীরাধালাল গোষামীর লিখিতেছেন, “সে কথা বাবা পড়ের আলাপী, পাড়ীর সহ্যাতী রসময়ের নিকট রসোপার্ণাব অবতী করিতেন না। পাণ-গোপন লোকের ভদ্রা, স্বকৃত পাণ-প্রচার করিবার জন্য প্রাণি গোষামীর মহাশয় রসময় জ্ঞান গণায় বাঁধিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন—ইহা বিবাস করিবার প্রযুক্তি হয় না।”

ঐ ভূমিকায় আরও লিখিত হইয়াছে যে বাবুলার প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কচূড়ামণি প্রায় ৩৪৫৬ বৎসর পূর্বে হুগলীর নিকট কেউটার ৬৩য় গোপাল চক্রবর্তীর সমীপে ‘করচা’ পুথি দেখিয়াছিলেন; উহা কীটপে ও কীট ছিল, তিনি উহা নকল করিতেন এবং তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে জাকিয়া দেখাইতেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলেন যে, ৬৩য় গোপাল গোষামীর হৃদিত পুস্তক ও ঐ পুথি একপ্রকার। সে যে পুস্তকে করচা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে নীনেশবাবু তাহার একটা তালিকা দিয়াছেন। তিনি

নিম্নে ‘দি কলিকাতা রিভিউ’ (১) বহুমন্ত্রী (২) প্রকৃতি পত্রিকায় ও বহু গ্রন্থে (৩) উহার প্রামাণিকতা নির্ধারণ করিয়াছেন। প্রবাসী (৪), গোষ্ঠী, বিষ্ণুজিলা, সাধনা (কুমিল্লা), আনন্দবাজার প্রকৃতি পত্রে যে বস বিরুদ্ধ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল নীনেশবাবু তাহারও প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে প্রায় ৩৭৫ বৎসর পূর্বের বঙ্গবাসীর মতের লেখার, চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীতে ও চৈতন্যভাগবতে ঐ গোষামিদের উল্লেখ আছে এবং ‘করচা’ যে নোট এতদিন জুগুপ্স ছিল এবং কেন এখন তাহার চাক্ষু প্রমাণ পাওয়া যায় না তাহার কারণও নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার জন্য তাহাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। ৬৩য় গোপাল গোষামীর মহাশয়ও কল লিখিত হয় নাই। নব সত্যব্রতের উৎসর্গে এইরূপ লিখিত আবে-

যে শিবকল্প পুস্তকব্রতের জটিল সাধনা-বিমুক্ত

ভগবৎপ্রেম

নবদীপদামকে দ্বিতীয় হরিব্রতের পরিণত করিয়া

হৃদিত পরিগ্রহ করিয়াছিল,

ভক্তি-হুমাচাচারের অঙ্গতঃ—মাধবস্বপ্নপুত্রীয় প্রিয় শিষ্য

সেই ভগবৎপ্রেম ঐ অমৃত প্রভুর

বহুমন্ত্রী

অশেষ নিগ্রহ ও অকৃতজ্ঞতা-লাঞ্ছিত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত,

প্রদীপ্ত স্বর্গীয় অন্নগোপাল গোষামীর মহাভাগ

—মিনি তদীয় পুণ্যমোক্ষ পিতৃপুত্রের

ছন্দাংহুতী হইয়া

ভক্তিগন্ধার ক্ষুদ্র শাখাঙ্গণ—বিশুতির বাগুকাতে

লুপ্তায়িত—গোবিন্দদাসের করচা

‘আবিস্কার পুস্তক গোবিন্দ-চাক্ষুরের নবনীলার

চিহ্নালেশে’ উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন,—

তাঁহারই পবিত্র নামে

করচার এই নব সত্যব্রতখানি

উৎসর্গ করিলাম।

- (১) রিভিউ, ১৯২৫। (২) চৈত্র, ১৩৩১। (৩) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ। (৪) শ্রাবণ, ১৩৩২।

(১) ইনি শাস্তিপুত্রের বরজী বংশের সন্তান।

(২) বর্তমান সংস্করণের ২১ পৃষ্ঠা।



১। মনঃশুদ্ধি



ইহার প্রামাণিকতার বড় সাক্ষী। মহাপ্রভু প্রাণিসাত্তান যে দেবচিহ্ন গোবিন্দ আঁকিয়াছেন, তাহাই তাহার প্রধান সাক্ষী। যে ভৌগোলিক চিত্র তিনি দিয়াছেন তাহাই তাহার প্রধান সাক্ষী।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনও উক্ত হইল—“বর্তমান জেলার কাঞ্চননগর গ্রামনিবাসী কর্ণকর-জাতীয় গোবিন্দ দাম ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে পত্নী শশিসুখীর সহিত

কলহ করিয়া গৃহত্যাগ করেন। তিনি নব্বীপে চৈতন্তদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তদবধি তাহার সঙ্গী ছিলেন। দক্ষিণাপথে তীর্থযাত্রাকালে গোবিন্দ চৈতন্তদেবের সহচর ছিলেন। তিনি গোপনে তীর্থযাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।” (১) ক্রমশঃ

১। বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় ভাগ।

## আলাপ-আলোচনা

ভারতবর্ষের সমানপ্রাপ্তি

সম্প্রতি ন্যূনের পাঁচকু গিয়াছে যে, আমেরিকার সান-ফ্রানসিসকো শহরের ‘কালিকোপিয়া একেডমি অফ সায়েন্স’-এর কর্তৃপক্ষেরা ভারতের ‘জলজিকান্দ’ শরতে অফ ইণ্ডিয়া’র অস্থায়ী অধ্যক্ষ ডাঃ বেনীপ্রসাদকে তাহাদের অবৈতনিক সভ্য পদে মনোনীত করিয়াছেন। শঙ্খ-শত্ৰুকাঙ্গি-বিষয়ক বিজ্ঞানে তাহার গবেষণার গণ্যে খ্যাতি আছে। তিনি বিজ্ঞানের এই বিভাগে অনেক নূতন সত্যের সন্ধান দিয়াছেন। ইতিপূর্বে কোন ভারতবাসী এ সম্মানার্হ পদ পান নাই।

উত্তর-ভারতের লবণ-পর্লতমালায় অভিযান

আমেরিকার ইয়েল-বিখবিদ্যালয়ের উদ্যোগে তথাকার ছবিদ্যার অধ্যাপক হেলমুত দে তেরার কর্তৃবাহীনে উত্তর-

ভারতের লবণ-পর্লতমালা (‘গল্ট রেজ’) নামক ছোট পর্লত শ্রেণীর ভূত্ব ও প্রাচীন জীবজন্তু-বিষয়ক বিজ্ঞান-সম্বন্ধে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত একটা অভিযান ভারতে প্রেরিত হইয়াছে। ওঁহারা গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়্য দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছেন, সেখান হইতে তিনি লাডাক প্রভৃতি স্থানে অন্বেষণ করিবার জন্য শ্রীনগর যাত্রা করিবেন। উক্ত বিষয়ের কোন বিশেষজ্ঞ এ সকল স্থানে ইতিপূর্বে ভাল করিয়া অন্বেষণ করেন নাই। সেইজন্য অধ্যক্ষ মহাশয় বলেন যে, এ সব জায়গা খনন করিলে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে যাহা হারা আদিম মানবের ক্রম-বিকাশ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরও দৃষ্টি হইয়া উঠিবে। অধ্যক্ষ মহাশয় ব্যতীত এই অভিযানে তাহার পত্নী, প্রাণীতত্ত্ববিদ অধ্যাপক জি. ই. হাট্টিংসন, পুয়াতন জীব-জন্তু-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জি. ই. গিউটসন আছেন।